

কদমঞ্জরী

নারায়ণ সান্যাল



রূপমঞ্জরী

প্রথম খণ্ড

নারায়ণ সান্যাল

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা 700 073

RUPAMANJARI. Rs. 80/-
Part I
NARAYAN SANYAL

Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street
Calcutta : 700 073

রচনাকাল : 1988

প্রথম প্রকাশ :

বইমেলা, মাঘ, ১৩৯৬

জানুয়ারী, 1990

প্রকাশক :

সুধাংশুকুমার দে

দে'জ পাবলিশিং

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলকাতা-700 073

অঙ্করণ : সুধীর মৈত্র, গৌতম দাশগুপ্ত, লেখক

ফটো অফসেট কম্পোজিশান :

গ্রাফিটেক ইণ্ডিয়া লিমিটেড

216/3এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড

কলিকাতা-700 017

প্রচ্ছদ : গৌতম দাশগুপ্ত, আলোকচিত্র : বিপুল বসু

শব্দসজ্জা :

'ফাস্ট' শিল্পীবৃন্দ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা 700 009.

মুদ্রক :

শ্রী স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট, 13, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-700 073

প্রুফ - নিরীক্ষা : সুবাস মৈত্র

© সবিতা সান্যাল

দাম : ৮০ টাকা

উৎসর্গ

মহর্ষি

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

রাজ্যনুগ্রহমণ্ডিত নিষ্কর ব্রহ্মত্রা বা বৃত্তি, পণ্ডিতসমাজের
উপাধিদানের প্রস্তাব আর ছাত্রদের সম্মানদক্ষিণা বা 'সিধা'
তুমি ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছিলে।

দুশ বছর স্বর্গবাসের পর তোমার মতটা কি কিছু পালটেছে?
তাহলে

ধূলিধূসরিত চরণপ্রান্তে এই অর্ঘ্যটি সমর্পণের সৌভাগ্য
থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না।

শ্রদ্ধাবিনম্র

বাবুজী সান্দ্রা
১.১.৯০

রূপমঞ্জরীর অগ্রজ :

শিশুসাহিত্য (যুগ্মাক্ষর বর্জিত)

হাতি আর হাতি

কিশোর সাহিত্য

কালো-কালো
শা লক হেবো
কিশোর অমনিবাস
না-মানুষের পাঁচালী
রাফেল
না-মানুষের কাহিনী
নাকউচু

সদ্য-সাক্ষর সাহিত্য

গ্রাম্যবাস্তু
পরিকল্পিত পরিবার
দেশেমিলি

জীবনী ভিত্তিক

আমি নেতাজীকে দেখেছি
আমি রাসবিহারীকে দেখেছি
লিঙবার্গ
রোদাঁ

গবেষণামূলক

নেতাজী রহস্য সম্বন্ধে
পয়োমুখম
গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা
চীনভারত লঙমার্চ
অরিগামি
বাস্তুবিজ্ঞান
গ্রামের বাড়ি

উদ্ভাস্ত-বিষয়ক সাহিত্য

বকুলতলা পি-এল-ক্যাম্প
বঙ্গীক
অরশাদগুক

ভ্রমণ-ভিত্তিক রচনা

পথের মহাপ্রস্থান
জাপান থেকে ফিরে
দণ্ডকশবরী
ডিজনেল্যাণ্ড

কথাসাহিত্য

ব্রাত্য
মনামী
অন্তলীনা
অলক নন্দা
নীলিমায় নীল
সত্যকাম
তাজের স্বপ্ন
পাষণ্ড পণ্ডিত
প্যারাবোলা স্যার
আবার যদি ইচ্ছা কর
অল্লীলতার দায়ে
লালত্রিকোণ
প্রবঞ্চক
পুরবৈয়া
মিলনাস্তক

রহস্যরোমাঞ্চ-গোয়েন্দা

নাগচম্পা
সোনার কাঁটা
মাছের কাঁটা
পথের কাঁটা
ঘড়ির কাঁটা
উলের কাঁটা
কুলের কাঁটা
আঁআ কখনের কাঁটা
সারমেয় গেডুকের কাঁটা
অচ্ছেদবন্ধন
ছৌবল
ছয়তানের খাওয়াল

না-মানুষ ভিত্তিক

গজমুক্তা
তিমি-তিমিসিল
না-মানুষী বিশ্বকোষ
(অমেরুদণ্ডী)

বিজ্ঞান-ভিত্তিক

বিশ্বাসঘাতক
আজি হতে শতবর্ষ পরে
নক্ষত্রলোকের দেবতাস্বা
অবাক পৃথিবী
হে হংস-বলাকা

স্মৃতিচারণ ধর্মী

পঞ্চাশোর্ধ্ব
ষটি-একষটি
আবার সে এসেছে
ফিরিয়া

শিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্য

অজন্তা অপরাণা
কারুতীর্থ কলিঙ্গ
ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন
লা-জবাব দেহলী
অপরাণ আগ্রা

দেবদাসী-সংশ্লিষ্ট

সুতনুকা একটি
দেবদাসীর নাম
সুতনুকা কোন
দেবদাসীর নাম নয়

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মহাকাশের মন্দির
হংসেশ্বরী
আনন্দস্বরূপিনী
লাডলিবেগম

স্বীকার্য— অষ্টাদশ শতাব্দীর চালচিহ্নে একটি বৃহদায়তন উপন্যাস রচনার এই ইচ্ছটা হঠাৎ কেন জাগল সে-বিষয়ে আপনাদের কৌতূহল হতেই পারে। বিশেষত আজ বছর-দশেক ধরে লেখনাদ্দো দ্য ভিঞ্চির বিষয়ে কাগজপত্র, বই ইত্যাদি সংগ্রহ করে চলেছি, নোট রাখছি, কাজে হাত দিতে পারিনি হঠাৎ একটা ‘না-মানুষী’ দরদ উথলে ওঠায়। সে ‘বিশ্বকোষ’ও অসমাপ্ত — শুধু ঐ অমেরুদণ্ডী পর্যায়টুকু পাড়ি দেওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে—

কী জানেন? খেয়াল-বেখেয়ালে কোন-গানের তান যে ধরে বসবে ঐ ‘সাধের লাউ’ তা কি বাউল নিজেই আগে-ভাগে টের পায়? আঙুলের সঙ্গে গুবগুবির আতাত, কঠকে গলা মেলাতেই হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন ‘বঙ্গের নবযুগ’, পরে যার নাম হয় ‘বেঙ্গল রেনেসাঁস’, তার উপর যথেষ্ট গবেষণাগ্রন্থ আছে; অগুনতি গবেষক তাঁদের বঙ্কমণিলাকায় সেই সময়-এর অসংখ্য মণিমাণিক্য সমুৎকীর্ণ করে রেখেছেন। তাই সেই সময়ের মালা গাঁথা দুঃসাধ্য হতে পারে, অসাধ্য নয়। সাম্প্রতিককালে বৃহদাকারে সে-চেষ্টা করাও হয়েছে। আমি নৌকাটাকে ঠেলতে ঠেলতে আরও একশ বছর উজানে নিয়ে যেতে চেয়েছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় প্রাক-রামমোহনের ‘সেই তর’ যুগের বঙ্গসমাজ তথা গৌড়-সংস্কৃতি গভীর তমসচ্ছন্ন।

কোন ধারাবাহিক সাহিত্য-সাপ্তাহিকে অথবা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয়াতে যদি এ রচনা প্রকাশ করা সম্ভবপর হত তাহলে যে-সব তথ্যগত বিচ্যুতি বা ‘কালানৌচিত্যদোষ’ (অ্যানাক্রনিজম) আমার অজ্ঞতাবশত রয়ে গেল তার অনেকটাই সংশোধন করা যেত। এ-জাতীয় বৃহৎ কাজে সেটা বাঞ্ছনীয়। তাহলে ধারাবাহিক প্রকাশকালে সতর্ক ও গবেষকমনা পাঠকের ইঁসিয়ারিতে লেখক মার্জনার সুযোগ পায়। উভয় অর্থেই ‘মার্জনা’। সম্পাদকের কাছে লেখা সতর্ক পাঠকের চিঠির কল্যাণে গ্রন্থাকারে প্রকাশ কালে সংশোধনগুলি করা চলে এবং লেখক মার্জনা চেয়ে নেবার অবকাশ পায়। দুর্ভাগ্যবশত সে সুযোগ পাইনি।

তবে সজ্ঞানে কিছু কিছু কালানৌচিত্য-দোষ উপেক্ষা করেছি কথাসাহিত্যের অনুরোধে। কথাসাহিত্যিককে এ জাতীয় ছাড়পত্র দিয়ে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ প্রবন্ধে। তাছাড়া স্বীকৃতিতে পাপের কিছুটা স্থালন হয়। তাই এখানে তা লিপিবদ্ধ করে যাই। ঐতিহাসিক চরিত্রের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি তা গ্রন্থমধ্যেই স্বীকার করা গেছে— যেমন ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রাধার প্রথম সাক্ষাৎ, রামপ্রসাদের বাগানের বেড়াবাঁধা, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পরিবারে সতীদাহ ইত্যাদি। সজ্ঞান কালবিরোধ-দোষগুলি ইতিহাসের সামগ্রিক স্বরূপকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করেনি বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে কট্টর ইতিহাসবিদদের মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে যতদূর মনে পড়ে স্বীকার করে যাই:

1. কাহিনী অনুসারে রাপেশ্বনাথ 1742 খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের পর্ণকুটীরে ‘বিদ্যাসুন্দর’-এর পাণ্ডুলিপি পড়েন; অথচ অধিকাংশ বাঙলা-সাহিত্যের পণ্ডিতদের মতে (ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ ভূদেব চৌধুরী সহ) অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ হয়েছিল 1752 খ্রীষ্টাব্দে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে আলিবর্দীর কাছ থেকে মুক্তি পাবার পর স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 1743 খ্রীষ্টাব্দে কালিকামঙ্গল লিখতে বলেন এবং রচনা সমাপ্ত হয় 1752-53তে। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের মতেও ‘বিদ্যাসুন্দর’ সম্পূর্ণ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে।

2. গবেষকদের মতে নদীয়া কৃষ্ণনগরে ‘বারোদোল’-এর মেলায় সূচনা পলাশীযুদ্ধের পরবর্তীকালে। শতাব্দীর চতুর্দশকে তার বর্ণনা: অ্যানাক্রনিজম।

3. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যদি 1743 সালে স্বপ্নটা দেখে থাকেন তাহলে তার পূর্ব বৎসর রূপেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রীপূজা দেখেন কোন সুবাদে ?

4. ফরাসী গভর্নর ডুপ্লেস্স (আজে হ্যাঁ, উচ্চারণটা ঐভাবেই দেখানো হয়েছে চেম্বার্স বাইওগ্রাফিকাল ডিক্সনারীতে — ‘দুপ্লে’ বা ‘ডুপ্লে’ নয়) চন্দননগরে যে বছর প্রথমে আসেন তার পূর্ববৎসর তাঁকে চন্দননগরে দেখানো হয়েছে।
এইসব ‘কালানৌচিত্যাদোষ’গুলিকে পাণ্ডা দেওয়া হয়নি! এই অজুহাতে বিদ্যাসন্দর, বারোদোল, জগদ্ধাত্রীপূজা বা ডুপ্লেস্সকে বাদ দেওয়ার ইচ্ছে হয়নি। ঠিক যে যুক্তিতে ‘দ্রবময়ী’র কথাও উপেক্ষা করা যায়নি।

এছাড়া অন্তর্বাসী হওয়ায় হাতের কাছে ভালো গ্রন্থাগার ছিল না — তা অবশ্য কোন কালেই ছিল না। কিন্তু যত বয়স বাড়ছে ততই দেখছি ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সেই বেলভেডিয়ার প্রমোদভবনটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। কালের দূরত্বে নয়, ভৌগোলিক বিচারে। জাতীয় গ্রন্থাগারগামী পাবলিক-বাসের হাতল আরও পিছলি, পা-দানি আরও সন্ধীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে বঙ্গসাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-আশ্রিত যে গ্রন্থটি নানা পুরস্কারে অভিনন্দিত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাতে এই চতুর্মাত্রিক বিশ্বপ্রপঞ্চের ঘন জ্যামিতির প্রথম তিনটি মাত্রা ছিল ধ্রুবক; শুধুমাত্র চতুর্থমাত্রাটি ছিল পরিবর্তনশীল: ‘সময়’! লেখকের স্বীকৃতিমতে যে তাঁর নায়ক। সেই সময়-এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল শহর-কলকাতার চৌহদ্দী; উচ্চতা — যেহেতু গোবিন্দ মিত্রের ‘ব্ল্যাক-প্যাগোডা’ ধূলিসাৎ — তাই 1828 সালে নির্মিত নেপালজয়-স্মারকের চূড়া। অধর্মের ক্ষেত্রে শুধু ‘সময়’ নয়, ভৌগোলিক মাত্রা তিনটিও সর্বদা পরিবর্তনশীল। ডিহি-গোবিন্দপুর-সুতানুটি তখন আতুড় ঘরে। তাই এ অধমুকু দাবড়ে বেড়াতে হয়েছে তদানীন্তন বৃহত্তর-বঙ্গের — অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের — এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। কখনো বা বঙ্গ-সংস্কৃতির উপনিবেশ — কাশীধাম! পাঠক-পাঠিকা যাতে লেখকের মতো দিশেহারা না হয়ে পড়েন তাই মার্জিনে স্থান-কালের ইঙ্গিত রাখা গেছে।

শেষ কথা: ঊনবিংশ শতাব্দী সাদা-কালোয় মেশানো। সে যেন শরৎকালের আকাশ। মেঘরৌদ্রের লুকোচুরি। এদিকে বাইজী-বেড়ালের বিয়ে-বুলবুল-বাবুকালচার, ওদিকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অতল সাধনার আশীর্বাদ। তুলনায় বক্ষ্যমাণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের ‘সেই-তর সময়’ নীরঞ্জন অন্ধকারাচ্ছন্ন আবণের অমরাত্রি। শুধুমাত্র তথ্যের অপ্রতুলতা নয়, যেটুকু দৃষ্টিগোচর তাও পঙ্কিল, ক্রেদান্ত, আদ্যস্ত পুতিগন্ধময় পুরীষ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অথবা রামপ্রসাদের বিশুদ্ধ কালীভক্তি সমকালীন গৌড়জনের সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত। সতীদাহ প্রথাটাকে তখনো কারও আপত্তিকর বলে মনে হয়নি, বিধবাবিবাহ একটা অলীক দিব্যস্বপ্ন, কুলীনপাত্রের ধর্মপত্নীর সংখ্যা গুনতি করা হত ‘কুড়ি’-র এককে। স্ত্রীশিক্ষা এবং বৈধব্যযোগ্য বাগথের মতো সম্পৃক্ত!

জাতীয় উন্মাদনায় প্রাকস্বাধীনতাকালে সিরাজ বা মহারাজ নন্দকুমারকে আদর্শ নায়ক খাড়া করার প্রচেষ্টা হয়েছিল বটে কিন্তু আজ আমরা বুঝি — তার অনেকটাই ফাঁকা বুলি। তাহলে? এমনটা তো হবার কথা নয়? বিবর্তনের একটি ফলস্বরূপ যে থাকতেই হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কেউ-না-কেউ নদীয়ার সেই প্রেমানন্দে-পাগল বিদ্রোহী পণ্ডিতের পূর্ণকুটীর থেকে হোমায়ি শিখাটি নিশ্চয় পৌছে দিয়েছিলেন রাখানগরের রাজপ্রাসাদে — জ্ঞানগরিমার দাটো সমুদ্রতীর নবীন ঋত্বিকের হাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় যখন প্রত্যক্ষ সত্য তখন কেউ-না-কেউ নিশ্চয় গোপনে করে গেছেন অষ্টাদশ-শতাব্দীর অমানিশায় অতল ‘রাত্রির তপস্যা’। বুড়ো ইতিহাস কথাটা বে-মালুম ভুলে গিয়ে আছে।

খুঁজতে শুরু করলাম অন্ধকারে হাংড়ে হাংড়ে। একটি অলোকসামান্য ঐতিহাসিক নায়কোচিত চরিত্রকে খুঁজেও পেলাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর কালীপ্রসন্ন সিংহ শুধু নয়, বীরসিংহের সিংহশিখর

পালাপাশিও তাঁকে বেমানান লাগত না—কী পাণ্ডিত্যে, কী সরলতায়, কী চারিত্রিক দার্ঢ্যে! কিন্তু পরে শনে হল—যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে আদর্শ নায়ক করে অষ্টাদশ শতাব্দীকে কজা করতে চাইছি, সেই ‘শুণটাই তাঁর ‘দোষ’! তাঁর কোন প্রামাণিক জীবনী নেই। ‘বাঙালী চরিতাভিধান’-এর পণ্ডিতেরা না খুঁজে পেয়েছেন তাঁর জন্ম তারিখ, না তিরোধান দিবস! ওমা, সেকি! কেন? সমকালীন পণ্ডিতদের বিস্তারিত পরিচয় সমন্বিত একাধিক পুথি তো আছে? হ্যাঁ তা আছে। তিন-গোষ্ঠীভুক্ত দলেরইঃ নবদ্বীপকেন্দ্রিক, ভাটপাড়া কেন্দ্রিক এবং ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম কেন্দ্রিক। নেই শুধু সেই অস্ত্রবাসী, অসামাজিক, অরণ্যচারীর পরিচয়! সঙ্গত হেতুতে। সেই আত্মাভিমানী পণ্ডিত সমকালীন মহামহোপাধ্যায়দের পদাঙ্ক অনুসরণে—নবদ্বীপের জ্যোতিষ শঙ্কর তর্কবাগীশ থেকে ত্রিবেণীর ক্ষণজন্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো—‘লাঙ্গুলহীন শৃগাল’ হতে স্বীকৃত হননি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং উপযাচক হয়ে তাঁর পর্ণকুটারে এসেছিলেন বৃত্তিদানের প্রস্তাব নিয়ে, রাজানুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করে তিষ্ঠিড়ি-পত্রপ্রেমী সেই আজীবন অরণ্যচারী ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রইলেন: ‘বুনো’ রামনাথ নামে।

ইতিহাস রচনা করে রাজার বেতনভূক্ত একডালে-বসা ‘হম-সব-পঙ্কী’। ইদানীং যেমন রাজনৈতিক দলের পাটি-ফান্ড অথবা বৃহৎ পত্রিকা-গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে সাহিত্যের বিচার-সমালোচনা-ইতিহাস রচিত হয়, সে-কালেও তাই হত। যুগে-যুগে একডালে-বসা একই রঙের পালকধারী পার্শ্ববর্তী কণ্ঠকূহরে গেয়ে চলে, “তোর গানে পেঁচি রে/সব ভুলে গেছি রে!”

এ ‘বুনো বামনের’ নামটা ইতিহাসের পাতা থেকে একেবারে মুছে ফেলা যায়নি। উপায় কী? কিছু কিছু তথ্য যে চাপা দেওয়া যায় না। যেমন রাজা নবকৃষ্ণের সেই ‘আন্তর্জাতিক’ বিচারসভার ইতিবৃত্তটা। ভারতজয়ী দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে সবাই যখন অধোবদন—মায়, নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ, শাস্তিপুরের গোস্বামীপাদ রাধামোহন বিদ্যাব্যাসম্পতি, এমনকি ত্রিবেণীর সেই ‘শতাব্দীর-শ্রেষ্ঠ-পণ্ডিত’ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন স্বয়ং, তখন গৌড়দেশকে ভরাডুবি হতে রক্ষা করতে বিচারসভায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এ অস্ত্রবাসী ‘বুনো’ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত! দক্ষিণাত্যের পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেলেন দক্ষিণাত্যে, চীরধারী চির-অপরাজেয় ‘বুনো’-পণ্ডিত ফিরে গেলেন বনে।

তথ্যের অপ্রতুলতাজনিত কারণে ইতিহাসে উপেক্ষিত সেই অস্ত্রবাসী এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক হবার অনুপযুক্ত।

না! ভুল হল! বরং বলা উচিত: অর্থলোভী, যশোলোভী বিংশ শতাব্দীর কোনও শহুরে কথাসাহিত্যিক তাঁকে নায়করূপে লাভ করার অনুপযুক্ত।

অনুসন্ধানকার্যে ক্ষান্ত হইনি তা বলে।

খুঁজতে-খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে হাতে এল চব্বিশ-পৃষ্ঠার একটি চটি বই। ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রামাণিক। প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। লেখক: ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যসাধক চরিতমালার ঊননব্বইতম পুস্তিকাটি: চতুষ্পাঠীর যুগে বিদ্যুৎ মহিলা।

তিনজন অসামান্য বিদ্যুৎর কথ্য লিখে গেছেন গবেষক: হটী বিদ্যালঙ্কার (1743?-1810), হটী বিদ্যালঙ্কার (1775?-1875?) এবং দ্রবময়ী (1837?-?)

স্মৃতিত হয়ে গেলাম। যা খুঁজছি এতদিন! নায়ক নয়, নায়িকা।

তৃতীয়জন ঊনবিংশ শতাব্দীর; কিন্তু প্রথম দুজনের জীবনের অনেকটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর। দুজনেরই আদি নিবাস বর্ধমানভুক্তিতে। হটীর পিতৃপরিচয় জানা যায় না। জন্ম: সে-একটি বর্ধমান। পিতার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শেখেন। বিধবা হবার পর তাঁর পিতৃদেব তাঁকে সহমরণে যেতে দেননি। পিতৃবিয়োগের পরে তিনি কাশীধামে চলে যান, সেখানে স্মৃতি, ব্যাকরণ ও নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে অসাধারণ জ্ঞানার্জন করেন। কাশীর পণ্ডিত সমাজ তাঁকে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি দান করেন। সেখানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন, প্রকাশ্যে পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে যোগ দিতেন এবং চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মতো দক্ষিণা গ্রহণ করতেন।

অপরক্ষণে হট্ট বিদ্যালঙ্কার, ওরফে ‘রূপমঞ্জরী’ হট্টী অপেক্ষা প্রায় তিন দশকের অনুজ। জন্ম: কলাইঝাট, বর্ধমান। পিতা পরমবৈষ্ণব নারায়ণ দাস। কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় করে তিনি প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় আত্মজার বাল্যবিবাহ দিতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে তাঁকে নানা বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলেন — ব্যাকরণ, সাহিত্য, নবান্যায় এবং চিকিৎসাবিদ্যা। রূপমঞ্জরী পরে সরগ্রামনিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে সাহিত্য এবং চরক, সূত্রত, নিদান ইত্যাদি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি চিরকুমারী। আশ্চর্যের কথা, ইনি পুরুষদের মতো মস্তক-মুণ্ডন, শিখাধারণ এবং উত্তরীয় পরিধান করতেন।

এই দুজন অলোকসামান্য মহিলার পূর্ণ পরিচয় পুরিশিষ্টে সংযুক্ত করা গেছে, যাতে ঐ দুই অসামান্যর বাস্তবজীবনের উপাদানের মিশ্রণে এই বিংশশতাব্দীর নারায়ণদাসের মানসকন্যার জীবনীটা আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়! বিশ্বাস করা শক্ত বই কি! রাজা রামমোহন যখন হামাগুড়ি দিতে শেখেননি তখন কোন পিতৃহীন বালবিধবা চিত্রাঙ্কিত বারাগসীধামে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি নিয়ে বিচারসভায় পুরুষদের সঙ্গে তর্ক করছেন, লেখকের কল্পনায় নয়, বাস্তবে — এটা সহজে মেনে নেওয়া কঠিন! কিংবা রামমোহনের প্রায় সমবয়সী একটি বাঙালী মহিলা পুরুষের বেশে স্বগ্রামে নরনারী নির্বিশেষে চিকিৎসা করছেন, ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখাচ্ছেন এ কি সহজে বিশ্বাসযোগ্য?

না! ‘রূপমঞ্জরী’র নায়ক ‘সময়’ নয়।

কারণ গোটা অষ্টাদশ-শতাব্দীব্যাপী মহাকাল এ গৌড়দেশে বড় একদেশদর্শী! শতাব্দীর শুরু থেকে দক্ষিণাঞ্চলে মগ-আরাকান-পর্তুগীজ বোম্বেটের অত্যাচার, তার পরেই বর্গীর হাঙ্গামা; মিটতে-না-মিটতেই পলাশীপ্রান্তরে যৌথ বিশ্বাসঘাতকতা! এরপর ক্রমাগত মীরজাফর-রেজা খা-দেবীলালের নির্মম শোষণ; ওদিকে বেনিয়া ইংরাজের রাজ্যভাভে শেষ হয়ে গেল বাঙলার তাঁতশিল্প কুটির-শিল্প, লবণের ব্যবসা। অনিবার্য ফল: ছিয়ান্তরের মরুভূমি!

‘সুসময়’ আদৌ এল না সেই-তার গোটা শতাব্দীতে, সবটাই — ‘দুঃসময়’!

তাই আমার কাহিনীর নায়ক সেই নিঃসঙ্গ ক্লান্ত বিহঙ্গিতি যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছিল: ‘আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অঙ্গন!’

তঁাকে খুঁজে পেয়েছি একই চিন্তাসূত্রে। রাজা রামমোহন যদি স্বয়ং লিপ্সের মতো অলৌকিক ক্ষমতায় গজিয়ে উঠতে না পারেন, তাহলে হট্টী বা হট্ট বিদ্যালঙ্কারও তা পারেন না। পারে না আমার মানসকন্যাও। তাঁদেরও প্রয়োজন এক-একজন পূর্বসূরী। শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিটি রক্তকণিকার প্রতিটি ‘জীন’-এ চাই সেই পূর্বসূরীর আশীর্বাদ। বাস্তব রূপমঞ্জরীর পিতৃদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর নারায়ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কিন্তু সেই তৃণাদপি সূনীচকে দেখা গেল রূপমঞ্জুর সমাজের বিরুদ্ধে বজ্রাদপি কঠোর হতে। হট্টার পিতৃদেবের নামটা মনে করে রাখতে পারেনি বুড়ো ইতিহাস। তবে এটুকু তার স্মরণে আছে — সমাজপতিদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তিনি আত্মজার অক্ষর-পরিচয় করিয়েছিলেন, সহমরণের চিত্র থেকে নাবালিকাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে এনেছিলেন।

সেই অজ্ঞাতনামা বজ্রাদপি কঠোর টুলো পণ্ডিতই আমার উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র।

এ-গ্রন্থ রচনার সময় নানাভাবে তথ্য সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন ব্যারাকপুর নিবাসী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, সুবর্ণরেখা প্রকাশনীর ইন্দ্রনাথ মন্সুমদার, জাতীয় গ্রন্থাগারের অপর্ণা বসু। প্রয়োজন মতো গ্রন্থ সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন প্রকাশক-মহলের সুধাংশু কুমার দে, প্রসূন বসু এবং বামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

পাণ্ডুলিপি পাঠ করে নানা পরামর্শে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে আমাকে সাহায্য করেছে দুজন — দে’জ প্রকাশনীর সুবীর ভট্টাচার্য এবং ভাগিনেয় সুবাস মৈত্র। তাদের দুজনের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

শিল্পী সুবীর মৈত্র অলঙ্কারের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে নিশ্চিত করেছে — আশী হয়েছে — লেখার গুণে আকৃষ্ট না হলেও রেখার আকর্ষণে এ-বই পাতা উলটে দেখতে হবে। আলোকচিত্রগুলি কোথা থেকে সংগৃহীত সে বিষয়ে গ্রন্থ-শেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা গেছে।

সবশেষে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আপনাদের কথাই বলছি — আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং/অথবা শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকার কাছে। কী জানেন? এই ‘কৈফিয়ৎ’টি লিখবার সময়েই হঠাৎ আপনাদের কথা মনে পড়েছে। গ্রন্থরচনাকালে সারাক্ষণ আমার মানসক্ষেপে উপস্থিত ছিল আমার দিদিভাইয়েরা—‘সমবয়সী’ হওয়ার সুবাদে যেসব নাতনিদের সঙ্গে আমার কোন জেনারেশন-গ্যাপ নেই। আপনারা অনুমতি দিলে সব শেষে তাদের সঙ্গে জনান্তিক আলাপচারীটুকু সেরে নিতে পারি:

* * *

—তো, যে-কথা বলছিলাম, দিদিভাই: ওটা, তোমাদের ভুল ধারণা। নারীমুক্তি বল, স্ত্রী-স্বাধীনতা অথবা ‘উইমেন্স লিব’ — তোমরা নতুন কিছুই করছ না। এ লড়াই আগেও ছিল, পরেও থাকবে। তোমাদের মা-ঠাকুমা-দিদিমা, তাঁদের-তাঁদের-তাঁদের ‘পূর্বনারী’—‘এন-এথ টার্ম’ পর্যন্ত পিছিয়ে যাও — একই ছবি। ওদেশে ‘জেন অব আর্ক’ তো এ-দেশে ঝাঁসির রানী। রণচণ্ডীর ‘উত্তরসূরিনী’। বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন আদিমতমা যে নারী-বিদ্বেষিণী ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নামটাই আমরা জানি না। শুধু অস্তিত্বটা টের পাই — গ্লেনজিয়ার-সাহেবের ‘রিপোর্ট অন্ দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব রঙপুর’-এর 42 পৃষ্ঠাতে। লেখা আছে এই মহিলা-ডাকাত ‘দেবী’ সন্ন্যাসীবিদ্বেহের নায়ক মজনু শাহর সহযোগী এবং সম্ভবত ভবানী পাঠকের মন্ত্রশিষ্যা। তিনি নাকি মহিলা, ডাকাত, জমিদার! ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু তিনি নিশ্চয় কারও কন্যা, কারও স্ত্রী বা ‘মা’ না হলেও। আমরা ভুল করে ভাবি তিনি বক্শিমের মানসকন্যা, বক্শিমের ‘কল্পনা’।

তারও আগের কালে আর একজনের কথা বলি। পাটবাড়ী - ময়মনসিংহের কবি বংশীদাস ভট্টাচার্যের আত্মজা: চন্দ্রাবতী। জন্ম তাঁর ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি। চৈতন্যদেব তিরোহিত হবার পর দুই দশকও অতিক্রান্ত হয়নি। ভট্টাচার্য-মশাই নিজে কুরি, ঋষ্টমবর্ষে গৌরী দান করতে সম্মত হলেন না। আত্মজাকে ভর্তি করে দিলেন চতুপাঠীতে। সেখানে কিশোরী চন্দ্রাবতীর রূপে গুণে মুগ্ধ এক ভ্রমর এগিয়ে এল প্রেম নিবেদন করতে। ওরই সহপাঠী জয়চন্দ্র। কিশোর-কিশোরী। তোমাদের ভাষায় ‘কাফ-ল্যাভ’। কিন্তু দুজনেই দুজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল! এক যবনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে জয়চন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করল। চন্দ্রাবতীর দিকে ফিরেও তাকালো না। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে বিবাহ করল সেই যবনীকে। বংশীদাস স্বভাবকবি, বুঝলেন সবই। সুপাত্রে বিবাহ দিতে চাইলেন চন্দ্রাবতী। ততদিনে চন্দ্রাবতী আর কিশোরী নয়, যুবতী। প্রত্যাখ্যান করল সে। পিতাকে জানালো, চিরকুমারী থেকে গৃহদেবতার পূজার্চনা আর সাহিত্যসেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কন্যাপণের টাকায় বংশীদাস একটি মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। সেই দেবতার সেবাতেই জীবন অতিবাহিত করতে বসলেন চন্দ্রাবতী! কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামে প্রত্যাবর্তন করলেন জয়চন্দ্র। জানালেন, যবনীর মৃত্যু হয়েছে; এখন তিনি চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত, প্রয়োজনে নাথ-পন্থী হয়ে, অথবা বৈষ্ণব! প্রত্যাখ্যান করলেন চন্দ্রাবতী! জয়চন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে জানতে চাইলেন, তুমি আমাকে আর ভালোবাস না?

চন্দ্রাবতী স্নান হেসে বললেন, সেটাই তো সব চেয়ে বেদনার! বাসি!

—তাহলে কোথায় তোমার আপত্তি? ‘ধর্ম’ ত্যাগ করতে?

—হ্যাঁ। কিন্তু ‘ব্রাহ্মণ্যধর্মের’ কথা বলছি না আমি। আমার ‘নারীত্বধর্মের মর্যাদা’! সেটা ত্যাগ করতে পারব না!

জনশ্রুতি, জয়চন্দ্র আত্মহত্যা করেন এবং চন্দ্রাবতী সেই নিদারুণ সংবাদশ্রবণে মুহুর্ভূত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সে মূর্ছা আর তাঁর ভাঙেনি। ‘ময়মনসিংহীতিকা’র কবি হিসাবেই তাঁর খ্যাতি; কিন্তু তিনিই কি ‘দেবী-চৌধুরাণীর পূর্বসূরিনী’ নন? এবং রূপমঞ্জরীর?

PANORAMA

রূপমঞ্জরী এবং তার বাবা দুজনকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই অর্ধে দুই সংকটজনক অবস্থায় ফেলে রেখে অসমাপ্ত গানে আচম্কা থামতে বাধ্য হয়েছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে, ব্যক্তিগত কারণে।

বর্তমান বছরের (1989) বইমেলায় শেষাংশে ঐ বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদিন কিছু 'চিন্তাচঞ্চল' অনুভব করি। একটি নার্সিং হোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এক কালো মুখোশখারীর সঙ্গে কিছু তর্করার হয় — একটি প্রত্যঙ্গের দখলদারী নিয়ে। সওয়া-তিনকুড়ি বছরের স্বত্বাধিকার অগ্রাহ্য করে সে আমার হৃদপিণ্ডটি জ্বরদখল করতে চাইছিল। যাহোক, শেষ-মেঘ হামলাদারটা ক্ষমাঘোষা করে বলে গেল, “এখনো আমার সময় হয়নি, আজি তাই পেলে ছুটি/সময় যেদিন আসিবে আপনি ধরিব তোমার টুটি।” সে-সব কথা বিস্তারিত লিখেছি আমার পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থে: ‘আবার সে এসেছে ফিরিয়া’।

ফিরে এলাম নিজের ডেরায়। এসে দেখি, ইত্যবসরে আমার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানি ছিন্তাই হয়ে গেছে। এবার অপরিচিত জ্বরদখলকারী নয়, সুপরিচিত ‘হামলাদারনী’: তোমাদের দিদা!

ন্যাপথালিন-সুরভিত আমার সে পাণ্ডুলিপি আলমারিতে বন্দি। এখনো পর্যন্ত তার দিকে দেখি নাই ফিরে। যেটুকু আগেই লিখেছি তাই ছেপে ফেলা গেল।

এসব খবর তোমরা অনেকেই জান না। জানবে কোথা থেকে? ‘খানদারি’ খবরের কাগজে সে খবর তো ছাপা হয়নি। আর সেসব কাগজকেও দোষ দেওয়া যায় না। অহন্যহনি কত কত ভেদ-রঙের সাহিত্য-যশোপ্রার্থী অখ্যাত চিড়িয়া নার্সিং হোমে ‘গচ্ছন্তি’ এবং সেখান থেকে সংকার-সমিতির ভ্যানে অন্যত্র ‘পুনর্গচ্ছন্তি’, অত সব খবর কি ছাপা সম্ভব?

তবু ‘আজকাল’ পত্রিকায় সংবাদটা ছাপা হয়েছিল। তাই তোমাদের মধ্যে অনেকে আবার জানতে পেরেছিলে। তার ভিতর কেউ-কেউ খামে ভরে আমাকে প্রসাদী নির্মাল্য পাঠিয়েছ, আমার রোগমুক্তি কামনা করেছ।

তাদের শুভেচ্ছায় আশা রাখি এ কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডটি শেষ করে যেতে পারব।

বাবুল সান্না
2.10.89

পুনশ্চ :

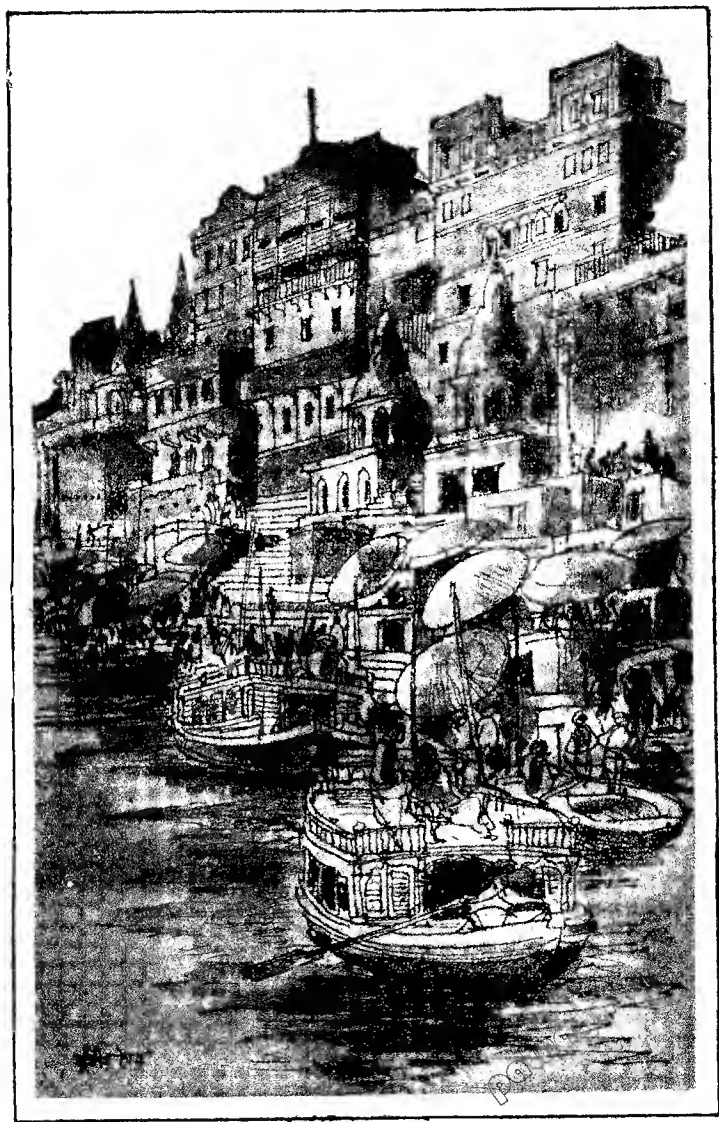
পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডটির যবনিকাপাত ঘটবে সূতিকাগারে কুসুমমঞ্জরীর প্রয়াণে অর্থাৎ রূপমঞ্জরীর আবির্ভাবে। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। দ্বিতীয়বার নার্সিং-হোম থেকে ফিরে আসার পর সিদ্ধান্ত নিতে হল: ‘অসমাপ্ত গানে’ই আপাতত থামতে হবে। ময়দানে যখন নব্বই-দশকের বইমেলা জমজমাট তখন আমাকে একটি অস্ত্রোপচার করাতে হবে। প্রতিশ্রুত নির্ঘণ্ট, ফটো-ক্রেডিট প্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে সংযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

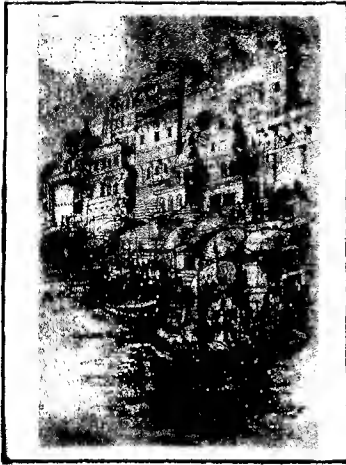
তাবলে এ কিছু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয়।

গঙ্গাপুত্রের মতো ‘ইচ্ছামৃত্যু’র পুঁজি তো আমার তুলীয়ে নেই।

আগে অস্ত্রোপচার করে ফিরে তো আসি।

বাবুল সান্না
1.1.90





কাশীধাম

1774

প্রথম পর্ব

স্থান, কাল আর পাত্র।

প্রথমেই চিহ্নিত করে নেওয়া যাক।

স্থান: সেই যেখানে নাকি ভূমিকম্প হয়

না—বাবা *বিশ্বনাথের ত্রিশূলপ্রাপ্তে চিহ্নিত

মহানগরী কাশীধাম।

কাল: 1696 শকাব্দ; সংবৎ: 1831—অর্থাৎ ফেরঙ্গমতে 1774 খ্রীষ্টাব্দ। সূর্য কুন্তরাশিতে, কৃষ্ণা নবমী। হিসাব মতো ফরাসী দেশে ব্যাঙ্গিল দুর্গের পতন হতে যেমন পনের বছর তেমনি পলাশীর যুদ্ধ সতের বছর অতীতের ঘটনা। কোম্পানির রাজত্ব সবে শিকড় গেড়েছে। ইংলন্ডে তখন তৃতীয় জর্জ সিংহাসনে আসীন। রাজা রামমোহন রায় মাত্র দুই বৎসরের শিশু।

পাত্র: না, পাত্র নয়, পাত্রী। কিন্তু তাঁর কথা পরে আসবে। আপাতত যার প্রসঙ্গ দিয়ে কাহিনী শুরু হচ্ছে তার নাম সুখিয়া—মহামহিম কাশীরাজ সরকারের বেতনভুক 'হুসিসিয়ুন'—সাদা-বাঙলায়—গুপ্তচর, প্রয়োজনে যাকে গুপ্তহত্যার কাজে নিয়োগ করা চলে।

তিনতলা পাষাণ-হর্ম্য। গঙ্গাতীর। অসিঘাটের কাছাকাছি। আদ্যন্ত চুনা-পাথরে চুন-সুরকির মশলায় গাঁথা। দেখলে মনে হয় না এটা প্রমোদভবন, যেন—দুর্গ! এ অট্টালিকার পরিচয়—‘অসিঘাটের বাগানবাড়ি’। জনহীন, নির্বাক্রব পাষাণপূরী সারাটি দিন বিমায়। সন্ধ্যা সমাগমে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন শোনা যায় কিছু কলগুঞ্জন। রাজকার্যে ক্রান্ত-তনু রাজাসাহেবের শুভাগমন ঘটে। বাগানের মালি ছুটে এসে সেলাম করে, ঘোড়ার লাগামটা ধরে। রাজাসাহেব ময়ূরপঙ্খী-নাগরা মশমশিয়ে সোপান বেয়ে উঠে যান ফাঁকা ছাদে। আসে কিছু বয়স্য, আর আসে কিংখাবে-মোড়া পালকি চেপে নৃত্যগীত-পাটিয়সী কিছু বেহেস্তের ছরী। সেটাই হচ্ছে সুখিয়ার চিন্তার কারণ।

প্রয়োজনে সে রাজাসাহেবের শয়নকক্ষে বিনা-এন্তেলায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে

—সে অধিকার তার আছে—যদি তেমন-তেমন গোপন সংবাদ লুকানো থাকে তার

পান্থক

আস্তিনের তলায়। রাজারানীর মিলন-মুহূর্তটাকে খানখান করে সে জানিলা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারে, যদি তার কুর্তার জেব-এ লুকানো থাকে রাজহত্যার গোপন ষড়যন্ত্রের বার্তা। কিন্তু আজ সে যে খবরটি সংগ্রহ করে এনেছে তা চমকপ্রদ হলেও রাজাসাহেবের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত নয়—শুধু তাঁর একটা কৌতূহল চরিতার্থ করতে। এ সময় রাজাসাহেবের সাক্ষ্য-বিনোদনে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত হবে কিনা ঠাণ্ডার করে উঠতে পারে না।

অশ্বপৃষ্ঠে ওকে এগিয়ে আসতে দেখে লোহার-শিক দেওয়া বিরাট ফটকটা খুলে গেল। দ্বাররক্ষক ওকে চেনে। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে অশ্বটিকে রজ্জুবদ্ধ করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। প্রমোদ-প্রাসাদে কোথাও আলো জ্বলছে না। শুধু খোলা ছাদে কিছু স্তিমিত আলোকরশ্মি। একটু কান করে শোনার চেষ্টা করল—না, তব্লা বা ঘুড়ুর শব্দ উঠছে না। বাগানেও নেই কোনো কিংখাবে-মোড়া পালকি। তার মানে, নাচনেওয়ালীরা এখনো এসে পৌছায়নি। কিন্তু রাজাসাহেবের ঘোড়াটাকে দেখা যাচ্ছে।

নজরে পড়ে সিঁড়ির ও প্রান্তে রামলগন বসে সিঁদ্ধি ঝুটছে। রামলগন রাজাসাহেবের দেহরক্ষী—মহিষাসুরের মতো চেহারা। ঈয়া পাকানো মৌচ, ঈয়া বৃকের পাটা—লাঠিয়াল-দলের সর্দার। ছেদিলাল শিলাপটে পেশাবাদাম জাতীয় কী যেন পিষছে।

সুখিয়া সেদিকে এগিয়ে আসে। বলে, রাম-রাম লগনজী, ক্যা হালচাল?

রামলগন একবার চোখ তুলে তাকায়। জবাব দেয় না।

রাজসন্দর্শনে যাবার আগে একটি অনিবার্য প্রশ্ন থাকে। সেটা জেনে যাওয়াই প্রথা। গরজ বড় বালাই। সুখিয়া জানতে চায়: রাজাসাহেবের মেজাজ শরীফ?

এবারও প্রত্যুত্তর করল না সর্দার-লেঠেল।

সুখিয়া প্রশ্ন করে, উপর ঝাঁউ?

—তৌহার মর্জি।

বোঝা গেল, রাজাসাহেবের মেজাজ যেমনই থাক, তাঁর খাশ দেহরক্ষীটির মেজাজ তিরিক্ষে। সুখিয়া পেশায় গুপ্তচর, রাজ্যের যাবতীয় তথ্যের হক-হদিস্ তার নখদর্পণে। তার জানা আছে, কী হেতুতে রামলগনের মেজাজ এতটা বিগড়ে আছে।

তা তো হতেই পারে। রামলগনের স্বহস্তে বানানো সিঁদ্ধির সুখ্যাতি তামাম কাশীধামে সুবিদিত—দশাশ্বমেধ ঘাটের মেঠাইওয়ালা তেওয়ারিজীর ‘জিলাইবী’ অথবা দড়িয়া-কা-পোলের ভুঁজাওয়ালার পিস্তা-কা-হালুয়ার মতো—‘যো খায়া বহ পস্তায়া, যো নহী খায়া বহুভি পস্তায়া’। অনেকের ধারণা—ঐ সিঁদ্ধির সিঁদ্ধিতেই রামলগন সর্দার-সেঠেলের পদে উন্নীত। না হলে ঈশান কৈবর্তের নোকরি-খতমের পরে এই বারানসীধামে কি ‘পালওয়ানে’র আকাল পড়েছিল? কিন্তু রাজাসাহেব ইদানীং আর সিঁদ্ধির নেশায় মৌজ করেন না। বেশ কিছুদিন প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্টে বাস করে যখন কাশীতে ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তাঁর নেশাটিরও বদল হয়েছে। রাজারাজড়ার ব্যাপার—শয্যাসজিনীর মতো ঈদের মাঝে মাঝে নেশারও বদল করতে হয়। ঠুঁর এখন ধারণা হয়েছে—সিঁদ্ধি-ভাঙা হচ্ছে নাবালকের আর গঞ্জিকা নাস্তা ফকিরের নেশা। বর্তমানে তিনি নাকি কী এক অজীব বিলাইতির

মাতোয়ারা—সুখিয়া বাপের জন্মে তার নাম শোনেনি—‘শ্যামপিন’, না কী যেন নাম। আকবরী মোহর দিয়ে তা রাজাসাহেব আমদানি করেন ফেরঙ্গ ক্যান্টনমেন্ট থেকে।

তা রাজাসাহেবের অমৃত অরুচি হতে পারে, রামলগনের তো সেটা হয়নি। সে তার তিনপুরুষের সিদ্ধিকে ত্যাগ করতে পারে না। ইদানীং বেচারি গ্যাটের কড়ি গচ্ছা দিয়ে নেশার যোগান দেয়। পারতপক্ষে রাজাসাহেবের সামনে আসে না আজকাল। সেই যেদিন ভাঙের ভাঁড়টা রাজাসাহেব ওর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছিলেন তার পর থেকে।

সুখিয়া এসব বৃথা জ্ঞানে। তাই বলে, আমার জন্যেও এক লোটা ‘অমরিং’ বানিও তাই রামলগন। আমি তো রাজকাজে দেশ-বিদেশ ঘুরি—তোমার সিদ্ধির সুখ্যাতি দেখছি ইদানীং কাশীর বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

খুশি হল রামলগন। বলে, সে সব ফেরার পথে হবে। তুমি যাও, ছাদে চলে যাও। ফেরার সময় মহাবীরজীর পরসাদ পেয়ে যেও। লেकिन এগো বাৎ শুনিহ সুখিয়া ভেইয়া—এক লোটা পীলে তিন দিন তোমার নিদ্ টুটবে না। যতটুকু পরিসাঁদ তোমার সহ্য হবে তা আমি নিজে হাতে মেপে দেব। সমঝা? যাও! উপর যাও।

—নাচনেওয়ালী কসবরা এসে পৌছায়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ছাদে আছেন কে কে?

—কবিজী আছেন, আড্ডাধারী ঠোর বটু।

তিনজনই সুপরিচিত। রাজাসাহেবের তিন অন্তরঙ্গ ইয়ার দোস্ত। কবিজী, অর্থাৎ কাব্যতীর্থ ব্রাহ্মণ, রাজা-সাহেবের চেয়ে না হোক দশ বছরের বড়। তবু তিনি বয়সাপদে বহল। কারণ নবরসের প্রথম রসটিতে তাঁর দিল্ সর্বদাই টুটুটু—ঘনরসে পাভুয়ার মতো। কাঁচা খিস্তিকে সুচারুরূপে কাব্যরস মণ্ডিত করার দুর্লভ প্রতিভা তাঁর এক্তিয়ারে। কাব্য আর খিস্তির ফারাকটা বোঝা যায় না। আড্ডাধারী রাজা-সাহেবের ঘুলিঘুগের বন্ধু। অর্থাৎ যে আমলে মাজায় কবি দেবারও প্রয়োজন ছিল না—শ্রেফ ঘুনসি। রাজা-সাহেবের উত্থান-পতনের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। ছায়ার মতো তাঁর পিছন পিছন যোৱেন। কুপরামর্শের যোগান দিয়ে চলেন ক্রমাগত।

তৃতীয় ব্যক্তি বটু। বামন। প্রাক্তন রাজামশায়ের বিদূষক। সচরাচর বিদূষকের পদ লাভ করে পৈতাধারী বামন। বটুকেশ্বর প্রামাণিক। অতি ধূর্ত লোক। প্রাক্তন কাশীরেশ বলবন্ত সিং-এর গঙ্গাপ্রাপ্তির পর রাজ-সরকারের খোল-নলচে আদ্যন্ত পালটে গেছে। সেনাপতি বজ্রধর দেশত্যাগী, রাজপুরোহিত গঙ্গারাম মিশ্র অপসারিত, মন্ত্রী বেপাতা। রাজার লাঠিয়াল-সর্দার ঈশান কৈবর্তকে সপরিবারে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল—কোনক্রমে সে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। তার বউটাই শুধু পুড়ে মারা যায়। বোধকরি এতদিনে সে তার পিতৃভূমি বঙ্গাল-মুলুকে ফিরে গেছে—কারণ তার ডাকাতির খবর আর ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে নী। যা বদলায় নি তা: বিদূষক! একমাত্র ব্যতিক্রম তাই বটুকেশ্বর প্রামাণিক! ভাঁড়ামোর পান্নদশিতায় সে কর্মচ্যুত হয়নি।

সিড়ি বেয়ে, ছাদে পৌছে সুখিয়া আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। ভারী পদার কাকে একটা চোখ লাগিয়ে সে ওদিককার অবস্থাটা সমঝে নিতে চায়।

ফাল্গুনের শেষাংশে। দিব্যি ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া। ছাদে প্রকাণ্ড গদি বিছানো। তার উপর

জাজিম। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মখমলে মোড়া খানকতক কামদার তাকিয়া। রাজাসাহেব অর্ধশয়ান। তাঁর হাতে আলবোলায় ফরসি। সামনে মোরাদাবাদী কাজ-করা ধাতবপাত্রের উপর বিলাইতির বোতল আর পানপাত্র। একপাশে রাখা আছে কিছু বাদ্যযন্ত্র। একটা রূপার রেকাবিতে অপরিপাট জুই ফুল। বয়স্য তিনজন রাজাসাহেবকে ঘিরে। নর্তকীরা এখনো এসে পৌঁছায়নি।

—কোন? কোন হ্যায়?—সবার আগে বটুকের নজর পড়েছে ভারী পর্দার নিচে একজোড়া নাগরাপরা পা। পর্দা সরিয়ে সুখিয়া ছাদে উঠে আসে। আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে। লোকটা ধূর্ত—সাবেক রাজামশায়কে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত। এখন কুর্নিশের কায়দা রপ্ত করেছে। জানে, রাজাসাহেবের ঐসব মোগলাই কেতা মনপসন্দ।

রাজাসাহেব উর্দু-মেশানো হিন্দুস্থানীতে বললেন, ও! তুই! খবর নিয়ে এসেছিস?

—জী সরকার। লেकिन খবরটা তো তেমন জরুরী নয়, এখনি হজুরের দিল বিগড়ে দিতে চাই না। ওয়ার্না কাল সুবে আপনার খিদমতে...

হুক্মার দিয়ে ওঠেন রাজাসাহেব, হারামজাদা! কোন ব্যাপারটা জরুরী তা বিচার করব আমি! সমঝ গয়ে? বেতমিজ, গিদ্ধড়! তুই হুকুমের খিদমদগার। যা হুকুম হবে সিরেফ তামিল করে যাবি! বল, কী জেনে এসেছিস? জগু পণ্ডিত যা বলেছে তা সচ?

যুক্তকর গরুড়পক্ষীর মতো সুখিয়া দাঁড়িয়ে থাকে। বয়স্যের অধিকারে আড্ডাধারী রাজাসাহেবকে সম্মেহ ধমক দেয়, তোমার যেমন কাণ্ড, রাজাসাহেব! সুখিয়া হারামজাদা কি জানে—জগুয়া কী অভিযোগ করে গেছে? র'স, আমি জেরা করছি। আই সুখিয়া, তুই নিজে চোখে বিদ্যালঙ্কারকে দেখে এসেছিস?

—জী সরকার!

—কী করছিল র্যা? ছাত্তর ঠেঙাছিল?

সুখিয়া ইতস্তত করে। না, কোন ছাত্তরকে গ্রহণ করতে দেখিনি। স্বীকার করল সে কথা। সে শুধু দেখে এসেছে—বিদ্যালঙ্কার তাঁর চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করছিলেন।

—এ হল! তারেই বলে ছাত্তর ঠ্যাঙানো! এখন বল দিনি—ওর ছাত্তরদের বয়স কত হবে? দশ, পনের, বিশ, বাইশ?

—জী হাঁ। যেযাদা ভি হো সক্তা।

—আর বিদ্যালঙ্কারের বয়স?

সুখিয়া মাথা চুলকায়। কী জবাব দেবে ঠাওর করে উঠতে পারে না।

—আন্দাজে বল হারামজাদা! বিশ-পঁচিশ? নাকি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ?

—ঐসিনই হো সক্তা।

কাব্যতীর্থ অট্টহাস্য করে ওঠে, বাঃ! বাঃ! তুই যে সমদর্শী হয়ে উঠলি রে সুখিয়া—কদমে বা কদমে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা। আঁা? কাঁচা-মিঠে 'কিশোরী রসাল' আর শ্রোণীভারাদলসগমনা 'পক্ক পনস' তোর চোখে এক?

আড্ডাধারী ওসব চটুলতায় বিচলিত না হয়ে প্রশ্ন করে, কী দেখলি বল? বিদ্যালঙ্কারের মাথা কামানো? টিকি দেখলি?

—জী।

ষ্ট্রাকেশ্বর উপর-পড়া হয়ে জানতে চায়, কত বড় টিকি দেখলি বল? দু' চার আঙুল?
নাকি দেড় হাত?

সুখিয়া সকলের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখে। বটু বিদূষক। প্রথা বলে, তার প্রতি
হেসে উঠতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তার কথায় কেউই এখন হাসছে না। সুখিয়ার
প্রশ্নটা রসিকতা নয়, জবাবের অপেক্ষা রাখে। বলে, এত্না বড়া হোগা শায়েদ!
হাতের মুদ্রায় বিদ্যালঙ্কারের অর্কফলার দৈর্ঘ্যটা বোঝাবার চেষ্টা করে।
আড্ডাধারী জানতে চায়, বিদ্যালঙ্কারের পরিধানে কী দেখলি? ধুতি পিরান?
—জী!

কাব্যতীর্থ প্রচণ্ড ধমক লাগায়, কী তখন থেকে শুধু 'জী-জী' করছিল। বলি, তুই কি 'জুজু'
দেখে এলি? ঠিক করে বল বেটা: পিরান না কামিজ, নাকি কুর্তা? অথবা ফতুয়া?

সুখিয়ার সব কিছু গুলিয়ে যায়। ঐ চারটি অঙ্গাবরণ পুরুষে উর্ধ্বাঙ্গে পরিধান করে এটুকুই
জানা আছে; তাদের পার্থক্যটা ঠিক কী, তা ওর জ্ঞানসীমার বাইরে। স্বীকার করল সে কথা।

কাব্যতীর্থ এবার অন্নয়-ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, 'পিরান' হচ্ছে ঢিলে-ঢালা জামা—যা
ভবিষ্যতে বিবর্তিত হবে পাঞ্জাবিতে; 'কামিজ' হচ্ছে 'শার্ট'-এর আদিমরূপ; 'কুর্তা' হচ্ছে ফেরঙ্গ
সৈনিকদের অঙ্গাবরণ—আঁটো-জামা। আর ফতুয়া—হাতকাটা গ্রীষ্মের পোশাক।

এবার সুখিয়া নিবেদন করে—সেক্ষেত্রে বিদ্যালঙ্কারের গায়ে যে জামাটা দেখে এসেছে
তাকে 'পিরানই' বলা উচিত।

কাব্যতীর্থ আরও গভীরে প্রবেশ করতে চায়, আর পিরানের তলায়?

সুখিয়া হালে পানি পায় না।

—বলি, পিরানের তলায় কী দেখলি, বল?

সুখিয়া নির্বাক!

—বল হারামজাদা! পিরানের নিচে কী আছে তা দেখেছিলি? চোখে বা হাত চালিয়ে?

এবারেও কেউ হাসছে না। কী বিড়ম্বনা! কোনটা রসিকতা আর কোনটা প্রশ্ন বোঝা ভার।
সুখিয়া মাথা নেড়ে জানায়, সে কথা ও জানে না!

কাব্যতীর্থ এবার ন্যায়তীর্থ হয়ে উঠতে চায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আনুমানিক প্রমাণ, 'আনুভূতিক'
প্রমাণ! প্রশ্ন করে, তবে তুই কেমন করে বুঝলি বাপদন, যে তুই ন্যায়্য সেই হটী
বিদ্যালঙ্কারকেই দেখে এসেছিস? আর কোনও টুলো পণ্ডিতকে নয়?

—সবাই তো বললে, উনিই বিদ্যালঙ্কার!

—মানছি! সেটা তো অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পিরানটা তুলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া ইত্তক
তুই কী করে বুঝলি যে, সে স্বীলোক? কামানো মাথায় চুটকি দেখে?

এবারেও কেউ হাসছে না। এমন একটা অশ্লীল ইঙ্গিতে। সুখিয়া জবাব দিল না। মাথা নিচু
করে দাঁড়িয়েই রইল।

—তার মানে তুই বলতে চাস্ যে, পিরানের উপর থেকেই মর্মভেদী দৃষ্টিতে সেটা আন্দাজ
করতে পারছিলি! কেমন?

এবারও সুখিয়া মেদিনীনিবন্ধদৃষ্টি।

বাণীবায়

—কিরে ব্যাটা? তোর বাক্য হরে গেল যে! তা উপর থেকে কী সমঝে নিলি তাই না হয় খুলে বল—বদরী, দাড়িষ, নাকি বাবা বিশ্বনাথের যা মনুসন্দ: যুগল পকবিস্ব?

এতক্ষণে রাজাসাহেব কথা বলে ওঠেন। কাব্যতীর্থকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, অ্যাই সুখিয়া, তুই শুধু বল—ঠিক লোককে দেখে এসেছিস তো?

—জী হুজুর, গরিবপরবর!

ধমক খেয়েও কাব্যতীর্থ ক্ষান্ত হল না। লোকটা জানে, কাব্যালোচনার নল্চের আড়ালে ক্রমাগত আদরিস পরিবেশনের জন্যই সে রাজসরকার থেকে বৃত্তিভোগী। বললে, ব্যাপারটা কিন্তু প্রমাণ হল না, রাজাসাহেব।

রাজাসাহেব হাত নাড়লেন। মক্ষিকাবিতাডনমুদ্রা। সুখিয়া মুক্তি পেল। খানদানি মোগলাই কায়দায় তিনবার কুর্নিশ করে তিনপা পিছু হটে পদার ওপাশে অন্তর্হিত হল।

আড্ডাধারী বুঝে নিয়েছে রাজাসাহেবের মন এখন অন্য দিকে। কাব্যতীর্থের চটুলতায় তাঁর মন নেই। আড়চোখে তাঁর দিকে একনজর দেখে নিয়ে বলে, জগৎ পণ্ডিত তো তাহলে মিছে কথা বলেনি! এতদূর দুঃসাহস! একজন জীলোক কাশীধামে এসে চতুষ্পাঠী খুলে বসেছে! পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে ছাত্তর ঠ্যাঙাচ্ছে।

রাজাসাহেব বলেন, কাব্যতীর্থ! চ্যাঙামি কর না। ভেবে চিন্তে বল তো—তোমার জ্ঞানমতে এমন ঘটনা কাশীধামে ইতিপূর্বে ঘটেছে?

কাব্যতীর্থ এবার নিজেকে সামলে নেয়। গভীর হয়ে প্রত্নস্তর করে, আঙে না, রাজা-সাহেব! এমন বিচিত্র কথা আমি জীবনে শুনিনি।

—শুধু ‘বিচিত্র’ নয়! অসামাজিক! অশাস্ত্রীয়!

—তা তো বটেই। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ‘স্বীষু দুষ্টাষু’ হলে ‘বর্ণসঙ্কর’ জন্মগ্রহণ করে। জীলোকের দুষ্টিমি কদাচ সহ্য করতে নেই। সুখিয়ার কথায় মনে হল মেয়েটি পূর্ণ-যৌবনা। কোন সাহসে সে প্রকাশ্যে পুরুষের বেশে, মাথা কামিয়ে, টিকি রেখে চতুষ্পাঠী খুলে বসে? মনুর সুনির্দিষ্ট বিধান আছে—জীলোক শুধু সন্তানের জন্ম দেবে, তাদের স্তনদান করবে, লালন-পালন করবে, স্বামীর পদসেবা করবে ...

বটুকেশ্বরও বুঝে নিয়েছে। এ আসরে ভাঁড়ামি চলবে না। বললে, শুনেছি সে বিধবা। নিঃসন্তান!

—তাহলে তার সহমরণে যাবার কথা। না হলে অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় লুক্কায়িত থাকা!

রাজাসাহেব জানতে চান, কোন দেশের লেড়কি? তৈলঙ্গী?

—আঙে না! শুনেছি বঙ্গদেশের। রাঢ়বংশের। ব্রাহ্মণ কন্যা। বালবিধবা...

—বামুনের মেয়ে? বিধবা! সহমরণে যায়নি?

—যায়নি যে, তা তো দেখাই যাচ্ছে।

—কতদিন হল সে টোল খুলে বসেছে?

—প্রায় ছয় মাস!

—ছয় মাস! দোষ তোমাদের! আমি রাজকার্যে এলাহাবাদে ছিলাম। তোমরা কোনও ব্যবস্থা নাওনি! আমি ফিরে আসার পরেও কিছু জানাওনি। নেহাৎ জগাপণ্ডিত দরবার করতে এসেছিল তাই এতবড় অনাচারটা আমার গোচরে এল।

আড্ডাধারী এক কথায় অভিযোগটা মেনে নেয়। বলে, তা ঠিক। আমাদের খবর নেওয়া উচিত ছিল—তোমাকে জানানো উচিত ছিল। যাক, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন বল, কী কর্তব্য?

রাজাসাহেব বলেন, তোমরাই আমার পরামর্শদাতা। প্রথমে তোমাদের অভিমতগুলো শুনি। কাব্যতীর্থ কী বল? কী শাস্তি দেওয়া উচিত বিদ্যালঙ্কারকে?

কাব্যতীর্থ বলে, শূদ্র আর স্ত্রীলোকের বেদপাঠের অধিকার নাই। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমটির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা শম্বুক উপাখ্যানে বাঙ্গালীকি আমাদের শুনিতে গেছেন। দ্বিতীয়টির বিষয়ে কাশীরনরেশ কী ব্যবস্থা নেন তাই আমরা এখন দেখব।

—আর আড্ডাধারী? তোমার অভিমত?

—না, রাজাসাহেব। আমি কাব্যতীর্থের সঙ্গে একমত নই। কাব্যতীর্থ স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছে—শিরশ্ছেদ! তোমার শুভানুধ্যায়ী হিসাবে আমার পরামর্শ—অতটা বাড়াবাড়ি কর না!

—কেন?

—শম্বুক গোপনে বেদাভ্যাস করছিল। এ মেয়েটি করছে প্রকাশ্যে। কাশীর পণ্ডিতসমাজ তাকে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি প্রদান করেছেন। এতবড় উপাধি আর কোনও স্ত্রীলোক কখনো পেয়েছে বলে আমি তো শুনিনি। না বয়স্য—শিরশ্ছেদ করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমি বলি—ওকে লঘুতর শাস্তি দাও। মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, উষ্টোগাধায় চড়িয়ে কাশীরাজ্যের সীমানার বাইরে বার করে দাও। কী বল বটু?

বটু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে, আজ্ঞে নাঁ! তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি! প্রথম কথা, অপরাধী শিখা-বাদে মাথাটা নিজেই মুড়িয়ে রেখেছে। দ্বিতীয়ত তত্র অতি উপাদেয় পানীয়, অপচয় করা ঠিক নয়। তৃতীয়ত উষ্টো গাধা? শাটিকের^১ বদলে শাটিকা-গাত্রাবরণী, ঢোলিকার পরিবর্তে পিরান, কুণ্ডিত কেশদামের বদলে ন্যাড়ামুণ্ডি—মহারাজ, উষ্টোগাধার আর বাকিটা কী!

আড্ডাধারী বলে, তা বটে! এবার রাজা-সাহেবের অন্তিম ফতোয়াটা শোনা যাক।

রাজাসাহেব সোজা হয়ে বসেন। বলেন, রসিকতা নয়, আড্ডাধারী। এ একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। রাজশক্তি সচেতন না হলে সমাজে পাপ প্রবেশ করে। অপরাধ একা হুঁটী বিদ্যালঙ্কার করেনি—করেছে কাশীর ঐ তথাকথিত পণ্ডিত-মূর্খরা! যারা ওকে চতুষ্পাঠী খুলে এই ধাষ্ট্যমো দেখানোর পথ পরিকার করে দিয়েছে। অত্যন্ত নির্মমভাবে আমাদের শাস্তি দিতে হবে! যাতে এ জাতীয় বেলেহ্লাপনা আর কোন স্ত্রীলোক ভবিষ্যতে দেখাবার সাহস না পায়!

—তার মানে মৃত্যুদণ্ড?

—না! তার চেয়েও কঠিনতর দণ্ড! সময়ে তা জানতে পারবে তোমরা।

^১ শাটিক—পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র = ধুতি

^২ শাটিকা—রমণীদের পরিধেয় বস্ত্র = শাড়ি



রাজাসাহেব পুরন্দর ক্ষেত্রী কাশীধামের দৌর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক। তা বলে তিনি কিন্তু কাশীনরেশ নন। কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের দেহান্ত হয়েছে গত দশকে। তাঁর নাবালকপুত্র কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের তরফে প্রাক্তন কাশীনরেশের ভাগিনেয় পুরন্দর ক্ষেত্রী এখন শাসক। কিন্তু প্রজারা তাকে সিংহাসনে বসবার নিরঙ্কুশ অধিকার দেয়নি। ভোগৈশ্বর্য, বিলাসবৈভব সব কিছু হস্তামলকবৎ পেয়েও পুরন্দর তাই মানসিক শান্তি লাভ করেনি। মনে মনে সে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। যতদিন মাথায় মুকুট, হাতে রাজদণ্ড এবং পশ্চাদ্দেশে সিংহাসনের কোমলস্পর্শ অনুভব না করছে ততদিন সে বিবাহ করবে না। তা বলে সে কিছু শুকদেব গোসাই নয়। সহধর্মিণী না হলেও নিত্যনতুন শয্যাসজিনীর গোপন ব্যবস্থা আছে।

সমস্ত কাশীরাজ্য প্রতীক্ষা করে আছে—কবে ঐ কিশোর রাজপুত্র সাবালক হবে, অপশাসকের হাত থেকে শাসনদণ্ডটি ছিনিয়ে নেবে। পুরন্দরের অবশ্য চেষ্টার ক্রটি নেই। পূর্বতন রাজকর্মচারীদের হত্যা অথবা অপসারণ করেছে একে একে। নিজের বিশ্বস্ত অনুচরদের বসিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। রাজ্যের কোন প্রত্যন্ত-দেশে বিক্ষোভের বীজ অঙ্কুরিত হবার উপক্রম হলেই, সে সূচাঙ্কুরে ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু মামাতো ভাইটিকে বিষপ্রয়োগে মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে পাঠিয়ে দেবার হিম্মত তার হয়নি। বিষের নয়, সাহসের অভাবে। পুরন্দর জানে, প্রজাবৃন্দ তাকে সাময়িক উপদ্রব বলে মনে করে মাত্র। প্রজাবিদ্রোহের একটা সূচনাও হয়েছিল, অত্যন্ত কঠোর হস্তে সে অভিযান দমন করেছে। প্রাক্তন সেনাপতি বজ্রধর সপরিবারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। বর্তমানে সে শাহাবাদ জেলায় রোহিতাশ্ব দুর্গের দুর্গাধিপ। প্রাক্তন কাশীনরেশের লাঠিয়াল-সর্দার ঈশান কৈবর্তও পালিয়ে যায়। কিছুদিন কাশীরাজ্যের ভিতরেই ডাকাতি করত। ইদানীং তার সাড়া-শব্দ নেই; সম্ভবত পিতৃভূমি বঙ্গাল-মূলকেই ফিরে গেছে।

বিদ্রোহদমনের পরে পুরন্দর চলে গিয়েছিল এলাহাবাদ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা জঙ্গী ছাউনি সেখানে গড়ে উঠবার উপক্রম করছে। কোম্পানির মূল ঘাঁটি শহর-মাদ্রাজ আর শহর-কলকাতা। আগের জমানায় মাদ্রাজের রবরবাই ছিল বেশী। পলাশী-যুদ্ধের পর জাঁকিয়ে উঠেছে শহর-কলকাতা।

পলাশী-যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিরাজের মর্মান্তিক মৃত্যু। তারপর নবাবী পেয়েছিল বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আলি খাঁ। রুহরতিনেকের জন্ম। কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রজাসাধারণের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করতে থাকে মীরজাফর। ইতিমধ্যে ক্রাইভ ফিরে গেল বিলাতে। কিন্তু মীরজাফর ইংরেজের অর্থদাবি মিটাতে পারল না। ফলশ্রুতিতে দশক শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বাসঘাতকের নবাবীও ফুরালো। জাফর খাঁকে ইটিয়ে ইংরাজ বাঙলার নবাবী গদিতে বসিয়ে দিল তারই জামাইকে—মীরকাশিমকে। মীরজাফর-তনয়া ফতেমাকে

বিবাহ করেছিল সে। পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাইকে যখন ইংরাজ-কোম্পানির কাউন্সিলাররা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল তখন মীরকাশিম এগিয়ে এল প্রচুর অর্থদমনের প্রতিশ্রুতিসহ। কিন্তু বঙ্গদেশের ততদিনে নাভিস্বাস উঠেছে। দীর্ঘ দিনের বর্গীর-হাঙ্গামা, ইংরাজের অত্যাচার, মীরজাফরের অপশাসন—মীরকাশিম ব্যর্থ না হবে কেন? তবে জামাই ঠিক শ্বশুরের মতো ছিল না—মনে মনে তার তাল ছিল সুবিধামতো ইংরাজকে সমূলে উৎপাটন করবে। তাই প্রথম পদক্ষেপ মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর করা—সেটা ইংরেজের ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কিছু বেশী দূরে। পরের ধাপে মীরকাশিম আর একটা কাজ করে বসল যাতে বেনিয়া ইংরাজ প্রমাদ গণল। তাদের এতদিনের একচেটিয়া বিনা-শুল্কে বাণিজ্য অধিকার মীরকাশিম অর্পণ করল প্রতিযোগী বিদেশী ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলিকেও। ফলে বিরোধ বেধে গেল। 1763 খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ আমাদের কাহিনীর কালের পূর্ব দশকে নবাবের সৈন্যদলের সঙ্গে ইংরাজের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হল—প্রথমে উদুয়ানালায়, পরে ঘেরিয়ায়। পরের বছর মারা গেল মীরকাশিম।

রঙ্গমঞ্চে এবার আবির্ভূত হল দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম আর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলাররা কিন্তু ফিরিয়ে আনল আবার মীরজাফরকেই। তখন তার বয়স সত্তরের উপর। মাত্র দুটি বছর নবাবী করে মাটি নিল সেই বিশ্বাসঘাতক 5.2.1765 তারিখে।

তার তিন মাস পরে ক্লাইভ ফিরে এল বিলাত থেকে।

মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভ—ততদিনে সে লর্ড ক্লাইভ—শহর কলকাতায় এসে পৌঁছাল তেশ্বরা মে। তার দুদিন পরেই কাউন্সিলের জরুরী মিটিং ডাকল।

মীরজাফর, মীরকাশিম দুজনেই ফৌত হয়েছে—ক্লাইভের ইচ্ছা ছিল এবার বাঙলার গদীতে বসিয়ে দেবে সিরাজউদ্দৌলা-হত্যার নায়ক এবং মীরজাফর-তনয় মীরনের শিশুপুত্র মীর সৈয়দকে। কারণ ক্লাইভ ততদিনে বুঝে নিয়েছে যে, কোম্পানি তাকে দ্বিতীয়বার গভর্নর করে দেবে। ঐ শিশুপুত্রকে শিখণ্ডী করে বস্তুত ক্লাইভ নিজেই হয়ে বসবে বাঙলার হর্তাকর্তা। নবাব না হলেও সুবেদার। কিন্তু তার মনের সাথে বাদ সাধল তদানীন্তন গভর্নর আর তার কাউন্সিলাররা। তারা প্রস্তাব করল বাঙলার মসনদে বসানো হবে ঢাকার ফৌজদার মহম্মদ রেজা খাঁকে। ক্লাইভের প্রথমটা প্রবল আপত্তি ছিল, কিন্তু সতেরো বছরের ঐ মেদামারা হাঁদা-গঙ্গারাম রেজা খাঁকে দেখে ক্লাইভ আশ্বস্ত হল। এই ছোকরা-নবাবকে দিয়ে কাজ চলবে—বিশেষ, ঐ কিশোর বিশ লাখ টাকার নজরানা কাউন্সিলারদের দিতে প্রস্তুত।

ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হচ্ছে এজন্য যে, আমাদের কাহিনীর চরিত্র পুরন্দর ক্ষেত্রী ঐ স্রোতে গা ভাসাতে চেয়েছিল। একই চঙে, একই ছাঁদে। এবার সে-কথাই বলব।

পূর্ব-প্রান্তে যাবতীয় সুবন্দোবস্ত করে—লর্ড ক্লাইভ এল ‘ওয়েস্টার্নফ্রন্টের’ মহুড়া নিতে। দিল্লীর নখদন্তুহীন শাহ-য়েন-শাহ শাহআলম আর অযোধ্যানবাব সুজাউদ্দৌলা ভিতর ন্যায়বিচার-সম্মতভাবে পিঠাবন্টন করে দিতে।

প্রাচীন নথিপত্র হাতড়ে দেখবেন—স্থান: কাশীধাম; কাল: ৭.8.1765 এবং পাত্র: লর্ড

কান্টনামেন্ট

ক্লাইভ। তখনো কান্টনামেন্ট বলবন্ত সিং জীবিত। ইংরাজ সেপাই-পল্টন ক্লাইভকে রাজকীয় সম্মান জানালো উনিশবার তোপধ্বনি করে। খোদায়-মালুম প্রটোকলের কোন ধারা মোতাবেক রাজকীয় সম্বন্ধনায় তোপধ্বনি এক কুড়ি পূরণ হল না! সে যাই হোক, ক্লাইভ দিল্লীস্থর আর অযোধ্যা-নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কনফারেন্সে বসল। বাহান্তর ঘটনা! ব্যস! খতম! এতবড় একটা মহাযজ্ঞের ফয়সালা হয়ে গেল মাস্তুর তিনটি দিনে। বাদশাহ্ আলম এবং সুজাউদ্দৌলা বোধকরি বুঝতে পেরেছিল এই বানরের পিঠাভাগ দীর্ঘায়ত করলে আহা-পাত্রে অবস্থা হবে—‘পিপিড়া কাঁদিয়া যায় পাত্রে’!

সুজাউদ্দৌলা আর শাহ্ আলম দুজনেই ইংরাজের বিরুদ্ধে মীরকাশিমকে মদৎ জুগিয়েছিল। ফলে, আলোচনা-সভায় তাদের ভূমিকা ছিল পরাজিতের। যা পেল—‘যথালভ’ বলে মেনে নেওয়া ছাড়া গতান্তর ছিল না।

সুজাউদ্দৌলা ফেরত পেল প্রায় তার গোটা রাজত্বটাই। দুটি জেলা বাদে—এলাহাবাদ আর কোরা। সে দুটি শাহ্ আলমের খাশে রাখা হল। কান্টনামেন্ট বলবন্ত সিং কনফারেন্স-কক্ষের আনাচ-কানাচে তিনদিন ধরেই ঘুরঘুর করছেন। জেনারেল কারন্যাকে যথেষ্ট পরিমাণ তৈলাক্ত করেও রেখেছিলেন। বস্তৃত কারন্যাকের সুপারিশেই কান্টনামেন্টের স্বাধীনতা অটুট থাকল। কান্টনামেন্ট সুজাউদ্দৌলার অধীনে রাখা হল না।

সে সময় পুরন্দরও ছিল মামার পাশে পাশে। কী ভাবে গদী লাভ করা যায় তা স্বচক্ষে দেখেছিল। তাই কান্টনামেন্ট বলবন্ত সিং-এর দেহান্ত হবার পর সে দরবার করতে গিয়েছিল এলাহাবাদে। সেটা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ততদিনে ক্লাইভ ফিরে গেছে কলকাতায়। এলাহাবাদের ফৌজি ছাউনির দায়িত্ব মেজর কিল্প্যাট্রিকের। তাকেই মুরুবিব পাকড়াও করে পুরন্দর চেপ্টা করেছিল কান্টনামেন্টের গদীটা পাকাপাকি হাতাতে। কিল্প্যাট্রিক প্রথমে সম্মত হয়েছিল। উৎকোচের অঙ্কটা দরদস্তুর করে স্থির হবার পূর্বেই হঠাৎ বৈকে বসল কিল্প্যাট্রিক।

কারণ ছিল। ইতিমধ্যে বিলাত থেকে কাউন্সিলারদের উপর হুকুম এসে গেছে যে, কোম্পানির কোন কর্মচারী কাউন্সিলারদের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে “এদেশের রাজারাজড়া নবাব-বাদশাহ্ আমীর-ওমরা কারো কাছ থেকে চার হাজার টাকার বেশি দামের উপহার, জমি জিরাৎ, জায়গির, খাজনাজমা ইত্যাদি নিতে পারবে না, আর এই মর্মে তাদের প্রত্যেককেই দু’-প্রস্থ করে মুচলেকা সই করে দিতে হবে। তার একটা থাকবে কাউন্সিলের দপ্তরে, আর একটা চলে যাবে লন্ডনে, ডিরেক্টরদের অফিসে।”

শুনে পুরন্দর বলেছিল, তাহলে উপায়?

মেজর কিল্প্যাট্রিক হেসে বলেছিল, চুটিয়ে রাজত্ব তো করেই চলেছ পুরন্দর, মাথায় এই মুকুটটা নাই বা চড়ালে?

পুরন্দর মুকুটহীন মাথাটা নেড়ে বলেছিল, তা হয় না! মুকুটটা আমার চাইই। জমি যদি তোমাকে মাসে-মাসে তিন হাজার ন’শ নিরানব্বই করে জমা দিতে থাকি? তাহলে কত বছর পরে তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে?

কিল্প্যাট্রিক বলেছিল, হিসাবটা পরে করা যাবে। তুমি মাথা-মাস পাঠাতে থাক তো!

ফাঁদে পড়ে গেছিল পুরন্দর। এ কী ঝামেলা! কবে সিংহাসন পাবে তার কোনও স্থিরতা

নেই, মাস-মাস কিস্তি দিয়ে চল ? লোকটা ফৌজি জোয়ান ! বেমক্কা ফৌত হয়ে গেলে ? আবার কিস্তির টাকা না পাঠালেও কিল্প্যাট্রিক চটে যাবে ! ইংরাজের দয়া না হলে সে যুগে নবাবী বা রাজত্ব করা চলত না।

কী আতান্ত্রিতেই পড়েছে পুরন্দর ! মেজাজ তার খাপ্পা হয়ে থাকবে এতে বিচিত্র কী ?

সম্প্রহথানেক আগে একদল টুলো-পাণ্ডিত রাজদরবারে এসে অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছিল মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের বিরুদ্ধে। দ্বারকেশ্বর কাশীধামের সর্বাঙ্গগণ্য পাণ্ডিতদের অন্যতম। অশীতিপর বৃদ্ধ। এককালে নব্যান্যায় চর্চা করতেন। ইদানীং আর নিজে চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেন না। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য—প্রশিষ্য। তারাই চতুষ্পাঠীর ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। উনি নিজে সাধন-ভজন নিয়ে আছেন। প্রায় সন্ন্যাসী। আজ্ঞা ব্রহ্মচারী। তাঁরই গুরুগৃহে পালিতা হচ্ছিল ঐ মেয়েটি। শোনা যায়—বঙ্গভূমির, কুলীন ব্রাহ্মণবংশের বালবিধবা। সে যে কী করে এই সুন্দর কাশীধামে এসে উপনীত হয়েছিল, কেমন ধরে ঐ মহাপণ্ডিতের স্নেহদ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে, সেটা ইতিহাসের এক অনুদঘাটিত অধ্যায়। এতদিন কাশীর নব্যপণ্ডিতেরা এ বিষয়ে নজর করেনি। কেউ ভ্রূক্ষেপও করেনি। কিন্তু অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠল কয়েক বছর পরেই।

অপরাধ সেই মেয়েটিরই : অনন্যসাধারণ মেধাবিনী সে ! একে একে উত্তীর্ণ হয়ে গেল নানান পরীক্ষায়—ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য—শেষমেশ নব্যান্যায় ! সহাধ্যায়ী পুরুষ প্রতিযোগীদের অনেক পিছনে ফেলে। সব শেষে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর তাকে উপাধি দান করে বসলেন : বিদ্যালঙ্কার !

এটা বাড়াবাড়ি !

হতে পারে মেয়েটি মেধাবী। তাই বলে অমন সম্মানজনক উপাধি—স্ট্রীলোককে ! এমন অঘটন আগে কখনো ঘটেছে ? যা হোক, তাতেও কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। বুড়ো পাণ্ডিতের খেয়াল—ওটা নজর না করলেই হল।

কিন্তু দেখা গেল সেই আরবী উটের গল্পটি পুনরভিনীত হতে চলেছে। প্রথমে নাক, পরে গলা, ক্রমে সারা দেহ—শেষমেশ আশ্রয়দাতাকেই বিতাড়ন করে গোটা তাঁবুর অধিকার। হট্টা বিদ্যালঙ্কার বিদ্যার্ণবের পরিত্যক্ত চতুষ্পাঠীর একান্তে নিজেই একটি টোল খুলে বসেছেন। আশ্চর্য ! বিদ্যার্থীদের ভিড় দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। জগমোহন তর্কবাগীশ প্রমুখ নব্যপণ্ডিতদের মনে হল—এটা শুধু আপত্তিকর নয়, অপমানজনক কাশীর বিদ্যাচর্চার দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব। যার উপনয়ন হয়নি, অর্কফলার ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করার হিম্মৎ যার নেই—সেই অর্বাচীন কোন সাহস টোল খুলে বসে ! দ্বিতীয় আপত্তি, হট্টা বিদ্যালঙ্কার অসম প্রতিযোগিতার সুযোগ নিচ্ছেন। অন্যান্য টোল-শ্লেষকে কেন যে তরুণ ছাত্রের দল ঐ চতুষ্পাঠীতে ছুটে আসছে এ কথা বুঝতে হলে দিগগজ পাণ্ডিত হবার দরকার নেই। চতুষ্পাঠী তো নয়—লীলাকুঞ্জ ! ছাত্ররা কেন যে মুগ্ধ হয়ে গুড় শোনে, তা কে না বোঝে ! বয়সটাই যে মুগ্ধ হবার। জনশ্রুতি হট্টা বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে সর্বাপেক্ষা আবশ্যিক বস্তুটিই অনুপস্থিত : বেত্রদণ্ড ! কী দরকার ? ঈশ্বরদত্ত বিশালবটাক্ষ যার অধিকারে, তার ছাত্ররা অমনোযোগী হবে কেন ?

কালীধাম

জগমোহন পণ্ডিতের দল এসে প্রথমে দরবার করেছিল বিদ্যার্ণবের কাছে: কাশীর নব্যপণ্ডিতসমাজ এ জাতীয় অনাচার বরদাস্ত করবে না।

দ্বারকেশ্বর ধৈর্য ধরে ওদের বক্তব্য শুনলেন। অর্থগ্রহণ হল না। প্রশ্ন করেন, এটাকে ‘অনাচার’ বলছ কেন?

—কাশীধামে কোনও স্ত্রীলোক কখনো কোনও চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেনি।

—মানছি। কাশীধামে আজকের প্রভাতটিও ইতিপূর্বে আসেনি।

—আজ্ঞে?

—বাপু হে! যা কখনো হয়নি তা কখনো হবে না—এটা তোমাদের কেমন যুক্তি? ঐ যুক্তিতে ‘শ্লেচ্ছান্ মূর্খয়তে’ দশম অবতার এলে তোমরা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

—আমরা সে কথা বলছি না। বলছি, স্ত্রীলোকের ধর্ম ভিন্ন প্রকার। বেদপাঠের অধিকার তার নাই।

—আমি সে মত স্বীকার করি না।

—শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের যে বেদপাঠের অধিকার নাই—এই ধ্রুবসত্যকে আপনি স্বীকার করেন না?

বিদ্যার্ণব বললেন, দেখ বাবাসকল! আমার একার মতামতে তো কিছু হবে না। তোমরা বরং একটি বিচার সভার আয়োজন কর। স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপনের অধিকার ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃত কি না সেটাই হবে বিচার্য বিষয়। তোমরা তোমাদের ভিতর থেকে পাঁচজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন কর। তর্কযুদ্ধে আমার পালিতকন্যাটিকে পরাস্ত কর। তার পর কাশীর পণ্ডিতসমাজ যথাকর্তব্য করবেন।

নব্যপণ্ডিতের দল সানন্দে স্বীকৃত হল। বললে, তাহলে আপনিই হবেন সে সভার বিচারক।

দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করেন বিদ্যার্ণব, না। তা হবে না। যেহেতু এ বিষয়ে আমি স্থিরসিদ্ধান্ত। আমার বিচার একদেশদর্শী হয়ে যাবে। ও বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত না হলে আমি আমার পালিতা কন্যাটিকে চতুষ্পাঠীতে গ্রহণ করতাম না। তাকে বেদাভ্যাস করতে দিতাম না। তোমরা বরং কাশীধামের তিনজন সর্বাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায়কে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ কর।

অগত্যা তাই। স্থির হল, প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন মহাপণ্ডিত রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। বিদ্যার্ণবের অনুরোধে তিনি স্বীকৃতি হলেন এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন কাশীর পণ্ডিত সমাজের এক প্রখ্যাত নৈয়ায়িক। আদি নিবাস হুগলীর ইলছোবা গ্রামে। বীশবেড়িয়া বিদ্যাসমাজের ভট্টাচার্য বংশীয় এই মহাপণ্ডিত আকৈশোর কাশীবাসী। প্রসঙ্গত বলি, আমাদের আখ্যায়িকার যে সময়কাল তার সতের বছর পরে, 1791 খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিরাজী বৎসর বয়সে তখন ঐ রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন সেখানে ন্যায়ের প্রথম অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। আর তার পরের বাইশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে অধ্যাপনা করে এই অসাধারণ পণ্ডিত যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স: একশ তিন! তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ! তবু নিকৃতি পাননি। অবসর গ্রহণের পরেও অনেক জ্ঞানপিপাসু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসত। অন্ধ পণ্ডিতের জ্ঞান-মঞ্জুসায় থরে থরে সাজানো জ্ঞানের মাধ্যমে তারা তাদের ‘অনুপপত্তি’ নিরাকরণ করে যেত।

আমাদের কাহিনীর কালে তাঁর বয়স চৌষটি। তাঁর দুই সহকারী বিচারক — শ্রীজীব ন্যায়াধীশ এবং শ্রীরতনলাল ব্রহ্মচারী।

প্রথমে স্থির হয়েছিল বিচার সভার আয়োজন করা হবে দুর্গাবাড়িতে। দুর্গাবাড়ি তখন যুবতী—মাত্র উনিশ বছর বয়স তার। নাটোরের পুণ্যলোক রানী ভবানী নির্মিত এ মন্দিরের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি তখন ঝকঝক-তক্তক্ত করছে। কিন্তু পরে স্থান পরিবর্তন করতে হল। বিপুল জনসমাগমের আশঙ্কায়। আলোচনা হবে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে—যা শ্রোতৃবৃন্দের বৃকোদরভাগের কাছে অর্থহীন। তা হোক—বিচারবিষয়টি অতি অদ্ভুত। তার চেয়ে বড় কথা—প্রতিযোগীদের এক তরফে পাঁচজন নব্যপণ্ডিত, অন্যদিকে এক যুবতী! এ যে অবিশ্বাস্য! কাশীর অতিবৃদ্ধ নাগরিকেরাও স্মরণ করতে পারলেন না—কোন বিচারসভায় স্ত্রীলোক প্রতিযোগীরূপে আবির্ভূত!

স্থির হল, দুর্গাকুণ্ডের অনতিদূরে 'কুরুক্ষেত্র তালাও'-এর মুক্তমণ্ডপে এই বিচারসভার আয়োজন করা হবে। এই তালাওটিও রাণী ভবানীর কীর্তি।

নব্যপণ্ডিতেরা দলে ভারি। তারা মোটামুটি নিশ্চিন্ত। বারোহাত কাপড়ে যে হতভাগিনী কাছা দিতে শেখেনি—দেবার চেষ্টা করছে এখন—তাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করা তো ছেলেখেলা! দ্বারকেশ্বর নেহাৎ স্নেহে অন্ধ। সংসারধর্ম করেননি, শেষবয়সে পালিতা কন্যার পিতা হয়েছেন—তাই ওকে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি দিয়ে বসে আছেন।

মেয়েটির বিরুদ্ধে শুধু টুলো পণ্ডিতেরা নন, আরও একদল সোচ্চার। বারাগসীধামের কিছু বিচক্ষণ কবিরাজ। ঝাঁরা চতুপাঠী আদৌ পরিচালনা করেন না—দেহধারী মানুষের আধি-ব্যাধিই যাদের উপার্জনের রাজপথ। ঐ দুর্বিনীতা নাকি তাঁদেরও যারপরনাই অপমান করেছে। মেয়েটির দাবী—কাশীধামে আগমনের পূর্বেই সে নাকি চরক, সুশ্রুত, নিদান আয়ত্ত্ব করে বসে আছে। দেবমূর্তির পিছনে চালচিহ্নের মতো অন্ততভাষণের পশ্চাতে একটা বিশ্বাসযোগ্যতার আচ্ছাদন প্রয়োজন। তাও ও মেয়েটি জানে না। হিসাব মতো সে কাশীতে এসে পৌঁছেছে পঁচিশ বছর বয়সে। তার পূর্বে সেই এরণ্ডের-দেশ বঙ্গভূমে কে ঐ যুবতীকে চরক, সুশ্রুত শিখিয়েছে? আর কী আকাশচুম্বী স্পর্ধা! সে আর্তের সেবা করতে চায়! শিকড়, বাকড়, ঘাস-পাতা, জড়ি-বুটি খাইয়ে। যদি বলতিস্ —ডাকিনীবিদ্যা জানি, তাহলেও না হয় মেনে নেওয়া যেত! আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে বিজ্ঞানসম্মত! দীর্ঘদিন ভেষগাচার্যের পদতলে বসে শিক্ষা না করলে তাতে অধিকার জন্মায় না। বয়ঃপ্রাপ্তি হওয়ার পূর্বে সে বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না। এমন কি যেসব হতভাগ্যের জন্য অন্তর্জলিয়াত্রার নিদান হৈঁকেছেন কাশীর সর্বগ্রগণ্য কবিরাজেরা—ও তাদেরও দায়িত্ব নিতে চায়! অপিচ তাদের দু-চারজনকে নিরাময় করে সে গঙ্গাতীর থেকে সংসারশ্রমে ফেরত পাঠিয়েছে! দুর্বিনীতা ঐ সহজ কথাটাও জানে না—অন্তর্জলি যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ! তাছাড়া এর অর্থ কী? একটাই অর্থ—প্রতিষ্ঠাবান ভেষগাচার্যদের বেইজ্জত করা! অপমান করা! নয় কি?

সভার একপ্রান্তে একটি উচু বেদী। সেখানে তিন বিচারকের অজিনাসন। অল্প দক্ষিণে পঞ্চ-নব্যপণ্ডিতের আসন। বামে একটিমাত্র আসন, প্রতিবাদীর। বেদীর দক্ষিণপার্শ্বে আর একটি পৃথক বেদীর উপর রত্নখচিত সিংহাসন। সেটি কাশীনরেশের জন্য চিহ্নিত। যেহেতু কাশীনরেশ

আমাদের কাহিনীর কালে তাঁর বয়স চৌষট্টি। তাঁর দুই সহকারী বিচারক — শ্রীজীব নায়াধীশ এবং শ্রীরতনলাল ব্রহ্মচারী।

প্রথমে স্থির হয়েছিল বিচার সভার আয়োজন করা হবে দুর্গাবাড়িতে। দুর্গাবাড়ি তখন —মাত্র উনিশ বছর বয়স তার। নাটোরের পুণ্যশ্লোক রানী ভবানী নির্মিত এ মন্দিরের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি তখন ঝকঝক-তক্তক্ত করছে। কিন্তু পরে স্থান পরিবর্তন করতে হল। বিপুল জনসমাগমের আশঙ্কায়। আলোচনা হবে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে—যা শ্রোতৃবৃন্দের কাছে অর্থহীন। তা হোক—বিচার্যবিষয়টি অতি অদ্ভুত। তার চেয়ে বড় কথা—প্রতিযোগীদের এক তরফে পাঁচজন নব্যপণ্ডিত, অন্যদিকে এক যুবতী! এ যে অবিশ্বাস্য! কাশীর অতিবৃদ্ধ নাগরিকেরাও স্মরণ করতে পারলেন না—কোন বিচারসভায় শ্রীলোক প্রতিযোগীরূপে অবিভূর্ত!

স্থির হল, দুর্গাকুণ্ডের অনতিদূরে ‘কুরুক্ষেত্র তালাও’-এর মুক্তমণ্ডপে এই বিচারসভার আয়োজন করা হবে। এই তালাওটিও রাণী ভবানীর কীর্তি।

নব্যপণ্ডিতেরা দলে ভারি। তারা মোটামুটি নিশ্চিন্ত। বারোহাত কাপড়ে যে হতভাগিনী কাছা দিতে শেখেনি—দেবার চেষ্টা করছে এখন—তাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করা তো ছেলেখেলা! দ্বারকেশ্বর নেহাৎ স্নেহে অন্ধ। সংসারধর্ম করেননি, শেষবয়সে পালিতা কন্যার পিতা হয়েছেন—তাই ওকে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি দিয়ে বসে আছেন!

মেয়েটির বিরুদ্ধে শুধু টুলো পণ্ডিতেরা নন, আরও একদল সোচ্চার। বারাগসীধামের কিছু বিচক্ষণ কবিরাজ। ঝাঁরা চতুষ্পাঠী আদৌ পরিচালনা করেন না—দেহধারী মানুষের আধি-ব্যাধিই ধাঁদের উপার্জনের রাজপথ। ঐ দুর্বিনীতা নাকি তাঁদেরও যারপরনাই অপমান করেছে। মেয়েটির দাবী—কাশীধামে আগমনের পূর্বেই সে নাকি চরক, সুশ্রুত, নিদান আয়ত্ত্ব করে বসে আছে। দেবমূর্তির পিছনে চালচিহ্নের মতো অন্তর্ভাষণের পশ্চাতে একটু বিশ্বাসযোগ্যতার আচ্ছাদন প্রয়োজন। তাও ও মেয়েটি জানে না। হিসাব মতো সে কাশীতে এসে পৌঁচেছে পঁচিশ বছর বয়সে। তার পূর্বে সেই এরণ্ডের-দেশ বঙ্গভূমে কে ঐ যুবতীকে চরক, সুশ্রুত শিখিয়েছে? আর কী আকাশচুম্বী স্পর্ধা! সে আর্তের সেবা করতে চায়! শিকড়, বাকড়, ঘাস-পাতা, জড়ি-বুটি খাইয়ে। যদি বলতিস্ —ভাকিনীবিদ্যা জানি, তাহলেও না হয় মেনে নেওয়া যেত! আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে বিজ্ঞানসম্মত! দীর্ঘদিন ভেষগাচার্যের পদতলে বসে শিক্ষা না করলে তাতে অধিকার জন্মায় না। বয়ঃপ্রাপ্তি হওয়ার পূর্বে সে বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না। এমন কি যেসব হতভাগ্যের জন্য অন্তর্জলিষাত্রার নিদান হৈঁকেছেন কাশীর সর্বাগ্রগণ্য কবিরাজেরা—ও তাদেরও দায়িত্ব নিতে চায়! অপিচ তাদের দু-চারজনকে নিরাময় করে সে গঙ্গাতীর থেকে সংসারাস্রমে ফেরত পাঠিয়েছে! দুর্বিনীতা এই সহজ কথাটাও জানে না—অন্তর্জলি যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ! তাহাড়া এর অর্থ কী? একটাই অর্থ—প্রতিষ্ঠাবান ভেষগাচার্যদের বেইজ্জত করা! অপমান করা! নয় কি?

সভার একপ্রান্তে একটি উচু বেদী। সেখানে তিন বিচারকের অজিনাসন। তিন দক্ষিণে পঞ্চ নব্যপণ্ডিতের আসন। বামে একটিমাত্র আসন, প্রতিবাদীর। বেদীর দক্ষিণপার্শ্বে আর একটি পৃথক বেদীর উপর রত্নখচিত সিংহাসন। সেটি কাশীররেশের জন্য স্থাপিত। যেহেতু কাশীররেশ

কাম্যধাম

বলবন্ত সিং লোকান্তরিত, তাঁর উত্তরাধিকারী নাবালক—তাই ঐ সিংহাসনের উপর আনুষ্ঠানিকভাবে রাখা আছে কাম্যরাজের রাজদণ্ডটি। সম্মুখে দর্শকদের আসন। ‘শ্রোতৃবৃন্দ’ শব্দটি সুপ্রযুক্ত হবে না—কারণ আলোচনা হবে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে। দূর-দূরান্ত থেকে যারা এসেছে, তারা শুনতে আসেনি, এসেছে তামাশা দেখতে। তামাশা বইকি! স্ত্রীলোক, অথচ পুরুষের বেশ! অবগুষ্ঠন নাই, অর্কফলা! সে সমানতালে তর্ক করতে চায় পুরুষের সঙ্গে। তামাশা নয়?

বামপ্রান্তে চিকন মাদুরের একটি চিকের আড়াল। এটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। এটিও অভূতপূর্ব! কাম্যর কোনও বিচারসভায় ঐ চিকের ব্যবস্থা কখনো হয়নি। যাত্রার আসরে তা থাকে; কীর্তন, রামলীলা বা কবিগানের ব্যবস্থা হলে চিকের আড়াল থাকে। কিন্তু বিচার সভায় চিকের আড়াল! এ তো নপুংসকের বিবাহে ছাদনাতলার ছাউনি। এ তো অহৈতুকী! মহিলা তো কেউ আসবে না!

হটী বিদ্যালঙ্কার সে যুক্তিটি মেনে নিতে পারেননি। বলে পাঠিয়েছিলেন —কেউ আসুক, না আসুক ঐ ব্যবস্থা থাকা চাই!

স্ত্রীলোকের জিদিবাজি! ঠিক আছে, মা!

বিচারারম্ভের পূর্বেই সভামণ্ডল পরিপূর্ণ। হটী বিদ্যালঙ্কার সভায় এলেন—না, পালকি চেপে নয়, পদব্রজে। অনেকটা পথ হেঁটে। আশ্রম থেকে এই মণ্ডপের দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ।

মুণ্ডিত মস্তক। দীর্ঘ শিখাপ্রান্তে একটি ষ্ঠেকরবী পুষ্প অনুবিন্দ। পরিধানে পট্টবস্ত্র—শাড়ি নয়, ধুতি। পুরুষের মতো কাছা-কোঁচা দিয়ে পরা। নগ্নপদ। উর্ধ্বাঙ্গে টিলে-ঢালা পিরান, তদুপরি নামাবলী। কর্ণভরণ নাই, দু’হাতে নাই কোনও অলঙ্কার, শুধু প্রতিযোগীদের উপবীতের পরিপূরক কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা।

একাকী নন। দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের গুরুকুলভূক্ত অনেকেই পদব্রজে তাঁর সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এসেছেন। সর্বাগ্রে আসছিলেন প্রধান আচার্য স্বয়ং। অশীতিপর বৃদ্ধ—কিন্তু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েননি। তাঁরও মস্তক মুণ্ডিত, দীর্ঘ অর্কফলা। উর্ধ্বাঙ্গে নিরাবরণ, শুধু সামবেদী দীর্ঘ যজ্ঞোপবীত। পাশে পাশে আসছে রমারঞ্জন ভট্টশালী—হটী বিদ্যালঙ্কারের সহায়্যায়ী। একটি তালপাতার ছত্র বৃদ্ধের মাথার উপর ধরে। সভায় বিচারকদল ইতিপূর্বেই এসেছেন। প্রতিপক্ষরা উপস্থিত। দর্শকের আসনগুলিও পূর্ণ। দূর থেকে শোভাযাত্রাটিকে আসতে দেখেই একটা কলগুঞ্জন উঠল: এসে গেছেন! এসে গেছেন।

কোথাও কিছু নেই, ঘেরাটোপ চিকের আড়াল থেকে বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ। সকলেই হতচকিত। এমনটি তো হবার কথা ছিল না!

হটী বিদ্যালঙ্কার তাঁর গুরুর কর্ণমূলে কী যেন অনুমতি প্রার্থনা করলেন মনে হল, বুদ্ধ শিরশ্চালনে সম্মতি জানালেন। পদপ্রক্ষালনান্তে তিনি দর্শকদলের প্রথম সারিতে তাঁর চিহ্নিত আসনে উপবেশন করলেন। আজ তিনি শ্রোতামাত্র।

ততক্ষণে হটী বিদ্যালঙ্কার একাকী অগ্রসর হয়ে গেলেন ঐ ঘেরাটোপের দিকে। তাঁর সহযাত্রীরা, যারা এতক্ষণ শোভাযাত্রা করে আসছিল—তারা একে একে দর্শক-সভায় আসন গ্রহণ করল।

বিদ্যালঙ্কারের দূরন্ত কৌতূহল হয়েছিল—শঙ্খধ্বনি করল কে? তাঁর ধারণা ছিল ঐ অংশটা জনশূন্য পড়ে থাকবে। এ শুধু নারীর সম-অধিকারের দাবীতে; জেনে বুঝে যে, বিচারসভায় কোন স্ত্রীলোক উপস্থিত থাকবে না। সভায় উপস্থিত হয়েই টের পেলেন, তাঁর ধারণাটা ভ্রান্ত! হট্টা পর্দা সরিয়ে ভিতরে এলেন।

দেখলেন মাত্র দুইজন মহিলা বসে আছেন।

দুজনেই উঠে এসে গুঁর চরণবন্দনা করলেন। একজনকে সহজেই চিনতে পারলেন—স্বর্গত কাশীরেশের বিধবা। রাজরানী—কিন্তু নিরাভরণা। দ্বিতীয়াও তাই। সম্পূর্ণ নিরাভরণা, ফেনশুভ্র থান তাঁর পরিধানে। অপূর্ব সুন্দরী। কণ্ঠে একটা ফটিকের মালা।

বিদ্যালঙ্কার রানীকে বললেন, আপনি যে এ সভায় আসতে পারবেন তা ভাবতে পারিনি। কিন্তু ইনি—?

রানী বললেন, ইনি তারাসুন্দরী। ঘটনাচক্রে উনি এখন কাশীধামে। আমি তো কিছুই বুঝব না, উনি হয়তো কিছু কিছু বুঝবেন।

তারাসুন্দরী সলজ্জে বলেন, না, না, আমার সংস্কৃতজ্ঞান অতি অল্প। আজ যদি মা কাশীতে থাকতেন.....

—মা?—বিদ্যালঙ্কার জানতে চান।

রানী-মা বলেন, আপনি ঠুঁকে চিনতে পারেননি। উনি নাটোরের স্বনামধন্য রানী ভবানী—যাঁর দেবোত্তর ভূখণ্ডে এই বিচারসভার আয়োজন হয়েছে—তাঁরই একমাত্র কন্যা।

বিদ্যালঙ্কার যুক্তকরে বলেন, আপনার জননী তো প্রাতঃস্মরণীয়! আপনি এ সভায় এসে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

যুক্তকরে কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে তারাসুন্দরী প্রতিবাদ করেন, এ আপনি কী বলছেন! আপনি নারীমুক্তির প্রথম ধ্বজাধারিণী! এ তো আমাদের কর্তব্য!

এই তাহলে সেই তারাসুন্দরী—ভাবেন বিদ্যালঙ্কার—রানী ভবানীর আয়াজ। বালবিধবা। অসাধারণ রূপবতী—তা তো স্বচক্ষেই দেখছেন। যাঁর সৌন্দর্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঙলার সেই শেষ নবাব তারাহরণের চক্রান্ত করেছিল। ঐ অনিন্দ্যকান্তির রূপই হচ্ছে পরোক্ষ কারণ, যে জন্য পুণ্যশ্লোক নাটোরের রানী ভবানী পলাশী-প্রান্তরে সিরাজপক্ষে যোগ দিতে পারেননি।

ইতিহাস যুগে যুগে একই কাহিনী লিখে চলেছে। পুনরুত্তর দোষের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার—জঙ্ঘের রাবণ—আলাউদ্দিন খিলজী—মুর্শিদাবাদের সিরাজ!

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন সভামণ্ডপে। বিচারবেদীতে পদার্পণের পূর্বে মুণ্ডিত মস্তকটি সেই মুস্তিকা বেদিকায় স্পর্শ করালেন। বিচারক ও সমাগত পণ্ডিতদের সম্মুখে প্রণাম জানিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। উপবেশন করলেন ধ্যানস্থ যোগীর ভঙ্গিতে—সমংকায়শিরোগ্রীব।

ক্ষত্রিয়ের বেশে চিত্রাঙ্গদা যুদ্ধ করেছিলেন অর্জুনের সঙ্গে। ব্রাহ্মণের বেশে বিদ্যালঙ্কার আজ যুদ্ধ করতে এসেছেন পঞ্চপণ্ডিতের সঙ্গে। বেশভূষায় যদিচ নারীত্বের বাস্পমাত্র নাই, তবু ত্রিশতিবর্ষীয়ার প্রকৃতিদত্ত প্রভায় বিচারসভাটি যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কালীকায়

প্রধান বিচারক মহাপণ্ডিত রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন তাঁর কৌতূহলটি গোপন করতে পারলেন না। বললেন, এ তোমার কী বেশ, মা?

—যে প্রতর্কের সমাধান সন্ধান আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হয়েছি এ তারই উপযুক্ত সাজ, বাবা!

নামিয়ে রাখলেন বিচারকদের পদপ্রান্তে ভূজপত্রে রচিত তাঁর স্বীকৃতি-প্রতিজ্ঞা। সংস্কৃতে, দেবনাগরী হরফে:

নিম্নস্বাক্ষরকারী, আদি নিবাস সোণাই বর্ধমানভুক্তি, গৌড়দেশ, পিতা *রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য, বর্তমানে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের গুরুকুলভূক্তা বিদ্যার্থী, এই মত কড়ার করিলাম বিচার মানিলাম, তাহাতে পাতসাহী শুভ শ্রীমন্ মহারাজ কাশীনরেশের অনুজ্ঞাক্রমে দলিল লিখিয়া দিলাম। অদ্য বিচারসভায় স্বীজাতীয়ার অধ্যাপন ও বেদাধ্যয়ন সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত হইবে তাহা মানিতে বাধ্য থাকিব।

প্রতিপক্ষ পঞ্চপণ্ডিতের তরফে জগমোহন তর্কবাগীশ তাঁদের প্রতিজ্ঞাপত্রটি এবার পেশ করলেন। সেটি পাঠান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন হট্টা বিদ্যালঙ্কার। বললেন, না, এই শর্তে আমি বর্তমান বিচারসভায় অংশগ্রহণ করিতে আসিনি। হট্টা বিদ্যালঙ্কারের এই কাশীধামে চতুষ্পাঠী পরিচালনার অধিকার আছে কি নাই, এ প্রশ্ন বিচারসভার এজিয়ার-বহির্ভূত, বাহ্যিক ও প্রক্ষিপ্ত।

জগমোহন হৃদু হেসে বলেন, আমাদের তো ধারণা ছিল, সেটাই এই বিতর্কসভার আলোচ্য।

—তাহলে বলব, আপনারা ব্রাহ্ম ধারণার বশীভূত। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের চতুষ্পাঠীভূক্তা জনৈক বিদ্যার্থীকে কাশীর পণ্ডিতসমাজ বিদ্যালঙ্কার উপাধি প্রদান করেছেন; তাঁকে চতুষ্পাঠী পরিচালনের অনুমতিও দান করা হয়েছে। কাশীনরেশের অনুপস্থিতিতে রাজগুরুর অনুমতিক্রমে রাজমাতা সে আদেশে পাতসাহী ছাপও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বর্তমান বিচারসভায় পূর্বপক্ষীয় প্রতিযোগীদের সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোন অধিকার নাই! আমার বিশ্বাস ছিল, আজিকার বিচারসভার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক—নারীর অধ্যাপনা ও বেদাধ্যয়নের অধিকার আছে বা নাই। এটুকুই বিচারসভার এজিয়ারভূক্ত। আমি মাননীয় বিচারকমণ্ডলীর নির্দেশপ্রার্থী।

বিচারকত্রয়ী নিম্নকণ্ঠে আলোচনা করে বিদ্যালঙ্কারের মতটিই স্বীকার করে নিলেন। দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের গুরুকুল যাকে চতুষ্পাঠী পরিচালনার অধিকার দিয়েছেন, রাজমাতা যা অনুমোদন করেছেন সেইসব প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনও অধিকার পঞ্চ নব্যপণ্ডিতের নাই। তাঁরা নির্দেশ দিলেন, পূর্বপক্ষকে নূতনভাবে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিতে হবে।

জগমোহন ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, কী লিখতে হবে বলুন?

বিদ্যালঙ্কার বলেন, আপনাদের এই মর্মে স্বীকৃতিপত্র দিতে হবে যে, তর্কে পরাজিত হলে ভবিষ্যতে কোনও মহিলা-পণ্ডিতকে কোনভাবেই বাধা দেবেন না।

তর্কবাগীশ রুখে ওঠে, তা কী করে সম্ভব? ভবিষ্যতে যে মহিলা এ জাতের পণ্ডিতা দেখাবেন, তাঁর শিক্ষা বা জ্ঞান কতদূর তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে না!

—না! নিশ্চয় নয়! সে বিষয়টি বিচার করে দেখবেন যে গুরুকুল তাঁকে অধ্যাপন-অধিকার

প্রদান করছেন, দেখবেন কাশীরেশ সে সিদ্ধান্তে পাতসাহীছাপ দেওয়ার পূর্বে। আপনাদের কী অধিকার? কে দিয়েছে সেই দায়িত্ব?

এবারও বিচারকত্রয়ী বিদ্যালয়দ্বারের মতই স্বীকার করলেন। পঞ্চপণ্ডিতকে সেই মর্মে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দিতে হল।

গুরু হল বিচার।

যুক্তি-তর্ক, প্রতিতর্ক, বিপ্রতীপতর্ক, উদ্ধৃতি, অনুজ্ঞা, নির্দেশ! জগমোহন এবং তাঁর সহযোগীরা স্তূপাকারে সাজিয়ে রেখেছেন নানান পুঁথি। যখন যা প্রয়োজন যেন হাতের কাছে পাওয়া যায়।

তালিকা মিলিয়ে ক্রমে ক্রমে যুক্তিগুলি পেশ করতে থাকেন। নানান পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, খ্রীজাতীয়কে হিন্দুধর্ম বেদপাঠের অধিকার দেয়নি, বস্তুত তার দেবার্চনা, দেবপূজার অধিকার নাই। শুধু স্বামীসেবা:

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

অর্থাৎ দ্বিজগণের গুরু হচ্ছেন অগ্নি, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই গুরু, অতিথি গৃহস্থের গুরু আর স্বামী স্ত্রীলোকের পরম গুরু।

বিদ্যালয়দ্বার বললেন, এটি কোনও প্রামাণ্য শাস্ত্রবাক্যরূপে চিহ্নিত করা যায় না। সম্ভবত এটি একটি উদ্ভট শ্লোক। কিন্তু পূর্বপক্ষ যখন সেটিকেই যুক্তি হিসাবে দাখিল করেছেন তখন তারই বিচার করি: অগ্নি নির্বাপিত হলে অরণি কাষ্ঠের সাহায্যে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। অতিথির অভাব কোন গৃহস্থকেই কখনো সহ্য করতে হয় না, বিশেষ করে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে। মস্ত্রটি যখন ব্রাহ্মণ-রচিত তখন ব্রাহ্মণদেরই সকলের গুরু হিসাবে দেখানো স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী? কোথায় তার পরিপূরক? এই ব্রাহ্মণধর্মে? পতিব্রতা সাধ্বী বিধবা হয়ে পড়লে তখন সে গুরু কোথায় পাবে? তখন সে যদি স্বাবলম্বী হতে চায়—নিজের এবং সম্ভ্রানের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন মেটাতে—তখন তাকে উপার্জনক্ষম হতেই হয়। সেই বিধবা যদি বিদুষী হন, তাহলে তাঁকে চতুষ্পাঠী পরিচালনাই বা করতে দেওয়া যাবে না কেন? অন্যথায় সে কীভাবে তার এবং তার সম্ভ্রানের ভরণপোষণ করবে? তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবে?

তর্কবাগীশ বললেন, করবে না। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের এই ধারণাটা অর্বাচীন, প্রাচীন শাস্ত্রে তার কোনও স্বীকৃতি নেই। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে:

পিতা রক্ষতি কৌমাৰে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি॥^১

বিদ্যালয়দ্বার বললেন, বশিষ্ঠের এই ধর্মসূত্রটি সাধারণ সূত্র। আর্য ঋষিরা যাযাবরবৃত্তি ভ্রাম্য করে যখন কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গোষ্ঠী ও কৌম যখন পিতৃতান্ত্রিক ‘কুল’ ও ‘প্রবর’-এর জন্ম দিচ্ছে তখন এই নীতি সাধারণভাবে গ্রহীত হয়েছিল।

^১ কুমারীকালে নারীকে রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা। নারীকে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নাই [৫/১-২]।

কাশীবাস

সূতিকাগৃহে যে কন্যা পিতৃহীন হয়ে যাচ্ছে, যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বেই যে বিধবা হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতি যে এই সাধারণ সূত্র প্রযোজ্য নয় এ-কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

—আপনি কি তাহলে সেই ব্যতিক্রমক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অধিকার প্রার্থনা করছেন?

—নিশ্চয় নয়। শৈশবে পিতৃহীন, কৈশোরে বিধবা না হলে স্ত্রীলোক বিদ্যাচর্চা করতে পারবে না এ-কথা আমি বলছি না। আমি সাধারণভাবেই বলতে চাই—‘ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি’ বিধানটি ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য হলেও সর্বত্র স্বীকার্য নয়।

—কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে সর্বত্র এই নির্দেশই আছে যে, স্ত্রী সর্বদা স্বামীর অনুগামিনী হবেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন, “স্ত্রীঃ পুংষোঃ অনুবর্ত্যানো ভাবুকাঃ”। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছেন, “পতিং বা অনুজায়া”^১।

বিদ্যালঙ্কার সহাস্যে বললেন, আপনি শতপথ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি শুনিয়েছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি ঋগ্বেদের উদ্ধৃতি দিই। ঋগ্বেদের ঋষি বলছেন, “উষা যাতি স্বসরস্য পত্নী”। অর্থাৎ পতি-সূর্য পত্নী-উষার অনুগমন করেন। এবার আপনিই বলুন—কোন নির্দেশটি মানবেন? বৈদিক নির্দেশ অথবা পরবর্তী যুগের রচনা?

—ঋগ্বেদের ঋষি ওখানে কবিত্ব করেছেন মাত্র!

—কিন্তু তথ্যটা প্রাকৃতিক। সূর্যপত্নী উষা কোনদিন সূর্যের অনুগমন করেন না।

তর্কবাগীশ বলেন, মনে হচ্ছে আমরা সামাজিক বিধান এবং তত্ত্বকথা ছেড়ে কাব্য নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছি। আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করি: ব্রাহ্মণধর্মে স্ত্রীলোক বেদমন্ত্র পাঠ করতে পারত না। স্বামী যজ্ঞ করলে সে শুধু উপস্থিত থাকত, কোন মন্তোচ্চারণ করার অধিকার তার ছিল না—“ন স্ত্রী জুহুয়াৎ”^২। বৈদিক যজ্ঞের পূর্বার্ধ স্বয়ং যজমান, উত্তরার্ধ তার পত্নী; কিন্তু পত্নী শুধু তার স্বামীর পাশে বসে থাকার অধিকার লাভ করত। শতপথ ব্রাহ্মণের স্পষ্ট নির্দেশ—“পূর্বার্ধো বৈ যজ্ঞস্যাদধযুক্তজঘনার্ধং পত্নী”^৩।

—জানি। সে জন্য শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতাকে বামে বসিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। তাতে কী প্রমাণ হয়?

—প্রমাণ হয় “অস্বতত্ত্বা ধর্মে স্ত্রী”^৪ সন্তান উৎপাদন, স্বামীসেবা, এবং গৃহকর্ম ব্যতীত সামান্য দু’ একটি বৃত্তি কুলনারীর অধিকারভুক্ত বলে শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, যথা—পশম পাকানো, বোনা, সূতা-কাটা বা রেশমের গুটি বানানো। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ তো বহু দূরের কথা, বৈদিকমন্ত্র তাঁদের শোনাও পাপ। বোধকরি যজ্ঞমানের বামপার্শ্বে উপবিষ্টা তদীয় পত্নীর কর্ণমূলে কার্পাসখণ্ড প্রবিষ্ট করার বিধান ছিল, কারণঃ “স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা”^৫।

১ নারীর কর্তব্য পুরুষের অনুগামিনী হওয়া [১৩/২/২৪]।

২ স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে অনুগমন করবে [১/৯/২/১৪]।

৩ উষা সূর্যদেবের আগে আগে যান [১/১১৫/২]।

৪ নারী হোম করতে পারবে না [অবাস্তব ধর্মসূত্র ২/৭/১৫/১৭]।

৫ যজমান পূর্বার্ধ, তদীয় পত্নী যজ্ঞের উত্তরার্ধ [শ. ব্রা- ১/৯/১/২, ৫/২/১-১৫]।

৬ ধর্মচারণে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, ভূমিকা নেই [গৌতম ধর্মসূত্র, ১৮/২]।

৭ স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণদের বন্ধুহীনীয় ক্ষত্রিয়-বৈশ্য আদির পক্ষে স্ত্রী বেলের মন্ত্র শোনাও পাপ।

এটিকে আপনি নিশ্চয় অব্যবহৃত শ্লোক বলবেন না, কারণ এ শ্লোক যখন রচিত হয়েছিল তখন 'অথর্ববেদ' পর্যন্ত অনুপস্থিত। তাই 'ত্রয়ী' বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ঋক্, সাম ও যজুঃ' বেদই তখন উপস্থিত।

বিদ্যালঙ্কার বললেন, এটিও কোনও বৈদিক সূত্র নয়। মনে হয় এ শ্লোকটি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত, কারণ সেই সময়েই সূত্রসাহিত্য সংকলিত হয়। যে কোন হেতুতেই হোক সূত্ররচনাকার অথর্ববেদকে পরিত্যাগ করেছেন। সে যাই হোক, আলোচ্য শ্লোকে বক্ষ্যমান তিনটি দৃষ্টিকোণ—ত্রীলোক, শূদ্র এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্য। সম্ভবত এ শ্লোক মহাকাব্য যুগের পূর্বে রচিত—না হলে শম্ভুক উপাখ্যানে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করতেন না...

সভায় একটা অক্ষুট গুঞ্জন শ্রুত হল।

বিদ্যালঙ্কার তৎক্ষণাৎ সংযত হলেন। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে বলেন, আমি কোনভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র চরিত্রে অথবা আদি কবির রচনার সমালোচনা করতে চাইছি না। তারা তৎকালীন সামাজিক নির্দেশে পরিচালিত হয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু অপর দুইটি দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। উপনিষদের যুগে “ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব নরপতিরা অনেকেই আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা ছিলেন; ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তাঁহাদের সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে উপদ্রষ্ট হইতেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে, প্রবাহন রাজা গৌতম ঋষিকে কহিতেছেন—

যথেষ্ম প্রাক্তত্ত্বং পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্
গচ্ছতি তস্মাদুসর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব
প্রশাসনমভূদিমি।”—ছান্দোগ্য। ১৫।৩।৭।^১

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সমান্তরালে আদি যুগে ক্ষত্রিয় নৃপতিরাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছেন। যেমন বিশ্বামিত্র মুনি, যেমন কালীমহিষী মদালসা।

তৃতীয় দৃষ্টিকোণ: নারীজাতি।

সে সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি পূর্বপক্ষকে একটি প্রতিপ্রশ্ন পেশ করছি: 'উপাধ্যায়' এবং 'উপাধ্যায়িনী' শব্দদ্বয়ের পার্থক্য কী?

তর্কবাগীশ কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে বলেন, মতভেদে কিছু যোগরূঢ় অর্থভেদ হতে পারে, মূলত শব্দ দুটি সমার্থক। তার অর্থ: অধ্যাপকের সহধর্মিণী।

হাসলেন হটী বিদ্যালঙ্কার। বললেন, বিশ্বাস করা কঠিন, এমন দুইটি বহুলব্যবহৃত শব্দের অর্থ পূর্বপক্ষীয় পণ্ডিতদের জানা নাই। ঐ শব্দ দুটি আদৌ সমার্থক নয়। পাণিনির সুস্পষ্ট নির্দেশে 'উপাধ্যায়িনী' শব্দের অর্থ উপাধ্যায়ের স্ত্রী; এবং 'উপাধ্যায়' শব্দের একটিমাত্র অর্থ—'স্ত্রী-জাতীয়া অধ্যাপক' বা অধ্যাপিকা। আমি সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করে প্রশ্ন

১ উদ্ধৃতিটি অক্ষয়কুমার দত্ত বিরচিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৪ পৃঃ ১১১) থেকে। বিদ্যালঙ্কার এ ভাষায় কথা বলছেন তা লেখকের কল্পনা—কিন্তু তথ্যটা যে কাঙ্ক্ষনিক নয় এটা বোঝাতে ঐ উদ্ধৃতি। শ্লোকের অর্থ: "তোমার পূর্বে ব্রাহ্মণদের এই বিদ্যায় অধিকার ছিল না; অতএব সর্বত্র ক্ষত্রিয়জাতিরই ইহা উপদেশ দেবার অধিকার ছিল।"

কবিতা

রাখছি—এখানে এমন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কি আছেন, যিনি আমার সঙ্গে একমত নন ? অর্থাৎ ‘উপাখ্যায়’ শব্দের অন্য কোনও যোগরূঢ় ব্যবহার যিনি লক্ষ্য করেছেন ? থাকলে, তিনি অনুগ্রহ করে আমার ভ্রান্তি অপনোদন করুন।

সভাস্থলে মৃদু গুঞ্জনই শুধু উঠল। হট্টা বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে তাঁরা যে একমত তা বোঝা গেল।

বিদ্যালঙ্কার পুনরায় বলতে থাকেন, ঐ শব্দটির অস্তিত্বই প্রমাণ করে—ব্যবহারিক প্রয়োজনে শব্দটির সৃষ্টি হয়েছিল। স্ত্রীজাতীয়া অধ্যাপকের অস্তিত্ব না থাকলে তার অর্থবোধক ঐ শব্দটি আদৌ সৃষ্টি হত না। এবার আমার প্রশ্ন—বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী উপাখ্যান :

মিথিলাধিপতি জনক একবার এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। দেশ-দেশান্তর থেকে দক্ষিণার লোভে সমবেত হয়েছেন বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রালোচনা শ্রবণমানসে ঐ সঙ্গে সমবেত হয়েছেন অনেকানেক নির্লোভ ব্রহ্মজ্ঞও। মহারাজ সভাস্থলে নিয়ে এলেন এক সহস্র গাভী। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি গাভীর প্রতিটি শৃঙ্গে দশদশ পরিমাণ সুবর্ণ-অলংকার। ধরুন প্রতিটি তিন তোলা ওজনের। সমবেত পণ্ডিতদের সম্বোধন করে রাজা জনক ঘোষণা করলেন, ‘আপনাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ তিনি অনুগ্রহ করে অগ্রসর হয়ে আসুন, এই গাভীকুল তাঁর প্রাপ্য।’ স্বভাববিনয়ী ব্রাহ্মণেরা অধোবদনে নিস্তব্ধ হয়ে বসেই রইলেন। গোধনে তাঁদের যথেষ্টই লোভ। কিন্তু লোভের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে সঙ্কোচ ও আতঙ্ক। শুধু আর্যাবর্তের নয়, হিমবর্ত থেকেও একান্তচায়ী সাধকবৃন্দও সমাগত—কোন আক্কেলে উঠে দাঁড়ান ? ওঁরা যদি সমবেতভাবে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন ?

সভাস্থে ব্রাহ্মণদের অধোবদন দেখে উঠে দাঁড়ালেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। বিশ্বামিত্রের বংশধর, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বা চারায়ণের তনয়। মহামুনি তিনি। বাজসনেয়ী সংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদ ঐরই রচনা। তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, বাবাসকল ! এই গাভীকুলকে আমার আশ্রম অভিমুখে পরিচালিত কর।

স্তুভিত হয়ে গেল সভাস্থ সকলে !

এবার গাত্ৰোত্থান করলেন জনকরাজের কুলপুরুষোহিত অশ্বল। বললেন, ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য ! আপনি কি বলতে চান যে, এই আর্যাবর্তের ভিতর আপনিই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ ?

যাজ্ঞবল্ক্য করজোড়ে নিবেদন করেন, ব্রহ্মবিদ্যের শ্রীচরণে শতকোটি নমস্কার ! শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ হিসাবে আমি অগ্রসর হয়ে আসিনি; বাস্তবে আমার কিছু গোধনের প্রয়োজন। তত্ত্বি লক্ষ্য করে দেখলাম, সমবেত সকলেই নীরব। তাই অনুমান হল—আমি কিছু অস্পষ্ট দেখি বটে, কিন্তু সমবেত সকলে সম্ভবত ছুছুন্দরপ্রতিম দৃষ্টিহীন !

অশ্বল বলেন, ক্ষান্ত হোন ঋষিবর ! প্রথমে প্রমাণ করুন—আপনিই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ। আমাদের সবাইকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করুন। প্রথমে আমিই প্রশ্ন রাখি :

একের পর একজন পর্যায়ক্রমে প্রশ্ন করতে থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ সদুত্তর দান করে যান। প্রথমে অশ্বল। ‘অশ্বল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ’ বৃহদারণ্যকোপনিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তারপর এলেন জরৎকার-বংশীয় আত্ৰভাণ্ড ঋষি। তৎপর ভৃজুঋষি।

অতঃপর চাক্রায়ণ উষন্ত, উষন্তের পরে কৌষীতকেয় কহোল। প্রত্যেকের উত্থাপিত প্রশ্নের সম্ভোষজনক উত্তর বা সমাধান দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য।

সর্বশেষে উঠে দাঁড়ালেন মহাপণ্ডিতা গার্গী।

এই খণ্ড-কাহিনীর শেষ প্রশ্নকর্ত্রী সেই মহিলাটি।

বচকৃতনয়া ব্রহ্মবাদিনী। তাঁর প্রশ্নগুলিই হল সর্বাপেক্ষা জটিল, সর্বোচ্চস্তরের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

উপনিষদকার যে পর্যায়ক্রমে প্রশ্নকর্তাদের সাজিয়েছেন তার সর্বশেষে গার্গীকে স্থান দেবার একটাই অর্থ। পরিচিত রচনাকৌশলী! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় অর্জুন অথবা জানকীর বিবাহসভায় শ্রীরামচন্দ্র যে কারণে সবার শেষে উপস্থাপিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ সেদিন জনকসভায় উপস্থিত ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে উত্তরদাতা যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন এই বচকৃতনয়া গার্গী। বস্তুত তাঁর শেষ প্রশ্নটির প্রত্যুত্তর দিতে অশক্ত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলে উঠেছিলেন, “গার্গী মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্খা ব্যপপুং।”^১

বলা বাহুল্য, এই সতর্কবাণীর মধ্যে পরাজয় স্বীকারের একটি অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা অনস্বীকার্য। প্রকাশ্যে নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়ে তিনি তির্যকপথে গার্গীকে অনুরোধ করছেন, ঐ জাতীয় অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা থেকে বিরত হতে।

ভুললে চলবে না, বৃহদারণ্যকোপনিষদ স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যের রচনা। লেখক অনায়াসে এই কথোপকথন অনুজ্ঞ রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা রাখেননি। লেখকের নিজস্ব ত্রুটির এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ভারতীয় সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—ঠিক যেভাবে অকুণ্ঠভাষায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্মরহস্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সত্যাপ্রিয়ী যাজ্ঞবল্ক্য তাই ঐ অনবদ্য শ্লোকটিও রচনা করেছেন—গার্গী, তুমি প্রশ্নসীমা অতিক্রমণে ‘অতিপ্রশ্নের’ নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছ। ক্ষান্ত হও!

গার্গী সে সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে পুনরায় বললেন, ঋষিবর! এবার আমার শেষ প্রশ্ন: বলুন—এই যে দু্যলোক, তার উপরে কী বর্তমান? এই যে ভুলোক, এর অতলেই বা কী আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তার নাম: সূত্রাত্মা! সূত্রের মতো এই তিন ভুবন গ্রথিত। সেই সূত্রটির অভিধা: ব্রহ্ম!

অতঃপর গার্গী সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং জনকরাজকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করুন। বিদ্যায় আর ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ এই ভূভারতে আর কেউ নাই।

সমগ্র রাজসভা এই শেষ নিদান এক কথায় মেনে নিলেন।

দীর্ঘ কাহিনীটি বিদ্যালঙ্কারকে বিবৃত করতে হয়নি। বৃহদারণ্যকোপনিষদ বিচারসভায় উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সুপরিচিত। তাই ইঙ্গিত দিয়েই তিনি প্রশ্ন রাখলেন, এবার আপনারা বলুন, সেই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী—উপনিষদকার ঋকে সাহিত্যরচনায় শৈলীমাধ্যমে ইঙ্গিতে বলেছেন—যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যতিরেকে তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য, একমাত্র যিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে

^১ গার্গী! আর বেশী প্রশ্ন কর না, তোমার মাথা খসে পড়বে [বৃ.আ.উ.৩/৬/১]।

বাংলাদেশ

পরীক্ষা করে দেখার মতো জ্ঞানের অধিকারিণী, যার ঘোষণা সমগ্র পণ্ডিতসমাজ নতমস্তকে শেষবিচার বলে স্বীকার করে নিলেন—তিনি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণের সময় কী বলতেন? ‘ওঁ’ এর পরিবর্তে ‘নমঃ’?

পঞ্চপণ্ডিতের মধ্যে একজন বলে ওঠেন, গার্গী এক দুর্লভ ব্যতিক্রম।

—সে ক্ষেত্রে মৈত্রেয়ী? ঐ যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্মিণী? যিনি বলতে পেরেছিলেন, ‘যেনাহম্ নাম্বতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?’^১ অথবা এই কাশীধামের পৌরাণিক মহারাজা অলকের জননী, মদালসা? অলককে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য গুরুর আশ্রমে যেতে হয়নি, রাজাস্তঃপুরে তত্ত্বদর্শিনী জননীর কাছে তা পেয়েছিলেন। কেমন করে? বাস্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী ছিলেন পণ্ডিতা—বিদর্ভ রাজকন্যা রুহ্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে কী করে স্বহস্তে গোপনপত্র লিখে পাঠান, যদি তাঁর অক্ষর-পরিচয় না হয়ে থাকে? উভয়ভারতী কোন আধিকারে আচার্য শঙ্কর এবং মণ্ডন মিশ্রের বিচারসভায় বিচারকরূপে নির্বাচিতা হন?

তর্কবাগীশ বললেন, আপনি উত্তেজিতা হবেন না! চিন্তা করে দেখুন, যুগযুগান্তরের ঐতিহ্যময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকে এ পর্যন্ত চার-পাঁচটি উদাহরণ আপনি পেশ করেছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই কয়েক সহস্রাব্দে কয়েক লক্ষ পুরুষ শাস্ত্রজ্ঞ এসেছেন এবং গেছেন। ফলে ঐ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ব্যতিক্রম বলা চলে।

বিদ্যালঙ্কার বলেন, না। চার-পাঁচটি মাত্র নয়। ঋগ্বেদের সূত্রকারদের ভিতর অনূন সাতাশজন মহিলার নাম পাওয়া যায়। গার্গী প্রণীত ঋগ্বেদের টীকা আজও প্রামাণ্য। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত অষ্টবিংশতি সূক্তটি আদ্যন্ত রচনা করেছিলেন বিশ্ববারা-নারী একজন অত্রি বংশীয়া মহাপণ্ডিতা। এছাড়া সংখ্যাতত্ত্ব-বিচার ওভাবে করা যায় না। সংখ্যাতত্ত্বের বিচার তখনই গ্রাহ্য যখন দুটি তুলনীয় বিশেষ্যপদ একই পরিমণ্ডলে অবস্থিত। বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানলাভের বাতাবরণ যদি পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে তুল্যমূল্য থাকত, তাহলেই আপনার ঐ কয়েক লক্ষ এবং মুষ্টিমেয় সংখ্যা দুটির বিচার গ্রাহ্য হত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি বিচার্য বিষয়ের বাতাবরণ দুই রকম ছিল। সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করুন, তার ধারাবাহিকতাটি বিচার করুন। তাহলেই প্রণিধান করবেন কেন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নারী সংখ্যালঘিষ্ঠ।

অতঃপর বিদ্যালঙ্কার তত্ত্বটির দীর্ঘ বিশ্লেষণে রতী হলেন:

মনুর বিধান শাস্ত্রতকালের হতে পারে না। প্রত্যেকটি মনুর শাসনকালের অবসানে, অর্থাৎ প্রতিবার মন্বন্তরে কালকশাঘাতে সে বিধান জরাজীর্ণ হয়ে যায়, পরিবর্তনযোগ্য হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে বৈদিক অনুশাসন অনাদ্যন্তকালের। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন—বৈদিকযুগের আদিম পর্যায়ে পুরুষের মতো ব্রহ্মবিদ্যাধিনিদের ব্রহ্মচর্য পালন কুরতে হত। শিক্ষণীয় বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ছাত্রীদের সে-কালে দুইটি প্রধান ধারায় বিভক্ত করা হত। যার আভ্যন্তরীণ দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় নিরত থাকার সম্ভাবনা তাদের, বলা হত: ‘ব্রহ্মবাদিনী’। তাঁদের পক্ষে আশ্রমিক, চিরকুমারী বা বিগতভর্তা হবার কোনও আবশ্যিক

^১ যা (যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরাধিকারিণী হিসাবে পার্থিব ধনসম্পদ) পেলে আমি ‘অমৃতজ্ঞ’ করব না, তা নিয়ে কী করব?

শর্ত ছিল না। অনেকেই সীমন্তিনী, ব্রহ্মচারিণী নন। সংসারধর্ম পালনের অবকাশে তারা যোগসাধনা করতে পারতেন। রাজবৈভব যেমন রাজর্ষি জনকের সাধনমার্গে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি তেমনি কাশীরাজ মহিষী মদালসাও স্বামী-সংসার পুত্র-কলত্র দাসদাসী পরিবেষ্টিত হয়েও রাজান্তঃপুরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী হতে পেয়েছিলেন।

স্মর্তব্য—আদিমতম যুগে যাযাবরধর্মী পশুচারী আর্যরা যখন প্রথম উত্তরভারতে আসেন তার আগেই সেখানে ছিল কৃষিজীবী নগরসভ্যতার একটি অপূর্ব নিদর্শন: ‘সিন্ধুসভ্যতা’। তারা ছিল ব্রোঞ্জযুগের মানুষ—বলদে-টানা ব্রোঞ্জধাতুর লাঙ্গল ছিল তাদের অধিকারে, লৌহ-নির্মিত অস্ত্রধারী অশ্ববাহিত রথী তারা চিনত না। হয়তো লৌহ-নির্মিত তরবারি অথবা ভল্লই ছিল ইন্দ্রের বজ্র, যা নির্মাণ করেছিলেন দধীচি নামের কোনও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ—হাপরে ফুঁ পাড়তে পাড়তে যাঁর পাঁজরা ঝাঁঝ হয়ে যায়। প্রাগাৰ্য সভ্যতার বীরদল—মহেন্ জো-দড়ো-হড়াম্বার প্রতিরোধকারীরা তাদের ব্রোঞ্জনির্মিত অস্ত্র দিয়ে সে লৌহ-বজ্রকে প্রতিহত করতে পারেনি। তা সে যাই হোক, পঞ্চনদের উর্বর ভূখণ্ডে কুঠারধারী পরশুরাম হলেন হলধারী বলরাম। কাঠুরিয়া যাযাবর বৃত্তির মানুষ হল কৃষিজীবী। স্থায়ী হবার পরই এল জমি অধিকারের প্রশ্ন এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি জমির উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। যাযাবরধর্মীর গোষ্ঠী^১ ও কৌম^২ ভেঙে গড়ে উঠতে থাকে শস্যক্ষেত্র-ভিত্তিক কুল^৩ ও পরিবার^৪—ক্রমে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা রূপান্তরিত হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। দেখা দিল দুটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ—‘ভৃত্য’ আর ‘ভার্য্য’! দুটিই এক ‘ধাতু’তে গড়া = $\sqrt{\text{ভ}+\text{য}}$ । অর্থাৎ ভরণীয় — যাকে খাওয়া পরা দিয়ে কাজ করাতে হয়। এমনকি ‘ভৃত্য’ শব্দের দুটি অর্থ — (১) দাসবর্গ, (২) “অবশ্যভরণীয়পুত্রদারাদি বর্গ”^৫। কী কাজ? ভৃত্য করে শস্য উৎপাদন, গৃহস্থামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে নানান শ্রমের কাজ; ভার্য্যও তা করে, উপরন্তু করে সন্তান উৎপাদন। দুজনের কর্মক্ষেত্রে একাংশে আছে মিল—উভয়েরই অবশ্য-কর্তব্য গৃহস্থামীর পদসেবা।

এই যে পুং-জাতির সেবক ‘ভৃত্য’ এবং ‘ভার্য্য’, এরা ভরণীয় তো বুঝলাম, কিন্তু কীভাবে তাদের ভরণপোষণ করতে হবে? যাতে প্রথমজন কৃষিক্ষেত্রে শস্য এবং দ্বিতীয়া সংসার-ক্ষেত্রে পুত্রসন্তান উৎপন্ন করতে পারে? শাস্ত্রে কী কোনও নির্দেশ নাই? আছে। বৎস! অবধান কর: ভৃত্যকে প্রদান করবে ব্যবহৃত পোশাক, যা জীর্ণ হয়ে এসেছে এবং ভার্য্যকে দেবে—“ভুক্তোবাচ্ছিত্তংবধৈব দদাৎ”^৬।

* এই যখন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে যাচ্ছে তখন যে ‘ব্রহ্মবাদিনী’ শিক্ষার্থী অপ্রতুল হয়ে আসবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তখনো ছিল আর এক জাতির ক্রীশিক্ষার ব্যবস্থা—ঐ মানসিকতা থেকে—শুধু জান্তব ক্ষুদ্রবৃত্তিতেই মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। তাই আদিমযুগে বালিকা, কিশোরী এমনকি যুবতীদেরও কিছু কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তারা ব্রহ্মবাদিনী হত না অন্তিম—ব্রহ্মাস্বাদের বাসনা তাদের থাক না থাক, অভিভাবককুল চেয়েছিলেন তাদের অক্ষর পরিচয় দিতে। কিছুটা ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য। সচরাচর প্রাগবিক্ষেপকালেই এই

^১ গোষ্ঠী = tribe, ^২ কৌম = clan, ^৩ কুল = sect, ^৪ পরিবার = family, ^৫ মনুসংহিতা ১১/১২

^৬ অহারাশ্তে যা খেতে পারলে না সেই ভুক্তবশিত সমেত ঐটে পাতাখানা ক্রীকেশ্বরে দেবে [গৃহসূত্র ১/৪/১১]।

বিদ্যাচর্চার আয়োজন হত বটে তবু প্রথম যুগে বিবাহিতা ও বিগতভর্তা অবস্থাতেও কেউ কেউ এ জাতীয় বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন। তাঁদের বলে: ‘সদ্যোদ্ধাহ’।

বৈদিকযুগে স্বামীস্ত্রী যে একত্রে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন তার প্রমাণ রয়ে গেছে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশত একত্রিশতম সূক্তে। “বি ত্বা ততশ্চে মিথুনা অবস্যাবো ব্রজস্য সাতা...” ইত্যাদি সূক্তে যজমান-দম্পতি যৌথভাবে অগ্নিকে আহুতি দিচ্ছেন (১/১৩১/৩)। পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টবিংশতি সূক্তে অগ্নিদেবতাকে বলা হল, “সং জম্পতাং সযমমা কৃণুষ” (তুমি আমাদের দাম্পত্য-সম্পর্ক সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর—৫/২৮/৩)। অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেও নারী যজ্ঞ করতে পারতেন। এই মন্ত্রটির দেবতা: অগ্নি, ছন্দ: গায়ত্রী এবং ‘দ্রষ্টা’ বা রচয়িতা হচ্ছেন অত্রি-গোত্রজা বিশ্ববারা-নারী রমণী-ঋষি! শুধুমাত্র ঋগ্বেদেই পাচ্ছি একাধিক ‘মহিলা-দ্রষ্টা’—অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা (১/১৭৯), ঋষি অত্রির কন্যা অপালা (৮/৯৬), ঋষি কক্ষিবৎ-তনয়া ঘোষা (১/১৭৭/৭ এবং ১০/৩৯-৪০), ঋষি অভূণাশ্বজা বাক্ (১০/১২৫) এবং ইন্দ্রের সহধর্মিণী ইন্দ্রানী (১০/১৪৫)। সেকালে কুমারী কন্যার উপনয়ন হত, তাদের সাবিত্রীমন্ত্র জপ এবং অধ্যাপনের অধিকার স্বীকৃত (“পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জী বন্ধনমিষ্যতে/অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা ॥”—শব্দকল্পদ্রুম-মতে ‘মৌঞ্জী’ অর্থে ‘উপনয়ন’)। চিরকুমারী-সাধিকা ভ্রাতাদের সঙ্গে সমানভাবে পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণীও হতেন (২/১৭/৭)।

কীভাবে আদিম বৈদিকযুগের স্ত্রীশিক্ষার ঐ দ্বিধারা—ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোদ্ধাহ—অবলুপ্ত হয়ে গেল তার একটি চূষকসার অতঃপর ব্যাখ্যা করে শোনালেন হটী বিদ্যালঙ্কার:

চতুর্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ ছিল কর্মপ্রধান, আরণ্যক ও উপনিষদ-অংশ জ্ঞানপ্রধান। মীমাংসকগণ আরও সুস্পষ্টভাবে বিচার করে শ্রুতিকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করলেন: বিধি, নিষেধ, অর্থবাদ, মন্ত্র, নামধেয় এবং উপনিষদ। যা যজমানের প্রবৃত্তিকে যাগাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে তাই হচ্ছে প্রথম শ্রুতি: বিধি। যা শ্রবণে চিত্তে নিবৃত্তির উদয় ঘটায় তা হল: নিষেধ। “দেবস্য ত্বা ইত্যাদির দ্বারা অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মরণ হয় বলে তা মন্ত্র”। অর্থবাদ দুই প্রকার—প্রশংসা ও নিন্দা। “জ্যোতিষ্টোম—এই নামভাবনা করিবার জন্য নামধেয় এবং অবিদ্যানিরাসপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশ উপনিষদে আছে।”^২

বৈদিকযুগে কর্মবাদের আদর্শ ছিল গার্হস্থ্যধর্ম। সঙ্গীক আচরিতব্য। নিত্য যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীস্ত্রী বৈদিক বিধিগুলি স্বীকার করে ধর্মচর্চা করতেন যৌথভাবে। তখনও ভার্যাকে ভুক্তবশিষ্ট দিয়ে ‘ভরগীয়’ মনে করা হত না। যজমানের স্ত্রী তখনো তার সহধর্মিণী, ‘ভার্য’ নয়! ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্রের প্রথম পর্যায়ে এইসব স্বামীস্ত্রীর যুগলে আচরিতব্য গার্হস্থ্য ধর্মচরণের প্রণালী বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।

তার পরবর্তী কালে উপস্থিত হল দুটি অন্তরায়।

এক: বেদবিরোধী কর্মবাদের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব; দুই: শ্রুতিপথবিরোধী

^২ এবং: “বাঙলার সংস্কৃত সমাজের এক বিখ্যাত অধ্যাপক, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ‘দেশ’ পত্রিকা, ২০ জুন, ১৯৮৭।

জ্ঞানবাদের ধ্বজাধারী জৈন তীর্থঙ্করের দল, তথা বর্ধমান মহাবীরও প্রায় সমকালের চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শনের প্রভাব।

শ্রুতি তখন রূপান্তরিত হয়ে গেল স্মৃতিতে।

ব্রাহ্মণ্যধর্মে ক্রমে আবির্ভূত হল মনু প্রভৃতির রচিত ঊনবিংশতি সংহিতা।

মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট, ইত্যাদির রচনা করতে শুরু করলেন সংহিতার সটীক ব্যাখ্যা।

স্মার্তপণ্ডিতেরা নানান বিধান জারী করতে শুরু করলেন। ইতিপূর্বে প্রতিটি সিদ্ধান্তের পূর্বে হিতাহিতের ব্যাখ্যা দেওয়া হত—ভাল কেন ভাল, মন্দ কেন পরিহার্য। এখন সে জাতের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতা লোপ পেল। স্মার্ত পণ্ডিতেরা ‘আশ্ববাক্য’ ধরনের হুকুমনামা জারী করতে শুরু করলেন।

বলা যায় এখনই শুরু হল অচলায়তনের সেই ‘তট-তট-তট তোটয়’-র জমানা।

প্রাথমিক যুগে যদিচ বিবাহযোগ্য কন্যার বয়স সচরাচর ধরা হত ষোলো-সাতেরো, এই যুগে তা কমিয়ে আনা হল নয়-দশে। ‘কেন’, তার হেতু প্রদর্শন স্মার্ত-পণ্ডিতদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। ক্রমে প্রচলিত হল মারাত্মক গৌরীদানের ব্যবস্থা: ‘অষ্টমবর্ষেতু ভবেৎ গৌরী’

ফলে ‘সদ্যোদ্ধাহ’-র অনুপাত অনিবার্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে।

মুসলমান যুগে খ্রীশিক্ষার পথে দেখা দিল আর একজাতের বাধা—

প্রথমত আগন্তুক বিজয়ীদের পদাপ্রথা হিন্দুসমাজে প্রভাব বিস্তার করল। দ্বিতীয়ত কিশোরী মেয়েদের পক্ষে পাঠশালায় যাতায়াত করার নিরাপত্তা আর রইল না। নারী বিদ্যাচর্চার প্রাঙ্গণে স্বতই সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেল।

ক্রমে ঐ স্মার্ত টুলো-পণ্ডিতদের প্রভাবে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার থেকে নারীসমাজ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে গেল। কুপমণ্ডকেরা নিদান হাঁকল: অক্ষর পরিচয় আর অকালবৈধব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

তবু, ব্যতিক্রম হিসাবে প্রতিটি যুগেই মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়েছেন গার্মী-মৈত্রেয়ীর উত্তরাধিকারিণীরা। অকালবৈধব্যের নিদারুণ সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে তাঁরা সারস্বত আরাধনা করে গেছেন অকুতোভয়ে।

বিদ্যালঙ্কার তাঁর যুক্তির সমর্থনে দুএকটি উদাহরণ শোনালেন। বিগত দুই এক শতাব্দীর ভিতর থেকে—

প্রথমত—ফরিদপুর অঞ্চলের কোটালিপাড়া গ্রাম নিবাসিনী প্রিয়দ্বদা দেবী।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে তাঁর জন্ম। পিতা প্রখ্যাত পণ্ডিত শিবরাম সার্বভৌম। টুলো পণ্ডিত হলেও তিনি ছিলেন ধনীব্যক্তি। কন্যাকে শিশুকাল থেকেই শিক্ষাদান করেছিলেন। পশ্চিমদেশীয় একটি ছাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দান করে তিনি কন্যা ও জামাতা বাবাজীধিনকে ‘মাঝবাড়ি’ গ্রামে অধিষ্ঠিত করেন। ভূসম্পত্তিদান ও চতুষ্পাঠী নির্মাণ করে দেন। পিতার যত্ন ও শিক্ষাগুণে প্রতিভাশালিনী প্রিয়দ্বদা কাব্যে, সাহিত্যে, ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বালিকা বয়স থেকেই সংস্কৃত ভাষায় যেমন অনর্গল কথা বলতে পারতেন তেমনি কবিতা রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন। কুলদেবতা শ্রীগোবিন্দদেবের উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত সংস্কৃত কবিতাটি

ইংরেজীতেও অনুদিত হয়েছে।”^১ “শ্যামারহস্য” নামে সুবিখ্যাত তত্ত্বশাস্ত্রের গ্রন্থটি এই প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনা। তাছাড়া মদালসা-উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা আর মহাভারতের মোক্ষধর্মের একটি সুবিস্তৃত টীকার ইনিই রচয়িত্রী।

দ্বিতীয়ত—ঐ ফরিদপুরেরই ধানকা গ্রামের জয়ন্তী দেবী। সপ্তদশ শতকে তাঁর জন্ম। মধ্যযুগের এক বিখ্যাত বিদুষী। স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। স্বামী শ্রী দুর্জনে মিলে তাঁরা রচনা করেছিলেন একটি চম্পূকাব্য, ‘আনন্দলতিকা’(1652)। কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, অলঙ্কারশাস্ত্রের অধিকারিণী এই মহিলাও বিশ্বাস করেননি ঐ অর্বাচীন যুক্তিতে — জীলোক সাক্ষর হলে অকালবৈধব্য প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়ত : দ্রবময়ী।^২

সমকালীন পত্রিকায় সম্পাদক তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন, “খানাকুল কৃষ্ণনগর সমিহিত বেড়াবাড়ি গ্রামনিবাসী ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী দ্রবময়ী দেবী (প্রবন্ধ রচনাকালে দ্রবময়ী পঞ্চদশী বালিকামাত্র, তবু তর্কবাগীশ তাঁকে ‘আপনি’ বলে উল্লেখ করেছেন) বালিকা বয়সে বিধবা হইয়া পিতার টোলে পড়িতে আরম্ভ করেন। পুরাণ মহাভাগবতাদি সর্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হয়েন মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে। পিতা তখন বৃদ্ধ। দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার টোলে ১৫-১৬জন প্রায় সমবয়সী ছাত্রকে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার পড়াইতেন।”^৩ সম্পাদক বর্ণনা করেছেন, ঐ প্রায় নাবালিকা পণ্ডিতাকে পরীক্ষা করতে প্রায়ই বিভিন্ন গুরুকুলের পণ্ডিতেরা সমবেত হতেন। দ্রবময়ী তাঁদের সঙ্গে বিচার করতেন ‘অনবগুপ্তিতা’ অবস্থায়। ‘পৃথগাসনে উপবিষ্টা’ হয়ে, এবং ‘অনর্গল সংস্কৃত ভাষায়’। যারা তাঁকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন তাঁরা স্বীকার করে যেতে বাধ্য হন যে, দ্রবময়ী পিতার চতুষ্পাঠী পরিচালনার উপযুক্ত পাঠ্রী।

পরিশেষে হটী বিদ্যালঙ্কার বিচারক-মণ্ডলী তথা কবীধামের পণ্ডিতসমাজের নেতৃস্থানীয় মহামহোপাধ্যায়দের উদ্দেশ্যে কৃতাজলিপুটে নিবেদন করলেন: নারীশিক্ষার এই রুদ্ধদ্বারটি আপনারা উন্মুক্ত করে দিন। নারী সমাজকে কৃপমণ্ডুপ দৃষ্টিভঙ্গিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখলে সমাজের সামূহিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য! অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, অবশ্য পরিত্যাজ্য। বালবৈধব্য আর সহমরণ প্রথার বীভৎসতায় হিন্দুসমাজ ক্রমশ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে।

বিচারকত্রয়ী সর্ববাদীসম্মতভাবে বিধান দিলেন: শুধুমাত্র নারীজন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবার অপরাধে কারও বিদ্যার্জন ও বিদ্যাবিতরণের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না!

বলাবাহুল্য জগমোহন তর্কবাগীশ আর তার দলবল এ পরাজয় শাস্তিচিন্তে গ্রহণ করতে পারল না। শুধু নব্যপণ্ডিতেরা নয়, প্রতিষ্ঠাবান কবিরাজেরাও। ক্রমে দেখা গেল—দ্বন্দ্বটো পুরুষ

^১ ‘বাঙালী চরিতাভিধান’, সংসদ। বলাবাহুল্য ইংরাজী অনুবাদটি হয়েছে অনেক পরবর্তী কালে।

^২ এটি লেখকের সজ্ঞান ‘অ্যানাক্রিনিজম’। দ্রবময়ীর জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে, হটী বিদ্যালঙ্কারের তিরোধানের পরে। কিন্তু দেবী করে আবির্ভূত হবার অপরাধে এই আশ্চর্য মহিষসী মহিলার নামটি বাদ দিতে মন সরল না।

^৩ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সম্পাদক ‘সম্বাদ প্রভাকর’ (১৯ এপ্রিল, ১৮৫১)

ও স্বীজাতির অধিকারভেদের সংগ্রামে পর্যবসিত হতে চলেছে। হয়তো হটী বিদ্যালয়দ্বারের পক্ষে ছিল মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্তা রমণীকুলের সমর্থন—কিন্তু সেই অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষপাদে 'আলোকপ্রাপ্তা' শব্দটাই যে অশ্রুত! তাঁদের উচ্ছ্বাস এ একবারই শ্রুত হল—কুরুক্ষেত্র তালো—এর বিচারসভায়—চিকের আড়াল থেকে। শঙ্করধনিত। অপরপক্ষে নব্যপণ্ডিতের দল মনে করল, এ প্রচেষ্টা শুধু অবমাননাকরই নয়, এ তাদের রুজি-রোজগারে হাত দেওয়া। এ কুলীনঘরের বালবিধবাটির কর্তব্য ছিল স্বামীর মস্তকটি ক্রোড়ে ধারণ করে সহমরণে যাওয়া। তাহলে সে ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে পারত। তা সে যায়নি। তাই বলে যা-নাকি আবহমানকাল পুরুষের অধিকারে—তাতেও সে হাত বাড়াবে?

ওরা সিদ্ধান্তে এল—এ কয়জন হুঁবির পণ্ডিতের এই বিধান মানা চলে না। সে বিচারসভায় শ্রীমন্ মহারাজ কাশীরনরেশের পাতসাহীই তো ছিল না—আনুষ্ঠানিকভাবে রাজদণ্ডটি শুধু শোভা পাচ্ছিল সভাস্থলে। স্বীকার্য—কাশীরনরেশ লোকান্তরিত, তাঁর পুত্রটি নাবালক—কিন্তু মহারাজের ভাগিনেয়টি তো সশরীরে বর্তমান। শোনা যাচ্ছে, সম্প্রতি তিনি এলাহাবাদ ক্যান্টনমেন্ট থেকে কাশীতে প্রত্যাবর্তনও করেছেন! ওরা সদলবলে তাঁরই দ্বারস্থ হল।

পুরন্দর ক্ষেত্রী এসব বৃত্তান্ত কিছুই জানত না। আদ্যন্ত শুনে সে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেল! এ কী অনাচার! কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা—সহমরণে স্বর্গে যাবি, তা নয় কাশীধামে এসে বেলেছাপনা শুরু করে দিলি? মস্তকমুগুন করে, শিখাধারণ করে, প্রকাশ্যে পুরুষের সঙ্গে পণ্ডিত্যমি করছিস্।

কঠিন শাস্তি দিতে হবে সেই দুর্বিনীতাকে!

জনমতকে স্বমতে আনার সাধনা তার। পুরন্দর জানে, দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব বা রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতির নিতান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ। সমগ্র কাশীর পণ্ডিতসমাজ বিদ্যালয়দ্বারের বিপক্ষে। তদুপরি কবিরাজদল। সকলেই মনেপ্রাণে চাইছে, হয়তো মুখে স্বীকার করছে না—এ বিদ্রোহিনীকে শাস্তি দেওয়া করতে, অপমান করতে।

তাই করবে পুরন্দর। এমন পৈশাচিক পদ্ধতিতে বেইজ্জত করবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোন পুরললনা এ দুঃসাহসের কথা স্বপ্নেও না চিন্তা করতে পারে।

পুরন্দর ধুরন্ধর। হঠকারিতা তার ধাতে নেই। অভিযোগ শুনেই সে ঐ ছুকরির চতুপ্পাঠীতে হানা দেয়নি। বিশ্বস্ত গুপ্তচরের মাধ্যমে সর্বপ্রথমে সংগ্রহ করল সংবাদের যথার্থ্য। যখন জানতে পারল, জগু-পণ্ডিতের অভিযোগের মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই, তখন এক পৈশাচিক উল্লাসে সে মেতে ওঠে। এতদিন কামচরিতার্থতা করতে হচ্ছিল গোপনে। প্রজাদের অসন্তোষের আশঙ্কায়। এবার সে নির্ভয়। এবার জনসমর্থন আছে তার কামচরিতার্থতায়—কিন্তু সেটাতে এমন প্রলেপ দিতে হবে যাতে মনে হয় এ রাজকর্তব্য! সমাজের কলুষতা দূরীকরণের জন্যই তাকে এ জাতীয় শাস্তির বিধান দিতে হল।

পৈশাচিক শাস্তিদানের সবচেয়ে বড় জাতের নজির রেখে গেছেন দীনদুস্মিয়ার মালেক বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর! শাহজাদা খুরম্-এর বিদ্রোহ দমন করে পুত্রের দুই সেনাপতিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরিকল্পনাটি অভিনব। একটি মৃত গাধা ও একটি মৃত বণ্ডের চামড়ার খোলের ভিতর জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল দুই সেনাপতিকে। তারপর চমকিধীরে এ

ও স্বীজাতির অধিকারভেদের সংগ্রামে পর্যবসিত হতে চলেছে। হয়তো হট্টা বিদ্যালয়কারের পক্ষে ছিল মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্তা রমণীকুলের সমর্থন—কিন্তু সেই অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষপাদে 'আলোকপ্রাপ্তা' শব্দটাই যে অশ্রুত! তাঁদের উচ্ছ্বাস ঐ একবারই শ্রুত হল—কুরুক্ষেত্র তালো—এর বিচারসভায়—চিকের আড়াল থেকে। শঙ্করবনিত। অপূর্ণপক্ষে নব্যপণ্ডিতের দল মনে করল, এ প্রচেষ্টা শুধু অবমাননাকরই নয়, এ তাদের রুজি-রোজগারে হাত দেওয়া। ঐ বালবিধবাটির কর্তব্য ছিল স্বামীর মস্তকটি ক্রোড়ে ধারণ করে সহমরণে যাওয়া। তাহলে সে ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে পারত। তা সে যায়নি। তাই বলে যা—নাকি আবহমানকাল অধিকারে—তাতেও সে হাত বাড়াবে?

ওরা সিদ্ধান্তে এল—ঐ কয়জন স্থবির পণ্ডিতের এই বিধান মানা চলে না। সে বিচারসভায় মহারাজ কাশীররেশের পাতসাহীই তো ছিল না—আনুষ্ঠানিকভাবে রাজদণ্ডটি শুধু শোভা পাচ্ছিল সভাস্থলে। স্বীকার্য—কাশীররেশ লোকান্তরিত, তাঁর পুত্রটি নাবালক—কিন্তু মহারাজের ভাগিনেয়টি তো সশরীরে বর্তমান। শোনা যাচ্ছে, সম্প্রতি তিনি এলাহাবাদ ক্যান্টনমেন্ট থেকে কাশীতে প্রত্যাবর্তনও করেছেন! ওরা সদলবলে তাঁরই দ্বারস্থ হল। পুরন্দর ক্ষেত্রী এসব বৃত্তান্ত কিছুই জানত না। আদ্যন্ত শুনে সে ক্রোধে উদ্ভাদ হয়ে গেল! এ কী অনাচার! কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা—সহমরণে স্বর্গে যাবি, তা নয় কাশীধামে এসে শুরু করে দিলি? মস্তকমুগুন করে, শিখাধারণ করে, প্রকাশ্যে পুরুষের সঙ্গে পণ্ডিতোন্মি করছিস্।

কঠিন শাস্তি দিতে হবে সেই দুবিনীতাকে!

জনমতকে স্বমতে আনার সাধনা তার। পুরন্দর জানে, দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্নব বা রামপ্রসাদ ওর্কপঞ্চানন প্রভৃতির নিতান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ। সমগ্র কাশীর পণ্ডিতসমাজ বিদ্যালয়কারের তদুপরি কবিরাজদল। সকলেই মনেপ্রাণে চাইছে, হয়তো মুখে স্বীকার করছে না—ঐ বিদ্রোহিনীকে শায়েস্তা করতে, অপমান করতে।

তাই করবে পুরন্দর। এমন পৈশাচিক পদ্ধতিতে বেইজ্জত করবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোন পুরললনা এ দুঃসাহসের কথা স্বপ্নেও না চিন্তা করতে পারে।

পুরন্দর ধুরন্ধর। হঠকারিতা তার ধাতে নেই। অভিযোগ শুনেই সে ঐ ছুরির চতুষ্পাঠীতে হানা দেয়নি। বিশ্বস্ত গুপ্তচরের মাধ্যমে সর্বপ্রথমে সংগ্রহ করল সংবাদের যথার্থ্য। যখন জানতে পারল, জগু-পণ্ডিতের অভিযোগের মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই, তখন এক পৈশাচিক উল্লাসে সে মেতে ওঠে। এতদিন কামচরিতার্থতা করতে ইচ্ছিল গোপনে। প্রজাদের অসন্তোষের আশঙ্কায়। এবার সে নির্ভয়। এবার জনসমর্থন আছে তার কামচরিতার্থতায়—কিন্তু সৈতেতে এমন প্রলেপ দিতে হবে যাতে মনে হয় এ রাজকর্তব্য! সমাজের কলুষতা দূরীকরণের জন্যই তাকে এ জাতীয় শাস্তির বিধান দিতে হল!

পৈশাচিক শাস্তিদানের সবচেয়ে বড় জাতের নজির রেখে গেছেন দীনদুনিয়ার আলেক শাদশাহ জাহাঙ্গীর! শাহজাদা খুরম—এর বিদ্রোহ দমন করে পুত্রের দুই সেনাপতিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরিকল্পনাটি অভিনব। একটি মৃত গাধা ও একটি মৃত ষগের চামড়ার খোলের ভিতর জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল দুই সেনাপতিকে। তারপর চমশিকীরা ঐ

দুটি মৃত জন্তুর খোল সেলাই করে দেয়। এমন সূচাক্রমে তা করে, যাতে বায়ুর অভাবে দুই হতভাগ্য তৎক্ষণাৎ মারা না যেতে পারে। যাতে তারা আট-দশ ঘণ্টা ঐ মৃত জন্তুর পুতিগন্ধময় নিশ্বাসে জীবনের শেষকটি প্রহর জীবিত থাকে। তারপর ঐ দুটি মৃতপশুকে গো-শকটে উঠিয়ে সমগ্র শহর শোভাযাত্রা করে প্রদক্ষিণ করানো হয়। সমগ্র আগ্রা শহর শিহরিত হয়েছিল গো-শকটের উপর ঐ দুটি মৃত জন্তুকে ক্রমাগত ধড়ফড় করে উঠতে দেখে।

না, পুরন্দর সে জাতীয় কিছু করবে না। নারীহত্যা করবে না! তবে স্থির করেছিল শাস্তিদান সমাপ্ত করে সে ঐ অপরাধিনীকে বাধ্য করবে পদব্রজে সমগ্র কাশীনগরী পরিক্রমায়। সঙ্গে ঢাক-টোল-শিঙা বাজিয়ে মিছিল করে যাবে শোভাযাত্রীরা। প্রকাশ্য দিবালোকে। অপরাধিনী থাকবে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা!

দশাশ্বমেধে সহস্রযাত্রীর দৃষ্টির সম্মুখে সেই বস্ত্রহীনা নগ্ন-স্নান করবে এবং তার পর শোভাযাত্রীদের সঙ্গে পদব্রজে উপনীত হবে তার বাকি জীবনের বন্দী আবাসে।

কাশীর রথবাজার!



দুর্গাবাড়ির দিকে যাওয়ার পথে আম-জাম-কাঁঠাল গাছের ছায়া-সুনিবিড় একটি বিঘে-তিনেকের বাগান। এই ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ডেই দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্যবের গুরুকুল-চতুষ্পাঠী। ছাত্রসংখ্যা এত বেশী যে, গৃহভাস্তরে জ্ঞানচর্চা সম্ভবপর নয়। শুধু বর্ষাকালের কয়েক মাস বাগানে বসা যায় না। বৎসরের বাকি সময়কালে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের আয়োজন উপনিষদী। চণ্ডে—গাছের ছায়ায়।

দুজন সুবেশ অশ্বারোহী রাজপুরুষ যে কক্ষির বেড়া-দেওয়া বাগানের বাহিরে অঙ্গপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেছে এটা নজর হয়নি বিদ্যার্যবের। ওরা 'কেন' এসেছে—এই সামান্য প্রশ্নটাকে অতিক্রম করে বোধকরি সে সময় উনি আর একটি অসামান্য 'কেন'-র উত্তর খুঁজছিলেন: 'কেনেযিতং পততি প্রেযিতং মনঃ/কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ॥' (কেন প্রাণ তার প্রথম বেগ নিয়ে পৃথিবীতে এল, ইত্যাদি)।

নজর হল একটি শ্যামবর্ণ কিশোর ছাত্রের। সে দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে এল যুগল অশ্বারোহীর সমীপে। যুক্তকরে অভিবাদন করে বললে, আপনারা নিশ্চয় পথশ্রমে ক্লান্ত, আসুন আমাদের গুরুকুল-আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

আড্ডাধারী বলে ওঠে, না হে ছোকরা, আমরা আদৌ পথশ্রান্ত নই। একটা কথা বলতে পার? হঠাৎ বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠী কোনটা?

—এটাই। আসুন, ভিতরে আসুন ...

—কিন্তু ঐ যে লোকটা ছাত্রদের ঠেঙাচ্ছে ও তো বুড়ি নয়, বুড়ো!

ছেলেটি মর্মাহত হল। বুঝল, আগন্তুকের কোন শিক্ষাদীক্ষা নেই। ‘ছাত্র-ঠাণ্ডানো’ একটা শ্রাক্তজনভাষা—যার অর্থ বিদ্যাদান করা। বললে উনি আমাদের গুরুদেব, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব। মা আজ অনুপস্থিত। তাই গুরুদেব স্বয়ং ...

অড্ডাধারী বললে, অ! তা তোমার ঐ গুরুঠাকুরকে বল একটু করুণা করতে। উনি তো আমাদের মতো চুনোপুটির দিকে চোখ তুলে নজরই করছেন না।

কিশোর আশ্রমিক বলে, আশ্চে হ্যাঁ, উনি এই সময় একেবারে তন্ময় হয়ে যান। আসুন, আশ্রমের ভিতরে আসুন, পদপ্রক্ষালনের জন্য ...

অড্ডাধারী খিচিয়ে ওঠে, ক্রমাগত একই কথা ঘ্যানর-ঘ্যানর কর না তো হে ছোকরা। তোমাকে যা বলছি কর। তোমার ঐ গুরুঠাকুরকে উঠে আসতে বল।

ছাত্রটি নতমস্তকে বিদ্যার্ণবের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়।

ওরা দুজনও গুটিগুটি এগিয়ে আসে।

এতক্ষণে বিদ্যার্ণবের নজরে পড়ে। গাভ্রোখান করে তিনি অগ্রসর হয়ে আসেন, এস, এস, এস তোমরা।

পূরন্দর বুঝতে পারে বৃদ্ধ ওকে শনাক্ত করতে পারেনি। তাই বয়সের পার্থক্য বিচার করে এই ‘তুমি’ সম্বোধন। বললে, বসতে আমরা আসিনি পণ্ডিতমশাই। দু একটা কথা জানতে এসেছি শুধু। প্রথম কথা, এ চতুষ্পাঠীর মালিক কে? আপনি, না হটী বিদ্যালঙ্কার?

বিদ্যার্ণব প্রশান্ত হাসলেন। বললেন, মালিকানা স্বয়ং বাগদেবীর। আমি এতদিন ছিলাম তাঁর সেবায়েত। বর্তমানে আমার কন্যাটি সে দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অবসর দিয়েছে।

—বটে! তা হলে সে কই? আপনি ক্লাস নিচ্ছেন কেন?

‘ক্লাস নেওয়া’ ক্রিয়াপদের অর্থ নিশ্চয় ছাত্রদের বিদ্যাদান। বৃদ্ধ বললেন, আজ একাদশী তিথি বাবা। মাসের এ দুটি দিন আমি তাকে—কী-বলে-ভাল ‘ক্লাস’ নিতে দিই না।

—কেন? ত্রয়োদশীতে অলাবৃত্তক্ষণের মতো কি একাদশীতে ক্লাস নেওয়া বারণ?

বৃদ্ধ প্রণিধান করতে পারেন না এ জাতীয় ব্যঙ্গোক্তির অর্থ কী! গম্ভীর হয়ে বলেন, আজ যে সে নিরবু-উপবাস করছে।

—নাকি? তাহলে একাদশীটা অন্তত সে করে? তা পণ্ডিতমশাই, আপনি সম্ভবত আমাকে চিনতে পারেননি। আমার পিতৃদণ্ডনাম পুরন্দর ছত্রী।

—কেন চিনব না বাবা? তুমি তো স্বনামধন্য...

খুশি়াল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল পুরন্দর। প্রদীপটা দপ করে নিভে গেল বাক্যটা সমাপ্ত হলে।

—স্বনামধন্য স্বর্গত কাশীরেশের দেহান্তে নাবালকের তরফে রাজকার্য পরিচালনা করছ।

পুরন্দর গম্ভীর হয়ে বললে, হ্যাঁ, তাই করছি। জানেন নিশ্চয়, রাজার কর্তব্য হচ্ছে শিষ্টের পালন আর দুষ্টির দমন। এবার বলুন তো পণ্ডিতমশাই, এই বুড়ো বয়সে ঐ দুষ্টির ধাষ্ট্যমো কেন চাপলো আপনার ঘাড়ে?

বিদ্যার্ণব স্তম্ভিত! তিনি কাশীধামের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায়, এই দুর্বিনীত লোকটা কি ভদ্রভাবে বাক্যালাপ করতেও শেখেনি?

কাম্ব্য

—কী মশাই? ন্যাকা সাজতে চাইছেন মনে হচ্ছে! যেন বুঝতেই পারছেন না, আমি কী বলছি!

বুদ্ধ গভীরভাবে বলেন, আমি সত্যই অনুধাবন করতে পারছি না...

—আপনার বুঝে কাজ নেই। আপনার পালিতা কন্যাটিকে পাঠিয়ে দিন। বোঝাপড়া তার সঙ্গেই হবে।

—এখনই তো বললাম সে কথা। আজ একাদশী....

বাক্যটা সমাপ্ত হল না। নজরে পড়ে—পর্ণকুটিরের দ্বার উন্মোচন করে ধীরপদে অলিন্দে বাহির হয়ে এসেছেন তাঁর কন্যাটি। পরিধানে ধূতি, উর্ধ্বাঙ্গে গেকুয়া-রঙের আলখাল্লা ধরনের একটি পোশাক। তদুপরি উত্তরীয়। শান্তকণ্ঠে বলেন, কী চান আপনারা?

পুরুষের মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মহিলাটির বয়স ওর চেয়ে কিছু কম—অনুমান ত্রিংশতি বর্ষ। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, আয়ত চক্ষু, বুদ্ধিদীপ্ত একটি আভা। সর্বোপরি যেটা নজরে পড়ে তা ওর ব্যক্তিত্ব। ওর ঐ অঙ্গুরী-বিনিমিত রূপকে ছাপিয়ে সেটা যেন হীরকখণ্ডের দ্যুতির মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। পানপুতাক নিশ্চয় সেবন করে না—বিধবা সে, তাহলে ওর গুণধর কী করে হয় অমন রক্তিম বর্ণের? শুধু ব্যক্তিত্ব নয়, ওর সর্বব্যব ভেদ করে যেটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সঙ্গে মিশে আছে কিছু দার্দ্র্যও। রাজাসাহেব নামক জীবটিকে সে যেন ভ্রক্ষেপই করতে চাইছে না। একটা বিরক্তিকর মক্ষিকা যেন।

পুরুষের ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, চাই অনেক কিছুই। সর্বপ্রথমে চাই একটা কৈফিয়ৎ। তুমি সেই সুদূর বঙ্গদেশ থেকে এখানে মরতে এসেছ কেন?

‘তুমি’ সম্বোধনটা অবমাননাকর কিনা এ প্রশ্ন যেন জাগলই না বিদ্যালঙ্কারের মনে। মক্ষিকার ধর্মই তো ভ্যানভ্যান করা। মাথা খাড়া রেখেই বললেন, মরতে তো আসিনি। এসেছিলাম ঝাঁচতে। তবে অস্ত্রিমে যখন মরতে হবেই তখন কাম্ব্যামই তো সেক্ষেত্রে কাম্য!

‘হটি’! ‘হটি’ মানে কী? পুরুষের ভাবছে। প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্ট-এ কয়েকটি ইংরাজ সৈনিকের সঙ্গে দোস্তি হয়েছে। অল্প-বিস্তর ইংরাজি শব্দ রপ্তও হয়েছে। ওর মনে পড়ল—ফেরঙ্গিভাষায় ‘হট’ মানে উত্তপ্ত, গরম। তাহলে ‘হটি’ অর্থে—গরমাগরম। ‘অমৃতের’ চাট যেমন বেগুনি-ফুলুরি। নামটা সার্থক! বললে, তুমি ধূতি পরে আছ কেন?

—আপনার তাতে আপত্তি আছে?

—আছে। আলবৎ আছে। লোকাচার ঠিক মতো পালিত হচ্ছে কিনা রাজাকেই দেখে নিতে হয়।

—‘রাজাকে’! রাজা কে?

বিদ্যার্ণব তাড়াতাড়ি অল্প-ব্যাখ্যা দাখিল করতে তৎপর হয়ে ওঠেন, উনি পুরুষের ক্ষেত্রী। স্বর্গত কাশীনরেশের ভাগিনেয়। নাবালকের তরফে...

—ও! ‘তরফে’! তা বেশ, রাজসরকারের যদি আপত্তি থাকে তাহলে আমি ত্রীলোকের পোশাকই পরিধান করব অতঃপর।

পুরুষের বিচিত্র হেসে বলে, অত সহজে তো মিটবে না সন্দেহ। চতুষ্পাঠীতে এই সব সমবয়সী পুরুষ ছাত্রদের নিয়ে রাসলীলাও চলবে না।

বিদ্যালঙ্কারের মুখে রক্তিমভা। লোকটার ‘তুমি’ সম্বোধন তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু এই ‘সুন্দরি’ সম্বোধন এবং ঐ অস্বীল ইঙ্গিত কি প্রতিবাদযোগ্য নয়? কিন্তু তিনি কিছু বলার পূর্বেই বিদ্যার্ণব কথা বলে ওঠেন। ইতিমধ্যে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি নিজে কিন্তু ‘তুমি’ থেকে ‘আপনি’তে উঠে এসেছেন। বলেন, আপনি বোধহয় জানেন না, এ নিয়ে সম্প্রতি একটি বিচারসভা হয়েছিল। কাশীর পণ্ডিতসমাজ সর্ববাদীসম্মতভাবে—

ছকার দিয়ে ওঠে পুরন্দর, আপনি থামুন! মেলা পণ্ডিত্যে মি করতে আসবেন না! আপনিই তো যত নষ্টের গোড়া।

বিদ্যার্ণব স্তম্ভিত!

আশ্রমিক ছাত্ররা শ্রুতিসীমার বাহিরে। তারা নিজ নিজ পাঠাভ্যাসে মগ্ন। কিন্তু ঘনিষে এসেছে রমারঞ্জন ভট্টশালী—বিদ্যার্ণবের আর এক প্রিয়শিষ্য। প্রায় হট্টা বিদ্যালঙ্কারের সমবয়সী ও সহাধ্যায়ী। সে দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে, আপনি সংযতভাবে বাক্যালাপ করুন মহাশয়! বিস্মৃত হবেন না—যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি কাশীধামের একজন মহামহোপাধ্যায়।

আড্ডাধারী একটা বিজ্ঞপ্তি বিতারণ করে বলে ওঠে, এই আর এক ভেজাল জুটল। নাও হে বয়স্য, তোমার যা কাজের কথা আছে চটপট সেরে নাও।

বিদ্যালঙ্কারের নাসারঞ্জ শ্বুরিত হয়ে ওঠে! অগ্নিবর্ষী দুটি চক্ষু ঐ রাজাসাহেবের দিকে মেলে বলে ওঠেন, আপনাদের দুজনের কোমরবন্ধে তরবারি আছে। আশ্রমিকেরা নিরস্ত্র। এটাই কি আপনাদের দুজনের স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি? ভুলে যাবেন না—কাশীর পণ্ডিতসমাজ বিধান দিলে ঐ নাবালকের ‘তরফে’ রাজাগিরি করার মেয়াদ কিন্তু আপনার ফুরিয়ে যাবে।

পুরন্দরের মনে পড়ে গেল মেজর কিলপ্যাট্রিকের কথা। প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্টের সেই দুর্ধ্ব সৈনিকটি। সে বলেছিল—দিখিজয়ী সেকেন্দার শাহ্ নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বন্য ঘোটকী বশে আনানোর ব্যাপারে। পুরন্দরের সে অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু বন্য ঘোটকীকে যদি রজ্জুবদ্ধ করে ফেলা যায়, তখন কি তার পিঠে সওয়ার হওয়া যায় না? পিরান চড়িয়ে আর মাথা কামিয়ে তো তোমার নারীত্বকে লোপ করতে পারনি সুন্দরি! নির্জন অর্গলবদ্ধ কক্ষে পুরুষের পুরুষবাহুর নিষ্পেষণে দম যখন বদ্ধ হয়ে আসবে তখনো কি বজায় থাকবে তোমার তেজ? দেখতে হবে!

পুরন্দর সংস্কৃতজ্ঞ নয়। তবে নিত্য শুনে শুনে চণ্ডীর দুচারটি শ্লোক তার আয়ত্তে। সহাস্যে বললে, ‘গর্জ! গর্জ! ক্ষণং মৃঢ়ঃ! যাবন্নধু পিবাম্যহম্!’

—তার অর্থ?

—অর্থ প্রাঞ্জল। অস্ত্র নয়, যুক্তিতর্কই করব, সুন্দরি! তুমি যতক্ষণ না দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করতে পারছ ততক্ষণ তোমাকে আমার এই কাশীধামে টোল খোলার অনুমতি আমি দিতে পারি না। পাতসাহী মিলবে না!

বিদ্যালঙ্কার সর্বিষ্ময়ে বলেন, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ? তর্কশাস্ত্রের রীতিনীতি জানেন?

—সেটা তোমার আমার দ্বৈরথসমরে প্রমাণিত হবে, সুন্দরি!

হট্টা বিদ্যালঙ্কার ঘণায় মুখ সরিয়ে নিলেন। অন্যদিকে ফিরে বসেন, বেশ। তাই যদি আপনার অভিরুচি, তাহলে আমি সম্মত। বলুন, কবে? কোথায়?

কালীধাম

—আজ থেকে উনিশ দিন পরে। আগামী চৈতালী পূর্ণিমারাত্রে। অসিঘাটে আমার বাগানবাড়িতে।

—বাগানবাড়িতে!

—হ্যাঁ, দ্বৈরথ-সমরের পক্ষে স্থানটা মনোরম! আশেপাশে জনমানব নেই—যারা তোমার ‘গর্জনে’ অথবা আমার ‘মধুপানে’ বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সে দ্বৈরথযুদ্ধে শ্রোতৃবৃন্দ বা দর্শক কেউ থাকবে না—শুধু তুমি আর আমি। বিচারক থাকবেন, তবে তাঁকে চর্মচক্ষুতে দেখা যাবে না। কারণ তিনি ‘অনঙ্গ’!

হট্টা বিদ্যালঙ্কারের বাক্যস্ফুর্তি হল না।

—এবার বুঝতে পারছ, সুন্দরি? প্রতর্কের বিষয়: ‘কুলীনঘরের ব্রাহ্মণের বিধবা সহমরণে যেতে ভীতা হলে তার কী অস্তিমগতি হয়!’ একটা রাজ্যদেশ শুধু জানিয়ে যাই: এই উনিশ দিন তুমি মাথা কামাতে পারবে না। ন্যাডামণ্ডির সঙ্গে হৃদযুদ্ধটা আমার লা-পসন্দ! ... এস হে আড্ডাধারী। আমার যা বলার ছিল, তা বলা শেষ হয়ে গেছে।

ওরা দুজন ধীরপদে নির্গমন-দ্বারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

শুধু বিদ্যালঙ্কার একা নন, বিদ্যাগর্ব এবং ভট্টশালীও বজ্রাহত!



উপবাসক্লিষ্টা কন্যাটির মুখের দিকে সমস্ত দিন চোখ তুলে তাকাতে পারেননি। এ কী হয়ে গেল! এমন আকাশভাঙা বিপর্যয়ের সম্মুখী হতে হবে এ যে তাঁর দুঃস্বপ্নের অগোচর! পুরন্দর ক্ষেত্রী দুঃশাসক—নানাবিধ অত্যাচার সে চালিয়ে যাচ্ছে এ দুঃসংবাদ যে না পান তা নয়। তার অত্যাচারে রাজপুরোহিত অবসর নিয়েছেন, মন্ত্রী অপসারিত। সেনাপতি বজ্রধর দেশত্যাগী—সে নাকি বর্তমানে শাহাবাদভুক্তির রোহিতাশ্ব দুর্গের দুর্গাধিপ। প্রাক্তন কাশী নরেশের একান্ত বিশ্বস্ত দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ঈশান কৈবর্তের শাস্তির কথা কে না জানে? তার কুটিরে নাকি রাজাসাহেবের নির্দেশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়—নিদ্রাগত ঈশানকে সপরিবারে হত্যা করতে। পুরন্দর লোকটা কামুক। তার অসিঘাটের বাগানবাড়িতে দেখা যায় নিত্য নূতন ছরী। শোনা যায়, তার ভিতর কিছু যবনীও আসে নাকি! এবং ভদ্রঘরের কুলনারীরাও! বলপ্রয়োগে! এদিকে অতিশয় ধূর্ত। প্রতিটি ঋতিতে বসিয়েছে নিজের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। গুপ্তচরেরা রাজ্যের সর্বত্র সন্ধান করে বেড়ায়—প্রজাবিদ্রোহ সে কিছুতেই হতে দেবে না। শাসনের নামে কাশীরাজ্যকে শোষণ করার সুপরিচালিত বন্দোবস্ত! এসব তথ্য মোটামুটি জানাই ছিল। যেহেতু তিনি নিজে ভিন্ন পথের পথিক, তদ্বি দ্বারকেশ্বর বিদ্যাগর্ব এইসব রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি।

আজ ঘামাতে হচ্ছে—যেহেতু শেলটা আজ এসে বিধেছে তাঁরই পাজর-সর্বস্ব বুক!

লোকটা আজ বেপরোয়া। কারণ আছে। ঘটনাচক্রে আজ কাশীর বৃহত্তর জনসমাজ বিদ্যার্ণব আর তাঁর কন্যাটির বিপক্ষে। নারীর মুক্তি, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা—সেইসব কথা এই কুপমণ্ডকেরা চিন্তাই করতে পারে না। কন্যার পরামর্শে তিনি চতুষ্পাঠী উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ছাত্রীদের জন্যও। ‘ব্রহ্মবাদিনী’ ছাত্রী নয় ‘সদ্যোদ্ধাহ’। অর্থাৎ যারা প্রাকবিবাহ-কালে বিদ্যাশিক্ষা করবে। সংস্কৃত কাব্য পড়তে শিখবে, সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারিত হলে তার অর্থ বুঝবে। এ ছাড়া সংসারী হবার পর পূজা অর্চনার জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না। মদালসার মতো পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে না পারুক, অন্তত তার অক্ষর পরিচয়ের সহায়ক হবে। কিন্তু পিতাপুত্রীর যৌথপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কাশীবাসী কোন গৃহস্থ তাঁর কন্যাকে চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করেননি। এই কুপমণ্ডক সমাজ কন্যাদের শিক্ষিত করতে ভয় পায়। বৈধবোর ভীতি!

বিদ্যার্ণব এবং তাঁর পালিতা কন্যা যে সমাজে নারী-শিক্ষার দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছিলেন সেই সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। থাকবে কোথা থেকে? তখন না ছিল কোন সংবাদপত্র না মাসিক পত্রপত্রিকা। বাঙলাভাষার তখন চর্চা হত সামান্য। দলিল দস্তাবেজ সব ফার্সিতে। ভুললে চলবে না, আমাদের আখ্যায়িকার কালে রাজা রামমোহনের বয়স দুই বৎসর। উইলিয়াম কেরী—যাঁর উদ্যোগে পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ম্যাথু-লিখিত সুসমাচারের প্রথম পৃষ্ঠাটি বাঙলাভাষায় মুদ্রিত করেন—সেই কেরী-সাহেব তখনো ভারতবর্ষে আসেননি। তাই আমাদের আখ্যায়িকার ঘটনাকালের প্রায় সত্তর বছর পরের তিনটি উদ্ধৃতি পাঠকের দরবারে পেশ করি—তাহলে আন্দাজ পাবেন, আমাদের কাহিনীর কালে সমাজের কী অবস্থা ছিল—

১। “বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের আশঙ্কা আছে।” (সংবাদ প্রভাকর, 12.5.1849)

২। “স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে পতির প্রতি অশ্রদ্ধা করিবেন” (সংবাদ-প্রভাকর, 31.5.1849)

৩। “স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারসিকা হইলে ব্যাপিকা হইবেন। ব্যভিচার করিবেন, রন্ধনাদি গৃহকর্ম করিতে চাহিবেন না, পতিসেবা এবং পুত্রকন্যাতির মলমূত্রাদি ধৌত করিবেন না, গরুকে যাব দিবেন না, পাকশালায় গোবর লেপন করিবেন না, বাসন মাজিবেন না, পতির উচ্ছিষ্ট খাইবেন না, শয্যা পাড়িবেন না, পান সাজিবেন না, স্বামীর পদতলে তৈল দিবেন না, পতির পাদোদক গ্রহণ করিবেন না।” (সংবাদ প্রভাকর, 19.6.1849)

তবু সেই অশীতিপর বৃদ্ধ বৈদান্তিক আর তাঁর পালিতা কন্যা দুর্গাবাড়ি অঞ্চলের গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে ফিরেছেন—কেউ স্বীকার করেননি। ‘অষ্টমবর্ষে তু ভবেৎ গৌরী’ নিয়ম তখনো চালু আছে; কিন্তু কৌলিন্য প্রথার প্রাদুর্ভাবে অনেক হতভাগিনীকে হয়তো আজন্ম কুমারীই থাকতে হত—পাত্রের অভাবে। কুলীনপাত্র কিছু মূল্য ধরে দিলে পিসী-ভাইবিকে হয়তো একই লগ্নে উদ্ধার করে দিয়ে যায়—কিন্তু ত্রিরাত্রির বেশি স্বস্তুরালায়ে থাকতে স্বীকৃত হয় না। বছরে যে মাত্র তিনশ পয়ষড়ির অধিক রাত্রি নাই! সেইসব স্বামীসুখবঞ্চিতাদের অভাব ছিল না—বালবিধবাদের দল তো ছিলই। তবু দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের চতুষ্পাঠীতে একটিও ছাত্রী

শুভাগমন ঘটেনি।

তবু চলছিল। কিন্তু এ কী বিপর্যয়!

কী যেন বলে গেল পুরন্দর?

“কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা সহমরণে যেতে ভীতা হলে তার কী অন্তিম পরিণাম হয়!”

হ্যাঁ। সেটাই সমাজের বিধান!

স্বামীর মৃত্যুতে মরতে তোমাকে হবেই! এটা স্ত্রীজন্মের অনিবার্য নিয়তি। তবে কীভাবে মরতে চাও সেটা বেছে নেবার অধিকার সমাজ তোমাকে দিয়েছে। ইচ্ছা করলে স্বামীর দেহান্তে তার সঙ্গে চিতায় উঠে বসতে পার। তখন তোমার কী সম্মান! তোমার পায়ে ওরা আলতা পরিয়ে দেবে, সিঁদুরে সিঁদুরে ব্রহ্মতালুটা আগুনবরণ করে দেবে! অলঙ্কারাগে রঞ্জিত করে তোমার রাতুল চরণদ্বয়ের ছাপ তুলে নিয়ে যাবে। তুমি যে মহাসতী! অবশ্য তোমার গায়ের গহনাগুলো সব খুলে নেবে। ওগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলার তো কোন অর্থ হয় না। পরের মেয়েটিকে তো পার করতে হবে! একবজ্রা হয়ে তুমি স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে জ্বলন্ত চিতায় পতিসহ পুষ্পক রথে ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গপানে রওনা হতে পার।

তা যদি না চাও, তাহলেও আগুনে তোমাকে পুড়তে হবে। অন্য জাতের আগুন! সমাজ এ বিষয়ে উদার—কোন জাতের আগুনে পুড়বে তা তোমার ইচ্ছানুসারে। একেবারে প্রথম পর্যায়েই যদি আগুনে পুড়তে ভয় পাও তাহলে আমৃত্যু—অন্তত আয়ৌবন, দন্ধে দন্ধে মরতে পার। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সেবা করে। তাদের কাম চরিতার্থ করে। যা তোমার অভিক্রটি। তোমার অন্তিমগতি বড় বড় শহরের লালবাতি-জ্বলা কোন এক স্বর্গে!

আগুন এবং স্বর্গ দুটোই পাবে। যে পথেই যাও!

কিন্তু ভদ্রভাবে কোন বিগতভর্তার প্রাণধারণের প্রচেষ্টা? সেটা আকাশকুসুম! মনু তেমন বিধান দিয়ে যাননি—অন্তত এটাই ওদের মনুসংহিতার ভাষ্য!

তা না হয় হল। কিন্তু এখন কী করবেন বিদ্যার্বব? কীভাবে ধর্মরক্ষা হবে তাঁর আদরের পালিতা কন্যার? রাজমাতার দরবারে আর্জি পেশ করার প্রচেষ্টা বৃথা। সেই অভঃপুরে তিনি প্রবেশ করতেই পারবেন না। কন্যাটিকে সেখানে পাঠাতে পারেন—কিন্তু তাতেও ফল হবে না কিছু। রাজমাতা নিঃসহায়া। বন্তুত রাজাবরোধের ভিতর তিনি বন্দিনীমাত্র!

দ্বারকেশ্বর অকৃতদার। জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নিতান্ত দৈবক্রমে তাঁর সংসারে এসেছে এই মা-জননী। তার ফেলে আসা বর্ধমানের জীবনের কথা প্রায় কিছুই জানেন না। বৃদ্ধ কোন কৌতূহল কখনো দেখাননি, মেয়েটিও স্বতঃপ্রগোদিত ভাবে তা জানায়নি।

শুধু জানেন—সে এক পণ্ডিত পিতার আদরের দুলালী: রূপমঞ্জরী। গৌরীদান করেছিলেন পিতা কন্যার নবম বর্ষে। ত্রয়োদশে বিধবা। আর জানতেন—অসাধারণ মেধা ঐ বাল-বিধবার, অনন্যসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা।

প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা। এক নিদাঘ প্রভাতে তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন দশাশ্বমেধ ঘাটের একান্তে। তখনো পুর্ব আকাশটা ফর্সা হতে শুরু করেনি। পথঘাট নির্জন। এই ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই বিদ্যার্বব গঙ্গান্নান সেরে আসেন—কী শীত, কী বর্ষা—ইঠাৎ নজরে পড়ে পথের ধারে বসে আছে একটি যুবতী মেয়ে। দু হাঁটুর মধ্যে মুখটা গুঁজে। ওর পিঠটা মাঝে মাঝে ফুলে-

ফুলে উঠছে। মেয়েটি যে কাঁদছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কিন্তু বৈয়াকরণিক পণ্ডিতের মনে পড়ে গেল হেতুর্থে পঞ্চমী-বিভক্তির সূত্রটা। অগ্নিকে চোখে না দেখেও শুধু ধূম দর্শনে যদি প্রমাণিত হয় ‘পর্বতো বহিমান’; তাহলে ওর পৃষ্ঠ-‘আন্দোলনাৎ’ সিদ্ধান্তে আসা যায়—অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে মেয়েটি কাঁদছে। ওর মনে হল—মেয়েটি পথ হারিয়েছে। ধীরপদে এগিয়ে এসে ওর পিঠে একটা হাত রাখলেন।

চমকে অশ্রুআর্দ্র মুখখানা মেলে ধরতেই বৃদ্ধ বললেন, কী হয়েছে মা? কাঁদছি কখন? পাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছি না?

মেয়েটি বললে, না বাবা, বাড়িই নেই, তার পথ হারাবো কী করে?

অনেক পীড়াপীড়ির পর শুনলেন, মেয়েটি গত রাত্রে মধ্যম্যমে এসে পৌঁছেছে এই ঘাটে। নৌকাযোগে। কে যে ওকে এভাবে মধ্যম্যমে দশাশ্বমেধ ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেল তার নামটা কিছুতেই স্বীকার করল না। তবে এটুকু জানাল যে, সে নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের বালবিধবা। তিনকূলে তার কেউ নেই। অগতির গতি ‘বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নিতে আসছিল। পথে বিপর্যয়। কী জাতের বিপর্যয় তাও স্বীকার করল না। ওর আদি নিবাস বঙ্গভূমে। বর্ধমান জিলার সোণাই গ্রামে।

ইতিমধ্যে আলো ফুটেছে। স্নানার্থীদের ভিড় বাড়ছে। একটি পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া রোহুদ্যমানা অনিন্দ্যকান্তি বিধবার সঙ্গে আলাপনরত বৃদ্ধকে দেখে অনেকে কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে এল : কী হয়েছে পণ্ডিতমশাই?

বিদ্যার্ণব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মেয়েটির উপস্থিতিবুদ্ধি দেখে। তার চেয়েও বেশি, ওর মুখে নির্ভুল দেবভাষা শুনে। মেয়েটি তার বক্তব্যের শেষাংশ পেশ করল সংস্কৃত ভাষায়। কৌতূহলী মানুষজন ও দুর্বোধ্য ভাষার নাগাল গেল না—যে যার পথ দেখল। বৃদ্ধ সবিষ্ময়ে প্রশ্ন করেন, সংস্কৃতেই—এ দেবভাষা কার কাছে শিখেছিস?

—আমার পিতৃদেবের কাছে। তাঁরও ছিল চতুষ্পাঠী। তদুপরি তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কবিরাজ। তিনিই আমাকে সহমরণে যেতে দেননি, তাই গ্রামে জাতিচ্যুত হয়ে বাস করতেন। তাঁর বৈকুণ্ঠলাভের পরে বাধ্য হয়ে আমি কাশীযাত্রা করেছিলাম—

বিদ্যার্ণব দৃঢ়মুষ্টিতে রূপমঞ্জরীর হাতটি ধরে বলেছিলেন, আয়।

—কোথায় বাবা?

—‘বাবা’ বলে ডেকেছিস, আবার বোকার মতো জানতে চাইছিস, ‘কোথায়’? চল, আগে দুজনে গঙ্গাস্নানটা সেরে নিই—

—এগুলো?

এতক্ষণে বিদ্যার্ণবের নজর হল, মেয়েটির হাতে একটি পুঁটুলি। বললেন, ঘাটেই কারও কাছে জমা রেখে বাপবেটিতে স্নান সেরে নেব, আয়।

রূপমঞ্জরী স্বীকৃত হাল না। পুঁটুলি খুলে দেখাল তার সম্পদ। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দুটি দ্রব্য : একটি জীবন্ত কবুতর আর একটি দুর্লভ বামাবর্ত শঙ্খ।

গঙ্গাস্নান মাথায় উঠল। মেয়ের হাত ধরে ফিরে এলেন চতুষ্পাঠীও। এগুলি ওর মা-জননী কোথায়, কেমন করে পেয়েছে তা আর জানতে চাননি।

জীবনযাত্রার ছকটাই গেল পালটে। চিরদিন একলাটি থেকেছেন। একবেলা স্বপাক আহার। এখন সংসারের সব দায়-বন্ধি মা-জননীর। এত দীর্ঘদিনের অভ্যাসটা ছাড়তে প্রথমটা রাজি হননি — ঐ স্বপাক আহার। কিন্তু যখন বুঝলেন, সে অভ্যাসটা ত্যাগ করতে না পারলে কন্যাটিকেই ত্যাগ করতে হবে, তখন বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন। তারপর পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেছে।

পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া রূপমঞ্জরী আজ ত্রিশের কোঠায়। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, নব্যন্যায়, সমাপ্ত করে আজ মা-জননী কাশীর পণ্ডিত সমাজে বিদ্যালঙ্কার।

বাকি আছে শেষ জ্ঞান: ব্রহ্মবিদ্যা। সেটা উনি দেবেন না। না, মন্ত্রদীক্ষা দিতে স্বীকৃত হননি। বিদ্যার্ব নিজে দীক্ষিত সন্ন্যাসী নন। তাই মা-জননীকে বলে রেখেছেন উপযুক্ত গুরুর ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। সম্ভাব্য গুরু যে কে, তা জানাননি তাঁর কন্যাটিকে। কিন্তু নিজে মনে মনে তাঁকে নির্বাচন করে রেখেছেন। সেই মহাযোগীর বর্তমান অধিষ্ঠান এই কাশীধামেই—যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী না হলেও অন্তত পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতাব্দী থেকে! উনি অবশ্য কাউকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে চান না—তবে একথাও ঠিক যে, তিনি নিতান্ত খেয়ালী। শিশুর মতো সরল। হঠাৎ রাজি হলেও হয়ে যেতে পারেন।

সবই পরিকল্পনা করা ছিল—ইতিমধ্যে এই বিনামেঘে বজ্রপাত!

নাঃ। পুরন্দরের ওটা ফাঁকা আওয়াজ নয়!

আশ্রমে নেমে এসেছে একটা মৃত্যুশীতল কুজুটিকা। পুরন্দরের কুৎসিত শাস্তিদানের প্রস্তাবটা ছিল যথেষ্ট সোচ্চার। আশ্রমিক ছাত্রদের মধ্যে যারা কিশোর বা তরুণ তারা না-বুঝে তা নয়। তরুণ আশ্রমিক ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীরা ক্ষাত্রধর্মের অভাবটা অনুভব করল যেন।

পরদিন রমারঞ্জন বললে, আপনাকে কখনো বলা হয়নি দিদি, আমার এক বড় ভগ্নী ছিলেন। আপনার চেয়ে কিছু বড়ই হবেন—এবং তিনি ছিলেন শ্যামবর্ণা। আমার কৈশোরে তাঁকে মণিকর্ণিকায় দাহ করে এসেছি। আপনাকে দেখলে আমার নিরন্তর তাঁর কথা মনে পড়ে যায়।

রূপমঞ্জরী বুদ্ধিমতী। সহজেই বুঝতে পারে রমা আজ অন্তরঙ্গ হতে চাইছে—ছোটভাইয়ের আসনটা দৃঢ়তর করতে চাইছে। সেই অশ্লীল বিপদটার কথা আলোচনা করার পূর্বপ্রস্তুতি। সে কথা সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করতে সক্ষম হয়, দিদির সঙ্গে নয়।

রমারঞ্জন প্রশ্ন করে, আপনার এমন নাম হল কেন? হটী?

—তোমার নাম রমারঞ্জন হল কেন?

—বাঃ। তার একটা অর্থ আছে। ‘হটী’র মানে কী?

রূপমঞ্জরী বলেন, ওটা আমার নাম নয়, পিতৃদত্ত উপাধি। ‘হট’ শব্দের অর্থ সংস্কৃতে নানান প্রকার। যেমন: ‘বিদ্রোহ-বুদ্ধি’, উদাহরণ: “মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি যায়”—এটা মনসার ভাসান থেকে। আবার ‘হট’ মানে ‘ক্রোধ’; যেমন ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গলে আছে, “হটে হৈমবতী যবে হানিল তার শির”। অথবা ‘জোর-জবরদস্তী’, যেমন দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে ‘হট’ শব্দের ব্যবহার—“আজি হবে এ সঙ্কট, তেঁই হর কৈলা হট।” ‘হটী’ নিঃসন্দেহে ‘হটী-আম ইপ’। আমি অবশ্য জানি না, পিতৃদেব আমার কোন গুণে মুগ্ধ হয়ে ঐ ডাকনামের উপাধি দিয়েছিলেন—বিদ্রোহবুদ্ধি, ক্রোধ অথবা জবরদস্তী।

—তাহলে আপনার নামটা কী দিদি?

—সেটা শুনলে তুমি হাসবে ভাই: রূপমঞ্জরী।

—কেন? হাসব কেন?

—আমার এই নেড়ামুণ্ডি ...

কথাটা শেষ করতে পারেন না। রমারঞ্জনও অধেবদন হয়। দুজনেরই মনে পড়ে যায় পুরন্দরের সেই অল্লীল কদর্য ইঙ্গিত: ন্যাড়ামুণ্ডির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধটা জমবে না।

রমারঞ্জন আর দ্বিধা করে না। সরাসরি নেমে পড়ে কাজের কথায়, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন দিদি, আজ আপনার সঙ্গে খোশগল্প করতে আসিনি আমি। গুরুদেব তো বজ্রাহত তালগাছের মতো নিথর হয়ে আছেন। লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না, আজ তিনি গঙ্গাস্নানে যাননি—বোধকরি বিগত পঞ্চাশ বছরে এই প্রথম! এমন উদাসীনভাবে বসে থাকাটা তো কোন কাজের কথা নয়।

বিদ্যালঙ্কার স্নান হাসলেন। বললেন, আমি তো উদাসীনের মতো বসে নেই রমা। সংসারের কাজ তো করে যাচ্ছি একই ভাবে—

—কিন্তু কী করে করছেন?

—সহজেই। যে হেতু আমি সমাধানে পৌঁছে গেছি। উদ্ধার পাবার পথ আমার 'হস্তমলকবৎ'!

উৎসাহে সোজা হয়ে বসে রমারঞ্জন, কী তা?

—তুমি রূপমতীর নাম শুনেছ রমারঞ্জন? মালোয়া রাজ্যের জনপদকল্যাণী 'রূপমতী'?

—না। আপনি তাঁর কথা কোথায় শুনলেন?

—আমার বাবামশায়ের কাছে। তিনি আরবী-ফার্সি দুটো ভাষাই জানতেন। রূপমতীর উপাখ্যান আছে আবুল-ফজলের আকবরনামায়। শোন, তোমাকে গল্পটা বলি আগে। নামসায়ুজ্যে রূপমতীর কথাই আজ মনে পড়ে গেল আমার। শোন গল্পটা—

আকবর বাদশার ফৌজ নিয়ে বীরদর্পে সেনাপতি আধম খাঁ প্রবেশ করল পরাজিত মালোয়ার রাজধানীতে। আধম হুকুম জারি করে রেখেছিল—মুগল সৈন্য মালোয়ার যৌবনবতীদের ইচ্ছামতো দখল করতে পারে। শুধুমাত্র যদি মালোয়ারাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রূপমতীকে ধরতে পারা যায় তাহলে কেউ তার গাত্র স্পর্শ করবে না। তাকে পৌঁছে দিতে হবে স্বয়ং সিপাহসালারের শিবিরে।

হত্যা-উৎসব শেষ হল রাত্রির তৃতীয় যামে। ক্লান্ত অবসন্ন রক্তমাখা আধম শয্যাগ্রহণের উপক্রম করছে। ঠিক তখনই এল জবর খবর: রূপমতীকে জিন্দা পাওয়া গেছে!

উৎসাহে চারপাইয়ের উপর উঠে বসল আধম: তব লাও বহু ছুরিকো!

দুই মুগল সৈন্য দুই বাহুমূল ধরে নিয়ে এল বন্দিনীকে। রূপমতীর ঘাঘরা ছিন্নভিন্ন ওড়না খসে গেছে, কঞ্চুলিকা স্থানচ্যুত। তার কপালে রক্তের ধারা। আধম অবাক বিস্ময়ে দেখছিল।

শিবির নির্জন হলে, প্রহরীরা নিভ্রান্ত হলে, গোঁফে চাড়া দিয়ে আধম বসলেন। শোন বাঈজী! বেয়াদবী আমার বিলকুল লা পসন্দ। রাতে যাকে আমার বিছানায় উঠে বসার অধিকার দিই তার সতীপনা আমার বরদাস্ত হয় না। বেচাল দেখলে তোমার ঐ কাঁচুলী-খসা বুকের উপত্যকায় এই

কালীধাম

ছোরাখানা আমূল বিক্র করে দিতে আমার হাত কাঁপবে না! কিছু বুঝলে?

চৌষট্ঠিকলায় পারঙ্গমা রূপমতী একটি কুর্নিশ করে বললে,

‘বক্‌ৎল্-এ চুন মনীপার খাতিরং

খুশ্নুদ সী গরদদ।

বজায় মিন্নং ওয়ালি টেব্‌ই-তুদন্

আলুদ মী গরখুদ॥

কিছু বুঝলেন?

আধমের শিরস্ত্রাণ ভেদ করে কাব্যমাধুর্য আদৌ প্রবেশ করল না। বললে, সোজা ভাষায় কথা বল?

—সোজা ভাষায় তার অর্থ:

খুন-খারাবির রঙ-তামাশায় খেলতে হোলী চাও?

খুশ্ হবে কি গুপ্তিখানা বিধলে বুকে? দাও!

তোমার খুশেই হই খুশিয়াল, ভয় শুধু মোর দিলে

খুন কলঙ্কে লিপ্ত হবে তোমার ছোরাটাও॥

আরও সহজ ভাষায়—আমি বাঈজী, সুরং আর জওয়ানি নিয়েই আমার মহব্বতের বেসাতি। তাই জানতে চাইছি, মুগল সেনাপতির রুচিটা কী জাতের? আমার মঞ্জিলে আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে স্বমহিমায় দেখতে চান? না কি রক্তমাখা বিবস্ত্রা একটা নারীদেহ ধর্ষণ করেই আপনি তৃপ্ত?

আধম স্তম্ভিত হয়ে গেল। গ্রহণ করল বাঈজীর আমন্ত্রণ। পরদিন সন্ধ্যায় সেজে-গুজে আতর মেখে সে উপস্থিত হল রক্তস্নাত জনপদের শেষ প্রান্তে—বাঈজীর মঞ্জিলে। সেখানে শুয়ে আছে রূপমতী—অতিথির জন্য সাজানো আছে নানান উপকরণ: সিরাজি, চষক, ভুঙ্গার, নানান বাদ্যযন্ত্র, তবক্-দেওয়া সুগন্ধী পান, রূপার রেকাবিতে গোড়ে মালা। আর তার মাঝখানে রেশমী চীনাংশুকে আবৃত রূপমতীর মৃতদেহ!

রমারঞ্জন আত্মবিস্মৃত হল। হঠাৎ দুই হাত চেপে ধরল রূপমঞ্জরীর। আতঁকটে শুধু বললে, ন—না!

পরক্ষণেই সে সন্ত্রস্ত ফিরে পায়। সলজ্জে হাত ছেড়ে দেয়। এবার রূপমঞ্জরীই সেই হাত দুটি চেপে ধরে বলে, দিদির একটা মিনিতি, রমা! আমার তো তিনকুলে কেউ নেই। মণিকর্ণিকাঘাটে এ দিদির মুখাণ্ডিটাও তুই করিস!

রমারঞ্জন দিদির হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে যায়।

পরদিন সে আবার এল। বললে, প্রশ্নাম করতে এলাম দিদি। কালীধামের বাইরে ঘাঁচ্ছ! কাল ফিরে আসব।

—কোথায় যাচ্ছ ভাই?

—সাসারামের পথে রোহিতাশ্ব দুর্গে। গুরুদেব একটি পত্র দিয়েছেন রক্তধর মিশ্রকে। জবাব নিয়ে আসতে হবে।

বিদ্যালঙ্কারের মনে পড়ল না তিনি কে। রমারঞ্জন বুঝিয়ে দিল—বজ্রধর মিশ্র হচ্ছেন প্রাক্তন কাশীরাজের প্রধান সেনাপতি। কাশীরেশের মৃত্যুর পরে তাঁকে পদচ্যুত করেছে রাজাসাহেব। বর্তমানে তিনি শাহাবাদভুক্তির রোহিতাশ্ব কিল্লার দুর্গাধিপ। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন গুরুদেব।

এবার বিদ্যালঙ্কার নিজেই আপত্তি তোলেন—এ হতে পারে না! একটি মেয়ের জন্য হয়তো অসংখ্য সৈনিকের মৃত্যু হবে! তা আমি হতে দেব না, দিতে পারি না।

রমারঞ্জন দৃঢ় প্রতিবাদ জানায়, এবার আপনিই ভুল বলছেন দিদি। একটি নারীর জন্য নয়, একটি আদর্শের জন্য।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ব্যর্থ হল রমারঞ্জনের পরিশ্রম। দুর্গাধিপ বজ্রধর মিশ্র রোহিতাশ্ব দুর্গে অনুপস্থিত। সৈন্যসংগ্রহ মানসে তিনি কোথায় কোথায় ঘুরছেন। পাটনা-শাহাবাদ অঞ্চলে যেসব দস্যুর দল বিচ্ছিন্নভাবে ডাকাতি করে সেইসব দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ারদের নিজ সৈন্যদলে বেতনভুক সিপাহীতে রূপান্তরিত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তাঁর। দুর্গরক্ষার জন্য যেসব অধীনস্থ সেনানায়কদের রেখে গেছিলেন তারা এতবড় দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হল না। কাশীস্থরের সৈন্য-বাহিনী সংখ্যায় বৃহত্তর। তদুপরি—জনশ্রুতি, কোম্পানির ফৌজ পুরন্দরের সহায়। লক্ষ্মী-প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে রাজা-সাহেবের আঁতাত আছে।

রমারঞ্জন দ্বিতীয় একটা বিকল্প সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিল—গোপনে দিদিকে নিয়ে সে কাশীরাজ্য ত্যাগ করে যাবে। রূপমঞ্জরী স্বীকৃতি হতে পারেনি। প্রথমত সে-ক্ষেত্রে অকথ্য অত্যাচার হবে রমারঞ্জনের পরিবারবর্গের উপর। সে কাশীরই বাসিন্দা। তার বাবা, মা এবং ভগ্নীরা কাশীর প্রজা। দ্বিতীয়ত সমাজ তো ওদের ভাইবোনে! সম্পর্কটা বুঝবে না—এই গৃহত্যাগের একটা কদর্য ইঙ্গিত করবে; সমাজে পতিত হবেন রমারঞ্জনের পিতৃদেব; মাথা হেঁট হয়ে যাবে দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের।

বিদ্যালঙ্কার কিন্তু বিচলিতা নন—সমাধান তো তাঁর মুঠায়—‘হস্তামলকবৎ’!

রূপমঞ্জরীর আদর্শ—রূপমতী!



দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেল। সূর্যদেব কুন্তরাশি ত্যাগ করে মীনরাশিতে সংক্রামিত হয়েছেন। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার গাছগুলি ফুলের ভারে আনত। আশ্রমকুলের গন্ধে আকাশ-বাতাস আমোদিত। কোকিলের কণ্ঠে শোনা যায় বসন্তের পুনরাগমনবাতা!

গঙ্গাবক্ষে ভেসে যায় বড় বড় মহাজনী নৌকা। কাশীর গঙ্গাঘাটের দৃশ্যে কোনও পরিবর্তন হয় না। পালোয়ানেরা প্রত্যুষে ডন-বৈঠক করে, সন্ন্যাসী অবধূতেরা ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকেন। কুলরমণীর দল অবশুষ্ঠনে মুখ ঢেকে টুপ-টুপ ডুব দেয় আর কিশোর দল জলে ঝাঁপাই জোড়ে।

কল্যাণ

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

গোপন রাখার কোন চেষ্টাও করেনি রাজাসাহেব। সে চায় এ নিয়ে আলোচনা হক। লোকে জানুক, বুঝুক—সামাজিক বিধান অস্বীকার করলে সমাজ কী জাতের শাস্তি দেবে। সমাজ যদি সাহস না পায় তাহলে রাজশক্তি এসে কীভাবে সমাজপতিদের দায়িত্ব নিতে পারে।

পথেঘাটে এটাই আলোচ্য বিষয়। কেউ বলেনি খবরটা গোপন রাখতে। তবু সেটাকে গোপন রাখতে সবাই উৎসাহী। সবাই বলে, তোমাকেই শুধু বললাম ভাই, দেখ, পাঁচ-কান কর না।

একদিন জগমোহন পণ্ডিত গোপনে এসে দেখা করলেন বিদ্যার্ণবের সঙ্গে। তাঁর চরণদুটি ধরে বললেন, বিশ্বাস করুন পণ্ডিতমশাই। এ আমরা চাইনি, চাই না। এ কী বীভৎস অত্যাচার! এ কী হয়ে গেল! আমরা রাজাসাহেবের কাছে এ নিয়ে দরবার করতেও গিয়েছিলাম, তিনি কর্ণপাত করলেন না।

বিদ্যার্ণব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, পিশাচসিদ্ধ হতে চাইলে এ রকম পরিণামই হয় তর্কবাগীশ। তোমরা ন্যায়ধর্মকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলে পিশাচের পাশবিক বৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এখন সেই তামসশক্তি তোমাদের ক্ষমতার বাইরে।

বিষয়টা নিয়ে অসিঘাটের বাগানবাড়িতেও আলোচনা হয়। আত্মধারী বলে, কাজটা তুমি ভালো করনি বয়স্য।

—ভালো করিনি? কী বলতে চাইছ তুমি?

—না, না। সে কথা বলছি না! আমি বলতে চাইছি উনিশটা দিন ওকে সময় দেওয়াটা উচিত হয়নি। সেদিনই ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা উচিত ছিল এই বাগানবাড়িতে।

রাজাসাহেব পানপাত্রটা পূর্ণ করার অবকাশে বলেন, তুমি মূর্থ! এই জন্যেই সারাটা জীবন শুধু মোসাম্বিক হয়েই কাটালে। কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে তোমাকে গদিয়াল করে দিতে পারলাম না!

—তার মানে?

—বুঝলে না? আমি যদি সেদিনই ঐ মাগীটাকে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে বাগানবাড়িতে নিয়ে আসতাম, সে রাতেই ওর ধর্মঘট করতাম তাহলে সারা রাজ্যের লোক বলত—রাজাসাহেব কামোদ্ভূত হয়ে একাজ করেছে! ঠিক কি না?

—সে কথা বলতে পার!

—দ্বিতীয়ত, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কথা ভেবে দেখ। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন—মৃতপশুর দেহের খোলে ঐ দুই বিদ্রোহীকে এমনভাবে সেলাই করতে হবে যাতে তারা তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা না যায়। যেন সমস্ত দিন গো-শকটের উপর ঐ দুটো মৃতপশু ধড়ফড় করতে থাকে! কেন? যাতে সমস্ত শহর সে দৃশ্যটা দেখতে পায়! যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ বিদ্রোহের কথা চিন্তাও করতে না পারে! আমিও তাই চাই—এই উনিশ দিন ধরে ঘরে ঘরে ঐ কথা আলোচনা হক। সে মাগীও পক্ষকাল ধরে ধড়ফড় করুক! শিরশ্ছেদ তো মুহূর্তে ঘটে যায়—শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়—মেয়াদটা দীর্ঘায়িত করে। এ অতি কঠিন কুটিল কৌটিল্য-নীতি, বয়স্য!

কাব্যতীর্থ ফোড়ন কাটে, ন্যায্য কথা। একটা উপমা দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়। ধর কৈ মাছ! বাজার থেকে কিনে এনে তাকে তৎক্ষণাৎ রন্ধন করলে সেই স্বাদ পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় জিয়োনো কৈ-এ! কিন্তু একটা কথা রাজাসাহেব। মনে আছে নিশ্চয় শিবাজী-মহারাজের কথা! আফজল খাঁর সঙ্গে তাঁর সেই একান্ত সাক্ষাৎ? তুমি এই বাগানবাড়িতে বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে দ্বৈরথ-সংগ্রামে ব্রতী হতে চাও—ভাল কথা; কিন্তু তার পূর্বে আমাকে অনুমতি দিতে হবে। অর্গলবন্ধ-কক্ষে মেয়েটিকে প্রবেশ করতে দেওয়ার পূর্বে আমি তার সর্বস্ব তল্লাসী করে দেখব—তার কাঁচুলীর ভিতর বা ঘাঘরার নিচে কোনও অস্ত্র লুকানো আছে কিনা।

বটু বললে, তল্লাসীর কাজটা আমরা ভাগাভাগি করে সারতে পারি। আপনি লম্বা মানুষ—প্রথম দায়িত্বটা নিলে, দ্বিতীয়টা আমিই নিতে পারি।

রাজাসাহেব মনে মনে হাসলেও মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, তোমাদের সব তাতেই ঐ এক অশ্লীল রসিকতা! আমার উদ্দেশ্যটা তোমরা আদৌ বুঝতে পারনি। আমাকে এ কাজটা করতে হচ্ছে নিতান্ত কর্তব্য হিসাবে। সামাজিক দুর্নীতি দূরীকরণ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে এ জাতীয় কর্তব্য পালন করতে হয় বলে। কখনো বা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

বয়স্য়াও মনে মনে হাসে। তবে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। রাজাসাহেব যদি নল্‌চের আড়াল দিয়ে তামাক সেবন করতে চান তাহলে তাঁর বেতনভূক মোসায়েব হিসাবে ওদের ভান করতে হবে যে, নল্‌চের আড়াল পড়ায় দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে না।

কাব্যতীর্থ বললে, সে-কথা ঠিক! কিন্তু আমি একটা খবর পেয়েছি রাজাসাহেব। আপনার রাজ্যদেশটা বিদ্যালঙ্কার মানছে না। সে নাকি এখনো তার মাথা কামিয়ে চলেছে! এটা মূল অপরাধের অতিরিক্ত। এ পাপের শাস্তিবিধানের দায়িত্বটুকু কি আপনি আমাদের ভাগাভাগি করে নিতে দেবেন? আমাকে আর বটুকে?

রাজাসাহেব বলেন, তোমাদের কিছু করতে হবে না। খবরটা আমার অগোচর নয়। ব্যবস্থা আমি নিয়েছি ইতিমধ্যে। কাশীশ্বরী যাত্রাপার্টির অধিকারীকে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছি—চৈতালী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সে আমাকে একটি সুদৃশ্য সুগন্ধী পরচুলা পাঠিয়ে দেবে। এই বাগানবাড়িতে।

আজ্ঞাধারী জানতে চায়, কিন্তু সেদিন সেই যে শোভাযাত্রার কথা বলেছিলেন তার তো কোনও উদ্যোগ দেখছি না? বিদ্যালঙ্কার—তোমার সঙ্গে দ্বৈরথসমরে জয়ী হোক আর পরাজিত হক—তাকে যে ঢাক-ঢোল-শিঙা বাজিয়ে রন্ডিবাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তার কী আয়োজন হল?

রাজাসাহেব বললেন, না! সে সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করেছি। কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা সহমরণে যেতে ভয় পেলে তার কী অন্তিম পরিণতি হয় এটা সমাজকে বুঝিয়ে দেবার পর মেয়েটির মৃতদেহ গঙ্গাবক্ষেই নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।

তিন বয়স্য নীরব থাকে। রসিকতা করতেও ভুলে যায়! স্তব্ধতা ঘন্টিয়ে আসে।

ওরা কিন্তু আদৌ বুঝতে পারেনি কেন এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত। সে প্রশ্নটা ওরা উত্থাপন করতেও ভুলে যায়। মৃত্যুর এমনই মহিমা।

পূরন্দর, আগেই বলেছি, ধুরন্ধর।

কাশীবাস

সে অনেক কিছু ভেবে দেখেছে।

তার অশঙ্কা হয়েছে—হয়তো ঐ পাশবিক শোভাযাত্রায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি রমণীর ধর্মিতা হওয়ার সংবাদ মানুষে সহজে ভুলে যায়; কিন্তু বিবস্ত্রা একটি যুবতীকে জনবহুল সড়ক দিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হতে স্বচক্ষে দেখলে দৃশ্যটা মানুষে ভুলতে পারে না। কাশীর প্রজাসাধারণের মধ্যে শুধুমাত্র পাষাণই নেই, আছেন মহামান্য অসংখ্য পণ্ডিত। হয়তো বিদ্রোহ ধুমায়িত হয়ে উঠবে ঐ জ্ঞানী মানুষগুলির অন্তরেই। ওদের তীরধনুক-বল্লম-তরবারী নাই—কিন্তু ‘ব্রহ্মশাপ’-এর ব্রহ্মাস্ত্র আছে! তাঁরা যদি সমবেতভাবে নিদান হাঁকেন তাহলে রাজাসাহেবের গদিও হয়তো টলে উঠবে।

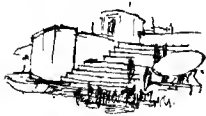
রাজাসাহেব বিকল্প ব্যবস্থা করেছে। বয়স্যদের কাছেও সংবাদটা গোপন রেখেছে। জানে ওর দুএকটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর—রামলগন, ভিখন আর ছেদীলাল। স্থির হয়েছে ঐ মেয়েটিকে এই বাগানবাড়ির একটি কক্ষে পক্ষকাল বন্দি করি রাখা হবে। নিত্য সন্ধ্যায় তাকে উপস্থিত করা হবে রাজাসাহেবের শয়নকক্ষে। পক্ষকালের নিত্যধর্মণ!

‘গর্জ গর্জ ক্ষণং মৃত্যু যাবন্মধু পিবাম্যহম’।

বিগতভর্তা যৌবনবতীর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পক্ষকালকে ‘ক্ষণ’ বলা অযৌক্তিক নয়। অসহায় ধর্মিতা নারীর গর্জন পাষণ্ড প্রাচীরের বাহিরে শোনা যাবে না—রাজাসাহেব নিশ্চিন্তে মধুপান করতে পারবে। তারপর, ওর মাথায় কিছু চুল গজালেই—না, গঙ্গাবক্ষে তার মৃতদেহটি নিক্ষিপ্ত হবে না; তাকে রাতারাতি বজরায় চাপিয়ে রওনা দেবে দক্ষ লাঠিয়াল রামলগন। পূর্ব মুখে। পৌছে দেবে এলাহাবাদ ক্যান্টনমেন্টে। মেজর কিল্প্যাট্রিকের খিদমতে।

কাশীরাজ একটি ক্রীতদাসীকে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। কিল্প্যাট্রিক একদিন শ্যাম্পেনের নেশার ঝোঁকে সক্ষেদে বলেছিল, এ দেশীয় ক্রীতদাসী, কস্বি অথবা উপপত্নীতে তার মন ভরে না—সব ‘কালো ঔরৎ’!

রাজাসাহেব ওকে খুশি করে দেবে এতদিনে! দ্যাখ শালা! এ কালো-আদমির দেশেও পদ্মফুল ফোটে!



অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন অশীতিপর বৃদ্ধ বিদ্যার্ণব।

মেয়ের হাতদুটি টেনে নিয়ে বললেন, আমি সমাধানে পৌঁচেছি, মা জননী। শোন, বুঝিয়ে বলি—গত দশ দিন তুই আমি দুজনেই ঘরের বার হইনি। চতুষ্পাশী পরিচালনা করেছে রমারঞ্জন। আমরা দুজন এ দশ দিন গঙ্গাস্নানও করিনি। কাল করব। পূর্ব-আকাশে আলো ফোটার আগেই বাপ-বেটিতে বেরিয়ে যাব। বুঝলি?

—বেশ তো, যাব। এটা কী-এমন বড় জাতের সিদ্ধান্ত?

—না, সবটা বলা হয়নি। গঙ্গাস্নান একটা অছিল। রমারঞ্জন ব্যবস্থা করেছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে ওর একজন বিশ্বস্ত মাঝি—নকুলেশ্বর কাহার—অপেক্ষা করবে। সে আমাদের ব্যাসকাশী পৌছে দেবে। সেখানে থেকে আমরা বাপ-বেটিতে বাদশাহী-সড়ক ধরে কাশীত্যাগ করব। পদরজে চলে যাব রোহিতাশ্ব।

—কাশীত্যাগ করবেন! এই বৃদ্ধ বয়সে! এই ভদ্রাসন? এই গুরুকুল-চতুষ্পাঠী!

—রমারঞ্জন দায়িত্ব নিয়েছে। সে সব কিছুর দায়িত্ব নেবে—যতদিন না আমরা বাপ-বেটিতে ফিরে আসি। তুই ঠিকই বলেছিলি—রমার সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে তার নানান প্রতিক্রিয়া হত। আমার ক্ষেত্রে তা হবে না।

—কতদিন পরে আমরা ফিরে আসব?

—কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ সাবালক হলেই। পুরন্দরের হাত থেকে শাসনদণ্ডটা গ্রহণ করলেই।

—সে তো তিন-চার বছর, বাবা?

—হোক না! ‘কালোহায়ম্ নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বীঃ’। এখন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে—কাল অনন্ত, পৃথ্বী বিপুলা। একদিন-না-একদিন ফিরে আসবই। কোথাও না কোথাও আশ্রয় জুটবেই। আর নেহাৎ নাই যদি জোটে তাতেই বা ক্ষতি কী? আত্মমর্যাদা তো খোঁয়াব না।

হট্টা বিদ্যালঙ্কার সম্মত হলেন। ঐ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের বলিরেখাক্ত হাতটি ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পুনরায় গৃহত্যাগ করতে।

পরদিন—না পরদিন নয়, সেই রাত্রেরই শেষ প্রহর। মাথার উপর তখনো এক-আকাশ তারা। শুক্লা সপ্তমী তিথি। চাঁদ অস্ত গেছে অনেক আগে। কিন্তু তারার দলের কৌতূহল মেটেনি। তারা ঝুঁকে পড়ে দেখছে এক বৃদ্ধ আর তার কন্যার আজব অভিসার। ওরা ঘর ছেড়ে পথে নামছে। রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে প্রজা।

না, রাজা একা নয়—ভাবেন বিদ্যালঙ্কার। রাজা-সাহেব এই পুরুষশাসিত কূপমণ্ডুক সমাজের এক প্রতীক মাত্র। সমাজের সর্বস্তরে গ্লানি, ক্রোধ, পঙ্ক। বঙ্গভূমে দেখে এসেছেন কী প্রচণ্ড সামাজিক অবক্ষয়। ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় মঠে মঠে বীভৎস বামাচার। জায়গীরদারের দল বিলাসের শ্রোতে গা ভাসিয়েছিল। প্রজার সঙ্গে একটিমাত্র সম্পর্ক—খাজনা আদায়। সমাজপতিরও সেই পঙ্কশ্রোতে গা ভাসালো। মুষ্টিমেয় যে কজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ করতে রুখে দাঁড়ালো তাদের ওরা ফাঁসিকাঠ থেকে লটকালো। এই অবক্ষয়ের অনিবার্য ফল—বর্গীর আক্রমণ। সোনার বাঙলা স্বশান হয়ে গেল! একজনও মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে পারল না। তারপর এল বিদেশী বেনিয়ার দল। সহজেই দখল করে নিল দেশ-শাসনের অধিকার। শুধু বাঙলা নয়, সারা ভারতবর্ষে তখন ঐ অবক্ষয়ী অধঃপতনের যুগ। ভাগোয়া-ঝাণ্ডার ধারক স্বয়ং ভবানী মাতার বরপুত্র শিবাজী-মহারাজের ঊত্তরসূরীরা জেজি লুটেরা ডাকাত; রাণা প্রতাপের ঐতিহ্যের ধারক আজ বাদশাহী-সড়কের ঠগী।

এবং তারপর ছিয়াত্তরের মল্লভর! তার ভিতরেই তিনি কাশীযাত্রা বন্ধ করেন।

কাশীনরেশের প্রয়াণে এই পুণ্যভূমিতে শাসনের নামে যে শোষণ করতে এসেছে সেই রাজাসাহেব ঐ অবক্ষয়ী পাশবিকতার এক মূর্ত প্রতীক মাত্র।

মা-জননীর হাতটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে অতি সন্তর্পণে বিদ্যার্নব গৃহদ্বার উন্মুক্ত করলেন।

ঋশিধাম

চরাচর নিস্তব্ধ। পাখির কাকলি এখনো শুরু হয়নি। পথে দেখা দেয়নি প্রত্যা-স্নানার্থীর দল। দুইজনে পথে নামলেন।

ইষ্টনাম স্মরণ করার পূর্বেই বাধা।

—কে! কে ওখানে?

অন্ধকারের ভিতর থেকে অগ্রসর হয়ে এল এক দশাসই জোয়ান। মাথার ঝাঁকড়া চুল একটি গামছায় ফেটি দিয়ে বাঁধা। কটিবন্ধে তরবারী, হাতে দীর্ঘ বংশদণ্ড। বিদ্যার্ণবকে নত হয়ে প্রণাম করল। বললে, ডরিয়ে মৎ পণ্ডিত মোশা। হামি রামলগন আছি।

—রামলগন! কে তুমি বাবা, রামলগন? এখানে কী করছ?

অতি বিনীতভাবে লোকটা আত্মপরিচয় দিল। সে রাজসরকারের বেতনভুক্ত লাঠিয়াল। শহরের অনেক মানুষ নাকি আজ পণ্ডিতজী আর তাঁর কন্যা ঐ মাতাজীকে বিষ নজরে দেখে। যে কোন মুহূর্তে তারা নাকি এই চতুষ্পাঠী আক্রমণ করে মাতাজীকে অপহরণের চেষ্টা করতে পারে। তাই তাঁর নিরাপত্তাবিধানে সে রাজসরকার-নিয়োজিত প্রহরীমাত্র—যাবৎ পূর্ণমাসী।

বললে, গঙ্গাজীমে যাইবন নু? আসেন হমার সাথ। কৌন ঘাট? দশাশ্বমেধ সায়েদ? মুহূর্তে ধুলিসাং হয়ে গেল যাবতীয় পরিকল্পনা।

প্রণিধান করলেন, তিনি সন্ধ্যা গৃহবন্দীমাত্র। ওর ঐ ‘যাবৎপূর্ণমাসী’ শব্দটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। অর্থাৎ, অনর্থক! চৈতালী পূর্ণিমায় কামাগিরি চিতায় তাঁর আদরের কন্যাটিকে পূর্ণাছতি দেওয়া হবে। চিতাশ্রষ্টার অন্তিম গতি—ব্যভিচারীর কামাগিচিঁতা।

কী যেন বলেছিল রমারঞ্জন? সেই মালায়া-জনপদকল্যাণীর নাম?

এতক্ষণে পূব-আকাশটা একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে রামলগন বসল পাষাণ-রানার একান্তে—যেখানে থেকে ঘাটের স্নানরতাদের নজর করা যায়। পাণ্ডাজীর গোলছাতির আড়াল থেকে। বিদ্যার্ণব আর বিদ্যালঙ্কার পায়ে পায়ে নেমে গেলেন গঙ্গার দিকে। ডাইনে পুরুষদের ঘাট, বামে স্ত্রীলোকদের। বিদ্যার্ণব পুরুষদের ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। দশ-পনেরজন স্নানার্থী ইতিপূর্বেই এসেছে। তাদের মধ্যে একজন ঠুঁকে দেখে চিনতে পারেন। বলেন, প্রাতঃপ্রণাম ঠাকুরমশাই, কিছু সুরাহা হল?

বিদ্যালঙ্কারের মনটা বিধিয়ে ওঠে। সর্বত্র ঐ আলোচনা। দ্রুতপদে তিনি স্ত্রীলোকদের ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তবু পরবর্তী কথাটাও কানে যায়, ঘোর কলি পণ্ডিতমশাই! কী করবেন বলুন? ঐ রাজাসাহেবের চরণদুটি আঁকড়ে ধরে ক্ষমা চান!

বিদ্যালঙ্কার শিহরিতা হয়ে ওঠেন। কে যেন সপাৎ করে একটা চাবুক মেয়েছে ওঁর পৃষ্ঠদেশে। ওপাশ থেকে আবার একজন বলে ওঠে, কী বলছ বসুজা? মহামহোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব ক্ষত্রিয়ের পদস্পর্শ করবেন?

বিদ্যালঙ্কার দুহাতে কর্ণমূল চেপে ধরে এ-ঘাটে দ্রুত প্রবেশ করেন। একজন বয়সী মহিলা তাঁকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, এ ঘাটে নয় পণ্ডিতমশাই, এটা মেয়েদের ঘাট।

বিদ্যালঙ্কার যেন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন মাগঙ্গার বুকে। বৃদ্ধা চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে যান; কিন্তু তার পূর্বেই একটি বধু ওঁর কর্ণমূলে বলে ওঠে, কাকে কী বলছ

ঠান্না? উনি যে সেই আজব ‘মেয়ে-পণ্ডিত’!

বিদ্যালঙ্কার এক ডুব দিয়ে তখন পুনরায় দাঁড়িয়ে উঠেছেন, কোমর জলে। তাঁর ঢিলেঢালা পিরান গায়ের সঙ্গে সঁটে গেছে। গৈরিক সিন্ধু বসন ভেদ করে বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় ততক্ষণে পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে। তিনি আবার ডুব দিলেন।

ঘাটের উপরে পাষাণরানায় রামলগন বসে নজর রেখেছিল। বন্দিনীর জিম্মাদারী তার। নজরে রাখা তার রাজকর্তব্য; কিন্তু ধর্মভীরু লোকটা চোখ ফেরালো। সিন্ধুবসনা ঐ অনিন্দ্যকান্তি রমণীর রূপ থেকে মনটাকেও ফেরাবার চেষ্টা করল: জয় শিউজী! জয় বজরঙ্গবলী!

ওর মনে পড়ে গেল পূর্বদিনের সন্ধ্যার কথা। সিদ্ধির আসরে সুখিয়া ওকে জনাস্তিকে প্রণয় করেছিল, এক বাৎ পুঁছু লগনভাই?

—কা বাৎ?

সুখিয়া জানতে চেয়েছিল, শহরে যে গুজবটা মুখে মুখে ছড়াচ্ছে তা কি সত্যি? ঐ পণ্ডিত মহিলাটিকে শাস্তিদানের পর নান্দা অবস্থায় শোভাযাত্রা করে পৌছে দেওয়া হবে রণ্ডিবাজারে? রামলগন বলেছিল, ম্যায় কা জানতা?

স্বীকার করেনি। মন্ত্রগুপ্তির নির্দেশ ছিল—কথাটা তাই পাঁচকান করেনি। রামলগন জানত—না, ঐ মহিলাটিকে নয় অবস্থায় ঢাল-ঢোল-শিঙ্গা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে রণ্ডিবাজারে আদৌ পৌছে দেওয়া হবে না। তার অন্তিমগতি প্রয়াগ ক্যান্টনমেন্টে। যবন শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের কাম চরিতার্থ করতে করতেই মাতাজীর যৌবন বিকাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল রামলগনের।

—হে শিউজী! হে বজরঙ্গবলী! এ তোমাদের কেমন বিচার? কী পাপ করেছে ঐ পণ্ডিতমাদি। সে তো কারও পাকাধানে মই দেয়নি? লিখা-পড়ি নিয়ে সে তো দিবি ছিল বড় পণ্ডিতজীর ডেরায়। কেন তাকে তোমরা বেইজ্জত করছ?

কেন পাঠিয়ে দিচ্ছ জঙ্গী ফিরিস্দিদের ছাউনিতে?

রাজাসাহেবের উপর এই ধর্মভীরু মানুষটি খুশি নয়। রাজাসাহেব মত্তাবস্থায় ভাঙের ভাণ্ড ওর মস্তক লক্ষ্য করে মেরেছিলেন একদিন—মাথা ফেটে রক্তপাত হয়েছিল—তা হোক; সে জন্য রামলগনের কোন ক্ষোভ নেই। রাজাসাহেব মালিক, সে নোকর—মত্তাবস্থায় রাজাসাহেব যদি ওর রক্তপাতের উপলক্ষ্য হন তাহলে জম্মদাস রামলগনের মতো মানুষরা ক্ষুব্ধ হয় না। ঐ ওদের সাতপুরুষের নিয়তি। মদ্যপান বা নিত্যানতুন নারীসঙ্গের জন্যও সে রাজাসাহেবের উপর বিরক্ত হয়নি—এমনটা তো হয়েই থাকে। বৃড়ারাজার এসব দোষ ছিল না—কিন্তু তিনি তো ব্যতিক্রম। রামলগন জানে, এটাই বড়লোকের বেওয়াজ। তামাম হিন্দুস্থানে। রামজীর মতো প্রজা-পালক, জনকরাজার মতো রাজর্ষি এ যুগে দুর্লভ। রামলগন ক্ষুব্ধ—মুগ্ধ! ঐ রাজাসাহেব লোকটা কসবি বা রণ্ডি নিয়ে খুশ থাকে না। তার নজর—ঘরানা-ঘরের বধু, গৃহস্থ ঘরের কন্যা! তাদের মুখে ফোট্রি বেঁধে নিয়ে আসে বেতনভুক অপহারকরসল। দু-চার রাত ফুর্তি-ফার্তা করে রাজাসাহেব জানায়—সখ মিটে গেছে! তখন হয়তো ইতভাগিনী আত্মহত্যা করে। অনেকে আশ্রয় নেয় রণ্ডিবাজারে। কেউ কেউ নিঃশঙ্কিত পালকি চেপে ফিরে যায়

ব্যাসকাশী

স্বগৃহে। কখনো বাড়ির লোক নিঃশব্দে মেনে নেয়। কখনো বা তার মৃতদেহ নিজেরাই সংকার করে!

চমক ভেঙে রামলগন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

স্নানান্তে পণ্ডিতজী সকল্য ফিরে আসছেন। বগলে সিঁজিবসন। পরিধানে শুষ্ক পোশাক।

—চলিয়ে পণ্ডিতজী।

—না। আমি একবার ওপারে যাব। ব্যাসকাশী।

রামলগন অবাক হয়। বলে, ক্যোও?

বিদ্যার্ণব বিরক্ত। বলেন, আমার খুশি। তুমি এখন কী করবে?

—মায় ভি যাউঙ্গা! ক্যা করু? চলিয়ে—

ঘাটে নির্দেশমতো অপেক্ষা করছিল নকুলেশ্বর। সে বিম্মিত হল। রমারঞ্জনের কাছ থেকে সে নির্দেশ পেয়েছিল—ভোররাতে পণ্ডিতজী আর মাতাজী ঘাটে আসবেন—সঙ্গে আর কেউ থাকবে না। নকুলেশ্বর কোন কথা বলবে না। শুধু দুজনকে ওপারে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। আর কাকপক্ষীকেও সে কথা বলবে না। রমারঞ্জনের নির্দেশটি ছিল প্রাঞ্জল। বুঝতে কিছু অসুবিধা হয়নি নকুলের। সে কাশীরই বাসিন্দা। সবাই যা জানে, তা তার অবিদিত নয়। সে সহজেই বুঝতে পেরেছিল—ওঁরা বাপবেটিতে কাশীত্যাগ করতে চাইছেন। আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে অব্যাহতির শেষ চেষ্টা। নকুলেশ্বর রাজি হয়েছিল। বোধকরি এ জন্য পারিশ্রমিক না পেলেও সে রাজি হত। রাজাসাহেবকে সেও অত্যাচারী শাসক বলে মনে করে। ঐ নির্বিরোধী পণ্ডিতজী আর তাঁর সেই সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমার মতো কন্যাটিকে সে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে—কিছু না বুঝেও। তাই সে অবাক হল, যখন দেখলো ওঁরা দুজনে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন সশস্ত্র দেহরক্ষীটিকে। রামলগনকে ভালভাবেই চিনত নকুলেশ্বর। জেনে-বুঝেও সে প্রশ্ন করে, কাঁহা যাইবন পণ্ডিতমোশা?

—ওপারে। ব্যাসকাশীতে।

নৌকায় তিনজনে উঠে বসলেন। ছোট ডিঙি নৌকা। বাপবেটি বসলেন একদিকে, ঘোষাঘোষি করে। সামনের পাটাতনে লাঠিহাতে রামলগন। নৌকা ছাড়ল। রামলগন হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে প্রায় কানে-কানে বিদ্যার্ণবকে বললে, পণ্ডিতজী, এক বাৎ বাঁটাই?

—কী?

—আপনি যা হিঙ্কা করছেন, উ হবে না!

—কী বলতে চাইছে তুমি?

—আপনি হমার এক্তিয়ার থিকে ভাগতে পারবেন না। বেহুদো ব্যাসকাশী যাচ্ছেন কেন? বিদ্যার্ণব দাঁতে-দাঁত দিয়ে নীরব রইলেন।

বিদ্যালঙ্কার বুঝে উঠতে পারেন না, এই গঙ্গা পার হবার হেতুটা কী? নকুলেশ্বর নির্দেশ মতো উপস্থিত ছিলই। তারই নৌকায় ওঁরা গঙ্গা পার হচ্ছেন। কিন্তু এখন তো তুমি কোনও অর্থ হয় না। মূর্তিমান ফমদুতের মতো সশস্ত্র বসে আছে রামলগন।

সূর্যোদয় হয়েছে ইতিমধ্যে। গঙ্গার ঘাট এখন লোকে লোকারণ্য। সে-আমলে কাশীর গঙ্গা ছিল হরিদ্বার-গঙ্গার মতোই নির্মল, নীল। ‘কা শীতলবাহিনী গঙ্গা?’—‘কাশীতলবাহিনী গঙ্গা!’

নকুলেশ্বর ওপ্রান্তে বসে একভাবে দাঁড় টেনে চলেছে। লগিটাকে তুলে রেখেছে ঘাটের সীমা পার হবার পর। ছলাং-ছল, ছলাং-ছল। বহু লোক স্নান করছে—এঘাটে ওঘাটে। তারা চোখ তুলে দেখছে নৌকার যাত্রীদের। তারা জানে না, এই তিনটি ঘৈষাঘৈষি পারানির যাত্রীর দুজন বন্দী আর একজন পাহারাদার।

ক্রমে এপারের দৃশ্য আবছা হয়ে এল। এগিয়ে এল ওপারের দৃশ্য। দিগন্তজোড়া শুধু ধূ-ধূ বালির চড়া। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। কিছু জলচর পাখি শুধু ভিড় করে আছে—কাদা-খোঁচা, জলপিপি, গাঙশালিক, চখাচখী—এমনকি কিছু শীতালী পাখি, যারা এখনও মানসযাত্রা শুরু করেনি।

রামলগন পুনরায় নিচু হয়ে একই কথা বলল, পণ্ডিতজী! এক বাৎ কই?

বিদ্যার্ণব রীতিমতো বিরক্ত। তিনি নিজের চিন্তায় বিভোর ছিলেন। বলেন, বার-বার একই কথা বলছ কেন, রামলগন?

—নেহি, নেহি পণ্ডিতজী। ইবার ম্যয় দুসরা বাৎ কহুনে চাহতা।

—ক্যা বাৎ?

রামলগন নতনেত্রে তার প্রাকৃতভাষে যে কথা নিবেদন করল তা বেশ কিছুটা অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ গঙ্গাজলে ডান হাতটা ডুবিয়ে দিয়ে অক্ষুটস্বরে বলে ওঠে, এই গঙ্গাজীমে হাঁথ দিয়ে বলছি পণ্ডিতজী। আপ...আপনি মাতাজীকে নিয়ে ভেগে যেতে পারলে এই রামলগন হারামি ভি খুশি হোবে। লেकिन ক্যা কঁরু? ইয়ে হয় মেরা নসিব!

বিদ্যার্ণব জবাব দিলেন না।

বিদ্যালঙ্কার হঠাৎ কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েন। যুক্তকরে অক্ষুটে উচ্চারণ করেন উপনিষদের মন্ত্র:

‘মাংং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমন্ত্রনিরাকরণং মেহন্তু। তদাশ্বনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্যাস্তে ময়ি সন্তু। তে ময়ি সন্তু।’

বিদ্যার্ণবের কর্ণে প্রবেশ করল সে মন্ত্রধ্বনি। তিনি পাদপূরণ করলেন, ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

বিদ্যালঙ্কারের মনে পড়ল এই কিছুক্ষণ আগেকার একটি ছোট ঘটনা। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানান্তে তিনি যখন বস্ত্র পরিবর্তন করতে প্রাচীরের অন্তরালে যাচ্ছিলেন তখন পিছন থেকে কে যেন তাঁকে ডেকে উঠেছিল, বাবা! একটু দাঁড়িয়ে যাবেন?

বিস্মিতা হটা বিদ্যালঙ্কার দূরন্ত কৌতূহলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তিনি সদ্যস্নাতা। সিন্ধু পিরানটি তাঁর দেহের সঙ্গে লেপটে সেঁটে আছে। তাছাড়া তিনি স্ত্রীলোকদের জন্য চিহ্নিত অন্তরালে যাচ্ছিলেন বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য। এই সময়ে কে তাঁকে ডাকল ‘বাবা’ বলে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই বৃদ্ধা। যিনি ওঁকে বারণ করেছিলেন এ ঘাটে স্নান করতে। তাঁর পাজর-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বধুটি, অবগুণ্ঠন টেনে।

বিদ্যালঙ্কার বলেছিলেন, কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ বাবা! আপনাকে একটি প্রণাম করতে চাই। না, না, আমরা বামুন নছি, গন্ধ-বেনে! আপনি বয়সে ছোট বলে দোষ নেই।

কালীধাম

বৃদ্ধা আর তাঁর নাতবৌ বিদ্যালঙ্কারকে প্রণাম করেছিলেন পদস্পর্শ করে। বিদ্যালঙ্কার আপত্তি করেননি, আশীর্বাদ করেছিলেন। সহাস্যে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি এখনো আমাকে ‘বাবা’ বলে ডাকছেন কেন?

বৃদ্ধা নিদন্ত হাসি হেসে বলেছিলেন, তখন আপনারে চিনতে পারিনি, বাবা। আমার এই নাত-বউ বুঝিয়ে দিল—আপনিই সেদিন সেই কুরুক্ষেত্রের তালো-এ ...

বাধা দিয়ে বিদ্যালঙ্কার বলেন, সে তো হল, কিন্তু ‘বাবা’ কেন? কেন নয় ‘মা’?

বৃদ্ধা জোড়হস্তে বলেছিলেন, আপনি বেঙ্গজ্ঞানী! ‘বাবা-মা ডাকাডাকির’ ওপারে!

বিদ্যালঙ্কারের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তাঁর সাধনা তাহলে তো নিষ্ফল নয়! এই গন্ধবনিক বৃদ্ধাটি তো তাঁর অশিক্ষা সত্ত্বেও প্রণিধান করতে পেরেছেন—ব্রহ্মবিদ্যা লাভের এজ্জিয়ার শুধুমাত্র পুরুষজাতির দখলে নয়। মহাজ্ঞানের সেই শিখরচূড়ায় উপনীত হলে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদাভেদ আর থাকে না!

আর এখন এই রামলগন!

রাজসরকারের বেতনভুক ভৃত্যমাত্র। তবু তার অন্তরে সঞ্চিত এক ক্ষুদ্র প্রতিবাদ! অন্যায়ের বিরুদ্ধে! অসত্যের বিরুদ্ধে! সে খুশি হবে যদি বিদ্যার্ণব তাঁর কন্যাটির ধর্মরক্ষা করতে পারেন। রামলগন আজ নিরুপায়। অন্নদাস ভীষ্মের মতো!

নৌকা ওপারে ভিড়ল।

নকুলেশ্বরকে অপেক্ষা করতে বলে বিদ্যার্ণব ব্যাসকাশীর পারে নামলেন। কন্যাকে আহ্বান করলেন, নেমে আয় মা।

বিদ্যালঙ্কার নৌকা থেকে অবতরণ করলেন। নকুলেশ্বর কোনও প্রশ্ন করল না। উদাস দুটি মেলে বসেই রইল। বিদ্যার্ণব ডানে-বাঁয়ে তাকালেন না। সোজা রওনা হলেন। বিদ্যালঙ্কার এতক্ষণ কোনও প্রশ্ন করেননি। লক্ষ্য করে দেখলেন রামলগনও তার লাঠিগাছখানা তুলে নিয়ে পিছন পিছন আসছে—শ্রুতিসীমার ভিতরেই সে। বিদ্যালঙ্কার তাই সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের। বললেন, আর তো কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না, মা। এই আমার শেষ চেষ্টা। চল, তোকে বিশ্বনাথের চরণতলে ফেলে দিয়ে আসি। তারপর রাখেন তিনি, মারেন তিনি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন হট্টা বিদ্যালঙ্কার! একী! বৃদ্ধ কি শোকের আঘাতে, আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে উঠে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন? তিনি কি এখন উন্মাদ? কাশীধাম ছেড়ে নৌকায় ওপারে ব্যাসকাশীতে এসেছেন বিশ্বনাথের চরণজোড়ার সন্ধানে?

বিদ্যার্ণবের খেয়াল হয়নি অনুগামিনী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আপন মনে কথা বলতে তিনি বালিয়াড়ি ভাঙছেন। বিড়বিড় করে বলছেন, আমি তো সামান্য মানুষ, যারা ব্রহ্মবিদ, বেদজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়, তাঁরাও দিশেহারা হয়ে পড়লে ঐ বাবা বিশ্বনাথের চরণজোড়াই আঁকড়ে ধরেন।

হট্টা বিদ্যালঙ্কার ছুটে এসে পিছন থেকে গুঁর হাত দুটি ধরে ডেকে ওঠেন, বাবা?

—অ্যা?

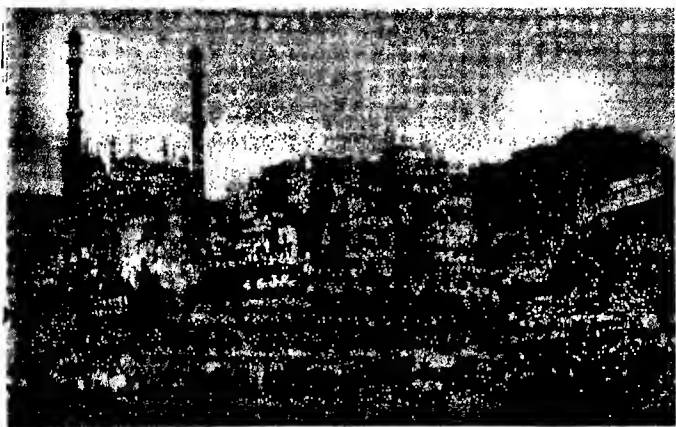
—বিশ্বনাথের মন্দির তো ওপারে?

হাসলেন বৃদ্ধ। বলেন, না রে মা! আমি সেই অচল বিশ্বনাথের কথা বলছি না। তিনি তো পাষাণ!

—তা হলে? তবে কার কথা বলছেন?

—সচল বিশ্বনাথ!

দেহের সমস্ত রোমকূপে স্পন্দন জেগে ওঠে হঠাৎ বিদ্যালঙ্কারের। এ অভিজ্ঞা অতি পরিচিত। কাশীবাসী কারও অস্থয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। নামটুকুই শোনা ছিল, স্বচক্ষে কখনো দেখেননি! সচল বিশ্বনাথ!



দশাশ্বমেধ-ঘাটের আলোকচিত্র — ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদ

সচল বিশ্বনাথ! তাঁর দেখা পাওয়া কি সহজ?

কখন কোথায় থাকেন টেরই পাওয়া যায় না। এই শোনা গেল বাবা আছেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। দৌড়ালো শত শত দর্শনাধীর দল। গিয়ে শুনল, বাবা ভাসতে ভাসতে চলে গেছেন কেদারঘাটে। অসি থেকে বরুণা তিনি ক্রমাগত সাঁতার দিয়ে অতিক্রম করেন—ঘাট দিয়ে, হেঁটে নয়। তিনি যে দিগম্বর! সমস্ত রাত হয়তো আকণ্ঠ-গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হয়ে বসে আছেন—কী শীত, কী গ্রীষ্ম। তারপর যেই গঙ্গার ঘাটে প্রথম স্নানাধীর আবির্ভাব ঘটে অমনি বাবা সাঁতরে চলে যান ব্যাসকাশীতে। জনশ্রুতি—তিনি দাক্ষিণাত্যের সন্ন্যাসী। কাশীধামে প্রথম যখন আসেন তখনো বেণীমাধবের ধ্বজাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুই তো হয়েছে 1707 খ্রীষ্টাব্দে। তার কত বছর পূর্বে ঐ মসজিদটা হয়েছিল তার আন্দাজ নেই বিদ্যালঙ্কারের।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বালিয়াড়ি ভাঙার পর দূর থেকে তাঁর দর্শন পাওয়া গেল। বসে আছেন

পদ্মাসনে। জনহীন প্রান্তরে, বালির উপর। চোখ দুটি নিমীলিত। ধ্যানস্থ। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তবে ঠুর মধ্যদেশে এতই স্ফীত যে, মের্দের মৈনাকে তাঁর—না, ভুল হল, তাঁর নয়, দর্শনাধীর—লজ্জা নিবারণ হয়েছে। বিশালকায় পুরুষ। মুণ্ডিত মস্তক। দাড়ি-গোফের বালাই নেই।

একজন কাশীবাসী পরামানিকের কীর্তি সেটা।

জপ-তপ, পূজা-উজা সে কিছুই করে না। বিশ্বনাথ দর্শন বা গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন নেই তার। সগর্বে বলে, ‘দেখি কোন শালা যমদূত আমাকে মরার পর ছুঁতে আসে!’ কারণ তার সাধনমার্গ অতি বিচিত্র। সপ্তাহে দুদিন—‘বিহে ঠুর এতোয়ার’ সে ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতের বাধা মানে না। ব্যাসকাশীতে চলে আসে তার সরঞ্জাম নিয়ে। ধ্যানস্থ বাবাকে ফৌরি করে দিয়ে যায়। বাবা টেরও পান না!

তবে এজন্য পরামানিককে পাড়ানির কড়ি গুণে দিতে হয় না। একজন পশ্চিমা মাঝি বিনা কড়িতে তাকে পারাপার করে দেয়। তারও বিশ্বাস মৃত্যুর পর তার অনন্ত বৈকুণ্ঠবাস ঠেকাতে পারবে না যমদূতের দল। শ্রমজলই ওদের গঙ্গোদক।

দূর থেকে দেখা গেল—কিছু কাক, গাঙ-শালিক আর শূগাল বাবাকে ঘিরে আছে। লোকজনকে আসতে দেখে তারা স্থানত্যাগ করল। দৃষ্টিসীমার বাহিরে নয়, নিরাপদ দূরত্ব থেকে অপেক্ষা করে—কতক্ষণে এই উটকো আপদের দল বিদায় হয়।

ভক্তরা যা ফলমূল মিষ্টান্ন নিবেদন করে যায় তা পড়ে থাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পশুপাখি নির্দিধায় তাতে উদরপূর্ণ করে যায়। ওদের দৃষ্টিতে সচল বিশ্বনাথ যে ধ্যানস্থ অচল বিশ্বনাথ। তাঁকে আর ভয় কী? বাবা বিশ্বনাথই জানেন ধ্যানভঙ্গ হলে বাবা সেই বায়স ও শিবাকুলের উচ্ছিষ্টে উদরপূর্তি করেন কিনা।

ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীকে ঠুরা তিনজনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোন গতান্তর নেই। ততক্ষণে চৈতালী রৌদ্র চড়া হতে শুরু করেছে। রামলগন মাজা থেকে খুলে গামছায় মাথাটা ঢাকল। এমন কত চৈতালী দিনে উদয়ভানু অস্তাচলে পৌছে দেখেছেন সমস্ত দুপুরের ‘লু’-এর ঝড়ে বাবার দেহ প্রায় ঢেকে যেতে বসেছে, কিন্তু তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়নি।

নিতান্ত সৌভাগ্য ওঁদের। বাবার ধ্যানভঙ্গ হল।

ঘোলাটে দুটি চোখ মেলে তিনি আগন্তুকদের দেখলেন। সবার আগে নজর পড়ল বৃদ্ধ বিদ্যার্ণবের দিকে। প্রশ্ন করলেন, ক্যা মাংতা হ্যায় রে বেটা?

‘বেটা’ সম্বোধন তো প্রত্যাশিত। বাবার বয়স ঐ অশীতিপর বৃদ্ধের প্রায় দ্বিগুণ!

শোনা যায়, তৈলঙ্গস্বামী জীবনের শেষ পর্যায়ে মৌনব্রত পালন করতেন। তা ‘জীবনের শেষ পর্যায়’ বলতে কী বোঝায়? সচল বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে সাধারণ গার্হিত্যিক হিসাব অচল। কারণ, জনশ্রুতি—তিনি নাকি প্রায় আড়াই শত বৎসরকাল এই ধরামে লীলাময় হয়ে ছিলেন। না, ‘গ্যিনেস-বুক-অব-রেকর্ডস্’-এ তথ্যটা লেখা নেই। তা সে যাই হোক, আমরা আছি ঐ ৭৪ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ বাবার তিরোধান কাল থেকে একশ তেরো বছর পিছিয়ে। সে সময় তাঁর বয়স একশ সাতাশ। ব্রৈবশিকের অন্ধ সহজেই বলবে—বাবার তখন যৌবন শেষ হয়েছে, প্রৌঢ়ত্ব শুরু হয়নি। মোটকথা, মেনে নেওয়া যেতে পারে সেটা তাঁর জীবনের শেষ পর্যায় নয়। কাহিনীর অনুরোধে তাই ধরে নেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি খোঁড়া বাঁচিৎ করে থাকেন

বিদ্যার্ণব হিন্দিভাষাতে জিজ্ঞাসিত হয়েও প্রত্যুত্তর করলেন সংস্কৃতে—যাতে সেটা ঐ রামলগন লোকটার মাথার উপর দিয়ে যায়। বললেন, আমি কিছু চাই না, বাবা। এই মেয়েটি আমার পালিতা কন্যা। এর বড় বিপদ

বিদ্যার্ণবের তর্জনীসংকেতে বাবা এবার এদিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল নতজানু ভঙ্গিতে যুক্তকরে বসে আছেন বিদ্যালঙ্কার। হয়তো প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পৌঁছেও, এই সওয়া শ বছর অতিক্রমণেও, তাঁর অক্ষিগোলকের সম্মুখস্থ ‘লেশ’-এ ‘ক্যাটারাক্ট’ দেখা দেয়নি। অন্তত তাঁর আধাবয়সী গন্ধবণিক বৃদ্ধা-গৃহিণীর অপেক্ষা তাঁর দৃষ্টি প্রখরতর। হিন্দিতেই প্রশ্ন করেন: শিউজী ঔর কালীমাসি—কিমণজী ঔর রাধামাসি, কোই ফারাক নহী! আঁয়া? সব ঝুট হ্যায়! ক্যা রে?

বিদ্যালঙ্কারের ওষ্ঠাধর খরখর করে কেঁপে উঠল। কী বলতে চাইছেন বাবা? এ কি প্রশ্ন, না তিরস্কার? নারীত্বকে তিনি অস্বীকার করেছেন বলেই কি উনি বিরক্ত? কিন্তু এসব তুচ্ছ জাগতিক অকিঞ্চনের দিকে তো ঔর নজর পড়ে না? নিজের পোশাকের চিন্তা যার নেই সে কি অপরের পোশাক নজর করে?

তৈলঙ্গ স্বামী পুনরায় বলে ওঠেন, ক্যা মাংতা তু?

‘বেটা’ বা ‘বেটি’ সম্বোধন করেননি এবারও। কিন্তু ‘মাংতি’ নয়, ‘মাংতা’!

এতক্ষণে বিদ্যালঙ্কারের কণ্ঠে স্বর ফুটল। বোধকরি সচেতনভাবে প্রত্যুত্তর করলেন না তিনি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা আকৃতি অজান্তেই বার হয়ে এল। সেই আদিমতমা নারীমুক্তির ধ্বজাধারিণী নিশ্চয় জানতেন না—ঐ একই প্রশ্ন শুনে একই জবাব দেবেন ভবিষ্যতে ভারত-আত্মার আর এক সিদ্ধপুরুষ—দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে:

—ভক্তি চাই বাবা। অচলা-ভক্তি।

এতক্ষণে মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল মহাযোগীর ওষ্ঠাধরে। বললেন, দীক্ষা নিবি?

হটী বিদ্যালঙ্কারের সহসা মনে হল তাঁর নাভিকুণ্ডলী থেকে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ সুঘুমা নাড়ি বেয়ে ব্রহ্মরজ্জ ভেদ করে পটাকাশে বিলীন হয়ে গেল।

—যা। পহিলে গঙ্গাজীমে নাহা লে।

বিদ্যালঙ্কার উঠে দাঁড়ালেন। ঘণ্টাখানেক পূর্বেই তিনি দশাশ্বমেধ-ঘাটে অবগাহন করেছেন; ব্যাসকালীতে স্নানই হয়—গঙ্গাস্নান হয় না—এসব কথা তাঁর মনেই পড়ল না। চকিতে নজর পড়ল ঔর শিক্ষাগুরুর দিকে। যুক্তকরে বসে আছেন তিনি; দুটি গালে বিগলিত ধারা। তাঁর বহুদিনের মনস্কামনা আজ সিদ্ধ হতে চলেছে। রূপমঞ্জরী গঙ্গার দিকে এক পদ অগ্রসর হতেই বাবা পিছন থেকে হৈকে ওঠেন, আরে বুদ্ধ! ক্যা করতি হ্যায় রে তু? তেরা ঘোঁতি ঔর পিরান খোলকে রাখ পহিলে।

এবার কিন্তু ‘করতা’ নয় ‘করতি’! চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন বিদ্যালঙ্কার: বাবা?

কৌতুক যেন উপচে উঠছে বাবার দুচোখ থেকে। তিনি খানদানি হিন্দিতে শুনিতে দিলেন এক লবঙ্গ—ঈশ্বর জানেন, কে তাঁর রচয়িতা—তুলসীদাসজী, কবীর না ডুকীরাম। বঙ্গানুবাদে যা: ‘লজ্জা-ঘৃণা-ভয়/তিন থাকতে নয়।’

দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব সম্বিত ফিরে পান। তাঁর আর্তকণ্ঠ থেকে শুধু বার হয়ে এল একটি

ধ্বনি : ন—না !

বাবা ভূক্ষেপ করলেন না। রূপমঞ্জরীকেই হিন্দিতে বললেন, প্রকৃতি-পুরুষ ভেদাভেদ তো তুই মানিস না। এই দেখ না আমাকে। মুক্তিকামী মানুষের আবার লজ্জা কী ?

নারীর মুক্তিব্রত গ্রহণ করেছিলেন সোণাই গ্রামের সেই আদিমতমা বিদ্রোহিণী। রাজা রামমোহন রায় তখন দুই বৎসরের শিশু ! কিন্তু কী থেকে মুক্তি ? শুধুই পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ? পুরুষ প্রতিযোগীর সঙ্গে সমানতালে চতুর্পাঠী পরিচালনার অধিকার ? হ্যাঁ, সেজন্যই মস্তক মুগুন করেছেন, শিখা রেখেছেন, শাড়ি-বক্ষাবরণ পরিত্যাগ করে ধূতি-পিরানে লোকলজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। কিন্তু সেটুকুই কি ছিল ওঁর চরম লক্ষ্য ? কুস্তমেলায় সহস্র সহস্র নাগা-সন্ন্যাসীর সমতলে উঠে না আসতে পারলে কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হবে সম-অধিকারের দাবী ? নাগা-সন্ন্যাসীরা তো পারেন ! পুরুষ-প্রকৃতির ভেদাভেদ তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন ! লোকলজ্জাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নগ্ন শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চলে ন জনাকীর্ণ গঙ্গার ঘাটে—হর হর মহাদেও !

তাহলে তিনিই বা কেন পারবেন না ?

দশাশ্বমেধ ঘাটের সেই বৃদ্ধা গঙ্গাবণিক না বলেছিলেন—উপপদতৎপুরুষ ‘ব্রহ্মবাদিন’ শব্দের জ্ঞী-য়াম ঈপ্ ‘ব্রহ্মবাদিনীর’ এক্তিয়ার শুধুমাত্র ব্যাকরণের অন্দরমহলে ?

মুক্তিকামীর কি লিঙ্গভেদ থাকতে পারে ?

তৈলঙ্গস্বামী অন্তর্যামী ! চর্মচক্ষে না দেখলেও তিনি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে প্রণিধান করেছেন বিদ্যালঙ্কারের শেষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ! তাই তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন এমন একটি কঠিন পরীক্ষা !

এ পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতেই হবে !

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ধূ-ধূ বালির চড়া। জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। বহুদূরে নৌকার গলুয়ে বসে আছে নকুলেশ্বর কাহার—বিন্দুবৎ। মাঝগঙ্গায় ভাসছে কিছু নৌকা। ওদের হাতে দূরবীন নেই নিশ্চয়। থাকে থাকুক ! দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব মর্মান্তিক প্রয়োজনে দুই জানুর মধ্যে মাথা ঝুঁজে নিখর নিষ্পন্দ। তৈলঙ্গস্বামী অবশ্য তাকিয়ে আছেন। শিশুর সারল্যে মিটিমিটি হাসছেন, যেন মনে মনে বলছেন, কী ? কেমন জন্ম ?

হটী বিদ্যালঙ্কার তাতে ভূক্ষেপ করবেন না। বাবা তাকিয়ে থাকেন তোঁ থাকুন। সে তো ঐ শেয়ালগুলোও দূরে দাঁড়িয়ে ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। উনি তো ওদের দলে ! হ্যাঁ, ঐ শৃগালগুলোর সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই তৈলঙ্গস্বামীর। নারীপুরুষ ভেদাভেদ-জ্ঞানের একপারে ঐ শিবাকুল, আর-পারে উনি। কেন নয় ? ওরা সে ভেদাভেদজ্ঞানের সীমান্তে উপনীত হতে পারে না, আর উনি সে রাজ্যটা অতিক্রম করে এসেছেন—এই যা !

একমাত্র দর্শক ঐ রামলগন। বাবা কথা বলেছেন ঠেট হিন্দিতে; রামলগনের বুকে কোন অসুবিধা হয়নি। লোকটা উত্তেজনাতে দাঁড়িয়ে উঠেছে। বিস্ময়ে বিস্মারিত হয়ে গেছে তার ভাঙের নেশায় লাল চোখদুটো। না, কামনায় লালায়িত নয় তার অঁবাক চাহনি। সে চোখে শুধুই দুরন্ত বিস্ময় ! হয়তো ভাবছে—যেকথা আন্দাজ করতে পারছে না রূপমঞ্জরী : তাহলে আর কী ফারাক তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে রাজাসাহেবের ? দুজনেই তো বাধ্য করছে ঐ মেয়েটিকে

প্রকাশ্যে উলঙ্গ হতে।

কিন্তু না—রূপমঞ্জরী ভাবে—একটু আগেই ঐ লোকটা বলেছিল—পণ্ডিতমাসীজীর এইজ্ঞতির আশঙ্কায় সে মর্মান্বিত। আত্মগ্লানিতে সে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে। গঙ্গাস্পর্শ করে স্নান করার করেছে সে-কথা। ও লোকটা কি এই কটা নির্মম মুহূর্তে পিছন ফিরে দাঁড়াবে না? চোখ দুটি বন্ধ করবে না? সাধারণ সৌজন্যবোধে? সে তো রূপমঞ্জরীকে মাতৃসম্বোধন করেছে।

না! এ প্রার্থনা নিরর্থক! হট্টা বিদ্যালঙ্কার ভূক্ষেপ করবেন না। যদি তাকিয়ে থাকে তবু ওর চোখের সম্মুখেই তিনি নিরাবরণা হবেন। মহাযোগী ইদানীং কাউকে মস্তদীক্ষা দেননি, দেন না—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দীক্ষার প্রস্তুতি উত্থাপন করেছেন। বিদ্যালঙ্কারের এ এক জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি! এই দুর্লভপ্রাপ্তির মূল্য কড়াক্রান্তিতে মিটিয়ে দিতে হবে বইকি!

এ ওর গুরুদক্ষিণা!

রূপমঞ্জরী—নয় বছর বয়সে যে হতভাগিনী শুভদৃষ্টির ছাদনাতলায় তার হবু বরের দিকে অপরিসীম লজ্জায় চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পারেনি—তের বছর বয়সে দ্বিরাগমনের পূর্বেই যার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে—স্বামীকে বস্ত্রত যে কোনদিন চোখেই দেখেনি, সে শেষ সিদ্ধান্তে এল।

উর্ধ্বাঙ্গ থেকে পাক খুলে খুলে উত্তরীয়টি নামিয়ে রাখেন বালির উপর। পিরানের তলায় কোন অধোবাস নেই—ইদানীং পরিধান করেন না। এক এক করে বন্ধনমুক্ত করে দিতে থাকেন পিরানের বোতাম।

রামলগন—ভাঙের নেশায় মাতাল সেই নোকরির-খ্যাপলাজালে আবদ্ধ নিরঙ্কর লাঠিয়াল, আত্মধিকারে দক্ষ হয়ে তিজুকঠে যে নিজের পরিচয় দিয়েছিল ‘রামলগন-হারামি’ বলে—সেই লোকটা আর স্থির থাকতে পারল না। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, নেহী! নেহী! মাতাজী! রোখ্ যাইয়ে!

—আহ! তুই পিছন ফিরে দাঁড়া না বাপু!

না! কথাটা শুধু ওঁর মনের কোণে উদয় হল মাত্র। জিহ্বা উচ্চারণ করল না। শুধু রামলগনের কণ্ঠস্বরে তাঁর পুনরায় স্মরণ হল—এ কৌরবসভা দর্শকহীন নয়!

না হোক! লজ্জাহারী মধুসূদনকে স্মরণ করবেন না তিনি। শরণ নেবেন না।

‘তস্মৈ তপো দমঃ কস্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বকামানি সত্যজায়তম।’

“দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযমরূপ দম, নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম, ঋক প্রভৃতি বেদ, শিক্ষাশাস্ত্র প্রভৃতি বেদাঙ্গ”—সবই তো সেই পরমপ্রাপ্তির আশ্রয়!

দেহের এই লজ্জা, ইন্দ্রিয়ের এই গোপনতা, মনের এই সংশয়ই বড় হবে? ব্রহ্মবিদ্যালোভের চেয়েও বড়? পরমাত্মায় বিলীন হওয়ায় চেয়েও বড়?

একে একে পিরানের সব কটা বোতাম খুলে ফেলেন। যেন নারীদেহের গোপনীয়তার বন্ধন-মুক্তি ঘটছে। মাথার উপর দিয়ে পিরানটা খুলে ফেলার উপক্রম করতই আকাশ কাঁপিয়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন শিশু ভোলানাথ।

কাকের দল উঠে গেল আকাশে। শিবাকুল সচকিতে অন্তর্হিত হইল কাশঝোপের আড়ালে।

থমকে গেলেন হট্টা বিদ্যালঙ্কার। উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ করতে পারলেন না। তাকিয়ে দেখলেন

বংশাব্যাস

বাবার দিকে। ওঁর এই অহৈতুকী অটুহাস্যের অর্থটা প্রণিধান করতে।

বাবা স্নেহে তিরস্কার করেন: পাগলি কাঁহাকা!

বিদ্যালঙ্কার নির্বাক তাকিয়ে আছেন।

তৈলঙ্গস্বামী হাসতে হাসতে হিন্দিতে বললেন, জবর নাম রেখেছিল তোর বাবা—হটী! খুব বীরত্ব দেখিয়েছিস! যা! ঘর লৌট যা!

বিদ্যার্ণব এতক্ষণে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

হটী বিদ্যালঙ্কার আকুলভাবে বলে ওঠেন, দীক্ষা দেবেন না আমাকে?

—কैसे দুঁ? তুই তো এখনো দু-কুড়ি-সাতের খেলাটা সাস্ক করতে পারলি না? বেটির ঘাট পার হলে তবে তো বাপের ঘাট? না কী রে পাগলি?

—বেটির ঘাট?

—হ্যাঁ রে বেটি! সরস্বতী মাস্কী! যা ভাগ! ঘর যা।

হটী বিদ্যালঙ্কার অধোবদন হলেন।

বিদ্যার্ণব বুঝে নিয়েছেন—মহাযোগী এতক্ষণ তাঁর আদরের কন্যাটিকে পরীক্ষা করছিলেন মাত্র। তিনি নিজেও মহামহোপাধ্যায়—সাধনমার্গের রীতিনীতি তাঁর নখদর্পণে। প্রণিধান করেন—মহাসন্ন্যাসীর মতে হটী বিদ্যালঙ্কারের মানসিক প্রস্তুতিপর্বের পর্যায়টা এখনো অতিক্রান্ত হয়নি। জমি 'ভর' না হলে বীজবপন সার্থক হয় না। রূপমঞ্জরী—হটী! বিদ্রোহিণী! নিতান্ত জেদের বশে সে প্রকৃতি-পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞানের সীমারেখাটা অতিক্রম করতে চাইছিল। নারীত্বের সচেতনতা সে অস্বীকার করতে চাইছিল মনের জোরে। এভাবে হয় না। আরও, আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন। বাবা প্রতিশ্রুত—নিশ্চয় সময় হলে স্বপাদদেশে আহ্বান জানাবেন তাঁর কন্যাকে। উপযুক্ত সময়ে তার কর্ণমূলে প্রদান করবেন: বীজমন্ত্র!

কিন্তু সেসব তো আধ্যাত্মিক জগতের কথা। তার পূর্বে যে ভৌতিক জগতের এক বিরাট অন্তরায়। সেই ক্রোধান্ত পঙ্ককুণ্ড থেকে উত্তরণটা তো এখনো বাকি। তাই করজোড়ে নিবেদন করেন, বাবা! ওর বিপদের কথাটা তো...

বাক্যটা শেষ হল না। বজ্রনির্যোষে গর্জন করে ওঠেন সদাশিব: উল্লু! গিদধর! মূবু!

মহামহোপাধ্যায় নতমস্তকে স্বীকার করে নিলেন এ তিরস্কার। নীরবই রইলেন তিনি।

বাবা নিজে থেকেই বলে ওঠেন, ধুতি-পিরান পরে ও যে পুরুষ সেজেছে। ওঁরং হয়ে তাই শাঁখ বাজানো ভুলে গেছে!

শাঁখ! শঙ্খ! তার অর্থ? এ অপ্রাসঙ্গিক কথা কেন? চকিতে মনে পড়ে গেল—হ্যাঁ, ওঁর কন্যাটির হেপাজতে একটি দুর্লভ বামাবর্ত শঙ্খ আছে বটে। সেটা সে কীভাবে পেয়েছে তা জানেন না, জানতে চাননি কোনদিন। তবে হ্যাঁ, কোনদিন সেটাকে বাজাতে শোনেননি। বাবার সে কথা জানার সম্ভাবনা নেই—অবশ্য তিনি নাকি অন্তর্ধামী। হয়তো জেনেছেন। কিন্তু এ অহৈতুকী তিরস্কারের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?

চকিতে পাশ ফিরলেন। তাকিয়ে দেখলেন কন্যাটির দিকে। এ কী?

কার্যকারণসূত্র কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু লক্ষ্য হল, হটী বিদ্যালঙ্কারের দুটি আয়ত চক্ষু বিষ্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। যেন কী একটা বোধের উন্মেষ হচ্ছে তাঁর মস্তিষ্কে!

আবার তাকিয়ে দেখলেন তৈলঙ্গস্বামীর দিকে। দেখলেন, মিটিমিটি হাসছেন তিনি। সহাস্যে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন বিদ্যালঙ্কারকে: জীবাত্মাকে বন্দী করে রাখতে নেই—মুক্ত নীলাকাশের দিকে, পরমাত্মার দিকে মিলিত হবার সাধনা তার! ক্যা রে বেটি? সমঝি?—বলেই ধ্যানস্থ। সমাধি!

সাপ্তাহে লুটিয়ে পড়লেন বিদ্যালঙ্কার বালিয়াড়ির উপর। তাঁর দু-গালে তখন দরবিগলিত ধারা।



প্রত্যাবর্তনের পথে কেউ কোন কথা বলেননি। যে-যার চিন্তায় বিভোর ছিলেন। বিদ্যার্ণব যে উদ্দেশ্যে ব্যাসকালীতে ছুটে গিয়েছিলেন—মহাযোগীর অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে এই পার্থিব সঙ্কট থেকে উদ্ধারের পথ, তা পাননি; কিন্তু কী যেন একটা ব্যাপার ঘটেছে যা বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পেরেছেন। বাবার কথাগুলো যেন ছিল দ্ব্যর্থবোধক—জীবাত্মা-পরমাত্মার সদুপদেশ—তদুপরি ঐ শঙ্খটার উল্লেখ! কী যেন এক গুঢ় সংকেত ছিল সেই আপাত-অসঙ্গত কথা। সে ব্যাসকুট ভেদ করতে পারেননি; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন বিদ্যালঙ্কারের চোখে-মুখে যেন অদ্ভুত একটা দীপ্তি। শুধু দীপ্তি নয়। তৃপ্তি। কেন?

তিনজন যখন গুরুকুল চতুষ্পাঠীতে ফিরে এলেন বেলা তখন দ্বিপ্রহর। আশ্রমকুঞ্জে রমারঞ্জন বিদ্যার্থীদের নিয়ে অধ্যাপনরত। সে এ সময় তার গুরুদেবের মত আশ্রম-সমাহিত হতে পারে না। ত্রিমূর্তিকে উদ্যানের ফটক অতিক্রম করতে দেখে সে যেন ভূত দেখল!

এতক্ষণ সে মনশ্চক্ষে দেখছিল ষ্ঠ গুরুদেব তার সহাধ্যায়িনীর হাতখানি ধরে বাদশাহী সড়ক বেয়ে এগিয়ে চলেছেন পূবমুখো। কথা ছিল ঠাঁর সড়ক ধরে যাবেন না, পারতপক্ষে বাদশাহী সড়কের সমান্তরাল মেঠো পথে এগিয়ে যাবেন—পৌছাবেন সাসারাম। সেই যেখানে আছে বাদশাহ শের শাহর মক্বারা। সেখানে থেকে রোহিতাশ্ব দুর্গ এক দিনের পথ। এই তিনটি দিন যদি সংবাদটা গোপন রাখা যায় তাহলেই কার্যসিদ্ধি। রোহিতাশ্ব দুর্গে ঠাঁর আশ্রয় পেলে আর ভয় নেই। শুধু দেখতে হবে এই তিনদিনের ভিতর রাজাসাহেবের অশ্বারোহী গুপ্তচর আর কোতোয়াল যেন পলাতকদের নাগাল না পায়।

কিন্তু এ কী! যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই যে ঠাঁর ধরা পড়ে গেছেন! না হলে মূর্তিমান সন্ন্যাসীদের মতো রামলগন কেন ঠাঁদের দুজনকে নিরাপদে বাড়িতে পৌছে দিচ্ছে!

অর্গলবদ্ধ গৃহের নির্জনতায় দ্বারকেশ্বর ডাকলেন, মা! কাছে আয়। তুই কিছু বুঝতে পারলি!

রূপমঞ্জরী তার পোষা পাখিদের আহ্ব্য বিতরণ করছিল। কাছের ঘনি়ে এসে বললে, পেরেছি, বাবা!

কান্দো

—আমারও তাই মনে হল। বাবার কথার মধ্যে স্পষ্টতই কিছু একটা গুঢ় ইঙ্গিত ছিল। তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।

—সেটাই যে স্বাভাবিক, বাবা। কান্দোতে এসে আমি আমার পূর্বজীবনের কথা এ পাঁচ বছরে কাউকে যে বলিনি। আপনিও কোনদিন জানতে চাননি...

—আজ বলবি?

—বলব। কিন্তু তার পূর্বে আমার কৌতূহলটা চরিতার্থ করুন। আপনি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে স্বীকৃত হননি। বলেছিলেন, আপনি দীক্ষিত সন্ন্যাসী নন, এটাই বাধা। ঐ সঙ্গে আরও বলেছিলেন, মনে মনে আপনি আমার মন্ত্রগুরুকে নির্বাচন করে রেখেছেন...

—না, মা! নির্বাচন করার কী অধিকার আমার? উনি নিতান্ত খেয়ালী মানুষ। ইদানীং কাউকে দীক্ষা দেননি এটুকু জানি। তবে শিশু ভোলানাথ তো! আমার মনের ইচ্ছাটা নিজে থেকেই পূর্ণ করতে চাইলেন।

—কিন্তু মাঝপথে থেমেও গেলেন। আপনি কি মনে করেন সবটাই ঠর শিশুসুলভ চপলতা?

—না, নিশ্চয় নয়। সময় হলেই তিনি তোকে স্বপ্নাদেশে আহ্বান জানাবেন। মন্ত্রদীক্ষা নিতে ডাকবেন।

—কিন্তু আজই কেন তা দিলেন না? কর্ণমূলে বীজমন্ত্র? তিনি তো নিজে থেকেই বলেছিলেন, ‘গঙ্গান্নান করে আয়।’

—সচল বিশ্বনাথের লীলা-খেলা অচল বিশ্বনাথের মতোই দুর্বোধ্য। ঠর সব কথা, সব আচরণ আমরা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি মতে বুঝতে পারি না। তোকে তো স্পষ্টই বললেন—সারস্বত সাধনাতেই আরও অগ্রসর হতে হবে। তাই বললেন না? বাপের ঘাটে পাড়ি জমাবার আগে বেটির ঘাট পার হয়ে আয়?

বিদ্যালঙ্কার কোন কথা বললেন না। তিনি গভীরভাবে কী-যেন ভাবছেন।

—কী ভাবছিস রে মা?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিদ্যালঙ্কারের। বললেন আপনার কাছে কিছু স্বীকারোক্তি করার আছে, বাবা। আমি সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি।

ভ্রুকৃষ্ণন হল বিদ্যালঙ্কারের। বললেন, পাপের স্বীকৃতি?

—পাপ? না, পাপ নয়! আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন জড়িত নয়, ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত কর্মে পাপ কেন হবে? তবে সজ্ঞানে ‘তথাকথিত’ মিথ্যার আশ্রয়। আমার আশঙ্কা সেই অপরাধেই বাবা আমাকে মন্ত্র দিলেন না। আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলেন উদ্দেশ্য যদি ‘শুভ’ হয়, তাহলে অসত্যের পথে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অন্যায়, অপরাধ, পাপ?

দ্বারকেশ্বর প্রশান্ত হাসলেন। বললেন, প্রশ্নটাই অবৈধ মা। সত্য-শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর সম্পৃক্ত! অসত্যের পথে ‘শিব’-এ উপনীত হওয়া যায় না, অপিচ ‘সত্য’ের পথে কখনো অশিবে সমাপ্ত হয় না। এ সংশয় তোর মনে কেন জাগল রে, বেটি?

—সেদিন ‘কুরুক্ষেত্র তালো’-এর বিচার সভায় আমি সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। আমার নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে।

—‘কুরুক্ষেত্র তালো’-এর বিচার সভায়? কই? না! আমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলাম। একবার মাত্র কিছু অসংযম লক্ষ্য হয়েছিল আমার, কিন্তু পরমুহূর্তেই তুই নিজেকে সংযত করেছিলি। সেই যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুক প্রসঙ্গে। সে কথাই কি বলছিস?

—সে কথাই বলছি, বাবা। কিন্তু আপনি যে অর্থে গ্রহণ করছেন সে-অর্থে নয়। ঐ মুহূর্ত থেকেই আমি মিথ্যাচারী হয়েছিলাম।

—না! অসংযত মুহূর্তে তুই বলে ফেলেছিলি—‘শম্বুক উপাখ্যানে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের পৃথ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন’—কিন্তু পরমুহূর্তেই তুই নিজেকে সংশোধন করেছিলি।

—ঐ যেটাকে আপনি সংশোধন বলছেন, সেটাই আমার মিথ্যাভাষণ। উক্তিটা প্রত্যাহার করাই আমার অনায়াস, অসত্যাচরণ! আমার মূল লক্ষ্যটি ছিল শুভ—আমার মতো কোনও হতভাগিনী যদি ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে চায়, তাহলে সে যেন আমার মতো বাধার সম্মুখীন না হয়—এটাই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। বলুন—সেটা কি শুভপ্রচেষ্টা নয়?

বিদ্যার্নব নতনেত্রে কী যেন চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ প্রতিপ্রশ্ন করেন, ও কথা থাক! তার পূর্বে আমাকে বল—ঐ কথটা কেন বলি? শম্বুক উপাখ্যান প্রসঙ্গে। শ্রীরামচন্দ্র যদিও দ্বন্দ্বরের অবতার তবু তিনি নরদেহধারীরূপে যখন অবতীর্ণ তখন তাঁকে দেশকালের বিধান মেনে চলতে হবে না? শ্রীচৈতন্যদের যেভাবে যখন হরিদাসকে কোল দিয়েছিলেন সেটা ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

বিদ্যালঙ্কার বলেন, দেশকালের বিধান যে নতমস্তকে সর্বত্র মেনে চলে সে কথাসাহিত্য বা কাব্যের অন্যতম চরিত্র, মহাকাব্যের নায়কের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা তিনি দেশকালের উর্ধ্বে উঠবেন। তা সে যাই হোক, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র মহাকাব্যের নায়িকার প্রতি যে ব্যবহার করলেন তাতে তো তিনি দেশকালের বিধান মেনেও নায়কোচিত পরিচয় রাখতে পারেননি! সেটাকে কীভাবে সমর্থন করবেন?

—কিসের কথা বলছিস তুই?

—সীতাদেবী মহাকাব্যের সার্থক নায়িকা। তাঁর মন্ত্র “ইহ প্রেতা চ নারীগাং পতিরেকো গতিঃ সদা।”^১

দশানন তার বৈভবে, পরাক্রমে, ত্রিভুবনজয়ী রাজসিক আড়ম্বরে যখন বন্দিনী সীতার হৃদয় জয় করতে চাইছে তখন পতিব্রতা অপরিসীম দাটো তিরস্কার করে বলছেন:

“যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে...”

যদন্তরং কাঞ্চনসীসলোহয়োঃ...

যদন্তরং বায়সবৈনতয়য়োঃ...”^২

কতখানি মনোবল থাকলে, পতিব্রতের অহঙ্কার কী পরিমাণ অভ্যংগলী হলে, এ-কথা

^১ ইহজগতে বা পরলোকে সর্বদা পতিই হচ্ছে নারীর একমাত্র গতি (রা. ২/২৫/৩)।

^২ অরণ্যমাধ্যে সিংহ ও শৃগালের যে পার্থক্য, সুবর্ণের সঙ্গে সীসা-লৌহের যে পার্থক্য, মহাগুরুড়ের সঙ্গে কাকের যে পার্থক্য তোমার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের সেটাই পার্থক্য [রা. ৩/৪৭/৪৫-৪৭]।

কান্দো

একটি বন্দিনী তার অপহারককে বলতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। রাবণ ত্রিভুবন জয় করেছে, কিন্তু সীতার হৃদয় জয় করতে পারল না। সতীর দেহ স্পর্শ করতেও সাহসী হল না। এবার চিন্তা করে দেখুন, বাবা, রাবণ-নিধনের পরে সেই পাতিব্রতের মূর্ত প্রতীক সীতাকে প্রথম দর্শনে মহাকাব্যের নায়ক কী সম্ভাষণ করলেন—

“...ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ।

প্রখ্যাতস্যাশ্ববংশস্য ন্যঙ্গঃ পরিমার্জতা।।”

কী নিষ্ঠুর মিলন-সম্ভাষণ। কথাটা যদি সত্যই মনে হয়ে থাকে, তাহলেও দীর্ঘ বিরহের পর প্রথম সম্ভাষণেই কি তা উচ্চারণ? ‘মা ব্রূহৎ সত্যমপ্রিয়ম’ নীতি-বাক্যটাও কি জানা ছিল না শ্রীরামচন্দ্রের?

বিদ্যার্ণব ক্ষুব্ধ হন। বলেন, প্রজ্ঞানুরঞ্জন রাম যে নিরুপায় ছিলেন, মা!

—না বাবা! তা বললে মানব কেন! দীর্ঘ বিরহের পর এটা সীতা ও রামের প্রথম সাক্ষাৎ। প্রজ্ঞা তখনো কিছু বলেনি। বাল্মীকি-রামায়ণের বর্ণনায়।

—কিন্তু তিনি তো অস্ত্রযামী, জানতেন এ আপত্তি উঠবেই। সীতাদেবী দীর্ঘ দিন রাবণের অবরোধে বন্দিনী ছিলেন। তাঁকে পুনরায় রাজমহিষী করা চলে না। তাতে রঘুবংশের অপবাদ। বাল্মীকি-সৃষ্ট মহানায়ক তা কীভাবে মেনে নেবেন?

—উত্তরে তিনটি কথা বলব, বাবা। প্রথম কথা: রাজসিংহাসনের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের অচ্ছেদ্যবন্ধন ছিল না, যেমন ছিল সীতার সঙ্গে। তিনি অযোধ্যার সিংহাসনলাভের মোহ ত্যাগ করতে পারলে ভরত তা সুশাসনে রাখতেন। দ্বিতীয় কথা: রঘুবংশের অপবাদের প্রশ্নটা গ্রাহ্য নয়, বাল্মীকি রচিত পরবর্তী শ্লোকে। রামচন্দ্র ধর্মপত্নীকে অনায়াসে বলতে পারলেন, “লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম।”^১ রাবণের অবরোধে বন্দিনী থাকার অপরাধে যদি সীতা বর্জনীয় হন, তাহলে ভরতকে বা লক্ষ্মণকে—যে লক্ষ্মণ দ্বাদশ বৎসরকাল সীতার চরণ ভিন্ন মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি—তাদের স্বন্ধে সীতাকে অধিষ্ঠিত করতে চাইছেন কেন? তৃতীয় কথা: লোকাচার—যে যুক্তি আপনিই দেখিয়েছেন। সমকালীন লোকাচার—বশিষ্ঠের নির্দেশ—বলাৎকৃত্য নারী প্রায়শ্চিত্তে শুচি হন। সে-কথা জানা ছিল বলেই রামচন্দ্র সীতাকে বলেছিলেন—লক্ষ্মণকে বিবাহ করতে! তাই শুধু শব্দক উপাখ্যান, বা বালীবধের জন্যই নয়, রামচন্দ্রকে মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক বলে স্বীকার করতে পারি না।

বিদ্যার্ণব নিরতিশয় আহত হলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি মহাকাব্যের নায়ক রূপে চিহ্নিত করতেন না, শ্রীজয়দেবের নির্দেশে দশাবতারের অন্যতম অবতার বলেই পূজা করতেন। তবু আদরিণী কন্যার এ চপলতা ক্ষমা করে বলেন, ঠিক আছে মা, ও আলোচনা থাক বরং! বল ‘কুরুক্ষেত্র তালো’-এর বিচারসভায় কোন জাতের মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলি?

—যা আমি বিশ্বাস করি না, তাই বলেছি। যা বিশ্বাস করি, তা বলিনি। কারণ বিচারকমণ্ডলী তা গ্রহণ করতেন না। আমি লক্ষ্যে উপনীত হতে পারতাম না—পরাজিত হতাম!

^১ ভেব না, তোমাকে উদ্ধার করতে আমি এ যুদ্ধজয় করেছি। বাস্তবে নিজের বিখ্যাত বংশের কলঙ্কমোচনের জন্যই আমাকে এ যুদ্ধজয় করতে হয়েছে [রা. ৬/১১৫/১৫-১৬]।

^২ লক্ষ্মণ বা ভরত যাতে তোমার সুখ হয়, তাকেই পতি হিসাবে বরণ কর [রা. ৬/১১৫/২২]।

—কী তুই বিশ্বাস করিস? আর কী বিশ্বাস করিস না?

—আমি বিশ্বাস করি না সেই সব দেবনাগরী হরফে লেখা তথাকথিত শাস্ত্র-বাক্য, যা আমার বিবেক-নির্দেশের পরিপন্থী। আর বিশ্বাস করি সেই মহামানবের অন্তিম উপদেশ: 'আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব, অনন্যশরণো ভব'।

দ্বারকেশ্বর বললেন, শাক্যসিংহ শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতার। ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন দশাবতার-স্তোত্রে। শ্রীজয়দেবও তা করেছেন।

—কিন্তু কবি জয়দেব ওটা খুশি মনে করেননি বাবা। না হলে 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেঃ' লিখেই কেন আত্ননাদ করে উঠবেন? 'অহহ!'

—'অহহ' আত্ননাদ পরবর্তী পংক্তির শেষ শব্দটির উদ্দেশ্যে।^২

—সম্ভবত তা নয়, বাবা। বৌদ্ধধর্মকে নিঃশেষিত করে, ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে আচার্য শঙ্কর গৌতম বুদ্ধকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন অন্য হেতুতে। কারণ তিনি জানতেন যে, ভারতবর্ষকে যদি আত্মদীপের আলোয় পথ চলতে দেওয়া হয় তাহলে তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

—কী পরিকল্পনা? উত্তর-মীমাংসা সম্ভূত অদ্বৈতবেদান্ত মত?

—আজ্ঞে না। তাঁর চার মঠের চার নবীন দেবতা! তাঁর দশনামী সম্প্রদায়। তাঁর একদেশদর্শী দর্শন।

—'একদেশদর্শী দর্শন'! আদি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের?

—হ্যাঁ, বাবা। তাই বলেছি আমি। আমাকে বিস্তারিত বলতে দিন। বলুন, কোথায় আমার সমীক্ষার ভাঙি।

দীর্ঘ বিশ্লেষণ করলেন হুঁচকি বিদ্যালঙ্কার। এসব কথা কোনদিন বলেননি গুরুদেবকে। আজ কী-জানি-কী-করে রুদ্ধদ্বারটি উন্মোচিত হয়ে গেল। উত্তেজনা হয়তো খেয়াল করেননি পিতৃদেবের সঙ্গে গুরুদেবের শিক্ষায় একটা মৌল পার্থক্য আছে। যা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রকাশ হলে যে কী জাতের সর্বনাশ হবে বোধ করি তা প্রাধান্য করেননি।

মগ্নচৈতন্য অবস্থায় তিনি যেন স্বগতোক্তি করে চলেছেন—আত্মদীপের আলোকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে ক্রমাবনতি উপলব্ধি করেছেন তারই এক দীর্ঘ বিশ্লেষণ। নারীত্বের অবমানতা দেখে এককালে তাঁর পিতৃদেব, পরে তিনি নিজে, যেভাবে নিপীড়িত হয়েছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন:

উপনিষদের যুগে জ্ঞানপিপাসাই ছিল ঋষিদের একমাত্র প্রেরণা। ঐহিক বিপদ থেকে পরিত্রাণের কথা তাঁরা চিন্তা করেননি; বৈয়য়িক উন্নতিবিধানে রচনা করেননি কোন মন্ত্র। তাঁদের তখন স্থিরলক্ষ্য—অন্ধকার থেকে আলোকে পদার্পণ, মৃত্যু থেকে অমৃত্যু উত্তরণ।^১ বিশ্বজ্ঞ

^১ "নিজেকে প্রদীপশিখা করে তোলে। সেই বিবেকদীপের আলোয় নিজের পথ ঝুঁজে নিও। উপরের শরণ নিও না"—মৃত্যুশয্যায় শায়িত গৌতমবুদ্ধ শিষ্য আনন্দকে একথা বলেছিলেন। আনন্দ যখন প্রস্থ করেছিলেন, 'আপনার মহাপরিনির্বাণের পর আমরা কার কাছে যাব পথের সন্ধান জানতে?' তখন এই তাঁর শেষ বাণী।

^২ সুপরিচিত পংক্তিটি "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহঃ শ্রুতিজাতম্/সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্॥"

জ্ঞানপিপাসাই একমাত্র লক্ষ্য—জানতে হবে সেই অবাঞ্ছমানসগোচরকে। প্রশ্নধান করতে হবে কোন উদ্দেশ্যে সেই ‘একবর্ণা’ ‘বহুধা’ হয়েছেন। ক্রমে উপনিষদের ঋষি উপনীত হলেন সেই সত্যে : এ শুধু অহৈতুকী আনন্দের এক উচ্ছ্বাস ! ব্রহ্মের উদ্দেশ্য-কারণত্ব হল : রসের আশ্বাদন ! ‘রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবাযং লক্কানন্দী ভবতি’।” এই আনন্দতত্ত্বকে উপলব্ধি করে উপনিষদের ঋষি অমৃতের পুত্রগণকে সন্বেদন করে বলেছেন : “তোমরা শোন ! সেই আদিত্যবর্ণের ওপারের তত্ত্ব আমি জেনেছি।” বললেন : “আনন্দাচ্ছ্যেব খন্নিমানি ভূতানি জায়ন্তে।”^২

এই নিত্যসত্য যেদিন জ্ঞানের আলোকে উপলব্ধি করলেন সেদিন উপনিষদের ঋষি প্রকৃতি-পুরুষের ভেদাভেদকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন। নারী সেই অমৃতময়ী যুগে নরকের দ্বার ছিল না, ছিল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী—পরিপূরক। ব্রহ্মবাদীর পাশাপাশি ঠাই পেয়েছিলেন ব্রহ্মবাদিনীর দল। যাজ্ঞবল্ক্যের পাজর ঘেষে মৈত্রেয়ী !

তারপরেই এল ষড়দর্শনের যুগ।

হারিয়ে গেল উপনিষদের সেই অমৃতময়ী মন্ত্রটি—‘আনন্দ’ই আছে, আর কিছু নাই ! এল নূতন চিন্তাধারা—মনুষ্যজীবন ঐকান্তিকভাবে ‘দুঃখময়’। কর্মফলবন্ধনের সূত্রে আবদ্ধ মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই দুঃখময় জীবনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। পুরুষার্থ হল—ঐ দুঃখ থেকে উত্তরণ। কী ভাবে ? ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধনমার্গে।

দ্বারকেশ্বর প্রশ্ন করেন, সেটাই কি পুরুষার্থ নয় ?

হাসলেন বিদ্যালঙ্কার ! বললেন, সেটাই আমার প্রথম প্রশ্ন বাবা—ঐ শব্দটা : ‘পুরুষার্থ’ ! লিঙ্গে কিছু ভুল হল না কি ? মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী, মদালসার লক্ষ্য কী ছিল ? পুরুষার্থ না ‘প্রকৃত্যর্থ’ ? ঐ শেবোক্ত শব্দটার স্বীকৃতি ব্রাহ্মণ্য দর্শনে নাই ! শব্দটা অজ্ঞাত ! কিন্তু ‘পুরুষার্থের’ পরিবর্তে ষড়দর্শন কি ‘মনুষ্যার্থ’ শব্দটা ব্যবহার করতে পারত না ? না, সেই ষড়দর্শনের যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এসে গেল পুরুষের কজায় ! এর পর ‘পুরাণ’ আর ‘সংহিতার’ যুগ। আরও কোণঠাসা হয়ে গেল নারীজাতি। ষড়দর্শনের যুগে নারী-পুরুষের ভেদাভেদটা তত প্রকট নয়। তখন শুধু তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। সাংখ্য আর যোগদর্শন প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের উদগাতা। তাতে নারীকে নরকের দ্বার বলা হয়নি। ন্যায় ও বৈশেষিকের অন্য জাতের চিন্তা : কেন বলা হল ব্যক্তি-আত্মা আর জড়-জগৎ উভয়েই মৌলিক সত্তা। পূর্ব-মীমাংসা বৈদিক কর্মকাণ্ডের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। উত্তর-মীমাংসা জন্ম দিল এমন এক মতবাদ যা সাধারণ নরনারীর নাগালের বাহিরে : অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন।

কিন্তু ঠিক তার পরের ধাপে এসে উপনীত হলেন ষড়দর্শনের ভাষ্যকারের দল। উপনিষদ বলেছিলেন : সৃষ্টির মূলে আছে : ‘আনন্দ’ ! ষড়দর্শন বলেছিলেন, না ! সৃষ্টির মূলে আছে কর্মফলবন্ধনের ‘দুঃখ’ ! এ সব তাত্ত্বিক কচকচি। হিন্দু ভারতের সমাজে এর কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এবার যারা এসে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির হাল ধরলেন, তাঁরা তাত্ত্বিক কচকচিতেই তাঁদের কর্মকাণ্ড সীমিত করলেন না। দিতে শুরু করলেন সামাজিক বিধান : কর্তব্য আর

^১ রসেই তিনি আছেন। ‘রস’-এই তিনি আনন্দ লাভ করেন।

^২ আনন্দের উৎসমুখে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি।

অকর্তব্যের তালিকা। স্বর্গ লাভের সরল প্রকরণ আর নরকবাসের শাস্তি। যদিচ ‘নরক’ শব্দটা বা ঐ ধারণাটা বেদ-এ কুত্রাপি নাই! এল নানান ‘পুরাণ’ আর ‘সংহিতা’। এই চিন্তাধারার প্রভূত প্রভাব পড়ল সাধারণ নরনারীর উপর। শুরু হল, দ্বিসহস্রবর্ষব্যাপী ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অবক্ষয়।

স্থির হল—ধর্ম শুধুমাত্র থাকবে পুরুষের কজায়।

—নারীর নয়—নারী হচ্ছে: নরকের দ্বার!

আশ্চর্য! পরম আশ্চর্য! এই আকাশজোড়া মিথ্যাটাকে সমগ্র ভারতবর্ষ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল! এমনকি, স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্য! তাতেই তাঁকে বলেছি একদেশদর্শী!

দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণব ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত। তবু তাঁর নাসারক্ত স্কুরিত হয়ে উঠল। বললেন, শব্দটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলে বিদ্যালঙ্কার—কিন্তু কোন উদাহরণ দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করনি এখনো।

মা নয়, বিদ্যালঙ্কার! সেটা খেয়াল করেছেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু প্রত্যুত্তরের সময় তাঁর সম্বোধনটাও পরিবর্তিত হয়ে গেল। বললেন, গুরুদেব! আচার্য শঙ্কর সারাজীবন শুধু পুরুষকেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। গৃহী পুরুষ, সন্ন্যাসী পুরুষ। হেতু?

নারী হচ্ছে নরকের দ্বার!

‘কা তব কাষ্ঠা কস্তে পুত্রঃ’-র পরিপূরক ‘কা তব ভর্তা’র কথা বলতে তাই তিনি ভুলেছেন। ভর্তাই যে নারীর শেষ ‘মোক্ষ’! তাই তাঁর অনুশাসনে নারী হয় উপেক্ষিত, নয় নিগৃহীত! জ্যোষীমঠ-সংক্রান্ত তাঁর ‘মঠানুশাসন অনুষ্ঠায় লক্ষ্য করে দেখুন, গুরুদেব, তিনি ভবিষ্যৎ শঙ্করাচার্যদের—তাঁর চারধামের মঠাধীশদের বলেছেন ‘শুচিতায়ুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র বিশারদ’ হতে হবে। বেশ কথা! কিন্তু তাঁরা এ ধরাধামে আবির্ভূত হবেন কোন অলৌকিক প্রক্রিয়ায়? তা তো বলে গেলেন না? ঐ ভবিষ্যৎ-শঙ্করাচার্যের পিতৃদেবেরা যদি ‘নরকের’ দ্বারস্থ না হয়—যে ‘নরক’ শব্দটাই বেদ-এ অনুক্ত—তাহলে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে তাঁর চতুর্ধামের ধর্মপ্রচারের আয়োজন? আপনি আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন গুরুদেব—কোথায় আমার ভ্রান্তি। এটা কি একদেশদর্শিতা নয়?

দ্বারকেশ্বর নিরুত্তর। মেদিনীনিবন্ধদৃষ্টিতে চিন্তামগ্ন।

ক্ষুদ্র কণ্ঠে হট্টা বিদ্যালঙ্কার বলে ওঠেন, অথচ আপনারা বলেন—আদি শঙ্করাচার্য পূর্ণ ভগবান। গৌতম বুদ্ধ নবম অবতারমাত্র। তুলনা করে দেখুন—শাক্যসিংহ পরমপুরুষ, কিন্তু প্রকৃতির ঋণ তিনি কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করে দিয়ে এসেছেন রাহুলমাতার মাতৃত্বধর্মকে সার্থক করে! তাঁর সন্ন্যাসজীবনও ছিল স্ত্রী-সংসর্গবর্জিত। কিন্তু তার হেতু এ নয় যে, নারী নরকের দ্বার! তিনি জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু ‘ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ’—নারীত্বের অবমাননাকর এই নির্দেশ তিনি মানতেন না। সন্ন্যাস জীবনে তিনি তাঁর গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে মুখোমুখি বসে সন্ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, প্রিয়শিষ্য ‘যশ’-এর সহধর্মিণীকে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। কী অপরিণীম মহিমা তাঁর! বৈশালীরাজ ও নগর শ্রেষ্ঠীদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে বারবনিতা আসপালীকে বলেছেন, ‘তোমার স্বর্গভোগে একরাত্রের জন্য আমায় আশ্রয় দেবে, মা?’ আসপালীর পতিতালয়ে নিব্বির্ধায় রাত্রিযাপন করেছেন মহাকাব্যিক। শেষ জীবনে সন্ন্যাসিনীদের পৃথক সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠার অনুমতিও দিয়েছিলেন। তাই ‘খেরগাথার’

তখনই হরিদ্বারে এই অমৃতকুণ্ডযোগ।

বোধকরি প্রিয়শিষ্যার কণ্ঠে উচ্চারিত ঐ ঘৃণিত বাক্যটি শ্রবণের পাপ—যা নাকি গোহত্যা-ব্রহ্মহত্যার সমতুল্য—তা থেকে স্থালনের এ ছাড়া গত্যন্তর নাই!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিদ্যালঙ্কারের। হাত দুটি জোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন।

এই ভাল হল! এই ভাল হল!

অপাপবিদ্ধ ঐ মহাজ্ঞানীটি মুক্তি পেয়েছেন। এক পক্ষকালের মধ্যেই অনিবার্যভাবে নেমে আসবে প্রলয়। এই পবিত্র গুরুকুল-মহাবিদ্যালয়ের একটি বিদ্যার্থীকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে; পৈশাচিক উল্লাসে এ আশ্রমের উপর নিক্ষেপ করবে পৃতিগন্ধময় ক্রেদান্ত পুরীষ! উপায় নেই! সে মহামৃত্যু সহ্য করতে হবে হট্টা বিদ্যালঙ্কারকে! কাশীধামের সমগ্র পণ্ডিত সমাজ নতমস্তকে সহ্য করতে বাধ্য হবে এই নারকীয় অত্যাচার!

ঈশ্বর করুণাময়! তখন দ্বারকেশ্বর গঙ্গাদ্বারে অমৃতকুণ্ডযোগে স্নানরত।

রমারঞ্জন ইতস্তত করল না। জানতে চাইল, দিদি! এ কথা কি সত্য যে, আপনি গুরুদেবকে বলেছেন বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে আপনার সংশয় আছে?

বিদ্যালঙ্কার স্নান হেসে জবাবে বললেন, না ভাই, সে-কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম—বৈদিক অনুশাসনের যে রূপ আমরা আজ দেখতে পাই তার অভ্রান্ততা নিজ-নিজ বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে।

—কেন? এ সংশয় কেন জাগল আপনার অন্তরে? বেদ যে অভ্রান্ত—এ তো স্বতঃসিদ্ধ!

—জবাব দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমার একটি প্রতিপ্রশ্নের জবাব দাও তো ভাই—তোমার- আমার গুরুদেব সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ করেন না, এটা তোমার কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধান্ত?

—নিশ্চয়! তিনি কখনো অনৃতভাষণ করেন না। কিন্তু সে-কথা কেন?

—এবার আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি, তা সত্ত্বেও তুমি কেন আমার কাছে ঐ প্রশ্নটা করলে?

রমারঞ্জন এত দুঃখেও হেসে ফেলে। বলে, দুটি স্বতঃসিদ্ধান্তের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল যে, দিদি! আপনি বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন—এই তথ্যটাও যে মেনে নিতে পারছিলাম না।

—তবেই দেখ! প্রতিমুহূর্তে আমরা আমাদের পূর্বকৃত ধ্যানধারণার সত্যতা যাচাই করতে চাই। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় বিচার করে দেখতে চাই। তারপর বিবেকের নির্দেশে সিদ্ধান্তে আসি। ধর্মের পথ যে ‘ক্ষুরস্য ধারা’! আত্মদীপের আলোক ব্যতিরেকে প্রতিটি পদক্ষেপে পদচ্যুতির আশঙ্কা। তুমি যে প্রশ্নটা করেছ তারও ঐ একই উত্তর। ভেবে দেখ, বেদ-এর মন্ত্রগুলি আমরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি। তার যে লিখিত রূপ দেখছি তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে অযুত-নিযুত অনুকারকের হস্তাক্ষর। তারা মহাপণ্ডিত, কিন্তু অপৌরুষেয় নন, তাঁরা মরমানব। অনুকারণের সময় তালপাতার পৃষ্ঠে ভুলত্রুটি এসে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত অনেক বৈদিক শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পরবর্তীকালের

ভাষ্যকারেরা—এমনকি আদি শঙ্করাচার্য তার যে অর্থ বলেছেন তা স্বীকার করার পূর্বে যাচাই করতে হবে না? ধর একটি বাঙলা শব্দ: ‘অপর্যাপ্ত’। বৈয়াকরণিক হয়তো বললেন তার অর্থ ‘যা পর্যাপ্ত নয়’! অথচ ঠিক বিপরীত অর্থবোধকভাবে কি শব্দটির প্রয়োগ হয় না? অর্থাৎ যা ‘পর্যাপ্তের অতিরিক্ত’! কোন অর্থটা গ্রহণ করব? কে বলবে? তোমার-আমার বিবেক ভিন্ন? ‘বেদ অভ্রান্ত’ কি না এই প্রশ্নের সঙ্গে যে ঐ প্রশ্নটিও সম্পৃক্ত—বেদ-এর কোন পাঠ, কোন ব্যাখ্যা, কোন ভাষ্য?

রমারঞ্জন সন্ধেদে বললে, গুরুদেব বোধহয় এসব কথা আপনার সঙ্গে আলোচনাই করেননি, তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই। আমরা সচরাচর সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হই। আমার মুখে ঐ কথাটা শ্রবণমাত্র তিনি এতদূর মর্মাহত হয়ে পড়লেন যে, তীর্থযাত্রার পূর্বে আমার প্রণামটাও নিয়ে গেলেন না। দুর্ভাগ্য আমার!

রমারঞ্জন প্রশ্ন করে, আপনি কি গুরুদেবকে এ-কথাও বলেছিলেন যে, হিন্দুধর্মে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি?

আবার হাসলেন বিদ্যালঙ্কার। বললেন, এই দেখ, কীভাবে শ্রুতিনির্ভর তথ্য বিকৃত হয়ে যায়! একটি রাত মাত্র কেটেছে, অথচ এর ভিতরেই আমার বক্তৃতাটা বিকৃত হয়ে গেছে! আমি ওকথা আদৌ বলিনি। বলেছি, উপনিষদ-উত্তর পুরাণ ও সংহিতার যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে নারীর মর্যাদা ক্রমাবক্ষয়ের পথে চলেছে। গৌতম বুদ্ধ—যিনি হিন্দুধর্মের একজন মহাপুরুষ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের নয়—তিনি কীভাবে বারবনিতা মাতা আশ্রপালীর মর্যাদা মিটিয়ে দিয়েছিলেন সে-কথাও আমি সবিস্তারে বলেছিলাম।

—কিন্তু আপনার কি মনে পড়ে না মহাভারতের সেই খণ্ড-কাহিনীটি? গৃহস্থবধূর কাছে একজন তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীর অপদস্থ হওয়ার কথা?

—নারীর কাছে পুরুষের পরাজয়? কোন খণ্ডকাহিনীটির উল্লেখ করছ তুমি?

রমারঞ্জন কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে থাকে। একটু পরেই সে-কথা স্মরণ হল হীটা বিদ্যালঙ্কারের। কিন্তু তিনি রমারঞ্জনের উচ্ছ্বাসকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন না। মহাভারতের সেই খণ্ড-কাহিনীটি এই রকম:

একজন সন্ন্যাসী দীর্ঘদিন এক নির্জন অরণ্যে তপস্যায় নিরত ছিলেন। তারপর একদিন একটি কৌশলবকের উপদ্রবে হঠাৎ তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল। ঠাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়বার সময় পাখিটি পুরীষত্যাগ করে এবং ঘটনাচক্রে তা পতিত হয় ধ্যানরত সন্ন্যাসীর মস্তকে। সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে উর্ধ্বে দৃকপাত করা-মাত্র পাখিটি ভস্ম হয়ে গেল। সন্ন্যাসী প্রণিধান করলেন—তিনি অলৌকিক বিভূতি লাভ করেছেন। অর্থাৎ কেউ তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করলে দৃকপাতে তাকে ভস্ম করে দেবার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন! ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে এক গৃহস্থ বীড়িতে যখন তিনি ভিক্ষা চেয়েছেন তখন গৃহস্থামিনীর আসতে কিছু দেরী হয়েছিল। ক্ষুব্ধ সন্ন্যাসী সেই মহিলাটিকে বললেন, কী এমন রাজকার্য করছিলে যে, সন্ন্যাসীকে রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে অপেক্ষা করতে হয়?

গৃহিণী শান্তস্বরে বললেন, রাজকার্য নয়, বাবা, আমি স্বামী-পুত্রকে আহার্য পরিবেশন

করছিলাম।

সন্ন্যাসী বলেন, এতদূর স্পর্ধা তোমার! অভুক্ত সন্ন্যাসীর চেয়ে স্বামীপুত্রই বড় হল? গৃহস্থ বধুটি শান্তস্বরে জবাব দিলেন, সন্ন্যাসীঠাকুর! আপনি আমার দিকে ওভাবে তাকাবেন না। আমি ক্রোধবক নই! ভিক্ষা গ্রহণ করে নিজ পথে গমন করুন। আমার সংসারের অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।

কাহিনীটি জানা ছিল। তবু ধৈর্য ধরে সবটা শুনলেন। তারপর বললেন, এই খণ্ডকাহিনীটি কিন্তু আমার যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করছে। অর্থাৎ মহিলাটির মুক্তি—স্বামীপুত্রের সেবার মাধ্যমেই। সে যেন ঐ বেয়াড়া প্রপীড়া পেশ না করে বসে: ‘যেনাহম্ নাম্তাস্যাম তেনাহম্ কিম কুর্যাম?’ কিন্তু ওটি তো খণ্ডকাহিনীমাত্র—মহাভারতের মূল কাহিনী অনুসারে নারী তার ভর্তার অস্থাবর সম্পত্তিমাত্র। স্বামী তাকে পণ রেখে পাশা খেলতে পারেন; পরাস্ত হলে সেই কুলনারীকে সর্বসমক্ষে বিবজ্রা করায় কোন ধর্মীয় আপত্তি নেই! শুধু মহাভারত নয় রমা—সর্বত্র দেখতে পাবে নারীর পৃথক সত্তা, তার আত্মমর্বাদা উপেক্ষিত। সে পুরুষের খেলার পুতুলমাত্র। ধর বৈষ্ণব ভক্তমাল গ্রন্থ বিশ্বমঙ্গল। কাহিনীর নায়ক নদীতটে অহল্যা নামী একটি রূপবতী পুরললনাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। স্নানান্তে ঐ মহিলা যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন তখন দেখা গেল কাহিনীর নায়ক তাকে অনুসরণ করছেন। তিনি দেখলেন সেই সধবা মহিলাটি একজন বণিকের ধর্মপত্নী। কাহিনী অনুসারে ঐ ঘটনার পূর্বেই নায়ক বিশ্বমঙ্গল সোমগিরির নিকট দীক্ষা নিয়েছেন। সেই দীক্ষিত নায়ক বণিকগৃহে অতিথ্য গ্রহণ করলেন এবং বণিক পত্নীকে একরাত্রের জন্য প্রার্থনা করলেন। কিমার্চ্যমতঃপরম! স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠল কামুক অতিথির প্রতি অতিথি-বৎসলতা! তিনি সে রাত্রে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বিশ্বমঙ্গলের শয়নকক্ষে! বিচার করে দেখ রমা, কাহিনীকারের একমাত্র উদ্দেশ্য ভক্তির সঞ্চারণ করা—‘বিশ্বমঙ্গল’ একান্ত ভাবে ভক্তিমূলক গ্রন্থ! অথচ কেউ কখনো সেই অহল্যা নামের মেয়েটির দৃষ্টিকোণ থেকে এ ঘটনাটা যাচাই করল না! রাত্রিপ্রভাতে ধর্মিতা সতীসাক্ষী কী করেছিল? সে যদি আত্মঘাতিনী না হয়ে থাকে তাহলে দ্বিচারিণী হওয়ার অপরাধে বণিক কি তাকে ত্যাগ করেছিল? কাহিনীকার সে কথা বলতে ভুলেছেন! হিন্দুশাস্ত্রে—পুরাণে-সংহিতায়-কাব্যে ক্রমাগত এই একই দৃষ্টিভঙ্গি—পুনরুজ্জীবিত্ব দোষে ক্লান্তিকর! পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় নিদ্ধিধায় কুঠারাঘাতে জননীর শিরশ্ছেদ করলেন। কী যুক্তি? তাঁর মাতা তো পিতার অস্থাবর সম্পত্তিমাত্র! এবং সেই পরশুরাম আমাদের দশাবতারের একজন। লক্ষ্মীনারাণী ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে পিঠে করে বারবনিতার গৃহে পৌছে দিচ্ছে—কেন? সেটাই যে তার সতীত্ব ধর্মের পরিচয়! কেন ‘অগ্নিপরীক্ষা’ দিতে হল সীতাকে? যদি তিনি রাবণকর্তৃক ধর্মিতা হয়ে থাকেন, তাহলে সেটা কি তাঁর অপরাধ? আদিকবি সে প্রশ্ন আদৌ উত্থাপন করেননি। বরং দেখিয়েছেন, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেও শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বর্জন

১ তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে রবিঠাকুরের কলম খার করে মৃণাল তার স্বামীকে এই প্রসঙ্গে লিখেছিল “কৃষ্ণরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌছে দিয়েছে, সতীসাক্ষীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে অসিতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচ বোধ হয়নি।” (স্ত্রীর পত্র)

করছেন। কেন? না, তিনি প্রজানুরঞ্জন। শ্রীরামচন্দ্রের একবারও মনে হল না রাজা-প্রজার বন্ধনটা অচ্ছেদ্য নয়, স্বামীশ্রীর মতো। রাজ্য ত্যাগ করলে ভরত বা লক্ষ্মণ প্রজাদের দায়িত্ব নিতে পারত—কিন্তু সীতার একমাত্র আশ্রয় দ্বিধাবিভক্ত ধরণী।

না রমারঞ্জন—আমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত: নারীজাতির প্রতি এই অশ্রদ্ধা, অপমানই হিন্দু-সমাজের, হিন্দুসংস্কৃতির এই অধঃপতনের হেতু। বারে বারে তাই সে পদানত হয়েছে বহিরাগত বিধর্মীদের কাছে।

রমারঞ্জন এ অভিযোগের জবাব খুঁজে পায়নি।

সেখানে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্নাদেশ পেলেন হটী বিদ্যালঙ্কার।

স্বপ্ন? না। স্বপ্ন কেন হবে? তখন তো তিনি জাগ্রত, সমংকায়শিরোগ্রীব ভঙ্গিতে। পদ্মাসনে। পূজার ঘরে।

বিদ্যালঙ্কার প্রত্যহ রাতে ধ্যানে বসতেন। এ বিদ্যাও তাঁকে শিখিয়েছেন তাঁর পিতৃদেব। কৈশোর অতিক্রমণে। বিধবা হওয়ার পরে। সহমরণের চিতা থেকে ফিরে আসার পরে। শৈশবকাল থেকেই বাবামশাইকে দেখেছেন ধ্যান করতে। জননীকে হারিয়েছেন জন্মলগ্নে। বাবামশাই ছিলেন ঠাঁর বাবা ও মা। বাবার দেখাদেখি উনিও শৈশবে চুপচাপ বসে থাকতেন পিতৃদেবের অদূরে—আর একটি কুশাসনের উপর। একটু বড় হয়ে জানতে চেয়েছিলেন—ধ্যানে আপনি কার কথা চিন্তা করেন বাবা?

রূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমি মন্ত্র নিইনি রে হটী। আমার কোনও ইষ্ট দেবদেবী নাই। আমি 'ভূমা'কে ধ্যান করি।

অর্থগ্রহণ হয়নি সে বয়সে। পরে, বাবামশাই ঠুকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে আজ প্রায় দুই দশক আগের কথা। আজ তাঁরও কোনও ইষ্ট দেবদেবী নাই। বীজমন্ত্র পাননি। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারেন, নগুর্থক ধ্যান কীভাবে ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে। ধ্যানে উনি ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করেন, সংহত করেন। জাগতিক যাবতীয় চিন্তাকে বিদূরিত করে নগুর্থক জগতে প্রবিষ্ট হবার চেষ্টা করেন। 'না'-য়ের জগতে। এ ঘর নাই। এ দেহ নাই। এ জগৎ নাই—আছেন জগত-প্রপঞ্চের সেই আদিভূত কারণ।

প্রথমে দীপশিখার উপর মনঃসংযোগ করতেন। ইদানিং তাও করতে হয় না। চোখ বুজলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দেহাতীত আত্মার স্বরূপ ভূমানন্দের স্বাদ পান।

সে রাতেও তাই করতে চেয়েছিলেন।

স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন—আর সপ্তাহখানেক তিনি আছেন এই ধরাধামে! চৈতালী পূর্ণিমা হচ্ছে চিহ্নিত তিথি। তার পূর্বেই তাঁকে বিদায় নিতে হবে এই রূপরসস্বাদস্পর্শগন্ধময় পৃথিবী থেকে। ঘটাকাশ মিলিত হয়ে যাবে পটাকাশে।

মালোয়া রাজ্যের রূপোপজীবিনী রূপমতী ঠাঁর পথ প্রদর্শক। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কী ভাবে বাঁচা যায় তা সেই শিখিয়ে দিয়ে গেছে।

সে রাতেও উনি ধ্যানস্থ হয়েছেন। রাত্রি গভীর। চরাচর নিস্তব্ধ। সহসা ঘ্রাণে উপলব্ধি করলেন এক অপূর্ব পদ্মগন্ধ। ধীরে ধীরে চোখদুটি খুলে গেল ঠাঁর দিকে। দেখতে পেলেন কক্ষের

বাণীবাস

ভিতর ঘনীভূত হয়েছে এক আলৌকিক আলোকচ্ছটা। সেই দীপ্তিময় আলোক-বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে ক্রমে প্রস্ফুটিত হল একটি পরিচিত আলংকার্য। চিনতে অসুবিধা হল না—তাঁর স্বর্গত পরমপূজ্য পিতৃদেব—রাপেন্দ্রনাথ ভৈষগাচার্য। তিনি এসেছেন মৃত্যুতীর্থে উপনীত হবার মুহূর্তে কন্যাকে আশীর্বাদ করতে। কিন্তু তাঁর এ কী ভঙ্গি? পদ্মাসনে বসে আছেন—যেন তৈলঙ্গ স্বামী।

ঠিক তখনই যেন অন্তরীক্ষ্য থেকে দৈববাণী হল: এখনো ‘রূপ’-এর মোহ? ‘সত্য’কে চিনলি না?

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হট্টা বিদ্যালঙ্কার। অর্থগ্রহণ হল না তাঁর। বললেন, কী বলছেন, বাবা? কোথায় রাপের মোহ? কখন প্রত্যাখ্যান করলাম সত্যকে?

—তবে ‘রূপমতী’ কেন রে হট্টা? কেন নয় ‘সত্যবতী’?

—সত্যবতী! সে কে?

কোনও প্রত্যুত্তর হল না। বিদ্যালঙ্কার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার তাকিয়ে দেখলেন সেই অলৌকিক মূর্তির দিকে। না—উনি তৈলঙ্গ স্বামী নন, রাপেন্দ্রনাথও নন—উনি একজন রাজপুরুষ। হাতে রাজদণ্ড, মাথায় রত্নখচিত স্বর্ণমুকুট।

বিদ্যালঙ্কার আতর্কণ্টে বলে ওঠেন, কে? কে আপনি?

—চিনতে পারছিস না হট্টা? আমি তোর বাবা—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কাপুর।

মূর্ছিত হয়ে ভূষায়া লুটিয়ে পড়লেন হট্টা।

মূর্ছা ভাঙল অনেক অনেকক্ষণ পর। উঠে বসলেন। রাত তখন তৃতীয় যাম। শরীর দুর্বল। তা তো হতেই পারে। গুরুদেব গৃহত্যাগ করার পর থেকে বস্তুত তিনি অনাহারে আছেন। শরীর মানবে কেন?

আচ্ছন্নের মতো দেওয়ালে ঠেকা দিয়ে বসলেন। স্বপ্নের কথাগুলো মনে পড়ল একে একে। প্রতিটি দৃশ্য। প্রতিটি কথোপকথন। ধীরে ধীরে সমস্যাটার সমাধান হয়ে আসে। স্বপ্নদেশের অর্থ প্রণিধান করতে অসুবিধা হল না আর। বর্ধমানের মেয়ে—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উপাখ্যান কি ভোলা যায়? প্রায় দেড়শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—তবু আজও কৃষ্ণসাগরের নিস্তরঙ্গ জলে যেন প্রতিবিম্বিত হয় সেই অনিন্দ্যকান্তির মুখখানি: রাজকুমারী সত্যবতী!

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদ। সুদূর লাহোর থেকে এক ক্ষত্রী কাপুর বংশের রাজপুরুষ এসে ছিলেন পুরীধামে তীর্থ করতে। সদ্গম রায় কাপুর। তীর্থ সেরে প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধমান শহরের কাছাকাছি একটি গ্রাম—তার নাম বৈকুণ্ঠপুর—তাঁর মনে ধরে গেল। স্বদেশে আর ফিরে গেলেন না। ছায়া-সুনিবিড় ঐ গ্রামেই একটি ভদ্রাসন নির্মাণ করে বসবাস শুরু করলেন। শুরু করলেন ব্যবসা। এক পুরুষেই প্রচুর ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করলেন তিনি। তাঁরই উত্তরাধিকারী কৃষ্ণ রায়। করিৎকর্মা পুরুষ। বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে নিয়ে এলেন ফরমান। হয়ে বসলেন ঐ অঞ্চলের জমিদার। বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। উপাধি পেলেন চৌধুরী। খেতাব পেলেন রাজা। নির্মিত হল বর্ধমান রাজবাটি। খনন করালেন এক বিরাট দাঁঘি—যা আজও কানায়-কানায় টলমল: কৃষ্ণসায়র।

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হতে আর মাত্র চারটি বছর বাকি। সেই সময়ে চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিং আক্রমণ করল বর্ধমান রাজ্য। মুগল শাসনের বিরুদ্ধে গ্রহিম খাঁ নামে এক বিদ্রোহী

আফগান সর্দার যোগ দিল শোভা সিং এর সঙ্গে। এই যৌথ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সেনাদলকে পরিচালনা করে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা দিলেন রাজা কৃষ্ণরায়। সঙ্গে তাঁর যুবকপুত্র অশ্বর রায়।

স্বামীর ও পুত্রের ললাটে রানী-মা ঐকে দিলেন রক্ত-তিলক। যাত্রা পূর্বমুহূর্তে রাজা কৃষ্ণরায় পুণললনাদের ডেকে বললেন, যুদ্ধে আমার এবং অশ্বরের মৃত্যু হয়েছে সংবাদ পেলে বাবা নিশ্চিন্তের এই প্রসাদ তোমরা মুখে দিও। ধর্মরক্ষা হবে!

রানী-মা বুঝলেন। তীব্র হলাহলটি চার ভাগ করে একটি রাখলেন নিজের জন্যে। এক ভাগ পুত্রবধুর, বাকি দুটি দুই কন্যার।

দিবসান্তে এল মর্মান্তিক দৃঃসংবাদ। রাজা এবং রাজপুত্র উভয়েই সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যু-বরণ করেছেন। যে কোন মুহূর্তে বিজয়ী সৈন্যদল রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে।

রানী-মা পূজা করছিলেন। পূজা অসমাপ্ত রেখে বার হয়ে এলেন মন্দির থেকে। দুই কন্যা আর পুত্রবধু অপেক্ষা করছিল। তাদের বুকে টেনে নিলেন। বুকফাটাকান্নায় ভেঙে পড়ে মনটা হাল্কা করার সময় নেই। কেউ হারিয়েছে স্বামীকে, কেউ পিতাকে! হতভাগিনী! বর্ধমান-মহিষী একই খণ্ডমুহূর্তে হারিয়েছেন স্বামী-পুত্র! কিন্তু কে কার চোখে জল মুছিয়ে দেবে? রাজ-প্রসাদের সিং-দরোজা ভেঙে পড়ার ভীমনাদ যে ভেসে এসেছে তার পূর্বেই। রানী-মা বললেন, নে মা! নিজের হাতে তাদের আগে খাইয়ে দিই। তাদের গাচাতে পেরেছি না জেনে গেলে যে মরেও আমি শান্তি পাব না।

ছেলেবেলায় যেমন করে ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ‘কাগের দল-বাগের দল’ খাইয়েছেন তেমনি করে দুই মেয়ের মুখে তুলে দিতে গেলেন তীব্র কালকট।

পুত্রবধু প্রসাদ মুখে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল শাণ্ডড়ীর পায়ের উপা। সদ্য-বিধবার সিথিতে জ্বলজ্বল করছে রাঙা-সিদুর।

বড় মেয়ে এগিয়ে এল: এবার আমাকে দাও মা!

রানী-মা তার কপালে একটি চুষন-চিহ্ন ঐকে দিয়ে বললেন, আয় মা! নে!

এর পর কনিষ্ঠা কন্যা। সত্যবতী। ষোড়শী রাজকন্যা। অপূর্ব সুন্দরী। বাবার নয়নের মণি। দাদার আদরের বোনটি।

মা ডাকলেন, আয়? — তাঁর দু চোখে শ্রাবণ ধারা। নিজে হাতে আজ মেয়েকে বিষ দিতে হচ্ছে।

মেয়ে এক-পা পিছিয়ে গেল। বললে, ন-না!

—না? না কিরে? বাবা কী বলে গেল শুনিসনি?

—শুনেছি! বাবার কোন্ কথটা কবে শুনেছি আমি? পারব না। আমি এখন মরতে পারব না।

সোপান বেয়ে ওদিকে উঠে আসছে শত্রু সৈন্য। আর একটি মাঝ রুদ্ধ কপাট। এঘরের। সময় নেই। মা জাপটে ধরল মেয়েকে। বললে, খেতেই হবে! খা!

সত্যবতী ছিটকে সরে গেল। বললে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে প্রসাদ মুখে দাও মা! আমি আসছি, এখনই আসছি। কিন্তু তার আগে আমাকে প্রতিশোধ নিতে দাও। যেসব তান আমার দাদাকে,

আমার বাবাকে.....

হতভাগিনীর কথাটা শেষ হল না। মড়মড়িয়ে ভেঙে গেল অন্দরমহলের রুদ্ধ দরওয়াজা। দুর্বিনীতা কন্যা! কথা শোনে না! কী করবেন? বাবা বিশ্বনাথের চরণে মনে মনে তাকে সমর্পণ করে রানী-মা তাঁর অংশের প্রসাদটুকু মুখে ফেলে দিলেন।

জীয়ন্তে ধরা দিল সত্যবতী।

তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল শোভা সিং। সে একা নয়। রহিম খাঁও! দুই সহযোগী মূহুর্তে হয়ে ওঠে দুজনের দ্বন্দ্বী। শোভা সিং বললে, খাঁ—সাহেব! গোটা রাজকোষ তোমার। আমাকে বখরা দিতে হবে না। লেकिन এ ‘জহর’ আমার।

রহিম খাঁ মেনে নিল। বললে, খামোশ! মান্‌ লি!

মুখ শোভা সিং। সে চিনতে পারেনি। সে বুঝতে পারেনি। ‘জহর’ শব্দটার যে দুটো অর্থ আছে, তা ওর মনে পড়েনি!

সত্যবতী : দিনী হল স্বেচ্ছায়। কোন প্রতিবাদ করেনি সে। সুবেদার শোভা সিং-এর আদেশে মেয়েটিকে প্রহরীরা পৌছে দিল তার শয়নকক্ষে। তারা স্বপ্নেও ভাবেনি—মেয়েটি তার কঞ্চলিকার অন্তরালে বুকের উপত্যকায় লুকিয়ে রেখেছে একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু তীক্ষ্ণ ছুরিকা। বাবার দেওয়া একটা শৌখিন উপহার।

মেয়েটিকে শোভা সিংয়ের শয়নকক্ষে পৌছে দিয়ে প্রহরীরা কুর্নিশ করে বার হয়ে গেল ঘর ছেড়ে। শোভা এগিয়ে এল। রুদ্ধ করে দিল কবাট! কোন সোহাগের কথা বলল না। সে জানে, মেয়েটি সেদিনই তার বাবাকে হারিয়েছে, ভাইকে হারিয়েছে—মহব্বতের মিঠে মিঠে বুলি এখন তার বরদাস্ত হবে না। রানী মহলের আর পাঁচটা মেয়ে ধর্মিতা হওয়ার আশঙ্কায় জান দিয়েছে। এ ছুরি নিত্যন্ত ছেলেমানুষ—সাহস পায়নি আত্মহত্যা করতে। জান দেওয়ার বদলে ইচ্ছা দেওয়াটাকে ও পসন্দ করেছে।

শোভা সিং এগিয়ে এল। পরষ পেষণে নিষ্পেষিত করল সেই অনাঘ্রাতা যুবতীকে। তার বিশ্বাসের দেগে দিল এক হিংস্র চুষনচিহ্ন! ঠোঁটদুটো জ্বলে উঠল সত্যবতীর। কিন্তু সে ঠেলে সরিয়ে দিল না শোভা সিংকে।

ততক্ষণে পাশবসত্তা পূর্ণমাত্রায় জাগরিত। শোভা এক টানে খুলে নিল ওর ওর্না। আর এক টানে ছিড়ে ফেলল ওর ঘাঘরা। ভিতরে অধোবাস। দেহের সঙ্গে লেপটে থাকা চূড়িদার চূস্ত বা শেরওয়ানী-পাজামা। তা টেনে খোলা যায় না অথবা হেঁড়া। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের এই বিচিত্র পোশাকে বঙ্গললনারা ততদিনে অভ্যস্ত। পূর্বযুগেই জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রহে বর্ণনা আছে—“বঙ্গনারীরা, বিশেষ করে নর্তকীরা, পায়ের কঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পাজামা পরতেন।”^১ শোভা সিং সত্যবতীর নীরববন্ধের ফাঁসটা খুঁজতে থাকে। কী বজ্র আঁটনি গেরো! কামাবেগে পিঁচাটটার সন্দেহ হল না—এ জাতীয় গ্রন্থির অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। টানটানি করে খুলতে না পেরে মেয়েটিকেই বললে, খুল!

সত্যবতী পাথর-প্রতিমা।

^১: ‘বাঙালীর ইতিহাস’—নীহাররঞ্জন রায়

টেনে এক চড় মারতে ইচ্ছা করছিল শোভা সিং এর। কিন্তু না তাতে ছুকারি মেজাজটা শিচড়ে যাবে—জমবে না! দু-হাতে সে ঐ গিটটাকে খুলবার জন্য তৎপর হয়ে পড়ে।

এই মুহূর্তটির জন্যই এতক্ষণ দৈহিক নিগ্রহ সয়েছে কৃষ্ণ রয়ের আদরিণী আত্মজা। দর্শনকারী দুইহাতে গ্রন্থিমোচনে নিবিষ্ট হয়েছে দেখে অতি সন্তুষ্ট সে তার ডান হাতখানা প্রবেশ করিয়ে দিল নিজ বুকের উপত্যকায়!

পরমুহূর্তেই রুদ্ধদ্বারের বাহিরে প্রহরীদ্বয় চমকে ওঠে। একটা গগনবিদারী আর্তনাদ! আর্তনাদ একটা প্রত্যাশিত—ওরতের আর্তি! রমণ-শীংকার! কিন্তু এ যে পুরুষকণ্ঠ! এ যে শোভা সিং-এর আর্তনাদ!

রুদ্ধদ্বার ভেঙে ওরা যখন ধ্বংসক্ষেত্রে প্রবেশ করল তখন সত্যবতীর দেহে প্রাণ নেই। আর বর্মান রাজপ্রাসাদজয়ী শোভা সিং চিৎ হয়ে পড়ে আছে ভূশয্যায়। গর কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মারাত্মক ছুরিকা।

শৌখিন একটা অস্ত্র। বাবা নাকি জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল আদরের কন্যাকে!



পূব আকাশে আলো ফুটছে। চিহ্নিত সময়কালের আর একটি দিন শেষ হল। সমস্ত রাত্রি দ্বিত্ব করেও শেষ সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

—রূপমতী বনাম সত্যবতী!

কে ঠাঁর আদর্শ? রূপমতীর পথ সহজ, সরল। যে মুক্তিপথকে ঐ দুদিন আগেও বলেছেন ‘হস্তামলকবৎ’। সে মৃত্যু ঠাঁর হাতের মুঠোয়। চৈতালী পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়ের আগে। রূপমতী পেরেছে, সত্যবতীর মা-দিদি-বৌদি পেরেছে! বর্গীর আক্রমণে কেন কোন গায়ের আনপড় মেয়েরা দলে-দলে পেরেছে। এক এক পাতকুয়ায় দশ বিশটি যুবতী নরী। বর্গী দানবেরা তাদের ধর্মনষ্ট করতে পারেনি। সেই সহজ সরল পথটা বেছে নিয়েছিলেন বলে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কিন্তু আজ যে স্বপ্নাদেশে সব কিছু গুলিয়ে গেল!

ঠাঁর আদর্শ রূপমতী নয়—সত্যবতী!

সেটা কি পারবেন?

‘বিনাশায় চ দুক্তাম্’ জগৎনিয়ন্তা যুগে যুগে ‘সম্ভব’ হন। কখনে পুরুষের বেশে, কখনো প্রকৃতির। হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করতে যেমন তিনি তীক্ষ্ণশরলঙ্কৃত নৃসিংহ, তেমনি মহিষাসুরকে বধ করতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন অপরূপা মতুমূর্তিতে! কিন্তু সেসব সত্য-ত্রৈতা-দ্বাপর যুগের কথা। কলিযুগে সে দৈবশক্তির আবির্ভাব হয় মরমানুষের শুভবুদ্ধিতে।

আজ তেমনই স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন! শহীদ হবার আহ্বান শুনেছেন ‘শহীদ’ কে? যে দেশের জন্য, দেশের জন্য, নিজের প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ‘প্রাণ’ই কি মরমানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ? ‘ধর্ম’ কি তার চেয়েও বড় নয়? মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেশে দেশে কালে কালে কত কত শহীদ তো প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু পৃথিবীর ভার লাঘব করতে ধর্ম দিতে পেরেছে কজন?

কানিশ্বাস

অত বড় দানবীর, অমন মহান দাতাকর্ণও তা দান করতে প্রস্তুত ছিলেন না—সব কিছু তিনি প্রদান করতে প্রস্তুত—প্রাণ পর্যন্ত; কিন্তু ঠেকে গেলেন এখানে: ‘আপন পৌরুষ আর ধর্ম’—তা তিনি দিতে অপারগ!

স্বপ্নাদেশে তাঁকে বলা হয়েছে—বেণীর সঙ্গে মাথা দেওয়া চলবে না। মাথা রেখে বেণীটুকু দিতে হবে!

কিন্তু কথাটা কি ঠিক?

সত্যিই কি স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় সম্পদ? ‘ধর্ম’ কি তার চেয়েও বড় নয়? ‘ধর্ম’ কি তাঁর এই নম্বর নারীদেহের চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ? কে বলে দেবে? কোন্ শাস্ত্র? কোন্ পুরাণ, সংহিতা, কোন্ মহাকাব্যের অনুশাসন?

মনে পড়ে গেল পিতৃদেবের বহুব্যবহৃত গৌতম বৃদ্ধের সেই অস্তিম বাণী:

আত্মদীপো ভব

আত্মশরণো ভব

অনন্যশরণো ভব!

—নিজের বিবেকের নির্দেশে, আত্মদীপের আলোয় পথ খুঁজে নিও। পরের কথায় কান দিও না। তুমিই তোমার গুরু, তুমিই তোমার পথপ্রদর্শক!

কী দিচ্ছেন? কী পাচ্ছেন?

পাচ্ছেন স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত দৈব আদেশ পালনের তৃপ্তি। দেশের মঙ্গল, দশের মঙ্গল। সমগ্র কানিশ্বাস আজ চাইছে ঐ করাল রাতুগ্রাস হতে মুক্তি পেতে। তিনি স্বপ্নাদেশে আদিষ্ট হয়েছেন পৃথিবীর সেই পাপ স্থালন করতে।

কীসের বিনিময়ে?

নারীর ‘তথাকথিত’ সত্যত্ব।

তিনি যদি সন্তানে, স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা হতে স্বীকৃতা হন, আর নিজ দেহে সেই যন্ত্রণা সহ্য করে সত্যবতীর মতো সাফল্য লাভ করেন, তবে শত শত মেয়ে রক্ষা পেয়ে যাবে। ঐ যাদের আগামী সপ্তাহে, আগামী মাসে, পরের বছরে মুখে ফেট্রি বেঁধে নিয়ে আসবে পুরন্দরের চেলা-চামুণ্ডার দল তার বাগানবাড়িতে। তাদের স্বামী আছে, পিতা আছে, সন্তান আছে, সংসার আছে। যার বিন্দুমাত্রও নাই হটী বিদ্যালঙ্কারের। তাদের সকলের হয়ে তিনি একা কেন পারবেন না ঐ মরণান্তিক দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে? তাদের বিনিময়ে ধর্ষিতা হতে? কেন পারবেন না সেই মরণান্তিক নিগ্রহ সহ্য করে ঐ পশুটাকে মায়ের যুপকাঠে বলি দিতে?

সিদ্ধান্তে এলেন হটী বিদ্যালঙ্কার—স্বেচ্ছায় তিনি ধর্ষিতা হবেন!

কিন্তু দুরন্ত অভিমানে বরঝরিয়ে কৈদেও ফেললেন। পূব আকাশে তখন উদয়ভানুর আভাস। সেদিকে মুখ তুলে হঠাৎ তিনি পিতৃসম্বোধন করলেন। বললেন, আপনি আমাকে এই আদেশ দিলেন, কিন্তু কই ‘মা’কে তো তা বলেননি? তাহলে তাঁর আদেশে বিষ বেঁধে দিয়েছিলেন কেন?

আমি ক্ষমা চাইছি।

ভুল হয়ে গেল দিদিভাই! তোমাদের এখনো বলাই হয়নি হট্টা বিদ্যালঙ্কারের বাবার কথা, মায়ের কথা। তাঁর বাল্যকালের কথা!

ব্যাপারটা কী জান বোনটি? ওখানেই তোমাদের সঙ্গে আমার ফারাক। কথা-সাহিত্য একটা যোগের সাধনা—পাঠিকা-পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগ। তোমাদের সঙ্গে রাখীবন্ধনের উৎসবে যোগ দিতেই তো বসেছি। কিন্তু ঠিক এক সমতলে বসিনি। বসা যায় না। প্রথম পংক্তিতে কবি যখন বর্ণনা করতে বসেন—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের চেহারা ভূতের মতন; সে অতি ঘোর নির্বোধ, কবিপত্নীর ধারণা সে ক্রমাগত চুরি করে যাচ্ছে, তখন সেই ‘বোটা বুদ্ধির টেকি’র কাণ্ড—কারখানায় আমরা হাসছি—কিন্তু সেই প্রথম পংক্তি রচনা-কালেও কবির চোখদুটি অশ্রুসজল! তিনি জানেন, ঐ পুরাতন ভৃত্যটি তাঁর জন্য অন্তিমে প্রাণ দেবে। সে তথ্যটা তুমি-আমি জানি না, কিন্তু তাঁর জানা!

এই যে ‘হট্টা বিদ্যালঙ্কার’—না সোএগ্রাই গ্রামের বাস্তব মহাপণ্ডিতা নয়, আমি অযোধ্যার শ্রীরামের কথা এখন বলছি না, বলছি আমার মনোভূমির রামের কথা—তাঁর সব কিছু যে আমার জানা। তিনি প্রাণ দেবেন, না সতীত্ব-ধর্ম, কী তাঁর পরিণাম—সব জেনে-বুঝে আমি লিখতে বসেছি। তোমরা আসনপিড়ি হয়ে বসেছ, জান না এবার আমি তোমাদের পাতে কী পরিবেশন করব—নিম-বেগুন, না পরমার!

কী বললে? আমি কেমন করে জানলাম?

না দিদিভাই, বাস্তব হট্টা বিদ্যালঙ্কারের সব কিছু জানতে পারিনি, জানি না তাঁর জন্ম তারিখ, বাবার বা মায়ের নাম। তাঁর তিরোধান 1810—কাশীতে, প্রায় সত্তর বছর বয়সে—তাই আন্দাজে বলেছি তাঁর জন্ম 1742 এর কাছাকাছি। জন্মস্থান: বর্ধমান, সোএগ্রাই।

ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করেছি। তার মনে নেই।

জাতীয় গ্রন্থাগারকে প্রশ্ন করেছি। সে বলেছে খুঁজে নাও—এ গন্ধমাদনে তোমার বিশ্ল্যকরণী আছে কি নেই তার আমি কী জানি!

জানতে চেয়েছি মহাকালের কাছে। উন্টে ধমক খেতে হয়েছে। সত্যি তো, তার জাবদা-খাতায় যে ‘হোমো-স্যাপিয়ান’-এর আগের খবরও লিখতে হয়েছে। সে কেমন করে দেবে সোএগ্রাই গাঁয়ের সেই ভাগরচোখো কিশোরীর সন্ধান?

না, মহামহিমময়ী সেই বাস্তব হট্টা বিদ্যালঙ্কারের কথা বলছি না। বলছি না হট্টা বিদ্যালঙ্কারের কথাও। তাঁরা দুজনেই তো আমার মা! বলছি আমার ছোট্ট পাগলি মেয়েটার কথা। আমার মনের কোণের এই সোএগ্রাই গাঁয়ে নতুন করে যে জন্মেছে। তিল-তিল করে যে বর্ধমান, বেড়ে উঠছে, তার কথা বলছি। ঘুম—না—আসা রাতে যে এসে আমাকে ইতিমধ্যেই চুপিচুপি বলে গেছে তার সব কথা, স—ব কথা! তার আনন্দের কথা, বেদনার কথা, তার প্রাপ্তি আর বঞ্চনা। তোমাদের সে-কথাই তো শোনাতে বসেছি।

তাই এ জাতের ভুল হয়ে যাচ্ছে। তোমরা তো এখনো জানই না হট্টার পিতৃপুত্র নামটা কেন ‘রূপমঞ্জরী’!

বাপের দেওয়া নাম। বাবা মহাপণ্ডিত। চমৎকার নামটি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের

কশিধাম

নাম ‘রূপেন্দ্রনাথ’, স্বীর নাম ‘কুসুমমঞ্জরী’। দুজনে মিলে সৃষ্টি করেছিলেন ঐ মেয়েটিকে ‘রূপমঞ্জরী’।

না! আবার ভুল হল! হট্টা বিদ্যালঙ্কারের নামটা তাঁর পিতৃদেব দেননি। সে-কথা সবাই জানে না। আসলে নামকরণ করেছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ মহাকবি! সেসব কথা শুধু আমার মনেই আছে। আমাকে লিখতে হবে, এখনো তোমাদের বলা হয়নি!

গল্পের ধরতাইটা ধরতে হলে আপাতত নোঙর তোল, দিদিভাই! অনেক-অনেকটা পথ উজান ঠেলে যেতে হবে।

আমাদের কাহিনী শুরু হয়েছিল 1774 খ্রীষ্টাব্দে। পলাশীর যুদ্ধের সতের বছর পরে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর উজান ঠেলে আমাদের কেঁচে-গাধু করতে হবে।

আমরা আবার নতুন করে শুরু করব রাঢ়খণ্ডে। রূপেন্দ্রনাথের জন্ম-বৎসর থেকে। সেটা 1717 খ্রীষ্টাব্দ।



pathagat.net





সোএগাই

1742

দ্বিতীয় পর্ব

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পিছনে কী যেন একটা উপাধি ছিল; কিন্তু এখন তার কোন নিশানা নেই। রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম থেকে জগন্নাথ

তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতই কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। রূপেন্দ্রনাথ সে জাতীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন না নিশ্চয়। কিন্তু বর্ধমানের সেই সোএগাই গ্রামখানিকে কেন্দ্রবিন্দু করে মানচিত্রে পঁচিশ ফ্রোশ ব্যাসের একটি বৃত্ত টানলে সে আমলে দেখা যেত ঐ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে তিনি অপরিচিত নন। তবে তাঁকে সবাই চিনত দুটি বিচিত্র নামে—‘একবগ্না ঠাকুর’ অথবা ‘ধনুস্তরি’।

দ্বিতীয় উপাধিটা তাঁকে দান করেছিলেন স্থানীয় জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী। ভেবেচিন্তে নয়, তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসের বশে। কিন্তু নামটা পাকাপোক্ত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়। সোএগাই গায়ে গেলে আজও দেখতে পাবে তাঁর নামে একটা দীঘি এখনো টিকে আছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এঞ্জিনিয়ার পাকা সড়ক বানাবার সময়—এই তো সেদিন—তার চারধার চৌকশ করতে চেয়েছিল। গ্রামবাসী বাধা দেওয়ায় কাজটা করা যায়নি। ভালই হয়েছে। দীঘিটা সার্থকনামা হয়ে রইল। জ্যামিতিক বিচারে দীঘিটি: ট্র্যাপিজিয়াম। দুটি বাহু সমান কিন্তু সমান্তরাল নয়, বাকি দুটি সমান্তরাল, কিন্তু অসমান। তার নাম: ‘একবগ্না দীঘি’!

প্রথম উপাধিটা দিয়েছিল গায়ের মানুষ—তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কারণ সমকালের ধারণায় তিনি এক সুদর্লভ ব্যতিক্রম! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যান্নাটিক অচিন্তনীয়—একজন আধুনিকমনা প্রগতিবাদী!

প্রতিটি শাস্ত্রীয় অনুশাসন তিনি নিজ বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে গ্রহণ করতেন। তা বেদবাক্য হলেও! যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন। কারও পরোয়া না করতেন। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি নিজেও কম ভোগেননি, পরিবারবর্গকেও ভুগিয়েছেন। এমনকি ক্রমোজ্জমের মাধ্যমে ভুগিয়েছেন আত্মজাকে। তাই হট্টা বিদ্যালয়স্থলের স্মৃতিতর্পণ করতে হলে আমাদের প্রথমেই চিনে নিতে হবে সেই ‘একবগ্না ঠাকুর’কে।

সোণাই

জন্ম : সোণাই, বর্ধমানভুক্তি।

সময়টা : ফেরঙ্গমতে 1717 খ্রীষ্টাব্দ।

অর্থাৎ শেষ গ্র্যান্ড-মোঘল আলমগীর বাদশাহর মৃত্যুর দশ বছর পরে। বাঙলার তদানীন্তন সুবেদার আজিম উসমানের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে পূর্বদশকে সম্রাটনিযুক্ত বঙ্গশাসক ঢাকা থেকে রাজধানী সরিয়ে এনেছেন মুখসুদাবাদে। নতুন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নাম অনুসারে ভাগীরথী তীরের এই নতুন রাজধানীর নাম হয়েছে: মুর্শিদাবাদ। বস্তুত রূপেন্দ্রনাথের জন্ম-বৎসরে মুর্শিদকুলী পাকাপাকিভাবে বাঙলার সুবেদার হলেন—বাদশাহী-ফরমান মোতাবেক।

মুর্শিদকুলী লোভী ছিলেন না। নিজে সংযত জীবন যাপন করে গেছেন, যা নাকি সে-আমলে নবাব-বাদশাহদের ভিতর নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। উপপত্নী তো নয়ই—এমনকি একটি মাত্র পত্নী নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন।

সুবেদার ও দেওয়ান একই ব্যক্তি। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তাঁকে নির্মম হতে হত, কিন্তু অতিরিক্ত আদায়ের লালসা ছিল না। আদিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ-সন্তান। তিনি ধর্মাস্তরিত মুসলমান।

বালক বয়সেই রূপেন্দ্রনাথ ত্রিবেণীতে চলে যান। গুরুগৃহে বিদ্যার্জনমানসে। নবদ্বীপেই যাওয়ার কথা। নবদ্বীপ সেই কানভট্ট শিরোমণির কাল থেকে নবান্যায়ের পীঠস্থান। তার পূর্বযুগে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদের যেতে হত মিথিলা অথবা কাশীধাম। কিন্তু ত্রিবেণীর এক ক্ষণজন্মা পণ্ডিতের কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন সৌরীন্দ্রনাথ—রূপেন্দ্রনাথের পিতৃদেব। সেই আশ্চর্য নৈয়ায়িকের গুরুকুল চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়েছিলেন পুত্রকে।

তিনি রূপেন্দ্রনাথ অপেক্ষা ত্রয়োবিংশতি বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তখনো হয়তো তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি হয়নি, কিন্তু সেই আমলেই তিনি নবদ্বীপের গর্ব খর্ব করে নবান্যায়ের এক নতুন পীঠস্থান গড়ে তুলতে শুরু করেছেন ত্রিবেণীতে। ঠিক যেভাবে মিথিলার পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের পক্ষশাতন করে নবদ্বীপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন পূর্বজমানায় কানভট্ট রঘুনাথ শিরোমণি।

রূপেন্দ্রনাথের সেই শিক্ষাগুরুর নাম : জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের কীর্তিকাহিনী সর্বজনবিদিত। অনেকানেক পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে এসে মাথা নত করে ফিরে গেছেন। তার ভিতর একটির নাম : অষ্টাদশ শতাব্দী।

শতাব্দিকবর্ষের আয়ুর কথা নিতান্ত বিরল। তবু তা ব্যতিক্রম হিসাবে হয়তো শোনা যায়। কিন্তু আমি তো ‘বায়োগ্রাফিকাল ডিস্কনারী’ ঘেঁটে দ্বিতীয় আর কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির নাম খুঁজে পাইনি যার চরণপ্রান্তে একটি গোটা খ্রীষ্টীয় শতাব্দী ‘অজয়-পত্র’ লিখে দিয়ে গেছে!

ওঁর জন্মতারিখ : 13. 9. 1694

তিরোধান দিবস : 19. 10. 1807

গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁর প্রতিভার বিকাশ দেখতে দেখতে বুড়িয়ে-ফুরিয়ে গেছে।

এহেন গুরুর গৃহে রূপেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় দশবৎসর কাল। স্মৃতি অথবা নবান্যায়, কীসের উপর যেন তিনি উপাধিও লাভ করেন। তবে নিজের নামের সঙ্গে উপাধিটা সংযুক্ত করা তিনি পছন্দ করতেন না। গ্রামে তাঁকে কেউ তর্কালঙ্কার, ন্যায়তীর্থ বা ঐ জাতীয় কোন সম্বোধন

করলে ভর্তুকি হত। অব্যবহারে তরোয়ালের পর্যন্ত ধার ক্ষয়ে যায় আর এ তো সামান্য উপাধি। ফলে, এতদিন পরে সঠিক তথ্যটা আর উদ্ধার করার সম্ভাবনা নাই। ‘একবঙ্গা ঠাকুর’ উপাধিটাও সম্বোধনে ব্যবহৃত হত না, হত নেপথ্যে। ‘ধন্যন্তরি’ সম্বোধনটাও প্রায় তাই। গ্রামের মানুষ ঠেকে যে দুটি নামে সম্বোধন করত তার একটি ‘কোবজে মশাই’, দ্বিতীয়টি ‘পণ্ডিতমশাই’।

প্রথমটি ঠাঁর বৃত্তি অনুসারে। দ্বিতীয়টি, যেহেতু ইচ্ছার বিরুদ্ধে এককালে তাঁকে একটি চতুষ্পাঠী খুলে বসতে হয়েছিল। কন্যাকে কোন চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করতে না পেরে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটিই তাঁর কৌলিক বৃত্তি। পিতৃদেব এবং পিতামহ এই গ্রামে আজীবন অধ্যয়ন-অধ্যাপন নিয়েই কালাতিপাত করেছেন।

কিন্তু রূপেন্দ্রনাথকে ভিন্ন পথের পথিক করতে চেয়েছিলেন তাঁর টুলোপণ্ডিত পিতা। সোএরাই গ্রামের কাছে-পিঠে সে আমলে ভাল কবিরাজ ছিল না। মুশকিল এই—সেটা যে একটা অভাব এ বোধটাও ছিল না কারও। তার অর্থ কী? অসুখ-বিসুখ, অধিব্যাধি কি ছিল না? যাথেষ্ট ছিল। ম্যালেরিয়া তো ব্যাপক। এ ছাড়া ঐ অঞ্চলে ঘরে ঘরে ছিগ আন্ত্রিক রোগ। কিন্তু এইসব আধি-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনে কোনও কবিরাজ বা ভেষ্যগাচার্যের অভাব বোধ করতে না পঞ্চগ্রামের মানুষ। কোন চণ্ডীমণ্ডপে কেউ কখনো প্রস্তব রাখেনি—এ গ্রামে একঘর কবিরাজ এনে বসালে মন্দ হয় না। সকলেই ছিল ভিন্ন পথে পথিক, ভিন্ন অস্ত্রে দিশ্বাসী: ঝাড়-ফুক, মস্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবচ। অর্থবানদের জন্য যন্ত্র, গ্রহশাস্তি, অথবা ডাকিনী-যোগিনী বিদ্যা।

রূপেন্দ্রনাথের পিতৃদেব, সৌরীন্দ্রনাথ—যাঁর ‘পাপে’ রূপেন্দ্র হয়েছিলেন ‘একবঙ্গা ঠাকুর’ আর রূপমঞ্জরী ‘হটী’ : —তিনি নিজে ছিলেন স্মার্ত-পণ্ডিত। কিন্তু পরিণয় বয়সে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এসব ঝাড়ফুক-মস্ত্রতন্ত্র গ্রামজীবনকে বাঁচাতে পারবে না। তাই চেয়েছিলেন নিজের ছোট ভাইটিকে কবিরাজ করে তুলতে। বিধি বাম। ছোটভাই নরীন্দ্রনাথ একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করল। সম্যাস নিল সে। অগত্যা পুত্রটিকেই চেয়েছিলেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পারঙ্গম করে তুলতে।

চরক, সুশ্রুত, নিদান আয়ত্ত করতে হলে সংস্কৃত জ্ঞানটা আবশ্যিক। যে জ্ঞান নিজেই দিতে পারতেন, যেহেতু তিনি স্বয়ং একটি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করেন। কিন্তু সে পথে যাননি। পুত্রটিকে রেখে এসেছিলেন ত্রিবেণীর নব্যপণ্ডিতের গুরুগৃহে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ব্যবস্থাপনাতেই পরে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে চলে যান সরগ্রামে। পরবর্তীকালের সরগ্রামনিবাসী স্বনামধন্য কবিরাজ আচার্য গোপালানন্দের পিতামহর কাছে দীর্ঘ সাত বৎসর আয়ুর্বেদশাস্ত্র, চরক, সুশ্রুত ও নিদান আয়ত্ত করেন।

সংগ্রামে যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চাংশতি বৎসর। দীর্ঘ পনের বৎসর পরে।

সেটা 1742 খ্রীষ্টাব্দ। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের ভাগ্যাকাশে অনেক ঝড়-পতন ঘটেছে। শওলার মসনদে মুর্শিদকুলীর জামাতা ‘মতোমন-উল-মুলক সুজাউদ্দীন হাছাদুর অসদ্ জঙ্গ’ এসেছেন ও গেছেন। সুজাউদ্দীনের এস্তেকাল হলে মুর্শিদাবাদের ঈশ্বাসনে অধিষ্ঠিত

সোনার

হয়েছিলেন সরফরাজ খাঁ বাহাদুর। কিন্তু সিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করে বিহারের সুবাদার এসে বসেছেন বাঙলার মসনদে : 'সুজা-উল-মূলক হোসামুদ্দৌলা মহাবৎ জঙ্গ বাহাদুর'। অতবড় নামটা তো মনে থাকে না, তাই ইতিহাস তাকে সংক্ষেপে বলে : আলিবর্দী

বঙ্গদেশের বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক ঔদ্ধত্য মুর্শিদকুলির আমলেই অবদমিত হয়েছিল। এতদিনে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত। খাজনা আদায়ের অত্যাচার আছেই; কিন্তু সমগ্র রাজ্যে নিরঙ্কুশ শান্তি। চোর-ডাকাতেরা হয় তাদের বৃত্তি ত্যাগ করেছে অথবা প্রতিবেশী রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। যারা দুটোর একটাও করেনি তাদের বাদশাহী সড়কের দু-পাশে বুলতে দেখা গেছে। মাঠে-মাঠে ধান, গোলায়-গোলায় শস্য। মুর্শিদাবাদের বাজারে তখন এক তঙ্কায় পাঁচ মণ চাউল। তন্তুজাত দ্রব্য, কাঁসার বাসন, লাক্ষার কাজ, লোহা-ঢালাই প্রভৃতি। এমনকি বীরভূমে লোহা ঢালাই করে কামান-বন্দুক পর্যন্ত নির্মিত হত। সুজাউদ্দীনের আমলেই সুবাদার দিল্লীর বাদশাহকে প্রায় সওয়া কোটি টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। তার মানে এ নয় যে, রাজ্যে দারিদ্র্য না—ছিল। গ্রামবাসীর উপার্জনও অল্প, প্রয়োজনও অল্প। তার চেয়ে বড় কথা তাদের ছিল অভাব-বোধের অভাব। তারা উচ্চাভিলাষী হত কদাচিৎ। তাদের পার্থিব-কামনার শেষসীমান্ত “আমার সম্ভান যেন থাকে দুধে-ভাতে।” সদ্যবিবাহিতা আত্মজাকে বিদায় দেওয়ার সময় জামাতা বাবাজীবনকে শাশুড়ী ঠাকরুণ অনুরোধ করতেন, “হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিহ, পেট ভরি ভাত।” ঢাকায় মসলিন পয়দা হয় কি হয় না সে খোঁজ কে রাখে? হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা শাড়ি পেলেই যখন লজ্জানিবারণ হয়।

ঘরে ঘরে তাঁত। রেশমের চাষও হয়। বিভিন্ন বৃত্তিতে মানুষ মোটামুটি সন্তুষ্ট। লেনদেন-বিনিময় প্রথা—কড়ি-কপর্দকও বাজারে চলে। সরকারী কর্মচারী বাজারে বাজারে ঘুরে নজর রাখে। তদারকি করে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে যারা পড়ে, তাদের ললাটে অশেষ দুর্গতি—মৃত্যু পর্যন্ত।

বর্গীর হাঙ্গামা যে আসন্ন তা কিন্তু তখনো কেউ টের পায়নি।

ততদিনে রূপেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। গুরুগৃহ থেকে স্বগ্রামে এসে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করে তিনি পুনরায় গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। জননীকে হারিয়েছেন তো শৈশবেই। স্বগ্রামে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী—বৃদ্ধা পিতৃস্বসা আর তাঁর কন্যা। পিসেমশায়ের জীবিত কালেই জগু-পিসিমা ভাইয়ের সংসারে ফিরে এসেছিলেন সকল্য। এমনকি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েও স্বশুরালয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে যাননি। এ গ্রামেই শাঁখা-সিন্দুর ঘুচিয়ে থান পরে কন্যাটিকে দিয়ে পৃথক চতুর্থীশ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন।

হেতুটি সামান্য এবং অসামান্য। পিতৃস্বসার এই বিদ্রোহের হেতু বৃদ্ধ বয়সে পিসেমশাই একটি পঞ্চদশীকে দ্বিতীয় পক্ষে ঘরে এনেছিলেন। সে আমলে এ হেতুটা হাস্যকর : ওমা, আমি কোথায় যাব! কুলীন বামন—আড়াইকুড়ি বয়সে মান্তর দ্বিতীয় পক্ষ করল আর তাও হুঁইল না জগু ঠাকরুণের? হেসে ব্যাচিনে!

তা তোমরা হাস আর কাঁদ, এ অনাচার সহ্য হয়নি জগদ্ধাত্রী দেবীর। ঘরে-ঘরে কুলীন ব্রাহ্মণের প্রথমা ভার্ঘ্য দল যেটাকে অনিবার্য নিয়তি হিসাবে গণ্যে নেয়—বাৎসরিক কালবৈশাখী ঝড়ের মতো—বছরে বছরে সপত্নীসংখ্যার বৃদ্ধি যৌবন-অবসানে যৌবনবতী

নবাগতার অঞ্চলপ্রান্তে সিদ্ধকের চাবিগোছা বৈধে দেওয়া আর নিজ অঞ্চলপ্রান্তের গিট খুলে স্বামীর অধিকার ত্যাগ করা, তা জগুঠাকরুণের মতে: অসৈরণ!

বিপর্যয়টা ছিল রক্তে। বাঁড়জে বংশের শোণিতে! না হলে তাঁর ভাইপো কেন হবে 'একবঙ্গা ঠাকুর', নাতনী: 'ইটী'?

পিসতুতো বোনটি রূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের অনুজ। যথারীতি তারও হয়েছিল নবমবর্ষে গৌরীদান। অবছা মনে পড়ে কাত্যায়িনীর। অঘ্রাণের এক শীতের রাতে নাকে নোলক, ললাটে চন্দনের ছাপ নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল ছাদনাতলায়। কলকোলাহল, উলু-উলু, শঙ্খধ্বনি, অগ্নয়ে স্বাহা-অগ্নয়ে স্বাহা! বরের মুখটা ওর ভাল মনে নেই, তবে মনে পড়ে, গায়ে ছিল উড়ুনি, মাথায় টোপের আর গলায় গোড়ের মালা! সেই একটিবার মাত্র দেখেছে লোকটাকে, যার কল্যাণে আজও ওর সিথিতে সিদ্ধুর, হাতে খাড়ু শাঁখা।

গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপন করে রূপেন্দ্রনাথ যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন কাত্যায়িনী ঘোড়শী। যৌবন তার ভরা দামোদরের মতো কানায়-কানায়। বিবাহের পর আর তার স্বামী-সন্দর্শন ঘটেনি। ভিন্ন গায়ের যে নৈক্য কুলীনটি জগু ঠাকরুণকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিয়ে ছিল, বরপণটি উত্তরীয়-প্রান্তে বেঁধে চলে গিয়েছিল, সে আর কোনদিন ফিরে আসেনি। তার পৈত্রিক ভদ্রাসন গো-আড়ি গ্রামে। বর্ধমানরাজের এস্তিয়ারভুক্ত নয়। নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীর সন্নিকটে। দূরের গ্রাম সন্দেহ নাই। এ জাতীয় ভ্রাম্যমাণ কুলীন বিবাহ-বিশারদেরা যজ্ঞ, যাজন, পূজা পাঠ কিছুই করেন না। শাস্ত্রে নিষেধ! তাঁরা শুধু দু-এক বৎসর পর-পর স্বশুরালয়ে শুভাগমন করে থাকেন। সেটাই প্রথা। বস্তুত স্বগৃহে নিত্য অরন্ধন। বৎসরের 'বারোমাস্যায়' বিভিন্ন ব্রাহ্মণবাড়িতে তাঁর পর্যায়ক্রমে জামাই আদর, এবং রাতে নিত্যনতুন শয্যাসঙ্গিনী—সবকয়টি সীমন্তিনীই ওঁর অগ্নিসাক্ষী সহধর্মিণী। সারাটি বছর স্বামী সন্দর্শনের তীব্র কামনা নিয়ে হতভাগিনীর দল অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গনে! পরদিন জামাই-বিদায় নগদে গ্রহণ করে গ্রামান্তরে চলে যায় সেই বিবাহ-বিশারদ নৈক্য কুলীন। উপায় কী? বৎসরে মাত্র তিনশত পয়ষড়ির অধিক রাত্রির ব্যবস্থা যে করেননি কৃপণ বিধাতা! ভাবছ, তাদের জীবন সুখের? কী বুঝবে তোমরা? বারোমাস্যায় লাভের অংশটাই শুধু দেখলে হে, কিন্তু লোকসানের খতিয়ানটা সমঝে নিলে না! নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—প্রতিটি রজনীতে ক্ষুধিতা বাঘিনীর আক্রমণ! দুটো সুখ-দুঃখের কথা প্রাণ খুলে বলার অবকাশ নেই—দুজনেই দুজনের অপরিচিত-অপরিচিত! ওদের বাসাই নেই, তার 'ভালোবাসা'! সাংসারিক চিন্তা নেই, সময় নেই, সন্তানের সান্নিধ্য নেই—শুধুই নিরঙ্কুশ জৈবিক আচরণ। একজনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা—একরাত্রির মেয়াদের, আরজনের নিদারুণ ক্লান্তি—নিত্য অবক্ষয়ের! কোন কোন স্বশুরালয়ে অবশ্য একাধিক রাত্রি বাস করতে হয়—কখনো বা পুরো সপ্তাহ! সে আমলে কেউ পরিসংখ্যান রাখেনি, রাখলে দেখা যেত—সেই স্বশুরালয়ের প্রোথিতভর্তিকারটির সৌন্দর্য বা যৌবন এভাবে বিবাহ-বিশারদকে বন্দী করত না—করত স্বশুরমশায়ের আর্থিক সঙ্গতি। ওরা রাতপিছু দক্ষিণা পেত!

কাত্যায়িনীর বিবাহ হয়েছে সাত বৎসর পূর্বে। জামাতা বাবাঈবংশের সেই লালরঙের খেড়ো-খাতায় এই হতভাগিনীর নামধাম লেখা পৃষ্ঠাটি যদি ইতিমধ্যে কীটদষ্ট না হয়ে থাকে,

সোত্রাই

তাহলে তার এতদিনে অন্তত একবার আসা উচিত ছিল। এটুকু গণিতশাস্ত্রের অধিকার তার নিশ্চয় আছে। সাত বৎসর পূর্বে সে যে নোলকপরা বেনারসীর ঝুটুলীটিকে দেখে গিয়েছিল, এতদিনে তার যৌবন কানায়-কানায় টলমল! অথবা কে জানে, নিত্য-অবক্ষণে সেটাই ওর আতঙ্ক কি না। মোট কথা, সে আসেনি! কেন, কে জানে? রূপেন্দ্রনাথ ছেঁট বোনটির মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারেন। খোঁজ নিতে একবার গো-আড়ি গাঁয়ে যেতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু জগুঠাকুরগণের প্রবল আপত্তি। হেতুটা তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানাননি। সেটা অনুমানসাপেক্ষ! সেই বাঁড়ুজ্জ-বংশের অভিমান!

—আমার মেয়ে কি ফ্যালনা?

‘ফ্যালনা’ না হলেও খেলনা তো বটে! পুতুল-খেলার অধিকার নিয়ে সে কি দুনিয়াদারী করতে আসেনি? কিন্তু কে শোনে সে কথা। জগু ঠাকুরগণ শেষ নিদান হৈকে রেখেছিলেন, খবর্দার! জামাইয়ের তল্লাশে গো-আড়ি যেতে পারবি না। আমি এই দিব্যি দিয়ে রাখলাম, রূপো!

কাত্যায়নীর প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। সে নীরবে তর্জনীতে অঞ্চলপ্রান্ত জড়াতে ব্যস্ত ছিল তখন।

পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকাটাই সে আমলে কোন কুলীন সুপাত্রের পক্ষে এক ভেঙ্কি। ঘটকীদের নিত্য শুভাগমন লেগেই থাকত। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে। কুলীন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কোন গ্রামে কয় ঘর তা ওদের নখদর্পণে। মায় তাদের কার ঘরে কয়টি অরক্ষণীয়া। আর কী আশ্চর্যের কথা—জগুঠাকুরগণ যখন যে পাত্রীটির বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়েন তখন দেখা যায়, সেটিই তদানীন্তন বঙ্গদেশের সবচেয়ে রূপবতী, গুণবতী, লীলাবতী! পূর্ব-জমানায় স্বয়ম্বরার কাছে ভাট যেমন বিভিন্ন পাণিপ্রার্থীর গুণাবলী গড়গড় করে আউড়ে যেত, ঘটকীরা তেমনি অনর্গল বর্ণনা করে যেত সেই নেপথ্যনায়িকাদের।

মুশকিল এই যে, রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পূজ্যপাদ পিসিমাতা ঠাকুরানীকে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে রেখেছেন তাঁর সুদৃঢ় অভিমত: ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করবেন তিনি। আজীবন আর্তজনের সেবায় ব্রতী থাকবেন—দারপরিগ্রহ আদৌ করবেন না। এমনকি ভীতি প্রদর্শন পর্যন্ত করে রেখেছেন—বেশি বিরক্ত করলে খুঁড়ামশায়ের পদচিহ্ন-রেখা ধরে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন।

জগুঠাকুরগণের ছোটভাইটি সন্মাসী হয়ে গেছে।

ভিনগাঁয়ের অরক্ষণীয়াদের কথা থাক, স্বগ্রামেই কি বিবাহযোগ্য সুপাত্রীর অভাব ছিল? গাঁয়ে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণ। অধিকাংশই রাঢ়ী শ্রেণীর। সবাই যে কুলীন, তা নয়। কিন্তু কুলীনের ঘর থেকে শুধু জামাতাই সংগ্রহ করতে হয়। না-হলে কৌলিন্য থাকে না। কন্যা সংগ্রহ করায় আপত্তি নাই। তাতে কৌলিন্য খোয়া যায় না—কিন্তু সেটা অধর্ম! একজন কুলীনকন্যাকে বঞ্চিতা করা! নেহাৎ তেমন-তেমন কৌলিন্য-মর্যাদা না পেলে তাই শ্রোত্রিয়ের ঘর থেকে পাত্রী সংগ্রহ করার প্রথা নেই।

Pathagana

ঐষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যে আবর্তে এখন আমাদের কাহিনী পাক খাচ্ছে তাকে আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে চিনে নেওয়া দরকার। সে-কালটাকে আমরা বিশেষ চিনি না।

সে আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস শাঠ্য-ষড়যন্ত্রে আর নীচতায় কানায়-কানায় ভরা। গোটা রাজ্য কঙ্কালসার—অর্থনৈতিক শোষণে। শতাব্দীর প্রারম্ভে যে প্রাচুর্য ছিল—নিরন্ন কৃষিজীবীদের না হলেও, যাকে বলে ‘জাতীয় আয়’—দিন দিন তা ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে। এক দিকে মুসলমান সুবেদার, দেওয়ান আর তাদের উচ্ছিন্নলোভী পরগাছার দল, অপর দিকে বিদেশী বণিক আর তাদের প্রসাদলোভীর আক্রমণে তিলেতিলে অবক্ষয়ের পথে ঢলে পড়ছে সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ। অন্নপূর্ণা এতদিন ছিলেন যার গৃহলক্ষ্মী, এবার তাঁকে বাঘছাল পরে ভিক্ষায় বের হতে হচ্ছে! তবু আমরা কাহিনীর যে মাঝদরিয়ায় আছি সেখানে এখনো এসে উপস্থিত হয়নি বাঙলার ভাগ্যাকাশে সেই শতাব্দীর সবচেয়ে সর্বনাশা বিভীষিকা: বর্গীর হাঙ্গামা!

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তো তার পরের কথা!



কিন্তু বিলাসী, উজ্জ্বল, দুর্নীতিপরায়ণ মুসলমান শাসককুলের অর্থগুপ্ততা আর ঘৃণ্য আদর্শ সমাজের রক্তে রক্তে বিষক্রিয়া শুরু করেছে। বিদেশী বণিকদের শোষণের পূর্বযুগ থেকেই বাঙলার ধনসম্পদ একমুখী স্রোতে ক্রমাগত চলেছে দিল্লীমুখো—রাজস্ব, নজরানা, আবওয়াব। পরিপূরণের কোনও আয়োজন নাই। ক্রমাগত অবক্ষয়ে কুবেরও হয়ে পড়েন কর্পদকহীন, অন্নপূর্ণার হাত ধরে শিবকে পথে নেমে পড়তে হয়—ভিক্ষায়।

মুর্শিদাবাদের বিলাসের স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—শহর কলকাতা। ইংরাজ বণিকের নবীন আস্তানা। ঐষ্টাদশ শতাব্দীর উষ্মযুগে—আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর কালে সেই সুতানুটি-গোবিন্দপুর অঞ্চলের লোক-সংখ্যা ছিল মাত্র পনের হাজার; আমাদের কাহিনীর কালে, পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে, তা বর্ধিত হয়েছে এক লক্ষে।

এই অর্ধশতাব্দীকালে শুধু অর্থনৈতিক আর সমাজনৈতিক অধঃপতনই নয়, সমান্তরালে সংঘটিত হচ্ছিল আর এক মর্মভেদ অবক্ষয়: সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনা!

প্রাগ্-মুসলমান যুগে ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতির কাঠামো ভারতীয় সমাজ তথা ধর্মকে ধরে রেখেছিল তাকে বলি: ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সে কালের জ্ঞানমার্গী ব্রাহ্মণ আচার্যের দল সমাজের কাছ থেকে যে খুদকুড়ো গ্রহণ করতেন, দান করতেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

‘তিস্তিড়ি-পল্লবের’ ব্যঞ্জনেই তাঁদের তৃপ্তি—নিরলস নিষ্ঠায় সমাজের নানাবিধ ‘অনুপপত্তি’ বিদূরিত করতেন তাঁরা। তাঁদের ধর্মপত্নীরাও অশন-ব্যসনের প্রত্যাশী ছিলেন না—তাদের ধর্মার্থ সিদূর আর হাতের শাখাই নবদ্বীপ-মহিবীর অলঙ্কার-প্রাচুর্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত!

সেই সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য ছিল—সামূহিক সামাজিক উন্নতি। আপামর জনসাধারণের শুধু

ইহলোক নয়, পরলোকের উন্নতিবিধান। মানুষের অভাববোধ ছিল অল্প। আত্মসন্তুষ্টি তাদের অন্তরের গভীরে। যে-যার বৃত্তিতে চতুর্বর্গের ফললাভের চেষ্টা করত—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

বঙ্গসংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল মুসলমান আধিপত্যের পরে। শাসিত সম্প্রদায়ের—অর্থাৎ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ইহলোকের উন্নতির আশা আর রইল না। হতাশার ধর্মই হচ্ছে অলৌকিকত্বে আস্থাশীল হয়ে পড়া। ফলে তারা পার্থিব কামনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে তো ছাড়লই তদুপরি সরস্বতীও তাদের ত্যাগ করে গেলেন।

ইহকাল পরকাল দুইই গেল।

ব্রাহ্মণ আচার্যের স্থলে বৃহত্তর বঙ্গসমাজে এসে আসর জমালেন টুলো-পণ্ডিতের দল। গুরু, কুলপুরোহিত, তান্ত্রিক, ডাকিনী-যোগিনী বিদ্যায় পারঙ্গমের দল। বিদ্যার স্থানে অবিদ্যা।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় আবার কিছুটা রকমফেরও হল—মুর্শিদাবাদ, শহর কলকাতায়, বর্ধমানে বা নবদ্বীপরাজের নূতন রাজধানী কৃষ্ণনগরে। এসব স্থলে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করল—বৈশ্যসমাজ। বিশেষ করে কলকাতায়। সমাজপতি না হলেও সমাজের কর্ণধার হয়ে পড়ল এক কায়স্থ-সমাজ। টুলো-পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা কায়স্থসেব্য হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নৈবেদ্যচূড়ার সন্দেশটির মতো শোভা পেতে থাকেন। হিন্দু বণিক-কায়স্থরা হল সমাজের মেরুদণ্ড। বৈশ্য-সম্প্রদায়ের অপরাপর লোকেরা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ-সমাজ পূর্বযুগের মতো বর্ণাশ্রম-ধর্মের কাঠামোয় গড়া নয়। আর্থিক সঙ্গতিই এই সমাজের জিয়নকাঠি-মরণকাঠি। কলকাতায় তা ছিল ইংরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ঢাকা বা কৃষ্ণনগরে এই রূপান্তর পূর্বযুগ থেকেই ধীরে ধীরে দেখা গিয়েছিল ভিন্নতর হেতুতে—

মুর্শিদকুলী ঋ তঁার মুসলমান রাজকর্মচারীদের উপর আস্থা রাখতে পারতেন না। সঙ্গত কারণে। মুসলমান কর্মচারীরা অনেকসময় আদায়ী রাজস্বের হিসাব দিতে পারত না। হেতু দ্বিবিধ—অশিক্ষা এবং অসাধুতা। মুর্শিদকুলী তাই গোটা বাঙলাদেশকে তেরটি প্রধান বিভাগে বা চাকলায় ভাগ করেছিলেন। তিনি বেছে বেছে বিশ্বস্ত হিন্দু কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন—যারা হিসাব বোঝে, হিসাব দিতে জানে এবং পরস্বাপহারক নয়। এই জাতীয় লোক ক্রমাগত নিয়োগ হতে থাকে ইজারাদার বা দেওয়ানী বিভাগে। ঐ সব ইজারাদার রাজস্বের অতিরিক্ত যদি কিছু উপার্জন করত তাতে চোখ বুজে থাকলেই হল। এই ইজারাদার-প্রথা প্রবর্তনের পিছনে আরও একটি মর্মভুদ হেতু আছে। মর্মভুদ এজন্য যে, তার সুদূরপ্রসারী ফল সমাজের উপর পড়েছিল।

শাসকদল হঠাৎ বুঝে ফেললেন যে, এতাবৎকালের জমিদারবৃন্দ প্রকারান্তরে প্রজার মঙ্গল চাইতেন। কেন? অনেকগুলি হেতুতে। প্রথমত তাঁরা গ্রামেই বাস করতেন—প্রজাদের সুখ-দুঃখের ছিলেন ভাগিদার। অজ্ঞান-দুর্ভিক্ষ-বন্যা তাঁদের প্রত্যক্ষ সত্য। খাজনা মাপ করা তাঁদের একটা বাতিক! দ্বিতীয় কথা—যে হাঁস বছর বছর সোনার ডিম পাড়ে তার মাংস খেতে তাঁরা নারাজ। ভূস্বামীর সঙ্গে কৃষিজীবীর—মন্দিরচূড়া আর বনিয়াদ—একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। মূর্থ জমিদারগুলো কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, এক ঝাঁক স্বর্ণডিমপ্রসূ হাঁসের বিলোপে আর এক ঝাঁক এসে হাজির হবে পরবর্তী প্রজন্মে!

তাই শাসকশ্রেণী প্রবর্তন করল 'ইজারাদারী' ব্যবস্থা। ইজারা যে নিচ্ছে সে যে গ্রামে থাকবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নায়েব-গোমস্তা-পাইক পাঠিয়ে সে রাজস্ব আদায় করবে। রাজা-প্রজা সম্পর্কের সূত্রে মহানুভবতা দেখানোর ব্যতিক্রম তাদের থাকবে না। দোল-দুর্গোৎসবে আপামর জনসাধারণকে ডেকে পাত পাড়তে বলবে না নিজ ভদ্রাসনে। গ্রাম্যজীবনের বাহিরে থেকে আদায় করে যাবে প্রাপ্য—দেখবে না, ওরা কিসের বিনিময়ে কী-ভাবে খাজনা দেয় 'আবু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে' না 'বুকের রক্ত দিয়ে!'

ধীরে ধীরে সে-কালীন ভূস্বামীদের অবসান হয়ে আসে। তার পরিপূরকরূপে আবির্ভূত হতে থাকে ইজারাদারেরা—পরবর্তীকালে বঙ্গভূমে অত্যাচারী 'জমিদার' নামক যে সমস্ত রক্ত-শোষকের আবির্ভাব হয়েছিল তারা এই অষ্টাদশ-শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইজারাদারদেরই বংশধর।

সোএগ্রাই গ্রামখানি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘায়ত। দামোদর নদের দক্ষিণ বরাবর। ভদ্রপল্লী সবই এই তটে। ও পারে—উত্তর পাড়ে, জল-অচল অচ্ছুতদের বাস। উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর। দুটিই পূর্বাভিমুখী। অচ্ছুতেরা পারানি-নৌকায় নিত্য এ পারে আসে রুজি-রোজগারের ধান্দায়। এক ক্রোশ উজানে একটি মুসলমান পল্লী—পীরপুর। এ পারে ঘননিবদ্ধ একটি ব্রাহ্মণ পল্লী। রাঢ়ী সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিছু দূরে কায়স্থ পাড়া, আর তাঁটিতে বেশ কতকগুলি তন্তুবায় পরিবার। গ্রামের সীমানা—পশ্চিমে তেঁতুলবট, পূর্বে ভোলাবাবার মন্দির।

দামোদর—শুধু দামোদরই বা কেন, অজয় নদেরও তখন প্রকৃতি ছিল ভিন্নতর। 'হিরোসিমা' বা 'ক্র্যাকাটোয়া' জাতীয় ভৌগোলিক নামগুলি শুনলেই যেমন আমাদের চিন্তাজগতে উদয় হয় 'বিষ্ফোরণ' শব্দটা, তেমনি সে-আমলে 'দামোদর', এই ভৌগোলিক নামটির সঙ্গে 'বন্যা' শব্দটা অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কে যুক্ত ছিল না। তার হেতুটা সহজবোধ্য। তখনো ঐ প্রাকৃতিক আশীর্বাদটিবে মানুষ শৃঙ্খলিত করেনি। বর্ষায় বন্যা হত না, হত—জলক্ষীতি। ভাদ্র-আশ্বিনে। দুই কূল ছাপিয়ে দামোদর প্রবেশ করত গ্রামে। অপ্যাতদৃষ্টিতে আদিগন্ত সমুদ্র। কিন্তু জলের গভীরতা সামান্য। ধরবাড়ি ডুবিয়ে, তালগাছ ছাপিয়ে নয়। দামোদর—ভুললে চলবে না, নদী নয়, নদ। অজয়ও তাই। তারা সে-আমলের নৈকষ্য কুলীন নদ। বৎসরান্তে শৃঙ্গবাড়িতে আসত। আদিগন্ত কৃষিক্ষেত্র মাথায় সিঁদুর আর হাতে শাখা নিয়ে গোটা বছর তার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকত। পলিমাটির আশীর্বাদে সেই শবরীর-প্রতীক্ষারতাদের দামোদর আর অজয় সার্থক করে যেত। দস্তান জন্মাতো পাকা ধানের মাথায় মাথায়। বন্যার জল ভেঙে যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেত গ্রামাবধূরা তখন তাদের হাঁটুর উপর শাড়ি তুলতে হত না। দামোদরের আশীর্বাদে পেট ভরে তারা ভাতও খেতে পারত।

সে-আমলে নৈকষ্যকুলীন দামোদর রাঢ়-শাণ্ডী ঠাকরনের সেই কন্যা-বিদায়কালীন মিনতিটুকুর মর্যাদা দিত: 'আঁটু ঢাকি বস্ত্র দিহ, পেট ভরি ভাত।'

ভৌগোলিক বিচারে সোএগ্রাই পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘায়ত হলেও অর্থনৈতিক আর সামাজিক জ্যামিতির ছকটা ছিল ত্রিকোণাকৃতি। সমকোণী ত্রিভুজ। শীর্ষবিন্দুটি সাবেক জমিদার

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী, আর ত্রিকোণভূমির দুই প্রান্তের দুই কোণে দুটি ‘হঠাৎ-নবাব’—নন্দ চাটুজ্জি আর দুর্গা গাঙ্গুলী।

আসুন, একে একে পরিচয় করিয়ে দিই : ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সাবেক ভূম্যধিকারী। চার পুরুষে সোণাই গ্রামের ভূস্বামী। ব্রজেন্দ্রের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ঠিক কী হেতুতে তাঁর বরেন্দ্রভূমের সাবেক আবাস ছেড়ে এই রাঢ়খণ্ডে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেটা ইতিহাসের একটা অনুদঘাটিত অধ্যায়। সাবেক জমিদারবাড়ি ঘিরে একটি বারেন্দ্রপাড়া। খোঁজ নিলে দেখা যাবে সেইসব ভদ্রাসনের আদি-পুরুষেরা এসেছিলেন ঘরজামাই হিসাবে। ক্রমে আর্থিক সঙ্গতি লাভের পর নিজ-নিজ ভদ্রাসন নির্মাণ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের বৃহৎ পরিবার। দিনে, দুবেলায় অন্তত পঞ্চাশটি পাতা পড়ে। তাঁর গৃহে দোল-দুর্গোৎসব হয়। জমিদার বাড়ির ভিতরেই আছে একটি দেবালয়—শিবমন্দির। নিত্যপূজার ব্যবস্থা। ভাদুড়ীদের কীর্তি সোণাই গ্রামের চতুর্দিকে ছড়ানো—নীল সায়র, পদ্মদীঘি, চতুষ্পাঠী এবং গ্রামপ্রান্তে সর্বসাধারণের জন্য ভোলাবাবার মন্দির।

নন্দ ও দুর্গা ‘হঠাৎ-নবাব’ হয়েছেন মাত্র এক-পুরুষে। সম্পত্তি তাঁদের স্বোপার্জিত। তাঁরা দুজনেই এ গ্রাম্য-সমাজের মাথা। তাঁদের যৌথ নিদানই ইদানীং গ্রামবাসীর কাছে বেদব্যাক্য। এক-পুরুষ আগেও ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পিতৃদেব ছিলেন এ গ্রামের একজন সমাজপতি। ব্রজেন্দ্র সম্প্রতি স্বেচ্ছায় সে অধিকার ত্যাগ করেছেন। দুটি হেতুতে। প্রথমত তিনি নির্লিপ্ত থাকতে চান, দ্বিতীয়ত দুই ‘হঠাৎ নবাব’ উঠে পড়ে লেগেছেন প্রমাণ করতে যে, এই রাঢ়ভূমে ঐ কয়টি পরিবার বহিরাগত। ওদের লৌকিক আচার-বিচার ভিন্নতর। ওদের কুশঙিকা পর্যন্ত হয় বরের বাড়িতে, কন্যাগৃহে নয়! ঐরা দুজনেই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, ঐদের কৌলীন্য যাবৎচন্দ্রার্কমেদিনী না হলেও সেই বঙ্গাল সেন অথবা আদিশূরের আমল থেকে! বঙ্গাল আর আদিশূরের মধ্যে কে যে ব্যোজ্যেষ্ঠ সেটা ঠরা ঠিক মতো জানেন না—মোটকথা সেই প্রাচীনতর আমল থেকে। জমিদার যে ‘বারিন্দ্র’ এই সহজ কথাটা এতদিন বেমানাম ভুলে ছিল এই রাঢ়ভূমের ব্রাহ্মণ সমাজ। এতদিনে ঠরা সে তত্ত্বটা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু গৈয়ো ভূতগুলো গাধারও অধম। বোঝে না, অর্থকৌলীনে ঠরা দুজন একপুরুষই ব্রজেন্দ্রের কাছাকাছি উন্নীত হয়ে পড়েছেন। ঐ দুই ‘হঠাৎ-নবাব’কে দেখলে গাঁয়ের মানুষ ঘাড় নিচু করে ‘পাতঃপেনাম’ জানায়, আর দূর থেকে সাবেক জমিদার-মশায়ের পালকি আসতে দেখলে আজও সাষ্টাঙ্গ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

নন্দ চাটুজ্জি উপ-ইজারাদার। অর্থাৎ বর্ধমান শহরের ধনকুবের নরেশ দত্তের তরফে রাজস্ব আদায় করে থাকেন। ক্রমে ক্রমে মাছের তেলে মাছ ভাজতে শুরু করেছেন। ব্রজেন্দ্র অনেকগুলি মহাল ছেড়ে দিয়েছেন—ক্রমশঃ যেন জমিদারী সঙ্কুচিত করে আনছেন। হয়তো এ গ্রাম ত্যাগ করে যাবারই একটা গোপন বাসনা আছে তাঁর। দুই নবীন প্রতিযোগীর অস্তিত্ব কিছু অর্থগমের ব্যবস্থা আছে। নন্দ ইজারা নিয়েছেন দামোদরের পারানি-ঘাট ও কুঞ্জার। হাটে যা বিকি-কিনি হয় তার উপর খাজনা আদায় করেন, ধান-চালের উপর ‘কৌহলী’ পান। গ্রামে কেউ স্থাবর সম্পত্তি কিনলে ‘সেলামি’ দিতে হয়। কোন বিয়ে-সাদি হলে ইজারাদারকে বরপক্ষ দেন দেড়টাকা, কন্যাপক্ষ তিনটাকা। এসবকিছুই আদায় হয় মূল ইজারাদার নরেশ দত্তের

নামো নন্দ চাটুজে একটি কমিশান পান মাত্র। তহশীলদার ইত্যাদির বেতন তাঁকে দিতে হয় না। সেটাও ইজারাদারের দেয়।

গাঙ্গুলীমশাই নিয়েছেন তন্তুবায়দের শোষণ-দায়িত্ব। পাঁচখানা গ্রামে যা কিছু উৎপন্ন হয় তার তুলোর যোগান থেকে উৎপন্ন-দ্রব্যের বিক্রি-ব্যবস্থা গাঙ্গুলীর। গো-গাড়ির সারি প্রথমে যায় উত্তর-মুখো। অজয়ের তীর পর্যন্ত। তারপর নৌকাযোগে পূবমুখো—ইলামবাজার, কাটোয়া, ফরাসডাঙা, মায় শহর কলকাতা। ফেরার পথে নৌকা নিয়ে আসে লবণ আর গঙ্গাজল। দুটিই এ গ্রাম্যজীবনে আবশ্যিক উপাদান। লবণ-এর মহাজনী নৌকা দু-দিন দেরি করে এলে তবু জীবনযাত্রা থেমে থাকবে না—কাঁচা ফলার বা আলুনিব্যঞ্জে জীবনধারণ করা সম্ভব। কিন্তু এই নিগদার দেশে গঙ্গাজল না পেলে যে সৃষ্টি ঠাকুরও মাঝ-আকাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বেন! ঠগ-জুয়াচোরের তো আকাল পড়েনি—তাই গাঙ্গুলী-মশায়ের গঙ্গাজলের কলসি গোটা এলাকায় বিক্রি হয়। বর্ধমান-বীরভূম-বাকুড়া মায় জঙ্গলমহল। কলসির মুখ গামছা দিয়ে বাঁধা। দড়ির গ্রহ্নির উপর গাঙ্গুলীমশায়ের ‘আগমার্ক’ ছাপ। সীলমোহর ছাপ দেন ইমানদার ব্রাহ্মণ।

ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ। ‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’ প্রবাদবাক্যটা সম্বন্ধে নিতে না পারায়।



পশ্চিমাকাশের দিকে একবার দৃকপাত করে মৌলবী-সাহেব বললেন, শাম-ওয়ন্ত হয়ে গেল

—না। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে। সূর্যাস্তের এখনও বাকি আছে। আপনার নামাজের সময় হয়নি।

—তা হোক। আজ এই পর্যন্তই থাক। আপনার গৃহে একজন মেহমান আসছেন, মনে হচ্ছে।

পুঁথিপত্র বঁধে নিতে থাকেন মৌলভী-সাব।

কথা হচ্ছিল রূপেন্দ্রনাথের দাওয়ায়। প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে মৌলবীসাহেব আসেন ঠুকে আরবী-ফার্সী শেখাতে। রূপেন্দ্রনাথ বর্ধমানের একজন প্রতিষ্ঠাবান মুসলমান ভেষগাচার্যের কাছে হাকিমী-বিদ্যা শিখতে ইচ্ছুক। তার পূর্বে ঐ দুটি ভাষা গ্রামে বসেই আয়ত্ত করতে চান। পীরপুরের মৌলভীসাব এ দায়িত্বটা গ্রহণ করেছেন। প্রত্যহ পড়ন্ত-বেলায় তিনি আসেন—জুম্মাবার বাদে—সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে ওঁদের ভাষাশিক্ষার আসর। তার পর জুগুপ্সাকরূপে কিছু ফলমূল-বাতাসা নিয়ে আসেন, একগলা ঘোমটা টেনে। মৌলভীসাব গম্ভীরভাবে অঙ্গ সেরে নামাজ পড়েন, তারপর ঐ দেবতার প্রসাদটুকু মুখে ফেলে বিদায় নেন। দামোদর পার হয়ে পীরপুরের দিকে।

মেহমানের উল্লেখে রূপেন্দ্রনাথ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, ঠিকই। নন্দদুলাল চাটুজ্জে। বিচিত্র পোশাক তাঁর। পরিধানে যদিচ ধূতি, কাছা-কোঁচা দেওয়া, তবু তার উপর যাগরা জাতীয় একটি অতি সূক্ষ্ম আবরণ, মধ্যদেশে রজ্জুবদ্ধ। উর্ধ্বাঙ্গে পুরোহিতা বেনিয়ান। কণ্ঠে একটি মুক্তার মাল। মাথায় শামলা, যদিচ পশ্চাদেশে শামলার বাইরে বার হয়ে আছে দীর্ঘ শিখার প্রান্তদেশ। তার শেষপ্রান্তে একটি অপরাজিতা অনুবিদ্ধ। তাঁর পিছন পিছন তালপাতার ছাতা ধরে আসছিল দোবেজি—ওঁর দেহরক্ষী-তথা-খিদমদগার। রোদ নেই এই সন্ধ্যাকাশে, বৃষ্টিও নেই। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে ছত্রধারী অনুগমন করছে।

রূপেন্দ্রনাথ মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। মৌলবীসাবও দ্রুতহস্তে মাদুরটা গুটিয়ে নেন। দাওয়া থেকে নিচে নেমে দাঁড়ান। রূপেন্দ্রনাথ সবিনয়ে যুক্তকরে বলেন, আসুন, আসুন, চাটুজ্জে কাকা। মৌলবী-সাবও মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, আদাব।

দোবেজি ছাতা নিয়ে অন্তরালে সরে যায়।

নন্দ বলেন, ‘আসুন, আসুন,’ মুখে তো বলছ রূপেন, কিন্তু যাই কী করে?

তর্জনী-সঙ্কেতে দাওয়ার দিকে কী-যেন দেখালেন। রূপেন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারেন না। তালপাতায় বোনা মাদুর—যা বিছিয়ে ওঁরা দুজনে এতক্ষণ বিদ্যাচর্চা করছিলেন, স্পর্শদোষ ঝাঁচাতে সেটা তো মৌলবী-সাব ইতিপূর্বেই অপসারণ করেছেন। তাহলে? রূপেন্দ্রনাথ না বুঝলেও মৌলবী-সাব বুঝে ফেলেছেন, ‘মাফি কিয়া যায়’ বলে তিনি একপাশে সরে গেলেন। তাঁর ছায়াটিও যেন লজ্জা পেল; অনুগমন করল কায়ার। গৃহস্বামীকে বললেন, কাল আবার একই সময়ে আসব।

দুজনকেই আদাব জানিয়ে বড় বড় পা ফেলে তিনি ঘাটের দিকে রওনা হয়ে যান।

এতক্ষণে সমস্যাটার পূরণ হল। অন্তাচলগামী সূর্যের আলোয় ঐ যবনের ছায়াটা দীর্ঘায়িত হয়ে পড়েছিল দাওয়ায়।

পাদুকা ত্যাগ করে নন্দ চাটুজ্জে উঠে এলেন দাওয়ার উপর। রূপেন্দ্র প্রণাম করার উদ্যোগ করতেই এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন, দূর থেকেই পেলাম কর বাবাজি, এই অবেলায় আর ছান করতে পারব না।

রূপেন্দ্র যবনের সঙ্গে একাসনে বসেছিলেন এতক্ষণ। একটা চৌপায়া টেনে নিয়ে নন্দ বসলেন। রূপেন্দ্র বসে পড়েন নিকানো দাওয়ায়। বৃদ্ধ বললেন, তুমি ‘মায়ের ইচ্ছায় গায়ে ফিরে এসেছ। খুবই আনন্দের কথা। রাজই ভাবি এসে দেখা করে যাব, সময় করে উঠতে পারি না।

রূপেন্দ্র কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, আমারই যাওয়া উচিত ছিল, কাকা, কিন্তু ...

নন্দ কথা ঘোরালেন। প্রশ্ন করেন, উটি কে এয়েছিল? পীরপুরের কলিম-মোম্বা নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মৌলভী কলিমুদ্দীন। ওঁর কাছে আমি আরবী-ফারসী শিক্ষা ক্রি।

—খুব ভাল কথা বাবা, খুবই আনন্দের কথা। এই অং-বং-ভাষার জমানা গোছে। এখন উন্নতি করতে হলে স্নেহভাষা শিখতেই হবে। একটু রপ্ত করে নাও ত্বরপূর বড়কর্তাকে ধরপাকড় করে তোমাকে আমি মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেব। নির্যাস সায়েবের দরবারে ‘বড়কর্তা’ যে নরেশ দত্ত এটুকু বুঝলেন রূপেন্দ্র। মুর্শিদাবাদের দরবারে রজি-রোজগারের বাসনা যে তাঁর আদৌ নাই, একথা জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনিও প্রসঙ্গান্তরে

চলে এলেন, খুঁড়িমাঝা ভাল আছেন? বাড়ির আর সবাই?

—তা পরের মুখে কাল খাবে কেন বাবা? সে তো তোমার নিজের বাড়ি। সৌরীনদা ছিলেন আমার বড় ভাইয়ের মতো। বলতে গেলে একই পরিবার। তুমি বরাবর বিদেশে ছিলে বলেই ...

ইতিমধ্যে জগুঠাকরুণ এসে দাঁড়িয়েছেন ভিতরের দরজার সামনে। পরনে থান, মাথায় আধো-ঘোমটা। সেখান থেকেই বলেন, কী সৌভাগ্য! চাটুজে ঠাকুরপোর পদধূলি পড়ল আজ এ বাস্তুতে! বসুন, আমি একটু বেলের পানা আর নৈবেদ্যের কুচোকাচা কিছু নিয়ে আসি।

নন্দ হাত দুটি জোড় করে বলেন, ও-কথা বলবেন না জগু-দিদি। প্রসাদ গ্রহণ করতে পারছি না—এ-কথা মুখে 'উরুশ্চারণ' করাও পাপ! কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, মানে ...

জগুঠাকরুণ বলে ওঠেন, বুঝেছি! তা মতির মায়ের বাতের ব্যথাটা এখন কেমন আছে?

—ও তো তার বাকি জীবনের সাথী হয়ে রইল, দিদি। হরিমতি যদি মায়ের দায়িত্বটা নিতে না পারত তাহলে সংসারটা ভেসে যেত।

—মতি? সে তো নেহাৎ বাচ্চা! কত বয়স হল তার?

নন্দ হাসলেন। বলেন, কুলীনের ঘরের অরক্ষণীয়ার বয়সের কেউ হিসাব রাখে, দিদি? তবে গৌরীদানের বয়স যে আর নেই তা তো আপনিও জানেন। একপক্ষে এ ভালই হয়েছে। আমার তো আরও তিনটি কন্যা আছে। গৌরীদানের পুণ্য পরেও অর্জন করতে পারব। কিন্তু হরিমতি আমার সংসারে না থাকলে সব ভেসে যেত। দারুণ বুদ্ধিমতী! সবদিকে তার নজর। জানেনই তো, দৈনিক আমার বাড়িতে দু-বেলায় দেড়কুড়ি পাতা পড়ে। হরিমতির মা তো দেখা-শোনা করতে পারে না, সব ব্যবস্থা ঐ হরিমতির। এদিকে সংসার, ওদিকে মায়ের সেবা, আবার 'মায়ের নিভাপূজার যোগান। আমি অবাধ হয়ে ভাবি—কেমন করে মেয়েটা এমন দশভুজা হয়ে উঠল? সবই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! তারা—তারা—মা!

জগুঠাকরুণ মনে মনে হাসছিলেন। চাটুজে-বাড়ির হক হদিস তাঁর অজানা নয়। নন্দ-চাটুজের তিন তিনটি পত্নী। সংসারের যাবতীয় দায়বদ্ধি তাঁর নিঃসন্তান বড় বউয়ের। স্বামীর অধিকার হারিয়ে সেই সন্তানবদ্ধিতা সংসারটিকেই আঁকড়ে ধরেছেন। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন—অথবা কে-জানে হয়তো বিবাহিতযুগের উষাকালের স্মৃতিচারণে তাঁর অবকাশ কাটে। মেজবৌ—হরিমতির মা—বাতে পঙ্গু। পড়ে আছে সংসারের একপ্রান্তে। নন্দ চাটুজের নয়নের মণি এখন তৃতীয়পক্ষ। সে ঐ কাতুর চেয়ে দু-এক বছরের বড় হবে হয় তো। কী উদ্দেশ্যে বড় মেয়েটির গুণগানে আজ চাটুজে মশাই চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেজেছেন তা বুঝতে বাকি থাকে না। কথা ঘোরাতে বলেন, আপনি এসে পড়েছেন, ভালই হল, অমাবস্যার পারণ কি কাল না পরশু?

—কালই দিদি। আর সেজন্যই তো আসতে হল। মঙ্গলবারে অমাবস্যা পড়েছে, তাই মায়ের পূজার সামান্য আয়োজন করেছি। পূজা তো সারারাত ধরে, পশু রূপো-বাবা দ্বিপ্রহরে আমার ওখানে মহাপ্রসাদ পেয়ে আসবে। মাত্র ছাদশটি ব্রাহ্মণ সেবা করব। তার-ভিতর একজন আমাদের রূপেন। আপনাকে অনুমতি দিতে হল, দিদি।

জগুঠাকরুণ আড়-চোখে একবার ভাইপোকে দেখে নিয়ে বলেন, আমার অনুমতি আবার কিসের? ওকেই বলুন?

সোপান

—ওকে তো বলবই। তবু আপনি যখন আছেন মাথার উপর...তা, বাবা রূপেন, তুমি আসবে। কেমন? 'গুন্তির বামুন', যেন অন্যথা না হয়।

রূপেন্দ্রনাথ যুক্তকরে বলে ওঠেন, আপনার ভদ্রাসনে পাত পাতব এ তো আমার সৌভাগ্য; কিন্তু এবার আমাকে মাপ করতে হবে, কাকা। অন্য কোন দিন...

ভুকৃষ্ণিত হল নন্দ চাটুজের। প্রশ্ন করেন, কেন, বলত?

—সং শান্ত ব্রাহ্মণ আপনি অনায়াসেই গ্রামে জোগাড় করতে পারবেন। আমি পেশায় কবিরাজ—কেউ ডাকতে এলে 'যাব না' বলতে পারব না তো। আপনি 'গুন্তির বামুন' বললেন কি না—

—বেশ, না হয় আমি তোমাকে 'গুন্তির বামুন' হওয়ার বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি দিলাম। রূগী-পুস্তরের কামেলা মিটিয়ে নিশ্চয় যাবে, কথা দাও?

রূপেন্দ্রনাথ তখনও যুক্তকর। বলেন, এবার থাক, কাকা।

পুনরায় ভুকৃষ্ণিত হল নন্দর। বললেন, তোমার বাবা, তোমার ঠাকুরা দুজনেই ছিলেন শান্ত। তুমি কি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছ?

—আজ্ঞে না। দীক্ষা আমি গ্রহণ করিনি।

—তাহলে? আপত্তিটা কিসের?

রূপেন্দ্র ইতস্তত করে বললেন, দেখতেই তো পেলেন, আমি আচার-বিচার ঠিক মতো মানি না। 'মায়ের পূজার আয়োজন করেছেন, সেখানে আমার না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোথায় ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়ে যাবে।

নন্দ দৃঢ়স্বরে বলেন, যাবে না। আমি গঙ্গা-জল ছিটিয়ে দেব তোমার মাথায়। তবে একথাও বলি, রূপেন—এ মোহলমানের সঙ্গে এক মাদুরে ভর সন্ধ্যাবেলায় তোমার ওভাবে বসাটা ঠিক নয়। মোহলমানদের ভাষা শিখছে ভাল কথা—ওটা না আয়ত্ত্ব হলে নবাব সরকারে পাত্তা পাবে না। দলিল দস্তাবেজ সবই এ যাবনিক ভাষায়। কিন্তু তাই বলে একাননে বসা...তুমি এক কাজ কর। কলিম মোল্লা এলে এ তৈলবটের ছায়ায় গিয়ে দুজনে বস। মহামতি বিদুর একবার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন যে, ভূমিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আসন! বুঝলে না বাবা?

রূপেন্দ্রনাথ বুঝলেন। 'ধর্ম' শব্দটা 'উরুশ্চারণ' পর্যন্ত যিনি করতে পারেন না, মহাভারতটাও যিনি পড়েননি—ভাসা-ভাসা শুনেছেন, তিনিই আজ সমাজপতি!

—আজ, উঠি। কেটপক্ষের রাত। এখনি সব আধার হয়ে যাবে। —তাহলে এ কথাই রইল। যত বেলাই হক, রূগীপুস্তর সব মিটিয়ে তুমি দুপুরে আমার ওখানে আসবে। বিকাল হয়ে যায়, তাই সহ! কেমন?

গাওঁখান করলেন এবার। রূপেন্দ্রও উঠে দাঁড়ান। মৃদুভাবে বলেন, আমি তো আগেই বলেছি কাকা—কিছু বাধা আছে। পরে একদিন আপনার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করে আসব।

নন্দ স্পষ্টতই বিরক্ত। ওর একগুঁয়েমিতে। কী ভেবেছে ছোকা? ওঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ধন্য করে দিচ্ছে? সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, বাধা আছে তা বলেছ, কিন্তু 'বাধাটা' কী, তা তুমি শান্তবংশের সন্তান, মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বোষ্টমও হওনি! তাহলে এই জেদাজেদের অর্থ কী?

জগুঠাকরুণ দাঁড়িয়ে আছেন তখনো। অন্দরমহলের দ্বারদেশে। দ্রাতুপ্পুরের এই একগুঁয়েমির অর্থটা তিনিও প্রণিধান করতে পারছেন না। হতভাগাটা কী ভাবছে? চাটুজে বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলে ওরা জোর করে ঐ হরিমতিকে সাতপাক ঘুরিয়ে দেবে? সে এখনো নীরব আছে দেখে তিনি বলে ওঠেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান ভাই। আমি ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে পাঠিয়ে দেব। আর নেহাৎ না যায় তো নাই গেল, ও তো আর ‘গুন্তির বামুন’ থাকছে না!

নন্দদুলাল নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। করার কথাও। ঐ একফোঁটা ছোকরা ভেবেছে কী? গম্ভীর হয়ে বলেন, না, দিদি। ব্যাপারটা অত সহজে মিটেবে না। আমি এই সোঞাই গায়ের সমাজপতি। আমাকে জেনে যেতে হবে। দু-পাতা সমস্কৃত পড়ে ও এমন দিগ্ভ্রজ পণ্ডিত হল কী করে যে, আমার বাড়ির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে? মায়ের প্রসাদ মুখে দেব না বলে!

জগুঠাকরুণ শিহরিতা হয়ে ওঠেন। এ কোথা থেকে কী হতে বসেছে! নন্দ চাটুজে এ গায়ের মাথা। ইচ্ছে করলে হাতে মাথা কটতে পারেন। সত্যি তো! এভাবে মানী লোকটাকে অপমান করার কী অর্থ? বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকেন, রূপো!

রূপেন্দ্রনাথ এখনো যুক্তকর! শান্তস্বরে বলেন, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন কাকা! আপনার নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করিনি। কেন করব? আপনি আমার পরমপূজ্য—সোঞাই গ্রামের সমাজপতি। ভবিষ্যতে যেদিন, ডাকবেন, আমি আপনার বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়ে আসব।

—কেন? ভবিষ্যৎ কেন? কেন পর্শ নয়?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, সে-কথা থাক না, কাকা!

—না! থাকবে না! আমাকে জেনে যেতে হবে! আমার জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। কেন থাকবে?

—কথাটা অপ্রিয়। অহেতুক আপনাকে আঘাত দিতে চাই না বলে। আপনার ধর্ম আপনার, আমার ধর্ম আমার। কী প্রয়োজন বিরোধের সৃষ্টি করে?

নন্দ চাটুজে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, তোমার বাবা কিন্তু এমন মিন্মিন্ম করতেন না রূপেন। সত্যিকথা মাথা খাড়া রেখে বলবার হিম্মৎ ছিল তাঁর। তোমার ঠাকুদাও ছিলেন স্পষ্টবক্তা। সেই বংশের ছেলে হয়ে তুমি যে সত্যিকথা বলতে ভির্মি খাও—সেই বাঁড়ুজে-বংশের ভিটেয় দাঁড়িয়ে...

রূপেন্দ্রনাথের চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। বলেন, থাক! ‘মাত্রুয়াং সত্যমপ্রিয়ম্’ নীতির নির্দেশেই এতক্ষণ আপনাকে দাগা দিতে চাইনি। কিন্তু আপনি আমাকে বাধ্য করলেন। তাই বলছি, আমি ‘মহাপ্রসাদ’ গ্রহণ করি না।

বজ্রাহত হয়ে গেলেন নন্দদুলাল!

বেশ কিছুটা সময় লাগল তাঁর স্বাভাবিক হতে। তারপর পাশে ফিরে দেখলেন জগুঠাকরুণও দারুমূর্তিতে রূপান্তরিত। নন্দ তাঁকে বললেন, একটু আগে আপনার ভাইপোকে বলছিলুম, পায়ে হাত দে পেন্সামটা করিসনি রূপেন, এই অবেলায় ছান করলে শরীর খারাপ হবে। তা আপনার ভাইপো এই বুড়ো মানুষটাকে ভরস্কে বেলায় ছানটা করিয়েই ছাড়ল। যে কথা

এইমাত্র শুনলুম, তারপর ছান না করে তো বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে পারব না!

জগুঠাকরুণ সে-কথার জবাব না দিয়ে ভাইপোকেই প্রশ্ন করেন, এত বড় কথাটা তুই বলি? শান্ত বংশের সন্তান হয়ে? কিন্তু কেন, কেন, কেন?

রূপেন্দ্রনাথ এখনো যুক্তকর। শান্তকণ্ঠে বলেন, সময়মতো তা আপনাকে বুঝিয়ে বলব, পিসিমা। অনেক সময় লাগবে।

নন্দ চাটুজে চৌপায়াটা আবার টেনে নেন। বসে পড়েন। ইতিমধ্যে পিলসুজের উপর প্রদীপটা বসিয়ে কাত্যায়নী এসেছিল একবার। হাওয়া বাঁচিয়ে কপাটের আড়ালে প্রদীপটা রেখে সেও কাঠ হয়ে অপেক্ষা করছে। দাদাকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধাও করে, কিছু না বুঝেও। কথোপকথন সব কিছুই কানে গেছে তার। নন্দ বললেন, যদি সারারাতও লাগে তবু ব্যাখ্যাটা আমাকে শুনে যেতে হবে। বল? তুমি আমিষ আহার কর না?

—করি। খাদ্য-খাদকের এই সম্পর্ক জীবজগতে অনবীকার্য! এমন একটা ব্যবস্থাপনা কেন যে করেছেন দিন-দুনিয়ার মালিক, তা জানি না। তাই মৎস্য ও মাংস দুইই আমি ভক্ষণ করে থাকি। তবে মাংসের ক্ষেত্রে ঐ যাকে আপনার বলেন ‘বৃথা মাংস’ শুধু তাই আহার করি। নৈতিক কারণে আপনারা যাকে বলেন ‘মহাপ্রসাদ’.....

—থাক! বারে বারে একই কথা বলতে হবে না। কিন্তু কেন?

রূপেন্দ্রও বসে পড়েছেন ভূশয্যা। বলেন, বেশ, শুনুন। শক্তি উপাসনা এই ভারত ভূখণ্ডে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। ত্রিবেণীতে থাকতেই আমি গুরুদেবের সংগ্রহে অনেক শান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। মধ্যযুগে রচিত তারাতন্ত্র, তারা-রহস্য, রুদ্র-যামল-তন্ত্র, চীনাচার প্রয়োগবিধি ইত্যাদি পুঁথি রচনার বহু বহু পূর্বযুগ থেকেই শক্তিপূজার আয়োজন ছিল। আদিযুগে পশুবলির ব্যবস্থা ছিল না। আদিযুগের শক্তি উপাসকেরা নির্দেশ দিতেন, মায়ের বেদীর সম্মুখে যূপকাঠে বলি দিতে হবে অন্তরের ষড়রিপুকে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। ক্রমে ঐ ষড়রিপুকে বলিদানের প্রতীক হিসাবে একটি ছাগশিশুকে বলিদানের আয়োজন হল। চীনাচারের প্রভাবে ক্রমশ শান্ত পণ্ডিতেরা বিস্মৃত হয়ে গেলেন—মূল উদ্দেশ্যটা কী ছিল! ষড়রিপুকে নয়, ঐ ছাগশিশুকে হত্যা করার মধ্যেই তাঁরা মুক্তির পথ খুঁজতে শুরু করলেন! পঞ্চ মকারের পঞ্চকুণ্ডে ভেসে গেল তাঁদের শুভবুদ্ধি—ব্যভিচারের বন্যায়...

—বাস! থাক! তোমার গুহ্যতেরও একটা সীমা থাকা উচিত! —উঠে দাঁড়ালেন নন্দ।

রূপেন্দ্রনাথ মনের আবেগে কথা বলে যাচ্ছিলেন! এতক্ষণে নজর হল, বৃদ্ধ দু-হাতে দুই কান চাপা দিয়ে ধর্মব্যাখ্যা শুনছিলেন!

ওঁরা দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলে যাবার পর হৃদ্ধার দিয়ে উঠলেন জগুঠাকরুণ, কী পেয়েছি সুই! হতভাগা, বাদর। যা মুখে আসে তাই বলবি?

রূপেন্দ্রনাথ স্নান হেসে বলেন, বলতে তো আমি চাইনি, পিসি। আপনিই তো বাধ্য করলেন। আর তাছাড়া এই ভাল হল! ওঁরাও যে দেখছেন! শুনছেন!

কৃষ্ণাচর্চুর্দশীর নৈশাকাশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে দেখান। এই উল্লাসের পূর্বপুরুষদের অবশ্য দেখা গেল না। তবে সন্ধ্যাকাশে ফুটে উঠেছে সপ্তর্ষি। অত্রি-অঙ্গিরা-পুলহ-পুলস্ত...



নন্দ চাটুজ্জের ভদ্রাসনে মহাপ্রসাদ কিছু বেশি পরিমাণে সেবা করা হয়ে গেছে। দুর্গাচরণ তাই জানিয়ে রেখেছেন, রাত্রে এক কুচো প্রসাদ মুখে দেবেন মাত্র। সন্ধ্যাহ্নিক সেরে তিনি উঠে এলেন ভিতরবাড়িতে। এত সকাল-সকাল সচরাচর তিনি বৈঠকখানা ছেড়ে আসেন না। সন্ধ্যায় তাঁর কাছে আসতে থাকে নানান দর্শনার্থী। অধিকাংশই তত্ত্ববায় পরিবার। তাদের নানান আর্জি, নানান দাবী-দাওয়া। আজ কিন্তু উনি এক প্রহর রাত না হতেই শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। মৃন্ময়ী ঘরে ঘরে ধুনো দিচ্ছিল—বিশেষ করে শয়নকক্ষে। মশা প্রচণ্ড! সন্ধ্যাবেলায় ধুনো না দিলে ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে পড়ে। বামুনবাড়ি বলে রেয়াৎ করে না। দুর্গা ওকে কাছে ডাকলেন, শোন। এখানে এসে বস দিনি। কতা আছে।

—রসুন, তেলের বাটিতে এটু তেল গরম করে আনি।

—থাক না, ছুটকি। একদিন পদসেবা না করলে তোমার সগ্যের বাতি কমতি হবে না। বসো দিনি! দুটো প্রাণের কতা কই! আজ একটা ভারি মজার কতা শুনে এলুম চাটুজ্জবাড়ি। তোমারে বলি।

মৃন্ময়ীকে উনি সচরাচর ‘ছোট গিরি’ নামে ডাকেন। আবেগ উথলে উঠলে—‘ছুটকি’!

মৃন্ময়ী ঔর নাগালের মধ্যে একটা তালপাখা এগিয়ে দিয়ে বলে, কী শুরু করলেন আপনি! সন্ধ্যা রাতে প্রাণের কতা! ঠাকুরপোর আফিক এখনো সারা হয়নি। ঠাকুরঘরে অংবং করছেন।

—করুন। তুমি ইদিকে এস দিনি।

মৃন্ময়ী ঔর চতুর্থপক্ষ। এ সংসারে এসেছে সম্প্রতি। এখনো বছর পোরেনি। নববধূই বলা চলে। তখন সে ছিল পঞ্চদশী। এক বছরেই যোলকলা পুরেছে। ভাগ্যবতী বলতে যা বোঝায়। এই ভরভরাস্ত গাঙ্গুলী পরিবারে রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে এসেছিল একেবারে অসপত্ন-অধিকারে। কটা এয়োতি মেয়ের সে ভাগ্য হয়? বড়-সতীন—যদি আজও বেঁচে থাকেন—তাহলে পঞ্চাশার্থী—দীর্ঘদিন কাশীবাসী। একটিমাত্র সন্তান তাঁর—কন্যাসন্তান। মাঝের দুই সতীন অসময়ে সংসারের মায়া কাটিয়েছে। একটি সন্তান প্রসব করতে গিয়ে—আহা ছেলেই হত তার, হল না। দ্বিতীয় জন আত্মিক রোগে। বৃদ্ধ বয়সে লুপ্ত-পিণ্ডোদক হবার আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে “বৃদ্ধকে চতুর্থপক্ষ করতে হল। তবে মৃন্ময়ীকে বিবাহ করতে প্রথমটা কিছুতেই স্বীকৃত হননি—তার একমাত্র অপরাধ, সে অত্যন্ত সুন্দরী! দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, না, না, সে হয় না। আমি তো শুধু বংশধরের কামনায়.....

কন্যাদায়গন্ত ব্রাহ্মণ পীতৃ মুখুজ্জে ঔর হাতদুটি ধরে বলেছিলেন, কী! আবোলতাবোল বলছেন গাঙ্গুলী-মশাই! পুত্র কামনাতেই তো সবাই বিবাহ করে, শান্ত্রই আছে—‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্য’! আমি যে নিতান্ত গরিব! উপযুক্ত কুলীনের মর্যাদা দেবার সামর্থ্য কি আমার

আছে? কোথায় বিয়ে দেব?

দুর্গাচরণ শেষমেশ সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু এক কঠিন শর্তে! শুধু শাখা-সিঁদুর। আর মাএ এক কপর্দক কোঁলিনা মর্যাদা!

ওটা নিতেই হয়। শাস্ত্রীয় নির্দেশ!

তা মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে গাঙ্গুলীমশায়ের। বছর না ঘুরতেই নববধূর গর্ভসংস্কারের লক্ষণ পরিস্ফুট! গৃহকর্তার আনন্দের আর সীমাপরিসীমা নাই। এই বাষাটি বৎসর ধমসে যে নিয়োগপ্রথার সাহায্য নিতে হল না, এটাই পরম তৃপ্তি। বস্তৃত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা আদৌ আছে কি না এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিল। ছয় দশক দুনিয়াদারী করে তিন-তিনটি সহধর্মিণীকে পার করার পরেও তাঁর ধর্মরক্ষা হয়নি—পুত্র সন্তান ছিল না এতদিন। কনিষ্ঠ দুটি ভ্রাতা আছে, তাদের সন্তানও আছে—কিন্তু পুত্রের হাতে পিণ্ডলাভের একটা আলাদা তৃপ্তি! প্রতিজ্ঞা করেছেন, এবার যদি পুত্রসন্তান লাভ করেন তাহলে আগামী বৎসর এ ভদ্রাসনে দুর্গোৎসব লাগিয়ে দেবেন। গ্রামে একটিই দুর্গা পূজা হয়—ভাদুড়ী বাড়ি—এবার ‘বারিন্দির’দের কজ্জা থেকে মুক্তি পেয়ে এই রাত্ৰভূমে পূজা পাবেন জগজ্জননী। সেই লোভে পড়েও কি মা দুর্গা ঠুকে একটি সোনার চাঁদ উপহার দেবেন না? কন্যা সন্তান আছে—বড় বৌয়ের। শোভারাগী। মৃন্ময়ীর চেয়ে মাস্তুর বছর তিনেকের বড়। তার মা-মাগী কাশী যাবার আগে তাকে ঠুঁর স্বাক্ষে চাপিয়ে দিয়ে গেছে। পাষাণী যাকে বলে, আর কী!

মৃন্ময়ীকে চাটুজে-বাড়ির কেছাটা না শোনানো পর্যন্ত ঠুঁর তৃপ্তি হচ্ছিল না। ব্যাপারটা ঠিক মতো সমঝে উঠতে পারেননি। দ্বিপ্রহরে প্রাগাহার পর্যায়ে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ তামাকু সেবন করছিলেন। পংক্তিভোজনে বসবার আহ্বান শুনে নিতান্ত খোলা মনে বলেছিলেন, রূপো বাঁড়ুচ্ছে এখনো আসেনি দেখছি?

অন্দরমহলের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন গৃহস্থামী স্বয়ং, নন্দ চাটুজে। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, রূপো গুণতির বামুন নয়। আপনারা বারো জন এসেছেন। আসুন.....

—তা এসেছি। কিন্তু রূপো বাঁড়ুজের ভিটে তো আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নয়। কেউ আগু বাড়িয়ে তাকে ডেকে আনলে সবাই একসঙ্গে...

—না। তার দেরী হবে। সে ভিন্ গাঁয়ে গেছে কণী দেখতে।

অতপর সবাই পংক্তি ভোজনে বসে পড়েন। বেণী চাটুজে বসে ছিল ঠিক ঠুঁর পাশেই। নন্দের জ্ঞাতি ভাই—সরিক আর কী। দুর্গাচরণের কর্ণমূলে নিবেদন করেছিল, ‘একবগ্না’ আসবে না গাঙ্গুলীদাদা। সে নেমস্তম্ভ গ্রহণই করেনি।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন দুর্গাচরণ। পঞ্চদেবতার অন্যতম শেষ দেবতাটি হাপিত্যেসে গণ্ডূষ-জলের অপেক্ষায় আছেন। অক্ষুটে ‘অপানায় স্বাহা’র বদলে বলে ফেলেন, বল কী হেতু কেন?

—পরে বলব।

এই মর্মান্তিক সংবাদটা কি মধ্যাহ্ন আহারের পরে পরিবেশন করা চলত না? মন দিয়ে আর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতেই পারেননি। ব্যাপার কী? এ যে অবিশ্বাস্য! যুদ্ধের মনে পড়ে একবগ্নার ঘাড়ে তো একটাই মাথা দেখেছেন! তাহলে?

আহারাণ্ডেও সমস্যাটার সমাধান হয়নি। নন্দ সবাইকে চোখে চোখে রেখেছেন সেবাস্তিক তাম্বাকু সেবনের পর্যায়ে। ওরই ফাঁকে একবার সুযোগ পেয়ে বেণীকে একটা কনুইয়ের গোস্তা মারার সৌভাগ্য জুটেছিল, কী ব্যাপার হে? সৌদামিনী? অ্যাডিন পরে?

—ঠিক জানি না দাদা। সদুর কেছা কি একবগ্না জানে? সে তো তখন ভিন গাঁয়ে। আপনার ভাদ্দর-বৌ বলছিল, নন্দদা নাকি জগুদিদির কাছে প্রস্তাব তুলেছিলেন—হরিমতির সঙ্গে...

—তা তো হতেই পারে; তার সঙ্গে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার কী সম্পর্ক?

বেণী জবার দেবার সুযোগ পায়নি। হঠাৎ দেখে জগুঠাকুরগণ সন্দিগ্ধ চোখে এগিয়ে আসছেন। বলে, আরে জগুদিদি! আপনি কখন এলেন?

জগুঠাকুরগণ অনিমন্ত্রিত এসেছেন। মধ্যাহ্নে শুধু ব্রাহ্মণ-সেবার আয়োজন। তিনি বিধবা মানুষ। তাঁর আহ্বারের প্রশ্ন তো নেই। তিনি না এসে পারেননি। সকাল থেকে দেখা-শোনা করছেন, তরকারি কুটে দিচ্ছেন। পাগল ভাইপোটার ঐ হিমালয়াস্তিক অপরাধের যদি সামান্য কিছুটা স্থালন হয়।

দুর্গাচরণ ভালমানুষটি সেজে বলেন, কখন এসেছেন মানে? এ তো জগুদিদির নিজের বাড়ি। জগুদিকে বাদ দিয়ে সোএগই গাঁয়ে কোন যজ্ঞিবাড়ির কাজ কখনো হয়েছে, যে আজ নতুন করে হবে?

জগুঠাকুরগণ কথা ঘোরান, মিনিটা এখন কেমন আছে? এ সময়ে খুব সাবধানে রাখবে ভাই। ঘরের বার হতে দেবে না। নজর-টজর না লাগে।

ছয়দশকের দুনিয়াদারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে হবু পিতা বোধকরি লজ্জা পেলেন। নতমস্তকে বলেন, সেসব তো আপনাদেরই দেখার কথা, দিদি। আসবেন সুযোগ মতো। পায়ের ধুলো দেবেন, আশীর্বাদ করবেন, আর ঐ সঙ্গে দুটো সৎ পরামর্শও দেবেন! তা, ভাল কথা। রূপো কোন গাঁয়ে গেল চিকিচ্ছে করতে? এতটা বেলা হয়ে গেল.....

নন্দ বৃদ্ধাকে মিথ্যাভাষণের হাত থেকে অব্যাহতি দিলেন। বলেন, না, আর খোশ গল্প নয়। জগুদি, আপনি এবার মেয়েদের ঠাই করতে বলুন।

দুর্গাচরণ মনে মনে হেসেছিলেন। বেণীটা তাহলে তো মিছে কথা বলেনি। একবগ্না বাঁড়ুজ্জের তাহলে নন্দ চাটুজ্জের নাকে সতিাই ঝামা ঘষে দিয়েছে! কিন্তু কেন? একবগ্না ঠাকুর এভাবে ক্ষেপে গেল কেন?

একটু পরে সংসারের কাজ সেরে মুগ্ধী এসে বসল ঔর শয্যাপ্রান্তে। তেল না হয় নাই দিল, পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়াটা বাদ দেবে কেন? বলে, এবার বলুন, কী বলছিলেন তখন?

এই এক যন্ত্রণা! মুগ্ধী ঔর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে পারল, কিন্তু 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'তে নামতে পারল না। নিবিড়তম মুহূর্তেও!

দুর্গা গম্ভীর হয়ে বলেন, বামনদি তো কাজ ছেড়ে দেননি, তাহলে তোমার ঐই হাল কেন ছোটগিন্নি?

জনাস্তিকে 'ছুটকি' থেকে 'ছোটগিন্নি'তে যখন সম্বোধনটা সরে গেছে তখন বুঝে নিতে হবে কর্তা অসন্তুষ্ট। কারণটা বুঝে উঠতে পারে না। কাজলকালো দুটি চোখ মেলে বলে, মানে?

—যে বাঁধে, শুনেছি সে চুল বাঁধে না। তার একটা কৈফিয়ৎ থাকে। তা তোমার এ হাল কেন হল?

শোভারাগীর বিকালের দিকে তেড়ে জ্বর এসেছিল। মালোয়ারি। এ জ্বর ঘরে ঘরে। এই ভ্রাসে এই যায়। ওর মাথায় জলপটি দিতে দিতে মৃন্ময়ী বিকালে চুল বাঁধার সময় পায়নি। স্বামীর প্রশ্নে ফিক্ করে হেসে বলে, আপনার সব দিকে নজর।

—মাথার পিছনেও এক জোড়া চোখ না থাকলে কি এত বড় সংসারটা চালাতে পারি ছোটগিন্নি? আর শুধু কি সংসার? এই পঞ্চগ্রামের গোটা সমাজটা। সে কতা নয়, কিন্তু ভরসনখে বেলায় এলোচুলে থাকতে নেই—বিশেষ করে পোয়াতি মাগীর—এই কটা কতাও কি শিখিয়ে দেয়নি তোমার মা-আবাগি?

মৃন্ময়ী নিতান্ত গরিব ঘরের মেয়ে। শাখা-সিদুর সম্বল করে এ সংসারে এসেছিল। তার পিতৃকুলকে উদ্ধার করেছেন কুলীন কুলতিলক। প্রায় বছরখানেক সকাল-সন্ধ্যা স্বশ্রুতালয়ের নানান জনের মুখে বাপমায়ের সম্বন্ধে এজাতীয় মধুর বিশেষণ শুনে শুনে এখন সে অভ্যস্ত। কোন ভাবান্তর হয় না আর। পিঠভরা চুলের শেষপ্রান্তে একটা গ্রহি দিয়ে বলে, কী মজার কতা বলবেন বলছিলেন তখন?

দ্বিপ্রহরে সংগৃহীত মজাদার কেচ্ছাটা সবিস্তারে বর্ণনা করেন, যার উপসংহার: হেতু যাই হোক, নন্দ চাটুজ্জের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছে একবগ্নাটা।

নামটা শুনেই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে মৃন্ময়ী।

একবগ্না-ঠাকুর! রূপেন্দ্রনাথ! ওর প্রতিবেশী। পীতাম্বর চাটুজ্জের চালাখানা পদ্মদীঘির পূবপারে আর বাঁড়ুজ্জ বাড়ির ভদ্রাসন পশ্চিমপারে। মাঝখানে ঐ পদ্মদীঘি—রসি কয়েক ব্যবধান। রসি কয়েক, তবু অতলান্ত। রূপোদা ওর চেয়ে নয় বছরের বড়। তাঁর সান্নিধ্য ও অবশ্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে পায়নি, পাশের বাড়ির বাসিন্দা হয়েও। তিনি তো মিনুর স্তন হবার পর থেকেই গুরুগৃহে। তবে কাত্যায়নী ওর সমবয়সী, সখী। সকাল-সন্ধ্যা দেখা হত। প্রাণের কথা হত। তা হোক, রূপোদা বৎসরান্তে এক বার আসত। দেখা হত।

‘নয়’ একটা গাণিতিক সংখ্যা। গণিত বলে সেটা নির্গুণ। ঐ ‘নয়’ সংখ্যাটা। নয়টি আসরফি আর নয়টি কর্দকের মূল্যমানে যা ফারাক তার জন্য ‘নয়’ দায়ী নয়। কিন্তু হিসাবটা কি ঠিক? সব ‘নয়’ কি এক জাতের?

স্মৃতি ভিড় করে আসছে। প্রায়-শৈশবের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। দামোদরের বাইচ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ভিড়ে-ভিড়। কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিল না বেচারি। হঠাৎ রূপোদা ওকে কোলে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল কাঁধে। বললে, কী রে মিনু? এবার দেখতে পাচ্ছিস?

কাতু চিৎকার করে নিচে থেকে বলে, নেমে আয় বলছি। পাজি, বাঁদর। ও তো আমার দাদা! আমি ওর কাঁধে চড়ব। তুই চড়েছিস্ কোন আক্কেলে?

রূপোদা বোনকে ধমক দিয়েছিল, হিংসুটেমি করলে। তাকে কোনদিন কোলে নেব না কিন্তু কাতু!

তখন মিনুর বয়স ছয়। তাহলে রূপোদার কত? নয়-ছয়ে পনের।

মনে পড়ে আরও একদিনের ঘটনা। পিতৃশ্রাদ্ধ করতে এসেছিল রূপেন্দ্রনাথ। কাচা গলায়

উদাস দৃষ্টি মেলে বসেছিল সামনের দাওয়ায়। মিনু তার কোল ঘেঁষে বসে পড়ে বলেছিল, তুমি কেঁদ না, সোনাদা। আমার তো বাবা আছেন, আমরা দুজন তাঁকে ভাগ করে নেব। কেমন?

সোনাদা সেদিন স্নান হেসে ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়েছিল শুধু। একজন পিতৃবিয়োগে মুহমান, আর-জন তার ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে চায়। হিসাব কষে দেখ, একজন আট, আর-জন সতের। ফারাক সেই সমান—নয় বছর।

সোনাদা! নামটা ওরই দেওয়া। মনে আছে, একদিন প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা তোমার নাম ‘রূপোদা’ কেন গো? ‘সোনাদা’ হলে আরও মানোতো।

রূপেন্দ্র ছদ্মগাভীরে বলেছিল, তুই আমার দাম কমিয়ে দিতে চাইছিস, মিনু? জানিস না, সোনার চেয়ে রূপো দামী?

হঠাৎ হকচকিয়ে যায়। তাই নাকি? রূপোদা তো মিছে কথা বলে না। পরে বাবামশাইকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিল। রূপোদার পিঠে গুম্‌গুম বসিয়ে বলেছিল: মিথ্যুক! তোমাকে আমি কী শাস্তি দিই দ্যাখ!

—কী শাস্তি দিবি? তোর কিলে আমার কিছ্ছু হয় না!

—শুধু কিল কেন? তোমাকে সবার সামনে আমি ‘সোনাদা’ বলে ডাকব।

তা কিন্তু পারেনি। কারণ পরের বছর দুর্গোৎসবে যখন রূপোদা ফিরে এল, তখন সে কেমন যেন তালচ্যাঙা হয়ে গেছে। না ভুল হল, দুর্গোৎসবে সেবার আসতে পারেনি। প্রায় দেড় বছর পরের কথা। ততদিনে মিনুও মৃন্ময়ী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একাদশবর্ষীয়া কিশোরী। তার দেহমনেও ভিতর থেকে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। বুঝতে পেরেছিল সর্বসমক্ষে গুঁকে আর ‘সোনাদা’ ডাকা যায় না। সে বড় লজ্জার কথা। সেবার উনি ফিরে এসেছিলেন ফাল্গুন মাসে—দুর্গোৎসব পার করে। জগুপিসির ‘মায়ের দয়া’ হয়েছে খবর পেয়ে। রঙ-দোলার আগেই ভাল হয়েছিল পিসি। তখন দখিন থেকে বইতে শুরু করেছে একটা পাগলা হাওয়া। প্রতি বছরই হয় তো তা বয়। কিন্তু মৃন্ময়ী সেই কিশোরী বয়সে তখন প্রথম বুঝতে শিখছে—ওটা ‘মন-কেমনের’ হাওয়া। প্রতি বসন্তেই হয়তো নিলর্জ কোকিলটা অমন আকুলভাবে ডাকে। এ বছরই যেন সেটা প্রথম খেয়াল হল। কাতুকে রঙ দিতে গিয়েছিল বাঁড়ুজ্জ বাড়ি। কাতু কোথায় লুকিয়ে বসে আছে ঘাপাটি মেরে। আনাচে-কানাচে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল তাঁর। রূপোদার হাতে একটা আবীরের পুঁটলি। সেও বুঝি এতক্ষণ ছেলের দলে রঙ খেলছিল। দোর আগলে বললে, এবার?

বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠেছিল কিশোরী মেয়েটির। এ কে? ঐ তালচ্যাঙা মানুষটা? আর ওর গলার স্বরও তো রূপোদার মতো নয়! আশেপাশে তাকিয়ে দেখে—ত্রিসীমানায় কেউ নেই! কী সর্বনাশ! এখন যদি ঐ লোকটা ওকে.....

রূপোদা ‘এবার’? বলে ওর দিকে এক পা এগিয়ে আসতেই কী যেন কিসের আশঙ্কায় ওর সারা দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। ওর মনে হল—এখনি দুই হাত বাড়িয়ে রূপোদা ওকে বুকে টেনে নেবে। আর তার পর ওর মুখে, বুকে, সর্বাস্থে.....

দুরন্ত লজ্জায় দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে ওঠে, ন-না!

রূপোদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর আতঙ্কতাজিত কচি মুখখানার দিকে অবাক দৃষ্টিতে

নির্নিমেষলোচনে শুধু তাকিয়ে দেখেছিল। তারপর কী ভেবে যেন অনুমতি ভিক্ষার সুরে জানতে চেয়েছিল, কী ব্যাপার রে মিনু?

মুখ থেকে হাত সরায়নি। আবীরমাথা লালে-লাল মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে পুনরুজ্জ্বল করেছিল শুধু, ন-না!

কী বুঝল তা সেই জানে। হাসতে হাসতে বললে, রঙ মাথতে এত ভয়? ঠিক আছে, আমি আলতো করে একটা টিপ শুধু পরিয়ে দিই তোমার কপালে। কেমন? বোকা মেয়ে! তুমি এখনো খুকি।

বোকা! বোকা কে? আমি, না তুমি? কথা কটা শুধু মনেই ফুটেছিল, মুখে নয়। কপালে একটা টিপ নিয়ে এক ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। একটু দৌড়েই, থেমে, পিছন পানে তাকিয়ে দেখেছিল। না, রূপোদা ওকে তাড়া করে আসেনি!

আড়ালে গিয়ে ইচ্ছে করছিল নিজের গালেই ঠাস্ ঠাস্ করে চড় কষাতে। স্নানের সময় সেই এক বিন্দু আবীরের টিপটুকুও ধুয়ে গেল! যাক! কিন্তু সোনাদা সেই প্রথম ওকে 'তুই-তোকারি' করতে পারেনি। চিরটা কাল যাকে 'তুই' বলেছে, তাকে সেদিন বলতে হয়েছিল, 'তুমি এখনো খুকি।'

কেন গো? এই বোকা মেয়েটাকে তুমি বুঝিয়ে দেবে গো পণ্ডিতমশাই? 'তুই' কেমন করে 'তুমি' হয়ে যায়?

—কেন গো? কারণটা কী হতে পারে?

রীতিমতো চমকে উঠেছে মৃন্ময়ী। তার নিজের মনের ঐ নিভৃত প্রশ্নটা এই নির্জন কক্ষে স্বামীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠায়।

—কী হল? দেয়ালা দেখছ নাকি? অমন চমকে উঠলে যে?

—কিছু নয়। কী জিঞ্জ্ঞাস করছিলেন যেন?

—মানে, কারণটা কী হতে পারে? কেন একবন্ধা এমন কাণ্ডটা করে বসল? সেই সৌদামিনীর কেচ্ছা?

এতক্ষণ স্মৃতিচারণে যে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর উজান পথে কৈশোর-বাল্যের গোমুখ গঙ্গোত্রীর নির্মল জলে অবগাহন করছিল তাতে এসে মিশল পুতিগন্ধময় নদমার ক্রেদান্ত জল! মনটা বিধিয়ে ওঠে! টানা নখে অনুবিন্দু নাকটা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। বলে, সদুপিসি! বাব্বা! পারেনও বটে আপনারা! মরেও সে হতভাগীর শাস্তি নেই!

—আহা! আবার আমাকে টানছ কেন ছোটগিন্নি? আমি কী করেছি?

নন্দ চাঁটুজ্জ তার বালবিধবা শ্যালিকাটিকে আশ্রয় দিয়েছিল নিজ ভদ্রাসনে। যৌবনপ্রাপ্তির পর তার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে বছর-পাঁচেক আগে। কেউ বলে আত্মহত্যা, কেউ বা—হত্যা! অনেকেই বিশ্বাস কীর্তিটা স্বয়ং নন্দেরই—মানে, অন্তিম মৃত্যুর আগের যে মৃত্যু অর্ধাৎ কে সেই বিধবাটির গর্ভসংস্কার করেছিল তাও নাকি সবার জানা। তবে প্রকাশ্যে সবাই মেনে নিয়েছিল—খাদ্যে বিযজ্রিয়া। কার্তিক ময়রার পচা পক্কান্নো খেয়ে। পুষ্পায়েত তাই কার্তিককে অর্ধদণ্ডও করেছিল—মায়ের থানে একটি পাঠা দিতে হয়েছিল তাকে। অবশ্য কার্তিক আড়ালে

স্বীকার করে, তার দামটা নন্দ গোপনে ওকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। মৃন্ময়ী এ-গ্রামেরই মেয়ে। ফলে আর পাচজনের মতো এসব কেছা তার না-জানা নয়। এতদিন পরে সেই হতভাগিনীর নামটা উঠা পড়ায় তাই ও-কথাটা বলে ফেলেছে।

দুর্গাচরণ বলেন, বেণী আবার একটা উল্টো কথা শোনালো, বুয়েছ? তার বউয়ের খপর—নন্দ চাটুজে নাকি হরিমতির সঙ্গে সুরোর বের কথা বলে। তাতেই ঐ একবন্ধা ঠাকুর ক্ষেপে গিয়ে—

—তা তো ক্ষেপবারই কথা বাপু! ওঁর সঙ্গে কি হরিমতিকে মানায়?

—তুমি যে অবাক করলে ছোটগিন্নি! কুলীন ঘরের আইবুড়া খেড়ে খোকা! কেউ বিয়ের কথা তুলতে এলে মায়ের পেসাদ প্রেত্যাখ্যান করবে?

মৃন্ময়ীকে স্বীকার করতেই হয়, সে-কথা ঠিক। এটা রূপোদার একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।

দুর্গাচরণ হেসে ফেলেন, ‘রূপোদা’ কী গো! তুমি যে সম্পর্কে তার খুঁড়ি!

মৃন্ময়ী লজ্জা পায়। কথাটা তার খেয়াল ছিল না।

দুর্গা কৌতুক করে ওর তলপেটে আঙুল ঝুইয়ে বলেন, একবন্ধাটাকে ‘রূপোদা’ যে ডাকবে সে তো এখানে ঘুমুচ্ছে গো!

মৃন্ময়ী দুহাতে মুখ ঢাকে।

কর্তা পাশ ফিরে শুলেন। বলেন, পিঠে এটু সুড়সুড়ি দিয়ে দাও দিনি।

স্বামীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আর এক দিনের কথা মনে পড়ে গেল মৃন্ময়ীর। সেই তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। গ্রামে ফিরে আসার পরে তাঁকে আর দেখিনি। তার পূর্বেই মৃন্ময়ী গাঙ্গুলীবাড়ির নববধূ হয়ে গেছে। ওর বিয়ে হয়েছিল মাঘে। সে বছর আশ্বিন মাসের কথা। সে বারও উনি গায়ে এসেছিলেন দুর্গোৎসবে। তখনো কিন্তু দুজনের বয়সের ফারাক সেই নয় বৎসর। মিনু পনের, রূপেন্দ্রনাথ চব্বিশ।

বিজয়ার পরদিন সকালে মৃন্ময়ী এসেছে জগুপিসিকে প্রণাম করতে। কাতু বললে, দাদাকে পেমাম করবি না, মিনু?

মীনু হেসে বলেছিল, করব না! বলিস কীরে! সবাই বলে, তিনি দিগ্গজ পণ্ডিত হয়ে গেছেন। একটা পেমাম ঠুকে দিলে ভালমন্দ আশীর্বাদ পেয়ে যাব!

কাতু বলেছিল, দস্তুরি যদি দিস, ভালোমত আশীর্বাদ পাইয়ে দেব। কী বর চাস বল্‌দিনি? শিবের মতো বর?

মিনু ফিস্‌ফিসিয়ে বলেছিল, শিবের মতো হোক-না-হোক। তোর মতো বেপান্তা বর যেন না হয়!

তারপর লজ্জিত হয়ে কাত্যায়নীর হাতখানা টেনে নিয়ে বললে, ছি, ছি। বছরকার দিনে বেঁফাঁস কথাটা বলে তোকে মিছিমিছি দাগা দিলাম।

কাত্যায়নী স্নান হেসে বলেছিল, কিন্তু কতটা তো মিছে নয় রে মীনু! এ সঙ্কোচনাশ যেন শতভুরেরও না হয়। কোনদিন মানুষটাকে চোখেই দেখিনি!

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলেছিল, আয়।

—কোথায়? রূপোদা কী করছে?

—চিরটাকাল যা করেছে। পুঁথি পড়ছে।

পূবের জানালাটা খোলা। এক বলক প্রভাত-সূর্যালোক ঘরে ঢুকে পড়ে যেন থমকে গেছে। রূপেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে কী একটা পুঁথি পড়ছিলেন। কাত্যায়নী তাঁকে ডাকতে গেল। মৃন্ময়ী হঠাৎ মুখ চেপে ধরল তার। কাতু সবিম্বয়ে চোখ দিয়ে প্রশ্ন করে, কী?

মৃন্ময়ী নিশেপে ওষ্ঠাধরে আঙুল ছোঁওয়ায়।

ধ্যানমগ্ন বিদ্যার্থীর ঐ তন্ময় ভাবটা ছিন্ন করতে তার মন সরছিল না। ওর মনে পড়ে গেল—একবার ভাদুড়ী-বাড়ির নাটমঞ্চে ‘নিমাই-সন্ন্যাস’ পালা দেখেছিল। এক গাদা রঙ-চঙে মেখে, চোখে সূর্য আর ঠোঁটে অলঙ্কার-হিন্দুলী লাগিয়েও সেই মেকি নিমাই পণ্ডিত এত সুন্দর হতে পারেনি! রূপেন্দ্রের উদ্ভাস নিরাবরণ, শুধু সামবেদী উপবীত। মস্তক মুণ্ডিত, শিখাপ্রান্তে কোনও পুষ্প অনুবিদ্ধ নেই। চোখ দুটি আয়ত, উন্নত নাসা,—ঠিক যেন নিমাই পণ্ডিত! সোনার গৌরাজ। সার্থক নাম: সোনাদা! কাত্যায়নীর কণ্ঠস্বরে ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর।

—দাদা, মীনু তোমাকে পেলাম করতে এয়েছে!

ধ্যানস্থ সন্ন্যাসী চোখ তুলে চাইলেন যেন। তখনো তাঁর ঘোর কাটেনি। তারপর সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ান। কোঁচার খুঁটটা বুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বলেন, তুমি আমাদের সেই মীনু?

—বিশ্বাস হচ্ছে না? —প্রশ্ন করে কাত্যায়নী।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় কাতু—কিন্তু পথে-ঘাটে দেখলে ওকে আমি চিনতেই পারতাম না! কী সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে এই শাড়িখানিতে!

কাতু মুখ টিপে হাসে, শুধু শাড়িখানাই নজরে পড়ল দাদা? দৃষ্টি বটে তোমার!

রূপেন্দ্রনাথ জবাবে কী-একটা কথা বললেন। উচ্ছসিত শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর। বেচারী মৃন্ময়ী—উনি কথাটা বলেছেন বিশুদ্ধ সংস্কৃতে! অর্থ গ্রহণ হয়নি তার।

মৃন্ময়ী তার শাস্তিপূরে ডূরে শাড়ির আঁচল গলায় জড়িয়ে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে একটি সলজ্জ প্রণাম। সাহস করে পদস্পর্শ করতে পারে না!

রূপেন্দ্রনাথ যুগ্মকরে বললেন, ওঁ, নমঃ নারায়ণায়!

কাত্যায়নী বলে, এমন একটা জমকালো পেলামের ঐটুকু আশীর্বাদ?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ওটা আশীর্বাদ নয় রে বোকা! আমি মীনুর প্রণামটা নারায়ণকে নিবেদন করলাম শুধু—

—তার মানে তুমি ওর পেলামটা নিলে না?

—পাগলি! তুই বুঝবি না!

কাত্যায়নী রীতিমতো জেদ করে, ওসব শুনছি না। ওকে আশীর্বাদ করতে হবে। কর বলছি!

—বেশ তাই করছি.....

বলেই আবার একটা শ্লোক বললেন দেবভাষায়।

কাত্যায়নী রীতিমতো বিরক্ত! বলে, অং-বং নয়। সোজা কথায় মানোটা কী হল বলতে হবে! শ্লোকটা কি তুমি মুখে মুখে বানালে?

—না, এটা মহাকবি কালিদাসের। তিনি বলছেন, তোমার অশুভলের মতো ভর্তা হৌক, জয়ন্তের মতো কীর্তিমান সূতঃ। তুমি পৌলমী হবে! তোমার মতো কল্যাণময়ীর আর কোন

আশীর্বাদই যেন সুপ্রযুক্ত নয়!

এখনো মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়।

না, অশ্রয়-ব্যাখা শুনেও সে কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু কথাগুলো যেন ওর মনের পাষণফলকে খোঁদাই করে রেখে হয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে ফিরে এসে সে পিতার কাছে প্রশ্ন করে বুঝে নিয়েছিল—‘আখণ্ডল’ মানে ইন্দ্র, ‘সুত’ মানে সন্তান। আর ‘পৌলমী’ হচ্ছে ইন্দ্রাণীর নাম।’

তখনই ওর সারা দেহ ফোটা-কদমের মতো কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল!

হঠাৎ শয্যার উপর উঠে বসেন দুর্গাচরণ।

আবার চমকে ওঠে মৃন্ময়ী, কী হল?

—আমার মাথায় একটা জ্বর ফন্দি এয়েছে ছোটগিমি। তোমার ক্ষুধামান্য তো লেগেই আছে। মাঝে মাঝে বমির বেগও আছে। পাগলাটাকে ডেকে পাঠাই—বদ্যি হিসাবে। সে তোমাকে একবার দেখে যাক। ঐ ফাঁকে জেনে নেওয়া যাবে, কেন সে জলে বাস করে স্বেচ্ছায় কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করতে চাইছে। কী বল?

মৃন্ময়ীর বুকের ভিতর গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল। তিনি এ বাড়িতে আসবেন। আবার মুখোমুখি দেখা হবে। আবার গলায় আঁচল দিয়ে তাঁকে প্রণাম করার সৌভাগ্য হবে! কিন্তু.....

—ইতস্তত কিসের গো? তুমি তো তার পাড়ার মেয়ে। ন্যাংটো হয়ে হামা দিয়েছ তাদের বাড়িতে।

আঃ! কর্তার কথার কোন আড় নেই! সে তো বহু যুগ আগেকার কথা! মীনুর তখন এক, আর সোনাদার দশ—সেই ‘নয়’ কি আজকের ‘নয়’? যখন রূপেন্দ্রনাথ পঁচিশ, আর মৃন্ময়ী পরব্রী?



মুক্তকেশী এসে খবর দিয়ে গেল কর্তা আসছেন।

এটাই প্রথা। মানে, এটাও প্রথা নয়, তবে বিকল্পে এটাই চলছে। কোন বনেদী পরিবারে কর্তা-গিমিতে দিবাভাগে সন্ধ্যা হওয়ার কানুন নেই। এটা যে কোন সংহিতায় কোন পুরাণকার লিখে গেছেন তা জানা নেই, তবে বনেদী বাড়িতে—যেখানে বার-মহল আর অন্দর-মহল আছে—হাড়-হাবাতে দুঃস্থর এক-কামরার পর্ণকুটির নয়, সেখানে ঐ অনাচারটা সহ্য করা হয় না। কর্তারা দিবা-নিদ্রা দেন বার-মহলে, গিমিরা পান-দোকান আসর বসান, ঘুটি, রাখবন্দী,

মূল শ্লোকটি :

আখণ্ডল সম ভর্তা জয়ন্ত প্রতিমোসুতঃ।

আশীরন্যাঃ ন তে যোগ্যাঃ পৌলমী মঙ্গলা ভব॥

সোঞাই

ষোলঘর, দশ-পঁচিশ খেলেন অন্দর-মহলে। কখনও বা ‘অড়’ বা ‘আড়’ অর্থাৎ বাজি রেখে খেলা। ‘চোরে কামারে’ দেখা হয় প্রথম প্রহরে শেয়াল ডাকার পর—তাও যদি পঞ্জিকায় শুভরাত্রির নির্দেশ থাকে। নচেৎ কর্তারা যান উপপত্নীর শয্যাকক্ষে, গিম্বিরা তাঁদের নিজ নিজ একক শয্যায়।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ এক ব্যতিক্রম। তিনি মধ্যাহ্নে প্রত্যহ অন্দর-মহলে আগমন করে থাকেন। তবে আসার পূর্বে যথারীতি দ্বিতীয় মুখে সংবাদ পাঠান। যাতে গা খুলে যেসব পুরলহনা বিশ্রুতলাপ করছে বা নিদ্রা যাচ্ছে তারা বিভ্রান্ত না হয়।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অনেক কারণেই ব্যতিক্রম। শুধু সোঞাই গ্রামেই নয়, বোধকরি এই রাঢ়খণ্ডে তাঁর কীর্তির নাগাল আর কেউ পায়নি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কুলীন ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রশ্রেণীর—কাশ্যপ গোত্র, নিরাবিল পটি। বয়স তিনকুড়ি পার হয়েছে, প্রচুর ধনসম্পদ—অথচ তাঁর ধর্মপত্নী—একমেবাদ্বিতীয়মঃ ব্রজসুন্দরী।

সেটা ঠাঁর পিতৃদত্ত নাম নয়। তিন-চার দশক পূর্বে নাকে নোলক, গলায় শতনরী, হাতে রতনচূড় পরে যে বালিকাটি নববধূরূপে এই জমিদারবাড়ি শুভাগমন করেছিলেন তখনই তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছিল ব্রজেন্দ্রনারায়ণের ধর্মপত্নী: ব্রজসুন্দরী।

তারপর কেটে গেছে বহু বৎসর। দুটিমাত্র সন্তানের জননী—তারাপ্রসন্ন আর পটুরাগী, অর্থাৎ পটেশ্বরী। উত্তরবঙ্গ থেকে একাধিকবার লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু কর্তা-মশাই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহে-স্বীকৃত হননি। গ্রামে তাই ব্রজসুন্দরীর এক বিশেষ মর্যাদা। এমন সতী লক্ষ্মী সুদর্ভ—যিনি পাকা চুলে সিন্দুর পরেন অসপত্ন-অধিকারে।

লোকে তাই আড়ালে ব্রজেন্দ্রনারায়ণকে বলে: নবাব-সাহেব।

অর্থাৎ নবাব আলিবর্দী খাঁ সাহেব।

শোনা যায়, সেই আহাম্মক নবাবও একটি স্ত্রী নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে গেছেন—উপপত্নী পর্যন্ত ছিল না তাঁর। নবাবের এক বেগম। বিশ্বাস হতে চায় না। খোদাতালা কত বিচিত্র চিড়িয়াই না পয়দা করেন!

স্বভাবতই গ্রামের লোক মেনে নিয়েছিল জমিদার-মশাই কিঞ্চিৎ জ্ঞেয়! তাই বনেদী প্রথা নস্যৎ করে দ্বিপ্রহরে স্ত্রীর কক্ষে দিব্যানিদ্রা দিতে আসেন। রুদ্ধ কক্ষে নয়। কবাট খোলাই থাকে। না থাকলেও ক্ষতি ছিল না—জানতে কারও বাকি নেই।

সে ক্ষমতাই নেই যৌবনোত্তীর্ণার। না, শুধু যৌবন গেছে বলেই নয়—এক কালরোগে আজ দু বছর ধরে তিনি তিলতিল করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছেন।

ঘরে ঘরে এ নিয়ে দাম্পত্য রসলাপ চলে, তাহলে বুড়ো কেন এমন আচলধরা? যে বউ ‘ইয়েই’ করতে পারে না তার কাছে ঘুরঘুর করা কেন বাওয়া? তোর তঙ্কায় তো ছাত্তা পড়ছে। নতুন বউ পোষার হিম্মৎ না থাকে তো দু-চারটে বাইজীই পোষ!

সেই মর্মভুদ হেতুতেই ব্রজেন্দ্র নিত্য আবির্ভূত হন সহমধমিণীর শয্যাকক্ষে। দুজনেই জানেন—খোলাখুলি কথা হয় না—আর বড় জোর দুটি বছর। মানে প্রায় সাতশোটি দিন!

দুপুরগুলো নষ্ট করার মানে হয়? কত কথা বলা হয়নি! কত কথা আছে, যা বারে বারে বলেও তৃপ্তি হয় না।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কক্ষের বাহিরে পাদুকা ত্যাগ করে ভিতরে এলেন। ঘরে বিরাট বড় একটা পালঙ্ক—দ্বৈত শয্যা। কিন্তু এখন, এই দিব্যভাগে কর্তা-মশাই অর্ধশয়ান থাকেন একটি আরাম-কেন্দারায়। উরুনিটা মুক্তোকেশীর হাতে দিয়ে উনি বসলেন নির্দিষ্ট আসনে। ব্রজসুন্দরী আধশোয়া হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর পিঠের দিকে দু'তিনটি কামদার উপাধান। তার পাশে শুভ ঘুমাচ্ছে। শুভপ্রসন্ন গুঁর নাতি—তারাপ্রসন্নের একমাত্র সন্তান। বছর-চারেক বয়স।

কর্তা উর্ধ্বমুখ হয়ে কী-যেন দেখে নিয়ে বলেন, আবার জ্বর এল নাকি? শীত শীত করছে? ব্রজ বলেন, না তো। শীত করবে কেন?

—তাহলে টানা-পাখা বন্ধ? যে?

—এক নাগাড়ে টানতে টানতে ওরাও তো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। —বলেন, কিন্তু শয্যাপার্শ্বে বিলম্বিত একটি রেশমী রজ্জুতে আকর্ষণও করেন। সেটি 'কল-বেল'। তৎক্ষণাৎ টানা-পাখা চালু হল। যে চালায় সে কক্ষান্তরে।

ব্রজ বলেন, নন্দ ঠাকুরপোর বাড়িতে মহাপ্রসাদ খেতে গেলে না কেন কাল?

—তাতে ক্ষতি হয়নি। লৌকিকতাই শুধু নয়, 'মায়ের পূজায় যাওয়াটা কর্তব্য'। তারাপ্রসন্ন গিয়েছিল।

—জানি। ফিরে এসে বলেছে সে কথা। কিন্তু সে আরও একটা অদ্ভুত কথা বলল, শুনেছ?

—শুনেছি। এতবড় কথাটা সে তোমাকে বলবে আর আমাকে বলবে না? কিন্তু হেঁচুটা কী, সেটা সে আন্দাজ করতে পারেনি।

—তোমার কী মনে হয়?

—জানি না, গিমি। গায়ে তার বদনাম—'একবগ্না'! আমার যদিও তা মনে হয়নি কখনো।

—রূপো বাঁড়ুচ্ছে 'একবগ্না' নয়? আপন খেয়ালে থাকে না?

—কী 'একবগ্নামি' দেখলে তার?

—বামুনের ছেলে, একটা ও বিয়ে করল না?

ব্রজেন্দ্র হেসে ফেলেন। বলেন, তাহলে তো আদি শঙ্করাচার্যও 'একবগ্না'। আর তোমার ঐ সংজ্ঞাটা সম্প্রসারিত করলে 'আলিবর্দী'ও তো 'একবগ্না'! নয়? নবাব হয়ে একটিমাত্র বেগম?

ব্রজসুন্দরীও মৃদু হেসে বলেন, 'পরমৈষপদী' ধাতু কেন গো কুলীনকুলতিলক? 'আত্মনেপদী' ধাতু কী দোষ করল।

ব্রজসুন্দরী শিক্ষিতা! এও এক ব্যতিক্রম! ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত সুগোপনে তাঁকে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন। সুগোপনে—কারণ সমাজ সেটা সে-কালে মেনে নিত না!

কথা ঘোরাতে কর্তা-মশাই বলেন, তোমার প্রথম যুক্তিটা খাটল না। বিবাহ না-করাটা একবগ্নামি নয়। আর কিছু?

—রূপেন্দ্র তার বাপের চতুষ্পাঠীটা তুলে দিল—

—এটা ভুল বললে, গিমি। বাবা চেয়েছিল সে হয়-নব্বর কবিরাজ হক! তাই সে হয়েছে।

সোফা

—‘ছয়-নম্বর কবিরাজ’ মানে ?

—‘মালাকারশ্রমকারঃ নাপিতো রজকস্তথা। বৃক্ষাঃ বিশেষণ কলৌ পঞ্চ চিকিৎসকাঃ॥’^১
এরাই এতদিন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের চর্চা করত। সৌরীন বাঁড়ুজের তা পছন্দ হয়নি। তাই ছেলেকে
কবিরাজ করে তুলেছে, টোল খুলতে দেয়নি।

—কিন্তু এখানে কে তার চিকিৎসা করাবে ?

—দোষটা রূপেন্দ্রের নয়। তোমার-আমার। তুমিও তো রাজি হওনি। বল, ঠিক কি না ?

—আমার এ রোগ সারবার নয় গো! আর কী জন্য বেঁচে থাকব, বলো ? সবাইকে রেখে
ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে পারলে আর কী চাই ?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তবু হেসেই বললেন —সেটাই তো মুশকিল গিমি! এ পোড়া দেশে
স্ট্রীলোকের চিকিৎসা হতে পারে না। কুমারী অবস্থায় সে চায় বাপ-মায়ের গলগ্রহ হয়ে না
থাকতে। বিধবার তো কথাই নেই, মায় সখবার দলও ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে চায়!



রূপেন্দ্রনাথকে বৈঠকখানায় প্রবেশ করতে দেখে দুর্গাচরণ উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানান, এস,
বাবাজীবন! কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম। তুমি গায়ে ফিরে আসার পর রোজই
ভাবি.....

একই কথা সবিনয়ে নিবেদন করলেন আগন্তুক। আমারই আগে আসা উচিত ছিল,
কাকা। কিন্তু নানান কাজে—

—জানি, জানি। তোমার তো এখন দারুণ পশার! ক্রমাগত রুগীবাড়ি থেকে
ডাক আসছে।

রূপেন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারেন না—এটা অজ্ঞানকৃত না ব্যঙ্গোক্তি। পীরপুর এবং
অন্ত্যজ পরিবারগুলি ছাড়া চিকিৎসক হিসাবে তাঁকে ইতিপূর্বে খুব অল্প লোকেই ডেকেছে।
সেদিক থেকে আজই তাঁর প্রথম অভিযান। একটি বনেদী পরিবারে কবিরাজ হিসাবে আহ্বান
পেয়ে আসা।

দুর্গাচরণের বৈঠকখানায় কাজ সারা হয়নি। তিনি রূপেন্দ্রনাথকে সংলগ্ন একটি কক্ষে নিয়ে
এলেন। বার-মহলেই—একটি জনাস্তিক কক্ষ। তেমন-তেমন গোপন পরামর্শের প্রয়োজনে
ঘরটি ব্যবহৃত হয়। এঘরে এসে দুজনে দুটি চৌ-পায়ায় বসলেন। ভূমিকা ছেড়ে সরাসরি নেমে
আসেন কাজের কথায়, তুমি হয়তো শুনে থাকবে গত বৎসর আমি একটি দারপরিগ্রহ করেছি।
তোমাদের পাড়ারই পীতাম্বর ঠাকুরের কন্যাটিকে—

—হ্যাঁ, গায়ে ফিরে এসে শুনেছি।

^১ ‘বাগানের মালী, কর্মকার, নাপিত, ধোপা আর পাড়ার বৃদ্ধা বেশটা—কলিযুগে এই পাঁচজনই হচ্ছে চিকিৎসক।’

—তিনিই রুগী। তাকেই একটু দেখতে হবে।

—কী উপসর্গ তাঁর?

—ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ এবং বারে বারে বমি করছে।

—ক্ষুধামান্দ্য এবং বমন! ওঁর কি ... অর্থাৎ?

একগাল হাসলেন বৃদ্ধ, এ না হলে ভেষগাচার্য! ঠিকই ধরেছ, বাবাজীবন। ই্যা, জন্মসার্থক হতে চলেছে তাঁর। অনুমান এটি তৃতীয় মাস। শিরোমণি মশাই শান্তি-সন্তোষ করে গেছেন। শনি বক্সী চলছে ওঁর। জনাই ওঝা এসে ঝাড়ফুকও করে গেছে। ওঁর জন্মপত্রিকা অনুসারে পুত্রসন্তানই হবার কথা—নির্বিন্ধেই; অবশ্য একটি কবচ ধারণ করতে হবে। সে ব্যবস্থাও নিয়েছি ...

রূপেন্দ্রনাথ নতনেত্র বেলেন, আমাকে তা হলে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন গাঙ্গুলীকাকা? ব্যবস্থা যা নেবার সবই তো নিয়েছেন দেখছি।

—না, বাবা তুমি অভিমান কর না। তোমরা আজকালকার ছেলে, এসব মানতে চাও না। আমি সবরকম আটখাট বেঁধেই কাজ করতে চাই। খরচ করতেও কুণ্ঠিত নই আমি। শান্তি-সন্তোষ, ঝাড়ফুক, তাবিচ-কবচ, কোবরেজি ঔষধ সব এক যোগে চলবে। বুয়েছ না? লাগে তাক, না লাগে তুক। এই বোধহয় শেষ চেষ্টা। এবার পুত্রসন্তান আমাকে লাভ করতেই হবে। পুন্ড্রাম নরক অতি ভয়াবহ!

রূপেন্দ্রনাথ নীরব রইলেন।

—তুমি তোমার খুড়িমাকে একটি বার দেখ বাবা। ওষুধ-পাঁচন যা বিধান দেবে সব মানা হবে।

—পারবেন তো? লোকলজ্জায় পিছিয়ে যাবেন না?

—পারব না মানে? দুর্গা গাঙ্গুলী কাকে পরোয়া করে? আর লোকলজ্জার কথাটা এখনই আসছে কেন?

—রুগী না দেখেই বলছি—দেখলে হয়তো মতটা বদলাতেও পারে—সাধারণভাবে আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্র বলে এসময় মুক্তবায়ুতে প্রত্যহ কিছুটা পদব্রজে ভ্রমণ করতে হয়। খুড়িমাকে তা অনুমতি দেবেন তো?

আকাশ থেকে পড়লেন গাঙ্গুলী! গ্রামের পথে একটি ফীতোদরা সীমন্তিনী পদব্রজে পায়চারি করছেন! ভাবা যায়? একবার ইচ্ছে হল প্রশ্ন করেন, তোমাদের শাস্ত্রের কী নির্দেশ বাবাজীবন? সেই আসন্ন জননীর পরিধানে অন্তত একটা বস্ত্র থাকবে তো? না কি তাতে হাওয়া-খাওয়া বাধা হবে? কুণ্ঠিত হয়ে প্রশ্নে বালেন, সেটা যে নিতান্ত অসম্ভব তা তো বুঝতেই পারছ বাবা। তবে আমার অন্দরমহলের প্রাক্ষণটি ছোট নয়। সেখানে যদি পদব্রজে ...

—ঠিক আছে। আগে রুগী দেখি। আপনি ভিতরে খবর পাঠান।

অন্দরমহলে খবর দেওয়া হল। ইতিমধ্যে একটি রূপার থালায় কিছু জলযোগ নিয়ে উপস্থিত হল একটি পরিচারিকা। সঙ্গে শোভারানী। গৃহস্থানী বললেন, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, শোভা।

শোভা ব্রাহ্মণের পদধূলি নিল। বাপের দেহের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে প্রতক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে দেখছিল ঐ কন্দর্পকান্তি নব্যপণ্ডিতকে। শোভা জানে—ঐ লোকটির সঙ্গে বাবামশাই তার

বিবাহ প্রস্তাব তুলেছিলেন, তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। না, শোভাকে দেখে তিনি অপছন্দ করেননি। বিবাহ করবেন না বলে স্থির করে রেখেছেন বলেই এ প্রত্যাখ্যান। আচ্ছা, সে-কথা ওঁর কি মনে আছে? শোভার দিকে চোখ তুলে যখন দেখলেন তখন কি তাঁর মনে হয়েছিল—ঐ মেয়েটি হলেও হতে পারত তাঁর জীবনসঙ্গিনী?

একটু পর ডাক এল ভিতর থেকে।

দুর্গাচরণ ওঁকে পথ দেখিয়ে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে এলেন। পিছন পিছন শোভারানী। দ্বারের সম্মুখে চৌকাঠের ফ্রেমে বাঁধানো যেন একটি দেবী প্রতিমা। রক্ত চীনাংশুক তার পরিধানে, মাথায় আধো ঘোমটা, সর্বান্তে নানান অলঙ্কার—এ ভদ্রাসনের নববধূ সে। রূপেন্দ্রনাথ অবশ্য সেসব কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না—তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অলঙ্কারাগ-রঞ্জিত নূপুরশোভিত একজোড়া রাতুল চরণে। মৃন্ময়ীর কিন্তু কোন সঙ্কোচ নেই। কেন থাকবে? উনি তো ওর সোনাদা! কাল সারারাত যাকে স্বপ্ন দেখেছে, আজ সারা সকাল যার আগমন প্রতীক্ষা করেছে। নির্নিমেষ দুটি কাজলকালো চোখ মেলে সে দেখছিল ঐ অদ্ভুত মানুষটাকে। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে সেই সেবারের মতো নিচু হয়ে ওঁকে প্রণাম করার উপক্রম করল। কিন্তু তার পূর্বেই রূপেন্দ্রনাথ নত হলেন মৃন্ময়ীর পদধূলি নিতে।

শিউরে উঠল মেয়েটি। এক লাফে পিছিয়ে গেল কিছুটা। অশ্রুটে আর্তনাদ করে উঠল, আমি মৃন্ময়ী, মীনু!

এতক্ষণে মুখ তুললেন। কাব্যের ভাষায় যাকে বলে ‘চারিচক্ষের মিলন হওয়া’—তাই ঘটল। স্নান হেসে রূপেন্দ্রনাথ বললেন, জানি, জানি, খুড়িমা। ঠিক আছে, আপনি বয়সেকনিষ্ঠা, আমার প্রণাম যদি না নেন, তো নাই নিলেন।

পিছন থেকে দুর্গাচরণ হঠাৎ ফোড়ন কাটেন, প্রথম পোয়াতি তো! বড়ই লজ্জা ওর! এমনকি পেন্নাম নিতেও।

রূপেন্দ্রনাথ পিছনে ফিরলেন। একটু কঠিন শোনালো তাঁর কর্তৃস্বর। বৃদ্ধকে বললেন, আপনি বৈঠকখানায় গিয়ে অপেক্ষা করুন। রোগিনীকে দেখা শেষ হলে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

দুর্গাচরণ ঘাবড়ে যান। যা কবাব! এ আবার কি অসৈরণ কথা! ‘সোয়ামি’ বলে কতা। তাকেও খেদিয়ে দেবে! মৎলবখানা কী?

—না, তুমি যেও না। তুমি থাকবে।

শেষ নির্দেশটা শোভারানীকে।

বৃদ্ধকে বিতাড়িত করে তিনজনে কক্ষের ভিতরে এলেন। এটাই বড়কর্তার শয়নকক্ষ। এক প্রান্তে বিরাট পালঙ্ক। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি চারপাই ও বেতে-বোনা মোড়া। একটি আরাম-কোদারা। দেওয়ালে দেবদেবীর পটে আঁকা ছবি। কুলুঙ্গিতে কালিমাচিহ্ন—প্রদীপ রাখা হয় সেখানে। রূপেন্দ্রনাথ এবার প্রশ্ন করেন, আপনার শারীরিক কষ্ট কী জাতীয়?

মৃন্ময়ী এখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি। সেই ‘নয়’ এর হিসাবটা! যে মানুষটার কাছে চেপে এককালে দামোদরে নৌকায় বাইচ খেলা দেখেছে, সে ওর চেয়ে কত বড়? অথবা কত ছোট? ‘তুই’ থেকে যেদিন হঠাৎ ‘তুমি’তে উঠেছিলেন—বলেছিলেন ‘তুমি এখনো খুকি’ তখন মনে মনে কী যেন একটা প্রশ্ন করেছিল না মৃন্ময়ী? আজ সেই ‘তুমি’ ছেড়ে ‘আপনি’-তে ওঠায়

মনে-মনেও কোন প্রশ্ন করতে পারল না। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠছে শুধু।

—বলুন খুঁড়িমা? কী কষ্ট হয় আপনার?

অজান্তে সত্য কথাটাই বার হয়ে এল মুখ দিয়ে, বুকে বড় ব্যথা!

—বুকে ব্যথা! ঠিক কোনখানটায়? আচ্ছা, আপনি বরং শুয়ে পড়ুন। চিৎ হয়ে।

একটু চমকে ওঠে! চিৎ হয়ে! লোকটা বলে কী?

শোভারানীও অবাক হয়েছিল। তবু মায়ের হাত ধরে নিয়ে এসে পালকে শুইয়ে দেয়। চাদরটা টেনে পা দুটি ঢেকে দেয়।

—আপনার হাতটা দিন? —নিজের হাতটি প্রসারিত করে দেন চিকিৎসক।

—হাত! কেন?

—বাঃ! নাড়ি দেখব না?

আপাদমস্তক শিউরে উঠল মৃন্ময়ীর। একদিন সাহসে ভর করে গুঁর চরণ ছুঁয়ে প্রণামটা পর্যন্ত করতে পারেনি। আজ সেই তিনিই বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর হাত—পরস্পার পাণি গ্রহণ করবেন বলে! কিন্তু শুধু সেটুকুই নয়—মৃন্ময়ীর মনে পরে গেল, কোথায় যেন শুনেছে: অভিজ্ঞ কবিরাজ নাড়ি ধরে রোগিণীর মনের ভিতরের কথাটা টের পেয়ে যান! উনি যদি বুঝে ফেলেন! ওর বুকের ভিতরটা কী ভাবে উথাল-পাতাল হচ্ছে! কেন হচ্ছে!!

মৃন্ময়ী নিজের হাতটা গুটিয়ে নিয়ে শুধু বললে, ন-না!

হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। তাঁর মনে পড় গেল আর একদিনের কথা। মীনুর কী দোষ? সে তো স্বয়ংরা হয়ে রাজরাজেশ্বরী হয়েনি। সে তো ছাগশিশু মাত্র। সমাজ তার গলায় দড়ি বেঁধে এই যূপকাঠে এনে ফেলেছে! তাই হাসতে হাসতেই বলেন, ‘না’ কেন? আমি তো আপনার মুখে আবার মাখিয়ে দিতে চাইছি না!

বুকের মধ্যে আবার মুচড়ে উঠেছে হতভাগিনীর। ইচ্ছা করছিল একটা জান্তব আর্তনাদ করে প্রতিবাদ করতে! সেই স্বাধীনতাকে নিয়ে এ জাতীয় ব্যঙ্গ ও সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারল না। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে নীরব প্রতিবাদ জানাতে চায়। ‘না’-য়ের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে।

উনি ভুল বুঝলেন। এটা যে নীরব প্রতিবাদের ভঙ্গি তা বুঝলেন না। ওর প্রসারিত কর গ্রহণ করে নাড়ি দেখতে শুরু করলেন। মৃন্ময়ী দাঁতে দাঁত দিয়ে তার আন্তর আকুতিটাকে গোপন করার চেষ্টা করতে থাকে।

দীর্ঘ সময় নাড়ির গতি পরীক্ষা করে রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, ভয়ের কিছু নাই। নাড়ির গতি দ্রুত—সম্ভবত উত্তেজনা। হয়তো যে কথাটা গোপন করতে চাইছিল মীনু, তা বুঝে ফেলেছেন। নাড়ির স্পন্দনে নয়, ওর আচরণে, ওর মুখের রক্তমাভায়। ওর সর্বাবয়বে সেই গোপনবার্তার অনুরণন। এ যে মানুষে কেমন করে বোঝে তা বোঝানো যায় না। ষোড়শকরি একই তরঙ্গভঙ্গে যখন দুটি হৃদয় স্পন্দিত হতে থাকে তখন ‘বে-তারে’ ধরা পড়ে একের কাছে অপরের গোপন কথা!

হয়তো গুঁর গোপন কথাটাও বুঝে ফেলেছে ঐ বোকা মেয়েটা—কেন তিনি গ্রামে ফিরে আসার পর জগুঠাকরুণকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্ত: তিনি আজীবন কৌমার্যরত পালন

করে আর্থের সেবা করে যাবেন।

ধীরে ধীরে রোগিণীর হাতটা নামিয়ে রেখে বলেন, ভয়ের কিছু নাই। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ।
বম্বনের যে বেগটা আছে ওটা স্বাভাবিক—জৈব বৃত্তি। নির্বিঘ্নেই সন্তান জন্মাবে।

এবার উনি ‘আপনি তুমি’ এড়িয়ে কথা বলেছেন।

শোভারানী হঠাৎ ফস করে প্রশ্ন করে বসে, ছেলে না মেয়ে?

রাপেন্দ্র ওর দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত হাসলেন। বলেন, সে কথা দৈবজ্ঞই শুধু বলতে পারেন,
শোভা, চিকিৎসক পারে না।

নিজের অজান্তেই মীনুও হঠাৎ একটা কথা বলে বসেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ...

চোখে চোখ পড়তেই থেমে যায়।

রাপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে যায়, ‘জয়ন্তপ্রতিম সূতঃ’!

মান হেসে বলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ একালে অমোঘ নয়—‘অমোঘ ব্রাহ্মণাশীষঃ’
নীতিবাচকা শুধুমাত্র সত্যযুগের জন্য। কলির ব্রাহ্মণের সে ক্ষমতা নেই, মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী! ‘খুড়িমা’ নয়! চোখ দুটি জলে ভরে আসে।

‘পৌলমী’ সে হতে চায়নি, পাকেচক্রে হয়ে গেছে। কিন্তু একটি পুত্রসন্তান যে তার চাই-ই!
না হলে তাকে এ ইন্দ্রপুরী থেকে নেপথ্যে সরে যেতে হবে। তার অবমাননার শেষ থাকবে না!

রাপেন্দ্রনাথের পরবর্তী কথাটায় এ চিন্তার ছেদ পড়ল। কথাটা শুনে যেন বহুহতা হয়ে
গেল মৃন্ময়ী।

রাপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এবার বুকটা একবার দেখব, মীনু!

কথাটা বলে তিনি পুলিন্দা হাৎড়াতে থাকেন।

‘স্টেথোস্কোপ’ যন্ত্রটা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তার একটি আদিমরূপের ব্যবহার ছিল
আরব-পারস্যে। মুঘলযুগে হাকিম-উল্-মলুকদের মাধ্যমে সেটি গ্রুসে পৌঁছেছে ভারত-খণ্ডেও।
দু-মুখো ক্ল্যারিওনেট জাতীয় একটা যন্ত্র। তার দুপ্রান্তে দুটি ভেক-চর্ম। এক প্রান্ত রোগীর
বক্ষস্থলে স্থাপন করলে অপরপ্রান্তে চিকিৎসকের কর্ণমূলে হৃদস্পন্দনের শব্দ শ্রুত হয়।
রাপেন্দ্রনাথের তেমন একটা যন্ত্র ছিল পুলিন্দায়। তিনি সেটি ঝুঁজে বার করতে নিচু হয়েছেন।
তাই নজরে পড়েনি, তাঁর কথাটা শুনে কী জাতীয় প্রতিক্রিয়া হয়েছে কক্ষ উপস্থিত দুটি যুবতীর
মুখাবয়বে। মৃন্ময়ীর মুখটা ক্ষণেকের জন্য আরক্তিম হয়ে উঠেছিল—পরমুহূর্তেই তা রক্তশূন্য।
শোভারানীও বিচলিতা। বস্তৃত ‘কবিরাজ’ জীবটিকে সে ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। চিকিৎসা-
পদ্ধতি কী জাতীয় হয় কিছুই জানা নেই। তার মনে হল—হয় তো এটাই নিয়ম। নাড়ি দেখার
পর বুক দেখা! নাড়ির স্পন্দনের পর বকের স্পন্দন!

মৃন্ময়ী আর শায়িতা নয়। উঠে বসেছে। অশ্রুটে বলে, কী বললেন?

তখনও যন্ত্রটা ঝুঁজে পাননি। মুখ নিচু করেই পুনরাবৃত্তি করেন, বুকটা একটু দেখিব।

মৃন্ময়ী যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না।

যন্ত্রটা ঝুঁজে পেয়েছেন। সেটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসেই ওঁর নজর পড়ল রোগিণীর
দিকে। প্রশ্ন করেন, কী হল?

—আপনি ... আপনি ...

শোভারানী ওর বাহুমূল ধরে ফেলে।

অক্ষুটে বলে, এটাই নিয়ম ছোট মা। আমি কাঁচুলির বাঁধন খুলে দিচ্ছি। লজ্জা করবেন না।
উনি এবার আপনার বুক দুটো দেখাবেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন রূপেন্দ্রনাথ। কী সর্বনাশ! তাঁর উচ্চ গত 'বুক' শব্দটা সহসা দ্বিবিচনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ায় মুহূর্তমধ্যে প্রাণধান করেছেন—এদের কী মর্মান্তিক ভ্রান্তি হয়েছে।

কিন্তু প্রতিবাদে তিনি কোন কথা বলার পূর্বেই গৃহের দ্বার উন্মোচিত হল। বোঝা গেল, গৃহস্বামী দৃষ্টিসীমার বাহিরেই ছিলেন শুধু, শ্রুতিসীমার নয়। ধীর পদক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবার কন্যাকে বলেন, তুই ভিতরে যা!

শোভারানী তার বিমাতার পৃষ্ঠদেশে কঞ্চুলিকার ফাঁসটি সবেমাত্র উন্মোচিত করেছে। নিদারুণ আতঙ্কে, লজ্জায় আরক্ত আননে মুন্সায়ী বাধা দিতে ভুলে গেছে যেন। বাবার আদেশে ঐ অবস্থাতেই শোভারানী শয়নকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। বৃদ্ধ বললেন, তোমার রুগী দেখা শেষ হয়ে গেছে, রূপেন্দ্রনাথ। এস, আমার সঙ্গে এ ঘরে এস।

রূপেন্দ্রনাথ আতঙ্কে বলে ওঠেন, না! আপনারা আমাকে ভুল বুঝেছেন। সে কথা বলতে চাইনি আমি।

দুর্গাচরণ দৃঢ়স্বরে বলেন, এ ভদ্রাসনটি আমার। আমিই গৃহস্বামী। আমি তোমাকে আদেশ করছি রূপেন্দ্রনাথ। বাইরে এস। তোমার যা কৈফিয়ৎ তা আমাকেই দিও। এস—

রূপেন্দ্রনাথ একবার পিছন ফিরে দেখলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় এবং সম্ভবত আরও কোন অনুভূতিতে মুন্সায়ী আর মানুষ নয়: মুন্সায়ী!

বৈঠকখানার নির্ভনে এসে গাঙ্গুলী বলেন, আমি তোমার কোন কৈফিয়ৎ শুনতে চাইনে—এ তোমার সাময়িক চিন্তাচঞ্চল্য, দুর্মতি না চিকিৎসাপদ্ধতির অঙ্গ তা জানবার কোন কৌতূহল নেই আমার। যদি চিকিচ্ছেই হয়, তাহলে বলব সেটি থাক! শুনেছি, তোমরা প্রতিবেশী—নিতান্ত অল্পবয়সেই তোমাদের দুজনের মধ্যে

—কী বলছেন আপনি! শুনুন—

—না। তোমাকে বৈদ্যবিদ্যায় হিসাবে কয় কর্দক দিতে হবে তাই শুধু বল। এ পৈশাচিক চিকিৎসার কথা আমি কিছু শুনব না। তবে একটা কৌতূহল যদি মিটিয়ে যাও তাহলে খুশি হব—

—কী?

—যুবতী নারীর বুকজোড়া দেখার সখ যদি এতই প্রবল, তাহলে কুলীন বামুন হয়ে তুমি কেন

রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পুলিস্‌টা তুলে নিয়ে বললেন, ধামুন! আপনি বয়োজেষ্ঠ। সম্পর্কেও বড়। তবে আপনার সঙ্গে বাক্যলাপ করতে আমার আজ ঘণা হচ্ছে। আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!

—বুঝলাম! তা বাবা সম্পর্কটা কার সঙ্গে রাখবে? দুর্গা গাঙ্গুলী তোমার শততুর, নন্দ

চাটুজ্জও তাই। তোমার পরমাত্মীয় কি ঐ পীরপুরের কলিমুদ্দীন মোল্লা? সোঞাই গায়ে তিষ্ঠতে পারবে?

বিনা প্রত্যুত্তরে রূপেন্দ্রনাথ বার হয়ে গেলেন।



গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংবাদটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল: ব্রজসুন্দরী অন্তর্জলিয়াত্রায় যাচ্ছেন।

সোঞাইয়ের কাছে-পিঠে গঙ্গা নাই। গ্রামটি দামোদরের প্রসাদধন্য। গঙ্গাতীরে উপনীত হবার দুটি বিকল্প পথ। স্থলপথে অথবা জলপথে। ডুলি নিয়ে সড়ক ধরে যদি এগিয়ে যাও গলসি, বর্ধমান, মন্তেশ্বর হয়ে মহাতীর্থ নবদ্বীপধামে উপনীত হবে পাঁচদিনের মাথায়। দ্বিতীয়ত জলপথ। সময় হয়তো কিছুটা বেশি লাগবে। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে সেটা আরামদায়ক। নৌকায় ঝাঁকি কম। সে পথ প্রথমে সিধা উত্তরমুখে। দামোদর পার হয়ে উত্তর-মুখে চলতে থাকলে পৌছাবে অজয়ের তীরে। নৌকা পাবে সেখানে। চলতে থাক পূর্বাভিমুখে। পথে পড়বে ইলামবাজার। জয়দেব-কেন্দুবিষের কাছাকাছি। তারপর মঙ্গলকোট, কাটোয়া। এই কাটোয়াতে অজয় বিলীন হয়েছে গঙ্গায়। রোগীর অবস্থা যদি ইতিমধ্যে সঙ্গীন হয়ে উঠে থাকে, তাহলে নবদ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা কর না। কাটোয়ার গঙ্গাতীরেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সব কিছু পাবে সেখানে—হরিসংকীর্তনের দল থেকে চন্দন কাঠ। আর তখনো যদি রোগীর পার্শ্বিক বন্ধন ছিল হবার মুহূর্তটি আসন্ন না হয়ে থাকে, তবে এবার গঙ্গা বেয়ে দক্ষিণাভিমুখে চলতে পার। অচিরেই উপনীত হবে শ্রীচৈতন্য-পদরঞ্জন্য নবদ্বীপধামে। স্থির হয়েছে গুঁরা নদীপথেই যাবেন। কাটোয়া অথবা নবদ্বীপ? সেটা—‘ক্ষেত্রে কর্ম বিধিযতে’। রোগীর অবস্থা বুঝে।

সেই মতো যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাড়ম্বরে শেষযাত্রার আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। শুধুমাত্র রোগিণী একা গেলেই তো চলবে না—যেতে হবে বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র তারাপ্রসন্নকে। না হলে, মুখাণ্ডি করবে কে? এমনকি যেতে হবে স্বয়ং জমিদার-মশাইকেও। না হলে, অস্তিম মুহূর্তে সতীসাবিত্রীর ওষ্ঠাধরে পতিদেবতার পাদোদকটুকু দেওয়া যাবে কী ভাবে?

এল ডুলি, পালকি, সারি সারি গোয়ান। গো-গাড়িতে যাবে মালপত্র। অনেক আগেই রওনা হবে তারা স্থলপথে। পথে চোর-ডাকাতের ভয় নাই। নবাব আলিবর্দীর সুবন্দোবস্তে সমগ্র রাজ্যে শান্তি বিরাজিত। তবু আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে সঙ্গে যাবে পাইক বরকন্দাজ। যাত্রা-মুহূর্তটি সুচিহ্নিত। রওনা হতে হবে কৃষ্ণা তৃতীয়ার সূর্যোদয়-মুহূর্তে। পঞ্জিকা দেখে যাত্রা-মুহূর্তটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং বাচস্পতি। কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ভাদুড়ী মশায়ের কুলশুক। প্রতিটি মোচ্ছবেই তাঁর শুভাগমন ঘটে। দোল, দুর্গোৎসব, পুণ্যাহে। এবারও সংবাদ পেয়ে এসেছেন। বিধানটা তাঁরই—ঐ অন্তর্জলিয়াত্রা। গ্রহ সংস্থান ও কোটি বিচার করে উনি সিদ্ধান্তে এসেছেন

তিন-চার সপ্তাহ পরে—ঐ পূর্ণিমার কাছাকাছি পটাকাশ-ঘটাকাশে আর ফারাক থাকবে না। পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি পাবেন ব্রজসুন্দরী। গুরুদেব অভ্যর্জলিয়াত্রার দলে যাচ্ছেন না। গৃহলক্ষ্মীকে রওনা করে দিয়ে তিনি যজ্ঞ করতে বসবেন। অনিবার্ণ শিখায় জ্বলতে থাকবে হোমায়ি। যতদিন না সংবাদ আসে গঙ্গাতীরে জীবাত্মা বিলীন হয়ে গেছে পরমাত্মায়। এ জন্য গুরুদেব দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ শিষ্য সমভিব্যাহারে এসেছেন। যাতে অহোরাত্র যজ্ঞে কোনও ব্যত্যয় না হয়। অপরিসীম দাটো বাচস্পতি ঘোষণা করেছেন—এ মহাযজ্ঞ অমোঘ! অব্যর্থ! কোন যমদূতের পিতৃদেবেরও দুঃসাহস হবে না সতীলক্ষ্মীর পুষ্পকরথের সম্মুখে এসে পথ রুখতে। গঙ্গাতীর থেকে পুষ্পকরথ না থেমে সোজা চলে যাবে খাশ বৈকুণ্ঠলোক—

গোয়াবাপি চ চণ্ডালো দুষ্টো দুষ্টচেতনঃ।

বালঘাতী তথাহবিদ্বান্ শ্রিয়তে তত্র বৈ যদা॥

গো-হত্যার পাপ, শিশু হত্যার পাপও এই হোমশিখায় পুড়ে থাক হয়ে যায় যে! চণ্ডাল, শঠ, দুষ্টচেতা, বিদ্বান্, মূর্থ কোন বাহুবিচার নেই—যজ্ঞান্তে পূর্ণাহুতির অবসানে যজ্ঞমান লাভ করে বৈকুণ্ঠধামের অধিকার। ব্রজসুন্দরী এমনিতেই পুণ্যাত্মা, সতীলক্ষ্মী—তার অক্ষয় বৈকুণ্ঠবাস ঠেকায় কোন 'ইয়ে'। জমিদার-বাড়ির 'মাচিঘর' অর্থাৎ ভাণ্ডার থেকে আড়াই মণ গব্যঘৃত বার করে দিয়েছে গোমস্তা। সোজা কথা! যমদূত তো ছাড়, তার চৌদ্দপুরুষ এ দিগড়ে ভিড়বে না! আড়াই মণ গব্য ঘৃত! সোজা 'কতা'?

শুধু সোএগই বা পঞ্চগ্রামেই নয়, পুণ্যাত্মা মহিলা হিসাবে—দেবীর অংশ হিসাবে, ব্রজসুন্দরীর খ্যাতি দূর-দূরান্তে প্রসারিত। পাকা চুল কুলীনের ঘরে অসপত্ন অধিকারে সংসার করে গেলেন দেড়কুড়ি বছর! সেটাই একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম। তাছাড়া, তাঁর স্বামীর ঐশ্বর্য কুবেরীবিহিত, প্রতাপ ইন্ড্রের মতো আর দাম্পত্য জীবনের একমুখিনতা শ্রীরামচন্দ্রের মতো। এমন সৌভাগ্যশীলা ভাগ্যবতী কে কোথায় দেখেছে?

কিন্তু সেজন্যই শুধু নয়, ব্রজসুন্দরীর উপর দেবীত্ব আরোপিত হয়েছিল আর একটি অলৌকিক ঘটনায়। অবিশ্বাসীরা তার লৌকিক ব্যাখ্যা দেবার অপচেষ্টা যে না করে তা নয়—বলে, এ নিতান্তই কাকতালীয়। কিন্তু যারা ভগবৎ-বিশ্বাসী তারা বুঝতে পারে 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর।'

সে অনেক-অনেক দিন আগেকার কথা। ব্রজসুন্দরী তখন পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া। একটি মাত্র সন্তানের জননী—তারাপ্রসন্ন।

কৃষিনির্ভর অঞ্চল। আর কৃষকের ভাগ্য বৃষ্টির সময় ও পরিমাণের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। দু-পাঁচ-দশ বছর পর পর আসে 'আকাল'—অনাবৃষ্টি। অনাবৃষ্টি মানে অনাসৃষ্টি। মা ধরিত্রীর বুক টৌচির হয়ে যায়। দিগন্তজোড়া মাঠ খা-খা করতে থাকে। তৃণশুল্ক পূর্যন্ত নিঃশেষিত। গোচারণ ভূমি সব ব্রহ্মডাঙার মাঠ। শুরু হয় প্রথমে গো-মড়ক! তাতে সীতাবান হওয়ার কথা বায়েন পরিবারের; কিন্তু তারাও যুক্তকরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জিনায়—এমন সৌভাগ্য যেন না আসে! সে দৃশ্য চোখ চেয়ে দেখা যায় না। আকাশের কোণে কোণে কালো মেঘের বদলে সঞ্চরমান শকুন! মাথায় হাত দিয়ে বসে চাষীভাই ইলিমবাজার, বর্ধমান, খাশ মুর্শিদাবাদে ক্রীতদাসের দাম হু-হু করে পড়তে থাকে। দলে দলে গ্রামের মানুষ চলতে থাকে

শহর গঞ্জের দিকে। এক ধামা মুড়ির বিনিময়ে তাদের পরিবার থেকে নির্বাচন করে নিতে পার যে কোন যৌবনবতীকে। যাকে মনে ধরে! ক্রীতদাসী! আমৃত্যু না হলেও, আযৌবন তারা নিত্য-সেবায় খাড়া থাকবে।

সেই আকালের বৎসরে গ্রামের মানুষ শিবের দোরে 'হত্যা' দেয়। মানত করে। মায়ের থানে জোড়া পাঠা বলি দেয়। শেষমেশ ব্যাঙের বিয়ে। তাতেও বৃষ্টি না নামলে অস্তিম প্রচেষ্টা—সার্বজনীন 'পর্যন্তদেবের' পূজা।

'পর্যন্তদেব' এক লৌকিক দেবতা। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে তাঁর নামটা যে কোন পুরাণে লেখা আছে তা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে, তবে শিরোমণি-মশাই বলেন আছে, নিশ্চয় আছে। না হলে আবহমানকাল ধরে আকালের বছর তাঁরে স্মরণ করা হয় কেন? আর মনে করে দেখ; বাবা-সকল—তাঁর কৃপাতেই শেষমেশ বর্ষা নামে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থটাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শিরোমণি মশাই, নামটির অর্থ বুঝলি তো? ওনার বাস মানুষের শেষ সহ্য সীমান্তে। 'আকাল' মানে দেবতার রোষ। কোন কিছু অন্যায় হয়েছে—অজান্তে—মানে সবাই তা টের পায়নি। তাই এই অনাবৃষ্টির অনাসৃষ্টি। সহ্য কর তোমরা। তারপর শেষ সীমান্তে পৌঁছে দেবতাকে বল: আর পারবনি বাবা! আমাদের সইবার ক্ষমতা এই পর্যন্ত! তখনই 'পর্যন্ত' দেবের পূজা করতে হয়। বৃষ্টি নামে। পর্যন্তদেবের গায়ের রঙটি নিকষ কালো—নীলের আভা। চতুর্ভুজ—বরাভয়, লক্ষ্মীর ঋণি আর বজ্র।

দুদশ বছর বাদে—আকালের বছরে—এ অঞ্চলে পর্যন্তদেবের সার্বজনীন পূজা হয়। রূপেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'পর্যন্তদেব'-এর বর্ণনা কোন পুরাণে আছে।

আদ্যোপান্ত শুনে সেই মহাপণ্ডিত বলেছিলেন, আমার মনে হয়, এই লৌকিক দেবতাটি অব্যতীত নয়। সম্ভবত পুরাকালে তাঁর নাম ছিল : 'পর্জন্যদেব'। শব্দটা লোক মুখে 'পর্যন্তদেব' হয়ে গেছে; পর্জন্য একজন বৈদিক দেবতা। তাঁর গাত্রবর্ণ ঘন নীল, হাতে বজ্র মেঘ দিয়ে তিনি অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেন। ঋগ্বেদে তাঁর নামে তিনটি সূক্ত আছে।

পঞ্চম মণ্ডলের ত্রাশীতিতম সূক্তের দ্রষ্টা অত্রিপুত্র ভৌম ঋষি, ছন্দ : ত্রিষ্টুপ এবং দেবতা : পর্জন্যদেব। গীতাতেও আছে: 'পর্জন্যং অন্নসম্ভবঃ'!



যে বছরের কথা বলছি—প্রায় বিশ বছর আগে, সেবার কিন্তু 'পর্যন্তদেব' বা 'পর্জন্যদেব'-ও কক্ৰুণা করলেন না। এমনটি কখনো হয়নি আতঙ্কে সবাই হিতাহিত জ্ঞান হারাতে বসল।

হঠাৎ একমুঠি-বাবা এসে বললে, ঐসিন নেহী হোগা! যবতক বড়ামাই নেহী আয়েগি, গুজা নেহী চড়ায়েগি, তবতক বাবা খুশ নেহী হোগা!

একমুঠি-বাবা এক পাগল সন্ন্যাসী। ভোলাবাবার মন্দিরের গায়ে যে ভবানী মন্দির—সেখানেই আছে আবহমানকাল। কেউ বলে তার বয়স সওয়াশ্রী, কেউ বলে দেড়শ। গ্রামের প্রাচীনতম অশীতিপর বৃদ্ধও বলেন, বাল্যকালে একমুঠি-বাবার চেহারা ঠিক একই রকম

লেখেছেন—এক মাথা জটা, একবুক দাড়ি, হাতে ত্রিশূল, কানে মাকড়ি আর ডান হাতের অনামিকায় একটা অষ্টধাতুর প্রকাণ্ড আংটি। বিদেশী িচয়—সেটা তাঁর বাচন-ভঙ্গিতেই বোঝা যায়। কিন্তু কোথা থেকে যেন এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন কেউ জানে না।

পাগল মানুষটার কথা মানাও চলে না, ফেলাও চলে না। তাঁর কথাটা অবশ্য সত্য। জমিদার গৃহিণী আজ মাসখানেক শয্যাশায়ী। তিনি বারোয়ারীতলায় আসেননি, আসতে পারেননি।

লোকমুখে একমুঠি-বাবার ঐ নিদান শুনে ব্রজসুন্দরী জিদ ধরলেন তাঁকে পূজাতলায় নিয়ে যেতে হবে। পাল্কি চেপে তিনি এলেন; কিন্তু বাবাকে অর্ঘ্য নিবেদন করার সময় তাঁর মাথা টলে উঠল। তিনি মুর্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন বাবার সামনে। হস্তধৃত নৈবেদ্যের থালাটা ঠিকরে গিয়ে পড়ল মূর্তির চরণে।

ধরাধরি করে মুর্ছিতাকে সবাই বার করে আনল।

নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা! সেরাত্রেই প্রবল বর্ষণে মাঠঘাট ভেসে গেল!

সেই দিন থেকেই আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস ব্রজসুন্দরী কোন শাপভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী। জমিদারবাড়িতে এসে একটা নিষ্পাপ জীবন কাটিয়ে গেলেন। আজ মেয়াদ অন্তে শাপভ্রষ্টা স্বর্গে ফিরে যাচ্ছেন!

আর সেই জনেই খবরটা যখন গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়ে গেল তখন দূর-দূরান্তর থেকে গোযান আসতে শুরু করল সোণাই অভিমুখে। ওরা 'বড়মাক'ে শেষ প্রণাম করতে আসছে।

দুরন্ত অভিমানে জগুঠাকুরণ বাক্যলাপ বন্ধ করেছেন তাঁর ভাইপোর সঙ্গে। দুর্গা গাঙ্গুলীর বাড়িতে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানেন না, তবে উপসংহারে দুজনে যে দুজনার মুখ দেখাদেখি বন্ধ করেছেন এটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে। ওর 'একবল্লামির' একটা সীমা থাকবে তো!

জগু তাঁর কন্যাটিকে বলেন, তোর দাদাকে জিজ্ঞেস কর—ও কি যাবে আমাদের সাথে? রূপেন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রুতিসীমার মধ্যেই। প্রশ্ন করেন, কোথায় পিসি?

কিন্তু জগু তো কথা বলবেন না। তাই কাত্যায়নীকেই বলেন, বল না তোর দাদাকে সব বিস্তারিত। জেনে নে—ওর শাস্তর কী বলে! জ্যেষ্ঠিকে পেন্নাম করাটা কি শাস্তর-সম্মত হবে? নাকি তার শাস্তরে মানা!

কাত্যায়নী অতি দ্রুত বাধা দিয়ে বলে, কাল সকালে বড়মা শেষ যাত্রা করবেন। মা আর আমি যাচ্ছি তাঁকে পেন্নাম করতে। তুমি আসবে?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আপনি আমার উপর অহেতুক রাগ করে আছেন, পিসিমা। আমি অন্যায় কিছু করিনি...

জগুপিসি কাত্যায়নীকে নির্দেশ দেন, তোর দাদাকে বলে দে, আমরা এগুচ্ছি। তার মন চায় তবে সে যেন আসে, না চায় নেই! আমার সব সইবে!

ব্রজসুন্দরীকে নামিয়ে আনা হয়েছে পূজামণ্ডপে। বাড়িটি চক মেলানো অস্থায়ী চারিদিকে সারি সারি ঘর। মাঝখানে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেটা পূজামণ্ডপ গ্রন্থানেই দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা হয়। আবার কুলনে রাখাকুন্ডের দোলনমঞ্চ। এই প্রাঙ্গণেই বসে যাত্রার



আসর। কীর্তনের আসর। বর্তমানে ঐ প্রাঙ্গণের কেন্দ্র-স্থলে একটি সুসজ্জিত পালঙ্কে গৃহস্থামিনী শায়িত। তাঁর পরিধানে নিতান্ত বেমানান একটি অত্যন্ত মহার্ঘ বেনারসী শাড়ি। বেমানান এজন্য যে, বৃদ্ধার পরিধানে তা দৃষ্টিকটু। কিন্তু জগুঠাকুরগণ কোন কথা শোনেননি। বলেছিলেন, গঙ্গাজল, আর কোনদিন তো তোকে কিছু বলতে আসবনি। কতা শোন! এই বের বেনারসী পরেই ড্যাংডেডিয়ে যাত্রা করতে হবে।

জগুঠাকুরগণ ব্রজসুন্দরীর ‘গঙ্গাজল’। সখী। ব্রজসুন্দরী এই শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। বড়বৌমা—তারা প্রসন্নের স্ত্রী, তাই এই শাড়িখানিই পরিয়ে দিয়েছেন তাঁকে। বৃদ্ধার মাথায় অপরিপুষ্ট সিন্দুর, চরণদুটি অলঙ্কারাগরঞ্জিত। তিনি শয্যালীন। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান আছে। বিহ্বল দুটি চোখ মেলে তিনি সবাইকে দেখছিলেন। চিনতে পারছিলেন। শয্যালীন হলেও তাঁর মাথার পিছনে কয়েকটি উপাধান—শায়িত অবস্থায় প্রণাম করতে নেই—এমনকি অন্তর্জলিয়াত্রার পথিককেও।

রূপেন্দ্রনাথ যখন এসে উপস্থিত হলেন তখনো অপরাহ্নের আলো আছে। সন্ধ্যা হতে আরও দূদণ্ড বাকি। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে। প্রাঙ্গণে তিলধারণের ঠাই নাই। শয্যালীনাকে ঘিরে পুরললনার দল। পুরুষেরা প্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। বাহিরেও অনেক দর্শনার্থী। তারা সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করে প্রণাম করে অন্য নিষ্ক্রমণ দ্বার দিয়ে বহির্গত হয়ে যাচ্ছে। সারা দুপুর ধরে। রূপেন্দ্রনাথ অনেককেই চিনতে পারলেন, যদিও তিনি গ্রামের অনেককেই চেনেন না। বরাবর ভিনগাঁয়ে থাকায়। বৃদ্ধার চরণপ্রান্তে বসে আছেন বৌঠান—তারা প্রসন্নের সহধর্মিণী। তার পাশে পুটু। ওপাশে নন্দখুড়োর দুই স্ত্রী, তার পরে শোভারানী, মতি, মৃদুয়া। তার পাশে কাত্যায়নী। জগুপিসি বৃদ্ধার মাথার কাছে। রূপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য হল বৃদ্ধা সজ্জানে আছেন। দু-চারটি কথাও বলছেন। কথোপকথন শুনে পাচ্ছিলেন না তিনি। পেলে বুঝতে পারতেন—জগুঠাকুরগণ প্রশ্ন করেছিলেন, কীরে গঙ্গাজল? ভয় করছে?

বৃদ্ধা বলছিলেন, ওমা, ভয় করবে কেন রে? ভর-ভরাস্ত সংসার রেখে যাচ্ছি—এতো আনন্দের যাওয়া। শুধু ঐ বুড়োটোর জন্যে—ওকে একটু দেখিস, গঙ্গাজল।

টেকে নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। রূপেন্দ্রনাথ রোগীবাড়ি এসেছিলেন তাঁর সেই বিচিত্র পুলিঙ্গটি হাতে নিয়ে। এখন মনে হল ভুল করছেন তিনি। এ রোগের চিকিৎসা নেই। এই রোগীবাড়ি থেকে কেউ তাঁকে কোনদিন ডাকেনি—চিকিৎসক হিসাবে। কিন্তু এ বাড়ির দ্বার তাঁর কাছে অব্যাহত। বছর বছর দোল-দুর্গোৎসবে এসেছেন। সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখতে তো কতবার। ব্রজসুন্দরী তাঁকে ভালও বাসতেন খুব। ব্রজেন্দ্রনারায়ণও। কিন্তু এখন তিনি অব্যাহত। যে রোগী মৃত্যুর কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে বসে আছে তার চিকিৎসা হয় না।

দাসখৎ? না, কথাটা ঠিক হল না। বরং বলা উচিত মৃত্যুই ঔর কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। মৃত্যু তার মহিমা, তার ভয়াবহতা, তার আতঙ্কে ত্যাগ করে রীতিমতো চোরের মতো এসে চুপটি করে দাঁড়িয়েছে ঔর পদপ্রান্তে। নতনেত্রে। তার লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই। নেহাৎ অভ্যাসবশে প্রতীক্ষা করছে—কখন ঐ সীমন্তিনী ড্যাংডেডিয়ে যাত্রা শুরু করবেন।

—রূপেন!

সম্বিত ফিরে পান রূপেন্দ্রনাথ। পাশে ফিরে দেখেন তারা প্রসন্ন এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর

পাশটিতে। চোখাচোখি হতে বলেন, বাবামশাই তোমাকে একবার ডাকছেন।

—জেঠামশাই! কই কোথায় তিনি?

—এস আমার সঙ্গে।

তাই তো! গৃহস্থামীর অনুপস্থিতিটা তো এতক্ষণ নজরে পড়েনি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বসেছিলেন পাশের ঘরে। একা। ঘরজোড়া তক্তাপোশে ফরাস বিছানো।

উনি কিন্তু বসেছিলেন একটি আরাম-কেদারায়। ইস্তিতে বসতে বললেন রূপেন্দ্রনাথকে।

তারাপ্রসন্ন দাঁড়িয়েই রইলেন।

রাশভারী মানুষটি একবার তাকিয়ে দেখলেন পাশের দিকে। বললেন, তোমার বড়-মার এতবড় অসুখে তোমাকে একবারও ডাকিনি। তুমি অভিমান করতে পারো রূপেন্দ্র। কিন্তু কেন ডাকিনি জান?

রূপেন্দ্রনাথ নতনেত্রে নীরব রইলেন।

—এ পোড়া দেশে স্ত্রীলোকের চিকিৎসা হয় না বলে। স্ত্রীজাতির তিন অবস্থা—অধবা, সধবা আর বিধবা। বাকি দুজনের তো কথাই নেই, এমনকি সধবাও চায় ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যেতে। কী করে চিকিৎসা করবে তুমি?

এবারও রূপেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন না।

—তোমাকে এখনি ডেকে পাঠিয়েছি কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে পরামর্শ নিতেই।

এতক্ষণে চোখ তুলে তাকালেন, চিকিৎসক হিসাবে?

—হ্যাঁ, রূপেন্দ্র। তুমি একবার ঠুঁর নাড়িটা দেখ। দেখে বল—আমার কী কর্তব্য। ব্যবস্থা কাটোয়ায় করব না নবদ্বীপে? অর্থাৎ ঠুঁর মেয়াদ...

বাঁকাটা অসমাপ্ত থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হল না। রূপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ান।

—আর একটি কথা, বাবা। কী বুঝলে তা শুধু আমাকে জানিও। আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত কি উনি আছেন?

রূপেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন প্রাঙ্গণে। তারাপ্রসন্ন ঠুঁকে পথ করে, ভিড় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসালেন রোগীর পাশটিতে। বড়মাকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, এসেছিস? এবার সত্যিই চললাম রে, রূপো।

—আপনার নাড়িটা দেখি।

—নাড়ি? কী হবে রে? ...ও বুঝেছি! গঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব কিনা? পারব রে, পারব! তুলিস না রূপো—‘নিয়তি কেন বাধাতে’? প্রশ্নটার জবাব হচ্ছে: ‘মনসা’! মনের জোর থাকলে মৃত্যুকেও—না, ফেরানো যায় না, কিন্তু তাকে অপেক্ষা করতে হয়!

রূপেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হল পুনর্বীর ঐ মৃত্যুপথ যাত্রিণীর পদধূলি নিতে। পরিবর্তে ঠুঁর রোগজীর্ণ হাতটি তুলে নিয়ে নাড়ি ধরে বসলেন।

মনঃসংযোগ করতে পারলেন না কিন্তু। প্রাঙ্গণে তিন-চারশ লোক—পুরুষ ও স্ত্রী। একটা কলগুঞ্জে ঠুঁর একাগ্রতা ব্যাহত হচ্ছিল। মুখ তুলে বললেন, তারাদা, সকলকে নীরব হতে

গোপন্য

বলুন। কেউ কোন শব্দ করবেন না।

তারাশ্রমকে সে কথা দ্বিতীয়বার বলতে হল না। রূপেন্দ্রনাথ যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর নির্দেশ। সভাস্থল স্তব্ধ হয়ে গেল। সালঙ্কারা শীর্ণ হাতের মণিবন্ধে দুটি আঙুল স্পর্শ করে ভেষগাচার্য ধ্যানে বসলেন। নিমীলিত নেত্র। সমংকায়শিরোগ্রীব তঙ্গি।

অষ্টোত্তর শতবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে যতটা সময় লাগে তাও যেন অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর যেন ধ্যানভঙ্গ হল। ধীরে ধীরে হাতটি নামিয়ে রাখলেন।

বৃদ্ধা এবার প্রশ্ন করেন, কী বুঝলি রে পাগলা ঠাকুর? তোর বড়মা নবদ্বীপ পর্যন্ত পৌছতে পারবে?

হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। প্রতিপ্রশ্ন করলেন, ‘নিয়তি কেন বাধ্যতে’? বড়মা?

উঠে দাঁড়ালেন এবার। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। সভাস্থ সকলের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মৃন্ময়ী ঠিক ঠুর সামনেই অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে আছে—নজর পড়ল সেদিকে। কী যেন মনে পড়ে গেল। আবার ধীরে ধীরে বসে পড়লেন। পুলিন্দা হাঙড়ে বার করলেন তাঁর সেই বিচিত্র যন্ত্রটি। বললেন, আপনার বুকটা একটু দেখব, বড়মা!

পাশেই খসখস শব্দ। নজর পড়ল সেদিকে। বললেন, শব্দ করবেন না।

মৃন্ময়ী জড়সড় হয়ে চূপ করে বসে রইল। বৃদ্ধা বললেন, দেখ।

যন্ত্রটার একপ্রান্ত বৃদ্ধার বুকে বসিয়ে অপর প্রান্তে কান লাগাতে গেলেন।

আঃ! আবার কিসের শব্দ!

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, একটি থেলো হুকো হাতে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন দুর্গাচরণ। তাঁরই গুড়ুক খাওয়ার শব্দ। রূপেন্দ্রনাথ পুনর্বার বলেন, তারাদা, হারা তামাক খেতে চান, তাঁদের বাইরে যেতে বলুন। শব্দে আমার অসুবিধা হচ্ছে।

গাঙ্গুলীমশাই থেলো হুকোটা একজন খিদমদগারের হস্তে সমর্পণ করলেন।

রূপেন্দ্রনাথ যন্ত্রে কান লাগিয়ে বৃদ্ধার হৃদস্পন্দন শুনলেন দীর্ঘসময়। তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন। কেউ কোন প্রশ্ন করল না।

এ ঘরে একই ভঙ্গিতে বসে আছেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ। রূপেন্দ্রনাথ নিঃশব্দে গিয়ে বসলেন তাঁর পাশে। ব্রজেন্দ্র আড়চোখে সেদিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। অভিজ্ঞ ভূয়োদর্শীর বুঝতে অসুবিধা হল না—রূপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত। যেন রোগিণীকে পরীক্ষা করে তিনি কী-একটা মর্মান্তিক সংবাদ জেনেছেন, বলতে সাহস পাচ্ছেন না। দীর্ঘসময় অপেক্ষা করেও ব্রজেন্দ্র দেখলেন নতনয়নে নবীন ভেষগাচার্য দারুণ দৃষ্টিস্তাগ্রস্ত। তিনি এখনো নীরব।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বৃদ্ধের। বললেন, বুঝলাম।

রূপেন্দ্রনাথ চকিতে মুখ তুলে বলেন, কী? কী বুঝেছেন আপনি?

—কতটা সময় পাব? ডুলিতে যদি সরাসরি নবদ্বীপে নিয়ে যাই? পৌছানো যাবে না?

হঠাৎ আসন ছেড়ে এগিয়ে এলেন রূপেন্দ্র! আবেগের সঙ্গে বৃদ্ধের হাত দুটি ধরে বললেন, আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইব, জেঠামশাই; দেবেন?

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রীতিমতো বিস্মিত। তারাশ্রম এখনো স্থানত্যাগ করেননি। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন দ্বারপথে। ঘটনার প্রবাহ লক্ষ্য করে তিনি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দ্বারের পাশে

দুটি নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কী বলবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। এমন কথা বাঁড়ুজ্ঞে পরিবার তিন পুরুষে কখনো বলেনি! রূপেন্দ্রনাথের পিতামহকে কিছু ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ড দান করতে চেয়েছিলেন ঠাঁর পিতৃদেব। সেই সাক্ষিক ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, কেন ভাদুড়ীমশাই? আপনার রাজ্যে কি অগ্রদানী বামুনের আকাল পড়েছে? রূপেন্দ্রের পিতাও জমিদারের খরচে তাঁর চতুষ্পাঠী সম্প্রসারিত করতে স্বীকৃত হননি। সেই বংশের সন্তান রূপো বাঁড়ুজ্ঞে এই মর্যাস্তিক সময়ে নিজে প্রার্থী হয়ে ভিক্ষা চাইছে!

—জেঠামশাই!

—তার পূর্বে আমাকে বল—তুমি কী বুঝেছ? গঙ্গা পর্যন্ত উনি পৌছাতে পারবেন!

—হ্যাঁ। তাঁকে নিয়ে গেলে তিনি শুধু সশরীরে কাটোয়া নয়, নবদ্বীপেই পৌছাবেন!

—তাহলে আমি আজ দাতাকর্ণ! বল, কী প্রার্থনা করছ আমার কাছে? সব কিছুই আজ এই আনন্দের দিনে তোমাকে দিতে প্রস্তুত! বল, কী চাইছো?

জিজ্ঞাসিত হয়ে বিড়ম্বনায় পড়লেন যেন। কীভাবে এই অবাস্তব প্রস্তাবটা পাড়বেন—কী ভাষায়—তা যেন প্রণিধান করে উঠতে পারছেন না। ঠাঁর নীরবতার সুযোগে বৃদ্ধ পুনর্বার বলে ওঠেন, আমার আশঙ্কা হয়েছিল, তুমি ঠাঁর নাড়ি দেখে বুঝেছ যে, তোমার বড়মার শেষ ইচ্ছাটা আমি পূরণ করতে পারব না। তা যদি না হয়... কিন্তু একটা কথা রূপেন, কিছু মনে কর না বাবা, তোমার কথাটা আমার কানে একটু বেসুরো লেগেছে! এ তো বাঁড়ুজ্ঞে বংশের রেওয়াজ নয়!

—যাচঞা মোঘা বরমধিগুণে, নাধমে লব্ধকামাঃ!*

—অধিগুণ তোমার জেঠার আছে কিনা জানি না, কিন্তু আগেই বলেছি—আজ আমি দাতাকর্ণ! আমার পৌরুষ আর ধর্ম ছাড়া তুমি আজ যা ইচ্ছা প্রার্থনা করে দেখতে পার।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, শুনুন জেঠামশাই, গুরুর আশীর্বাদে ‘নিদান’ যদি বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করে থাকি, তাহলে নিশ্চয় বুঝেছি, পক্ষকালের মধ্যে বড়মা আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আপনি ঠাঁর যাত্রা স্থগিত রাখুন। একপক্ষ কালের জন্য। এই একপক্ষকাল আমাকে একবার শেষ চেষ্টা করতে দিন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ব্রজেন্দ্র, এ কী বলছ রূপেন? কাল প্রভাতে আমরা যাত্রা করব! সব কিছু যে প্রস্তুত!

—আপনি কিন্তু সত্যবদ্ধ জেঠামশাই! আমি আপনার পৌরুষ বা ধর্মে হস্তক্ষেপ করিনি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। বারকতক কক্ষের ভিতরেই পদচারণা করে হঠাৎ থেমে বলেন, কিন্তু কী লাভ? আরও কয়েক মাস পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার? এ যে ঠাঁর নিয়তি।

—পঙ্গু হয়েই যে থাকবেন একথা তো আমি বলিনি জেঠামশাই। আর ‘নিয়তির’ কথা বলছেন? ‘নিয়তি কেন বাধ্যতে?’—এই প্রশ্নের জবাবটা কী, জানেন? —‘মনসা’

—কে বলেছেন?

—বড়মা!

* হারা মহৎ তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে বিফল হওয়াও ভাল, অশ্রমের কাছে মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়ার চেয়ে।

সোহাগ

—কবে ?

—এইমাত্র !

আবার পদচারণা শুরু করেন ব্রজেন্দ্র। তারাপ্রসন্ন আর স্থির থাকতে পারেন না। ডেকে ওঠেন, বাবা ?

—কিন্তু গুরুদেব যে বিধান দিয়ে বসেছেন ?

—তাকে ডাকুন। রূপেন তো তাঁর নির্দেশ অমান্য করার পরামর্শ দেয়নি। সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছে শুধু। আপনি বরং গুরুদেবকে বলুন—আপনার বাসনা, যজ্ঞ সমাপ্তির ভস্মতিলক মাথায় নিয়েই পক্ষকাল পরে মা যাত্রা করবেন।

পুত্রের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন এবার। এ প্রস্তাবে হয় তো গুরুদেব স্বীকৃত হয়ে যাবেন। লোক-চক্ষুর আড়ালে যজ্ঞের কোনও মহিমা থাকবে না।

গুরুদেব রাজী হলেন।

রূপেন্দ্রনাথ পক্ষকালের মধ্যে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন না আদৌ। নিরলস নিষ্ঠায় বালু-ঘড়ি হাতে বসে রইল রোগিণীর শিয়রে। দশ-দশ ঔষধ প্রস্তুত করে সেবন করালেন। এমনকি পথ্যও প্রস্তুত করালেন নিজের তত্ত্বাবধানে। জগুঠাকরুণ আর কাত্যায়নী সকাল-সন্ধ্যা সংবাদ সংগ্রহ করে যেত। কাত্যায়নী একদিন সুযোগ মতো গুঁর কর্ণমূলে বলতে গেল, দাদা, আজ মিনু খুঁড়িমা এসেছিল, বললে...

রূপেন্দ্রনাথ একটি হাত তুলে শুধু বললেন, থাক ! আমার একাগ্রতা ব্যাহত করে দিস্ না কাতু। বাড়ি যা—

বিচিত্র ঘটনাচক্র। পক্ষকাল পরে একদিন যজ্ঞ সমাপ্ত হল। গুরুদেব তাম্রপাত্রে ঘৃত-নিষিক্ত যজ্ঞভস্ম নিয়ে যেদিন রোগিণীর শিয়রে উপস্থিত হলেন সেদিন আর তিনি শয্যালীনী নন। উঠে বসেছেন।

ব্রজসুন্দরী মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, তুই আমার সব কিছু লগুভগু করে দিলি কেন রে, পাগলা ?

রূপেন্দ্রনাথ মিটিমিটি হেসে বলতেন, কী করব ? জেঠামশাই যে আমাদের জন্য একটা নতুন জেঠিমা আনতে কিছতেই রাজি হলেন না ?

—জেঠা তো হলেন না। ভাইপো কেন অমন জিদ্দি ধরে বসে আছে ?

পরবর্তী পূর্ণিমায় জমিদার বাড়িতে সাড়স্বরে 'সত্যনারায়ণের পূজা' হল। গোটা গ্রাম প্রসাদ পেয়ে গেল এসে। এমনকি ভিন-গাঁয়ের মানুষও। ব্রতকথার আসরে বড়মা আসন-পিড়ি হয়ে বসতে পেরেছিলেন। মানুষজন শুধু তাদের 'বড়মা'কে পেনাম করেই তৃপ্ত হতে পারে না—খোঁজ করে, আর সেই পাগলা কোবরেজ-মশাই কোনজন্য গো ?

গুরুদেব বললেন, কেমন ? বলিনি ? এ যজ্ঞ অমোঘ ! অর্থাৎ 'অশ্বমেধসংহতানি'র যে পুণ্যফল, 'লক্ষং প্রদক্ষিণাঃ পুণ্যঃ'-র যে ফল—এই মহাযজ্ঞে 'তদযজ্ঞম্' লুপ্তে না, বাবা, যমদূতেরা ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি।

সকলেই সেটা সহজে বুঝে নিল। এই রকম একটা ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন বটে উনি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণও তা স্বীকার করলেন, কিন্তু ঐখানেই থামলেন না তিনি। একবগ্নাঠাকুরকে অন্তরালে ডেকে জনান্তিকে যে নতুন নামে সম্বোধন করলেন কী-জানি কী-করে তা ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। ব্রজেন্দ্র ঠুকে বললেন, ধন্বন্তরি! তোমাকে কী বৈদ্যবিদ্য দেব, বল?

—বড়মা আমার নিজের মায়ের মতো, জেঠামশাই!

—বটেই তো! তুমিও আমার ছেলের মতো! তারাকে যদি একটা মহাল দান করতে পারি, তাহলে তোমাকেই বা কিছু ব্রহ্মোত্তর লিখে দিতে পারব না কেন?

রূপেন্দ্রনাথ যুক্তকরে নীরব রইলেন।

—কী হল? জবাব দাও? স্বীকার কর!

—স্বীকার করলে কথাটা যে আপনার কানে আবার বেসুরো লাগবে জেঠামশাই। আপনি নিজেই যে সেদিন বলেছিলেন—সেটা বাঁড়ুজ্জে বংশের রেওয়াজ নয়। বৈদ্যবিদ্য হিসাবে আমি সকলের কাছ থেকে সমপরিমাণেই সম্মানমূল্য নিয়ে থাকি। অর্থাৎ যেখানে আমি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করছি না।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বলেন, কিন্তু ‘অধিগুণ’ আর ‘অধম’-এর পার্থক্যের প্রসঙ্গ তো তুমি নিজে থেকেই তুলেছিলে?

এবারেও রূপেন্দ্রকে নীরব দেখে কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ। হঠাৎ সেই সেদিন ও যেমন করে বৃদ্ধের হাতদুটি আবেগভরে টেনে নিয়েছিল সেইভাবে রূপেন্দ্রের হাতদুটি ধরে বললেন, আজ আমিই তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি রূপেন! বামনের দ্বারে আজ বলিরাজা ভিক্ষাদানের অধিকারটুকু প্রার্থনা করছে।

রূপেন্দ্রনাথ নিচু হয়ে বৃদ্ধের পদধূলি নিলেন। শান্তস্বরে বললেন, আপনি বিদ্বান, পণ্ডিত, বিবেচনা করে দেখুন,—আপনি যা চাইছেন তা আমার ধর্ম! আমার পৌরুষ! আমার বংশে কেউ কখনো যে ভিক্ষা নেয়নি, জেঠামশাই!

তৎক্ষণাৎ হাত দুটি ছেড়ে দিলেন। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো বারকতক পদচারণা করে নিলেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে। তারপর ফিরে এসে আবার বসলেন তাঁর আরাম-কেন্দারায়। বললেন, শোন! আমি কখনো কারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিনি। আজও করব না। আমার বিকল্প প্রস্তাবটি শোন। বল, এতে কি তুমি স্বীকৃত? এ প্রস্তাবে কি আমি তোমার পৌরুষ অথবা ধর্মে হস্তক্ষেপ করছি?

জমিদার মশায়ের বিকল্প প্রস্তাবটি বিচিত্র।

তিনি লক্ষ্য করেছেন, স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠা না পেলেও চিকিৎসক হিসাবে ঠাঁর কাছে ভিন্নগাঁয়ের মানুষ প্রায়ই আসে। এবার যে অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তিনি অন্তর্জলিয়াত্রার রোগিণীকে সংসারে ফিরিয়ে এনেছেন তাতে অচিরেই দূর-দূরান্তর থেকে বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে রোগীর দল আসতে শুরু করবে। হয়তো তাদের চিকিৎসা করতে দু-দশদিন সময় লাগবে। গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নাই। জমিদারের একটি অতিথিশালা অবশ্য আছে; কিন্তু সেটা গ্রামের অন্য প্রান্তে। তাছাড়া সেখানে রোগীকে আশ্রয় দেওয়ার নানান বাধা। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের প্রস্তাব, ধন্বন্তরির ভদ্রাসনের দক্ষিণপূর্বে যে পুকুরিবাটি আছে—পদ্মদীঘি—তার পাড়ে পাশাপাশি পাঁচটি কুটির নির্মিত হবে। সে জমি জমিদারের, কুটিরের মালিকও থাকবেন তিনি। শুধু তাতে আশ্রয়

নেবে গ্রামান্তরের রোগী বা তার পরিবারবর্গ—ধন্বন্তরির নির্দেশে। যারা আশ্রয় পাবে তাদের জন্য জমিদারের ব্যবস্থাপনায় ‘সিধা’ যাবে অথবা কাঁচা-ফলার। পরিকল্পনাটি পেশ করে বলেন, বল ধন্বন্তরি! আমি কি তোমার পৌরুষ বা ধর্মে হস্তক্ষেপ করেছি?

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ এই বিচিত্র ব্যবস্থা কেন করতে চাইছেন আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। সেকালে কোন কোন জমিদার প্রজার মঙ্গলবিধানে, পিতৃমাতৃস্মৃতিতে এই জাতীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতেন।

রূপেন্দ্রনাথ করজোড়ে বলেন, না, জেঠামশাই! আপনি নরনারায়ণের সেবা করতে চাইলে আমি অন্তরায় হব কেন? এ তো অতি শুভ প্রস্তাব। তবে সে-ক্ষেত্রে আমার দুটি বিকল্প-প্রস্তাব আছে।

—বল?

—আপনি পাঁচটির পরিবর্তে আপাতত তিনটি আশ্রয়গৃহ নির্মাণের আদেশ দিন। একটি পুরুষের, একটি স্ত্রীলোকের, এবং তৃতীয়টি বেশ কিছু দূরে, সংক্রামক রোগীর—নরনারী নির্বিশেষে।

বিস্মিত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বলেন, কেন ধন্বন্তরি? তোমার জেঠামশাই ‘অধিগুণ’ হতে চাইলে তাঁকে ‘অধম’ করতে চাইছ কেন? পাঁচটি কমিয়ে তিনটি...

রূপেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলেন, আজে না। আপনার অর্থসাশ্রয় করতে একথা বলিনি। যে অর্থ সাশ্রয় হবে তাই দিয়ে আপনি ঐ পদ্মপুকুরের চতুর্দিকে শক্ত একটা বেড়া দেবার ব্যবস্থা করুন। ঐ পুকুরিগীতে অবগাহন স্নান, বস্ত্রাদি বা বাসনপত্র ধৌত করা নিষিদ্ধ করতে হবে। পদ্মপুকুর থেকে এখন শুধুমাত্র পানীয় জল সংগ্রহ করা যাবে।

বৃদ্ধ স্মিতহাস্যে বললেন, তোমার এই অদ্ভুত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মতামত জ্ঞাপন করার পূর্বে একটি প্রতিপ্রশ্ন করছি—বল তো, পদ্মপুকুরে একটিও পদ্ম নাই, তবু ওর নাম কেন ‘পদ্মপুকুর’?

রূপেন্দ্র স্বীকার করেন, জানি না। বোধকরি এককালে ওতে পদ্ম ছিল, মানে যখন নামকরণ করা হয়।

—না। আমার প্রপিতামহীর নাম ছিল পদ্মরাণী। ঐ পুকুরিগীটি আমার পিতামহ খনন করান মাতৃস্মৃতিতে। ওটি প্রতিষ্ঠিত জলাশয়। প্রতিষ্ঠাকালে আমার পূজ্যপাদ পিতামহ ‘নারায়ণ সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ঐ জলে জনসাধারণের অবগাহন স্নানের অধিকার যাবৎচন্দ্রার্কমেদিনী স্বীকৃত। তা ছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠিত পুকুরিগীতে ‘করণ’ হয়ে থাকে। ‘করণ’ বোঝ? কুলীন শ্রেণীর বারেন্দ্র পুত্রকন্যার বিবাহে সম্মত হবার পর অবগাহন স্নানান্তে পুকুরিগীর জলে দাঁড়িয়ে বিবাহসূত্রে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করেন। প্রতিজ্ঞা করেন।

রূপেন্দ্র বলেন, প্রতিষ্ঠিত পুকুরিগীর অভাব তো সোহ্রাই গ্রামে নেই জেঠামশাই। ‘নীলসায়র’ দীঘি তো মাত্র কয়েক রসি দূরে। অতঃপর সেখানেই ‘করণ’ হবে। পদ্মদীঘি সংরক্ষিত করা হলে অসুবিধা কারও হবে না।

—না, তা হয় না। অসুবিধা হয় তা হবে না। কিন্তু আমার পিতৃপুরুষেরা যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা তো আমি ব্যত্যয় হতে দিতে পারি না...কিন্তু কেন এই অদ্ভুত শর্তটি আরোপ

করতে চাইছ তুমি?

—সে অনেক কথা। কিন্তু আপনি যদি এতে সম্মত না হন তাহলে আমিও আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি না!

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ কয়েকটা মুহূর্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—যেন ভ্রাতৃপুত্র নয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিপক্ষ! যেন দুই ইজারাদার নবাব সরকারে এসেছেন রাজস্বের নিলাম-ডাকে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে অধিকার অর্জনে!

হঠাৎ উঠে পড়েন ফের আসন ছেড়ে। একই ভঙ্গিতে বার কতক পদচারণা করে ফিরে এসে বলেন, অগ্নি যদি ঐখানে একটি নূতন পুষ্করিণী খনন করাই?

—তাতে যে আপনার অনেক-অনেক বেশি খরচ হয়ে যাবে, জেঠামশাই?

এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। গর্জন করে ওঠেন, সেটুকু বুঝবার মতো বৈষয়িক বুদ্ধি আছে তোমার জেঠামশায়ের। বাজে কথা থাক। সোজাসুজি বল, তাহলে কি তুমি স্বীকৃত? রূপেন্দ্রনাথ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান। বলেন, সানন্দে।

—বস। কথা এখনো শেষ হয়নি।

—আবার কী?

—তুমি ভুলে গেছ। দুটি শর্তের কথা বলেছিলে তুমি। দ্বিতীয়টি?

—ও ই্যা। আবার বসে পড়েন।

এবার দ্বিতীয় শর্তটি ব্যক্ত করেন। প্রয়োজনে রূপেন্দ্রনাথ কোন অহিন্দুকেও ওখানে আশ্রয় দিতে পারবেন। পীরপুরের কোন মুসলমান পরিবার যদি তাঁর কাছে দীর্ঘদিনের চিকিৎসার জন্য আসে, তাহলে তাদেরও তো একই জাতের সমস্যা হবে।

এক কথায় সম্মত হলেন ব্রজেন্দ্রনারায়ণ। বললেন, ঠিক কথা। আর্তের জাত নেই। সেক্ষেত্রে আমি সে গৃহের কলি ফিরিয়ে নেব। শাস্ত্রীয় নিয়মে গৃহশুদ্ধি করে নেব।

—এখানকার ব্রাহ্মণ সমাজ আপত্তি করবেন না?

—সম্ভবত করবেন। কিন্তু কাঞ্চনমূল্যও তো বড় কম কথা নয়।

—আরও একটা কথা জেঠামশাই। এটা আমার শর্ত নয়, আদ্যার।

—বল?

—প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে: ‘ব্রজসুন্দরী আরোগ্য নিকেতন’।

ব্রজেন্দ্র স্মিত হাসলেন। বলেন, কিন্তু নামকরণ যে আমি মনে মনে আগেই স্থির করে রেখেছি রূপেন্দ্র: ‘দ্বন্দ্বস্তরী আরোগ্য নিকেতন’।

আবার উঠে দাঁড়াতে হল। বলেন, না। তাহলে ওটা আর আমার আদ্যার নয়, শর্ত! ভেবে দেখুন, বড়মা যদি নিজের মনের জোরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে স্বীকৃত না হতেন, তাহলে আমার ঔষধে কোন ফলই হত না। আমার চেয়ে অভিজ্ঞ কবিরাজ এ ঝুঁকিও ভুরি ভুরি; কিন্তু বড়মার চেয়ে মহিয়সী নারী আপনি আর একটিও দেখাতে পারেন?

ব্রজেন্দ্র কৌতুক বোধ করেন। বলেন, কী মাহাত্ম্য দেখতে পেলে তাঁর? অনাবৃষ্টির বছরে বৃষ্টি নামানো?

—আজ্ঞে না। বড়মা কুসংস্কারকে জয় করেছেন বলে! জ্বীলোক বিদ্যাচর্চা করলে তার

শোভাই

বৈধব্যযোগ অনিবার্য—এতবড় কথাটাকে তিনি উড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন বলে! কোন সীমন্তিনী নারীর পক্ষে এ যে কতবড় কীর্তি, তা তো আপনার অজানা নেই জেঠামশাই।

ব্রজেন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, নাঃ! ‘ধন্বন্তরী’ নয়—তোমার ঐ বদনামটাই টিকে থাকবে: ‘একবঙ্গা ঠাকুর’।

জেঠামশায়ের পদধূলি নিয়ে এবার বিদায় নেন। বলেন, আশীর্বাদ করুন—ঐ বদনামটার মর্যাদা যেন কোনদিন ক্ষুণ্ণ না করি।



—কইরে, তোরা কোথা গেলি সব? খেঁদি, ঝুঁকি, ছোটখুকি, শোভা-মা?

নন্দ চাটুজে সটান অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছেন।

গাঙ্গুলীবাড়িতে অবশ্য তাঁর অব্যবহিত দ্বার। মৃন্ময়ী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মোচা কুটছিল। তার মাথায় আখো-ঘোমটা, কারণ ঠাকুরপোরা কেউ বাড়ি নেই। হঠাৎ পুরুষকণ্ঠে ঐ বাজুখাই আওয়াজ শুনে সে শশব্যস্তে কপাটের আড়ালে আত্মগোপন করে।

নন্দ একগাল হেসে বলেন, আমাকে দেখে আপনার অত সরম কিসের বোঠান? আর ঝঁটিটে যে খাড়া করা রইল, ভর সন্ধ্যাবেলা।

এটা অশান্ত্রীয় কাজ। মৃন্ময়ী ইতস্তত করে। ঝঁটি ছেড়ে উঠে যাওয়ার সময় সেটাকে শুইয়ে রেখে যেতে হয়। নাহলে গৃহস্থের অকল্যাণ। কিন্তু নন্দ ঠাকুরপো যেভাবে ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন—

শোভা বুঝল। চট করে ঝঁটিটা শুইয়ে দিয়ে বললে, আসুন কাকা। বসবেন আসুন—

—তোর বাপু কি কচ্ছে রে শোভা?

—আহিক করছেন। এই হয়ে এল।

—আহিক! বলিস কী রে? আজ যে সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি।

ঠাকুরঘর এমন কিছু তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নয়। তাছাড়া দুর্গাচরণ যখন সন্ধ্যাহিক সারেন তখন কান দুটি সজাগ রাখেন। নন্দভায়ার নিদান শুনেই ‘শ্রীবিষ্ণু’ বলে উঠে বাহিরে আসেন। পরিধানে পাটের কাপড়, বরাঙ্গে নামাবলী, শিখাপ্রান্তে একটি কল্কে ফুল। বলেন, চাটুজে নাকি? এস, এস। কিন্তু ওটা কী বললে? আজ সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি? কই, তিড়িবিড়ে তো সঁকালে সেকথা বলে গেল না?

‘তিড়িবিড়ে’ ওঁর পিতৃদত্ত নাম নয়। তবে নিতাপূজার ব্যবস্থা যাঁর হেপাজতে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হেতুতেই সবাই বলে তিড়িবিড়ে-ঠাকুর। দুর্গার অভিযোগ, সেই তিড়িবিড়ে-ঠাকুরের উচিত ছিল জানিয়ে যাওয়া যে, আজ সায়ংসন্ধ্যার প্রয়োজন নেই।

নন্দ বলেন, দুটো পাজিতে দু-রকম মত কিনা, তাই—

—সেক্ষেত্রে যজ্ঞমানের যোটা সুবিধা সেই মতই তো বিধান দেবে! ‘আস্তি-নাস্তি’ বেছে

নিয়ে। আধঘণ্টা ধরে অহেতুক মশার কামড় খাচ্ছি।

নন্দভায়াকে নিয়ে এসে বসালেন তাঁর ঘরে। শোভারানীকে বললেন, বিশুকে বল, কুলীনহঁকোয় তামাক দিয়ে যেতে।

বাঙলা দেশের গ্রামে তখন সচরাচর তিন জাতের হঁকো: বামুন, কায়ং আর বেনে। কদবাকিরা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবে এ গ্রামের নিষ্ঠাবান সমাজপতিরা কিছু উপবিভাগের বিধান দিয়েছেন। বামুন-হঁকোও আবার তিন জাতের: কুলীন, কাপ আর ছুরিত্তির। আর কিছু না, তাতে কার কতটা কৌলীন্য-মর্যাদা সেটা বারে বারে ঝালিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া কুলীনদের মনে রাখা দরকার—কৌলীন্য খোয়ালে, হঁকা-শ্রেণীবিन্যাসেও সমাজে একধাপ নেমে যেতে হবে।

আলোচনার শুরুটা হয়েছিল ভালই—চাষবাস, ফলন, ইত্যাদি দিয়ে। ক্রমে অনিবার্যভাবে ইদানিং কালের আচারপ্রকৃতি আর ছোটজাতের ঔদ্ধত্যে। পরে নন্দ বললেন, একটা খপর শুনেছ দাদা, দীঘির পাড়ে ঘর উঠছে?

দুর্গাচরণ বললেন, ওটা আমার শ্বশুরবাড়ির পাড়া চাটুজ্জে। খপর না পাবার কোন হেতু নেই। একবগ্নার রুগীপত্র নাকি গাছতলায় কষ্ট পাচ্ছে, তাই দানসাগর ঘর তুলে দিচ্ছেন।

—তা দিন। তাঁর জমি, তাঁর সম্পত্তি, আমাদের কী বলার আছে; কিন্তু বিশু বললে, ব্যবস্থা হচ্ছে একই ঘরে, গুঁরা ছত্রিশ জাতকে ঠাই দেবেন। বলি, সেটা শুনেছ?

—শুনেছি। সে-কথার জবাবটাতো তুমিই দিলে। জমি তাঁর, সম্পত্তি তাঁর, কাকে থাকতে দেবেন তার বিধান কি তুমি-আমি দেব?

—এটা একটা কথা হল? আমি যদি গাঁয়ের পঞ্চজনাকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে সাত জাতকে একপংক্তিতে বসাই, তাহলে তা মেনে নেবে দুর্গাদা? যেহেতু জমি আমার, ভূরিভোজের ব্যবস্থা আমার?

দুর্গা বললেন, কথাটা ভাববার। নেমন্তন্ন করার কথায় মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ চাটুজ্জে, একবগ্না নাকি তোমার নেমন্তন্ন নেয়নি? কথাটা ঠিক?

—কে বললে?

—বলেনি কেউ। সেদিন মায়ের প্রসাদ নিতে সে তো এল না? কেমন যেন একটা কানায়ুযো শুনলাম।

—একবগ্না বলেছে, সে ‘মহাপ্রসাদ’ ছোঁয় না! সে নাস্তিক!

দুর্গা আকাশ থেকে পড়লেন। ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে সব কিছু শুনলেন। বলা বাহুল্য নন্দ চাটুজ্জে সেদিন সম্ভার কথোপকথন যতখানি সম্ভব বিকৃত করে পেশ করলেন। উপসংহারে বললেন, একটা কিছু বিহিত কর গাঙ্গুলীদা! শুধু খোপা-নাপিত বন্ধ করলেই চলবে না, গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

দুর্গাচরণ বললেন, হঁ! ব্যবস্থা একটা কিছু করতে হচ্ছে। অল্পুরেই এসব পাপ বিনাশ করা উচিত! এতবড় দুঃসাহস!

নন্দ ঘনিয়ে এসে বলেন, আমিও একটা উড়ো খপর শুনলাম, কতটা সত্যি?

—কী?

সোহাই

—বোঠানকে দেখতে এসে নাকি একবগ্না কী এক কুপ্রস্তাব দিয়েছিল?

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণা। দুর্গাও বলেন, কে বললে?

—কে বললে, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু কতটা সত্যি?

দুর্গাচরণ ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছেন, একবগ্নার কোন কুমতলব সেদিন ছিল না। কথাটার মধ্যে অলীল কিছু থাকলে স্বীয় সমুখে সে জমিদার গিমিকে বলতে পারত না ‘—বড়মা, আপনার বুকটা একটু দেখব।’ তাছাড়া জামা-কাপড়ের উপর দিয়ে বুক-দেখার সেই আজব যন্ত্রটাকেও এতদিনে চিনে নিয়েছেন। তাই কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন, না হে, কু-প্রস্তাব কিছু নয়। সেখানে তো শোভা ছিল, আশ্রো ছিলাম। তবে কতার ধরনধারণ ঠিক ভদ্রজনোচিত নয়। খুড়িকে বার দুই নাম ধরে ডেকে বসল। হোক তোর পাড়ার মেয়ে। তাই বলে, শোভার সমুখে তুই ওকে ‘মীনু’ বলে ডাকিস কোন আঙ্কেলে?

নন্দ সায় দিলেন, শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে যা হয়। ছেলেবেলা থেকে বাউণ্ডলের মতো এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরেছে তো। কিন্তু কী করে ওকে কায়দা করা যায় বল তো?

—দেখছি! ছিদ্দির একটা বার করি আগে।

—ঐ তো ছিদ্দির! ‘মহাপ্রসাদ খাব না’ বলা!

দুর্গা ধমকে ওঠেন, বোকার মতো কথা বল না, চাটুজ্জ। সে ঘরের কোণে তোমাকে কী বলছে তাই নিয়ে খোঁট পাকানো কি ঠিক? টুটি টিপে ধরলে সে যদি বলে, কে বলেছে? বাজে কথা!

—জগুঠাকুর গুনেছে। কাতু ছিল।

—তারা তো তখন চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। বলবে, ‘কই না তো’! তখন? একবগ্না যদি বলে বসে, নিয়ে আসুন গোটা পাঠা। বলি দিয়ে আমি একাই খাব—? তখন? তাছাড়া, বুয়েছ না, জমিদার গিমির ব্যাপারে এখন সবাই ওকে মাথায় করে নাচছে। ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়বে—

—‘ঝড়ে কাক মরে’?

—মরে না? অতবড় তাত্ত্বিক সাধক কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি যজ্ঞ করলেন, আড়াই মণ গব্য ঘৃত আহুতি দিলেন, সেসব কিছুই না?

—তা বটে! তাহলে?

—শোন ভায়া। এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। কোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। যাতে এক কোপেই ধড় থেকে মাথাটা নেমে যায়। শাস্ত্রে বলেছে না—‘মনসা চিন্তেৎ কন্মো, বচসা ন প্রকাশয়েৎ’।

—কথাটা আশ্রো গুনেচি। মানোটা জানি না। কোন শাস্ত্রে আছে গো গাঙ্গুলীদেও?

—মনসামঙ্গলে।

—অ! তা মানোটা কী?

—মা মনসা কখনো কারও সাথে বচসা করেন না, চরম মুহুর্তে একটি ছোবলেই কন্মো সারা! বুয়েচো না?

পরাজয় স্বীকার করে নেননি বৃদ্ধ জমিদার ঐ তরুণ ভেষগাচার্যের কাছে। খনন করা হল নূতন পুষ্করিণী। আজব তার আকৃতি। প্রথমটা সকলে ধরে নিয়েছিল এটা খননকারকদের একটা মারাত্মক ভ্রান্তি। দু-একজন বড় মিস্ত্রিকে সেটা দেখিয়ে দিতেও চেয়েছিল; কিন্তু বড় মিস্ত্রি বলে—না, বড় কর্তার ঐ রকমই হুকুম। পুষ্করিণীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড় সমান্তরাল, পূর্ব-পশ্চিম পাড় তা নয়। হেতুটা সহজবোধ্য। উত্তরপাড়ের দৈর্ঘ্য চারশ দশ হাত, দক্ষিণ পাড়ের তিনশ ষাট! অর্থাৎ পঞ্চাশ হাতের হেরফের। কারা বুঝি ব্রজেন্দ্র-নারায়ণের কাছে দরবার করতেও গিয়েছিল, তাঁর এমন অদ্ভুত নির্দেশ সত্যি আছে কিনা জানতে। অথবা মিস্ত্রি নিজের ভ্রান্তিটা কর্তার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।

শুনে ব্রজেন্দ্র শুধু গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, বল কী? দীঘিটাও অমন ‘একবগ্না’ হয়ে গেল! এবার ঠেকাতে পারেননি। আরোগ্য নিকেতনের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে রাজি হননি। এবার পারলেন না। দীঘির নাম হয়ে গেল—অনিবার্যভাবে: ‘একবগ্না দীঘি’।

তার চারিদিকে উঠল প্রাচীর। না, বাঁশ বা শালখুঁটির বেড়া নয়। পাকা ইটের পাঁচিল। চুন-সুরকি মশলার। নির্মিত হল তিনটি আশ্রয়গৃহ। ধ্বস্তরির তত্ত্বাবধানে। গ্রামে টেড়া দেওয়া হল—ঐ পুষ্করিণী থেকে শুধুমাত্র পানীয় জলই সংগ্রহ করা যাবে, অবগাহন নিষিদ্ধ। এমনকি সংগ্রহকারী নিজ নিজ জলপাত্র ঐ পুষ্করিণীতে নিমজ্জিত করতে পারবে না। পানীয় জল সংগ্রহ করতে হবে বিচিত্র পদ্ধতিতে—একটি টেকিকলের রজ্জুর সঙ্গে আবদ্ধ নির্দিষ্ট জলপাত্রের সাহায্যে। বিচিত্র তার আকৃতি। সতীশ কামার রূপেন্দ্রনাথের নির্দেশ মোতাবেক এই অদ্ভুত পাত্রটি তৈরী করে বলেছিল, সারা জেবনভর কয়েক হাজার পাত্তর বানিয়েছি বাবু-মশাই, কিন্তুক্ এমন আজব পাত্তর বানাই নাই, যা মাটিতে থোওয়া যায় না।

তা সত্যি। পাত্রটির তলদেশ সূচালো। জমিতে তাকে রাখা যায় না। সেটি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ত্রিশঙ্কুর মতো আকাশমার্গে ঝুলতে থাকে। টেকিকলের মাধ্যমে পানীয় জলটা সংগ্রহ করে তা পাত্রান্তরে সঞ্চয় করতে হয়!

পাগলের খেয়াল যাকে বলে!

একবগ্না-ঠাউরের উৎকট রসিকতা!

শিরোমণি মশাই একদিন মাঝ সড়কে পাকড়াও করলেন ঔকে। বললেন, আমাকে বুঝিয়ে বল তো রূপেন, এমন অদ্ভুত একটা জলপাত্র তুমি কেন তৈরী করালে? আর অমন চমৎকার একটা পুষ্করিণী খনন করিয়ে তা ‘প্রতিষ্ঠা’ করতে দিলে না কেন?

রূপেন্দ্রনাথ জানান, এইসব স্থবির কুপমণ্ডকদের সংস্কারকে যুক্তিতর্ক দিয়ে দূর করা যায় না। এ বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। পাজি পুঁথিতে দেবনাগরী হরফে যা লেখা আছে তাই হচ্ছে ধ্রুব সত্য। ‘আয়ুর্বেদ’ যদি ‘বেদ’ না হত, অথর্ববেদের অংশভাক্ বলে তাকে প্রচার না করা হত, তাহলে কেউ ঔর ঔষধ মুখে তুলেই দেখত না। তাই তিনি ‘মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্’ নীতিবাক্যটাই সম্প্রসারিত করে নিয়েছেন। যাতে সাধারণের সামূহিক মঙ্গল ত্যাগাত্যাগতভাবে মিথ্যা হলেও তত্ত্বগতভাবে সত্য। তাই অনায়াসে বলতে পারেন, আমি যেসঙ্গে ঐরকমই একটা প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম শিরোমণি-কাকা।

সহজ সরল কথা। বুঝতে কোন অসুবিধা হল না শিরোমণি-ঠাকুরের। বলেন, তাই বল!

শোভা

বৈধব্যযোগ অনিবার্য—এতবড় কথাটাকে তিনি উড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন বলে! কোন সীমন্তিনী নারীর পক্ষে এ যে কতবড় কীর্তি, তা তো আপনার অজানা নেই জেঠামশাই।

ব্রজেন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, নাঃ! ‘ধনুস্তরী’ নয়—তোমার ঐ বদনামটাই টিকে থাকবে: ‘একবন্ধা ঠাকুর’।

জেঠামশায়ের পদধূলি নিয়ে এবার বিদায় নেন। বলেন, আশীর্বাদ করুন—ঐ বদনামটার মর্যাদা যেন কোনদিন ক্ষুণ্ণ না করি।



—কইরে, তোরা কোথা গেলি সব? খেঁদি, ঝুঁকি, ছোটখুঁকি, শোভা-মা?

নন্দ চাটুজে সটান অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছেন।

গাঙ্গুলীবাড়িতে অবশ্য তাঁর অব্যবহিত দ্বার। মৃন্ময়ী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মোচা কুটছিল। তার মাথায় আধো-ঘোমটা, কারণ ঠাকুরপোরা কেউ বাড়ি নেই। হঠাৎ পুরুষকণ্ঠে ঐ বাজঝাঁই আওয়াজ শুনে সে শশব্যস্তে কপাটের আড়ালে আত্মগোপন করে।

নন্দ একগাল হেসে বলেন, আমাকে দেখে আপনার অত সরম কিসের বোঠান? আর ঝিটে যে খাড়া করা রইল, ভর সন্ধোবেলা!

এটা অশাস্ত্রীয় কাজ। মৃন্ময়ী ইতস্তত করে। ঝিটে ছেড়ে উঠে যাওয়ার সময় সেটাকে শুইয়ে রেখে যেতে হয়। নাহলে গৃহস্থের অকল্যাণ। কিন্তু নন্দ ঠাকুরপো যেভাবে ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন—

শোভা বুঝল। চট করে ঝিটটা শুইয়ে দিয়ে বললে, আসুন কাকা। বসবেন আসুন—

—তোর বাপু কি কচ্ছে রে শোভা?

—আফিক করছেন। এই হয়ে এল।

—আফিক! বলিস কী রে? আজ যে সায়াংসন্ধ্যা নাস্তি।

ঠাকুরঘর এমন কিছু তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নয়। তাছাড়া দুর্গাচরণ যখন সন্ধ্যাহ্নিক সারেন তখন কান দুটি সজাগ রাখেন। নন্দভায়ার নিদান শুনেই ‘ঐকিঁকিঁ’ বলে উঠে বাহিরে আসেন। পরিধানে পাটের কাপড়, বরাপে নামাবলী, শিখাপ্রান্তে একটি কল্কে ফুল। বলেন, চাটুজে নাকি? এস, এস। কিন্তু ওটা কী বললে? আজ সায়াংসন্ধ্যা নাস্তি? কই, তিড়বিড়ে তো সকালে সেকথা বলে গেল না?

‘তিড়বিড়ে’ গুর পিতৃদত্ত নাম নয়। তবে নিত্যপূজার ব্যবস্থা ফাঁর হেপাজতে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হেতুতেই সবাই বলে তিড়বিড়ে-ঠাকুর। দুর্গার অভিযোগ, সেই তিড়বিড়ে-ঠাকুরের উচিত ছিল জানিয়ে যাওয়া যে, আজ সায়াংসন্ধ্যার প্রয়োজন নেই।

নন্দ বলেন, দুটো পাজিতে দু-রকম মত কিনা, তাই—

—সেক্ষেত্রে যজ্ঞমানের যেটা সুবিধা সেই মতই তো বিধান দেবে। ‘আস্তি-নাস্তি’ বেছে

নিয়ে। আধঘণ্টা ধরে অহেতুক মশার কামড় খাচ্ছি!

নন্দভায়াকে নিয়ে এসে বসালেন তাঁর ঘরে। শোভারানীকে বললেন, বিশুকে বল, কুলীনহঁকোয় তামাক দিয়ে যেতে।

বাঙলা দেশের গ্রামে তখন সচরাচর তিন জাতের হঁকো: বামুন, কায়েৎ আর বেনে। কাদবাকিরা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবে এ গ্রামের নিষ্ঠাবান সমাজপতিরা কিছু উপবিভাগের বিধান দিয়েছেন। বামুন-হঁকোও আবার তিন জাতের: কুলীন, কাপ আর ছুরিত্তির। আর কিছু না, তাতে কার কতটা কৌলীন্য-মর্যাদা সেটা ব্যারে ব্যারে ঝালিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া কুলীনদের মনে রাখা দরকার—কৌলীন্য খোয়ালে, হঁকা-শ্রেণীবিন্যাসেও সমাজে একধাপ নেমে যেতে হবে।

আলোচনার শুরুটা হয়েছিল ভালই—চাষবাস, ফলন, ইত্যাদি দিয়ে। ক্রমে অনিবার্যভাবে ইদানিং কালের আচারব্রততা আর ছোটজাতের উদ্ধত্যে। পরে নন্দ বললেন, একটা খপর শুনেছ দাদা, দীঘির পাড়ে ঘর উঠছে?

দুর্গাচরণ বললেন, ওটা আমার স্বশুরবাড়ির পাড়া চাটুজ্জে। খপর না পাবার কোন হেতু নেই। একবন্ধার রুগীপত্র নাকি গাছতলায় কষ্ট পাচ্ছে, তাই দানসাগর ঘর তুলে দিচ্ছেন।

—তা দিন। তাঁর জমি, তাঁর সম্পত্তি, আমাদের কী বলার আছে; কিন্তু বিশু বললে, ব্যবস্থা হচ্ছে একই ঘরে গুঁরা ছত্রিশ জাতকে ঠাই দেবেন। বলি, সেটা শুনেছ?

—শুনেছি। সে-কথার জবাবটাতো তুমিই দিলে। জমি তাঁর, সম্পত্তি তাঁর, কাকে থাকতে দেবেন তার বিধান কি তুমি-আমি দেব?

—এটা একটা কথা হল? আমি যদি গাঁয়ের পঞ্চজনাকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে সাত জাতকে একপংক্তিতে বসাই, তাহলে তা মেনে নেবে দুর্গাদা? যেহেতু জমি আমার, ভূরিভোজের ব্যবস্থা আমার?

দুর্গা বললেন, কথাটা ভাববার। নেমন্তন্ন করার কথায় মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ চাটুজ্জে, একবন্ধা নাকি তোমার নেমন্তন্ন নেয়নি? কথাটা ঠিক?

—কে বললে?

—বলেনি কেউ। সেদিন মায়ের প্রসাদ নিতে সে তো এল না? কেমন যেন একটা কানায়যো শুনলাম।

—একবন্ধা বলেছে, সে 'মহাপ্রসাদ' ছোঁয় না! সে নাস্তিক!

দুর্গা আকাশ থেকে পড়লেন। ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে সব কিছু শুনলেন। বলা বাহুল্য নন্দ চাটুজ্জে সেদিন সন্ধ্যার কথোপকথন যতখানি সম্ভব বিকৃত করে পেশ করলেন। উপসংহারে বললেন, একটা কিছু বিহিত কর গাঙ্গুলীদা! শুধু ধোপা-নাপিত বন্ধ করলেই চলবে না, গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

দুর্গাচরণ বললেন, হঁ! ব্যবস্থা একটা কিছু করতে হচ্ছে। অকুরেই এসব পাপ বিনাশ করা উচিত! এতবড় দুঃসাহস!

নন্দ ঘনিয়ে এসে বলেন, আমিও একটা উড়ো খপর শুনলাম, কতটা সত্যি?

—কী?

—বোঠানকে দেখতে এসে নাকি একবগ্না কী এক কুপ্রস্তাব দিয়েছিল?

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণা! দুর্গাও বলেন, কে বললে?

—কে বললে, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু কতটা সত্যি?

দুর্গাচরণ ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছেন, একবগ্নার কোন কুমতলব সেদিন ছিল না। কথাটার মধ্যে অশ্লীল কিছু থাকলে সবার সমুখে সে জমিদার গিন্নিকে বলতে পারত না—‘বড়মা, আপনার বুকটা একটু দেখব।’ তাছাড়া জামা-কাপড়ের উপর দিয়ে বুক-দেখার সেই আজব যন্ত্রটাকেও এতদিনে চিনে নিয়েছেন। তাই কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন, না হে, কু-প্রস্তাব কিছু নয়। সেখানে তো শোভা ছিল, আশ্রো ছিলাম। তবে কতার ধরনধারণ ঠিক ভদ্রজনোচিত নয়। খুড়িকে বার দুই নাম ধরে ডেকে বসল। হোক তোর পাড়ার মেয়ে। তাই বলে, শোভার সমুখে তুই ওকে ‘মীনু’ বলে ডাকিস কোন আক্কেলে?

নন্দ সায় দিলেন, শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে যা হয়। ছেলেবেলা থেকে বাউগুলের মতো এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরেছে তো। কিন্তু কী করে ওকে কায়দা করা যায় বল তো?

—দেখছি। ছিদ্দির একটা বার করি আগে।

—ঐ তো ছিদ্দির! ‘মহাপ্রসাদ খাব না’ বলা!

দুর্গা ধমকে ওঠেন, বোকার মতো কথা বল না, চাটুজে। সে ঘরের কোণে তোমাকে কী বলছে তাই নিয়ে খোঁট পাকানো কি ঠিক? টুটি টিপে ধরলে সে যদি বলে, কে বলেছে? বাজে কথা!

—জগুঠাকরুণ শুনেছে। কাতু ছিল।

—তারাতো তখন চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। বলবে, ‘কই না তো’! তখন? একবগ্না যদি বলে বসে, নিয়ে আসুন গোটা পাঠা। বলি দিয়ে আমি একাই খাব—? তখন? তাছাড়া, বুয়েছ না, জমিদার গিন্নির ব্যাপারে এখন সবাই ওকে মাথায় করে নাচছে। ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে—

—‘ঝড়ে কাক মরে’?

—মরে না? অতবড় তান্ত্রিক সাধক কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি যজ্ঞ করলেন, আড়াই মণ গব্য ঘৃত আছতি দিলেন, সেসব কিছুই না?

—তা বটে। তাহলে?

—শোন ভায়া। এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। যাতে এক কোপেই ধড় থেকে মাথাটা নেমে যায়। শাস্ত্রে বলেছে না—‘মনসাঁ চিন্তেৎ কন্মো, বচসা ন প্রকাশয়েৎ’।

—কথাটা আশ্রো শুনেচি। মানোটা জানি না। কোন শাস্ত্রে আছে গো গাঙ্গুলীদে?

—মনসামঙ্গলে।

—অ! তা মানোটা কী?

—মা মনসা কখনো কারও সাথে বচসা করেন না, চরম মুহুর্তে একটি ছোবলেই কন্মো সারা! বুয়েচো না?

পরাজয় স্বীকার করে নেননি বুদ্ধ জমিদার ঐ তরুণ ভেষ্যগাচার্যের কাছে। খনন করা হল নূতন পুষ্করিণী। আজব তার আকৃতি। প্রথমটা সকলে ধরে নিয়েছিল এটা খননকারকদের একটা মারাখক ভাঙি। দু-একজন বড় মিস্ত্রিকে সেটা দেখিয়ে দিতেও চেয়েছিল; কিন্তু বড় মিস্ত্রি বলে—না, বড় কর্তার ঐ রকমই হুকুম। পুষ্করিণীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড় সমান্তরাল, পূর্ব-পশ্চিম পাড় তা নয়। হেতুটা সহজবোধ্য। উত্তরপাড়ের দৈর্ঘ্য চারশ দশ হাত, দক্ষিণ পাড়ের তিনশ ষাট। অর্থাৎ পঞ্চাশ হাতের হেরফের। কারা বুঝি ব্রজেন্দ্র-নারায়ণের কাছে দরবার করতেও গিয়েছিল, তাঁর এমন অদ্ভুত নির্দেশ সত্যি আছে কিনা জানতে। অথবা মিস্ত্রি নিজের ভাঙিটা কর্তার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।

শুনে ব্রজেন্দ্র শুধু গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, বল কী? দীঘিটাও অমন ‘একবগ্না’ হয়ে গেল!

এবার ঠেকাতে পারেননি। আরোগ্য নিকেতনের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে রাজি হননি। এবার পারলেন না। দীঘির নাম হয়ে গেল—অনিবার্যভাবে: ‘একবগ্না দীঘি!’

তার চারিদিকে উঠল প্রাচীর। না, বাঁশ বা শালখুঁটির বেড়া নয়। পাকা ইটের পাঁচিল। চুন-সুরকি মশলার। নির্মিত হল তিনটি আশ্রয়গৃহ। ধ্বংসস্তরির তত্ত্বাবধানে। গ্রামে টেঁড়া দেওয়া হল—এ পুষ্করিণী থেকে শুধুমাত্র পানীয় জলই সংগ্রহ করা যাবে, অবগাহন নিষিদ্ধ। এমনকি সংগ্রহকারী নিজ নিজ জলপাত্র ঐ পুষ্করিণীতে নিমজ্জিত করতে পারবে না। পানীয় জল সংগ্রহ করতে হবে বিচিত্র পদ্ধতিতে—একটি টেকিকলের রজ্জুর সঙ্গে আবদ্ধ নির্দিষ্ট জলপাত্রের সাহায্যে। বিচিত্র তার আকৃতি। সতীশ কামার রূপেন্দ্রনাথের নির্দেশ মোতাবেক এই অদ্ভুত পাত্রটি তৈরী করে বলেছিল, সারা জেবনভর কয়েক হাজার পাতুর বানিয়েছি বাবু-মশাই, কিন্তুকু এমন আজব পাতুর বানাই নাই, যা মাটিতে থোওয়া যায় না।

তা সত্যি। পাত্রটির তলদেশ সূচালো। জমিতে তাকে রাখা যায় না। সেটি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ত্রিশঙ্কর মতো আকাশমার্গে বুলতে থাকে। টেকিকলের মাধ্যমে পানীয় জলটা সংগ্রহ করে তা পাত্রান্তরে সঞ্চয় করতে হয়।

পাগলের খেয়াল যাকে বলে!

একবগ্না-ঠাউরের উৎকট রসিকতা!

শিরোমণি মশাই একদিন মাঝ সড়কে পাকড়াও করলেন ঔকে। বললেন, আমাকে বুঝিয়ে বল তো রূপেন, এমন অদ্ভুত একটা জলপাত্র তুমি কেন তৈরী করালে? আর অমন চমৎকার একটা পুষ্করিণী খনন করিয়ে তা ‘প্রতিষ্ঠা’ করতে দিলে না কেন?

রূপেন্দ্রনাথ জানেন, এইসব স্থবির কূপমণ্ডুকদের সংস্কারকে যুক্তিতর্ক দিয়ে দূর করা যায় না। এ বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। পাঁজি পৃথিতে দেবনাগরী হরফে যা লেখা আছে তাই হচ্ছে ধ্রুব সত্য। ‘আয়ুর্বেদ’ যদি ‘বেদ’ না হত, অথর্ববেদের অংশভাক বলে তাকে প্রচলিত করা হত, তাহলে কেউ ঔর ঔষধ মুখে তুলেই দেখত না। তাই তিনি ‘মা ব্রূয়াৎ সত্যমগ্নিযম্’ নীতিবাক্যটাই সম্প্রসারিত করে নিয়েছেন। যাতে সাধারণের সামূহিক মঙ্গল-অন্তত্যাগতভাবে মিথ্যা হলেও তত্ত্বগতভাবে সত্য। তাই অনায়াসে বলতে পারেন, আমি যে স্থানে এরকমই একটা প্রত্যাশ দেশ পেয়েছিলাম শিরোমণি-কাকা।

সহজ সরল কথা। বুঝতে কোন অসুবিধা হল না শিরোমণি-ঠাকুরের। বলেন, তাই বল!

বৃদ্ধ শিরোমণিকে যত সহজে নিবৃত্ত করতে পেরেছিলেন অত সহজে সন্তুষ্ট করা গেল না কিন্তু যুবক জমিদারতনয়কে। তারাপ্রসন্নও একদিন পাকড়াও করলেন ঔকে, কী প্রত্যাদেশ পেয়েছ রূপেন্দ্র ?

রূপেন্দ্রনাথ সেই সংক্ষিপ্ত আলাপচারী বিস্মৃত হয়ে গেছেন। সবিস্ময়ে জানতে চান, কী প্রত্যাদেশ ? কে বলেছে।

—শিরোমণি ঠাকুরকে নাকি তুমি বলেছ যে, মায়ের প্রত্যাদেশেই ঐ একবঙ্গা দীঘিকে তুমি প্রতিষ্ঠা করতে দাওনি।

রূপেন্দ্রনাথ মিটি-মিটি হাসতে থাকেন।

—না, না, হেসে পার পাবে না। বল, স্বপ্নে তুমি কী প্রত্যাদেশ পেয়েছিলে ?

—কোন প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী থেকে নয়, শুধু মাত্র সংরক্ষিত পুকুরের জলপান করলেই সোণাই গায়ের এই ব্যাপক আন্ত্রিক রোগ দূরীভূত হবে। একে একে প্রতিটি পাড়াতেই আমি এ-ভাবে দু-একটি পুষ্করিণীকে সংরক্ষিত করব।

কেন এ প্রচেষ্টা—এই প্রশ্নটা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারাপ্রসন্ন সে দিক দিয়েও গেলেন না। তদানীন্তন চিন্তাধারায় তাঁর পরবর্তী প্রশ্নটি হল, কিন্তু * মায়ের কোন মূর্তিকে স্বপ্নে দেখতে পেলে তুমি ? কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী...

বিচিত্র মানুষের কৌতুহল।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, না, তারা, কোন দেবীমূর্তিকে আমি স্বপ্নে দেখিনি।

—তাহলে তোমাকে প্রত্যাদেশটা দিলেন কে ?

এবার হেসে বলেছিলেন, তারা, তুমি বাবামশায়ের টোলে বেশ কিছুদিন ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলে। বল দেখি, ‘প্রত্যাদেশ’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি কী ?

—সেসব কবে ভুলে মেরে দিয়েছি। একথা কেন ?

—প্রতি+আ+দিশ+অ (ভো)!

—এই শুরু হল পণ্ডিতেমি! বেশ, না হয় তাই হল। তাতে কী ? আমার প্রশ্নের জবাব কোথায় ?

—‘প্রত্যাদেশ’ শব্দটির দুটি অর্থ। প্রথম অর্থ: ‘দৈববাণী’, যে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন শিরোমণি-ঠাকুর, করেছে তুমি। কিন্তু ওর দ্বিতীয় আর একটি অর্থ আছে: ‘পূর্বের আদেশ প্রত্যাহার করা’। আমি দ্বিতীয় অর্থে শব্দটা ব্যবহার করেছি। মিথ্যাভাষণ করিনি।

—কিন্তু কার আদেশ ? কী আদেশ প্রত্যাহার করার কথা বলছ ?

—কার আদেশ তা এখনি সঠিক বলতে পারছি না, তুমি এ গ্রামের কোন ঠাকুরমশাইকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পার। কোথাও না কোথাও এই শাস্ত্রীয় নির্দেশটি নিশ্চয় লেখা আছে দেবনাগরী হরফে—প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীর দৈবমাহাত্ম্য এমন যে, তাতে আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত রোগীর বস্ত্রাদি দৌত করলে জল অপবিত্র হয় না।

তারাপ্রসন্ন বলেন, জিজ্ঞাসা করার কী আছে ? এ কথা তো শিশুও জানে, প্রতিষ্ঠিত পুকুরের জল অপবিত্র হয় না।

—সেই দেবনাগরী হরফে লেখা আদেশটা ‘প্রত্যাহার’ করার একটা প্রত্যাদেশ

পেয়েছিলাম—স্বপ্নে নয়, শিক্ষায়। শাস্ত্রজ্ঞানে নয়, বিজ্ঞানের আশীর্বাদে।

তারা প্রসন্ন স্বীকার করেন, বুঝলাম না।

—বসো। বুঝিয়ে বলি।

তারা প্রসন্ন নব্যযুগের মানুষ। রূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষা মাত্র বছর-পাঁচেকের বড়। ভবিষ্যৎ-জমিদার। তাঁকে স্বদলে আনতে হবে। রূপেন্দ্রনাথের অনেক-অনেক স্বপ্ন। এই সোঞাই গ্রামকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে আধুনিকতার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করবেন। অল্প কৃপমণ্ডকগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে—দেবনাগরী হরফে যেখানে যা কিছু লেখা আছে তাই অস্বাস্ত সত্য নয়! গ্রাম্য জীবনের নৌকার কাণ্ডারী হচ্ছেন ভূস্বামী। জমিদার নিজেই যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয় তবে বিবেকবুদ্ধির বর্তিকায় নতুন করে পথ খোঁজা যাবে না। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বার্ষিক্যে উপনীত; তারা প্রসন্ন নব্য যুবক। তাকে স্বদলে আনতে হবে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁকে বোঝাতে থাকেন।



শুধুমাত্র পুরুষকারে আস্থাশীল ছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। নিয়তির অমোঘ বিধান মনের জোরে, বিবেকের নির্দেশে অতিক্রম করা যায় কিনা এটা পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর সাধনা। বোধকরি তাই এক অলক্ষ্য নাট্যকার কৌতুক করে বারে বারে তাঁকে নাস্তানাবুদ করেন। ক্রমাগত দৈবনির্দেশে পালটে দিতে চেয়েছেন তাঁর জীবনের ছকটা। ‘একবঙ্গা পণ্ডিত’ রাতারাতি ‘ধনুস্তরি’ হয়েছিলেন নিতান্ত আকস্মিকভাবে। ব্রজেন্দ্র তাঁকে ঘটনাচক্রে নাড়ি দেখে নিদান হাঁকতে অনুরোধ করেছিলেন বলে। একবঙ্গা সেটাকে দৈবঘটনা বলে স্বীকার করেন না। বড়মা মৃত্যুকামী ছিলেন না—মুখে তিনি যাই বলুন। তাঁর ইচ্ছাশক্তিই তির্যকপথে রূপেন্দ্রনাথকে সুযোগ এনে দিয়েছিল। এই তাঁর বিশ্বাস।

কিন্তু ঠাঁর সেই সঙ্কল্পটা—আমৃত্যু ব্রহ্মচারী হিসাবে আর্ত সেবার প্রতিজ্ঞাটা যে ভাবে বিলীন হয়ে গেল, সেটাও কি দৈবনির্দেশ নয়?

ব্রাহ্মমূর্ত্তে গাত্রোস্থান করেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃকৃত্যাদি ও সন্ধ্যাহ্নিক সারা। গৃহদেবতার প্রসাদটুকু মুখে দিয়ে রুগী দেখতে বার হয়ে যান অস্থপঠে। ততক্ষণে সূর্যোদয় হয়েছে, কিন্তু গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালির কলরব থামেনি। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। এ গ্রামে না হলেও আশপাশের গ্রামে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। এ গ্রামেও অসুখে-বিসুখে আজকাল তাঁর দু-একটি ডাক পড়ছে। রুগী দেখতে দেখতে পঁচিশ-দশ ক্রোশ চলে যেতেন। ফিরে আসতেন কখনো দ্বিপ্রহরে কখনো বা পড়ন্ত বেলায় একাহারী তিনি। আহারান্তে বসতেন ভূপাকার পুঁথিপত্র নিয়ে। শুধু পড়া নয়। লেখাপড়া প্রতিদিন যে সব রোগের চিকিৎসা করেন তার বিবরণ লিখে রাখতেন। নিজের এবং ভবিষ্যতের জন্য। ইতিমধ্যেই একটি শিষ্য জুটেছে। স্বগ্রামের, কিন্তু কায়স্থ সন্তান—জীবনকৃষ্ণ দত্ত। প্রতিদিন ঠাঁর কাছে আসে। পাঠ

নেয়। অপরাহ্নে আসেন মৌলবী সা'ব। সন্ধ্যার পর রুদ্ধদ্বারের ওপাশে রূপেন্দ্রনাথ একা বসে কী করেন সে বিষয়ে ধারণা নেই কাত্যায়নীর অথবা জগুপিসির।

ওঁদের দুজনেরই ধারণা তিনি ধ্যান করেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় উনি একা বসেছিলেন বাইরের দাওয়ায়। সূর্যাস্ত হয়েছে, সন্ধ্যা লাগেনি। পশ্চিমাকাশে অপূর্ব মেঘের সম্ভার। সারাটা পশ্চিম আকাশ যেন রঙদোলের নেশায় মেতেছে। পিসি আর কাতু গেছে বড়মার কাছে। প্রায়ই যায়। বিকালে। তাদের ফিরে আসার সময় হল। হঠাৎ নজর হল একটি ডুলি আসছে ওঁর বাড়ির দিকে। পিছন পিছন দুর্গা গাঙ্গুলী।

ডুলিটা ওঁর বাড়ির দিকেই আসছে কিনা তা স্থির-নিশ্চয় বুঝতে পারছিলেন না। সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ যখন আর থাকল না তখন যুক্তকরে এগিয়ে আসেন, আসুন, আসুন গাঙ্গুলীকাকা!

নত হয়ে প্রণাম করেন।

—হ্যাঁ, নিজেই চলে এলাম। কই গো, বেরিয়ে এস।

ডুলিটা নামিয়ে বাহকেরা পাগড়ি খুলে কপালের ঘাম মুছেছে। দূরে সরে যাচ্ছে। একগলা ঘোমটা দিয়ে নেমে এল মৃন্ময়ী। পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর। রূপেন্দ্র ভিতর-বাড়ির দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করেন, বাড়িতে কিন্তু এখন কেউ নেই।

দুর্গা প্রশ্ন করেন, দিদি নেই? কাতু?

—না, এখন এসে পড়বেন। বসুন—

একটা চৌপায়া এগিয়ে দেন। দুর্গাচরণ পিছন ফিরে একবার দেখে নিলেন ডুলিবাহকেরা শ্রতিসীমার বাহিরে কি না। নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, তোমাকে একটা উব্গার করতে হবে, বাবা।

—বলুন?

পিছনের দ্বারে মৃন্ময়ী এসে দাঁড়িয়েছে দেখে থমকে গেলেন। মৃন্ময়ী লজ্জা করল না, মাথার অবশুষ্ঠন কিছু কমিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল, —কাকে, তা বোঝা গেল না—আমি কি একটা প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে আসব?

রূপেন্দ্র বলেন, কিন্তু চক্‌মকি কোথায় আছে তা কি তুমি খুঁজে পাবে?

—পাব। জানি। ঠাকুরঘরের কুলুঙ্গিতে।

নিঃশব্দ চরণে আবার সে ভিতরে চলে যায়। দুর্গাচরণ বলেন, তুমি আর একবার তোমার খুড়িকে পরীক্ষা করে দেখ, বাবা।

—কেন? নতুন কোন উপসর্গ হয়েছে?

—না! তা নয়। মানে তোমার সেই যন্ত্রটা দিয়ে ওঁর তলপেটটা একবার বাজিয়ে দেখ।

—কেন? কী হয়েছে?

—হয়নি কিছু। মানে যন্ত্রটা দিয়ে দেখই না—ওর পেটে কী আছে—ছেলে না মেয়ে?

রূপেন্দ্রনাথ বিব্রত বোধ করেন। বলেন, যন্ত্র দিয়ে তা বোঝা যায় না। একটা হৃদস্পন্দন শুধু শুনতে পাব। অজাত ভূণের। তার লিঙ্গ নির্ণয় ওভাবে করা যায় না। যদি ওঁর গর্ভে যমজ সন্তান না থাকে—

—না, না, তা নেই। রাসু দেখে বলেছে।

রাসমণি সোণাই গ্রামের একমাত্র ধাত্রী।

—তাহলে ওঁর গর্ভস্থ সন্তানের পুত্র হবার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশভাগ।

দুজনের কেউই খেয়াল করেননি। মৃণ্ময়ী প্রদীপ না জেলেই পুনরায় নিঃশব্দে ফিরে এসেছে। অন্দরের দিকে অপেক্ষা করছে। চক্ৰমকি নির্দিষ্ট স্থানে ছিল না।

বৃদ্ধ বলেন, তুমি আমার উপর রাগ করে আছ বাবা। তাই ওকে পরীক্ষা করতে চাইছ না।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, না। আমি রাগ করিনি। সেদিন যেভাবে আপনি আমাকে অপমান করে ছিলেন তাতে আমার আহত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সেই রাগ পুষে রেখে মৃণ্ময়ীর চিকিৎসা করব না...কিছু মনে করবেন না কাকা, ওকে হয়তো খুড়িমাই আমার বলার কথা, কিন্তু...

—না, না, মনে করব কেন? তুমি ওকে কোলেপিঠে করে ঘুরেছ। গ্রামসম্পর্কে খুড়ি হলেও ও তোমার চোখে ছোট বোনের মতো। তাহলে পরীক্ষা করতে চাইছো না কেন?

—ঐ তো বললাম। আপনি যে উদ্দেশ্যে ওকে পরীক্ষা করতে বলছেন তা আমার ক্ষমতার বাহিরে। ভ্রূণের হৃদস্পন্দন শুনে বোঝা যায় না, সে পুত্র অথবা কন্যা।

—চেষ্টা করেই দেখ না। খপরটা যে আমার নিতান্তই জানা দরকার।

হঠাৎ দুরন্ত ক্রোধ হয়ে গেল। বলেন, ধরুন আমি পরীক্ষা করে আপনাকে জানালাম, ওঁর গর্ভে কন্যা সন্তান আছে। তাহলে আপনি কী করতে চান?

—এই ভর সন্ধ্যাবেলায় অমন কথাটা বললে, বাবা?

—কী আশ্চর্য! আপনাকে কেমন করে বোঝাই? আমার কথায় ওঁর গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ পরিবর্তন হতে পারে না। যা হয়েছে, তাই হবে। আপনি আমার প্রশ্নের জবাবটা দেননি কিন্তু। যদি আমি বলি, ওঁর গর্ভে কন্যাসন্তানই আছে তাহলে কী করবেন?

—কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমার সময় কম।

—হ্যাঁ, খুড়ো। আমার তাই আশঙ্কা। আর কয়েক বছর পরেই সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা আর আপনার থাকবে না।

—থাকবে না? কতদিন সময় আছে আমার?

—তা কি বলা যায়? বয়স বাড়ছে এটা তো জানেন?

—তা তো জানিই। তুমি কি পরামর্শ দাও?

—আমি কি পরামর্শ দেব? আপনি যা বিশ্বাস করেন তাই করুন—যাগ-যজ্ঞ, তুচ্ছতাক, কবচ-তবিজ।

—তুমি ওসব বিশ্বাস কর না?

—আবার কেন ওসব অপ্রিয় আলোচনা তুলছেন?

—হঁ! তুমি শুধু অপরাবিদ্যায় বিশ্বাসী! তোমার বিদ্যায় এ সমস্যা সমাধানের কোন পথ নেই?

তিক্ত কণ্ঠে রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আছে। নিশ্চিত সমাধান নয়, সম্ভাব্যতার বিচারে আছে!

—কী তা?

সোহাগী

—আপনি তো কুলীন! সময় থাকতে থাকতে গুটিদশেক কুলীন কন্যাকে বিবাহ করে তাদের গর্ভ-সঞ্চার করুন। পুত্র জন্মানোর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে!

—তুমি আমাকে বাঙ্গ করছ?

—না খুড়ো! আপনার প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যুত্তর করছি। এছাড়া এই অপরাবিদ্যায় আর কোন সমাধান আমার জানা নেই।

হঠাৎ নজর পড়ল ভিতর দ্বারে পাষণপ্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময়ী।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন, কী হল? প্রদীপ জ্বাললে না?

মৃন্ময়ী লোকাচার লঙ্ঘন করল। পরপুরুষের সম্মুখে স্বামী-সম্ভাষণ করে বলল, কই যে-কথা বলবেন বলে আমাকে ধরে নিয়ে এলেন, তা তো ঠুঁকে বললেন না?

—কী কথা? বাঃ! আমি আবার কী কথা বলব?

মৃন্ময়ী এবার রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললে, উনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেই আমরা দুজন আসছি। তা উনি যখন বলছেন না, তখন আমিই বলি—সেদিন আমরা যে ব্যবহার করেছি সেজন্য আমরা অনুতপ্ত। আমরা ক্ষমা চাইতেই এসেছিলাম।

রূপেন্দ্রনাথ শশব্যস্তে বলেন, না, না, ভুল ভুলই। আমি কিছু মনে করিনি।

প্রায় একই সঙ্গে বৃদ্ধ বলে ওঠেন, দেখলে? রূপো কিছু মনে করেনি। আমি বলেছিলুম কিনা? যা'হোক। আমরা তাহলে চলি, কইরে তোরা কোথায় গেলি?

রূপেন্দ্রনাথ বাধা দিয়ে বলেন, শুনুন গাঙ্গুলীকাকা। ওর প্রসব-বেদনা উঠলে আমাকে সংবাদ দেবেন। না, না, আঁতুড় ঘরে আমি প্রবেশ করব না। বাইরে অপেক্ষা করব; যাতে প্রয়োজনবোধে রাসু-দাই আমার সাহায্য চাইতে পারে, ঔষধ হাতের কাছে পায়। প্রথমবার প্রসবকালে নানান ধরনের জটিলতা হওয়ার আশঙ্কা থাকে তো...

—নিশ্চয়, নিশ্চয় সে আর বলতে!

দুর্গাচরণ ঘর ছেড়ে বাইরের দাওয়ায় বার হয়ে যান। এতক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে, যেন মানুষের লোকলজ্জাকে আড়াল করে দিতে। গাঙ্গুলীমশাই দাওয়া থেকে নেমে পড়েন, ডুলিবাঁহকদের সন্ধানে।

প্রায়শ্চিন্তে নির্জন কক্ষ। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। রূপেন্দ্র কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করেন। তাঁর দৃষ্টি নেমে যায় সীমন্তিনীর অলঙ্করণবিহীন চরণপ্রান্তে। মৃন্ময়ীর কিন্তু কোন সন্দোহ নেই। এই ঘর, এই ঘরের মানুষজন তার বাল্যস্মৃতিবিজড়িত। অনেকদিন পরে এ বাড়িতে এসেছে। এতক্ষণ ভিতর-বাড়িতে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে সব কিছু আবার দেখছিল। পটের ছবি, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, কাত্যায়নীর বিবাহের স্মারক মেঠো-দেওয়ালে বসুধারা চিহ্ন। এখন দেখছে গৃহস্বামীকে—সেও তার অতি পরিচিত। এই দুর্লভ মুহূর্তটিকে সে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দিতে পারে না। অশ্রুজলকণ্ঠে অশ্রুতে বললে, সোনাদা! একটা কথা! শেষ সময়ে আমি যদি তোমার পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়াই, তুমি যেন পিছিয়ে যেও না!

রূপেন্দ্রনাথ চমকে ওঠেন। সোনাদা! এতক্ষণে চোখে চোখে তাকিয়ে দেখেন। মীনু এমন আবেগভরা গলায় তাঁকে কখনো কিছু বলেনি। বরাবর 'আপনি'—বন্দুরে তাঁকে শ্রদ্ধা-সন্মান জানিয়ে এসেছে। ওর কাজলকালো চোখের তারায় যেন দেখতে পেলেন

দৃশ্যটা—প্রসবাগারের প্রায়াক্ষকারে একটি সদ্যজননী একমুঠি প্রাণকে এ দুনিয়ায় পৌঁছে দিতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে বসেছে—একটা শাখাপরা হাত সেই অস্তিম মুহূর্তে অন্ধকারে ঝুঁজছে একমুঠি ধূলি...তার শেষপাড়ানির কড়ি!

রূপেন্দ্রনাথ সংযম হারালেন। দক্ষিণহস্তটা প্রসারিত করে দিলেন ওর অবগুণ্ঠনচ্যুত মাথায়। অশ্রুটে বললেন, ছিঃ! ও-কথা বলিস্ না মীনু! আতুড়ঘর থেকে সোনার চাঁদ ছেলে নিয়েই ফিরে আসবি তুই! তোর সোনাদার আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না।

উদগত অশ্রুর আবেগকে রুখতে মীনু চোখে আঁচলচাপা দিল।

বাইরে থেকে ভেসে এল, কই গো? এস। ওরা এসে গেছে।



দিনকতক পরের কথা। সূর্য এখন তুলারাশিতে। পিতৃপক্ষ চলছে। দামোদর এখন কানায়-কানায় ভরা। তার ভরাভাদ্রের জলক্ষীতি অবদমিত। মাঠে-ঘাটে থকথকে কাদা এখনো শুকিয়ে ওঠেনি, তবে প্রখর মেঘভাঙা রৌদ্রে তা ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে পলিমাটির আস্তরণে। দামোদরের বার্ষিক দান। আকাশে মানসযাত্রী হংস বলাকার মতো সাদা মেঘের সম্ভার; তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দামোদরের পাড় ঘেঁষে কাশফুলের দিগন্ত ছোঁয়ার আকুলতা। সকালবেলায় শিউলীতলায় শিশিরবিন্দুর উপর হলুদ-সাদার নকশা।

আজকাল আরও প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হয় ঔর। স্নানান্তে তর্পণে কিছুটা সময় যায়। পিতৃপুরুষকে জল দিয়ে রোগী দেখতে বের হন। সেদিনও গ্রামান্তরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সূর্যোদয় মুহূর্ত। হঠাৎ কাত্যায়নী এঘরে এসে বললে, একবার বাইরে এস দাদা। ভিন্গা থেকে একটা গো-গাড়িতে করে কারা যেন এসেছেন। মনে হয়, ঘরানা-ঘরের রোগী। মহিলাই হবেন। ঘেরাটোপ পর্দা। সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ।

রূপেন্দ্র বাইরে এসে দেখেন, অদূরে একটি গো-শকট অপেক্ষা করছে। টাপর তোলা, পর্দা ঘেরা। বোধ করি পর্দানসীন কোন মহিলা। মুসলমান হওয়াই সম্ভব—পর্দার নিশ্চিন্ততা সেরকমই ইঙ্গিত করছে। তবে সৌখিন লোকের গো-যান। বলদের শিং রঙ করা, গলায় কড়ির মালা, বাকঝকে পিতলের ঘণ্টা। একজন অশ্বারোহীও রয়েছে তার কাছাকাছি। আরও দুজন বরকন্দাজ। ঔকে বার হয়ে আসতে দেখে অশ্বারোহী অবতরণ করল। বলিষ্ঠগঠন সৈনিকশ্রেণীর লোক। তার সাজ-পোশাক হিন্দুর। খাটো কুর্তা, কোমরবন্ধে তরবারি, কিন্তু কপালে চন্দন-তিলক। লোকটা ঔকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিবেদন করে, প্রাতঃপ্রণাম কবিরাজ মশাই। আমরা আসছি রূপনগর থেকে—মোহান্ত মহারাজের গড় থেকে।

—কোন মোহান্ত মহারাজ?

—রূপনগরে তো একজনই মোহান্ত মহারাজ আছেন, প্রভু—প্রভুপাদ শ্রীমন্ন মহারাজ প্রেমদাস গোসাইজীর পাট থেকে।

নামটা সুপরিচিত। প্রেমদাস গোস্বামী গোটা রাঢ়খণ্ডে সুপরিচিত। রূপনগরের স্বনামধন্য

সিদ্ধপুরুষ। অসীম তাঁর ক্ষমতা—ইহলোক পরলোকে। বাকসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক। তাঁর পাট দামোদরের উত্তরে, বস্তুত অজয়ের তীরে। কেন্দুবিশ্বের কাছাকাছি। রূপনগর বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। আউল, বাউল, নেড়ানেড়ি প্রভৃতি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও আছে, তবে মুসলমান নেই। গ্রামটি বর্ধমান রাজসরকারের এজিয়ারভুক্ত ভূখণ্ডে নয়। সুবাদার হাতেম আলির রাজ্যে। প্রেমদাস গোসাই ও অঞ্চলের শুধু ধর্মীয় নেতা নন, রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট। তাঁর আখড়াটি বাস্তবে পরিখাবেষ্টিত একটি গড়। সচরাচর কোন ধর্মীয় নেতাকে এ জাতীয় গড় নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় না—বিশেষ, হিন্দু ধর্মের কোন নেতাকে। হাতেম আলিও দিতেন না—দিতে বাধ্য হয়েছেন! সেদিক থেকে প্রেমদাস বাবাজী একটি ব্যতিক্রম। শুধু বেতনভুক লাঠিয়াল নয়, তাঁর বন্দুকধারী অশ্বারোহী সৈন্যও আছে।

রূপেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, গাড়িতে কে আছেন?

সৈনিকটি তার আঙুরাখা থেকে একটি পত্র বাহির করে স্পর্শ বাঁচিয়ে সেটি নামিয়ে রাখে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে।

পত্রলেখক স্বয়ং প্রেমদাস গোস্বামী।

বৈষ্ণবজনাচিৎ বিনয় প্রকাশ করে তিনি সোণাই গ্রামনিবাসী মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রনাথ ধ্বজুরি মহাশয় বরাবর এই আর্জিটি পেশ করেছেন। দেবনাগরী হরফে, ব্রজভাষায়: “রাধাগোবিন্দজী আপনার অশেষ মঙ্গল বিধান করুন। পরে জানাই, এক অনাথাকে আপনার পদপ্রান্তে প্রেরণ করিলাম। এস্থলে নানাবিধ পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞাদি করিয়াও হতভাগিনীকে নিরাময় করা যায় নাই। অথচ ঐ হতভাগিনী ভাগ্যবতীই আগামী রাসপূর্ণিমায় রাইরানী হইবার জন্য দৈবনির্বাচিতা। তাহার মুহূর্ত্তমুহূর্ত্ত হইতেছে। হেতু নির্ধারণ করা যায় নাই। সময় নিতান্তই অল্প। এই সিদ্ধগীঠের আবহমানকালের প্রথায় যাহাতে ব্যত্যয় না হয় তাই আপনার শরণাগত হইতেছি। পত্রবাহকের মাধ্যমে অবিলম্বে আমাকে জ্ঞাত করাইবেন এস্থলে বিকল্প ব্যবস্থার কোনও প্রয়োজন আছে কিনা।

বিনয়াবনম্র গোবিন্দচরণাশ্রিত ইতি প্রেমদাস গোসাই।”

পত্রটি বার দুই পাঠ করেও তার মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না। ‘রাইরানী’ কাকে বলে, ঠুন্দের আবহমানকালের প্রথাটিই বা কী, জানা নেই। বিকল্প ব্যবস্থা বলতে কী ইঙ্গিত করা হয়েছে? সম্ভবত সৈনিকটি সে কথা জানে। কিন্তু তাকে সেসব প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় না। মূল তথ্যটা অনুধাবন করতে অসুবিধা হল না। গোয়ানে একটি নারী আছে, সে অসুস্থ। সর্বাগ্রে তাকে দেখা দরকার।

তিনি ঘেরাটোপ গো-শকটের নিকটে অগ্রসর হয়ে এলেন। পর্দার বাহিরে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আমি চিকিৎসক। ভিতরে কে আছেন?

পর্দা সরিয়ে একটি প্রৌঢ়া নেমে এলেন। গৌরবর্ণ, নাকে রসকলি। ব্রাহ্মণকে প্রশ্নায় করে বললেন, আপনিই ধনঞ্জয়বাবা?

—আমার নাম রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা। আমি পেশায় চিকিৎসক। রোগিণীকে দেখতে চাই।

—দেখুন বাবা, আসুন।

প্রৌঢ়া আচ্ছাদনের এক প্রান্ত তুলে ধরলেন।

ভিতরে একটি শয্যা পাতা। একটি তরুণী শায়িতা। তার চোখ দুটি নিমীলিত। হয় নিদ্রাগতা অথবা জ্ঞানহীনা। রূপেন্দ্রনাথ একটি ধাক্কা খেলেন মনে মনে। রোগপাণ্ডুর মুখ, ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ ঈষৎ পিঙ্গল—বোধকরি দীর্ঘদিন রক্ষণ থাকায়। রক্তশূন্য। তবু অপরূপ সুন্দরী সে। শায়িতা দুর্গাপ্রতিমা! ওর ভূমধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে যেমন একটি ধূসর ছায়াপাতের আসন্নতায় পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তি ন্মান হয়ে যায়, এখানেও যেন তেমনি এক মৃত্যুশীতল সত্তাবনা। অচৈতন্যার শীর্ণ দক্ষিণহস্তটি তুলে নিলেন। নিমীলিত নেত্র দীর্ঘ সময় তার নাড়ির গতি পরীক্ষা করলেন। জ্বরতাপে দেহ যেন পুড়ে যাচ্ছে। নাড়ির গতি অতি ক্ষীণ। মৃত্যু তিলতিল করে এগিয়ে আসতে চাইছে, সপ্তদশীর জীবনীশক্তি তাকে বাধা দিচ্ছে। কে হারে, কে জেতে!

অচৈতন্যার মণিবন্ধ ত্যাগ করে সেটি দেহের পাশে নামিয়ে রাখার পরে সৈনিকটি প্রস্থ করল, কোন্‌ গৃহে ওকে স্থান দেওয়া হবে কবিরাজ মশাই? আপনি অনুমতি দিলে আমি পাজাকোলা করে শুইয়ে দিতে পারি।

রূপেন্দ্র বললেন, না। ওর সে সহ্যক্ষমতা বর্তমানে নাই। কোনক্রমেই ওকে এখন স্থানান্তরিত করা যাবে না। তোমরা এক কাজ কর। বলদজোড়া খুলে দাও। ধীরে ধীরে গো-শকটটিকে ঐ তেঁতুলবটের ছায়ায় নিয়ে যাও। দুদিকে ঠেকো দিয়ে ওর শয্যাটি ভূমির সমান্তরালে রাখার ব্যবস্থা কর। এভাবেই ওকে সমস্ত দিন রাখতে হবে। দেখ, যেন রৌদ্রতাপ ওর গায়ে না লাগে।

শ্রোতা আকুলভাবে প্রশ্ন করেন, বাঁচবে তো বাবা?

সে কথার জবাব না দিয়ে রূপেন্দ্রনাথ প্রতিপ্রশ্ন করেন, মেয়েটি আপনার কে হয়?

—আমাকে তুমিই বলবেন, বাবা। ওর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই। আমি মোহন্ত-মহারাজের সেবাদাসী ছিলাম।

—ছিলেন? এখন নন?

শ্রোতা কী জানি কেন লজ্জা পেলেন। বলেন, তাঁর ‘দাসী’ তো বটেই, আর দাসীর ধম্মোই হচ্ছে ‘সেবা’ করা। কিন্তু ও বাঁচবে তো?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আমি চিকিৎসক, দৈবজ্ঞ নই, মা। আমাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস রাখতে হয়—রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তরল পানীয়। প্রতি আধঘন্টা পর পর পাঁচ ফোঁটা করে ওর মুখে দেবেন।

—‘আধঘন্টা’ কাকে বলে বাবা?

—ধরুন একদণ্ড কাল। আপনাকে একটি বালুকা ঘড়িও পাঠিয়ে দিচ্ছি। কীভাবে ‘দণ্ডকাল’ বিচার করতে হবে, তা আমার ভগিনী আপনাকে শিখিয়ে দেবে। সেও আপনাকে সাহায্য করবে।

গো-শকটটিকে বৃক্ষের ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হল। কাত্যায়নী এল শ্রোতা পরিচারিকটিকে সাহায্য করতে। সিন্ধু বস্ত্রখণ্ড রোগিণীর ললাটে বারে বারে দেওয়া হচ্ছিল—জ্বরতাপ খুব বেশি থাকায়। জ্ঞান ফিরে এলে রোগিণী মধুমিশ্রিত দুগ্ধ পান করতে পারে—আর কিছু নয়। শ্রোতার মধ্যাহ্ন আহারের আয়োজন হল ব্রাহ্মণবাড়িতে। রূপেন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মকন্দাজটিকে প্রস্থ করলেন,

সোণাই

তোমরা কজন এখন কী করবে? এখানে মধ্যাহ্ন আহার সেরে রূপনগরে ফিরে যাবে?
লোকটা বললে, আপনি তো এখনো পত্রের উত্তর আমাকে দেননি, কবিরাজমশাই?
—দেখতেই তো পাচ্ছ রোগিণীর অবস্থা। ওর জ্ঞান হোক। তারপর পত্র লেখার প্রস্তুত হবে।

—তাহলে, এই সোণাই গায়েই আমাদের আপাতত থেকে যেতে হবে। যতদিন না ওর ভালোমন্দ কিছু হয়। তবে আপনার চিন্তার কিছু নাই। মোহন্ত-মহারাজ আপনাদের জমিদার-মশাইকেও একটি পত্র দিয়েছেন। আশা করি তাঁর অতিথিশালায় আমাদের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
—রূপেন্দ্রনাথ স্পষ্টবক্তা। বললেন, ‘মন্দ’ অবশ্য যে কোন মুহূর্তেই হতে পারে; কিন্তু ‘ভালো’ হতে ওর পক্ষকাল সময় লাগবেই।

—তাহলে পক্ষকালই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

—তোমাদের ইচ্ছা।

যাবতীয় ব্যবস্থা করে তিনি রুগী দেখতে বার হয়ে গেলেন।



পার্শ্ববর্তী গ্রামে যে গৃহে গিয়েছিলেন সেখানেও ছিল একটি মৃত্যুপথযাত্রী রোগী। সারাটা দিন সেখানে থাকতে হল। সেটিও ব্রাহ্মণবাড়ি। বাধ্য হয়েই সেখানেই মধ্যাহ্ন-আহার সারতে হল। অপরাহ্ন বেলায় রোগীর অবস্থা কিছু ভালোর দিকে পরিবর্তিত হওয়ায় ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে গ্রামের দিকে ফিরতে থাকেন। চিকিৎসার প্রয়োজনে একটি অশ্ব ক্রয় করেছেন সম্প্রতি। সৈন্যগুপ্ত তার নাম। নিজেই তাকে দানাপানি দেন, পরিচর্যা করেন। জীবন দত্তও করে।
সমস্ত দিন একটি রোগপাগুর মুখের ছবি ভাসতে থাকে তাঁর মনের পটে। মেয়েটি ‘অনাথা’। গৌসাইজী লিখেছেন। ‘নাথ’ অর্থ কি স্বামী? অর্থাৎ বিধবা? কে জানে? সধবা যে নয়, এটুকু বোঝা যায়। কিন্তু একটি ‘অনাথা’ হতভাগিনীর বাবদে মোহন্ত-মহারাজ এত অর্থব্যয় করছেন কেন? সে কি তাঁর ‘সেবাদাসী’? আবার লিখেছেন সে শুধু ‘হতভাগিনী’ নয়, ‘ভাগ্যবতী’—‘রাইরানী’ হওয়ার জন্য দৈবনির্বাচিত। মেয়েটিকে ঘিরে একটা রহস্যজাল গড়ে উঠছে বলেই কি তাঁর এই চিন্তাচঞ্চল্য? সে শুধু আত্ম নয়—সে বিশেষ।

গৃহে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখনো সন্ধ্যা নামেনি। দেখলেন, গো-শকটটি বৃক্ষচ্ছায়ায় অপেক্ষারত। রোগিণীর এখনো জ্ঞান হয়নি। কাত্যায়নী বসে আসে তার শিয়রের কাছে। আর কোন জনমানব নেই।

—কেমন আছে রে? জ্ঞান হয়েছিল?

—পুরো জ্ঞান হয়নি। দুপুরে একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

—এরা সব কোথায়?

কাত্যায়নী জানায়, প্রৌঢ়া মধ্যাহ্ন আহারান্তে নিদ্রাগত। এখনো ঘুমাচ্ছে। বোধ করি পূর্বরাত্র

সম্পূর্ণ জাগরিত থাকতে হয়েছিল তাকে গো-যানে। সেপাইগুলো কে-কোথায় কাতু জানে না।

রোগিণীর জ্বরতাপ দেখলেন কপালে হাত দিয়ে। জ্বর অনেকটা কমেছে। নাড়ি দেখলেন—হ্যাঁ, ঔষধে কাজ হয়েছে। নাড়ির গতিবেগ উন্নতির দিকে।

বললেন, সারা রাত ওকে এখানে রাখা ঠিক নয়। কার্তিকের হিম সহ্য হবে না। তুই ঘরে একটা বিছানা পেতে দে।

কাত্যায়নী জানায় আরোগ্য নিকেতনের নবনির্মিত একটি কক্ষে সে বিছানা পেতে রেখেছে। কিন্তু সেপাইগুলো ফিরে না আসা পর্যন্ত কী করে রোগিণীকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন : সে তোকে ভাবতে হবে না। তুই একটু দুধ গরম করে নিয়ে আয়। নড়াচড়া যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলে দুধটুকু খাইয়ে দেওয়া যাবে। আমিই ওকে পাজাকোলা করে নিয়ে যাব।

সহজ সরল নির্দেশ, কিন্তু কাতুর বুঝি তা মাথায় ঢুকল না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার দাদার দিকে। ফলে ধমক খায়, কী বললাম মাথায় ঢুকল না? আমি তো সংস্কৃতে বলিনি কাতু।

থতমত খেয়ে কাত্যায়নী তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করে। রূপেন্দ্রনাথ এপাশে ফিরে এগিয়ে আসেন রোগীকে স্থানান্তরিত করতে। ঠিক তখনি পশ্চিমাকাশে অন্তসূর্য মুক্তি পেল মেঘের বন্ধন থেকে। এক মুঠি হলুদ-আবীর রোদ ছড়িয়ে দিলেন সূর্যদেব শেষ বিদায়ের পূর্বে। রূপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নির্দেশ : ‘বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে সূর্য যেমন প্রকৃতির ললাটে শেষ চুসন চিহ্ন ঐকে দিয়ে যায় তেমনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে রোগীর ললাটে ফুটে ওঠে এক মহিমাময় দ্যুতি।’

এই অন্তসূর্যের ‘কনে-দেখা’ আলোয় রোগীর ভূমধ্যে তেমন কোন দ্যুতি ফুটে উঠেছে কি না দেখবার জন্য ধ্বস্তুরি মুখটা ওর অচৈতন্য আননের সন্নিগটে নিয়ে এলেন।

আর তৎক্ষণাৎ সত্যটা প্রণিধান করলেন : ও রোগী নয়, রোগিণী। পূর্ণযৌবনা একটি নারী! বুঝতে পারেন, কেন কাতু অমন অবাক চোখে তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। তার জ্ঞানত দাদা কখনও কোন নারীদেহ এভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বহন করে নিয়ে যায়নি।

নজর হল, অসাবধানে মেয়েটির বক্ষাবরণ কিছুটা অপসারিত। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে তার প্রাণধারণের প্রেরণা বক্ষের যুগ্মকামনায় ফুলে-ফুলে উঠছে। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন দৃশ্যটায়। ভূমধ্যে নজর গেল না।

বরং স্মরণ হল আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অপর একটি শ্লোক : ‘তৃতীয়ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে যৌবনপ্রাপ্তা কোনও নারীদেহ কদাচ পরীক্ষা করিবে না। তার দেহস্পর্শ করিবে না।’

নির্দেশটির অর্থ, উদ্দেশ্য, প্রাঞ্জল। কিন্তু সে নির্দেশের কি ব্যতিক্রম নাই? নির্জন প্রান্তরে যদি ‘মুমূর্ষু যৌবনপ্রাপ্তার সন্ধান পান, তাহলে তাকে উপেক্ষা করে পলায়ন করিতে হবে—যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত? বিবেকের নির্দেশকে নস্যাৎ করতে হবে—যেহেতু শাস্ত্রীয় অনুশাসনটি দেবনাগরী হরফে সংস্কৃতে রচিত?

মনস্থির করলেন পণ্ডিত। না, এ অনুশাসন তিনি মানেন না, বর্তমান অবস্থায় মানতে রাজি নন। প্রথমেই ঐ অচৈতন্যার আঁচলটি টেনে দিলেন বুকের উপর। একদৃষ্টে রক্ষ কুস্তলচূর্ণ এসে পড়েছিল কপালের উপর—আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিলেন তা। তারপর একটি হাত সাবধানে

স্থাপন করলেন ওর মাথার নিচে, দ্বিতীয় হাত জানুয়ার তলা দিয়ে। অনায়াসে মেয়েটিকে পাজাকোলা করে তুলে নিলেন বুকে।

কী হাসা। যেন একটি কবুতর।

অতি সাবধানে মুহূর্তাকে বহন করে নিয়ে এলেন নির্দিষ্ট কক্ষে। সেখানে সদারচিত শয্যাপার্শ্বে দুধের পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে কাত্যায়নী। পথের দিকে নজর থাকায় রূপেন্দ্র খেয়াল হয়নি, কোলে তুলে নেওয়ার পরমুহূর্তেই মেয়েটি চোখ মেলে তাকিয়েছে। ঠুঁর বাহুবন্ধে এলায়িততনু মেয়েটি নির্নিমেষনয়নে ঠুঁকেই দেখছিল এতক্ষণ। শয্যায় তার দেহটি স্থাপিত করার উপক্রম করতেই সে দুই বাহু দিয়ে সবলে ঠুঁর কণ্ঠ বেঁটন করে ধরল। তার দুটি চোখে ততক্ষণে আনন্দের জোয়ার। অশ্রুটে সে বললে, এসেছ? এত দেরী হল যে?

একটা বিদ্যুত-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল রূপেন্দ্রের সর্বদেহে। ভারমুক্ত হতে পেরেছেন, কিন্তু বন্ধনমুক্ত নয়। বুঝতে অসুবিধা হয়নি—এ ঘোর প্রলাপ। অসংলগ্ন উক্তি। কাকে কী বলছে, তা ও জানে না। কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে ভ্রমাত্মক ব্যক্তির সর্পদর্শনজাত ভীতি যেমন নিখাদ, এই প্রলাপোক্তিও তেমন একটা মিথ্যা মোহের বাস্তব মাদকতা বিস্তার করতে চাইছে যেন।

নিরুপায় রূপেন্দ্র ভগিনীকে আদেশ দিলেন, পিছন থেকে ওর হাতের বাঁধন আলগা করে দে।

দুধের পাত্রটা নামিয়ে রেখে কাত্যায়নী এগিয়ে এল। আদেশ পালন করল। রূপেন্দ্র বন্ধনমুক্ত হলেন। দেখলেন রোগিণী পুনরায় অচেতন্য। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি অনুভব করেছেন ঐ মৃত্যুপথ যাত্রিণীর আর্তি—যে বাঁচতে চায়! কিছুক্ষণ পূর্বে দৃষ্টির মাধ্যমে মনে হয়েছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে-তালে ওর যুগ্মরক্ষের স্থিতি শুধুমাত্র প্রাণধারণের তাগিদে, এখন স্পর্শের মাধ্যমে বুক দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, অনুভব করেছেন—না, ও শুধু মানবশিশু হয়েই বাঁচতে চাইছে না—নারী হিসাবে বেঁচে উঠতে চাইছে।

রোগিণীর দিকে যেন আর তাকিয়ে দেখতে পারছেন না। নতমস্তকে আত্মস্থ হতে চাইছেন। কাঁচ বললে, ঐ কথাটা ও কেন বললে দাদা?

—প্রলাপ। বিকারের ঘোর।

—তা বুঝেছি। কিন্তু ও তোমাকে ভুল করে কাকে ভেবেছিল?

—ওর কোন নিকট-আত্মীয়। দাদা-টাদা হবে।

—দাদা?

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ধমক দিয়ে ওঠেন, দাদা কি বাবা, কি পিসেমশাই তা কি আমার জানার কথা? তুই বড় বোকার মতো কথা বলিস কাঁচ। দে, পারিস তো দুধটুকু খাইয়ে দে।

স্থানত্যাগ করেন। পলায়নই বলা যায়। কারণ, কাত্যায়নীকে ধমক দিলেও বোঝেন—প্রিয়মন কাঁচ বুঝেছে—ঐ আকুলতা, ঐ সম্ভাবণ দাদা, বাবা, পিসেমশায়ের প্রতি প্রযুক্ত নয়ন মেয়েটি নিঃসন্দেহে বিধবা। বিকারের ঘোরে সে তার মৃত জীবনমরণের সাথীকেই দৃষ্টিতে পেয়েছিল খণ্ডমুহূর্তের জন্য।

এতক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ির দাওয়ায় এসে বসলেন। রোগিণীর কথা নয়,

নিজের কথাই চিন্তা করতে থাকেন। ন্যায়ের সেই সূত্রটিকেই বিচার করতে বসেন মনে মনে : ঠিক কথা। রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে ভ্রমাত্মক ব্যক্তির ভীতির পরিমাপটা সমানই হওয়ার কথা ; কিন্তু সে ব্যক্তির যদি পূর্বজ্ঞান থাকে যে, ওটা সর্প নয়, রজ্জু ? তাহলে সে ভয় পাবে কেন ? রূপেন্দ্রনাথ তো উচ্চারণ মাত্র বুঝতে পেরেছিলেন—মেয়েটির ঐ উক্তি নিতান্ত প্রলাপ। তাঁর দিকে দৃকপাত করে শব্দকয়টি উচ্চারিত হলেও উদ্ভিষ্ট ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি ! তাহলে ? বিগতভর্তা যুবতীর প্রলাপোক্তিতে তিনি বিচলিত হলেন কেন ? তার স্বামীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রেমসম্ভাষণে তিনি শিহরিততনু হন কোন অধিকারে ? এ তো পরুষাপহরণ !

—রূপেন আছে নাকি ?

চমকিত হয়ে দেখেন তারাশ্রম এগিয়ে আসছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। কৃষ্ণপঙ্কের রাত। এক আকাশ তারা। পল্লীর বিভিন্ন কুটিরে শঙ্খধ্বনি নীরব হয়েছে। একটানা বিঝি পোকার ডাক ঝোপেঝাড়ে শুধু মুঠো-মুঠো জোনাকি।

—তারাঙ্গা নাকি ? এস, বস।

নিজে বসেছিলেন মেঠো দাওয়ায়। তারাশ্রমের জন্য একটি চৌপায়া এগিয়ে দিলেন। তিনি সেটি সরিয়ে দিয়ে ঘনিয়ে এসে বসলেন। বললেন, মেয়েটি বাঁচবে ?

—তুমি জানলে কী করে ?

—মোহন্ত মহারাজ বাবামশাইকেও একটি পত্র লিখেছেন যে। কুসুমমঞ্জরীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার কাছে। চিকিৎসা করাতে।

—কুসুমমঞ্জরী ? মেয়েটির নাম ?

—হ্যাঁ। তুমি জানতে না ? ওর যে এ বছর রাইরানী হওয়ার কথা।

—‘রাইরানী’ কাকে বলে তারাঙ্গা ?

—ও। তুমি বুঝি কিছুই জান না ? শোন।

তারাশ্রম দীর্ঘ কাহিনী শোনালেন। এসব বৃত্তান্ত তাঁর ভাল ভাবে জানা। নিতান্ত ঘটনাচক্রে। তারাশ্রমের প্রথমা পত্নী তারাসুন্দরী—ভাদুড়ী-বাড়ির ঐ রেওয়াজ, অর্থাৎ বিবাহের পর প্রথমা পত্নীর নাম হয়ে যায় স্বামীর নামে—রূপনগরের মেয়ে। তিনি কুলীন বারেন্দ্র ঘরের সুন্দরী বালিকা ছিলেন। তাঁর পিতৃদেবের উপাধি সান্যাল—বাংস্যগোত্র। কন্যা সম্ভানের ফুটফুটে রূপ দেখে শৈশবেই সান্যাল মশাই আত্মজাকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেন। স্বগ্রামে আনয়ন করতেন না—পাছে কারও নজর পড়ে যায়। তারাশ্রম বিবাহ করতে যান স্ত্রীর মাতুলালয়ে, পিতৃগৃহে নয়।

—‘কারও নজরে পড়ে যায়’ মানে ?

ধর্মপত্নীর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলিই এবার সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন :

প্রেমদাস মোহান্ত একটি নববন্দাবন রচনা করেছেন। বন্দাবনে যেমন এক কৃষ্ণ আর ষোড়শ গোপিনী, রূপনগরেও তারই প্রতিচ্ছবি। মোহান্ত বাবাজীর অসংখ্য গোপিনী, কিন্তু ‘রাইরানী’ মাত্র একজনই। এক বৎসরের মেয়াদে। প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমার দিন নিৰ্ব্বাচিত হয়ে যায় পর বৎসর রাসপূর্ণিমায় কোন ষোড়শী ‘রাইরানী’ হবে। দ্বাদশমাসে দ্বাদশবার প্রতি-পূর্ণিমায় তার কাছে ভেট যায়—মুর্শিদাবাদী রেশমের শাড়ি, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্য, অগুরু-চন্দন। সেবাদাসীরা

তার অঙ্গমার্জনা করে, তাকে নানান আভরণে সাজায়। এই এক বৎসরকাল সে কিন্তু গোবিন্দদর্শনে বঞ্চিত। মন্দিরে তার আসার অধিকার নেই। তখন তার বিরহের কাল। প্রতি পূর্ণিমায় আখড়ার ব্যবস্থাপনায় মন্দির-সংলগ্ন নাটমঞ্চে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রেমদাস বাবাজী এসে বসেন। আশীর্বাদ করেন। ‘মাথুর পালা’ গীত হয়। বিরহের গান। তারপর দ্বাদশ মাস বিরহযাপনান্তে রাসপূর্ণিমায় মেয়েটিকে ‘রাইরানী’ সাজানো হয়। হস্তিপৃষ্ঠে তাকে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। মুহূর্মুহ পুষ্পবাষ্টি হতে থাকে। নগরবাসী হরিসংকীর্তন করতে করতে অনুগমন করে। সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা এসে থামে গোবিন্দ মন্দিরে। সেদিন সান্ধ্য-আরতির অধিকার ঐ ভাগ্যবতীর। অতঃপর কীর্তন। এবার মিলনের গান। মধ্যরাত্রে আসর ভাঙে। বরমাল্য নিয়ে তখন রাইরানী প্রবেশ করেন গোবিন্দজীর শয়নকক্ষে—মন্দিরে নয়, মন্দির-সংলগ্ন একটি পুষ্পশোভিত ফুলশয্যাগৃহে। প্রেমদাস বাবাজী পট্টবস্ত্র পরিধান করে, চন্দন-তিলক সেবা-অঙ্কে গোবিন্দের তরুণে তার পাণিগ্রহণ করেন। তাকে আশীর্বাদ করেন। রাইরানীর জীবনযৌবন ধন্য হয়ে যায়।

এক বৎসরের মেয়াদ। পরবর্তী রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত। তখন আবির্ভূত হন নতুনকালের নবীনা রাইরানী। বাসিফুলে কি দেবতার পূজা হয়? তবে নাকি দেবতাদের একটি দিবারাত্র মানবিক বিচারে এক বৎসর, তাই এই বৎসরান্তিক পালাবদলের পালা।

পুরাতনী? সে তখন আর রাইরানী নয়—সেবাদাসী। অসংখ্য সেবাদাসীর অন্যতমা। কখনো বা গোবিন্দের ঐ নির্মালাটি কাঞ্চনমূল্যে মাথায় করে গৃহে নিয়ে যায় রূপনগরের কোনও বিস্তালালী বৈষ্ণবসাধক—সেবাদাসী করে। তার প্রণামীতে স্ফীত হয় দেবতার তহবিল। গোবিন্দের ইচ্ছে যার অধিকার একমাত্র প্রেমদাস বাবাজীর।

একটা নিরুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করছিল রূপেন্দ্রনাথের। আশ্চর্য। এই হচ্ছে হিন্দু সমাজ। এই হচ্ছে ধর্মের স্বরূপ। এতবড় একটা ক্রোধান্ত অনাচারকে সাল্লা দেশ মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। কেউ রুখে দাঁড়ায় না। বরং দু-হাত তুলে হরিসংকীর্তন করতে করতে পাপাচারকে ধর্মীয় প্রলেপ দেয়।

—কী মনে হয়? মেয়েটি বাঁচবে?

রূপেন্দ্র বলেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নির্দেশ আজ লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করছে, তারাদা। মৃত্যুকে প্রতিহত করতে ওর পক্ষে একটিই ঔষধ—এক পুরিয়া বিষ।

তারাপ্রসন্ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কী করবে বল ভাই, রূপেন্দ্র? এই হচ্ছে হিন্দুধর্ম!

তিক্তকণ্ঠে রূপেন্দ্র বলেন, ওরা বলুক, কিন্তু তুমিও একথা বললে তারাদা? এই ধর্ম? ধর্ম কী? ধৃ-ধাতুতে গড়া ‘ধর্ম’ হচ্ছে পিলসূজ, যা ধরে রাখে। কিন্তু কাকে ধরে রাখে? যারা তার বিকৃত ব্যাখ্যা করে কামচরিতার্থ করছে, তাদের? না! ‘ধর্ম’ যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুবিল্ব তৎ—’ স্বয়ং বেদব্যাসের উক্তি। মঙ্গলকে, শিবকে যে ধারণ করে তাই ধর্ম—পাপকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধর্ম নয়।

তারাপ্রসন্ন বলেন, কিন্তু আমরা যে নিরুপায় ভাই। এটাই যে সামাজিক নির্দেশ।

—সমাজ! হাঃ! ‘সমাজ’ শব্দটা পুংলিঙ্গ, তারাদা। ক্রীবাঙ্গুলিঙ্গ নয়। তোমরা, বঙ্গদেশের ভূস্বামীরা রুখে দাঁড়াও, দেখি আমরা সমাজটাকে বদলাতে পারি কি না।

—আমি ভূস্বামী নই রূপেন্দ্র। তাই বাবামশায়ের তরফে তোমাকে ডাকতে এসেছি। তিনি অবিলম্বে তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

—এখনই চল। ঐ মেয়েটির বিষয়ে আলোচনা?

—সম্ভবত না। বাবামশাই কাল প্রত্যুষে কাটোয়া যাচ্ছেন। আমাকে তো বললেন, পিতৃপক্ষে গঙ্গাতীরে তর্পণ করতে যাচ্ছেন; কিন্তু আমার মনে হল আরও কিছু গভীর উদ্দেশ্য আছে। কাল থেকে মনে হচ্ছে তিনি বেশ উত্তেজিত। ক্রমাগত পদচারণা করে চলেছেন। আমি এই একটু আগে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম ঐ কুসুমমঞ্জরীর বিষয়ে; তিনি এককথায় আমাকে থামিয়ে দিলেন।

—এককথায় থামিয়ে দিলেন! কী বললেন তিনি?

—বললেন, রূপনগরের মোহন্ত মহারাজ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তাঁর বিক্রদ্ধাচরণ কোনভাবেই করা উচিত হবে না। তাছাড়া রূপেন্দ্র চিকিৎসক—এসব বিষয়ে তার মাথা না ঘামালেও চলবে।

রূপেন্দ্রর একটা আঘাত লাগল। জেঠামশাই বৃদ্ধ, প্রাচীনপন্থী, কিন্তু তাঁকে সংস্কারাচ্ছন্ন কৃপমণ্ডক বলে মনে হয়নি কখনো। তাঁর এ সিদ্ধান্তে ব্যথা পাওয়ারই কথা। প্রশ্ন করেন, তুমি কী পরামর্শ দাও?

—আমি কী বলব? বাবামশাই যখন...

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেন, না! আমি তোমার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাইছি তারাদ। ধর, জেঠামশাই আগামীকালের বদলে যদি গতকাল কাটোয়া রওনা হয়ে যেতেন? তাহলে তাঁর অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্তটা তো তোমাকেই নিতে হত। তুমি সে ক্ষেত্রে কী করত?

তারাপ্রসন্ন একটু চিন্তা করে বলেন, আমি সে ক্ষেত্রে গোসাই মহারাজকে জানিয়ে দিতাম, মেয়েটির সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অল্প; তিনি যেন বিকল্প ব্যবস্থা করেন।

—অর্থাৎ ওর পরিবর্তে আর কোন ছাগশিশুকে যূপকাঠে প্রেরণ করতে!

—তাহলে তুমি কী করত বল?

—শঠে শাঠ্য সমাচরেৎ। আমাদের ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। আমরা জানিয়ে দেব, রাসপূর্ণিমার পূর্বেই মেয়েটি সুস্থ হয়ে যাবে। বিকল্প ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। তারপর একেবারে শেষ মুহূর্তে জানিয়ে দেব মেয়েটি সুস্থ হল না। এমনটা তো হতেই পারে।

—মিথ্যাচার? তৎপরতা?

—না! সত্যাচার! ধর্মরক্ষা।

—তাতে কী লাভ?

—অস্তুত একটি বছর একটি মেয়ে রক্ষা পাবে। গতবৎসর যে মেয়েটি রাইবানী হয়েছে—তার তো যা সর্বনাশ হবার হয়েছে গেছে—তার মেয়াদ এক বৎসর বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, অজানা-অচেনা এক কামুক শ্রেষ্ঠীর অঙ্কশায়িনী হবার যন্ত্রণাটা পিছিয়ে যাবে।

তারাপ্রসন্নের প্রকৃষ্ণন হল। বললেন, রূপেন্দ্র, আমাকে খোলাখুলি বল। তুমি বাবামশাই যদি কারণ করেন তা সত্ত্বেও তুমি এই ছলনার আশ্রয় নিতে চাও?

মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে রূপেন্দ্র বলেন, আমিই রোগিণীর অভিভাবক। তার ভালমন্দ আমাকেই

দেখতে হবে।

তারাশ্রম ওর হাতখানা টেনে নিয়ে বলেন, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করতে চাইছ রূপেন্দ্রনাথ। প্রেমদাস মোহন্তের গুপ্তচর সমস্ত রাঢ়খণ্ড ঘুরে বেড়ায়। অত্যন্ত কটকৌশলী সে। অপরিসীম তার ক্ষমতা। তার নিজস্ব সৈন্যদল আছে। টের পেলে সোণাই গ্রামখানাকে সে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

—মুসলমান রাজত্বে সে গোঁসাই মানুষ এতটা ক্ষমতা পেল কী করে? আর কোন সম্প্রদায়ের হিন্দু সাধকের নিজস্ব সৈন্যদল আছে বলে তো শুনিনি।

—না। প্রেমদাস বাবাজী সে দিক থেকে এক দুর্লভ ব্যতিক্রম। ‘অঙ্গাঙ্গিভাবমঞ্জারী কথং সামর্থ্যনির্নয়ঃ?’ —বাবাজীর মুকবির জোর আছে। তুমি জানতে না?

—না। কে মুকবি?

—স্বয়ং ফতেচাঁদজী।

—বল কী। কিন্তু তিনি তো বৈষ্ণব নন?

—না। শোন বলি—

ফতেচাঁদজীর নাম শুনেই তাঁকে চিনতে পেরেছেন রূপেন্দ্রনাথ। আপনি-আমিও চিনব। তবে নামে নয়, কৌলিক উপাধিতে। আপাতত তারাশ্রম—কথিত কাহিনীটি শোনাই—

ফতেচাঁদ ছিলেন নিতান্ত গরিব পিতামাতার সন্তান। সুদূর রাজস্থান থেকে ভাগ্যস্বেষণে এসেছিলেন বঙ্গদেশে। কিশোর বয়সে। অত্যন্ত সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, উচ্চাভিলাষী ও বুদ্ধিমান। কৌতূহলী হয়ে রূপনগরে এসেছিলেন রাসের মেলা দেখতে। সেখানে খুব জমজালো রাসমেলা হয়। সে বৎসরের নির্বাচিতা রূপনগরের রূপবতীকে হস্তিপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। সম্ভ্রায় প্রেমদাস বাবাজীর রাসলীলার আসর। সে এক দুর্লভ দৃশ্য। রাসমঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে রাইরানীকে পাশে নিয়ে সিদ্ধপুরুষ প্রেমদাস মোহন্ত—একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। আর তাঁকে ঘিরে তালে তালে নৃত্যরতা বিশ-বাইশজন গোপিনী। ষোলো থেকে ছত্রিশ—যারা প্রাক্তন রাইরানী, বর্তমানে গোপিনী। তাদের পরিধানে টাইট চোস্ত আর কাঁচুলি—মোগলাই কথক নর্তকীদের ঢঙে। নিম্নাঙ্গে ঘাঘরা এবং বরাঙ্গে ওড়না। ঢাকাই মসলিনের। এতই স্বচ্ছ যে, যৌবনপুষ্ট তনুদেহের স্বরূপ অনুধাবনে ‘ভক্ত’দের কোন বাধা সৃষ্টি করে না। এমনকি ইতিমধ্যে যেসব গোপিনী অন্য কোন ধর্নাভক্তের সেবাদাসী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তারাও ঐ বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে আসে। নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করে। ভক্তেরা দোহার দেয়। মাথা নাড়ে।

কিশোর ফতেচাঁদ সেই সুন্দরীদের হাট দেখতে এসেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতেও নাকি একযোগে এতগুলি সুন্দরীর সমাবেশ ঘটে না। একেবারে সামনের সারিতে বসেছিলেন তিনি।

প্রেমদাস বাবাজী নিজেও তখন তরুণ। তাঁর বিলক্ষণ নেশা হয়েছে। সিদ্ধি নৈব বড় কলকে অথবা তরল পানীয় জানা নেই, কিন্তু ঘোর লেগেছে তাঁর। গোপিনীদের দেহ হিন্দোলার তালে—

‘কার সঙ্গে কী জাতের খাতির আছে তা না জানা পর্যন্ত কারও প্রকৃত ক্ষমতা বোঝা যায় না।’

তালে ঝাড় লঠনগুলোও যেন পাক খাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর নজর হল, সামনের সারিতে বসে আছে এক বালকৃষ্ণ—নন্দকিশোর। অপূর্ব সুপুরুষ ছেলটি। বাৎসল্যরস উথলে উঠল। তিনি হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন। এক কদম কীর্তন তখন সবে থেমেছে। নূতন কীর্তনীয়া তান ধরেনি। বাদক তার বাঁধছে, সুর বাঁধছে। গোসাইজী প্রশ্ন করলেন, কী নাম রে তোর?

—আজ্ঞে, ফতেচাঁদ।

—বোষ্টম?

—না, প্রভু। আমি জৈন। শ্বেতাশ্বর সম্প্রদায়ের।

—তবে মধুর লোভে এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন? দ্যাখ, এদের কাউকে মনে ধরে?

পাঁচ আঙুলে গ্রহবারণ পঞ্চরত্ন: মুক্তা, প্রবাল, নীলকান্ত, পদ্মরাগ ও হীরকখণ্ড। দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করে গোপিনীদের দেখিয়ে দেন। তারা এতক্ষণ নৃত্যরতা ছিল। শ্রমজনিত শ্বাসপ্রশ্বাসে জোড়া-জোড়া স্বর্ণকলস উথালপাথাল করছে। তারা হেসে মুখে ওড়না চাপা দেয়। কারও বা কাজলকালো চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ঐ কন্দর্পকান্তিকে দেখে।

ফতেচাঁদ কৌতুক বোধ করেন। অনিন্দ্যকান্তি গোপিকাকুলের উপর চোখ বুলিয়ে বলেন, আমি নিতান্ত অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ গোসাইজী। সাধিকা পুষব কী ভাবে?

হঠাৎ কী যেন হল সিদ্ধপুরুষের। দুই বাঘের খাবায় খামচে ধরলেন তরুণের দুই বাহুমূল। নিকটে আকর্ষণ করলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কী যেন দেখতে থাকেন তার ভ্রূমধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে তাকে মুক্ত করে দেন। বলেন, মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। যাকে মন চায় তুলে নিয়ে যা। সূর্য উত্তরায়ণে যাত্রা করার পূর্বেই তুই লাখপতি হয়ে যাবি।

দু-একটি প্রগল্ভা সেকৌতুকে বলে ওঠে, আমাদের, আমাদের শেঠজী।

ফতেচাঁদ দারুণ কৌতুক বোধ করেন। গোপিনীদের দিকে ফিরে বললেন, একটু দেবী হবে সুন্দরীরা। মকর-সংক্রান্তির এখনো এক পূর্ণিমা বাকি। আমি এখন শেঠজী নই, ফকিরজী। সবাই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

ফতেচাঁদ গোসাইজীর দিকে ফিরে যুক্তকরে নিবেদন করেন, প্রভু! মনে মনেই যখন খেতে দিচ্ছেন তখন দুধ কেন? ক্ষীরের বাটিই বরাদ্দ করুন। লাখপতির বদলে ক্রোড়পতি।

প্রেমদাস বৈষ্ণব। সদা সুনীচ—তৃণাদপি। রাগ করতে জানেন না। ‘রাগ’ বলতে বোঝেন ‘অনুরাগ’। একগাল হেসে বললেন, কথটা প্রত্যয় হল না, বাবা নন্দকিশোর? জানিস্ না, আমি বাকসিদ্ধ?

—জানি প্রভু! তবে আমার নাম ‘নন্দকিশোর’ নয়, ‘ফতেচাঁদ’। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন রাজস্থানী বণিক। আমি তাঁদের এক অযোগ্য পুত্র।

প্রেমদাস স্মিত হেসে বলেন, বুকেছি। রাজস্থানী বণিক বংশের বেটা বলেই ‘ক্ষীর’ ছাড়া মুখে আর কিছু রোচে না। তা বেশ। ক্ষীরই বরাদ্দ করে দিলাম। একমাসের মধ্যেই তুই লাখপতি নয়, ক্রোড়পতি হয়ে যাবি। যা ভাগ! পালা!

ভক্ত অনুচররা ঐ রসভক্ষারী বিধবীকে সসম্মানে পথ দেখিয়ে রাসমঞ্চের বাইরে নিয়ে যায়। যেসব ভদ্রঘরের মেয়ে গোপিনীবৃত্তিতে পাকা হয়েছে তাদের কেউ কেউ পিছন থেকে বলে ওঠে—মাসখানেক পরে ফিরে এস ফকিরজী! আমাদের বিব্রহ যন্ত্রণার অবসান কর।

গোষ্ঠা

আশ্চর্য ঘটনাচক্র। প্রায় অবিশ্বাস্য!

সিদ্ধপুরুষ প্রেমদাস গোসাই-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। মকর-সংক্রান্তির পূর্বেই ফকির হয়ে গেল আমীর। এ যেন রূপকথার গল্প! অপূত্রক ধনকুবের মানিকচাঁদের নজর পড়ল ঐ অসামান্য রূপবান তরুণটির উপর। মানিকচাঁদও রাজস্থানী বণিক—স্বৈতাধর বণিক সম্প্রদায়ের। ফতেচাঁদকে দত্তক নিলেন তিনি। ফতেচাঁদ প্রণাম করতে এলেন প্রেমদাস বাবাজীকে।

মানিকচাঁদ বা ফতেচাঁদকে সে আমলে সবাই চিনত। দশ বছরের ব্যবধানে আপনি-আমি হয়তো ঠিক ধরতাইটা ধরতে পারছি না; কিন্তু উপাধিটা শুনলে আজও তাঁদের সনাক্ত করতে পারবেন। তাঁদের কৌলিক উপাধি—জগৎশেঠ।

‘জগৎশেঠ’ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। পারিবারিক পরিচয়। মহাকালের স্রোতে আমরা যে ঘাটে বর্তমানে নৌকা ভিড়িয়েছি তার বছর পনের পরে পলাশীর আমবাগানে যিনি ক্যাপ্টেন ক্লাইভকে ইতিহাসের ভিড়ে ঠেলে-ঠেলে ঠাই করে দিলেন তিনি যেমন ‘জগৎশেঠ মহতাপচাঁদ’, তেমনি প্রেমদাস বাবাজীকে যিনি গড় গড়বার অনুমতি নবাব-সরকার থেকে পাইয়ে দিলেন তিনি—‘জগৎশেঠ ফতেচাঁদ’। মহতাপের পূজ্যপাদ পিতামহ।

শুধু অর্থকৌলিন্য নয়, ফতেচাঁদ ছিলেন আলিবর্দীর প্রিয়পাত্র অন্য এক হেতুতেও। প্রাগবর্তী নবাব—সরফরাজ খাঁর—হাত থেকে আলিবর্দীর শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

হাতেম আলী এতবড় মুরুবির জোরকে উপেক্ষা করতে পারেননি—প্রেমদাস বাবাজীকে গড় গড়তে দিতে হয়েছিল। প্রেমদাস তাই নিজস্ব বেতনভুক সৈন্যও রেখেছেন। তারাপ্রসন্ন যা বলেছেন তা বড় মিছে কথা নয়—‘অঙ্গঙ্গি ভাবমজ্জা’—। বাবাজী ইচ্ছা করলে সোএগই গ্রামখানিকে রাঢ়খণ্ডের মানচিত্র থেকে মুছে দেবার ক্ষমতা রাখেন।



—বস, বাবা রূপেন্দ্র। তুমিও বস তারাপ্রসন্ন। তোমাদের সঙ্গে একটি অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরী আলোচনা আছে। শুনেছ বোধহয়, কাল প্রত্যুষে আমি কাটোয়া যাচ্ছি?

কথা হচ্ছিল ব্রজেন্দ্রনারায়ণের বৈঠকখানায়। ওঁরা দুজনেই আদিষ্ট হয়ে আসন গ্রহণ করেন। রূপেন্দ্র বলেন, হ্যাঁ, তারাদার কাছে এইমাত্র শুনলাম। পক্ষকালের জন্য আপনি কাটোয়া যাচ্ছেন। মহালয়ার তর্পণ সেরে ফিরে আসবেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য দুটি। ঐ অবকাশে আমি দাঁইহাটিতে পণ্ডিত ভাস্কররাম পত্নের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে আসব। তোমরা তাঁর নাম শুনেছ?

রূপেন্দ্র বলেন, শুনেছি। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। গত বৎসর তিনি যখন ঐ দাঁইহাটিতেই অকালবোধন করছিলেন তখন নবাব আলিবর্দী মহাষ্টমীর দিন তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করেন।

অষ্টমীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত নাকি কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে মহারাষ্ট্রে ফিরে যান।

—ঠিকই শুনেছ। কিন্তু পশুজীর উদ্দেশ্য কী, কেন তিনি পুনর্বীর ফিরে এসেছেন জান?

—আন্দাজ করতে পারি। যবনের উপর প্রতিশোধ নিতে।

—সেটা তো আপাত উদ্দেশ্য। মূল লক্ষ্যটা? কী নিয়ে বিরোধ? কী হতে পারে এর পরিণাম?

—না, সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই। তুমি কিছু জান, তারাদা?

তারাপ্রসন্ন নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করেন।

ব্রজেন্দ্র জানালেন পূর্বদিন তিনি বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের কাছ থেকে একটি গোপন নির্দেশ পেয়েছেন। বস্তুত রাজ্যদেশেই তিনি কাটোয়া যাচ্ছেন। দাঁইহাটি তার কাছেই। সেখানে বর্তমানে অধিষ্ঠান করছেন ঐ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ব্রজেন্দ্র বর্ধমানরাজের দূত হিসাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন। জানতে—এ রাজ্য থেকে যবন-শাসন নির্মূল করতে যদি বর্ধমানরাজ তাঁর হস্তপ্রসারিত করে দেন তাহলে বিনিময়ে কী প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হবে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, আপনার কি ধারণা পশুজী যবন শাসনের অবসান ঘটিয়ে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন?

ব্রজেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমার ধারণা, ভাস্কর পণ্ডিতের উদ্দেশ্য তা আদৌ নয়। কী জবাব দেব? সে দেখিজয়ী নয়, একজন লুটেরা, ডাকাত। অত্যন্ত কূটবুদ্ধি—কিন্তু লোভী ও নির্মম। রঘুজী ভৌসলেও তাই।

—তিনি কে?

—সর্বাত্মক ঐতিহাসিক পটভূমিকাটুকু জেনে নাও।

মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ও তার তদানীন্তন স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি চুখকসার শোনালেন।

শিবাজী মহারাজের ছিল সেই উদ্দেশ্য—হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই মহানায়কের দেহাবসানের পর মারাঠা বাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেল। তারা ক্ষমতাদপ্পী, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ। চতুর্ভুজের শুধু মাঝের দুটির দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ। এদেরই একটির দলপতি হচ্ছেন নাগপুর অঞ্চলের মারাঠা দস্যু-সর্দার রঘুজী ভৌসলে। আর তাঁর প্রধানমন্ত্রী ঐ কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ: ভাস্করবরাম পশু।

রঘুজী নবাব আলিবর্দীর কাছে 'চৌথ' দাবী করে দূত পাঠালেন। 'চৌথ' হচ্ছে রাজ্যের সম্পূর্ণ রাজস্বের চারভাগের এক ভাগ।

শিবাজীর জীবিতকালেই দিল্লীর বাদশাহ্ স্বীকার করে নিয়েছিলেন এই চৌথ সংগ্রহের অধিকার মারাঠাদের আছে। ভাস্কর পণ্ডিত রঘুজীর তরফে তাই নবাব আলিবর্দীর কাছে চৌথ চেয়ে পাঠালেন। অস্বীকার করলেন আলিবর্দী—না চৌথ, না সরদেশ মুখ।

সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক—অর্থাৎ আমাদের কাহিনীর কাল। নাগপুরের পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অশ্বারোহী বর্গী সৈন্য নিয়ে ভাস্করপণ্ডিত রওনা হলেন বংগাল-মুল্ক। তখন বাঙলা বলতে বিহার ও উড়িষ্যার অনেকখানি সমেত। বীরভূম-বিষ্ণুপুরের শালবন ডিঙিয়ে

সোপাই

ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চেপে এসে হাজির হল লুঠেরার দল। তাদের পিঠে ঢাল, মাথায় উষ্ণীষ, কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম। বেশ কিছু বন্দুকধারীও।

ভাস্কর পণ্ডিত ইতিপূর্বেও একবার এসেছেন বঙ্গদেশে, সর্দার রঘুজীর তরফে চৌখ সংগ্রহ করতে। গত বৎসর দুর্গা পূজার মরশুমে। সেবার বর্গীরা খুব কিছু অত্যাচার করেনি। ঔর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে চৌখ সংগ্রহ করে যাওয়া। অজয় নদ যেখানে গঙ্গায় মিশেছে সেই কাটোয়া-ঘাটের কাছাকাছি ঝাঁটি গেড়েছিলেন। তখন শারদীয়া দুর্গাপূজা আসন্ন। হিন্দুদের সহানুভূতি পাবেন আশা করে ভাস্কর সাড়ম্বরে দুর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। তখন বঙ্গদেশে শান্তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভাস্করপণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজকে সামাজিক বিদায় পাঠিয়ে খুশি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি পূজা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মহাষ্টমীর দিন বৃদ্ধ আলিবর্দী ঋণ তাকে সৈন্য আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। প্রতিমা ফেলে ভাস্কর কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! সে সময় অনেক হিন্দু বর্ধিষ্ণু জমিদার মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত পরের বছর ফিরে আসুন। অসমাপ্ত পূজা সাঙ্গ করুন। আর ঐ আলিবর্দী নামক মহিষাসুরটার শিরশ্ছেদ করুন।

ভাস্কর ফিরে এলেন, কিন্তু এবার নিজমূর্তি ধরে। লুটেরার মূর্তিতে। এবার তাঁর যাত্রা পথে যেসব গ্রাম পড়ল—হিন্দু অথবা মুসলমান গ্রাম—সেখানে অকথ্য অত্যাচার করতে করতে। সে অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা সবার জানা। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঋণা ভাস্করকে হিন্দুধর্মের ধ্বংসকারী ভেবেছিলেন তাঁরা অধোবদন হলেন।

নিয়তির সেটাই চূড়ান্ত পরিহাস নয়। কিছু সম্ভ্রান্ত মুসলমান আমীর ওমরাহুও ঐ কাফের পণ্ডিতকে গোপনে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন! তাঁরা সবাই সরফরাজ ঋণ আত্মীয়বন্ধু ও অনুগ্রহভাক্ত।

সরফরাজ ঋণ প্রাণত্যাগী বাঙলার নবাব। মুর্শিদকুলী ঋণ দৌহিত্র। মাত্র তের মাস তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন বাঙলার মসনদে। মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে গিরিয়ার ময়দানে তাঁর নবাবী ফুরালো। আলিবর্দীর হাতে। সেটা 1740 খ্রীষ্টাব্দ।

সরফরাজ ঋণ আত্মীয়বন্ধুদের আরও একটি যুক্তি ছিল—আলিবর্দী যে শুধু বাঙালী নন তাই নয়, তিনি আদৌ হিন্দুস্থানী মুসলমান ছিলেন না। তাঁর বাপ আরবী, মা তুর্কিদেশের মেয়ে।

তা সে যাই হোক, ভাস্কর পণ্ডিত বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন—বলা যায়—হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আমন্ত্রণে! নিয়তির পরিহাস ওটাই: আতিথ্য ধর্ম পালনের সময় ভাস্কর পণ্ডিত সমদর্শী! হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনও ফারাক রাখেননি। যে গ্রাম জ্বালিয়েছেন, যে নরনারীর শিরশ্ছেদ করেছেন, যে সমস্ত রমণীকে তাঁর সৈন্যদল যৌথ বলাৎকারে জীবন্ত করেছেন—তাঁরা কাফের এবং যবন। সে অত্যাচারের বীভৎসতা দুশ বছর পরেও মিলিয়ে যায়নি। আজও বাঙলার গ্রামে মায়েরা শিশুদের ঘুমপাড়ায় সেই একই সুরে—

‘খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে’

সে-খোকা রামও হতে পারে, রহিমও হতে পারে।

সে আমলে দেশের একপ্রান্তের সংবাদ অপরপ্রান্তে পৌঁছাতে সময় লাগতো। তাছাড়া

অতিরঞ্জনের ভাৱে অধিকাংশ খবরই ভাৱাক্ৰান্ত। বৰ্ধমানৰাজ তিলকচাঁদেৰ তাই তখনো স্বপ্নভঙ্গ হয়নি। মহাৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতটিৰ ভিতৰ তিনি তখনও শিৰাজী মহাৰাজেৰ ভাগোয়া-ঝাণ্ডাৰ পতাকাধাৰীকে খুঁজতে ব্যস্ত। তিনি আশা কৰে আছেন—ভাস্কৰ পণ্ডিত তাঁৰ বৰ্গী সৈন্য নিয়ে আক্ৰমণ কৰবেন মুৰ্শিদাবাদ; বিধৰ্মীকে গদিচ্যুত কৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰবেন হিন্দু ৰাজ্য। যাৰ তিনিটি স্তম্ভ—নাটোৱেৰ ৰানী ভবানী, নদীয়াৰ কৃষ্ণচন্দ্ৰ এবং বৰ্ধমানৰ তিলকচাঁদ।

ব্ৰজেন্দ্ৰনাৰায়ণ ইমানদাৰ লোক, তাই তাঁকে দূতৰূপে প্ৰেৰণ কৰতে চাইলেন দাঁইহাটি। ব্ৰজেন্দ্ৰনাৰায়ণ বললেন, আমাৰ কিন্তু মোহভঙ্গ হয়ে গেছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পাৰিছ—ঐ ভাস্কৰ আৰ তাঁৰ বৰ্গী সৈন্য এসেছে বাঙলাকে লুট কৰতে। চৌথ আদায় হোক আৰ না হোক ওৱা নাগপুৰে ফিৰে যাবাৰ পথে একইভাবে গ্ৰামেৰ পৰ গ্ৰাম লুট কৰতে কবতে যাবে। তাই আমাদেৰ অবিলম্বে গড়ে তুলতে হবে প্ৰতিৰোধ ব্যবস্থা।

তাৱাপ্ৰসন্ন বলেন, কিন্তু কী নিয়ে লড়ব আমাৰা? আমাদেৰ না আছে ঢাল-তলোয়াৰ, গোলাবাৰুদ, না শিক্ষিত সৈন্যদল। ফাঁকা মাঠে অশ্বাৰোহী সৈন্যদলকে আমাৰা ক'ব কী কৰে?

ব্ৰজেন্দ্ৰ বললেন, শোন বলি। দুটি যুক্তি আমাদেৰ তৰফে। দুটি বিষয়ে আমাদেৰ স্থান বৰ্গীদলেৰ উপৰে। এক: সংখ্যাগৰিষ্ঠতা; দুই: মৰণপণ লড়াই কৰাৰ প্ৰবণতা। বিচাৰ কৰে দেখ—ওদেৰ আছে বন্দুক। আমাৰ লড়ব তীৰখনুক দিয়ে। কিন্তু প্ৰতিটি বন্দুকধাৰীৰ মহড়া নিতে যদি হাজিৰ থাকে পঞ্চাশজন মৰণপণ তীৰন্দাজ, তাহলে লড়াইয়েৰ ফল অন্যৰকম হতে পাৰে। ওৱা আসছে লুট কৰতে, মেয়েদেৰ ইজ্জত বাঁচাতে নয়। তাই বাধা পেলেই তাৱা ভিন্ন পথে অগ্ৰসৰ হয়ে যাবে।

সমস্ত পৰিকল্পনাটি ব্যক্ত কৰলেন তিনি।

গ্ৰামবাসীৰ বন্দুক নেই, অসিচালনা বা অশ্বাৰোহণ তাৱা জানে না—যাৱাও বা জানে তাদেৰ না আছে অসি, না অশ্ব। প্ৰতিৰোধ কৰতে হবে তীৰখনুকে। বৰ্গী আক্ৰমণেৰ সূচনামাত্ৰ গ্ৰাম থেকে গ্ৰামান্তৰে প্ৰচাৰিত কৰতে হবে সেই বিপদবাৰ্তা। হিন্দুগ্ৰামে শঙ্খধ্বনি—শঙ্খ প্ৰতিটি ঘৰেই আছে। মুসলমান গ্ৰামে প্ৰস্তুত ৰাখতে হবে দামামা। তাছাড়া তৈৰী কৰতে হবে ধনুক ও তীৰ। শত শত, সহস্ৰ-সহস্ৰ। তীৰখনুকেৰ ব্যবহাৰ শিখতে সময় লাগে না। বিপদসঙ্কেত শ্ৰবণমাত্ৰ হিন্দু-মুসলমান নিৰ্বিশেষে জওয়ানৱা উঠে বসবে পথপাৰ্শ্বেৰ অযুত-নিযুত বৃক্ষচূড়ায়। অশ্বাৰোহী বাহিনী নিকটবৰ্তী হলেই মুঘলধাৰে বৰ্ষণ কৰতে হবে তীৰ।

বন্দুকধাৰীৰা পৰাজিত হবে না, মুখ ঘূৰিয়ে নিতে বাধ্য হবে। তাৱা খুঁজে নিতে চাইবে অৱক্ষিত গ্ৰাম। কিন্তু এই সোণ্ডাই গ্ৰামেৰ আদৰ্শে যদি ৱাঢ়খণ্ডেৰ প্ৰতিটি জনপদ একইভাবে মৰণপণ প্ৰতিৰোধেৰ আয়োজন গড়ে তোলে তাহলে বৰ্গীৰ দল এ ৰাজ্য ছেড়ে অন্যত্র সৰে যাবে, সহজ শিকাৱেৰ সন্ধানে।

দীৰ্ঘ আলোচনা হল। ব্ৰজেন্দ্ৰ বললেন, সব কিছুই এখন কৰতে হবে গোপনে। বৰ্ধমান-ৰাজ যেন অসন্তুষ্ট না হন। সংবাদটা জানাতে হবে আশপাশেৰ গ্ৰামেও—হিন্দু-মুসলমান এবং অন্ত্যজ পল্লীতে। ৰূপেন্দ্ৰ এবং তাৱাপ্ৰসন্ন সেইসব গ্ৰামেৰ মাতব্বৰদেৱ যেন একইভাবে সতৰ্ক কৰে আসেন। সজোপনে প্ৰতিৰোধ ব্যবস্থাৰ উদ্যোগ কৰেন। বললেন, আমি খাজাঞ্চিকে বলেছি এক সহস্ৰ মুদ্রা আপাতত তোমাদেৰ হাতে দেবে। তোমৱা লোহা সংগ্ৰহ কৰ।

মোহন্ত

কামারদের নিয়োজিত করে তীরের ফলা বানানোর কাজ এখনই শুরু করে দাও। বাঁশ ঝাড় কেটে ধনুক বানাও।

প্রথম প্রহর সমাপ্তির যাম ঘোষণা হল। ব্রজেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। বললেন আজ এই পর্যন্তই। তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে?

রূপেন্দ্রও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ মেয়েটি, যাকে রূপনগরের মোহন্তবাবাজী—

ব্রজেন্দ্র একটি হাত তুলে ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। বললেন, এ অঞ্চলে ঐ একটি মাত্র কেলা; মোহন্ত মহারাজের। তাঁর নিজস্ব সৈন্যদল আছে। বাদবাকি গোটা রাঢ়খণ্ড উন্মুক্ত প্রান্তর—যেখানে অশ্বারোহী সৈন্যদলকে রাখা যায় না। এমনকি, অজয়ের তীরে ইছাই ঘোষের পরিত্যক্ত শ্যামরূপার গড়টাকেও কেউ সংস্কার করা প্রয়োজন বোধ করেনি। না রূপেন্দ্র—বর্গী বিপর্যয়ের এই সঙ্কীর্ণণে আমরা কিছুতেই রূপনগরের মোহন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে উৎপাদন করতে পারি না।

রূপেন্দ্র নতনেত্র কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, আপনি এখনই বলছিলেন, মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাতে আমাদের মরণপণ লড়াই করতে হবে, কিন্তু যে হতভাগিনীর বিলকুল কেউ নেই

কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে ব্রজেন্দ্রের মুখ।

বললেন, উপায় নেই! সেই হোক প্রথম শহীদ।

—শহীদ! এ তো শুধু বুকের রক্ত দেওয়া নয়, জেঠামশাই! এ যে ইজ্জৎ-কা-সওয়ালা!

ব্রজেন্দ্র কক্ষান্তরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন। এ কথায় ঘুরে দাঁড়ান। বলেন, তুমি তার চিকিৎসক রূপেন্দ্র—

—কিন্তু আপনি তার অভিভাবক, জেঠামশাই। আমাকে মোহন্ত মহারাজ চিঠি লিখেছেন তার চিকিৎসার জন্য, আপনাকে তার নিরাপত্তার জন্য—

ব্রজেন্দ্রনাথের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলেন, তোমার আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যদি নিষেধ না থাকে তাহলে ফেরত পাঠানোর সময় সেই হতভাগিনীর আঁচলে এক পুরিয়া বিষ বেঁধে দিও। যাতে ইজ্জতের বদলে জান দিয়ে সে দেশ-মাতৃকার সেবা করতে পারে!



কালবৈশাখীর প্রভঞ্জন আসে ভৈরব-রভসে! বাতাস নেই, বিদ্যুৎ নেই, চরাচর স্তব্ধ। রৌদ্রতাপদগ্ধ অপরাহ্নের আকাশে নেমে আসে আতঙ্কতাড়িত সূর্যসাক্ষী চিলের আর্তনাদ। আসন্ন সর্বনাশের প্রতীক্ষায় প্রকৃতি প্রহর গানে।

সোঞাই গ্রামখানিরও সেই অবস্থা।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সূর্যসাক্ষী চিলের মতো গ্রামকে একটি অমঙ্গলবার্তা শুনিয়ে মিলিয়ে গেছেন

আকাশের নিঃসীমায়। তারাশ্রম আর রূপেত্র নিরলস নিষ্ঠায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রচারকার্য। বর্গী-প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার কাজ। বর্গহিন্দু সমাজপতির অধিকাংশই ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। হাজার হোক, ভাস্কর পণ্ডিত লোকটা বামুন, তাঁর সৈন্য দলের কেউ যবন নয়। তাদের সম্বন্ধে লোকে যেসব গুজব ছড়াচ্ছে তা অতিরঞ্জিত বৈ কিছু নয়।

দুর্গাচরণ নন্দ চাটুজ্জেকে জনান্তিকে বলেন, বড়কর্তার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, কতকগুলো ছেলে-ছোকরাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজে ডুব মেরেছেন। আর 'হপুই' এর গন্ধ পেলে এসব চ্যাঙ্ডার দল তো একপায়ে খাড়া। বিশেষ যদি চাঁদা-তোলার ব্যবস্থা থাকে। তা সে ওলাবিবি, শীতলা মায়ের বারোয়ারী পূজাই হক আর বর্গী ঠেঙানোর হুজুগই হোক।

নন্দ বলেন, শুনলাম—বড়কর্তা নাকি হাজার তঙ্কা...

বাধা দিয়ে দুর্গা বলেন, ক্ষেপেছ! গুনে দেখেছ? ও সব ওরা রটাচ্ছে—যাতে তোমার আমার কাছ থেকে মোটা চাঁদা চাইতে পারে। এ একটা কতা হল? ভাস্কর পণ্ডিত নিষ্ঠাবান বামুন! ত্রিসন্ধ্যা জপ না করে জলস্পর্শ করেন না।

কিন্তু আপামর জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া জেগেছে। কী হিন্দু, কী মুসলমান। তারা বিশ্বাস করেছে। না করে উপায় কী? ইতিমধ্যে বীরভূম বিষ্ণুপুর থেকে দলে দলে সর্বহারার দল যে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। তারা অন্ধ, খঞ্জ—কারও খোয়া গেছে নাক, কারও কান—এখনো ঘা শুকাইনি। অনেকের মা-বোনকে চরম লাঞ্ছনা সহ্যে হয়েছে। যে হতভাগিনীরা প্রাণে মরেনি, তাদের যে এখনো প্রাণ-ধারণের শ্বাসি সহ্যে ভিক্ষায় বের হতে হয়েছে ভিন্ গাঁয়ে। ওদের পাকা ধানের ক্ষেত আর পর্ণকুটীর জ্বালিয়ে দিয়েছে বর্গী সৈন্য—ওরা আশ্রয়প্রার্থী, আহাৰ্যসন্ধানী।

এ যে প্রত্যক্ষ সত্য! অস্বীকার করবে কে?

বিশেষ করে সাড়া জেগেছে অন্ত্যজ পল্লীতে। দামোদরের ওপারে তাদের সারি-সারি বস্তি—কৈবর্ত, নমঃশূদ্র, বাগদী, বায়েন পরিবার। এক দশক আগে—মুর্শিদকুলীর আমলে ওদের অনেকেই ছিল ডাকাত। কেউ কেউ এসেছে উত্তর অথবা পূর্ববঙ্গ থেকে। পদ্মার চরে জমিদারের তরফে তারা মারদাঙ্গা করত। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাদের ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছিলেন। আলিবর্দীর আমলে চোরডাকাতের উপদ্রব অনেক কমে গেছে। মুর্গিচুরির অপরাধে তখন ফাঁসির ব্যবস্থা। ফলে ডাকাতেরা তাদুড়ীমহাশয়ের পরামর্শ মেনে নিয়ে ঘর-গেরস্থালি করতে রাজী হয়েছে। দামোদরে মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, মহাজনের ক্ষেত-খামারে মুনিষ খাটায় মন দিয়েছিল। প্রতিরোধ-পরিষদের আহবানে তাদের রক্তে দোলা লাগল। ওদের মাতব্বর ভীমা বাগদী। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স—ইয়া বৃকের ছাতি—ইয়া স্ট্রিট জোয়ান এখনও। তারাশ্রমের দরবারে এসে যুক্ত করে নিবেদন করল, তাইলে মোদের যন্তরগুলান প্রতিদানের আঞ্জা হোক হজুর।

'প্রতিদান' মানে 'প্রতিদান' নয়, 'প্রতাপ'। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে হলে ভীমা বাগদী এ জাতীয় ভদ্র ভাষা ব্যবহার করে থাকে। বুঝতে অসুবিধা হলে না তারাশ্রমের। তিনি বললেন, কিন্তু গঙ্গাজল হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা কর, এই সব বর্গীর হাঙ্গামা মিটে গেলে আবার

আমার মালখানায় যন্ত্রগুলো 'প্রতিদান' দিবি।

একগাল হেসেছিল ভীমা বাগদী, কী যে বলেন কস্তা! হাকামা মিটে গেলে ও নিয়ে আমরা কী করব? না কি বলিস রে তোরা?

ভীমা এসেছিল সদলবলে। তার জোয়ান ভাইপো ঈশান সর্দার বলে, সে আর বলতি।

তারাশ্রমের আদেশে মালখানা থেকে ওদের আটক করা অস্ত্রশস্ত্র সাময়িকভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তিনটি ফিরিস্তি গাদা-বন্দুক—পর্তুগীজ বোম্বার্ডারের কাছ থেকে সংগৃহীত, একত্রিশটি ভীল ধনুক—রাজস্থানী ভীলদের কাছ থেকে ভীমার পূর্বপুরুষেরা কী জানি কী করে সংগ্রহ করেছিল। আর অসংখ্য মরিচাধরা তীর। ভীমার সাগরেদরা বসল সেগুলি শান দিতে।

ওরা সবাই লাঠিখেলায় ওস্তাদ। ভীম ভাল তীরন্দাজ। ভাইপো ঈশানের তো অব্যর্থ টিপ। বীরাষ্টমীর দিন শুধু একদিনের জন্য ওরা ফেরত পেত যন্ত্রগুলো। পূজামণ্ডপে খেল দেখিয়ে সবাইকে তাজ্জব করে দিত খুড়ো-ভাইপো। মহরমেও ওরা লাঠির কসরৎ দেখাতে যেত। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐসব অভ্যাজ পরিবারগুলির সঙ্গে নিরম মুসলমান পল্লীর মনোমালিন্য ছিল না। যবনের ছায়া মাড়ালে নন্দ চটুজেকে অবেলায় স্নান করতে হত বটে কিন্তু ভীমা বাগদী বকর-ঈদের দিনে ফিরনি খেত চেটেপুটে।

দুর্গা গাঙ্গুলীর একটা বড় বাঁশঝাড় আছে। ভীমা বাগদী জীবন দস্তকে মুখপাত্র করে তাঁর অনুমতি চাইতে গিয়েছিল। প্রতিরক্ষা পরিষদের নাকি ঐ গোটা ঝাড়টাই প্রয়োজন। দুর্গা আঁতকে ওঠেন, কী হবে রে অত বাঁশে? ও ঝাড়ে না হোক একশ তলতা বাঁশ। কত দাম জানিস?

জীবন বলে, দরদাম পরে ঠিক করে নেবেন, প্রতিরোধ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে। গোটা ঝাড়টাই লাগবে দাদু।

ঈশান-সর্দার ইঁকাড় পাড়ে, নে রে ভাই। দেরি করিস না।

কুঠার হাতে সাত-আটজন মহিষাসুর এগিয়ে আসে বাঁশ ঝাড়টার দিকে।

ই-ই করে বাধা দিয়েছিলেন গাঙ্গুলী। এমন আজব কতা তো বাপের জন্মে শুনিনি। কী দরে নিচ্ছিস সেটা আগে কবুল খা।

ভীমা এবার মহড়া নিতে এগিয়ে এল তার দশাসই দেহখানি যথাসম্ভব বিনয়াবনত করে। পেন্নাম করে বললে, ঠিগাছে ঠাউরমশাই! যা দাম ধরবেন তাই দেব নে। দরদাম আমরা করবনি। এক কতা! হক কতা!

—ইস! তোর যে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ফুটছে রে ভীমা! আমি যদি বলি, এক একখানা বাঁশের দাম এক আসরুফি? দেবে তোর বাবুরা?

—মুই এককথার মুনিষ ঠাকুরমশাই। তাই দেবনে!

—তাই দিবি? বাঁশ-পিছু এক আসরুফি?

—বিবেচনা করে দেখেন, নগদে তো আর দিতি হচ্ছে না! একশ বাঁশের দরুন এক শ আসরুফি, এই ছুটবাবু আপনার নামে চাঁদার খাতায় নিকে নেবে নে। কী ছুটবাবু, নেবে তো? দ্যাখ, আমার কতার খেলাপ করনি বাবু।

জীবন কোনক্রমে হাসি লুকিয়ে বলে, নিশ্চয়। তুমি যখন জবাব দিয়েছ, দরদাম করবে না।

দাদুর নামে একশ আসরফি লিখে নেব চাঁদার খাতায়।

এর চেয়ে যে বর্গীর অত্যাচারও ভাল ছিল। ভীমা বাগদীর হাড়-হারামজাদ চেলা-চামুণ্ডার দল এক বেজার মধ্যেই গোটা বাঁশবাড়টা সাফল্য করে দিল। কী বলবেন উনি? এক ঝাঁক পরশুরাম। প্রত্যেকের হাতেই শাণিত কুঠার।

বিষ্ণু বায়েন আবার এক আজব পাগলামী জুড়ে দিয়েছে। কোথা থেকে কে জানে সে জোগাড় করেছে একটা তিন-ছাঁদাওয়ালা শিঙা। এক-এক ছাঁদা আঙুল দিয়ে বন্ধ করলে তার এক-এক বেসুর। বিষ্ণুর মতে সে তিনটি—উদারা, মুদারা, তারা। পথে-ঘাটে, এখানে-সেখানে লোক জড়ো করে সে ক্রমাগত শিঙে ফুঁকে চলেছে, বোয়েছেন না, 'তারায়' সেই দিকসীমায়, মাঠের ও-বাগে, 'মুদারায়' বেঞ্চাডাঙার মাঠের মাঝখানে, আর 'তারার' শোনলে বোঝাবেন যে শিরে সংক্ৰান্তি। বোয়েছেন?

তালগাছে চড়ায় বেষ্টা-বায়েনের দারুণ কেরামতি। কাঠবিড়ালীদেরও লজ্জা হবে। সে সবাইকে জানিয়ে রেখেছে, শঙ্খধ্বনি বা দামামার শব্দ কানে গেলেই সে শিঙা-ট্যাকে তড়বড়িয়ে উঠে যাবে ব্রহ্মডাঙা মাঠের ঐ বড় তালগাছটায়। মা-বোনেরা তখন ঘরে আগড় দিও, জওয়ানেরা ধনুক নিয়ে চড়ে বসো যে-যার গাছে। বেষ্টা-বায়েনের উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। টের পাবে বর্গীসৈন্য কত দূরে। 'তারার' তান শুনলি পরে ধনুকে বাণ জুড়ে সুস্বুন্ধি-পোদের দিকে তাগ করবে। বোয়েছ না?



কুসুমমঞ্জরী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার রুম্বচুল এখন ঝোঁপা বাঁধা যায়। মুঁছা আর হচ্ছে না। পথি পেয়ে গায়ে তাগদও এসেছে। গোয়ানটা অপেক্ষা করছে। সেই প্রহরীটি ফিরে গেছে রূপনগরে। বোধকরি বারম্বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে সমঝে নিয়েছে, কবিরাজ-মশায়ের কু-মতলব আছে। তা তো হতেই পারে—কুসুমকে দেখলে মুনিস্ববিরও মতিভ্রম হয়ে যায়, আর ও তো সামান্য কবিরাজ। দূর থেকে সে লক্ষ্য করেছে সব কিছু। কুসুম মাঝে মাঝে বাইরের দাঁওয়ায় এসে নিশ্চুপ বসে থাকে। অথচ কবিরাজ মশায়ের সানাই-এ সেই এক পোঁ।

একদিন সুযোগমতো কুসুমমঞ্জরী বললে, শুনুন।

নাড়ি দেখে ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করে রূপেন্দ্র ফিরে যাচ্ছিলেন। ঘরে তখন কাত্যায়নীও আছে। পিছন থেকে ওর ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, কিছ বলবে?

—আমাকে আপনি বাঁচিয়ে তুললেন কেন?

প্রশ্নের অন্তর্নিহিত জ্বালাটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বলেন, সেটাই যে চিকিৎসকের ধর্ম।

—ও, ধর্ম! আপনারা সবাই খুব ধার্মিক, নয়?

এ তিরস্কারের কী জবাব?

—কিন্তু আমি তো বাঁচতে চাইনি। বলুন, কেন তাহলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এভাবে বাঁচালেন?

অপরোধীর মতো রূপেন্দ্র অধোবদন।

কাত্যায়নী তাঁকে নীরব দেখে বলে ওঠে, তুমি তো তখন অজ্ঞান অচেতন ছিলে ভাই। দাদা

সোহাগ

কেমন করে বুঝবে, তুমি কী চাও ?

—কিন্তু এখন তো আমি সজ্ঞানে আছি। এখন তো উনি জানান, আমি কী চাই।
রূপেন্দ্র অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন। শান্ত স্বরে বলেন, কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ,
মঞ্জরী।

—ও ! আত্মহত্যা করলে অনন্ত নরকবাস বুঝি ? আপনাদের ধর্ম তাই বলে ?
এবারও প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না।

—আর সেই ধর্মগুরুর সেবাদাসী হলে ? অনন্ত বৈকুণ্ঠ-লোক ? কী ? বলুন ? জবাব দিচ্ছেন
না কেন ?

রূপেন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন মেয়েটির দিকে। ওর চোখ দুটি জ্বলছে। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে।
আর হাপরে ফুঁ পড়লে কামারের চুল্লিতে যেমন অস্বাভাবিক জ্বলে-জ্বলে ওঠে তেমনি প্রতি স্বাসে
ওর চোখ দুটিতে আগুন জ্বলছে।

রূপেন্দ্র বলেন, তুমি কী চাও ?

—মরতে। আমাকে এক পুরিয়া বিষ এনে দেবেন ?

কাত্যায়নী স্তম্ভিত হয়ে গেল দাদার উত্তর শুনে। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বললেন, দেব। আজ নয়,
যেদিন তুমি রূপনগরে ফিরে যাবে, সেদিন তোমার আঁচলে বেঁধে দেব। কিন্তু কথা
দাও—একেবারে চরম মুহূর্তের আগে তা মুখে দেবে না ?

অদ্ভুত হাসল মেয়েটি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। যুক্তকরে অসঙ্কোচে বললে, আপনি
আমাকে মার্জনা করবেন, গৌর ! মরতে আমি চাই না, কেই বা মরতে চায় ?—মিছে কথা
বলেছিলাম তখন। তাই কথা দিতে পারছি।

রূপেন্দ্রনাথ আর দাঁড়ালেন না। স্থানত্যাগ করেন তৎক্ষণাৎ।

না, মরতে কেউ চায় না—যে মর্মস্তদ হেতুটা মানুষকে আত্মঘাতী হতে প্রেরণা যোগায় সেটা
অপসারিত হলে কে মরতে চায় ? পরমাত্মার মতো জীবাত্মাও শুধু আনন্দের
অভিসারী—আনন্দান্ধোব খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে। ঐ অজগরের নাগপাশ থেকে মেয়েটিকে
যদি মুক্ত করা যেত, তাহলে ঐ কুসুমমঞ্জরীও ফুলে-ফুলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠত। কিন্তু তা হবার
নয়। স্বহস্তে তিনি ওর অঞ্চলপ্রান্তে বেঁধে দেবেন মুক্তিপথের চাবিকাঠি !

হ্যাঁ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন আজ। গুরুর আদেশ অমান্য করেছেন। ‘মা
প্রদেয়ম্’ তালিকায় যে প্রাণহানিকর বিষ আছে তার থেকে বেছে নিয়ে একটি তীব্র কালকূট
দিতে হবে ঐ মেয়েটিকে।

শাস্ত্রীয় নির্দেশ নয়, গুরুবাক্য নয়—সবার বড় তাঁর বিবেকের সঙ্কেত।

সত্যশিবসুন্দরকে ঝুঁজে পেতে হলে ‘আত্মদীপ’ হতে হবে।

গৌর !

সম্বোধনটা শুনে অবাক হননি—প্রতিবাদও করেননি। তবুও তাঁর জানা। কাত্যায়নী
বলেছে। মেয়েটি স্বীকার করেছিল কাত্যায়নীর কাছে। দুজনে প্রায় সমবয়সী। কদিনেই সখীত

গড়ে উঠেছে একটা। কাত্যায়নীর কাছে সে স্বীকার করেছে।

সে নাস্তিক!

না, জ্ঞান হবার পর থেকেই সে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারায়নি। শৈশবেই হারিয়েছে বাবা-মাকে—কাঁকার কাছে মানুষ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ি—নিত্যপূজার ব্যবস্থা ছিল। বাড়িতেই আছে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপূজা, শিবরাত্রির উপবাস, বৈশাখে ‘পুণ্যপুকুর’ সব রকমই করেছে বাল্যে ও কৈশোরে। দেবতার উপর তার বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে গত বৎসর রাসপূর্ণিমায়—যখন শুনল, আগামীবছর রূপনগরের সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী হওয়ার জন্য সে নির্বাচিত হয়েছে। এই একটি বছর সে সব দেবতার দ্বারে মাথা কুটেছে—কারও দয়া হয়নি! দেবদেবী, ঠাকুরঠাকুর সব ফস্কিকারী—সব মিথ্যা! ঠুটো জগন্নাথ আতের ডাকে সাড়া দেন না—ধনী যজমানের মালপো-ভোগের দিকে তাঁর দৃষ্টি! মা-কালী শুনতে পান না ছাগশিশুর আর্তনাদ! যুপকাঠে বৃথাই ধড়ফড় করে শান্ত হয় ছিন্নশির হতভাগ্য!

কাত্যায়নী আস্তিকের ঘরে লালিত। আজন্ম সংস্কারে আঘাত লাগায় শিউরে উঠেছিল সে—কিন্তু মেয়েটিকে ঘৃণা করতেও পারেনি। বোঝে—কী মর্মান্তিক যন্ত্রণায় হতভাগিনী নাস্তিক হয়ে যেতে বসেছে। আকুল হয়ে কাতু বলে উঠেছিল, কিন্তু শিব? আশুতোষ?

—না, আকাশের কোন দেবতাকে বিশ্বাস করি না আমি। আমার দেবতা মর-মানুষ! আমার ইষ্ট—শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভু। তাই সর্বজীবে গৌরকে খুঁজি আমি।

—কিন্তু তিনিও তো বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করেছিলেন?

—জানি। ত্যাগ দুজনেই করেছেন। মা বিষ্ণুপ্রিয়াও মহাসাধিকা। স্বামীর কোল থেকে সরে গেছিলেন যাতে তিনি সর্বজীবে কোল দিতে পারেন।

রীতিমতো অবাধ হয় গিয়েছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। কাতুর কাছ থেকে সব কিছু শুনে। ঐ মেয়েটি কে? ওর কি অক্ষর-পরিচয় আছে? না হলে এমন তত্ত্বজ্ঞান ওর হল কী করে?

বুঝতে পারেন—আর বুঝতে পেরে নিরতিশয় লজ্জায় মুখখানা কোথায় লুকোবেন ভেবে পান না—কেন সে সেদিন ঐ কথা বলেছিল! ওঁর অন্ধশায়িনী সেই মেয়েটি সেদিন—ছি ছি, কী লজ্জা—ওঁর মুখে দেবতে পেয়েছিল তার প্রাণের ঠাকুরের প্রতিচ্ছবি! অচেতনের অন্ধকার রাজ্য থেকে চেতনার সীমান্তে পৌঁছে অত কাছে ওঁকে দেখতে পেয়ে ও ভুল করেছিল। ওঁর নয়, ওর প্রাণের ঠাকুরেরই কণ্ঠ বেটন করে ধরেছিল। বলেছিল, এসেছো এত দেবী হল যে?

ভেবেছিল, মৃত্যুদেবতার রূপ ধরে ওকে কোলে তুলে নিয়েছেন ওর সেই প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর—গৌর!



মহালয়ার আর মাত্র তিনদিন বাকি। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। তর্পণ সেরে

সোফার

দ্বিপ্রাহরিক আহারে বসেছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। জগুঠাকরুণ সামনে বসে আছেন তালপাখা হাতে।

কাত্যায়নী আর কুসুমমঞ্জরী বসে গল্প করছিল আরোগ্য নিকেতনের মেঠো দাওয়ায়। হঠাৎ ওদের নজর হল—দূর থেকে তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক এগিয়ে আসছে। মাঠের ওপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল গো-গাড়িটা। তার গাড়োয়ানের সঙ্গে কী যেন কথা হল। গাড়োয়ানটা নত হয়ে প্রণাম করল, হাত তুলে দেখিয়ে দিল কুসুমমঞ্জরীদের দিকে।

অশ্বারোহী তিনজন এদিকে আগিয়ে আসে।

উঠে পড়ে ওরা দুজন। দ্রুতগতি কক্ষের ভিতর চলে যায়। কুসুম বলে, মাসি, কাঁরা যেন আসছে।

প্রৌঢ়া সেবাদাসীটি এগিয়ে এল সদরের দিকে।

আগন্তুক তিনজন ততক্ষণে আরোগ্যশালার দোরগোড়ায়। মুখটা সাদা হয়ে গেল সেবাদাসীর। কৃত্রিম হাসি টেনে এনে বললে, কী সৌভাগ্য! ছোটছজুর যে! আসুন, আসুন!

—যাক, তবু চিনতে পেরেছ।

সম্মুখস্থ অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে আসে। বছরত্রিশেক বয়স, বলিষ্ঠ গঠন। তিনজনের মধ্যে তারই সাজ-পোশাকের ঘটা বেশী। রূপনগরের মোহান্ত মহারাজের ভ্রাতৃপুত্র এবং দক্ষিণহস্ত। ধর্মে বৈষ্ণব, কিন্তু মারদাঙ্গায় সিদ্ধহস্ত। বস্ত্রত সে হচ্ছে প্রেমদাস বাবাজীর সৈন্যদলের প্রধান। চোখ দুটি ছোট আর ক্রুরতা মেশানো। কথা বলে কেটে কেটে। বললে, মাসির শরীরগতিক তো ভালই দেখছি, খুব মালপো-টালপো সাঁটছ বোধহয়। তা তোমার বোনঝিটিও ভাল হয়ে গেছেন দেখলাম। ফেরায় মন নেই কেন?

প্রৌঢ়া জোড়হস্তে বললে, আমরা তো দাবাবোড়ের ঘুঁটি, ছোটছজুর! যেমন চালাবে তেমনি চলব। আমাদের আবার মন হওয়া-হওয়া কী?

—তাই নাকি? তাহলে এবার গতির নাড়াও। পোটলা-পুঁটলি বেঁধে নাও। রওনা হতে হবে। এখনই।

ঘরের ভিতর তখন কুসুম সবলে চেপে ধরেছে কাত্যায়নীর দুটি হাত। আগন্তুককে সে চেনে না, দেখিনি কোনদিন, কিন্তু মাসির ঐ ‘ছোটছজুর’ সম্বোধনে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। কাত্যায়নী নিজেকে বন্ধন-মুক্ত করে নিল। নিঃসাড়ে বার হয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ছোটছজুর নজর করল, বাধা দিল না।

‘অশুভস্য কালহরণম্’ নীতিবাক্যটা বোধকরি মাসির জানা। বললে, ওমা, সে কী গো? একটা ডুলি-টুলির ব্যবস্থা কর?

—ডুলি লাগবে না। যাতে এসেছে, তাতেই ফিরবে। নাও দেবী কর না অহৈতুক।

—তা কোবরাজ-মশায়ের অনুমতি তো নিতে হবে?

এবার ধমকে ওঠে ছোটছজুর, হবে না! খাঁচা খালি দেখলেই তোমার কোবরাজ-মশাই বুঝে নেবে পাখি উড়ে গেছে।

—তবু একটা খপর তো দেওয়া দরকার।

—খবর দিতে একজন যে ছুটে গেল তা তো স্বচক্ষেই দেখলে।

দাওয়ায় উঠে আসে। দ্বারপথে দাঁড়ায় দুই চৌকাঠে দু-হাত দিয়ে। আতঙ্কে পাষণ প্রতিমার মতো কক্ষের দূরতম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে কুসুমমঞ্জরী। ছোটছুর তাকে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। বললে, তোমার কাপড়-জামা পুঁটলি বেঁধে নাও। ঋণ্য হয়েছো? এখনি রওনা হব আমরা।

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণায় বলা কথা, আমি যাব না!

—যাবে না! —ঘরের ভিতর এতক্ষণে প্রবেশ করে ছোটছুর। এগিয়ে যায় মেয়েটির দিকে।

ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে কাত্যায়নী পৌঁছেছে নিজের ভদ্রাসনে। মাঠের ও প্রান্তেই তাদের বাড়ি। রসি-খানেক দূরে। বলে, দাদা, শিল্লি! কুসুমকে ধরে নিয়ে যেতে পাইক এসেছে!

—ধরে নিয়ে যেতে? কে?

আহারকালে রূপেন্দ্র বাক-সংযম করেন। অসতর্ক মুহূর্তে প্রশ্নটা করার পরেই অল্পপাত্র সরিয়ে দেন। গণ্ডুষ করে উঠে পড়েন। দ্রুত হস্তপ্রক্ষালন করে বলেন, চল তো দেখি। দুজনে বেরিয়ে এলেন বাইরে। জগুঠাকুরণ কিন্তু সদরদ্বারের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। দৃষ্টি তাঁর ক্ষীণ, তবু দৃশ্যটা দেখতে পেলেন। মাঠের ও-প্রান্তে আরোগ্যশালার সম্মুখে দুজন অশ্বারোহী। তৃতীয় একটি অশ্ব আরোহীহীন। একজন বলিষ্ঠগঠন যুবাধর কুসুমমঞ্জরীকে হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছে। মেয়েটি মাটিতে শুয়ে পড়েছে। জড়িয়ে ধরেছে দাওয়ার একটা বাঁশের ঝুটি। আর সেই প্রৌঢ়া দু-হাত শূন্য তুলে আর্তকণ্ঠে বিলাপ করছে। জগু-ঠাকুরণ ঘর ছেড়ে পথে নামলেন না। দ্রুতগতি ফিরে গেলেন তাঁর ঠাকুরঘরে। তুলে নিলেন লক্ষ্মীর পায়ের কাছে পড়ে থাকা শঙ্খটিকে। আবার বেরিয়ে এলেন বাইরে। শাঁখে ফুঁ দিলেন। স্তব্ধ-মধ্যাহ্ন শিউরে উঠল! পদ্ম দীঘির ও-পাশে, পীতুঠাকুরের বাড়ির সামনেও মেয়েদের একটা জটলা। বোধকরি ঐ সেবাদাসীর আর্ত কণ্ঠের চিৎকার শুনে ওরাও বার হয়ে এসেছে কৌতূহলী হয়ে। তাদের মধ্যে থেকে কে একজন সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে দিল একটা শাঁখ।

এমন নির্দেশ দেওয়াই ছিল। বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পুরললনাদের কী কী কর্তব্য।

মাঠের ও প্রান্তে ভীমা বাগদি আপন-মনে বিড়বিড় করতে করতে আল পথ ধরে কোথায় যাচ্ছিল। খরমধ্যাহ্নে পাশা-পাশি দুবাড়ি থেকে শাঁখ বেজে ওঠায় সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দৃশ্যটা তার নজরে পড়ে। ছুটতে-ছুটতে সেও এসে পড়ে অকুস্থলে।

ততক্ষণে রূপেন্দ্রনাথও পৌঁছে গেছেন। কিন্তু তার পূর্বেই পৌঁছেছে ভীমা। সে নিরস্ত্র। তবু অকুতোভয়ে চেপে ধরে ঐ হাতিয়ারবন্দ মানুষটার কজ্জি—বলে, অ্যাঁও! কী করছিস্ তুই? হারামজাদা?

দুই অশ্বারোহী তৎক্ষণাৎ তার দুদিকে অশ্বকে পরিচালিত করে। হাতে তাদের কোর্সমুক্ত তরবারি। ছোটছুরের আদেশের অপেক্ষায় তারা ঐ বিশালকায় মানুষটার দৃশ্যে অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করে। মাথাটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দেয় না।

ছোটছুর মেয়েটির হাত ছেড়ে দেন। এগিয়ে এসে ভীমার গায়ে কবিয়ে দেন ঠাশ করে একটা চড়। কুসুম তার স্থলিত অঞ্চলটা টেনে নিয়ে বুকটা ঢাকে। বাঁশের ঝুটির আলিঙ্গন কিন্তু

সোশাই

সে ছাড়েনি।

ভীমা তার গালে হাতটাও বোলায় না। তিনজনের দিকে পর্যায়ক্রমে সে তাকিয়ে দেখে নেয়। তিনজনের হাতেই নাস্তা তরোয়াল। ভীমা তিলতিল করে পাঁচটা পা পিছিয়ে যায়। তরোয়ালের কোপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে সে যে কাণ্ডটা করল তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ নিচু হয়ে মুখে হাতের তালু সঞ্চালনে ‘কুক’ দিয়ে উঠল। সে ধ্বনি অতিবিচিত্র: আ-বা-বা-বা-বা!

ছোটহুজুর এই রাঢ়খণ্ডেরই মানুষ। বাঙলা দেশের ছেলে—মারদাঙ্গাতে সে অভ্যস্ত। তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়—এ ধ্বনি যে ওভাবে বাজাতে পারে সে সামান্য চাষার ছেলে নয়—এ বাঙলার একটি বহু-বিখ্যাত যুদ্ধধ্বনি। লোকটা ডাকাত!

তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ প্রকৃতি যেন মুখর হয়ে উঠল। যেন হঠাৎ এসে পড়া কালবৈশাখীর ঝড়। পল্লীর এপ্রান্তে-ওপ্রান্তে ক্রমান্বয়ে হতে থাকে শঙ্খধ্বনি। দামোদরের দিক থেকে ভেসে এল ঐ ‘কুক’ এর প্রতিধ্বনি: আ-বা-বা-বা-বা!

দামোদরের দুই তীরের মাঝি-মাল্লা—দুর্ধর্ষ নমঃশূদ্র, আর কৈবর্ত মাছমারার দল যেন জানিয়ে দিল: আমরা সজাগ আছি! আসছি! ত—য় নে—ই!

আরও আশ্চর্য! দামোদরের ওপার থেকে—বোধকরি পীরপুর গ্রামের দিক থেকে ভেসে এল দামামার শব্দ: ডুম্-ডুম্, ডুম্-ডুম্, ডুম্-ডুম্।

ছোটহুজুর এদেশের ছেলে। তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে—এরা চড় খেয়ে তা হজম করে নেবে না। কিন্তু ওদের সঙ্গে বন্দুক নেই। তৎক্ষণাৎ অস্থগুষ্ঠে আরোহণ করে বসে। যাতে প্রয়োজনে ঐ পদাতিক বাহিনীর মাঝখান দিয়ে তলোয়ার ঘোরাতে ~~যোরাতে~~ যোড়া ছোটানো যায়।

রূপেন্দ্র বলেন, কে আপনি? আমার বাড়ির মেয়েদের গায়ে হাত তোলেন কোন অধিকারে?

ছোটহুজুর ঘোড়াকে এক চক্কর টেঁহল দিয়ে ঘুরে এসে বলে, আমি কে, তা ঐ মাসিকের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আপনিই বরং বলুন, আমাদের গাঁয়ের মেয়েকে এভাবে আটকে রেখেছেন কোন অধিকারে?

—সে কৈফিয়ৎ আপনার মালিককে দেব। আপনি ওড়ে চড় মারলেন কেন?

—ও আমার হাত চেপে ধরেছিল! সে তো নিজে চোখেই দেখলেন!

রূপেন্দ্র নজর হল—মাঠের এপ্রান্তে-ওপ্রান্তে দু-চারজন ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে—ভীমা বাগদীর চেলা চামুণ্ডা। অধিকাংশের হাতেই তেলপাকা লাঠি, দু-একজন ভীল ধনুক হাতে।

—আপনি নেমে আসুন। ওর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

—ক্ষমা? —অট্টহাস্য করে ওঠে দুঃসাহসী ছোটহুজুর। চোখ বুলিয়ে সেও পরিস্থিতিটা সমঝে নেয়। যদিও ওরা পদাতিক, তবু ওদের অনেকের হাতে ধনুর্বাণ। সংখ্যাতেও এতক্ষণে দশ-পনেরজন। বলে, আজ আমি ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আবার আসব। আপনি আশুন নিয়ে খেলা করছেন কোবরেজ-মশাই। তারিখটা জানিয়ে যাচ্ছি: মহাষ্টমীর দিন। আপনার ঐ তীরন্দাজ ডাকাতদের জানিয়ে দেবেন—যারা আসবে তারা তীরধনুক দিয়ে ‘যুদ্ধ-যুদ্ধ’ খেলতে আসবে না, তারা বন্দুকধারী। হাতি আর কামানও আসবে। অহেতুক এ গ্রামে রক্তগঙ্গা বহাতে

চাই না।

তারপর ভীমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, তোর নামটা কী রে হারামজাদা?

ভীমা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছিল। এ প্রশ্নে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পাশে ফিরে বলে, অ-ঈশেন! বাবু মোর নামটো জিগাইছে রে। নবাব-ছরকারে শিকায়ত করবে।

যাকে প্রশ্নটা করেছে সে দাঁড়িয়ে আছে হাত-দশেক দূরে। তার হাতে একটা ভীল-খনুক। আকর্ষণ তার জ্যা টেনে ছোটছজুরের দিকে স্থির লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যেন দ্রৌপদীর স্বয়ংস্বর সভায় মীনলক্ষ্যে অর্জুন! তার দৃষ্টি সরল না। জবাবে বললে, নাম জিগাইছে তো নামটো বলি দাও কেনে?

ভীমা আবার এগিয়ে এল কাছে। বললে, বাবুর হাতে চড় খায়ে তোর খুড়ো যে বাপের দেওয়া নামটো ভুলি গেল রে ঈশেন!

ঈশান একইভাবে জবাবে বললে, ও হারামজাদার বাপের দেওয়া নামটো যখন কীচক, তখন তো অর আনজাদ করা উচিত নামটো কী হতি পারে। ...শোনে কীচক বাবু মশয়। খুড়োর নাম ভীমা বাগদী, অধমের নাম ঈশেন। বড় কোতোয়ালের খাতায় নামদুটি নেখা আছে। তাই পহুছান্তে পারবেন!

ভীমা এতক্ষণে অশ্বারোহীর পাজর ঘেঁষে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই এক লাফ দিয়ে উঠল সে। তার ডান হাতটা শূন্যে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল। প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় সে কষিয়ে দিল ঐ অশ্বারোহীর গণ্ডদেশে। টলে উঠল ছোটছজুর। তৎক্ষণাৎ সে কোষমুক্ত করল তার ধারালো তলোয়ার, কোমরবন্ধের খাপ থেকে। আর একই মুহূর্তে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল ঈশান সর্দার: খবরদার!

ছোটছজুর টাল সামলে সোজা হয়ে বসল। ভীমা ততক্ষণে পাঁচ হাত দূরত্বে। অশ্বারোহী তিনজনেরই লক্ষ্য হল—চার পাঁচজন ধানুকী স্থিরলক্ষ্যে তাদের ঘিরে ফেলেছে। প্রত্যেকের ধনুকের জ্যা আকর্ষণ-বিস্তৃত।

ঠিক তখনই দেখা গেল মাঠের ওপ্রান্ত থেকে মাকিমাল্লার দল পিলপিল করে ছুটে আসছে এদিকে। কারও হাতে দাঁড়, কারও বা লগি! আকাশবাতাস মথিত করে ধ্বনিত হচ্ছে: আ-বা-বা-বা—

গালটা জ্বালা করছে! উপায় নেই! এরা ডাকাত! ছোট সরকার তার সঙ্গী দুজনকে নিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল ভিড়ের মাঝখান দিয়ে।



দেবীপক্ষের পঞ্চমীতিথি।

আগামীকাল মহাপূজার শুরু। মহাযজ্ঞী ঘরে ঘরে চঞ্চলতা। জমিদার-বাড়ির সম্মুখে প্রতি বছরের মতো এবারও মেলা বসেছে। শুধু এ গ্রামে নয়, এ-অঞ্চলেই ঐ একস্থানি মাত্র দুর্গাপূজা। গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ তিন দিনের মধ্যে অন্তত একদিন এসে মন্দির চরণে প্রণাম করে যাবে। সমস্ত দিন দামোদরের সমান্তরালে চলতে থাকবে গো-গাড়ির সারি। ঐ চওড়া রাস্তাটাই দামোদরের বাঁধ। বাঁধ ঠিক নয়, রাস্তাটা জলস্বীতির বাধা দিয়ে কিছুটা মঁড়া নেয়, এই

শোভাই

আর কী। মাঝে মাঝেই জমিদারবাড়ি থেকে পেদ্রাদ আর কেঠা বায়েনের যুগলবন্দী ঢাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে: গুড়-গুড়-গুড়—খিতাং খিতাং!

পূজো এখনো শুরু হয়নি। কিন্তু বায়েনদের যেন আর তর সইছে না। ছেলে-বুড়োর মনের তালে তালে তাদের ঢাকের কাঠি-জোড়াও খেয়ালে বে-খেয়ালে নেচে উঠছে।

রূপেন্দ্র একদিন আর রুগী দেখতে যাবেন না, নেহাৎ প্রয়োজন না হলে। জগুঠাকুরণ আর কাতু সাত-সকালে উঠে ও-বাড়ি চলে গেছে। ও-বাড়ি বলতে জমিদার বাড়ি। কত কাজ! পুজার যোগান দেওয়া, গুড় জ্বাল দেওয়া, ভোগ, আনন্দ-নাড়ু পাকানো। পাঁচবাড়ির এয়োরা না করলে কে করবে?

রূপেন্দ্র দাওয়ায় বসে বসে প্রাকৃতিক শোভা দেখছেন। শারদীয়ার প্রাক্কালে পল্লীবাঙলার রূপ। শিউলি গাছ তলুটা ফুলে-ফুলে সাদা। সোনাগলানো রোদ। আকাশ নির্মেষ। পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘের দল আকাশে ভেসে চলেছে। সেকালে এই সময়েই রাজা মহারাজারা দিগ্বিজয়ে বার হয়ে পড়তেন। সওদাগরের দল যাত্রা করত সমুদ্রের পথে, ‘বদর-বদর’ বলে। দামোদরের কিনার বেয়ে—নদী আর শাহী সড়কের মাঝখানের অপ্রশস্ত কিন্তু অতি দীর্ঘ এলাকাটা এখন সাদায় সাদা—কাশফুলের ঘন জঙ্গলে।

নজর পড়ল সামনের চালাখানায়। যে ঘরখানায় আশ্রয় নিয়েছিল রূপনগরের সেই মেয়েটি আর তার পাতানো মাসি। তারা এখন নেই। নতুন কোন রুগী আসেনি। আরোগ্যশালার তিনখানি ঘরই খালি। না, কুসুমমঞ্জরী রূপনগরে ফিরে যায়নি। সে বর্তমানে আছে ভাদুড়ীবাড়ি। ঐ পুজোবাড়িতে।

কাটোয়া-ঘাটে পিতৃতর্পণ সেরে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ফিরে এসেছেন দিন-চারেক আগে। মহালয়ার পরদিন এসেই সমস্ত বিবরণ শুনেছেন। বলেছিলেন, লোকটা সম্ভবত ফাঁকা হুমকি দিয়ে গেছে। রূপনগরের মোহন্ত মহারাজের এখন শিরে সংক্রান্তি। এখন সে ঐ জাতের মূর্খামি করবে না। আগে দেখবে, ভাস্কর পণ্ডিতের ঘোড়াটা আড়াইচালে কোন দিকে যায়—মুশিদিবাদ না বর্ধমান। যতক্ষণ না ভাস্কর পণ্ডিত চাল দিচ্ছেন ততক্ষণ প্রেমদাস বাবাজীর দান নেই। তাঁকে প্রতীক্ষা করতে হবে। এই হচ্ছে খেলার আইন।

না, ভীম বা ঈশান সদারের ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ হননি। বলেছিলেন, তাঁর মোহভঙ্গ হয়ে গেছে। রূপনগরের মোহন্ত মহারাজকে স্বপক্ষে রাখার প্রচেষ্টা নিরর্থক। শুধু দাঁইহাটিতে ভাস্কর পণ্ডিত নয়, রূপনগরের মোহন্ত মহারাজের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করে এসেছেন।

স্বচক্ষে দেখে পূর্বমত দৃঢ়তর হয়েছে ভাদুড়ী মহাশয়ের ভাস্কর পণ্ডিত লোকটা অতি শয় ধূর্ত, নির্মম, নীতিহীন ও অর্থলোলুপ। নিজে হয় তো কামুক নয়, কিন্তু সৈন্যদলের নারী নির্যাতনের বীভৎসতা তার জ্ঞাতসারে।

ব্রজেন্দ্রর অনুমান—ভাস্করের সৈন্য-সংখ্যা আন্দাজ বিশ সহস্র। তার ভিতর অন্তত এক হাজার বন্দুকধারী। বাদবাকির অস্ত্র—তরবারি ও ভল্লা। অশ্বপৃষ্ঠে যখন অগ্রসর হয় তখন পিঠে থাকে ঢাল, কোমরবন্দে তরবারি, বাম হাতে ঘোড়ার লাগাম, দক্ষিণ হাতে ভল্লা। সৈন্যদলে হাতি নাই, কামানও নাই। তেমনি পদাতিকও নাই। বিশ হাজার সৈন্য তো বিশ হাজার অশ্ব। তাই ওরা প্রভঞ্জনগতি; তাই ওরা দুর্বীর। আজ এখানে তো কাল সেখানে। তুলনায় নবাব

আলিবর্দীর সমর বাহিনী শ্লথগতি। একাধিক রণহস্তী। তারা দ্রুতগতি, কিন্তু গো-শকটে বাহিত হয় কামান। বহু সৈন্য অগ্রসর হয় পদব্রজে। ভাস্করের তেইশজন সেনা-নায়ক। প্রত্যেকের সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট, সূচিহিত। মুহূর্ত মধ্যে নির্দেশ পেয়ে গোটা বাহিনী চার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে রওনা হয়ে পড়ে। আবার হয়তো দুদিন পরে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়। নবাবী বাহিনী সেভাবে সুশৃঙ্খলবদ্ধ নয়। তারা স্থির করে উঠতে পারে না বর্গীদের সহসা-বিভক্ত কোন দলটিকে অনুসরণ করবে। তাই বৃদ্ধ নবাব গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বর্গী সৈন্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোন ক্ষুদ্র দলে ভাস্কর স্বয়ং আছেন তা বুঝে উঠতে পারেন না।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ যখন ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়ন করেন। বর্ধমানরাজের দূত যেন বর্ধমানরাজ স্বয়ং! কথাবার্তায় তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি এসেছেন যখন নিধনের ব্রত নিয়ে। আলিবর্দী চৌখ প্রদানে স্বীকৃত হোন বা না হোন, ভাস্কর সংকল্পচ্যুত হবেন না—সে সংকল্প নবাব আলিবর্দীকে গদিচ্যুত করে কোনও উপযুক্ত হিন্দু রাজাকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা। যে দুরাত্মা মহাপূজায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে সদ্-ব্রাহ্মণকে অষ্টমীতে প্রতিমা বিসর্জন দিতে বাধ্য করে, তার কোন ক্ষমা নাই! পরবর্তী নবাব? যিনি ভাস্কর পণ্ডিতকে ঐ যখন-নিধন কার্যে সম্যক সহায়তা করবেন। তিনি কে, ভাস্কর জানেন না—মা ভবানীর ইচ্ছা। নদীয়ারাজ হতে পারেন, বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদও হতে পারেন। ব্রজেন্দ্র জাত-‘বারিন্দির’। বৈয়্যিক বুদ্ধিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কাছে হারবার পাত্র নন। তিনি বর্ধমান-মহারাজের তরফে ভাস্কররাম পঙ্ককে শ্রীকৃষ্ণের দশম অবতাররূপে নমস্কার করে এসেছেন। শ্রীজয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্রটি শুনিয়ে দিয়ে এসেছেন—যার দশম অবতারস্নেহানুর্ভূত ‘সম্ভবামি’ হবেন বলে প্রতিশ্রুত। কথা দিয়েছিলেন পণ্ডিতজীর কী কী ‘হিঙ্কা’, কোন্ কোন্ উদ্যোগ, তা বর্ধমানরাজকে সবিস্তারে জানিয়ে দেবেন। তা তিনি দিয়েছেন। কাটোয়া থেকে ফেরার পথেই পড়ে শহর বর্ধমান। যেখানে তিলকচাঁদকে সব কথা জানিয়ে এসেছেন। এবং একথাও বলতে ভোলেননি যে, বাকচাতুর্যে তাঁকে আশ্বস্ত করে সেই ধূর্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে অতর্কিতে বর্ধমান রাজ্যটি আক্রমণ করা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। তার মূল লক্ষ্য—অর্থ সম্পদ।

ব্রজেন্দ্রর সন্দেহ হয়েছিল ভাস্করের শিবিরে কী যেন একটা কর্মচঞ্চলতা। শিবিরে কী যেন একটা কর্মচঞ্চলতা। দাঁইহাটির শিবির গুটিয়ে দুই একদিনের মধ্যেই তিনি কোথাও চলে যাবেন। আত্মগোপন না অতর্কিত আক্রমণ তা বুঝে উঠতে পারেননি। আক্রমণ হলে লক্ষ্যহুল কোনটি? বর্ধমানরাজের রাজপ্রাসাদ, নদীয়ারাজের কৃষ্ণনগরের প্রাসাদ, অথবা খাশ মুর্শিদাবাদ? সম্ভবত কলকাতার দিকে অভিযান করবে না সে। সংবাদ পেয়েছে, ইংরাজ স্থপতি যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছে—পরিখা খনন—‘মারাঠা ডিচ’ এবং প্রতিটি প্রবেশদ্বারে কামান সংস্থাপন। উত্তরে প্রথমই মুর্শিদাবাদ অভিযান করবে না। তার পূর্বে দু-একটি ছোট-খাট রাজভাণ্ডার তাকে লুটে নিতে হবে—বর্গী সৈন্যদলকে সন্তুষ্ট করতে, তাদের লোভের আগুনে ইন্ধন জোগাতে। যাতে নবাবী তোষাখানা আক্রমণের সময় সবাই মরণপণ লড়ে।

বর্ধমানে রাজকার্য সমাধা করে রওনা হয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম মুখো। পথে গুশকরা, আউসগ্রাম মৌজা। তারপর অজয়ের তীরে ইলামবাজার। অদূরে ‘কবিরাজ’ জয়দেবের

স্মৃতিবিজড়িত কেন্দুবিষ ও কদমখণ্ডির ঘাট। তার উত্তরে ধর্মমঙ্গলের কালের অসীম শক্তিশালী ইছাই ঘোষ-এর গড়। গোপভূমের মহা শক্তি উপাসক। আজ অরণ্যভূমির কাছে মাথা নত করেছে তাঁর শ্যামরূপার গড়—ইটের স্তূপ যেন পাহাড় হয়ে পড়ে আছে। 'ইছাই' সম্ভবত 'ঈশ্বর' শব্দের অপভ্রংশ। যেটাকে আজ সকলে শ্যামরূপার গড় বলে, ওটাই এককালে ছিল ঈশ্বর ঘোষের মহা সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ঢেকুর বা ঢেকুর। কোন কালে? পাল রাজাদের আমলে তো বটেই। হয়তো বিগ্রহপালের সময়ে। তার অর্থ সাত-সাতটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে—রাঢ়খণ্ডের কোনও ভূস্বামী প্রয়োজন বোধ করেননি সেই স্তূপের ইট দিয়ে নতুন একটি গড় গড়ে তুলতে, অজয়ের কিনার ঘেঁষে—বৈদেশিক শত্রুকে প্রতিহত করতে। বৈদেশিক শত্রুরা যে মাঝে মাঝে অতর্কিতে আসে, ঝাড়ঝাড়ির বানের মতো—না, তুল হল, ভাদ্রের বানের মতো তা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান আসে না, আসে অনিয়মিত—ভূমিকম্পের মতো। কিন্তু আসে। শুধু হিন্দুস্থানের নয়, বাঙলার ইতিহাসেও পৌনঃপুনিকতায় এ ঐতিহাসিক সত্যটি ক্লাস্তিকর! তবু সাত-শতাব্দীর ভিতর কোন ক্ষমতাসালী নৃপতি রাঢ়খণ্ডে আর দ্বিতীয় কেদার নির্মাণ করেননি। বোধকরি তাঁদের আশা ছিল—তাঁদের শাসনকালে এ দুর্দৈব ঘটবে না। ঘটলেও উৎকোচে বশীভূত করতে পারবেন বিদেশী দস্যুদের। সেই মূল্যই দিয়েছে বাঙালী সাম্প্রতিক মগ, পর্তুগীজ আর হার্মাদদের আক্রমণে, এখন দিচ্ছে বর্গীদের।

শুধু অর্থ নয়, দিতে হয়েছে ইমান আর ইজ্জৎ!

মৌকা থেকে শ্যামরূপার পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ দেখতে দেখতে সে কথাই মনে হচ্ছিল ব্রজেন্দ্রনারায়ণের।

আরও দাগা পেলেন রূপনগরে উপনীত হয়ে।

বিদেশী মহারাজ্যীয় দস্যুসর্দার তাঁকে যে সম্মানটুকু দিয়েছিল রূপনগরে মোহন্ত মহারাজ সেটুকুও দিলেন না। লোকটা স্থবির। স্থূলকায়—ব্রজেন্দ্র অপেক্ষা অস্তুত দশ বৎসরের বড়। ব্যতিচারে বিকৃততনু। নারীসংসর্গের হয়তো ক্ষমতাই নাই—কিন্তু লালসার তৃপ্তি হয়নি আজও।

সর্বক্ষণ সে ঐ এক কথাই বলে গেল—কোন সাহসে ব্রজেন্দ্রনারায়ণের তালুকভুক্ত এক অকালপক্ক কবিরাজ তাঁর রাইরানীকে এভাবে আটকে রাখে? তিনি এক সপ্তাহমাত্র সময় দিচ্ছেন ভাদুড়ীমশাইকে। তার ভিতর যদি বন্দিনী ফিরে না আসে তাহলে সোণাই গ্রামখানিকে রাঢ়ভূমের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হবে!

বর্গীদের প্রসঙ্গ দু-তিনবার তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রেমদাস বাবাজী কর্ণপাত করেননি। বলেছেন, আপনারা নিজ নিজ ঘর সামলান ভাদুড়ীমশাই—আমাকে পরামর্শ দিতে আসবেন না। অপরিসীম দাট্টে বলেছিলেন, সেই মারাত্মক ব্রাহ্মণকুলাসারটির সঙ্গে দেখা হতে বলবেন, রূপনগর অধিকার করার দুমতি হলে যেন তার পিতার নামটি একটি ভূর্জপত্রে লিখে নিয়ে আসে—জীবিত ফিরে যাবার সৌভাগ্য হলে সেটি তার প্রয়োজন হবে।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণের মনে পড়ে গিয়েছিল সেই অজ্ঞাত উর্দুকবির বয়েংটি:

“ইখর গৌড় মৌ হরতরফ অঙ্গেরা।

কি থা গিয়ান গুণকা লড়াইয়াসে ডরা

—এদিকে যুদ্ধভীত বঙ্গভূমের চতুর্দিকে থেকে ঘনিয়ে এসেছে নীরঞ্জন অন্ধকার।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। হঠাৎ মনে হল দূর—বহুদূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে: ডুম্-ডুম্, ডুম্-ডুম্, ডুম্-ডুম্!

উঠে পড়লেন রূপেন্দ্র। কান খাড়া করে শুনলেন। না, ভুল শোনেননি তিনি। শব্দটা আসছে দক্ষিণ কোণ থেকে—অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। সম্ভবত দামোদরের ওপারে অবস্থিত পীরপুর গ্রামের দামামা। ছুটে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ষষ্ঠীচরণ এড়াএড়ি ভাবে দৌড়ে মাঠটা পার হচ্ছিল। তাকে প্রশ্ন করলেন, কিসের শব্দ রে ষষ্ঠী?

ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা। বলে, বর্গীর হাঙ্গামা মনে লাগে। ঘাট পানে যাই, ঠাউর। আপনেও আসেন।

দামোদরের দক্ষিণপারে এই সোএগ্রাই গ্রাম। বর্গীদের বর্তমান অবস্থান—যদি দাঁইহাটিই হয়—তাহলে দামোদরের ওপারে। নদীর ওপার থেকে তাদের আক্রমণের আশঙ্কাটা বেশি। সেজন্য প্রতিরোধ পরিষদ নদীতীরের দিকটাই অধিকতর সুরক্ষিত করেছে। শঙ্খধ্বনি বা দামামার সঙ্কেতমাত্র যে যার কাজে লেগে যাবে—বিনা নির্দেশে। অতর্কিত আক্রমণে যথাযথ আদেশ দেবার সময় থাকে না। তাই সবরকম দায়িত্ব বিভাগ আগেভাগে করা আছে।

রূপেন্দ্র উড়ুনিটা দড়ি থেকে টেনে নিয়ে নগ্ন গাত্র আবরিত করলেন। খড়ম-জোড়া খুলেই রাখলেন। প্রয়োজনে যাতে দৌড়াতে পারেন। নগ্নপদেই সুবিধা। সদরে শিকলটা তুলে দিয়ে দ্রুতপদে রওনা দিলেন দামোদরের ঘাটের দিকে। বাড়ির মেয়েরা পূজাবাড়ি।

ততক্ষণে দামোদরের কিনার-ঘেঁষা বিভিন্ন পল্লী থেকে ভেসে আসতে শুরু করেছে শঙ্খধ্বনি। মাঝে একবার শোনা গেল নদীর ওপার থেকে: আ-বা-বা-বা-বা!

—জেকে আছে। সবাই জেকে আছে। তোমরাও সজাগ হও!

লক্ষ্য হল, সদর দোরে শিকল তুলে দিয়ে এ-বাড়ি ও বাড়ির পুরললনার দল দ্রুতপদে মাঠ পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে ভাদুড়ী-বাড়ির দিকে! এটাও পূর্ব-পরিকল্পনা মতো। পূজা-মণ্ডপে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিড়া আর গুড়। তাছাড়া বিরাট চৌবাচ্চায় পানীয় জল। প্রয়োজনে দু-তিন দিন-সারা গ্রামের শিশু-নারী ও বৃদ্ধরা সে বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেও তারা অনাহারে থাকবে না।

অধিকাংশ বাড়িই পর্ণকুটির—দাহ্য! বর্গীরা সবার আগে চালায় ধরিয়ে দেয় আগুন। অতঙ্কতাড়িত অর্ধদগ্ন নরনারী বার হয়ে এলেই পড়ে বর্গী ডাকাতদের খপ্পরে। তারা বেছে নেবার সুযোগ পায়—কাকে হত্যা করবে, কাকে জিইয়ে বাখবে ভিন্নতর মৃত্যুর স্বাদ দিতে। জমিদারবাড়ি পাকা-ইটের। উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। সৌধ শীর্ষে ইন্দ্রকোষের ব্যবস্থাপনা, যার আড়ালে আশ্রয়গোপন করে ধানুকী সৈনিক আক্রমণকারীদের মহড়া নিতে পারে। অধিকাংশ গৃহস্থ তার মূল্যবান যা কিছু—অলঙ্কার বা নগদ সঞ্চয় আগেভাগেই মাটির ভিতর পুঁতে রেখেছে। মুহূর্তমধ্যে দোরে শিকল দিয়ে জমিদারবাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা পাকা।

রূপেন্দ্র যখন দামোদরের তীরে এসে পৌঁছালেন তখন সেখানে অনেক মানুষের জটলা। তাঁর মতো কেউ খালি হাতে আসেনি। যা হোক একটা অস্ত্র এনেছে—নির্দৈন তেলপাকা লাঠিগাছ।

দামোদরের মূল স্রোত এখন এ-পাড় ঘেঁষে। এপাড় ভাঙছে, ওপারে চড়া পড়ছে। এদিকে

সোহাগ

বরাবর খাড়া পাড়, শুধু পারানি ঘাটের কাছে প্রায় তিনশ হাত নদ-কিনার সমতল। সেখানেই নৌকা বাধার আয়োজন, পারানি ঘাট, স্নানঘাট। তুলনায় ওপাড়ে অনেকটা শুধু বালি আর বালি।

শোনা গেল, অনেকেই বর্গী বাহিনীকে দেখেছে। অস্বারোহী—কিন্তু একটি রণহস্তীও আছে। ব্রজেন্দ্রের সংগৃহীত সংবাদ অনুসারে বর্গীদের এক্সিক্যারে হাতি ছিল না। সম্ভবত ইতিমধ্যে অন্য কোন যুদ্ধবাহিনীর কাছ থেকে সেটি ছিনিয়ে নিয়েছে। অথবা রণহস্তীসহ আরও কিছু বর্গী সৈন্য আবির্ভূত হয়েছে নাগপুরের দিক থেকে।

রূপেন্দ্র তাদের দেখতে পেলেন না। তারা নাকি পূর্ব দিক থেকে নদের কিনার ঘেঁষে দল বেঁধে আসছিল। বীরপুর থেকে দামামার শব্দ হতেই ঘাটের মাঝি-স্বামীরা সচকিত হয়ে ওঠে। তারা ‘কুক’ দিয়ে দুঃসংবাদটা জানিয়ে দেয় সবাইকে। তৎক্ষণাৎ সবাই নোঙর তুলে নৌকাগুলি জলে ভাসায়। সারিবদ্ধ নৌকা চলে আসে এ-পারে। অস্বারোহী বাহিনী যখন ওদিকের পারানি-ঘাটে এসে পৌঁছায় তখন সে ঘাট জনমানবহীন। একখানিও নৌকা নাই। দামোদর এখনো টইটবুর। ওরা বাধ্য হয়ে ফিরে যায়—যে পথে এসেছিল, সেই পথে।

সমস্ত বিবরণটা শুনে লক্ষ্মণ বাগদী বললে, ই কথাটা তো মানতে লারলেম। শালারা সমুখবাগে না যায়ে পিছু হটলেক কেনে গো?

যুগী ডোম রুখে ওঠে, মুই কি মিছা কতা বলিছি? শুধাও কেনে রতনেরে, রহিমচাচারে, বড়খোকারে।

লক্ষ্মণ সর্দার বলে, সি কথাটো লয় রে যগন, মিছা কতা বুলার কতা বলি নাই। শুন কেনে—

লক্ষ্মণের বিশ্লেষণটা ভেবে দেখার:

বর্গী সৈন্যদল যে-পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল কেন? ওরা পশ্চিমমুখো আসছিল—তাহলে তাদের লক্ষ্যস্থল সেদিকেই। নদের ওপার থেকে জমিদার বাড়ির দোতলা অংশটা অথবা মন্দিরচূড়া দেখতে পায়। নিশ্চয় তখন স্থির করে এপারে এসে এ গ্রামটা লুট করলে মন্দ হয় না। পাকা ইমারৎ আর মন্দির দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল এটি একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম। লুট করলে মেহন্নত পোয়াবে। তারপর ঘাটে এসে দেখে একখানিও নৌকা নাই। নদীতে এখন অনেক জল। হাতি না ডুবলেও ঘোড়ার পক্ষে ডুব জল। ঘোড়া অবশ্য সাঁতার দিতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই বলেছে বর্গী সৈন্যদের পিঠে বাধা ছিল বন্দুক। সাঁতরে নদী পার হতে হলে বারুদ ভিজ়ে যাবে। ফলে তারা পার হবার কোন পথ দেখেনি। এ পর্যন্ত বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবার কথা? যে পথে চলেছিল সে পথেই এগিয়ে যাওয়া। এ গ্রামটি লুট করার আশা ত্যাগ করে। তা তারা করেনি। তারা ফিরে গেছে। কেন?

হয়তো ভাঁটির দিকে, অর্থাৎ পূর্বদিকে—যেদিকে গেছে, সে দিকে কোন ঘাটে নৌকা দেখে এসেছে। ফুল্লরা গায়ে, কিংবা রতনহাটি মৌজার কোন ঘাটে গেছে সেই নৌকাগুলি লুট করে আনতে। সোহাগই গা-খানাকে অব্যাহতি দিতে ওদের মন চাইছে না।

ভীমা বাগদী বললে, লখাই, তু একটো ঘোড়া লিয়ে দেখি আর পেরথমে। শালারা কোন

বাগে গেল।

আদেশমাত্র লক্ষ্মণ ডোম অস্থপৃষ্ঠে জোরকদম পূর্বাভিমুখে ছুটে চলল। নদের এ পাড় বরাবর—দামোদরের বাঁধ ধরে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে সে ফিরে এল। সংগৃহীত সংবাদ দাখিল করল সেনাপতিকে—ভীমাকে।

না, বর্গী সৈন্যদল রতনহাটি পর্যন্ত ফিরে যায়নি। ফুল্লরাঘাটেও কোনও নৌকা ছিল না। যে খানকয় জেলে ডিঙি ছিল তারাও দামামার শব্দ শুনে এগারে চলে এসেছিল। বর্গী সৈন্য থানা গেড়েছে ঐ ফুল্লরা গাঁয়ে। নিতান্ত নিঃস্ব অস্ত্রাজপল্লী। বায়েনপল্লী। পাঁচ বাড়ি লুট করলেও হয়তো এক ধামা মুড়ি জুটেবে না। তবে যৌবনবতী কিছু পাওয়া যেতে পারে। সে চেষ্টা তারা করেনি। হয়তো এ বিষয়ে তারা ক্লান্ত। ফুল্লরা গাঁয়ের কোন ঘরের চালায় আগুন দেয়নি। তারা বপাবপ শুধু কলাগাছ কাটছে!

ফুল্লরা গাঁয়ে বিরাট বড় কলা-বাগান। কলা বিক্রয় করা ওদের বাড়তি রোজগারের খন্দায়। সোঞাই গাঁয়ে কোনও উৎসব হলে কলাপাতার সন্ধানে যেতে হয় ফুল্লরায়। সেই গাছগুলি ওরা কেটে শুইয়ে দিচ্ছে। কেন গো? মানুষের মাথার বদলে কলাগাছ কাটা?

ওরা ভেলা বানাবে। ভেলায় চড়ে দামোদরে পাড়ি দেবে। সোঞাইকে ছেড়ে যেতে ওদের মন সরছে না। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল ওরা। নদের কিনার ধরে এগিয়ে গেল উজানে, সোঞাইয়ের পারানি ঘাট অতিক্রম করে। বড় বড় কলাগাছ বহন করে। উজান থেকে ভেলা ভাসাতে হবে। যাতে লগি মেরে অগ্রসর হবার সময় স্রোতের টানে ভেলা এসে ভেড়ে এপারের এই সমতল পারানি ঘাটে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, ওরা বর্গীই তো?

তারাশ্রম জবাব দেন, হ্যাঁ। নবাবী সৈন্য নয়। সবাই হিন্দু। দাড়িওয়ালা মুখ নজরে পড়ছে না বিশেষ। পোশাকও সব হিন্দুর।

ভীমা বাগদী তার দলবল নিয়ে এগিয়ে গেল এপার বরাবর—ঐ বর্গীদলের অনুসরণে। আরও ঘন্টাখানেক অতিক্রান্ত হল ওদের ভেলা বেঁধে তৈরী হতে। ইতিমধ্যে ব্রজেন্দ্র বার দুই দূত পাঠিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা যদিও হয়নি তবু দুর্গা গাঙ্গুলী পূজা মণ্ডপে ঐ মূর্তির সামনেই জপে বসেছেন। তাঁর ধর্মপত্নীটি আসন্নপ্রসবা—চিন্তা তো হওয়ার কথাই। শুধু দুর্গা আর নন্দেরই নয়। অধিকাংশ গৃহস্থের পুরললনার দল সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন জমিদার বাড়ি। প্রধান সিংহদরোজার মাথায় চওড়া প্রাচীরে পূর্বেই নির্মিত হয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড উনান। জোগাড় করা আছে কাঠ, হাওয়ায় জল। ঠিক প্রবেশদ্বারের মাথাতেই ফুটতে থাকবে গরম জল। আক্রমণকারীদের মস্তকে যাতে বর্ষণ করা যায় ফুটন্ত জল—অতিথিদের জন্য পাদোদকের পরিবর্তে ‘মস্তকোদকের’ আয়োজন।

ওপারে ওরা যেখানে ভেলা বাঁধার আয়োজন করছে তার বিপরীতে এপারে ঘন কাশবন। সাদা সাদা ফুলে এখন আকীর্ণ। কাশ ঝোপের ঘন প্রাচীর এই পারানিঘাট তকু—প্রায় পাঁচশ হাত দৈর্ঘ্যের।

ভীমা তার প্রতিরোধের যে পরিকল্পনাটি মেলে ধরলো তাতে অস্বাভাবিক হয়ে গেলেন রূপেন্দ্র।

ঐ অস্ত্রাজ বাগ্দী সর্দারের বংশে কারও অক্ষর পরিচয় নেই। দশ পনের বছর ধরে নিবারণ চক্ৰোতির খাশ জমিতে বেগার দিয়েও কেন যে তার ঋণমুক্তি হল না—এই সুদকষা অঙ্কটা তার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার মাথা যে কি পরিমাণ পাকা, তার একটা প্রমাণ দিল। তার বিচিত্র ভাষায় সে বুঝিয়ে দিল। ওরা দুটো কলার ভেলা বানাচ্ছে। এক একটায় দশজন করে অশ্বারোহী উঠতে পারবে। তার মানে জোড়া-ভেলা এপারে এলে এক কুড়ি সুসুন্দির পো এ পারে নামবে। শুভক্ষরী অঙ্ক না-জেনেও ভীমা বলে দিল—তার অর্থ, ওদের শতখানেক সৈন্য পার করতে ‘আনজাদ’ পাঁচ বার জোড়া-ভেলা পারাপার করতে হবে। ভীমার অনুমান শত-খানেক বন্দুকধারী এপারে না আসা পর্যন্ত ওরা আক্রমণ করবে না। পারানি ঘাটে বন্দুক উচিয়ে প্রতীক্ষা করবে। কেণ্টা-বায়েন তার শাস্ত্রভাষ্য দাখিল করে:

—বোয়েছেন। তার মানে হল গে, শালারা মোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সন্ধ্যা নাগাদ। জোড়া ভেলা পার করতি আনজাদ এক দণ্ড সময় নাগবে। বোয়েছেন?

ঈশান-সর্দার বলে, ইটা তো ভাল ববস্থা খুড়ো। পেরথম ফ্রেন্স নামলেই আমরা সেই এক কুড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

—না রে ঈশেন! ঐ গলতিটি করবি না। মোদের হাতে তীরধনুক, সুসুন্দির পো-দের হাতে বন্দুক!

—থাইলে?

—বলি শুন্।

ভীমা বাঙলা হরফ চেনে না, কিন্তু দামোদরকে চেনে। ঐ নদে নৌকা বাওয়াই তার উপজীবিকা। বুঝিয়ে বলে, ভেলাগুলান শালারা উপারে ক্যামনে নে-যাবে তাই ক দিনি?

একটিই উপায়। ভেলা দুটি ঐ বিশজ্ঞন সৈনিককে নামিয়ে দেবার পর এপারের কিনার ঘেঁষে আধকোশ উজানে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে ভেলা ভাসালে তবেই ওরা পৌছাবে পরপারের নির্দিষ্ট ঘাটে। না হলে স্রোতের টানে ভেলা বহুদূর ভাঁটিতে ভেসে যাবে। ভীমার রণকৌশল—প্রথম খেপ সৈন্য অবতরণকালে কোনও বাধা দেওয়া হবে না। শুধু আড়াল থেকে অসহায় আর্তনাদ করে ওদের উৎসাহ যোগাতে হবে। যারা নৌকা থেকে নামবে তারা বন্দুক উচিয়ে প্রতীক্ষা করবে। জনমানবকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তারা এগিয়েও আসবে না। এরপর নিশ্চয় পাঁচ-সাত জন গুণ টেনে ঐ ভেলা জোড়াকে টেনে নিয়ে যাবে উজানে। তারা ঐ প্রথম খেপ সৈন্যদলের দৃষ্টির আড়ালে এলেই আক্রান্ত হবে ভীমার ধানুকী সৈনিকদের বাণে। সম্মুখ যুদ্ধ নয়। কারণ গুণটানা মানুষগুলোও অনিবার্যভাবে হবে বন্দুকধারী। তাদের আক্রমণ করতে হবে কাশঝোপের আড়াল থেকে। তীরবিদ্ধ করে। গুণটানা ঐ পাঁচ-সাত জনকে ঘায়েল করতে পারলেই হাতে আসবে পাঁচ-সাতটা বন্দুক। তখন ঐ জোড়া ভেলাকে টেনে নিয়ে চুপটি করে বদে থাকি।

—এপারে এককুড়ি স্যাঙাৎ, ও-পারে অনারা। এখন তোমাদের দান! দাও কী চাল দিবে দাও!

লক্ষণ বলে, ক্যান? ত্যাখন আমরা ই-পারের ঐ এককুড়ি সুসুন্দির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব

—কী দরকার? থাক না শালারা বইস্যা! তামাম রাত! প্যাটের ভিৎখি চুইচুইটে জমাট

বান্দুক। কাল ভোরের কুকরো ডাকলি বুলব অনে: ‘বাবারা। আইস্য! ঘাটে বন্দুক রাখ্যা আগায়ে আস’—মুণ্ডুর উপর হাত তুলিয়া। আমরায় আনন্দ-লাড় বানায়ে রাখছি!

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঐ দুর্ধর্ষ লোকটার এই বেরোয়া রসিকতায় সব কটা দৈত্য অটুহাস্য করে ওঠে।

কিন্তু বর্গী সেনাপতিও দক্ষ-দাবাড়ু।

রণকৌশলের প্রথম চালেই ওঠসাই কিস্তির ফাদে পড়ে যাওয়া তাঁর ধাতে নেই। ভীমার নৌকার চালটা তিনি বুঝে ফেললেন। গজ দিয়ে সে পথে চাপা দিলেন।

প্রথম ভেলা-জোড়া যখন রওনা দিল—ঠিকই ‘আনজাদ’ করেছে ভীমা—দশদুকনে বিশজন বন্দুকধারীকে নিয়ে, তখন গজরাজও ধীর গতিতে নেমে এলেন দামোদরের বুকে। প্রকাণ্ড রণহস্তী। দাঁতাল। মন্দা। তার গজকুণ্ডে মাছত। হাওদায় মাত্র একজন যোদ্ধা। মাথায় মস্ত উষ্ণীষ—বোধকরি বর্গীসেনাপতি স্বয়ং!

অর্থাৎ এপারে পৌছে ভেলা-জোড়াকে উজানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ওরা করবে হাতি দিয়ে। কাশ ঝোপের আড়াল থেকে তীরবিদ্ধ করে ঐ গজদানবকে বিচলিত করা সম্ভব নয়। আর প্রয়োজনে মাছত নির্মমভাবে চালিয়ে দেবে হাতিটাকে ঐ কাশঝোপের দিকে। বন্দুকের নিশানা থেকে কাশ ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করতে পার—কিন্তু হস্তিপদদলিত হওয়া রুখবে কী ভাবে?

ভীমার মুখটা কালো হয়ে গেল। বললে, শালারা বুড়বক নয় রে ঈশেন! ফদিটা বদলাতে হবেক।

—কী করবা কও?

তৎক্ষণাৎ ভীমা বাগদি তার সৈন্যদলকে সাজালো নতুন ছন্দে। জনা-পঞ্চাশ ধানুকীকে লুকিয়ে ফেলল কাশঝোপের একটা নির্দিষ্ট অংশে। এবার তার জ্যামিতি, গতিবিদ্যা আর ঔদস্থিতিবিদ্যার কঠিন অঙ্ক! এপারের কোন্ বিন্দু থেকে ভেলার দূরত্ব সর্বনিম্ন হবে—যখন সে দুটি এসে পৌছাবে তীরন্দাজদের নাগালের ভিতর! নির্দেশ দিল—ভেলা দুটি তিনপো জলপথ অতিক্রম করলেই সে ‘কুক’ দেবে। আর তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশজন তীরন্দাজ এক যোগে ঐ ভাসমান ভেলার সৈনিকদের উপর তীরনিষ্ক্ষেপ করবে। ওরাও নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ বন্দুক দাগবে। আগ্নেয়াস্ত্র বনাম তীরধনুক! অসম যুদ্ধ! তা হোক—এরা থাকবে শারদলক্ষ্মীর অঞ্চলের আড়ালে—কাশঝোপের অন্তরালে; আর ওরা ভরা দামোদরের উলঙ্গ উচ্ছ্বাসে টালমাটাল। ওরা আত্মগোপনের কোনও সুযোগ পাবে না। এই অসমযুদ্ধের ভাগ্য নির্ভর করবে এদের টিপ-এর উপর। এলেমের উপর!

ঈশান বললে, খুড়ো! সবারে বলি দাও—ঐ বড় সুমুন্দির এক্টিয়ার আমার! অরে টিপ করি বেহন্দো যান বাণ নষ্ট না করে!

ঈশান সর্দার গায়ের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। শুধু সোঞাই নয়, পঞ্চগ্রামের। বছর বছর বীর্যটমীতে সে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে প্রতিযোগিতার আসরে। উড়ন্ত হংসপাতির ষ্ঠেকোন একটাকে বলে বলে নামাতে পারে! তার দাবী সবাই এক কথায় মেনে নিল। গজরাজ সেনাপতির মাথা নেবার অধিকার ওর। মাঝখানে সম্ভরণরত গজরাজ, দুপাশে দুটি ভেলা। ওরা তিল

সোহাই

তিল করে এগিয়ে আসছে।

থাবা-গাড়া চিতাবাঘের মতো দম ধরে বসে আছে ভীমা বাগদি। ঘন কাশঝোপের আড়ালে। নিঃসাড়ে লক্ষ্য করছে ভেলা দুটোকে। তিলতিল করে সে দুটো এগিয়ে আসছে এপারে। কোণাকুণি। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণপূবে, দামোদরের স্রোতধারার সঙ্গে পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ রচনা করে। দুটি ভেলায় প্রায় বিশজন বর্গী সৈনিক। কেউই অশ্বারুঢ় নয়। ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। বাকিরা বন্দুক উচিয়ে নিশানা স্থির করেছে ঐ কাশঝোপটার দিকেই। ওরাও গতিবিদ্যা আর ঔদস্থিতিবিদ্যায় বোধকরি ওয়াকিবহাল। জানে, দিগন্তব্যাপী কাশঝোপের ঠিক কোন অংশটায় তীরন্দাজদের ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা। কাশঝোপ এতই নিষ্পন্দ যে, তীরন্দাজদের প্রায় নাকের ডগায় এসে বসল একঝাঁক জলপিপি।

এসে গেছে। নাগালের মধ্যে। কিন্তু সবার সীমানা সমান নয়। ঈশানের বাণ যে দূরত্বে লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারে, অনেকের তীর অত দূরে পৌছাবেই না। জ্যা-আকর্ষণ করার দৈহিক ক্ষমতা তো সবার সমান নয়। এইবার—এইবার!

ভীমা মুখটা নিচু করে। জমি সই-সই। ডানহাতের তালুটা মুখে চাপা দিয়ে ধ্বনি দিতে গেল: আ-বা-বা-বা-বা!

দেওয়া হল না।

কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই স্তব্ধ দিগন্ত কাঁপিয়ে ধ্বনিত হল একটা বিকট শব্দ! জলের কিনারে সব চেয়ে উচু তালগাছের মাথা থেকে! শিঙার শব্দ।

বেষ্টা-বায়েনের সাবধানবাণী!

উদারা-মুদারা নয়, বোধকরি 'তারা'-য়। সামাল ভাইসব! —শিরে সংক্ৰান্তি! বায়েছেন?

তৎক্ষণাৎ ভেলার সৈনিকদের লক্ষ্যমুখ বদল হল। একসঙ্গে পাঁচসাতটা বন্দুক হয়ে গেল উর্ধ্বমুখ। তালগাছের মাথাটা তাদের লক্ষ্য! গর্জন করে উঠল বেশ কয়েকটি বন্দুক—প্রায় একসঙ্গে।

অস্ত্রত একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

ভাদ্রের পাকাতালটির মতো বেষ্টা-বায়েনের মৃতদেহ ছুটে এল ধরিত্রীকে শেষ আলিঙ্গন করতে। আশ্চর্য! বাদক নিষ্পন্দ—অথচ তার শিঙার শব্দটা তখনো থামেনি। গাছ-গাছালিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে তার শিঙার প্রতিধ্বনি!

জান দিয়ে বেষ্টা-বায়েন কিন্তু একাই এই অসম যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। কারণ একযোগে অতগুলি গাদা বন্দুকের প্রতিঘাতে ভেলা দুটি আবার টলোমলো। দ্রুতহস্তে সৈনিকেরা বন্দুকের নলে বারুদ ঠেঁসছে। ভীমা বাগদি ফিরেও দেখল না বেষ্টা বায়েনের দিকে। পরমুহূর্তেই শুনিয়ে দিল সমরধ্বনি।

একঝাঁক তীর ছুটে গেল ভেলার দিকে।

দুটি ভেলায় মিলিয়ে জনা-সাতেক আহত। দু-একটি অশ্বও। তাদের সম্মান্যপিতে দুটি ভেলাই কাত হয়ে গেল। প্রাণধারণের তাড়নায় লাগাম ছাড়িয়ে আতঙ্কিত আহত অশ্বগুলি ঝাঁপ খেয়ে পড়ল জলে। তবু দু-এক জন বন্দুক হুঁড়ল। বেসামাল নৌকা তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল।

আবার এক ঝাঁক তাঁর ছুটে গেল ভেলা দুটোর দিকে।

ঘুরে পড়ল আরও দুজন। বাকিরা দিশেহারা। ঝপাঝপ তারা লাফিয়ে পড়ল জলে। অশ্বগুলি, যে কটি তখনও খাড়া ছিল, তারাও।

তিনচারটি মৃতদেহকে দেখা গেল—স্রোতের টানে ভেসে চলেছে তাঁটির দিকে। বাদবাকি সৈনিকেরা সাঁতার কেটে ফিরে যাচ্ছে ওপারে। অশ্বগুলি কিন্তু তাদের অনুসরণ করল না। প্রাণধারণের জৈবিক প্রবৃত্তি। এপার অনেক কাছে, ও পার বহুদূর। সব চেয়ে নিরাপদ স্থান ঐ পার'নি ঘাট—বাদ বাকি খাড়া পাড়। ঘোড়াগুলো একে একে উঠে এল পারানি ঘাটে। সেটা জনমানবহীন।

হাতিটা ?

সেটাও সাঁতার দিয়ে এসে উঠল এপারে। স্নানঘাটে। আর তার মাছত ? সেই সেনাপতি ? মাছতটার কী হয়েছে কেউ দেখেনি। বোধকরি সেও সাঁতরে চলে গেছে ওপারের নিরাপদ আশ্রয়ে।

তাহলে সেই গজারূঢ় বর্গী সেনানায়ক ?

ঈশান তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে বললে, —হু-ই দেখ কেনে ?

হ্যাঁ, এখনো দেখা যাচ্ছে। দামোদর তাকে নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। সেখানে একদিন ভোজ খাবে কামট-কুমির।

ভেলা দুটোও ভেসে চলেছে সেনানায়কের সাথে সাথে।

দুপারেই নেমে এল স্তব্ধতা। ঈশান এবার এগিয়ে এল। বলিষ্ঠ দুহাতে বেষ্টা বায়েনের মৃতদেহটা তুলে নিয়ে তাকে গালমন্দ করতে থাকে : তুর মাতা খারাপ হয়ি গেল কেনে বেষ্টাদা। কেনে বাজাই দিলি শিঙাটো ? বুকু কাঁহাকা !

সে-কথার জবাব দিতে দৈত্যের মতো মানুষটার গলা কেঁপে গেল। ভীমা বললে, গালি দিস না রে ঈশন ! বেষ্টা শিঙা বাজাই দিলেক তুদের জান দিতে ! নাইলে তুর-আমার লাশ পড়ি থাকত ইখানে !

মর্মান্তিক সত্য ! শিঙার শব্দে সে সব কয়টা বন্দুকধারীকে বিচলিত করেছে। লক্ষ্যমুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে তাদের !

বেষ্টা আজ শহীদ !

দুপারেই নেমে এল স্তব্ধতা। ওরা দ্বিতীয়বার আর এই দুরন্ত দামোদরকে অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখালো না—আর ভেলাই বা কোথায় ? সমস্ত দিন দু-পারে দুই দল নিশ্চূপ বসে রইল। কেউ নতুন চাল দিল না।

সন্ধ্যার ঝোঁকে দেখা গেল পূর্বদিক থেকে ধুলো উড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে একজনমাত্র ঘোড়সওয়ার। দামোদরের ওপার দিয়ে। সম্ভবত সংবাদবহ, মূল বাহিনীর বর্গী সর্দারের কোন জরুরী আদেশ জারী করতে হয়তো। ওপারে একটা চঞ্চলতা—ছোট ছোট দলে উপদলে কী-যেন শলা পরামর্শ হচ্ছে। তারপর ওরা সিদ্ধান্তে এল। অস্বাভাবিক করল সবাই। একটি হাতি, কিছু ঘোড়া আর কিছু সৈনিককে হারিয়ে তারা নৈতমস্তকে ফিরে গেল পূর্বমুখে—যে পথ বেয়ে তারা সগৌরবে এসেছিল সকালবেলা।

ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। আন্দাজে মনে হল, ওদের প্রত্যাবর্তনের নির্দেশই পাঠিয়েছেন মূল সেনাধ্যক্ষ—হয়তো স্বয়ং ভাস্কর-পণ্ডিত। ভীমা বাগদির চ্যালাচামুণ্ডার দল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সে কলরোল থামলে ভীমা বললে, শালাদের বিশ্বাস নাই রে, লখা। অখনই লাফাস না।

বাকিটা বলতে হল না। লক্ষ্মণ জবাবে বললে, হ, বোঝছি। দেইখ্যা আসি।

ঘোড়ায় উঠল সে। বর্গী-বাহিনীর সমান্তরালে সে এপাড়ের সড়ক ধরে পূর্বমুখে চলল—দেখে আসতে, ওরা সত্যিই ফিরে গেল, নাকি এ ওদের আর একটা চাল!

এক প্রহর রাতে সে ফিরে এসে জানালো, না ওরা সত্যিই ফিরে গেছে। তবু ভীমা রাতে নদীতীরে কিছু প্রহার ব্যবস্থা করল। তারপর তার নিজস্ব ডিউটি নৌকাটার বাঁধন খুলতে খুলতে ভাইপোকে বললে, ঈশেন, অরে নে আয়। ফুল্লরায় যাতি হবে। সে-আবাগী পথ চায়ি বসি আছে।

সে-আবাগী! যমুনা! বেটা বায়েনের ঘর-ওয়ালী। তিনটি সন্তানের জননী। ওরা থাকে ঐ ফুল্লরা গাঁয়ে। সাত-সকালে বহুছরকার দিনে দুটো পাশ্চা মুখে দিয়ে তার সেই মরদ শিঙা বগলে গ্রাম ছেড়ে এ-পারে এসেছে। তারপর সারাটা দিন বোধকরি হতভাগিনী ঘর-রার করেছে—মরদটা এখনো ফেরে না কেনে?

বেটাকে ওরা শুইয়ে দিল ভীমার ডিউটি নৌকায়। প্রহ্লাদ বায়েন—বায়েনপাড়ার মোড়ল—বসল তার মাথাটা কোলে নিয়ে। দশ-বিশটা মাঝি-মাল্লা শবানুগমন করল। সবার আগে বেটাকে নিয়ে যেতে হবে ফুল্লরা গাঁয়ে। যার ধন তার কাছে পৌছে দিতে।

রূপেন্দ্র নতমস্তকে ফিরে এলেন বাড়িতে।



পরদিন সকাল। মহাষষ্ঠী। বৎসরের একটি চিহ্নিত শুভদিন।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে ছিলেন তাঁর আরাম-কোদারায়। প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হয়েছে। পরনে পট্টবাস। উর্ধ্বাঙ্গে একটি উত্তরীয় শুধু। নিচে, পূজামণ্ডপে সকাল থেকে ঢাক বাজছে। মহাষষ্ঠীর পূজা একটু বেলায়।

ব্রজসুন্দরী প্রবেশ করলেন অন্দরমহল থেকে। পূজার নববস্ত্র তাঁর পরিধানে। লালপেড়ে তাঁতের কোরা শাড়ি, হাতে বাউটি পৈছে, মকরমুখী সোনার ভারী বালা, লোহার খাড়ু ও শাঁখা। কপালে গিনি-মাপের টিপ, সিঁথিতে পাকাচুলের ঘের-দেওয়া লাল-সিদুর।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অতি প্রত্যুবেই একটি বিচিত্র সংবাদ পেয়েছেন—অপ্রত্যাশিত সংবাদ। ঘুম ভাঙতেই তারাপ্রসন্ন সেটি জানিয়ে গেছে, বলেছে, সেই সংবাদবহ লোকটি সমস্ত রাত অস্বারোহণে ক্লান্ত। সে নিদ্রাগত। সকালে সে এসে বিস্তারিত জানাবে কিছু ছড়রকে। তবে সংক্ষিপ্তসার সে ইতিমধ্যেই নিবেদন করেছে তারাপ্রসন্নের কাছে। সেই বিচিত্র সংবাদের কথাই ভাবছিলেন বসে বসে।

ব্রজসুন্দরী সবার আগে সেই প্রশ্নটাই করলেন, ভোররাত্রে তারা এসে তোমাকে কী বলে গেল গো?

ব্রজেন্দ্র ফরসির নলটা সরিয়ে রেখে বললেন, বস। কথা আছে। ঐ মেয়েটি—কী যেন নাম?—ওর সম্বন্ধে কী করা যায় বল?

ব্রজসুন্দরীর বুঝতে অসুবিধা হল না। নাম না শুনেও। গতকাল হাঙ্গামা মিটে যাবার পর পুরুললনার দল যে-যার ভিটেয় ফিরে গেছে, শুধু ব্রজেন্দ্রনারায়ণের নির্দেশে কুসুমমঞ্জরী আর তার মাসিকে যেতে দেওয়া হয়নি। কর্তার যুক্তিটা অকাট্য। প্রেমদাস বাবাজীর ভাইপো হুমকি দিয়ে গেছে মহাষ্টমীর দিন সে সদলবলে আসবে গাঁয়ের মেয়েকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু লোকটাকে বিশ্বাস নেই—যে কোন সময়েই সে অতর্কিতে ঐ আরোগ্য-নিকেতনে হানা দিতে পারে। সেদিন যেমন দিয়েছিল। সেবারকার মতো ভীমা বা তার ভাইপো ঈশেন কাছাকাছি না থাকলে ওরা দ্বিতীয় হানায় ব্যর্থ নাও হতে পারে। তাই এই ব্যবস্থা। এসব কথা জানা ছিল ব্রজসুন্দরীর। বললেন, আমি কী বলব বল, এসব বিষয়ে? তুমিই নাকি কাটোয়া যাবার আগে তারাকে বলে গেছিলে, রূপনগরের মোহন্ত মহারাজকে এসময় বিরূপ করা ঠিক হবে না—

বাধা দিয়ে ব্রজেন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, তাই তখন বলেছিলাম। কিন্তু তারপর অনেক জল যে বয়ে গেছে দামোদর দিয়ে। বর্গীর হাঙ্গামা হলে রূপনগরের মোহন্ত মহারাজ শুধু নিজের এলাকাটাই রক্ষা করবেন, আর পাঁচটা গ্রামের কী হল তা ভ্রূক্ষেপ করেও দেখবেন না—এই নির্মম তথ্যটা বোঝা গেছে। তাছাড়া ঘটনাচক্রে ভীমা আর ঈশেন পরিস্থিতিটা আদ্যন্ত পালটে দিয়েছে—ঠিকই করেছে তারা। এখন ঐ অনাথা আশ্রিতাকে রক্ষা না করা যে আমার অধর্ম হবে, রানী।

রাঙিয়ে ওঠেন বৃদ্ধা। সন্ধানটায়। বিশেষ আনন্দঘন নৈশ মুহূর্তে ছাড়া এ-নামে ব্রজেন্দ্র তাঁকে সন্ধান করেন না। সামনে নিয়ে বলেন, তা যদি মনে কর, তাহলে ওকে রক্ষা কর, আশ্রয় দাও।

—তাই তো দিয়েছি। কিন্তু একটা খটকাও যে লেগে রয়েছে। ওকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্বটা আমার আছে, কিন্তু সামাজিক অধিকার তো নেই!

—সামাজিক অধিকার! তার মানে?

—সে একটি অনাথা কুমারী কন্যা। যদি বারেন্দ্রশ্রেণীর হত, তাহলে না হয় তারাপ্রসন্নকে বলতাম, আর একটি দারপরিগ্রহ করতে। কিন্তু ওরা রাষ্ট্র শ্রেণীর। মেয়েটি যদি এ গাঁয়ের বধু হয়ে যায়, শুধুমাত্র তখনই আমার সামাজিক অধিকার বর্তাবে। না হলে, তার সেই কাকা যদি স্বয়ং এসে দাবী করে তখন আমি তো তাকে ফেরাতে পারব না। আর তারপর যদি সে আবার হতভাগিনীকে ঐ প্রেমদাসের আখড়ায় পাঠায়...

ব্রজসুন্দরী যুক্তির সারবত্তা প্রশিধান করেন। বলেন, ওর সেই মাসি বললে, ওরা নৈকধ্য কুলীন, শাণ্ডিল্য গোত্র। এ গ্রামে তেমন পাত্র কি তুমি পাবে না?

—পাব। নন্দ চাটুজে আর দুর্গা গাঙ্গুলী দুজনেই সুপাত্র—কিন্তু তাঁরা কিস্তি সম্মত হবেন? দুজনের ঘরেই 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্য' মঞ্জুত।

ব্রজসুন্দরী রুখে ওঠেন, কেন? ঘাটের মড়া ছাড়া কি এ গাঁয়ে রাঢ়ী-শ্রেণীর কুলীন পার নেই? নন্দ ঠাকুরপোর বড় ছেলেটি তো এখনো বিয়ে করেনি।

—তা করেনি। পত্নী না থাক তার উপপত্নী একাধিক। ছেলেটি বিকৃতরুচির। নানা রকম নেশা-ভাঙ করে। রাতের পর রাত থাকে ঐ অন্ত্যজ পল্লীতে। তার চেয়ে নন্দ সুপাত্র। তবে সুপাত্র যে নেই, তা বলব না। আছে। কিন্তু তাকে কি রাজী করাতে পারবে?

এবারও বুঝে নিতে অসুবিধা হল না। হাসলেন ব্রজসুন্দরী। বলেন, হলে কিন্তু দুর্দান্ত মানাবে! তবে আমার মনে হয়, একবন্ধা রাজী হবে না।

—হবে না? বলছ?

—পারলে একমাত্র তুমিই পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই। দেখবে চেষ্টা করে?

—দেখব। তবে তার আগে জমিটা তুমি একটু তৈরী করে রেখ। শোন বলি—

বলা হল না। নিচে, পূজো-দালানে একটা শোরগোল। ঢাকের বাদিটা থেমে গেছে। অনেকে একসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কিছু আলোচনা করছে। ব্রজেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। খড়মজোড়া পায়ে দিয়ে বার হয়ে এলেন। দ্বিতলের টানা-বারান্দার রেলিংটা দু-হাতে চেপে ধরে ঝুঁকে পড়লেন নিচের দিকে।

ইতিমধ্যেই অনেকে এসেছেন ঠাকুর দেখতে। ছেলে বড়ো, অবগুষ্ঠনবতীও কিছু। সবারই সঙ্গে পূজোর নতুন পোশাক। নন্দ এসেছেন, দুর্গাচরণ, শিরোমণি-মশাই, বাচস্পতি, ঘোষপাড়ার অন্নদা ঘোষ, বিপিন দত্ত, রূপেন্দ্র আরও কে কে।

প্রহ্লাদ বায়েনের পিঠে ঢাক। বায়েনপাড়ার মোড়ল সে। বোধকরি এতক্ষণ বাজাছিল। তার ঢাকের বাদি সদ্য থেমেছে। আর 'পূজা-মণ্ডপের বাহিরে—সিং দরোজার এক পাশে স্নানমুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোর। তার পিঠে ঢাক, হাতে ঢাকের কাঠি। খালি গা, তাতে একটা কাচায় বাঁধা একটা চাবি। মহাগুরুনিপাতের চিহ্নিত সজ্জা। চিনতে অসুবিধা হল না—বেষ্টা বায়েনের বড় ছেলে নবা, বছর পনের বয়স। মুখটা শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটো রাঙা।

নন্দ চাটুজ্ঞে তাকে ধমকাচ্ছিলেন, এই জন্যেই তাদের ছোটলোক বলে, বুয়েহিস্! কোন আক্কেলে তুই ঢাক কাঁধে পূজোতলায় আসিস্? অশৌচ চলছে তোরা, মহাগুরুনিপাত! শুভকাজে কি এখন আসতে আছে? আর শুভ কাজ মানে কী? 'মায়ের পূজা! মা আমার দশভুজা!

নবা বায়েন সম্ভবত সারারাত দুচোখের পাতা এক করার সময় পায়নি। ছোট দুটি বোনকে, মাকে সামলাতে সামলাতেই রাতটা কোথা দিয়ে কেটে গেছে। ভোর বেলা মা অজ্ঞান-অচেতনের মতো শুয়ে পড়ার পর খুড়ির পরামর্শে ঢাক কাঁধে সে রওনা হয়েছিল। খুড়ি অর্থে প্রহ্লাদের বউ। পেছাদা আর বেষ্টা বছর বছর ঢাক বাজায়। মায়ের মণ্ডপে। খুড়ি বলেছিল, আমি অ্যাঁরে দেখছি, টুক বাজায়ে আয় বাপ—নয়তো খাজাঞ্চি-বাবু তোরে পাকবনি দিবেনি!

নন্দের দিকে ফিরে হাতদুটি জোড় করে নবা বায়েন কাতরকণ্ঠে বললে, ঠিগাছে ঠাউরি! মুই ভিথরি যাবনি। এই বাহিরে ডাঁড়িয়ে বাজাব অনে।

—আবার মুখে মুখে তক্কো? কথা বললে শুনিস না কেন? অশৌচের মধ্যে মায়ের পূজায় ঢাক বাজাতে নেই। শান্তরে বারণ—

—না বাজালি খাজাঞ্চিবাবু পাকবনি দেবে না যে! বছরে তো দু-বার মাস্তর পাই।

তা বটে। শারদীয়া দুর্গোৎসবে আর গাজনের মেলায় প্রহ্লাদ আর বেষ্ঠা জুড়ি বেঁধে ঢাক বাজাতে আসে। বাৎসরিক পার্বণী বাঁধা—একখানি খুতি, একটি লালপাড় শাড়ি, একটি গামছা। এছাড়া পাঁচ কুনকে চাল, তেল-সিদুর, পাঁচটা পান সুপারি আর পাঁচ-কপদক নগদ। বারেন-বিদায়। এ ওদের বংশগত বৃত্তি—বংশানুক্রমিক অধিকার। কিশোরটির আশঙ্কা পূজো-মণ্ডপে গড়হাজির থাকলে, বাপের বদলে বেটা অনুপস্থিত হলে, সেই বংশানুক্রমিক অধিকারটা খোয়া যাবে।

নন্দ গর্জে ওঠেন, ছোটলোক একেই বলে! বাপটা দাঁত ছিরকুটে পড়ে আছে, তার মুখে এখনো আশুন ছোঁয়াসনি—সেসব দিকে খেয়াল নেই, শুধু আদায়-পত্রটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর!

রূপেন্দ্র দাঁড়িয়েছিলেন। বুঝে উঠতে পারেন-না—কেন নন্দ-খুড়ো এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারছেন না। কী চরম দরিস্ত ওরা! কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে সদ্য-পিড়হারা এভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। বলেন, তুই বাড়ি যা, নবা। আমি কথা দিচ্ছি—ব্যবস্থা করে দেব—তোকে বাৎসরিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

ছেলেটি মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, দিবে না ঠাউর। খাজাঞ্চিবাবু বুলবে—তু তো বাজাস নাই! হঠাৎ যেন দৈববাণী হয়। সবাই উর্ধ্বমুখ হয়ে গেল।

দ্বিতলের বায়ান্দা থেকে ঝুঁকে ব্রজেন্দ্র বললেন, তোর পার্বণীটা পরে নিয়ে যাস। তবে কাপড়ের ঝুটুলিটা এখনই নিয়ে যা নবা। কোরা কাপড় তোর এখনি লাগবে।

নবা উর্ধ্বমুখে তাকিয়ে হঠাৎ ঝরঝরিয়ে কঁদে ফেলল। উদ্দেশ্যে গড় হয়ে পেন্নাম করল জমিদারমশাইকে।

ব্রজেন্দ্রর নির্দেশে খাজাঞ্চিবাবু তখনই ঝুটুলিটা বার করে আনলেন। স্পর্শ বাঁচিয়ে ঐ কিশোরটির প্রসারিত হস্তে ফেলে দিলেন।

প্রত্যেকের নাম-লেখা কাপড়ের বাণ্ডিল প্রতিমার পিছনে থাক দিয়ে রাখা থাকে—পুরোহিত, তত্ত্বধারক, কুমোর, মালাকার, ঢাকি, কাঁসি, সানাই—মায় একটি ঝুটুলিতে শুধু ঢেড়া-চিহ্ন। খাজাঞ্চিবাবু জানেন, সেটা কাকে পৌছে দিতে হবে। সেই পাপীয়সীর নামটা লিখতে নেই—কিন্তু তার জন্যেও বরাদ্দ করা আছে এই সামাজিক মর্যাদা। যার দ্বারপ্রান্ত থেকে কুমোরভায়া সংগ্রহ করে এনেছিল মূর্তি গড়ার মৃত্তিকা। প্রতিমা গড়ার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে।

ঝুটুলিটায় মুখ চেপে কঁদতে কঁদতে পূজো-মণ্ডপ ত্যাগ করে গেল নবা। কাঁধে ঢাক, গলায় কাচা, হ্যাঁ সত্যি কথাই বলেছিলেন নন্দ-ঠাউর। বাপের সংকার হয়নি এখনো।

অপরাত্নে সাড়ম্বরে তাকে দাহ করা হবে সোএগাইয়ের শ্মশানঘাটে।

বারেনের আবার দাহকার্য!

কপালে একটা টিপ দিবি, ব্রহ্মতালুতে এক ঘটি গঙ্গাজল, মুখে নুড়ো ছুঁইয়ে ত্যানায় জড়াবি। তারপর ঠেলে দিবি দামোদরের দিকে। ব্যস! বাকি দায়দায়িত্ব কামঠ, কুমির আর বোয়ালের। এই তো হল অন্তজ্য পরিবারের চিরাচরিত সংস্কারের আয়োজন। তা নয়। চিতা ছেলে

বায়েনের দেহ দাহ করা! কী ভাগ্য করেই জন্মেছিল বেটা! জমিদারবাবু তার জন্য বরাদ্দ করেছেন—শুধু চিতার কাঠ নয়, চন্দন কাঠ! গব্য হৃত। হেসে বাঁচি না! কী? না, বেটা বায়েন শহীদ!

তেলাপোকাকর পাখা আছে? বল কী! তবে তো তার জন্যে খাঁচা বানাতে হয়! পাখি হয়ে গেল যে সে! বেটা বায়েন শিঙে ফুঁকছে। বল কী? তাহলে তার জন্যে....

যতসব আধিক্যেতা!



সেদিন অপরাহ্নবেলা।

রাপেশ্রনাথ অশ্বপৃষ্ঠে ফিরে আসছিলেন তিজলহাটি থেকে। তিন ক্রোশ দূরের গ্রাম। তিজলহাটির পাঁচকড়ি ঘোষালের জোয়ান ছেলটাকে সাপে কামড়েছে শুনে তড়িঘড়ি ছুটে গিয়েছিলেন ভিন গায়ে। ভাগ্য ভাল—সাপটি বিষাক্ত ছিল বটে, কিন্তু জুং করে কামড়াতে পারেনি। বিষ ঢালতে পারেনি ঠিক মতো। তাছাড়া স্থানীয় গুণিন গুঁর নির্দেশ মোতাবেক বাঁধনটা দিয়েছিল ভালই। নির্দেশ উনি আজ দেননি। দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে।

এ অঞ্চলে সাপের উপদ্রব খুব বেশি। গোখরো, কেউটে, লাউডগা, খরিশ—নানান জাতের। প্রতি মাসেই এক-আধটা সর্পদংশনের রোগী জোটে। রাপেশ্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থানীয় ওঝা-গুণিনদের শিখিয়ে দিয়ে আসেন 'টুর্নিকেট' বাঁধার কায়দাটা। ওঝাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে বলতেন, শোন বাবা, তোরা ঝাড়ফুঁক করিস, মা-মনসাকে স্তবস্তুতি করিস, ভাল কথা। তাতে আমি বাধা দিচ্ছি না। কিন্তু এই বাঁধনটা দিতে ভুলিস না।

সাপের বিষ কী-ভাবে শিরা-ধমনীর পথ বেয়ে আক্রান্তের মৃত্যু ঘটায়—কোথায় বাঁধন দিতে হবে, কতটা জোরে বাঁধতে হবে, কতক্ষণ পর-পর বাঁধন একটু আলগা করে আক্রান্ত প্রত্যঙ্গে রক্তসঞ্চালন সচল রাখতে হবে, সব শিখিয়ে দিতেন। ওদের রুজি-রোজগারে হাত পড়ছে না দেখে অনেকেই ধ্বস্তুরি বাবামশায়ের নির্দেশটা মেনে চলত।

দু-একটি ক্ষেত্রে এক আসুরিক পদ্ধতিতে তাঁকে সর্পদংশনের চিকিৎসাও করতে দেখেছে ওরা। দংশনের অনতিবিলম্বে উপস্থিত হতে পারলে তিনি অকুতোভয়ে দংশিত ক্ষতচিহ্নে মুখ লাগিয়ে বিষাক্ত রক্তটা শুষে নিতেন—থু-থু করে ফেলে মুখটা ধুয়ে ফেলতেন। তাজ্জব হয়ে যেত সবাই। উনি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতেন—এ কোন অলৌকিক ক্ষমতা নয়, সাপের বিষ যতই মারাত্মক হোক না কেন, রক্তের সঙ্গে না মিশলে, শুধু মুখে টেনে নিলে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই যদি না মুখে কোনো ক্ষত থাকে।

ওরা বিশ্বাস করত না। হাসত। বলত, জানি, জানি, ঠাউর! তুমি কবুল খাবে না। মা মনসা স্বয়ং এসে তোমাকে মন্ত্র দে গেছে।

পাঁচকড়ি ঘোষালের সম্ভানটির জীবন রক্ষা পাওয়ায় মনটা খুশি। ঘোষাল মশাই সম্পন্ন গৃহস্থ। পঞ্চাশ বিঘে আউসের জমি আছে, তিন জোড়া হেলে-বলদ। পাঁচটি ব্রজতখণ্ড গুঁর চরণমূলে নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, খোকার জীবনের দামের তুলনায় এঁ কিছই নয়, কিন্তু আপনার আরোগ্য নিকেতনে একটি ঘর তুলে দেবার মতো অর্থিক সঙ্গতি আমার নেই

কোবরেজ-মশাই! এই কয়টি মুদ্রা প্রত্যাখ্যান করলে খুবই মনঃকষ্ট হবে আমার।

রূপেন্দ্র ইস্তিতা বুঝতে পারেন। বলেন, না ঘোষাল-মশাই। সে বাতিক আর নেই আমার। এখন যে যা দেয় আমি গ্রহণ করি।

পাঁচটি টাকা উঠিয়ে নেন। সত্যিই খ্রীত হলেন ঘোষাল। বলেন, আপনি বাঁচালেন আমাকে।
—বাতিকটা কীভাবে, কার নির্দেশ ত্যাগ করলাম জানেন? একমুঠি-বাবার কথায়।

ভিন গায়ের মানুষ হলেও ঘোষাল-মশাই চিনতে পারেন। বলেন, কী রকম? যদি আপত্তি না থাকে তো শুনি।

—না, বাধা আর কিসের, শুনুন।

একমুঠি-বাবা সোণাই গায়ের এক পাগলা সাধক। তাঁর বয়সের কোন গাছ-পাথর নেই। পাগলামোরও। সন্ন্যাসী মানুষ। শিক্ষাজীবী। তবে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি বড় বিচিত্র। দৈনিক তিনি একজনের কাছে থেকে মাত্র একমুঠি শিক্ষা নিয়ে থাকেন। পাঁচবাড়ি প্রত্যাখ্যান হলে ষষ্ঠ গৃহস্থের দ্বারে হানা দিতে সঙ্কোচ করেন না; কিন্তু প্রথম গৃহস্থ যদি মুষ্টিভিক্ষা দেয়, তাহলে সেদিন আর দ্বিতীয় বাড়িতে যান না। তাঁর বিশ্বাস দিনান্তে এক মুঠিতেই তাঁর অধিকার। প্রথম গৃহস্থ এক মুঠি শিক্ষা দিলে মনে করেন—দিনটি সার্থক! কারণ সেদিন ভজন-পূজনের সময়টা বেশি পাওয়া যায়।

সেই একমুঠি-বাবা পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছেন। খবর পেয়ে রূপেন্দ্র গিয়েছিলেন চিকিৎসা করতে। ঔষধ আর মালিস দিয়ে নিদান হাঁকেন, সাতদিন তাঁকে শুয়ে থাকতে হবে। হাঁটা-চলা বারণ।

সন্ন্যাসী রুখে ওঠেন, বহু কৈসে হোগা? মুখে ভিক্ষু তো মাংসা চাহিয়ে!

রূপেন্দ্র বলেছিলেন, না! সাত দিনের সাতমুঠি শিক্ষা আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি না হয়।

তাতেও রাজী নন—বহু কৈসে হোগা?

সাতদিনের শিক্ষা তিনি একদিনে কেমন করে নেবেন? তা হয় না! রূপেন্দ্র রুখে ওঠেন, আপনি তো আচ্ছা একবঙ্গী মানুষ।

হা-হা করে ঠারে ঠারে হেসেছিলেন সন্ন্যাসী। তুলসীদাসজী না কবীর কার যেন একটা দোঁহা আবৃত্তি করে শোনান। যার নিগলিতার্থ: 'জীব মাগ্রেই দর্পণ! সর্বজীবে সে নিজের প্রতিবিম্বই দেখতে পায়। সাধু দেখে সবার মধ্যেই আছেন শিউজী, পাণ্ডী দেখে সবার মধ্যেই আছে নরক!'

অর্থাৎ একবঙ্গীরই শুধু অধিকার অপরের মধ্যে ঐ একবঙ্গীমি দেখতে পাওয়া।

বুঝিয়ে বলেন, কেন তিনি ঐ বিচিত্র পদ্ধতিতে শিক্ষা করেন। নিজের জন্য নয়, যে শিক্ষা দিচ্ছে, তার স্বার্থে। লোকহিতার্থে। বারেবারে ভিন্ন ভিন্ন গৃহস্থকে হাত উবুড় করা শেখাতে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, তাহলে শুধু একমুঠি কেন? একজনই যদি পাঁচমুঠি দিতে চায় তাহলে তা নেন না কেন?

—কেমন করে নেব? শিউজী আমার জন্য সিরেফ এক মুঠি বরাদ্দ করেছেন যে। তবে শুধু চাউলই নয়। বিশুওয়াস না হলে তুই একমুঠি মোহর দিয়ে দেখ! আমি নিয়ে নেব। একটা ভাঙিয়ে একমুঠো চাউল খরিদ করব। বাকিটা আবার দান করে দেব। কোঁড়া কি মুখে তো কল ফিন নিকালনা চাহিয়ে না?

জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল রূপেন্দ্রের। তাই তো! অর্থাভাবে তাঁর নানান পরিকল্পনা আটকে আছে। বাগদি পাড়ায় তিনটি পুষ্করিণীর মধ্যে একটিকে সংরক্ষিত করতে চান—ওরা রাজীও হয়েছে—কিন্তু সেটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরতে হবে, টেকিকল আর বালতি বানাতে হবে। তিনি তো একই পদ্ধতিতে তাঁর সম্মানদক্ষিণ গ্রহণ করতে পারেন! ধনী গৃহস্থ যদি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ কিছু বেশী দিতে চায়, তাহলে নেবেন না কেন? তাঁর সংসারের প্রয়োজনের জন্য 'একমুঠি' সরিয়ে রেখে বাকিটা সংকাজে ব্যয় করতে পারবেন। কৌণ্ড-কি কল্ তো ফিন নিকালনা চাহিয়ে না?

—তিজলহাটি থেকে সোণাই ঘন্টাখানেকের অশ্বপথ। গ্রামটা ছাড়িয়েই একটা বন। বন নয়, আগাছার জঙ্গল। পতিত জমি। সেটা পার হলেই পৌছাবেন দামোদরের তীরে। বাকি পথ দামোদরের বাঁধ বরাবর। অপরাহ্ন বেলায় বার হয়েছিলেন। সম্ভার পূর্বেই তাঁকে সোণাই পৌছতে হবে। সূর্যাস্তের আগেই বেটা বায়েনের চিতায় আগুন দেওয়া হবে। ঐ সময় উপস্থিত থাকা চাই।

শরৎকালের পল্লীদৃশ্য। বাঁ-দিকে দিগন্তবিস্তৃত আউসের ক্ষেত—এখন নাড়া-মুড়ো ভরা। ফসল সব উঠেছে মড়াইয়ে। তিৎপল্লার হলুদ রঙের ফুলে-ফুলে বনলক্ষ্মীর আঁচলে হাজারবুটির নকশা। স্বর্ণলতা কণ্ঠবেষ্টন করে ধরেছে বাবলা গাছটার। তালগাছের মাথায় বাবুইয়ের বাসা ঝুলছে। বনপথটা পাড়ি দিয়ে এবার এসে পৌছালেন দামোদরের কিনারে।

ঐ সেই বটগাছটা।

যাতায়াতের পথে এখানে এলে তিনি কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ান। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ঐ বিশাল বটগাছটার দিকে। অতি বিশাল, বয়ঃবৃদ্ধ। দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে যেন মিলনপ্রয়াসী মহাপাদপ সবাইকে কাছে ডাকছে। অযুত-নিযুত ঝুড়ি নেমেছে তা থেকে। কত বিচিত্র পাখি যে বাসা বেঁধেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এমনকি যাযাবর পাখিরাও ঐ গাছের আকাশছোঁয়া ডালে দু-দণ্ড আশ্রয় নিয়ে যায়—সিল্লি, বেলে হাঁস, মরাল, শামকূট, সারস।

রূপেন্দ্র ঐ জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপাদপের মধ্যে যেন একটি রূপককে খুঁজে পান।

ও যেন এই সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতীক।

ও কিছু চায় না, শুধু উন্মুখ, উদার আশ্রয়ে সে দুইহাতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয়। রৌদ্রতাপদঙ্ককে ছায়া।

বাল্যকালে, মনে আছে—বাবামশায়ের হাত ধরে একবার তিজলহাটিতে যেতে হয়েছিল—কী-যেন সামাজিক নিমন্ত্রণরক্ষা করতে। তখন প্রথম ঐ মহাপাদপকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম সাক্ষাৎ। দিগন্তচুম্বী মাঠের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একান্তচারী—যেন কোন মনিষ্যি ধ্যান করছেন! নদী কিনার থেকে বহুদূরে, নির্জনে। তার ডালে ডালে-টিল বাঁধা। নিচে তেল-সিঁদুর মাখানো একটি লৌকিক দেবতা—ষষ্ঠী ঠাকরণ। সন্তানহীনার দল মানত করে ওর ডালে টিল বেঁধে দিয়ে যায়। এই দশ বছরে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে কী-জানি কেন সম্মাসী পায়ে পায়ে নদীর দিকে সরে এসেছেন। এখন তিনি দামোদরের কিনার সই-সই। না—মহীক্লহ এগিয়ে আসেনি। স্থির, স্থবির তন্মিষ্ঠায় আত্মসমাহিত ঋষি বাম্বীকির মতো ধ্যানমগ্ন। বরং ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে হত্যা করতে দামোদর ব্যাধই নষ্টতে নাচতে গুঁর কাছে এগিয়ে

আসছে। তার শুধু ভাঙার মন্ত্র। প্রতি ভাদ্রেই দশ-বিশ হাত পাড় ভেঙে সে এগিয়ে আসছে ঐ ধ্যানস্তিমিত সন্ন্যাসীর কাছে। লঘুচিন্ত, প্রগল্ভ, অন্ধ কুসংস্কারের ফেনিল আবর্তে সে খলখল করে হাসছে! সে কেন এই অবক্ষয়ী হিন্দুসমাজের প্রতীক!

হয়তো আগামী বর্ষাতেই শেষ হয়ে যাবে মহাপাদপের যুগযুগান্তরের সাধনা! মুখ থুবড়ে পড়বে ঐ ফেনিল আবর্তে!

আজ ঠুঁর হাতে সময় নেই। বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তিনি ঘোড়া ছুঁয়ে দিলেন বাঁধ বরাবর। ফুল্লরা গায়ের কাছাকাছি আসতেই কানে গেল একটি দূরগত আহ্বান: ঠা-উর-মশাই!

অশ্বের গতিবেগ রুদ্ধ করলেন। কে ডাকে?

নজর হল মাঝ-দরিয়ায় ভাসছে একটি জেলে ডিঙি। তিনচারজন পারানি-যাত্রী। তাদেরই একজন ডাকে তাকে।

একটু পরে নৌকাটা তীরে এসে ভিড়ল। ছুটতে ছুটতে ঠুঁর কাছে এগিয়ে এল প্রহ্লাদ বায়েন। বলে, পেন্নাম ঠাউরমশাই। আপনারে পিছু ডাকলম। কী করি? এই হতচ্ছাড়া কে টুক বুঝিয়ে দেন কেনে! ও মুয়ে আগুন না দিলি বেঁটার যে গতি নাই!

নজর হল দুজন শক্ত করে ধরে রেখেছে কিশোর বিদ্রোহীর দুটি হাত! তার পরনে একটা খেটো কোরা ধুতি। খালি গা। গলায় সেই সুতোটা—নবা বায়েন।

—কী হয়েছে? নবা বাপের মুখাঙ্গি করবে না বলছে?

—ঈ কর্তা! অরে টুক বুঝিয়ে দেন কেনে!

কী বিড়ম্বনা। নবা বায়েন সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলেছে, সে বাপের মুখাঙ্গি করবে না। কিছুতেই না।

রাপেন্দ্র ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। লাগামটা ধরতে দিলেন প্রহ্লাদকে। তাঁর ইস্তিতে দুজন জোয়ান, যারা ওকে ধরে রেখেছিল তারা সরে দাঁড়ালো। রাপেন্দ্র দুই হাতে ধরলেন ওর বাহুমূল। সম্মুখে বললেন, কী পাগলামি শুরু করেছিস নবা! এ যে ছেলের কর্তব্য। তুই বাপের বড় ছেলে! তুই না করলে কে করবে বল? আয় বাবা, আর মাথা গরম করিস না!

নবা কুঞ্জে গুঠে, উয়ারা মায়েরে বিষ দিলেক কেনে?

—বিষ! কী বলছিস! কে দিয়েছে? তোর মাকে?

—শুধাও কেনে ও-দিগে!

পীতম বায়েন করজোড়ে বললে, না ঠাউর, বিষ লয়। টুক ধুতরা, না ভাঙ কী-যেন উয়ারা খাওয়াই দিলেক!

—ধুতরা, না ভাঙ! যমুনাকে? কেন?

ওরা যে ব্যাখ্যাটা সবিনয়ে দাখিল করে তাতে বজ্রাহত হয়ে গেলেন। এটাই যে প্রকৃত সম্পূর্ণ সজ্ঞানে কি কেউ জ্বলন্ত চিতায় উঠতে পারে? সতী হতে পারে?

সতী? যমুনা সহমরণে যাচ্ছে! কেন? কে এ বিধান দিল! যমুনা রাজি হয়েছে? হতেই পারে না। যমুনা তো জানে! যে গোপন তথ্যটা তিনি নিতান্ত ঘটনাচক্রে জানিতে পেরেছেন তা তো যমুনারও জানা! যমুনার জোড়ে একটি দেড় বছরের শিশুকন্যা এবং সে আবার মা হতে

চোদ্দাই

ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। আন্দাজে মনে হল, ওদের প্রত্যাবর্তনের নির্দেশই পাঠিয়েছেন মূল সেনাধ্যক্ষ—হয়তো স্বয়ং ভাস্কর-পণ্ডিত। ভীমা বাগদির চ্যালাচামুণ্ডার দল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। সে কলরোল থামলে ভীমা বললে, শালাদের বিশ্বাস নাই রে, লখা। অখনই লাফাস না।

বাকিটা বলতে হল না। লক্ষ্মণ জবাবে বললে, হ, বোঝছি। দেইখ্যা আসি।

যোড়ায় উঠল সে। বর্গী-বাহিনীর সমান্তরালে সে এপাড়ের সড়ক ধরে পূবমুখে চলল—দেখে আসতে, ওরা সতিই ফিরে গেল, নাকি এ ওদের আর একটা চাল!

এক প্রহর রাতে সে ফিরে এসে জানালো, না ওরা সতিই ফিরে গেছে। তবু ভীমা রাগে নদীতীরে কিছু প্রহরার ব্যবস্থা করল। তারপর তার নিজস্ব ডিঙি নৌকাটার বাঁধন খুলতে খুলতে ভাইপোকে বললে, ঈশেন, অরে নে আয়। ফুল্লরায় যাতি হবে। সে-আবাগী পথ চায়ি বসি আছে।

সে-আবাগী। যমুনা! বেটা বায়েনের ঘর-ওয়ালী। তিনটি সন্তানের জননী। ওরা থাকে ঐ ফুল্লরা গাঁয়ে। সাত-সকালে বহুহরকার দিনে দুটো পান্ডা মুখে দিয়ে তার সেই মরদ শিঙা বগলে গ্রাম ছেড়ে এ-পারে এসেছে। তারপর সারাটা দিন বোধকরি হতভাগিনী ঘর-বার করেছে—মরদটা এখনো ফেরে না কেনে?

বেটাকে ওরা শুইয়ে দিল ভীমার ডিঙি নৌকায়। প্রহ্লাদ বায়েন—বায়েনপাড়ার মোড়ল—বসল তার মাথাটা কোলে নিয়ে। দশ-বিশটা মাঝি-মাল্লা শবানুগমন করল। সবার আগে বেটাকে নিয়ে যেতে হবে ফুল্লরা গাঁয়ে। যার ধন তার কাছে পৌছে দিতে।

রূপেন্দ্র নতমস্তকে ফিরে এলেন বাড়িতে।



পরদিন সকাল। মহাষষ্ঠী। বৎসরের একটি চিহ্নিত শুভদিন।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে ছিলেন তাঁর আরাম-কেন্দারায়। প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হয়েছে। পরনে পটবাস। উর্ধ্বাঙ্গে একটি উত্তরীয় শুধু। নিচে, পূজামণ্ডপে সকাল থেকে ঢাক বাজছে। মহাষষ্ঠীর পূজা একটু বেলায়।

ব্রজসুন্দরী প্রবেশ করলেন অন্দরমহল থেকে। পূজার নববস্ত্র তাঁর পরিধানে। লালপেড়ে তাঁতের কোরা শাড়ি, হাতে বাউটি পৈছে, মকরমুখী সোনার ভারী বালা, লোহার খাড়া ও শাঁখা। কপালে গিনি-মাপের টিপ, সিঁথিতে পাকাচুলের ঘের-দেওয়া লাল-সিঁদুর।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অতি প্রত্যাশেই একটি বিচিত্র সংবাদ পেয়েছেন—অপ্রত্যাশিত সুখবর। ঘুম ভাঙতেই তারাপ্রসন্ন সোটি জানিয়ে গেছে, বলেছে, সেই সংবাদবহ লোকটি সমস্ত রাত অশ্রোহরণে ক্রান্ত। সে নিদ্রাগত। সকালে সে এসে বিস্তারিত জানাবার বড় হুজুরকে। তবে সংক্ষিপ্তসার সে ইতিমধ্যেই নিবেদন করেছে তারাপ্রসন্নের কাছে। সেই বিচিত্র সংবাদের কথাই ভাবছিলেন বসে বসে।

ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে বলেছিল, ‘মড়ার কি জাত থাকে রে?’

বেচারি ইন্দ্রনাথ : দুর্জয় সাহস আর বুকভরা ভালবাসা নিয়ে সে এই বাড়লা দেশে জন্মেছিল শ’দেড়েক বছর পরে। সে আমলে এলে দেখত : মড়ার জাত থাকবে না প্লকী অসৈরন অশাস্ত্রীয় কতা গো।

শ্মশানঘাটের তিন-দিকে তিনটি চিহ্নিত স্থান। এ-প্রান্তে বামুনদের চিতা—তবে কুলীন-শ্রোত্রিয়-কাপ ছাই হয় একই চিতায়। ও-পাশে কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপ জাতীয় জলচল জাতের। তৃতীয় একটি ছোট্ট এলাকা জল-অচলদের।

ছোট্ট—কারণ চিতায় ওঠার সৌভাগ্য সচরাচর অস্বাভাবিক পরিবারভুক্তদের হয় না। তাদের গতি দামোদর। তবে তাদের মধ্যেও কচিং কখনো কেউ চিতায় চড়ে—যৌবনবতী চণ্ডাল-কন্যাকেও কখনো কখনো পুড়তে দেখা গেছে, বাবুদের খরচে। নেহাৎ কোনও সদ্য মৃতের সহধর্মিণী সহমরণে যেতে স্বীকৃত হলে তখন তাকে দাহ করার আয়োজনও হয়। এমনকি সে-ক্ষেত্রে সেই অচ্ছুৎ সতীকে সতীমন্দিরে প্রবেশ পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়। জল-অচল জাত বলে সমাজ আপত্তি করে না। বুঝে দেখ তোমরা—হিন্দু সমাজ কত উদার! সতীর মাহাত্ম্য যদি লাভ করতে স্বীকৃত হও তাহলে তোমার জন্মদোষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে।

সতীমন্দির একটি পাকা কোঠা। শ্মশানপ্রান্তে। সতীমায়ের একটা মূর্তি আছে, মূর্তি ঠিক নয়, তেল-সিদুরে রান্ধা একটি প্রস্তরখণ্ড। চিতায় ওঠার আগে সতী-মা তাতে তেল-সিদুরের প্রলেপ দিয়ে যান। এ কক্ষটি সতীর শেষ বিশ্রামস্থল। স্নানান্তে এখানেই তাকে একবস্ত্রা করা হয়। চিতায় উঠতে হবে লালপাড় কোরা শাড়ি পরে। দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড থাকবে না গায়ে। হাতে লোহার খাড়ু, আর শাখা। স্বর্ণলঙ্কারগুলি খুলে রাখা হয়। কপালে কনে-চন্দন, ব্রহ্মতালুটা সিদুরে মাখামাখি। গলায় গোড়ে-মালা। পায়ে আলতা। পায়ের পাতার কিনারা ঘেঁষে, নয়, পায়ের পাতা দুটিও বারে বারে অলঙ্করণাগরঞ্জিত। পাঁচ বাড়ির এয়ো আলতাছাপ সংগ্রহ করে নিয়ে যায় যে। লৌকিক কানুনে এ গৃহভাস্তরে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সতী-মন্দিরে যখন সদ্যোবিধবাকে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি সজ্জানে থাকেন না। থাকেন একটা ঘোরের মধ্যে। তার পূর্বেই তাকে নানান জাতের ‘মন্ত্রঃপূত পবিত্র পানীয়ে’ তৈরী করে দেওয়া হয়।

ওঁরা যখন অকুস্থলে পৌঁছালেন তখন শ্মশান-ঘাটে তিলধারণের ঠাই নেই। বেঁটা বায়েনের স্নান সারা। কোরা কাপড় পরে চিতায় শুয়ে আছে সে। যমুনারও স্নানপর্ব সমাপ্ত। এমনকি তাকে লালপাড় নতুন কাপড়খানা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছন্নের মতো সে ভূশ্যালীন।

চিতা এতক্ষণ জ্বলে ওঠার কথা।

শিরোমণি মশাই পঞ্জিকা ঘেঁটে বলে রেখেছেন, বেলা চার ঘটিকা বত্রিশ মিনিট গতে শুভ লগ্ন—সূর্যাস্ত-তক। তার পরেই ত্রিপাদ-দোষ বর্তাবে। শুভকার্য এখনো সম্পন্ন হয়নি, মোহেতু মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্রটি ছিল না-পাত্তা। নবা বায়েনকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই একটা সোরগোল উঠল : ঐ তো! ঐ তো!.....

দু-একজন ছুটে এসে পাকড়াও করল তাকে।

রাপেল্ল যোড়া থেকে নেমে পড়েন। জীবন দত্ত এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগামটা ধরল। তার

অপর হাতে কবিরাজ মশায়ের সেই ঔষধপত্রের পুলিন্দা। রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, যমুনা কোথায়?

—সতীমন্দিরে। জ্ঞান নেই তার।

—জ্ঞান নেই? কী হয়েছে তার?

—ওরা কী যেন খাইয়ে দিয়েছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা বার হচ্ছে।

—নাড়ি দেখেছিলে?

—ওরা আমাকে ঢুকতেই দেয়নি।

রূপেন্দ্র ওর হাত থেকে ঔষধের পুলিন্দাটা নিলেন। গটগট করে এগিয়ে গেলেন সতীমন্দিরের দিকে। তিন চারটি সোপান পেরিয়ে মন্দিরের পোতায় পৌঁছাতে সবাই দেখতে পেল তাঁকে। মেয়েরা সসঙ্কোচে সরে দাঁড়ায়।

ভিড়ের ভিতর থেকে শিরোমণি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, ওটা কী হচ্ছে?

রূপেন্দ্র ঘুরে দাঁড়ালেন, আমাকে বলছেন?

—আবার কাকে? তোমার এতটা বয়স হল তবু জ্ঞান না—সতী-মন্দিরে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই! ওটা অন্দরমহল?

রূপেন্দ্রের চোখ দুটি জ্বলে উঠল। কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে উত্তাপ সঞ্চারিত হল না। প্রশ্ন করলেন, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলুন তো?

শিরোমণি অপমানিত বোধ করলেন। বলেন, ঔদ্ধত্যের একটা সীমা থাকা উচিত রূপেন্দ্রনাথ। এটা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই—এ হচ্ছে লৌকিক আচার!

—তাহলে শাস্ত্রীয় বিধানটা আমার কাছে শুনে নিন, শিরোমণি কাকা! শাস্ত্রে এ বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ আছে!

—কোন শাস্ত্র?

—অথর্ববেদ। যার একটি বেদান্ত হচ্ছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র। তাতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে: কোন আর্ত রোগিণী যদি অন্দরমহলে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে একমাত্র ভেষগাচার্যের অধিকার আছে দ্বিতীয়া মহিলার উপস্থিতিতে সেখানে প্রবেশ করার। সতী-মায়ের মন্দিরে আমার অনেক মা এখন আছেন।

শিরোমণি একটি জুংসই জবাব দেবার আগেই তিনি প্রবেশ করলেন সতীমন্দিরে।

যমুনা চিৎ হয়ে পড়ে আছে ভূশযায়। জ্ঞানহীনা। তার মুখ দিয়ে গাঁজলা বার হচ্ছে। একটি প্রৌঢ়া মহিলা—চিনতে পারলেন না উনি, প্রহ্লাদের বউ—মুঁছিতার মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছেন। যমুনা একবজ্রা।

সে যে গর্ভিণী তা বোঝা যায় না। মাতৃত্ব লক্ষণ তার মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠেনি এখনো; কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গে তা পরিস্ফুট। তার বুকের কাপড় সরানো। একটি শিশু তার উপর উপড় হয়ে পড়ে আছে। অচেতন্য মাতার অমৃতভাণ্ড থেকে অমৃতরস আহরণ করছে। ভেষগাচার্যকে দেখে প্রৌঢ়া তার বুকের উপর আঁচলটা টেনে দিলেন।

রূপেন্দ্র ওর মণিবন্ধে নাড়ির গতি লক্ষ্য করলেন। একটি ঔষধ নিয়ে প্রৌঢ়াকেই বললেন অধরোষ্ঠ উন্মুক্ত করে দিতে। পাঁচফোঁটা ঔষুধ দিলেন তার মুখ-বিবরে। তারপর বার হয়ে এলেন।

ভিড়ের পিছন থেকে তারা প্রসন্ন বলেন, কেমন আছে?

মন্দির-পোতায় দাঁড়িয়ে রূপেন্দ্র বললেন, না, মারাত্মক কিছু না। এখনি জ্ঞান হবে। দুর্গাচরণ বলেন, হলেই ভাল। অজ্ঞান অবস্থায় সতীকে চিতায় তুলতে নেই। শাস্ত্রে মানা। রূপেন্দ্র জানতে চাইলেন না: কোন শাস্ত্র।

শিরোমণি বলেন, কিন্তু সময় তো খুব বেশী নাই। সূর্যাস্তের পূর্বে চিতা প্রজ্জ্বলিত না হলে ত্রিপাদ দোষ বর্তাবে।

রূপেন্দ্র স্পষ্টাঙ্কুরে বলেন, তাহলে আর দেরি করবেন না শিরোমণি কাকা। এখনই দাহকার্য শুরু করে দিন।

—কিন্তু যমুনা....?

—না! যমুনা সহমরণে যাবে না।

প্রথমটা সকলে একটু হকচকিয়ে যায়। রূপেন্দ্র তখনো মন্দিরপোতার উপরে দাঁড়িয়ে। সবাই তাঁকে দেখতে পাচ্ছে, শুনেও পাচ্ছে তাঁর কথা।

নন্দ চাটুজ্জ্বল বলেন, বটে! তা বিধানটি কোন পণ্ডিত দিচ্ছেন? তুমি? তোমার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে লেখা আছে বুঝি?

রূপেন্দ্র তাঁর দিকে ফিরে বললেন, না খুড়ো। আয়ুর্বেদশাস্ত্র নয়। নারদীয় পুরাণের দ্বিতীয়খণ্ডে মহামুনি নারদ বলেছেন, স্বামীর মৃত্যু সময়ে জননীর ক্রোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকলে অথবা সে গর্ভবতী হয়ে থাকলে কোন সদ্য-বিগতভর্তা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পারে না।

শিরোমণি বলেন, এমন আজব কথা তো কখনো শুনিনি।

রূপেন্দ্র বলেন, আমার সংকলনেই নারদীয় পুরাণের পুঁথি আছে। আমি এখনি এনে দেখাচ্ছি।

বাচস্পতি বলেন, দেখাতে হবে না। আমরা জানি। ঋষি বৃহস্পতি নারদোক্ত ঐ সূত্রটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন—যদি অন্য কোনও রমণী ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করে সে-ক্ষেত্রে সেই শিশুর জননী সহমরণে যেতে পারে। তুমি যদি চাও, তাহলে সেই নির্দেশটি আমিও দেখাতে পারি। পুঁথিটি আমার সংকলনে আছে। তবে দেবনাগরী হরফে। পড়তে পারবে তো, বাবা?

শিরোমণি এই মুখের মতো জবাবটি শুনে নিজের নাসারন্ধ্রে একটুপ নস্য চালিয়ে দিলেন।

রূপেন্দ্র এ ব্যঙ্গোক্তিতে অক্ষিপণ্ড করলেন না। বললেন, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। বাচস্পতি-কাকা। আমি যমুনার দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রসঙ্গ আদৌ তুলিনি।

—তা হলে?

—হেতুটা এই: যমুনা গর্ভবতী! তার জঠরে অজাত সন্তান। বৃহস্পতি ঋষিও কিন্তু গর্ভবতী মণীকে সহমরণে যেতে নিষেধ করেছেন। তাই না? আপনার সংকলনেই তো পুঁথিটা আছে।

এ এক নতুন ফ্যাকড়া! নন্দ বলেন, একথা কে বলেছে?

—ঐ যে বললাম—নারদীয় পুরাণ এবং বৃহস্পতির টিকা-টিপ্পনি।

—আহা! তা বলছি না। যমুনা যে পোয়াতি সে কথা কে বলেছে?

সোপ্তাই

—আমি শ্রীরাপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা। এ-কথা ঘটনাচক্রে আমি জানি, যেহেতু বেটা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার স্ত্রীকে দেখাতে। জনতো বেটা, আর জানে যমুনা নিজে।

নন্দ এবার কথো ওঠেন, তাহলে কিছুই প্রমাণ হয় না। তুমি ওকে ঠাচাতে চাইছ—যা মন চায় তাই বলছ। যমুনা তো সজ্ঞানে ওকথা বলবেই—সত্য হোক, মিথ্যা হোক!

রাপেন্দ্রের চোখ দুটি জ্বলে উঠল। বলেন, আপনি আমাকে সর্বসমক্ষে মিথ্যাবাদী বললেন; কিন্তু বলুন তো নন্দ খুড়ো—এতে আপনার কী স্বার্থ? একটা নৃশংস দৃশ্য দেখার জন্য আপনারই বা এত আগ্রহ কিসের?

নন্দ গর্জে উঠেন, মুখ সামলে কথা বল রূপেন।

দুর্গা গাঙ্গুলী এগিয়ে আসেন এবার। বলেন, আহহা! তুমি মেজাজ খারাপ করছ কেন চাটুজ্জভায়া? কাপেন্দ্র তো কালকের ছেলে। ও কী জানে এই সনাতন ধর্মের মহিমা? আর ওর একবার কতায় তো কিছু হবে না! বেটা বায়েনের ঝাঁড় সতী হতে চায়, সমাজের কাছে অনুমতি চেয়েছে। সমাজ অনুমতি দিয়েছে, বিধান দিয়েছে। আমার মতো ক্ষুদ্র মনিষ্যের কতা না হয় ছেড়েই দাও, তুমি শিরোমণি-মশাই, বাচস্পতি-মশাই, তর্কালঙ্কার-ডায়া, স্বয়ং ভাদুড়ীমশাই...

রাপেন্দ্র চমকে ওঠেন, ভাদুড়ীমশাই! জেঠামশাই অনুমতি দিয়েছেন! অসম্ভব! তিনি তো চিরকাল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। তাঁর পরিবারে...

—সে তাঁর নিজের পরিবারে। যমুনার বেলা তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

ভিড়ের পিছন থেকে তারাপ্রসন্ন বলে ওঠেন, না! ভুল বলছেন গাঙ্গুলীকাকা, বাবামশায়ের এতে ঘোরতর আপত্তি। তিনি বেটার শ্মশান-বন্ধু হতে স্বয়ং আসছিলেন, কিন্তু তার স্ত্রী সহমরণে যাচ্ছে শুনে ফিরে গেছেন। তাঁর সম্মতি নিশ্চয় নেই।

দুর্গাচরণ কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন, ও-কথা বললে শুনব কেন বাবা তারাপ্রসন্ন? যমুনা এখন যে লালপাড় কোরা শাড়িখানা পরে আছে, সেটা সে পেল কোথায়? নবাকেই শুধিয়ে দেখ না একবার?

নবা বিহুলের মতো এদিকে ওদিকে তাকায়। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না।

দুর্গা হেসে বলেন, আমি যে তখন স্বয়ং উপস্থিত। রাপেন্দ্র এখন শাস্তর আওড়াচ্ছে, কিন্তু সেও স্বচক্ষে দেখেছে! ভাদুড়ীমশাই ঐ নবার হাতে লালপাড় শাড়িখানা দিয়ে বললেন, তোর মাকে পরতে দিস্। ঐ তো নবা দাঁড়িয়ে আছে। ওকেই জিজ্ঞেস কর তোমরা।

নন্দ উত্তেজনার বশে স্পর্শদোষের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলেন। খপ করে চেপে ধরলেন কিশোরটির বাহুবল। গর্জে ওঠেন, কী রে হতভাগা? বামুনের ঠেংগে মিছে কথা বললে জিব খসে যাবে! বল হারামজাদা—ঐ লালপাড় শাড়িখানা তোরে কে দিয়েল?

নবা ঝরঝরিয়ে কঁদে ফেলে। এই স্বীকৃতির মধ্যে কী আছে তা না বুঝেই।

তারাপ্রসন্ন ততক্ষণে ভিড় থেকে এগিয়ে এসেছেন। রোরুদ্রমান কিশোরটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, ওকে দিয়ে কবুল করাতে হবে না নন্দকাকা। তখন আমিও সেখানে ছিলাম।

শুনুন—বায়েন-বিদায়ের গুটিলিটা অনেক আগেই বেঁধে চালচিত্রের পিছনে রাখা হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন—তাই থাকে। বেটা তখনো বেঁচে। না হলে সদ্যোবিধবাকে বাবামশাই অহেতুক কেন ঐ লালপাড় শাড়িখানা দেবেন বলুন?

—অহেতুক নয়, তারা। তার একটিমাত্র হেতু! তোমার বাবা আমাদের মতো অর্বাচীন নন। তিনি পাকামাথার মানুষ। সদ্যোবিধবাকে লালপাড় শাড়ি দান করার অর্থ একটিই—তিনি তির্যক-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন তাঁর সম্মতি! সহমরণে যাবার নির্দেশ! একথা যদি মেনে না-নাও তারা প্রসন্ন, তাহলে তার পরিণাম যে সামাজিক!

রাগেন্দ্র বুঝতে পারেন—দুর্গাচরণ কোন দিকে চলেছেন! বিরুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসতে থাকেন তিনি।

নন্দ ঐ শেষ শব্দটার প্রতিধ্বনি করলেন মাত্র: সামাজিক?

—নয়? এ যে যারপরনাই সামাজিক অপরাধ! বিধবাকে লালপেড়ে শাড়ি দান করা! বাচস্পতি-মশাইকে জিজ্ঞেস কর, তর্কালঙ্কার-ভাষা জানে! প্রতিটি সমাজপতির পদস্পর্শ করে অপরাধীকে ক্ষমা চাইতে হয়! না, না—সে কিছুতেই হতে পারে না। ভাদুড়ী মশাই বয়েজ্যেষ্ঠ। মনী লোক! তাছাড়া অপরাধ তো তিনি কিছু করেননি যে প্রাচিতির করতে হবে! তারা ছেলেমানুষ—ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারেনি, এই যা?

নন্দ উচ্ছ্বসিত! এতো দারুণ একটা ফন্দি বার করেছে দুর্গাদা! দাবা ধরে ঘোড়ার কিস্তি! বাহারে বাহা! তিনি তারা প্রসন্নের দিকে ফিরে বলেন, তুমি কী বলছ তারা? ভাদুড়ীমশাই বেষ্টির ঝাড়কে সহমরণে যাবার অনুমতি দেননি? সেজন্যই ফিরে গেছেন? তাই বলছ এখনো?

দুর্গা গাঙ্গুলী ধুরন্ধর—জানেন, লেবু কতটুকু কচলাতে হয়। দুর্গা ধমক দেন নন্দকে, তুমি থামতো নন্দভায়া! তিনি কীজন্যে ফিরে গেছেন, তা কি বোঝ না? তাঁর মনটা নরম। এই পুণ্যকর্মটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার মতো মনের জোর নেই। তা তো আমারও থাকে না। বুকের মধ্যে হু-হু করে জ্বলতে থাকে! কিন্তু কী করব? সইতে হয়! সামাজিক দায়!

শিরোমণি বলেন, মোটামোট কী সিদ্ধান্ত হল তাইলে?

দুর্গা নিদেন হাঁকেন, ঐ তো বললাম! বেষ্টির ঝাড় সহমরণে যাবার অনুমতি চেয়েছে। সমাজ তা অনুমোদন করেছে। মায় স্বয়ং ভূখানী সমাজের তরফ থেকে তাকে সহমরণের বস্ত্রখণ্ডটি দান করেছেন! এখন শুভস্যা শীঘ্রম! মেয়েটি গর্ভবতী বলে রূপেন একটা আঘাতে আপত্তি তুলেছিল—পঞ্চজন সেটাও বিচার করে দেখেছেন। তার কোন প্রমাণ নেই, সাক্ষী নেই—

কোথাও কিছু নেই ইঠাৎ মন্দির-পোতা থেকে শোনা গেল প্রতিবাদ: না! আছে!

সকলেই সেদিকে ফেরে। কণ্ঠস্বর মহিলার। কাংসবিদ্বিন্দিত। সবাই দেখতে পায় সতী-মন্দিরের পোতায় দাঁড়িয়ে আছেন জগু-ঠাকুরণ। মাথায় আধ-ঘোমটা। সকলে সেদিকে ফিরলে জগুঠাকুরণ বলে ওঠেন, এর কথাটুকু শুনে আপনারা শেষ রায় দিন!

শিরোমণি বলেন ‘এর কথা’ মানে?

—এই যে আমাদের রেসো!

দেখা গেল, জগু-ঠাকুরণের পাজর ঘেঁষে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছে এক অবগুণ্ঠনবতী! ঘোমটা এতবড় যে, মুখখানা দেখা যাচ্ছে না।

নন্দ বলেন, রেসো! রেসো! কে?

দুর্গাচরণ কিন্তু চিনতে পেরেছেন। ঐ মেয়েটি রেসো-দাই—রাসমণি। সোএয়াই গায়ের একমাত্র ধাত্রী। দিনসাতক আগেও সে মৃন্ময়ীকে দেখে এসেছে। জাতি বিচক্ষণ ধাত্রী। ধন্যস্তরি

সোণার

পারেনি, কিন্তু সে মাগী মৃন্ময়ীর পেটে কান পেতে শুনে ঠুকে বলে দিয়েছে—ছেলেই আছে মৃন্ময়ীর গর্ভে, মেয়ে নয়। মৃন্ময়ী সহমরণ দেখতে আসেনি। পোয়াতি মেয়েদের দেখতে নেই। শাস্তরে মানা।

দুর্গা তাড়াতাড়ি বলেন, হচ্ছে সমাজের বিচার, তার ভিত্তি রাসু-দাই আবার কী বলবে? জগু রাসমণিকে একটা খোঁচা মেরে বলেন, বল না মুখপুড়ি! আ-হাহ! তোর সরম দেখে বাঁচি না!

রাসমণি আরও কঁকড়ে যায়। লজ্জায় নয়, ভয়ে। সোনার নাকছাবি খোয়াবার ভয়ে। গাঙ্গুলীমশাই যে তাকে খুশি হয়ে বলেছেন—সত্যিই যদি নিরাপদে ওর পেট থেকে ছেলে বার করতে পারিস....

রাসমণি বুঝে নিয়েছে, গোপন কথাটা বেমকা জগু-ঠাকুরকণকে বলে ফেলা বোকামি হয়ে গেছে তার। গাঙ্গুলীমশাই চটে যাবেন! গেল—নাকছাবিটে!

কিন্তু জগুঠাকুরকণ নাছোড়বান্দা। হাজার হোক একবন্ধার পিসি তো তিনি! তাই উচ্চকণ্ঠে বাত্ময় করে তোলেন রাসুর অনুস্ত এজাহারটা: রেসো বলছে, কতটা সেও জানে—সেও অবাগীটারে দেকেছে। রূপো ভুল বলেনি কিছু! ই্যা, যমুনা তিনমাসের পোয়াতি!

শিরোমণির মেজাজ তিরিষ্কি হয়ে ওঠে। শুভকার্যে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি হলে কারই বা মাথার ঠিক থাকে। খিচিয়ে ওঠেন, ন্যাও ঠেলা! চোরের সাক্ষী এবার গাঁটকাটা!

একটা থমথমে ভাব। সুযোগ বুঝে যুক্তকরে এগিয়ে আসে পেলাদ বায়েন। সর্বিনয়ে বলে, পঞ্চজনা উপস্থিত আছেন। তাইলে এই অধমের কতটুকুও নিবেদন করতি দেন আপনকার ছিচরণে—

গর্জে ওঠেন নন্দ। প্রহ্লাদ তাঁর খাতক। বলেন, তুই চুপ-যা, হারামজাদা! এবার কি বায়েন-পোর কাছে শাস্তর-ব্যাখ্যা শুনতে হবে নাকি?

প্রহ্লাদ সভয়ে একপা পিছিয়ে যায়। তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, শ্রাবণ-কিস্তির সুদটা এখনো দেওয়া হয়নি। কিন্তু পিছন থেকেও হড়ো ঝেতে হল তাকে। কে যেন বজ্রমুষ্টিতে ওর গর্দানা পাকড়ে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। পিছন ফিরে দেখে, ভীমা। প্রহ্লাদ হকচকিয়ে যায়—পিছুনি ভেড়োর ভেড়ো, এগুলি নিকবংশর বেটা!

ভীমা ওকে ঠেলে সরিয়ে নিজেই এগিয়ে এল। বললে, আজ্ঞে ই্যা, ঠাউর! শাস্তর ব্যাক্ষা টুক ঐ বায়েন-পোর কাছ থিকেই শুনতে হবে।

ভীমা বাগদিকে ধমকে থামানো যায় না—তা হোক না কেন সে জল-অচল।

নন্দ ঢোক গিলে বলেন, মানে?

ভীমা এবার শঙ্করভাষ্য দাখিল করে: শোনে! পেলাদ হতিছে বায়েনপাড়ার মাতকবর! যারে পোড়ায় মারতি চান সেই অবাগী বামুন-কায়েত লয়, বায়েন! হক কতা কি না? তা, কুন বায়েন-মাগী সতী হবে-কি-হবেনি সি-কতাটো বলার হক আছে পেলাদের। বল রে, পেলাদ! তুর যা প্রাণ চায় তুই পঞ্চজনার ছিচরণে নিভায়ে নিবেদন কর! মুই হেথা ঝাড়িয়ে আছি।

ভয়ে-কি-নির্ভয়ে বোঝা গেল না, কিন্তু প্রহ্লাদ যেন মরিয়া হয়ে এবার এক-দামোদর কথা হড়বড়িয়ে বলে গেল: ব্যাবারডা হতিছে অ্যাই—মোরা তো জানতম না যে, যমনীর প্যাটে

বাচ্চা আছে? যমুনী রাজি হয়েল, হক কতা, ল্যাঘ্য কতা! কিন্তুক বাচ্ছাডা? সে বেটা তো বেষ্টার রাঁড় লয়! তাইলে? সে ক্যান পুড়ি মরবে! কতাটো বুঝায়ে দ্যান, আঞ্জে। শাস্তরে কী বলিচে?

নীরঞ্জন অন্ধকারে এবার আশার আলোক দেখতে পেলেন রূপেন্দ্র! বলে ওঠেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ প্রহ্লাদ! বায়েন-পাড়ারি মোড়লের মতো কথাটা বলেছ! শাস্তর যমুনাকে এ ক্ষেত্রে সতী হতে মানা করছে!

ভীমা বলে ওঠে, ব্যাস্ ব্যাস্! একবন্না ঠাউর বিধান দি-দিল! আর কুন কতা লয়! আয় রে লবা, বাপের মুখে নুড়োডা জ্বালি দে যা! আপনেও আসেন শিরোমণি ঠাউর। কীসব অং বং মস্তুর আছে পড়ায়ে দে যান! যমুনা সতী হবেক নাই!

যেন মুর্শিদাবাদী নবাবী ফতোয়া নয়, খাশ দিল্লীর বাদশাহী ফরমান!

শিরোমণি ইতস্তত করেন।

দুর্গা একবার শেষ চেষ্টা করেন: কাজটা ভাল করলি না ভীমা! চিতাশ্রু হলো তার কী দুর্গতি হয় জানিস?

ঈশেন ভুল বুঝল। উনি যে পারলৌকিক দুর্গতির কথা বলতে চাইছেন তা ওর মোটা মাথায় ঢোকেনি। পরলোক-ফরলোক ও বেটা বোঝে না—ছেটলোক তো?—চেনে শুধু ইহলোকের লেনদেনটুকু। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, কারে দুর্গ্যতির ভয় দেখাইছেন ঠাউর? খুড়োরে? বলি, করবেনডা কী! তীটে-মাটির খনে উজ্জিদ? করেন, তাই করেন! খুড়ো-ভাইপো ফিরে-ফিতি ছাকাতে হই যাব নে? ভুখা মরব না! দুজনে বলে, আপনার সিদ্ধকে নাকি রূপার ট্যাং নাই—বেবাক মোহর! তা চান তো আপনার ভিটে থিকেই 'লতুন-খেল'-এর বউনিটা শুরু করব আনে!...আয় রে লবা!

দুর্গাচরণের হাত-পা পেটের ভিতর সঁদিয়ে যাবার উপক্রম! এদিকে বগীর হাক্কা, ওদিকে নবাবের নতুন 'আবওয়াব', তদুপরি মহাষ্টমীতে নাকি মোহাম্মদ-মহারাজের ফৌজ আসবে! তার উপর এই সর্বের মধ্যে যদি ভূতের কেমন শুরু হয়ে যায়, তাহলে তাঁর মতো সম্পন্ন গৃহস্থ দাঁড়ায় কোথায়?

ভিড়টা ততক্ষণে পাতলা হয়ে যেতে শুরু করেছে। সবাই বুকে নিয়েছে ভাঙ-ধুতুরা খাইয়েও মেয়েটিকে কন্ডা করা গেল না।

রূপেন্দ্র খুশিয়াল! মহাযশ্ঠীর দিনটি সার্থক। ধর্মরক্ষা করা গেছে। প্রহ্লাদ, ভীমা, ঈশেন সবাই যদি ঠেকে সাহায্য না করত, কুখে না দাঁড়াতো—

হঠাৎ যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন অলক্ষ্যলোক থেকে একটা প্রতিবাদ: ইটা কি বুলছেন ঠাউর! গোটা গাঁয়ের মহড়া নিল তো ঐ পুঁচকেটা! বোয়েচেন না?

বেষ্টা বায়েনের কণ্ঠস্বর! রূপেন্দ্র মনে মনে প্রতিপ্রসন্ন করেন, কার কথা বলছ বেষ্টা? —যমুনীর প্যাটে আমার বাচ্ছাডা! বেটা না জমেই শিঙে ফুকি দিল! বোয়েচেন না?

সোফাই

মহাসপ্তমী। পরদিন। রূপেন্দ্র একা বসে আছেন তাঁর দাওয়ায়। ভোরবেলাতেই পিসি আর কাতু চলে গেছে পূজাবাড়িতে। সেখানে কত কাজ! পাঁচ-বাড়ির মেয়েরাই তা করে হাতে হাতে।

দাওয়ায় বসে রূপেন্দ্র গত দুদিনের কথাই চিন্তা করছিলেন। কী ঘটনাবল্হল দুটি দিন! পঞ্চমীতে হল বর্গীর আক্রমণ—গাঁয়ের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ—একটি প্রাণ। আর গতকাল লড়াই করতে হল গ্রাম্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—এবার রক্ষা পেল একটি প্রাণ। না, একটি নয়, দুটি! লাভক্ষতির হিসাব নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত।

নজর পড়ল সামনের আরোগ্যশালার নবনির্মিত কুটিরগুলির দিকে। তিনখানি ঘরই ফাঁকা। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে জেঠামশাই কুসুমমঞ্জরীকে অপসারিত করেছেন তাঁর প্রাসাদে। তার সেই মাসিটিও গেছে। সেদিকে নজর পড়তেই মনে পড়ে গেল—‘ছোট হুজুর’ হুমকি দিয়ে গেছে, মহাষ্টমীতে সে ফিরে আসবে। এবার সৈন্য। বন্দুকধারী। বলে গেছে, এবার তার সঙ্গে থাকবে হাতি আর কামান। সাবধানবাণী শুনিয়ে গেছে: সোফাই গ্রামে সে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে চায় না—যদি না ঐ গৌয়ারগুলো তাদের তীরধনুক নিয়ে কেরামতি দেখাতে আসে! কথটা নিয়ে ভীমা বা ঈশেনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। সত্যি যদি মোহন্ত মহারাজ এ জাতীয় ব্যবস্থা নিতে চায়, তাহলে কী হবে তাঁদের রণকৌশল? জেঠামশাই অবশ্য বলেছেন, মোহন্ত-মহারাজের এ জাতীয় দুর্মতি হবে না। যতক্ষণ না ভাস্কর পণ্ডিত তার ‘চাল’ দিচ্ছে ততক্ষণ মোহন্তের ‘দান’ নেই। তাকে অপেক্ষা করতে হবে। সমঝে নিতে হবে, ভাস্কর পণ্ডিত কোন দিকে যায়—বর্ধমান না মুর্শিদাবাদ। যে পথেই যাক বর্গীদের পথেই পড়বে রূপনগর। দাঁইহাট থেকে মুর্শিদাবাদ যেতে হলে ভাস্করের গতিমুখ উত্তরে। বর্ধমান আসতে হলে তার গতিমুখ দক্ষিণ-পশ্চিমে, মঙ্গলকোট ভাটার হয়ে। কিন্তু দুটি পথই কাটোয়াকে ছুঁয়ে—কেতুগ্রাম মৌজায়। সেই যেখানে অজয় নদ বিলীন হয়েছে ভাগীরথীতে। আর কাটোয়া থেকে রূপনগর তো আধ বেলার অশ্বপথ! সুতরাং ভাস্কর পণ্ডিত-এর পরবর্তী পদক্ষেপের সঙ্গে মোহন্ত-মহারাজের আচরণ সম্পৃক্ত।

নবাব আলিবর্দী গলদঘর্ম। বয়স সত্তর ছুঁই-ছুঁই। বিহারের সহকারী সুবেদার আলিবর্দী যেদিন তাঁর আজিমাবাদ (পাটনা) প্রাসাদ ত্যাগ করে রাজমহলের পথে রওনা হয়েছিলেন সরফরাজ খাঁর হাত থেকে নবাবী ছিনিয়ে নিতে, সেদিন থেকেই তাঁর আর স্বস্তি নেই। গিরিয়া প্রান্তরে মুখোমুখি হয়েছিল দুই ভাগ্যাস্থেবী—একদিকে বিহারের সহকারী সুবেদার আলিবর্দী, অপরদিকে সুবে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দণ্ডমুন্সেব কর্তা সরফরাজ খাঁ। বোচারি সরফরাজ—সুজাউদ্দীনের অযোগ্য পুত্র—সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ ছেঁড়বার সৌভাগ্যও হল না তার। গভীর রাতে স্মৃতিহীন আক্রমণে নিহত হল সরফরাজ। আলিবর্দী সগৌরবে এসে পৌছাল মুর্শিদাবাদে। ‘চিহ্ন সাতুনে’ সাড়ম্বরে সুবেদার হয়ে বসল।

কিন্তু সেদিন থেকেই নবাবী কর্তার খেসারত দিতে শুরু করল সুবেদার। দিল্লীর অপদেব-বাদশাহ্ মহম্মদ শাহকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে সংগ্রহ করতে হল বাদশাহী ফরমান। তারপর সরফরাজের অনুতপ্ত পরিবারবর্গকে দিতে হল যথেষ্ট অর্থ-উপঢৌকন।

করায়ত্ত করতে। আলিবর্দীও মুর্শিদকুলীর্ মতো একপাক্ষিক—সংযমী পুরুষ। তাঁর তিন কন্যা—পুত্রসন্তান নাই। তিন কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি মহম্মদের তিন পুত্রের। বড় জামাই ঘসেটি বেগমের স্বামী হ'ল ঢাকার, মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ হল উড়িষ্যার আর কনিষ্ঠ জামাতা সিরাজদ্দৌলার পিতা জৈনউদ্দীন হল বিহারের শাসনকর্তা। তিন জামাইকে তিন খুঁটি বানিয়ে চুটিয়ে শুরু করলেন নবাবী।

শুরুতেই বিপত্তি। মধ্যম জামাতা বাবাজীবন গদি লাভ করেই শুরু করে দিল নানান জাতের অত্যাচার। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিদ্রোহ করল। জামাতা বাবাজীবন কটকে কারারুদ্ধ হল অচিরে।

দুঃসংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ আলিবর্দীকে দৌড়াতে হল কলিঙ্গ দেশে। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা ও দামাদকে কারামুক্ত করে তিনি ফিরে আসছিলেন মুর্শিদাবাদে। পথে, বালেশ্বরে পৌঁছে পেলেন অন্য এক দুঃসংবাদ। মারাঠা বর্গীর দল আবার ফিরে এসেছে। পূর্ববৎসর দাঁইহাটিতে যে কাফেরটাকে অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত করেছিলেন, সেই ভাস্কর পণ্ডিতই প্রত্যাবর্তন করেছে—লুটতরাজ শুরু করেছে ভাগীরথীর পশ্চিম পারের নানান গ্রামে।

আলিবর্দী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছেন মুর্শিদাবাদের দিকে।

যে মহাসপ্তমীর ঘাটে আমাদের কাহিনীর নৌকা এখন নোঙর গেড়েছে তখনো আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ পৌঁছাতে পারেননি।

—সোনাদা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে উঠে বসেন। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, সম্বোধনটিও যে একান্ত চিহ্নিত। নজর হল—মুক্তদ্বার পথে একটি অপূর্ব নারী মূর্তি। পরিধানে আকাশী-নীল মুর্শিদাবাদী, হৃদয়ে সিন্দূর বিন্দু, চরণপ্রান্তে অলঙ্কার-রেখা, চূড়ো করে বাঁধা খোঁপায় একটি বেলফুলের মালা, চোখে কঙ্কল!

বলেন, মীনু! তুমি! এমন অসময়ে? কার সঙ্গে এসেছ?

মুম্বয়ী হাসল। দেখা গেল তার সঙ্গে আছে একটি বালক। তাকে দেখিয়ে বললে, এই নিতুর সঙ্গে। নিতাই। আমার দেওর-পো। ভিতরে আসব?

মনে পড়ে গেল কবির বর্ণনা!

“আদ্রাচন্দন কুচার্চিত সূত্রহারঃ

সীমন্তচুর্নিসিচয় শৃটবাহুমূলঃ।

দূর্বাগ্রকাণ্ড কটিবাস্তুগুরুপভোগাদ্

গৌড়াসনাসু চিরমেঘ চকান্ত বেঘঃ।”^১

—কী দেখছেন এমন করে?

—কিছু নয়। মানে, কাহু তো বাড়িতে নেই। পিসিমাও নেই।

—জানি। আমি পূজাবাড়ি থেকে আসছি। তাঁদের সেখানে দেখে এলাম যে। তাই টুক করে পালিয়ে এসেছি। ভাবলাম, এখন এলে নির্জনে আপনার দেখা পাব!

^১“বন্ধে আদ্র-চন্দন, কাণ্ডে সূত্রহার, সীমন্ত পর্যন্ত অদ্যন্ত অবগুঠন, অনাবৃত বাহুমূল, বরজাগ্রে অগুরু প্রসাধনের সৌরভ, দেহ-বর্ণ যেন নবদূর্বাদলের মতো শ্যাম—ইহাই গৌড়দেশবাসিনীর সজ্জা।”

‘নির্জনে দেখা পাব!’—রূপেন্দ্রনাথ ঘামতে শুরু করেন। মৃন্ময়ী সেটা লক্ষ্য করল। আবার হেসে বলে, আমি বাঘ না ভালুক? অনেকটা হেঁটে এসেছি। একটু বসব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বসবে বইকি! বস।—নিজের উঠে দাঁড়ান চোঁকি ছেড়ে।

মৃন্ময়ী চৌকির তলা থেকে একটা কুশাসন টেনে নিয়ে বসে। মাটিতেই। বলে, না, না, আপনি উঠে দাঁড়ালেন কেন? আমি ‘একাসনে’ বসার কথা বলিনি, সোনাদা!

রূপেন্দ্র বুঝে উঠতে পারেন না, সেই লাজুক মেয়েটি হঠাৎ কী করে আজ এমন প্রগল্ভ হয়ে উঠেছে। পুনরায় উপবেশন করতে করতে বলেন, তুমি আমাকে ‘সোনাদা’ ডেক না!

—মৃন্ময়ী সাত-সকালেই পান খেয়েছে। ঠোঁট দুটি রাঙা। সেই রাঙা ঠোঁটে ফুটে উঠল বিচিত্র হাসির আলিঙ্গন। বললে, নিতু সোনা-রূপার ফারাক বোঝে না! জানে না, কোনটা বেশি দামী। আমার মতই বোকা! সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয়!

—নিতুর কথা বলছি না। কেঁ কোথা থেকে শুনে ভুল বুঝবে।

—নিতু ছাড়া ঘরে তো শুধু আপনি! আপনি তো কখনো ভুল করেন না, ভুল বোঝেন না! তা বেশ! সাবেক নামে যদি না ডাকি, তাহলে নতুন কী নামে ডাকব, মৌর?

এতক্ষণে বুঝতে পারেন—কেন আজ মৃন্ময়ী এত প্রগল্ভ। কাতুর কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছে। অনেক মুখরোচক কেছা শুনেছে। নিজের মতো তার অর্থ বানিয়ে নিয়ে এসেছে তাঁকে খোঁচা দিতে। প্রসঙ্গটা বদলে তাই বলেন, তুমি কি বিশেষ কোন কথা বলতে এসেছ আমাকে?

—হ্যাঁ! একটা কথা জানতে এসেছি। আর সেই জন্যই এই নির্জন সাক্ষাৎ। বিশ্বাস করুন আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। বলুন তো—কেন আপনি এভাবে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছেন?

—শত্রুতা করছি! আমি? তোমার সঙ্গে? মানে? কে বললে?

—কে আবার বলবে? আমি তো নিজের কানেই শুনলাম সেদিন। আপনি আপনার পূজ্যপাদ খুড়ো-মশাইকে বললেন না—রাতারাতি দশ-বিশটা খুড়িমা ঘরে আনতে?

রূপেন্দ্র একটু অবাক হয়ে যান। মেয়েটি কী চায়? এমন গায়ে-পড়ে বগড়া করতে এসেছে কেন? বলেন, বলেছি। কিন্তু কী কথার জবাবে, কেন বলেছি, তাও তো তুমি জান মৃন্ময়ী। এবং একথাও জান যে, আমার সে তিরস্কার শুনে গাঙ্গুলীখুড়ো তখনই এককুড়ি টোপর কিনতে ছোটেননি।

—কিন্তু একটা টোপর যে তিনি কিনতে ছুটেছেন তা কি আপনি জানেন না?

এবার রীতিমতো অবাক হয়ে যান। এসব কী বলছে ও! দুর্গা গাঙ্গুলী কি সত্যিই বিবাহ করতে চাইছেন! এই বয়সে? চতুর্থা পত্নী যখন আসন্নপ্রসবা? না কি এটাও ঐ মৃন্ময়ীর মনগড়া একটা আশঙ্কা। বলেন, বিশ্বাস কর মৃন্ময়ী—আমি কিছুই জানি না। তুমি কী বলছ, তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। দুর্গাখুড়ো কি সত্যিই আবার বিবাহ করার কথা ভাবছেন? পাত্রী কোথায়?

মৃন্ময়ী এতক্ষণে অধোবদন হল। প্রগল্ভতা ত্যাগ করে এক নিশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে গেল:

জেঠামশাই, অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ নাকি বলেছেন—রূপনগরের ঐ মেয়েটির দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না, যদি না সে এই সোণ্ডাই গাঁয়ের কুলবধু হয়। তা তিনি সত্যিই পারেন না। তার সেই কাকামশাই যদি রূপনগর থেকে ফিরে এসে ভাইঝিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করার তাঁর না আছে নৈতিক অধিকার না সামাজিক। অথচ মেয়েটি তার কাকার কাছে ফিরে যেতে চায় না। জানে, তার অর্থ আবার ঐ পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া। ভাদুড়ীমশাই তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই রূপনগরী ‘রাইরানী’কে অবিলম্বে সোণ্ডাই গাঁয়ের বধূতে রূপান্তরিত করতে হবে। রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন সুপাত্র চাই—যে বিনাপণে ঐ অন্নাত্মকে পায়ের ঠাই দেবে! মৃন্ময়ী নাকি এইমাত্র পূজাবাড়ির অন্দরমহলে শুনে এসেছে—জেঠামশায়ের দুটি সুপাত্রের কথা মনে হয়েছে—নন্দ চাটুজ্জে, অথবা দুর্গা গাঙ্গুলী। দুজনেই কুলীন, দুজনেই স্বগোত্র নন, এবং দুজনেই হয়তো বিনাপণে বিবাহে স্বীকৃত হবেন। যদিও নন্দ চাটুজ্জের বয়স কম, তবু জেঠামশায়ের মতে দুর্গা গাঙ্গুলী পাত্র হিসাবে অধিকতর বাঞ্ছনীয়। দুজনেরই তিন-চারটি ধর্মপত্নী। কিন্তু গাঙ্গুলী-মশায়ের মাত্র একটি পত্নীই বর্তমান, বাকি অতীত। নন্দের তিন ঘরবীই বর্তমান। তদুপরি তাঁর নামে সৌদামিনী সংক্রান্ত কিছু কলঙ্কও আছে। মৃন্ময়ীর আশঙ্কা—প্রস্তাব উত্থাপন মাত্র সেই ছয়-দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পাত্র সলজ্জে স্বীকৃত হয়ে যাবেন। এক : জনশ্রুতি—মেয়েটি অসামান্য রূপবতী। রূপনগরের নির্বাচিতা ‘রাইরানী’। দুই : গাঙ্গুলী-মশায়ের চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছেন—অবিলম্বে তিনি গোটাকতক বিবাহ করলে তাঁর অপুত্রক অবস্থায় তিরোহিত হওয়ার আশঙ্কাটা কমবে।

রূপেন্দ্রনাথ বজ্রাহত হয়ে গেলেন। সন্মুখে উপস্থিত মেয়েটিকে যেন আর দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর মনের পটে ভেসে উঠেছে নেপথ্য নায়িকার আলেখ্য।

দুজনেই নিশ্চুপ বসে আছেন মুখোমুখি।

—জেঠাম! বাড়ি যাবে না? —নিতু তাগাদা দেয়।

—যাব সোনা! না, ভুল হল! ‘সোনা’ বলতে নেই! আয়, মোয়া খাবি?

নিতুকে নিয়ে সে ভিতরে চলে যায়। ভাঁড়ার ঘরে কোন বেতের ঝাঁপিতে মুড়ির মোয়া থাকে তা ওর জানা। এ-বাড়ির প্রতিটি অক্সিসন্ধি তার নখদর্পণে। রূপেন্দ্র নিশ্চুপ বসে থাকেন। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে! তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে কুসুমমঞ্জরীর সঙ্গে বিদায়কালীন সাক্ষাতের কথা। জমিদার-বাড়িতে রওনা হবার পূর্বে সে কাতুকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল রূপেন্দ্রকে। পূজার ‘পার্বণী’ চেয়েছিল অসঙ্কোচে—তার প্রাপ্য যেটা—রূপেন্দ্র প্রতিশ্রুত। দিতে হয়েছিল তাঁকে—ওর হাতে : তীব্র কালকূট!

মৃন্ময়ী ফিরে এল নিতুকে নিয়ে। একটা রেকাবিতে কিছু মুড়ির মোয়া। নিতু থাপন জুড়ে বসে টুকিয়ে টুকিয়ে মোয়া খেতে থাকে। মৃন্ময়ী বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব রূপোদা। সত্যি করে বলবেন?

রূপেন্দ্রনাথ নির্বাক ওর চোখের দিকে তাকালেন।

মৃন্ময়ী স্নান হাসল। বললে, মাপ চাইছি! মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। সংসারী মানুষ তো! আপনি যে মিছে কথা বলতে পারেন না, সেটা মনে থাকে না।

—কিন্তু প্রশ্নটা কী?

—এ কুসুমঞ্জরী আপনার পরিচয় পাওয়ার আগেই, প্রথম দিনেই, আপনার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—‘এতক্ষণে এলে? এত দেৱী হল যে!’ বলেছিল?

বুঝতে পারেন। কাতুর কাছে শুনেছে। কিন্তু কাতু তো জানে, মেয়েটি নিতান্ত বিকারের ঘোরে ও-কথা বলেছে। সে-কথাটা কি বুঝিয়ে দেয়নি? নাকি, সব জেনে-বুঝেও মৃন্ময়ী এ-প্রশ্ন তুলেছে? অন্য কী একটা হেতুতে তার বুকটা টনটনিয়ে উঠছে বলে। হয় তো ঠিক ঐ কটা কথাই সে নিজে বলতে চেয়েছিল—রূপেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন গুরুগৃহে বাস করে যখন প্রথম গ্রামে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন—পাশের বাড়ির সেই একফোঁটা মেয়েটা—পীতুকাকার আদরের মীনু—হঠাৎ হয়ে গেছে তার পরমপূজ্য ‘খুড়িমা’! আহা! তখন কেন ওর ঘোর বিকার হয়নি! কেন তখন সে প্রলাপ বকার সৌভাগ্য লাভ করেনি? তাহলে তা লোকলজ্জাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেও তার সোনারদার গলাটা জড়িয়ে ধরে ছ-ছ করে উঠতে পারত: ‘এতদিনে এলে? এত দেৱী হল যে?’

—থাক! আপনাকে বলতে হবে না। আমি জবাব পেয়ে গেছি। কাতু মিছে কথা বলেনি।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, না, কাতু মিছে কথা বলেনি। কিন্তু এ-কথাও কি সে বলেনি যে, মঞ্জু সেদিন নিতান্ত বিকারের ঘোরে ...

—মঞ্জু! ওর নাম তো ‘কুসুমঞ্জরী’?

—হ্যাঁ, তাই! মানে

—থাক রূপেন্দ্রনাথ! এ কিছু সংস্কৃত শোলক নয় যে, অস্বয়-ব্যাখ্যা ছাড়া আমি ‘মানে’ বুঝব না। কিন্তু যে-কথা আমি জানতে এসেছি তার জবাব তো এখনো দিলেন না?

—তুমি তো কোন প্রশ্ন করনি মৃন্ময়ী। একটা তথ্য পরিবেশন করেছ মাত্র। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, সেটা অতি বিচিত্র তথ্য—আমি তার বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না। ও হ্যাঁ, সেই প্রসঙ্গে তুমি একটি প্রশ্নও পেশ করেছিলে—‘কেন আমি জেনেশুনে তোমার শত্রুতা করছি’। তার জবাবটা তোমার জানা। এ অভিযোগ তোমার হতাশা থেকে, বেদনা থেকে—এ তোমার দুরন্ত অভিমানের তির্যক প্রকাশ! আমি জানি না, তুমি নিজেও হয়তো জান না—সে অভিমানের পাত্র কতটুকু আমি আর কতটুকু দুর্গা-খুড়ো। কিন্তু তুমি সন্দেহাতীতভাবে জান—ঠাকের আমি বিবাহ করার পরামর্শ সেদিন দিহিনি। দিয়েছিলাম—খিকার।

মৃন্ময়ী ধৈর্য ধরে সবটা শুনল। বলল, আমারই ভুল। না, প্রশ্নটা এখনো পেশ করিনি। এখন করছি—আপনি কি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করবেন? ‘দয়া করে’। আমার প্রতি ‘দয়া’! তার প্রতি নয়।

রূপেন্দ্র বলেন, আমি তোমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না মৃন্ময়ী। কী চাইছ?

—খুবই দুর্বোধ্য ন্যায়ের সূত্র, নয়? আপনি কি পারেন না জেঠামশাইকে গিয়ে বলতে যে, এই সোণাই গায়ে ঐ দুই বুড়ো-হাবড়া ছাড়াও আর একটি কুলীন সুপাত্র আছে—আপনার ঐ ‘মঞ্জু’র সঙ্গে যাকে দারুণ মানাবে! গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া!

রূপেন্দ্র উঠে দাঁড়ান। প্রস্তাবটা অকল্পনীয় নয়, ছিল না। তবে অবচেতনের কোন্ কোণায় যে লুকিয়েছিল তা টের পাননি এতদিন। মৃন্ময়ী, মীনু, সেই অন্তর্লীন ভাবনাটিকে টেনে বার করে নিয়ে এসেছে প্রকাশ্যে। কী তার মূল উদ্দেশ্য তা সে-ই জানে। হত পাবে, এ তার নিতান্ত

জৈবিক বৃত্তি—প্রাণধারণের তাগিদে। ‘পৌলমী’ তার ইন্দ্রলোকের অসম্পত্তি অধিকার রক্ষা করতে চায় বলে। অথবা কে জানে—মেয়েটি হয়তো বুঝে ফেলেছে—কোন সুগোপন হেতুতে রূপেন্দ্রনাথ আজীবন কৌমার্যব্রত গ্রহণ করে আর্থের সেবা করে যেতে চেয়েছিলেন। হয়তো সে নিজেকেই দায়ী করে সে জন্যে—হয়তো দায়ী করে এক অলক্ষ্য ভাগ্যদেবতাকে! কিন্তু সেই কাঁটাখানা খচখচ করে প্রতিনিয়ত ওকে বিদ্ধ করে বলেই ও সংসারে মন দিতে পারে না। হোক বুড়ো বর—তবু তাকে জড়িয়ে ধরেও শান্তি পায় না। বেচারির ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায়—তার ‘সোনাদা’ সংসারী হয়নি আজও!

রূপেন্দ্রনাথ নীরবে পদচারণা করছিলেন। মৃন্ময়ী কোনও কথা বলেনি। অপেক্ষা করছিল। বার-কয়েক পদচারণা করে ফিরে এসে চোকির প্রান্তে উনি বসতেই আবার বলে, তোমার ঐ ‘মঞ্জু’কে আমি দেখেছি, সোনাদা! শুধু সোঞাই গায়ে নয়, এমন সুন্দরী আমি কখনো কোথাও দেখিনি!

রূপেন্দ্রনাথ হেসে ফেলেন। বলেন, তুই এমন ভাবে কথা বলছিস মীনু যেন, কাটোয়া, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, মায় শহর কলকাতা তোর চষে বেড়ানো।

মৃন্ময়ীও হেসে ফেলে। বলে, তা সত্যি। জীবনে সোঞাই গায়ে বইরে কখনো যাইনি। কিন্তু তুমি তো গেছ! বল? তুমি কখনো দেখেছ?

রূপেন্দ্র সে-কথার জবাব না দিয়ে বলেন, তুই সত্যিই তাই চাস? আমি রাজী হলে তুই খুশি হবি?

মৃন্ময়ী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, হব! হব! হব! ‘তিন-সত্যি’ করছি। সত্যিই খুশি হব!

—তাহলে বোকার মতো কাঁদছিস কেন রে?

মৃন্ময়ী লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। ঘর ছেড়ে যাবার আগে বলে যায়, আনন্দে কাঁদছি, সোনাদা! এ তুমি বুঝবে না।

তা বটে! এ তো বেদান্তের শাস্ত্র ভাষ্য নয়! এ যে মেয়ে-মন! কী করে বুঝবেন রূপেন্দ্র? তিনি চুপচাপ বসে থাকেন।

বেশ কিছুটা সময় নিয়ে ফিরে এল মৃন্ময়ী। এখন তাকে কিন্তু দিব্যি প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। কে বলবে—একটু আগে ঐ মেয়েটি কাঁদছিল—হোক তা আনন্দাশ্রু। হাসি-হাসি মুখে বললে, তাহলে আবার যাই পূজোবাড়ি? বড়মাকে বলে আসি!

—না রে, মীনু! বড়মা নয়। তুই শুধু চুপিচুপি কাতুকে বলিস। সে আবার চুপিচুপি বলবে পিসিকে। প্রস্তাবটা পিসিই তুলবে। না হলে পিসি মনে দাগা পাবে। সে বেচারি তো কম চেষ্টা করেনি তার এই একবধা ভাইপোটার নাকে দড়ি পরাতে! কাঁধে জোয়াল চাপাতে। তুই সরাসরি বড়-মাকে বললে পিসির অভিমান হবে।

মৃন্ময়ী স্বীকার করে। হেসে বলে, মাঝে-মাঝে তুমি এমন পাকা মাথার পরামর্শ দাও না সোনাদা, ঠিক মনে হয় পুঁথি-টুঁথি নয়, সারা জীবন তুমি যেন মনুষ্যচরিত্র ছাটিছ! আমি মেয়েমানুষ, আমারই তো বোঝার কথা যে, পরের মুখে এ-কথা শুনে পিসির কেমন লাগবে! অথচ আমার সেটা খেয়াল হল না, আর তুমি—আজন্ম বই-পোকা—মেয়েদের দিকে কখনো

সোনার

চোখ তুলে তাকাও না, তোমার মনে পড়ে গেল! 'সোনাদা' নয়, তোমাকে 'হীরেদা' বলব এর পর থেকে—তা বৌঠান শুনুক, না শুনুক।

—বৌঠান?

—ঐ তোমার আদরের 'মঞ্জু' গো!

নিতুর মোয়ার রেকাবি শূন্য হয়ে গেছে। সে আবার তাগাদা দেয়।

মুন্সীর মুখটা ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সোনাদা সসারী হতে রাজী হয়েছে। তার সঙ্গে আজ থেকে নতুন একটা সম্বন্ধ পাতানো গেল। বৌঠানকে উপলক্ষ্য করে সোনাদাকে উত্সাহ করতে যখন-তখন এ বাড়ি এলে কেউ কিছু মনে করবে না! মুন্সী বলে, শোন, অজ্ঞানের সাত-তারিখ দিন আছে। মাসখানেক ধৈর্য ধরে থাক। আমি নিজে এসে বৌঠানকে বরণ করে ঘরে তুলব!

রূপেন্দ্র হেসে ওঠেন, ওরে বাবা! তুই যে ঈর্জিপুথি দেখে বসে আছিস।

—থাকব না? গরজটা যে আমার! অজ্ঞান ফসকে গেলে আমি নিজেই যে ফেসে যাব। মাঘ-ফাল্গুনে আমি আটকা পড়ব আঁতুড়ঘরে! ভোমাকে বরসাজে সাজাতে আসতে পারব না!

রূপেন্দ্র বলেন, তাহলে মাঘ-ফাল্গুনেই ব্যবস্থা করব। তোকে ঠিক জন্দ করা যাবে। শোধ তোলা যাবে। তোর বিয়েতে যেমন আমি ...

মাঝপথেই থেমে যান। ফুলে ফেঁপে ওঠা বেলুনটায় যেন বেমজ্জা একটা সূচ বিদ্ধ করে দিয়েছেন। মুন্সীর প্রভাতী প্রফুল্লতার ঝলমলে আলোর উপর ঘনিয়ে এল একখানা কালো মেঘ। মুখটা হঠাৎ বেদনার্ত হয়ে ওঠে। মুখটা নেমে আসে বৃকের উপত্যকায়। যে 'আনন্দাশ্রু'কে এতক্ষণ কোনক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছিল তা টপটপ করে ঝরে পড়ল মাটিতে। সোনাদার 'উদ্ধাহন' থেকে মনটা হঠাৎ সরে গেছে নিজের 'উদ্ধাহনে'! অশ্রুটে বলে, সে সময় গায়ে থাকলে তুমি তোমার খুড়িমার বিয়েতে একপেট মশা-মিঠাই গিলতে পারতে, সোনাদা?

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ কী লাভি! অজ্ঞান এমন আনন্দঘন মুহূর্তে কেন হঠাৎ মাড়িয়ে দিলেন ওর বেদনার স্থলটি!

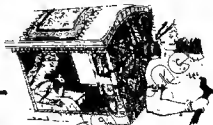
নিতু আবার তাগাদা দেয়, কই বাড়ি চল?

—চল যাই! আজও একটা প্রণাম করে যাব কিঙ্ক, সোনাদা! পুজোর নতুন শাড়ি পরেছি তো। গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়! আশা করি তুমি বাখা দেবে না তোমার খুড়িমাকে!

প্রতিবর্তী প্রেরণায় প্রণামগ্রহণ কালে যে অভ্যস্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করে ওঁর গুণধর, তা অনুভব রইল। এ প্রণাম 'নারায়ণকে নিবেদন করা যায় না।

এ যে খুড়িমার প্রণাম! পুজোর দিনে স্বামী-সোহাগী নতুন শাড়ি পরার অভ্যুহাতে নিবেদন করছে ভাঙুর-পো-কে!

এ কি 'নারায়ণকে নিবেদন করা যায়?



রূপেন্দ্র বজ্রাহত হয়ে গেলেন জেঠামশায়ের মুখে কণ্ঠাটা শুনে

—না রূপেন্দ্রনাথ! আমি এ বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত হতে পারি না!

মহাষ্টমী অতিক্রান্ত। সন্ধিপূজোর চাকের বাদ্যি একটু আগে থেমেছে। ব্রজেন্দ্রনাথের খাশ কামরায় বসেছেন ওঁরা দুজন—রূপেন্দ্র আর ব্রজেন্দ্রনাথ। মাটিতে ফুলকাটা পশমের আসনে। সমস্ত দিন মহাষ্টমীর উপবাস গেছে। এখন প্রসাদ পেতে বসেছেন। সামনে দুটি পাথরের থালা। প্রসাদ গ্রহণ শেষ হয়েছে। একটু আগে ঐ দুটি থালায় সাজানো ছিল—নানান ফলমূল, লুচি, নিরামিশ তরকারি, পায়ের, পক্কান, খেজুর গুড়, তিলেখাজা, চন্দ্রপুলি, মায় বর্ধমান থেকে আনানো সীতাভোগ। ভাদুড়ী-বাড়িতে ‘বলি’ হয় না। আগে হত। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পিতৃদেবের আমলে নাকি একবার বলি আটকে যায়। তার পর থেকে ও প্রথা উঠে গেছে। সামনে বসে আছেন বড়মা, তালপাখা হাতে। গরমও নেই, মাছিও নেই—পাখাটা হাতে আছে নিভাস্ত অভ্যাসবশে। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একগল্য ঘোমটা টেনে তারাসুন্দরী—কখন কী প্রয়োজন হয়।

সংবাদটা গোপন—এতদূর গোপন যে, জমিদারবাড়ির সব কয়টি পুরললনাই তা’ গোপনে জানে। প্রত্যেকেই ঐ মুখরোচক সংবাদটির উপসংহার হিসাবে শ্রোতার সাবধানবাণীটি শুনেছে: তোকেই শুধু বললাম, এখনি পাঁচকান করিস না।

জগুপিসি নাকি আজ দুপুরে তাঁর ‘গঙ্গাজল’ের মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে বলেছিলেন, তোরে একটা ‘গোপন-কথা’ বলতে এলাম, গঙ্গাজল! একটা বিয়ের-প্রস্তাব! তা আমি বলবনি!

ব্রজেন্দ্রসুন্দরীর বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি। তবু ন্যাকা সেজে বলে ছিলেন, এ আবার কী হৈয়ালী? ‘গোপন-কথা’ বলতে এসেছিস—আবার বলছিস—‘বলবনি’?

—কেন বলব? আমার একটা ময়াদা নেই! আমি হল্যাম গে বরের ঘরের পিসি! আমি কেন প্রস্তাব তুলব? তুই মেয়ের তরফের! তুই কথা তুলবি, আমার হাতে পায়ে ধরবি—আমি শুধু রাজী হব!

ব্রজসুন্দরী বলেছিলেন, ওসব আধিক্যোতা ‘সম্বন্দ-করা’ বিয়েতে হয়! এ কী তাই? এ তো ...

মনের উচ্ছ্বাসে তিনি ভুলে গেছিলেন শ্রোতা জগু ঠাকরণ। কালিদাসের একটি সুবিখ্যাত শ্লোক শুনিয়ে দিয়েছিলেন তিনি—‘যেখানে মদন পঞ্চশর স্বয়ং ব্যবস্থাপক সেখানে পুরোহিত নিমন্ত্রয়োজন।’

জগুপিসি ঐ ‘গোপন-কথাটা’ জানেন—তাঁর দুঃসাহসিনী গঙ্গাজল ঐ অংবংভাষাটা আয়ত্ত করেছে—নিভায়ে! কেন করবে না? দেবী অংশে জন্ম তার! সে জানে, কোন অলগ্নেয়ে যমদূত সে অপরাধে ওঁর সিঁথির দিকে হাত বাড়াতে সাহস পাবে না—ভয় হয়ে যাবার ভয়ে!

ধমকে উঠেছিলেন তিনি, ওসব অংবং-মন্ত্র রাস্তিরে শোনাস তোর বরকে! আমাকে যা বলবি তা সাদা-বাঙলায় বল দিনি?

—কী আর বলব বল? একবগ্না আমাকে ‘জীবন’ দিল, আর আমি ওকে একটা ‘জীবনসঙ্গিনী’ দিতে পারব না?

সমস্ত দিনে গোপনে গোপনে এই রসঘন আনন্দবার্তাটা মহিল্যামহলে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ কী অসৈরন নিদান হাঁকলেন বড়কর্তা! তিনি সম্মত নন!

প্রশ্নটা ব্রজসুন্দরীই পেশ করেন, এ কী বলছেন আপনি? কুসুমমঞ্জরীর সঙ্গে রূপেন্দ্রনাথের বিবাহপ্রস্তাবে আপনার সম্মতি নেই?

জনান্তিকে 'তুমি' সম্বোধন করলেও প্রকাশ্যে তিনি 'আপনি' বলেন।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বললেন, সেই কথাই বলেছি, গিমি! কারণ আমি জানি, তোমরা রূপেন্দ্রকে বাধ্য করেছে এ বিবাহে সম্মত হতে। তার মনোগত বাসনা—আজীবন কৌমার্যব্রত গ্রহণ করে আর্থের সেবা করে যাওয়া। সে তার সঙ্কল্পচ্যুত হতে স্বীকৃত হয়েছে—শুধু ঐ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে!

ব্রজসুন্দরী রুখে ওঠেন, না হয় তাই হল! তাতেই বা আপনার আপত্তি কিসের?

—আপত্তি এজন্য যে, তোমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে। কুসুমমঞ্জরীর যে বিপদের আশঙ্কা তোমরা করেছে সে বিপদ থেকে মেয়েটি ইতিমধ্যে উদ্ধার পেয়েছে। ওর 'রাইরানী' হওয়ার আশঙ্কা আর নেই।

—কেন?

—যেহেতু রূপনগরের মোহন্ত-মহারাজের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে! পঞ্চমীর দিন।

রূপেন্দ্রনাথ এতক্ষণ অধোবদনে বসে ছিলেন। এ সংবাদে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, এ সংবাদ জানা ছিল না; কিন্তু আশঙ্কা তো তাতেও দূরীভূত হয়নি, জেঠামশাই! মোহন্ত মহারাজ গতায়ু—কিন্তু তাঁর গদীটা তো আছে। আবার কেউ উঠে বসবে তাতে। হয় তো সেই 'ছোটহজুর'!

—না! সেও তীরবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। তরুণ ঈশানের তীরে বিদ্ধ হয়ে।

—ঈশানের তীরে! মানে, আমাদের ঈশেন?

—হ্যাঁ তাই! রূপনগরের মঠ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সমস্ত গ্রামটা নিশ্চিহ্ন! মোহন্ত মহারাজের ধনাগার লুণ্ঠিত—তার সেই গোপিকার দল....আহ!

আচমন করে উঠে পড়লেন তিনি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তারপর শোনালেন এক বিচিত্র সংবাদ। বিস্তারিতভাবে। এ সংবাদ তিনি পেয়েছেন বিশেষ সংবাদবহ মারফত। সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন। জানে, একমাত্র তারাপ্রসন্ন! সংক্ষেপে তা এই—

ভাতুপুত্রের মুখে সংবাদটা শুনে হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিল মোহন্ত মহারাজের! ভাদুড়ী-মশাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—অবিলম্বে রূপনগরের মেয়েকে ফেরত পাঠাতে। গো-গাড়িটা আজ প্রায় মাসখানেক অপেক্ষা করেছে। স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও গাড়িটা ফিরে আসেনি। মোহন্ত মহারাজ তখন আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ভাতুপুত্রকে—মেয়েটিকে ছিনিয়ে আনতে। দুই হাতিয়ারবন্দ সহচরকে নিয়ে 'ছোটহজুর' মোহন্ত মহারাজের হুকুম তামিল করতে তখনই ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়েছিল। সোণাই গাঁয়ের সেই অর্বাচীন কবিরাজটা তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। খালি হাতে। শুধু তাই নয়—সেই দুঃসাহসী কবিরাজটার চোখের সম্মুখে কে একটা বাগদির-পো মহামহিম মোহন্ত মহারাজের দূতের গালে চপেটাঘাত করেছে। ক্ষিপ্ত হয়ে যাবার কথাই! প্রেমদাস গোসাই তৎক্ষণাৎ আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ভাতুপুত্রকে—অবিলম্বে সৈন্য সোণাই আক্রমণ করতে। শুধু মেয়েটিকে ছিনিয়ে আনলেই চলবে না—শুলে বিদ্ধ করে আনতে হবে সেই কবিরাজ আর তার বাগদি-চেলার ছিন্ন মুণ্ড দুটো!

ছোট হজুর জানিয়েছিল, সে মহাষ্টমীতে ফিরে আসবে বলে 'ইসিয়ার' জানিয়ে এসেছে।

হুঙ্কার করে উঠেছিলেন, না, এখনি! এই মুহূর্তে! কামান নিয়ে যেতে হবে না। তাহলে পৌছতেই তিন দিন লেগে যাবে। সঙ্গে নিয়ে যা এক শ বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার আর হেরম্বদাসকে।

‘হেরম্বদাস’ ঔর রণহস্তীর পোষাকী নাম।

আদেশমাত্র সৈন্য সমাবেশ করে ওরা রওনা হয়েছিল।

নিয়তির পরিহাস! ভাস্কর পণ্ডিতও সেই সময় চলেছে মুর্শিদাবাদ-মুখো। দাঁইহাটি থেকে উত্তরমুখো, ভাগীরথীর পশ্চিম কিনার ধরে। তার গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল সে স্বচক্ষে দেখেছে, রূপনগরের গড় থেকে শতাধিক অশ্বারোহী আর একটি রণহস্তী নিয়ে মোহন্ত-মহারাজের সৈন্যদল পশ্চিমমুখো কোথায় যেন চলেছে। ভাস্কর সাবধানী। সে কাটোয়ায় এক বেলা অপেক্ষা করল—বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করল। অচিরেই জানতে পারল সঠিক সংবাদ। ঐ সৈন্যদল চলেছে বর্ধমানের কী একটা গাঁয়ে—স্থানীয় এক জমিদারকে সায়ন্তা করতে। ভাস্কর তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়—রূপনগরের গড় বস্তুত অরক্ষিত! জনশ্রুতি আগেই সংগ্রহ করা ছিল—মোহন্ত-মহারাজের রত্নভাণ্ডার কুবেরীর্ষিত! বর্গী সৈন্যদল মুখ ঘোরালো।

ছোট-হজুর শোঞাই গাঁয়ের পারানি-ঘাটে যে দিনটি কলার ভেলায় দামোদর পার হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, সেই সারাটি দিনে অজয়ের তীরে নির্মূল হয়ে গেছে রূপনগরের গড় ও গ্রাম! সন্ধ্যাবেলায় সেই দুঃসংবাদ দিতেই রূপনগর থেকে ছুটে এসেছিল অশ্বারোহী সংবাদবহ—ছোট-হজুরকে মর্মান্তিক বার্তাটা পেশ করতে। বেচারি এসে শোনে, সেই ছোট-হজুরও ভেসে গেছে দামোদরের স্রোতের টানে!

সহজ ভাষায় ভীমা আর ঈশান যাদের সঙ্গে সারাদিন কাজিয়া করেছে তারা বর্গী সৈন্য আদৌ নয়—রূপনগরের ফৌজ! এপার থেকে তাদের সনাক্ত করা যায়নি। শুধু বোঝা গিয়েছিল তারা হিন্দু।

ভাস্কর রূপনগরকে ধূলিসাৎ করে, মোহন্ত-মহারাজের দ্বিখণ্ডিত দেহটা অজয়ে নিক্ষেপ করে তারপর রওনা হয় উত্তরমুখো।

নিতান্ত সৌভাগ্য গঙ্গার পূর্ব-উপকূলের জনপদগুলির—কালীগঞ্জ, পলাশীপাড়া, রেজিনগর, বা বেলডাঙার। বর্গী সৈন্য ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূল ধরে চলেছিল উত্তরমুখো—কাটোয়া ঘাট থেকে মুর্শিদাবাদ। গঙ্গা পার হওয়ায় কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ভাস্কর পছের হাতে সময় ছিল অল্প। তার গোপন খবর ছিল, নবাব আলিবর্দী বালেশ্বরে থাকতেই খবর পেয়েছেন—বর্গী সৈন্য তাঁর রাজধানী আক্রমণ করতে পারে। নবাবী সৈন্য বালেশ্বর-দাঁতন পার হয়েছে। তারাও দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে মুর্শিদাবাদের দিকে। তাই শুধু ভাগীরথীর পূর্বপারের জনপদ নয়, পশ্চিমপারের গ্রামগুলিও সে-যাত্রা বর্গী-আক্রমণ থেকে রেহাই পেল—কেতুগ্রাম, ডুবুতপুর, কান্দি, খড়গ্রাম। বিদ্যুৎগতিতে বর্গী সৈন্য ঝাপিয়ে পড়ল খাশ মুর্শিদাবাদে—জালিবাগ, আজিমগঞ্জ।

নবাবী দুর্গ অধিকার করিতে পারল না তারা। আলিবর্দী ঐ রূপনগরের প্রেমদাস বাবাজীর মতো মুখ নয়—যুদ্ধযাত্রা করার পূর্বে নিজের প্রাসাদ ও তোষাখান সুরক্ষিত করে রাখার কথা ভোলেনা। কিন্তু বর্গী সৈন্য অসামান্য দখল করে নিল জগৎশেঠের ধনাগার।

সোহাগ

বর্গীরা আক্রমণ করতে আসছে শুনে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ সম্প্রদায়ের মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে আত্মগোপন করেছিলেন। ভাস্করপন্থ তাঁর গদি লুট করে পেয়েছিলেন দু কোটি আঁকট মুদ্রা!

আজকের হিসাবে তা কত হাজার কোটি টাকা তা বলতে পারব না! শুধু মনে করিয়ে দিতে পারি—মুর্শিদাবাদের বাজারে তখন এক তঙ্কায় পাঁচ মণ চাউল পাওয়া যেত! সেটাও কিন্তু আমার কাহিনীর শেষ চমক নয়! এর পরে আমাকে বলতে হবে—ঐ ক্ষয়ক্ষতিতে বিশেষ বিব্রত হননি জগৎশেঠ ফতেচাঁদ।

বর্গীর হাঙ্গামা মিটে গেলে আবার গদিয়াল হয়ে বসে নাকি বলেছিলেন—এসিন তো হোতাই হয়। খোড়া-বহু নুকসান হোঁ গ্যা! ক্যা কিয়া যায়?

পরবৎসরই নবাবকে উপহার দিয়েছিলেন এক কোটি আঁকট মুদ্রা!

সে যা হোক—বিস্তারিত ইতিহাস শুনিয়ে ভাদুড়ী-মশাই তাঁর ধর্মগঙ্গীর দিকে ফিরে বলেছিলেন, এখন তো কুখলে, রূপেন্দ্রকে বিবাহ করতে বাধ্য করার কোন প্রয়োজন নেই! কুসুমমঞ্জরী আমার কন্যারূপে এ বাড়িতে অনায়াসে আশ্রয় পেতে পারে—সোএরাই গাঁয়ের কুলধু-না হলেও!

ব্রজসুন্দরী বললেন, আপনি আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বলুন দেখি। পুরুষ মানুষ বিবাহে সম্মতি দেয় কেন? অরক্ষণীয়া একটি কন্যাকে উদ্ধার করতে?

ব্রজেন্দ্র গঙ্গীর ভাবে বলেন, শাস্ত্র বলেছেন,—না! ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্য।’

—শাস্ত্রের বাক্য থাক! একবাক্য শাস্ত্রনির্দেশে চলে না, চলে বিবেকের নির্দেশে।

—তা ওর বিবেক কী নির্দেশ, কেন দিচ্ছে, তা আমি কেমন করে জানব?

রূপেন্দ্রনাথ বুড়োবুড়ির এ জাতীয় কথোপকথনের কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারেন না। কী নিয়ে তর্ক? কিসের বিবাদ?

বৃদ্ধা বলেন, আপনি কি শুধু শাস্ত্রই পড়েছেন। কাব্য পড়েননি?

ব্রজেন্দ্র বললেন, তা কাব্য তো তুমিও যথেষ্ট পড়েছ, গিন্নি। বল, তোমার মুখ থেকেই শুনি—

—তাই শুনুন তবে। এই মাত্র যে শব্দটা উচ্চারণ করলেন—‘গৃহিণী’ সেটা ‘গৃহ’ শব্দের সমার্থক—‘ন গৃহং গৃহমিত্যর্থাৎ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে’।^১ একবাক্যে গৃহ ‘দ্বিবাক্য’ না হলে ‘অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যম্ তথা গৃহম’^২! কিছু বুঝলেন?

ব্রজেন্দ্র বললেন, একটু একটু! পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ।^৩

‘গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্ভণো

—তা তো বটেই। সেক্ষেত্রে পিক-কুহ কী বলছে শুনুন,

“কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা

^১ যে গৃহে গৃহিণী অনুপস্থিত তাকে ‘গৃহ’ বলা চলে না। গৃহিণীই গৃহকে গৃহ-মর্যাদা প্রদান করে।

^২ তার পক্ষে বনে যাওয়াই ভাল; কারণ তার কাছে অরণ্যও যা, গৃহও তাই।

^৩ গুণীবাঙ্গি গুণীর সমাদর করতে পারে। যে নির্ভণ সে কী বুঝবে? বসন্তের মাইমা কোকিলই বোঝে, কাক বোঝে না।

বলদাক্ষ্যমানা চেং সহসা বিরসায়তো।”^১

রূপেন্দ্রনাথ রীতিমতো স্তম্ভিত! এ কী শুরু করেছেন ওঁরা! যেন দুই কাব্যতীর্থ সংস্কৃতে কবির-লড়াই জুড়ে দিয়েছেন। পরমুহূর্তেই বুঝে ফেলেন এই কবির লড়াইয়ের মূল-উৎসটা কোথায়। ওঁরা দুজনে মিলে একটা কৌতুক করছিলেন এতক্ষণ। সমস্তটাই নিদারুণ রসঘন প্রমোদন! যদিও সম্পর্কটা ‘জেঠা-জেঠি’, কিন্তু বয়সের ফারাকটা ‘দাদু-দিদার’! আনন্দের আতিশয্যে বুড়োবুড়ি আজ উচ্ছসিত! তাই এই প্রগল্ভতা। কিন্তু দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করছে পুত্রবধূ—তাই তার বোধগম্য ভাষায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাসটাকে ব্যক্ত করতে পারছেন না—দুজনেই ক্রমাগত সংস্কৃতে মনের আবেগকে মুক্তি দিচ্ছেন!

ব্রজেন্দ্রকে নীরব দেখে বড়মা বলে ওঠেন, এবার যে আমার ‘চাপান’। আপনারাই ‘উতোর’ দেবার কথা! কিছু বলছেন না যে?

—কী বলব? ‘ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে

দর্দরা যত্র বজ্রারব্রত মৌনং হি শোভনম॥’^২

হঠাৎ বড়-মার নজরে পড়ে দ্বারপ্রান্তে তারাসুন্দরীর চক্ষুদ্বয় বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মাথা থেকে তার যে ঘোমটা খসে গেছে, তাও সে টের পায়নি। বড়-মা লজ্জা পেলেন। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে বলেন, একবন্ধা! শোন! এ তোমার বড়মার-আদেশ। সাতই অযাণ দিন স্থির হয়েছে। যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফেল ইতিমধ্যে।

রূপেন্দ্রর আচমন শেষ হয়েছিল ইতিপূর্বেই। তিনি উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করলেন।



কথায় বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন। ওঁর ভাগ্যে এখনো স্ত্রীধন-লাভ ঘটেনি; সম্বন্ধটা পাকা হয়েছে মাত্র। তবু বড় জাতের একটা লাভের সূচনা হয়ে গেল আকস্মিকভাবে।

প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছেন স্বয়ং দুর্গাচরণ। নন্দতায়ী ইতিমধ্যে অনেকবার কান ভাঙতে চেয়েছে, উনি নিজেও বিরক্ত এইসব ছেলে-ছোকরার অশাস্ত্রীয় আচার-বিচারে। তা হোক, মাথা গরম করার মানুষ উনি নন। নির্বিঘ্নে ‘পুন্ডাম’ নরক থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা পাকা-হওল ইন্তক উনি কাউকে চটাবেন না—গ্রহচাৰ্য, গুণীন, রাসু দাই বা ধনুস্তর।

ব্যবধবজ দত্ত নববীপের একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। টাকার কুমির। কী-একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আজ বছরখানেক ভুগছেন। শান্তি-স্বস্ত্যান, যজ্ঞ, এবং হাকিমী-কোবরেজি চিকিৎসা হয়েছে। উপশম তো হয়ইনি—ব্যাধির প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। ব্যবধবজ তত্ত্ববায়জাত শিল্পের আড়তদার—মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতার বাজারে তাঁর প্রতিপত্তি। দুর্গাচরণের সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে আবদ্ধ। গাঙ্গুলী-মশায়ের কাছে সোণাই গ্রামের ধনুস্তরির অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তিনি লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। কবিরেজমশাই যদি অধিলম্বে

১ কবিতা আর কবিপ্রিয়া যখন যেচ্ছায় সলজ্জচরণে এগিয়ে আসেন তখনই কবি সার্থক। জোর-জবরদস্তি করে ধরে আনলে—কী কবিতা, কী কবিপ্রিয়া—কেউই রসমগ্নিতা হয় না। সরস হলেও তা শুকিয়ে যায়।

২ সময়ে-সময়ে মৌন থাকাই ভদ্রতা। বর্ষাগমে যখন ভেকদল সরব হয় তখন কোকিলেরা নীরব থাকে।

সোফায়ে

নবদ্বীপে পদধূলি দিতে স্বীকৃত হন তাহলে তাঁর যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে!

গাঙ্গুলী-মশাই রূপেন্দ্রর কর্ণমূলে নিবেদন করলেন, শোন ভায়া! রাহাখরচ বাবদে পাঁচটি আকবরী মোহর দাবী করেছি আমি—তোমাকে না শুধিয়েই। আর যদি নিরাময় করে দিতে পার, তাহলে বৌমার জন্য একটি দশভরির রত্নহার! বল, কম করে বলেছি?

—বৌমা! বৌমা কে?

—আহা হা! খবরটা কি আমরা জানি না নাকি? আজ কার্তিকের সতের তারিখ। যাতায়াতে সাতদিন। ইদিকে বিয়ের ব্যবস্থা আমরাই করব। সৌরীনদা নেই, আমরাই তো তোমার পিতৃস্থানীয়, না কী বল?

নবদ্বীপ! ভাগীরথী-জলাঙ্গীর সঙ্গমস্থলে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এই মহাতীর্থ! এখানেই বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের তীর্থাবাস আক্রমণ করেছিল বিধর্মী মহম্মদ বিন বক্তিয়ারের অশ্বারোহী বাহিনী। বঙ্গলক্ষ্মী অন্তর্মিত হয়েছিলেন ঐ নবদ্বীপের গঙ্গায়। সমগ্র ভারতাস্থার ধারক ঐ নবদ্বীপ। সেনযুগে নবদ্বীপ-বিদ্রোহসমাজের জ্যোতিষ্ক ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ জলায়ুধ, পশুপতি, শূলপাণি, উদয়নাচার্য, আদ্বিহোথ যোগী। এখানেই আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রাক্‌চৈতন্য যুগে—বাসুদেব সার্বভৌম, ঐদ্বৈতাচার্য, চিন্তামণি-দীর্ঘিতি প্রণেতা ও গৌতমসূত্রের ভাষ্যকার নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। বঙ্গদেশের সাকারকালী মূর্তির প্রবর্তক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ঐ নবদ্বীপে বসেই সচেষ্ট হয়েছিলেন তাত্ত্বিক ব্যাভিচার থেকে দেশকে রক্ষা করতে—রচনা করেছিলেন প্রামাণিক তাত্ত্বিক নিবন্ধ-সংবলিত ‘তত্ত্বসার’ গ্রন্থ; যা পাঠ করে রূপেন্দ্র প্রণিধান করেছেন ‘বলি’-র কী অর্থ! এখানেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব রচনা করেছিলেন ‘জ্যোতিঃসারসংগ্রহ’। ‘শব্দশক্তি-প্রকাশিকা’ প্রণেতা ‘জগদগুরু’ জগদীশ তর্কালঙ্কার ঐ নবদ্বীপেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তারপর নিমাই পণ্ডিতের কীর্তিকাহিনীর তো কথাই নেই—

—কী হল রূপেন্দ্র? তুমি স্বীকৃত হলে তো? তাকে কী বলব? নাকি আর কিছু দরদস্তুর করব?

রূপেন্দ্র সহাস্যে বলেন, না, খুড়ো! নবদ্বীপ আমি স্বচক্ষে দেখিনি আজও। এ এক দুর্লভ সুযোগ হয়ে গেল। নিশ্চয় যাব।

মনে মনে বললেন—ঐ তামসিক বৃদ্ধ তার অর্থ বুঝবে না বলে—সংসার-জীবনে প্রবেশের উষালগ্নে নবদ্বীপের পদধূলি ললাটে লেপন করার এ সৌভাগ্য তাঁর দুর্লভ প্রাপ্তি।

শুনে বেজার হলেন জগুপিসি: এ আবার কী অসৈরন কথা! বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেলে আর যে নৌকায় চাপতে নেই! শাস্তরে বারণ।

রূপেন্দ্র ঠোঁটলা-ঠুঁটলি বোধছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না পিসিমা—নৌকায় আমি যাচ্ছি না—শাস্ত্রে বারণ আছে, তা জানি।

—তাহলে?

—মনসংহিতায় আছে “ইতরতাপশতানি যথেষ্টা বিতর্য তানি সহৈ চতুরানন।”

—তার মানে?

—তার মানে, নৌকার পরিবর্তে চতুর ব্যক্তি অশ্বারোহণে যথেষ্ট গমন করতে পারে,

চতুরানিন, মানে ব্রহ্মা তা 'সহে', অর্থাৎ সহ্য করেন। আমি ঘোড়ায় যাচ্ছি।

জগুপিসি বলেন, কী জানি বাপু! আমার কেমন সন্দ' হচ্ছে! শিরোমণি মশাইকে আগে একবার শুধিয়ে দেখি।

রূপেন্দ্র খাড়া হয়ে দাঁড়ান। বলেন, পিসিমা! কুটুম্ব বলতে আমার একজনই আছে। এই দুর্লভ সুযোগ যখন পেয়েছি তখন নিজে গিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করে আসব। সে জন্যই যাচ্ছি নবদ্বীপ।

জগুপিসি আকাশ থেকে পড়েন। বলেন, মানে? নবদ্বীপে কে তোর কুটুম?

—নবদ্বীপ থেকে গো-আড়ি গাঁ মাত্র ছয় ক্রোশ!

কাত্যায়নী দাঁড়িয়ে ছিল অদূরে। হাত বাড়িয়ে সে চৌকাঠটা ধরল।

মুহূর্ত বিলম্ব হল জগু ঠাকরুণের প্রত্যুত্তর করতে। কন্যা এবং ভ্রাতৃপুত্রের দিকে পর্যায়ক্রমে দেখে নিয়ে একটি মাত্র শব্দে নিদান ইংকলেন: না!

—না? না কেন? এমন আনন্দের দিনেও তার খোঁজ নেব না?

জগুপিসি চোখে আঁচল দিলেন।

রূপেন্দ্র এগিয়ে এসে একখানি হাত রাখলেন তাঁর পিঠে: পিসিমা?

অশ্রুআর্দ্র মুখখানি তুলে জগু পিসি কথা বলতে গেলেন। চোঁট দুটি থরথর করে কঁপে উঠল। তবু বলতে পারলেন কথাটা: আর ফিরে এসে যদি বলিস্ ঐ আবাবী বৌমারে বরণ করতে পারবেনি? ওর মাছভাত খাওয়া ঘুচেছে?

কাত্যায়নী আর সংযত করতে পারল না নিজেকে। একটা আর্ত শব্দ বার হয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে। বোধহয় 'মা—' বলতে চেয়েছিল, শোনালো একটা জাস্তব আর্তনাদের মতো: 'আ—!'

সে বসে পড়েছে ভূশয্যাতেই।

জগুপিসি হু-হু করে কঁদে ফেললেন। তার মধ্যেই বলে ওঠেন, আমি দিবি দিয়ে রাখলাম 'প্যা! যাচ্ছিস যা—কিন্তু সে বাদরটার খোঁজ নিতে পারবিনি কিন্তু! আমার মাথার দিবি রইল।

রূপেন্দ্রনাথ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এতদিন কেন যে পিসিমা ঠুকে গো-আড়ি গাঁয়ে খোঁজ নিতে নিষেধ করেছিলেন তা প্রণিধান করলেন। কথাটা মিথ্যা নয়! এমন মর্মান্তিক সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে পড়েনি!

জগু ঠাকরুণ পূজায় বসেছেন দেখে কাতু ঘনিয়ে এল। ঠুকে আড়ালে টেনে এনে বললে, না দাদা, তুমি যা মতলব করেছ, তা করতে যেও না!

—মতলব করেছি! কী মতলব করেছি আমি?

—আমি জানি। তুমি শাস্তর মান না, দিবি দিলেও মান না—তুমি একটা কালাপাহাড়! তুমি খোঁজ নিতে যেওনা গো-আড়ি গাঁয়ে। যা ভাবছ তা হবে না। তুমি ধরা পড়ে যাবে!

—ধরা পড়ে যাব! কার কাছে?

—আমার কাছে! তুমি ভেবেছ—জেনে আসবে, কিন্তু তেমন-তমন খবর থাকলে তা চেপে যাবে! পারবে না। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝে ফেলব। কী দরকার খুঁচিয়ে ঘা

সোশাই

করার ? যা হবার নয় তা হবে না ! মা ঠিকই বলেছেন—এখন ও বিষয়ে কোন খোঁজ খবর নিতে ,
যেও না। আমি এই তো বেশ আছি।

—ঠিক আছে। তাই যখন তোর ইচ্ছে!

কাতু এবার অন্য জাতের প্রশ্ন করে, আচ্ছা, এ লোকটার অমন আদ্ভুত নাম কেন ? বাষধ্বজ !
এমন নাম বাপের জন্মে শুনিনি। তার মানে কী ?

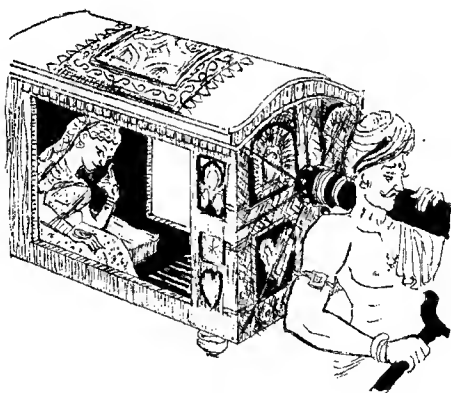
রূপেন্দ্র বললেন, ‘বাষ’ মানে ‘মীন’, মাছ। শব্দটা বহুব্রীহি সমাস। তার অর্থ ‘বাষ ধ্বজ
যাহার’।

—তারই বা মানে কী ?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের। বললেন, কী করে তোকে বোঝাই! তুই যে কুলীন
ব্রাহ্মণের জীবনকাব্যে উপেক্ষিতা! ‘মীনধ্বজ’কে তুই যে চিনিস না!

কাত্যায়নী ভুল বুঝল। তার নিরঙ্করতার প্রতি এটা একটা ব্যঙ্গ মনে করে বলে, আমাদের
তো হল না। বৌরানীকে বরং শিখিও—জেঠামশায়ের মতো!

বেচারী কাত্যায়নী!



pathagat.net





নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর :

1742

তৃতীয় পর্ব

নবদ্বীপ।

জননী জাহ্নবীর দুই আত্মজা—ভাগীরথী
আর জলাঙ্গীর বিয়ে হল ভিন্ন ভিন্ন গায়ে।
রাঙা চেলিতে কিশোরীতনু ঢেকে দুই

চন্দন-চটিতা বালিকাবধূ গেল দু-মুখো, ঘর-সংসার করতে। তারপর যে-যার স্বপ্নরঘরে
গিরিপনা সেরে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে একেবারে দুজনের মুখোমুখি।

‘ওমা! মুখপুড়ি! তুই হেথায় এলি কোথেকে?’ —বলে এ-ওর গলা জড়িয়ে ধরল।

সেই যে কথায় বলে না—‘গাঙে গাঙে দেখা হয়, তবু বোনে বোনে হয় না!’ —এ যেন
সেই বিস্তাস্ত। দেখা হতেই দুই বোন দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। হাপুস-নয়নে কান্না। কত
সুখ-দুঃখের গাধো। তারপর পানের বাটা খুলে বললে, নে, পান খা!

দুই বোনের সেই মিলনস্থলটির নামই হল গিয়ে—নবদ্বীপ।

কোন বিম্বৃত অতীতে এই জনপদটি গড়ে উঠেছিল তা বাপু ভুলে বসে আছে বুড়ো
ইতিহাস। শুধালে বলে, কী জানি বাপু, জানে!

কেউ বলে, দুই নদীর মিলনস্থলে রাখা সেই সোনার পানের বাটার উপরে জেগে উঠেছিল
একটা চরা বা দ্বীপ। নতুন গজানো দ্বীপ বলে তার নাম ‘নবদ্বীপ’। আবার কেউ বলে, ছাই জান
তোমরা—‘নব’ মানে ‘নতুন’ নয়; এ হল গিয়ে ‘আটের-পরে-দশের-আগের’ নয়। ঐ
নতুন-জাগা চরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এক মহান তত্ত্বসাধক। লোকচক্ষুর আড়ালে তিনি ওখানে
বসে গুপ্ত সাধন-ভজন করতেন। সাঁজের বেলায় জেলে দিতেন নয়টি প্রদীপ—নবগ্রহের
উদ্দেশ্যে। সারাবাত নদীকিনারে জ্বলত সেই নয়টি প্রদীপ। নদীপথে নৌকার যাত্রীরা যখন
আধারে তাত্ত্বিককে তো দেখতে পেত না—দেখত শুধু অনির্বাণ শিখায় জ্বলছে নয়টি
ঘৃতপ্রদীপ। তা থেকেই ঐ দ্বীপের নাম হয়ে গেল নব-দ্বীপ, বা নবদ্বীপ।

সেন বংশীয় নৃপতি বল্লাল সেন এখানে বানিয়ে ছিলেন একটা জম্মর প্রাসাদ—একেবারে
গাঙের কিনার সই-সই: ‘গঙ্গাবাস’। সেটা দ্বাদশ শতাব্দীর ঘটনা। ঐ প্রাসাদ থেকেই পরে

মহম্মদ বক্তিয়ারের আক্রমণে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন গঙ্গাযোগে পলায়ন করেন। তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে এখনো গিয়ে দেখে আসতে পার—সেই গঙ্গাবাসের দু-দশখানা ছোট মাপের পাতলা বাঙলা ইট—গাঙের পুবপারে। ঐ যে এখন জমজমাট মায়াপুর আশ্রম হয়েছে তার মাইল-খানেক উত্তরে—বামুনপুকুর গাঁয়ে। তবে আমার কথা শুনে অতদূরে গিয়ে যদি দেখ সবই ভোঁ—ভোঁ, তাহলে আমাকে দোষ দিও না বাপু! বিশ্বাস কর, আমাদের হাফ-প্যান্ট-পরা যুগে—বিশ-ত্রিশের দশকে তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি!

এখন হয়তো কিছুই নেই, পরে একথা লোকে বিশ্বাস করবে না। তাই আমাদের শিক্ষাকালে কী ছিল তাই বরং লিপিবদ্ধ করে যাই—

প্রাচীন মায়াপুর থেকে আধমাইলটাক উত্তরে বামুনপুকুর গাঁ। সেখানে কোন পুকুর দেখেছি কিনা মনে নেই, তবে চাঁদকাজীর সমাধি ছিল। আর সেই সমাধির ঠিক পাশে ছিল প্রকাণ্ড—অতি প্রকাণ্ড একটা গোলক-চাঁপার গাছ। আজও যদি সেটা বেঁচে থাকে, তবে চাঁদকাজীর সমাধিটা খুঁজে নিতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এত বড় গোলকচাঁপার গাছ তোমার কখনো দেখনি। ভাল কথা, চাঁদকাজীকে চিনতে পারলে তো? তাঁর আসল নাম মৌলানা সিরাজউদ্দীন। তাও চিনতে পারলে না? বলি শোন, গৌড়েশ্বর হুসেন শাহর নামটা শুনেছ তো? সেই যিনি ফতোয়া জারী করেছিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব নগর সংকীর্তন করতে পারবেন না। এই চাঁদকাজী ছিলেন সেই হুসেন শাহর শিক্ষক। তাঁরই মোক্তাবে পড়তে যেতেন হুসেন শাহ। কী পড়তেন? শোন বলি: মোক্তাবে তখন তিনজাতের শিক্ষা দেওয়া হত। প্রথমত ‘তাবি’, অর্থাৎ ভৌত-বিজ্ঞান, দ্বিতীয়ত ‘রিয়াজি’—তার মানে হল গিয়ে অঙ্ক আর অলঙ্কার শাস্ত্র। শেষ ‘ইলাহি’—ধর্মতত্ত্ব, অল্লাহর উপাসনা। এ তিন বিদ্যা আয়ত্ত না করলে মুসলমান সমাজে ‘আলিম’ হওয়া যেত না।

চাঁদকাজী ‘মোছলমান’, কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবেরা সে আমলে ঐ সমাধি প্রদক্ষিণ করে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতেন, চিরাগ জ্বলে দিয়ে যেতেন। ঐ চাঁদকাজীর শিক্ষার বনিয়াদ ছিল বলেই না হুসেন শাহ শেষ-মেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা।

সমাধি মন্দিরের কিনার-ঘেঁষে মৌলানা সিরাজউদ্দীনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

অদূরেই ‘বল্লাল টিবি’।

প্রায় সওয়া শ মিটার দীর্ঘ আর তিনতলা সমান উঁচু। দূর থেকে মনে হয় একটা প্রাকৃতিক টিলা। আসলে তা গঙ্গাবাসের ধ্বংসস্তুপ। এখন এলাকাটা পুরাতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্বে সংরক্ষিত। আমরা ওখানেই দুদশখানা পাতলা বাঙলা-ইট দেখেছি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। তোমরা পথ চিনে চিনে অকুস্থলে পৌঁছে হয়তো এখন দেখতে পাবে শুধু সেই নীলরঙা বোর্ডে পরিচিত সাদা হরফের একটা বাঁধা বয়ান। ইংরাজী ভাষার ‘লুটিশ’—যার বয়ান লর্ড কার্জনের:

এই স্থান সংরক্ষিত!

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় সমকাল থেকে বাঙালী মনীষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে নবদ্বীপ। তার দুটি ধারা—যেন ভাগীরথী আর জলাঙ্গীর মিলন। জলাঙ্গী—নব্যন্যায়, আর ভাগীরথী চৈতন্যভাবধারা। দ্বিতীয় ভাবধারার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত—তাই নব্যন্যায় চর্চার কথাই বলি—

প্রাক-চৈতন্যযুগ থেকেই বেদান্তের অনুশীলন হত—শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে খণ্ডনের একটা প্রবণতা দেখা যেত। এ অঞ্চলে ন্যায়-বৈশেষিকের প্রাধান্যের ফলে। আদি শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদের গুরুদেবের নামই ছিল ‘গৌড়পাদ’। নামেই হয়তো পরিচয়, তিনি ছিলেন—গৌড়জন। গৌড়ীয় নব্যন্যায়ের চর্চা যদিচ প্রাগ্বর্তীকাল থেকেই অন্তঃসলিল ধারায় প্রবাহিত ছিল, তবু তা ভীষ্মনাদিনী হয়ে উঠল বাসুদেব সার্বভৌমের (জন্ম আনুমানিক : 1420) সময় থেকে। বাসুদেব এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি (জ.আ: 1455) এ ধারার যুগ্ম-ভগীরথ। এবং স্মার্ত রঘুনন্দন।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ মহর্ষি গৌতম বিরচিত ন্যায়সূত্র। পরে ঋষি বাৎস্যায়ন রচনা করেন তার ভাষ্য, আর তারও পরে উদ্ভেদতকর প্রণয়ন করেন ন্যায়ের টীকা-টিপ্পনী। নব্যন্যায়ের চর্চা প্রধানত সীমিত ছিল মিথিলায়। গৌড়ীয় বিদ্যার্থীকে ঐ জ্ঞান আহরণের জন্য মিথিলায় যেতে হত। কী-ভাবে সেই নব্যন্যায় মিথিলা থেকে নবদ্বীপে আসে তা নিয়ে কিছু কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীর নায়ক কোথাও বাসুদেব সার্বভৌম, কোথাও বা তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি। নায়ককে সনাক্ত নাই বা করলাম, গল্পটা শোন—

গৌড়ীয় পণ্ডিত নব্যন্যায় অধ্যয়ন করতে মিথিলায় এসেছেন। মিথিলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পঞ্চধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করে স্বহস্তে রচনা করলেন নানান টীকা-টিপ্পনী। শিক্ষা সমাপনান্তে যখন তিনি গুরুর কাছে বিদায় চাইলেন তখন পঞ্চধর মিশ্র বললেন, ও কী বাবা। তোমার ঐ পুঁথিগুলি তো তুমি গৌড়ে নিয়ে যেতে পার না।

গৌড়ীয় পণ্ডিত সবিস্ময়ে বলেন, কেন গুরুদেব? এগুলি তো আমার স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি। এ তো আমার নিজস্ব সম্পদ?

গুরু বললেন, সে-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এগুলি যদি তুমি গৌড়মণ্ডলে নিয়ে যাও তাহলে ভবিষ্যতে তো সেখান থেকে আর কোন শিক্ষার্থী মিথিলায় আসবে না। আমি কী ভাবে সজ্ঞানে আমার মাতৃভূমি মিথিলার সর্বনাশ করি?

শিষ্য বলেন, যুক্তিপূর্ণ কথা। সে-বন্ধে আমাকে এ গুরু-গৃহে আরও এক সপ্তাহকাল বসবাসের অনুমতি দিন।

গুরু সহাস্যে বলেন, এক সপ্তাহ কেন, বাবা? তুমি স্বীকৃত হলে মিথিলারাজের কাছ থেকে উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি আজীবন মিথিলাবাসী হয়ে থাকতে পার।

তরুণ পণ্ডিত স্মিত হেসে বলেন, তা কেমন করে হবে, গুরুদেব? আমিও তো সজ্ঞানে আমার মাতৃভূমি নবদ্বীপের সর্বনাশ করতে পারি না।

সপ্তদিবস-রজনী শিষ্য ঐ চতুষ্পাঠীর এক রুদ্ধদ্বার গৃহে তাঁর রচিত টীকা-টিপ্পনী আদ্যস্ত কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। বিদায়কালে যখন রক্তহস্তে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন নব্যন্যায়ের বিভিন্ন সূত্র ও ব্যাখ্যা তাঁর মস্তিষ্ক-মঞ্জুষায় থরে থরে সাজানো।

গৌড়ীয় বিদ্যার্থীকে অতঃপর নব্যন্যায় চর্চার জন্য মিথিলায় যেতে হত না।

এই প্রচলিত কাহিনীর অনুপ্রেরণাতেই সতেন্দ্রনাথ তাঁর ‘বাঙালী কবিতায় লিখেছিলেন, ‘...পঞ্চধরের পঞ্চশাতন করি/বাঙালীর ছেলে ফিরে এল স্বপ্নে মিশের মুকুট পরি।’

কারও মতে ঐ নবীন গৌড়ীয় পণ্ডিত স্বয়ং বাসুদেব সার্বভৌম। সেটি ব্রান্ত হতে বাধ্য।

কারণ তিনি পক্ষধর মিশ্রের সমসাময়িক পণ্ডিত এবং পিতা নরহরি বিশারদের নিকটেই নব্যন্যায় শিক্ষা করেন—জীবনে কখনো মিথিলা যাননি। পুরী গেছেন, বারাণসী গেছেন, যথুরা-বন্দাবন পরিক্রমা করেছেন; কিন্তু মিথিলা নয়।

কারণও মতে এ কাহিনীর নায়ক রঘুনাথ শিরোমণি, যার আর এক নাম 'কাণভট্ট' শিরোমণি। তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য; তাঁর একটি চোখে দৃষ্টি-শক্তি ছিল না বলেই ঐ নাম। তিনিও কিন্তু পক্ষধর মিশ্রের কাছে নব্যন্যায় শিখতে যাননি।

তার মানে কি সত্যেন দত্ত ওটা ভুল লিখেছেন? পক্ষধরের পক্ষশাতন কোন বাঙালী পণ্ডিত করেননি? না, সেটাও ঠিক নয়। করেছিলেন। অযোধ্যা নয়, বাঙ্গালীর মনোভূমিই যেমন শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান, ঠিক তেমনি ঐ খণ্ডকাহিনীটি প্রচলিত প্রবাদ হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরিবেশিত কাব্যসত্য স্বত! সেই সত্যকাহিনীটি এবার বলি—

নব্যন্যায়ের এক জটিল তত্ত্বের সমাধান হচ্ছিল না। মৈথিলী পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে দ্বিমত। তখন মিথিলারাজ এক মহতী বিচার-সভার আয়োজন করলেন। একপক্ষে মৈথিলী বিদ্বৎসমাজের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র, অপরপক্ষে নবদ্বীপপন্থী গৌড়ীয় পণ্ডিতেরা। মিথিলারাজের নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছল নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজের মধ্যমণি বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট। বাসুদেব স্বয়ং সে বিচার-সভায় গমন করলেন না। পাঠিয়ে দিলেন নিজের প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণিকে। তাঁর সঙ্গে আর দুই পণ্ডিত—কুশদহ বিদ্বৎসমাজের জ্ঞানৈক তর্কসিদ্ধান্ত—যাঁর পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি, আর নলদ্বীপ ভট্টাচার্য বংশীয় বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত।

বিচার্য বিষয়টা যে কী, তা বুঝবার মতো বিদ্যা আমার নেই। একটি উদ্ধৃতি শুধু পরিবেশন করতে পারি, মহাপণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের “বঙ্গালীর সারস্বত অবদান (১ম)” গ্রন্থ থেকে। দেখুন, আপনারা ধরতাইটা ধরতে পারেন কি না—“বিচার্যের বিষয় ছিল সামান্য লক্ষণা-নামক ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অলৌকিক সন্নিকর্ষ।”

ঘটনাটা ১৪৮০-৮৫-এর ভিতর।

স্বয়ং বাসুদেব সার্বভৌমের পরিবর্তে গৌড়মণ্ডল থেকে তিন-তিনজন নব্যপণ্ডিত উপস্থিত হয়েছেন দেখে ক্ষুব্ধ হলেন মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র। যদিচ তিনি পূর্বপক্ষের দলপতি, তবু তাঁর শিষ্যত্রয়ীকে ঐ গৌড়াগত উত্তরপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বললেন। স্বয়ং নীরব শ্রোতার ভূমিকা অবলম্বন করলেন।

কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, মিথিলাপক্ষ বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। বাধ্য হয়ে এর পর পক্ষধর মিশ্র স্বয়ং বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির ক্ষুরধার যুক্তিতে তাঁর সমস্ত যুক্তিই ভেসে গেল। পক্ষধর সংযম হারালেন! তিনি ছিলেন স্বভাব কবি—শেষ পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি রঘুনাথের উদ্দেশ্যে একটি শ্লেষাত্মক শ্লোক রচনা করে তাঁকে আক্রমণ করলেন—

“বক্ষোজপানকুং কাণং! সংশয়ে জাগ্রতি স্মৃতিং
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥”

১ বক্ষোজপানকুং- যে বুকের দুধ খায়, অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুমাত্র

২ কাণ= কানা

তৎক্ষণাৎ ন্যায়াদিশ বিচারক তর্কযুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন। বললেন, মৈথিলী বৃদ্ধ পণ্ডিত নিজ স্বীকৃতিমতে পরাজিত! কারণ তাঁর যুক্তিতর্ক আর নৈর্ব্যক্তিক নয়। তা তরুণ উত্তরপক্ষ অবলম্বনকারীদের প্রতি প্রযুক্ত অহৈতুক কটুভাষা মাত্র। ব্যক্তিগত আক্রমণ!

এটিই হল কবি সত্যেন্দ্রনাথের ঐ অনবদ্য পংক্তিটির যথার্থ্য!

বাসুদেব সার্বভৌম পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের দ্বৈতবাদ স্বীকার করে নেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির এক অনবদ্য টীকা রচনা করেন। রঘুনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘অনুমানদীপ্তি’। পরবর্তীকালে জগদীশ তর্কালঙ্কার (জ:আ:1540) নব্যন্যায়ের আর এক স্তম্ভ। ঐর আর একটি কীর্তি: চৈতন্যদেবের প্রভাবে তিনি আচণ্ডালকে শিষ্যত্বদানে পরাজু হননি। বাস্তবে তাঁর কয়েকজন প্রখ্যাত শূদ্র শিষ্য ছিলেন। আরও অর্ধশতাব্দী পরে গদাধর ভট্টাচার্য, হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি নবদ্বীপের উজ্জ্বল রত্ন। মধুসূদন সরস্বতী বোধ করি অদ্বৈতবাদের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁর নামে একটি বহুল প্রচারিত শ্লোক আজও শোনা যায়—

“সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি মধুসূদন সরস্বতীঃ।

মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতীঃ ॥”

নবদ্বীপ-গৌরবের দ্বিতীয় ধারাটি চৈতন্য-আশ্রয়ী। সে তথা সর্বজনবিদিত।

শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি-বিজড়িত কত-কী আছে নবদ্বীপে, মায়াপুরে, শান্তিপুরে।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান যে নবদ্বীপধাম, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। প্রশ্ন: সেটি কি গঙ্গার পশ্চিমপারে? অথবা পূর্বে, জলাঙ্গী নদীর উত্তরে? যুক্তিগ্রাহ্য মত—চৈতন্যদেবের জন্মস্থান ঐ মায়াপুর। এ মতের পিছনে বহু পণ্ডিত, ভক্ত এবং পুরাতত্ত্ববিদদের সমর্থন। প্রাচীন ইতিহাস আর বৈষ্ণব গ্রন্থমতে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্বতটে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ জনপদকে মনে হয় প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা ‘কুলিয়া-পাহাড়পুর’। ভুললে চলবে না ভাগীরথীর মূল জলধারা তখন ভিন্ন খাতে বইত—জলাঙ্গী, মাথাভাঙা, গড়াই, ইছামতি তখন ছিল দুর্বার। ক্রমে তা পদ্মার পথ খুঁজে নেয়। পরম বৈষ্ণব নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস—যিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে, আর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর ভোগ নিজে হাতে রান্না করতেন—তিনি তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ ‘ভক্তি-রত্নাকরে’ লিখে গেছেন—

“নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।

যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥

যেছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।

তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥”

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাশীর দণ্ডী সমাজের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী—যাকে মহাপ্রভু নতুন নাম দিয়েছিলেন ‘প্রবোধানন্দ সরস্বতী’—তিনি তাঁর ‘নবদ্বীপ শতক’ গ্রন্থেও এই মায়াপুরের নাম উল্লেখ করেছেন।

১ বাগদেবীর জ্ঞানের সীমান্তে যেমন উপনীত হতে পেরেছিলেন মধুসূদন সরস্বতী, তেমনি মধুসূদনের জ্ঞান-সীমার পরিমাপ একমাত্র বাগদেবীরই পক্ষে করা সম্ভব।

এই সব বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। এই সব তীর্থ স্বচক্ষে দেখবেন, তাদের যাথার্থ্য বিচার করবেন—এমন মনোবাসনা নিয়ে তিনি চলেছেন নবদ্বীপে।

আমাদের কাহিনীর কালে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স বত্রিশ বৎসর। তখনো তিনি ‘মহারাজ’ হননি। সে খেতাব পেয়েছিলেন পরবর্তী দশকে, সিরাজ-বিতাড়ন নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করায়। প্রজানুরঞ্জন, গুণগ্রাহী, নিজে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত, শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু কটকৌশলী, প্রাচীনপন্থী, আর আদিরসের দিকে তাঁর ঝোঁক। নবদ্বীপ থেকে তাঁর রাজধানী প্রায় সাত ক্রোশ দূরে—‘গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর’। গোয়াড়ি গ্রামের নামটা যুক্ত করতে হয় ‘খানাকুল-কৃষ্ণনগর’ থেকে পৃথক করতে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী অতি ব্যাপক অর্থে। ন্যায় ও বেদান্তের পণ্ডিত, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, কুস্তিগীর, লাঠিয়াল, মৃৎশিল্পী, হাস্যরসিক—প্রভৃতি সকলেই তাঁর অনুগৃহীত। আকবর বাদশাহের মতো তাঁর সভাতেও নবরত্নের প্রভা! স্মার্ত রঘুনন্দনের বংশধর হরিরাম তর্কালঙ্কার, অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন পুরুষ শান্তিপূর বিদ্বৎসমাজের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গোস্বামীপাদ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি, নবদ্বীপের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর রাজসভার তিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কালীভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন এক পদ্মরাজ মণি। আর ঠোঁড়ো-ভুরশুটের সেই বাণীর বরপুত্র—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সে সভার কমলহীরে! আকবর-সরবারে বীরবলের প্রতিচ্ছায়া ঘূর্ণী গ্রাম নিবাসী হাস্যার্ণব গোপালচন্দ্র ভণ্ড!

এসব তথ্যই মোটামুটি জানা ছিল রূপেন্দ্রনাথের। তাঁদের সকলের খ্যাতি তখন গোটা রাঢ়খণ্ডে বিস্তৃত। তিনি এসব কথা আরও বিস্তারিতভাবে শুনেছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে। তিনিও ঐ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী—যদিও তিনি কৃষ্ণনগর রাজসভায় কদাচিৎ পদধূলি দিভেন। বস্তুত তিনি ছাড়াও রাঢ়খণ্ডের অনেকানেক পণ্ডিত ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী। যেমন হুগলি গুপ্তিপাড়ার রামদেব তর্কবাগীশের সুযোগ্য পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তিনি প্রায়ই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আহ্বানে কৃষ্ণনগরে তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতে আবির্ভূত হতেন। তিনি মুখে মুখে কবিত্বপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোকে ‘পাদপূরণ’ করতে পারতেন। পরবর্তীকালে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উদ্যোগে বাঙলাদেশের তদানীন্তন প্রধান কয়েকজন স্মার্ত পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় যখন ‘বিবাদার্ণবসেতু’ সংকলন-গ্রন্থ রচিত হয়, তখন বাণেশ্বর তার প্রধান রূপকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।



রূপেন্দ্র অস্বারোহণে যখন শহর গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরে এসে পৌঁছলেন তখন মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। পথপ্রদর্শক তাঁকে প্রথমেই নিয়ে গেল বাসুদেবের আতিথিশালায়। খড়ো আটচালা। মাটির দেওয়াল, মাটির মেজে; কিন্তু সুনিপুণভাবে নিরুপনো। বাহিরের দেওয়ালে

কিছু অর্ধাংকীর্ণ পোড়ামাটির মূর্তি—স্থাপত্যের ভাষায় যাকে বলে ‘অপ্টো-রিলিভে’। শিল্পীর এলেম আছে—মূর্তিগুলি অতি অপরাধ; কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাতে কিছু স্থূলতার পরিচয়। রূপেন্দ্রনাথ পুরী-ভুবনেশ্বর-কোণার্ক দেখেননি। তাঁর কর্ণধর রক্তিম হয়ে ওঠে।

মাঝখানে একটিই বড় ‘হল’-ঘর। আটটি শয্যা পাতা—কাঠের তক্তাপোষ। তার উপর শয্যা। স্ফটিক অধিকৃত, অষ্টম শয্যাটি নির্দেশ করে পথপ্রদর্শক সরকার-মশাই বললে, এটি আপনার।

রূপেন্দ্র তাঁর ধূলি-ধূসরিত পরিচ্ছদ খুলে চৌকির উপর রাখলেন। কক্ষস্থ সাতজন অতিথিই কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাঁকে দেখছিল। কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। একটু পরেই একটি মহিলা এনে সরকার-মশাইকে প্রশ্ন করে, ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ, মতির-মা, এই ঠাকুরমশাই দিনকয়েক এ বিছানায় থাকবেন। সব ব্যবস্থা করে দিও।
উনি মহাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ এবং ভেষগাচার্য। দেখ, যেন আমাদের বদনাম না হয়।

মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল। বললে, বদনাম হবে কেনে-গো, আমি আছি না?

তারপর রূপেন্দ্রের দিকে ফিরে বললে, ছান করবেন তো, বাবা?

—করব। নদী কি কাছে?

—খড়ে রসি-দুয়েক! চান তো কুয়োর জলও তুলে দিতে পারি।

—‘খড়ে’ মানে? খড়ে কী?

—জলাঙ্গী নদীর ডাক নাম।

—তা হলে খড়েতেই স্নান করে আসব। কুয়োর জল লাগবে না।

—বেশ কথা। আমি সঙ্গে নোক দিচ্ছি। কাপড় গামছা নে-যাবে আর পথ দেখাবে। ফলার কী হবে, কাঁচা না পাকা? অন্নসেবা করবেন তো?

রূপেন্দ্রকে জবাব দিতে হল না। সামনের চৌকিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ থেলো হুঁকা থেকে মুখটা সরিয়ে বললেন, না! তুমি কাঁচা-ফলারের আয়োজনই করে দাও, মতির-মা!

মতির-মা তাঁর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখল। হেসে বললে, সবাই যে আপনার মতো ছুঁমার্গী হবেন এমন তো কতা নেই!

রূপেন্দ্র বুঝে উঠতে পারেন না, ব্যাপারটা কী! যা হোক প্রথমই কক্ষবন্ধুর বিরাগভাজন হওয়াটা ঠিক নয়। বললেন, না, অবেলায় আর অন্নসেবা করব না। আপনি অনুগ্রহ করে কাঁচা ফলারের আয়োজনই করুন।

মেয়েটি জিহ্বা দংশন করল। পানদোস্তায় রাঙা টুকটুক ছোট্ট জিব। বললে, আমারে আবার ‘আপনি’ কিসের গোসাই ঠাকুর? আমি যে সেবাদাসী!

এতক্ষণ দ্বীলোকটির দিকে চোখ তুলে তাকাননি। এবার তাকাতে হল। সধবা। বয়স দেড়-কুড়ির কাছাকাছি। প্রসাধনের পারিপাট্য নজর কাড়ে। ‘সেবাদাসী’ শব্দটায় তার জড়িত নির্ণয় করা যায়।

মতির-মা নিজস্ব হতে বৃদ্ধ ঘনিজে আসেন। বলেন, মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। কিন্তু বামুন শুনেই নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো বিধান দিয়ে বসেছি। মহাশয় বিরক্ত হননি তো?

—না, না, মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। এখন অন্নসেবা না করাই বিধেয়।

হৃদয়

—সেজন্য নয়, মহাশয়! এখানে যারা অন্নপাক করে তাদের সব শালার গলায় পৈতে আছে, কিন্তু শালারা বামুন কিনা আমাদের সকলেরই সন্দেহ। বিশ্বাস না হয় ভট্টাচার্য-মশাইকে শুধিয়ে দেখুন—

ভট্টাচার্য-মশাই ও-প্রান্ত থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলে ওঠেন, বুয়েছেন, একদিন এক শালাকে পাকড়াও করেছিলাম। শালা গায়ত্রীমন্ত্রটাও উচ্চারণ করতে পারল না!

রূপেন্দ্রনাথের মনটা খারাপ হয়ে যায়। এইসব লোকের সঙ্গে তাঁকে একই গৃহে বাস করতে হবে। প্রতিটি বাক্যে যারা ঐ ‘মধুর’ আত্মীয় সম্বোধনে অভ্যস্ত। হাঁকো-হাতে বলেন, আমরা সবাই কাঁচা সিধা নিই, পালা করে স্বপাক রন্ধন করি। ও-বেলা সে ব্যবস্থাই করা যাবে। আসুন, একটু তামাক ইচ্ছা করুন। কড়ি-বাঁধা বামুনের হাঁকো।

রূপেন্দ্রনাথ জানালেন, তিনি তামাক-সেবায় অভ্যস্ত নন। বৃদ্ধ বলেন, আমার নাম নিবারণচন্দ্র, ঠাকুরের নাম ‘অনুকূলচন্দ্র ঘোষাল। আদি নিবাস গুপ্তিপাড়া; বর্তমানে এই শালা দস্তর বৃত্তিভোগী। মশায়ের পরিচয়?

রূপেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিলেন। জানালেন, তিনি মাত্র দু-একদিন থাকবেন। গৃহস্বামীর চিকিৎসা করতে এসেছেন।

নিবারণচন্দ্র আরও ঘনিজে এলেন। তাঁর মুখে দুর্গন্ধ। রূপেন্দ্রের কর্ণমূলে বললেন, শিবের অসাধ্য ব্যামো মশাই! কুষ্ঠ! চিকিচ্ছে নেই!

—কুষ্ঠ! আপনি কী করে জানলেন?

নিবারণচন্দ্র সরবে তাহাবু ‘ইচ্ছা’ করতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে তখনই ফিরে এল মতির-মা। সঙ্গে একটি অল্পবয়সী ছেলে—যে ঠঁর কাপড়-গামছা নিয়ে পথ দেখিয়ে ঘাটে যাবে।



দ্বিপ্রহরে নিবারণচন্দ্র তাঁর দুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাস নিয়ে পুনরায় ঘনিজে এসে বসলেন। অন্যেরা দিবানিদ্ৰায় মগ্ন। নিবারণ দিবাভাগে নিদ্ৰা দেন না—‘দিবা মা শান্তি’—শান্তের বচন। উপায় নেই, ভদ্রতার খাতিরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সেই দুর্গন্ধযুক্ত সুখদুঃখের কথা কিছুক্ষণ শুনতে হল। সদ্ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। পিতৃদেবের সংস্কৃত টোল ছিল—গুপ্তিপাড়া গ্রামেই। নিবারণও প্রথমে পৈত্রিক বৃত্তিই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ঠঁর গ্রামস্থ শ্যালকেরা শ্যালক-পুত্রদের নাকি ‘সমোস্কৃত’ শেখাতে চায় না। সবাই ফারসী শিখবে! নবাব সরকারে চাকরি নেবে। সমোস্কৃতির অং-বং মস্ত শিখে কী লাভ? চাল-কলা-নৈবেদ্যে কারও মন ওঠে না। নিবারণচন্দ্রের দুই বিবাহ, দুই স্ত্রীর সর্বসাকুল্যে সাতটি সন্তান। একটি মাত্র কন্যাকে পার করেছেন; ‘পার’ অর্থে সিথিতে সিদুর দেওয়ার আয়োজন মাত্র। সে আবাবীও ঠঁর অল্পধ্বংস করছে—জামাতা বাবাজীবন বিবাহ-বিশারদ। তাকেও দোষ দেওয়া যায় না। চারকুড়ি বর্ষে নিয়ে তো কেউ সংসার ধর্ম করতে পারে না! বছরে দুবার আসে। পার্বণী নিয়ে যায়। ভগবান রক্ষা করেছেন—সেই ঝাঁকি-দর্শনের ফলে কোন নাতি-নাতনি এসে সংসারের ভারবৃদ্ধি করেনি।

একনাগাড়ে বকবক শুনতে ভাল লাগছিল না। রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, এখানে আপনাকে কী-জাতীয় কাজ করতে হয়? দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছেন বলে জানতে চাইছি।

—আমার কাজ সাঁঝের ঘোরে। দত্তজা হুজুরকে ‘সমোস্কৃত-খেউড়’ শোনানো।

‘সমোস্কৃত-খেউড়’ শব্দটির অর্থ অম্বয়-ব্যাখা করে বুঝিয়ে দেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁকে উপস্থিত হতে হয় ঋষধ্বজের প্রমোদকক্ষে। ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ জাতীয় আদিরসাত্মক সংস্কৃত কাব্যপাঠ করে শোনাতে হয়। ঋষধ্বজ সংস্কৃত জানেন না; কিন্তু দেবভাষার এসব বিশেষ কেছার দিকে আকর্ষণ। শুধু পাঠ নয়, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয়। সক্ষেদে বলেন, বললে বিশ্বাস করবেন না বাঁড়ুজ্জেমশাই, পাশগুটা জেনে বুঝে এই বুড়োটাকে নাকাল করে। সামনে মদের গেলাস, দুপাশে দুই ষণ্ডামার্ক যৌবনবতী উপপত্নী; আর শালা ন্যাকা সেজে বলে—এখানটা তো ঠিক বুঝলাম না পণ্ডিতমশাই! ‘বিপরীত-রত্নাতুরা’ শব্দটার মানে কি হল? তোমরা বুয়েছ? আর দুই হারামজাদী সব জেনে-বুঝে নেকী সেজে বলে, ‘না পণ্ডিতমশা, আমরাও বুঝিনি! ওর মানে কী?’ বুঝুন কাণ্ড! আমার তিনকুড়ি বয়স হল—এ জোয়ান মাগী দুটোকে বুঝিয়ে বলতে হবে, ‘বিপরীত রত্নাতুরা’র মানে। ওরা সব জানে, সব বোঝে—এ শুধু বুড়ো মানুষকে নাকাল করা।

রূপেন্দ্র বলেন, দু-দুটো! একসঙ্গে? কেন?

—এ যে শাস্ত্রে বলেছে—‘নাল্পে সুখমস্তি’! টাকায় যার ছাতা ধরছে সে এক-কুড়ি এক সঙ্গে নিয়ে বসলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? বললে পেতায় যাবেন না মশাই—দুটো মাগীকে নাকি দুই পাশবালিশ করে দু পাশে নিয়ে রাতে শোয়!

রূপেন্দ্র বলেন, থাক ঘোবাল মশাই। এ আলোচনা আমার ভাল লাগছে না।

—বলতে কি আমারই ভাল লাগছে বাঁড়ুজ্জেমশাই? আমারও তো দু-দুটি ধর্মপত্নী—কিন্তু দুটোকে নিয়ে এক বিছানায় কোনদিন শুইচি? বাৎসর্যয়ন বলেছেন পর্যায়ক্রমে...

রূপেন্দ্র উঠে পড়েন। বলেন, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি একটু ঘুরে আসি।

অষ্টটি প্রাসঙ্গে বাঁধা আছে। সৈনগুপ্ত। ইতিমধ্যে সেও দানাপানি পেয়েছে। প্রভুকে দেখেই হ্রেবান্ধনি করল। রূপেন্দ্রনাথ ভেবে দেখলেন, ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দুর্গন্ধযুক্ত—উভয়াথেরি—অভিযোগ শোনার চেয়ে শহরটা এক চক্রর ঘুরে এলে মন্দ হয় না। নদীয়ায় অনেক অনেক দ্রষ্টব্য। তিনি দু চারদিন থাকবেন মাত্র। তাও বাসস্থানটা পরিবর্তন করে কোন পাছশালায় আশ্রয় জুটিয়ে নিতে পারলে। একটি মধ্যাহ্নই বা অপব্যয় করেন কেন? বাজারের দিকে গিয়ে লাভ নেই। মধ্যদিনে দোকানপাঠ সম্ভবত সবই রুদ্ধদ্বার। কোথায় যাবেন? ঘুরী গ্রামে মৃৎশিল্পীদের বাস। তাদের হাতের কাজ নাকি অপূর্ব। কিন্তু খরমধ্যাহ্নে সে সব বিপণীও সম্ভবত রুদ্ধদ্বার। মনে পড়ে গেল, এই কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে আছে দোগাছিয়া গ্রাম। সেখানে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মাথার উষ্মীষটি সুরক্ষিত। একটা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য—মহা পুণ্যতীর্থও। কিন্তু ঐ সঙ্গে মনে পড়ে গেল—সাধারণ দর্শক তা বৎসরের একটি চিহ্নিত দিনেই দেখবার সৌভাগ্যলাভ করে। সে দিনটির মাত্র এক পক্ষকাল বাকি: অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে দোগাছিয়ায় ‘মুলী মহোৎসবে’ একটি মেলা হয়। তখনই উষ্মীষটি সর্বসাধারণকে দেখানো হয়। ফলে দোগাছিয়া যাওয়ার অর্থ হয় না।

দেবপল্লীর নৃসিংহ মন্দির দেখে এলে কেমন হয়? দেবপল্লী শহর কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মাত্র দেড় ক্রোশ দূরত্বে। মন্দিরের দ্বার খোলা থাকতে পারে। পথের নির্দেশ জেনে

নিয়ে সেদিকেই রওনা দিলেন অশ্বপৃষ্ঠে।

দেবপল্লী বা দেপাড়া একটি প্রাচীন জনপদ। এ অঞ্চলের ঐ নৃসিংহদেবের মূর্তিটির অসীম মাহাত্ম্য। নদীয়া রাজার প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয় থেকে এই দেব-বিগ্রহের নিত্য সেবার ব্যবস্থা। জনশ্রুতি এ মূর্তি কেউ নির্মাণ করায়নি। ইনি অনাদি বা স্বয়ংপ্রকাশ। প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে অম্লোৎসব হয়। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের সদ্যোজাত সন্তানের পিতা-মাতা সারা বছর ধরেই এই দেপাড়ায় আসেন—নৃসিংহদেবের ভোগ দেন—আর ঐ দেবতার প্রসাদী অম্নেই নবজাত শিশুর অন্নারস্ত অনুষ্ঠান হয়।

অনতিবিলম্বে উপনীত হলেন দেবপল্লীতে। পথের ধারে জঙ্গলাকীর্ণ উচু টিপির একাংশে নৃসিংহদেবের মন্দির। সুবৃহৎ মন্দির^১। ঐ সুউচ্চ টিপি দেখে বোঝা যায়, এখানে পূর্বযুগে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পাশেই প্রকাণ্ড বিল। তার একাংশের নাম ‘চামটার বিল’। এই বিল থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করেই কি ঐ জনপদ গড়ে উঠেছিল? ‘চামটার বিল’ নামটি হয়েছে ‘চামুণ্ডার বিল’ শব্দ থেকে। এক কালে এই বিলের পাশে চামুণ্ডা দেবীর একটি মন্দির ছিল নিশ্চয়। হয়তো তারও পূর্বে ছিল এক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম^২।

সৌভাগ্য রূপেন্দ্রনাথের। মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল। পুরোহিত ঔকে চরণামৃত দিলেন। কষ্টিপাথরের প্রকাণ্ড দেবমূর্তি। বহুস্থানেই অঙ্গহানি হয়েছে। সাধারণত অঙ্গহীন হলে দেবতার পূজা বন্ধ হয়ে যায়। নৃসিংহদেবের তা হয়নি—যেহেতু তিনি অনাদি বিগ্রহ! জনশ্রুতি নৃসিংহদেবের ভ্রূমধ্যে একটি পরশমণি ছিল। সেটি অপহরণের উদ্দেশ্যেই ঐ অঙ্গহানি। যে তস্কর সেই পরশপাথরখানি খুলে নিয়েছিল সে তা ব্যবহার করতে পারেনি—এটাই তস্করের দুঃখ এবং সাধুর সাহুনা। দেবতার ভ্রূ মধ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ায় স্পর্শমণি তার অলৌকিক গুণটি হারিয়ে ফেলে। যতদিন দেবতার ভ্রূমধ্য ছিল ততদিন নাকি এয়োজীর দল ঐ পাথরে হাতের নোয়া ছুঁইয়ে সোনার বালা পরে ঘরে ফিরত। দেবতার অঙ্গচ্যুত হবার পর সেই পরশমণি হয়ে গেল মামুলি পাথর! দেবমূর্তির উচ্চতা দ্বি-হস্ত পরিমাণের অধিক। পদতলে প্রহ্লাদ, অঙ্কে হিরণ্যকশিপু।

রূপেন্দ্রনাথ যখন শহরে ফিরে এলেন তখন পড়ন্ত বেলা।

নিবারণচন্দ্র অপেক্ষা করছিলেন। প্রস্ন্ন করেন, কোথায় গেছিলেন?

—দেবপল্লী। নৃসিংহদেবের মন্দির দেখে এলাম।

—বড় জাগ্রত দেবতা। চলুন, এবার দণ্ডবাড়ি যাই!

বেশ বড় প্রাসাদ! দ্বিতল। সামনে লোহার সিং-দরোজা। খিলানের উপর খাবা-তোলা এক সিংহ মূর্তি। কার্নিশে অসংখ্য গোলা পায়রা। ঔদের দেখতে পেয়েই দণ্ডজার সেই সরকারবাবু—যে ঔকে সোএগাই থেকে নিয়ে এসেছে—সে এগিয়ে এল। নিবারণচন্দ্রকে বললে, আপনি আজ আসুন পণ্ডিতমশাই। আজ সন্ধ্যায় পাঠ হবে না। আপনার ছুটি।

^১ রূপেন্দ্রনাথ দুষ্ট মন্দির বর্তমানে অবলুপ্ত। এখন—চল্লিশ বছর আগে দেখেছি—সেই আদিম মন্দিরের ধ্বংসস্থল—ইতস্তত বিক্ষিত কালো আর পিঙ্গল বর্ণের বালি-পাথর বা স্যান্ডস্টোন। এখনও তা দেখা যায় কিনা জানি না। পরে একটি ছোট মন্দির তৈরী করা হয়েছে বলে শুনেছি।

^২ চল্লিশের দশকে এখানে একটি ব্রাহ্মধাতুর ‘উগ্রভারার’ মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে।

রূপেন্দ্রকে বললে, আপনি ঐ বৈঠকখানায় গিয়ে বসুন। আমি হুজুরের কাছে এতেনা পাঠাচ্ছি।

নিবারণচন্দ্র বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন। সরকারবাবু অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল। রূপেন্দ্রনাথ পায়ে পায়ে অগ্রসর হয়ে আসেন বৈঠকখানায় দিকে।

প্রকাণ্ড ঘরটি। একদিকে বিরাট বড় একটা তক্তাপোষ। তার উপরে জাজিম পাতা। তিনচারজন পণ্ডিত বসে তালপাতার পুঁথি নকল করছেন। অদূরে একটি আরাম-কেদারায় নির্লিপ্তভাবে বসেছিলেন একজন। বয়স ত্রিশের কোটায়। শ্যামবর্ণ। মাথায় বাবরি চুল। শুকচঞ্চু নাসা। চোখদুটি স্বপ্নালু। হ্র মধ্যে একটি শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। নগ্নগাত্র উত্তরীয়—সামবেদী দীর্ঘ উপবীত। রূপেন্দ্র প্রবেশ করতেই দাঁড়ালেন। যুক্তকরে বললেন, নমস্কার। আপনি নিশ্চয় সেই ধর্মন্তরি! আপনি আজই পৌছাবেন; আমরা জানতাম।

অনুলেখকেরা চোখ তুলে ঠুঁকে দেখল। পুনরায় যে যার কাজে নিমগ্ন হল।

রূপেন্দ্র প্রতিনমস্কার করে বললেন, আপনি ঘটন্যুচ্চ্রে আমার পরিচয় জানেন; কিন্তু আমি মহাশয়ের পরিচয় জানি না।

যুবক তখনও যুক্তকর। সহাস্যে বলেন, বিবৃত করার মতো পরিচয় যে নাই, কী বলব? আমি নদীয়াধিপতি শ্রীমন্ মহারাজের বৃত্তিভোগী এক সামান্য কবি!

রূপেন্দ্রের মনে পড়ে গেল গুরুদেবের বর্ণনা। হুবহু মিলে যাচ্ছে। তিনিও সহাস্যে বলেন, দর্শনমাত্র আপনি আমাকে সনাক্ত করেছেন। আমারও তাই করা কর্তব্য। ...আপনার আদিনিবাস পেঁড়ো, ভূরশুট! ঠিক হয়েছে?

যুবকের আয়ত স্বপ্নময় চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল। বলেন, তাহলে আমি কি ভুল শুনেছি? আপনি চরক-সুশ্রুত নয়, 'ভৃগু' আয়ত্ত্ব করেছেন? আমার আদিনিবাস জানলেন কী করে?

—সহজেই! আপনি বাকপ্রয়োগে 'অ'-প্রত্যয়টি বিনয়বশত পরিত্যাগ করায়।

—'অ'-প্রত্যয়? অসমর্থ্য?

—নিজের পরিচয় দিলেন 'সামান্য কবি' বলে। 'অ'-প্রত্যয় বাদ গেছে কিনা তা আপনি বুঝবেন না, আপনার বঙ্গভাষায় অধিকার কম! বঙ্গ-সরস্বতীর বরপুত্র অসামান্য কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এ স্থলে উপস্থিত থাকলে বুঝতেন!

বিস্ময়বিমুঢ় ভারতচন্দ্র এগিয়ে এসে ওঁর দুটি হাত ধরে বলেন, ইতিপূর্বে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে বলতে চান?

—না। এই আমাদের প্রথম পরিচয়। আপনি ইতিপূর্বে আমাকে দেখেননি, কিন্তু আমি আপনাকে চিনেছি। ঘনিষ্ঠভাবে!

—ঘনিষ্ঠভাবে! কোথায়?

—আপনার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। ত্রিবেণীতে। আমার গুরুদেবের সংকলনে আপনার সে দ্রব্যগ্রন্থের একটি অনুলিপি পুঁথি আছে।

—আপনার গুরুদেব...?

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে রূপেন্দ্র বললেন, আমার শিক্ষক মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ ফাল্গুন্য।

ভারতচন্দ্রও উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলেন, এ তো বড় অদ্ভুত কথা শোনালেন আপনি! তাঁর সংকলনে এ দীন কবির গ্রন্থ!

দুজনে বসলেন পাশাপাশি। রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, বামধ্বজ দত্তমশাই তাঁতের কাপড়ের কেনাবেচা করেন শুনেছি। তাঁর দরবারে আপনি?

একটু আগেই যে নির্মল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছিল কবিবরের মুখমণ্ডল তাতে যেন একটি ছায়াপাত ঘটল। বললেন, আমার পরবর্তী কাব্যের কিছু অংশের অনুলিপি করাচ্ছেন দত্ত-মশাই। মূল পাণ্ডুলিপি থেকে—ঐ যে ঠাণ্ডা করছেন। সমস্ত গ্রন্থটি নয়, অংশবিশেষ। প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। স্বয়ং উপস্থিত থেকে অনুলিপি হয়ে গেলে নিয়ে যাব বলে বসে আছি। মূল পাণ্ডুলিপি তো—খোয়া গেলে সর্বনাশ!

রূপেন্দ্র উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বলেন, আপনার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ! কী নাম? কী বিষয়বস্তু?

—না, একে ঠিক ‘পরবর্তী গ্রন্থ’ বলা যায় না। ‘অন্নদামঙ্গলের’ই পরবর্তী কিছু অংশ। পূর্ব অংশের সঙ্গে সংযোজন করা হবে।

—কেন? আমার তো মনে হয়েছিল ‘অন্নদামঙ্গল’ সুসমাপ্ত।

মান হাসলেন ভারতচন্দ্র। বললেন, অহো ভাগ্য! আপনি কেন একজন রাজাধিরাজ হলেন না? তাহলে আপনার সভাকবি হবার জন্য আর্জি পেশ করতাম।

এ বক্তব্যের অর্থগ্রহণ হল না। রূপেন্দ্র বলেন, দু একটি পৃষ্ঠা দেখতে পারি?

—আপনার অভিরূচি এবং আমার সৌভাগ্য।

অনুলিপিকারকেরা যে পৃষ্ঠাগুলি অনুলেখন করে সরিয়ে রেখেছে তার একটি তুলে নিয়ে পড়তে থাকেন।

প্রথম পংক্তিটোতেই খটকা লাগল—‘গিরি অধোমুখে কাঁদে, চকোরি পাইয়া চাঁদে...’

কিসের বর্ণনা? পূর্বাপর পারস্পর্য বুঝে নিতে আগের পৃষ্ঠাটি তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে গৃহভৃত্য এসে রায়গুণাকরের হাতে একটি কড়িবাঁধা থেলো হুকো দিয়ে গেছে। তিনি গুড়ুক-গুড়ুক টানছিলেন, আর আড়চোখে পাঠককে লক্ষ্য করছিলেন—তার ভ্রুকুণ্ডন, তার ওৎসূকা, তার আগ্রহ। লক্ষ্য হল, পর পর সাত-আটখানি পৃষ্ঠা দ্রুত নিশ্বাসে পাঠ করে রূপেন্দ্রনাথ সেগুলি যথাস্থানে নামিয়ে রাখলেন। আরও অনেকগুলি পৃষ্ঠা অপঠিত থাক দেওয়া ছিল—কিন্তু রূপেন্দ্র সে দিকে হাত বাড়ালেন না। কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখখানি।

রায় গুণাকর প্রথর বুদ্ধিমান। বুঝলেন। তবু প্রশ্নটা পেশ না করে থাকতে পারলেন না, কই, কেমন লাগল বললেন না যে?

রূপেন্দ্রনাথ স্পষ্টবক্তা। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ পাঠ করে এককালে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সংস্কৃত নয়, সর্বজনবোধ্য সহজ বাঙলায় যে এমন সুললিত কাব্য রচনা করা সম্ভব, এটা যেন সেদিন স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হয়নি তাঁর। বস্তুর নদীয়া রাজসভার ঐ মধ্যমণিকে প্রত্যক্ষ করার, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার দূরন্ত বাসনা নিয়েই এতটা মুগ্ধ এসেছেন। মনের পটে কবির যে মূর্তি একেছিলেন তার সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাই দর্শনমাত্র

তাকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। কিন্তু ঐ আট-দশটি পৃষ্ঠা পাঠান্তে তাঁর মোহভঙ্গ হয়ে গেছে! মহাকবির অবক্ষয়ে তাঁর অন্তর ক্ষতবিক্ষত। এ কী অশ্লীল রচনা—কী ক্লদান্ত দৈহিক মিলন-বর্ণনা! যেন কবি রায়গুণাকর তাঁর হৃদপদ্মের কোরকটি বাণীর পদতলে অর্ঘ্য দিতে গিয়ে ভুল করে বারবনি তাঁর চরণতলে অঞ্জলি দিয়েছেন! সদ্যপরিচিত কবিকে একথা বলতে বাধল।

কবি হয়তো বুঝলেন, হয় তো বুঝলেন না। বললেন, বাঁড়জ্জেশমশাই! কবির ভাগ্যে দু-জাতের বিভ্রম। এক: অরসিককে রসনিবেদন; দুই: সুরসিকের উপেক্ষা! প্রশংসা না করতে পারেন তো তিরস্কারই করুন। নীরব কেন পাঠক?

রূপেন্দ্রের নাসাপুট স্ফীত হয়ে উঠল। বললেন, “সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। অপ্রিয়ঞ্চাপৃতঞ্চাপি প্রিয়ায়াপি হিতং বদেৎ॥”

ভারতচন্দ্র অধোবদন হলেন। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, দীর্ঘ এক বৎসর ধরে আমি যা রচনা করেছি তার মূল্যায়ন কি ঐ কয়খানি পৃষ্ঠা পাঠ করে করা যায়?

রূপেন্দ্র স্পষ্টবক্তা। বললেন, অন্ন সুপরিপক্ক হয়েছে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দু একটি চাউলের বেশি পরীক্ষা করতে হয় না।

ভারতচন্দ্র একটু ঝুঁকে আসেন। প্রায় কানে কানে বলেন, কিন্তু আমি তো এক হাঁড়ি আদরস রক্ষন করিনি, পাঠক! পঞ্চব্যঞ্জন পরিবেশনের বাসনা যে আমার! নবরসের পাকে প্রস্তুত সে আহাৰ্য্যপাত্রের একটি প্রান্ত থেকে আপনি স্বাদ গ্রহণ করেছেন। ঘটনাচক্রে সেটি নিম্ন-বেগুন! তা থেকেই আপনি বুঝে নেবেন, পরমাম্রটা উৎথরেছে কি না?

রূপেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তর করলেন না। কথাটা ভাববার।

ভারতচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করেন, আপনি ভেবগাচার্য! বিষশ্ফোটক অস্ত্রোপচার করেছেন কখনো?

এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না। বলেন, করেছে। সে-কথা কেন?

—সেই খণ্ডমুহুর্তে যদি আপনাকে আমি দেখতাম, আর এই ধারণা নিয়ে যেতাম যে, ঐ লোকটার দু হাতে শুধু রক্ত আর পুঁজ, তাহলে আমার সে সিদ্ধান্ত নির্ভুল?

রূপেন্দ্রনাথ চমকিত হন। কিন্তু প্রত্যুত্তর দেবার অবকাশ হল না। তার পূর্বেই সেই সরকার-মশাই ফিরে এলেন অন্দরমহল থেকে। রূপেন্দ্রকে বললেন, আজ তো রুগী দেখা হবে না, কবিরাজ-মশাই। উনি অসুস্থ। দেখা করতে পারছেন না। কাল সকালে আপনাকে খবর দেব।

রূপেন্দ্র সবিস্ময়ে বলেন, বুঝলাম না। তিনি যদি অসুস্থই হয়ে থাকেন তাহলে কবিরাজের প্রয়োজনই তো সর্বাগ্রে।

সরকারমশাই মাথা চুলকান। কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁকে রক্ষাক্ষেপের কবি ভারতচন্দ্র। বলেন, প্রয়োজন হবে না। এ রোগের প্রতিষেধক ঙ্গদের জানা। হয়তো কিছু তেঁতুলগোলা জল খাওয়াবেন। বারকয়েক বমি হয়ে গেলেই সুস্থ বোধ করবেন উনি।

দিনের আলো কমে এসেছে ইতিমধ্যে। অনুকারকের দল মূল পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলি রজ্জুবদ্ধ করে নমস্কারান্তে বিদায় নিয়েছে। ভারতচন্দ্র সেগুলি বগলদাবা করে রূপেন্দ্রের সঙ্গে ঘর থেকে বার হয়ে আসেন। জানতে চান, কোথায় উঠেছেন আপনি?

রূপেন্দ্র তা জানালেন। এ কথাও বললেন যে, সেই ক্রেদান্ত পরিবেশটি তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি জানতে চাইলেন, এখানে অর্থমূল্যে কোন পাঠশালায় রাত্রিবাসের আয়োজন হতে পারে কি না।

কবি বললেন, পারে। তবে আমাকে যদি কুসঙ্গ বলে না মনে করেন, তাহলে আপনি আমার গৃহেও অতিথি হতে পারেন।

রূপেন্দ্র ঠাঁর হাত দুটি ধরে বলেন, এ কী বলছেন, কবি! বিশ্বাস করুন, আমি নদীয়ার এসেছি যে কটি বিষয় দেখব বলে তার ভিতরে ছিল ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের রচয়িতা। না হলে দর্শনমাত্র কেমন করে আপনাকে চিনব বলুন? কিন্তু এই অবেলায় আমাকে আপনার ভদ্রাসনে নিয়ে গেলে কবিপত্নী অহেতুক বিরত হয়ে পড়বেন।

ভারতচন্দ্র হেসে ফেলেন। বলেন, আপনার আশঙ্কা অমূলক। আমার ভার্যা আছে তার পিত্রালয়ে। আমি এখানে একটি ভৃত্যকে নিয়ে থাকি। আমার আবাল্যসহচর পুরাতন ভৃত্য। কিছু দুর্মুখ। আমার সহে গেছে। আপনাকেও মেনে নিতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও অসুবিধা নেই। বরং আমার কিছু স্বার্থ আছে।

—স্বার্থ! সেটা কী?

—তার পূর্বে বলুন, আমরা কি দণ্ডবাড়ি থেকে সাত পা পার হয়ে আসিনি।

—সাত-পা! অনেকক্ষণ। কিন্তু এ কথা কেন?

—শাস্ত্র বলেছেন, ‘আত্মঃ সপ্তপদী মৈত্রী’^১। সূতরাং আর ‘আপনি-আজ্ঞে’ নয় রূপেন্দ্র! এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দিই। তুমি আমার ভদ্রাসনে আতিথ্য নিলে আমি পঞ্চব্যঞ্জনের পাত্রটি স্বহস্তে তোমাকে পরিবেশন করব। লেখক এবং কবির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কী জান? একজন সুরসিক বোদ্ধা পাঠক—যে পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে তার অকুণ্ঠ মতামত প্রকাশ করতে পারে। সপ্তপদ গমন করার পর যে ঐ উদ্ভট শ্লোকটার তোয়াক্কা করবে না: ‘মা ব্রহ্মাৎ সত্যমপ্রিয়ম্।’ তুমি সে দায়িত্ব নেবে, বন্ধু? আমার ‘বিদ্যাসুন্দর’ পাঠ করে প্রয়োজনে আমাকে তিরস্কার করতে?

রূপেন্দ্রনাথ পথের মাঝেই জড়িয়ে ধরলেন ভারতচন্দ্রকে!



—কোবরেরজমশাই, এটাই ইদিকে আসুন দিনি?

রূপেন্দ্রের কর্ণকুহরে কথাটা প্রবেশ করে না। তিনি হীরামালিনীর জবানিতে বিদ্যার রূপবর্ণনায় তন্ময়— ‘বিনোনিয়া বিনোদিনী বেগীর শোভায়/সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকাই ॥ কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা/পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা ॥ ফিঁহার মিছার কাম ধনু রাগে ফুলে/ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে ॥’ —এ বর্ণনা অতিশয় কৃত্রিম; কিন্তু অলঙ্কারমাত্রই তো কৃত্রিম! বাকসংযম ও বাকবিস্তারের পর্যায়ক্রমকেই তো বলে কাব্য! নাঃ! ভারতচন্দ্র বাস্তবসীমা লঙ্ঘন করলেও কাব্যসীমার স্বীকৃত সীমান্ত অতিক্রম করেননি।

^১ যার সঙ্গে সাত-পা একসঙ্গে হাঁটা যায়, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

—কোবরেজমশাই, শুভে পাচ্ছেন?

চম্কে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন, ভোলা প্রামাণিক দাঁড়িয়ে আছে দ্বারপ্রান্তে। ভারতচন্দ্রের গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। দু কামরার বাড়ি। পাশের ঘরে কবি বসে কাব্য রচনা করছেন। রূপেন্দ্র এঘরে একটি প্রদীপ জ্বলে বিদ্যাসুন্দরের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসেছেন। ভোলা কবির গৃহভৃত্য। দীর্ঘদিন সঙ্গে সঙ্গে আছে। রূপেন্দ্র বলেন, আমাকে বলছ?

—ন্যাও ঠেলা! এখানে কি দশ-বিশজন কোবরেজমশাই হাজির?

—কী বলছ?

—এটু পাকঘরে আসেন দিনি। ভাতটা ফুটে গেছে। নাবায়ে ফ্যানটা গালেন।

—তুমিই সেটা কর না বাপু? ডাল পাকালে, ব্যঞ্জন পাকালে, আর ভাত পাকাতে পার না?

তা পারুক না পারুক, ভোলা অন্তত চোখ পাকাতে পারে। বললে, ন্যাও ঠেলা! জেতে যে নাপিত! ভাত যতক্ষণ ফোটেনি ততক্ষণ ভোলার ফুটুনি, ফুটলেই ভোলা-নাপতের ফাটা কপাল —ফটাশ!

কবির দীর্ঘ সাহচর্যে ভোলা নাপিতের বাক-প্রয়োগেও কিছু বৈচিত্র্য।

রূপেন্দ্র বলেন, তাহলে তোমার বাবুকে বলছ না কেন?

—এখন? বর্গীরা বাড়িতে আগুন দিলেও এখন ডাকা বারণ। তাহলে গরম ভাতের হাঁড়ি আমার মাথায় ঢেলে দেবেনে। আপনিই বা কী রাজ কাজ করছেন? আসেন, আসেন।

রূপেন্দ্র বিব্রত। বলেন, আমি যে ভাতের ফ্যান গালতে জানি না।

—ন্যাও ঠেলা! নিজির হাতে খাতি জানেন তো? না রান্নাবান্না সেরে শ্যাষে খাওয়ায়ে দিতি হবে?

পাশের ঘরে বোধকরি ভারতচন্দ্রের তন্ময়তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি উঠে এসে বলেন, রূপেন্দ্রকে দিক্ করছিঁস কেন রে হতভাগা? ও পড়ছে পড়ক। নে চল!

ভোলা কপাল চাপড়ে বলে, ন্যাও ঠেলা। অ্যাদ্দিন শুনি আলাম 'নিখছে নিখুক'। এখন নোতুন করে শিখতি হবে 'পড়ছে-পড়ক'। আমারই পোড়া কপাল!



প্রথম প্রহরের শিবাধ্বনি হতে ভোলা দুটি আসন পেতে দিল রান্নাঘরে। ভাত, ডাল, ব্যঞ্জন, জল-পাত্র, দুটি রেকাবিতে লবণ, গন্ধলেবু, পাপড় ভাজা, কিন্তু অন্নপাত্র দুটি শূন্য। রূপেন্দ্র আচমন করে আসনে বসলেন। ভারতচন্দ্র স্পর্শ বাঁচিয়ে উবুড়-করা অন্নপাত্রটি নিয়ে এসে দুজনের পাতে ভাত বেড়ে দিলেন। আসনে বসতে যাবেন, ধমক দিল ভোলা, উদের মতো চোখ নাকি গো তোমার? হাঁড়ির ভিথরি আলুসেদ্ধ আছেন, তা বার করতি হবেনি?

ভারতচন্দ্র কথা বাড়ান না। হাঁড়ির তলদেশ হাংড়ে হাতা দিয়ে তুলে আনলেন আলু সিদ্ধ।

আহারের শেষ পর্যায়ে দুটি রেকাবিতে এক জোড়া করে কী একটা বিচিত্র-মিষ্টান্ন নামিয়ে রাখল ভোলা। রূপেন্দ্র দেখলেন তাকিয়ে—মিষ্টান্নের গড়নটি মৃদঙ্গের মতো, অচেনা—মুখে দিয়ে দেখলেন অতি সুস্বাদু। অনেকটা পানতুয়ার মতো; কিন্তু কিছু পার্থক্যও আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র

আহারকালে তিনি বাকসংযম করেন। আচমনান্তে বলেন, মিষ্টান্নটি তো বড় অদ্ভুত। কী নাম এর?

ভারতচন্দ্র বলেন, সে কি! এ মিষ্টান্ন তোমার অপরিচিত? বর্ধমানে কখনো যাওনি?

—কেন যাব না? কতবার গেছি। সেখানকার বিখ্যাত মিষ্টান্ন তো সীতাভোগ আর মিহিদানা।

—সম্প্রতি এটিও যুক্ত হয়েছে। সে এক মজার গল্প। এর নাম: ‘ল্যাংচা’!

—‘ল্যাংচা’? এ যে কাব্য-নায়িকার নাম ‘বিদ্যা’-র বদলে ‘পাঁচি’! এমন অদ্ভুত নাম কেন?

—তাহলে সেই মজার কিস্সাটা শোন:

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবারের একটি কন্যার বিবাহ হয়েছিল—কয়েক বছর আগে—বর্ধমান রাজার এক পুত্রের সঙ্গে। বিবাহের কয়েক বছর পরে মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হয়। কিছুই তার মুখে রোচে না। তার শাশুড়ী—বর্ধমান মহিষী—নানান সুখাদ্য নিয়ে আসেন; কিন্তু পুত্রবধূ শুধু মাথা নাড়ে। একদিন তিনি জনান্তিকে বৌমাকে চেপে ধরেন, বল মা, তোমার কী খেতে ইচ্ছে করছে?

বালিকাবধূ নতনেত্র বলেছিল: ল্যাংচা!

ল্যাংচা? খাদ্যদ্রব্য? রানীমা আকাশ থেকে পড়েন! জানতে চান, সেটা কী?

মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে। বালিকাবধূ কিছুতেই আর কিছু বলে না। পরদিন তার স্বামী জনান্তিকে মাকে জানায় ‘ল্যাংচা’ কোন খাদ্যদ্রব্যের নাম নয়। তবে বাপের বাড়িতে থাকতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদে ঐ বালিকাবধূ কী একটা মিষ্টান্ন খেয়েছে। তার নামটা ভুলে গেছে। যে তৈরী করত তার একটা পা খোঁড়া! সেই ল্যাংচা-মেঠাইওয়ালার সেই বিশেষ মিষ্টান্নটি আশ্বাদনের সাধ হয়েছে আসন্নপ্রসবার। কথটা সে মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে। জানাজানি হলে বেচারি নিদারুণ লজ্জা পাবে।

রাজমহিষী গোপনে সংবাদটা জ্ঞাপন করলেন বর্ধমানরাজকে। তৎক্ষণাৎ এক বিশ্বস্ত অশ্বারোহী দ্রুতগতি ঘোড়া ছোটালেন নদীয়ার দিকে—রাজাবাহাদুরের জরুরী এবং গোপনপত্র নিয়ে। অনতিবিলম্বেই বন্দী করে আনা হল সেই খঞ্জ ময়রাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতিক্রমে বর্ধমানরাজ সেই খঞ্জকে শহর বর্ধমানের পূবে চারকোশ দূরে বড়শূল গ্রামে একটি ভূসম্পত্তি দান করলেন। ঘর ছাইয়ে দিলেন। লেংচা-বিশারদ প্রতিষ্ঠা পেল। দোকান দিল বাদশাহী সড়কের উপর শক্তিগড় গ্রামে—বড়শূল থেকে আধকোশ দূরত্বে। প্রত্যহ তার ভিয়েন থেকে একমণ করে সেই বিচিত্র মিষ্টান্ন সরবরাহ হতে থাকে বর্ধমান রাজপ্রাসাদে।

খঞ্জ মিষ্টান্ন-বিশারদ সবই পেল—জমি-জেরেত, ঘর-দোকান—খোয়ালো মাত্র একটি জিনিস—তার আবিস্কৃত মিষ্টান্নের আদিম নামটা।

সেটা হয়ে গেল: ল্যাংচা!

এঁটো তুলে ভোলা এবার নৈশ আহার সারতে বসেছে। তার আগে তামাক দিয়ে এসেছে কবিকে। দুই বন্ধু জমিয়ে বসেছেন আবার ভারতের ঘরে। সুযোগ বুঝে রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আমার একটা সমস্যা আছে, কবি। কী কর্তব্য, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভেবে-চিন্তে একটা সমাধান বাংলাও তো

ভারত বলেন, সমস্যাটা আগে শুনি?

রূপেন্দ্র বিস্তারিতভাবে জানালেন কাত্যায়নী সংক্রান্ত সমস্যাটার কথা। নবমবর্ষে তাঁর ভগিনীটির গৌরীদান হয়েছিল। পাত্রের নাম গঙ্গাচরণ, পিতার নাম বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়। গোয়াড়ি-গায়ের নেদের-পাড়ায়। তারপর এই দীর্ঘ সাত-আট বছর জামাতা বাবাজীবন না-পাতা। কৃষ্ণনগরে রুগী দেখতে আসার পূর্বে রূপেন্দ্র স্থির করেছিলেন জামাই-বাড়ির খোজ করে ব্যাপারটা জানবেন। কিন্তু কাতুর মা—ওঁর পিসিমা, যাত্রামুহূর্তে কঠিন দিবি দিয়ে বসেছেন। এসব দিবি-দিলেশ রূপেন্দ্র মানেন না—এগুলিকে কুসংস্কার বলেই গণ্য করেন। কিন্তু পিসিমা যখন হেতুটা জানালেন তখন থমকে যেতে হল তাঁকে। রূপেন্দ্র বুঝে উঠতে পারছেন না, এ ক্ষেত্রে কী তাঁর করণীয়।

আদ্যন্ত সব কথা শুনে ভারতচন্দ্র বললেন, আমি তোমার পিসিমাতা ঠাকুরানীর সঙ্গে একমত, রূপেন্দ্রনাথ। ‘যঃ ধুবানি পরিত্যজ্য...’! তোমার ভগিনী, তার বয়স এখন ষোলো-সতের, সে রঙিন শাড়ি পরছে, মাছ-ভাত খাচ্ছে। স্বামীসুখ-বঞ্চিতা, কিন্তু সধবা। আমার আশঙ্কা—সংবাদ নিতে গেলে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা এক-কড়া, দুঃসংবাদের উনিশ-কড়া! জীবিত থাকলে, সে ইতিমধ্যে নিশ্চয় পার্বণী আদায় করতে তোমার ভদ্রাসনে যেত।

রূপেন্দ্র চিন্তিতমুখে বলেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কি আমার উচিত নয় ...

—না। ও কথাটা বল না!—সোজা হয়ে বসলেন কবি। ইঁকোটা নামিয়ে রেখে বলেন, যতক্ষণ খবর না পাচ্ছ ততক্ষণ ধরে নাও সে সন্ন্যাসী হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরছে! দেখ রূপেন্দ্র—এ হতভাগীগুলোকে আমরা কী দিয়েছি? সমাজ কী দিয়েছে? কেন অহেতুক খুঁচিয়ে ঘাঁ করছ?

রূপেন্দ্রের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলেন, তা ঠিক! কী জান ভারত? আমি এসব শাস্ত্র নির্দেশ-ফির্দেশ মানি না। বিবেকের নির্দেশে চলি। স্থির করেছিলাম—খবর নেব। যদি জানতে পারি খবর শুভ নয়, তাহলে স্রেফ গোপন করে যাব!

ভারতচন্দ্র সবিস্ময়ে বলেন, তুমি মনে কর না তাতে তোমার পাপ স্পর্শাবে?

—না! করি না! নয় বছর বয়সে গৌরীদান হয়েছিল হতভাগীর। স্বামীর চেহারাটা সে আদৌ মনে করতে পারে না। সেই অদেখা, অচেনা একটা মানুষ—যে স্বামীর কর্তব্য করেনি—একমুঠি খেতে দেওয়া তো দূরের কথা—সাত বছরের ভিতর একবার এসে জিজ্ঞেস করতে পারেনি—‘কেমন আছ’?—সে ওর বাকি জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে? স্বামীসুখ না পাক, সে তো এয়োস্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছে!

অনেকক্ষণ ভারতচন্দ্র কোন কথা বললেন না। তাঁর মনে হল—রূপেন্দ্র যা বলছে তার ভিতর যুক্তি নেই একথা স্বীকার করতে বাধে, কিন্তু তা কি মেনে নেওয়া যায়? তিনি নিজে পারতেন? প্রশ্ন করেন, তাহলে সে পথেই কেন গেলে না ভাই?

—সাহস পেলাম না!

—তবেই দেখ! সংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না!

—না, না, না! সে-কথা বলিনি! কাতু যে বুঝে ফেলেছিল আমার মতলব। সোজা বললে,

তুই পারবি না দাদা! তোর মুখ দেখেই আমি বুঝে ফেলব! তুই লুকাতে পারবি না! —কথাটা মিথ্যা নয় ভারত! বোনটাকে আমি সত্যিই বড় ভালবাসি! হয়তো ফিরে গিয়ে আমি চোখের জল রুখতে পারতাম না!

ভারতচন্দ্র উঠে পড়েন। বলেন, তোমার ভগিনীটি বুদ্ধিমতী! ঠিকই বলেছে সে! তুমি খোঁজ নিতে যেও না রূপেন্দ্র। শাস্ত্র বলেছেন—‘অশুভস্য কালহরণম্’।



সে রাত্রে কবির ঘুম এল না। কাতু, কাত্যায়নীকে তিনি দেখেননি, চেনেন না। মনে মনে তার একটা আন্দাজী আলেখ্য আঁকতে পারেন শুধু। রূপেন্দ্র রূপবান—সম্ভবত তার ভগ্নীটিও রূপসী। বয়স তার বোলো। হাতে শাঁখা, লোহার খাড়া। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে সিন্দূর বিন্দু। শান্তিপুরে ডুরে শাড়ি পরে মেয়েটি প্রদীপ হাতে তুলসীমঞ্চের প্রদীপ নামিয়ে রেখে মৃত্তিকা বেদিকায় মাথাটা নামিয়েছে। গলায় আঁচল দিয়ে

কিন্তু এ কী? ও তো কাত্যায়নী নয়! ও যে—রাধা!

রাধা! এগারো বছর বয়সে তাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল একটি পনের বছরের শ্যামবর্ণ কিশোর—কবি হবার স্বপ্ন দেখত সে! কবি তার সিঁথিতে সিন্দূর আর হাতে শাঁখা ছাড়া আর কী দিতে পেরেছেন? না, দিয়েছেন। একটি পংক্তি—তার কাব্যে:

“রাধানাথ তব দাস পুরাও মনের আশ

তব ঋণিচক্রে ঋণে তর গো॥”

ঐ কাব্যগ্রন্থের আদর যতদিন থাকবে—রসপিপাসু বাঙালী যতদিন ভারতচন্দ্রের কাব্যরস আহরণ করবে—ততদিন বঁচে থাকবে ঐ বক্ষিতা হতভাগিনী সীমন্তিনীর নামটা!

কবি ভারতচন্দ্র হচ্ছেন: ‘রাধানাথ’!*

নিদ্রাহীন রাত্রে অতীত জীবনের স্মৃতি যেন ভিড় করে আসছে। একের পর এক!

ধনী ভূস্বামী বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম। প্রাচীন বাঙলার সুবিখ্যাত সারস্বততীর্থ ভূরিশ্রেষ্ঠ এলাকায় পাণ্ডুয়া গ্রামে তাঁর জন্মভূমি ও শৈশব-লীলা। চতুরানন নামে এক ব্রাহ্মণ চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূরসূট পরগণায় একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁর জামাতা-শাখা ভূরশুটে প্রাধান্য পায়। ঐ রাজবংশের একটি শাখায় ভারতচন্দ্রের জন্ম। সেটা 1712 খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ উনি রূপেন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে পাঁচ বছরের বড়। পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ বায়। বিরাট সম্পত্তি তাঁর। ভারত পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। সম্পত্তির ব্যাপারে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে নরেন্দ্রনারায়ণের বিবাদ দেখা দেয়। বেগতিক দেখে কনিষ্ঠ পুত্রটিকে নরেন্দ্রনারায়ণ তার মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। মণ্ডলঘাট পরগণায় নওয়াপাড়া

* প্রসঙ্গত কুলীন ব্রাহ্মণকবি ভারতচন্দ্রও ঐ পণ্ডিত।

গ্রামে। সেখানে চতুষ্পাঠীও আছে, মস্তব্বও আছে। অভিভাবকদের নির্দেশ ছিল, তিনি মাতুলালয়ে ফারসী শিখবেন, যাতে ভবিষ্যতে কোন রাজ-সরকারে কর্ম সংস্থান করতে পারেন। কিশোর ভারতচন্দ্র সে নির্দেশ তুচ্ছ করে ভর্তি হলেন চতুষ্পাঠীতে। তাঁর স্বপ্ন কবি হবার—সংস্কৃতটা তাই আবশ্যিক। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং শিক্ষাগুরুর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

তাঁর বয়স যখন মাত্র পনের তখন একটা ঘটনা ঘটল—যে ঘটনা তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। পাঠশালায় যাতায়াতের পথে পার্শ্ববর্তী গ্রাম তেজপুরের একটি পর্ণকুটারের গবাক্ষে একটি বালিকাকে প্রায়ই লক্ষ্য করতেন। নির্দিষ্ট সময়ে—ওঁর যাতায়াতের নির্দিষ্টকালে মেয়েটি প্রতিদিন জানলায় এসে বসে থাকত আর ডাগর চোখে ওঁকে দেখত। ভারত কৌতূহলী হয়ে পড়েন। সন্ধান নিয়ে জানলেন, ঐ ভদ্রাসনটি কেশরকুণী আচার্যের। মেয়েটি তাঁরই কন্যা। বছর নয়-দশ বয়স তার। বালিকার এই বিচিত্র ব্যবহারে ভারত কৌতুক বোধ করেন। লক্ষ্য করে দেখেছেন, চোখাচোখি হলেই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কী দেখে মেয়েটি? মাত্র পনের বছর বয়স হলেও কিশোরটি ভবিষ্যতে হতে চলেছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর —হেতুটি প্রশিধান করতে অসুবিধা হয় না।

তাঁর হৃদয়ও কি ব্যাকুল হত না? হত। তবে তিনি তো ঐ নিরঙ্করা মেয়েটির মতো ‘ভূবিলাসানভিঞ্জ’ সরলা বালিকা নন! মনে মনে বলতেন: “ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোহং ন হস্তব্যো ন হস্তব্যঃ!”

তারপর একদিন। তিথিটা মনে আছে। মাঘী শ্রীপঞ্চমী। চতুষ্পাঠীতে সেদিন পাঠ বন্ধ। বাগদেবীর আরাধনা হচ্ছে। ছুটির দিন—তবু কী জানি কিসের টানে উনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের দিকে চলতে থাকেন। সেই সুচিহ্নিত গৃহটির সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন শিউলি-বোঁটায় ছোপানো একটি শাড়ি পরা মেয়েটি বসে আছে জানলায়। চোখাচোখি হতে আজ সে মুখ ফিরিয়ে নিল না। যেন সে ওঁরই প্রতীক্ষায় বসে ছিল এতক্ষণ। ডাক দিল, শুনুন?

ভারতচন্দ্র নিজের পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন। না, পথে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তবু নিশ্চিন্ত হতে প্রস্তুত করেন, আমাকে বলছ?

—হ্যাঁ, একবারটি আসবেন? বাবা আপনাকে কিছু বলবেন।

দুরন্ত কৌতূহলে ভারতচন্দ্র আচার্যমশায়ের ভদ্রাসনের দিকে অগ্রসর হয়ে যান। গৃহভ্যন্তর থেকে বার হয়ে এলেন এক শ্রোঁড় ভদ্রলোক। গৃহস্বামী নিশ্চয়। মুণ্ডিত মস্তক। দীর্ঘ অর্কফলা। গায়ে উত্তরীয়, পায়ে খড়ম।

ভারতচন্দ্র বলেন, আপনি কি আমাকে খুঁজছিলেন?

—হ্যাঁ, বাবা। আমার একটি উপকার করবে?

—বলুন?

—তুমি ব্রাহ্মণ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম ভারতচন্দ্র, ঠাকুরের নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রাই। আমরা রাঢ়ী শ্রেনীর। কৌলীক উপাধি মুখোপাধ্যায়। কেন, ঠাকুর মশাই?

—তুমি কি প্রাতরাশ করেছ?

নওয়াদাড়া

ভারতচন্দ্র রীতিমতো অবাধ হয়ে যান। বলেন, আঞ্জো না। চতুষ্পাঠীর দিকে যাচ্ছিলাম। অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ পাব।

—ও! তা বাবা আমার একটি উপকার করে যাও। প্রতি বৎসর আমার ভদ্রাসনে বাগদেবীর পূজা করি। মূর্তিপূজা নয়, গ্রন্থ পূজা। আমি নিজেই করি। সব ব্যবস্থাই হয়ে আছে। কিন্তু এই মাত্র একটি দুঃসংবাদ শুনলাম—আমার অতি দূর সম্পর্কের একটি জ্ঞাতি দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছেন। দূর সম্পর্ক বটে, তবে দশরাত্রের জ্ঞাতি! তুমি বাবা দুটি ফুল ফেলে পূজাটা সেরে দিয়ে যাবে? তাহলে রাধা অঞ্জলি দিয়ে দুটি প্রসাদ মুখে দিতে পারে।

ভারতচন্দ্র যথারীতি ন্যাকা সাজলেন, রাধা! রাধা কে?

—আমার কন্যা। সেই তো বললে তুমি ব্রাহ্মণ। কই রে রা—ধে!

বাসন্তী রঙের ছোপানো শাড়ি পরে নোলক-পরা দশমবর্ষীয়া মেয়েটি এসে বাপের পাজর ঘেঁষে দাঁড়ায়। নত নেত্রে।

ভারতচন্দ্র মেয়েটিকে প্রশ্ন করেন, তুমি কেমন করে জানলে আমি ব্রাহ্মণ?

মেয়েটির কুমারী-সিঁথি দেখা যাচ্ছে এখন। সরমে মাথাটা প্রায় বৃকের উপর।

ততক্ষণে মাথায় আধো-ঘোমটা টেনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন পণ্ডিতগৃহিণী। বললেন, আমিও অরে তাই জিগাই। তা রাধা কইল কি তোমারে উড়ুনী জড়ানো গায়ে দ্যাখ্ছে, পৈতাগাছখান কাঞ্জে আছিল।

প্রমাণিত হল, এক কালে আচার্যমশাই টোপর মাথায় গঙ্গার ওপারে গেছিলেন। পণ্ডিতগৃহিণীর ‘সুমধুর ভাষা’—হেতু্যার্থে পঞ্চমী সূত্রে।

ভারতচন্দ্র পূজা করলেন। লৌকিক আচার অনুসারে রাধাও অঞ্জলি দিতে পারল না। তারও অশৌচ চলছে। তবে পূজাস্তে টোপাকুল মুখে দিল মহানন্দে।

ভারতচন্দ্র মেয়েটিকে প্রশ্ন করেন, তুমি পড়াশুনা কর? সরস্বতীর পূজা তো খুব করছ ঘট। করে। বাঙলা পড়তে পার?

রাধা সলজ্জে মাথাটা নিচু করে। শিরশ্চালনে জানায়, না!

পণ্ডিতগৃহিণী বলেন, মাইয়া-মানুষের লেখাপড়া শিখতি নাই! জান না?

ভারতচন্দ্র রাধার বাবাকে প্রশ্ন করেন, আপনারও তাই বিশ্বাস?

প্রৌঢ় পণ্ডিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কী করব বল বাবা? লোকাচার! মূর্থগুলো ভেবে দেখে না—স্বয়ং বাগেশ্বরী কী করে সাক্ষর!

পণ্ডিতগৃহিণী একটি রেকাবিতে ফল মিষ্টি প্রসাদ সাজিয়ে নিয়ে এলেন। স্বীকৃত হতে পারলেন না ভারতচন্দ্র। অজুহাত দেখালেন—তাদের চতুষ্পাঠীতে পূজা এখনো অসমাপ্ত।

রাধার মা বললেন, তাইলে একদিন মধ্যাহ্নে এই হানে আইস্যা দুটি অন্ন সেবা করি যেও! অশৌচ মিটলে। আইবে তো?

ভারতচন্দ্র স্বীকৃত হলেন। রাধার দিকে ফিরে বলেন, লেখাপড়া তো শেখনি, রান্না করতে শিখেছ?

রাধা নোলক নেড়ে বলেছিল, বলব না!

—বলবে না! কেন? বলবে না কেন?

—বলতে হবে আপনাকে!

—আমি রাখতে জানি কি না?

—তা নয় মশাই! যেদিন অন্নসেবা করতে আসবেন সেদিন খেয়ে বলতে হবে, কোন ব্যঞ্জন মায়ের হাতের, কোনটি মেয়ের।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। সহপাঠী বংশীলাল একদিন বললে, শুনেছিস ভারত, সেই মেয়েটার বে ঠিক হয়ে গেছে। কী কপাল! বরটা বুড়ো-হাড়া! তিনকুড়ি বয়স তার!

—কোন মেয়েটা রে? —ভারত কৌতূহলী।

—সেই যাদের বাড়ি তুই সরস্বতী পূজা করে দিয়ে এসেছিলি। তেজপুরের আচার্য্য বাড়ির। রাখা! তোর তো নিমন্ত্রণও ছিল! গেলি না কেন?

বুকের মধ্যে টন্টনিয়ে উঠেছিল। বংশীর হাতটা চেপে ধরে বলেছিল, তুই ঠিক জানিস? বুড়ো বর?

—ওমা, জানব না কেন? ললিত গাঙ্গুলীর বয়সের কি গাছ-পাথর আছে? মুখে একটা দাঁত নেই। এক মাথা পাকা চুল। তার বড় নাতিরও তো বে হয়ে গেছে!

পনের বছরের কিশোর! রক্তে তখন আগুন জ্বলে! হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল তার। গোপনে গিয়ে সাক্ষাৎ করল কেশরকুনী আচার্যের সঙ্গে। বললে, এ আপনি কী করছেন পণ্ডিত মশাই! অমন লক্ষ্মীর প্রতিমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন?

অরক্ষণীয়া কন্যার পিতা মানমুখে বলেন, কী করব বাবা? কৌলিন্য মর্যাদা দেবার সামর্থ্য যে আমার নেই। উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাব? গাঙ্গুলী-মশাই এক কপর্দক মাত্র কৌলিন্যমর্যাদা নিয়ে ...

অপরিসীম দার্টো কিশোরটি বলেছিল, উপযুক্ত পাত্র কিনা জানি না, তবে আমার পিতামহের হাতি ছিল, আমাদের বাড়ি আজও দোল-দুর্গোৎসব হয়

পণ্ডিতমশাই আকাশ থেকে পড়েন, তুমি! তোমার মাতুল রাজী হবেন?

—সম্ভবত নয়। আপনার কন্যা যদি রাজী থাকে আর আপনার যদি হিম্মৎ থাকে তাহলে আমি স্বীকৃত! গোপনে! আমি কুলীন, এবং পালটি ঘর।

আচার্য্য ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত বাবা! বেঁচে থাক তুমি। দীর্ঘজীবী হও! এমন হৃদয় তোমার! তুমি দেশের মুখোজ্জ্বল করবে।

ভবিষ্যদ্বাণীটি আধাআধি সার্থক করেছিলেন আচার্যের জামাতা বাবাজীবন।

দীর্ঘজীবী হতে পারেননি। কিন্তু স্বল্পজীবনের মধ্যেই দেশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমাকে ঘরে আনতে পারেননি।

সংবাদ পেয়ে ভারতের অভিভাবকেরা তাকে মাতুলালয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

ওদের সংসারে তখন প্রচণ্ড অশান্তি—বর্ধমানরাজের অত্যাচারে। তার উপর নাবালকটির ঐ হঠকারিতায় কবির লাঞ্ছনার আর অবধি রইল না। কিশোর-কবি ক্ষোভে অভিমানে গৃহত্যাগ করেন। আশ্রয় পান হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমে দেবানন্দপুর গ্রামবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে। সেখানে থেকে বহু কষ্টে ফারসী ভাষা আয়ত্ত্ব করেন। কবি ঈশ্বরগুপ্ত সে-আমলে ভারতচন্দ্রের কৃচ্ছসাধন বর্ণনা করতে লিখছেন, “দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া

সেই অন্ন দুই বেলা আহার করেন, প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুন পোড়ার অর্ধভাগ এ-বেলা এবং অর্ধভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।” এখানে থাকতেই তিনি মুন্সীর বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষ্যে একটি ‘ব্রতকথা’ রচনা করেন: কবির প্রথম রচনা।

ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে কবি ফিরে এলেন স্বগৃহে। দাদারা তাঁর পুনর্বীর বিবাহ দেবার আয়োজন করল। দৃঢ় প্রতিবাদ করলেন কবি। বললেন, আমার এক স্ত্রী বর্তমান। আপনারা তাকে গ্রহণ করেননি। উপার্জনক্ষম হলে আমি তাকে স্বগৃহে নিয়ে আসব। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কদাচ করব না।

এই সময় কবিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বর্ধমানে। বর্ধমানরাজ কর্তৃক অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করতে। মোস্তার হিসাবে। রাজশক্তির অসীম ক্ষমতা! কবি মিথ্যা অভ্যুহাতে গ্রেপ্তার হলেন। কারারুদ্ধ কবি কোনক্রমে পালিয়ে যান। এই পলায়নে তাঁকে সাহায্য করেছিল পারিবারিক পুরাতন ভৃত্য ভোলা নাপতে! দুজনে বনজঙ্গল দিয়ে পথ ঝুঁজে ঝুঁজে উপনীত হন কটকে। কবির পরিচয় ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান মহারাষ্ট্রীয় সুবেদার শিব ভট্ট। রঘুজী ভোসলের তরফে তিনি তখন কটকের শাসনকর্তা। তাঁর অনুগ্রহে পুরুষোত্তমধামে বাস করার অনুমতি পান। তখন তিনি প্রায় সন্ন্যাসী! কিন্তু ভোলা প্রামাণিক ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে লেগে আছে।

কী ভাবে ঐ ধূর্ত প্রামাণিকের চক্রান্তে কবি আবার সংসারে ফিরে আসতে বাধ্য হন তার প্রামাণিক ইতিহাস নাই; আছে শৈল্পিক ইতিকথা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের—‘অমাবস্যার গান’-এ। নারায়ণ গাঙ্গুলীর কল্পনা অনুসারে ঐ সময় রাধার সঙ্গে ভারতের পুনর্মিলন হয়—পুনর্মিলনই বা বলি কেন? বিবাহকালে রাধা ছিল এগারো বৎসরের বালিকা—এই তার প্রথম স্বামী সম্মর্শন!*

অনতিবিলম্বেই কবি চলে যান ফরাসডাঙায়—দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে, কর্মের অনুসন্ধানে। রাধাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, মাথা-গোজার একটা ব্যবস্থা হলেই, দুবেলা দু-মুঠো অম্লের সংস্থান হলেই, তাকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যাবেন। সুযোগ হয়নি। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের সুপারিশে এসেছেন কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, বৃত্তি দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর উপার্জন এখনো এমন হয়নি যে, সেই সূর্যমুখী ফুলের চারাগাছটিকে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের উদ্যানে এনে রোপণ করেন।

বিশ্বাস করতে মন চায় না, নয়? যে ‘অন্নদামঙ্গল’ আজ এম-এ-র পাঠ্য—তা স্বীকৃতি পাওয়ার পরেও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর সত্বীক বসবাসের মতো সচ্ছলতার মুখ দেখতে পাননি। তাঁর আটচল্লিশ বছর জীবনের ত্রিশটি বছর কিন্তু ইতিমধ্যে কেটে গেছে!

রাজদেশে কবি এখন অন্নদামঙ্গলের সম্প্রসারণ করছেন! বিদ্যাসুন্দরের আদিরসাত্মক পদগুলি রচনা করছেন! ‘অমাবস্যার গান’ গাইছেন!

* ‘মিতে’-দার কল্পনা ছাড়া এ বিষয়ে পণ্ডিত গবেষকেরও সমর্থন আছে। যথার্থ ডঃ ভূদেব চৌধুরীর ‘বাঙলা-সাহিত্যের ইতিকথা’ প্রথম খণ্ড।

তোমরা কি কবির জন্য দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলবে?

তোমরা ফেলবে কি না জানি না, কবি ফেলেছিলেন—সে রাত্রে। না, রাধার জন্য নয়। সেই না-দেখা, না-চেনা কাত্যায়নীর উদ্দেশ্যে!

কবি জানেন, সেই উপেক্ষিতা যৌবনভারনম্রার অন্তলীন বেদনাটি কী তীব্র।

তিনি যে কবি!



পরদিন রূপেন্দ্রকে নিয়ে ভারতচন্দ্র উপস্থিত হলেন রাজসভায়।

সে এক অভিজ্ঞতা বটে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাতঃকালীন রাজসভার দুইটি পর্যায়। প্রথমাংশে তিনি শুধু রাজকার্য করেন। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। প্রয়োজনে আদেশনামা জারী করেন, স্বাক্ষর দেন দলিলে। সে সময় সভায় উপস্থিত থাকেন শুধুমাত্র মন্ত্রী, দেওয়ান, সেনাপতি, বিভিন্ন গুণ্ডচর এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। একটু বেলায় প্রায় একদণ্ডের মতো একটি বিরতি ঘটে। রাজা তখন সংলগ্ন কক্ষে প্রাতরাশ সেরে নেন। রাজসভার পালাবদল হয়। রাজকর্মচারীরা বিদায় নেয় আর আসর জমিয়ে বসেন পণ্ডিতের দল, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ। ভারতচন্দ্র সেই বুঝে একটু বেলাতেই এসেছেন।

রাজবাড়ির এই দরবারকক্ষটির নাম—বিষ্ণুমহল। প্রকাণ্ড দরবার গৃহ। চারমিনার-বিশিষ্ট তোরণপথ মুসলিম স্থাপত্যানুসারী। স্তম্ভ, খিলান, কালবুদ পঙ্খের কাজ করা, অতি মসৃণ। দুইসারি স্তম্ভের মাঝখান দিয়ে গালিচা-মোড়া প্রবেশ পথ। মাথার উপর সারি সারি সহস্রমুখ ঝাড়ু-বাতি। দু-পাশের দেওয়ালে প্রাস্তন রাজবর্গের তৈলচিত্র—ভবানন্দ, রাঘব, রুদ্র রায়, রঘুবীর!

ভূপেন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বসে আছেন সিংহাসনে। দু-পাশে পাত্রমিত্র। পিছনে দুজন ব্যাজন করছে। দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী। এক দিকে একটি উচ্চ বেদিকা। পণ্ডিতদের আসন। বিপরীত দিকে কিছু সঙ্গীতজ্ঞ নানান বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছেন। তাঁরা সর্বক্ষণই অতি মৃদু শব্দ-সংকারে একটি আলাপ করে চলেছেন। পরিকল্পনাটি শাহজাহাঁর দরবারের সঙ্গে আকবরের রাজসভার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ।

ভারতচন্দ্র রাজসমীপে অগ্রসর হয়ে এসে তাঁকে অভিবাদন করলেন। দেখাদেখি একই ভঙ্গিমায় রূপেন্দ্রনাথও রাজাকে অভিবাদন করেন। রাজা বললেন, স্বস্তি! আজ কবিরের সপার্বদ আগমন হল মনে হচ্ছে। তোমার ঐ কন্দর্পকাস্তি বয়সটির পরিচয় দান কর, কবি!

—ইনি বর্ধমানভুক্তির সোএগাই গ্রামনিবাসী ভেষগাচার্য। নাম শ্রীরূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈক্য কুলীন। পিতার নাম 'সৌরীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ।' উনি গতকাল কৃষ্ণচন্দ্রের এসেছেন ঋষধ্বজ দত্ত মশায়ের চিকিৎসা করতে।

রাজা বললেন, উনি সার্থকনামা! রূপেন্দ্র! নিতান্ত দুর্ভাগ্য আমার। আজ সভায়

উপস্থিত-কবি মহাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার অনুপস্থিত। থাকলে ‘রূপেন্দ্র’ শব্দের উপর তিনি নিশ্চয় একটি শ্লোক রচনা করে শোনাতেন।

বিদ্যাবাচস্পতি বলেন, মহারাজ! অধম স্বভাবকবি নয়। তবে এই রূপের ইন্দ্রটিকে দর্শন করে আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি মনে পড়ছে। আপনি অনুমতি করলে সেটি শোনাতে পারি। ‘রূপ’-এর সংজ্ঞা।

রাজা বললেন, শাস্ত্র বলছেন, ‘মধ্বভাবে শুড়ং দদ্যৎ’। তাই হোক তাহলে।

বিদ্যাবাচস্পতি বলেন, “অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা। যেন ভূষিতং ভাস্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে।” রায় গুণাকরের বয়স্য দেখছি পুষ্পধনু ব্যতিরেকেই মীনকেতনের প্রতিদ্বন্দ্বী!

রূপেন্দ্র নিরতিশয় লজ্জিত হন। রাজনির্দেশে দুজনে উপবেশন করেন। ওপাশ থেকে একজন বৃদ্ধ হঠাৎ বলে ওঠেন, আমি কিন্তু কবিরের ঐ শব্দটির অর্থগ্রহণ করতে পারিনি। ‘ভেষগাচার্য’ শব্দের অর্থ কী?

এই অর্বাচীন প্রশ্নে রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্নকর্তার দিকে দৃকপাত করলেন। এবং তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করলেন তাঁকে। স্বর্বকায়, স্ত্রীতোদর। পরিধানে একটি খাটো ধুতি, উর্ব্বাস নয়, শুধুমাত্র একটি উত্তরীয়। উপবীত নাই। মেদবহুল দেহ। নিঃসন্দেহে গোপাল ভাঁড়।

রাজা বললেন, কবি, অস্থয় ব্যাখ্যা দাখিল কর। গোপাল ‘ভেষগাচার্য’ শব্দের অর্থ বোঝেনি।

ভারতচন্দ্র বললেন, উপায় কি? হংসমধ্যে বক যখন উপস্থিত, তখন ব্যাখ্যা করতেই হবে। ভেষগাচার্য শব্দের অর্থ—চিকিৎসক, কবিরাজ, বদ্যি।

গোপাল বলে, এতক্ষণে বোঝা গেল। রায়গুণাকর তো দেবভাষায় কাব্য রচনা করেন না, তাই খটকা লেগেছিল শব্দটায়। কবিরাজ! গোবদ্যি! এবার বুঝেছি। তা ঝাড়ুজেমশাই, আপনি যখন গো-আড়িগঞ্জে এসেই পড়েছেন, আমার বাড়িতে একবার পদধূলি দেবেন। আমার দুধেলা গাইটে বেমক্কা দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে। গিম্মি বলেছেন, একটি ভাল গোবদ্যি ধরে নিয়ে যেতে।

ভারতচন্দ্র জবাবে কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রূপেন্দ্র তাঁর জানুতে হস্তস্পর্শ করায় থেমে গেলেন। অনুমান করেন, রূপেন্দ্র স্বয়ং এ বিদ্রূপের উত্তর দিতে চান। ঠিক তাই। রূপেন্দ্র বললেন, হাস্যার্ণব, এজন্য আমাকে আপনার ভদ্রাসনে নিয়ে যেতে হবে না—তাহলে আপনার কিছু অর্থদণ্ড হবে। আমি আপনার গো-মাতাকে না দেখেই এখান থেকে বিধান দিয়ে দিচ্ছি। গৃহিণীকে বাড়ি ফিরে বলবেন, তাঁর যেমন একটি দুধেলা গাই-গরু আছে তেমন একটি পোয়া অনডবানও তো আছে। সেটি ইদানীং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আসন পাওয়াতে বিরহানলে দগ্ধ হয়েছে ঐ গাভিটি। তাই দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে।

রাজা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। বললেন, নাও গোপাল! জবাব দাও।

গোপাল ইতস্তত করে বলেন, ইনিও যে সংস্কৃত শুরু করলেন মহারাজ! ‘অনডবানও’ যে বড় ভারি শব্দ। অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না।

রূপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলেন, ওর আর অস্থয় ব্যাখ্যা-হয় না। আপনি তো পেশায় প্রামাণিক।

^১ ভূষণভূষিত দেহ না হওয়া সত্ত্বেও যাকে ভূষিতবৎ প্রতীয়মান হয়, তাকেই বলে রূপবান—তাই রূপ!

বাড়িতে দর্পণ নিশ্চয় আছে। তার ভিতরেই ওর অর্থ ঝুঁজে দেখবেন।

গোপাল বলে ওঠেন, ইনি যে দেখছি খাস স্বয়শ্চ মুনি! ‘আত্মব্রহ্মন্যতে জগৎ’।

রাজা বাধা দিয়ে বললেন, উ হুঁ হুঁ। হল না। গোপাল, হল না। তুমি ঢং ধরেছিলে সংস্কৃত জান না। এখন ঠাই বদলাতে পার না। একবার অকুর, একবার বিন্দে দূতী—এ তো চলবে না। তোমার হার হয়েছে বাপু!

গোপাল বাজার হলেন। রাজা প্রসন্ন করেন রূপেন্দ্রকেই, তা ঋষধ্বজকে দেখে কী বুঝলেন? ওর অসুখটা সারবে তো?

প্রত্যুত্তরে রূপেন্দ্র বলেন, এখনো রুগী দেখা সম্ভবপর হয়নি। কারণ

মাঝপথেই থেমে যান।

রাজা বলেন, জানি! কারণ—‘কারণ’! কালীপূজার ধাক্কা এখনো সামলে উঠতে পারেনি। এটাই ওর রোগ ভেষ্যগাচার্য! যা হোক, কতদিন আছেন? কোথায় উঠেছেন? ঋষধ্বজের অতিথিশালায়?

—আজ্ঞে না মহারাজ। উঠেছি বন্ধুবর ভারতচন্দ্রের আবাসে। থাকব দিন-দুই-তিন।

রাজা বললেন, উইই! তা হবে না। আজ শুক্লা তৃতীয়া। পাঁচ দিন পরে মায়ের পূজা। এ সময় তো আপনি স্বদেশে ফিরতে পারবেন না!

একজন মোসায়ের বলে উঠে, গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা দেখলে জীবনে ভুলবেন না। ফরাসডাঙার দেওয়ান ইন্দ্র চৌধুরীর জগদ্ধাত্রী পূজার জৌলুস ...

কৃষ্ণচন্দ্র ধমক দিয়ে ওঠেন, তুমি চুপ কর মধু! ‘মা—মা! তুলনামূলক আলোচনা করে তোমাকে খোসামোদি করতে হবে না। ছিঃ!

মধু নামের মোসায়ের ম্লান হয়ে যায়। মাথা নিচু করে।

রূপেন্দ্র বলেন, বেশ কথা। আপনি যখন আদেশ করছেন তখন মায়ের পূজা প্রত্যক্ষ করে দেশে ফিরব। সত্যি তো, এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য।

রাজা ভারতচন্দ্রের দিকে দৃকপাত করে বলেন, উনি তোমার আতিথ্য স্বীকার করেছেন, আমার কিছু বলার নেই; কিন্তু ষে-কয়দিন উনি কৃষ্ণনগরে থাকবেন ওর ‘সিধা’ রাজবাড়ি থেকে যাবে।

গোপাল যেন প্রতিবর্তী-প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, দুজনের মতো মহারাজ! না হলে কবিরাজ মশায়ের হজম হবে না। কিছু মনে করবেন না রায় গুণাকর—আমি ন্যায্য কথাই বলেছি! অতিথি রাজভোগ কি হজম করতে পারবে যদি গৃহস্থামী পাস্তা খায়?

এরপর শুরু হল মার্গ সঙ্গীত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সঙ্গীত-বিশারদ।

এই সুযোগে ভারতচন্দ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর পরিচয় নিম্নস্বরে বিবৃত করতে থাকেন রূপেন্দ্রের কর্ণমূলে। রাজার বাম দিকে প্রথমেই বসে আছেন গোস্থামীপাদ রাধামোহন বিদ্যারচম্পতি। শাস্তিপুরের বৈষ্ণব ভক্ত-পণ্ডিত। যিনি উজ্জ্বলনীলকান্তমণি থেকে ‘রূপ’-এর সংজ্ঞা-নির্ধারক শ্লোকটি শুনিয়েছিলেন। সৌমদর্শন বৃন্দ, মুণ্ডিতমস্তক, ললাটে শ্বেতচন্দ্রনের তিলক।

তঁার পাশে শঙ্কর তর্কবাগীশ। তদানীন্তন নদীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। তাঁর চতুপ্পাঠীতেই ছাত্রসংখ্যা সর্বাধিক। শুধু বিদ্বৎসমাজে নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি নিরক্ষর চাষী-মজুরেরাও

কৃষ্ণনগর

জানত। একবার তিনি শান্তিপুরে গঙ্গার পারানিঘাটে এসে দেখেন, খেয়াঘাটের নৌকাটি দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীর অপ্রতুলতায় মাঝি অপেক্ষা করছে। তর্কবাগীশ মশায়ের কিছু তাড়া ছিল। মাঝিকে বললেন, এবার নৌকাটা ছাড়বে মাঝি ভাই? আমার কিছু তাড়া আছে।

মাঝি তাঁকে ধমকে উঠেছিল, কেনে ঠাকুরমশাই? আপনি কি স্বয়ং শঙ্কর তর্কোবাগীশ এয়েচেন আমারে উদ্ধার করতি যে, নৌকা ভরতি না হতেই নুকশান দে ওপারে যাব?

শঙ্কর তর্কবাগীশ সহাস্যে বলেছিলেন, তা বটে!

পারানি-যাত্রীদের একজন নাকি তাঁকে চিনতে পারে। সে মাঝির কানে-কানে কী-যেন বলে। শুনে মাঝির চোখ কপালে ওঠে। দৌড়ে ছুটে এসে জলকাদার মধ্যেই প্রাশ করে লুটিয়ে পড়ল তর্কবাগীশের চরণজোড়া ঝাঁকড়ে। মাথা ঝুড়তে ঝুড়তে সে বলে চলেছে, এ আমি কী বল্লাম ঠাউর! নরকেও যে মোর ঠাই হবেনি!

নৈয়ায়িক বুঝে উঠতে পারেননি—লোকটা অমন করছে কেন? তার কথায় তো তিনি তৃপ্তিই পেয়েছিলেন—বুঝে নিয়েছিলেন, তাঁর সত্যানুসন্ধানের প্রভাব আজ পারানি-মাঝিদেরও প্রভাবান্বিত করছে।

শঙ্কর তর্কবাগীশের পাশের আসনটিতে যিনি বসে আছেন, শ্যামবর্ণ, মধ্যবয়সী, মাথাভরা টাক—উনি গোকুলানন্দ বিদ্যামণি। কাব্য-ন্যায় প্রভৃতির ধার ধারেন না। তিনি সমকালীন এক প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ সুবুদ্ধি শিরোমণির প্রপৌত্র। জ্যোতির্বিদ শব্দের অর্থ না বুঝে কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর-উলার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ঔর কাছে ধমক খেয়েছে। তারা ঔর দ্বারস্থ হয়েছিল কোষ্ঠিবিচার করাতে, জন্ম পত্রিকা বানিয়ে ভবিষ্যৎ জানতে। উনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্থগুলোকে বোঝাতে—ফলিত জ্যোতিষ নয়, তাঁর এলাকা গণিত জ্যোতিষ। আর্যভট্ট তাঁর আরাধ্য, খনার বচন নয়! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী এই পণ্ডিত শুধু আকাশচারী গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য করেছেন। বৃত্তিভোগী পণ্ডিতের নানান কামনা—কেউ স্বপ্ন দেখেন কেদার-কৈলাসের, কেউ বা বৃন্দাবন। বিদ্যামণিরও অন্তরে অন্তরলীন হয়ে আছে এক তীর্থদর্শনের কামনা—জয়পুরে সোয়াই জয়সিংহের মানমন্দির! সম্প্রতি তিনি একটি অদ্ভুত আবিষ্কার করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন—বিদেশী ঘড়ি আবিষ্কৃত হবার পূর্বেই নিজ তত্ত্বাবধানে তিনি নির্মাণ করেছেন এক বালুকাঘড়ি। তার সাহায্যে শুধু দণ্ড, পল নয়, অনুপলও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। অদ্ভুত প্রতিভা!



‘কৃষ্ণনগর’ নামটি কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামানুসারে নয়।

নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার। তাঁর আদিনিবাস ছিল মাটিয়ারি গ্রাম। গ্রামটি অতি প্রাচীন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এই গ্রামটির উল্লেখ আছে—শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রার প্রসঙ্গে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই গ্রামে উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন তৈরী হত। এখন হয় কিনা জানি না, আমাদের বাল্যকালে সে গ্রামে—না, তখন আর সেটা গ্রাম ছিল না, গঞ্জাই,—সেখানে অসংখ্য কাঁসারিদের কাজ করতে দেখেছি। এই ভবানন্দ মজুমদারই কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

এই যে নদীয়া-রাজবংশ—যা কালে ফুলে-ফেঁপে বাঙলার ইতিহাসে চিহ্ন রেখে গেল, তার সূচনা কিন্তু একটি সামান্য ঘটনা থেকে। বালক ভবানন্দের সাহসিকতায়!

ভবানন্দ একদিন মাটিয়ারী গাঁয়ে গঙ্গাতীরে সমবয়সী কয়েকজন বালকের সঙ্গে খেলা করছে। হঠাৎ সবাই দেখতে পেল সৈন্য বোঝাই একটা নৌকা এসে ভিড়ল গঙ্গার ঘাটে। ওর বন্ধুবান্ধবেরা দুদাড়িয়ে পালিয়ে গেল। চাণক্যবাক্য স্মরণ করে স্নানার্থীরাও তাড়াতাড়ি ঘাট ছেড়ে উঠে পালায়। দাঁড়িয়ে রইল একা ভবানন্দ। দ্বাদশবর্ষীয় বালক। বাহুবল্লভাশ ভঙ্গিতে। যে ভঙ্গিতে তিনশ বছর পরে দেখা যাবে স্বামী বিবেকানন্দকে।

সৈন্যদলের সেনানায়ক ভাঙা ভাঙা বাঙলা বলতে পারে। সে বালকটিকে সকৌতুকে প্রশ্ন করে, কী হে? তুমি পালিয়ে গেলে না কেন?

—পালাব কেন? আপনারা বাঘ না রাক্ষস?

সেনাপতি জানতে চায়, বলতে পার খোকা, হুগলী বন্দর আর কত দূরে?

খোকা সেটুকু তো বলতে পারলও, ঐ সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজনীয় খবর সরবরাহ করল। ফৌজদার বালকের সাহস আর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। একটি পুরো দিন ওরা কাটিয়ে গেল মাটিয়ারিতে। তারপর অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে সেই বালকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল হুগলী। ভবানন্দ পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতা রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের বংশকৌলিন্য ছিল যথেষ্ট—আদিশূর তাঁর যজ্ঞসম্পাদন করতে কান্যকুব্জ থেকে যে ভট্টানারায়ণ মহোপাধ্যায়কে এনেছিলেন সেই বংশেরই সন্তান। কিন্তু তখন অর্থকৌলিন্য ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্রটিকে তার ভাগ্যান্বেষণে ঐ ফৌজদারের সঙ্গে যেতে দিলেন।

ফৌজদার তাকে নিয়ে এল সপ্তগ্রামে। অপুত্রক সেনানায়ক সম্রাট ভবানন্দের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করল—শাস্ত্রশিক্ষা, শস্ত্রশিক্ষা, রাজকার্য, ফারসীভাষা। অত্যন্ত মেধাবী ভবানন্দ। অচিরে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল সে।

কৈশোর-তারুণ্যের সজ্জিক্ষণে ঐ ফৌজদারের প্রচেষ্টায় ভবানন্দ লাভ করলেন বাঙলার নবাব সরকারে কানুনগোর পদ এবং পরে মজুমদার উপাধি।

উদ্যোগী পুরুষের ভাগ্যে এমনটিই ঘটে। আকবর বাদশাহর মুগল-বাহিনী নিয়ে রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ এসেছেন বঙ্গদেশে। বিরাট বাহিনী নিয়ে চলেছেন কপোতাক্ষ তীরে যশোর। বারো ভুঁইয়ার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ নেতা যশোরাদিপতি প্রতাপাদিত্যের শাসন-মানসে। পথে নামল প্রচণ্ড বর্ষা। রাজপুতানার মানুষ। বঙ্গদেশের এ ভয়াবহ নিম্নচাপের, এই ঝড়-ঝঞ্ঝা আর অবিচ্ছিন্ন ধারাপাতের বিষয়ে কোনও ধারণা নাই।

বাল্যকালের সেই নাটকটিই পুনরাবিত্ত হ'ল। মুগল সৈন্য আসছে শুনে গ্রাম-গঞ্জের মানুষ প্রাণভয়ে আত্মগোপন করেছে। মানসিংহ ন্যায্য মূল্য দিতে প্রস্তুত—কিন্তু হাটে-বাজারে বিক্রেতার পাভা নেই! গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য। প্রচণ্ড বিপদ! সেই সময়ে মুগল শিবিরে এসে সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এক অকুতোভয় স্থানীয় যুবক। সে জানালো—অর্থমূল্যে সে ঐ বিরাট বাহিনীর খাদ্যপানীয় সরবরাহ করতে পারবে। পুরো একটি সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হল মানসিংহকে। কিন্তু ভবানন্দ মজুমদারের ব্যবস্থাপনায় তাঁর সেনাবাহিনী অভুক্ত রইল না। এমনকি অশ্ব ও হস্তিযুগ্মের খাদ্যও সরবরাহ করল সে। প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে

কৃষ্ণনগর

প্রত্যাবর্তনের পথে মানসিংহ ঐ যুবকটিকে সঙ্গে নিয়েই দিল্লীতে ফিরে গেলেন। তাঁরই সুপারিশে ভবানন্দ মজুমদার লাভ করলেন চতুর্দশ পরগণার শাসনাধিকার। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমান। কারণ সেটা শাহেন-শাহ আকবরের দেহাবসানের পরের বৎসর—1606 খ্রীষ্টাব্দ।

ভবানন্দ ভট্টাচার্য হয়ে গেলেন, রাজা ভবানন্দ মজুমদার।

মাটিয়ারি গ্রামেই নির্মাণ করালেন রাজপ্রাসাদ।

তাঁর পৌত্র রাজা রাঘব মাটিয়ারি ছেড়ে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরে রাজধানী সরিয়ে আনেন। গ্রামটির পূর্বনাম : ‘রেউই’। রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্র এই নতুন রাজধানীর নামকরণ করেন ‘কৃষ্ণনগর’। হেতুটি এই : রেউই-গ্রামে ছিল গোপদের বাস, তারা মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত। রুদ্র রায়ের আমলে জমিদারী আরও বৃদ্ধি পায় ; তিনি দিল্লীর বাদশাহকে সে আমলেই বিশ লক্ষ টাকা কর দিতেন। রুদ্রের পুত্র রঘুরাজ ছিলেন প্রখ্যাত ধনুর্ধর বীর। তখন মুর্শিদকুলি খাঁয়ের আমল। বারাকোটের যুদ্ধে নবাবপক্ষ অবলম্বন করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। রাজসাহীর বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণের সেনাপতি আলি মহম্মদকে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বহস্তে নিহত করেন—তীরবিদ্ধ করে। সাধারণের কাছে তিনি ‘রঘুবীর’ নামে পরিচিত। সেই রঘুবীরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বে আমরা কাহিনীর নৌকা ভিড়িয়েছি। বস্তুত এ রাজবংশ-সূর্য ঐ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই মধ্যগগনে। তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রের আমল থেকে সে সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও স্বাভাবিকভাবে দোষে-গুণে মানুষ। মনে আছে, ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ক্রাইভের উপহার দেওয়া কামান দেখে আমরা নাক সিটকেছি। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-বিপক্ষে যোগ দেওয়ায় তিনি ঐ কামানগুলি উপটোকন পেয়েছিলেন—লাভ করেছিলেন ‘মহারাজা’ খেতাব। সে-আমলে ‘সিরাজদৌলা’ নাটকের প্রভাবে বাঙলার ঐ শেষ নবাবটির প্রতি কিশোর মনে কিছু দুর্বলতা ছিল। তখনও বুঝবার বয়স হয়নি, কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা রানী ভবানী সিরাজপক্ষে যোগ দিতে পারেননি।

কৃষ্ণচন্দ্র গোড়া ছিলেন, এ-কথা মানতেই হবে। আর সেই গোড়ামি যে অপকৌশলে জিইয়ে রাখতেন তা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। যেমন রাজা রাজবল্লভের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের আয়োজন ব্যর্থ করে দেওয়া।

রাজা রাজবল্লভ বৈদ্য—ব্রাহ্মণ নন। তাঁর অষ্টমবর্ষীয়া বিধবা কন্যাটির পুনর্বিবাহের জন্য তিনি প্রাণপাত করেছিলেন। সমাজপতি ব্রাহ্মণরাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মতিলভের জন্য তিনি পত্র লেখেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে প্রত্যুত্তরে কিছু পণ্ডিতকে পাঠিয়ে দিতে বলেন কৃষ্ণনগরে—বিচারের জন্য। রাজবল্লভ উৎসাহিত হয়ে কয়েকজন পণ্ডিতকে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পাঠিয়ে দিলেন। বিচার্য বিষয় : ‘অক্ষতযোনি বালবিধবার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা।’

কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাপণ্ডিত রামগোপাল তর্কালঙ্কার রাজবল্লভ-প্রেরিত পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন। অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অন্তিমে অপকৌশল প্রয়োগ করে ঐ সভাপণ্ডিত আরও কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে প্রচার করলেন ‘বিধবাবিবাহ’ দেশাচারবিরুদ্ধ—শাস্ত্রের অনুমোদন নাই। মজার কথা, যে যুক্তিগুলি হেতু হিসাবে দেখানো হল, তা আরো অক্ষতযোনি বালবিধব সংক্রান্ত নয়, ‘যৌবনপ্রাপ্তা বিধবার পুনর্বিবাহ’। এ দুটি বিষয়ের পার্থক্য বুঝে নেবার মতো

পাণ্ডিত্য নিঃসন্দেহে ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের। কিন্তু তিনি জেনে-বুঝে সমাজপতি হিসাবে নিদান ইকলেন: বটেই তো! বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয়।

প্রশ্নটা ছিল: ‘অক্ষতযোনি বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা’!

সমাজপতি জবাব দিলেন: যাবতীয় বিধবা বিবাহই অশাস্ত্রীয়!

যুক্তি হিসাবে দেখানো হল—পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বৈমায়েয় ভ্রাতৃগণের ভিতর সম্পত্তি বন্টন সম্ভবপর; ‘বৈপিত্র্যে’-ভ্রাতার উদ্ভাবনে সামাজিক জটিলতা অবশ্যম্ভাবী!

স্বতই প্রতিপ্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে; বিচারক মহাশয়! আপনি কি দুঃখপোষ্য শিশু?

সাত-আট বছরের একটি রাঙা-চেলির পুটুলিকে কনে-চন্দন পরিয়ে একরায়ে তার কর্ণমূলে কিছু অংবৎ মস্ত্র শোনানো হল; তারপর একদিন তাকে বলা হল—‘তুই বিধবা হয়ে গেছিস!’—বাস! আজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা! এই অনাচারকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন রাজবল্লভ। কিন্তু তিনি বৈদ্য—ব্রাহ্মণ নন। তাই সমাজপতির অনুমতি চেয়েছিলেন। আর কৃষ্ণচন্দ্র সেটা ঋত্যাখ্যান করলেন এই অভ্যুহাতে—‘বৈপিত্র্যে ভ্রাতার উদ্ভাবনে জটিলতা অবশ্যম্ভাবী!’

স্বীকার—রাজা রাজবল্লভ স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে এই সমাজ-সংস্কারের আয়োজন করে ছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীর সেই বীরসিংহের পাগলের মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চাননি; কিন্তু তাঁর আচরণে নিন্দনীয় কিছু নেই।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের?

দোষ যেমন ছিল, গুণও ছিল। অসাধারণ গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা—বিশেষ করে গৌড়ীয় নব্যন্যায়ের বিকাশন সম্ভবপর হয়েছিল একাধিক উদারমনা ভূস্বামীর অনুগ্রহে। ব্রাহ্মণকে সারসং আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন তাঁরা অকুণ্ঠ বদান্যতায়—পুণ্ড্রেশ্বরক রানী ভবানী, উত্তরবঙ্গের একাধিক ভূস্বামী, বর্ধমান মহারাজ, রাজবল্লভ, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব। তার ভিতর একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন—নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

সে আমলে একটি প্রবাদই চালু হয়ে গিয়েছিল: ‘মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহলাভ যে করেনি তার ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ জাগে!’

একটিমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম! তাঁর কথাই বলব এবার: রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।

—‘বুনো’ রামনাথ!



আশ্চর্য চরিত্র! অত্যন্ত দুঃখের কথা, তাঁর প্রামাণিক জীবনী নেই।

ধাত্রী গ্রামের গুরু ভট্টাচার্য বংশীয় পণ্ডিত। মনে হয়, সমকালীন নবদ্বীপের গণ্ডিতনিচয়ের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ। পিতার নাম অভয়রাম তর্কভূষণ। পিতা তাঁকে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন তৎকালীন নবদ্বীপের সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের গুরুকুল চতুষ্পাঠীতে।

এখানে বোধহয় ‘চতুষ্পাঠী’ শব্দটির কিছু পরিচয় দিয়ে রাখা ভাল। ‘চতুঃ’ শব্দটি চারি

নদীয়া

বেদের দ্যোতক। অর্থাৎ যে বিদ্যায়তনে চতুর্বেদের চর্চা হয়। যে আমলের কথা, তখন যাবতীয় শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ব্যবস্থা হত চতুষ্পাঠীতে বা টোলে। অর্থাৎ চতুর্বেদের অধ্যয়ন-প্রভৃতি—যজ্ঞ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) এবং যজ্ঞদর্শন (সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা)। ছাত্ররা গুরুগৃহেই বাস করত। এক-এক টোলে দু-চারটি ছাত্র। গুরুপত্নী তাদের জন্য রন্ধন করতেন। কোন কোন সম্পন্ন গুরু এজন্য শিষ্যদের কাছ থেকে ‘সিধা’ নিতেন না—তারা বিদ্যাদানের পুণ্য সঞ্চয় করতেন। অধিকাংশই শিষ্যদের কাছ থেকে প্রণামী পেতেন। কখনো বা ভূস্বামী এই ব্যয়ভার বহন করেন। যেমন মহাপণ্ডিত শঙ্কর তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী। অতি বৃহৎ আয়োজন। প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, আটচালা ঘর। চারি দিকে টানা বারান্দা। এক এক দিকে এক এক আয়োজন : ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়। তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্ররা—যারা নবান্যায় বা বেদান্ত অধ্যয়ন করছে, তারা সেই বারান্দায় পঠন-পাঠনের তত্ত্বালাশ নেয়। শঙ্কর স্বয়ং সেখানে গিয়ে তদারকি করেন। তিনি নিজে অধ্যাপনা করেন আটচালার ভিতরের ঘরখানিতে। নবান্যায় অথবা বেদান্ত। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ঘিরে সারি সারি ছাত্রাবাস। কিছু দূরে রন্ধনশালা, ভাণ্ডারঘর। পাচক-ভৃত্য-দ্বারপাল। দৈনিক দুই-তিনশ কল্যাপাতার প্রয়োজন হয়। সে এক এলাহী কাণ্ড। ছোটমাপের আবাসিক মহাবিদ্যালয় যেন। সমস্ত ব্যয়ভার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের।

রামনাথ তাঁর সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা মেধাবী। তিনিও গুরুর আশীর্বাদ আর্থা-আধি সফল করতে পেরেছিলেন। শেষ পরীক্ষায় আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়ে পঞ্চানন-গুরুকুল থেকে উপাধি লাভ করলেন : ‘তর্কসিদ্ধান্ত’। গুরুকে প্রণাম করার সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : জ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠায় তুমি বাগদেবীর আশীর্বাদ লাভ করবে; বিদ্যোৎসাহী রাজার অনুগ্রহে লক্ষ্মীর স্নেহধন্য হবে।

আশীর্বাদের শেষাংশ সার্থক করতে পারেননি ‘বুনো রামনাথ’।

উপাধিলাভের পর সে-আমলে কর্মসন্ধানে শিক্ষিত বেকারদের পথে পথে ঘুরতে হত না। উপাধিপত্রটি বগলদাবা করে সরাসরি চলে যেত রাজার কাছে। লাভ করত নিষ্কর ভূমি, টোল-নির্মাণের ব্যয়ভার। খুলে বসত একটি নতুন চতুষ্পাঠী। নবদ্বীপের গণনাটীত টোলের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটত বিনা আয়াসে। রামনাথের সহাধ্যায়ীরা সেভাবে সহজে জীবন শুরু করে দিলেন। উপযুক্ত, উপার্জনক্ষম নব্যপণ্ডিতদের অভিভাবক সমীপে আনাগোনা শুরু করল ঘটকের দল।

গোল বাখল রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের বেলায়। দুটি হেতুতে।

এক : তিনি রাজানুগ্রহ গ্রহণ করবেন না।

দুই : তিনি অকৃতদার নন, সংসারী।

ছাত্রাবস্থাতেই নিতান্ত কিশোর বয়সে একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

তোমরা আমাকে মার্জনা কর, দিদিভাই! অক্ষমতার কথা অকপটে স্বীকার করছি। জানি, কথাসিদ্ধী হিসাবে দারুণ একটা রোমাণ্টিক খণ্ডকাহিনী পরিবেশনের সুযোগ হারানো। কী করব ? কল্পনায় ঐ অবিশ্বাস ঘটনাটি কিছুতেই ধরতে পারছি না। খুলেই বলি :

অনুরূপ ‘পাপকাযটি’ করেছিলেন আলোচ্য শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

ছাত্রাবস্থায় অভিনাবকদের সম্মতি ব্যতিরেকে একটি নোলক-পরা বালিকার সিঁথিমূলে ঐকে দিয়েছিলেন সিন্দূরবিন্দু। ইতিহাস শুধু বলছে—ঘটনাটা তেজপুর নামক গ্রামে, বালিকাবধূর নাম : 'রাধা' ; তার পিতৃদেবের নাম : 'কেশরকুনী আচার্য' ব্যস! এছাড়া আর কোন তথ্য ইতিহাসের স্মরণে নেই। কবি তাঁর কাব্যে নিজেকে 'রাধানাথ' বলে উল্লেখ না করলে কবিপ্রিয়ার নামটাও আমরা জানতে পারতাম না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'অমাবস্যার গান'-এ কল্পনায় সে ঘটনার বিস্তার করেননি। কেন করেননি জানি না। তাই পাদপুরণ করতে আমি এখানে কিছু 'গল্পো' ফেঁদেছি—ঐ বাগদেবীর যৌথ আরাধনার কল্পিত কাহিনী। কিন্তু এবার, রামনাথের বেলায় কোন উদ্ভট কল্পনার আঁকশি বাড়িয়ে ঐ অবিশ্বাস্য নিষিদ্ধ ফলাটির নাগাল পাচ্ছি না। যে চরিত্রটির রেখাচিত্র আঁকতে বসেছি সেই আত্মভোলা, গ্রন্থকীট, ভিন্ন জগতের অ-রোমান্টিক পণ্ডিতটি যে কী-করে এমন একটা কেরামতি কিশোর বয়সে দেখিয়েছিলেন তা আমার আন্দাজের বাইরে। এ এমন একটা জটিল ব্যাপার যা কথাসাহিত্যিকের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এসব কাণ্ড-কারখানা ঘটানোর হিম্মৎ শুধু সেই অলক্ষ্য নাট্যকারের—যিনি কারও তোয়াক্কা করেন না। যিনি অনায়াসে বলতে পারেন : গদাধরও সারদামণিকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

আমি শুধু তোমাদের মেনে নিতে বলব—ইতিহাস-পরিবেশিত তথ্যটা। অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর পণ্ডিত তাঁর চতুর্দশ বর্ষীয়া সহধর্মিণীকে নিয়ে সংসার পাতবেন। চতুষ্পাঠী খুলে বসবেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নাই। সহাধ্যায়ীরা যেভাবে সহজ সমাধান করল, তাও পারলেন না, অর্থাৎ রাজানুগ্রহ হাত পেতে গ্রহণ করতে।

তবু যাহোক ব্যবস্থা হল। কারণ তুরুপের টেকাখানা ছিল অজান্তেই ঠাঁর হাতে। যে দু-তিনটি মেধাবী ছাত্রকে নিয়ে শুরু করলেন তারাই হয়ে উঠল ঠাঁর স্বনির্বাচিত বিজ্ঞাপনদাতা : দারুণ পড়ান উনি! কাশী-মিথিলার কথা জানি না; কিন্তু নবদ্বীপে এমনটি নেই। বিশ্বাস না হয় একদিন আসিস। শুনে যাসু তাঁর অধ্যাপন-পদ্ধতি।

গুটিগুটি অন্যান্য চতুষ্পাঠীর ছাত্রদল এসে বসত। চুপচাপ শুনত। তারা ভর্তি হতে চাইত ঠাঁর টোলে। রামনাথ স্বীকৃত হতে পারতেন না। আর্থিক অসচ্ছলতা। ছাত্রেরা বলত—আমরা প্রণামী দেব আপনাকে।

অর্কফলা সম্মত ঘনঘন নড়ে উঠত পণ্ডিতের মুণ্ডিত মস্তক। তা কি হয়? বিদ্যা 'বিক্রয়' করতে নেই। শুধু 'দান' করতে হয়! তোমরা এস, বস, শোন। যদি কোন 'অনুপপত্তি' থাকে অসঙ্কোচে সমাধান জেনে নিও। কিন্তু কোনক্রমেই কোন প্রতিদান দেবার চেষ্টা কর না।

অনতিবিলম্বেই প্রখ্যাত হয়ে পড়েন রামনাথ—আদর্শ শিক্ষক হিসাবে।

যে দু-তিনটি ছাত্রকে আশ্রয় দিয়েছেন তাদের আহাৰ্য-ব্যয় নিজেই বহন করেন। কী করে করেন তা ঈশ্বর জানেন!

ছাত্ররা বাধ্য হয়ে রাজী হয়। তারা নিজগৃহে আহাৰ্য্যে ছুটে আসে ঠাঁর কাছে। সারাদিন পঠন-পাঠন করে সন্ধ্যায় স্বগৃহে ফিরে যায়। তাতে আপত্তি নেই পণ্ডিতের।

এই আদর্শ শিক্ষকের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদানের পদ্ধতিটি নানা কারণে বিচিত্র। একটি কথা এটা আগেই বলেছি—অবৈতনিক শিক্ষা দান।

সেটা অভূতপূর্ব নয়। অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন অধ্যাপক বিনাবেতনে নিজব্যয়ে গুরুগৃহে শিষ্যদের ভরণপোষণ করতেন। তাঁরা নির্লোভ এবং বিদ্যাদানকে পুণ্যকার্য মনে করতেন। সুতরাং রামনাথের সে কাজটা দুঃসাহসিক হতে পারে, অশ্রুতপূর্ব নয়।

অভূতপূর্ব যে কাণ্ডটা করলেন তা—দুবিনীত ছাত্রদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা।

তাহলে গোবিন্দ রায়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতাটা শোনাই:

পরবর্তী জমানার—রাজা শিবচন্দ্রের আমলের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়তীর্থের বাল্যকালের এক বিচিত্র স্মৃতিচারণ। কী নিদারুণ শাস্তি পেয়েছিলেন তিনি গুরু রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের কাছে।

সেটা চৈত্রমাসের শেষাংশে। চৈত্র শুক্লা একাদশী তিথি। প্রায় মাসখানেকের জন্য কৃষ্ণনগরে একটি বিখ্যাত মেলা হয়, অন্তত হত:বারো দোল। নদীস্রারাজ্যের বিভিন্ন মন্দির থেকে দোলায় চাপিয়ে আনা হয় দ্বাদশটি কৃষ্ণ-রাধার মূর্তি। বারোটি বিগ্রহের এক সঙ্গে ‘দোল’ হয়। কেউ যুগলে, কেউ একাকী, কেউ বা নাড়ুগোপাল। তাঁর একটি বিগ্রহের বিষয়ে কৃষ্ণনগরে প্রচলিত আছে একটি অলৌকিক উপকথা: মদনমোহন! কিন্তু সে-কথা এখন থাক। পরে বলব, রাজা নবকৃষ্ণের প্রসঙ্গে। আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দিও, দিদি।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—বৃদ্ধ বয়সে গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়তীর্থ তাঁর শিষ্যদের জানিয়েছিলেন, কীভাবে তিনি রামনাথের কাছে শাস্তি লাভ করেন।

‘বারোদোল’ উপলক্ষে পরপর তিন দিন চতুষ্পাঠীতে অনধ্যায়। টোলে ছুটি থাকলে রামনাথ নির্দেশ দিতেন স্বগৃহে প্রতিটি ছাত্র কিছু কিছু পাঠাভ্যাস করবে। আজকের দিনের পরিভাষায় যাকে ‘হোমটাস্ক’ বলে আর কী। বারোদোলের মেলার ছমোড়ে বালক গোবিন্দ পড়ায় ফাঁকি দিয়েছিলেন। অবকাশ-অস্ত্রে গুরু রামনাথ যখন পড়া ধরলেন তখন কিছুই বলতে পারলেন না। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস নাই, জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বীকার করলেন—তাঁর বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়নি। সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য যে পাঠাভ্যাসে মন দিতে পারেননি, তা নয়। স্বীকার করলেন, অন্যায় করেছেন। গুরু জানতে চাইলেন, তুমি তাহলে মেনে নিচ্ছ যে, তোমার শাস্তি প্রাপ্য?

গোবিন্দ নতমস্তকে সে কথা মেনে নিলেন। তখন রামনাথ বললেন, তাহলে তোমার গুরুপত্নীকে ডেকে নিয়ে এস, বাবা।

অনতিবিলম্বে পণ্ডিতগৃহিণী—তাঁর নামটা পাইনি—এসে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা হলেন। রামনাথ বললেন, শোন। আজ আমার উপবাস। গোবিন্দের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে।

গৃহিণী জানতে চান, সমস্ত দিন?

—শুধু আজ নয়, হয়তো কালও। দেখি, ওর কতক্ষণ লাগে। যাও বাবা গোবিন্দ, বাড়ি যাও। পাঠাভ্যাস হয়ে গেলে এসে আমাকে জানিও।

গৃহিণী আবাসিক ছাত্র তিনজনকে বললেন, তোমরা কী করবে? কাঁচা ফলার? উনি উপবাস করবেন, ফলে আমারও উপবাস! তোমরা কাঁচা ফলার করলে আজ অরুচির ব্যবস্থাই করি।

ওদের মুখপাত্র বললে, সে কী মা! আপনারা উপবাসী থাকবেন আর আমরা কাঁচা ফলার করব? তা হয় না।

হাউহাউ করে কঁাদতে কঁাদতে গোবিন্দ বাড়ি ফিরে গেল। বলাবাহুল্য, সেদিন নাওয়া-খাওয়া হল না তার। সমস্ত দিন পাঠাভ্যাস করে তিনদিনের পড়া একদিনে আয়ত্ত করে সন্ধ্যায় ফিরে এল চতুষ্পাঠীতে। রামনাথ গৃহিনীকে ডেকে বললেন, উনুনে আগুন দাও। দু-মুঠো চাল বেশি নিও। গোবিন্দ বেচারির মুখখানাও শুকিয়ে গেছে! ও বোধহয় নাওয়া-খাওয়ার সময় পায়নি। না কী রে?

গোবিন্দ মুখ লুকিয়ে হাসে। বাহুল্য বোধে প্রশ্নটার জবাব দেয় না।

বেত্রদণ্ড—যা নাকি সে-আমলে ছিল টোলের এক আবশ্যিক উপাদান, তার প্রয়োজন হয়নি কখনো এই চতুষ্পাঠীতে। পাছে গুরু-গুর্বা অনশন শুরু করে দেন তাই ছাত্রদল চোখে রেড়ির তেল দিয়ে রাত জেগে পাঠাভ্যাস করত।

ভৈরব মজুমদারের শাস্তিটা ছিল আরও নির্মম। তাকে বহিষ্কার দণ্ড দিয়েছিলেন! আজকের ভাষায় যাকে বলে ‘রাস্টিকেট’ করা। আর কোনদিন মুখদর্শন করেননি প্রিয় ছাত্রের। বেচারী ভৈরব। তার উপাধিলাভ করা আর হয়নি। বিতাড়িত হয়ে অন্য কোন অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে গিয়ে ভর্তি হতে পারেনি। ভৈরবের অপরাধটা ছিল হিমালয়াস্তিক। পাঠে অবহেলা তবু ক্ষমা করা যায়, কিন্তু চৌর্য্যপরাধ? ব্রাহ্মণ সন্তান! গুরুগৃহে চুরি! না, তার ক্ষমা নাই!

ভৈরব ধনী গৃহের সন্তান। দুধ-ঘি-ননী তার নিত্যবরাদ। আবাসিক তিনটি সহাধ্যায়ীকে বেগুনপোড়া অথবা শাকান্ন গ্রহণ করতে দেখে মনে দুঃখ হত। লক্ষ্য করে দেখত—তাদের উদরপূর্তি হয়নি, তবু ‘ব্যাঘ্র-ঝম্পনে’ গুরুপত্নীকে বাধা দিত: ‘আর দেবেন না মা! পারব না!’ তারা যে জানে, শিষ্যদের আহ্বারান্তে গুরু-গুর্বা মধ্যাহ্নআহারে বসবেন—আর জানে, তাঁদের দুজনের জন্য হাঁড়িতে কতটুকু পড়ে আছে!

ভৈরব চুরি করতে শুরু করল।

লুকিয়ে পেট-কোঁচড়ে নিয়ে আসত চাউল। নিজেদের বাড়ি থেকে। গুরুপত্নী নদীতে জল আনতে গেলে নিপুণ হস্তলাঘবতায় তাঁর রান্নঘরে ঢুকে বেতের টুকরিতে মিশিয়ে দিত চুরি করে আনা চাউল।

গুরু-গুর্বা টের পেতেন না। বিস্মিত হতেন।

পণ্ডিতমশাই অন্নগ্রহণকালে বাক-সংযম করে থাকেন। আচমনের পরে গৃহিনীর সঙ্গে এ নিয়ে হয়তো কিছু আলাপচারিও হত। আড়াল থেকে শুনে ভৈরব মনে মনে হাসত।

ইতিপূর্বে রামনাথ পণ্ডিত-মশাইকে ‘অ-রোমান্টিক’ বলেছি। তা বলে তিনি ‘অরসিক’ ছিলেন না মোটেই। সময়-সময় দিবা রসিকতা করতেন। বলতেন, গুরুভোজনের পর মুখশুদ্ধি করা বিধেয়! কই গো করঙ্কধারিণী! পান-গুবাক-কর্পূরের খুঁকটা নিয়ে এস!

পণ্ডিতজায়া মুখে আঁচলচাপা দিয়ে নারকেলের মালায় করে নিয়ে আসতেন তাঁর মুখশুদ্ধির সামান্য আয়োজন—দু-চার টুকরা হরীতকী! তিনিও হয়তো রসিকতা করে বলেন, খুব গুরুভোজন হয়ে গেল বুঝি আজ? হজমী দেব?

—হল না? সেই যাকে বলে—“ওগুগরা ভত্তা বন্তঅ পত্তা, গাইক ঘিত্তা, দুক্ষ সজ্জুত্তা/মৌহিলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা, দিচ্ছই কাত্তা খা (ই) পুনবন্তা॥”

পণ্ডিতগৃহিণী অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, কতদিন বলেছি যে, ঐ দেবভাষা, বুঝি না?

—না, না গিমি! এ সংস্কৃত নয়—খাঁটি বাঙলা।

—বাঙলা? কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না?

—বোঝ-না-বোঝ এ চলিত বাঙলা। চর্যাপদের। প্রাকৃত পৈঙ্গল। এ ভাষাতেই গৌড়জন কথা বলত চার-পাঁচ'শ বছর পূর্বে। শ্লোকটির অর্থ হল “কদলীপত্রের গরম ভাত, গাওয়া ঘি, সঙ্গে দুধ, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে গৃহিণী নিত্য পরিবেশনে সক্ষম তাঁর ভর্তা পুণ্যবান।—এতে আর সন্দেহ কী?

—আপনার গিমি বুঝি আপনাকে তাই নিত্য পরিবেশন করে?

—না, তা নয়। তবে কী জান? মূল পদটি ‘অন্ন’। অন্নের বর্ণনায় নৈষধচরিতের কবি বলছেন, “পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম-নির্গত হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটি দানা অভয়, একটি হইতে অপরটি বিচ্ছিন্ন”—অর্থাৎ ঐ তোমরা যাকে বল, ‘ঝরঝরে ভাত’, —“সে-অন্ন সুসিদ্ধ, সুস্বাদু, সুশুভ্র, সুচিকণ এবং সৌরভ-সৌরবাস্তিত”! বুঝলে? আমি হাট থেকে নিয়ে আসি বোরোধানের আঁকাড়া লাল-চাল, আর তোমার শাঁখাপরা হাতের পরশমণির ছোঁয়ায় তা থেকে নির্গত হয় গোবিন্দভোগ চাউলের সৌরভগৌরব!

ভৈরব মনে মনে হাসত। ঐরা বৈষ্ণব নন, নিরামিবাশী নন; কিন্তু বাড়িতে মাছ আসে মাসে দুদিন। কৃষ্ণপক্ষে এক দিন, শুক্লপক্ষে একদিন। পণ্ডিত গৃহিণীর এ বিলাসিতাটুকু বরদাস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। কী করা যাবে? জীজাতীর সংস্কার। দুটি একাদশী তিথিতে মেধো-মালোঁ যা-হোক দুটো মাছ ফেলে দিয়ে যায়: মৌরলা, খলিসা, সরপুঁটি, চাঁদা।

জীমূতবাহনের মতো শামুক, কঁকড়া, হাঁস, দাতুহ পক্ষীর মতো বাণ-বোয়াল ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য। কিন্তু বৃহদ্রত্নপুরাণ বলেছেন, সৎব্রাহ্মণও অন্নসেবাকালে গ্রহণ করতে পারেন, রোহিত, ইল্লিস, শফরী, কাতল ও সকুল-মৎস। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ রাজানুগ্রহ অথবা শিষ্যদের প্রণামী গ্রহণ করতে অক্ষম, তাঁর পক্ষে কী কী মৎস, কী উপায়ে ভক্ষ্য তা কোন সংহিতা বা পুরাণে লেখা নেই। ফলে গুরা ব্যয়-সঙ্কোচ আর সংস্কারের একটা মাঝামাঝি রক্ষা করেছেন: ‘পক্ষে’ এক, যন্মাসে বারো/তারপর যত কমাতে পারো!

তারপর একদিন।

তঙ্করের মানসিকতাও ক্রমবর্ধমানধর্মী: ‘হবিষ্য কৃষ্ণবর্থেব’^১। তার সাহস বেড়ে যায়। গুঁবীর টুকরিতে ছিল দুটি বেগুন। পরদিন সকালে দেখা গেল গুণ্ডা পুরেছে। হংসীতে আগু দেয়, পাঠশালায় ছাত্ররা ‘গুণ্ডায় আগু’ দেয় তা বলে বার্তাকু আগু পাড়বে টুকরিতে। ব্রাহ্মণী ওই অলৌকিক ঘটনাটি বিবৃত করলেন পাণ্ডিতকে। অধীত বিদ্যার বাহির-জগতের সংবাদ উনি তেমন কিছু রাখতেন না—কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে এ সামান্য জ্ঞানটুকু ছিল: বেগুন গাছে ফলে! বেতের টুকরিতে তার বংশবৃদ্ধি অপ্রাকৃত ঘটনা! পণ্ডিত শিষ্যবর্গের সুস্থ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন।

^১ অগ্নিতে ঘটাস্থতি দিলে যেমন হয়।

‘হস্তলাঘবতা’ অয়াত্ত করতে শিখেছে আর ‘অনৃতভাষণ’ অভ্যাস করেনি! দোষ তো একা ভৈরবের নয়, গুরুও যে দায়ী। মিছেকথা বলা শেখাতে পারেননি। নতমস্তকে স্বীকার করল। তৎক্ষণাৎ বহিষ্কারদণ্ড!

ভৈরব মজুমদার কোন উপাধিলাভ করতে পারেনি। যে বেত্রদণ্ড চতুষ্পাঠীতে দেখেনি, তাই দেখল পিতৃদেবের হস্তে। না, নিজবাটিতে চুরি করার অপরাধে নয়—বহিষ্কারদণ্ড লাভের পর যখন সে প্রত্যাখ্যান করল দ্বিতীয় কোন চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হতে! বাপ অভিশাপ দিল, থাক! বামুনের ছেলে, মুখ্য হয়েই থাক!

তাও সে থাকেনি। উপাধি লাভ না করলেও পরবর্তী জমানার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভূস্বামী ভৈরব মজুমদার অশিক্ষিত ছিলেন না আদৌ। ভাগবৎ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। পড়াশুনা তিনি করেছিলেন। কোনও চতুষ্পাঠীতে নয়। একলব্যের একান্ত সাধনা!

গুরু রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের এক জোড়া বাতিল-খড়মকে সাক্ষী রেখে!

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অগুরু গুরুপত্নী সেটি উপহার দিয়েছিলেন হতভাগ্যকে।

চতুষ্পাঠী গৃহটি এতই ক্ষুদ্রায়তন যে বিদ্যাদানের আয়োজন করতে হয়েছিল সংলগ্ন উদ্যানে। সেটিও ক্ষুদ্র। ফলে সেখানেও স্থানাতাব দেখা দিল। তদ্বিত্ত শহরে পরিবেশে—ক্রমাগত কোলাহল-শোভাযাত্রা-সংকীর্তন—এতে বাগ্‌দেবীর আরাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। শহরে খাদ্যদ্রব্যও দুর্মূল্য। রামনাথ সিদ্ধান্তে এলেন—সব তর্কের শেষ সিদ্ধান্ত: অরণ্যচরী হয়ে যাবেন সস্ত্রীক। বানপ্রস্থ! জলাঙ্গীর ধারে, অরণ্যপ্রান্তে শশক, হরিণ ক্রৌঞ্চবকদের প্রতিবেশী হয়ে যাবেন। সেখানে কোলাহল নাই—মৌনপাদপের অশ্রুত সামগান, বনফুলের স্নিগ্ধ সৌরভ—প্রকৃতির নিবিড় অঞ্চলের ‘শান্তিনিকেতনে’ আশ্রয় নেবেন এবার। উপনিষদের চণ্ডে।

নবদ্বীপ-শহরপ্রান্তে, জলাঙ্গীর ধারে—সেই যেখানে আরণ্যক ধ্যানমগ্নতা থমকে দাঁড়িয়েছে শহুরে পরিবেশের জৌলুষ দেখে, সেই সীমান্ত-রেখাটি অতিক্রম করে নির্জনতার কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করলেন। ঝাঁশ-দড়ি-খড়, মাটির দেওয়াল, মাটির নিকানো মেঝে। ঘরামি লাগানোর সঙ্গতি নাই। শিষ্যদের সাহায্যে স্বয়ং নির্মাণ করলেন একটি পূর্ণকুটির। শহুরে টোল থেকে গো-গাড়িতে নিয়ে যেতে হল ঘর-গেরস্থালীর যাবতীয় সরঞ্জাম। তার বৃকোদর-অংশ শুধু হাতে লেখা পুঁথি। গৃহিণী নিত্য শোনে—গৃহ শেষ হয়ে এসেছে। জানতে চান: কেমন বাড়ি হল গো?

পণ্ডিত কৌতুক করে বলেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদের বর্ণনাটা মনে আছে, গিন্নি? কালিদাসের বর্ণনায়? শোন বলি:

“চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম্।

গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং মম॥”^১

গৃহিণী বলেন, সাদা বাঙলায় তার মানে কী হল?

—সেটা স্বচক্ষে গিয়ে দেখতে হবে।

^১ কাঠের খুঁটি নড়বড় করে, মাটির দেওয়াল গলে-গলে পড়ে, চালের খড় একটি-খণ্ডেই উড়ে পালায়, আর কৈচোর সন্ধানে উদগ্রীব ব্যাঙের সমাবেশে আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ

শিষ্যরা প্রমাদ গনে। এতটা পথ তাদের প্রতিদিন যাতায়াত করতে হবে? উপায় নাই। গুরুগৃহে বাস করার প্রশ্নই ওঠে না; আবার ঠেকে ত্যাগ করে অন্য কোন চতুষ্পাঠীতে যেতে পারে না। কিন্তু একথা ঠেকে কে বোঝাবে?

কথাটা কানে গেল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের। খোঁজ খবর নিলেন তিনি। বিভিন্ন টোলের বিশ-পঞ্চাশটি ছাত্রের গোপন এজাহার নেওয়া হল। সর্ববাদীসম্মত মত : রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সমতুল্য পণ্ডিত-তথা-শিক্ষক নবদ্বীপে দ্বিতীয় নাই। মহারাজ অতঃপর তাঁর কিশোর জ্যেষ্ঠপুত্রকে আদেশ দিলেন ঐ অরণ্যপ্রান্তে গিয়ে রামনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাঁকে অনুরোধ করতে, তিনি যেন নবদ্বীপধামে এসে তাঁর চতুষ্পাঠী খুলে বসেন। যাবতীয় ব্যয়ভার রাজসরকারের। অযাচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

শঙ্কর তর্কবাগীশ তখন সেখানে উপস্থিত। বললেন, বাবা শিবচন্দ্র, মনে রেখ, উনি অত্যন্ত অভিমাত্রী; সেজন্যই স্বয়ং উপযাচক হয়ে রাজদরবারে আসেননি।

কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, সে তো বটেই! উপযাচক আমি। তাই তাঁর ভ্রাসনে যুবরাজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। গরজ আমার। নবদ্বীপরাজ্যে বিদ্যাচর্চার প্রসার।

শিবচন্দ্র উভয়কে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছিলেন। রাজা তাঁকে আবার ফিরে ডাকলেন। উপদেশ দিলেন, শোন বাবা, আর একটি কথা বলি। তর্কসিদ্ধান্ত অধীকৃত হলে গোপনে তাঁর ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ কর।

শিবচন্দ্র প্রশ্ন করার পর শঙ্কর তর্কবাগীশের দিকে ফিরে রাজা বাম চক্ষুটি মুদ্রিত করে বললেন, কোন কোন পণ্ডিতের কাছে রাজ্যদেশের অপেক্ষা অর্ধাঙ্গিনীর আদেশ অধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ।

শঙ্কর সহাস্যে বলেন, জানি মহারাজ।

মহারাজও ফিরিয়ে দেন সহাস্য জবাব, —আপনি তো জানবেনই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে!

শিবচন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠে উপনীত হলেন রামনাথের চতুষ্পাঠীতে।

আরণ্যক পরিবেশ। মহামৌন পাদপের সারি রুদ্ধাশ্রমে শোনে তর্কসিদ্ধান্তের তত্ত্বকথা। দশ-পনেরটি শিষ্য গুরুকে ঘিরে বসে আছে। অশ্বারোহী রাজপুরুষ কিছু দূরে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। পদব্রজে এগিয়ে আসেন। প্রণাম করলেন তর্কসিদ্ধান্তকে। তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। প্রায় একদশকাল শিবচন্দ্র ছাত্রদলের পিছনে বসে শুনে গেলেন। বিন্দুবিগর্ভ বোধগম্য হল না। পাঠ সমাপ্ত হলে শিষ্যদল তাঁকে প্রণাম করে একে একে বিদায় হল। শিবচন্দ্র পুনরায় অগ্রসর হয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার প্রণাম করলেন ব্রাহ্মণকে। এতক্ষণে নজর হল। বললেন, কে বাবা তুমি? কী চাও?

—আজ্ঞে আমার নাম শ্রী শিবচন্দ্র। ঠাকুরের নাম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র রায়। নদীয়াধিপতি তিনি।

শেষ শব্দটা বোধহয় কানে যায়নি। বলেন, কোন গুরুকুলের?

—আজ্ঞে আমার পিতৃদেব নবদ্বীপাধিপতি, স্বয়ং রাজা শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

—অ! বুঝেছি। তা কী চাও বাবা?

শিবচন্দ্র বুঝে নিয়েছেন, ঠেকে নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগরে সম্মুখে উৎপাটন করে নিয়ে যাওয়া

বোধহয় সম্ভবপর হবে না। সহজতর সমাধান, যদি পণ্ডিত স্বীকৃত হন, এই আরণ্যক পরিবেশেই একটা বৃহত্তর চতুষ্পাঠী নির্মাণে। যেমন বৃহৎ চতুষ্পাঠী আছে শঙ্কর তর্কবাগীশের। পাশাপাশি ছাত্রাবাস—প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ! আরণ্যক মহাবিদ্যালয়! বললেন, বাবামশাই আপনার কথা শুনেছেন। আপনি এই আরণ্যক পরিবেশেই সারস্বত-সাধনা করে যেতে চান। এ তো আনন্দের কথা। কিন্তু বহু শিষ্য আপনার চতুষ্পাঠীতে স্থান পেতে চায়। আমাকে তাই পাঠিয়েছেন আপনার অনুপপত্তি-বিদূরণ মানসে!

‘অর্থসাহায্য’ কথাটা স্থূল। শিবচন্দ্র তাই একটি গালভারি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন—‘অনুপপত্তি’ অর্থাৎ অভাব, আর্থিক অনটন।

দুর্ভাগ্যবশত ঐ নঞতৎপুরুষ সমাসটির দ্বিতীয় একটি অর্থ আছে: অসংগতি, অমীমাংসা, প্রমাণাভাব।

সরল ব্রাহ্মণ ঐ দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করে বললেন, না বাবা! আমি চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উৎপত্তি করেছি: এখন তো কোন অনুপপত্তি দেখছি না!

নানানভাবে চেষ্টা করেও ঐ মহাপণ্ডিতের ‘নিরেট মাথায়’ সহজ কথাটা প্রবেশ করানো গেল না। পণ্ডিত বুঝতেই পারলেন না, রাজপুত্র রাজাদেশে এসেছেন তাঁকে অর্থসাহায্য করতে। নিরুপায় শিবচন্দ্র তারপরে প্রণাম করতে গেলেন সেই মহিলাটিকে! তিনি সহজেই বুঝলেন। প্রত্যুত্তরে বললেন, মহারাজকে বল, তাঁর ধারণাটি ভ্রান্ত। আমাদের সত্যই কোনও অভাব নাই। এখানে খুব ভাল ওল হয়। তাছাড়া ঐ যে তেঁতুল গাছটি দেখছ বাবা, ওর তেঁতুল পর্যাপ্ত হয়। উনি ওল-ভাত অথবা তিস্তিড়ী পত্রের বাঞ্জন দিয়ে পরমানন্দে অন্নগ্রহণ করেন। মহারাজ অহেতুক মনঃকষ্টে আছেন। এ তো শহর নয়, এখানে সত্যই কোনও অভাব নাই!

পত্রের মুখে এই বার্তা শুনে সেটা অবিশ্বাস্য মনে হল রাজমহিষীর—স্বামীজীর মধ্যে একটা পাগল হয়। এ যে জোড়া-পাগল! নিজের হিত বোঝে না?

অভিমানে লেগেছিল কৃষ্ণচন্দ্রেরও। পরাজয় স্বীকার করা তাঁর ধাতে নেই। উপযাচক হয়ে রাজপুত্রকে প্রেরণ করলেন, অথচ ব্রাহ্মণ তা প্রত্যাখ্যান করল! কীসের এত দম্ভ তার?

রানীকে প্রশ্ন করেন, যাবে? দেখতে?

—ওমা! এ কী বলছেন? আমি কেমন করে যাব?

—কেন? পালকিতে।

—আমি গিয়ে কী দেখব সেই ঐন্দো জঙ্গলে?

—জোড়া-পাগল বাস্তবে হয় কি না।



কৃষ্ণচন্দ্র এবার স্বয়ং এলেন আরণ্যক চতুষ্পাঠীতে। কিংখাবে-মোড়া পালকিতে রাজমহিষী। অশ্বপৃষ্ঠে মহারাজ। শহর-সীমার বাহিরে। কিছু স্বরগোশ আর বনতিতির ছোট্ট ছুটি করছে। নাম-না-জানা হাজার পাখির রাজত্ব। তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠীর দ্বারে দুই অশ্রুভেদী প্রহরী—এক জোড়া শিশুগাছ!

মহারাজ কোন দ্বর্থ্যবোধক সংস্কৃত শব্দের ফাঁদে পা দিলেন না। সহজ সরল বঙ্গভাষে পেশ

করলেন তাঁর কুণ্ঠিত আবেদন। দেশের স্বার্থে, নবদ্বীপধামের সারস্বত-আরাধনাকে সার্থক করার প্রয়োজনে পণ্ডিতকে এ আরণ্যক পরিবেশ ত্যাগ করে যেতে হবে। নবদ্বীপ পণ্ডিত-সভার মধ্যমণির আসনটি অলঙ্কৃত করে নদীয়ারাজকে ধন্য করতে হবে।

সহজ সরল বঙ্গভাষেই প্রত্যাখ্যান করলেন সেই আদর্শ শিক্ষক: তা হয় না, মহারাজ!

রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আপনি মহাপণ্ডিত! আমার একটি 'অনুপপত্তি' নিরাকরণ করে দিন তাহলে?

—বলুন, মহারাজ?

—উপনিষদ্ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ মহামুনি যাজ্ঞবল্কী কেমন করে হয়েছিলেন জনকরাজার বৃত্তিভোগী সভাপণ্ডিত?

স্মিতহাস্যে প্রশান্ত হয়ে উঠল মহাপণ্ডিতের মুখমণ্ডল। বললেন, এর সমাধান তো সহজ মহারাজ! তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদ, আমি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু। তিনি পেয়েছিলেন, আমি খুঁজছি। তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য, আমি সামান্য বুনো রামনাথ!

পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেন কৃষ্ণচন্দ্র। রাজমুকুটটি খুলে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করলেন মাথায়।

কিন্তু অত সহজে হার স্বীকার করতে পারলেন না রাজমহিষী। একই সময়ে কক্ষান্তরে তিনি বসেছিলেন ঐ সীমান্তনীর মুখোমুখি: কেন? কেন? কেন?

পণ্ডিত-গৃহিণী সহাস্যে বলেন, সে কথা তো আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, রানীমা। এ যে ব্যাখ্যার অতীত—বোধের জগতে! এটাই যে ঔর ধর্ম!

—ঔর ধর্ম। আপনার কী? আপনি কেন পড়ে থাকবেন এই জঙ্গলে?

পুনরায় একই কথা বললেন পণ্ডিত গৃহিণী: একই প্রত্যুত্তর, রানীমা! সেটাও ব্যাখ্যার অতীত, বোধের জগতে। আমি যে ঔর সহধর্মিণী!

রানী-মার শেষ সংযম ভেঙে পড়ল। অপমানিতা বোধ করলেন নিজেকে। স্বয়ং নদীয়াধিপতি সত্বীক উপযাচক হয়ে এসেছেন—ভিক্ষা চাইছেন—আর তা প্রত্যাখ্যান করছেন এই ভিক্ষুকদম্পতি! কীসের এই দার্ঢ্য! কীসের এত অহঙ্কার?

কঠিনস্বরে বলেন, আপনার অভিক্রটি। ইচ্ছা হয় এই জঙ্গলেই পড়ে থাকুন। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে একটা সত্যি কথা বলুন তো?

—'বুকে হাত দিয়ে' সত্যকথা। 'মিথ্যা' বলতে যাব কিসের ভয়ে?

রানী-মা সে-কথায় কান দিলেন না। বললেন, স্বামীর ইচ্ছায় এই জঙ্গলে জীবন-যৌবন কাটাতে চান। কিন্তু আপনার কি কখনো সাধ হয় না, এই আমার মতো অলঙ্কারভূষিতা হতে?

ব্রাহ্মণী এখনো সহাস্যবদনা। বলেন, অলঙ্কার! মহারানী! এ অরণ্যে আমার অঙ্গে আমার স্বামী যে-অলঙ্কার পরিয়ে দিয়েছেন তা যে সারা নবদ্বীপের আর কোনও ভাগ্যবতীর অঙ্গে নেই। আমি আপনাদের ঈর্ষা করতে যাব কেন?

রানী-মা সবিস্ময়ে বলেন, অলঙ্কার! আপনার অঙ্গে? পণ্ডিতমশায়ের দেওয়া উপহার?

সন্ধানীদৃষ্টিতে ঐ শাখা-সর্বস্ব বধূটির সর্বঙ্গ দেখে নিলেন। রাজবাটিতে নানান ধনাত্ম পরিবারের কুলললনাদের নিত্য শুভাগমন ঘটে। কে কোন কারুশিল্পময় স্বর্ণভূষণ পরিধান করে

এসেছেন তা চকিত দৃষ্টিতে দেখে নেওয়া একটা বিশেষ চারুকলা। অলঙ্কারগর্বিতা যাতে বুঝতে না পারে অথচ ভবিষ্যতে স্বর্ণকারকে তা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। রাজমহিষী সে চারুকলায় পারদর্শিনী। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না—হস্তে, কণ্ঠে, কর্ণে একরতি সোনাও নেই। মায়, অঙ্গুরীয় পর্যন্ত নাই অনামিকায়। বরং দেখলেন—লালপাড় ধনেখালি শাড়ির অঞ্চলপ্রান্তে সীবনচিহ্ন।

ব্রাহ্মণী বলেন, বৃথাই তল্লাস করছেন মহারানী। আপনার নজরে পড়বে না।

রাজমহিষী প্রশ্নধান করেন—‘অলঙ্কার’ শব্দটা ‘আলঙ্কারিক’ অর্থে ব্যবহার করেছেন পণ্ডিতজায়া—অর্থাৎ স্বামীর সোহাগের সোহাগায় গড়া ঠাঁর দাট্টা-অলঙ্কার!

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, লোকে যা চোখে দেখে না, তাকে আপনি ‘অলঙ্কার’ বলেন?

—লোকে দেখে, আপনিই শুধু দেখতে পাচ্ছেন না রানী-মা!

—বটে! আমার দৃষ্টিহীনতার হেতু?

—‘অলঙ্কারে’ অন্ধ হলে ‘অলঙ্কার’ যে দেখা যায় না, মহারানী! এই দেখুন!

অনশনক্ৰিষ্টা অরণ্যচারিণী তাঁর শীর্ণ হাতখানি তুলে দেখান: এই শাঁখা! এটি যতক্ষণ এই সৌভাগ্যবতীর হাতে আছে ততক্ষণই নবদ্বীপের গৌরব! ততক্ষণই সমগ্র আর্ষাবর্ত স্বীকার করবে—কাশী নয়, মিথিলা নয়, এই আরণ্যক পর্ণকূটরেই বর্তমানে মা সরস্বতীর অধিষ্ঠান!

রানী-মার মাথাটা নিচু হয়ে গেল। নিদারুণ সত্য-কথা! সমগ্র বঙ্গভূমির কোন রাজমহিষী, কোন নবাবের বেগম ও-কথা বলতে পারে না। স্বামীর নিজে হাতে পরিণয়ে দেওয়া প্রণয়োপহার দেখিয়ে অমন একটা কথা বলতে।

তিনি নত হলেন চীরধারিণীর চরণপ্রান্তে।

দুশ বছর কেটে গেছে তারপর।

সারা ভারতের শিক্ষাবতীর আদর্শ—আজও—বুনো রামনাথ!



পরদিন সকালে উনি বললেন, আজ ভাবছি শান্তিপুর ঘুরে আসব। অদ্বৈতাচার্যের ভিটে... ভারতচন্দ্র বলেন, না, রূপেন্দ্র। আজ তোমাকে উল্টো যেতে হবে।

—উল্টো! কোন গ্রামের নাম?

—গ্রাম নয়, শহর। অতি প্রাচীন জনপদ। সেখানে একটি রুগী দেখতে যেতে হবে তোমাকে। আমিও যাব। ভোলাকে বলেছি আর একটি অশ্ব ভাড়া করে আনতে।

রূপেন্দ্র জানতে চান—রুগীটি কে। ভারতচন্দ্র তাকে কতদিন চেনেন।

ভারত বলেন, সে আমার অপরিচিত। কিন্তু তোমার চেনা। দেখেছ, বছর সাত-আট আগে। তার নাম—গয়্যারাম। একটি পা খোঁড়া, আনুষঙ্গিক আরও কী কী ব্যাধি আছে।

—আমি তাকে চিনি? গয়্যারাম? সাত-আট বছর আগে দেখেছি?

প্রসঙ্গটি বেদনাবহ। কৌতুকের নয়। তাই রহস্যজাল ছিন্ন করে দেন এবার।

রুগী বস্তুত গঙ্গাচরণ, রূপেন্দ্রের ভগ্নিপতি, কাত্যায়নীর স্বামী।

রূপেন্দ্রকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ভারত নিজে গোপনে সন্ধান করেছিলেন। মহারাজের এক বিশ্বস্ত গুপ্তচরকে দিয়ে। প্রোষিতভর্তৃকা কাত্যায়নীর মর্মবেদনায় কবি স্থির থাকতে পারেননি। তাঁর কাছে কাত্যায়নী আর রাধারণী বারে বারে একান্ত হয়ে উঠেছিল। দুজনেই প্রত্যাশা করে দিন গুণছে শবরীর প্রতীক্ষায়। স্থির করেছিলেন, তেমন সংবাদ পেলে সে-কথা রূপেন্দ্রকে আদৌ জানাবেন না। সেই অদেখা-অচেনা মেয়েটিকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে দেবেন না। কিন্তু সংবাদ নিয়ে জানতে পারলেন—নেদেরপাড়া পল্লীর বিষ্ণুচরণ চাটুজের পুত্র গঙ্গাচরণ জীবিত। বছর পাঁচ-ছয় পূর্বে সে দেশত্যাগ করে। একজন ধনবান ব্যবসায়ীর সঙ্গে। আদি সপ্তগ্রামের নৈকম্য কুলীন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না। একটিই কন্যা। তিনি গঙ্গাচরণকে প্রস্তাব দেন যে, জামাতা বাবাজীবন যদি ভ্রাম্যমাণ জীবন ত্যাগ করে ঘরবসত করতে স্বীকৃত হয়, তবে তাকেই দিয়ে যাবেন সম্পত্তি। তাঁর কন্যাটিও ডাগর। গঙ্গাচরণ এককথায় রাজী হয়ে যায়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে পার্বণী আদায় করা আর সহ্য হচ্ছিল না তার। প্রণিধান করেছিল—এ ‘নাঙ্গে সুখমস্তি’ শ্লোকটা কোন কাজের কথা নয়। একটি স্থায়ী ঘর, একটি সালঙ্কারা যৌবনবতী নববধু, তার কোলে একটা বক্বকে বাচ্চা! সকাল-সন্ধ্যা নিরুপার্জিত ভোজ্যদ্রব্য এবং অধুরী-তামাক। সে তো স্বর্গসুখ!

শ্বশুরমশাই বলেছিলেন, বলুদিনের সখ একবার তীর্থে যাব—কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন। একা সাহস পোতাম না এতদিন। ছেলে নেই। ভাইপোরা আছে, কিন্তু এক একটা পাষণ্ড! ভূমি যদি ভরসা দাও তাহলে সপরিবারে তীর্থ করে আসি, বিয়েটা মিটে গেলেই। নিয়ে যাবে বাবা, আমাদের?

পরের পয়সায় তীর্থেই বা আপত্তি কী? রাজী হয়ে গেল। শ্বশুরমশাই বলেন, তাহলে দুটি কাজ করতে হবে, বাবাজীবন। তোমাকে দাড়ি রাখতে হবে, আর নামটা পাঁলটাতে হবে।

—আপনি বললে, নিশ্চয় করব। কিন্তু হেতুটা?

—পথে ঘাটে তোমার আর কোন শালা-শ্বশুর-সম্বন্ধী যদি চিনতে পেরে তোমাকে ছিনিয়ে নেয়? তাহলে বিদেশ বিভুঁইয়ে আমি অথৈ জলে পড়ে যাব।

শ্বশুর-শাশুড়ী আর সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে গঙ্গাচরণ—না, এখন সে গয়ারাম—দীর্ঘ দিন উত্তরখণ্ডের বহু তীর্থ পরিক্রমা করেছে। মাস-কতক আগে কেন্দুবিষ্মের কাছাকাছি ফেরার পথে ঘটে গেল বিপর্যয়। পড়ে গেল বর্গীর আক্রমণের সম্মুখে। ওর শ্বশুর-শাশুড়ী হত হলেন। ধর্মিতা স্ত্রী আত্মঘাতী হল। গঙ্গাচরণের একখানা চরণের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দিয়ে গেল বর্গীরা। যা ছিল সঙ্গে, অর্থ ও অলঙ্কার, লুপ্তিত হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে আদি সপ্তগ্রামে পৌঁছায়। ওর খুড়তুতো শ্যালকেরা ইতিমধ্যেই সম্পত্তির দখল নিয়েছে। তারা বুঝিয়ে দিল—একখানা গেছে, অবিলম্বে সপ্তগ্রামের সম্পত্তির আশা ত্যাগ না করলে দ্বিতীয় ঠ্যাঙখানাও যাবে। বর্গীরা যা বলছে, আগুনে পুড়িয়েছে, তার ভিতর খোঁয়া গেছে ওর সেই লাল খেরো খাতাখানা। এ অঞ্চলে তার অনেক-অনেক শ্বশুরবাড়ি; কিন্তু ঠিকানা মনে নেই—শ্বশুরের নাম, পত্নীর নাম, কিছুই যদি বলতে না পারে তাহলে বাড়ি খুঁজে পেলেও কেউ কি খোঁড়া-কুমারীকে বিশ্বাস করে আশ্রয় দেবে?

পাঁচ-সাত বছর দেশত্যাগী থাকায় নেদেরপাড়ার পৈত্রিক ভিটেখানার দখলও গেছে। খড়ো ঘরখানা দু-একটা বর্ষার কোপ সামলেছিল। তারপর মুখ খুবড়ে পড়ে। সরিকেরা ভাঙা কোঠার আবর্জনা সাফ করে জমিটা দখল নিয়ে যে-যার বসতবাড়ি সম্প্রসারিত করে নিয়েছে।

ঘটনাচক্রে তাকে চিনতে পেরেছিলেন উলোর রসিকলাল রায়ের জননী 'আনন্দময়ীতলায় পূজা দিয়ে ফিরে যাবার মুখে। 'আনন্দময়ী কালীমূর্তি। একটি খড়ো চালাই মায়ের মন্দির'। রাজার দেবোত্তর। জনশ্রুতি স্বয়ং আগমবাগীশের প্রতিষ্ঠা করা। তারই প্রবেশদ্বারে ভিক্ষা করতে বসেছে একজন খঞ্জ ভিক্ষুক। একমাথা রুক্ষ চুল, একমুখ দাড়ি। তার আঁচলে একটা কপর্দক ফেলে দিতে গিয়ে কেমন যেন চমকে উঠলেন বৃদ্ধা। বলেন, তোমার নামটি কী, বাবা?

—নাম? আঞ্জো গয়ারাম।

—গয়ারাম? ও! গঙ্গাচরণ তোমার কেউ হয়? মুখের আদলটা...

—কোন গঙ্গাচরণ, মা? 'বিষ্টচরণের সেই কুলাঙ্গার কুপুত্রটা? নেদেরপাড়ার বিবাহ-বিশারদ? তাকে চিনতেন বুঝি? সে মরেছে!

—মারা গেছে। আহা ষাট-ষাট! কতদিন?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল ভিক্ষুকের। বললে, কেন বলুন তো?

—সে আমার জামাই ছিল।

একটা পায়ের উপরেই ভর দিয়ে সোজা হয়ে ওঠে গঙ্গাচরণ। চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। বৃদ্ধাকে সে চিনতে পারেনি। কেমন করে পারবে? বৃদ্ধার একটিই জামাই। দাড়ি-গোফের জঙ্গল ভেদ করে তাই দেখতে পেয়েছেন ওর মুখের আদলটা। কিন্তু গঙ্গাচরণের যে তিনকুড়ি শাশুড়ী! কেমন করে চিনবে?

—কী হয়েছিল তার? কতদিন আগে?

গঙ্গা সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, আপনার মেয়ে? সে আসেনি?

—না বাবা। সে নেই। আজ বছর দুই!

আবার বসে পড়ে। দপ্ করে নিবে যায় আশার প্রদীপটা। মেয়েটির কথা ওর মনে নেই। নামটা জানে না। দুবছর আগেও সে ওর আয়ুষ্কামনা করে সীমস্তে সিদুর দিত। ঈস! কী বে-আক্কেলে মেয়েটা! পট করে মরে বসে আছি?

—কই বললে না, বাবা?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল গঙ্গাচরণ।

বৃদ্ধা ওর পরিচয় জানতে, পেরে ভৃত্যকে দিয়ে একখানা এক-ঘোড়ার পাক্ষি-গাড়ি আনিয়ে নিলেন। কন্যাটি দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে, তাই বলে উলোর রায়বাড়ির জামাই 'আনন্দময়ীতলায় বসে ভিক্ষা করবে! অসম্ভব!

রসিকলাল ধনী ব্যক্তি। উলোর একজন গণ্যমান্য ভূস্বামী। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মায়ের উপর খাপ্পা হয়ে ওঠে। এ কী উটকো আপদ! আনন্দময়ীতলায় বসে 'গয়ারাম' ভিক্ষা করছে তাতে মায়ের কী? সে তো আর 'গঙ্গাচরণ' নয়!

^১ যে সময়ের কথা, তখন আনন্দময়ী মায়ের মূর্তিটি ছিল খড়ো-চালায়। কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপতির তত্ত্বাবধায় মহারাজ গিরীশচন্দ্র 1804 খ্রীষ্টাব্দে চারচালা পাকা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সে অনেক পরের যুগে।

গঙ্গাচরণের দিকে একটি নগদ সিল্কা টাকা বাড়িয়ে ধরে বলে, বুঝতেই পারছ, আমার ভগিনীটির পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে। তোমাকে আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। যেখানে বসে ভিক্ষা করছিলে সেখানেই ফিরে যাও। নাও ধর।

গঙ্গাচরণ হাতদুটি জোড় করে বললে, আর যে তা পারি না, বড়দা!

—বড়দা! একটি চড়ে তোমার নাম ভুলিয়ে দেব! হারামজাদা! আমি রায়মশাই! যা দূর হ!

কোণঠাসা হতে হতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন নিরীহ অবোলা জীবও রুখে দাঁড়ায়। প্রত্যাঘাত করতে চায়। গঙ্গাচরণও বোধকরি সহ্যের সেই সীমান্তে পৌঁছেছিল। সারাজীবন সে জামাই-আদরে অভ্যস্ত—আজ মাস-কয়েক সে নিঃস্ব, ভিক্ষাজীবী, পঙ্গু। তাও মেনে নিয়েছিল। তারপর হঠাৎ ঐ বৃদ্ধার সম্মুখে সহানুভূতিতে সে বোধহয় আশার একটা ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পেয়ে অন্য জাতের মানুষ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। রসিকলালের কথাটা তাই তার সহ্য হল না। বললে, তাড়িয়ে দিলে আর কী করব? ফিরেই যাব—তবে আনন্দময়ীতলায় যে ফিরে গিয়ে বসবে সে নাম-ভুলে-যাওয়া গয়ারাম নয়! সাবেক গঙ্গাচরণ! রায়বাড়ির জামাই!

আর সহ্য হল না রসিকলালের। ছুটে এসে ঠাশ্ করে একটা প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিল। একটা পায়ে দেহভার রক্ষা করতে হয়। গঙ্গাচরণ ভারসাম্য হারালো। ছমড়ি খেয়ে উল্টে পড়ল মার্বেলের মেঝেতে। রসিকলাল গর্জে ওঠে, হারামজাদা! তুই যা ভাবছিস তা হবে না। তার আগে তোকে কেটে খড়ের জলে ভাসিয়ে দেব।

পাচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে গালে। চোখ দুটো ভরে এসেছে জলে। ভূশ্যা থেকে উঠে বসে। যুক্তকরে এবার যে কথাটা বললে তাতে কোন শ্লেষ নেই, কোন প্রত্যাঘাত নেই—তা ওর অন্তর-নিঃস্রাব আর্তি: তাই দিন, বড়দা! বিশ্বাস করুন—আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে দেখছি। পারিনি। সাহসে কুলারনি! অন্তত সেটুকু উদ্ধারই করুন! হাজার হোক, এক-কালে তো আপনার বোনাই ছিলাম!

রসিকলাল থমকে গেল। ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে ঐ পাকামাথার বৈষয়িক মানুষটাও কোন জবাব খুঁজে পেল না।

মা বললেন, না! ও থাকবে। এ বাড়িতেই। ঐ আত্মবলের একটেরে। গয়ারাম হিসাবেই। ওকে ভিক্ষা করতে দেব না আমি! কিছুই তো চায় না বেচারি। মাথার উপর ছাদ, আর দু বেলা দু-মুঠো...

—না! তা হয় না!—বৈষয়িক বুদ্ধি ফিরে এসেছে এতক্ষণে। বললে, তুমি বুঝতে পারছ না মা, তাতে নানান রকম বিপদ! কথাটা জানাজানি হয়ে যাবেই! হারামজাদাকে তাড়াতে হবে!

মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, ছোটখুঁচি নেই বলেই এতবড় কথাটা তুই বলতে পারলি, বড়খোকা! কিন্তু আমার কথার নড়চড় হয় না, তা তো তুই জানিস! আমি ওকে আশ্রয় দেব, দেখি, তুই কী করতে পারিস!

সেই থেকে গঙ্গাচরণ—না, গঙ্গাচরণ নয়, গয়ারাম, বাড়ির আত্মবলের এক কোণায় পড়ে আছে। প্রতিজ্ঞাতি রক্ষা করেছে সে। মায়ের মাথাটা হেঁট হতে দেয়নি। পরিচয় গোপন আছে তার—অন্তত তার নিজের তাই বিশ্বাস।

বাস্তবে তা নেই। অনেকেই জানে। গোপন রাখে। রসিকলাল ভুলোর এক দোঁদগুপ্রতাপ

ভূস্বামী। তেজরতি কারবার তার। হাতে মাথা কাটতে পারে। মুখরোচক কিসসাটা তাই কেউ আলোচনা করে না। সুখে থাকতে কে আর ভূতের কিল খেতে চায়? খবরটা বাইরের লোক না জানলে ভারতচন্দ্র সে খবরটা সংগ্রহ করতে পারতেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঐ ধুরন্ধর গুপ্তচর দুদিনেই ঠুকে আসল খবরটা জানাতে পেরেছিল: নেদেরপাড়ার গঙ্গাচরণ এখন উলোয় থাকে—রায়মশায়ের আস্তাবলে। এখন তার নাম: গয়ারাম।



উলা একটি প্রাচীন জনপদ। গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণে, কয়েক ক্রোশ দূরত্বে। পাকা নবাবী সড়ক দুই জনপদকে যুক্ত করেছে। সড়কের শেষ সেখানেই নয়। ঐ পথেরেখা ধরে চলতে থাক দক্ষিণবাগে—চূর্ণী পার হয়ে—পাবে একের পর এক প্রাচীন জনপদ। রণার ঘাট^১, চৌবেড়িয়া, কাম্বনপল্লী^২, কুমারহট্ট^৩, ভট্টপল্লী^৪, মূলাঘোড়^৫। কিন্তু সেসব কথা এখন নয়। আবার ঐ একই নবাবী সড়ক ধরে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর ছাড়িয়ে যদি উত্তরমুখে চলতে থাক, পাবে প্রথমেই জলাঙ্গীর খেয়াঘাট। পার হলে। পাবে বেলডাঙ্গা, দেবগ্রাম তারপর গঙ্গাতীরের লাখবাগ।

‘লাখবাগ’কে তোমরা চেন না। নামটা অজানা। কেমন করে জানবে গো? ‘লাখে এক’ও যে আজ নেই। এই পরগণার অনেকটা অংশ ছিল নাটোরের স্বনামধন্য রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত। রানীমার নির্দেশে এখানে গুনে গুনে এক লক্ষ আমের কলম পোতা হয়। খানদানি সব গাছ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হাজার হাজার গো-গাড়ি আর নৌকায় সেই সব হিমসাগর, ল্যাংড়া, বেগমখাশ, বাদশা-পসন্দ, কোহিতুর আমের পাহাড় চালান যেত—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপে, মুখসুদাবাদ, ওদিকে রাজসাহী, নাটোর। শেষ আমগাছটি কালবৈশাখীর ঝড়ে ভূতলশায়ী হয় ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ শেষ রসালবৃক্ষের মৃতদেহের পাশেই ইংরাজ-সরকার বাহাদুর খাড়া করেছিল একটা গ্র্যানাইট পাথরের ছোট ফলক। তাদের বঙ্গবিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন। তার ষোলো বছর পরে লর্ড কার্জন সেটা অপসারণ করে বসিয়েছিল একটা বড়মাপের মজবুত স্মৃতিচিহ্ন। ‘লাখবাগে’ গেলে সেটা আজও দেখতে পাবে। তবে তোমরা লাখবাগের খোঁজ কর না। ওর নাম পরের জমানায় যা হয়েছিল সেই নামেই আজ ওর পরিচয়: পলাশী।

সেটা পার হয়ে উত্তরমুখে গেলে পৌছাবে মুর্শিদাবাদে।

উলার কথায় ফিরে আসি।

চূর্ণীনদীর পশ্চিমপারের এই গ্রামটির নাম কেন এমন হল তা নিয়ে নানা মূনির নানা মত। কেউ বলেন, জ্ঞানী অর্থে ইরানীয় শব্দ ‘আউল’—যা থেকে বাঙলায় প্রচলিত শব্দ ‘আউল-বাউল’—তা থেকেই উলা নামটা এসেছে। আবার কেউ বলেন, তা নয়, গ্রাম পত্তনের আগে এখানে চূর্ণী নদীর কিনার ঘেঁষে ছিল দিগন্তবিস্তৃত উলুবনের জঙ্গল। ‘উল’ ঘাস চেন তো? উলুখড় দিয়ে বাঙলা-চালা ছাওয়া হয়। খানখড়ের চেয়ে তা অনেক অনেক বেশি

জনপদগুলির বর্তমান নাম

^১রণার ঘাট = রাণাঘাট, ^২কাম্বনপল্লী = কাঁচড়াপাড়া, ^৩কুমারহট্ট = হালিশহর, ^৪ভট্টপল্লী = ভাটপাড়া = কাঁকিনাড়া, ^৫মূলাঘোড় = শ্যামনগর।

টেকসই। ঐ জঙ্গলে বাস করত এক আদিম জাতি। সে অনেক অনেক কাল আগে। মানে, ধর্মশোক তখনো চণ্ডাশোক। অর্থাৎ সৎস্রুটি অংশোক তখনো কলিঙ্গ-বিজয়ে আসেননি। আর্য সভ্যতা এসে পৌছায়নি বঙ্গভূমে। নৃত্যবিকেরা বলেন, সেই বিস্মৃত অতীতে গোটা বঙ্গভূমে বাস করত অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর কিছু কৃষিজীবী আদিম জাতি। তাদেরই একটি শাখা বাস করত এই চুণীতীরের ঘন জঙ্গলে। তাদের এক লৌকিক দেবতা আজও টিকে আছেন ওখানে : উলাইচণ্ডী দেবী।

দেবীসেবার বংশানুক্রমিক অগ্রাধিকার হাড়ী জাতীয় এক পূজারী। এখন বোধহয় হয় না, কিন্তু আমাদের কাহিনীর কালে বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে 'মায়ের মন্দিরে শূকর-বলি হত।

চণ্ডী প্রাগার্য দেবী। মা মনসার মতো। পরবর্তী সহস্রকে আর্য-অনার্য-সংমিশ্রণে গৌড়মণ্ডলে জন্ম নিল একটি মিশ্র জাতি—বাঙালী; তখন ঐ দুই দেবীকে মার্জনা করে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁদের তেত্রিশ কোটির মধ্যে সামিল করে নিলেন। ঐ অনার্য ব্যাধের দেবী হলেন শিবের অর্ধাঙ্গিনী। বাঙালীর কবি-মন রচনা করতে শুরু করল—মনসামঙ্গল আর চণ্ডীমঙ্গল।

এক সময়ে ভাগীরথী বহিত এই উলা-গ্রামের পাশ দিয়েই। উলা ছিল গঙ্গাতীরবর্তী গ্রাম। এখন যেন বিশ্বাস হতে চায় না—গঙ্গা কত দূরে সরে গেছে! গঙ্গার সেই আদিম মরা-খাত উলার নগর সীমান্তে আজও দেখা যায়। উলা যে গঙ্গাতীরবর্তী জনপদ তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ রয়ে গেছে বাঙলা সাহিত্যে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে —

শ্রীমন্ত সওদাগর চলেছেন সিংহল-দ্বীপে—তাঁর সপ্তডিঙা-মধুকর ভাসিয়ে। ভাগীরথী বেয়ে উপনীত হতে হবে কপিলমুনির আশ্রমে—সেই 'দক্ষিণরায়ে' রাজ্যে, গঙ্গাসাগরে। তারপর সমুদ্রযাত্রা। নদীপথেই একদিন উঠল দারুণ ঝড়। শ্রীমন্ত নোঙর করলেন। শুনলেন, গ্রামটির নাম উলা। এমন নাম কেন গো? —জানতে চাইলেন শ্রীমন্ত সওদাগর। সর্দার-মাঝি বললে, সে কি ছজুর? আপনি জানেন না? এখানেই যে আছে মা উলাইচণ্ডীর মন্দির। তাঁর বরে কী না হয়? 'অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন'। মোটকথা: 'যে যে-বর চায়, সে সে-বর পায়'।

শ্রীমন্ত বললেন, তাহলে আমিই বা তাঁর পূজা না করি কেন? বর চাইব—যাতে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করে ফিরে আসতে পারি।

তাই হল। শ্রীমন্ত সওদাগর সাড়ম্বরে উলাইচণ্ডীর পূজা করলেন।

কেউ কেউ বলেন, যেহেতু শ্রীমন্ত সওদাগর এই ঘাটে নৌকা থেকে 'উলা' করেছিলেন, তাই গ্রামটির নাম 'উলা'। 'উলা' ক্রিয়াপদের অর্থ জান তো? —অবতরণ করা, নামা।

আমার বাপু এ ব্যাখ্যায় মন মানেনি। এ যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি ঝোতা! শ্রীমন্ত নৌকা থেকে উলা করার আগেই তো শুনলেন—গাঁয়ের নাম: 'উলা', যেহেতু সেখানে আছে 'মা উলাইচণ্ডীর দেউল'।

মোটকথা, শ্রীমন্ত সওদাগরের আমলে উলা গ্রামখানি ছিল গঙ্গার কিনারে। এখন এ জনপদের নাম: বীরনগর।

উলাকে এ খেতাবটি দিয়েছিলেন ইংরাজ সরকার-বাহাদুরের তরফে কলিকাতার এক ন্যায়াধীশ—কোট অব সার্কিটের প্রধান বিচারপতি। কারণ ছিল। ষোলোদশ শতাব্দীর শেষপাদ। সে সময় উলার কাছাকাছি—ঐ গঙ্গার মরাখাতের জঙ্গলে বাস করত একদল দুর্ধর্ষ

ডাকাত, যা থেকে ঐ বর্তমান নাম ‘ডাকাতের খাল’। তাদের উপদ্রবে সরকার-বাহাদুরের কোতোয়াল হিমসিম। শেষেমেঘ উলার যুবশক্তিসঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধরে ফেলল ডাকাত দলকে। কোতোয়াল পাঠিয়ে দিল সেই ডাকাতদের শহুর কলকাতায়। জজবাহাদুর তাদের দিলেন শাস্তি আর উলাবাসীকে ঐ খেতাব! উলা হয়ে গেল: বীরনগর!

আমাদের কাহিনীর কালেও উলার যথেষ্ট খ্যাতি। শিল্প ও বিদ্যাচর্চায়। অনেকগুলি টোল পরিচালিত হয়—অধিকাংশই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে। এখান থেকেই বিভিন্ন যুগে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন—চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সদাশিব তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন, শিবশিব তর্করত্ন প্রভৃতি। এই জনপদের পণ্ডিত সারণ সিদ্ধান্ত তাঁর দুই আত্মজাকে সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শিনী করে তোলেন। তবে সে ঘটনা যে ঠিক কোন আমলের তার হক-হন্দিশ জোগাড় করতে পারিনি। বীরনগরবাসী কোন পণ্ডিত কিছু হন্দিস দিতে পারেন?

দুই অশ্বারোহী বন্ধু শহর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন। সড়কের দুধারে পাকা বাড়ি। পাতলা ইটের। মোটা দেওয়াল। কাদার গাঁথনি। স্থানে স্থানে দ্বিতল বাড়ি। মাঝে-মাঝে প্রতিষ্ঠিত জলাশয় এবং মন্দির। পথে পদাতিকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। দু-একটি গো-গাড়ি বা অশ্বযান। ঘরানা-ঘরের মহিলারা চলেছেন পালকি চেপে। পদাতিক পুরুষদের অধোবাস ধুতি, হাটু পর্যন্ত। উর্ধ্বাঙ্গে উত্তরীয়। সেলাই করা বস্ত্র—পিরান বা কুর্তার চল কলকাতা বা মুর্শিদাবাদে হয়েছে। বর্ধমান বা কৃষ্ণনগরেও উচ্চকোটি মহলে তা সুপরিচিত; কিন্তু এখানে তা বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। দু-একটি সীমন্তিনীকে দ্বিতলের বারান্দায় বা প্রাঙ্গণের ভিতরে চকিত দর্শনে দেখা যায়। তারাও একবস্ত্র। গায়ে কামিজ নাই। তবে চর্যাপদের যুগে বক্ষয়ুগল অনাবৃত রাখায় যে বাধা ছিল না, এখন সে অবস্থা নয়। শাড়ির দৈর্ঘ্য সচরাচর কম, বহরেও ছোট। তার পরিপূরক হিসাবে যৌবনবতীরা ব্যবহার করেন একটি পৃথক ওড়না। তাতেই উর্ধ্বাঙ্গ আবরিত, তাতেই অবগুষ্ঠনের আয়োজন। কোন কোন সীমন্তিনী সম্ভানবতী। তাদের ক্রোড়ে শিশু। অধিকাংশই উলঙ্গ, মাজায় ঘুলি, মাথায় ‘কাকপক্ষগুচ্ছ’—অর্থাৎ চূড়া-করে-বাঁধা চুলের তিনটি শিখর। রমণীকুলের অলঙ্কারের মধ্যে সবার আগে যেটা নজর পড়ে তা শ্রৌতাদের ক্ষেত্রে নথ এবং যুবতী ও কিশোরীদের নোলক।

ওঁদের দুজনকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রসিকলালের কর্মচারী ভিতরে এত্তেলা দিতে গেল। যাবার আগে জানতে চায়, হুজুরকে কী বলব? কে দেখা করতে এসেছেন?

ভারতচন্দ্র বললেন, উদ্দেশ্যটা গোপন এবং বৈষয়িক।

ওঁরা অশ্বারোহণে এসেছেন। বেশবাস সম্ভ্রান্ত। লোকটা দ্বিতীয় প্রশ্ন করেনি।

একটু পরে দ্বিতল থেকে নোম এলেন গৃহস্বামী। কৌচানো ফরাসডাঙার ধুতি। উর্ধ্বাঙ্গে রেশমী কামিজ, তদুপরি বেনিয়ান। জবরদস্ত কোমরবন্ধ। দক্ষিণ তর্জনীতে একটি পোষা বুলবুল। দু হাতের নথ অতি দীর্ঘ এবং অলুপ্তক রাগরঞ্জিত। এটি ঋষি বাৎস্যায়ন নির্দেশ: “নথক্ষত প্রদানেচ্ছু গৌড়ীয় নাগর সচরাচর হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী দীর্ঘনখরলাঞ্জিত হইলেন।” চোখ দুটি রক্তবর্ণ। বুঝতে অসুবিধা হয় না এই প্রত্যুবেই কিছু গৌড়ীয় মাধবী সেবন করেছেন। যুক্তকরে উভয়কে নমস্কার করে বললেন, অহোবত! কী সৌভাগ্য! আসুন, বসুন।

ওঁরা বসেই ছিলেন। প্রতিনমস্কার করলেন শুধু।

প্রথমেই ওঁদের পরিচয় লাভের বাসনাটা জাগাই স্বাভাবিক। মদ্যপ সে পাথে গেলেন না। পর্যায়ক্রমে দুজনকে দেখে নিয়ে রূপেন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন, মহাশয়ের জেব-এ সিদকাঠি নাই, আশা করি?

—সিদকাঠি!—রূপেন্দ্র আঁতকে ওঠেন।

—আপনার খানদানি বদনখানিতে যে ‘মদন মুরছা যায়!’ তা যাগ্‌ গে, মরুগ্যো! মদন-শালা মুচ্ছে গেল তো ভারি বয়েই গেল আমার! যত ইচ্ছা সিদ দিন। আমার ঘরে কোন ‘বিদ্যা’ নেই! তিনকড়ি-পণ্ডিতের বেতের চোটে বাল্যেই ‘বিদ্যা’কে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছি! বলুন, কী ভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি?

ভারতচন্দ্র বলেন, আমার এই বন্ধুটি একজন কবিরাজ। উনি আপনার আস্তাবলে গিয়ে গয়ারামকে একবার দেখতে চান। আপনি অনুমতি দিলে...

রসিক একটা হেঁচকি সামলালেন। বলেন, এ তো আজব কথা শোনালেন মহাশয়! না ডাকতেই উনি গয়ারামের চিকিৎসা করতে এসেছেন! আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী? কোথেকে আসছেন?

রূপেন্দ্র বলেন, আসছি সোণাই গাঁ থেকে। বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত।

—সেই অদূরের গাঁ থেকে গয়াতীর্থে আসছেন! মতলবটা কী?

—মতলব কিছু নেই। গয়ারামের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করলে আপনার আপত্তি আছে?

—আলবাৎ আছে! তার আগে বলতে হবে, আপনাদের মতলবটা কী?

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন, রসিকলালের আপত্তির মূলটা কোথায়। গয়ারামের প্রসঙ্গ ওঠামাত্র উনি বদলে গেছেন। তাই প্রসঙ্গটার মোড় ঘোরান আপাতত। আর একটু ঘনিষ্ঠ না হয়ে সে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা ঠিক হবে না। বলেন, আপনার যখন আপত্তি আছে, তখন গয়ারামের প্রসঙ্গ থাক, কিন্তু সিধকাঠির কথা বললেন কেন তখন?

আবার প্রফুল্ল দেখায় মদ্যপকে। ঘনিয়ে এসে বলেন, আপনি ‘বিদ্যাসুন্দর’ পড়েননি?

ভারতচন্দ্র উদ্‌গীব হয়ে ওঠেন। রূপেন্দ্র বলেন, না। কার লেখা?

—মহারাজ কেঁটচন্দ্রের আমদানি-করা নয়া-চিড়িয়া! লোকটাকে এখনো দেখিনি। কিন্তু গোয়াড়ি-গঞ্জে এখন ঘরে-ঘরে তার নাম!

রূপেন্দ্র চকিতে তাঁর পার্শ্ববর্তী বয়স্যের দিকে দৃকপাত করেন। দেখেন, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কবির মুখখানি। বলেন, ঐ কাব্যগ্রন্থ লিখে এত খ্যাতি? আপনি পড়েছেন?

—সবটা পড়িনি। কিছু কিছু কেছা পড়েছি। আমার এক বয়স্য আছে। বামধবজ দত্ত। সে অনুলিপি করিয়েছে। অংশ-বিশেষ। পড়ে শুনিয়েছে! দারুণ লেখা, মহাশয়। মহারাজ সে-শালার উপাধি দিয়েছেন: ‘রায়-গুণাকর’; আমি হলে উপাধি দিতাম: ‘খেউড-বিশারদ’।

ভারতচন্দ্র অধোবদন হলেন। যেন রসিকলাল একটা সূচ বিন্দু করে দিয়েছেন ওঁর পঞ্জর। রসিক বলেই চলেন, ঢের-ঢের কবি দেখেছি মহাশয়, এমন কাঁচা-খিস্তি পদ্যের আকারে জেথার হিম্মৎ কারও নেই! সাঁঝের বেলা আসবেন, বামধবজের আড্ডায়। শুনিয়ে দেব। ওঁর পুথির শত শত অনুলিপি হবে, বুয়েছেন, ঘরে ঘরে সবাই লুকিয়ে পড়বে।

রূপেন্দ্র নিরতিশয় লজ্জিত হন, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করায়।

ভারত মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টিতে বসে আছেন। তাঁর কর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠেছে।

রসিকলাল পুনরায় বলেন, তার ফলাফল কী হবে আন্দাজ করতে পারছেন? কুমোরভাষাকে রঙিবস্তিতে গিয়ে আর প্রতিমার মাটি সংগ্রহ করতে হবে না। ঐ পুথির সম্যক প্রচার হলে কুমোরভাষা যে-কোন গেরস্তবাড়ি থেকেই তুলে নিতে পারবে এক খাব্লা মাটি। শুরু করতে পারবে মূর্তি গড়ার কাজ। গেরস্তবাড়ি আর রঙিবাজার একাকার করে ছেড়েছে শালা।

ধীর পায়ে ভারতচন্দ্র কক্ষ ত্যাগ করেন। যেতে যেতে শুনে পান, রসিকলাল বলছেন, 'বিদ্যাসুন্দরের কিসসা অমৃতের কথা/খেউড়ানন্দ কবি ভনে শুনে তার রাধা॥'

রূপেন্দ্র প্রতিবর্তী-প্রেরণায় যেন প্রতিধ্বনি করেন, রাধা!

—খেউড়ানন্দ নিজেকে 'রাধানাথ' বলেছে; খোদায় মালুম সে মাগী ওর বউ, অথবা...

দু-হাতে দুই কান ঢেকে ছুটে ছুটে প্রাঙ্গণটা অতিক্রম করে রাজপথে চলে আসেন।

প্রভাতী সূর্যের আলো গাছের পাতার ভিতর দিয়ে টাকা-টাকা ছোপ ফেলেছে বনভূমিতে। ভারতচন্দ্রের কিস্তি মনে হল—নীরঞ্জ অঙ্ককার! এ কী হয়ে গেল! এ কী করলেন তিনি! কে ঐ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র? কী প্রয়োজন তাঁর অনুগ্রহের? আজও কি নতুন করে শুরু করা যায় না? ঐ বনো রামনাথের মতো? তিনি তো রাজানুগ্রহের প্রত্যাশা করেননি, প্রত্যাখ্যান করেছেন! আছে, ভারতচন্দ্রেরও আছে সেই হিম্মৎ! তিনিও পারেন ওল-সিদ্ধ আর তিস্তিডীপত্রের ব্যঞ্জনে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতে। রাধাও পারে। পারবে। তিনি যদি তাকে হাত ধরে নিয়ে যান কোনও অরণ্যপ্রান্তের পর্ণকুটীরে। রাধাও গরিব ঘরের মেয়ে—দাসদাসী, অলঙ্কারের প্রত্যাশী সে নয়! সে শুধু চেয়েছিল অরুন্ধতীর মতো মহাবশিষ্ঠের চরণপ্রান্তে একটুকু ঠাই! ভারতচন্দ্রও লাভ করবেন বরদা বাণীর আশীর্বাদ! রাধাও সেদিন তার শাখা-পরা হাতখানি তুলে দেখাতে পারবে নবদ্বীপ রাজমহিষীকে! বলবে, আমার হাতে যতদিন এই শাখা আছে...

চোখ দুটি জলে ভরে এল কবির।



রূপেন্দ্র শেষমেশ অনুমতি আদায় করতে পেরেছেন। যখন বুঝিয়ে বলতে পারলেন, উনি গয়ারামকে সোণাই গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। সেখানকার একজন ধনী গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করেছিল ঐ গয়ারাম, অর্থাৎ গঙ্গাচরণ। সেই ধনী ভূস্বামীই সন্ধান পেয়ে রূপেন্দ্রকে গোয়াড়ি-গঞ্জে পাঠিয়েছে খরচপত্র দিয়ে—জামাতা বাবাজীবনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

এক কথায় রাজী হয়ে গেল রসিকলাল। আপদ বিদায় হবে। নিজে থেকেই বলল, আপনি ও-শালাকে রাজী করান। আমি নিজে ওকে নৌকায় তুলে দিয়ে আসব। নিজের খরচে বিদায় করব। নাম-বাম ঠিকানা লিখে দিয়ে যান শুধু।

রূপেন্দ্র বাহিরে এসে ভারতচন্দ্রকে খুঁজে বার করলেন। কবি বৃত্তক্ষেপে সামলেছেন। অপ্রিয় প্রসঙ্গটা দুজনেই এড়িয়ে গেলেন—অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরের মূল্যায়ন।

বাঁচনগর

গঙ্গাচরণ চিনতে পারল না রূপেন্দ্রকে। চেনা সম্ভবপরও নয়। এমন কি দামোদর নদের তীরে সোএগাই গ্রামখানার কথাও তার স্মরণে এল না। স্বীকার করল, সে-আমলে কত কত গাঁয়ে গেছি, বে-করেছি। সে-সব লেখা ছিল আমার খেড়ো খাতায়। অত নামধাম কি মুখস্ত থাকে ?

জানতে চাইল, সোএগাই গ্রামে তার স্বশুরের ধাম। রূপেন্দ্র তা বললেন না। রসিকলালকে যে-কথা বলেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। জানালেন, ঐ সোএগাই গ্রামের একজন ধনী গৃহস্থ—ওর স্বশুর মহাশয়—ওকে ফেরত নিয়ে যাবার জন্য রূপেন্দ্রকে পাঠিয়েছেন। গঙ্গাচরণ স্বীকৃত হলে তিনি ওকে নিয়ে যাবেন।

গঙ্গাচরণ আনন্দে আটখানা। বললে, রাজী হব না ? কী বলছেন, মহাশয় ? তিনি আমাকে জামাই-আদরে নিয়ে যেতে চাইছেন আর আমি এই আস্তাবলে পড়ে থাকব ? যাওয়ার জন্যে আমি একপায়ে খাড়া... মানে দু পা থাকলেও একপায়ে খাড়া হতাম।

রূপেন্দ্র বললেন, রায় মহাশয় দু-এক দিনের ভিতর তোমাকে নৌকাযোগে পাঠিয়ে দেবেন। তুমি তৈরী হয়ে নাও।

—আমি তো তৈরীই। কিন্তু আমার স্বশুর মশায়ের নামটা ? সোএগাই গাঁয়ে পৌছে কার বাড়ি খোঁজ করব ?

রূপেন্দ্রকে থামিয়ে ভারত প্রত্যুত্তর করেন, সেটা এখনি তোমাকে বলতে পারছি না। তুমি গিয়ে উঠবে রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্যের আরোগ্যশালায়। সেখানে তোমার থাকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে, যতদিন না ইনি গিয়ে পৌছন।

গঙ্গাচরণ জানতে চায়, এই লুকোচুরির অর্থটা কী ? এখনি বলতে বাধা কোথায় ?

ভারত বলেন, আমরা প্রথমে আমাদের প্রাপটা আদায় করি। জামাই পেয়ে শেষে ভদ্রলোক যদি আমাদের লবডঙ্কা দেখায় ?

গঙ্গাচরণ বুঝতে পারে। এতো সহজ কথা ! স্বীকৃত হয়।

প্রত্যাবর্তনের পথে রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, গঙ্গাকে তার স্বশুরালয়ের কথাটা কেন বললে না ভারত ? এক গঙ্গা মিছে কথা বলে গেলে কেন ?

ভারত বলেন, আমি কবি। বানিয়ে বানিয়ে কাহিনী রচনা করা আমার পেশা। তবু একটি বিশেষ কারণে ঐ মিথ্যাভাষণ করেছি। কিন্তু তুমি কেন মিথ্যা কথাটা বললে, রূপেন ? তুমিও তো রসিকলালের কাছে স্বীকার করনি যে, ও তোমার ভগ্নিপতি ! সত্য গোপন করলে কেন ?

রূপেন্দ্র বলেন, দেখ ভারত, 'সত্য' শব্দটার লৌকিক অর্থ আমি মানি না। 'সত্য' তাই, যা 'শিব'-এর দিশারী। আমি যদি এখানেই স্বীকার করতাম যে, গঙ্গাচরণ আমার ভগ্নিপতি তাহলে নানান জটিলতার সৃষ্টি হত। নিজের পূর্ণ পরিচয় দিতে হত। গঙ্গাও হয়তো রাজী হওয়ার অ্যাগে মোটারকম পার্বণী চেয়ে বসত। রসিকলাল ধৃত ব্যবসায়ী মানুষ—আমি অন্য একজন ধনীব্যক্তির নির্দেশে কিছু প্রাপ্তিযোগের প্রত্যাশায় কাজ করছি—এ তথ্যটা সে সহজেই মেনে নিল। গঙ্গাও সেই অচেনা ধনী স্বশুরের প্রত্যাশায় এককথায় রাজী হয়ে গেল। আমার মূল লক্ষ্য ছিল 'শিব', 'মঙ্গল'। কাতুর, গঙ্গার, রসিকলালের, তার মায়েক, সকলের সমস্যা সমাধান করে মঙ্গল বিধান করেছি। ফলে, 'মিথ্যাচার' করিনি আমি। 'সত্য' সৃজন করেছি—যে সত্য

‘শিব’-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ভারতচন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, সুন্দর কথাটি বলেছ রূপেন—‘আমি সত্য সৃজন করেছি।’

—এবার তুমি বল, তুমি কেন মিথ্যার আশ্রয় নিলে?

—আমি ‘পাদপুরণ’ করেছি মাত্র। আমি যে কবি। ‘সত্য’ তো শুধু ‘শিব’-এর সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়, সে যে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ ‘সুন্দর’-এর সঙ্গেও! আমি সেই ‘সুন্দর’-এর উপাসক। ‘সুন্দর’-এর মুখ চেয়ে ‘সত্য’কে সৃজন করেছি।

—বুঝলাম। তবু আর একটু ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছে করছে।

—আমি যে কুহকটা রচনা করলাম—লৌকিক ব্যাখ্যায় যা ‘মিথ্যা’, আমার ধারণায় তা ‘সত্য’। তার নানানরকম ফলাফল কল্পনা করতে পারছি। অনায়াসলব্ধ নায়িকার কদর নায়কে করে না। সোএগাই আরোগ্য-নিকেতনে পৌঁছে ঐ গঙ্গাচরণ খুঁজতে থাকুক—কে তার নিরুদ্দিষ্টা প্রিয়া। কোন্ সীমন্তিনী তার অজ্ঞাতে অথচ তারই আয়ুষ্কামনায় সিথিতে আঁকে সিদুরের রেখা, হাতে পরে খাড়ু-শাখা। সোএগাই গায়ের যাবতীয় সীমন্তিনী তার মা-বোন—শুধু একটি ব্যতিক্রম! তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তাকে সন্মুক্ত করতে হবে। সেই উদগ্রীব আগ্রহ, সেই ঐকান্তিক উৎসাহই ওর অন্তরে প্রেমের সঞ্চার করবে। মিলনমুহূর্তটিকে আনন্দঘন করে তুলবে। আবার ওদিক দিয়ে বিচার কর—কাত্যায়নী একটি রুগীর সেবা করছে। সম্পর্কটা আর্ত আর শুশ্রূষাকারিণীর। তবু মাঝে মাঝে কাত্যায়নীর মনে হবে—ও লোকটা অমন করে কী দেখে তার দিকে তাকিয়ে? বেচারী তো জানে না, গঙ্গাচরণ একটি বিশেষ সীমন্তিনীকে খুঁজছে সোএগাই গ্রামে পদার্পণের পর থেকেই!

রূপেন্দ্র অটুহাস্য করে ওঠেন, ওরে ক্বাবা! তুমি যে ‘কাতু-গঙ্গা’কে নিয়ে মনে মনে এক মহাকাব্য রচনা করে বসে আছ!

ভারতচন্দ্র হ্মান হাসেন, কী করব বল ভাই? ‘খেউড়ানন্দ’ হলেও আমি যে কবি।

রূপেন্দ্র তিরস্কার করেন, ছিঃ! ঐ অর্বচীন মদ্যপটার কথায় তুমি কান দিয়েছ?

ভারত একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলেন, ওর কথায় নয়, ভাই। আমার মনে এক আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে! ভাবছি, মহারাজকে সরাসরি প্রশ্ন করব—কেন তিনি আমাকে টেনে নামিয়ে আনলেন এই গঙ্গকুণ্ডে?

রূপেন্দ্র বয়স্যের হাতখানি চেপে ধরে বলেন, না! তুমি তা কর না। প্রশ্নটা আমাকেই করতে দাও। আমি জেনে নিয়ে তোমাকে জানাব। ঠিক যেভাবে আমাকে না জানিয়ে তুমি জেনে নিয়ে ছিলে গঙ্গাচরণের খবর।



—মহা ধুমধামে জগদ্ধাত্রী পূজা সমাপ্ত হয়ে গেল।

জগদ্ধাত্রী পূজা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না এতদিন। নদীয়ারীজ কৃষ্ণচন্দ্রই তার প্রবর্তক।

কৃষ্ণনগর

তঁারই আমলে তা ছড়িয়ে পড়ে ফরাসভাণ্ডায়। দু-আড়াইশ বছর পরে আজও শুধু ঐ দুটি জনপদে—কৃষ্ণনগর আর চন্দননগরে, জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যাপক আয়োজন।

এ পূজার প্রবর্তন নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত—

নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাড়স্বরে দুর্গা পূজা করতেন—বংশানুক্রমিক শারদীয়া দুর্গোৎসব। একবার তিনি নবাবের রাজস্ব, আবওয়াব প্রভৃতি সময় মতো দিতে পারেননি। তাতে নাকি নবাব আলিবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন মহাপূজার ঠিক প্রাক্কালে। তাঁর আশা ছিল, বাৎসরিক পূজা থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় রাজা স্বীকৃত হবেন। বাস্তবে হলেনও তাই। ব্রাহ্মণের মৌখিক প্রতিশ্রুতি পেয়ে আলিবর্দী হুকুম দিলেন তাঁকে মুক্ত করে দিতে। বন্দী আর্বদ্ধ ছিলেন মুঙ্গেরের কারাগারে। নৌকাযোগে তিনি সময়মতো কৃষ্ণনগরের রাজবাটিতে উপনীত হতে পারলেন না। অগ্রদ্বীপের রুকুনপুর ঘাটে যখন পৌঁছালেন তখন দেখতে পেলেন নবমীর সন্ধ্যা নেমেছে। বিজয়া দশমীর ঢাকের বোল শোনা যাচ্ছে! অগ্রদ্বীপ প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি পল্লী। এই সেই রুকুনপুরের অভিশপ্ত ঘাট, যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন-যাত্রার সময় আহারাণ্ডে সেবক গোবিন্দ ঘোষের কাছ থেকে মুখশুঙ্খি চেয়েছিলেন, আর গোবিন্দ পূর্বদিনের সঙ্ঘত একখণ্ড হরিতকী তার প্রভুকে দেওয়ার অপরাধে বৃন্দাবনতীর্থে যাওয়ার অধিকার হারায়। আজ সেই ঘাটে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হারালেন মাতৃপূজার অধিকার! কৃষ্ণনগর থেকে জলপথে মাত্র দশ-পনের ক্রোশ দূরে। নিদারুণ হতাশায় ভেঙে পড়লেন রাজা। অস্নাত অভুক্ত ব্রাহ্মণ নৈরাশ্যের অবসাদে নৌকার ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই রাতে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন—

একটি অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী বালিকা এসে যেন দাঁড়িয়েছে তাঁর শিয়রের কাছে। বলছে, মহারাজ, অনশনে প্রাণ দিও না। ওঠ! গঙ্গাজল পান কর।

রাজা ঘুমের মধ্যেই যেন উঠে বসলেন। বললেন, তুমি কে? কেন বলছ আমাকে এই অনশন-ব্রত ভঙ্গ করতে?

কিশোরী বলে, আমাকে চিনতে পারলি না? আমার কথা ভাবতে ভাবতেই তো ঘুমিয়ে পড়েছিলি? আমি পৃথিবী—‘পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়াদ্বিদম’।

বিস্মিত রাজা বলেন, আমি তোমাকে চিনি না! না, আমি তোমার কথা চিন্তা করতে করতে শয়ন করিনি। তুমি তো আমার কন্যার মতো—তিনি আমার মা!

—তিনিই আমি, আমিই তিনি!

এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরী পরিবর্তিত হয়ে গেলেন অপরূপা এক মাতৃমূর্তিতে। দুর্গার মতো ইনিও সিংহস্কন্ধ-সমারূঢ়া, তাঁরই মতো দিব্য বিভা, হাস্যময়ী, নানালঙ্কার-ভূষিতা,—কিন্তু দশভুজা নন, চতুর্ভুজা। দুই বাম হস্তে শঙ্খ ও ধনুক এবং দুই দক্ষিণ করে, চক্র ও পঞ্চবাণ। রক্তাশ্বর পরিহিতা, তাঁর কণ্ঠে রক্তোপবীতের পরিবর্তে সর্পযজ্ঞোপবীতি।

মা বললেন, শ্রীরামচন্দ্রের আহ্বানে অকালবোধনে স্বীকৃতা হয়েছিলাম। আজ তুমি আবার তোর দুর্দশা দেখে স্বীকৃতা হচ্ছি—আগামী শুক্লা নবমী তিথিতে তুই পূজার আয়োজন কর। আমি আসব, এই রূপেই আসব! তোর হাত থেকে অঞ্জলি গ্রহণ করব।

তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের। নৌকার গলুই থেকে বাহিরে বার হয়ে এসে

দেখলেন, ঘাটে দশভুজার বিসর্জন হচ্ছে। আজ বিজয়া দশমী।

সংস্কৃতজ্ঞ রাজার মনে পড়ে গেল : বিসর্জন = বি পূর্বক সৃজ্ ধাতু অনট!

‘বিসর্জন’ অর্থে বিশেষরূপে জন্ম গ্রহণ করা! ধাতুটা ‘সৃজ্’! মা দশভুজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—চতুর্ভুজরূপে তিনি আগামী শুক্লা নবমীতে তাঁর রাজবাটিতে আবির্ভূত হবেন। ঐ যে ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন হচ্ছে ওর মন্তব্যটা: ‘পুনরাগমনায় চ’!

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে পণ্ডিতদের আহ্বান করলেন। স্বপ্নদৃষ্ট মাতৃমূর্তির সবিশেষ বর্ণনা কাউকে বললেন না; শুধু জানতে চাইলেন ‘জগদ্ধাত্রী’-দেবীর পূজাবিধি কী? কেমন সে মূর্তি? কোথায় তাঁর পূজা-প্রকরণ পাওয়া যাবে?

বড় বড় তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা অধোবদন হলেন। শুধু শঙ্কর তর্কবাগীশ বললেন, মহারাজ! ‘জগদ্ধাত্রী’-দেবীর উল্লেখ আমি ‘কালিকাপুরাণ’ পুথিতে পেয়েছি। ঐ মন্ত্রটি আছে সেই পুরাণে: ‘পৃথিব্যং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মূর্যয়ত্বিদম্’। ঐ মূর্তিতে ‘মা. সেবার আবির্ভূতা হয়েছিলেন স্বয়ং জনকরাজার কাছে। কিন্তু তাঁর ধ্যানমন্ত্র কী, তা আমি জানি না।

সে-সময় রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন এক দক্ষিণ দেশীয় পণ্ডিত। তিনি জানালেন, সিংহাধিকারী দেবীমূর্তির পূজা দাক্ষিণাত্যের কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে বটে কিন্তু তাঁর ধ্যানমন্ত্র কী—তা জানেন না। মহারাজ বললেন, দাক্ষিণাত্যে হোক বা না হোক, আমি ঐরূপেই মাতৃপূজা করব, আগামী শুক্লা নবমীতে।

ঘূর্ণীর মৃৎ-ভাস্কর বলে, কিন্তু আমরা যে অমন মূর্তি কখনো দেখিনি মহারাজ! নিখুঁত বর্ণনা না জানলে কেমন করে গড়ব? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ধ্যানে-পাওয়া জগদ্ধাত্রী-মূর্তি



অগত্যা মহারাজকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হল শহরপ্রান্তে—সেই আরণ্যক পর্ণকুটীরে। জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমন্ত্র কী হতে পারে? পারলে হয়তো ঐ অবগ্যচারীই বলতে পারতেন।

রাজার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত পদ্মাসনে ধ্যানে বসলেন। তারপরে এক সময় নিমীলিতনেত্রে পণ্ডিত স্বগতোক্তির মতো মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—সেটাই জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমন্ত্র: ‘সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং চতুর্ভুজাং মহাদেবীম্ নাগেশ্বরোজ্জ্বলবীতিনীম্’।

আশ্চর্য! মায়ের যে রূপ তিনি স্বপ্নে দেখেছেন—যার বর্ণনা করারও কাছে করেননি, তর্কসিদ্ধান্তের কাছেও নয়, সেই দেবীর হুবহু রূপবর্ণনা ধ্যানযোগে লাভ করেছেন বুনো

কৃষ্ণনগর

রামনাথ : সিংহের পিঠে—নানা আভরণ ভূষিতা—চতুর্ভুজা—এই মহাদেবীর কণ্ঠে সর্পের যজ্ঞোপবীত।

ফরাসভাঙ্গার ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল গভীর সৌহার্দ্য। ইন্দ্রনারায়ণ সকল বৃত্তান্ত শুনে তাঁর ফরাসভাঙাতেও পর বৎসর এই পূজায় আয়োজন করেন। কারও কারও মতে রাজা কৃষ্ণনগরের এই পূজা প্রবর্তন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। অর্থাৎ আমাদের কাহিনীর কিছু পরে। তা হোক, কাহিনীর অনুরোধে সে মত আমরা মানতে পারিনি।

রাজবাড়ির ঠাকুর-দালানে যে দেবীমূর্তি তাতে বাস্তবতা অপেক্ষা ভাবরূপের বাজনা অধিক। ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পী বাস্তবতার হৃদমুদ্র করতে জানে। রেকাবিতে মাটির এলাচ-লবঙ্গ দিলে অতিথি ভুল করে মুখে ফেলে দেয়! কিন্তু এখানে সেই বাস্তবতা নাই। এমনকি পদতলের সিংহটিকে দেখেও মনে হয়—শিল্পী যখন ‘ইউনিকর্ন’ চেনে না, তখন কি সে সিংহ গড়তে গিয়ে ভুলে ঘোড়া গড়ে ফেলেছে?

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলার আয়োজন হয় রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে। শত শত বিপণী। নানান অঞ্চলের ব্যাপারীরা আসে বেসাতি নিয়ে। একদিনের পূজা। পরদিন বিসর্জনেরই বা কী সমারোহ। পঞ্চাশ-জোড়া ঢাকি মায়ের শোভাযাত্রার সম্মুখে ঢাক বাজাতে বাজাতে ছুটে চলে : “গুড়ু-গুড়ু-গুড়ু ঢ্যাং! ঐ আসছে/রাজার ঠাকুর/ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং/ড্যাং সু...”

পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে সেই বিচিত্র ধ্বনিটা এ বৃদ্ধের কানে লেগে আছে। তাই বিশ্বাস করতে মন চায়—দু-আড়াই শ বছর আগেও ঢাকির বোল ছিল ঐ রকমই।

রূপেন্দ্রনাথকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন ভারতচন্দ্র। তাঁর কানে-কানে বললেন, ভোলাকে দু-চার কপর্দক পাবণী দাও! সেটাই প্রথা। আমিও দিয়েছি।

রূপেন্দ্রের জানা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভোলাকে ডেকে নগদ একটি টাকাই পাবণী দিলেন। ভোলা ঠুঁকে প্রণাম করল।



বিসর্জনের পরদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রূপেন্দ্রকে মধ্যাহ্ন-ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন।

জনাস্তিকে বললেন, আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনার আছে, ভেষগাচার্য।

—বলুন মহারাজ?

—প্রথমে বলুন, ঔষধবজের রোগটা কী? কুষ্ঠ?

রূপেন্দ্র ইতিমধ্যে রুগীকে দেখেছেন। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা দিয়েছেন। জিনি-বললেন, না মহারাজ। এ একটি বিচিত্র মারাত্মক অসুখ। সাগরপারে এ রোগের প্রাদুর্ভাব। ইংরাজ-ফরাসী-পর্তুগীজদের দেশে আছে, চীনখণ্ডেও আছে। আমাদের দেশে এটি নতুন আমদানি। চিকিৎসাবিদ্যায় এর নাম রতিজ-রোগ!

—চিকিৎসা আছে? ভয়াবহ?

—না মহারাজ, এর চিকিৎসা আমার জানা নেই। আর ভয়াবহ তো বটেই। মৃত্যু অবশ্যস্বার্থী—কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় সেটাই দেখার।

—সংক্রামক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে রোগজীবাণু বায়ু বা জলের দ্বারা সংক্রামিত হয় না। এ রোগের আক্রমণ জনেন্দ্রিয়ের। নিরোগ ব্যক্তি রোগাক্রান্তের সঙ্গে যৌন সহবাস করলেই শুধু আক্রান্ত হয়। মুশকিল এই যে, রোগটি বংশানুক্রমিক। সন্তান জন্মান্ত হয়ে যায়, সেও অনুরূপ রোগজীবাণু নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

—এ তো বড় সর্বনাশের কথা শোনালেন! কী বিধান দিয়েছেন?



কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পূজামণ্ডপে জগদ্ধাত্রী (বিংশ শতাব্দী)

—ঔষধপত্রের ব্যবস্থা দিয়েছি, আর দত্তমশাইকে বলেছি, প্রতিবার নারী-সহবাসে তাঁর এক বৎসর করে আয়ুক্ষয় হয়ে যাবে!

—তাই যায় বুঝি?

—আজ্ঞে না। লক্ষ্য করে দেখলাম, লোকটার মৃত্যুভয় প্রচণ্ড। এ মিথ্যা ভীষণে রোগে বিস্তার কম হবে মনে করেই ওটুকু মিথ্যাভাষণ করেছে!

—ভালই করেছেন। আমাকে কী পরামর্শ দেন?

—আমার অনুমান, ঋষধ্বজ বৎসরখানেকের ভিতরেই মারা যাবে। আপনি দেখবেন, তা

কৃষ্ণনগরে

দুই উপপত্নী যেন দেহ-ব্যবসায়ী হয়ে রোগ বিস্তার করতে না পারে! তাহলে অনতিবিলম্বেই এই ভয়াবহ রোগ আপনার রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়বে।

রাজা চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলেন, আমি সে সম্ভাবনার মূলোৎপাটন এখনি করে ফেলতে চাই কবিরাজ মহাশয়। ঝষধবজকে এখনি গ্রেপ্তার করে আনিছি। আমৃত্যু তাকে রাজবন্দী করে রাখব। তার উপপত্নী দুটিকেও বন্দি করি আনব। আপনি পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন, তারা রোগাক্রান্ত কিনা?

—পারব। কিন্তু রোগাক্রান্ত হবার অপরাধে কি ঝষধবজকে বন্দী করা ঠিক হবে?

—আপনি জানেন না—জ্বাল-জুয়াচুরি—তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ। তার মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত। সে যা হোক, আপনাকে আমার দ্বিতীয় একটি জিজ্ঞাস্য আছে।

—বলুন মহারাজ?

—আপনাকে যদি কৃষ্ণনগরে বা নবদ্বীপে কিছু নিষ্কর-ভূমি দান করা হয়, ভদ্রাসন নির্মাণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং যথোপযুক্ত বস্তির ব্যবস্থাপনা করা হয়, তাহলে আপনি কি আপনার পৈত্রিক আবাস ত্যাগ করে নদীয়ায় এসে বসবাস করতে স্বীকৃত?

রূপেন্দ্র করজোড়ে বলেন, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য হত মহারাজ। কিন্তু দুটি অন্তরায় আছে। আমার পিতৃদেবের চতুষ্পাঠী ছিল, কিন্তু তিনি আমাকে কৌলিক-বৃত্তি গ্রহণ করতে দেননি। চিকিৎসাবিজ্ঞানী করে তুলেছিলেন একটি বিশেষ হেতুতে—সোএগাই গ্রামের কাছেপিঠে কোনও কবিরাজ নাই। আমি লোভের বশবর্তী হয়ে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলে স্বর্গবাসে তিনি ব্যথিত হবেন।

—বুঝলাম। আর দ্বিতীয় হেতু।

—অপরাধ নেবেন না, মহারাজ! পূর্বপুরুষদের কথা জানি না, কিন্তু আমার পিতৃদেব বা পিতামহ কখনো কোন দান গ্রহণ করেননি।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন। বললেন, এ তথ্যটা কিন্তু আপনার ইতিপূর্বেই বলা উচিত ছিল।

রূপেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত বোধ করেন এবং কেন যে অপ্রস্তুত বোধ করলেন তার হেতু নির্ণয় করতে পারেন না। জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বে সে-কথা কেন উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতে যাবেন? পরমুহূর্তেই মহারাজ রহস্যজাল ভেদ করে দেন—সবটাই কৌতুক। বললেন, সে কথা জানা থাকলে গৃহস্থের কিছু সাশ্রয় হত। পঞ্চ-ব্যঞ্জনের পরিবর্তে সেক্ষেত্রে অতিথির জন্য তিস্তিড়ী-পত্রের ব্যঞ্জনই যথেষ্ট হত।

এই সময় একটি সুদর্শনা কিশোরী দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হইল যুক্তকরে। রত্নালঙ্কারভূষিত। অবগুষ্ঠনবর্তী। এমনকি মাথায় সিঁথি, নাসিকায় টানা-নখ। মহারাজ তাকে আহ্বান করলেন, এস কস্তুরি...

কস্তুরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে গলায় আঁচল দিয়ে দুই ব্রাহ্মণকে প্রণাম করল।

রাজা বললেন, এ হল কস্তুরীবাদী, আমার অমাত্য শিবভট্টের কনিষ্ঠা কন্যা। ও আমাদের ডাকতে এসেছে। মধ্যাহ্ন-আহারে। তাই নয়, কস্তুরি?

মেয়েটি গ্রীবাভঙ্গিতে স্বীকার করে।

রাজা বলেন, চট করে বলে দাও তো মা, কোন পাঁচটি ব্যঞ্জন তোমার স্পর্শে ধন্য হয়েছে?

কস্তুরী জানে, রাশভারী মহারাজা অন্দরমহলে কৌতুকপ্রিয়। বললে, একি আপনাদের পুরুষদের চতুষ্পাঠী? রানী-মার টোলে ও-সব তঞ্চকতা চলে না।

রাজা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। বলেন ঠিক আছে, মা। তুমি যাও, আমরা এখনি আসছি। কস্তুরী হাসতে হাসতেই প্রস্থান করল।

রাজা তখন রহস্যটা ভেদ করে দিলেন রাপেন্দ্রর কাছে।

ওঁরা দুজনে এতক্ষণ কথা বলছিলেন ‘বার মহলে’। স্বাধীনতার বিষয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচীনপন্থী। মহিলারা গঙ্গান্নান করেন পাক্কি থেকে অবতরণ না-করে। অর্থাৎ বাহকেরা পাক্কিসমেত স্নানার্থিনীকে গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করে! রাজা কোনও বিশেষ অতিথিকে আহ্বারে নিমন্ত্রণ করলে ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশিত হয় এই ‘বার-মহলে’। অন্দরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় না। আজ মহারাজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে চলেছেন একটি বিশেষ হেতুতে। বড় মহারানী কিছুদিন ধরে প্রায়শই শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পত্নী। ইনি শিবচন্দ্রের মাতা। মহারাজের ইচ্ছা ভেষ্যগাচার্যকে অন্দর-মহলে নিয়ে এসে তাঁকে একবার দেখানো। রাপেন্দ্র রোগের লক্ষণ জেনে নিয়ে স্বীকৃত হলেন। উপরন্তু জানতে চান, ঐ কস্তুরী কেন আছে তাঁর অন্দরমহলে। আর ঐ মহারাজের সঙ্গে তাব কথোপকথনের অর্থটাই বা কী?

সে-কথাও মহারাজ বিস্তারিত জানালেন।

কৈশোরে পদার্পণ করার পূর্বেই বিশিষ্ট অমাত্যের আশ্রয়দল সীমস্তিনী হয়ে যায়; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির-পূর্বে স্বামীর ঘরে যায় না। তারা পর্যায়ক্রমে তখন কয়েক মাস রাজান্তঃপুরে এসে বাস করে। রাজা যেমন বিদ্যোৎসাহী, পুরুষদের জন্য ক্রমাগত চতুষ্পাঠী খুলে চলেছেন, বড় রানী-মাও তেমনি অন্দরমহলে একটি বিচিত্র চতুষ্পাঠী খুলেছেন। ঐসব শিক্ষানবীশ কিশোরীদের নিয়ে। তাদের নানান বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা—সীবন, গৃহকার্য, রন্ধন। তাদের পরীক্ষা আর উপাধিদানের ব্যবস্থাও আছে। আজ যেমন ঐ কস্তুরীর রন্ধনের পরীক্ষা। বিচিত্র সে ব্যবস্থাপনা—

মহারাজের জন্য যে দশ-বিশ পদ রান্না করা হয়েছে তার ভিতর মাত্র পাঁচটি পাক করেছে ঐ মেয়েটি, বাদবাকি রন্ধনশিল্পে অত্যন্ত অভিজ্ঞ পাচকবৃন্দ। আহ্বাস্তে রাজা-মশাইকে বলতে হবে—কোন পাঁচটি ‘পদ’ সেই অভিজ্ঞ পাচকবৃন্দের দ্বারা প্রস্তুত নয়। সেটা যদি সনাক্ত করা না যায়, তাহলেই পরীক্ষার্থিনী উপাধি লাভ করবে। আহ্বারের সময়ে ঐ মেয়েটি উপস্থিত থাকবে পরিবেশনের অছিলায়। রাজা মহাশয় তাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। জেনে নেবেন, রন্ধনবিদ্যায় মেয়েটির জ্ঞান কতদূর। স্বহস্তে যদিচ কখনো রন্ধন করেন না তবু মহারাজ একজন খাদ্য বিশারদ! মরিচ, অন্নাসাদ বা লবণাধিক্যের সামান্য হেরফের তো বটেই এমনকি ‘ফোড়ন’-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য পর্যন্ত ধরতে পারেন রসনার অনুভূতিতে। আজ ঐ পরীক্ষার্থিনী যে কোন পাঁচটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছে—সেগুলি আমিষ না নিরামিষ? হেঁচকি-কোড়া-ঘণ্ট-কালিয়া না ‘ক্লেংকে’ তা পর্যন্ত জানা নাই।

রাপেন্দ্র সহসা করজোড়ে বলে ওঠেন, একটা অপরাধ হয়ে গেছে মহারাজ! আমি বলতে ভুলে গেছি, আমি নিরামিষাণী।

রাজা হাসেন। বলেন মারাত্মক ভ্রান্তি! এখন আর উপায় কি? কিন্তু শুনছিলাম আপনি শান্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মৎস্য ও মাংস ত্যাগ করেছি সম্প্রতি।

—সম্প্রতি? কতদিন?

—ধরুন পক্ষকাল!

রাজার মুখভাব দেখে বোঝা গেল না তিনি কী ভাবছেন। বললেন, আসুন, অন্দরমহলে যাওয়া যাক। শুধু নিরামিষই আহার করবেন। ‘পলাতু’ সেবা করেন তো?

—আজ্ঞে না!

—তবে তো বড়ই বিপদে ফেললেন। তিষ্ঠিভীপত্রের ব্যঞ্জন কি ওরা বানিয়েছে? দেখা যাক। আসুন।

যে কক্ষে ঔদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন সেটিও বৃহৎ। এটি অন্দরমহলে। মর্মরমণ্ডিত কক্ষতল। প্রাচীর শুভ্রবর্ণের পঙ্খের কাজ করা। উপর থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটি সহস্রমুখী ঝাড়লিষ্ঠন। কক্ষের একপ্রান্তে একটি ষ্ঠেতপাথরের মেজ, তদুপরি পুষ্প পাত্রে কুসুমগুচ্ছ। এখানে প্রাচীরে কোন তৈলচিত্র নাই—একদিকে দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড একটি রঙিন রেশমচিত্র। মহাযানধর্মের কোন মাতৃমূর্তি—তারা, মঞ্জুশ্রী, ভৈরবী অথবা প্রজ্ঞাপারমিতা। তিব্বত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। কক্ষকেন্দ্রে দুটি পশমের চতুষ্কোণ আসন, অপূর্ব নকশাকাটা। দুটি প্রকাণ্ড অন্নপাত্র—রৌপ্যনির্মিত; আর সেদুটি ঘিরে তিনসারিতে কাঁসা অথবা রূপার কটোরা। সেগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে অন্নপাত্রকে বেষ্টিত করে আছে। দু-একটি কষ্টিপাথরের পাত্র অথবা খঞ্চা—যাতে ফলমূল মিষ্টান্ন পরিবেশিত—মক্ষিকাবারণ সরপোশে আবৃত।

ঔরা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করা মাত্র বিপরীত দিক থেকে অগ্রসর হয়ে এলেন রানী-মা। রূপেন্দ্রকে প্রণাম করার উদ্যোগ করতেই তিনি সসঙ্কোচে পেছিয়ে গেলেন। বলেন, না, না, মা। আপনি আমাকে প্রণাম করবেন না।

রানী-মা রূপেন্দ্রের প্রায় সমবয়সী, হয়তো সামান্য দু-চার বছরের ছোট।

মহারাজ বলেন, একটা কথা ভেবগাচার্য বলতে ভুলেছেন। উনি নিরামিষশী! এখন কী করা যায়?

রানী-মা প্রথমটা বিস্মিত। তারপরেই হেসে ফেলেন। বলেন, তাতে অসুবিধা কিছু হয়নি। কস্তুরী আজ শুধু নিরামিষ-ব্যঞ্জনই পরিবেশন করেছে।

মহারাজ কস্তুরীর দিকে ফিরে বলেন, কোন ব্যঞ্জনে ‘পলাতু’ দেওয়া আছে কি?

—না মহারাজ। আপনি তো পূর্বেই নিষেধ করেছিলেন!

—করেছিলাম, না? আজকাল আর কিছুই স্মরণে থাকে না। আসুন, বস।

রূপেন্দ্র রীতিমত বিস্মিত। বলেন, সে কী! এ ব্যবস্থা কেমন করে হল?

রাজা বললেন, শোনেননি—‘রাজা কর্ণে পশ্যতি’

কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত বিচক্ষণ। ভারতচন্দ্রের নিকট পূর্বেই তথ্যটা সংগ্রহ করেছেন। রূপেন্দ্রের আহাররুচি বিষয়ে। কস্তুরীকে বললেন, ইনি আমার মতো কল্লির ব্রাহ্মণ নন, আহারকালে

বাকসংযম করে থাকেন। ফলে তুমি এখনই কিছু আভাস দিয়ে রাখ মা—কোন কটোরায় কী পরিবেশিত।

ওঁরা দুজনে আসনে উপবেশন করলেন। সম্মুখে মর্মর গৃহতলে বসল মেয়েটি। তার হাতে একটি রৌপ্যদণ্ড, তার শেষপ্রান্তে আঁকশির মতো ঝাঁকানো। ভোজনকারী উপবিষ্ট-অবস্থায় তৃতীয় সারির কটোরায় নাগাল পায় না। তাই এই ব্যবস্থা। রৌপ্যদণ্ডের সাহায্যে কস্তুরী কটোরাগুলিকে আগিয়ে-পেছিয়ে দিতে পারবে। অনুরুদ্ধ হয়ে কস্তুরী মুখস্ত বলার মতো ভোজ্যদ্রব্যগুলির জাতনির্ণয় করে গেল।

বামদিক থেকে প্রথম সারিতে সর্বপ্রথম একটি ক্ষুদ্র সুবর্ণ-কটোরায় গব্য ঘৃত। তারপর কিছু ভাজা-সবজি—পনসবীজ ও চালকুমড়োর বুকো-বড়া, লাউডগার পোড়ে-ভাজা, শাপলা-ভেলার পাটভাজা। তিনরকম ডাইল—আমড়া-মুকুলের মটর-ডাল, কমলালেবু-ছানা সহ ঘন মুগ ডাল এবং ওলকপি মিশ্রিত ছোলার ডাল। দ্বিতীয় সারিতে কাঁচা-পেঁপের চাপরখন্ট, ছানার পাতুরি, বড়ি-সহযোগে পালং-ঝোল, লাউ-পোস্ত, কাঁচকলার ধোঁকা-ডালনা, জলপাইয়ের মাখা-চটনি, পাপড় ভাজা। এরপর তৃতীয় সারি—ক্ষীর, দধি, ও নানান মিষ্টান্ন। যেগুলি সরপোশে ঢাকা।

রাপেন্দ্র বলেন, এ তো আমার এক সপ্তাহের খাদ্য, মহারাজ, এত কি খাওয়া যায়?

—হয়তো যায়, হয়তো যায় না। আপনার যা অভিরুচি তাই গ্রহণ করুন। অপচয় হবে না কিছু। ব্রাহ্মণের সেবাস্তিক অবশেষ গ্রহণের লোকের অভাব নেই।

রাপেন্দ্রের নজর হল, কর্পূর-মিশ্রিত পানীয় জল পরিবেশিত হয়েছে দুটি সুবর্ণ-পাত্রে। তার পাশে রাখা আছে মোরাদাবাদী-কাজ করা একটি অপূর্ব রৌপ্য-ভূঙ্গার এবং একটি পিতলের বড় পাত্র। এ জাতীয় ভূঙ্গারে সচরাচর মাধবী পরিবেশিত হয়। আহার-থালিকার পার্শ্বে সেটি কেন রাখা আছে বোধগম্য হল না। সে বিষয়ে প্রশ্ন করতেও সঙ্কোচ হল।

মহারাজ বললেন, কস্তুরী, “তুমি তিস্তিডী-পত্রের ব্যঞ্জন করনি?

কস্তুরী অবাক মানে। জবাব জোগায় না। তার হয়ে রানী-মা বলে ওঠেন, না! এ তো আরণ্যক-আশ্রম নয়, এখানে তিস্তিডী-ব্যঞ্জনে নানান ‘অনুপপত্তি’!

কস্তুরী বুঝল না। কিন্তু যারা বোঝার তাঁরা বুঝলেন।

এবার মহারাজ বলেন, পেট ভরবে কী ভাবে? ‘শাক, মোচাখন্ট, ভুট্ট-পটোল নিম্বপাত’ কিছুই নাই...

এবারও কস্তুরী বিহ্বল এবং এবারও জবাব দিলেন রানী-মা; সে-সব সাংস্কিক আহার। রাজসিক নয়। ও আপনার পরিপাক হত না।

রাপেন্দ্র বুঝতে পারেন—রানী-মা নিরঙ্কর নন—কৃষ্ণদাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর ভালভাবেই পড়ি। অন্নপাত্রে নৈবেদ্যের মতো চূড়ো করে রাখা মূল ভোজ্যদ্রব্যটি অন্ন নয়,—ভর্জিত-অন্ন অর্থাৎ পলাল। তার এক-এক দিক এক-এক রঙের। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ

হয়তো লক্ষ্য করেছেন, নিরামিষ রান্নায় ‘আলু’র উল্লেখ নেই। মধ্যযুগে ডাল, আলু, উমেটো প্রভৃতি বাঙালীর খাদ্য ছিল না। আমাদের কাহিনীর কালে ‘ডাইল’-এর শুভাগমন ঘটেছে। ওলকপিরও। আলুর আবির্ভাব হতে আরও অর্ধশতাব্দী বাকি।

ও সাদা। কীভাবে পলানের এই বর্ণ-পার্থক্য হয়েছে বুঝে উঠতে পারেন না। মহারাজ সে বিষয়েই প্রশ্ন করলেন কস্তুরীকে। মেয়েটি জানালো—কোচিনীল দিয়ে রক্তবর্ণ, জাফরান-সহযোগে হলুদ রঙ, সুপুরি মিহি গুঁড়ো করে তার সঙ্গে কালোজামের রস মিশিয়ে নীল রঙ করা হয়েছে। আর সবুজ রঙ তো হলুদ-নীলের সমাহার। মহারাজের প্রশ্নের জবাবে কস্তুরী জানালো এর মূল উপকরণ : গোবিন্দভোগ মিহি পুরাতন চাউল আড়াই পোয়া, গব্যঘৃত এক পোয়া, শর্করা দেড় ছটাক, পাতি লেবুর রস এক ছটাক। আন্দাজ মতো ঘন দুধের সর, তিনচারটি বাদাম বাটা। ছোট এল্যচ আটটি। লবঙ্গ সাতটি। দারুচিনির ছোট টুকরো দশটি। সামান্য কালিজিরা ও চার-পাঁচটি তেজপাতা। ‘আকনির’ জন্য প্রয়োজন—সা-জিরে, ধনিয়া, তেজপাতা, আদ্রক ও দারুচিনি। এই বিচিত্র ভোজ্য দ্রব্যটি নাম : ‘পঞ্চরঙ অপলাম’।

মহারাজ বললেন, ‘পঞ্চরঙ’ তো বুঝলাম, কিন্তু ‘অপলাম’ অর্থ কী?

—মহারাজ, পলাম হচ্ছে ‘পল যুক্ত অন্ন’। ‘পল’ অর্থে মাংস। যেহেতু এটি নিরামিষ পদ তাই এর নাম ‘অপলাম’।

মহারাজ গৃহিণীর দিকে দৃকপাত করে বলেন, তুমি একে উপাধি দিতে পার : পাকশিরোমণি।

রানী হেসে বলেন, এখনই কী? সেবা হোক। দেখি, পঞ্চ গুণ্ডব্যঞ্জনকে স্নানান্ত করতে পারেন কি না।

অতঃপর দুজনে পঞ্চদেবতাকে অন্নদান শুরু করলেন। দেখা গেল, অন্ন গ্রহণকালে মহারাজও বাকসংযম করে থাকেন, যদিচ পূর্বে তিনি নিজেকে ‘কলির ব্রাহ্মণ’ বলেছেন।

রূপেন্দ্র এবার বুঝতে পারেন—এ কারুকার্যমণ্ডিত রৌপ্যভূঙ্গার এবং পিতলের গামলাটি কেন রাখা আছে। মহারাজ প্রত্যেকটি কটোরা থেকে সামান্য—কখনো কণিকামাত্র খাদ্য অন্নপাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছেন এবং তার রসাস্বাদনান্তে ভূঙ্গারের জলে মুখ প্রক্ষালন করে চলেছেন। না হলে, পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের স্বাদগন্ধ পরবর্তীতে অনুভূত হবে—খাদ্যবিচারে শ্রান্তি হয়ে যেতে পারে।

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন—রন্ধন যেমন শিল্পকর্ম তেমনি তার প্রকৃত রসাস্বাদনও একটি চারুকলা। খাদ্যকে এতদিন উদরপূর্তির উপকরণ বলেই জানা ছিল। নদীয়া রাজের আতিথ্য গ্রহণ না করলে তিনি বুঝতে পারতেন না ‘ভোজন’ও একটি চারু-শিল্প!



ভূরি-ভোজনাতে দুজনে আবার এসে বসলেন বার-মহলের সেই কক্ষটিতে। রূপেন্দ্র ধূমপানে অভ্যস্ত নন। মহারাজ সুগন্ধী অম্বুরী-তামাক সেবন করার অবকাশে প্রশ্ন করেন, রানী-মার অসুখটা কী?

রূপেন্দ্র ইতিমধ্যে রানী-মাকে পরীক্ষা করেছেন। বললেন বিচলিত হৃদয় মতো কিছু নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী উপসর্গ তিন জাতের : বায়ু, পিত্ত, কফ। রানীমার শেষ দুটি উপসর্গ

নাই। বায়ু কিছু কুপিত। হেতু: রক্তচাপ বৃদ্ধি। আমি ঔষধ প্রেরণ করছি, সেবনবিধিও জানিয়ে দেব। কিন্তু আরও দুটি কাজ করলে ভাল হয়। প্রতিদিন রাত্রে একমুঠি ‘কুলুখ কলাই’ জলে ভিজিয়ে দেবেন। পরদিন প্রত্যুষে শুধু জলটুকু ছেকে খেতে হবে। তদ্বিন্ন প্রত্যুষে—সূর্যোদয়ের পূর্বে, কিছু প্রাতঃভ্রমণেও উপকার পাবেন। পদচারণা করতে হবে অন্দরমহলের তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে। নগ্নপদে। কচি থোড়-এর রসও উপকারী।

রাজা এবার প্রসঙ্গান্তরে এলেন, গঙ্গাচরণ যেতে রাজী হয়েছেন?

রূপেন্দ্র চমকে ওঠেন। পরক্ষণেই বুঝে নেন, যে গুপ্তচরের মাধ্যমে ভারতচন্দ্র গঙ্গাচরণের সন্ধান পেয়েছেন সে রাজার বেতনভুক। তিনি স্বীকার করলেন, হয়েছে।

—কই আপনি তো আপনার বিবাহে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন না?

এবার দুরন্ত বিস্ময়ে বলেন, আপনি সে-কথা কী করে জানলেন? ভারতের কাছে?

—না। কিন্তু, রূপনগরের মঠলুষ্ঠনের সংবাদ কি আমি জানব না? আর সেই সূত্রে কী হেতু সেদিন মঠ অরক্ষিত ছিল? রূপনগরের ‘রাইরানীর’ কথা এই নবদ্বীপেও এসে পৌঁছেছে। কবে বিবাহ? এই অগ্রহায়ণে?

রূপেন্দ্র স্বলজ্জ স্বীকার করলেন। জানালেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে সে বিবাহে নিমন্ত্রণ করার মতো সাহস বা সঙ্গতি তাঁর নাই।

মহারাজ বললেন, তৎ-সঙ্গেও আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। স্বয়ং যেতে পারছি না। জগৎশেষের গদী লুট হয়েছে। আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছেন। কখন কী হয় বলা যায় না। তবে ‘কুসুমমঞ্জরীকে’ রানী-মা এই সামান্য আশীর্বাদটি দিচ্ছেন। এটি বিবাহের উপহার—রাজানুগ্রহ বা বৈদ্যবিদায় নয়—আপনি গ্রহণ করুন।

রূপেন্দ্র বাধ্য হলেন উপহারটি গ্রহণ করতে। মুজাখচিত একটি শতনরী।

এবার তিনি বলেন, মহারাজ, আমারও একটি জিজ্ঞাস্য আছে। যদি অভয় দেন তো নিবেদন করি?

—বলুন?

—সাহিত্যরসিক হিসাবে কি আপনার মনে হয়নি ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’ সুসমাপ্ত?

রাজা হঠাৎ গভীর হয়ে গেলেন। কৃষ্ণিত-ভূভঙ্গে প্রতিপ্রশ্ন করেন, জিজ্ঞাস্যটি কার? আপনার, না আপনার বন্ধুবরের?

—সেও স্বতই কৌতূহলী, কিন্তু প্রশ্নটি নিতান্তই আমার।

—আপনার জিজ্ঞাস্যটি তো এই: ‘অন্নদামঙ্গল’-এর কবিকে কেন রাজাদেশে ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনা করতে হল? তাই নয়?

রূপেন্দ্র যুক্তকরে বললেন, সরলভাষায় প্রশ্নটি সেইরকমই বটে।

—তার হেতু, আমি আপনার ঐ বন্ধুটির ভিতর একটি মহান সম্ভাবনাকে দেখতে পেয়েছি। আমার বাসনা, নদীয়ারাজের সভাকবির কাব্যের শতশত সহস্র-সহস্র অনুলিপি হোক। সমগ্র গৌড়মণ্ডলে তা ছড়িয়ে পড়ুক। যখন আমি থাকব না, আপনার বন্ধুও থাকবে না। তখনও যেন গৌড়বাসী রায়গুণাকরের গুণগান করে। আর সেই প্রসঙ্গে তারা বলবে, এই কবি ছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি।

স্বপ্নময়

রূপেন্দ্র নির্বাক শ্রোতা। ওঁর মনে হল মহারাজ কিছুটা উত্তেজিত। তিনি বললেন, আজ থেকে দু-চারশ বছর পরে এই বিষ্ণুমহল রাজসভার একখানি ইটও হয়তো থাকবে না। বল্লাল সেনের ‘গঙ্গাবাস’, চেকুড়ে ইছাই ঘোষের ‘শ্যামরূপা’র গড়ের মতো তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু জেনে রাখুন: তখনো থাকবে রায়গুণাকরের কাব্য। নবীন যুগের নবীন পাঠকের কাছে কাব্যমাধুর্যে ভরপুর। আমি সেই সূত্রে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাকতে চাই, ঝাঁড়জেমশাই!

রূপেন্দ্র বলেন, কিন্তু ঐ চটুল দৈহিক-মিলন বর্ণনার মধ্যে ভারতের বেঁচে থাকার কী সার্থকতা? ‘অন্নদামঙ্গল’ে কবি নিরম মানুষের সুখ-দুঃখের সার্থক চিত্র ঐকেছেন, ‘বিদ্যাসুন্দরে’ রাজা-রাজড়ার বিলাসবৈভব আর যৌন-মিলন বর্ণনা! অন্নদামঙ্গলই বা বেঁচে থাকবে না কেন?

—ভুলবেন না ভেষগাচার্য, বান্দীকি-বেদব্যাস থেকে কালিদাস পর্যন্ত রাজা-রাজড়ার ছবিই ঐকেছেন, নিরম ভিক্ষাজীবীর নয়। আর ঐ তথাকথিত ‘যৌনমিলন-বর্ণনা’ হচ্ছে নবরসের স্রাবাদিস। শিশুকে যখন তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন তখন কি তাকে মিষ্টানের প্রলোভন দেখান না?

—দেখাই। সে শিশু বলে। প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক শিশু নয়।

—ভুল বললেন। প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক শিশুরও অধম। শিশুর সারল্য আছে, তার সেই গুণটুকুও নাই। সমকাল তাকেই কাঁধে তুলে নিয়ে নৃত্য করে, যার জয়গান করে সমকালীন সাহিত্যবাজারের ক্ষমতাশালীগোষ্ঠী। ভেষগাচার্য! আমার একটি নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাখুন: আজ থেকে দুশ’ বছর পরে যদি কেউ এইকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীপণ্ডিতের জীবনী লিখতে বসে তখন একটিমাত্র লোকের সন্ধান সে পাবে না। কেউ তার জীবনের কথা লেখেনি। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত হারিয়ে যাবে! তিনি কে জানেন? আমার কালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত: বুনো রামনাথ!

—কিন্তু কেন?

—যেহেতু সমকাল তাঁকে স্বীকার করবে না, তাঁর সম্বন্ধে নীরব থাকবে।

—সেটাই বা কেন? শুনি তিনি নবদ্বীপধামের সর্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি!

—কিন্তু তিনি যে ‘লাঙ্গুলহীন’ শৃগাল হতে অস্বীকৃত! জীবনী লেখে কারা? ইতিহাস রচনা করে কারা? বৃত্তিভোগীর দল। রাজা-রাজড়ার অনুগ্রহভোগীর দল। তারা যে এক নিদারুণ হীনমন্যতায় ভুগছে—ঐ বদ্ধ উন্মাদটা তেঁতুল-পাতা সিদ্ধ খেয়ে জঙ্গলে পাড়ে থাকবে তবু ‘লাঙ্গুলহীন’ হতে স্বীকৃত নয়! ঠিক একই কথা আপনার বন্ধুর বিষয়েও। সে ‘ভালই সংস্কৃত’ জানে, তবু কাব্য রচনা করে সাদা বাঙলায়। কী নিদারুণ ধৃষ্টতা! কৃত্তিবাস-কাশীরামের মতো সে চতুর্দশাঙ্করা বস্তির পয়ারে সজ্জ্বল থাকছে না! দ্বাদশাঙ্করা তেটিক বা ভুজঙ্গ-প্রয়াত থেকে পঞ্চদশাঙ্করা তুণক, মালতী, চামর ছন্দে অনায়াসে যাতায়াত করছে—বাঙলায়, সংস্কৃতে নয়। এ কী সহ্য করা যায়? নবদ্বীপে পাড়ায় পাড়ায় কবি—কিন্তু সকলেই রচনা করেন সংস্কৃতে। সাদা বাঙলায় ঐ একজনই—

—কেন মহারাজ? আপনার সভার আর এক জ্যোতিষ্ক—রামপ্রসাদ—

—কবিরঞ্জনও বেঁচে থাকবে, কবি হিসাবে নয়—সুরশ্রুটি হিসাবে, কালীভক্ত হিসাবে। রায়গুণাকরই বাঙলা-ভাষায় একমাত্র কবি। সমকাল তাই তাকে তার প্রাণী মর্যাদাটি কিছুতেই দিচ্ছে

চাইবে না। বেঁচে থাকতে হলে তাকে জীবনীশক্তি আহরণ করতে হবে পাঠকের ভালবাসায়। তাকে জনপ্রিয় হতে হবে।

—কিন্তু জনপ্রিয় হওয়ার মাশুল কি নিরাবরণ দৈহিক মিলন-বর্ণনা?

—যদি যত্ন নিয়ে পাঠ করেন, তাহলে প্রণিধান করবেন—নগ্ন মিলনবর্ণনাকে অতিক্রম করে প্রতিটি ছত্র কাব্যরসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি রাজসিক পাঠক, আমি তো সবটুকু থেকেই রসাস্বাদন করি, আপনি যদি সাত্ত্বিক হন—দৈহিক-মিলন বর্ণনায় যদি অসোয়াস্তি বোধ করেন, তবু আপনাকে স্বীকার করতে হবে, ‘বিদ্যাসুন্দর’—‘পয়ঃকুণ্ড বিবোধমুখম্’! নয় কি?

রূপেন্দ্র নিকুন্তর থাকেন।

রাজা বলেন, বেশ, আমাকে আর একটা কথা বুঝিয়ে বলুন দেখি—রায় গুণাকরের ‘বিদ্যাসুন্দর’ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ মাত্র। এখনো তিনি সম্যক প্রতিষ্ঠা পাননি। অথচ মহাকবি কালিদাস যখন তাঁর ‘কুমারসম্ভবম্’ রচনা করেন তখন তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে। আশা করি স্বীকার করবেন, কাব্যবিচার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আপনার-আমার অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। অর্থাৎ তিনি জানতেন যে, সপ্তম সর্গেই তাঁর সে কাব্য সুসম্পূর্ণ। তাহলে কেন তিনি রচনা করেছিলেন: ‘অথঃ অষ্টম সর্গঃ ॥ পাণিগীড়ণবিধেরনন্তরং শৈলরাজদুহিতুহরং প্রতি.....’

রূপেন্দ্রনাথ কী একটা প্রত্যুত্তর করতে গেলেন। তারপর সহসা নিজেই থেমে যান। রাজা অভয় দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে অমন একটা কথা কি তাঁকে বলা যায়?

তীক্ষ্ণধী নদীয়ারাজ সেটা লক্ষ্য করলেন। স্মিত হাসলেন। বলেন, হ্যাঁ! এবার আপনার অকথিত প্রশ্নের জবাবটা দিই—

রূপেন্দ্রনাথ বিস্মিত। শুরু।

—তার জবাব ভারতচন্দ্রকে আমি ভালবাসি। ‘বন্ধু’ বলে মনে করি। তাই সব জেনেবুঝেও বন্ধুকৃত্য করতে ওটুকু কলঙ্কতিলক ললাটে ধারণ করেছি। স্বেচ্ছায়।

—কীসের কথা বলছেন, মহারাজ? কী কলঙ্ক?

—আপনি তো বলতে চাইছেন—ভবিষ্যৎকাল এ-কথা বলবে যে, রাজাদেশেই ভারতচন্দ্র ‘অমাবস্যার গান’ গেয়েছেন? বলুক তা। স্বয়ং বিক্রমাদিত্যকেও তো আমরা একইভাবে দায়ী করি। বলি, রাজাদেশেই মহাকবি রচনা করেছিলেন: অষ্টম সর্গঃ। স্বেচ্ছায় নয়। তাই নয়?

রূপেন্দ্রনাথ বজ্রাহত হয়ে গেলেন। মনে হল, এ আলোচনাটুকু না হলে তিনি ঐ প্রাচীনপন্থী সংস্কারাচ্ছন্ন নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে ঠিক মতো চিনতে পারতেন না।



আজ রূপেন্দ্রনাথ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করবেন।

ভারতচন্দ্র বলেছিলেন—সপ্তপদ একসঙ্গে হাঁটলে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সপ্তরজনী একই কণ্ঠে যাপন করলে কী হয়, তা খোলাখুলি বলেননি। দুজনেই আদর্শবাদী, সাত্ত্বিক প্রকৃতির, কবিতাবাগ্ন। পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মেছে। দুজনেই দুজনের সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছেন। ভারতচন্দ্র বন্ধুকে শুনিয়েছেন তাঁর জীবন কথা। নোলক-দোলানো এক রাধার আহ্বানে কিশোর কৃষ্ণ শুরু করেছিলেন বাগদেবীর আরাধনা।

কৃষ্ণনগর

বসন্ত সেটাই তাঁর জীবনে প্রথম সরস্বতী পূজা। তার পূর্বেও অঞ্জলি দিয়েছেন—কিন্তু পুরোহিত হিসাবে নয়। এও এক ‘বিপরীত’ কাণ্ড! কৃষ্ণের বাঁশরী শুনে রাধা ছুটে আসেননি—রাধার বাঁশরী-তানে কিশোর পণ্ডিত এলেন বাণীমন্দিরে।

শুরু করলেন সারস্বত আরাধনা! সে জন্য ভর্তুকি হয়েছেন গুরুজনদের কাছে—দাদা, বাবা, কে নয়? তাঁরা যে চেয়েছিলেন উনি ফারসী শিখুন, সংস্কৃত নয়। তার উপর এই দুঃসাহসিক গোপন বিবাহ! তিরস্কৃত কিশোর গৃহত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন দেবানন্দপুরে। পরে বর্ধমানরাজের বন্দীশালা। সেখান থেকে পলায়ন, পুরীধামে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা, প্রত্যাবর্তন, ফরাসডাকায় অন্নসংস্থানের প্রচেষ্টা। শেষমেশ নৌকা ভিড়িয়েছেন নদীয়ারাজের ঘাটে। রাজ্যদেশে আজ গাইছেন—‘অমাবস্যার গান’। শ্রোষিতভর্তৃকা রাধা আজও বিরহযন্ত্রণা ভোগ করছে পিণ্ডালয়ে। প্রায় অনাহারে।

রূপেন্দ্রও শুনিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতা। মৃণ্ময়ীর অনুরাগের কথা গোপন করেছেন, কিন্তু কুসুমমঞ্জুরীর আদ্যন্ত ইতিহাসটি মেলে ধরেছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ‘বিদ্যাসুন্দর’ সম্বন্ধে আলোচনার কথাও সবিস্তারে জানিয়েছেন। ভারত কোন প্রত্যাশার করেননি। নির্লিপ্ত উদাসীনতায় শুধু শুনে গেছেন।

ভারত বললেন, তোমার সময় কম। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের অনেক-অনেক কিছু অদেখা রয়েছে। শান্তিপুরে যাওনি, মায়াপুরেও নয়....

বাধা দিয়ে রূপেন্দ্র বললেন, সেসব পরে আর একবার এসে দেখব। সঙ্গীক। মঞ্জুর ইষ্টদেবতা হচ্ছেন শ্রীগৌরঙ্গ মহাপ্রভু। তাকে বঞ্চিত করে একা-একা সেই ঠাকুরের কীর্তি-কাহিনী দেখে যাওয়া কি ঠিক?

ভারত সকৌতুকে বলেন, একেই বলে ‘নিকষিত হেম’! আদর্শ প্রেম!

রূপেন্দ্র ক্রোধে ওঠেন, বটে! তাহলে তুমি মহারাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে না কেন? মহারাজ তো আমাদের দুজনকেই মধ্যাহ্ন-আহারে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন? তুমি তোমার কী এক ব্রতের ছুতো করে বাড়িতে পড়ে রইলে! কেন?

—কেন? তুমি কী ভেবেছ? কেন আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি?

রূপেন্দ্র বলেন, ভারত, ‘অন্নদামঙ্গলে’ ভিক্ষাজীবী শিব একবার মনের দুঃখে মা অন্নপূর্ণাকে বলেছিলেন, ‘মাধ হয় একদিন পেট ভরে খাই।’ মনে আছে? সে সময় যদি কেউ একা শিবকে নিমন্ত্রণ করত তাহলে তিনি কী করতেন? ‘পঞ্চরঙ অপলাম’ ভোজ খেতে ছুটতেন? না! তাঁর মনে পড়ত, তেজপুর গাঁয়ে শ্রোষিতভর্তৃকা সীমন্তিনী অন্নপূর্ণা হয়তো কন্দমূল চিবিয়ে ক্ষুধিবৃত্তি করছে।

ভারত ম্লান হেসে বলেন, তোমার কাছে অস্বীকার করব না, বন্ধু! তোমার কল্যাণে ও কয়দিন রাজবাড়ি থেকে কাঁচা-সিঁদে আসছে, ভোলা ভালমন্দ রান্নাও করছে। কিন্তু ঠিক ঐ কারণে তা আমার মুখে রোচে না। যা হোক, তাহলে শ্রীগৌরঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখতে সঙ্গীক কবে আবার আসবে?

—যবেই আসি, সেবার তো কবি ভারতচন্দ্রের অতিথি হবো, তোমার কী?

ভারতচন্দ্র একেবারে সাদা হয়ে যান। বলেন, মহারাজ বুঝি আগাম নিমন্ত্রণ করে রেখেছেন?

—না! কিন্তু সস্ত্রীক এলে তো কোনও প্রোষিতপত্নীকের ভদ্রাসনে আশ্রয় নিতে পারব না। তাই আশা করব, আমার অন্য এক বন্ধু তখন এখানে সস্ত্রীক বাস করবে—তার গৃহেই আতিথ্য নেব। আমার সেই বন্ধুটির নাম—শ্রীরাধানাথ রায় গুণাকর।

ভারত হেসে বললেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! তোমার বিবাহে আমি উপস্থিত থাকতে পারছি না। কিন্তু আমি ব্যয়োজ্যেষ্ঠ—বন্ধু হলেও। সেই অধিকারে আশীর্বাদ করি তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক। তুমি যে পত্নীপ্রেম দেখালে...

বাধা দিয়ে রূপেন্দ্র বলেন, পত্নীপ্রেম! বিবাহ না হতেই আমার কী পত্নীপ্রেম দেখলে হে?

ভারত হেসে বলেন, এটুকুও যদি না বুঝি তবে বৃথাই আমার কবির অভিমান!

—এটুকুও! কোন্টুকু?

—শান্তবংশের সন্তান কেন তার আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করে আজ নিরামিষাশী হয়ে গেল। মাত্র পঞ্চকাল পূর্বে!

এবার রূপেন্দ্রর স্বীকার করার পালা, বলেন তুমি ঠিকই বুঝেছ। আমি মনে করি, দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। স্ত্রী শুধু স্বামীর সহধর্মিণী নয়, স্বামীকেও হতে হবে স্ত্রীর সহধর্মী। তার পক্ষে এই বয়সে আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়ার চেয়ে সহজতর সমাধান আমার নিরামিষাশী হয়ে যাওয়া।

ভারত বলেন, দেখ রূপেন্দ্র, তুমি অবিলম্বে সস্ত্রীক নবদ্বীপধামে তীর্থ করতে আসবে বলেছ, কিন্তু ভাগ্যের কথা কিছুই বলা যায় না। রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন। নবাব আলিবর্দীর বয়স হয়েছে, তিনি অপুত্রক। গদী নিয়ে যে কোন সময় লড়াই বাধতে পারে। হয়তো তোমাতে-আমাতে আর কখনো দেখাই হবে না। তাই—তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি তোমার-আমার বন্ধুদের একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিতে চাই। যাতে আমার কথা তোমার বারে বারে মনে পড়ে যায়। তোমার বিবাহে এই দীন কবি আর কী উপহার দিতে পারে বল?

—কী উপহার? শুনি আগে।

—মদনারিরিপুর আশীর্বাদে তোমাদের মিলন সার্থক হবেই। সেই অনাগত মানবশিশুটির নামকরণ আমি করে দেব। তাকে যতবার ডাকবে ততবারই আমার কথা মনে পড়ে যাবে।

—এ তো খুবই আনন্দের কথা। কবির দেওয়া নাম। বল? কী নাম?

—তোমার পুত্রের নাম দিও: 'আত্মদীপ'!

—আত্মদীপ?

—হ্যাঁ। তুমি বিবেকের নির্দেশে পথ খুঁজে এগিয়ে চলতে চাও। মহাকাব্যিক গৌতম বুদ্ধের সেই শেষ নির্দেশটিই তোমার জীবনের মূলমন্ত্র—আত্মদীপো ভব!

রূপেন্দ্র হেসে বললেন, বন্ধু! তুমি অপূর্ব নামকরণটি করেছ। আমার পুত্রসন্তান হলে নিশ্চয় তার নাম দেব: 'আত্মদীপ'; কিন্তু তুমি কট্টর স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো এ পরামর্শ দিলে; ঠিক কবির মতো নয়।

—কবির মতো নয়? কী ক্রটি হল আমার?

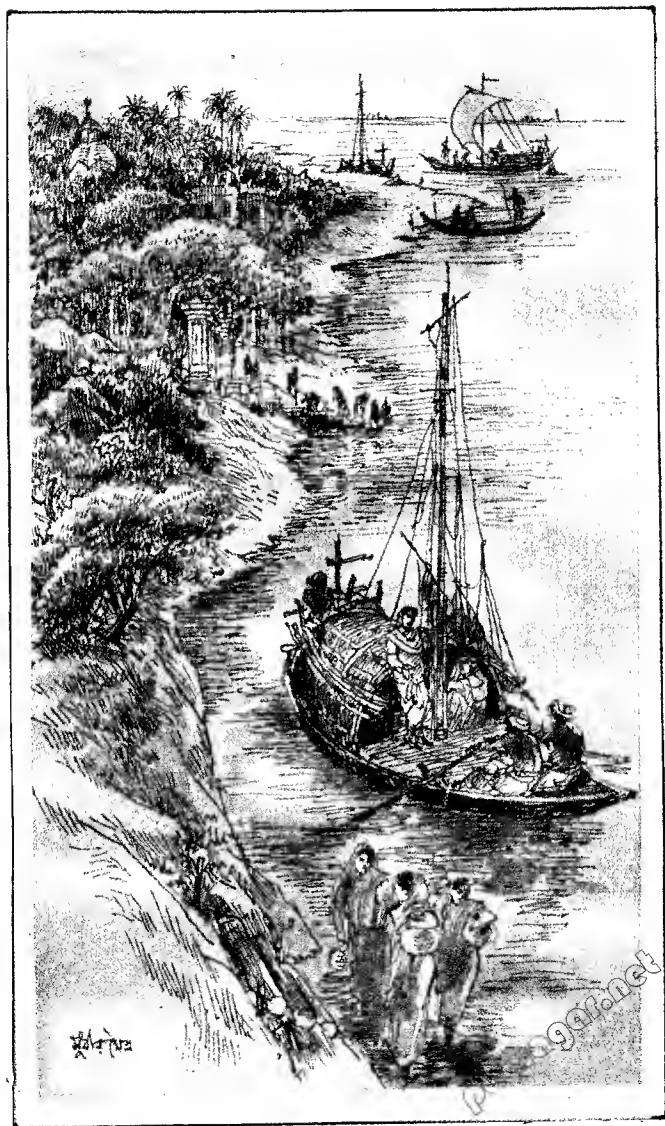
—তুমি কবি হিসাবে বিস্মৃত হয়েছ—এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগতের অধিকার একা পুরুষের নয়। এ বিবাহ সার্থক হলে আমার কন্যা-সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশভাগ।

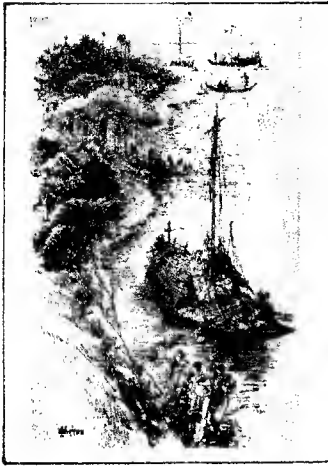
হুমুসন

ভারত বললেন, ঠিক কথাই বলেছে বন্ধু! পুত্রের নাম করেছিল কটর পণ্ডিত; এবার কন্যার নামকরণ করবে—কবি। রাপেদ্রনারায়ণ আর কুসুমমঞ্জরীর যৌথ মনসিজ-সাধনার ফলশ্রুতি যদি কন্যারূপে আবির্ভূত হয়, তবে তার নাম হোক: রূপমঞ্জরী!

—রূপমঞ্জরী! বাঃ! সুন্দর নামটি!







তীর্থের পথে

1742

চতুর্থ পর্ব

সূর্য এখন কুস্তরাশিতে।

রাপেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক এসেছেন শহর বর্ধমানে। কুসুমমঞ্জরী এখনো নববধূই। মাত্র দুইমাস পূর্বে বিবাহ হয়েছে তাদের। যে

আমলের কথা, তখন ‘মধুচন্দ্রমা’ শব্দটা অভিধানে ছিল না। বাঙলা ভাষার অভিধান তখনো জন্মানি, সংস্কৃততেও শব্দটার ব্যবহার নাই। বিবাহের অব্যবহিত পরে এই সস্ত্রীক দেশভ্রমণের তিনটি হেতু। কোনটি মুখ্য তা নির্ণয় করা কঠিন। যেটি স্বীকার করে নেওয়া শোভন, সেটিকেই সর্বাত্মে লিপিবদ্ধ করি:

যেভাবে দুর্গাচরণ একদিন বিবাহের ঠিক পূর্বে কাপেন্দ্রের কাছে নিয়ে এসেছিলেন নবদ্বীপ পরিদর্শনের প্রস্তাব, প্রায় অনুরূপ প্রস্তাব নিয়ে একদিন হাজির হলেন নন্দদুলাল চাটুজ্জে। তাঁর বড়কর্তা, অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ দত্ত-মশাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, ভেষগাচার্য যেন একবার তাঁর ভদ্রাসনে পদধূলি দেন। বর্ধমানে।

নগেন্দ্রনাথ বর্ধমানের একজন অত্যন্ত ধনী গৃহস্থ। বর্ধমানভুক্তির প্রধান ইজারাদার। রাজ-সরকার কর্তৃক নিয়োজিত রাজস্ব আদায়ের দালাল। বিশাল এলাকায় তাঁর কর্মক্ষেত্র। নন্দ-খুড়ো তাঁর তরফে সোণাই গ্রাম-সংলগ্ন পঞ্চগ্রামের উপ-ইজারাদার। নগেন্দ্রের বয়স অনুমান পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। শহর বর্ধমানের কবিরাজ এবং হাকিমের দল হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য তার পূর্বে ঝাড়-ফুক, তাবিজ-কবচ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের যাবতীয় পর্যায় পাড়ি দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী স্বর্গলাভ করেছেন বছর-দুয়েক—তিন-চারটি সন্তান রেখে। ছোটটি নেহাৎ দুগ্ধপোষ্য না হলেও বালকমাত্র। তাই বাধ্য হয়ে দত্তমশাইকে এই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু কী দুর্দৈব, বৎসরখানেকের ভিতরেই নববধূর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। দত্তজা নিতান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—খরচ করতে পিছপাও নন। নন্দখুড়োর মুখে ভেষগাচার্যের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

সোপাই

রূপেন্দ্রনাথ এককথাতেই সম্মত হয়ে গেলেন।

তাঁর ইচ্ছা ছিলই—বিবাহের পর একবার ত্রিবেণী যাবেন। গুরুদেবকে সঙ্গীক প্রণাম করে আসবেন। তাছাড়া মঞ্জুকে নিয়ে নবদ্বীপ, শান্তিপুরে তীর্থ সেরে আসবেন। ভারতচন্দ্রের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আরও একটা হেতু ছিল। সেটি বেদনাবহ এবং কৌতুকের।

রূপেন্দ্রনাথের ভদ্রাসনে একটিই শয়নকক্ষ। যে কক্ষে পূর্বযুগে শয়ন করতেন ঠাঁর পিতৃদেব—সৌরীন্দ্রনাথ। ইদানীং সেটি ছিল জগুঠাকরুণ আর কাতুর যৌথ অধিকারে। রূপেন্দ্র রাত্রিবাস করতেন বার-বাড়িতে, যা সেকালে ছিল চতুপাঠী, বর্তমানে গৌরবে ঠাঁর বৈঠকখানা। এ-ছাড়া প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আরও দুটি ছোট ছোট একচালা আছে—ঠাকুরঘর এবং পাকশালা। রূপেন্দ্রের বিবাহের প্রায় সমসময়েই কাতুর জন্য একটি পৃথক কামরার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। জগুঠাকরুণের সঙ্গে রাত্রিবাস করা আর তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সম্ভবপর হয়তো, বাঞ্ছনীয় না। গঙ্গাচরণ রুগী হিসাবেই এসে আশ্রয় নিয়েছিল বটে, কিন্তু এতদিনে তাকে চিনে ফেলেছে সবাই। জগুঠাকরুণ বাস্তুচ্যুত হয়েও উচ্ছ্বসিত! মেয়ে-জামাইকে এক সাথে পাবেন, এ আশা ছিল না তাঁর।

তা যেন হল, কিন্তু এই ‘ঠাই-নাই’ ভদ্রাসনে দু-জোড়া নবদম্পতির রাত্রিযাপনের কী আয়োজন করা যায়? স্বীকার্য, কাত্যায়নীর বিবাহ হয়েছে পূর্বদশকে; কিন্তু নারীজন্ম যে তার সার্থক হয়েছে এই সপ্তাহেই। জগুপিসি একটা সহজ সমাধান দাখিল করতে গিয়ে ভাইপোর কাছে ধমক খেয়েছেন। আরোগ্য-নিকেতনের জনশূন্য কক্ষগুলির সঙ্গে এ সমস্যার সম্পর্ক নাকি বায়স ও পক্শীফলের।

বৈঠকখানা ঘরটি বার-মহলে, বে-আবু, ফলে সমস্যাটার সমাধান হয়নি।

তোমরা যদি বল, ‘বাপু হে লেখক! তোমার ঐ নলচের আড়াল দেওয়ায় কিছুই ঢাকা পড়ছে না। যা বোঝার তা আমরা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। ‘মধুচন্দ্রমা’ শব্দটা অভিধানে থাক না থাক, যুগলে গুরুপ্রণাম করার অছিলাটা যতই তীব্র হোক, আমরা বুঝে নিয়েছি, কোনটা মুখ্য হেতু—তাহলে আমি প্রতিবাদ করব। আমার বিরুদ্ধ-যুক্তিটাও শোন, তারপর রায় দিও। তাই যদি হবে, তবে রূপেন্দ্র কেন জগু-পিসিমাকে বলবেন, আপনিও চলুন না পিসিম, তীর্থ-দর্শন করে আসবেন?

পিসিমাই রাজি হননি। বোধকরি তাঁর আশঙ্কা ছিল, গঙ্গাচরণ দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে। সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কাতু মুখপুড়ির হাতে ঐ যে শাঁখা-খাড়ু বজায় আছে তার হেতু—নিদারুণ দুঃসংবাদটা এ গায়ে এখনো এসে পৌঁছায়নি। মেয়ে-জামাই পেয়ে তাঁর তীর্থদর্শনের বাসনাটা উপে গেছে।

এবার তোমরাই বল: মধুচন্দ্রমায় কেউ বুড়ি পিসিকে সঙ্গী হতে ডাকে?

জীবন ঠাঁর রুগীদের দেখভাল করার দায়িত্ব নিয়েছে।

রূপেন্দ্রের বিবাহও এক এলাহী কাণ্ড!

ভেষগাচার্য বৈদ্যবিদ্য গ্রহণ করেননি। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আরোগ্যনিকেতন বানিয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন ভরেনি। এবার তাঁর পালিতা কন্যার বিবাহে তিনি যদি এলাহী

কাণ্ড করেন, তাহলে রূপেন্দ্রর কী বলার থাকতে পারে?

ফুলশয্যার রাত্রে ঘটল একটি কৌতুকের ঘটনা। এটাও বেদনাবহ!

রূপেন্দ্রর ভদ্রাসনে সেই একমাত্র শয়নকক্ষেই জোড়াপালঙ্কে ফুলশয্যার আয়োজন। কাতায়নী, মৃন্ময়ী আরও পাঁচ এয়া এসে ফুলে-ফুলে সাজিয়েছে ঘরখানা। কনেকে সাজিয়েছে কাতু, বরকে মীনু। নির্দিধায়। গালে-কপালে চন্দন-ফেঁটা নেব না বললে শুনছে কে? পাকস্পর্শ আর ফুলশয্যা একই দিনে। নিমজ্জিতদের বিদায় করতে করতে রাত প্রায় তৃতীয় যামের দিকে ঢলে পড়তে চলেছে।

সব মিটিয়ে রূপেন্দ্র যখন শয়ন করতে এলেন তখন বাঁড়ুজ্জবাড়ি নিস্তন্ধ। নিমজ্জিতরা ফিরে গেছে যে-যার বাড়ি। জগু-পিসি শুয়ে পড়েছেন। গঙ্গাচরণও। কাতুকে কোথাও দেখতে পেলেন না। একাই প্রবেশ করলেন শয়নকক্ষে। পালঙ্কের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন।

বার্লাক-রক্তিম বিক্রমপুরী খাসা-মসলিন, উর্ধ্বাঙ্গের উচ্ছ্বাস দৃঢ়নিবন্ধ কঞ্চলিকায় সংহত, স্তবকিত জলদ-সস্তারের মতো কবরীগুচ্ছে পুষ্পস্তবক অনুবিন্দ। সীমন্তের মধ্যভাগে সৌভাগ্যস্মারক রক্তিমাতা। অলস্তকরাগরঞ্জিত রাতুল চরণে কলহংসকণ্ঠনিঃস্বনমধুর নূপুর।

রূপেন্দ্র সেদিকে এক পদ অগ্রসর হতেই মেয়েটি মুখ তুলে তাকায়। চম্পকাসুলি স্পর্শ করায় ওষ্ঠাধরে। রূপেন্দ্র বিস্মিত। তখনই নজর হল, নববধূ তর্জনীসঙ্কেতে কী যেন দেখাচ্ছে। পরমুহুর্তেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কক্ষের অপরপ্রান্তে স্তূপাকার করা কিছু শয্যাশ্রব্য—লেপ-তোষক-কম্বল-বালিশ। তার একটি পুঁটুলি সন্দেহজনক। বোঝা গেল, কেন এতক্ষণ কাতুকে খুঁজে পাননি।

ধরা পড়ে বেচারি নিতান্ত অপ্রস্তুত। রূপেন্দ্র বলেন, তুই এখানে! ওদিকে গঙ্গা তোকে সারা বাড়ি গুরু-খোঁজা খুঁজছে।

কাতু বলে, বৌরানী ধরিয়ে না দিলে দেখতাম—

কী দেখত, তা আর বলে না।

রূপেন্দ্র ওকে বিতাড়িত করে ফিরে এলেন। কক্ষদ্বার অর্গলবন্ধ করতে ভোলেননি।

এবার পালঙ্ক থেকে অবতরণ করল নববধূ। গলায় আঁচল দিয়ে নামিয়ে রাখে একটি সলজ্জ প্রণাম। রূপেন্দ্র ওকে বাহুমূল ধরে তুলে ধরেন। বলেন, সারাদিন খুব ধকল গেছে, নয়? খুব ঘুম পেয়েছে তো?

নববধূ শিরশ্চালনে নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করে। আর তাতেই, কী জানি কেন, লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়।

রূপেন্দ্র ওকে পালঙ্কে বসিয়ে দেন। বলেন, সেই জিনিসটা কোথায়? সেই সেদিন যেটা তোমাকে দিয়েছিলাম?

মঞ্জুরী নতমস্তকে বললে, সে কথা আজ নয়।

বটেই তো! আজ সব মধুময়। ‘বিব’-এর প্রসঙ্গ আজ নয়। এই ‘মধুনক্তম’-এও কথা তোলাই উচিত হয়নি তাঁর। তবে নাকি পেশায় কবিরাজ, নিরাপত্তার কথাটা ভুল করতে পারেন না। এবার প্রসঙ্গান্তরে আসেন, এই একপক্ষকালে কী বিচিত্রভাবে বদলে গেল তোমার জীবনটা!

নববধু নতনেত্র বললে, সে তো আপনারও!

তা বটে! সংসারে জড়িয়ে পড়লেন। বলেন, সম্প্রতি নদীয়া গিয়েছিলাম। শুনেছ?

—শুনেছি! সোনার গৌরাঙ্গ দেখে এসেছেন?

রূপেন্দ্র তখনই জানালেন না যে, তা তিনি দেখেননি। যুগলে দেখবেন বলে। বরং বলেন, তুমি আমাকে ‘আপনি’ বলছ কেন? এতদিন যা বলেছ, বলেছ; কিন্তু অগ্নিসাক্ষী করে যখন তোমাকে সহধর্মিণী করেছি
—আপনি কতবড় পণ্ডিত!

—তোমার কাছে কি সেটাই আমার পরিচয়?

মুখটা লাল হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে নেতিবাচক ভঙ্গি করে।

—তাহলে? আমাকে ‘তুমি’ই বলবে। অন্তত নির্জনে। বড়-মা যেমন বলেন।

হয়তো এটা ওর অজ্ঞাত তথ্য। রূপেন্দ্র সেটা কীভাবে জেনেছেন তাও জানতে চাইল না। দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, সে আমি পারব না। কিছুতেই না। আপনি কত বড়!

—ও! কিছুতেই পারবেন না! তাহলে আর কী উপায়? আমি বিশ্বাস করি, সব বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার। ঠিক আছে, জোর-জবরদস্তি করা আমার স্বভাব নয়। আপনি আমাকে তাহলে ‘আপনি’ বলেই কথা বলবেন।

কুসুমঞ্জরী অবাক বিষ্ময়ে কিছুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, আপনি অমন করছেন কেন? আমার কী দোষ হল?

—কেমন করছি? আপনার দোষ হয়েছে, তা তো বলিনি।

—না, মানে আপনি আমাকে ‘আপনি’ বলে কথা বলছেন কেন?

—সে কথাই তো বলছি এতক্ষণ। দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রীকে থাকতে হবে একই সমতলে। আপনি যখন আমার সমতলে নামতে পারছেন না, তখন আমিই আপনার সমতলে উঠে আসি।

এবার দৃঢ়ভাবে মেয়েটি বলল, ছি ছি! তা কিছুতেই হবে না! আপনি আমাকে ‘আপনি’ বললে না, না, সে কিছুতেই হবে না।

রূপেন্দ্র ছদ্ম গাভীরে বলেন, তাহলে তো একটিই বিকল্প—বাক্যালাপ বন্ধ করা। আজকের এই শুভরাত্রে সেটাই কি আপনার প্রস্তাব?

কুসুমঞ্জরীর প্রায় কৈদে ফেলার উপক্রম। মাথা নিচু করে বলে, বেশ, আপনি যেভাবে বলতে বলছেন সেভাবেই বলব

—‘আপনি যেভাবে বলতে বলছেন!’ —আপনার পূজ্যপাদ পরমপতি কীভাবে বলতে আদেশ দিয়েছেন?

দুহাতে মুখ ঢেকে কুসুমঞ্জরী বললে, তুমি ভারী ‘ই—য়ে’!

—‘কিয়ে’? —রূপেন্দ্র এবার ওকে দুই বাহুমূল ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। এটা বোধকরি প্রত্যাশিত। নববধুর দেহ কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়, চোখ দুটি আবেশে মুদে আসে। রূপেন্দ্র ঐ চুশনতৃষিতার দিকে মুখটা নামিয়ে আনার মুহূর্তেই বাধা!

পালঙ্কের নিচে থেকে ভেসে এল এক অস্বুট আতর্জনাক!

চমকিত রূপেন্দ্র এক লাফে নেমে পড়েন পালঙ্ক থেকে। ঘৃত-প্রদীপটা জ্বলছিল পিলসুজের উপর। সেটি হাতে তুলে নিয়ে পালঙ্কের নিচে দৃষ্টিপাত করলেন।

অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। বাস্ক-পেটরার অন্তরালে মৃন্ময়ী বসে ছিল ঘাড় ঝুঁজে, এতক্ষণে প্রায় শুয়েই পড়েছে।

দুজনে কোনক্রমে বার করে আনলেন উৎসবসজ্জিতা সীমন্তিনীকে। যন্ত্রণায় যেন বিকৃত হয়ে গেছে মীনু। রূপেন্দ্র ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে মীনু? যন্ত্রণা হচ্ছে?

—হুঁ!

—কোথায়? পেটে?

গ্রীবাভঙ্গিতে স্বীকার করে।

কী অন্যায়! কী অপরিসীম অন্যায়! কৌতুকের একটা সীমা থাকবে তো? পূর্ণগর্ভা একটি রমণী—প্রথম সন্তানবতী হতে চলেছে—ঐ সঙ্গীর্ণ স্থানে ...

রূপেন্দ্র মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তিলমাত্র ইতস্তত করলেন না। এ মুহূর্তে তিনি বর নন, পুরুষ নন, ভেষগাচার্য। নির্দিধায় একটি হাত রাখলেন ওর যুথিপুষ্পঅনুবিদ্ধ কবরীগুচ্ছে, অপর হাত জানুঘরের নিচে। অবলীলাক্রমে ভূশয়া থেকে উঠিয়ে তাকে শুইয়ে দিলেন পালঙ্কে।

ছি, ছি, ছি! কেন মৃত্যু হল না সেই মুহূর্তে? যে ফুলশেষ সে সারাটা দিন ধরে সাজিয়েছে তার উপরেই তাকে কোলপাঁজা করে শুইয়ে দিলেন সোনাদা। আর তাঁর মঞ্জু পালঙ্ক থেকে নেমে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিতরিতা দুয়ারানী! মৃত্যু না হক, জ্ঞান হারালো না কেন? কিন্তু জ্ঞান হারালে কি প্রতিবর্তী প্রেরণায় সেও আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ধরত ঐ সোনার গৌরাসককে।

কোনক্রমে বললে, না-না-না! আমাকে নামিয়ে দিন! এ বিছানায় আমার শুতে নেই।

—চুপ কর তুমি! কথা বল না।

কুসুম অফুটে বলে, দোর খুলে দেখব? ঠাকুরঝিকে ডেকে আনব?

—না! আগে আমাকে বুকে নিতে দাও!

এ কী! এ কী! এ কী করছে সোনাদা? ওর কি মায়া, মমতা, হায়া-কায়া কিছু নেই?

রূপেন্দ্র তিলমাত্র ইতস্তত করলেন না। রোগিণীকে শুইয়ে দিয়েছেন। সবার আগে জানতে হবে গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃদস্পন্দন শোনা যাচ্ছে কি না—তার কিছু ক্ষতি হয়েছে কি না। তাঁর সেই আজব যন্ত্রটা এই মুহূর্তে কোথায় আছে জানেন না। উৎসবগৃহে সবকিছুই লগ্নভণ্ড হয়ে আছে।

দু-হাতের দশটি আঙুলে—যেন একাজে কতই অভ্যস্ত—উন্মোচন করে দিলেন ঐ পরস্কীর নীবিবন্ধের গ্রন্থী। অনায়াসে অনাবৃত করে দিলেন শায়িতা মেয়েটির উদরদেশ। শাড়িটা নামিয়ে দিলেন অনেকটা—কুসুমমঞ্জরীর দৃষ্টির সম্মুখে—শ্রায় সেই সঙ্গোপন উপত্যকায় ঐ কালিদাস বলেছেন, “নতনাভিরঙ্ঘ্য ররাজ তবী নবরোম রাজি। নীবীমতিক্রম্য সিত্তেতরস্য...”

মৃন্ময়ী বাধা দিতে পারল না। সে যেন পাথরপ্রতিমা! কণ্ঠে তার স্বর ফুটল না। রূপেন্দ্র সেই অনাবৃত নিম্ন-উদরে চেপে ধরলেন তাঁর কান। গাভীর গলকন্ডলে হস্তস্পর্শ করলে তার দেহ যেভাবে থরথর করে কঁপে ওঠে সেভাবেই কঁপতে থাকে মৃন্ময়ীর রৌমাঙ্কিত বিবশ তনুদেহ।

অনেক-অনেকক্ষণ পরে রূপেন্দ্র মাথাটা তুললেন। শাড়িটা টেনে দিলেন স্বস্থানে। বললেন, একদম নড়াচড়া করবে না। বাচ্চাটা ঠিক আছে।

হাসবে না কাঁদবে মৃন্ময়ী ভেবে পেল না। লজ্জা, বেদনা, আনন্দ কোন অনুভূতি কাকে ছাপিয়ে উঠেছে তা যেন ওর বোধসীমার বাহিরে! রূপেন্দ্র নববধূকে বললেন, ঐ কলসীতে জল আছে। ওর মুখে-চোখে ছিটিয়ে দাও। আমি দেখছি, কাতুকে ডেকে আনতে হবে।

রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েই দেখেন, সেখানে কাতু আর শোভারানী। ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখে কাত্যায়নী সশঙ্ক কণ্ঠে বলে, কী হয়েছে দাদা?

—তারা খুব অন্যায় করেছিস! ওকে কি এখন ঐ ভাবে পালঙ্কের তলায় ঢুকিয়ে দিতে হয়? ভাগ্যক্রমে হয়নি কিছু, কিন্তু হতে পারত।

—মীনু কি ওকে কি

—না! ওকে ঠাইনাড়া করা চলবে না। যেমন আছে তেমনই থাক। মীনু আর মঞ্জু পালঙ্কে শোবে। আমার জন্য একটা মাদুর নিয়ে আয়।

কাতু মাথা ঝাঁকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, তা হয় না! কিছুতেই না! মা টের পেলে ...

রূপেন্দ্রনাথ চাপা গর্জন করে ওঠেন, ধেড়ে বয়সে মার খাবি? যা বলছি কর। ওকে ঠাইনাড়া করা চলবেনা তিন-চার ঘণ্টা।

তারপর শোভারানীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, বাড়িতে কী বলে এসেছ? কতরায়ে ফিরবে? পাল্কি আছে?

—না। বাবা-মশাই জানেন, আমরা কাল সকালে ফিরে যাব। তখনই পাল্কি আসবে।

—ঠিক আছে। শোন! তুইও শোন কাতু আজ রাতে এ ঘটনার কথা যেন কাকপক্ষীতে টের না পায়। আমরা তিনজনেই থাকব এ ঘরে। আমাদের একটা মাদুর এনে দে শুধু।

শোভা জানতে চায়, ছোট-মার কিছু হয়নি তো? ওঁর পেটের ...

—না। হতে পারত, হয়নি। হতে পারে, এখনো নড়াচড়া করলে—

মৃন্ময়ী দুটি হাত জোড় করে বললে, রূপোদা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দিন ... এ আমি পারব না, কিছুতেই পারব না!

রূপেন্দ্রকে প্রত্যুত্তর করতে হল না। তাঁর পাশ থেকে শোভারানীই তাঁর হয়ে জবাব দিল। সে জবাব ক্ষুরধার—কেটে কেটে বসে: পারবেন, ছোট-মা! এমন নরম ফুলশয্যে একটা রাত কাটাতে পারবেন না? পারবেন। আর মাদুরেরই বা কী দরকার? এড়াএড়ি করে শুলে সোনাদা দুজনকে দুপাশে নিয়েই পালঙ্কে শুতে পারবেন।

সহজ-সরল সমাধান! অশোভন বা অশালীন কোন বক্রোক্তি নেই!

কিন্তু মৃন্ময়ী যেন একেবারে সাদা হয়ে গেল। বিকৃত হয়ে গেল মুখটা। দাঁত দিয়ে নিচেকারি ঠোঁটটা এত জোরে কামড়ে ধরেছে যে, রক্ত ফুটে ওঠার উপক্রম।

রূপেন্দ্র বলেন, কী হল? আবার যন্ত্রণা শুরু হল? পেটে?

কী জবাব দেবে হতভাগী? উদরদেশে নয়, অপরিসীম যন্ত্রণাটা যে ওর বুকে। শোভারানী জেনে-বুঝে দু-পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেল ওর হৃৎপিণ্ডটা। সরল সমাধানের অহিলায় গরল উদ্দীর্ণ!

তা বটে। ভুলটা রূপেদ্রনাথের। ভুলের মাশুল দিতে হবে বৈকি! ফুলশেয়ের রাতে সবার আগে যে নববধূর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন একটি নিষিদ্ধ বস্তু! সেটাই এতক্ষণে ফেরত দিল শোভারানী।

কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই বিবোধগার? কুলীনঘরের ঐ অরক্ষণীয়া কাকে দংশন করতে চায়? নববধূ না ছোট-মা? অথবা কে জানে, হয়তো তার মূল লক্ষ্য ছোট-মার ঐ আদরের ‘সোনাদা’—সেই আগুনবরণ ছেলোটো যে, চোখে না দেখেই নাকচ করেছিল এক অরক্ষণীয়াকে, চিরকুমার থাকার অছিলায়!



নগেন দত্ত শহর-বর্ধমানের একজন অত্যন্ত ধনী-ব্যক্তি। প্রথম যুগে ছিলেন বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের অধীনস্থ নায়েব কাননগো, বর্তমানে ইজারাদার।

বোধকরি কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন—ঐ নতুন দুটি শব্দের: ‘বঙ্গাধিপতি’ আর ‘কাননগো’।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বংগাল-বিহার মূলক-এর শের-এ-হিন্দ মুগলদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শাসনদণ্ড। মাত্র পাঁচবছর তিনি ছিলেন দিল্লীশ্বর। তার ভিতরেই বানিয়েছিলেন—শাহী-সড়ক: গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড। শেরশাহ শূর! আর তার ভিতরেই প্রবর্তন করেছিলেন রাজস্ব আদায়ের মূল কাঠামোটো, অন্তত এই বঙ্গদেশে। আকবর বাদশাহ্ ক্ষমতায় ফিরে আসার পর সেই খসড়া-নকশায় রঙতুলি বোলালেন। মূল রূপকার রাজা তোডরমল্ল। তিনি 1582 খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভূমির যাবতীয় ভূস্বামীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গোটা রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের একটা সুবন্দোবস্ত করলেন। সমগ্র বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা হল উনিশটি ‘সরকারে’ এবং প্রায় পৌনে সাত শতটি ‘পরগণায়’। বিভিন্ন ভূস্বামীর প্রদেয় রাজস্বের পরিমাণ সুচিহ্নিত হল। মোট পরিমাণ: এক কোটি সত্তর লক্ষ সিকা টাকা। জমির মাপ, নকশা, পরিমাণ, মালিকানা চিহ্নিত করা হল। ঐ সঙ্গে প্রতিটি ভূখণ্ডের জন্য ‘তোমরা-জমা, খালসা, আবওয়াব’ প্রভৃতির পরিমাণ। সে নথীপত্র পর্বতপ্রমাণ। পরগণায় পরগণায় নিযুক্ত হল আমিন, নকশানবীশ, কাননগো। এক এক ‘সরকারে’ সব কয়জন কাননগোর কাজ দেখভাল করার জন্য এক একজন নায়েব-কাননগো। আর সবার উপরে প্রধান কাননগো। অসীম প্রতিপত্তি তাঁর। সমগ্র রাজ্যের আদায়-তহশিল, মালিকানা তাঁর নখাগ্রে।

তোডরমল্ল স্বয়ং থাকতেন রাজধানীতে। তাঁর ওরফে গোটা বঙ্গদেশের হক-হিসাব যিনি দেখতেন, তাঁর নাম ভগবান রায়। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে খাজুরডিহি গ্রামে তাঁর জন্ম। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, মিত্রবংশসম্ভূত। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁর সুনিপুণ কর্মদক্ষতায় সমুদ্র হয়ে রাজা তোডরমল্লের সুপারিশে তাঁকে ‘বঙ্গাধিপতি’ খেতাব দেন বাদশাহ্ আকবর। এই সময় তাঁর সদর দপ্তর ছিল মালদহ জেলার শিবগঞ্জ পুখুরিয়ায়। সেখানে নাকি সেই কাছারি-বাড়ির ধ্বংসস্তুপ এই শতাব্দীর প্রথম পাদেও দেখা যেত।

বর্ধমান

ভগবান রায় থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ পাঁচ পুরুষের-ব্যবধান। আমাদের কাহিনীর কালে, অর্থাৎ আলিবর্দীর আমলে ভগবান রায়ের প্রপৌত্র শিবনারায়ণও স্বর্গলাভ করেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন শিবনারায়ণের পুত্র। তিনি ভট্টবাটীবংশীয় প্রধান কাননগো মহেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দীর্ঘদিন যৌথভাবে এ দায়িত্ব পালন করে যান। ক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ ব্যবস্থাপনার যবনিকাপাত ঘটে। সম্মানের পর্যায়ক্রমে মুর্শিদাবাদে বঙ্গাধিপতির স্থান তৃতীয়—স্বয়ং নবাব এবং জগৎশেঠের পরেই।

নগেন্দ্র দত্ত ছিলেন ঐ লক্ষ্মীনারায়ণের অধীনে বর্ধমান-সরকারের নায়েব-কাননগো। কিন্তু সম্মান নিয়ে কি ধুয়ে খাবেন? অসার খলু সংসারে সারং রৌপ্য মুদ্রায়াম! ইজারাদারের হাতে আসে কাঁচা সিক্কা-টাকা! বছর না ঘুরতেই হয়েছেন টাকার কুমির! বাগানবাড়িতে পাঁচ-ইয়ারের সঙ্গে মাঝে মাঝে রামপ্রসাদীর প্যারডি ভাঁজেন, “আমায় দে মা তবিলদারী/আমি নিম্নকহারাম ‘ইহ’ শঙ্করী!”

এখন যেখানে বর্ধমানরাজার পায়রাখানা প্রাসাদ, তার কিছু দূরে ছিল তাঁর ভদ্রাসন। বিশ বিঘের প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদ। দ্বিতল পাকা বাড়ি, প্রকাণ্ড সিং-দরোজা। সামনের দিকে দফতর, অতিথিশালা, মন্দিরা, এমনকি পিলখানা। অতিথিশালায় পাশাপাশি চার-পাঁচটি কক্ষ। কার্যব্যপদেশে বিভিন্ন অতিথি আসেন, অধিকাংশই উপ-ইজারাদার। দু-চারদিন তাঁদের রাত্রিবাস করতে হয়। প্রতিটি কক্ষে চার-চারজনের শয়নব্যবস্থা।

এত বৃহৎ আয়োজন, তবু সমস্যা দেখা দিল রূপেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। কোথায় তাঁকে থাকতে দেওয়া যায়? এতাবৎকাল যে-সব অতিথি-অভ্যাগত এসেছেন, প্রতিনিয়তই আসছেন, তাঁরা কখনো সন্ত্রীক আসেন না। পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের স্থান হয় অতিথিশালায়, কাউকে রাখা হয় একক-কক্ষে, কাউকে বা যৌথভাবে। কিন্তু সেটা পুরোপুরি পুরুষদের এলাকা। কোন মহিলাকে সে অতিথিশালায় আশ্রয়দান শোভন নয়। দত্তমশায়ের প্রাসাদটিও প্রকাণ্ড—পাঁচ-সাতখানা ঘর অন্দরমহলে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু অন্দরমহলে কীভাবে ভেবগাচার্যকে স্থান দেওয়া যায়? তাতে পর্দানবীন মহিলাদের যে চূড়ান্ত অসুবিধা! সেটা শোভনও নয়। উপায় নেই—স্থির হল দুজনকে দুই মহলে স্থান দেওয়া হবে। ভেবগাচার্য থাকবেন অতিথিশালায়, তাঁর স্ত্রী অন্দরমহলে।

দোষ অতিথির! সামাজিক রীতিনীতি, কালের বিধান না মানলে উপায়-কী? ‘পথি নারী বিবর্জিতা’ শ্লোকটাও যে শোনেনি তার কপালে এ জাতীয় দুর্ভোগ তো প্রত্যাশিত!

এবার বোঝ! ‘মধুচন্দ্রমা’ শব্দটা যখন পয়দা হয়নি তখন সন্ত্রীক বিদেশভ্রমণের বাসনা জাগলে কী খোয়ার হয়!



অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি। আন্তরিকতায় না হলেও আড়ম্বরে। সোণাই গাঁ থেকে এসেছেন দত্তজার সৌখীন বজরায়, দামোদর বেয়ে—সোজা পুর্বমুখে তাঁরপর দামোদরের শাখানদী বাঁকা ধরে বর্ধমানে। দত্তজার ভদ্রাসন একেবারে বাঁকা স্ত্রী-সই। অর্থাৎ সদর দ্বার রাজপথে কিন্তু প্রাসাদের খিড়কি ঘেঁষে বহে চলেছে বাঁকা। প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদে পাশাপাশি

দুটি ঘাট, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের। অর্থাৎ অবগাহন স্নানের প্রয়োজনে কাউকে বাড়ির বাইরে যেতে হয় না।

বজরাটা ঘাটে এসে ভিড়ল সূর্যোদয়ের একটু পরে। মাস ফাঙ্কুন। ঘাটে এখনো স্নানার্থীরা কেউ নেই। নির্জন। বড় মাঝি গলুইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে উর্ধ্বমুখে একটি শাঁখ বাজিয়ে দিল। বোধহয় এটাই প্রথা—এভাবেই ঘাটের মাঝি গৃহস্থের শ্রুতি আকর্ষণ করে।

রূপেন্দ্র ঘাটে নামলেন। হাত ধরে সাবধানে নামিয়ে আনলেন মঞ্জুকে। মাঝিরা হাতে-হাতে নামিয়ে দিল পোঁটলা-পুঁটলি। শঙ্খধ্বনি হবার একটু পরেই সোপান বেয়ে নেমে এল একজন তরুণ, সঙ্গে এক অবগুষ্ঠনবতী। পিছন পিছন কিছু খিদেমদগার। তরুণ-তরুণী দুজনেই প্রণাম করল ঐদের। মঞ্জুরী সন্কোচে আপত্তি জানায়। তরুণ শুনল না, বললে, সে কী মা? আপনি ব্রাহ্মণী, প্রণাম নিতে হবে বইকি।

তারপর রূপেন্দ্রকে বলে, আমার নাম শিবতোষ, ঠাকুরের নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। বজরায় অসুবিধা হয়নি তো কিছু?

রূপেন্দ্র বলেন, কিছু না।

—আসুন, আমার সঙ্গে।

রূপেন্দ্রনাথ ঐ তরুণটির পিছন পিছন গোটা বাড়িটা প্রদক্ষিণ করে সামনের অতিথিশালায় দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। লক্ষ্য হল, অবগুষ্ঠনবতী মঞ্জুর হাত ধরে নিয়ে চলেছে অন্দরমহলে। পোঁটলা-পুঁটলি সবই তার পিছন-পিছন।

অতিথিশালায় নির্দিষ্ট কক্ষটি দেখিয়ে দিয়ে শিবতোষ প্রশ্ন করে, আপনার প্রাতরাশ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি?

—না! আমি প্রথমে স্নান করব, তারপর সন্ধ্যাহ্নিক। তারপর ওসব হবে। দত্ত-মশাই কি শয্যাভ্যাগ করেছেন?

শিবতোষ বক্রপন্থায় প্রত্যুত্তর করল, প্রথম সুযোগেই তাঁকে জানিয়ে দেব যে, আপনারা নিরাপদে উপস্থিত হয়েছেন।

তিনি গাত্রোত্থান করেছেন কিনা বোঝা গেল না।

দ্বারপ্রান্তে একটি গামছা-কাঁধে দাঁড়িয়েছিল। শিবতোষ বললে, এ হল কালী। আপনার খিদেমদগার। জাতে উগ্রক্ষত্রিয়। জলচল। সর্বক্ষণ এখানেই থাকবে। যখন যা প্রয়োজন হবে, বলবেন। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন। পরে আসব।

কালী এসে প্রণাম করল ব্রাহ্মণকে। শিবতোষ প্রাসাদের দিকে ফিরে গেল।

পাকা ইটের গাঁথনি, কক্ষটি বেশ বড়। চারটি শয্যা চারপ্রান্তে। তিনটি শূন্য। উপরে টানা পাখা। দেওয়ালে হরিণের শিং। এক পাশে একটি মেজ, তদুপরি ভূঙ্গার ও পানপাত্র—পানীয় জলের।

কালী বললে, তেল মাখবেন তো কোবরেজ-মশাই?

রূপেন্দ্র বলেন, সে ঘাটে গিয়ে। কিন্তু মার্জনা-অঙ্গবস্ত্র না হল।

কালী মুখব্যাদন করল।

—মানে, গামছা আর কি। স্নান করে গা মুছতে হবে তো? তুমি এক কাজ কর,

০৪য়মান

কালী—অন্দরমহল থেকে তোমার গিন্নি-মায়ের কাছ থেকে ... মানে, আমার স্ত্রী আর কি, একখানা ধুতি আর একটা গামছা চেয়ে নিয়ে এস। পোঁটলা-পুঁটলি তো সব তাঁর কাছে।

কালী অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে মুখ নিচু করে ঘাড় চুলকাতে থাকে।

—কী হল? কী বললাম বুঝতে পারলে না?

—বুঝবনি কেনে ঠাউর; কিন্তুক তাতে যে অনেক ব্যথা। একটি বেলা যাবে ... রূপেন্দ্র বুঝে উঠতে পারেন না, সমস্যাটা কী? অন্দরমহল তো এক রশি দূরে।

কালী বুঝিয়ে দেয়। ঠাঁর আদেশ পালন করতে হলে ওকে মাঝমহলের গোমস্তা-মশায়ের কাছে আর্জি পেশ করতে হবে তাঁর এড্ডেলা পেয়ে অন্দর মহল থেকে ক্ষান্তমণি বা নিভাননী বা আর কেউ—যার 'হাত-অপসর' আছে, সে মাঝমহলে এসে সংবাদটা শুনবে। তারপর সেই সংবাদটা জ্ঞাত করবে মাঠানের নির্বাচিতা খাশদাসীকে—কল্যাণেশ্বরী জানেন, সে কে! এর পর সেই দাসীটি ঐ দুটি দ্রব্য সংগ্রহ করে এনে মাঝমহল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কালী তা নিয়ে ফিরে আসতে আসতে একদণ্ড পার হয়ে যাবার আশঙ্কা।

রূপেন্দ্র কী করবেন ভেবে পেলেন না। ভবিষ্যতে দুটি পৃথক গাঁটির বানাতে হবে এটা বুঝতে পারেন। এ জাতীয় বিড়খনা বারে-বারেই হবার আশঙ্কা। কিন্তু আপাতত কী করা যায়?

সমাধান বাংলালো কালী নিজেই। তার হেপাজতে নতুন বস্ত্র এবং গামছা আছে। অনেক অতিথি অতর্কিতে নৈশবাসে বাধ্য হন। তখন তাঁদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তাই অতিথিশালায় এ জাতীয় বিকল্প ব্যবস্থা রাখা থাকে। ঠাকুর-মশাইয়ের আপত্তি না থাকলে সে বার-মহলের গোমস্তামশায়ের অনুমতি নিয়ে এক প্রস্থ কাপড়-গামছা এখনি এনে দিতে পারে। রূপেন্দ্র ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু কালীর পরবর্তী সংযোজনে তিনি সম্মত হয়ে যান—অতিথি যদি ঐ আনকোরা নতুন বস্ত্র ও গামছা সঙ্গে নিয়ে না যান তবে তা দ্বিতীয় অতিথিকে প্রদান করার হুকুম নেই। সেটি পরিচারকের প্রাপ্য হয়—অর্থাৎ এক্ষেত্রে কালীচরণের।

স্নানাহিকের পর কালীচরণ পরিবেশন করল ঠাকুরের বাল্যভোগের প্রসাদ। ফল-মূল-মিষ্টান্ন। একটি পরিচিত মিষ্টান্ন নজরে পড়ল ঠাঁর ল্যাংচা।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, দত্তমশায়ের জলযোগ হয়েছে?

কালী জবাবে বললে, এখনো তাঁই আসেননি।

—আসেননি! উনি কি বর্ধমানে নেই?

কালী ইতস্তত করল। তারপর স্বীকার করল, বর্ধমানেই আছেন। মানে, বাগানবাড়ির থনে এখনও আসেননি।

দত্তমশায়ের এ বিষয়ে কোনও লুকোচুরি নেই। তাই প্রথমে ইতস্তত করলেও স্বীকার করতে ওর বাধল না। অর্থকৌলিন্য যার আছে সে বাগানবাড়িতে রাত কাটাতে এর মধ্যে লুকোছাপার কী আছে?

এক প্রহর বেলায় শিবতোষ ঠাঁকে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। গৃহস্থানী-প্রত্যাক্তন করেছেন। প্রতীক্ষা করছিলেন। বয়স পঞ্চাশ হতে পারে, কিন্তু শরীর মজবুত। বার্ধক্য তো দূরের কথা, প্রৌঢ়ত্বও যেন এখনো তাঁর নাগাল পায়নি। রূপেন্দ্রনাথকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। নানান কুশল প্রশ্ন করলেন। রোগাণীর কথাও কিছু বললেন। স্থানীয় চিকিৎসক বলেছেন।

ব্যাধিটার নাম : মৃগী !

অর্থাৎ মূছারোগ আর কি। বিবাহের পর প্রথম ছয়মাস এ উপসর্গ ছিল না। কুমারী অবস্থায় কখনো হয়নি। প্রথম দিকে দু-তিন মাস পর পর হত; ইদানীং প্রতি সপ্তাহেই দু-একবার হচ্ছে। রোগের আক্রমণ হলে হাত-পায়ের ক্ষেপণ হয়, জ্ঞান থাকে না, দাঁতে দাঁত লেগে যায়।

সমস্ত বিবরণ শুনে, কী-জাতের চিকিৎসা ইতিপূর্বে হয়েছে জেনে নিয়ে রূপেন্দ্র বললেন, অপরাহ্নে আমি রোগিণীকে দেখব। তারপর কথা হবে আপনার সঙ্গে।

দত্তজা বলেন, এসে যখন পড়েছেন তখন দু-দশদিন বর্ধমানে থাকুন।

—না, আমি দিন-দুয়েক থাকব। তারপর যাব ত্রিবেণী। সেখান থেকে নবদ্বীপ।

নগেন্দ্রনাথ ঠর সস্ত্রীক তীর্থ পরিক্রমার মনোবাসনা কথা শুনে বললেন, আমার পরামর্শ—সবার আগে সিংহল দ্বীপে যান। সেখানে বাবাকে দেখে চলে যাবেন ভাগীরথীর কিনারে। দক্ষিণ দিক থেকে উজানে চলতে থাকুন—দুপাশে অসংখ্য মন্দির আর তীর্থ। ত্রিবেণী পাবেন, আরও উত্তরে এসে নবদ্বীপ।

রূপেন্দ্র অবাক হয়ে বলেন, সিংহল দ্বীপ! সে তো সাগর-পারে!

—না, না, আমি সেই বিজয়সিংহের সিংহল দ্বীপের কথা বলচিনি। এই দামোদর ধরেই এক রাত দক্ষিণবাগে যেতে হবে। ভোর ভোর পৌছাবেন এক বিজন বনে। সেখানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এক অনাদি শিবলিঙ্গ। ভারী জাগ্রত দেবতা। হুগলি জেলায়। শুনুন মশাই, একটা দারুণ সুযোগও হয়ে যাচ্ছে। পশু এখান থেকে একটা মহাজনী নৌকা যাবে ভারামলপুরে। মন্দির তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। তাতেই যাতে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

শোনা গেল, ঐ বিজন বনে এই অনাদিলিঙ্গ শিবকে খুঁজে বার করেছে একজন স্থানীয় গোপ, তার নাম মুকুন্দ ঘোষ। কী একটা অলৌকিক সূত্রে—বিস্তারিত জানা নেই নগেন্দ্রনাথের। তবে সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিব নাকি হুগলির এক রাজা—বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজবংশীয় রাজা বরামল্লকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, বাবার জন্য মন্দির বানিয়ে দিতে। তাতেই এই মহাজনী নৌকায় বোঝাই হয়ে মন্দির নির্মাণের মালমশলা চলেছে সেই অরণ্যে। নগেন্দ্রনাথের মতে, এ এক দৈব যোগাযোগ—না হলে, পথঘাট কিছুই বাই, নবাবিকৃত এই তীর্থ সাধারণ যাত্রীর পক্ষে দুরতিক্রম্য। রূপেন্দ্র স্বীকৃত হলেন।

নগেন্দ্রনাথ পুত্রকে ডেকে বলে দিলেন, ভেষগাচার্য মাত্র দুইদিন বর্ধমানে থাকবেন। ঠন্দের দুজনকে যেন স্থানীয় দ্রষ্টব্য সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়। পালকিতে নয়, হেরন্দ্রদাসের পিঠে।

নন্দ চাটুজের মাধ্যমে নগেন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে ঐ প্রকাণ্ড হাতিটা কিনে নিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বলেছিলেন, হাতির মালিক তিনি নন, সোএাই গ্রামবাসী। তিনি জিহ্মি মাত্র—হস্তির খাদ্যের জোগান দেন এবং ব্যবহার করেন। ফলে নগেন্দ্রনাথ নিজ বায়ে সোএাই গায়ের হাটতলাটি পাকা করে দিয়েছেন। বর্ষার সময় যাতে ব্যাপারী আর খরিদদারেরা ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে পারে। একটি সাঁকোও বানিয়ে দিয়েছেন।

সেই মতই ব্যবস্থা হল। হস্তিপৃষ্ঠে নগর পরিদর্শন।

বর্ধমান

বর্ধমান রাজবংশের কথা ইতিপূর্বেও কিছ বলেছি। সঙ্গম রায় কাপুর থেকে কৃষ্ণরায়ের আত্মজা সত্যবতীর আত্মদানের কথা। জনপদটি কিন্তু তার বহু যুগ আগে থেকেই ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এই নামটি জৈন তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের নামানুসারে। প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ ‘অঙ্গ-পাঠে’ জানা যায় যে, ঐ ধর্মপ্রচারক এখানে তাঁর সদ্ধর্ম প্রচার মানসে আগমন করেছিলেন। তখন এখানে আর্যবসতি ছিল না। ঐ গ্রন্থে তাদের বলা হয়েছে ‘চুয়াড়’। তারপর আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে। বর্ধমান মহাবীরের ধর্মমত এ বঙ্গভূমি থেকে সরে গেছে অনেক অনেকটা দূরে; কিন্তু ‘চুয়াড়’-রা স্বধর্মচ্যুত হয়নি। তারা সমান দাপটে আজও বঙ্গভূমে মস্তানি করে চলেছে।

বর্ধমান মহাবীর ঐ ধর্মগ্রন্থ মতে প্রথমে চুয়াড়দের দ্বারা অপমানিত ও প্রহৃত হন, যদিও শেষে তারা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করে। সেটা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা।

কারও মতে গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী ‘পার্থোলিস্’ বাস্তবে এই বর্ধমান শহর। সে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল সপ্তগ্রাম। ইতিহাসে দেখছি, 1574 খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সৈন্যদল বর্ধমান-শাসক দাউদ খাঁর পরিজনবর্গকে বন্দী করে আর 1606 খ্রীষ্টাব্দে, আকবরের মৃত্যুর পরের বছর নিহত হন শের আফকন, জগৎবিখ্যাত সুন্দরী নূরজাহাঁর প্রথম স্বামী। ঐ শের আফকন ও তাঁর কন্যা লাডলি বেগমকে নিয়ে গোটা একটা উপন্যাসই ইতিপূর্বে লিখে ফেলেছি। ফলে সে-সব কথা যাক।

শিবতোষ পিতার আদেশে বর্ধমানের দ্রষ্টব্য সব কিছু ওঁদের ঘুরিয়ে দেখাল। কিন্তু সে-আমলে দেখার মতো ছিলই শ্বা কী? মহারাজার প্রাসাদটাও আকারে অনেক ছোট। বর্তমানে যে প্রাসাদ দেখা যায়, তা পরবর্তীকালের মহারাজ মহাতাবচাঁদের নির্মিত। তিনিই গোলাপবাগে একটি পশুশালা নির্মাণ করেন। লর্ড কার্জনের সম্মানার্থ নির্মিত ‘ভারতদ্বার’ তোরণ তো আরও পরবর্তী জমানার। সে আমলে অবশ্য ছিল শ্যামসায়র আর কৃষ্ণসায়র দীঘি, আর বর্ধমান শহরের এক ক্রোশ পশ্চিমে, শাহী সড়কের ধারে আর একটি কীর্তি। নবাবহাট গ্রামে একটি দীর্ঘিকা, আর তাকে ঘিরে একশ আট শিবমন্দির। অদূরেই তালিতগড় দুর্গ। আমাদের কাহিনীর কালে বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদ বারে বারে ঐ দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতেন—বগীর দল এগিয়ে আসছে সংবাদ পেলেই।

একটা অবাস্তব কথা বলি, কিছু মনে কর না:

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ঐ নবাবহাটের একশ আট শিবমন্দিরে এ গ্রন্থের লেখক সস্ত্রীক কাটিয়ে এসেছিল একটি মধ্যাহ্ন। আমরা খিচুড়ি বানিয়ে খেয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম, ঐ দীঘির জলে স্নান করা মানা, বাসন-পত্র ধোয়া বারণ। দীঘি থেকে শুধু পানীয় জল সংগ্রহ করা যেত। এখন হয়তো নলকূপ বসেছে, পাইপ-লাইনও বসেছে; কিন্তু এ গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সেখানে দেখে এসেছিল সেই ব্যবস্থাটি, যা রূপেন্দ্রনাথ করেছিলেন সোএরাই গাঁয়ে, আড়াইশ বছর আগে, তাঁর একবন্ধা দীঘিতে।

পরদিন সকালে রূপেন্দ্রনাথ বর্ধমান থেকে বিদায় নিলেন। রুগ্ন দেখেছেন, রোগ নির্ণয়ও

করেছেন। তা নিয়ে কিছু অগ্রিয় আলোচনাও হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন, কী বুঝলেন বলুন কোবরেজমশাই, এ অসুখ সারবে?

—সারবে। নিশ্চিত সারবে। ঠিক মতো চিকিৎসা করলে। কিন্তু আপনি কি পারবেন?

—কী বলছেন? পারব না? আমার অসাধ্য কিছু নেই! বলুন, কী করতে হবে?

তখন শিবতোষ উপস্থিত। রূপেন্দ্র তাকে বললেন, তুমি একটু অন্যত্র যাও শিবতোষ; আমি তোমার বাবার সঙ্গে কিছু কথা গোপনে আলোচনা করতে চাই।

শিবতোষ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। নগেন্দ্রনাথ বলেন, না, না, তুই বস।

তারপর রূপেন্দ্রর দিকে ফিরে বলেন, শুনুন কোবরেজমশাই, আমার সময় হয় না আদৌ। সেবা-শুশ্রূষা, ঔষধপত্র দেওয়া, সব করে বধুমাতা আর এই শিব। আপনার যা বলার আছে অসঙ্কোচে ওর সামনে বলতে পারেন। ওরাই তো সবকিছু করবে।

রূপেন্দ্র বলেন, গোপনীয়তার প্রয়োজনটা আপনার না থাকতে পারে, আমার আছে। শ্রুঙ্খিত হল নগেন্দ্রনাথের। তাঁর কথার প্রতিবাদ কেউ করে না, করতে সাহস পায় না। সামলে নিয়ে বললেন, ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, তুই যা।

শিবতোষ কক্ষত্যাগ করার পর বলেন, এবার বলুন?

—আমি এইমাত্র বলেছি, ঠিক মতো চিকিৎসা করলে গুঁর রোগমুক্তি হবে; কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজন গুঁর নাই। প্রয়োজন আপনার। তাই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম—আপনি কি পারবেন?

নগেন্দ্রনাথ নির্বাক তাকিয়ে রইলেন কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর বললেন, বুঝলাম না।

—আপনার স্ত্রীর অসুখটা দৈহিক নয়, মানসিক। রোগের মূল হেতু—যেহেতু তিনি আপনার কাছে যথাযথ স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছেন না!

—স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছে না? কী বলছেন আপনি? সে তো যা চায়, তাই পায়।

—না, পান না। নিশ্চয় জানেন, ভেষগাচার্যের কাছে কোন কিছু গোপন করতে নেই। এবার বলুন তো দত্তমশাই—আপনি কতদিন পূর্বে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় রাত্রি-যাপন করেছেন? কবে তার স্ত্রীর মর্যাদা শেষ মিটিয়েছেন?

নগেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। বললেন, আপনার স্পর্ধার একটা সীমা থাকবে তো, কোবরেজমশাই! কতদিন আগে আমি স্ত্রীকে নিয়ে এক শয্যায় শয়ন করেছি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আপনার বাধল না?

—প্রশ্ন করতে আমার যে বাধেনি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন, উত্তর দিতেই না বাধছে আপনার? শুনুন, ক্ষুধাপিপাসা-নিদ্রার মতো এও এক জৈবিক প্রবৃত্তি। আমি জানি না, কেন আপনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা আপনার স্ত্রী অক্ষতযোনি!

—চোপরাও বেয়াদপ! —গর্জন করে উঠে দাঁড়ান নগেন্দ্রনাথ। পিঞ্জরাবদ্ধ শাদুলের মত বার-কতক কক্ষ মধ্যে পায়চারি করে ফিরে এসে গুঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন, আপনাকে ওর চিকিৎসা করতে হবে না। কী বৈদ্যবিদ্য দিতে হবে শুধু বলুন?

রূপেন্দ্রনাথও উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, ভিতরবাড়িতে খবর পাঠান। আমার স্ত্রীকে জিনিসপত্র সমেত বাইরে চলে আসতে বলুন। আমি আপনার দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি।

নগেন্দ্রনাথ হঠাৎ নিবে যান। ঠুর হাতটা ধরে বলেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। মানে, আত্মসংযম হারিয়ে.....

—না! কিছু মনে করিনি আমি। আপনি প্রচুর অর্থের মালিক, শিক্ষাদীক্ষা বোধকরি কিছু নেই। ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলতে পারবেন না, এ তো প্রত্যাশিত। যা হোক, ভিতরে খবর পাঠান।

—আমি আপনার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি, ভেষগাচার্য! ঠিকই বলেছেন আপনি। শিক্ষাদীক্ষা আমার তেমন কিছু হয়নি। বলুন, ক্ষমা করেছেন?

—করেছি।

দুজনেই উপবেশন করেন অতঃপর। নগেন্দ্রনাথ বলেন, এবার বলুন, কী চিকিৎসা করতে চান? ঔষধপত্রের ব্যবস্থা...

—সে-কথা আমি আগেই বলেছি, দত্তমশাই। আপনি আপনার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন না করলে আমি তাঁর চিকিৎসা করতে পারব না।

—বেশ বলুন, আমাকে কী করতে হবে?

—মদ্যপান ত্যাগ করতে বলছি না, কিন্তু সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে হবে। সাত দিন ঐ ঔষধই চলবে, অষ্টম দিনে তাঁর কাছে গিয়ে বলতে হবে, এইমাত্র আমাকে যা বললেন—

—খুঝলাম না। কাকে কী বলতে হবে?

—আপনার ধর্মপত্নীকে গিয়ে বলবেন, যা আমাকে এইমাত্র বললেন: ‘আমি তোমার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি। বল, ক্ষমা করেছ?’

নগেন্দ্রনাথ নতনেত্র অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। তারপর বললেন, তাহলেই ও ভাল হয়ে যাবে?

—খুবই সম্ভাবনা। মোট কথা—এটাই একমাত্র চিকিৎসা। আপনার সঙ্গে তাঁর বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য। আপনার জীবনযাত্রার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় আছে। বাগানবাড়ি, বাইজী বা উপপত্নীকে আপনি একেবারে ত্যাগ করতে পারবেন বলে মনে হয় না; কিন্তু আপনার স্নেহ, প্রেম, সোহাগ পেলে খুব সম্ভব তাঁর এ মুছা রোগ সেরে যাবে। গেল কি গেল না, আপনি আমাকে জানাবেন। না গেলে, আমি আবার তাঁকে দেখব।

নগেন্দ্রনাথ বললেন, আমি চেষ্টা করব। ক্ষমা যখন করেছেন এবার বলুন, কী বৈদ্যবিদ্যায় দেব?

—না, দত্তমশাই! আমি কর্দকমাত্র নিতে পারব না এখন।

—কেন?

—আমাকে বৈদ্যবিদ্যায় দেবার অধিকার আপনাকে অর্জন করতে হবে। আমি যে বাকীস্থ দিয়ে গেলাম তা যদি যথাযথ পালন করতে পারেন, আপনার ধর্মপত্নীকে সুস্থ করতে পারেন তখনই আমি আপনার কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নিতে পারব!

—কিন্তু বৈদ্যের পরামর্শ নিয়ে বৈদ্যবিদ্যায় না দিলে যে নরকদর্শন করতে হয়।

—জানি! অন্তত সেই ভয়েই যদি আপনি আপনার জীবনযাত্রার ছকটা পাল্টাতে পারেন

তাহলেই আমি আনন্দিত। আমার বৈদ্যবিদ্যায় প্রত্যাখ্যান করার সেটাও একটা হেতু।
নগেন্দ্রনাথ অধোবদন হলেন। একথার জবাব নেই।



ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ। সম্ভারাত্রে রওনা হয়ে ভোর-ভোর ওঁরা এসে পৌঁছালেন ভারামলপুরের রামীধোপানির ঘাটে। ইট-পাথরে বোঝাই মহাজনী নৌকা। মাঝি-মাল্লা ছাড়া যাত্রী ওঁরা মাত্র দুজনই। নৌকা যে ঘাটে ভিড়ল সেখানে জনমানব নেই। তখনও ভাল করে সকাল হয়নি। গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালির কলরব। গাছ, গাছ আর গাছ, একখানা খড়োঘরও নজরে পড়ে না। এ অঞ্চলে যে মনুষ্যবসতি আছে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমা মাঝি বললে, শিউজীকী দর্শন করনেকে লিয়ে যাইবন তো, ঠাকুর মোশা? বহু সড়ক পাকড়কে সিধা যাইয়ে। নজদিগই হয়।

সড়ক কোথায়? ওড়কলমি, শেয়ালকাঁটা আর কচুঝোপের মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ। দুটি মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। আগুপিছু চলতে হয়। দুপাশে নাম-না-জানা হাজার গাছ। মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু চেনা গাছ: বাবুলা, পালতে-মাদার, ছাতিম, পাকুড়। আগাছায় ভরা। সকালের রোদ এখনো সে বনভূমির কপালে সোনার জিওনকাঠি ছোঁয়ায়নি। ঘুম-কাতুরে বনানীর শীতের ঘুম এখনও ভাঙেনি। মাঝে মাঝে কুয়াশার গলাবন্ধ জড়ানো তার গলায়।

মঞ্জুরী সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, মানুষজনের বাস আছে তো এখানে?

প্রশ্নটা সে মাঝিকে করেনি, করেছিল রূপেন্দ্রনাথকে; কিন্তু বৃড়ামাঝি শুনে ফেলেছে। সেই জবাব দিল, ডরিয়ে মং মা-জী, ইখানে চৌর-ডাকাত ইয়া শের না আছে।

তারপর রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললে, আপকো সামান হিয়া রহনে দিজিয়ে। বে-ফিকর রহিয়ে সমানকা বারে-মে: যাইয়ে, দর্শন তো কর্ লিজিয়ে পহিলে।

বুঝিয়ে বলল, সব মাল 'ঢোলাই' করতে, অর্থাৎ নৌকা থেকে নামিয়ে ঘাটে থাক দিয়ে সাজাতে ওদের একটি বেলা যাবে। তার ভিতর একজন যাবে গো-গাড়ি যোগাড় করতে। উলটি-বখৎ গো-গাড়ির সারি বাবার থানে চলতে শুরু করবে।

সহধর্মীর হাত ধরে রূপেন্দ্রনাথ হিম-হিম ঘাটে নামলেন। বনপথ ধরে এগিয়ে চলেন। পাঁচকদম এগিয়েই প্রবেশ করলেন, যাকে বলে নিবিড়-অরণ্যে। শুধু গাছ আর গাছ। এবার বড় বড় গাছ। তবে কুমারী মেয়ের সিঁথির মতো বনপথের নিশানাটা বজায় আছে। জলবসতি নিশ্চয় আছে, এই বনপথই তো তার প্রমাণ। পথচলতি মানুষের নিত্যমার্জনা না থাকলে বনলক্ষ্মীর এই সিঁথিটি বজায় থাকত না। পাগলের উস্কো-খুস্কো চুলের আঁতো সে চিহ্নটি হারিয়ে যেত।

অদ্ভুত একটা গন্ধ—আরণ্যক-সৌরভ। গাছ-গাছালির ড্রাকো-ডালে অসংখ্য পাখির কিচ্‌কিচানি। ডালে মৌচাক। মৌমাছির একটানা ভোঁ-ওও ফাঙ্কুন মাস। প্রকৃতিতে এখন

ভার্যামপদুর

মিলনের মহোৎসব। মাঝে একজোড়া ধূসর রঙের খরগোশ আগাছা জঙ্গল ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে এল বনপথে। ঠুঁদের দুজনাকে দেখে হঠাৎ ভাবাচাকা। তার পরেই ছুট-ছুট-ছুট।

ক্রোশখানেক পথ পাড়ি দেবার পর গাছের দৌরাশ্রয় কমে এল। একটু যেন ফাঁকা-ফাঁকা—বড় বড় উলুঘাসের বন। তারপর ঝাঁক ঘুরতেই দেখা গেল দুচারটি খড়ো চালা। জনবসতির লক্ষণ। দূর থেকেই নজরে পড়ল, কোন কোন গৃহস্থ বাড়ির ভিতর থেকে ধোয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এসেছে। এই সাত-সকালে কুয়াশার সঙ্গে জট পাকিয়ে ফেলেছে।

ছোট্ট একটি বিমণ্ড গ্ৰাম। সবই খড়ো চালা। উলুখড়ের। বাঙলা-চালা। মানে, ছাদের ছাউনি ধনুকের আকারে নকশা রচনা করেছে বাঁশ বা নারকেল খুঁটির মাথায়। দু-একটি গরু নজরে পড়ল। গো-গাড়ির ভাঙা চাকা। বিচালির গাদা।

মেঠো দাওয়ায় নাকে-গামছা, উদাম-গা একজন শ্রৌঢ় মানুষ ঝাঁটা বুলাচ্ছিল। ঠুঁদের আসতে দেখে ঝাঁটাগাছ নামিয়ে টান-টান হয়ে দাঁড়ায়। অবাক মানে। এ জাতীয় বেগানা লোক দেখতে অভ্যস্ত নয় মনে হল।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, বাবার থান আর কতদূরে?

মুণ্ডতমস্তক আর শিখাতেই পরিচয়। শ্রৌঢ় লোকটা ঝুঁকে পড়ে বললে, পেন্নাম ঠাউরমশাই, কোথেকে আসা হচ্ছে?

—বর্ধমান। বাবার থান কতদূরে বলতে পারেন? এখানে সম্প্রতি যে অনাদি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে—

শ্রৌঢ় ঠুর ব্রহ্ম সংশোধন করে দেয়, ‘অনাদি’ লয় বাবা, তাঁর নাম তারকেশ্বর। তা সেই তাঁরে দেখতি বধ্যমান থিকে আসিছেন। এ তো বড় আজব কতা!

রূপেন্দ্র বলেন, অনাদি শিবলিঙ্গ নয়? ভাস্কর নির্মিত?

গলকণ্ঠটা বারকতক ওঠা-নামা করল। যুক্তকরে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। শেষে বললে, মুই মুখ্য গোয়ালার পো—নেতাই ঘোষ, আঞ্জে। আপনকার কতা মুই বুঝতে পারছি ঠাকুরমশা! তা ডেঁড়িয়ে কেন মা? অনেকটা পথ এয়েছেন, বসেন।

দাওয়ার সামনেই একটা বাঁশের মাচা। ভরট-বাঁশের ছয়-খুঁটির উপর তলতা-বাঁশের ঘননিবন্ধ সারি। শ্রৌঢ় তার গামছাটা দিয়ে সেটা মুছে দিল। ধুলো ছিল না, কিন্তু হিমে ভিজে-ভিজে ছিল।

দুজনই বসলেন। কথটা সত্যি। রূপেন্দ্র অভ্যস্ত হলেও মঞ্জুরীর পক্ষে একটু জিরিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। রূপেন্দ্র বলেন, আপনি এটাকে ‘আজব কথা’ বললেন কেন? তীর্থদর্শনে কি ভিন্দেশের মানুষজন আসে না?

—হক্কতা! আসে। নিযাস আসে। কিন্তুক এই ভার্মালপুর কি তীর্থস্তান আঞ্জে? এ তো মুকুন্দ-খুড়োর এক নিপাট খ্যাপামি! দিব্যি সংসারি মনিষি, তিনজোড়া দুখেল গাই, স্কিনে আধমনটাক দুধ হতেন—দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ বদ পাগল হই গেল!

—কার কথা বলছেন? মুকুন্দ কে?

—দ্যাখবান অখনই। এই বাবার থানেই পড়ি আছে। রাতেও ভিটেয় আসে না! গেল সনের বর্ষায় চালাটা ছমড়ি ঝায়ি পড়ি গ্যালো। ভুরুক্ষেপ নাই।

হয়তো লোকটা আরও কিছু বলত। বাধা পড়ল। ঘরের ভিতর থেকে এগিয়ে এল এক শ্রোতা। লালপাড় মলিন শাড়ি। হাতে শাঁখা, নোয়া। মুখটা দেখা যায় না। ঘোমটায় ঢাকা। দু-হাতে ধরা আছে একটা কাঁসার থালা। তার উপর দু-ঘটি গরম দুধ। দুটি শালপাতায় দু-টুকরো খেজুড় গুড়।

—এ আবার কী?

—গোয়ালা-মনিষি আশ্বে। আর কী-করি বামুনসেবা করি কন?

শ্রোতা ফিস্-ফিস্ করে মঞ্জরীকে প্রশ্ন করে, ইখান থনে কই যাবেন?

মঞ্জরী বলে, ত্রিবেণী।

লৌকাতেই গায়ত্রীজপ সেরে নিয়েছেন। রূপেন্দ্র ইতস্তত করলেন না। নিতাই ঘোষের ব্রাহ্মণসেবায় অন্তরায় হলেন না। এক হিসাবে ভালই হল। এখানে দোকানপাট তো কিছু নজরে পড়ছে না। সারা দিনে কী জুটবে, আদৌ জুটবে কিনা, তা বাবা তাঁরকেশ্বরই জানেন।

শ্রোতের কাছে আরও কিছু সংবাদ পাওয়া গেল। শিবলিঙ্গটি আবিস্কৃত হয়েছে কয়েক বছর আগে। আকৃতি শিবলিঙ্গের মতো নয়। ধরিত্রীর মাতৃগর্ভ থেকে শিশু তোলানাথ হঠাৎ মাথা তুলে ঐ আরণ্যক শোভাকে দেখতে চেয়েছিলেন। বিজন অরণ্য তো? কেই বা ঠেকে লক্ষ্য করছে? ভেবেছিলেন টুক করে এক নজর দেখেই ধরিত্রীমায়ের পেট-কোচড়ে লুকিয়ে পড়বেন। কিন্তু তা হল না। জগৎটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি! ব্যথিতও! তাঁর ভক্তদের কত দুঃখ, কত কষ্ট! বাবা বজ্রাহত হয়ে পাষণ হয়ে গেলেন। নিটোল কটিপাথর। না, নিটোল নয়, মাথায় একটা গর্ত মতো আছে। কেউ বলে, দশ-বিশ পুরুষ আগে জায়গাটা এমন বিজন অরণ্য ছিল না। এখানে ছিল এক গোপভূম। গাঁয়ের মেয়েরা ঐ পাথরখানির উপরে ধান ভানতো, গান গেয়ে-গেয়ে। তাতেই হয়েছে ঐ গর্ত।

মুকুন্দ খুড়ো অবশ্য সে কথা মানে না। বলে, সমুদ্রমহনকালে বাবা যখন দেবতাদের বাঁচাতে হলাহলের পাত্রটা এক চুমুকে খেয়ে ফেলেছিলেন—‘সেই যে গ, যখন তেনার গলকণ্ঠটি নীলবরণ হয় গেল’—তখন বারেকের জন্য তাঁর মাথা ঘুরে ওঠে। টাল সামলাতে পারেন না! মন্দারের পাথরে—‘মন্দার’বুলে তো হে? সেই যি পাহাড়টো মহনদও হইছিল, তারই গাটে আছাড়ি পড়িছিলেন। ওটি সেই টক্করের দাগ! বুয়েছ?’

জঙ্গলের মাঝখানে অনেকটা জায়গা হাঁসিল করা হয়েছে। বড় বড় গাছ কেটে নামানো হয়েছে; আগাছা কেটে সাফা করা। প্রায় বিশ হাত চওড়া, পঞ্চাশ হাত লম্বা। তার মাঝখানে ঐ কালো পাথরের মেদিনীবিদীর্ণ কৌতূহল—ভূতাত্ত্বিকের ভাষায় ‘আউটক্রপ’। পাথরখানির চারদিকে ঝুঁটি—বীশ আর আধলা তাল। তার উপর শুকনো ডালপালার একটা আচ্ছাদন—রৌদ্রনিবারণ মানসে। অদূরে প্রকাণ্ড একটা বেল গাছ। পাথরটা যিরে আকন্দের জঙ্গল—অজস্র ফুল ফুটে আছে। বেলগাছতলায় বসে আছেন একজন সন্ন্যাসী। বয়স স্ফুটাজ করা শব্দ—তিন কুড়ি নির্বাণ পাড়ি দিয়েছেন। উদাম গা—বুকের লোম পর্যন্ত সুদী, চুল-দাড়ি তো বটেই। নিম্নাঙ্গে একটি কৌপীন। আসনপিড়ি হয়ে বসেছিলেন মাটিতে, দুই থেকে ঠুঁদের দেখতে পেয়েই চমকে উবু হয়ে উঠে বসেন। ডান হাতখানা ভ্রুর উপর রোদ-আড়াল করা ভঙ্গিতে ধরে একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে থাকেন। কাছাকাছি এসে রূপেন্দ্রনাথ যুক্তকরে কিছু বলার

ভারামলপুর

আগেই সন্ন্যাসী বলে ওঠেন, আসুন রাজামশাই! এত দেৱী হল যে?

ওঁরা স্বামীশ্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখেন। রূপেন্দ্রনাথের জীবনে এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে, কিন্তু সেবার প্রশ্নকর্তী ছিল বিকারগ্রস্তা—এ তো তা নয়। বললেন, আমার কি আরও আগে আসার কথা ছিল?

—ছিল নি? এক মাস হয় গেল! বাবা বলিছিলেন,—হুণ্ডাখানেকের ভিত্তিই আসপেন!

এই বৃদ্ধের পিতৃদেব জীবিত? তিনি ওঁকে এমন একটা আজব প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন! বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ নাকি এটা?

বৃদ্ধ পুনরায় বলেন, আপনে বরা-আজা বটে তো?

—আজ্ঞে না, আমি আসছি বর্ধমান থেকে। আমার নাম শ্রী রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা।

বৃদ্ধ নিরাশ হলেন। আবার পা-বিছিয়ে বসলেন। বললেন, অ! দামোদর বেয়ে আলেন নিচ্চয়—বাহিরগড়ের বরা-আজার নাওটা দেখিছেন গাঙে?

এবার বুঝতে পারেন—‘বরা-আজা’ বলতে উনি ভারামল বা বরাহমল রাজার কথা বলছেন। এবার জানান যে, সেই বরাহমল রাজার একটি প্রকাণ্ড মহাজনী নৌকা আজ সকালেই এসে ভিড়েছে রামীধোপানির ঘাটে। সেটা ইট-পাথরে বোঝাই, উনি সেই নৌকাতেই এসেছেন বটে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। হঠাৎ ওঁদের দিকে পিছন ফিরে ঐ নিকষ-কালো পাথরখানাকে সম্মোদন করে বলে ওঠেন, তবে তো ছলনা করিস্নি বাবা। ইট-পাথর তো এয়েছে! এবার তোর মন্দির হয়ি যাবে!

তারপর হঠাৎ উবুড় হয়ে পাথরখানার কানে-কানে যেন বলেন, তা হ্যাঁরে, মন্দির হয়ি গেলি তার একটেরে মোরে ঠাই দিবি তো? আশো তো তোরই মতো রোদে জলে পড়ি আছি? বল। হক কতা কি না?

প্রায় একটি বেলা গেল ঐ অর্ধোন্মাদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্যটা উদ্ধার করতে। উন্মাদ উনি নিশ্চয়ই, তবে ঐ—যাকে বলে ‘ভাবের ঘরে পাগল’। সমকালীন আর এক ‘মন-মাতাল’ পাগলকে যেমন ‘মদ-মাতালেরা’ ‘পাগল’ বলে! উনি আদৌ সন্ন্যাসী নন, এই বিজ্ঞ জঙ্গলে কে ওঁকে সন্ন্যাস দেবে, মন্ত্রদীক্ষা দেবে? তাই পূর্বাশ্রমের অভিধাতেই ওঁর পরিচয়: মুকুন্দরাম ঘোষ।

সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন একদিন। নিতাই ঘোষ ভুল বলেনি কিছু। তিন-জোড়া দুখেলা গাই—দৈনিক আধমন্টক দুধ ‘হতেন’। একা মানুষের সংসার; জীবিয়েগ হয়েছ অনেক দিন। দুটি কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। পুত্রটি ছিল লাঠি খেলায় ওস্তাদ—সে রাজসরকারের পাইক। তবু একদিন ছেলে ফিরে আসবে এই আশা বৃদ্ধে নিয়েই বৃদ্ধ পড়েছিলেন ভিটে আঁকড়ে। দুধ বেচে কপর্দক সঞ্চয় করতেন। কড়ি-কড়ি-কপর্দক-সিক্কাটাকা! মাটির হাঁড়িতে পুতে রাখতেন স্রবের মেখেতে গর্ত করে। দুটি রাখাল কিশোর গো-মাতাদের দেখভাল করত। বৃদ্ধ তখনো কর্মক্ষম। বাকি ঝুলিয়ে দুখটা বেচে দিয়ে আসতেন নিকটবর্তী ভারামলপুরের সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে। তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা! রাতারাতি দুধের যোগান হয়ে গেল আশ্চর্য্য। কী ব্যাপার? রাখাল সহকারী দুজনে জানালো, কপিলার দুধ বেমক ‘থমকে’ গেছে!

কপিলা ঠুর সবচেয়ে ভালো জাতের গাই। একাই দিনে দশসের দুধ দেয়। সদ্য সন্তানবতী সে। দেখ-না-দেখ তার বাঁটের দুধ ‘থমকে যাবে’ কেন? মুকুন্দরাম প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে এলেন—রাখাল কিশোর দুটি দুধ চুরি করছে। গোপনে বেচে দিয়ে আসছে অন্য কোনও ঘোষের-পোকে। কিন্তু ছেলে দুটি দীর্ঘদিন আছে ঠুর কাছে। এ জাতীয় তৎপরতা কখনো করেনি। বিশ্বাস করতে মন চায় না। সরেজমিন তদন্ত করবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

গাঙের কিনার ঘেঁষে বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি। জমিদারের খাশ লাখেরাজ। চাষ করা বারণ। গো-চারণ ক্ষেত্র। পাঁচ ঘোষের-পো তাদের গো-মাতাগুলিকে সকাল বেলা ছেড়ে দিয়ে আসে সেই গোচারণ ভূমিতে। বাছুরদের মুখে জাল-বাঁধা। শাঁখে-ফুঁ-পড়া সন্ধ্যায় সার বৈধে নিজে-নিজেই ফিরে আসে গরুর পাল—ঐ যাকে বলে গোধূলি লগ্নে। এ জঙ্গলে শেয়াল আছে, খটাশ আছে, কিন্তু দিনের বেলা যুথবদ্ধ গরুর পালকে তারা আক্রমণ করতে সাহস পায় না।

মুকুন্দরাম সেদিন তক্কে-তক্কে থাকলেন। দেখলেন, সূর্য পশ্চিম দিগ্বলয়ের দিকে ঢলে পড়তেই কপিলা দলছুট হয়ে গেল। ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভিতর। প্রায় পঞ্চাশ হাত ব্যবধানে মুকুন্দও অনুসরণ করলেন তাকে। কাঠুরিয়ারদের যাতায়াতে যে বনপথের সৃষ্টি হয়েছে সে পথ ধরে কপিলা বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়ে গেল। কিন্তু তারপর হঠাৎ বেমক্কা ঢুকে পড়ল এক নিবিড় অরণ্যে। গিয়ে থামল একখানা কালো কষ্টিপাথরের উপর। স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর উর্ধ্বমুখে ডাক দিল : হা—হা—!

ঠিক যে স্বরে সে ডাকে তার বাছুরকে। কিন্তু কী আশ্চর্য? কপিলার বকনা-বাছুর মংলি তো এ দিগড়ে নেই। ‘তাইলে ও ডাকে কারে’? প্রায় বিশ হাত দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিসারে লক্ষ্য করছিলেন মুকুন্দরাম : দ্যাখাই যাক্, ব্যাবারডা কোন বাগে ডাঁড়ায়।

যা ‘ডাঁড়ালো’ তাতে তাঁর সারাদেহের রোমকূপও ‘ডাঁড়িয়ে’ ওঠে।

কপিলের ঐ স্তনভারনম্র আহ্বান শুনে বেল গাছের মগডাল থেকে নেমে এল এক-জোড়া গোফুর সাপ। ফণায় তাদের খড়মের চিহ্ন। লিকলিক করছে চেরা জিব! মুকুন্দরাম ঘোষের পো; গোরুর হক্-হদিস তাঁর নখদর্পণে। অথচ কী আশ্চর্য! কপিলা না দিল দৌড়, না করল ফৌস-ফৌস।

একটা কালনাগ পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরল তার পিছনের ঠ্যাঙ জোড়া, বাঙলা ‘৪’-অঙ্কের নকশা ছকে। কপিলা কোন প্রতিবাদ করল না, স্থির হয়ে রইল। আর নাগিনী পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরে তার পালান। নিষ্পেষণ করতে থাকে ওর অমৃতরসভাণ্ডার। ফিন্কি দিয়ে দুধ বার হয়ে এল বাঁট থেকে, যেন পিচকারি! কালো কষ্টিপাথরখানা হয়ে গেল স্বেতপাথর।

দুগ্ধভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর নাগদম্পতি মুক্তি দিল কপিলাকে। ক্রুদ্ধাঙ্গে কপিলা দৌড়ালো তার বাথানপানে। মুকুন্দরাম অপেক্ষা করলেন, সমঝে নিতে চান—নাগদম্পতি এরপর কী করে।

দেখলেন, শ্রাবণের ধারার মতো দুগ্ধস্রোত সর্পিণি গতিতে এসে সঞ্চিত হল একটি প্রাকৃতিক গর্তে। নাগ-নাগিনী সেই ডোবা থেকে মুখ ডুবিয়ে যেন বাবার চরণামৃত পান করল।

মুকুন্দরাম ফিরে এলেন ভিটেতে। তখন আঁধার ঘনিয়েছে। প্রত্যক্ষ সত্যকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এমনটা কী করে হয়?

গরবেশ্বর

সে-রাত্রিই স্বপ্নাদেশ পেলেন। বাবা ওকে ডাকছেন। সেই বিচিত্র আহ্বান, যা কয়েক দশক বাদে শুনবেন লালাবাবু—পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ: 'বেলা যে যায় রে! বাসনায় আগুন দিবি না?'

যদি বল—'পাগল', তবে তাই। মুকুন্দরাম ঘোষ সন্ন্যাস নেননি। তবে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। কপনিসার সাধক বাকি জীবন কাটিয়ে গেছেন সেই বেলগাছ তলায়। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা। শুরু করে দিলেন নির্জন সাধনা। শুরু? ঐ তো—ঐ কালো পাথরখানা। ধরিত্রীর গর্ভ থেকে মুখ-বার-করা ঐ শিশু ভোলানাথ। তিনি যা স্বপ্নাদেশ দেন তাই শোনে, যেভাবে চালান সেভাবেই চলেন। এক হাতে বনজঙ্গল সাফা করে বাবার মাথায় বেঁধে দিলেন লতাপাতার একচালা: আহা! রোদে-জলে তোর বড় কষ্ট।

বাবা স্বপ্নে দেখা দিলেন। বলেন, তোরও তো বড় কষ্ট যাচ্ছে, মুকুন্দ! র, বরা-রাজাকে বলে দিচ্ছি, একখান পাকা ঘর বানিয়ে দিতে। বাপ-বেটায় থাকব।

সত্যি স্বপ্নাদেশ পেলেন হুগলীজেলার বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় নৃপতি বরাহমল্ল। লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে চাইলেন—স্বপ্নে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা কি বাস্তব? এল রাজার লোক, খোঁজ-খবর নিয়ে ফিরে গিয়ে জানালো রামীধোপানির ঘাটের কয়েক রসি দূরে সত্যি বসে আছে এক নেংটিসার পাগলা সাধু। বেলগাছ তলায়। আর একখণ্ড কালো-পাথরের উপর বেঁধেছে লতাপাতার এক চালা।

রাজার প্রতিভূ এসে মুকুন্দরামকে জানিয়ে গেল অচিরেই মন্দির বানানো হবে; রাজামশাই রানীমাকে নিয়ে স্বয়ং আসবেন তীর্থদর্শনে। তাই রাপেন্দ্র আর মঞ্জুরীকে দেখে ঠুর ধারণা হয়েছিল—ওরাই বুঝি সেই রাজারানী।

'আজ্ঞা-আনির মতোই সোন্দর তো! তাই ভেরম হই গেল, আজ্ঞে।'

আড়াই শ বছর কেটে গেছে তারপর। সহস্রাব্দীর এক পাদ। আমূল বদলে গেছে সব কিছু। শুধু বাস্তবে নয়, মানচিত্রেও আজ ঝুঁজে পাবে না ভারামলপুর গাঁ-খানি। এখন ওর নাম তারকেশ্বর। নিবিড় অরণ্যানী নিশ্চিহ্ন। রামীধোপানি ঘাটও এক গলা ঘোমটা টেনে সরে গেছে অন্যত্র। গাঙই যে দেশান্তরী, তা ঘাট পড়ে থাকবে কোন সুবাদে? দামোদর-নদের সাথেই না বাঁধা ছিল ঘাট, অচ্ছেদ্যবন্ধনে? কানা-দামোদর—তার যে ক্ষীণ রেখাটুকু ঐ অভিধা বহন করে—তা সরে গেছে ভিন্-দেশে। মরাগাঙের অশ্বখুর দহগুলো ভরাট হয়ে গেছে; সেখানে উঠেছে শালখুঁটির বনিয়াদ-নির্ভর দ্বিতল-ত্রিতল মোকাম। ঝুঁজলে এখন সেখানে সন্ধান পাবে ভি ডি ও ক্যাসেট পার্কার।

বাঙলা মায়ের আঁচলের খুঁট খুলে আচমকা ভেসে গেল—চন্দ্রনাথ; একমুঠো ধূতরো ফুলের মতো। আজ তাই মায়ের এই পুব-আঁচলে তারকেশ্বরই শ্রেষ্ঠ শৈবতীর্থ।

কিন্তু সব কিছু হারায়নি। হারায় না। খোঁজ নিলে দেখতে পাবে মন্দিরের গা-সইসই সেই পাগলা সাধুর সমাধি: 'মুকুন্দ ঘোষের থান'। দুধ-পুকুরটাও আছে—এখন তাতে বাঁধানো ঘাট—সেই যে ডোবাটায় সকালে সঞ্চিত হত কপিলার স্বতঃ-উৎসারিত অমৃতরস। তাই তো ওর নাম—'দুধপুকুর'।

আরও একটি জিনিস খোয়া যায়নি এই আড়াই শ' বছরে—মানুষের ধর্মবিশ্বাস। মুকুন্দ ঘোষের মতোই কাঁধ থেকে ঝুঁকিয়ে বিশ্বাসবারি নিয়ে চলেছে নিরম মানুষের মিছিল : 'ভোলেবাবা পার করে গা'।

তোমাদের 'গল্পো' শুনিয়েছি, কিন্তু আপনাদের কাছে কিছু কৈফিয়ৎ দেবার আছে।

হুগলী জেলার প্রামাণিক ইতিহাস রচয়িতা সুধীরকুমার মিত্র মশায়ের মতে তারকেশ্বরের মঠের প্রতিষ্ঠা হয় 1729 খ্রীষ্টাব্দে। তার পূর্বেও হয়তো এখানে কোন শৈবমন্দির ছিল ; কারণ তারকনাথের মন্দিরের ভিতর একটি প্রস্তরখণ্ডে খোদাই করা আছে—'শুভমণ্ড শকাব্দ ১৫৪৩'—অর্থাৎ 1621 খ্রীষ্টাব্দ। সম্ভবত নিকটবর্তী কোন মন্দির থেকে ঐ পাথরটি সংগৃহীত। মিত্র-মশাই বলছেন, 'মুকুন্দ ঘোষ হতেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ'; 'বাগিগড়ি পরগণার রাজা ভারামল্ল তারকনাথের প্রথম মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং দেবতার সেবার জন্য এক হাজার তেইশ বিঘা জমি দান করেন।'

ভূসম্পত্তি! ভক্তদের দান! অন্নদায়স্কলের সেই ভিক্ষাজীবী ভবঘুরেটা না তার সঙ্গিনীকে বলেছিল—'সাধ হয় একদিন পেট পূরে খাই'? সেই সর্বত্যাগী শিবের সম্পত্তি ক্রমে হয়ে উঠল কুবেল-ঈর্ষিত। গুটি গুটি এসে ছুটলেন মোহান্ত বাবাজীরা। মুকুন্দ ঘোষের দেহান্তের পরে এসে জাঁকিয়ে বসলেন দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিকারী সন্ন্যাসীরা। তাঁদের 'শৈবমঠ' বিবরণে আছে—'স্থাপিত প্রধান গদী শ্রীতারকেশ্বরে। মন্দের ভূভাগ রাজ্য খণ্ড খণ্ড করে।'

লেখা নেই, 'প্রধান গদী' প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই ভারতচন্দ্র-বর্ণিত ভবঘুরেটা তার জীবনসঙ্গিনী 'অন্নরিক্তা'র হাত ধরে কোন পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করল ভিক্ষার সন্ধানে।

সহদেব গোস্বামী বিরচিত 'ধর্মমঙ্গল' পুঁথিতে আছে আর একটি কৌতুককর বার্তা। রাজা বরাহমল্ল প্রথমবার স্বপ্নাদেশ পেয়ে এবং সরেজমিনে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঐ কষ্টিপাথরখানি এই বিজন অরণ্য থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। নিজ রাজধানী রামনগরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে এক মন্দির নির্মাণ করবেন। রাজাদেশে এল শ্রমিকদল। পঞ্চাশ হাত মাটি খুঁড়েও তারা বাবার তলদেশের সন্ধান পায়নি। কেন পায়নি তার যে ব্যাখ্যা সহদেব গোস্বামী দিয়েছেন—তার সঙ্গে ভূতত্ত্ববিজ্ঞান-এর সম্পর্ক নেই। 'জিওলজিকাল আউট-ক্রপের' তলদেশের সন্ধান যে ওভাবে পাওয়ার নয় একথা বলেননি। বরং বলেছেন—রাজা বরাহমল্ল পুনরায় স্বপ্নাদেশ পেলেন। 'বাবা বলছেন :

তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বসতি।

অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপতি॥

অকারণ দুঃখ পায় মোরে কেন খোঁড়?

গয়া-গঙ্গা-বারাণসী আদি মোর জড়॥

রাজা বরাহমল্লের আদিম মন্দির ভগ্ন হলে বর্ধমানের মহারাজা সে মন্দির পুনর্নির্মাণ করে দেন। কিন্তু সে মন্দিরটিও আয়তনে ছোট বলে যাত্রীদের অসুবিধা হত। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে তারকনাথের স্বপ্নাদেশ পেয়ে পাতুল সন্ধিপুত্র নিবাসী গোবর্ধন রক্ষিত বর্ধমান আটচালা শৈলীর বৃহদায়তন মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন।

মন্দিরের প্রবেশ পথের স্তম্ভ এবং খিলনএরী অলঙ্কৃত—নানান পৌরাণিক দৃশ্য, পুষ্পস্তবক ও নকশা। আটচালা মন্দিরের কমণীয় বজ্রকৃতি নয়নাভিরাম। কিন্তু সংস্কারের নামে মাঝে মাঝে আধুনিক প্রয়োগকৌশলের প্রবণতা এ—কালীন স্থপতিবিদদের বিপথে পরিচালিত করেছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে চুনবালির আস্তরের উপর ফুল-ফোটানোর প্রচেষ্টায় আদিম পোড়ামাটি-অলঙ্করণের মুখখানি স্তান হয়ে গেছে। সব চেয়ে দাগা দেয় মন্দিরের নিচের অংশে মানুষভর উচ্চতায় চীনা মাটির রঙিন টালি। এই ‘বেলবটম’ পোশাকে মন্দিরের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। বালুচরী শাড়ির সঙ্গে ‘ম্যাচ’ করেনা ‘স্লিভলেস জ্যাকেট’! এ যেন রতনচূড়ের গা-ঘেঁষে ডিজিটাল ঘড়ি অথবা নবরত্নের টায়রা-পরী সীমস্তিনীর ‘বয়েজকাট’ কেশবিন্যাস!

মন্দিরের সমুখে নাটমন্দিরটি তৈরী করে দেন চিত্তামণি দে—1801 খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে শিবের পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে প্রত্যাশিত শক্তিমন্দির: দশভুজা, চতুর্ভুজা। কায়েমী স্বার্থ ততদিনে সব কিছু কব্জা করে ফেলেছে। বিশ্বাসপ্রবণ যাত্রীদের মাথায় হাত বুলিয়ে এবং সেই মস্তকেই পনস বিদীর্ণ করে লুটে-পুটে খাবার আয়োজন: ‘এখানে পেন্নাম কর—পয়সা দাও; ওখানে ফুল ফেল,—পয়সা দাও; সেখানে চরণামৃত পান কর—পয়সা দাও।’ পূজাবিধি নানান প্রকার, ভক্তি-সঙ্গীতে নানান সুর-তান-লয়; কিন্তু মূল ধূয়োটা অপরিবর্তিত: ‘পয়সা দাও’!

এল অর্থলোলুপতার অনিবার্য অনুশঙ্গ: কামবিকার! মোহান্ত মহারাজদের কৃপায় অবলুপ্ত হল মুকুন্দ ঘোষের সেই আদিম স্বপ্নটা। এক সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মহাসন্ন্যাসী প্রণবানন্দ মহারাজজীর কাছে। গৃহী ও সন্ন্যাসী ‘পরম্পরং ভাবযন্ত মন্ত্রে’ দীক্ষিত হয়ে সে পাপ মোচন করেছিলেন।

তারেকেশ্বর মন্দিরে যদি যাও—আমার পরামর্শ—হাতে একটা ছোট টর্চ রেখ। টিপবাড়ি জ্বাললে আজও একটা জিনিস দেখতে পাবে। মেঝের তল থেকে এক হাত নিচে বাবার মাথায় আজও দেখতে পাবে সেই ক্ষতচিহ্নটা।

: ভুলি গ্যালো নাকি হে? গরল পান করি বাবা যে টলি পড়িছিলেন মন্দার পাহাড়ের গায়ে, সেই টক্করের দাগটো গ!



রামীধোপানি ঘাটে নৌকায় রাত্রিরাস করে পরদিন ভোর-ভোর পদব্রজে রওনা দিলেন। আপাতত গন্তব্যস্থল দিনেমারদের ফ্রেড্রিক নগর। তারেকেশ্বর থেকে প্রায় বারো ক্রোশ পূর্বদিকে। সড়ক বা পথ বলতে কিছু নাই। মাঝে মাঝে বনপথ, কখনো বা ধানক্ষেতের দিগন্ত-অনুসারী প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে বিসর্পিত গতিতে আলপথ। দিগন্তান্ত হবার আশঙ্কা নাই। লক্ষ্য বরাবর পূর্বাভিমুখী। পথে বড় নদীও নাই। বারো-চৌদ্দ ক্রোশ পথ একদিনে পাড়ি দেওয়া যাবে না, বিশেষ রূপেন্দ্র ‘পথি নারী বিবর্জিতা’ শ্লোকের নির্দেশ মনে ননি। তা হোক, অসুবিধা নাই কিছু। পথে পড়বে দুটি বর্ষিষ্ণু জনপদ: হরিপাল ও সিংহপুর। মোট দূরত্বের প্রায়

এক-তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিলে। হির করেছেন, দৈনিক প্রায় চার ত্রেণশ পথ অতিক্রম করবেন। হরিপাল এবং সিংহপুরে এক এক রাত্রি অতিবাহিত করে তৃতীয় দিনে উপনীত হবেন ফ্রেডরিক নগরে। বস্তুত এই ফেরঙ্গ-জনপদটিও তাঁর লক্ষ্যস্থল নয়, তিনি যাবেন রাধাবল্লভপুরে এই ফেরঙ্গ-শহরের উপকণ্ঠে।

চিহ্নিত পথরেখা যেমন নাই তেমনি চিহ্নহারা আলপথে বিপদও কিছু নাই। পথে মাঝে হয়তো কিছু জঙ্গল পড়বে, কিন্তু হিংস্র স্থাপদের আশঙ্কা নাই। আর চোর-ডাকাতের উপদ্রবও নাই।

রাপেন্স তাঁর সহধর্মিণীর হাত ধরে যে চিহ্নহারা পথে যাত্রা করলেন সেই পথেই আজ বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসে শত শত তীর্থযাত্রী। তাদের সম্বল ঝাঁকে ফুলের মালা, ঘটে গঙ্গাজল, কপালে শ্বেদবিন্দু, আর মুখে ধর্মবিশ্বাসের লোকায়াতধ্বনি : ভোলেবাবা পার করে গা।

তারেকেশ্বর ত্যাগ করে গাছ-গাছালির অন্তরাল অতিক্রম করে ফাঁকা মাঠে পড়েই নজর হল সামনের দিকে একদল যাত্রী। প্রায় আধক্রোশ দূরে। তারাও চলেছে পূর্বাভিমুখে। বোধ করি একই লক্ষ্যমুখে। এতদূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে দলে পনের-বিশজন পুরুষ-স্ত্রী; কিছু অল্পবয়সীও আছে। পুরুষদের অনেকের কাঁধে ঝাঁক। তাতে মালপত্র দুটি মালবাহী অশ্বতরও আছে। অনুমান হয়—ওরা সদলবলে চলেছে নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে—পশ্চিম থেকে পূর্বে—বোধকরি ভাগীরথীর পূর্বপারে। বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হওয়ার পর থেকে এ দৃশ্য পৌনঃপুনিকতায় ক্লাস্তিকর।

ব্যবধান ক্রমে কমে আসছে। সম্মুখবর্তী দলে আছে বৃদ্ধ ও শিশু; পুরুষেরা মালবাহী। এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে ওরা বাউল। কিন্তু বাউলদের মতো পুরুষেরা প্রকৃতিদত্ত শাশ্রু ও ওষ্ঠলোম রাখেনি, যদিও মাথার চুল উচু করে চূড়া বেঁধেছে—যাকে বাউলেরা বলে ‘ধম্মিল’। অনেকের উর্ধ্বাঙ্গে খেঁকা, কাঁধে ঝুলি, হাতে লাঠি। তাদের সঙ্গিনীদের চুলও চূড়া করে বাঁধা, কারও বা পরনে গিরিমাটিতে ছোপানো শাড়ি।

দ্বিপ্রহরে দূর থেকে নজর হল দলটি একটি দীর্ঘিকার পাড়ে জমিয়ে বসেছে, প্রকাণ্ড একটা বটগাছের ছায়ায়। রাপেন্স বললেন, মনে হচ্ছে ওরাও গঙ্গার দিকে চলেছে, তীর্থযাত্রী। চল, গিয়ে আলাপ করা যাক। অজানা পথে বড় দলে একসাথে যাওয়াই সুবিধাজনক।

আপত্তি জানালো মঞ্জুরী, না! দেখছ না, ওরা ফলারের আয়োজন করছে। এখন আমরা গিয়ে উপস্থিত হলে ওরা বিব্রত হবে। এই তো কাছেই গ্রাম। আমরা বরং সেদিকেই এগিয়ে যাই। গায়ে হয় তো দোকানে কিছু খাবার কিনতে পাওয়া যাবে। একই দিকে গেলে পথে আবার নিশ্চয় দেখা হবে।

কথা ঠিক। দলপতি বৃক্ষতলে একটি কিলিঞ্জকে এলিয়ে পড়েছেন—শরকাঠির মাদুর ভর কি। ওরা পোটলা-পুটলি খুলে মধ্যাহ্ন-আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। চক্ষুলজ্জা এড়াতে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ওঁরা দলটিকে অতিক্রম করে যেতে চাইলেন; কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। হঠাৎ একটি মেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে। বাধ্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মেয়েটির বয়স রাপেন্সেরই কাছাকাছি, হয়তো কিছু কম—রীতিমতো সুন্দরী, সুঠাম শরীর,

গরাকেশ্বর

মেদবর্জিত, নাকে রসকলি, ধমিল্লর চারপাশে একটা রঞ্জনফুলের মালা জড়ানো। গেরুয়া রঙের শাটিকা, উর্ধ্বাঙ্গে ঘননিবদ্ধ কঞ্চুলিকা। কাছাকাছি এসে সে যুক্তকরে দণ্ডবৎ হল রূপেন্দ্রর সম্মুখে, কিন্তু প্রশ্ন করল তাঁর সঙ্গিনীকে, তুমি কুসুম না?

মঞ্জরীও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ...

যুবতী সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তার ডাগর চোখদুটি মেলে রূপেন্দ্রর দিকে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকায়। বলে, আপনিই তাহলে সেই ধনুস্তরি?

রূপেন্দ্র বলেন, আমার নাম শ্রী রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মা ...

দেখ-না-দেখ মেয়েটি পথের উপরেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। রূপেন্দ্র বিব্রত; কিন্তু বিভ্রমনার তখনো বাকি। পরমুহূর্তেই মেয়েটি উঠে দাঁড়ায় আর অনায়াসে রূপেন্দ্রর দক্ষিণ মণিবন্ধ চেপে ধরে বলে, এমন আড়াল দিয়ে পালিয়ে গেলে তো চলবে না। আপনি আমার বোনাই! এস কুসুম—কর্তামশায়ের সঙ্গে আলাপ করবে—

গোটা দলটাই উন্মুখ আগ্রহে লক্ষ্য করছে। দলপতিও উঠে বসেছেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেশবাস অন্য সকলেরই মতো, শুধু উর্ধ্বাঙ্গে পিরানের পরিবর্তে 'চিন্তা-কস্থা'—অর্থাৎ নানারঙের কার্পাসখণ্ড, শেলাই করে বানানো আলখাল্লা ধরনের একটি পোশাক—বোধকরি দলপতির শনাক্তিচিহ্ন।

মেয়েটি বললে, কর্তামশাই! এই, দেখুন, কাদের ধরে এনেছি। এ হচ্ছে আমার বোন—রূপনগরের সেই রাইরানী, আর ইনি সেই সোএরাই গায়ের ধনুস্তরি।

দলপতি উৎফুল্ল হয়ে সাদর অভ্যর্থনা করেন, কী সৌভাগ্য আমাদের! আসুন, বসুন।

অগত্যা বসতে হল। মেয়েটি এতক্ষণে কুসুমমঞ্জরীকে বলে, তুমি আমাকে চিনবে না। আমিও রূপনগরের মেয়ে। তোমাকে বারে বারে দেখেছি। তোমাদের কথা আমার সব জানা। কোথায় চলেছ তোমরা?

প্রত্যুত্তর করলেন রূপেন্দ্র, দলপতির দিকে ফিরে। বলেন, আপাতত চলেছি হরিপাল। সেখান থেকে সিক্কুর হয়ে গঙ্গাতীরে, ত্রিবেণী।

—বাঃ! বাঃ! আমরাও তাই। তাহলে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হয়? বিশ্রাম করুন। সেবা করুন। তারপর এক সঙ্গে রওনা দেওয়া যাবে। সন্ধ্যার পূর্বেই হরিপালে পৌঁছে যাব।

রূপেন্দ্র বলেন, এ তো আনন্দের কথা। তবে একটি শর্ত আছে গৌসাইজী, তীর্থের পথে প্রতিগ্রহ গ্রহণ করতে নেই। আপনি যদি স্বীকৃত হন ...

হাত তুলে বৃদ্ধ ঠেকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তিন-চার দিন একসাথে চলতে হবে। বেশ তো, এর পর না হয় তাই হবে। কিন্তু প্রথমবার শু কণ্ঠা ওঠে না। আপনি অতিথি। আমাদের ব্রাহ্মণ সেবার পুণ্যফল থেকেই বা কেন বঞ্চিত করেন? আর আয়োজন আমাদের সামান্যই—কাঁচা ফলার। দ্বিতীয়ত আমি 'গৌসাই' নই...

—বাউল সম্প্রদায়ের দলপতিকে 'গৌসাইজী' সম্বোধন করাই তো প্রথা,...

—তা ঠিক। তবে আমরা বাউল নই, আউল।

—বাউল নন, আউল! উভয়ের কী পার্থক্য?

—ব্যাকুলতা আর আকুলতার মধ্যে যা। গুঁরা 'অচিন পাখির' সন্ধানে ব্যাকুল, আর আমরা

‘মনের মানুষের’ সন্ধানে আকুল। তা সেসব তত্ত্বকথা পরে হবে, আপাতত এই দীঘিতে হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।

আয়োজন সতাই সামান্য—সিঁড়ি চিপটিক, ইক্ষুগুড়, কদলী এবং খুরমো।

আহারান্তে সামান্য বিশ্রাম। সেই অবকাশে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেল।

এ মেয়েটি—রাধারানী—এ দলে আছে মাত্র কয়েক মাস। রূপনগরেরই মেয়ে। বন্দিনী ছিল মোহন্ত মহারাজের কুঞ্জে। চার পাঁচ বছর। প্রাক্তন রাইরানী। বর্গীরা যখন রূপনগর বিধ্বস্ত করে তখন সে প্রাণভয়ে অজয়ে ঝাঁপ দেয়। অনেক ঘাটে জল খেয়ে এখন এই দলে এসে মিশেছে। তারও সংসারে ফিরে যাবার পথ নেই—অবশ্য সংসার বলতে কিছু আছে কি না, তাও জানে না মেয়েটি।

এরা ‘বাউল’ নন, ‘আউল’। এই সম্প্রদায়ের কথাও কিছু শোনা গেল।

এ মতের—অন্তত এই দলের—আদি প্রবক্তার নাম: আউলেচাঁদ।

নদীয়ার উলা-গ্রামে—এ যার নাম পরবর্তীকালে হয়েছিল বীরনগর—সেখানেই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে আউলেচাঁদের আবির্ভাব। তাঁর পিতামাতার পরিচয় জানা যায় না। পরম্পরায় জনশ্রুতি ১৬১৬ শকে (1694 খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার তাঁকে আবিষ্কার করেন উলাগ্রামের এক বারুজীবী—নিজের পর্ণক্ষেত্রে। অজ্ঞাতকুলশীলটিকে পুত্রস্নেহে পালন করতে থাকেন। এ বারুজীবীর নাম—মহাদেব। দ্বাদশ বৎসর বয়সে আউলেচাঁদ এ পালক পিতার গৃহত্যাগ করেন, কিছুদিন এক গন্ধবণিকের গৃহে অবস্থান করেন। পরে এক ভূমামীর ভদ্রাসনে কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু সংসারে আবদ্ধ থাকার জন্য তিনি ধরা-ধামে আসেননি। পুনরায় গৃহত্যাগ। বঙ্গদেশের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সাঁইগ্রিশ বৎসর ষয়সে বেজরা গ্রামে প্রকট হন। অনতিবিলম্বে তাঁর বাইশজন শিষ্য হয়। তার মধ্যে হট্ট ঘোষ, কৃষ্ণদাস হরি ঘোষ, রায়পাল প্রভৃতি প্রধান। এ বাইশজন শিষ্য নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করতেন। নিম্নাঙ্গে কৌপীন, উর্ধ্বাঙ্গে খেঁক—আউলেচাঁদ একটি সহজ সরল ধর্মমত প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর মতে হিন্দু, মুসলমান, স্নেহে সবাই সমান—সকলের অন্নই গ্রহণ করতেন নির্বিবাদে। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত গান:

“এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো?

এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে সত্য কথা বলো।

এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন,

জয়কর্তা বলি, বাহ তুলি, করে প্রেমে ঢলোঢল।

এ যে হাবা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো ॥

এ ভাবের মানুষ কোথা থেকে এলো?”

আউলেচাঁদ দেহ রাখেন আমাদের কাহিনীকালের অনেক পরে, ১৬৯১ শকে (1770 খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই আদিম শিষ্যদের এক একজন এক-এক মতের প্রতিষ্ঠা করে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করেন। কেউ কেউ অবশ্য গৃহাশ্রমেও প্রত্যাবর্তন করেন। আউলেচাঁদের দেহাবসানের পর ঘোষপাড়ার সদেগাপ রামশরণ পাল যে দলটি গড়েন তাই পরবর্তীকালে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। সে দলের নাম: কর্তাভজা।

এই সম্প্রদায়ে গুরুকে বলা হয় ‘মহাশয়’ আর শিষ্যের নাম ‘বরাতি’। আউলেচাঁদ হচ্ছেন ‘আদি-মহাশয়’। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য—যিনি আমাদের কাহিনীবর্ণিত দলটির প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর নামটা জানা যায় না; কারণ দলে তাঁর নাম ‘প্রথম মহাশয়’। রূপেন্দ্রকে যিনি আপ্যায়ন করে বসালেন তিনি তাঁরই প্রত্যক্ষ শিষ্য—‘দ্বিতীয় মহাশয়’ সংক্ষেপে এখন ‘কর্তামশাই’।

রূপেন্দ্র এদের ধর্মমত এবং আচরণবিধি বিষয়ে কৌতূহল দেখালে কর্তামশাই করজোড়ে বললেন, “আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা, আপনাকে হইবে আপনি সাবধান।”

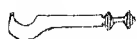
রূপেন্দ্র লজ্জিত হয়ে বলেন, মার্জনা করবেন। সত্যই তো, আমি বহিরাগত; আমার কৌতূহলী হওয়া ঠিক হয়নি।

কর্তামশাই রূপেন্দ্রর হাতদুটি ধরে বলেছিলেন, না—না—না! আপনাকে বলব। সব কথা খুলে বলব। বিশেষ হেতুতে। তবে এখন নয়। সুযোগ মতো।

রূপেন্দ্র জানতে চান, নবদ্বীপে আরও কয়েকটি সাধক-সম্প্রদায়কে দেখেছি, যাদের দেখলে বাইরে থেকে মনে হয় তাঁরা বাউল—কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন যে, তাঁরা বাউল নন। কেউ দরবেশ, কেউ ন্যাড়া। তাঁরাও কি আউলেচাঁদের শিষ্য?

কর্তামশাই বললেন, না, না। সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানান সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। ‘আউল’ শব্দটা সহজবোধ্য বলে আমি সেই পরিচয়ই আপনাকে দিয়েছি। বাস্তবে আমরা ‘আউল’ও নই—তার একটি বিশেষ শাখা—যার নাম ‘সহজিয়া’ বা ‘সহজী’। এই মতটি সদ্যপ্রসূত। আপনি যাদের কথা বললেন, তাঁরা আউলেচাঁদের প্রবর্তিত সাধক সম্প্রদায়ভুক্ত নন। ‘দরবেশ’ অথবা ‘সাই’ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী। তারা নামে ‘উদাসীন’ হলেও প্রত্যেকের এক-একজন প্রকৃতি-সাধিকা থাকে। তবে তারাও হিন্দু-মুসলমানের ফারাক মানে না। বলে, “ক্যা হিন্দু, ক্যা মুসলমান। মিল্‌জুলকে কর সাইজীকা নাম।” আর ঐ ন্যাড়া সম্প্রদায়ও আউলেচাঁদ প্রবর্তিত নয়। তার আদি গুরু হচ্ছেন—প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। শোনা যায়, প্রভু নিত্যানন্দ তাঁকে স্বমত-বহির্ভূত দেখে ত্যাজ্যপূত্র করেন। আর বীরভদ্র এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরাও বাউলদের মতো বিশ্বাস করেন, মানবদেহের মধ্যেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান। কিশোরীসাধন ও প্রকৃতিভজনের পথেই পরমাত্মাকে পাওয়া যায়।

রূপেন্দ্রের দুরন্ত কৌতূহল ইচ্ছিল জানতে—ও বিষয়ে ‘কর্তামশাই’ কী সিদ্ধান্তে এসেছেন—ঐ প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব বিষয়ে। দলে জনা-দশেক পুরুষ এবং প্রায় সাত জন রমণী—কিশোরী থেকে প্রৌড়া। দলপতির সাধনসঙ্গিনী আছে বলে মনে হল না—অস্তুত বয়সের দিক বিচার করে। এরা কি ‘উদাসীন’? ইন্দ্রিয়-সংযম করে থাকেন? ‘সহজী’ নামটিরই বা তাৎপর্য কী? কিন্তু সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল দেখালেন না।



হরিপালে এসে দলটি পৌছাল পড়ন্ত বেলায়। অপরাহ্নকালে। ওঁরা আশ্রয় নিলেন গ্রামপ্রান্তের হাটতলায়। হরিপাল একটি অতি প্রাচীন এবং এখনো বর্ধিষ্ণু গুপ্তগ্রাম। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, জল-অচল—নানান জাতির বাস, বিভিন্ন পল্লীতে। গ্রামের ঠিক বাহিরে প্রশস্ত মাঠের মাঝখানে হাটতলা—এখন সম্পূর্ণ জনহীন। সপ্তাহে মাত্র একদিন এখানে জমায়েত হয়

পঞ্চগ্রামের মানুষ—ব্যাপারি আর হাটুৱে। সকাল থেকেই সার বেঁধে আসে গো-গাড়ির মিছিল। মধ্যাহ্নকালে প্রচুর জনসমাগম। হাটতলায় বাঁশের খুঁটির উপর উলুখড়ের দোচালা—প্রায় শতহস্ত পরিমাণ দৈর্ঘ্যের; কিন্তু প্রস্থে অত্যন্ত অল্প। দুজন ব্যাপারি পিঠোপিঠি বসতে পারে মাত্র। হাটুৱেদের সচরাচর কেনাবেচা করতে হয় খোলা আকাশের নিচে। হাটবারে অপরাহ্নকাল পর্যন্ত চিংকার চোঁচামেচিতে হাটতলা সরগরম; তারপর সন্ধ্যার আগেই সব ভোঁ-ভোঁ। পুরো ছয়দিন তা জনশূন্য।

দেখা গেল দলের সবাই করিৎকর্মী। ভ্রাম্যমাণ দলটির সকলে যে-যার কর্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। জনা-ছয়েক বরাতি অশ্বতরের পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে সাজিয়ে ফেলল। দলপতির জন্য পেতে দিল মাদুর। দু-জন গেল জল আনতে, আরও দু-তিনজন কাঠের উনানে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ও-বেলা কাঁচা ফলার হয়েছে, এ-বেলা অন্নসেবার আয়োজন। বাদবাকি সবাই একতারা, ক্ষমক, খঞ্জনী নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল—নামগান শোনাতে আর ভিক্ষা করতে। কুসুমমঞ্জরীও রাধারানীর সঙ্গে রান্নার জোগাড়ে গেল।

হাটতলা নির্জন দেখে কর্তামশাই রূপেন্দ্রর কাছে ঘনিয়ে এসে বললেন, তখন যে কথাটা বলা হয়নি এবার তাই বলে নিতে চাই—আউল-বাউলদের অন্তরঙ্গ কথা।

এবার কিন্তু রূপেন্দ্র নিজেই আপত্তি তোলেন, থাক না কর্তামশাই। আমি বহিরাগত, পথ-চল্তি সঙ্গীমাত্র। আপনি নিজেই তখন বললেন, এই সাধনমার্গের কথা যথা-তথা বলা বারণ—

কর্তা-মশাই ঠুঁকে বাধা দেন, ‘যথা-তথা’ তো বলছি না ধ্বস্তুরি মশাই! যতই নিজেকে ঝুকিয়ে রাখার চেষ্টা করুন, আমি সব জানি, স—ব জানি!

—কী জানেন?

কর্তা-মশাই এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেন, আপনি একজন শাপশ্রষ্ট সিদ্ধপুরুষ!

রূপেন্দ্র স্তম্ভিত। এমন আজব কথাটা শুনে হবে তা আন্দাজ করতে পারেননি।

—কেন্দুবিষের মেলায় আমি সমস্ত বিবরণ শুনেছি! রূপনগরের অশ্বারোহী ফৌজ কী-ভাবে দামোদরে ভেসে গেল!

—কী ভাবে?

—ওরা যখন দামোদর অতিক্রমণ করছিল তখন আপনি মন্তোচ্চারণ করেন! তৎক্ষণাৎ দামোদরে এসে যায় অকাল ঝাড়াঝাড়ির বান! গোটা ফৌজ ভেসে গেল। শুধুমাত্র সেনাপতির রণহস্তী নলগিরি এসে লুটিয়ে পড়ল আপনার শ্রীচরণে!

বজ্রাহত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ! লোকগাথার কী অপরিসীম মহিমা! লৌকিক ক্রিয়াকলাপকে অলৌকিকত্ব দানের কী বিচিত্র প্রবণতা! বছর ঘোরেনি, অথচ তিনি উপকথার নায়ক হয়ে গেছেন মুখে-মুখে! এমনকি ‘হেরম্বদাস’-এর নামটাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী অনুসারে।

তিনি যতই দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করতে যান ততই কর্তামশাই সর্বোচ্চ মাতা নেড়ে বলতে থাকেন, জানি, জানি, এটাই যে সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ! তাঁরা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না

হরিদাস

তাদের অলৌকিক বিভূতির কথা!

উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হল। কর্তা-মশাই এর পর নিম্নস্বরে বলে গেলেন তাদের সাধনমার্গের গুপ্ত কথা। তাঁর অন্তরে যে সংশয় জেগেছে, যে সন্দেহের দোলায় দুলছেন—তার নিরাকরণের পথটি উনি খুঁজে পেতে চান এই সিদ্ধপুরুষের নির্দেশে। দৈবাৎ যখন সাক্ষাৎ পেয়েছেন তখন তিনি কিছুতেই এ সুযোগ ছাড়বেন না। সব কথাই তিনি খুলে বললেন— বাউল-তত্ত্ব আর ‘সহজী’-পন্থীদের মতপার্থক্যের কথা, কী তাঁর সংশয়, কোন বিষয়ে তিনি পরামর্শ চাইছেন:



‘বাউল’-তত্ত্বের মতো ‘বাউল’ শব্দটির উৎপত্তিও রহস্যাবৃত। ক্ষিতিমোহন সেন-মশায়ের মতে বায়ুগুপ্ত অর্থাৎ পাগলাটে ধরনের মানুষকে লোকে বাউল বলত, অথচ ব্রজেননাথ শীলের সিদ্ধান্ত ‘আউয়াল’ শব্দ থেকে প্রথমে ‘আউল’ এবং পরে ‘বাউল’ শব্দের উৎপত্তি। সুনীতিকুমার বলেছিলেন, দেশজ শব্দ ‘বাউল্যা’ এর গঙ্গোত্রী। আবার ইদানীং কোন কোন পণ্ডিতের মতে ‘ব’-সাধনায় ‘উল’ বা সিদ্ধিলাভ যে করেছে সেই হচ্ছে ‘বাউল’। তা এসব তো আজকালের কথা। আমাদের কাহিনীর কালে কোথায় বা ব্রজেন শীল আর কোথায় বা সুনীতি চাটুজ্জে!

তা হোক, তবু তখনও বাউল সাধকেরা জানতেন ‘ব’-সাধনার কথা, এবং সেপথে কী-ভাবে ‘উল’ হতে হয়!

বাউল কোন ধর্মসম্প্রদায় নয়, গুহ্যমার্গের এক বিশিষ্ট সাধনার স্তরে সিদ্ধিলাভই তাঁদের লক্ষ্য। ত্রিকোণকৃতি ঐ ‘ব’-অক্ষরটি প্রকৃতির দ্যোতক — ত্রিবেণীর ঘাট! সেই ঘাটে জোয়ানের গোনে মীনের প্রত্যাশায় প্রহর গোণা! রজ-বীজ, নীর-ক্ষীর, রূপ-স্বরূপের ক্রিয়াচারে রসের ভেয়ানে সহজ মানুষ সেখানে মনের মানুষ খোঁজে। ব্রহ্মাণ্ড সেখানে ধরা দেয় ভাঙে! ভাঙ কোথায় পাব? কেন? এই তো নবদ্বারী মানবদেহ! পুরুষ-প্রকৃতি দমের কাজে, রসের ভেয়ানে, অটল বীজরূপী পরমাত্মার সঙ্গজনিত মহানন্দের আশ্বাস পায়। তা, এসব হল গিয়ে তত্ত্ব কথা! তুমি-আমি বুঝব না—বুঝবে রসিকজন। সহজ ভাষায়: পরমদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ মানবদেহে নিত্য বিরাজমান। তাঁকে খুঁজে দেখ, পাবে। নরদেহ পরিত্যাগ করে বেহুন্দো তাকে বাইরে খুঁজতে যেও না। এ যেন কপালে চশমা তুলে, অন্ধ হয়ে চশমা খোঁজা:

“কারে বলবো কে করবে বা প্রত্যয়।

আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।”

বাউল সচরাচর একটি মাত্র সাধনসঙ্গিনীকে নির্বাচন করে। তারই সঙ্গে জীবন বিস্কায়। সাধনপদ্ধতি অতি গুহ্য ব্যাপার। তার ভিতর এমন সব ক্রিয়াকলাপ আছে যা সাধারণ মানুষের কাছে রীতিমতো বীভৎস, ন্যাকারজনক মনে হতে পারে, যেমন ‘চারিচন্দ্রের’ ক্রিয়া। কিন্তু বাউল তাকেও পবিত্র পুরুষার্থ-সাধন বলে বিশ্বাস করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছেন, “সকল কথা অন্যের জানিবার উপায় নেই; জানিলেও পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ প্রদান সঙ্গত নহে।” মোটকথা, বাউল বিশ্বাস করেন—ঐ ঐকান্তিক প্রেম যখন পরিপক্ব হয়, তখন আর স্ত্রী-পুরুষে

ভেদাভেদ থাকে না—আত্মবিস্মৃত যুগল সাধকসামিক্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে শ্রীরাধাক্ষেপণ পবিত্রলীলায় বিলীন হয়ে যান :

‘তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি
নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি
অকৈতব ঠিক যেন ক্ষিতি—বাক্য নাই॥”

আউলেকাঁদের প্রত্যক্ষ শিষ্য ‘প্রথম কর্তা-মশাই’ এই পথেই সাধনমার্গে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তারপর তাঁর সাধনসঙ্গিনীর দেহান্তে তাঁর এক বিচিত্র উপলব্ধি হল। তাঁর মনে হল—‘বাউল’-তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। রাধাতত্ত্বের সঙ্গে পরকীয়া-তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাউল যদিও তাঁর একমাত্র ঐ সাধনসঙ্গিনীর দেহমন্দিরে ‘রাধা’কে খোঁজে, তবে সে পরকীয়া-তত্ত্বকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়। একমুখী সেই প্রেমের সঙ্গে গৃহস্থ-মানুষের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের কী প্রভেদ? দ্বিতীয়ত ঐ ‘চারিচন্দ্রভেদ’ ক্রিয়াটিকেও তিনি তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করতে পারছিলেন না। তাঁর প্রতীতি হল—এই বিশ্বপ্রপঞ্চে তো একমুখী প্রেম স্বীকৃত নয়। পশুপক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, কীটপতঙ্গ তো প্রকৃতি-পুরুষের লীলাখেলায় এই প্রাণহীন পৃথিবীকে অনায়াসে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তাদের কাছে তো স্বকীয়-পরকীয়ার প্রভেদ নেই। এই ধারণাটা শুধুমাত্র মানুষের—সামাজিক বিধানে এই বাধা। এ বাধা উত্তরণই পুরুষার্থ।

তিনি নতুন বিধান দিলেন। সহজ সমাধান—‘সহজী’ পন্থা।

বরাতিদের অর্থাৎ শিষ্য-শিষ্যাদের প্রেম একমুখীন হতে পারবে না। সবাই কৃষ্ণ, সবাই রাধা। বললেন, গুরু দুই প্রকার—দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু। বিপত্নীক দলনেতা হলেন স্বয়ং দীক্ষাগুরু। তিনি শিষ্য শিষ্যাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন—ব্যুৎপত্তি দেন সাধনমার্গের আচরণবিধি। কিন্তু নিজে তিনি ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্ত। প্রকৃতি সাধনে বিরত। কিন্তু প্রতিটি শিষ্য-শিষ্যার একাধিক শিক্ষাগুরু—এক এক রাতে এক এক জন। পর্যায়ক্রমে। দলভুক্ত প্রতিটি পুরুষের ভিতর সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করবে শিষ্যারা; যেমন প্রতিটি বরাতি প্রতিটি দলভুক্ত প্রকৃতির তনু-মন্দিরে খুঁজবে শ্রীরাধিকাকে। মন্ত্র হল :

“গুরু করব শত শত মন্ত্র করবো সার।

যার সঙ্গে মন মিলবে দায় দিব তার॥”

শিষ্য-শিষ্যা জোটাতে অসুবিধা হল না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পুরুষ কিসের টানে এসে জুটল তা অনুমান করা শক্ত নয়। পুরুষ সভাবতই বৈচিত্র্যসন্ধানী—‘নাঙ্গে সুখমস্তি’ মন্ত্রটা জানুক না জানুক, তারা গুটিগুটি এসে জুটল। শিষ্যারা এল নানান ঘাট থেকে—অধিকাংশই সমাজতান্ত্রা। উপায়াস্তরবিহীন! পতিতালয়ের চেয়ে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়লাভই বাঞ্ছনীয় মনে করল তারা।

দ্বিতীয় কর্তা-মশাইও এসে যোগদান করেছিলেন প্রথম যৌবনে।

দীর্ঘদিন সহজী-পন্থায় সাধনভজন করে পুথক আখড়ায় এখন গদিয়ালি হয়েছেন।

‘কর্তা-মশাই’ পদলাভ করেছেন প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে। অসুবিধা হয়নি কিছু। যৌবন তখন অন্তর্মিত। প্রথম সমস্যা দেখা দিল বছর-পাঁচেক আগে। মনে সংশয় জাগল—গথটা কি ঠিক? এ সন্দেহ জাগল একটি সদ্য আগত দম্পতিকে কেন্দ্র করে। তারা স্বামী-স্ত্রী—যুগলে এসে

হরিদাস

যোগদান করল সম্প্রদায়ে, বিচিত্র হেতুতে : শীতলচন্দ্র আর রুক্মিণী।

শীতলচন্দ্র সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান। ব্রাহ্মণ, কিন্তু সব ছেড়ে-ছুড়ে সংসার ত্যাগ করে স্ত্রীর হাত ধরে পথে বার হয়েছিল। এ-ঘাট সে-ঘাট সেরে এসে পৌঁছালো ওঁদের আখড়ায়।

শীতলের বিবাহ হয়েছিল তের বছর বয়সে, ভিন্গাঁয়ের এক নোলক-দোলানো নবমবর্ষীয়ার সঙ্গে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে গৌরীদানের পর রুক্মিণীর পিতৃদেব তাকে স্বগৃহেই মানুষ করেছিলেন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বৈবাহিককে সংবাদ পাঠালেন—এবার দ্বিরাগমনের আয়োজন করতে। বিবাহের অব্যবহিত পরে যদি দ্বিরাগমন হয়, তাহলে দিনক্ষণ দেখতে হয় না। অন্যথায় বৈশাখ, অগ্রহায়ণ অথবা ফাল্গুন মাসে—রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি শুদ্ধ থাকলে—যাত্রোক্ত শুভলগ্নে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। শীতলের পিতৃদেব দিনক্ষণ বিচার করে পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন স্বশুরালয়ে। প্রত্যাগমন দিবসের এক সপ্তাহ পূর্বেই। অনুরোধটা সেই জাতেরই ছিল বৈবাহিক মহাশয়ের—নতুন জামাইকে কিছু আদর-আপ্যায়ন করতে চায় পুরুললনার দল। শীতল তখন বিশ্বেতিবর্ষীয় তরুণ, রুক্মিণীর যৌবনভারনন্দ দেহে ঘোলকলা পুরেছে। মাত্র সাতটি দিবসরজনীর সাধনা—কিন্তু তার ভিতরেই শীতলচন্দ্র তার সহধর্মিণীর মধ্যে উদ্ধার করল : শ্রীরাধাকে।

শীতলের পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জ্যোতিষগণনায় বোধকরি কিছু ভ্রান্তি হয়ে থাকবে। দ্বিরাগমন নির্বিঘ্নে হল না। প্রত্যাবর্তনের পথে নববধূর পাঙ্কি রুখল একদল ডাকাত। বাধা দিতে গিয়ে শীতল মারাত্মকভাবে আহত হল। সালঙ্কারা ষোড়শী অপহৃত হইল ডাকাতের হাতে। সে আমলে জমিদারের হাতি বড়ো হয়নি, তার গলায় ঢন্‌ঢন্‌নিয়ে ঘণ্টা বাজতো না—কিন্তু ঢাকিরা তখনো খালে-বিলে ঢাক বাজাতো! এ ঢাকের বাদ্যি যে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে শেষ প্রলয় তক্‌। মারাত্মকভাবে আহত শীতলচন্দ্র তার সহধর্মিণীকে অবশ্য ঝুঁজে পেয়েছিল বনমধ্যে। না, তাকে ঝুঁজতে হয়নি, ঝুঁজে পেয়েছিল মেয়েটিই। নববধূর যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করে নিয়ে গেছে ডাকাতদল। তার সঙ্গে আরও কিছু। শাখা-সর্বশ্ব একবস্ত্রা ধর্মিতাকে অরণ্যেই অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে। জ্ঞান ফিরে আসার পর টলতে টলতে সে ফিরে আসে দুর্ঘটনার স্থলে। শীতল তখনো অচৈতন্য। তার মাথা ফেটে গেছে। রক্ত বরছে। রক্তক্ষরণ অবশ্য ঐ হতভাগিনীরও হচ্ছে তখনো—মাথা থেকে নয়, উর্ধ্বাঙ্গ থেকেই নয়। তবু পার্বত্য বরনায় শাড়ির ঝাঁচল ভিজিয়ে সে বারে বারে মুছিয়ে দিল স্বামীর ক্ষতস্থানটা। ক্রমে তারও জ্ঞান হল।

হতভাগ্য দম্পতি পদব্রজে ফিরে এল তাদের ভিটেতে, বহু কষ্টে।

তখনই শুনল মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা! নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঐ অপবিত্রা পুত্রবধূকে ঠাই দিতে পারবেন না তাঁর ভদ্রাসনে। বাপের বাড়িতেও মেয়েটিকে রেখে আসার পথ নাই। রুক্মিণীর একটি অনুঢ়া অনুজা আছে। নিগৃহীতা আশ্রয় দিলে ব্রাহ্মণকে অনিবার্যভাবে জাতিচ্যুত হতে হবে।

হতভাগিনীর সামনে তখন তিনটি খোলা পথ : পতিতালয়, ধর্মান্তরগ্রহণ অথবা আত্মহত্যা।

শীতলচন্দ্র দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিল : চতুর্থপথ!

স্ত্রীর হাত ধরে পথে নামল সে।

অনেক ঘাটে জল খেয়ে শেষ-মেশ কর্তামশায়ের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেল। তখন তাদের অবস্থা ভারতচন্দ্র বর্ণিত শিব-অন্নপূর্ণার মতো। সহজী-মতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় মন দেবার অবকাশ নাই। বর্ষাকাল—সবার আগে চাই মাথার উপর একটা আচ্ছাদন, দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন!

সমস্যা দেখা দিল। অন্য জাতের। অচিরেই কর্তামশাই অনুভব করলেন—‘সহজীতত্ত্ব’ ওরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি, করতে পারছে না। বিচক্ষণ লোক, আন্দাজ করলেন, সমাধান নিজে থেকেই হয়ে যাবে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জীবমাত্রের ধর্ম। মানিয়ে নিয়েছিল বলে মনেও হল। তারপর সন্দেহ জাগল। নানান সূত্রে। বুঝলেন—ওদের একমুখী প্রেম বহুধা হয়নি, হচ্ছে না। না শীতল, না রুস্বিণী। তার চেয়েও অধিক খবর—আখড়ার আর সব বরাতি ওদের ঐ অদ্ভুত তত্ত্বটাই মেনে নিয়েছে। নিতান্ত গোপনে। পর্যায়ক্রমে শীতল যাকে নিয়ে শয়ন করে সে যেন তার ভগিনী; রুস্বিণী যার কক্ষে রাত্রিবাস করে সে যেন তার অগ্রজ! আশ্রমিকেরা আপত্তি করে না! ঐ ধর্মিতা মেয়েটির করুণ কাহিনী শুনে তারা কী-জানি-কেমন করে ওদের তত্ত্বটাই মেনে নিয়েছে! রুস্বিণী ‘রাধিকা’ নয়, ওদের বৌ-ঠাকরুণ!

এ কী অনাচার! আখড়ায় পাপ প্রবেশ করেছে! বিশ্বজনীন কৃষ্ণরাধা তত্ত্ব ওরা মানছে না—ঐ ওদের দুজনের ক্ষেত্রে। কর্তা-মশাই ভয় পেলেন! প্রকাশ্যে প্রশ্নটা পেশ করতে সাহস পেলেন না। যদি ওরাও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে! আশঙ্কটা অমূলক কিনা সেটা সবার আগে যাচাই হওয়া দরকার।

আশ্রমে কর্তামশায়ের জন্যে আছে একটি নির্দিষ্ট পূর্ণকুটীর, বাদবাকি সকলের জন্যে একটি প্রকাণ্ড দোচালায় ছোট ছোট খুপরি। যে গৃহটির দেওয়াল নাই।

বাঁশখুটির উপর দো-চালা আর গবাক্ষের নিম্নতল পর্যন্ত বুকা-মুলি তলতা বাঁশের বরফি-জাফরি। জানলার বালাই নেই। যেহেতু দাম্পত্যজীবনের গোপনতা নিষ্প্রয়োজন তাই গৃহনির্মাণে এই ব্যয়সঙ্কোচ। নৈশ-আহারান্তে বরাতিরা যখন সাধনসঙ্গিনীদের হাত ধরে জোড়ায়-জোড়ায় নিজ নিজ কক্ষে চলে যায় তখন বিনিদ্রনয়নে জেগে বসে থাকেন কর্তামশাই। তাঁকে দেখতে হবে, জানতে হবে—আখড়ায় অনাচার প্রবেশ করেছে কিনা। গুরুর নির্দেশ—প্রকৃতি-পুরুষের অনাবিল সাধনা অব্যাহত আছে কিনা। কৃষ্ণপক্ষের ঘনান্ধকারে ধ্বনিনির্ভর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু শুক্লপক্ষে কিছুই গোপন থাকে না।

ঘরে ঘরে সাধনরত প্রেমিকযুগল প্রকৃতি-পুরুষের সেই আদিম সংস্কারে কৈবল্যানন্দ লাভের জন্যে উদ্ভ্রীব আর বৃদ্ধ নিঃশব্দ পদসঙ্ঘরে সারারাত ঘুরে মরেন অতৃপ্ত প্রেতের মানসিকতায় বক্ষপদ সরীসৃপের ভঙ্গিতে। কোন কক্ষে কীজাতের ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে! শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলা যেমন ক্রমশ পূর্ণতার পথে অভিসারী, ঠাঁর প্রত্যক্ষজ্ঞানও তেমনি তিল তিল করে পরিণত হতে চলেছে। ক্রমে দৃঢ় প্রতীতি জন্মালো—ঠাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। রুস্বিণীকে একরাতেও দেখতে পেলেন না আশ্রমিক কোন বরাতির বাহুবন্ধে পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা দিতে। তেমনি আশ্রমের অন্য কোন নারীকেও বারেকের তরে দেখতে পেলেন না শীতলচন্দ্রের বক্ষলীনারূপে! এ কী অনাচার! এ কী পাপ!

তারপর এক রাত্রি। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি। ফিন্কে দিয়ে কাকজোৎস্না ফুটেছে। বৃদ্ধ

জানতেন পালা-বদলের পালায় পর্যায়ক্রমে সে রাত্রে শীতলচন্দ্র আর রুক্মিণী একই সাধন কক্ষে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চরাচর নিস্তব্ধ। নিঃশব্দসঞ্চারী উরগের মতো চার হাতে-পায়ে এগিয়ে এলেন সেই নির্দিষ্ট কক্ষটির নিকটে। অতি সন্তুর্ণণে কক্ষমধ্যে দৃকপাত করেই বৃদ্ধ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন। হ্যাঁ, সাধনতত্ত্বের গৌরীশৃঙ্গে উন্নীত হয়েছে, ওরা—“তখন আপনি পুরুষ কি প্রকৃতি/নাইকো জ্ঞান কিছুই স্থিতি—”

ওরা বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। কিন্তু তিনি? যা জ্ঞানবার তা তো জেনেছেন, তাহলে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছেন না কেন? সরে যেতে পারছেন না কেন অন্তরালে? প্রচণ্ড আত্মধিকারে মনটা বিষিয়ে গেল! কোনক্রমে টলতে টলতে ফিরে এলেন নিজের কক্ষে। আত্মদর্শন হল যেন। এই যে পক্ষকাল ধরে একটি বৃদ্ধ অতৃপ্ত প্রেতের মতো ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে ফিরেছে সে কি সত্যই আশ্রমের হিতার্থে সরেজমিন তদন্ত করছিল? নাকি সেই হতভাগ্য ছিল যৌবনোত্তীর্ণ এক সঙ্গীহীন দর্শনকামী? তত্ত্বদর্শন নয়, চর্মচক্ষুর দর্শন! না হলে কেন শ্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে তাঁর ললাটে, দ্রুততর হয়েছে নাড়ির গতি, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সর্বদেহ।

ছি—ছি—ছি! এ কী দেখলেন! তার চেয়েও বড় কথা—দর্শনজনিত এ কী অসংযমী অধঃপতন!

শীতল আর রুক্মিণীকে পরদিন বিতাড়ন করলেন আশ্রম থেকে। নিজে চান্দ্রায়ণ ব্রতে প্রায়শ্চিত্ত করলেন একমাস কাল।

রূপেন্দ্র বলেন, তাহলে আপনার সমস্যা তো মিটেই গেছে। নিজেও প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, অপরাধীরাও বিতাড়িত হয়েছে।

চক্ষুমার্জনা করে কর্তা-মশাই বললেন, না, ধন্বন্তরি-মশাই। সমস্যা মেটেনি। আবার নতুন জাতের সমস্যা দেখা দিয়েছে। সে বিষয়েই আপনার পরামর্শ নিতে চাই। কিন্তু তার পূর্বে আমাকে বলুন—আমাদের এই সহজিয়া সাধনমার্গের মূলেই কি কোনও ভ্রান্তি আছে? বারে বারে কেন এ জাতীয় প্রত্যবায় হচ্ছে?

রূপেন্দ্রনাথ মেদিনীবদ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। যারা ভিক্ষায় গিয়েছিল তারা এখনো প্রত্যাবর্তন করেনি। বরাতিরা দূরে দূরে নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত। কুসুমমঞ্জরী আর রাধা রন্ধনকার্যে ব্যাপ্ত। গুঁর মনে হয়—ঐ সরল জিজ্ঞাসুকে প্রত্যাখ্যান করা অন্যায্য হবে। বললেন, কর্তা-মশাই, আপনার জ্ঞান গুরুমুখীবিদ্যায়। আমার গ্রন্থমুখী শিক্ষায়। বাউল-তত্ত্ব নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে চর্চা করার সুযোগ কখনো হয়নি। তবু নানান গ্রন্থপাঠে যেটুকু জেনেছি, বুঝেছি, তা আপনাকে জানাতে পারি একটি শর্তে—যদি আপনি আমার এই বিশ্লেষণটিকে কোন সিদ্ধপুরুষের আপ্তবাক্য বলে গ্রহণ না করেন। আমি সত্যি তা নই, তবে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের চরণতলে শিক্ষালাভের সুযোগ আমার হয়েছে। তাই আমার এ-বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত তা শুধুমাত্র আমার বিবেক-নির্দেশিত। আপনি বিচার করে নিজ সিদ্ধান্তে আসবেন।

—বেশ, তাই বলুন। প্রথমে আমাকে বলুন ঐ রাধাতত্ত্বের কথা।

—প্রথমেই বলে রাখি, ‘রাধাতত্ত্ব’ আমার মতে: অর্বাচীন

—অর্বাচীন—শিহরিত হয়ে ওঠেন! —কী বলছেন আপনি! রাধাতত্ত্ব!

—না—না—না! সে অর্থে বলিনি। ‘অর্বাচীন’ বা ‘অধোগত’ বলিনি আমি। অর্বাচ শব্দের
দ্বন্দ্ব ভাবার্থে ‘অর্বাচীন’ বলেছি।

কর্তা-মশাই করজোড়ে বললেন, আমি সংস্কৃত জানি না, ধন্যন্তর-মশাই!

—মানে, অপ্রবীণ, আধুনিক, নবীন। কোন প্রাচীন শাস্ত্রে শ্রীরাধিকার উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণের
প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীমদভাগবত—সেখানে কৃষ্ণপ্রেমিকা এক সখীর উল্লেখ আছে বটে,
‘রাধা’ নাম নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবী ভাগবত, পদ্মপুরাণ এবং নারদপঞ্চরাত্রে ‘রাধার’ উল্লেখ
আছে। শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে ঘোড়শী নবযৌবনসম্পন্ন শ্রীরাধিকা ঐ সব পুঁথিতে বিষ্ণুবল্লাভা, শ্রী
বা লক্ষ্মীদেবীর গুণ ও লক্ষণযুক্ত। তিনি বৃষভানুর কন্যা নন, আয়ান ঘোষের পত্নী নন।
শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী নন। এই পরকীয়া পরিকল্পনাটি আদিতে কে করেছিলেন বলা যায় না, তবে
জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দে’ প্রথম রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার পূর্ণাঙ্গ রূপটি বিকশিত হল। বসন্তরাস,
মান, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিরহ, মিলন প্রভৃতি দ্বাদশসর্গে এবং বাইশটি গীতে তাঁর রাধাকৃষ্ণ
লীলা বর্ণিত। এই গীতগুলি প্রাকৃত শব্দের মিশ্রণে সংস্কৃতে রচিত। তারপর আবির্ভূত হলেন
নানান পদকর্তা। ঋটি বাঙলায় প্রথম পুঁথি বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’। শ্রীচৈতন্যদেবের
আবির্ভাবের পর রাধাকৃষ্ণ-লীলার দৃষ্টিকোণ কিছু বদলে গেল। ‘দেহজ-মিলন’ স্থলে
‘ভাব-মিলন’। কিন্তু ‘রাধাতত্ত্বের’ কথা থাক। যে নামেই ডাকুন, আপনাদের, তথা বাউলদের
সাধনতত্ত্বের গভীরে বাস্তবে আছে ‘প্রকৃতি-পুরুষ’ তত্ত্ব। এটি আদৌ ‘অর্বাচীন’ নয়। প্রাগায়
সভ্যতাতেও পুরুষ ও স্ত্রী জাতির লিঙ্গপূজার আয়োজন ছিল। চীনখণ্ডেও অনুরূপ ‘য়াঙ-য়িং’
তত্ত্ব অতি পুরাতন। আপনারা সহজী-পন্থার মূলে যে অভ্যুপগমটি গ্রহণ করেছেন, সেখানে কিছু
সন্দেহের অবকাশ আছে। আপনার গুরুদেবের মতে প্রকৃতিতে একমুখী প্রেম অস্বীকৃত।
পশুপক্ষী, বক্ষপদ, মৎস্য এবং কীটপতঙ্গরা সে বিধান মানে না, এ বাধা মানব সমাজের। প্রথম
কথা—তথ্যটি নির্ভুল নয়। অনেক পশু ও পক্ষী আজীবন একমুখীপ্রেমে আবদ্ধ থাকে। তবে
স্বীকার্য, তারা সংখ্যায় অল্প। দ্বিতীয়ত মনুষ্যসৃষ্ট ব্যবস্থাপনা মাত্রেই দৃশ্যীয় এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়।
ইন্দ্রিয়-সংযম, উপচিকীর্ষা, তিতিক্ষা এগুলিও তো মনুষ্যসমাজ সৃষ্ট। ঐ যে দুজন ওখানে
অন্নপাক করছে আমাদের নৈশাহারের ব্যবস্থাপনায়, এই যে কর্মবিভাগ, পারস্পরিক সাহায্য এও
তো সামাজিক বিধানে। কই এ-সব তো ত্যাগ করছি না। তৃতীয় কথা: মানবসভ্যতা বিবাহপ্রথা
গ্রহণ করার পর প্রেমের একমুখীন স্বরূপটি সৃষ্ট হয়েছে—সে আজ কয়েক সহস্র বর্ষের
অভিজ্ঞতা। অত সহজে কি তাকে ত্যাগ করা যায়? যায় কি যায় না সেটা পরের কথা—তার
পূর্বে বিচার্য: সেটা কি বাঞ্ছনীয়? শীতলচন্দ্র আর রুক্মিণী তাদের সংস্কার পরিত্যাগ করতে
পারেনি, তাই আপনাদের মতে তারা ব্রাত্য। কিন্তু আমার মতে তারা আদৌ ‘ব্রাত্য’ নয়, তারা এ
আখড়ার প্রচুর প্রলোভনকে জয় করে তাদের একমুখী প্রেমকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন—তারা
তাদের সাধনায় উত্তীর্ণ, সার্থক। তাদের সফলতা আরও উজ্জ্বল এক কারণে যে, তারা এ
আশ্রমের অন্যান্য আবাসিকদের পর্যন্ত নিজ ধর্মমতে গোপনে দীক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারাও
ইন্দ্রিয়-সংযম করে ওদের একমুখী প্রেমকে সম্মান জানিয়েছে।

কর্তা-মশাই এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া স্তব্ধ হল তা বোঝা গেল না।

আখড়ায় নতুন জাতের কী সমস্যা হয়েছে সেটাও বলার সুযোগ হল না। এই সময়ে অন্যান্য বরাতিরা সবাই ফিরে এল।



কুসুম বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। আহানমাত্র ঠুঁর সঙ্গে নেমে এসেছিল পথে। এখনো সন্ধ্যা রাত। শুক্লা সপ্তমী। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোক, তবু পথঘাট দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। হাটতলার সীমানার বাহিরে এসে জনতে চেয়েছিল, কোথায় চলেছি আমরা?

রূপেন্দ্র বললেন, শঙ্কঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছ না? ঐ মন্দিরে। মন্দির চাতালেই গিয়ে রাতটা কাটাও।

—কেন গো? ঠুঁরা আমাদের ঝুঁজবেন না রাতে?

—না, ঝুঁজবেন না। কর্তা-মশাই বুঝবেন। কাল সকালেই তো আমরা ফিরে আসব। আমাদের ঠোঁটলা-পুঁটলি তো রেখেই যাচ্ছি—

—তা না হয় হল; কিন্তু হাটতলায় রাত কাটাতে কী অসুবিধা ছিল?

পথ চলতে চলতে রূপেন্দ্র সংক্ষেপে জানালেন ওদের নৈশ-সাধনার কৌলিক প্রথা-কথা। সে পরিবেশে রূপেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক রাত্রিযাপন করতে অসমর্থ। সব কথা শুনতে শুনতে কুসুম স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ-কথা তার ধারণার বাইরে। বৈষ্ণব বাবাজীদের অনেক কাণ্ড-কারখানার কথা সে জানে, রূপনগরের মোহান্ত মহারাজের আখড়ায় যে-জাতের ব্যাভিচার হত তাও শুনেছিল মাসির কাছে। কিন্তু প্রতি রাতে পর্যায়ক্রমে শয্যাসঙ্গীর পরিবর্তনের কথাটায় তার কেমন যেন বিবমিষার উদ্বেক হল। বললে, রাধাদিও তাই করে?

—একা সেই নয়, সবাই। এটাই তাদের কৌলিক ক্রিয়াকলাপ। ওরা সব পুরুষের ভিতর শ্রীকৃষ্ণকে, সব নারীদেহেই শ্রীরাধিকার সন্ধান করে।

—আমরা বরং এর পর একা-একাই তীর্থে-তীর্থে ঘুরব, কেমন?

রূপেন্দ্রনাথ হাসেন। বুঝতে পারেন, কুসুমের আজন্ম-লালিত সংস্কারে এ বার্তা কী জাতের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। শ্রবণমাত্র গোটা দলটাকে সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। বললেন, সে-কথা কাল বিবেচনা করে দেখা যাবে। আপাতত ঐ শয়নারতি শেষ হবার আগেই আমাদের মন্দিরে পৌঁছতে হবে। একটু পা চালিয়ে চল।

মন্দিরটি গ্রামের বাইরে। কোন্ দেবী বা দেবতার মন্দির জানা নেই। তবে আলোর একটা আভাস দেখা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে শঙ্কঘণ্টাধ্বনি। পুরোহিত বোধকরি শয়নারতি করছেন। এর পর গর্ভগৃহে শিকল তুলে তিনি চলে যাবেন। তার পূর্বেই পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে মন্দির চাতালে রাতটুকু কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা চাই। কর্তা-মশাই সহজেই বুঝবেন—কেন উনি ঐ যৌথ শয়নব্যবস্থায় সামিল হতে পারলেন না। আর ভোর-রাত্রে তো ঠুঁরা দুজন ফিরেই আসবেন।

পথ চলতে চলতে উপলব্ধি করলেন—মন্দিরটি গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে। একটা নদীর কিনার ঘেঁষে। আরও কাছাকাছি এসে বুঝলেন—এটি একটি শ্মশান। ভাঙা হাড়ি, দূরে একটি চিতা জ্বলছে। দু-চারজন ঐ অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। কথাটা প্রকাশ করলেন না। কুসুম যদি এটা খেয়াল না করে তাহলে তার পক্ষে না জানাই ভাল। অহেতুক ভয় পাবে।

কালীমূর্তি। পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করছেন। দুটি ছোট ছেলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাচ্ছে। স্থানটা বস্তুত জনমানবহীন। শুধু একজন বৃদ্ধ দোলাই গায়ে 'অন্তরাল'-এ বসে আছেন যুক্তকরে। একমাত্র দর্শক বা ভক্ত। ওঁদের দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে চোখ তুলে একবার দেখলেন। তারপর নিম্নলিখিতভাবে বোধকরি কালীস্তোত্র আওড়াতে থাকেন।

আরতি শেষ হল। পুরোহিত পিতলের প্রজ্জ্বলিত কপূর-দীপটি হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন। কাঁসরঘণ্টা বাদকদের মাথায় অগ্নিতাপ দিলেন। বৃদ্ধের দিকেও দীপাধারটি এগিয়ে ধরলেন। বৃদ্ধ দোলাই থেকে দক্ষিণহস্তটি বার করে তাপ নিলেন। তারপর পুরোহিত ওঁদের দুজনকে দেখে একটু যেন চমকে ওঠেন। দীপাধারটি বাড়িয়ে ধরেন। রূপেন্দ্র তার তাপ নিলেন, স্পর্শ করালেন কুসুমের মাথায়। এরপর চরণামৃত পান।

পুরোহিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওঁদের দেখছিলেন। রূপেন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, ভিনদেশী মনে হচ্ছে? পূর্বে তো হরিপালে কখনো দেখিনি?

রূপেন্দ্র যুক্তকরে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ভিনদেশী। বর্ধমানে বাড়ি। চলেছি ত্রিবেণীর ঘাটে। তীর্থযাত্রী। কাল সকালেই সিঙ্গুর যাব।

—মাত্র দুজন? সচরাচর এমনটি তো হয় না, বাবা?

—আজ্ঞে আমরাও বড় দলে আছি। বাকিরা হাটতলায় রাত্রিযাপন করছে। শয়নারতির শব্দ শুনে আমরা দুজন দেবীদর্শনে এগিয়ে এলাম। মা যেন ডাক পাঠালেন। মূর্তি কি মহাকালীর?

—আজ্ঞে না, ইনি বিশালাক্ষী। মহাকালীরই আর এক রূপভেদ। আপনাদের দুজনের নৈশ আহার হয়েছে? মায়ের প্রসাদ আছে—

রূপেন্দ্র বললেন, আমাদের নৈশাহার সমাপ্ত হয়েছে। তবে প্রসাদের কথা যখন বলেছেন তখন ঐ নৈবেদ্যের কণিকামাত্র প্রদান করুন। ... একটা কথা বাবা, আমরা দুজন যদি ঐ নাটমন্দিরে রাত্রিযাপন করি তাহলে কি আপত্তি আছে?

রীতিমতো চমকে উঠলেন পুরোহিত। বললেন, আপত্তির কিছু নাই। তবে এ স্থানটি জনমানববর্জিত। আমরা এখনি হারকুদ্ধ করে চলে যাব। ঐ দূরে আমার দেবোত্তর ভদ্রাসন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমার গৃহে স্থানাভাব ...

দোলাই-গায়ে এতক্ষণ নিঃশব্দে ওঁদের কথোপকথন শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দৃঢ়স্বরে তিনি বলে ওঠেন, কিন্তু আমার গৃহে স্থানাভাব নেই। না হয়, কিছু অসুবিধাই হবে; তাই বলে এই শ্মশানে একা ...

কুসুমমঞ্জরী অস্ফুটে বলে ওঠে, শ্মশান!

—দেখছ না মা? ঐ তো চিতা জ্বলছে!

রূপেন্দ্র পুরোহিতমশাইকে প্রশ্ন করেন, ওঁর পরিচয়টা ...

পুরোহিত সে-কথার জবাব না দিয়ে বৃদ্ধের দিকে ফিরে বলেন, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন

হরিদাস

ঘোষাল মশাই! মায়ের ইচ্ছায় এভাবে বাধা দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? শুনলেন না—উনি বললেন, ‘মা যেন ডাক পাঠালেন!’

ঘোষাল অহেতুক ধর-ধর করে কঁপে ওঠেন। উঠে দাঁড়ান। লুটিয়ে পড়া দোলাইটা গায়ে জড়িয়ে যুক্তকরে রূপেন্দ্রকে বলেন, না বাবা! মিছে কথা বলেছিলাম! আমার ঘরেও স্থানাভাব! আমি চলি ... তারা! তারা! মা ...

যেন আকর্ষণ কারণ-বারি পান করেছেন! টলতে টলতে বৃদ্ধ মন্দির ছেড়ে বার হয়ে গেলেন।

রূপেন্দ্র পুনরায় একই প্রশ্ন পেশ করেন, উনি কে?

—হরিপালের একজন তাত্ত্বিক গৃহস্থ। বৃদ্ধবয়সে কিছুটা মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাহলে, আপনারা দুজন ঐ মন্দির-চাতালেই রাতটা কাটাচ্ছেন? না, ভয়ের কিছু নাই। চোর-ডাকাত ব্রিসীমানায় নেই। ‘লতা’র উপদ্রবও নাই এ অঞ্চলে। কিন্তু শয্যাশ্রয় তো কিছু দেখছি না?

—একটা রাত তো! যা হোক করে কেটে যাবে।

পুরোহিত কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। পূজার বাসনপত্র অহেতুক কিছু নাড়াচাড়া করলেন। হঠাৎ ঐ ছেলেদুটিকে বিনা কারণে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বসলেন, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, ঘর যা!

ছেলে দুটি প্রায় হুড়মুড়িয়ে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল।

পুরোহিত আবার আশ্বাসবাণী শোনালেন, ‘মায়ের স্থান। ভয়ের কিছু নাই! তাছাড়া জমিদার মশায়ের ব্যবস্থাপনায় পাহারাদার চৌকি দেয়। তার ইঁাক শুনবেন প্রহরে প্রহরে—‘জাগতে রহো’! ভয় পাবেন না।

কুসুমের মুখটা রক্তশূন্য। রূপেন্দ্র বললেন, না, ভয় পাব কেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ‘মায়ের আহবানে এসেছেন! ‘মায়ের অঞ্চলতলে আশ্রয় নিয়েছেন! ভয় কী? আমি তাহলে চলি, বাবা—

কাঁসর-ঘণ্টা বাদক ছেলে দুটি তাড়া খেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু একেবারে স্থানত্যাগও করেনি। দাঁড়িয়েছিল ‘অন্তরাল’-এর স্তম্ভের আড়ালে।

পুরোহিত-মশাই এরপর যে কাণ্ডটা করলেন তার কার্যকারণ কিছু বোঝা গেল না। উনি মন্দিরদ্বারের বাহিরে একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন। ছেলেদুটিকে দেখতে পেলেন না। হঠাৎ তুলে নিলেন ফলকাটার একটা বঁটি। তার ধারালো ফলায় দক্ষিণহস্তের মধ্যমাটা চেপে ধরলেন। রক্ত ফুটে বার হল। উনি প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে ঐ বহিরাগত দম্পতির ললাটে রক্ততিলক ঐকে দিলেন।

বিস্মিত রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্নটা না করে পারলেন না, এর মানে কী?

—এটাই প্রথা! আসুন, প্রণাম করুন ‘মাকে। এবার আমি দ্বাররুদ্ধ করব।

প্রণামান্তে ওঁরা তিনজনে বার হয়ে এলেন গর্ভগৃহ থেকে।

ঠিক তখনই এগিয়ে এল কাঁসর-বাদক। আচমকা কুসুমমঞ্জরীর আঁচলে একটা টান দিল। কুসুম চমকে পিছন ফেরে। বলে, ও কী করছ?

—না, মানে দেখছি, আপনার আঁচলে চাবি বাঁধা আছে কি না!

—চাবি! কেন?

পুরোহিত-মশাই ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন ছেলেটার মাথায়। ওরা দুজন ছুটে পালালো।

রূপেন্দ্র বলেন, কী ব্যাপার বলুন তো? ওর ঐ আঙুল কৌতূহল হল কেন? আমার স্ত্রীর আঁচলে চাবি বাঁধা আছে কি না

পুরোহিত কোনক্রমে বললেন, বালকের কৌতূহলের কি কোন মাথামুণ্ড থাকে? আচ্ছা চলি! আপনার নামটিও জানা হয়নি ... না, না, থাক ... সে সব কথা কাল সকালে হবে ...



বালকের কৌতূহলের মাথামুণ্ড হয়তো সব সময় থাকে না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বালকের ঐ বিচিত্র কৌতূহলটির একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাহলে রূপেন্দ্র-কুসুম উপাখ্যান ছেড়ে তোমাদের নিয়ে যেতে হবে অতীতকালে। হরিপাল জনপদের প্রতিষ্ঠাকালের ইতিকথায়। এই মাতৃমূর্তির আদিম ইতিহাসটা না জানলে বালকের ঐ বিচিত্র প্রশ্নটা, আর ষোড়শমশায়ের আতঙ্কের তাৎপর্যটা ঠিক মতো ধরা যাবে না। এসব আমার বানানো গল্প নয় গো! রীতিমতো বইপত্র ঘেঁটে কাহিনীটি সংগ্রহ করেছি। কিছুটা পেয়েছি ‘দিগ্বিজয় প্রকাশে’, কিছুটা জেলা-ভিত্তিক গেজেটিয়ারে, কিছুটা পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত-‘বাংলায় ভ্রমণ’ গ্রন্থে (হ্যাঁ গো, তোমরা বিশ্বাস করবে তো—দুই খণ্ডে 1940 সালে প্রকাশিত সেই রেঞ্জিন-বাঁধাই 200+331 = 531 পৃষ্ঠার গ্রন্থটির মোট মূল্য ছিল দেড় টাকা!) এবং বেশ কিছুটা শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের ‘হুগলী জেলার দেবদেউল’ আর ‘হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থগুলি থেকে। স্বীকার করি—তার সঙ্গে মিশেছে অধম কথাকোবিদের কল্পনা:

গৌড়ে তখন হিন্দু রাজত্ব। পাল-বংশের আমল। সে সময়ে গৌড়াধিপতি সত্ত্বত ধর্মপালের পুত্র দিগ্বিজয়ী দেবপাল। পালবংশীয় নৃপতিগণের কয়েকটি শাখা বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী জেলার রাজা হরিপাল প্রতিষ্ঠিত রাজ্যও তার মধ্যে একটি। তাঁর পিতা কুলপাল সতীদেবীর বরে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ছিল দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ হরিপাল ও কনিষ্ঠ মহিপাল। বৃদ্ধ বয়সে রাজা কুলপাল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডেকে বললেন, আমি তোমার অনুজ অহিকেই আমার সিংহাসন দিয়ে যাব বাল মনস্থ করেছি। এ বিষয়ে তোমার কী অভিমত?

হরিপাল ছিলেন শালগ্রামশূ মহাভূজ বীর। যেমন তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, শস্ত্রশিক্ষা, তেমনই উদার হৃদয়। তিনি যুক্তকরে বললেন, আপনার আদেশই শিরোধার্য পিতৃদেব! আমার অভিমতের তো কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

মহারাজ বললেন, ওঠে। এ সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছি জান? অহি মামলক। কিন্তু তুমি মহাবীর্যবান সাবালক। তোমাকে আমি সৈন্যসামন্ত দিচ্ছি, নিজ বাহুবলে তুমি একটি রাজ্য

হরিপাল

প্রতিষ্ঠা কর এবং বংশানুক্রমে ভোগ কর। অনুজ অহি তোমার ছত্রছায়াতেই এখানে রাজত্ব করবে। এ বিষয়ে তোমার কী অভিমত?

—আমি প্রস্তুত মহারাজ!

পিতার আশীর্বাদ নিয়ে হরিপাল তখনই যুদ্ধ যাত্রা করলেন এবং পিতার জীবিতকালেই সিঙ্গুরের পশ্চিমে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন: ‘মহাগ্রাম’। তাই কালে হল: হরিপাল।

দেবভাষায় না শুনলে তোমরা হয়তো ভাববে কথাকোবিদ বানিয়ে বানিয়ে ‘গল্পে’ শোনাচ্ছে।

সূত্রাং অবহিত হও:

“সতীদেব্যো বরেনৈব ভীমভূজবলপুত্রকঃ॥ ৬৭৭

কুলপালো দেশশালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।

কুলপালস্য দ্বৌপুত্রৌ হরিপালো অহিপালকৌ॥ ৬৭৮

জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামবসতিং কৃত।

‘হরিপালো’ মহাগ্রামো হট্রবাণীসমধিতঃ॥ ৬৭৯” —দিগ্বিজয়প্রকাশ।

কী? এবার বিশ্বাস হল তো?

সে আমলে ঐ হরিপাল গ্রামের কিনার ঘেঁসে দু-দুটি নদী প্রবাহিত। একটির নাম কৌশিকী, অপরটি বিমলা। বাস্তবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাচীন দামোদর। তা সে যাই হোক, ঐ জনপদ প্রতিষ্ঠা করার পর বেশ কয়েকঘর মানুষ এসে ওখানে বসবাস শুরু করল—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ-গোপ। অচিরেই জনপদটি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে থাকে। নির্মিত হল মন্দির, চতুষ্পাঠী, পণ্যবিপণী, হাটতলা, অসংখ্য ভদ্রাসন।

কিন্তু একটি উপদ্রব লগেই ছিল। কৌশিকী নদীর কিনার ঘেঁষে ছিল এক অরণ্য। আর সেখানে বাস করত একদল দুর্ধর্ষ ডাকাত। জাতে তারা চণ্ডাল। রঘু-চাঁড়াল তাদের সর্দার। অসীম বলশালী আর অত্যন্ত দুঃসাহসী। রাজা হরিপাল বহু আয়াসেও ঐ ডাকাতদলকে ধরতে পারেননি। গ্রামপ্রান্তে কৌশিকী নদীর পাশে ছিল এক প্রাচীন ডাকাতে-কালী—তার নাম ‘চণ্ডালী-মা’। রঘু ডাকাত প্রতিবার ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে তাঁর পূজা করে যায়। হরিপালে পণ্যবাহী সার্ব্ববাহের দল রঘুডাকাতের আতঙ্কে এ রাজ্যে বাণিজ্যে আসতে সাহস পায় না। প্রায়ই ডাকাতের দল তাদের ধনসম্পদ লুটেপুটে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়—রঘুর ডাকাতির আর এক মর্মভুদ বৈশিষ্ট্য—সর্বশ্ব লুটে নেবার পর সে একটি হতভাগ্যকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ঠিক যেভাবে চণ্ডালেরা বাঁশ থেকে ঝুলিয়ে নিয়ে যায় শূকর। ঐ ডাকাতে-কালীর যুগার্ঠে বন্দীকে বলি দেওয়া হয়! মাঝে মাঝেই শোনা যায় সেই মৃত্যুভীতের করুণ আর্তনাদ—আরণ্যক অন্ধকার ভেদ করে আসছে। এই পরিবেশে কি রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্ভব?

হরিপাল বহু চেষ্টা করেও ডাকাত দলকে ধরতে পারেননি। সে আজ এখানে প্রৌঢ় কাল ওখানে। দু একবার ঔর সৈন্যদলের সঙ্গে ডাকাতদলের প্রত্যক্ষ সংগ্রামও হয়েছে। দু-পক্ষেই হতাহত হয়েছে। রঘু-ডাকাত ঘায়েল হয়নি। জনশ্রুতি, ওর হাতে ঐ চারহাত প্রমাণ লাঠিগাছখানা থাকলে তাকে ঢিল মারা যায় না। বিদ্যুৎবেগে ঘূর্ণমান যষ্টি-প্রাকারে প্রতিহত হয়ে লোষ্ট্রখণ্ড ফিরে আসে। রঘু এ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল।

তারপর একদিন। সূর্য তখন তুলারশিতে। কার্তিক মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী। রাজা হরিপালের কাছে সংবাদ এল লুট হয়েছে দ্বারহট্টী গ্রামের চণ্ডী ঘোষ-এর গদী। সর্বস্ব লুট করে ডাকাতেরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে তাঁর কিশোর বয়স্ক হতভাগ্য পুত্রকে। গ্রামের অনেকেই শুনেছে সেই কিশোরের ‘অরণ্যরোদন’।

হরিপাল সিদ্ধান্তে এলেন! এই সুযোগ! দুদিন পরেই কালীপূজা। সেই পূণ্য তিথিতে নরবলি দানের মহাপুণ্য অর্জন করতে চাইছে রঘু। তিনি গোপনে সৈন্য সমাবেশ করলেন। আন্দাজ করলেন—কালীপূজার সন্ধ্যারাত্রে আক্রমণ করলে ঐ চণ্ডালী-মায়ের মন্দিরে সদলবলে রঘুডাকাতের সাক্ষাৎ পাবেন।

হরিপালের অনুমান নির্ভুল। সমস্ত অরণ্যভূমি বেঁটন করে, পলায়নের প্রতিটি হ্রদ্রপথ রুদ্ধ করে রাজা হরিপাল হানা দিলেন মায়ের মন্দিরে।

কিন্তু অতর্কিতে কায়সিক্তি হল না। ওপক্ষও সজাগ ছিল। নিঃশব্দে নীরব্র অমাবস্যা রাত্রে অগ্রসর হচ্ছিলেন সৈন্য; কিন্তু অকস্মাৎ অরণ্য মধ্যে কোথায় যেন শঙ্খধ্বনি হল। আর তৎক্ষণাৎ অরণ্যের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে শোনা গেল দুন্দুভি নিনাদ। মন্দিরের গর্ভগৃহে যে ধৃতপ্রদীপটা জ্বলছিল এতক্ষণ, তা দপ্ করে নিভে গেল।

অন্তরীক্ষ থেকে যেন দৈববাণী হল : শুনরে হরি-রাজা! তুই মোরে দ্যাখতি লারহিস্। তোরা শহুরে মনিষি—আধারে দ্যাখতে পাস্নে! কিন্তুক মুই তোরে দ্যাখতে পাই! পেতায় না হয় তো বল—এক বাণে তোরে ঝুড়ে দিই!

রঘুডাকাতের কণ্ঠস্বর! হরিপাল বোঝেন, এ ওর ত্রাসসঙ্করী মিথ্যা আশ্বাসন। এ নীরব্র অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখা সম্ভবপর নয়। কিন্তু মশাল জ্বালা চলবে না—তাহলেই তাঁদের বাণবিদ্ধ হতে হবে। হরিপাল গর্জে ওঠেন, রঘু! তুই চণ্ডী ঘোষের ছেলেটাকে তুলে এনেছিস?

—হঁ রে! তারে বলি দিব আজ। তা হঁ রে রাজা—তুইও তো হেঁদু! মায়ের পূজায় বাধ সাধ্ছিস্ কেনে রে?

রাজা বললেন, আজ কালীপূজা। আমি মায়ের পূজা করতে এসেছি। তুইও তো হিন্দু রে রঘু! তুই আমাকে রুখ্ছিস্ কোন অধিকারে?

অরণ্যভূম যেন কৈপে-কৈপে উঠল দুঃসাহসী ডাকাতের অটুহাস্যে। রঘু হাসি থামিয়ে বললে, ফন্দিটো ভালই ঠাউরেছিস্ রাজা! কিন্তু এ যে চণ্ডালী মা! এ ঠাইয়ে তুই কেনে রে?

হরিপাল বললেন, না! মা সবারই মা! আমি এ রাজ্যের রাজা। মায়ের পূজার অগ্রাধিকার থাকে রাজার!

রঘু ফিরিয়ে দেয় জবাব, না রে রাজা! চণ্ডালী-মা রাজা-পেরজা মানে না! যার গায়ে তাগ্গি বেশি তারই পূজা নেয়!

—তবে সেটাই প্রমাণ কর! তোর তাগ্গ আমার চেয়ে বেশি! বল, কী নিম্নে লড়বি? তরোয়াল, লাঠি না মল্লযুদ্ধ?

রঘু এককথায় মেনে নিল। দু-পক্ষই মায়ের নামে শপথ করলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্থির হবে মায়ের পূজার অগ্রাধিকার কার। দুপক্ষের ধানুকীরা বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করে রইল ধনুকে আর্কণ

হরিপাল

জ্যা আকর্ষণ করে। কোন পক্ষ তৎক্ষণাত করলে তৎক্ষণাৎ ফুঁড়ে দেবে! অরণ্যভূমে জ্বলে উঠল মশাল। রঘু-ডাকাত বেছে নিয়েছে যাতে তার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা: লাঠি!

মন্দিরের চাতালে দণ্ডায়মান হলেন দুই যোদ্ধা। দুজনের হাতেই চারহাত-প্রমাণ লাঠি। দর্শকেরা অদৃশ্য। সবাই বৃক্ষান্তরালে। রঘু ডাকাতের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। নিম্নাঙ্গে শুধু মালকোচা-সাঁটা খেটো ধুতি। রাজা খুলে রাখলেন তাঁর রাজ-পরিচ্ছদ। দুজনে দাঁড়ালেন মুখোমুখি।

নেপথ্যে বেজে উঠল ভেরী। যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা!

রঘু-চাঁড়াল প্রচণ্ড বলশালী। লাঠি খেলায় তার অসীম পারদর্শিতা। আন্দাজ করেছিল লড়াইটা ‘ফতে’ হতে অদৃশ্য দর্শকদের চোখে পলক পড়বে না। কিন্তু তা হল না। তার প্রতিটি আঘাত প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। রাজা হরিপাল যেন এক মন্ত্রঃপূত যষ্টিপ্রাকারের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন! তিনি ক্রমাগত আত্মরক্ষামূলক লড়াই করে চলেছেন। একবারও প্রত্যাঘাত করছেন না। রঘু একটু বিস্মিত হয়ে পড়ে—লোকটা দুধ-ক্ষীর-ননী খেয়ে মানুষ! এমন লাঠির খেলা সে শিখল কবে? আর লোকটা ক্রমাগত আত্মরক্ষামূলক লড়াই করছে কেন? কই, সে তো একবারও ‘শির তামেচা সামালকে’ হৈঁকে তেড়ে এল না। ক্রমে স্বেদবিন্দু ফুটে ওঠে রঘুর জ্বলাটে। এক লাফে তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, তু লড়ছিস না কেনে রে রাজা?

হরিপালও তিন-পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন, লড়ছি না? বলিস্ কী রে রঘু? একবারও ছুঁতে পারলি আমাকে?

—কিন্তুক তু তো খালি ঠেকাইছিস! এক তরফা! কেনে?

রাজা হেসে বলেন, উপায় কি? আমি রাজা, তুই যে প্রজা। আজ বছরকার দিনে কি তোকে ঘায়েল করতে পারি? তুই যে আমার ছেলের মতো রে!

—তোর ছাওয়াল! মুই তোর ছাওয়াল! তবে দাখ!

ক্ষিপ্ত শাউলের মতো হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে রঘু ডাকাত সজোরে আঘাত হানল রাজমস্তক লক্ষ্য করে। আর ঠিক তখনই হরিপালের যষ্টি বিচিত্র ভঙ্গিতে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল গগনমার্গে। যেন বিদ্যুতের একটা ঝলক!

দেখা গেল রঘু-ডাকাতের যষ্টি হস্তচ্যুত হয়েছে। বহুদূরে ছিটকে পড়েছে। রাজা সে পথটা আড়াল করে দাঁড়ালেন! নিরস্ত্র রঘু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা করলে হরিপাল সেই মুহূর্তে রঘুকে শুইয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। বললেন, যা। কুড়িয়ে নিয়ে আয় তোর লাঠি! নিরস্ত্রকে আমি আঘাত করি না।

রঘু হঠাৎ নতজানু হল। হোক ডাকাত! তবু সে তো লাঠিঠাল! বললে, না রে রাজা! রঘুও যে কারও দয়ায় জান বাঁচায় না! লাঠি কুড়িয়ে আনব কোন কালামুয়ে? মার!মোর শিরটো ফাটিয়ে দে!

হরিপাল নিজের লাঠিটাও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। নিরস্ত্র নৃপতি রঘুকে অতিক্রম করে উঠে গেলেন মন্দিরের গর্ভগৃহে। পরমুহূর্তেই ফিরে এলেন তিনি। তাঁর কোলে মুছিত কিশোরের দেহ। তার হাত-পা বাঁধা। রাজা বললেন, তোর লোকজনদের ডাক। প্রার্থা আমি’মায়ের পূজা করব। তুইও আয়। নরবলি নয়, জগবলি হবে এখানে! বাচ্চাটির মুখে-চোখে জল দে। ভয়ে

মুচ্ছা গেছে।

রঘু ডাকাত সদলবলে যোগ দিয়েছিল হরিপালের সৈন্যবাহিনীতে। হরিপাল মায়ের মন্দিরটি নতুন করে গড়ে দিয়েছিলেন। ‘চণ্ডালী-মা’ নামটা কালে পরিবর্তিত হয়ে গেল: ‘মা বিশালাক্ষী’।

দেবী চতুর্ভুজা, উচ্চতা প্রমাণ মানুষের চেয়েও বড়। কণ্ঠে মুণ্ডমালা। “দেবী শবোপরি ‘আড়বিঘা’, মহাকালের উপর দক্ষিণ পদ ও বিরূপাক্ষের মাথার উপর বামপদ দিয়ে দণ্ডায়মান। তাঁর দু-পাশে আছেন জয়া ও বিজয়া। দেবীর পদতলে পাদপীঠের উপর পাঁচটি অসুরের মুণ্ড অবস্থিত।”

তারপর শতাব্দীর একপাদ অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজা হরিপাল এখন বৃদ্ধ। অনেক অনেক কীর্তি স্থাপন করেছেন তিনি। হরিপাল রাজ্যও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। রঘু এখন আর ডাকাত নয়, রাজ্যের এক বিশিষ্ট সেনানায়ক। বহুবীর রাজার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পর্ণকুটির নয়, পাকা বাড়িতে সে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বাস করে। একজন সম্পন্ন অমাত্য।

তারপর একদিন। রঘু তার কিশোরপুত্রটির বিবাহ দিয়ে গ্রামে ফিরছিল। দুটি পাল্কিতে বর আর নববধূ, অশ্বপৃষ্ঠে বরযাত্রী দল—যারা এককালে ছিল এ অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত, এখন রাজ-সেনাবাহিনীর বেতনভুক সৈন্য। বেশ কিছু পদাতিক। সে দলে মশালধারী আর বাজনদার। ভিন গাঁ থেকে বরযাত্রী দল শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যাচ্ছিল সেনাপতির বর্তমান আবাসে। হঠাৎ হুকার দিয়ে উঠলেন রঘু: রুখ্ যা!

তাঁর দলবলকে বললেন, বেটা-বেটাবউ নে ঘরকে ফিরছি, সবার আগে সাবেক মায়েরে পেনাম করি আসি। তোরা আগায়ে যা, ঘরকে যেয়ে বল কেনে, এখনই আসপ আমরা।

পুত্র ও নববধূর পাল্কি নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে শ্মশানের দিকে মোড় নিলেন রঘু। মনে পড়ল, বহুদিন তিনি আসেননি চণ্ডালীমায়ের ‘থানে’। এখন এ দেবীর পূজার আয়োজন রাজসরকার নিয়ন্ত্রিত। মন্দিরকে নতুন করে গড়েছেন রাজা মশাই। নিয়োজিত হয়েছে পুরোহিত, দেবোত্তর ভূখণ্ড দান করেছেন—প্রায় দুইশত বিঘা আমন ধানের জমি। প্রতি অমাবস্যা় ছাগবলির ব্যবস্থা, অন্যান্য দিন নিত্যপূজা।

মন্দিরের কাছাকাছি যখন এলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। স্থানটা নির্জন। সন্ধ্যারতি সেরে পুরোহিত দ্বারে শিকল দিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অরণ্যপ্রান্তে পাল্কি বাহকদের রুখলেন রঘু। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নিজেও অবতরণ করলেন। পুত্রকে আহ্বান করেন, নামি আয় বাপ, পায়ে হাঁটে যাতি হবে। তুম্মো আইস, মা জননী।

পুত্র নির্দেশমতো নেমে এল পাল্কি থেকে। তবু জানতে চাইল, কেন বাবা?

—‘কেন’ কি শুধাস্ রে পাগলা! ‘মায়ের থানে পাঙ্কি চাপি যাতি হয়? আয়।’

পদব্রজে এগিয়ে গেলেন তিনজন। পাল্কি-বাহকেরা অপেক্ষা করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলতে থাকেন। নববধূ বালিকা মাত্র—অষ্টম বর্ষীয়া, পুত্রটি কিশোর। রঘুর মনে কৌতুক জমলো। দ্রুতপদে প্রায় দৌড়েই অগ্রসর হলেন। পুত্রকে বললেন, তাদজ্জুডা মাই, ধীর কদমে আগুয়ে আয়।

পুত্র এবং তার নববধূকে এই আরণ্যক নির্জনতায় বোধকরি কিছু সুযোগ দেবার ইচ্ছেটা মাথা

হরিদাস

চাড়া দিয়ে উঠেছে খুশিয়াল মানুষটার। একলাই উঠে এলেন মন্দির-সোপান বেয়ে। শিকল খুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন। “মা যেন শীর্ণা! “মা যেন অনশনক্লিষ্টা!

রঘুনাথ প্রণিধান করলেন তার হেতু। করজোড়ে বললেন, কী করব ক মা? রাজা যে বারণ করিছে। নরবলি হতে দিবেনি। ছাগমাসে কি তোর অভর প্যাট ভরে না রে পাগলি?

“মা প্রত্যুত্তর করবার সুযোগ পেলেন না। নবদম্পতি ততক্ষণে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু রঘুনাথের প্রত্যয় হল মায়ের তৃতীয় নয়নে স্পষ্ট ভ্রুকুটি। দুটি হাত জোড় করে মনে মনে বললেন, দিব্যি করলম রে মা, তোরে আনি দিব তু যা চাস্। কিন্তু কারেও বলবি না। গুপনে কাম সারপি, হঁ?

“মায়ের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটে উঠল।

রঘুনাথ ওদের বললেন, পেলাম কর। মায়েরে দক্ষিণা দে।

তখনই খেয়াল হল। তিনি তো সিক্কাটাকার থলিটা নিয়ে আসেননি। সেটা রাখা আছে পাল্কিতে। পুত্রকে বললেন, টুক বসি থাক। মুই যাপ আর আসপ।

দ্রুতপদেই ফিরে গেলেন পাল্কির কাছে। পাল্কিবাহক মুনিষগুলো ছিলিম ধরিয়েছিল। কর্তাকে ফিরে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ছিলিমটা স্কালা। রঘুনাথ পাল্কি থেকে টাকার থলিটা তুলে নিলেন। আজ এই আনন্দের দিনে তিনি যেন সেই হারানো দিনগুলোতে ফিরে যেতে চান। তাই পাল্কিবাহক দলের সর্দারকে বলেন, হেই তারকে! ছিলিমটো আক্কেবারে শ্যাস্ করি দিসনি। পুজো দে আস্যে মুইও টুক সেবা করপ নে!

বাহক-সর্দার তারক সরমে যেন মাটিতে মিশে যায়।

দ্রুতপদেই ফিরে এলেন রঘুনাথ। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়েছে।

কিন্তু এ কী? মন্দিরে তো ওরা নেই! মন্দিরের দ্বার খোলা। জনমানব নেই সেখানে। এদিক-ওদিক খুঁজলেন। কাকস্য পরিবেদনা। বেরিয়ে এলেন বাইরে। অরণ্যের দিকে ফিরে হাঁকাড় পাড়েন শিবজ—অঅঅ!

কিশোরপুত্র শিবনাথ সাড়া দিল না। মেজাজটা খিচড়ে গেল। একটু আগে যে খুশিয়াল ভাবটা ছিল—যে মন নিয়ে তারককে বলেছিলেন ছিলিমে গঞ্জিকা কিছু অবশিষ্ট রাখতে, সে মনটা হারিয়ে গেল। তিলতিল করে ফিরে আসছে তাঁর বংশানুক্রমিক চণ্ডালে বাগ। একটা আক্কেল থাকবে তো? বাপ রয়েছে নাগালের মধ্যে, জানে যে এখনি ফিরবে—অথচ এরই মধ্যে কচি বউটাকে নিয়ে এই ভরসঙ্কে বেলা লুকোচুরি খেলছি!

আবার দিলেন হুঙ্কার: শি—বঅঅঅ—!

প্রতিধ্বনিই ফিরে এল শুধু।

প্রতিবত্তী-প্রেরণায় কাজ। পঁচিশ বছরের অনভাস, তবু জাতে ডাকাত তো! ডানহাতের তালুটা ওষ্ঠাধরে লাগিয়ে ‘কুক’ দিয়ে উঠলেন হঠাৎ: আ—বাবাবাবা!

পাল্কিবাহকেরাও ঠুঁর প্রাক্তন চেলা-চামুণ্ডা। দূর থেকে ভেসে এল তাঁদের প্রতিধ্বনি: আ—বাবাবা! —ভয় নাই কর্তা! শুনছি! মোরাও আলাম বলে।

পরক্ষণেই বনজঙ্গল ভেদ করে ছুটে এল আট-দুকনে ঘোড়া বেহারা।

তন্নতন্ন করে খুঁজল সবাই। সারা বন। সারা শূশান! কোথায় কে?

হঠাৎ তারক স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেপে ধরল কর্তার হাত।

মায়ের দিকে তর্জনী তুলে বললে, ইডা কি বটে গ কর্তা?

—কী?

কর্তা মায়ের দিকে তাকালেন। তাই তো! মায়ের নাকে তো নথ ছিল না! ওটা তাহলে কী? গোলাকৃতি রূপার নথের মতো! কিন্তু না! নাসিকা থেকে তো ঝুলছে না! গোলাকার বস্তুটা আটকে আছে মায়ের ওষ্ঠাধর প্রান্তে। রঘুনাথ এগিয়ে এলেন। বৃত্তাকার ধাতব বস্তুটায় তর্জনীটা ঝাকিয়ে একটা মোক্ষম টান দিলেন! ছিড়ে বেরিয়ে এল সেটা মায়ের মুখ থেকে!

একটা চাবির ক্ষুদ্রাকার রৌপ্যবলয়! তাতে দু-তিনটি কুঞ্চিকা। আর তার সঙ্গে ঢাকাই খাসা মসলিনের একটা ছিন্নাংশ। ঘোর রক্তবর্ণের। যে শাটিকা পরিধান করে নববধূ এতক্ষণ আসছিল পালকি চেপে তারই একটা টুকরো!

কিন্তু ... কিন্তু সেটা তো ছিল নীলাধরী! এ তো ঘোর লাল!

পরক্ষণেই প্রণিধান করলেন হেতুটা। সেই ছিন্ন অঞ্চলপ্রাপ্ত থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে রক্ত। নীলবর্ণের খাসা-মসলিন ঘোর রক্তবর্ণের হয়ে গেছে একটি হতভাগিনী বালিকার শোণিতে! মায়ের করাল দংষ্ট্রার নিষ্পেষণে! বরবধূ মায়ের জঠরে!

মরণান্তিক একটা জান্তব আত্ননাদ করে রঘুনাথ লুটিয়ে পড়লেন চণ্ডালী মার চরণমূলে! মুহিত হয়ে!

মুর্ছা ভাঙল তিনদিন পরে, কিন্তু জ্ঞান ফিরল না। রঘুনাথ ঘোর উন্মাদ হয়ে গেছেন। বেঁচে ছিলেন আরও তিন বছর, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়—বদ্ধ উন্মাদ! সম্ভবত তাঁর ভারসাম্যহীন অন্তরে ও-প্রশ্নটা আদৌ জাগেনি—চণ্ডালী মা কি ভুল বুঝেছিলেন? ওঁর সেই মনে-মনে বলা 'ঐতিহ্যবাহিনী': দিবা করলম্ রে মা! তোরে আনি দিব তু যা চাস্। কিন্তু কারেও বলপি না, গুপনে কাম সারপি! ই?

রাজা হরিপাল কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। তাঁর রাজ্যকালে ওখানে আর নরবলি হয়নি। হল পরবর্তী জমানায়। তাও কালে-ভদ্রে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে আর ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলানো হত না। এতে সাপও মরে, অথচ লাঠিটাও ভাঙে না।

কিন্তু মানুষের মনে একটা অতঙ্ক জেগেই থাকে। হরিপাল গ্রামে ইতিমধ্যে আরও অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে সর্ববিখ্যাত ১৪৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। রায়বংশের প্রতিষ্ঠা করা পোড়ামাটির আটচালা দেউল। ফলে ভদ্র গ্রামবাসী সেই সব মন্দিরেই পূজা দিতে যায়। শ্মশানকালী ক্রমে ক্রমে উপেক্ষিত হয়ে পড়তে থাকেন। পূজার অধিকার ফিরে পেল চণ্ডালেরা। তারা ছাগবলির সঙ্গে শূকরবলির প্রবর্তন করল—ফলে, বিশালাক্ষী পুনর্মুখিক হয়ে পড়লেন কালে: চণ্ডালী-মা! তবু যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-বংশ দেবোত্তর ভোগ করেন তাঁরা নিত্যপূজার ব্যবস্থাটা বজায় রেখেছেন—না হলে দেবোত্তর ভোগ করতে পারতেন না।

কালের রথচক্র পাক খায়। আবার নতুন যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ফিদিয়া আনতে চায় প্রাচীন-প্রথা। মাঝে মাঝে নিখোঁজ হয়ে যায় ভিন্ন ঠাঁয়ের পথ-চলতি মানুষ!

রূপেন্দ্রনাথ সঙ্গিনীর হাত ধরে এসে বসলেন মন্দির সংলগ্ন নাট্যমন্দিরে। দু-হাত উচু পোতা—চুন-সুরকির মাজা-মেখে। প্রাচীর নাই। চারি দিকেই খোলা-মেলা। মোটা মোটা তাল-খুঁটির উপর তালের রলা। তার উপর শালকাঠের চাল-সাজ। উপরে উলুখড়ের বাঙলা আটচালা। নিপুণ ঘরামির হাতের কাজ—পাড়, পাটি, বাখারি, শারক, শলা-ফোড়ের ঠাসবুনানি। উপরে বরফি-আকারে তলতা বাঁশের চৌখুপি। কালবোশেখী ঝড় তো ছাড়—শালিক পাখিও তুলে নিয়ে যেতে পারে না উলু ঘাসের একটি কাঠি।

ম্নান জ্যোৎস্নার আলো। মুঠো-মুঠো জোনাক জ্বলছে। দূরে যে চিতাটা জ্বলছিল সেটা নিবে গেছে। একটু আগেই কলসি ভেঙে শ্মশানযাত্রীরা ফিরে গেছে গৃহে: ‘বিমুখাঃ বান্ধবাঃ যান্তি, ধমস্তিষ্ঠতি কেবলম’!

রূপেন্দ্র সঙ্গিনীকে বললেন, তুমি শূয়ে পড়। আমি জেগে আছি। ঘুম আসছে না আমার। মঞ্জরী শুয়ে পড়ে—ওঁর জানুতে মাথা রেখে। বলে, সারাদিন এতটা হেঁটেছ, ঘুম আসছে না কেন?

রূপেন্দ্র জবাব দিলেন না। মঞ্জরী বুঝতে পারে। বলে, কাজটা বোধহয় ঠিক হল না। হাটতলায় রাতটা থেকে গেলেই ভাল হত। না হয় একটু দূরে শুতাম আমরা।

ঐ কথাই ভাবছিলেন তিনিও। কী যেন একটা অস্বাভাবিক বোধ করছেন। তাঁরও মনে হচ্ছে: কাজটা ভাল হয়নি।

এই তো কিছুক্ষণ আগেই মঞ্জরী বলেছিল ঐ দলটিকে ত্যাগ করে ওঁরা ব্লাকি পথ পৃথক ভাবেই যাবেন। কিন্তু এখন সেই ভ্রষ্টাচারী সহজপন্থীদের সান্নিধ্যই কামনা করছে সে। হোক ভ্রষ্টাচারী—তবু তো তারা মানুষ! এটা যে মৃত্যুর ওপারের রাজত্ব—এই জনমানবহীন শ্মশানভূমি। যে হতভাগ্যদের বলিদান করা হয়েছে অশান্ত সেই পরিচয়-হারা প্রেতাত্মার দল যে এখানে পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে মরছে। ঐ যে জোনাকিগুলো বারে বারে মিটিমিটি করে ওঁদের দুজনকে দেখছে তারা কি সেই প্রেতাত্মার চোখ?

শ্মশানের দিক থেকে সমস্তরে ভেসে এল যামঘোবের আর্তনাদ, যেন ওরা সমবেতভাবে সেই কথাটাই বলতে চায়: ‘তফাৎ যাও! সব ঝুট হয়!’

হঠাৎ কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল মঞ্জরী, ওটা কী?

তার তর্জনীসন্ধিতে ঘুরে দেখলেন। নদীর ওপারে একটা আলোর গিণ্ড জলের উপর নেচে বেড়াচ্ছে। মরা নদী। জলজ উদ্ভিদ পচে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে। রূপেন্দ্র বললেন, ও কিছু নয়, আলেয়া!

মঞ্জরী ওঁর হাতটা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল। রূপেন্দ্র সাধুনা দিলেন, ভয়ের কিছু নেই মঞ্জু, ও একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। বদ্ধ জলাশয়ে আপনা থেকেই অমন আগুন জ্বলে, আপনা থেকেই নিবে যায়।

তাই গেল। আগুনের গোলাটা যেন জলে ডুবে গেল।

রূপেন্দ্রনাথ ওকে আবার জোর করে শুইয়ে দিলেন। আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল মঞ্জরী। এ পরিবেশে সে কিছুতেই ঘুমাতে পারবে না। রূপেন্দ্র একটা তাল ঝুটিতে ঠেঁশ দিয়ে বসলেন। তার বার বার মনে হচ্ছিল—এ শ্মশানভূমি আদৌ জনহীন নয়। এখানে অনেক-অনেক দর্শকের সমাবেশ ঘটেছে। এমন নবদম্পতিকে তারা যে অনেক দিন দেখেনি। এখানে কেউ রাত্রিবাস করে না। দর্শকদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা ওঁদের দেখছে। হয়তো ভাবছে—তাদেরও ছিল এমন আনন্দঘন দাম্পত্য জীবন। সে জীবনে অকস্মাৎ ছেদ পড়েছিল ঘাতকের খড়্গাঘাতে। অতৃপ্তির হাহাকারটুকু সম্বল করে তারা দেহাতীত মৃত্যুরাজ্যে রওনা হতে বাধ্য হয়েছিল এক-দিন।

কিন্তু সেই ছেলেটি হঠাৎ মঞ্জরীর ঝাঁচল ধরে টান দিয়েছিল কেন? অজানা-অচেনা এক ভিনদেশী তীর্থযাত্রিনীর অঞ্চলপ্রান্তে চাবি বাঁধা আছে কিনা সে বিষয়ে তার কিসের কৌতূহল? পুরোহিত-মশাই বলেছিলেন—‘বালকের ছেলেমানুষী’। তাই যদি তাঁর ধারণা, তাহলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন কেন তিনি? প্রহার করলেন কী কারণে ঐ ছেলেমানুষীর জন্য? ঐ ‘চাবি’র গভীরে কি রয়েছে গেল কোন অজ্ঞাত রহস্য? কোন্ রুদ্ধদ্বারের সেই কুণ্ডিকা? নাকি চাবির প্রসঙ্গ নিছক একটা অছিলা মাত্র? ছেলেটি তার দিদির বয়সী ঐ সুন্দরী অচেনা মেয়েটিকে সাবধান করে কিছু বলতে চেয়েছিল। কী কথা? ‘সব বুট হয়ে, তফাৎ যাও!’

দ্বিতীয়ত সেই ঘোষাল মশাই! অপ্রকৃতিস্থ বলে তো মনে হয়নি তাঁকে। পূর্বমুহূর্তে তিনি বলেছিলেন—তাঁর গৃহে স্থানাভাব হবে না, হলেই বা কী? এমন নির্জন শ্মশানে তিনি ওঁদের দুজনকে রাত্রিবাস করতে দেবেন না। অথচ পুরোহিত-মশায়ের ধমক খেয়েই তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। কাঁপছিলেন থরথর করে। কেন? কেন?

আর সবচেয়ে বড় কথা ঐ পুরোহিতের আচরণ। তিনি নিজেও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আগন্তুকদের ললাটে রক্ততিলক পরিয়ে দেওয়ারই বা কী তাৎপর্য? বলেছিলেন, ‘এটাই প্রথা!’

প্রথা! অর্থাৎ? তন্ত্র-উপাসকের বংশ! এভাবে রক্ততিলক কপালে ঐকে দেবার কী তাৎপর্য তা তো তাঁর অজানা নয়! কিন্তু এখানে তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? তাঁরা দুজন কিছু উৎসর্গ করা ছাগশিশু নন!

সহসা অন্য একটা আশঙ্কা জাগল। তাঁর মনে পড়ল—শ্মশানকালীর পূজা সাধারণত করে ডাকাতের দল। অজানা-অচেনা দেশ। এদের কিছু দুরভিসন্ধি নেই তো? কিন্তু ওঁরা এসেছেন খালি হাতে। মঞ্জরীর সারা দেহে এক রতি সোনা নেই। শুধু শাঁখা আর নোয়া, আর কিছু ইলামবাজারী গালার চুড়ি। কিন্তু না! ভুল হচ্ছে! কুসুমমঞ্জরী অপূর্ব সুন্দরী! ক্রীতদাসীর হাতে তার বাজারদর যথেষ্ট! ওঁদের দুরভিসন্ধির মূলে সে-রকম কিছু নেই তো! অথবা...!

হ্যাঁ, সেটাও অসম্ভব নয়। ডাকাতের দল শ্মশানকালীর পূজায় নরবলি দিয়ে থাকে। পুরোহিত কি তাদের কাছ থেকে মোটা হাতে দক্ষিণা পান? তাতেই কি ঐ রক্ততিলক চিহ্ন? সেজন্যই কি তাঁর সর্বদেহ ছিল বেপথুমান!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—তিনি নিরস্ত্র। অন্তত একখানা বংশদণ্ড পাশে নিয়ে বসে উচিত

হরিদাস

ছিল। তাঁদের আলো এখনো আছে। হয়তো শ্মশানে ঝুঁজলে তা পাওয়া যায়; কিন্তু মঞ্জরী তাঁর কোলে মাথা রেখে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, তার কাঁচা ঘুমটা...

ঠিক তখনি কে যেন তাঁর কর্ণমূলে বলে উঠল: 'কারেও বলপি না, গোপনে কাম সারপি! হু?'

রীতিমতো চমকে উঠেছেন। কেউ তো কোথাও নেই। মঞ্জরীও ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। বললে, কিছু বললে?

—না তো!

—আমার মনে হল তুমি বললে, 'কাকেও কিছু বলবি না, গোপনে কাম সারবি।' —বলনি?

রূপেন্দ্রনাথের দেহের সমস্ত রোমকূপ দাঁড়িয়ে উঠেছে। অসীম সংযমে তিনি বললেন, না তো! আমি তো কিছু বলিনি। তুমি স্বপ্ন দেখেছ বোধহয়।

মিথ্যাভাষণ নয়। কিন্তু সত্যভাষণ কি? মিথ্যার আশ্রয় না নিলে তাঁর বলার কথা: ওকথা আমি বলিনি; কিন্তু শুনেছি!

কিন্তু রূপেন্দ্রনাথের বিশ্বাস: সত্য শুধুমাত্র শিব-এর দিশারী। রাতের এখনো অনেকটা বাকি। যে সত্যকথায় ঐ মেয়েটি মনোবল হারিয়ে আতঙ্কে মূর্ছিতা হয়ে পড়বে তা: মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা!

প্রত্যয়নিতে বিশ্বাস করেন না রূপেন্দ্রনাথ ডেবগাচার্য! তাঁর মনে হল, এ কারও কারসাজি! কে বা কারা তাঁদের ভয় দেখাতে চাইছে। যাদুকরেরা দূর থেকে এমনভাবে ধ্বনি নিক্ষেপ করতে পারে যাতে শ্রোতার মনে হয় কথাটা কর্ণমূলে বলেছে কেউ! এ তেমনই এক ভোজবিদ্যা! বললেন, আমার এমন খালি হাতে বসে থাকাটা ঠিক নয়। ওঠ! একটা অস্ত্র চাই!

—অস্ত্র? এই বিজন শ্মশানে অস্ত্র কোথায় পাবে?

—মায়ের চালচিহ্নের পিছনে মন্দিরপ্রাচীর থেকে একটি খড়্গ বুলতে দেখেছি। সেটা নিয়ে এসে বসব। তুমি আমার সঙ্গে চল! তোমাকে একা ফেলে রেখে যাব না।

মঞ্জরী প্রতিবাদ করতে পারে না। কথাটা অযৌক্তিক কিছু নয়। সভয়ে তাঁর হাতটা চেপে ধরে। রূপেন্দ্র তাকে বলেন, হাত ছেড়ে দিতে। সে যেন তাঁর পিছন-পিছন আসে, তাঁর উপবীতটা আঙুলে জড়িয়ে। বলেন, তুমি যাদের ভয় পাচ্ছ মঞ্জু, তারাও ব্রাহ্মণের উপবীতকে ভয় করে! ভয় কী? আমি তো আছি!

দুজনে নেমে আসেন নাটমন্দির থেকে। নামতে গিয়েই কিসে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান। কিছু নয়, ওটা হাড়িকাঠ! কিন্তু এত বড়? মহিষবলি হয় না কি এখানে? এঃ! হাতটা আঠা-আঠা হয়ে গেল! বোধহয় রক্ত মাখা ছিল! কাপড়ে মুছে নিলেন হাতটা। পায়ে পায়ে উঠে এলেন মন্দির-চাতালে। মঞ্জরী শক্ত করে ধরে আছে তাঁর উপবীতগাছ!

শিকল খুলে দিলেন। বাইরে জ্যোৎস্নালোক। ভিতরে নীরক্স অন্ধকার। কপাট দুটি খুলে ভিতরে কিছুই দেখতে পেলেন না। কিন্তু আরতির সময় খড়্গটিকে কোনখানে দেখেছিলেন তা স্পষ্ট মনে আছে। অন্ধকারেও সেটি হাৎড়ে হাৎড়ে খুঁজে পাবেন। তবু অপ্রত্যাশিত করলেন। চোখটা অন্ধকারে সইয়ে নেওয়া দরকার। না হলে পূজার তৈজসপত্রের স্পর্শ হতে পারে। উন্মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রূপেন্দ্রনাথ উপবীতটা আঙুলে জড়িয়ে নীমিলিত নেত্র অস্ত্রোত্তর

শতবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করলেন।

এবার তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, অন্ধকারে চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। সম্মুখেই পাড়ে আছে কোশাকুশির পাত্রটা। হাত বাড়িয়ে গঙ্গাজলে হাতটা ধুয়ে নিলেন। সঙ্গিনীর ও নিজমস্তকে গবিত্র গঙ্গোদক সেচন করলেন। জানতে চাইলেন, মন্দিরের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছ মঞ্জরী?

—হ্যাঁ পাচ্ছি। ঐ তো শ্বাসনে মহাদেব; কিন্তু 'মাকে' দেখতে পাচ্ছি না।

সেই জন্যই ঐ প্রশ্ন। বস্তৃত রূপেন্দ্রও দেখতে পাচ্ছেন না মাতৃমূর্তিকে। বললেন, সেটাই স্বাভাবিক মঞ্জু। মহাদেব গৌরকান্তি, তাই এই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু 'মা' যে যোর মসীবর্ণা—এই স্বল্পালোকে তিনি তো অদৃশ্যই থাকবেন। দাও তোমার ডান হাতটা দাও!

—কেন?—প্রশ্নটা করল, হাতটাও বাড়িয়ে দিল।

রূপেন্দ্র ওর ঘর্মস্নাত হিমশীতল হাতটি অর্পণ করলেন শায়িত মহাদেবের চরণে।

বললেন, বাবার চরণস্পর্শ করে এখানে বসে থাক। ভয় কী? এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় কি দুনিয়ায় আছে? আমি অন্ধকারে হাঙড়ে হাঙড়ে খড়্গটা সংগ্রহ করে আনি।

এবারও প্রতিবাদ করল না মঞ্জরী। এই কয়মাসেই সে রূপেন্দ্রনাথের স্ত্রী থেকে যেন উন্নীত হয়েছে—একবক্সা-ঠাকুরের সহধর্মিণীতে। দুহাতে চেপে ধরল বাবার চরণ।

রূপেন্দ্র দেওয়াল হাঙড়ে হাঙড়ে চলে গেলেন মাতৃমূর্তির পিছন দিকে। অনুমান নির্ভুল। প্রাচীরে একটি কীলক থেকে প্রলম্বিত অবস্থায় মায়ের একটি খড়্গ। হাত বাড়িয়ে সেটা নামালেন। ডাকেন, মঞ্জু?

—উ?

—যা খুঁজছি তা পেয়ে গেছি। এখন কি 'মাকে' দেখতে পাচ্ছ? ভয় নেই। আমি এখনই আসছি।

পুনরায় নীরঞ্জ অন্ধকারে মন্দির-প্রাচীরে হাত বুলাতে বুলাতে ফিরে আসতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জাগল। এই যোর অন্ধকারে এতটা সময় অতিবাহিত করার পরেও কেন মাতৃমূর্তির কোনও আভাসই পাচ্ছেন না? তাঁর একার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি। মঞ্জুও পাচ্ছে না।

সেই ঘনান্ধকারে রূপেন্দ্রনাথ তাঁর দক্ষিণ হস্তটি বাড়িয়ে দিলেন। মন্দির-তলের দুই-হস্ত উপর দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ইস্তসঞ্চালনে একটি আনুভূমিক বৃত্ত রচনা করলেন।

বজ্রাহত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ!

যে উচ্চতায় উনি আনুভূমিক বৃত্তে হস্তচালনা করেছেন তাতে মায়ের পৃষ্ঠদেশের স্পর্শ পাওয়ার কথা! কিন্তু তিলমাত্র বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে নীরঞ্জ অন্ধকারে তাঁর হস্ত শূন্যে একটি অর্ধচন্দ্র রচনা করল! তার অর্থ?

অর্থ একটাই। শ্বাসনে শায়িত মহাদেবের বুকের উপর সেই নগ্নিকা নুমুওমালিনী নাই!!

এই প্রথম সংযম হারালেন রূপেন্দ্রনাথ! অকস্মাৎ গর্জে উঠলেন তিনি। মন্দিরের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল তাঁর ভর্ৎসনা—ঐ নিরুদ্দিষ্টার উদ্দেশ্যে!

—কাকে ভয় দেখাচ্ছি? রে! আমরা তিনপুরুষে তত্ত্বসাধক! জরনিত কখনো অন্যায্য করিনি। তেমন 'মায়ের' সন্তান নই আমি! শোন্:

হরিদাস

উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন:

“ধ্যায়োদ্দেশীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদ প্রভাম্।
চতুর্ভুজাং অম্বিকাংচণ্ডীং খড়্গং-খোটক-ধারিণীং॥
নানালঙ্কার ভূষিতাং রক্তাঙ্গর ধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং॥
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
শবোপরি মহাদেবীং জটা মুকুট মণ্ডিতাং॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকভীষ্টদায়িকাম্।
সর্বসৌভাগ্য জননীং মহাসশং প্রদাং স্মরেং॥”

—শুনলি? আমি সেই মহাদেবী-জননীর সন্তান! আমার ‘মা’ নমিকা ‘শ্মশান’কালী নন, দিগম্বরী ‘জগৎ-পালিকা’ আদ্যাশক্তি! তিনি ভক্তকে ভয় দেখান না! অভয় দেন। যা—শ্মশানে নেচে বেড়াগে যা! আমি তোকে পরোয়া করি না।

ক্রোধে কম্পিততনু রূপেন্দ্রনাথ ফিরে আসেন মন্দিরের সামনের দিকে। হামাগুড়ি দিয়ে। ডাকেন, মঞ্জু?

সাদা নেই! মঞ্জুরী মুহুঁতা হয়ে পড়ে আছে মহাদেবের চরণপ্রাপ্তে!

দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন খড়্গটা। সংজ্ঞাহীনা সঙ্গিনীর দেহটা তুলে নিলেন দুহাতে! সেই প্রথম দিনটির মতো! আহা! যেন মুহুঁতা কবুতরটি!

আবার তাকে নটমন্দিরের চাতালে শুইয়ে দিলেন। কোশাকুশির গঙ্গোসদক ছিটিয়ে দিলেন, ওর মুখে। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এল। উঠে বসল। বললে, তুমি তখন বকাবকি করছিলে কাকে?

রূপেন্দ্রনাথ হেসে ফেলেন। বলেন, তোমাকে নয়, মঞ্জু!

—তা বুঝছি। কিন্তু ‘মাকেই বা ভৎসনা করলে কেন?’ ‘মা-কে কি গাল দিতে হয়?

—হয়! সন্তানের ভুল হয়, আর মায়ের হয় না? তেমন তেমন ভক্তের হাতে পড়লে ভগবানেরও অবস্থা কাহিল হয়। না হলে স্বয়ং নারায়ণ কেন ভৃগুপদচিহ্ন বুকে ধারণ করবেন? বল? তুমি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নাম শুনছে?

—না, কে তিনি?

এক মহাসাধক। মা কালীকে তিনি বলেছেন—‘এবার কালী তোমায় খাব। ... তোমার মুণ্ড-মালা ছিড়ে নিয়ে অশ্বলে সঞ্চরা দিব।’

মঞ্জুরী হেসে ওঠে। বলে, ও মা! এমন বিশি কথটা বলতে পারলেন তিনি?

—হাঁ! শুধু বলেই থামেননি, গানে সুর দিয়ে তিনি ঐ গান মাকেই নিত্য শোভান। খজ্ঞাখানি হাতে পেয়ে রূপেন্দ্রনাথ অনেকটা মনোবল ফিরে পেয়েছেন। মাকে ভৎসনা করে পেয়েছেন তৃপ্তি! ‘বোটির কী দুঃসাহস! তাঁকে ভয় দেখাতে চেষ্টা

মঞ্জুরী হঠাৎ উঠে বসে, ঐ দেখ কারা যেন আসছে!

রূপেন্দ্র খজ্ঞাখানি বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়ান। মঞ্জুরীও দাঁড়ায় তাঁর পাঁজর ঘেঁসে।

সত্যিই মশাল হাতে কারা যেন গ্রামের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। একজন পুরুষ আর

একজন মহিলা। তাদের মধ্যে পুরুষটি চিৎকার করে ডাকল: কোবরেজ ম—শাই!

ওঁকেই খুঁজছে। রূপেন্দ্র সাড়া দিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ক্ষিপ্ৰবেগে মঞ্জরী ওঁর মুখ চেপে ধরে।

—কী হল? ওরা আমাদেরই খুঁজছে। আমাদের দলেরই লোক ...

—হোক! তিনবার ডাকুক। চতুর্থবার সাড়া দিও!

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন এই অনুরোধের মর্মার্থ। 'নিশির ডাক'! প্রথম তিনবার ডাকলে সাড়া দিতে নেই। চতুর্থবার ডাকবার ক্ষমতা নেই সেই অপদেবতার।

রূপেন্দ্র বললেন, 'নিশির ডাক' একটা কুসংস্কার! আমি তা মানি না।

—আমি মাথার দিব্যি দিছি কিন্তু!

—আমি যদি কখনো তোমার পরামর্শের বিরুদ্ধে যাই তাহলে যুক্তিতর্কে আমাকে স্বমতে আনবার চেষ্টা কর, মঞ্জু! মাথার দিব্যিতে কোন লাভ নেই! ওটাও একটা কুসংস্কার! আমি মানি না!

রূপেন্দ্রনাথ সাড়া দিলেন।



সমস্ত রাত দুটি চোখের পাতা এক করতে পারেননি।

প্রকাণ্ড হাটতলার একপ্রান্তে পুরুষেরা, সে-দলে তিনি নিজে। আর অপরপ্রান্তে শিষ্যার দল, যে-দলে ঘুমচ্ছে কুসুমমঞ্জরী। মাঝখানে—দীর্ঘায়ত হাটতলার মাঝামাঝি কর্তা-মশাই একাই শুয়েছেন। সমস্ত দিনে পদব্রজে এসেছেন তারেকেশ্বর থেকে এই চার-ক্রোশ পথ। দেহ ক্লান্ত। কিন্তু মন অশান্ত। কার্যকারণ সূত্রে সমস্ত ঘটনাবলিকে গ্রথিত করতে পারছিলেন না।

রাধা একজন তরুণ বরাতিক, কমলকুমারকে নিয়ে মশাল হাতে ওঁদের খুঁজতে বের হয়েছিল—কর্তা-মশায়ের নির্দেশেই। তিনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন—কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে সেই ধনন্তরি পৃথকস্থানে রাত্রিবাসের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। এটাও বুঝেছিলেন—সম্ভবত ওঁরা আশ্রয় নিয়েছেন কোন মন্দির প্রাঙ্গণে। রাধা কোন প্রশ্ন করেনি রূপেন্দ্রনাথকে। শুধু মঞ্জরীর হাতটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে বলেছিল, আয়।

কমলকুমার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, ঠাকুরমশাই। এই ডাকাতে-কালীর মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন? কী দুঃসাহস। শোনেননি, এখানে নরবলি হয়? .

রূপেন্দ্র সহাস্যে প্রত্যুত্তর করেছিলেন, সেজন্যই তো খজাহাতে অপেক্ষা করছি। জন্মান্দটা এলে তাকে বলি দেব বলে।

বলেছিলেন, মশালটা নিয়ে এসতো ভাই। কোশাকুশি আর খজাটা মন্দির মন্দিরে রেখে আসতে হবে।

এবার কপাট খুলেই জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখতে পেলেন—বিশালাক্ষী স্বস্থানে অধিষ্ঠিত। অটহাস্য করে উঠেছিলেন তান্ত্রিক পিতার উপযুক্ত পুত্র। মাতৃমূর্তির দিকে ফিরে যে-কথাটা বলেছিলেন তার অর্থগ্রহণ হয়নি সেই কমলের: ধমক খেয়ে সুস্থিতি হয়েছে দেখছি!

হরিদাস

ক্ষ্যাপামির একটা সীমা থাকবে তো?

তারপর ফিরে এসে তাঁকেও ঐ একই ভরসনা শুনতে হয়েছিল কর্তা-মশায়ের কাছে। এবং তারপর যে-যার শয্যায়। কিন্তু নিদ্রার কোনও আভাস নেই।

কী হতে পারে? তিনি কি তাহলে হাতটা সতাই বাড়িয়ে দেখেননি? মনে মনে ভেবেছেন, কিন্তু বাস্তবে অর্ধচন্দ্রাকারে হাতটা তিনি ওভাবে ঘোরাননি। তা না হলে মায়ের মূর্তিকে স্পর্শ করতে পারেননি কেন? মাকে ধমক দিয়েছিলেন—কিন্তু সত্য-সত্যি তো মৃন্ময়ী মূর্তি তখন শ্মশানে নেচে বেড়াচ্ছিল না। তা সম্ভব নয়। তাহলে?

—ঘুম যদি নাও হয় চুপটি করে শুয়ে থাকছ না কেন?

রূপেন্দ্রনাথ বসেছিলেন ঝুটিতে ঠেস দিয়ে। ঘুরে দেখলেন। শূরপঙ্কের সপ্তমীর চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে—তবু আলোর পশরা তার শেষ হয়নি। আবছা আলোয় চিনতে কোনও অসুবিধা হল না। শুধু কণ্ঠস্বরই নয়, ওর দেহগঠনের একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। উদ্বন্ধ-আকৃতির। ক্ষীণকটির দুই প্রান্তে পুরন্ত দেহের আভাস।

রূপেন্দ্রের ভ্রুকুণ্ডনটা এত কম আলোয় নিশ্চয় দেখতে পায়নি, কিন্তু বাচনভঙ্গিতে বুঝতে পারে তাঁর বিরক্তির। রূপেন্দ্র বললেন, ঘুম তো আপনারও হয়নি। ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন অহেতুক?

রাধারানী বসল যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, ঠাকুর। একমাত্র কর্তামশাই বাদে আখড়ায় আর সবাইকেই আমরা ‘তুমি’ সম্বোধন করি। অহেতুক রাগ কর না।

—কিন্তু এতক্ষণ তো আমাকে ‘আপনি’ই বলছিলে?

—সে তো দিনের বেলায়। রাতের কানুন ভিন্ন।

—ও! তাই বুঝি? তা আজ তোমাদের শয়নব্যবস্থাটাও ভিন্ন জাতের হয়ে গেল কেন? আখড়ায় ‘ভেজাল’ জুটে গেছে বলে?

—তা নয় গো মশাই! আখড়ার বাইরে এটাই প্রথা। কর্তামশাই বলেন, “লোকমধ্যে লোকাচার/সদৃশক মধ্যে একাচার।” তোমরা দুজন না থাকলেও এই ব্যবস্থাই হত। গায়ে-গাঞ্জের গাঙে চখারা এ-পারে, আর চখীরা ও-পারে।

রূপেন্দ্রনাথ হাসলেন। বাগবৈদগ্ধ্য বোঝা গেল মেয়েটি সুরসিকা। তবু জবাব দিলেন না। রাধারানী প্রসঙ্গান্তরে এল, একটা কথা বলবে?

—কী?

—তখন তুমি সেই শ্মশানকালীকে ও-কথা বললে কেন?

বিষয়টা মঞ্জুরে বলেননি। সে ভয় পাবে বলে। ভেবেছিলেন, কাল কর্তা-মশাইকে বলবেন, জানতে চাইবেন কী করে হল এই ব্যস্তি। কিন্তু এখন এই মেয়েটির প্রশ্নে তাকেই সব কথা বলে বললেন। কারও সঙ্গে আলোচনা না করে যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। বুঝেছেন, মেয়েটি কিছু প্রগলভা, কিন্তু বুদ্ধিমতী।

আদ্যন্ত শুনে রাধা বলল, তা এতে অবাক হবার কী আছে? মা কালীকে জানত। তিনি ইচ্ছে করলে পারেন না পীঠ ছেড়ে শ্মশানে যেতে?

—মা কালী পারেন, শুধু শ্মশানে কেন, মহাকাশের শেষপ্রান্তেও। কিন্তু মানুষের গড়া মৃন্ময়ী

মূর্তি পারে না।

—কেন পারবে না? তিনিই তো 'মা'?

—না! তিনি 'মায়ের' প্রতীক মাত্র। জাগতিক আইন-কানুন মেনে চলতে হয় মৃন্ময়-মূর্তিকে! মাটি-পাথরের মূর্তি ওভাবে শ্মশানে ঘুরে বেড়াতে পারে না।

—কে বলেছে?

—শ্রীরূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মাঃ।

এ কথার জবাব নেই। রাধা শুনেছে—কর্তামশাই তাকে গোপনে জানিয়েছেন, রূপেন্দ্রনাথ একজন সিদ্ধপুরুষ। তাঁর আদরযত্নের যেন কোন ক্রটি না হয় এদিকে রাধাকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। রূপেন্দ্রের হুকুমে দামোদরে অকাল ঝাঁড়াঝাড়িব বাণ আসে—মত্ত গজদানব শাস্ত হয়। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং এ দাট প্রত্যাশিত। সিদ্ধপুরুষ না হলে কি কেউ 'মাকে ওভাবে গালমন্দ করার সাহস পায়? বলে, তাহলে কেন তুমি হাত বাড়িয়ে 'মায়ের' স্পর্শ পেলে না?

—জানি না। সমস্যাটা তো সেটাই! আমার মনে হচ্ছে এইভাবে আমি আমার দক্ষিণহস্তটা চালনা করেছিলাম, বাস্তবে হয়তো করিনি। আমি ভেবেছি করেছি, সেই চিন্তাটাই...

নীমিলিত নেত্রে হস্তচালনার ক্রিয়াটা দেখাতে গেলেন রূপেন্দ্র। এবার কিন্তু তা শূন্যে শেষ হল না। বাধা প্রাপ্ত হল একটি নারী দেহে। পৃষ্ঠদেশ নয়, বক্ষে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো হাতটা টেনে নিতে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। আর সে হাতখানি হঠাৎ দু-হাতে ধরে ফেলল রাধা। বললে, সত্যি করে বলতো ঠাকুর—কেন পালিয়ে গেছিলে? কীসের ভয় তোমার? সুন্দরী বউকে কেউ বেদখল করে নেবে ভয়ে? না কি কোন রাক্ষসী তোমার ঘাড় মটকে রক্ত খাবে বলে?

রূপেন্দ্রনাথ কোন জবাব দিলেন না। ধীরে ধীরে ওর মুঠি থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। রাধা বাধা দিল না। হাতটা ছেড়ে দিল। একটু ঘনিয়ে এনে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, কই, জবাব দিলে না যে?

অসতর্ক হস্ত-সঞ্চালনে ঐ মেয়েটির পীনোন্নত বক্ষে করস্পর্শ করাতেই কি ওর বুকের দরজার আগলটা খুলে গেল? রূপেন্দ্র বলেন, কোন প্রশ্নের জবাব?

—কাকে তোমার ভয়? তুমি শ্মশানকালীকেও ভয় পাও না—তাঁর বেচাল দেখলে তাঁকে ধমক দাও। তাহলে কাকে ডরাও গো তুমি?

—যদি বলি: নিজেকে? নিজের মনটাই কি সব সময় নিজের মুঠোয় থাকে?

রাধা ঠোট উলটায়। বলে, তাহলে বলব মিছে কথা বলছ। তুমি সিদ্ধপুরুষ। তোমার মন তোমার মুঠোয়। তাকে আবার ভয় কী?

রূপেন্দ্র ওর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলেন, কোন জবাবটা শুনলে খুশি হবে? যদি বলি: তোমার ভয়ে?

রাধার মাথাটা নিচু হয়ে যায়। পরক্ষণেই সে চোখে চোখে তাকায়। কী-একটা কথা বলতে চায়—কিন্তু বলা হয় না। রূপেন্দ্রের পাশেই শুয়েছিল একজন ব্রাহ্ম—সেই কমলকুমার। ঘুমের ঘোরে ধমক লাগায়, তোমাদের প্রেমালাপ কি থামবে না? ঘুমাও না বাপু!

হরিদাস

রাধা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, চলি। কে কোথায় দেখবে। ভুল বুঝবে।

রূপেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ বললেন, তুমি ভুল না বুঝলেই হল।

রাধা পা বাড়িয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কিছু বলে না। ধীর পদে চলে যায় ও-প্রান্তে। চাঁদ অস্ত গেছে। পূব-আকাশে আলোর আভাস। সূর্য এখনো দিগন্তের অনেক নিচে। পূর্বগগনে এখন একচ্ছত্র সম্রাট ঐ ‘ভুলকো তারাটা’।

‘ভুলকো’ তারা। কার ‘ভুল’কে সম্বল করে ওর ওমন নামটা হল গো? জ্যোতিষাচার্যরা বলেন—উনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য! আসুরিক-সাধনার মূর্ত প্রতীক।

কিন্তু ‘আসুরিক’ মানে তো ‘তামসিক’ নয়।

দেবযানীও তো ঐ শুক্রাচার্যের আব্বজা।

তার সাধনা কি তামসিক? ‘ভুলকো’?



পরদিন সকালেই গুঁরা হরিপাল ত্যাগ করে দক্ষিণপূব-মুখো সিঙ্গুরে যাত্রা করলেন।

কিন্তু আমাদের সে পথে যাত্রা করতে কিছু দেরী হবে। ব্যাপারটা কী জানো?—

হরিপালে সংগৃহীত আর একটি ছোট্ট লোকগাথা না শুনিয়ে হরিপাল ছেড়ে যেতে মন সরছে না। আবার কী-ভাবে ‘চণ্ডালী-মা’ রূপান্তরিতা হলেন ‘বিশালাক্ষী’-তে। অর্থাৎ যে ঘটনায় চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল: নরবলি।

এ ঘটনা আমাদের কাহিনীর কালের প্রায় দেড়শ বছর পরের—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপার্শ্বের। ততদিনে বিশালাক্ষীর মন্দির পুনরায় অরণ্যভূমির কুক্ষিগত। চারিদিকেই জঙ্গল। নাট-মন্দিরটা বিধ্বস্ত—কেউ সারায়নি। ঠাণ্ডার ফাটলে পাখিতে নিয়ে আসা বীজ পড়ে বট-অশ্বথ জন্মেছে, মোটা শিকড়ের চাপে ফাটিয়েছে দেউল, ঝুড়ি নামিয়ে ঝাঁকড়াচুলো ডাইনীর মতো ঘাপটি মেরে বসেছে। শতাব্দীর সাধনায় শালশিশু জয় করে নিয়েছে শ্মশানঘাট। শত-সহস্র গ্রন্থিতে পত্রপল্লবের আলিসনে অরণ্য আটপেঠে জড়িয়ে ধরেছে মন্দিরচূড়া—তার মধ্যদেশে সবুজ শ্যাওলার আস্তর—পদতলে শতমূল, সহস্রমূল, শেয়ালকাঁটার আকুলি-বিকুলি। সেই নিবিড় অরণ্যভূমি ভেদ করে মাত্র দুটি বনপথ—একটি শ্মশানযাত্রীদের নিত্য আনাগোণায় বিসর্পিলরূপে শায়িত, দ্বিতীয়টি পুরোহিত মহাশয়ের ভদ্রাসন থেকে মন্দিরে যাবার সোজা পথটা। জমিদারের দান করা দেবোত্তরের অধিকার আছে দুটো। ভক্ত সমাবেশ হোক না হোক চক্রবর্তী-বংশের অধিকার আছে অক্ষুণ্ণ। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় মহাদেব চক্ৰোত্তি একবার করে মন্দিরে আসেন। শিকল খুলে ‘মাকে ভোগ নিবেদন করেন, সন্ধ্যায় শয়নাবস্থায় সেরে আবার শিকল তুলে ফিরে যান। ভক্ত বা যাত্রীর দেখা নেই—মাসে একদিন শুভ হয়। তবে ঐটুকু না করলে পূজার অধিকার-বজায় থাকে না—দেবোত্তর ভোগ করি স্বত্ব হারাতে হয়।

রাজা হরিপাল মায়ের সেবার জন্য প্রায় দুশো বিঘার মতো দেবোত্তরের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন; কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারীদের উপদ্রবে আর কারসাজিতে তার অধিকাংশই



মহীকুহের আলিঙ্গনে মহাকালীর মন্দির

যরদাম

বেহাত। চক্কোত্তির ক্ষমতা কি যে, জবরদখলকারীদের রোখেন? বর্তমান জমিদারও উদাসীন।
‘মায়ের সম্পত্তি রক্ষার চেয়ে ঐসব প্রতিপত্তিশালী মধ্যস্থতভোগীর সৌহার্দ্য তাঁর বেশী কাম্য।
মহাদেব চক্কোত্তির বাস্তু-সংলগ্ন বিধে-তিনেক জমি ছাড়া প্রায় সবই বে-দখল। ঐটুকু জমিতেই
ফলে লাউ-কুমড়ো-বেগুন, আলু-মরিচ। তবে জবরদখলকারীদের চক্ষুলাজ্ঞা আছে; তারা
চক্কোত্তির সংসারে সংবৎসরের প্রয়োজনের মতো চাউল পাঠিয়ে দেয়। আর সংসার বলতে তো
তিনটি প্রাণী। মহাদেব তখন চল্লিশের কোঠায়, স্ত্রী নিকুপমা ত্রিশ, আর একমাত্র পুত্র কাঙালীর
বয়স আট।

সেই আট। রঘুনাথের পুত্রবধূ—সেই যার খাসা-মসলিন নীলাস্বরী ‘মায়ের কৃপায়
রক্ত-চীনাংশুক হয়ে গেছিল—তার বয়সও ঐ আট ছিল না?

শুরুতে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, সমাপ্তিতে অষ্টমবর্ষীয়া বালক।

কাঙালীর অক্ষর-পরিচয় হয়েছে। বাপের কাছে। পাঠশালায় তাকে পাঠানোর মতো আর্থিক
সঙ্গতি নাই। একটিমাত্র সন্তান—কিন্তু তাকেও গুরুগৃহে পাঠাতে পারেন না। স্থির করেছেন
নিজেই যেটুকু পারেন পড়াবেন। মোটামুটি অক্ষর পরিচয়, সামান্য আঁক-কষা আর কৈলীক
পূজাবিধি। কাঙালী ‘আট’-এ পড়েছে। এটাই প্রশস্ত সময়। উপনয়নের। ব্রাহ্মণের আট,
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বারো আর বৈশ্যের পক্ষে ষোল। প্রথমটিই শাস্ত্রোক্ত—পরের দুটি ইদানীং চালু
হয়েছে। স্থির করেছেন—নিজেই দীক্ষা দেবেন—তাতে বায়-সক্কাচ হবে। শিখিয়ে দেবেন
ত্রিসন্ধাবিধি, আচমন, প্রণাম, মার্জন, অর্থ্যপ্রদান আর উপস্থানের বিধিগুলি। এবং
বলাবাহুল্য: গায়ত্রীমন্ত্র। অন্যান্য পূজাবিধি ক্রমশ শিখে নেবে। বাবা-মশায়ের সঙ্গে প্রতিদিন
সকাল-সন্ধ্যা সে মন্দিরে যায়—পূজাবিধি দেখে। বুদ্ধিমান ছেলে—মন্তোচ্চারণের অধিকার
নেই, না হলে এখনই সে বাবার কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

তারপর একদিন সন্ধ্যারাত্রে। কী তিথি তা মনে নেই, তবে আকাশে ছিল ভাঙা-চাঁদ।
শয়নারতি সেরে কাঙালীকে নিয়ে ফিরে আসছিলেন ভিটেতে, হঠাৎ মাঝপথে ওঁদের রুখল
একজন ভীমকায় পুরুষ। ঠাণ্ডকে উঠলেন চক্কোত্তি, কে বাবা তুমি? কী চাও?

উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, পেশীবহুল দেহ। মালকোচা সাঁটা। মাথায় বাবুর চুলে একটা গামছার
ফেট্টি। কপালে সিক্কাটাকার মাপে রক্তবিন্দু। হাতে প্রমাণ মাপের লাঠি। নজর হল, কিছু দূরে
আরও দুজন অনুরূপ অনুচর। সকলেই সসজ্জমে নিচু হয়ে ওঁকে দণ্ডবৎ করল। দলপতি বললে,
পেনাম হই ঠাকুরমোশাই। খোকারে ঘর যাতি বলেন, ছিচরণে কিছু নিবেদন করব, আজ্ঞে।

মহাদেব চক্কোত্তি চোখে ওঁকে কখনো দেখেননি, কিন্তু আন্দাজে চিনতে পেরেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে। এ অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত। অঘোর চণ্ডাল। অতীতকালের
বিভীষিকা রঘু-চণ্ডালের বংশাবতংস। ফেরঙ্গ-সরকারের কোতোয়াল ঐ বাবুরিচুলের ঝাঁকুড়া
মাথাটার উপর কত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে যেন। গোটা হুগলী জেলার অতিক্রম।

চক্কোত্তি খোকার হাতে নৈবেদ্যের পাত্রটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ঘরে যা বাবা আমি এখন
আসছি।

কাঙালী কী বুঝল তা সেই জানে। সভয়ে পিছন ফিরে দেখতে দেখতে সে বাড়ি ফিরে
গেল।

—আমারে চিন্তি লারলেন ঠাকুরমোশা ? মুই আপনকার ছি-চরণের দাস আজে, অঘোর চাড়াল।

মহাদেব কাঁপতে কাঁপতে বলেন, তা এ অধমের কাছে কেন বাবা ? চাল-কলা-নৈবেদ্য ছাড়া তো আমার কিছুই নাই। তবে হ্যাঁ, *মায়ের সঙ্গে কিছু অলঙ্কার আছে—সাত পুরুষ ধরে—জানি না, তা স্বর্ণালঙ্কার—

অঘোর *মা বিশালাক্ষীর পাল্লা-দেওয়া জিহ্বা-দংশন করল :

—ইটো কী বলছেন আজে ? *মায়ের গায়ের গহনা....

—তবে ?

অঘোর পথের মাঝেই পেশ করল তার প্রস্তাব। *মা তাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন। তিনি ক্ষুধার্তা, অনশনক্রিষ্টা—হাগমাংসে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে না। রঘু-ডাকাতের উত্তরসূরী তাই ফিরিয়ে আনতে চাইছে সেই সাবেক ব্যবস্থাপনাটা।

থরথর করে কঁপে ওঠেন মহাদেব চক্ৰোত্তি : এটা কী বলছিস্ রে অঘোর। সে-কাল আর এ-কাল ? এখন যে ফিরিস্দিদের জমানা। ও কাজ করা যে মানা। জানাজানি হলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।

—কাকপাখিতে জানবেক্ নাই ঠাউর।

—জানবে। লাস জ্বালাতে হবে না ? শ্মশানে মাঝরাত্রে নতুন চিতা জ্বলে উঠতে দেখলে গায়ের মানুষ জানতে চাইবে না—ফৌত হল কে ?

—চিতা জ্বলবেক্ না ঠাউর।

অঘোর সব কিছু চিন্তা করেছে। সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছে মনে মনে। তার পরিকল্পনাটি নিশ্চিহ্ন। বলির ‘পশু’ ওর করতলগত হলে অঘোর লোক-মারফৎ খবর পাঠাবে। ঠাকুর-মশাই পাজি-পুঁথি ঘেঁটে ঐ লোক-মারফৎই জানাবেন—কোন তিথিতে রাতের কোন লগ্ন প্রশস্ত। নির্দিষ্ট তিথিতে নৌকাযোগে আসবে অঘোর। সঙ্গে বলির ‘পশু’, একটি খাটিয়া আর কয়েকজন বাহক। মধ্যরাত্রে পুণ্যকর্ম সমাধা হলে যুপকাঠের শোণিত ধুয়ে দিয়ে অঘোর একাই ডিঙি নিয়ে ফিরে যাবে; আর বাহকেরা রওনা হয়ে পড়বে মৃতদেহ নিয়ে—নিঃশব্দে। ভিনগায়ে পৌছে ধ্বনি দেবে—‘বল হরি, হরি বোল’—ওরা চলেছে গঙ্গাতীরে দাহ করতে। কারও সন্দেহ হবে না। *গঙ্গাভারের আসায় এই ‘নিগঙ্গা’র দেশ থেকে প্রতিনিয়তই তো চলেছে ঐ জাহাজের মিছিল—‘অহনি-অহনি’। ‘দাহ’ কোথায় হবে ? আদৌ হবে না। যে শ্মশান-ঘাটেই দাহ করতে যাও—ছিন্নশির মৃতদেহ—দাহকেরা নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। দাহ হবে না, তবে কি কবর দেবে ? আজে না। মৃতদেহেরও একটা বাজারদর আছে। ওরা বেচে দেবে। ঐ ত্রিবেণী, আদিসপ্তগ্রাম, কাটোয়ায় আছে তান্ত্রিক-সাধক, কাপালিক—যারা শবসাধনা করতে চায়, শব জোগাড় করতে পারে না ; পঞ্চমুণ্ডির সাধনায় পিশাচসিদ্ধ হতে চায়, নরমুণ্ড পায় না। সে সব চিন্তা ‘ঠাউরমোশাই’কে করতে হবে না। আশঙ্কার কিছু নেই। *মায়ের ইচ্ছা পূরণ করবেন জ্ঞাতে আবার ইতস্তত কিসের ? আর যেটুকু বা দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল সেটা সম্পূর্ণরূপে বিদূষিত হয়ে গেল দক্ষিণার অঙ্কটা শুনে ; বলি-পিছু আড়াইগুণা সিক্কটাকা।

একটি বছর কেটে গেছে তারপর। হরিপালের গ্রাম্যজীবনে দশ-দ্বাদশ বছরে এমন কিছু

হরিদাস

পরিবর্তন হয় না; কিন্তু 'মায়ের আশীর্বাদে মহাদেব চক্ৰোত্তি ইদানীং একটু সচ্ছলতার মুখ দেখছেন। বর্ষার আগে ছাদটা ছাইয়েছেন, একটি গোয়ালঘরও তুলতে হয়েছে। কী করবেন? দুধেলা গাই কিনতে হল যে একটা। কাঙালী পিটুলিগোলাই পান করেছে এতদিন—দুধের-কাঙাল ছিল সে। পণ্ডিতগৃহীণীকে একটি নাকছাবিও কিনে দিয়েছেন। গৃহীণী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, এসব কী করে হচ্ছে গো?

—সে-কথা জানতে চেও না! 'মা' অ্যাদিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

চক্ৰোত্তি-গিন্নি সরল-বিশ্বাসে যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিয়েছিলেন শুধু। সত্যি তো, তাঁর সাত্ত্বিক প্রকৃতির পরমগুরু আজীবন নিরলস-নিষ্ঠায় 'মায়ের পূজা করে চলেছেন, 'মায়ের দয়া তো হতেই পারে। শুধু খোকার উপনয়নটা এখনো হয়নি। আর একটু গুছিয়ে নিয়ে কাজে হাত দেবেন। উপনয়নের প্রশস্তকাল—বয়ঃসন্ধি। আটাই যে হতে হবে এমন কোন অলঙ্ঘনীয় কানুন নেই।

কাকপক্ষীতে টের পায়নি সত্যি। কাকেরা রাতে জেগে থাকে না। তবে প্যাঁচারা জানে। তারা কথা বলে না। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখে কাণ্ডকারখানা।

কোথায় যেন খচ্‌খচ্‌ করে বাধে। কোন শালা টের পায়নি—কিন্তু পাজরার ভিতরে ঐ যে একটা প্রত্যঙ্গ আছে না?—হৃদপিণ্ড?—সেটা মাঝে-মাঝে টনটনিয়ে ওঠে। বলির 'পশুর' মুখে ফেট্রি বাঁধা থাকে, তবু শোনা যায় তার প্রাণভয়ের আর্তি। সে আর্তনাদের গুমরানি অন্তরটা কুরে-কুরে খায়। উপায়ান্তরবিহীন ব্রাহ্মণ কারণপানের মাত্রাটা বৃদ্ধি করে সেই অনাসৃষ্টিকে চাপা দেন।

স্ত্রী সন্দেহ করেনি, করেনি গ্রামবাসী। কিন্তু একজনের দুরন্ত বৌতুল দিন দিন 'হবিষা কৃষ্ণবর্ষের' বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কাঙালী। বাবামশাইকে সেই দৈত্যের মতো লোকটা সেদিন সন্ধ্যায় কী বলে গেল? তারপর সেই আজব মানুষগুলো মাঝে-মাঝেই আসে। বাপের সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করে। দু-একবার সে এগিয়ে এসেছিল শুনতে। প্রচণ্ড ধমক খেয়ে স্থানত্যাগ করতে হয়েছে। ব্যাপারটার কোন কুলকিনারা করতে পারেনি। এটা যে নিষিদ্ধ কোন কিছু তাও বোঝেনি—তবে এটুকু বুঝেছিল যে, বাবামশাই রহস্যঘন কোন একটা কাজ লুকিয়ে করে থাকেন। আর সেটা ঐ মন্দিরকে ঘিরে।

তারপর এক দিন। অঘোরের যমদূত এসে সংবাদ দিয়ে গেল, ধরা পড়েছে একটি বালক। কাঠুরীদের ছেলে, ভিন্ন গায়ের। কুড়াল কাঁধে বেওয়ারিশ জঙ্গলে কাষ্ঠাহরণে এসেছিল। তারপর থেকে সে বেপাত্তা। অনেক দূরের গ্রাম, হরিপালের কেউ কিছু জানে না, জানবে না। মহাদেব চক্ৰোত্তি পাজি-পুঁথি খেঁটে নিদান দিলেন: অমাবস্যা তিথির রাত্রি দুই ঘটিকা গতে শুভলগ্ন, তিনটা বত্রিশ পর্যন্ত। এতদিনে 'ঘণ্টা-মিনিট' বোঝে সবাই।

লোকটা জানিয়ে গেল, ঠিক মধ্যরাত্রে নৌকা এসে ভিড়বে শ্মশানঘাটে। পুরোহিতকে কেউ ডাকতে আসবে না। তিনি যেন একাই উপস্থিত থাকেন মন্দিরে।

দুজনের কেউই জানতে পারেননি এবার অন্তরাল থেকে কথটি শুনেছে কাঙালীচরণ। ব্যাপারটা কী, তা সে বোঝেনি, এটুকু আন্দাজ করেছে অমাবস্যার মধ্যরাত্রে মন্দিরে কিছু-একটা ঘটবে।

ভাদ্র মাস। একে অমাবস্যা, তায় সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। মহাদেব অমাবস্যার উপবাসে আছেন। গৃহিণীকে বলে রেখেছেন মধ্যরাত্রে তাঁকে মন্দিরে যেতে হবে একবার। পূজা দিতে হবে—অমাবস্যার পূজা। গৃহিণী বলেছিলেন, খোকা দুপুরে ঘুমিয়েছে, সে মশাল জ্বেলে নিয়ে সঙ্গে যাক।

—না, না, না! সে ঘুমাক। তাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন নেই।

কাঙালী যে ঘুমায়নি, তা ঠুঁরা দুজনেরই কেউই জানেন না। রাএে জাগতে হবে বলে সে দিনে বেশ লম্বা একটা নিদ্রা দিয়ে রেখেছে।

মধ্যরাত্রে টোকা-মাথায় রওনা হচ্ছিলেন মহাদেব। গৃহিণী পিছন থেকে বলেন, একটু দাড়িয়ে যাও, একটা মশাল জ্বেলে দিই। যে ঘুটুঘুটে আধার...

খিচিয়ে ওঠেন চক্কোত্তি, যাই একটা শুভ কাজে, পিছন থেকে টুকে দিলে তো?

গৃহিণী অপ্রস্তুত। তিনি মশাল জ্বালার আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁর হাত থেকে মশালদণ্ডটা ছিনিয়ে দূরে ফেলে দিলেন। তারপর গৃহিণীর অবাক চাহনি লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি সামলে নেন, যাচ্ছি মায়ের কাজে! পথ দেখাবেন মা! এ পথ কি আমার অচেনা? চোখ বাঁধা হলেও তো চলে যাব! মা—মাগো!

তা বটে! গৃহিণী যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন। সদর-দ্বারে আগড় দিয়ে খোকার পাশটিতে শুয়ে পড়েন।

ঘনাক্কার। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টিটা থেমেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। পথ চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না কিছু। আর ও-কথাটাও মিথ্যা বাগাড়ম্বর নয়—চোখ বুঁজেও তিনি এ পথে যাতায়াত করতে সক্ষম।

মন্দিরের সোপান বেয়ে উঠে এসে অন্ধকারে শিকলটা খুলতে গিয়ে দেখলেন সেটা খোলাই আছে। ভিতর থেকে জড়িত কণ্ঠে অঘোর চণ্ডাল বলে ওঠে, আসুন, ঠাউর মোশা।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চক্কোত্তি বলেন, মন্দিরে তোরা কজন আছিস?

—মুই একাই আছি, আঙে। স্যাঙাংরা ডিঙিতে।

—আর 'পশু'টা?

—অদের জিন্মায়।

মহাদেব ভিতর থেকে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। তাঁর অঙ্গরাখায় ছিল চক্‌মকি। জ্বলে ভেজেনি। আগুন জ্বাললেন। প্রজ্জ্বলিত করলেন ঘৃত প্রদীপ। পূজার নানান উপচার পৌঁটলা বেঁধে নিয়ে এসেছে অঘোর। ফল, ফুল, ঘৃত, মধু, দধি, গন্ধদ্রব্যাদি। রাঙাজবা আর অপরাঞ্জিতার মালা। আর বড় একটি পায়ে বিসুদ্ধ কারণ-বারি।

চক্রবর্তী পূজায় বসলেন। কালীপূজার নানাবিধ প্রকরণ—নানান বিধি-বিধান। তার ভিতর একটি হচ্ছে: ধ্বনি! শব্দ! কাংস্য-ঘণ্টা এবং স্ফোটক। মুশকিল এই যে, নরবলি নিষিদ্ধ হওয়ার পর এ-জাতীয় পূজায় কাংস্য-ঘণ্টা-ধ্বনি, বা স্ফোটকের শব্দ সম্ভবপর হচ্ছিল না। স্লেচ্ছ শাসকদের অত্যাচারে। কোন এক মহাতাত্ত্বিক কাপালিক তাই বিকল্প বিধান দিয়েছেন—কালীপূজায় যদি নরবলিদানের আয়োজন হয়ে থাকে তাহলে কাংস্য-ঘণ্টা-আদি বাদানিনাদ নিষ্প্রয়োজন—বিকল্প ব্যবস্থাই গ্রাহ্য। বিকল্প ব্যবস্থাটা কী? কাঞ্চনমূল্য? না! বকল

হরিদাস

বিধানটি এই জাতের:

বলির মুহূর্তে যেন 'পশু'র জ্ঞান থাকে। সে যেন অজ্ঞান অচেতন্য না হয়ে পড়ে। খজ্ঞাধাতের পূর্বমুহূর্তে উন্মোচিত করে দিতে হবে তার মুখের বন্ধন। সে মৃত্যুভয়ে অনিবার্যভাবে আত্ননাদ করে উঠবে। সেই মৃত্যু-আর্তির ধ্বনিই কাংসা-ঘণ্টা ফোঁটকের পরিপূরক।

কিন্তু ঘটনাচক্রে যদি বলির 'পশু' আত্ননাদ না করে?

এমনটা হওয়ার কথা নয়। তবু ব্যতিক্রম-হিসাবে সেই দুর্দৈব যদি উপস্থিত হয় তখন প্রজ্জ্বলিত ঘটদীপ শিখাটি তার ভ্রূমধ্যের দিকে তিল তিল করে সরিয়ে আনতে হবে। কোনভাবেই যেন রক্তপাত না ঘটে। প্রাণভয়ে মুক হয়ে থাকলেও ঐ পূত দীপশিখার উত্তাপে বলির 'পশু' আত্ননাদ করতে বাধ্য হবে। তখনই খজ্ঞাঘাত!

এ সকল বিধিই জানা আছে মহাদেব চক্ৰোত্তির। এই এক বৎসরে—হিসাব মনে আছে তাঁর—নয়টি 'পশু' বলিদান করা গেছে। প্রথম প্রথম যে বিভীষিকা, যে আতঙ্কে পক্ষকালধরে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন ইদানীং সেটা কমে গেছে। একটি অনিবার্য ঔষধও পেয়ে গেছেন যে—মাত্রাতিরিক্ত কারণবারি পান। 'পশু'কে উৎসর্গ করে দেবার পর প্রথম দিকে তিনি স্বচক্ষে বলিদানের পুণ্যকাণ্ডটি দেখতে পারতেন না—বিশেষ ঐ মুখের বাঁধন খুলে দেবার পর তার আঁর্তিটা যেন শ্রুতিপথে তীক্ষ্ণ-শলাকার মতো প্রবেশ করত। তারও একটি বিকল্প ব্যবস্থা করেছে অঘোর চণ্ডাল। ওর অনুচর হতভাগ্যের মুখের বাঁধনটা আলগা করে দিলেই অঘোর নিজের মুখে দুটি আঙুল প্রবিষ্ট করে দেয় আর হুবহু অনুকরণ করে শিবাধ্বনি। তাতে দুজাতের সুবিধা। প্রথমত ঘাতকের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না, দ্বিতীয়ত গ্রামবাসী দূর থেকে ঐ মৃত্যুভীত হতভাগ্যের আত্ননাদটা শুনতে পায় না।

পূজা সমাপনান্তে চক্ৰোত্তি বসলেন কারণপাত্রটি নিয়ে। ইতিপূর্বেও অনেকটা পান করেছেন; কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীগুলি এখনো সেভাবে উজ্জীবিত হয়নি। মন্দিরেই রাখা আছে একটি বালু-ঘটিকা। মাঝে মাঝে সেটিকে পরীক্ষা করছেন—মহালগ্ন যেন অতিক্রান্ত হয়ে না যায়।

ক্রমে ঘনিয়ে এল লগ্নটি। চক্ৰোত্তি জড়িতকণ্ঠে তাঁর যজমানকে আত্মীয়-সম্বোধন করে বললেন, যা রে শশালা, এইবার নিয়ায় তোর সেই শালা ছাগশিশুকে।

অঘোরেরও বিলক্ষণ নেশা হয়েছে। সে পুরোহিতকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, এটা কী বললি রে বাধোৎ ঠাকুরমশা? ছাগের বাচ্চা হবেক কেনে রে? কচি খোকন-সোনার মাস-খাওয়াবি বলে লোভ দেখালি বিটিরে, এখন বলিস্ ছাগের বাচ্চা? শশালো!

ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে পড়েছিলেন চক্ৰোত্তি। সেই অবস্থাতেই বলেন, ওই হল। বিটি জানে কী খাওয়াব। কিন্তুক কাল কোতোয়াল-শালা শুধোলে তো ছাগশিশুই বলতে হবে, না কি বল?

অঘোর জবাব দিতে পারল না। তখনই দ্বার-প্রান্তে দেখা গেল একজনকে। লোকটা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে বললে, সর্দার! সে শালা বিচ্ছু কি এদিক বাগে এয়েছে।

—কার কতা শুধাস্ রে কেলে? কোন বিচ্ছু?

—বলির 'পশু'টো। বাঁধন খুলি জঙ্গলে ছিপাইছে।

মুহূর্তে নেশা ছুটে যায় অঘোরের। প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল অনুচরের গণ্ডদেশে।

কালী-চাঁড়াল প্রতিবাদ করল না। শাস্তিটা তার প্রাপ্য। তার হেপাজত থেকে বন্দী পশায়ন করলে তাকে চপেটাঘাত সহ্য করতে হবে বৈকি! এক লাফে উঠে দাঁড়ায় অঘোর চণ্ডাল। কে বলবে পূর্বমুহুর্তে সে মাতলামি করছিল। বললে, আয়, চ, জঙ্গল চুঁড়ে দেখি। যাবে আর কন্দুর?

চক্ৰোত্তি কিন্তু উঠে বসেন না। শুয়ে শুয়েই স্বগতোক্তি করেন, যাঃ শালা। খসল দশ-দশটি সিকা টাকা।

অঘোর আর কালী বেরিয়ে গেল খুঁজতে। মহাদেব চণ্ডালী “মাকেই গাল পাড়তে থাকেন, আই তোর বিচার হল? সারাটি দিন মুখে কুটোটি কাটিনি, আর মাঝরাতে গাঁট কাটলি? আড়াইগুণা সিকা-টাকা।

সব ভালো যার শেষ ভাল। আঘঘন্টাখানেক পরেই ফিরে এল ওরা দুজন। বালকটিকে পাওয়া গেছে। মন্দিরের বাহিরেই বৃক্ষান্তরাল থেকে সে দেখছিল ওদের কাণ্ড-কারখানা। অঘোর তার গামছাটা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে কাঙালীচরণের মুখটা। তার হাত-পাও শক্ত করে বাঁধা। দুজনে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে এল বলির ‘পশু’কে।

ঘরে একটি মাত্র ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে। সেই ক্ষীণ আলোকে মহাদেব চিনতে পারলেন না সন্তানকে। বললেন, ভয় কি রে শশালা। এখন ‘মায়ে’র কোলে গিয়ে বসবি। আয়, তোর কপালে ফোঁটা-তিলক কেটে দিই! কাঙালী হাত-পা নেড়ে কী যেন বলতে গেল, শোনা গেল না। অঘোর ওকে কোলপাঁজা করে এগিয়ে নিয়ে এল।

মহাদেব ওর মাথা পবিত্র গঙ্গোদক সিঞ্চন করলেন। গলায় পরিয়ে দিলেন রাঙাজবার একটি মালা। নিজের দক্ষিণহস্তের মধ্যমা চেপে ধরলেন খড়্গে। রক্ত-ফুটে বার হতেই সন্তানের মুম্বো ঝুঁকে দিলেন রক্ততিলক। আদর করে ওর গাল দুটো টিপে দিয়ে জড়িতকণ্ঠে বললেন, লক্ষ্মী বাপু আমার। এ্যাই শালারা মুখের বাঁধন আলগা করে দিলেই প্রাণভরে একবার হাঁকাড় পাড়বি—মা! বুঝলি? তাহলেই ‘মায়ে’র কোল! মুখটি বুঁজে থাকিস না বাপু। নইলে শালারা আগুনের ছাঁকা দেবে। সে বড় কষ্ট! বড় যন্ত্রণা!

বালক তখন অঘোরের বাহুবন্ধে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে।

মহাদেব ধমকে ওঠেন তাঁর যজমানকে, দেরি করছিস কেন শালা! এ দৃশ্য কি চোখ চেয়ে দেখা যায়? যা, কাম সারা কর।

কালী জানতে চায়, উছুগু হই গেল?

—না তো দেখলি কী আতঙ্কণ? শালাহ!

কালী আর অধর চ্যাঙদোলা করে বালকটিকে নিয়ে গেল মন্দির চাতালের যুপকাঠে। যদি প্রয়োজন হয় মনে করে ঘৃতপ্রদীপটি হাতে নিয়ে মহাদেব-চক্ৰোত্তি এগিয়ে এলেন পিছন-পিছন।

হাড়িকাঠে ফেলা হল কাঙালীকে। কালী ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে পিছন থেকে সজোরে টেনে ধরল ঠ্যাঙ-জোড়া। গলাটা সরু লম্বা হয়ে গেলেই কাম সারার সুবিধা! অঘোর কাঁড়াখানা নামিয়ে রেখে এতক্ষণে খুলে দিল ওর মুখের বাঁধন। গলাটা এক বিষণ্ণ লম্বা হয়ে গেছে। তবু বাঁধন খুলে দিতেই কাঙালী আশ্রয় প্রয়াসে আর্তনাদ করে ওঠে—বা!

মহাদেব গর্জন করে ওঠেন: শালাহ! কী বললাম এতক্ষণ? বাপু নয় রে! বল: মা—

কাঙালী তবুও বললে, বা—বা! আ—মি!

হরিপাথ

—যাঃ শালাহ্!

অঘোর চণ্ডালের খড়া ভীম বেগে নেমে এল যূপকাঠের দিকে!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল চক্কোভির। হোক শুভকাজ! মায়ের পূজা! তবু একটা মানব শিশু তো! সেই কাঠুরিয়া দম্পতি বোধ করি এখনো বনে-জঙ্গলে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের নিরুদ্দিষ্ট সন্তানকে!

ঠিক তখনই কালীচরণ সজ্জস্ত হয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে, কে যান আসতিছে!

দুজনেই চকিতে সে দিকে দৃকপাত করেন। ঠিক কথা! মশাল হাতে কে যেন এগিয়ে আসছে। অঘোর খাঁড়টা বাগিয়ে ধরে। কিন্তু ও কী!

যে আগিয়ে আসছে সে পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক!

স্ত্রীলোক! এই ঘোর অমাবস্যা রাত্রে শ্মশানভূমিতে! একা! কী চায় সে! কেন ও অমন পাগলের মতো ছুটে আসছে?

কালী স্বগতোক্তি করে, কে বটে গ! মাইয়া ছেলে বটে! ভয়-ডর নাই নি কি!

মহাদেব চক্কোভির নেশা ছুটে গেছে এতক্ষণে। কালী আর অঘোর ফেরারী ডাকাত—তাদের মাথার উপর পুরস্কার ঝুলছে; কিন্তু তিনি যে সংসারী মানুষ! বউ-ছেলে নিয়ে সংসার করেন! এই নরবলির একটা সাক্ষীকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না উনি। হিস্‌হিসিয়ে ওঠেন, কেলে! ধর মাগীটাকে। শালীটাকেও উছছগু্য করে দিই। মায়ের থানে আজ জোড়া...

কালী ততক্ষণে চিনতে পেরেছে। বলে, কী বুলছ ঠাউর! ও তো মাঠান বটে!

—মাঠান! মানে! আরে, হ্যাঁ, তাই তো।

নিরুপমা উন্মাদিনীর মতো ছুটে আসে। বলে, থোকাকে দেখেছ? থোকা?

—থোকা! কাঙালী? সে তো তোমার কাছে শুয়েছিল।

ততক্ষণে মশালের আলোয় মা দেখতে পেয়েছে যূপকাঠের ওপ্রান্তে তার সন্তানের নিমীলিতনেত্র মুণ্ডটা আর এ-প্রান্তে কটিপাঁঠার মতো স্পন্দিত হচ্ছে বাকি দেহটা! নিরুপমা মুছিতা হয়ে লুটিয়ে পড়ল যূপকাঠের উপর।

মহাদেব তখন থরথর করে কাঁপছেন! এ কী হল! এ কী হয়ে গেল! ভ্রান্তি! কী মর্মান্তিক ভ্রান্তি! বুঝলেন, কেন ঐ বলির ‘পশু’টা মৃত্যুমুহুর্তে মায়ের বদলে পিতার করুণা ভিক্ষা করেছিল!

অঘোর এগিয়ে আসে এক-পা। বলে, ঠাউর! বাঁচতি চাও তো মাগের ললাটে এটা ফোঁটা কাটে অরে উছছগু্য করি দাও! নাইলে জানাজানি হয়ি যাবেই!

মহাদেব ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন মুহুর্তে! ব্রাহ্মণ ততক্ষণে চণ্ডাল! দ্রুতহস্তে এক খণ্ড খাঁথর তুলে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করলেন অঘোরকে লক্ষ্য করে। উন্মত্তের মতো তিনি লক্ষ্যে রাখলেন আর চিৎকার করছেন—হারামজাদা! তোদের সব কটাকে ধরিয়ে দেব! ফাঁসিতে ঝোলাবো!

অঘোর এটা আশঙ্কা করেনি। তার কপালে এসে লাগল পাথরের টুকরোটা। দরদর ধারে রক্ত ঝরল। চণ্ডালের রাগ! মত্তাবস্থায়! তার হস্তধৃত খড়াটা নৈশ অন্ধকারে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল। ছিন্নশির ব্রাহ্মণ লুটিয়ে পড়লেন মুছিতা স্ত্রী ও মৃতপুত্রের দেহের উপর!

তিন-তিনটি মৃতদেহ বিক্রয় করে অঘোর চাঁড়াল কী পরিমাণ কাঞ্চনমূল্য সংগ্রহ করেছিল সেটা এই উপকথার নেপথ্য তথ্য। বাস্তবে উপকথার উপসংহার—যেটা আমি সংগ্রহ করেছিলাম—তা ভিন্ন প্রকারের।

তোমরা যদি কখনো হরিপালের চণ্ডালীমায়ের মন্দিরে—না, ওর নাম এখন ‘মা বিশালাক্ষী’—তীর্থ করতে যাও, তাহলে লোকগাথার ভিন্নতর উপসংহারটা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে। নেহাৎ যদি অতদূরে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সুধীর কুমার মিত্রমশায়ের ‘হুগলী জেলার দেবদেউল’ গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, পৃ: ৩৯) অথবা অধিকাচরণ গুপ্তের ‘হুগলী’তে (পৃ: ১০৫) সে তথ্যটা পাবে। পড়ে নিও।

আমার কলমটা এমন বে-আদপ, বে-আক্কেলে, নাস্তিক, যে সেই ‘বিশ্বাসে-মিলায়ে সাই’ তত্ত্বটা লিপিবদ্ধ করতে পারল না। শুধু অবিশ্বাসী, একবাক্স বলে নয়—কলমের যুক্তি: এটা অযৌক্তিক! সেই অলৌকিক উপসংহারটা নরবলি বন্ধের লৌকিক উপসংহার হতে পারে না—

“ব্রাহ্মণ-দম্পতির কাতর ক্রন্দনে দেবী প্রসন্না হইয়া দৈববাণীতে কহিলেন, বালক হাটতলায় খেলা করিতেছে, সেখানে ঝুঁজিলেই পাইবে। অতঃপর আর এখানে নরবলি হইবে না।

“ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হাটে আসিয়া তাঁহাদের পুত্রকে দেখিতে পাইয়া কোলে লইলেন, সেই অবধি এখানে নরবলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।”

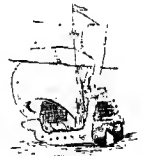
কাহিনীর এই মিলনান্তক উপসংহারটি যদি মেনে নিতে পার তাহলে তো কথাই নেই, নাহলে মহাদেব চক্ৰান্তির জন্য তোমরা কি দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না? বেচারি লঘুপাশে গুরুদণ্ড পেল। নয় কি? শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন তো সে একবার মাত্র করেছে। অঘোর চাঁড়ালের ঐ অন্তিম ইশিয়ারিটা অগ্রাহ্য করা:

‘ঠাউর! বাঁচতি চাও তো মাগের ললাটে এটা ফোঁটা কাটে অরে উছুগু্য করি দাও!’

ফোঁটা-কাটা বামুন হয়ে তাঁর স্মরণে থাকা উচিত ছিল শাস্ত্রীয় পবিত্র রাজধর্মের নির্দেশটা:

“আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেক্কনৈরপি।

আত্মানম্ সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি ॥”^১



সিন্ধুরে গুঁরা রাত্রিবাস করেননি। আট ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় এসে পৌঁছালেন ফ্রেডরিকনগরে। ভাগীরথীতীরে।

ফ্রেডরিকনগর সে-আমলে দিনেমারদের অধিকারে। ডেনমার্কের রাজার নামে এই জনপদের নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-পাদে জনপদটি ইংরাজ বেগেদের বিক্রয় করে

(১) আপদবিপদের জন্যই টাকার সঞ্চয়। কিন্তু গিনি যদি বিপদে পড়েন টাকা-কড়ি খরচ করতে পিছুপাও হয়ো না বাপু। আর নিজেই যদি ফ্যাসাদে পড়, তখন কী বা অর্থ; কী বা গিনি। সব ছেড়ে তখন মন্ত্র: চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা!

গমনজনন

দিনেমার কোম্পানি ভারত শোষণের আশা ত্যাগ করে চলে যায়। পরে এর নাম হয় 'শ্রীরামপুর'। তার আদালতের নিকটে গোরস্থানে কিছু সমাধিফলক ভিন্ন দিনেমার শাসনের কোন চিহ্ন আজ ঐ জনপদে নাই।

যাত্রীদলটি অবশ্য এই ফেরঙ্গভূমে ঘাঁটি গাড়েনি। নিকটেই হিন্দু ভূস্বামীদের পাশাপাশি দুখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম—মাহেশ আর বল্লভপুর। মাহেশের রথ সুবিখ্যাত। মনে আছে নিশ্চয়, 'রাধারানী' ঐ মাহেশের রথের মেলাতেই হারিয়ে যায়। এই ফ্রেডরিকনগর—বলা উচিত 'শ্রীরামপুর', বঙ্গসাহিত্যের এক তীর্থ। আমাদের কাহিনীকালের পরবর্তী জমানায় এখানেই পাদরী মার্শম্যান, ওয়ার্ড এবং কেরী-সাহেব বাংলা ছাপাখানায় প্রথম সংবাদ-পত্র 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশ করেন। এখানেই আছে তাঁদের তিনজনের সমাধি। শ্রীরামপুরের ছত্রপুরী, বা চাতরা পল্লীতে সে-আমলেও ছিল একটি শীতলা মন্দির—চাতরার-মা। ওঁরা কিন্তু এসে আশ্রয় নিলেন বল্লভপুরের রাধাবল্লভ-মন্দিরে। বোধকরি বৈষ্ণব বলে।

রাধাবল্লভের মূর্তিটি ভাস্কর্য-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।

এই মূর্তির বিষয়ে একটি লোকগাথা আছে।

এ পল্লীটির আদি নাম : আক্না। কৃতিবাসী রামায়ণে 'আক্না'-গ্রামের উল্লেখ আছে। সূত্রানুগত পাঁচ-ছয় শত বছরের প্রাচীন গ্রাম তো বটেই। ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ আক্না গাঁয়ের নাম পরিবর্তিত হল—যখন রুদ্ররাম পণ্ডিত সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন রাধাবল্লভজীউর আটচালা মন্দির। আক্না হয়ে গেল 'রাধাবল্লভপুর'।

রুদ্ররাম ছত্রপুরীতে মাতুলালয়ে থাকতেন। তাঁর মাতুলগৃহে ছিল একটি অপূর্ব নিমকাঠের শ্রীগৌরঙ্গ মূর্তি। জনশ্রুতি, ভাস্কর শ্রীগৌরঙ্গদেবকে স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু 1650 খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়া মঠে শ্রীচৈতন্যদেবের যে মূর্তিটি স্থাপিত হয় তারই অনুকরণে দক্ষ ভাস্করের গড়া এই দারুমূর্তি। রুদ্ররামের মাতুল ছিলেন বৈষ্ণব, কিন্তু রুদ্ররাম স্বয়ং শাক্ত বংশের সন্তান। একদিন রুদ্রকে ঐ দারুময় গৌরঙ্গদেবের মূর্তির সম্মুখে ধ্যানস্থ দেখে মাতুল তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, তুমি ঘোর শাক্তবংশের সন্তান, ঐর পূজার অধিকার তোমার নাই।

রুদ্ররাম নিদারুণ দুঃখিত হন। বিনা প্রতিবাদে তিনি গৃহত্যাগ করেন। ঘোর অরণ্যে একাকী তপস্যায় নিরত থাকেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন অন্তরাল থেকে আবির্ভূত হলেন এক দণ্ডী সন্ন্যাসী। ধ্যানভঙ্গে তাঁকে দেখেই শিহরিত হয়ে ওঠেন রুদ্রপণ্ডিত। এ কে ? মাতুলালয়ে যে নিমকাঠের দারুময় মূর্তিকে দেখেছেন এ তো সশরীরে তিনি!

সন্ন্যাসী বললেন, কী চাস্ ?

রুদ্র পণ্ডিত বললেন, যা পেলে চাওয়ার অন্ত হয়, তাই চাই প্রভু।

—কিন্তু তিনি তো বহুবর্ণ। কী রূপে তাঁকে দেখতে চাস্—রাধাবল্লভ, শ্যামসুন্দর, নানন্দদুলাল ?

রুদ্রপণ্ডিত মনস্থির করে উঠতে পারেন না। সত্যই তো, তাঁর ইষ্টদেবতা—কেন যে মোহিনী রূপে তিনি শ্রীরাধিকার নয়ন-বল্লভ হয়েছিলেন, না যে শ্যামরূপে তিনি ঐষ্টপঞ্চময় জগতে সুন্দরের মূর্ত প্রতীক ? অথবা যে বাৎসল্য মাধুর্যে তিনি নন্দ-যশোদার প্রিয় জয় করেছিলেন ? তাঁর নয়নে তখন দরবিগলিত ধারায় আনন্দাশ্রু। সন্ন্যাসী বলেন, শোন, তোকে গুপ্তধনের সন্ধান

বলে দিচ্ছি: গৌড়েশ্বরের শয়নকক্ষের দ্বারদেশে পশ্চিমপার্শ্বে একটি কষ্টিপাথর আছে। তার ভিতর অশ্বেষণ করে দ্যাখ। যাকে পাবি তিনিই তোর ইষ্টদেব। তাঁকে পেলেই চাওয়ার অন্ত হবে।

রুদ্রপণ্ডিত সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। গাত্রোত্থান করে দেখেন—সন্ন্যাসী অন্তর্হিত।

রুদ্রপণ্ডিত গৌড়ে এলেন। তখন সুলতানী আমল। সুলতানের প্রধান অমাত্য একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব—তিনিই মহামন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব কথা খুলে বললেন। বিস্মিত হলেন মহামন্ত্রী। বলেন, হ্যাঁ, নির্দিষ্টস্থানে একটি বৃহদায়তন কষ্টিপাথর আছে বটে; কিন্তু কই তার ভিতর কোন দেবমূর্তি তো কখনো দেখিনি। আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখব।

পরদিন প্রস্তরখণ্ডটি নিরীক্ষণ করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামন্ত্রী। স্পষ্ট দেখতে পেলেন—পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়েছে সেই প্রস্তরখণ্ডে, আর তাতে ঘর্মের মুক্তাবিন্দু ফুটে উঠেছে। পাথরের শ্বেদস্রোত! এ তো অলৌকিক!

প্রস্তরখণ্ডের নিকটে মহামন্ত্রীকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে সুলতান কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে এলেন। বলেন, অমন করে কী দেখছেন আপনি?

মহামন্ত্রী কৌশলে কার্যসিদ্ধি করতে চাইলেন। বলেন, জাঁহাপনা, এই দেখুন! এই কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ডটি অশ্রুবিবর্জিত করছে! একে অবিলম্বে মুক্তি দিন, না হলে রাজ্যের অমঙ্গল হতে পারে।

সুলতান তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হলেন। বলেন, এ পাথরখানা এখনি নিয়ে যান।

মহামন্ত্রী লোক দিয়ে সেই বিরাট কষ্টিপাথরখানি স্বগৃহে নিয়ে এলেন।

গৌড়ের প্রখ্যাত এক হিন্দু ভাস্করকে তিনি ডেকে পাঠালেন। পাথরখানা দেখালেন। বলেন, দেখুন, এ থেকে কি কোনও মূর্তি নির্মিত হতে পারে?

ভাস্কর বললেন, একখানা নয়, মহামন্ত্রী। আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ কষ্টিপাথরের ভিতর তিনখানি মূর্তির সমাহার ঘটেছে। তিনটিই পুরুষ মূর্তি।

মহামন্ত্রী এবং রুদ্ররাম বিস্মিত। বলেন, কই, আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আপনি কী করে দেখছেন?

—গুরুর কৃপায়। শিল্পীর সাধনায়। ভাস্করের ধ্যানে!

—কোন দেবতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করছেন আপনি? বর্ণনা দিন।

—তিনটিই ত্রীকৃষ্ণের। তাঁর তিন অপরূপ রূপ। এক: যেরূপে তিনি শ্রীরাধিকার মনোহরণ করেছিলেন: রাধাবল্লভ! দুই: যে শ্যামরূপে তিনি 'সত্য-শিব'এর সঙ্গে 'সুন্দর'রূপে সম্পৃক্ত: শ্যামসুন্দর! তিন: যে রূপে তিনি বাৎসল্যরসে জননীবক্ষে ক্ষীরসমুদ্রে তুফান তোলেন: নন্দদুলাল!

রুদ্ররামের দেহ কদম-ফুলের মতো রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! এই তিন দেবতার নামই তুমি করেছিলেন সেই মহাসন্ন্যাসী!

ভাস্কর বলেন, মহামন্ত্রী, আপনি নির্বাচন করে বলুন কোন মূর্তিখানি চাইছেন? আমি বিনা পারিশ্রমিকে সেটি উৎকীর্ণ করে দেব; কিন্তু বাকি প্রস্তর-খণ্ড আমার হবে। আমার পারিশ্রমিক।

মহামন্ত্রী বলেন, এ প্রস্তাবে আমি সম্মত নই, ক্ষোদকাচার্য! আমি কাঞ্চনমূল্যে আপনাকে

নোড়

পারিশ্রমিক প্রদান করব। তিনটি মূর্তিই আমার চাই।

অগত্যা তাই। তিনটি মূর্তিই উৎকীর্ণ করলেন ভাস্কর—তিনটিই অপূর্ব।

মহামন্ত্রী রুদ্রপণ্ডিতকে বলেন, একটি আমি রাখব, বাকি দুটি আপনি নিয়ে যান। কোনটিকে আপনি দেবেন বলুন?

রুদ্রপণ্ডিত বলেন, নির্বাচন আপনি করবেন মহামন্ত্রী। আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন এ সম্পদ আমি কিছুতেই লাভ করতাম না; দ্বিতীয়ত ক্ষোদকাচার্যের পারিশ্রমিক আপনিই সম্পূর্ণ প্রদান করেছেন। নির্বাচনের অধিকার আপনারই।

মহামন্ত্রী বলেন, ও-কথা বলবেন না, আপনি তপস্যায় সন্তুষ্ট করে দেবতার নিকট থেকে এই বিচিত্র সন্দেশটি সংগ্রহ করেছেন। যা হোক, আপনার ইচ্ছানুসারে আমি এই 'নন্দদুলাল' মূর্তিটিকেই আমার কাছে রাখলাম। আমার স্বগ্রামে ঐর প্রতিষ্ঠা করব। বাকি দুটি আপনার।

গৌড়ের অনেক সৎ-বৈষ্ণব ঔর কাছ থেকে যে-কোন একটি মূর্তি ভিক্ষা করলেন। কিন্তু মনস্থির করতে পারলেন না রুদ্ররাম। স্থির করলেন যুগলমূর্তিই প্রতিষ্ঠা করবেন নিজ গ্রামে।

আর্থিক সঙ্গতি সামান্য। সিদ্ধান্তে এলেন, একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করে উভয় মূর্তিই স্থাপন করবেন। কিন্তু দৈব যাঁর সহায়, তাঁর আবার কিসের অভাব! মন্দিরের ভিৎ খনন করতে গিয়ে লাভ করলেন এক ঘড়া আকবরী মোহর!

শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ব্যয় করলেন মন্দির নির্মাণে! যুগলমন্দির সমাপ্ত হলে সাড়স্বর প্রতিষ্ঠার আয়োজন হল। দেশ-দেশান্তরের বৈষ্ণবাচার্যদের আমন্ত্রণ করলেন রুদ্ররাম—নবদ্বীপ, কাটোয়া, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, তেঘরা, সপ্তগ্রাম।

এমনকি নিমন্ত্রণ রাখতে উপস্থিত হলেন স্বয়ং বীরভদ্র-আচার্য।

প্রভু নিত্যানন্দতনয়—'নেড়া'-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু অশক্ত নন। আচার্য বীরভদ্র গোস্বামী বললেন, রুদ্র! একটি কথা বলি বাবা, কিছু মনে কর না। দেবতার বরে যুগল দেবমূর্তি পেয়েছ। দুর্লভ প্রাপ্তি! কিন্তু তার একটিকে রাখ, একটি দান কর। না হলে সাধনা ঐকান্তিকতা লাভ করবে না।

ব্যথিত হলেন রুদ্ররাম। প্রতিপ্রশ্ন করেন, আপনার কি সিদ্ধান্ত এ দেউল যথেষ্ট বৃহৎ নয়? দুটি মূর্তির স্থান হবে না?

—ঠিক তাই! এ দেউলে একের বেশি দেবতার স্থানাভাব!

ভ্রুকুণ্ঠিত হল রুদ্ররামের। বলেন, দেখা যাক। সত্যই যদি স্থানাভাব হয়, তাহলে তিনিই আমাকে স্বপ্নাদেশ দেবেন।

বীরভদ্র সহাস্যে বলেন, কিন্তু তিনি 'কিনি'? রাধাবল্লভ না শ্যামসুন্দর? কে তোমাকে স্বপ্নাদেশ দেবেন?

রুদ্ররাম বিরক্ত হয়ে বলেন, দেখা যাক কার কৃপা হয়। কেউ না দিলে বুঝব যে, স্থানভিতি হচ্ছে না।

—তোমার ঘেরাপ অভিরুচি, বাবা।

প্রায় এক দশক পরের কথা। বীরভদ্র গোসাই-এর শতবর্ষ পূর্ণ হতে উঠলো কিছু বাকি। এই সময় রুদ্ররামের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃশ্রাদ্ধেও তিনি বৃহৎ আয়োজন করেছেন। অনেকানেক

পণ্ডিত সমাগত হলেন। তার ভিতর অতি বৃদ্ধ বীরভদ্র গোসাইজী।

কিন্তু শ্রাদ্ধের পূর্বরাত্রি থেকে শুরু হয়ে গেল অকাল বর্ষণ। মাঘ মাস, বৃষ্টির কোনও আশঙ্কা ছিল না। ফলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। সমস্ত পণ্ড হবার উপক্রম! সমবেত পণ্ডিতেরা বললেন, পারলে একমাত্র ঐ সিদ্ধপুরুষই রক্ষা করতে পারেন। উনি 'মেঘবন্ধনবিদ্যা' আয়ত্ত করেছেন।

রুদ্ররাম যুক্তকরে তাঁরই শরণ নিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, ব্যবস্থা তো সহজেই করা চলে। তোমাকে আমি ঐ 'মেঘবন্ধনমন্ত্রটি' শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি তোমার ইস্টদেবের নিকট ঐকান্তিক নিষ্ঠায় প্রার্থনা মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেই বারিপাত বন্ধ হবে।

রুদ্ররাম করজোড়ে বলেন, বলুন প্রভু?

—কিন্তু মুশকিল এই: তুমি 'ঐকান্তিক' হবে কী করে? তোমার ইস্টদেবের যে যুগলমূর্তি! ধ্যানে তো একজনকেই দেখতে হবে।

রুদ্ররাম বলেন, ওঁরা দুজনেই কি এক নন?

—নিশ্চয়ই। শ্যাম-শ্যামা-শিব-সরস্বতী মায় আত্মাহুঁও তিনি। বল, কে তোমার ইস্টদেব?

রুদ্ররাম লুটিয়ে পড়লেন পরমসাধকের চরণে। বলেন, বুঝেছি প্রভু! লোভ আর মোহের বশবর্তী হয়ে অনেক সং বৈষ্ণবকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আর করব না। শ্যামসুন্দরকে আপনি নিয়ে যান। আমার বর্তমান সাধনা শুধু রাধাভাবের।

বীরভদ্র বলেন, মনে আছে বাবা? তুমি প্রশ্ন করেছিলে, 'দেউল কি যথেষ্ট বড় নয়?' আমি জবাবে বলেছিলাম, 'ঠিক তাই।' তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেদিন। বোঝনি, আমি এই দেউলটার কথা বলেছিলাম, বাবা।

বলিরেখাক্রি তর্জনীটি তিনি স্পর্শ করালেন রুদ্ররামের পাঁজরে।

বীরভদ্রের অলৌকিক ক্ষমতায় শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পন্ন হল।

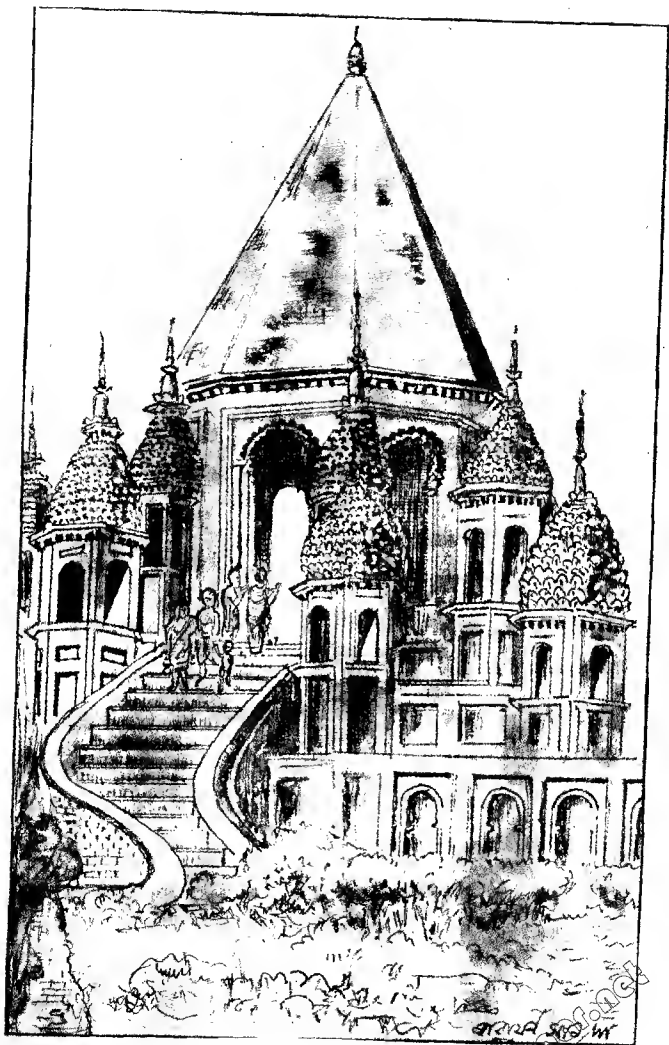
সেই থেকে আকনা গ্রাম হয়ে গেল: রাধাবল্লভপুর।

বীরভদ্র প্রতিষ্ঠা করলেন 'শ্যামসুন্দরকে স্বগ্রামে—অপূর্ব সে মন্দির, আজও অটুট—ভাগীরথীর পরপারে: খড়দহ।

'খড়দহ' নামটা কী করে হল জান তো? তাও জান না? কিছুই জান না দেখছি দিদিভাই-দাদুভাইরা! বুড়োকে বকিয়ে বকিয়ে মারছ। বার-বার খেঁই হারিয়ে যাচ্ছে আমার। যা হোক, জান না বললে যখন, তখন শোন বলি:

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ গাইস্থলধর্মে দীক্ষা নিলেন। নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্যদাস সরথেলের দুটি কন্যা—বসুধাদেবী আর জাহ্নবীদেবীকে একযোগে পত্নীত্ব বরণ করলেন। গৃহিণী হলে গৃহ আবশ্যিক। এতদিন অবধূতের শয়নের ব্যবস্থা ছিল হট্টমন্দিরে। এখন আর তা চলে না। গঙ্গাতীরের এক গ্রামে দুই পত্নীকে নিয়ে উপনীত হলেন প্রভু নিত্যানন্দ। শুনলেন, স্থানীয় ভূস্বামী গঙ্গাতীরে আছেন। তাঁর নিকট উপস্থিতি হয়ে সামান্য ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ড প্রার্থনা করলেন।

জমিদার-মশাই তখন ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে জমিয়ে বসেছেন মৎস্যশিকারে। বললেন, শুনেছি



শ্যামসুন্দরের বাসমন্দির, হজিরা

আপনি এককালে অবধূত ছিলেন, অর্থাৎ সন্ন্যাসী! আপনি 'বে' করলেন কোন আক্কেলে? আগে সেটাই আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

প্রভু নিত্যানন্দ বিনয়ের অবতার। তৃণাদপি সুনীচ। জিজ্ঞাসুকে কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না। করজোড়ে বললেন, অবধূত দুই প্রকার—শৈব ও বৈষ্ণব। মহানির্বীণতন্ত্র মতে তার চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ, যথা ব্রহ্মাবধূত, ধীরাবধূত, শৈবাবধূত ও কৃলাবধূত। শেষোক্ত শ্রেণী কুলাচার ধর্ম-মতে অভিযুক্ত থাকেন। তিনি গৃহাশ্রমে সাধন-ভজন করেন। আমি পরমপ্রভুর আদেশক্রমে বর্তমানে সেই কুলাবধূত। আপনি আমাকে সামান্য ভূখণ্ড দান করলে...

জমিদার-মশাই ঠুঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ও-সব তত্ত্বকথা আমাকে শোনাতে আসবেন না। সন্ন্যাসী হবার পরেও যখন বে-করতে পেরেছেন তখন গঙ্গাগর্ভে ভদ্রাসনও নিশ্চয় নির্মাণ করতে পারবেন। এখানে আপনি আপনার ভদ্রাসনটি নির্মাণ করে বংশানুক্রমে ভোগ করতে পারেন।

হঁকো-বরদার তখন এক-আঁটি জ্বলন্ত খড়ের সাহায্যে তাঁর ছিলিমে অগ্নি-সংযোগে ব্যাপ্ত ছিল। জমিদার-মশাই তার হাত থেকে জ্বলন্ত খড়ের আঁটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে বললেন, ঠিক এখানে। জলের মধ্যে!

নিত্যানন্দ করজোড়ে বললেন, তাই হবে প্রভু!

মোসায়েবের দল অটুহাস্যে কেয়াবাৎ দিয়ে ওঠে।

নিত্যানন্দ ভূক্ষেপ করলেন না। খড়-দড়ি-বাঁশের এস্তাজামে গেলেন। জমিদার-মশাই বয়স্যদের বললেন, পাগলটাকে তোমরা বাধা দিও না! দেখাই যাক না—রগড় কতদূর গড়ায়।

রগড় যতদূর গড়ালো তাতে সকলের চোখ কপালে ওঠে। প্রজ্জ্বলিত খড়ের আঁটিটি যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেখানে জেগে উঠল একটা চর। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল তা। নিত্যানন্দ সেখানেই নির্মাণ করলেন তাঁর ভদ্রাসন: খড়দহ গ্রামে।

গ্রামটির উৎপত্তি এই অলৌকিক ঘটনায়।

মজার কথা, মাত্র আড়াই ক্রোশ দূরে 'সাঁইবেনা' গ্রাম। গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রীর আদি নিবাস। সেখানেই নির্মিত হয়েছে 'নন্দদুলালজীর মন্দির।

অর্থাৎ সেই কষ্টিপাথরের ভিতর লুক্কায়িত ত্রি-মূর্তির—গৌড়ের ক্ষোদকাচার্য্য যাদের দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে, তাঁরা কাছাকাছিই আছেন আজও। ভাগীরথীর পশ্চিমপারে রাধাবল্লভ আর পূব-পারের পাশাপাশি গাঁয়ে 'শ্যামসুন্দর আর 'নন্দদুলালজী। মাঘী-পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে পর্যায়ক্রমে তিন-দেবতার দর্শন নাকি মহাপুণ্য কাজ।

যতদূর মনে পড়ছে—নিতান্ত বাল্যকালে ঐ তিন দেবতাকেই একত্র বলনে দুলতে দেখেছি। কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে—বারোদালের মেলায়। নামগুলিই শুধু মনে আছে: রাধাবল্লভ, শ্যামসুন্দর, নন্দদুলাল। তাঁরা পর্যায়ক্রমে রাধাবল্লভপুর, খড়দহ আর সাঁইবেনার বাসিন্দা কিনা তা বাপু হালপ করে বলতে পারব না। খুব সম্ভবত তাই।

'রাধাবল্লভজী' মন্দির-প্রতিষ্ঠার পূর্বোক্ত কাহিনীটি রূপেক্ষনাথ যাত্রাপুথিই সকলকে বিবৃত করতে এসেছেন। কর্তামশাই তাই নিদান হৈকেছেন—তাঁরা ফ্রেডরিকনগর বা শ্রীরামপুরে রাত্রি যাপন করবেন না। আশ্রয় নেবেন ঐ গ্রামে। রাধাবল্লভপুরে। শোনা গেল,

রাধাবল্লভদূর

সেই দেবোত্তর সম্প্রতিতে একটি সুবহুৎ যাত্রীনিবাস আছে। তীর্থযাত্রীরা তিন তিথি সেই ধর্মশালায় আশ্রয় পেতে পারে।

আরও একটি আকর্ষণ ছিল। স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয়—তবু বলব, সাধনভজন করছেন বলে ওঁরা তো নির্লোভ সন্ন্যাসী নন। রবি-বাউলের ঐ পংক্তিটা—‘সেরা রস রসনায়’ তখনো রচিত হয়নি বলে কি তত্বটা তাঁদের না-জানা? এ মন্দিরে বাল্যভোগে একটি বিচিত্র-প্রণালীতে প্রস্তুত ভোগ নিবেদন করা হয়—আহা যেন অমৃত। শোন বলি:

‘লেচিকা’-র নাম নিশ্চয় শুনেছ? মিহি গোধুমচূর্ণের ‘ঘৃতপক পিষ্টক’। সে তো সে-আমলে অনেকানেক বৈষ্ণব-আখড়ায় ভোগের জন্য প্রস্তুত হত। এ তারই এক রকমফের। পিষ্টকের দুটি পরতের ভিতর পাচক কী-জানি কী-করে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয় আর্দ্রক-মৌরী-হিঙ্গু-জীরা-সুরভিত ‘ডাইল’-এর এক অনুপান। ঘৃতভর্জিত এই বিশেষ পিষ্টকটি সে আমলে গৌড়মণ্ডলের মাত্র দুইটি দেবমন্দিরে ভোগার্থে প্রস্তুত হত। প্রথমত মুর্শিদাবাদ কান্দির সিংহ-পরিবার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে, দ্বিতীয়ত এখানে। দুইটি দেববিগ্রহের একই অভিধা: রাধাবল্লভ। পিষ্টকটি পরবর্তীকালে শুধু বৈষ্ণব বাবাজীদেরই নয়, সাধারণ গৌড়বাসীর কাছেও বড়ই আদরণীয় হয়ে পড়ে। এখন তার বহুল ব্যবহার।

তোমরা হয়তো তার নামটি শুনে থাকবে: ‘রাধাবল্লভী’!



কর্তামশায়ের সব সংশয় ঘুচে গেছে। দামোদরের অকাল বন্যা আর ‘নলগিরিদমনের’ উপাখ্যানটি ধ্বংসুরি মেনে নেননি, বারে-বারে প্রতিবাদ করে বলেছেন—এসব গালগল্প; কিন্তু হরিপালের ঘটনাটি যে ওঁর প্রত্যক্ষজ্ঞানে লঙ্কা কুসুমমঞ্জরী আর রাধারানীকে নানানভাবে জেরা করে সম্পূর্ণ তথ্যটি তিনি সংগ্রহ করেছেন। বুঝতে পেরেছেন—সেই পুরোহিত কী উদ্দেশ্যে নবদম্পতির ললাটে রক্ততিলক ঐকে দিয়েছিলেন, কাংস্যবাদক বালকটি কেন কুসুমের আঁচল ধরে টেনেছিল, আর সেই বৃদ্ধ ঘোষালমশাই হঠাৎ কেন পিছিয়ে গেছিলেন পুরোহিতের ধমক শুনে: ‘শুনছেন না, উনি ’মায়ের আহ্বান শুনে এসেছেন!’

সিদ্ধপুরুষ না হলে, শাপলষ্ট দেবতা না হলে, রূপেন্দ্রনাথ যখন প্রণিধান করলেন যে, শ্রীশানকালী শবাসন ত্যাগ করে শ্রীশানে নেচে বেড়াচ্ছেন তখনই তাঁর সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ার কথা। পরদিন প্রভাতে মায়ের ওষ্ঠপ্রান্তে তাহলে দেখা যেত কুসুমমঞ্জরীর অঞ্চলপ্রান্তে অনুবিন্দ কুঞ্চিকাটি! কিন্তু রূপেন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহীন তো হলেনই না, উল্টে ডালমতে-কালীকে ভৎসনা করে শুনিয়ে দিলেন আদ্যাশক্তির প্রকৃত স্বরূপ কীরকম হওয়া উচিত। ভৎসিতা শ্রীশানকালী ভক্তের তিরস্কারে সলজ্জে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নির্দিষ্ট শবাসনে—হ্যাঁ, সলজ্জে জিহ্বা দংশন করে।

ভেষগাচার্য—সন্দেহাতীতরূপে সিদ্ধ-পুরুষ।

তাই সুযোগ মতো তাঁর কাছে পেশ করেছেন তাঁর বর্তমান সমস্যাটি। ঐ সিদ্ধপুরুষের সমাধানটিই তিনি নির্বিচারে মেনে নেবেন।

শীতল-রুক্মিণী বিতাড়নের পর কয়েক বৎসর আখড়ায় দিন নির্বিঘ্নে কেটে যাচ্ছিল। গুরুবাক্য মেনে আশ্রমিকেরা দিনে উপাসনা, নামগান, ভিক্ষা করে; রাতে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নির্দেশে কৈবল্যানন্দের সন্ধান করে। চান্দ্রায়ণ-ব্রত উদযাপনের পর বৃদ্ধও ফিরে পেয়েছিলেন মানসিক শান্তি। শীতলদম্পতির কী হল, তারা কোথায় আশ্রয় পেল, সে-সব খবর পাননি। রাসের সময় আখড়ায় নানান যাত্রীসমাগম হয়। ঐ একটি দিন সর্বসাধারণের জন্য আখড়া উন্মুক্তদ্বার। রাসলীলায় নানান উৎসব। কাঞ্চনমূল্যে খিচুড়িভোগ সেবা করতে পারে বহিরাগতরা। রাত্রি সমাগমে তারা ফিরে যায় নাম-গান শুনে। কিছু বিস্ত্রশালী ভক্ত বিশেষ অনুমতিতে—সেটিও কাঞ্চনমূল্যে কিনা জানা যায় না—রাত্রিবাসের অনুমতি লাভ করেন। এসকল তথ্য শীতল-রুক্মিণীর যে না-জানা তাও নয়, তবু তারা রাসোৎসবে কোনবার ফিরে আসেনি। আশ্রমিকেরাও, অন্তত কর্তামশায়ের সামনে তাদের নামোচ্চারণ করেনি।

নতুন করে মুশকিল হল আখড়ায় রাধারানী যোগদান করার পরে।

তাকে সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন কর্তামশাই। এ তো রীতিমতো সৌভাগ্য। রাধারানী প্রাক্তন রাইরানী। যৌবনবতী—রীতিমতো সুন্দরী। বরাতিরাও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। শুনেছিলেন মেয়েটির করুণ কাহিনী—যেটুকু সে বিবৃত করেছে, শুধু সেইটুকুই। বিস্তারিত জানেন না। সে প্রশ্নে এককথায় ছেদ টেনে দিয়েছিল রাধা: আমি ঐ বিধবস্ত রূপনগরের প্রাক্তন রাইরানী। এক বৎসর মোহন্ত মহারাজের সেবা করেছি, পরে বহু-পরিচর্যাও করতে হয়েছে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই আমার। যদি আশ্রয় না দিতে পারেন খোলাখুলি বলে দিন।

কর্তামশাই আশ্রয় দিয়েছিলেন।

তারপর এই কয়মাসে তিনি তিল তিল করে প্রণিধান করেছেন, কাজটা ভাল হয়নি। কেন, কী বৃত্তান্ত—তা ঠিক জানেন না। বুঝতে পারছেন না। এ যেন এক ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। শুধু ঐ মেয়েটি একাই নয়, আশ্রমিক বরাতি এবং তাদের সঙ্গিনীরাও গোপনে আশ্রমিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করছে বলে আশঙ্কা হয়। পূর্ববার হেতুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন—শীতল-রুক্মিণী ছিল স্বামী-স্ত্রী; তারা সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। যে কোন হেতুতেই হোক, আশ্রমিকেরা গোপনে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু এবার রাধা তো একাকিনী। আশ্রমিকদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ পুরুষের প্রতি কি সে আসক্ত? ঐ কমলকুমার? তাহলে সেটা আর সবাই কেন মেনে নেবে?

কেন তাদের ঈর্ষা হবে না? এবার আর সরেজমিনে তদন্ত করার ভরসা পাননি। গতব্ত্রের তিন্ত অভিজ্ঞতাটা স্মরণে থাকায়। আদ্যোপান্ত সমস্যাটি তিনি জ্ঞাপন করলেন রাপেস্ত্রনাথকে। তাঁর উপদেশ চাইলেন।

রাপেস্ত্র স্বতই বিব্রত বোধ করেন। বলেন, এ ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি? আমি বহিরাগত। দু-এক দিনের ভিতরেই আমাদের সম্পর্কের ছেদ হবে।

কর্তামশাই ঠুর হাত দুটি ধরে বলেছিলেন, আপনি শুধু বহিরাগত নন, আপনি একজন

রাধাবল্লভদূর

শাপভট্ট সিদ্ধপুরুষ...

রাপেন্দ্র প্রায় গর্জন করে ওঠেন, না! তা যে আমি নই, তা তো বারে-বারেই বলছি।

—তাই সই! স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আপনি ভেষগাচার্য! আমাদের আশ্রম ব্যাধিগ্রস্ত। আপনি চিকিৎসাই করুন।

রাপেন্দ্র বললেন, বেশ। আমি চেষ্টা করে দেখব।

তার মনে হল, যে কোন কারণেই হোক ঐ প্রগলভা মেয়েটি তাঁকে কিছু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। হয়তো যে-কথা সে কর্তা-মশাইকে বলেনি, সে-কথা তাঁকে জানাতে পারে। হয়তো তিনি তাঁর শিক্ষায়, তাঁর বিদ্যায় একটা সমাধানের নাগাল পাবেন, যা ঐ মেয়েটি নিজে খুঁজে পাচ্ছে না। হতে পারে—ঐ মেয়েটি কোনও মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে, অথচ সে তা জানে না। ঠিক যেমন বর্ধমানে ঘটেছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়ও আছে। হরিপালের সেই রাত্রির শেষপ্রহরে রাধারানীর আচরণ এক বিশেষ ইঙ্গিতবাহী—সেটা যে শুধু তার চারিত্রিক প্রগলভতার প্রভাবে তা মনে হয়নি। তিনি নিজে অবিচলিত, একনিষ্ঠ আছেন, কিন্তু ও-পক্ষও কি তাই? রাধা বলেছিল, ‘কে-কোথায় দেখবে আর ভুল বুঝবে।’

রাধা যদি অন্তরের কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে চিকিৎসা করতে যাওয়ার মধ্যে বিপদ আছে। অবিবাহিত হলে তিনি নিঃসঙ্কোচে এ দায়িত্ব নিতে পারতেন; কিন্তু মঞ্জু যদি ঠেকে ভুল বোঝে?

বিবেকের নির্দেশে চলেন তিনি। স্থির করলেন, এ কাজের ভালমন্দ, আশঙ্কা ও লাভের কথাটা মঞ্জুর সঙ্গে প্রথমে খোলাখুলি আলোচনা করে নেবেন। তাতে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কাটা কমবে। কিন্তু নির্জনে মঞ্জুর সঙ্গে দুটো কথা বলার অবকাশই যে পাচ্ছেন না। বসন্তত সোঞাই গ্রাম থেকে রওনা হবার পর, বর্ধমানে উপনীত হবার পর তাঁর সঙ্গিনীটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য বারেকের তরেও পাননি। বর্ধমানে বাস করতে হয়েছিল পৃথক কক্ষে, এখানেও প্রায় তাই। শ্মশানকালীর মন্দির চাতালের সে বীভৎস রাত্রিটা তো হিসাবের বাইরে।

সুযোগ হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। মঞ্জু ঠেকে বললে, আচ্ছা মাহেশ গ্রামটা এখান থেকে কাছাকাছি নয়?

—হ্যাঁ, পাশের গ্রাম। কেন বল তো?

কুসুমমঞ্জুরী কারণটা জানায়। তার মনে আছে যে, তার এক পিসিমার বিবাহ হয়েছে ঐ মাহেশ গাঁয়ে। তাঁকে ও ডাকত ফুলপিসি। তাঁর স্বামীর নামটাও মনে আছে—ভরতীশরণ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে সেটা হুগলী জেলার ‘মাহেশ’ গ্রাম কিনা, ঠিক জানে না।

রাপেন্দ্র বললেন, খোঁজ করে দেখতে দোষ কী? এত কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছি। সত্য হলে তুমি হয় তো অনেক খবর পাবে।

দলটি যাত্রীশালায় তিন দিন থাকবে। স্থির করলেন, পরদিন শুধু দুজন মাহেশ গ্রামে গিয়ে গাঙ্গুলীমশায়ের তল্লাশ করবেন। যদি তাঁর দেখা না-ও পান তবু মাহেশ গ্রামটাতো দেখা হবে।

কর্তা-মশাই বললেন, মাহেশ থেকে ঘুরে আসতে আপনাদের পাঁচ-ছয় দণ্ড লাগবে। অপরাহ্নেই ফিরে আসতে পারবেন।

রূপেন্দ্র বলেন, কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎ যদি পাই, আর তাঁরা যদি পীড়াপীড়ি করেন তাহলে হয়তো দু-এক রাত তাঁদের বাড়িতেই থেকে যাব। সুতরাং বিকালে আমরা ফিরে না এলে ব্যস্ত হবেন না।

—কিন্তু মনে আছে তো, পশুর পরদিন আমরা ত্রিবেণীঘাটে চলে যাব?

—আছে বৈকি। তার আগে আমি নিশ্চয় ফিরে আসব। সস্ত্রীক যদি নাও হয় তবে একাই। এরকমই স্থির হয়েছে। কর্তামশাই এরপর সদলবলে ত্রিবেণী চলে যাবেন। সেটাই তাঁদের যাত্রাপথের শেষ লক্ষ্য। অপরপক্ষে রূপেন্দ্রের ইচ্ছা ভাগীরথীর উভয় তীরে কিছু তীর্থদর্শন সেরে সস্ত্রীক যাবেন ত্রিবেণী। যদি সেখানে সাক্ষাৎ না হয় তাই দু-পক্ষই তাঁদের আদি-নিবাসের পাকা-ঠিকানা বিনিময় করে রেখেছেন। সহজিয়া পন্থীদের মূল ঘাঁটি কেন্দুবিল্বের কাছাকাছি—কদমখণ্ডী-ঘাটের ক্রোশ-খানেক পশ্চিমে। কর্তামশাই ঠুকে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করে রেখেছেন রাসপূর্ণিমায় তাঁর আখড়ায় আসতে। তখনই বার্ষিক মহোৎসব।

কর্তামশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে পিছন ফিরতেই নজর হল অদূরে রাধারানী একা বসে প্রভাতী তিলকসেবা করছে। তার স্নান সারা। চুল শোকায়নি, তাই ধ্মিল্ল বাঁধা হয়নি এখনো। সমুখে ধাতব দর্পণ। ললাটে রসকলির আলিম্পন রচনায় ব্যস্ত। কথাবার্তা সবই শুনেছে। হঠাৎ ডাক দিল, এদিকে একটু আসবেন, গোসাইঠাকুর।

রূপেন্দ্র সেদিকে এগিয়ে যান। রাধা একটি পশমের আসন এগিয়ে দিয়ে বলে, বসুন, জপতপ হয়েছে?

—হয়েছে, কিন্তু আমি সমুখে বসে থাকলে তোমার প্রসাধনে ব্যাঘাত হবে না তো কিছু?

রাধা মুচ্কি হেসে বলে, একে ‘প্রসাধন’ বলে না, গোসাই। এ হল ‘শৃঙ্গার’—‘রস’-এর কথা কিছু জানা আছে? ‘দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস/চারিভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ।’

রূপেন্দ্র বলেন, আমি বেরসিক—‘রস’-এর কথা কী জানি? আমি তো বুঝি: ‘পুং স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সন্তোগং প্রতি যা স্পৃহা/সা শৃঙ্গার ইতি খ্যাতে রতিক্রীড়াদিকারণম্॥’

অপাঙ্গে দৃষ্টি হেনে রাধা জানতে চায়, তার মানেটা কী হল, ঠাকুর?

—অমরকোষ বলছেন, ‘স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের সন্তোগকামনায় যা কৃত্য, সেই রতিক্রীড়ার উদ্যোগপর্বের নাম শৃঙ্গার’। প্রসাধনও অবশ্য তাই। তবে প্রসাধন নিতান্তই জাগতিক ব্যাপার, ‘শৃঙ্গার’-এর সঙ্গে মিশে আছে কিছু আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা—এই যা!

রাধা কপট তাড়না করে, আপনাকে পণ্ডিত্যমো করতে হবে না। মঞ্জু কোথায়? তাকে দেখছি না যে?

—ঘাটে গেছে। স্নান করতে। আমরা দুজন একটু পরেই মাহেশে চলে যাব।

—শুনেছি! তাহলে বস দিকি শান্ত হয়ে। এই নাও, খাও! এখনো গরম আছে।

খুশিগোষের আবরণ সরিয়ে সে বাল্যভোগের প্রসাদপাত্রটি এগিয়ে দেয়। তাতে কিছু কাটা ফল, আখের গুড় আর দুখানি সেই অপূর্ব পিষ্টক: রাধাবল্লভী। রাধা জানায়, আর সকলের

রাধাবল্লভদূর

সেবা হয়েছে; শুধু ওদের তিনজনেরটা পৃথক রাখা ছিল।

রূপেন্দ্র প্রসাদের পাত্রটা ললাটে স্পর্শ করিয়ে আহারে প্রবৃত্ত হলেন। বলেন, শুনেছি তোমাদের কানুনে পুরুষ ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’-র নৈকট্যে নেমে আসে রাতের বেলায়। আজ দেখছি এক শৃঙ্গাররতা সে কানুন দিনের বেলাতেও মানছেন না। হেতুটা কী? ঐ ‘তাহলে’?

—‘তাহলে’! মানে?

—একটু আগে তুমি বললে না: ‘তাহলে বস দিকি শান্ত হয়ে’—যখন আমি বললাম মঞ্জু স্নানে গেছে।

রাধা মুখ টিপে হাসল। অপাঙ্গে আবার দেখে নিল। বললে, আখড়ার সে কানুনটা শুধু ভদ্রলোকের জন্য। চোরকে আবার ‘আপনি’ বলে কে?

—চোর! চোর আবার কোথায় পেলে তুমি?

রাধা তার প্রসাদখী সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে ঝোলায় মধ্যে হাঙড়াতে থাকে। বার করে আনে তার খঞ্জনী-জোড়া। কোথাও কিছু নেই ঠুনঠুন করে তান ধরে:

“ললিতা কহয়ে শুনহ হরি।

দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥

শুন শুন ওহে রসিকরাজ।

এই কি তোমার উচিত কাজ?

উচিত কহিতে কাহার ডর।

কিবা সে আপন কিবা সে পর॥

রূপেন্দ্রের আহার-কার্য বন্ধ হয়েছে। ইতি-উতি তাকিয়ে দেখেন। শ্রুতিসীমার মধ্যে আছে অনেক বরাতি। তারা যে-যার তালে মগ্নচৈতন্য। বৈষ্ণবী খেয়াল-বেখেয়ালে খঞ্জনী বাজিয়ে তান ধরে; এতে ওরা অভ্যস্ত। অবাক হয় না। পদকর্তার বিশেষ পদ চয়ন করে যে মনের ভাব তির্যকরূপে প্রকাশ করা যায় তা ওদের ধারণার বাইরে। গান—গান! মোট কথা, কেউ ফিরেও চাইল না। রাধা দ্বিজ চণ্ডীদাসের জবানীতে এগিয়ে চলে:

“শিশুকাল হইতে স্বভাব চুরি।

সে কি পারে রহিতে ধৈর্য ধরি॥

এক ঘরে যদি না পোষে তায়।

ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়॥

সোনা-লোহা-তামা পিতল কি বাছে?

চোরের কি কখনো নিবৃত্তি আছে॥”

সুললিত কণ্ঠ। দরদ দিয়ে গাইছে। রূপেন্দ্র মুগ্ধ, তবু তাঁর যষ্ঠ-ইন্দ্রিয় সজাগ। বৈষ্ণবী তার মোহজাল বিস্তার করতে চাইছে। পরকীয়া-প্রেম ওদের রক্তে। মঞ্জুর অনুপস্থিতিতেই শৃঙ্গাররতার এই প্রগলভতা। দ্বিজ চণ্ডীদাসের ঐ বিশেষ পদটি চয়নের মধ্যে একটা তির্যক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। ঔর ভিষগ-সন্তাকে বারে বারে ইশিয়ারী জানাচ্ছে তাঁর সাবধানী মন। ঐ প্রিয়লোক কটাক্ষ, এই হঠাৎ ‘তুমি’ সম্বোধন, ঐ ‘এক ঘরে যদি না পোষে তায়’-এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত—সবই একটিমাত্র অর্থবহ। বৈষ্ণবী নিজে মজেছে, এখন ঔকে মজাতে চাইছে। এ পদাবলীর আকৃতি নৈব্যক্তিক

নয়, ঈশ্বরমুখীও নয়। অন্তরের একটা সাবধানী অংশ ঠুকে বলছে—এ প্রগলভাকে নিবৃত্ত করতে, আর সত্যানুসন্ধানী ভিষগ-সত্তা বলছে—তাতে ইন্ধন জোগাতে। তাহলেই বোঝা যাবে ওর অন্তরের জটিলতাটা কী জাতীয়। কেন তাকে কর্তা-মশাই মনে করছেন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ় না হলে তিনি কিছুতেই পরবর্তী রসিকতাটা করতে পারতেন না, তুমি আমাকে একটা সাধারণ চোর ঠাওরালে, সাধারানী?

—সাধারণ? না গোসাই। তুমি নিজেই ভাল জান: তুমি অসাধারণ! না হলে কি আমার দিন-রাত এমন একাকার হয়ে যেতে পারে? শোন, ঠাকুর—গান শোন:

আবার ঠুনঠুন করে বেজে ওঠে ওর স্বঞ্জনী:

“ঘর কৈনু বাহির
বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন
আপন কৈনু পর।
রাতি কৈনু দিবস
দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু সখি,
তোমার পিরীতি॥”

রূপেন্দ্র সিদ্ধান্তে এলেন। কর্তামশায়ের আশঙ্কা অমূলক—কমলকুমার নয়। ওর অন্তঃকরণ এতদিন ‘মনের মানুষ’ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সেও একমুখী প্রেমের কাঙাল—সর্বপুরুষে ঐরমপুরুষকে দেখতে পেত না এতদিন। আজ হয়তো পেয়েছে! পরশমণির সন্ধান!

এখন কোন পথে অগ্রসর হবেন? যা জানার ছিল বোধকরি জেনেছেন। আরও অগ্রসর হওয়া বিপদজনক! যা প্রাণে-প্রাণে বলার মেয়েটি তা গানে-গানে বলেছে। কী বলবেন, কী করবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। হঠাৎ সাধারানীর একটি কথায় আবার সংযম হারালেন। ওর দিকে ফিরে মেয়েটি হেসে বলেছিল, ভুল বুঝ না গোসাই ঠাকুর। আমি তোমার ঘর ভাঙতে চাইছি না। তবে এ গান না গেয়ে শান্তিও পাচ্ছিলাম না। হয়তো তুমি বুঝলে, নয় তো বুঝলে না—তা হোক, আমার বুকের পাষণ্ডভারটা তো নেমে গেল। ঐ-কথাটিতেই সান্ত্বনা খুঁজব, ‘বুঝ লোক, যে জান সন্ধান।’

রূপেন্দ্র আত্মবিশ্মৃত হয়ে ওর হাতখানি তুলে নিলেন নিজের মুঠোয়। অবাক হয়ে বলেন, কী বললে? ‘বুঝ লোক যে জান সন্ধান।’ এ উদ্ধৃতি তুমি কোথায় পেলে রাখা?

—ঐর কথা তুমি জান না ঠাকুর। এ তোমার অমরকোষ নয়, এ কোন পদকর্তার লেখা গানও নয়। এ এক অখ্যাত আশ্চর্য কবির রচনা। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

—জানি, জানি! কিন্তু তুমি তাঁর ‘বিদ্যাসুন্দর’ কোথায় পেলে? ঐ পংক্তিটা তো মাত্র ছয় মাস পূর্বের রচনা।

রাখা অবাক হয়। কিন্তু তার মন তখন অন্যদিকে। রূপেন্দ্রের মুঠিতে তখনো বন্দি হয়ে

রাধাবল্লভপুর

আছে তার করপল্লব। সে দিকে তাকিয়ে ফের গুন্তুনিয়ে ওঠে। এবার খালি গলায়:

“গায়ে দিয়ে হাত মোর প্রাণনাথ

অন্তরে বাড়ল সুখ।

হাসিয়া কাদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া

দেখিনু বঁধুর মুখ॥”

রূপেন্দ্র সলজ্জে ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলেন, কই, বললে না? এ কাব্য কোথায় পড়েছ? দুজনের কেউই লক্ষ্য করেননি—অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে কুসুমমঞ্জরী। পুকুরঘাট থেকে সিন্ধবসনে ফিরে আসছিল সে। হয়তো নজর হত না। হল গানের কলি শুনে। তখনো রাধার হাতখানি রূপেন্দ্রের করায়ত্ত। সে নিজেই যেন লজ্জা পেল। সন্তর্পণে সরে গেল আড়ালে।

রাধা বললে, ‘বিদ্যাসুন্দর’ আমি পড়িনি, গোসাই। কিছু বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি শুনেছি শুধু। তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ পড়েছি। অসাধারণ সেই কবি। মর্মান্বিত হয়েছি তাঁর বিদ্যাসুন্দরের ক্রোদান্ত পদে।

—ক্রোদান্ত পদ। এই যে বললে, তুমি তা পড়নি।

—সবটা নয়। কিছু কিছু দৈহিক মিলনের পদ মাত্র শুনেছি। ঘোরতর অলীল।

রূপেন্দ্র প্রায় ধমক দিয়ে ওঠেন, কবি কয়েক বছর ধরে একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন, আর তুমি তার দু-একটি পংক্তি পড়ে বুঝে নিলে—তা অলীল?

রাধা বললে, ভাত সিদ্ধ হয়েছে কিনা বুঝে নিতে দু-চারটি তণ্ডুলকণা পরীক্ষা করাই যথেষ্ট।

রূপেন্দ্র গর্জে ওঠেন, না, তা যথেষ্ট নয়। ‘রাধুনি’ সে ক্ষেত্রে নির্বিচারে কিছু তণ্ডুলকণা দর্বি সহযোগে উঠিয়ে নেয়। তোমাকে সুনির্বাচিত কদম পরিবেশন করা হয়েছে—প্রস্তরচূর্ণ-মিশ্রিত। অপক্ক তণ্ডুল। সম্পূর্ণ কাব্যের মূল্যায়ন ওভাবে করা যায় না।

এবার ‘বঙ্কিম’-রচনা শৈলী আশ্রয় করে আমারই বলে উঠতে ইচ্ছে করছে: ‘ও রূপেন্দ্র! কী বলিলে! তাহা হইলে সেদিন ভারতচন্দ্রকে ও-কথা বলিয়াছিল কেন?’

রাধা জানতে চায়, আমি তা ঘটনাচক্রে শুনেছি। ওরা ঐসব অলীল পদ আমাকে পড়ে শোনাতো উদ্বেজিত করতে। কিন্তু মাত্র ছয়-মাস পূর্বে রচিত পুথির অনুলিপি তুমি কোথায় পেলে?

রূপেন্দ্র বললেন, অনুলিপি নয়, আমি পড়েছি মূল পুঁথি। কবির হস্তাক্ষরে। ভারত আমার বিশিষ্ট বন্ধু।

এবার রাধারই সব কিছু ভুল হয়ে গেল। রূপেন্দ্রের হাতটি টেনে নিয়ে বললে, কবি তোমার বন্ধু? তিনি দেখতে কেমন? কত বয়স?

রূপেন্দ্র কৌতুক করে বলেন, তোমার এই আকুলতা দেখে কবিকে আজ ঈর্ষা হচ্ছে।

একথায় প্রগলভা মেয়েটির উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু এবার আর কোন বাগবৈদ্যের লক্ষণ দেখা গেল না। কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। বলে, অসাধারণ কবি ভারতচন্দ্র। ইঁা, কবি আমার প্রিয়জন, অথচ তাঁর কাব্যের কিছু বাছা বাছা অলীল অংশই শুধু শুনেছি আমি! উপায় কী...

রূপেন্দ্র বুঝতে পারেন। কারা ঐ অংশবিশেষ শুনিয়েছে রাধাকে—এ রূপনগরের ক্রোদান্ত পরিবেশে। তাদের নমুনা তো স্বচক্ষেই দেখে এসেছেন বীরনগরে। পাষাণটা কী যেন

বলেছিল? এ-কাব্যের প্রচার হবে সারা গৌড়মণ্ডলে! তখন নাকি কুমোরভায়াকে মূর্তি গড়ার আগে বিশেষ পক্ষীতে যেতে হবে না। ঘরে-ঘরেই তেমন মাটি পাওয়া যাবে।.....ইচ্ছা করছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হাতখানা ধরে হিড়হিড় করে এখানে টেনে নিয়ে আসতে ও বলতে, এ দেখুন মহারাজ! আপনার প্রিয় কবি কী-ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন।

দুজনের কেউই লক্ষ্য করেন না—কুসুমমঞ্জরী অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কাছে এগিয়ে আসবে কিনা মনস্থির করে উঠতে পারছে না।



শ্রীভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মাহেশ-এর একজন বিখ্যাত বাসিন্দা। বোধ করি সর্ববিখ্যাত। ধনে মানে, প্রতিপত্তিতে। তিনি হচ্ছেন ফরাসভাষার প্রখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রধান নায়েব। ইন্দ্রনারায়ণ সমগ্র রাঢ়খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রানী ভবানী অথবা বর্ধমানরাজের অপেক্ষা অর্থকৌলীনে বোধহয় নূন নন। সেই ইন্দ্রনারায়ণের দক্ষিণহস্ত ইচ্ছা করলে হাতে মাথা কাটতে পারতেন। বোধকরি কাটতেন না—জন্মদেরা নিষ্কর্মা হয়ে যাবে আশঙ্কায়।

ইন্দ্রনারায়ণ যেমন দুপ্লেঙ্কের^১ দক্ষিণহস্ত, ভবতারণও তেমনি দেওয়ানজীর দক্ষিণহস্ত। সপ্তাহে পাঁচদিন থাকেন ফরাসভাঙ্গায়, দেড় দিন মাহেশ-এ। প্রতি সপ্তাহান্তে আসেন শনিবার সন্ধ্যায়, ফিরে যান সোমবার প্রত্যুষে। হেতুটি মর্মান্তিক—তঁার গৃহিণী, মঞ্জুর ফুলপিসিমাতা-ঠাকুরাণী সেই ফেরঙ্গদেশে বসবাস করতে অস্বীকৃত। কৌতুককর সংবাদটি হচ্ছে এই—ভবতারণ শনিবার অপরাহ্নে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথমেই ‘বার-মহলে’র একটি স্নানাগারে গঙ্গাজলে স্নানপর্ব সারেন। কী গ্রীষ্ম কী শীত! পটু বস্ত্র পরিধান করে গৃহে প্রবেশের ছাড়পত্র পান। ম্লেচ্ছদেশের অনাচার তাঁর ভদ্রাসনে বরদাস্ত করেন না। মাতঙ্গীদেবী এবং নিভাননী। ভবতারণের দুই পত্নী। শনি-রবি তিনি ভিন্ন-ভিন্ন শয়নকক্ষে নিশাযাপন করে সোমবার প্রত্যুষে পাল্কি-চেপে ফরাসভাঙ্গায় ফিরে যান।

নবদম্পতির আদর-আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি হল না। পরিচয়মাত্র ঠোঁরা সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা শুরু করলেন। সেদিন রবিবার—নিভান্ত ঘটনাচক্রে গাঙ্গুলীমশাই ভদ্রাসনে উপস্থিত। কিন্তু এ—গাঙ্গুলী-মশাই বিধাতার মতো অনুদার, ব্যাধের মতো উদার নন! মঞ্জরীকে পুরললনার দল টেনে নিয়ে গেল অন্দরমহলে, আর রূপেন্দ্র ‘বার-মহলে’ খাতিরযত্ন পেতে থাকেন। ‘বড় দুখে সুখ’লাভের সম্ভাবনা রইল না।

ভিতর-মহল থেকে কিছু ক্রন্দনরোলও কর্ণগোচর হল। ও কিছু নয়—শোনা গেল বগী

^১ প্রায় সমকালীন এই বিদেশী ভদ্রলোক ফরাসী-চন্দননগরের গভর্নর-জেনারেল হয়েছিলেন 1744 খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ আমাদের কাহিনীকালের দুই বৎসর পরে। কিন্তু এ অসাধারণ চরিত্রটিকে সেই অপরাধে এড়িয়ে যেতে মন সরল না। ইতিহাস তথা আপনাদের কাছে এই সম্ভ্রান্ত-অ্যানাক্রিনিজম-এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

মাহেশ

হাস্যামার সময় মঞ্জুর খুড়োমশাই নিহত হয়েছেন। তাঁর পত্নী পুত্রকন্যাদের হাত ধরে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। সংবাদ শ্রবণে রূপেন্দ্রনাথ অধোবদনে ব্যথিত মুখভঙ্গি করে নীরব রইলেন। যে পূজাপাদ খুড়াশ্বশুর রূপেন্দ্রের ধর্মপত্নীকে কুমারী অবস্থায় মোহান্ত মহারাজের লীলাকুঞ্জে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর এবন্নিধ অকালমৃত্যুতে সতাই তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি; কিন্তু সৌজন্যের নির্দেশে তাঁকে শোকাভিভূত হবার অভিনয় করতে হল।

জলযোগের পালা মিটলে রূপেন্দ্রনাথ সর্বিনয়ে অর্জিটা পেশ করলেন তাঁর পিসাশ্বশুরের কাছে: এবার অনুগ্রহ করে ঠেকে ডেকে দিন। আমাদের অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে।

পিসাশ্বশুর বলেন, সে কী বাবাজী! তা কী হয়? তোমরা এলে, কদিন থাক, বিশ্রাম নাও। তারপর তীর্থভ্রমণে যেও। সামনেই দোলযাত্রা—তার পূর্বে কি তোমার শাণ্ডী-ঠাকরুণ ছেড়ে দেবেন ভেবেছ?

দেখা গেল গাঙ্গুলীমশায়ের আশঙ্কা অমূলক নয়। সংবাদটা অন্দরমহলে প্রেরণ করার অনতিকাল পরেই একটি অবগুষ্ঠনবতী এসে বড়কর্তার কাছে নিবেদন করল, জামাইবাবুকে ওঁরা ভিতরে ডাকছেন।

—ঐ দেখ! ডাক এসে গেছে। যাও গিয়ে শোন ওদের বক্তব্য।

অবগুষ্ঠনবতীর পিছন পিছন অনেকটা পথ যেতে হল। দুই মহলের মাঝখানে যে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ তাতে হা-ডু-ডু খেলা যায়। অন্দরমহলের সীমানায় পৌঁছানো মাত্র রূপেন্দ্রের অবস্থা হল সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মতো, অথবা তার বাপের, প্রমীলা রাজ্যে পদার্পণের পরে। দুই পিসিমা—একটি নকল, তখনো তাঁদের ঠিকমতো চিনে ওঠা যায়নি, তদুপরি তাঁদের দুই জা, তিন নন্দ, পুত্রবধু—সর্বোপরি রূপেন্দ্রের দুই শ্যালিকা! সে এক সুন্দরীদের হাট। কে যেন প্রণম্যা আর কার প্রণাম গ্রহণ করতে হবে ঠাওর হয় না।

যাহোক, শিষ্টাচার অবসানে স্নাতঙ্গী—এতক্ষণে তাঁকে ফুলপিসিমা বলে চিহ্নিত করা গেছে—বললেন, এ কী শুনিছি বাবা রূপেন্দ্র! মেয়েটা আদিন পরে বাপের বাড়ি এল...

রূপেন্দ্র তখন সে প্রমীলারাজ্যে সকলকেই দেখেছেন, অথচ যেন ‘কাউকেই’ দেখতে পাচ্ছেন না—অর্থাৎ যার সুবাদে এ রাজ্যে প্রবেশ। তিনি বোধহয় অন্তরাল থেকে মজা দেখেছেন। অনেক কথাবার্তার পর স্থির হল, রবিবারের রাতটা দুজনকে মাহেশে কাটাতে হবে। পরদিন রূপেন্দ্র একলাই প্রত্যাবর্তন করবেন রাধাবল্লভপুরে। সহযাত্রীদের যা বলার আছে বলে আবার ফিরে আসবেন। দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। তারপর এই মাহেশকে ঘাঁটি করে ওঁরা দুজনে ভাগীরথীর দুই তীরে তীর্থ পরিক্রমা করবেন।

মঞ্জুর পিসিতুতো বোন—প্রায় সমবয়সী—রূপেন্দ্রকে কানে কানে বলে গেল, জামাইবাবু যে ভয় পাচ্ছেন তা অমূলক। এটা আপনার স্বশুরবাড়ি, বর্ধমান নয়।

রূপেন্দ্র বলেন, মানে?

বলেই মনে মনে জিব কাটেন। তুলসী সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। বললো, এই সরল কথাটার মানেও বলে দিতে হবে? তবে আপনি কেমনতর দিগুগুজ পণ্ডিত? মানে হচ্ছে—এখানে ‘চখা ওপারে চখী এপারে’ হবে না?

রূপেন্দ্র শ্যালিকার কানবালা-শোভিত প্রত্যঙ্গের নাগাল পাওয়ার আগেই সে হাওয়া। বোঝা

গেল, মঞ্জু ইতিমধ্যেই বোনকে জানিয়েছে বর্ধমানে কীভাবে নাকাল হতে হয়েছিল।

গুরুপাক নৈশ-ভোজনের পর তুলসী প্রতিশ্রুতি মতো রূপেন্দ্রকে পৌছে দিল তাঁর শয়নকক্ষে। বিরাট পালকে মশারি-ফেলা নির্জনতায় হারানো মানিক ফিরে পেলেন। দীর্ঘদিন পরে পাওয়া গেল ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সুযোগ।

এ অধম কথাশিল্পীও ভারতচন্দ্রের গুণগ্রাহী; কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তাঁকে প্রতিপদেই অনুসরণ করতে হবে। অনেক কষ্টে সিঁদ কেটে আমাদের সুন্দর নায়ক এতদিনে বিদ্যালাভ করেছেন; তার পরের একদণ্ডের ঘটনাচক্র অনুমান-নির্ভরই থাক না বাপু! এস, আমরা বরং বিবহতাপ-জর্জরিত সেই মিলন রাত্রির বর্ণনা ঘটনাখানেক পর থেকে শুরু করি:

রাধারানীর প্রসঙ্গ উত্থাপনমাত্র মঞ্জু বলে ওঠে, দিদি বড়ই দুখিনি! হ্যাঁ গো—শান্তরে কোন বিধান-টিধান নেই? রহিমকে শুদ্ধি করে নেওয়া যায় না?

রূপেন্দ্র বলেন, রহিম! রহিম আবার কে?

—বাঃ! যার জন্যে রাধাদির আজ এই আতান্তরি। রহিম ওস্তাগর।

রূপেন্দ্র আকাশ থেকে পড়েন।

দেখা গেল—রাধা আর মঞ্জুরী এই কয়দিনের সান্নিধ্যে খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। মঞ্জু তাকে খুলে বলেছে তার সব কথা, স—ব কথা। বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবনের সেই বিভীষিকাময়ী দিনগুলোর কথা; তারপর তার মূর্ছারোগ, গো-গাড়ি চেপে সোঞাই আসা। শেষমেষ ভিষগাচার্যের হাত থেকে প্রথমে গরল ও পরে অমৃতলাভ! এমনকি ফুলশয্যা রাত্রের সেই বিড়ম্বনার কথাও। অপরপক্ষে রাধারানীও নির্বিচারে মেলে ধরেছে তার ইতিহাস। ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে বলেছে তার সব কথা, স—ব কথা!

এমনটা বোধহয় হয়। রাধারানী ঐ মঞ্জুর ভিতর আবিষ্কার করেছে এক 'বিপ্রতীপ-রাধা'কে। শুরুটা দুজনেরই এক! ঘটনাচক্রে শেষটা ভিন্ন রকম! হয়তো হতভাগিনীর অবচেতন মনে জেগেছে প্রস্ফটা: মূর্ছা রোগটা তো তারও হতে পারত। দু-বছর আগে। তাহলে হয়তো রাধাই গো-গাড়ি চেপে রওনা হত সোঞাইমুখো—ঐ আগুনবরণ ছেলের হাত থেকে তাহলে রাধাই প্রথমে গরল আর পরে অমৃতভাণ্ড লাভ করত!

মানুষ যা চায় তা পায় না। যা পায় তা চায় না—তুল করে পায়! এই চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে মিল ঝুঁজে পাওয়ার নামই দুনিয়াদারী। যাকে ঐ রবি-বাউল বলেছেন, ঘড়া ঘড়া অশ্রু ঢেলে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হয়। তারপর “মনেরে আজ কহ যে/ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।”

কিন্তু অমৃততিয়াসী কি পারে নীলকণ্ঠ শিবের মতো হলাহল পান করতে—‘সহজে’?

অন্তত রাধা তা পারেনি। রাধারানীর অতীত জীবনের চুষকসারটা এই জাতের:

রাধারানীর বাল্য ও কৈশোরস্মৃতিতে অবিমিশ্র আনন্দ। কুসুমমঞ্জুরীর চেয়ে তা অনেক বেশি

সৌভাগ্যের দ্যোতক। তার বাবা-মা, ভাই-বোন সবই ছিল। বাবা গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন জিন্মা-তালুকদার, মধ্যস্বত্ব-ভোগী। জাতে বঙ্গজ কায়স্থ—কৌলীক উপাধি বসু। জিন্মা-তালুকদার পেশাগত উপাধি। সে-আমলে জমিদারের অধীনে একাধিক মধ্যস্বত্ব-ভোগী পদ ছিল—লাখরাজদার, যারা খাজনা দিত না, নিষ্কর ভূমি ভোগ করত, প্রায়শই ব্রহ্মোত্তর। তালুকদার, পত্তনীদার, গাঁতিদার, জোতদার প্রভৃতি। সরাসরি কিছু কৃষিজীবীকেও জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হত, তাদের বলা হত রায়ত। রায়তেরা কখনো অস্থায়ী, অর্থাৎ কোর্ফ বন্দোবস্ত; কখনো বা স্থায়ী বর্গাদার। তালুকদারেরা জমিদারের অধীনস্থ হয়েছিল পরবর্তী-জমানায়। পলাশীযুদ্ধের প্রাক্কালে তালুকদারেরা সরাসরি নবাব-সরকারে খাজনা জমা দিত—জমিদারের মাধ্যমে নয়; বলা যায় ছোটমাপের জমিদার। কারও বা মৌরসী স্বত্ব, অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে ভোগ্য অধিকার, কারও বা মোকররী স্বত্ব—অর্থাৎ খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট। আবার কারও বা ‘সোনা-সোহাগা’—মকররী-মৌরসী স্বত্ব যা নির্দিষ্ট খাজনায় বংশানুক্রমে ভোগ্য। জিন্মা-তালুকদারেরা ঐ তালুকদারের অধীনে। তা, অতসব তত্ত্বকথা আলোচনা করার প্রয়োজন নাই—মোট কথা, গঙ্গাপ্রসাদের আর্থিক সচ্ছলতা যথেষ্টই ছিল। ধর্মে বৈষ্ণব, রূপনগরের বাসিন্দা।

জীবনের প্রথম নয়টা বছর কেটেছে পার্বত্য ঝরনার মতো—নেচে-কুঁদে। সে হাঁটতে গেলে ছুটতো, কথা বলতে গেলে গান গেয়ে উঠত। রাজহাঁসের মতো গায়ের রঙ, বুলবুলের বুকের ধূপুকানির মতো ঠোটদুটি, মাথায় টাকা-টাকা চুল দুধরাজ-রঙের অর্থাৎ শুধু কুচকুচেই নয় চিক্‌চিকে। আর প্রকৃতি খঞ্জন-পাখির মতো। দোষের মধ্যে নয় বছর বয়সেই তার দেহগঠন একটু পুরস্ত। তা হোক, পাড়ায় সে ছিল ডাকসাইটে সুন্দরী।

ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহান্তে অমাবস্যা তিথি। শিবচতুর্দশীর পর দিন। অর্থাৎ মৌনী অমাবস্যা। পঞ্জিকার নির্দেশ এই পূণ্যতিথিতে গঙ্গান্নে অক্ষয় পুণ্য। তা অজয়ের তীরে গঙ্গা কোথায় পারে ? ওরা অজয়েই স্নান করে—অবগাহন স্নানই বিধেয়। রাত্রিপ্রভাতে, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ : মাধবপক্ষ—যার পরিণাম পূর্ণিমায় মাধবের রঙ-দোল।

সেই পূণ্যতিথিতে সহধর্মিণী আর কন্যাকে নিয়ে ভোর-ভোর স্নানে এসেছেন গঙ্গাপ্রসাদ। অমাবস্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, পূব-আকাশে তখনো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে শুকতারা। মৌনী অমাবস্যার ‘মন্তুঘরা-স্নান’ উপলক্ষ্যে সেই সাত-সকালেই অজয়ের ঘাটে সমবেত হয়েছে অনেক স্নানার্থী। এ ঘাট মোহন্ত মহারাজের প্রাসাদ-সংলগ্ন; নাম ‘মহারাজের ঘাট’।

স্ত্রী-পুরুষদের পৃথক ঘাট। গঙ্গাপ্রসাদ স্নান সমাপনাতে এসে দেখলেন স্ত্রী-কন্যারও অর্বাগাহন সুসম্পন্ন। গৃহিণী একগলা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন ঘাটোয়াল পাণ্ডাজীর প্রতীকার ছত্রতলে; আর কন্যা বসে আছে হাঁটু গেড়ে। পাণ্ডাজী তার ললাটে চন্দনছাপ লিপন করছেন।

সহসা পথের দিক থেকে শোনা গেল এক কলরোল : হট যাও ! হট যাও ! গঙ্গাপ্রসাদ প্রাচীর সই-সই হয়ে পথ দিলেন। একটি ছোট শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে। শোভাযাত্রার সম্মুখে মোহন্ত-মহারাজের মঠের ধ্বজাধারী কয়েকজন, কিছু ঢাক-টোল-শিঙাবাদক। তার পিছনেই

সুসজ্জিত এক বিশাল রণহস্তী। সবাই তাকে চেনে: হেরদাস।

মোহন্ত মহারাজ স্বয়ং এসেছেন গঙ্গাস্নানে। তাই এত কলরব, এত ঢাক-ঢোল-শিঙ্গা। গজরাজ পা মুড়ে বসল ঘাটের কিনারে। মই লাগানো হল। নেমে এলেন স্থূলকায় বৃদ্ধ মোহন্ত-মহারাজ। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় গোড়েমালা, মেদের মৈনাক! গজগমনে অগ্রসর হলেন ঘাটের দিকে। সসম্মানে দুই সারি হয়ে মানুষজন পথ দিল।

হঠাৎ গতিরুদ্ধ হল বাবাজীর। হেলতে-দুলতে এগিয়ে এলেন ঘাটোয়ালের দিকে। পাণ্ডাজী গাত্ৰোত্থান করে দণ্ডবৎ হল। বালিকা তখনো নতজানু—অবাক চোখে দেখছে। শ্রগাম করতেও ভুলে গেছে। গোসাইজী ওর চিবুক ধরে ওর ভ্রূমধ্যে কী যেন দেখছেন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে। বলেন, কী নাম রে তোর, রাধারানী?

—শিউলী...মানে, শ্রীমতী শেফালী বসু।

—না, তুই রাধারানী। এ কার মেয়ে?

শেষ প্রশ্নটা পাণ্ডাজীকে। সে হাত তুলে ওর মাকে দেখিয়ে দেয়। গঙ্গাপ্রসাদ ভীড় ঠেলে অগ্রসর হয়ে আসেন। বলেন, আমার কন্যা, প্রভু।

—কত বয়স?

—আজ্ঞে আট পার হয়েছে। নবমবর্ষ চলছে।

—অ! বিবাহ দিয়েছি?

—আজ্ঞে না। সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে। বৈশাখে দেব। আপনি অনুমতি দিলেই। এক গাল হাসলেন মোহন্ত মহারাজ। বললেন, দিলাম না!

—আজ্ঞে?

—বুঝলি না? অনুমতি দিলাম না! এর গৌরীদান হবে না। ষোড়শ বর্ষে এর বিবাহ বিধেয়। ওর ভ্রূমধ্যে আমি সুলক্ষণ দেখতে পেয়েছি। এ মেয়ে মহাসৌভাগ্যবতী।

কপর্দকহীন মানিকচাঁদের ভ্রূমধ্যে তার কোটিপতি হবার সম্ভাবনা দেখেছিলেন তিনি। সবাই তা জানে।... কিন্তু তাহলে রামানন্দ দত্তের বাবাকে কী বলবেন? সম্বন্ধটা ভেঙে দেবেন? প্রতিবেশী দত্তমশায়ের কাছে যে বাকদান করা আছে। রামানন্দ ছেলেটিও খুব ভাল—যেমন বিনয়ী, বুদ্ধিমান, তেমন সুন্দর। সে যেন ঘরের ছেলে হয়ে গেছে।

সবিনয়ে সে কথাই নিবেদন করেন যুক্তকরে, শিউলীর সম্বন্ধ যে হয়ে আছে প্রভু। কথা দিয়েছি আমি।

—শিউলী! শিউলী কে? বলছি না—ওর নাম রাধারানী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম কি যে, ঐ রাধারানী বাকদত্তা...

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন গোসাইজী: বাকদত্তা! বলিস্ কী রে! বাকদানের আগে আমার অনুমতি নিইছিলি?

গঙ্গা পাষাণমূর্তি! এ কী হতে চলেছে? বালিকার গাল দুটি টিপে ধরে গালসাজজর কণ্ঠে বলে ওঠেন, আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি রে—আহা! “পহিলে বৃদ্ধরসম পুন নবরঙ্গ/দিনে দিনে অনঙ্গ আগোড়ালো অঙ্গ॥”

শিউলী জোড়া-পায়ে পিছিয়ে যায়, খঞ্জন পাখির মতো। বলে, আমাকে ছুঁয়ে না। তোমার

ঋদনার

হাত নোংরা।

হা-হা করে আবার হাসি। মেদবহুল মধ্যদেশে সে হাস্য তরঙ্গ তোলেন। বৃদ্ধ বলেন, ওরে তোরা শোন! রাইরানী কী বলছে শোন। আমার হাত নাকি...

কথাটা শেষ হয় না। নজরে পড়ে নিজের হাত। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অবতরণের সময় সত্যিই তাঁর তালু কালিমালিপ্ত হয়েছে। পটুবস্ত্রে হাতটা মুছে ফেলে হাঁকাড় পারেন: অকুর!

সশস্ত্র দেহরক্ষী অকুর সর্দার এগিয়ে এসে দণ্ডবৎ হয়। তাকে বলেন, রাইরানীকে তার কুঞ্জে পৌঁছে দিয়ে আয়।

গঙ্গাপ্রসাদের দিকে ফিরে পাদপূরণ করেন, কাল দেখা করিস! কথা আছে। বুঝলি? হ্যাঁ, বুঝেছেন। সবটা না হলেও, অনেকটা। না হলে নজরবন্দী হয়ে স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে কেন? পাছে ঐ গোবিন্দনা গোবী জনারণ্যে হারিয়ে যায় তাই এই সাবধানতা। অকুর চলেছে বাড়িটা চিনে রাখতে।

শিউলীর মায়েরও বাকরোধ হয়ে গেছে। মৌনী অমাবস্যার স্নানান্তে যেন মৌনী! অন্তরে জাগছে সেই অব্যক্ত হাহাকার যা বাঙ্ঘয় হয়ে উঠবে আরও দুশ'বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথের কলমে:

“হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী।
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি
দুখে ধোয়া কচি দাঁতের হাসি!
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি॥”

পরদিন বিস্তারিত নির্দেশ পেয়ে বজ্রহত হয়ে গেলেন গঙ্গাপ্রসাদ। রাজা শান্তনুও পারেননি প্রতিবাদ করতে, যখন গঙ্গাদেবী তাঁর সন্তানকে ডুবিয়ে দিতেন গঙ্গায়। কিন্তু তাঁর বুকফাটা কান্নায় কেউ বাধা দেয়নি। গঙ্গাসাগরে কন্যা বিসর্জন দেবার প্রথা তখনও চালু—কিন্তু সমাজ অত অনুদার নয়। সন্তানহারা কাঁদলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। গঙ্গাপ্রসাদ আরও দুর্ভাগা। চোখের জল ফেলা মানা! দু-হাত তুলে কন্যার মৃত্যুতে হরিসংকীর্ণনে যোগ দিতে হবে: ‘বল হরি! হরি বল!’ চোখে জল এলে যেন বোঝা না যায় এ আনন্দাক্রম নয়!

পূর্ববৎসর গৌসাইজী পুরীধামে তীর্থে গিয়েছিলেন। দেখে এসেছেন, কলিঙ্গের নানান মন্দিরে ‘সুতনুকা’ দেবদাসীদের। তারা ঠাঁর মঠের সেবাদাসীদের মতো যৌবন-সম্বল শুধু নারীমাংসপিণ্ডই নয়—চৌষটি কলায় পারদর্শিনী। প্রেমালোকে সুরসিকা, শৃঙ্গারে কামোদ্দীপিনী, সঙ্গীতে কিন্নরী, নৃত্যে স্বর্গনটী! কাঞ্চনমূল্যে তেমনই দু-একটি বরনারীকে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। সফলকাম হননি। পুরোহিতেরা সম্মত হয়নি। কলিঙ্গরাজের বদন্যাতায় তাঁদের অর্থাভাব নাই। তাই এই বিকল্প আয়োজন—স্ত্রির করেছেন: নিজ ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি করবেন কিছু: গোপিকা!

‘গোপিকা’ বোঝ তো? শৈবমন্দিরে প্রধান দেবদাসীকে বলে ‘কুম্ভারী’, বিষ্ণু-মন্দিরে সে: ‘গোপিকা’! কাঞ্চনমূল্যে গোপিকা ক্রয় করা যায়নি বটে কিন্তু আয়তন করেছিলেন একটি

‘গোপালিকা’—জোগতি। ‘জোগতি’ অর্থে প্রাক্তন দেবদাসী। যৌবন বিকিয়ে যাবার পর তারা নবীন যুগের দেবদাসীদের নানান বিদ্যায় পারদর্শিনী করে তোলে। গায়ের আনপড় সুন্দরী বালিকাকে ঘষে মেখে এই মণিকারেরা তৈরী করে সুদক্ষা কিশোরী দেবদাসীতে। অন্তিমে তার যাদুদণ্ডে সেই কিশোরী রূপান্তরিতা হয়ে যায় যৌবনভারনম্রা সকলকলাপারঙ্গমা গোপিকায়। প্রেমকৃজনে রাজনটী, সঙ্গীতে গীতভারতী, নৃত্যে উর্বশী আর সুরতক্রিয়ায় মদনজয়ী রতিদেবীতে।

নগর প্রান্তের এক নিভৃতকুঞ্জে বন্দিনী হল নবমবর্ষীয়া বালিকা। সে বন্দিআবাসে মাত্র দুজন আবাসিক—বর্ষীয়সী জোগতি আর তার বালিকা শিক্ষাথিনী। প্রাচীর-বেষ্টিত একতলা মোকাম—কারাগারই বলা চলে। বাবা-মা-ভাই-বোন, সই-সয়া কেউ দেখা করতে আসে না। কানুন নেই। সাধনা হওয়া চাই একনিষ্ঠ—নির্বাক্তব পরিবেশে। শুধু গবাঙ্কপথে বালিকা দেখতে পায় ফটকের কাছে পাহারা দেয় দাড়িয়লা এক বন্দুকধারী শাক্তী। দেখে কিছু কাক, চড়াই, শালিক—ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে কখনো বা ল্যাজঝোলা হাঁড়িচাচা, হলুদবরণ বেনেবউ বা দীর্ঘপুচ্ছ মসীকৃষ্ণ দুধরাজ! আর বাগানে নাচানাচি করে ফেরে কিছু কাঠবিড়ালী।

জোগতি প্রৌঢ়া নয়, প্রায় বৃদ্ধাই। মনটা নরম। যত্ন নিয়ে শেখায় নাচ আর গান, মুখে মুখে শোনায় নানান তত্ত্বকথা, অক্ষর পরিচয় করায়। রতিরঙ্গের অন্তরঙ্গ কথা শেখানোর সময় হয়নি এখনো।

জানলার ধারে বসে অবকাশের দৈনিক বরাদ্দ ব্যয়িত হয় স্মৃতিচারণে। হোক নবমবর্ষীয়া, তবু তার স্মৃতিভাণ্ডারে কত-কত জন্মা হয়ে আছে। বাবার কথা, বোনের কথা, ভাই-এর কথা। মায়ের সোহাগ। আর সেই পাগলটার কথা: রামু।

মনে পড়ে ‘পুনিপুকুর’ ব্রতের কথা। ‘পুনিপুকুর’ নয়, কথাটা ‘পূর্ণিপুকুর’। বৈশাখ মাসে যাতে পুকুরে জল না শুকায়, গরমিতে গাছ না মরে যায়, তাই এই ব্রত। ছোট ছোট মেয়েরা বাড়ির আশপাশে ছোট্ট একটা চৌকোণ পুকুর খোঁড়ে—ধর, এক হাত লম্বা, আধ-হাত চওড়া, তিন-চার আঙুল গভীর। তার মাঝখানে পুঁততে হবে বেলগাছের ডাল, তারপর ঢালো জল, যতক্ষণ না শুষে নেবার পরেও পূর্ণিপুকুর টেটস্থুর হয়ে ওঠে। তারপর সকালবেলা ‘উপুস’ করে ঠিক ‘দুকুর বেলা’ পূজো করতে হয়। পুকুরের চার কোণায় জুঁই, বেল, টগরের অঞ্জলি দিয়ে মস্তুর পড়তে হবে:

পুনিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে ‘দুকুর’ বেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
ভাই-এর বোন পূত্রবতী।
হয়ে ‘পুতুর’ মরবে না,
‘পিরথিবীতে’ ধরবে না।”

রামু ওর খিদমদগার। গুঁচকে বান্ধবীর হুকুমে পুকুর ঝুঁড়েছে, বেলের ডাল স্রীর পূজার ফুল নিয়ে এসেছে। মায় শিউলী ‘উপুস’ করছে বলে সকাল থেকে দাঁড়ে কুটোটি কাটেনি। শিউলী ভিজে চুল পিঠে এলিয়ে জোড়-হাতে ছড়া কেটে-কেটে পুকুরে ফুল ছিটায় আর রাম টুম-টুম

ঐদগার

হয়ে বসে থাকে সমুখে। যেন তাকেই পূজা করা হচ্ছে।

একদিনের কথা মনে পড়ছে, বছর তিনেক আগেকার কথা। তখন শিউলীর ছয়, রামুর নয়। সেদিন রামুর একটা বেয়াড়া প্রশ্নে সব নয়-ছয় হয়ে গেল। রামু হঠাৎ বললে, অ্যাই শিউলী? তুই ছড়ায় ও-কথা বলিস্ কেন রে? ‘ভাই এর বোন পুত্রবতী’?

শিউলী রুখে উঠেছিল—ঈস্! কী বিচ্ছিরি কথাবার্তা তোমার রাম-দা! ‘ছড়া’ কী? একে বলে ‘মস্তুর’। বুঝলে?

—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তুই কি পুত্রবতী?

—হ্যাঁ গো মশাই! আমার তিনটে কাঠের পুতুল, একটা মাটির! আমার দুই মেয়ে, দুই ছেলে।

—মানছি। কিন্তু মস্তুরের ঐখানটা—‘আমি সতী লীলাবতী!’

—তাতেই বা অসৈরণ কতটা কী বলেছি? আমি কি অসৎ?

—দূর পাগলি! ‘সতী’ মানে বুঝি তাই? ‘সতী’ মানে যে বরকে ভালবাসে! তোর তো বরই নেই, ভালোটা বাসবি কাকে?

টোবা-টোবা গাল দুটো পাকা-আপেল। ছয়-বছরের বালিকা। ধমক দিয়ে ওঠে, দাঁড়াও! জেঠিমাকে বলে দেব! তুমি আমাকে ‘অসভ্য-কতা’ শেখাচ্ছ!

মাকে ডরায় রামানন্দ। বলে, আয় বাপ্! ‘বর’ কতটা কি অসভ্য কতা? ‘ভালবাসা’ কি মন্দ-বাসা? খারাপ কতা?

নোলক সমেত মাথা দুলিয়ে শিউলী বলে, জানি না। দিক্ কর না দিনি! আমাকে থির হয়ে পূজো-পাঠ কর্তে দাও!

আজ এই নবমবর্ষীয়া ভাবী-গোপিকার হাসি পায় সে-সব কথা মনে পড়লে। এখন সে অনেক-অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। অনেক সইয়ের সয়! এসেছে যে ওর। শুনেছে সেইসব সয়া-ওলা ভাগ্যবতীদের কাছে—‘বর’ কতটা অসভ্য নয়, কিন্তু বরেরা মাঝে-মাঝে ভারী অসভ্যতা করে। দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ ফটাস্ করে চুমু খেয়ে বসে। মায় দিনমানে! পাত্রীর মালিকানা পেলেই স্থান-কালের কথা ভুলে যায়। আর ঐ ‘ভালবাসা’ কতটা? সরম হয় স্বীকার করতে, কিন্তু—না, ওটা মন্দ নয়, কতটা সোন্দর!

সাত আর আট—এ দুটি বছরেও রাম-দাকে সাক্ষীগোপাল করে বেরতো করেছে। তবে মস্তুরের বিশেষ বিশেষ পংক্তি ‘উরুচ্চারণ’ করত না। মনে মনে গুনগুনাতো। রাম্ হাসত মুখ লুকিয়ে। প্রকাশ্যে নয়—তাহলেই পিঠে গুম্-গুম্ হবে! হাসত দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠত। আর লজ্জায় শিউলীর মুখখানি হয়ে যেত শিউলী-বাঁটা রঙের।

আগামী বৈশাখে তার ব্রত সমাপনের শেষ মাহেন্দ্রক্ষণ আসার কথা ছিল—পুণ্যপুকুর হয়ে ওঠার কথা পুণ্যে টে-টবুর, পূর্ণিপুকুর পরিণত পূর্ণতার সার্থকতায়। লীলাবতী হত সন্তিকারের সতী—সীতা: রামানন্দের হৃদয়লীনা।

কালে—লাজে বাঁচি না—হয়তো পুত্রবতীও হত!

হল না। সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল লঙ্কেশ্বর! এক শ্রোত্রী অমাবস্যায় সে মুখর সম্ভাবনা হয়ে গেল চির মৌন।

কেটে গেল পাঁচ-পাঁচটা বছর। বালিকা হল কিশোরী। 'নবরঙ্গ' এখনো হয়নি, তবে নব রঙ্গ তো বটে! বদরির কাল অতীত। কিশোরীবক্ষে জেগেছে যুগল কৌতুহল। 'কস্তুরী-মৃগ' হবার জমানা—আপনাতে আপনি বিভোর। পূর্ণিমায় পৌছাতে তখন সেই চতুর্দশীর এক-তিথি বাকি : প্রত্যক্ষ অনুভূতির জ্ঞান! পরোক্ষে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ। জোগতি ওকে শিখিয়েছে চার-ষোলং চৌষটি কলা—এ এক-কলা বাকি : হাতে-কলমে! জোগতি-মাসির মঞ্জুবায ছিল 'কুটিনীমতমে'র এক ওড়িয়া অনুবাদ। তাল পাতার পুঁথিতে—হাতে লেখা সচিত্র পুস্তিকা! সুর করে পড়ে শোনাতে—ওড়িয়া-শব্দের আড়াল আবডালে সব কথা বোঝা যেত না, ছবি দেখেও না বুঝলে প্রশ্ন করতে সরম হত। মাসিও ইচ্ছা করেই অনুক্ত রাখত। ছড়া কেটে বলত :

“রসবতী মোর প্রতি যাদু কিলা!

গোটা পান দিয়ে গোটা সুপুুরিয়ে

মুচুকিরি হাসি কিরি মোর হাতে দিলা।”

তার শাক্তরভাষ্য হচ্ছে : এ বিদ্যায় শেষ শিক্ষা শুধু দিতে পারে নাগর। যখন রসবতী মৃদু হেসে তার হাতে তুলে দেবে গুবাক-সুপারীর গুরুদক্ষিণা!

তখনই সেই নিভৃত নিকেতনে ঘুর-ঘুর করতে দেখা গেল একজনকে। নামটা জানে না রাধারানী—সবাই তাকে ডাকত : ছোট-হুজুর। মোহন্ত মহারাজের ভাইপো না ভাগ্নে কী যেন হয়। সেনাবাহিনীর সেনাপতি। অসীম তার ক্ষমতা। দ্বাররক্ষককে অনায়াসে বশীভূত করল উৎকোচে; কিন্তু পদ্মকলির নাগাল পেল না মুগ্ধ ভ্রমর। লঙ্কেশ্বরের লাঞ্ছনা থেকে অশোকবনে জানকীকে কোনও চোড়ি রক্ষা করেছিল কি না বাগ্মীকি লিখে যাননি; কিন্তু সেই লম্পটের পাশবিকতা থেকে রাধারানীকে নিরাপত্তা দিয়েছিল ঐ সামান্য নারী। সামান্য—তবু অসামান্য! ভয় দেখিয়ে তাকে জয় করা গেল না, লোভ দেখিয়ে লুন্ড। ছোট হুজুর তার গলার শতনরী খুলে দিয়েছিল জোগতির হাতে—সসম্মানে সেটি ওরই পদমূলে নামিয়ে রেখে জোগতি বলেছিল, মুই নেমকহারাম ন-আছি ছোট-হুজুর!

‘ছোট হুজুর হাসতে হাসতে বলেছিল, নেমকহারামির কথা উঠছে কেন? আমি তো তাঁরই লোক। জোগতি তার পাকা চুলে ভরা মাথাটি নেতিবাচক ভঙ্গিতে নোড়েছিল শুধু!

—ঘটঘট করে মাথা তো নাড়ছ, ঐ মাথাটা যদি কেটে নামিয়ে দিই খাড় থেকে? কে রক্ষা করবে তোমাকে?

করজোড়ে বলেছিল, মোর ধম্ম আজ্ঞে!

ছোট হুজুর কিন্তু অন্য জাতের খবর পেয়েছিল। কে এক দুঃসাহসী লৌণ্ডা আসে রাতের আধারে। প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে প্রাঙ্গণে—তার গুণ্ডচর স্বচক্ষে দেখেছে—গ্রহরী জানে না, কিন্তু জানে ঐ জোগতি। আপত্তি করে না। সে পাহারা দেয়—চোখের আড়াল হতে দেয় না, তবে শ্রুতিসীমার বাহিরে থাকে সে। কে সেই দুঃসাহসী? আর কী মন্ত্বে সে বশীভূত করেছে ঐ বৃদ্ধাকে?

ছোট হুজুর তো ছাড়, রাধারানীও সেটা আন্দাজ করতে পারে না। মাঝে তখন পারত না। আজ—কুসুমমঞ্জরীকে গল্প করার সময় বুঝতে পারেন। কোন মন্ত্বে রত্নানন্দ বশীভূত করেছিল বৃদ্ধাকে।

রুদনগর

মঞ্জরী জানতে চেয়েছিল—কেন গো রাধাটি?

—আজ বুঝতে পারি, কারণ আমি নিজেই আজ প্রাক্তন গোপিকা। আজ কেউ ঐ অবস্থায় পড়লে আমিও কি সুযোগ করে দেব না? ঐ বৃদ্ধাও কি একদিন অতিক্রম করে আসেনি তার বয়ঃসন্ধির সেই অবাধ দিনগুলি—তার প্রাকদেবদাসী জীবনে? তখন তার যৌবনের মৌ-বনে কি গুণ্ণুন্ করতে আসেনি কোন লুন্ড ভ্রমর?

শেফালী বলত, এভাবে লুকিয়ে দেখা করতে এস না রাম-দা। ধরা পড়লে তোমাকে—

—ধরা পড়ব না রে! ঠিক একদিন পালিয়ে যাব তোকে নিয়ে। সবুর কর—

সবুরে মেওয়া ফেলেনি। ধরাই পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ছোট হুজুর ওকে ডালকুড়া দিয়ে খাওয়াবার প্রস্তাব দিয়েছিল; কিন্তু মোহন্ত মহারাজ বৈষ্ণব। তিনি স্বীকৃত হননি। অপরাধীকে তুলে দিয়েছিলেন কাজী-সাহেবের হাতে। আর ঐ সঙ্গে এক থলে মোহর! বাদীর উৎকোচের পরিমাণেই যে সে-আমলে নির্ধারিত হত আসামীর শাস্তির পরিমাণটা।

আশ্চর্য! এক থলে মোহর হজম করে কাজী-সাহেব বিচারে অতি লঘু দণ্ড বিধান করলেন সেই পরস্বাপহরকের: তিনমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

মাত্র তিন মাস! তাও বিনাশ্রমে!

ছোট হুজুর তড়পায়—কাজী-শালা দু-তরফা ঘুষ খেয়েছে!

তা সে খায়নি কিন্তু। কাজী-সাহেব একটু নতুন খেলায় মেতেছিল। পরিকল্পনাটি খাশা। বিনাশ্রম কারাদণ্ড বটে তবে বন্দীর আহার এক পদ—কাফেরদের নিষিদ্ধ চতুস্পদী! শুধুমাত্র শূলপক্ষ গো-মাংসের শিককাবাব। দেখা যাক—কদিন না খেয়ে থাকিস।

শিককাবাব কাজীসাহেবের বড় মন-পসন্দ। বন্দীর শিককাবাবটা কেমন জমে তাই সে দেখবে। মাংস বন্দীর, শূল তার হুকুম, উত্তাপ ভঠরাগিরি! পঞ্চম সপ্তাহে ভেঙে পড়ল তরুণের মনোবল। সেদিনই মুক্তি—তখন কঙ্কালসার মানুষটা চলৎ-শক্তিহীন। দুনিয়ায় সে একা। নির্বাহ্য। কাজী-সাহেব কৌশলে বাকি জীবনের জন্য গোটা দুনিয়াটাই রূপান্তরিত করে দিয়েছে কারাগারে। স্বর্গহে তার স্থানাভাব। স্বর্গ্যমে তার প্রবেশ নিষেধ। রামানন্দ—না, কারাগার থেকে যে কঙ্কালটাকে ওরা মুক্তি দিয়েছিল তার নাম রামানন্দ নয়, রহিম-মিঞা—এখন সে থাকে ফরাসডাঙায়। আকবর ওস্তাগরের পালিতপুত্র: আবদুল রহিম ওস্তাগর। রাধারানী তার খবর জানে না আর, চোখেও দেখেনি। সে আজ পঁচ-সাত বছর আগেকার কথা। এতদিনে হয়তো সংসার পেতেছে। কার কাছে যেন শুনেছিল—ওর বিবিজানের নাম, ফতিমা।

এরপর শুরু হল তার নিজের নির্যাতন।

অভিষেক!

লালসাঁ-জর্জর লোলচর্মার তির্যক প্রয়াস। মোহন্ত বোষ্টম মানুষ, শিককাবাব সেবা করা সম্ভবপর নয়—‘স্বাণেন’ অর্ধভোজন তার ‘মনপসন্দ’ নয়—অগত্যা বিকৃতকাম!

তবে ছয়মাসের মধ্যেই নিষ্কৃতি পেল। নতুন সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়ে পড়ল রাধাজীর। প্রসাদ দিলেন ছোটহুজুরকে। সেখানেও বিভ্রম্না! ছয়মাসও টিকতে পারেনি। ছোটহুজুরের অরুচি হয়নি, কিন্তু ছুকারি যে সহযোগিতা কর্তে কিছুতেই রাজী হল না—কেমন করে হবে? সে যে জানে, ঐ লম্পটটার জন্যই রামুদা আজ রহিম মিঞা—থাক থেকে নির্বাসিত। রাতের

পর রাত বলাৎকারে সম্ভট হবার মানুষ নয় ছোট হুজুর। অগত্যা আবার হাতবদল। তবে নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে ভুল হয়নি। আখমাড়াই কলে ওকে নিষ্পেষিত হতে পাঠিয়ে দিল। এমন ব্যবস্থাপনা করল...

কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রাধারানী। মঞ্জুর হাত দুটি ধরে বলেছিল, কী হবে তোর শুনে? বলতে আমারও কষ্ট, শুনতে তোরও! সে-সব কথা শুনতে চাসনে আর।

মঞ্জু বলেছিল, থাক দিদি! ও-কথা থাক!

শিউরে উঠেছিল মনে-মনে। এমনটা তো তারও হতে পারত। রাধারানীর মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিল এক বিপ্রতীপ-মঞ্জুকে।

রোগ নির্ণয় করা গেছে।

পুরুষ-প্রকৃতিই বল অথবা 'স্বাং-য়িঙ'—সৃষ্টিতত্ত্বের সেই অমৃতময় আদিম সত্যটার এ জাতীয় কদর্য রকমফের হলে কী প্রতিক্রিয়া হয় তা আন্দাজ করা শক্ত নয় ভেষগাচার্যের পক্ষে। বোঝেন—কতকগুলো বিকৃতকাম পাষণ্ড যখন ওকে নিয়ে আখমাড়াই কলে পিষেছে তখন শুধু ওর দেহটাই দুমড়ে-মুচড়ে শেষ হয়নি, গেছে মনটাও। নরনারীর দৈহিক-মিলন ওর কাছে এক বিভীষিকার ন্যাকারজনক প্রতিচ্ছায়া। ওর মনের একটা অংশ সুরত-বিমুখ, কিন্তু আর একটা অংশ? যেটিকে পাঁচ-পাঁচটি বসন্তে গড়ে তুলেছিল সুদক্ষা জোগতি—পাদাবলী কীর্তন গানে, কব্যকথায়, নৃত্যভঙ্গিমার আত্মনিবেদনে? তা আছে অটুট। তা দেহাতীত প্রেম—তার যে মৃত্যু নাই। তা যে 'নিকষিত হেম! কামগন্ধ নাই তায়।' তাই আজও সে খঞ্জনি ব্রাজিয়ে গাইতে পারে—'গায়ে দিয়ে হাত, মোর প্রাণনাথ অন্তরে বাঢ়ল সুখ!' কিন্তু 'গা' বলতে করমুষ্টির শেষ সীমান্ত। আর একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেই ওর অন্তরে জেগে ওঠে বিক্ষোভ, জঠরে বিবমিষা। কে জানে, হয়তো বরাতিরা সবাই এতদিনে জেনে ফেলেছে রহস্যটা। ঐ নির্যাতিতার করুণ ইতিহাস। ওর ঐ শব্দকব্জির নিদারুণ হেতুটা। ওরা তাকে করুণা করে। টানটানি করে না। জানে, ঐ আখের ছিব্ড়েটায় আর কোন রস-কষ নেই—যতই কেন না দৃষ্টিবিভ্রম হোক।

আর সে জনাই কর্তা-মশায়ের আশঙ্কা—আখড়ায় নতুন করে অনাচার প্রবেশ করেছে ঐ অপক্লপার আগমন-মুহূর্ত থেকে। তাই সাহায্য চেয়েছেন ভেষগাচার্যের।

রোগনির্ণয় তো হল। কিন্তু নিরাময় হবে কী-ভাবে? এ রোগের কী চিকিৎসা?

রাত্রির তৃতীয় যাম। মাধবপক্ষ অনিবার্য নিয়মে চলেছে দোলপূর্ণিমার লক্ষ্যে। আজ শুক্লা একাদশী। নির্মেষ আকাশে নিদ্রাহারা শশী। তার তির্যক আলো এসে পড়েছে মশারি-ফেলা নির্জনতায়। পাশে আল্পেষশয়নে রতিক্লাস্তা সীমন্তিনী—বিপ্রতীপ-রাধা। নিতান্ত ঘটনাচক্রে যে আখমাড়াই কলে যায়নি।

হয়তো রাধাবল্লভপুরের মন্দির-চাতালে চাঁদের দিকে তাকিয়ে জেগে বসে আছে বিপ্রতীপ-মঞ্জু!

ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; মঞ্জুকে সব কথা খুলে বলবেন। রাধারানীর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার পূর্বে মঞ্জুরী অনুমতি নেবেন। তাতে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কাটা কমবে।

মাহেশ

কিন্তু এখন মতটা বদলে গেল। ফুল-পিসিমা ওকে ছাড়বেন না—একাকী তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে সেই সহজপন্থীদের আখড়ায়। সেখানে তিনি ঐ হতভাগিনীর কী-জাতের চিকিৎসা করলেন, আদৌ করলেন কি না, তা মঞ্জু কোনদিন জানতে পারবে না। জানবে—যেটুকু তিনি জানাবেন। কে জানে—সে চিকিৎসাটা কোন জাতের হবে শেষ পর্যন্ত। রাধারানীকে যদি নারীজীবনের স্বাভাবিকতার মালভূমিতে উত্তোলন করতে হয়, তাহলে হয়তো তাঁকেই সে-কাজ করতে হবে—ঠিক যেভাবে মৃণ্ময়ীকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়েছিলেন ভূশয়া থেকে ফুলশেখের ফুলেভরা শয়্যায়। কিন্তু তারপর? কোথায় থামবেন? এবারেও কি উন্মোচন করে দিতে হবে ঐ মধ্যক্ষামার নীবিবন্ধ—যেমন করেছিলেন স্বরীতোদর মীনুর? কিন্তু সেবার সাক্ষী ছিল ধর্মপত্নীর চর্মচক্ষু। এবার? এবার তা করতে হবে—যদি সেই শেষ চিকিৎসাই করতে হয়—একান্ত নিভূতে। হোক! তবু তা তাঁর ধর্মবোধের মর্মচক্ষুর সম্মুখে। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায়—বুঝে নিতে ঐ অনিন্দ্যকান্তি রোগিণীর...

কিন্তু তা কি সম্ভব? তিনি তো মরমানুষ! ভেষগবিদ্যায় সুস্পষ্ট নিষেধ আছে। মহামুনি চরক তা অনুমোদন করেন না—তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে যুবতী নারীর দৈহিক পরীক্ষা। কিন্তু বিবেকের নির্দেশে তো চরককে ইতিপূর্বেও অস্বীকার করেছেন। এবারেও কেন করবেন না? শুধু কর্মেই তাঁর অধিকার—‘কর্মণ্যোবাধিকারন্তে’। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত কর্ম। ফলের আকাঙ্ক্ষা নিষ্পন্ন করবেন—রোগিণীর রোগমুক্তি। সে কৃত্য শুধু পরম্পদী ধাতুতে গড়া, আয়তনপদী নয়। এ তো ঔষধ—ঐ হতভাগিনীর সেব্য। তাকে শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বুঝিয়ে দিতে—দেহজ-মিলন মাত্রেই ক্রেদান্ত নয়, কামবিকারের বহিঃপ্রকাশ নয়।

কিন্তু তা কি সম্ভব? কামবিকারগ্রস্তাকে তৃপ্তি দিতে হবে, নিজে কামতৃপ্ত না হয়ে। এ তো বাতুলের প্রলাপ! চরক ছাড়, এ তো স্বয়ং স্বমি বাৎস্যায়নেরও ধারণার বাহিরে। এক হাতে খঞ্জনি বাজে না। প্রথমের আঘাতে যদি দ্বিতীয়া স্পন্দিত হয়, তবে দ্বিতীয়ার প্রত্যাঘাতে প্রথমটিও বেপথুমান হতে বাধ্য। এ যে জাগতিক নিয়ম।

যদি হয়ই। তাতেই বা কী? সামাজিক বিধানে, নৈতিক নির্দেশে একমুখীন হবার দায় শুধু নারীর, পুরুষের নয়। মহান হিন্দুধর্মে ‘সতীত্ব’ শব্দটা একপক্ষের প্রতিই প্রযোজ্য। পুরুষের সে দায় নেই। ব্যতিক্রম যদি নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা হয় তাহলে পঞ্চপতিপ্রিয়া পাক্কালা প্রতিষ্ঠা করেছেন এই মত, হিন্দু ভারতে। কাতুর পরমপতি যে কত শত রমণীকে শয্যাসজ্জিনী হিসাবে লাভ করেছে তা তার নিজেরই স্মরণ নেই। সমাজ তাতে দোষ ধরে না, কাতুর সে বাবদ কোন ক্ষোভও নেই। তাহলে মঞ্জুই বা অভিমান করবে কেন, যদি খঞ্জনির দুটি পাটিই সমানতালে বাজে? যে-হেতু তার পূর্বে রূপেন্দ্র কিছু অং-বাং মন্ত্র উচ্চারণ করেননি?

কে বলে দেবে? কোন শাস্ত্রে আছে এর বিধান?

স্পষ্ট শুনতে পেলেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রত্যাশার:

—তোমার বিবেক! ‘আত্মদীপো ভব! আত্মশরণ ভব! অনন্যশরণ ভব!’

যা অসম্ভব, যা অবাস্তব, যা হয় না—তাই তাঁর লক্ষ্য! কামকলায় তৃপ্ত করতে হবে সেছ অনিন্দ্যকান্তিকে—নিজে অনাসক্ত থেকে।

কী যেন গানের কলিটা গেয়েছিল সেই বাউল?

: আমার যেমন বেণী তেমনি 'রবে, চুল ভিজাবো না !



পরদিন সকাল। রূপেন্দ্র আর গাঙ্গুলীমশাই অশ্বারোহণে এসেছেন ফরাসডাঙ্গায়। এখন হঠাৎ তোমরা রূপেন্দ্রকে দেখলে চিনতে পারতে না। তাঁর গায়ে কুর্তা, অর্কফলাশোভিত মুণ্ডিত-মস্তক নয়, মাথায় পাগড়ি। এটা তুলসী জোর করে পরিয়েছে ঠুকে। মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণ যে অশ্বারোহী হয় না তা নয়, রূপেন্দ্র সেভাবেই গ্রাম-গ্রামান্তরে চিকিৎসা করতে যেতেন; কিন্তু তুলসী রাজী হয়নি। ফরাসডাঙ্গার ফেরঙ্গ-পরিবেশে সে বড় বেমানান। উপরোধে মানুষ টেকি পর্যন্ত গিলে থাকে আর এক্ষেত্রে সুন্দরী শ্যালিকার বিশেষ উপরোধ! নিজে হাতে ঠুর মাথায় পাগড়িটা বেঁধে দিয়েছে। মঞ্জুরী সকৌতুকে লক্ষ্য করেছে। দুজনে অশ্বারোহণে যখন মাহেশ ত্যাগ করে গেলেন—ওরা দুই বোন পাকাবাড়ির ছাদ থেকে লুকিয়ে দেখেছে। মঞ্জুর নিশ্চয় মনে পড়েনি সেই উদ্ধৃতিটা—সেটা রচিতই হয়নি তখন, 'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে/এমনটি আর পড়িল না চোখে/আমার যেমন আছে॥'

ফরাসডাঙায় ফরাসী-রাজত্ব। তার কর্ণধার তখন যোসেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লেঙ্ক। ভারতবর্ষে এসেছেন 1720 সালে; ফরাসী চন্দননগরে ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়েছিলেন বছর দশেক পরে। 1741-এ তিনি চন্দননগরে পূর্বভারতের ফরাসী উপনিবেশের গভর্নর জেনারেল। অর্থাৎ পূর্ববৎসর। ভারতীয় স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিত—যেহেতু অস্তিমে ফরাসী জাতি নয়, ইংরাজই ভারত দখল করেছিল। অন্যথায় রবার্ট ক্লাইভ-এর তুলনায় তিনি ছিলেন সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিচেরী, কন্নটিক আর চন্দননগরে তিনি যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তা ছিল ইংরাজ অথবা নবাবের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। তাঁর সততা ছিল সমকালের এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। তাঁর আমলে ইংরাজ আর ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু ও শেষ হয়; 1746-এ ফরাসী সেনাপতি লা-বুদোনে ইংরাজের হাত থেকে মাদ্রাজের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় আর গোপনে তা ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রত্যাৰ্পণ করতে রাজী হয়ে যায় প্রচুর উৎকোচের বিনিময়ে। উৎকোচের পরিমাণটা ছিল চল্লিশ হাজার ব্রিটিশ স্টার্লিং। বলা বাহুল্য, সেটা দুপ্লেঙ্ক আর লা-বুদোনের মধ্যে ঝাটোয়ারা হবার কথা। সমকালীন প্রথাকে দুপ্লেঙ্ক নস্যৎ করেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। লা-বুদোনে দেশে ফিরে যায় এবং ব্যাস্টিলে বন্দী হয়। দুপ্লেঙ্ক নিজের শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করে এবং প্রচুর ঋণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যান। 1754 সালে তাঁকে দেশে ফিরে যাবার আদেশ দেওয়া হল। নয় বৎসর পরে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে এই অবহেলিত মহানায়কের মৃত্যু হয়। ফরাসী সরকার তাঁর স্রষ্টা মিটিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। হেতুটি সহজবোধ্য: দুপ্লেঙ্ক অস্তিমে পরাজিত। ভারত ফরাসী উপনিবেশ হয়নি!

এই দুপ্লেঙ্ক তখন ফরাসডাঙা বা ফরাসী চন্দননগরের শাসক

ওমান্নজেনম

ভবানীচরণ সহজেই সন্ধান জোপাড় করতে পেরেছেন। রহিম ওস্তাগর যার পালিতপুত্র সেই আকবর ওস্তাগর ফরাসী সেনাবাহিনীর পোশাক বানায়। সে—জাতীয় পোশাক বানানোর কায়দা এদেশের ওস্তাগরেরা জানত না। বস্ত্রত সেলাই করা জামার প্রচলনই ছিল না তার পূর্ব জমানায়, এই গৌড়মণ্ডলে। মুসলমানদের আগমনের পর সেলাই করা জামা-কাপড়ের প্রচলন শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু আটোসাটো ফরাসী কুর্তার প্রচলন ছিল না। তাই আকবর ওস্তাগরের নাম সবাই জানে।

নায়েব-নাজিরের হুকুম পেয়ে দেখা করতে এল রহিম। বছর সাতাশ-আঠাশ। বলিষ্ঠগঠন। মুসলমানী সাজ, গায়ে মেরজাই, মাথায় সফেদ-টুপি। আভূমি নত হয়ে সেলাম করল রূপেন্দ্রকে। ঘরে তখন তিনি একলাই। বললেন, তোমার নাম রহিম? আকবর ওস্তাগরের পালিত—পুত্র তুমি?

—জী, জনাব।

—কোথায় দেশ তোমার?

—রূপনগর, খোদাবন্দ। অজয়ের ধারে, বর্ধমান-ভুক্তিতে। কী কসুর হল আমার?

—‘কসুর’ হয়েছে ধরে নিচ্ছ কেন? বিশেষ একটা কারণে আমি তোমার খোঁজ নিচ্ছি। তুমি ঐ রূপনগরের গঙ্গাপ্রসাদ বসুর কন্যা শেফালীকে চেন?

লোকটা স্বতই আতঙ্কগ্রস্ত হল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ঐ উষ্মীষপরা রাজপুরুষটির দিকে। তার অন্তরে তখন কী-জ্বালের তুফান তা বোঝা গেল না। ক্রমে তার দৃষ্টি নত হল। বললে, চিনতাম! শেফালী মারা গেছে হজুর। তার কথা কেন?

—মারা গেছে! তুমি নিশ্চিত জান?

—না হজুর। নিশ্চিতভাবে জানি না। জানতে চাইও না। এসব কথা কেন আমাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করছেন?

রূপেন্দ্রনাথ স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। তুমি যেতে পার।

তবু স্থানত্যাগ করল না লোকটা। বললে, আপনি যে-কথা জানতে চেয়েছেন তা আমি বলেছি। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব তো আপনি দিলেন না, খোদাবন্দ? কেন আমাকে ডেকেছিলেন?

—আমি ভুল করেছিলাম রহিম। আমি খুঁজছিলাম রামানন্দ দত্তকে। তোমাকে নয়। তাকে জানাতে যে, শিউলী মরেনি!

এবারও দেরী হল জবাবটা দিতে। তবু বললে, বুঝতে পারছি, আপনি অনেক কথাই জানেন। আমার কাছে সে মৃত—এটা হক কথা নয়, হজুর?

—আমি তা ভাবিনি! তুমি জানালে, তাই এখন জানতে পারলাম।

—শুনেছি, সেই রূপনগরের মঠ বর্ণীতে লুট করেছিল। শিউলী যে মারা যায়নি, তা আমি জানতাম না।

—না, সে জীবিত। কোথায় আছে তা আমি জানি। তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?

—কী লাভ খোদাবন্দ? সেও দাগা পাবে। আমিও!

—তুমি সাদি করেছ? সন্তানাদি কী?

—জী, না। আমি আজও সে পাপ করিনি।

উৎসাহে সোজা হয়ে বসেন। বলেন, পাপ কাজ! কী বলছ? সাদি করা পাপকাজ?

—জী, না। তা বলিনি। কিন্তু কী দরকার তৃতীয় একজনকে এ জটিলতার মধ্যে টেনে আনার? সে তো আমাকে সাদি করে সুখী হবে না।

রাপেন্ড ওর হাতখানা চেপে ধরেন। বলেন, রামানন্দ! তাই যদি হবে তাহলে তুমি কেন আজ তাকে গ্রহণ করতে পারছ না? সে অনেক দাগা পেয়েছে, অনেক নির্যাতন সয়েছে। কিন্তু সেও তো সাদি করেনি? তোমার পথ চেয়ে আছে!

রহিম তার হাতখানা টেনে নিল না। বললে, সে কি রাজী হবে ধর্মত্যাগ করতে?

—যদি হয়, তুমি কি তোমার কুসংস্কারকে ত্যাগ করতে পারবে?

—কুসংস্কার! তার মানে?

—রাধারানী বহুভোগ্যার জীবন কাটিয়েছে এতদিন! তা তুমি জান।

মাথা খাড়া করে রহিম বললে, আমি তো কাকের নই গরিবপরবর! আল্লারসুলের দরবারে সে অপরাধের কোন শাস্তির বিধান তো নেই। তাছাড়া সে দুর্ভাগ্য তো হয়েছে রাধারানীর—তাকে আমি চিনি না। আমরা শিউলীর কথা আলোচনা করছি হজুর! ... সে এখন কোথায়?

রাপেন্ড একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তুমি কি যে-কোন শর্তে তাকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত?

—যে কোন শর্তে, মানে?

—আমি জানি না, সে ধর্মত্যাগ করতে স্বীকৃতি হবে কি না। জানি না হিন্দু পণ্ডিতেরা তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে কোনও শুদ্ধির মাধ্যমে...

রহিম মাঝখানেই বাধা দিয়ে ওঠে, মাপ করবেন। আমি রাজী নই। আমি কোনও পাপ করিনি। প্রাণধারণের জন্য খাদ্যগ্রহণ পাপ কাজ নয়। প্রায়শ্চিত্তের কোনও বিধান আমি মানব না!

—ঠিক কথা, রামানন্দ ...

—মাপ করবেন হজুর! আমাকে রহিম নামেই ডাকবেন।

—তাই ডাকব, রহিম! কিন্তু একটা কথা বল। আজ তুমি রহিম, কিন্তু ঐককালে তুমি তো রামানন্দ ছিলে। এ কথা কি বুঝবে না—কেন শেফালী মুসলমানী হয়ে যেতে পারে না?

—তাহলে আর উপায় কী বলুন? আমি প্রায়শ্চিত্ত করব না— সে আমার ধর্ম গ্রহণ করবে না। সেক্ষেত্রে ...

—না, না, সে তো তার কথা বলেনি এখনো। আমি কেমন করে জানব? আমি কি জানি: সব কথা শোনার পর কোনটা তার কাছে বড় হয়ে উঠবে—প্রেম, না ধর্ম? তুমি এক কাজ কর। আজ সম্মুখি এখানে এস। আমি জেনে এসে তোমাকে জানাব।

—একটা কথা শুধু বলুন—আপনি কে? আপনার কী গরজ? আপনি তাকে কী করে চিনলেন?

—এখন নয়, রহিম। সে-কথাও পরে বলব। তুমি এস এখন।

রাধাবল্লভপুর

আদাব জানিয়ে রহিম প্রশ্ন করছিল। আবার তাকে ফিরে ডাকলেন, রহিম!

—জী?

—সব কথা তোমাকে এখন বলতে পারছি না। তবু দু-একটা কথা বলা দরকার। আমি একজন কবিরাজ। শিউলীর চিকিৎসা করছি ...

—ওর কী হয়েছে?

—মানসিক ব্যাধি। ওর মনের একটা অংশ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। মস্তিষ্কবিকৃতির কোনও লক্ষণ নেই—কথাবার্তা চাল-চলনে সে নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যে তাকে বিবাহ করবে তাকে জানিয়ে রাখা উচিত নরনারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটাকে সে ঘৃণার চোখে দেখে।

রহিম বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে, সেটাই তো স্বাভাবিক, কবিরাজমশাই। যে অত্যাচার তার উপর দিয়ে গেছে ...

রূপেন্দ্র ওর হাতটি আবার টেনে নিয়ে বললেন, তুমি পারবে! তুমি নিশ্চিত তাকে আবার স্বাভাবিক করে তুলতে পারবে। চেষ্টা করে দেখবে, রহিম?

রহিমের চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। বলে, বাবুজী, জানি না আপনি আমাদের কথা কতদূর জানেন—কিন্তু এটা কেন বুঝছেন না, একমাত্র সেই হতভাগীই পারে এই আধখানা মানুষটাকে আবার একটা গোটা মানুষ করে তুলতে। এ তো শুধু দেওয়া নয় ছজুর! এ যে দেওয়া আর নেওয়া! আমরা দুজনেই তো ভুগছি! একই অসুখে!

—আরও একটা কথা! আমি যদি তোমাদের দুজনকে কোনও গীর্জায় নিয়ে যাই? তোমরা কি খ্রীস্টান মতে বিবাহ করতে পার না?

—সে রাজী হলে পারি। কারণ আন্দাজ করছি পাদরী-সাহেব আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবে না! পাদরী তো আর কাফের নন!

সেদিনই অপরাহ্ন কাল। অস্বাভাবিক রূপেন্দ্র রাধারানীকে নিয়ে ফিরে আসছিলেন রাধাবল্লভপুর থেকে ফরাসডাঙ্গায়। প্রকাণ্ড আরবীয় অশ্ব, অনায়াসে দুইজন আরোহীর ভার বহনে সক্ষম। রাধারানীকে নিয়ে আসতে হবে বলে এই ‘উচ্চৈঃশ্রবা’-কেই বেছে নিয়েছিলেন ফরাসী-সরকারের মন্দুরা থেকে। রাধারানী বসেছে সামনে, বাঁ-দিকে, দু-পা ঝুলিয়ে। ডানহাতে একটা পোটলা, অপরহস্তে শিথিলবন্ধনে বেঁটন করে ধরে আছে রূপেন্দ্রের কটিদেশ। অশ্ব আকস্মিক গতিহ্রদ লাভ করলেই সেই বন্ধনটি প্রতিবর্তী-প্রেরণায় দৃঢ় আলিঙ্গনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রূপেন্দ্র বোঝেন, এটা ঐ বৈষ্ণবীর প্রগলভতা-জনিত কারণে নয়, নিতান্ত প্রাণ ধারণের তাগিদেই মাঝে-মাঝে তার পীবর-প্রত্যঙ্গ নিষ্পেষিত হচ্ছে ঠাঁর কবাটবন্ধে।

রাধারানীর ধারণা, ওরা দুজনে আসছে মাহেশে। সে-কথাই বলেছিলেন রূপেন্দ্র কর্তা-মশাইকে। বলেছিলেন রাধারানী যদি ফিরে না আসে তাহলেও যেন তিনি চিন্তিত না হন; কারণ রোগিণীর নিরাময়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন। ব্যবস্থাটা বেশী জাতীয়, তা বুঝে উঠতে পারেননি কর্তামশাই। তবু আপদ বিদায় হওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত—বিশেষ, মেয়েটি যখন নিজেই রূপেন্দ্রের সঙ্গে চলে যেতে স্বীকৃতা হল।

রূপেন্দ্রকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল রাধারানী, এ কী, এ কী! এ তো প্রণ্যাবর্তন নয়, এ যে আবির্ভাব! গৌসাইঠাকুর! তুমি রাজপুত্র হয়ে গেলে কেমন করে?

—কর্তা-মশায়ের কাছে শোননি, আমি সিদ্ধপুরুষ? বছরপীর মতো আমার রঙ বদলায়!

—তাই তো দেখছি! কিন্তু যুগলে আসার কথা ছিল যে, রাজপুত্র!

—না! সে বলেছে তোমাকে নিয়ে যেতে। তোমার পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে নাও!

তাই বামদিকের সড়ক ছেড়ে রূপেন্দ্র যখন দক্ষিণ দিকের রাজপথ ধরলেন তখনই রাধারানী প্রশ্ন করেছিল, এ কী! এদিকে কেন? আমরা কোথায় যাচ্ছি?

সড়ক যেখানে দ্বিধাবিভক্ত, সেখানে আছে নবাবী পূর্ববিভাগের পথনির্দেশ —সাদা বাঙলায়—কোন দিকে মাহেশ এবং কোনদিকে ফরাসডাঙা। রাধারানী নিরঙ্কর নয়, তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তাদের গতিমুখ এখন ফরাসী চন্দননগর।

রূপেন্দ্র বললেন, আমরা যাচ্ছি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে প্রাণ-ভোমরার সন্ধানে!

—কিন্তু এমন তো কথা ছিল না গৌসাই?

—গৌসাই! গৌসাই কে? এখন আমি রাজপুত্র!

—মানছি, কিন্তু রাজকন্যার পথ যে বাঁদিকের সড়কে?

রূপেন্দ্র বললেন, “এক ঘরে যদি না পোষে তায়/ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়।” রাধারানী চুপ করে যায়। বোধকরি হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হয়তো তার মনে হয়, কাজটা ভাল হয়নি। এভাবে মানুষটাকে উত্তেজিত করা। ভুল বোধানো।

ভুল? তা সে নিজেও জানে না! কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল! নিজের কাছে স্বীকার করতে আর লজ্জা কী? পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই ঐ আগুনবরণ মানুষটাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছিল। প্রথম দিনই। দূর থেকেই। তারপর পরিচয় পাওয়া মাত্র যে-কথাটা ওর মনে পড়েছিল—কী লজ্জা! —সেটার কথা মঞ্জুকেও মন-খুলে বলতে পারেনি: মুঁছা রোগটা তো তারও হতে পারত! তারপর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। মনের যে অংশটা দুমড়ে-মুচড়ে অষ্টাবক্র হয়ে যায়নি —হঠাৎ লক্ষ্য করেছিল সেই অংশে একটা ছোট চারা গাছ! দু-তিন দিনের ভিতরেই সে চারাগাছে দেখা দিয়েছিল কাঁচা কিশলয়, গোপন বৃন্তে মুঞ্জরিত হয়েছিল কচি পুষ্প-কোরক। গানে-গানে দল মেলে ফুটে উঠতে চেয়েছিল সেই কুসুমকলিকা। কিন্তু তাই বলে মঞ্জুর ঘরভাঙার কথা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না—সে কথা সে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়েও দিয়েছিল গৌসাই ঠাকুরকে।

কাজটা ঠিক হয়নি। ও পুরুষ। মানবে কেন? প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়ার পরেও?

রাধারানীর মন তখন দ্বিধাবিভক্ত। বুঝেছে—এ ওদের অভিসার! অবৈধ অভিসার! গৌসাই আজ বেপরোয়া রাজপুত্র: ‘চোরের কি কভু নিবৃত্তি আছে!’

কিন্তু! নিজের মনটাকেই কি চিনতে পেরেছে রাধারানী? সে তো জানে তার সীমারেখা! কাব্যে, গানে, লাস্যে, হাস্যে প্রণয়কথা এক জিনিস, আর...

শেষ সময়ে যদি ঐ অষ্টাবক্র-মনটা পথ রুখে দাঁড়ায়!

অশ্বের গতি স্তিমিত হয়ে এল একটি নাকা-টোঁকির সম্মুখে। পৃষ্ঠের সামনে এডোঁএড়ি করে একটি বাঁশ বাঁধা। তার একপ্রান্তে দড়ির বাঁধন; অপরপ্রান্তে ভারী পাথর-বাঁধা হাঁসকল। কী

রাধাবল্লভপুর

ব্যাপার? পথ রুদ্ধ কেন?

এটাই কানুন। এটা ফরাসী-চন্দননগরের শহরসীমান্ত। ও-প্রান্ত ফরাসী সরকারের শাসনাধীন। নাকাটোকারী পাশেই একটি ছোট গুমটি ঘর। তার সম্মুখে পল্ল মাথায় একজন রক্ষী, ঘরের ভিতর টকটকে লালমুখো এক সাহেব।

—পথে আগড় দেওয়া কেন? —জানতে চাইল রাধারানী।

—আমরা নগরসীমান্তে পৌঁচেছি। ছাড়পত্র দেখাতে হয় এখানে।

রূপেন্দ্র অস্থপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। রাধার কটিদেশ বেঁটন করে তাকে ভূতলে নামিয়ে আনলেন। সাহেবের চোখের সামনে এভাবে অবতরণ করতে সলজ্জ হয়ে পড়ে।

সহাস্য-বদনে ঘর ছেড়ে বাইরে বার হয়ে এল ফরাসী যুবক। এমন রাঙামুখো মানুষ রাধা সারাজীবনে দেখেনি। আর তার সাজপোশাকেরই বা কী বাহার! উর্ধ্বাঙ্গে খাটো কুর্তা, নিম্নাঙ্গে যে পরিচ্ছদ—ব্রিচেস্—তা আগে কখনো দেখেনি। মাথায় বিরাট টুপি, তাতে আবার কী একটা পাখির পালক লটকানো। কোমরবন্ধে শুধু তরবারীই নয়, পিস্তলও।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে ঠুঁদের দুজনকে বলে, 'ঐ সোয়ে!'

রূপেন্দ্র নমস্কার করে প্রত্যভিবাদন করেন: 'ঐ সোয়ে'!—কথাটার মানে না জেনেই। 'নমস্কারে'—'নমস্কার', 'রাম-রাম'—এ 'রাম-রাম', 'শুভসন্ধ্যায়' যদি 'শুভসন্ধ্যায়' প্রত্যভিবাদন হয়, তাহলে 'ঐ সোয়ে'-র ক্ষেত্রেই বা নিপাতনে সিদ্ধ হতে যাবে কেন?

সাহেব বলে, 'আত্রে, আত্রে, সিল ভু প্লে—'

এবার আর হালে পানি পান না। তবে ওর দুটি হাতের মুদ্রায় বোঝা যায় বক্তব্যটা, আসুন, আসুন, অনুগ্রহ করে ভিতরে আসুন।

রূপেন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে জেব থেকে তাঁর অনুমতিপত্রটি বার করে দেখান। পিসেমশাই সেটা ঠুঁকে দিয়ে রেখেছেন; বলেছেন, প্রয়োজনে সেই সনাক্তিকরণ পত্রটি দেখাতে হতে পারে। সাহেব দেখে খুশি হল। হড়বড় করে কী যেন অনেকটা বলে গেল তার মাতৃভাষায়। রূপেন্দ্র উপায়ান্তরবিহীনভাবে না-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আধা-সংস্কৃত আধা-বাঙলায় বললেন, ফরাসী নাহং বেদ!

লোকটা বুঝল। সেও নীরবে তার দুটি হাত বাড়িয়ে দিল ফরাসী চন্দননগরের দিকে, যে ভঙ্গিতে কন্যাকর্তা বরযাত্রীদের 'আস্তাজ্ঞা-হোক' জানায়।

অর্থাৎ রূপেন্দ্র নগরে প্রবেশ করতে পারেন।

রূপেন্দ্র পুনরায় যুবতীর কটিদেশ বেঁটন করে অস্থারূঢ় করতে চাইলেন। রাধা বাধা দিল। বললে, 'ঐ সাহেবের চোখের সম্মুখে নয়। চল, একটু পায়ে হেঁটে আড়ালে যাই। মুখপোড়া ভাববে আমি বুঝি তোমার বিয়ে করা বউ।'

কোথাও কিছু নেই লালমুখো আকাশ-ফটানো হাসি হাসল। মাথা থেকে টুপিটা পুনরায় খুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে দোলাতে দোলাতে বললে, আশাতে মাদমোয়াজেল! মুখপোড়া কিছু-কিছু বুঝিল! কমপ্রিহেন্ড!

—ও মা গো। সাহেব বাঙলা বোঝে।—রাধারানীও এখন রাঙামুখো।

হাঁটতে হাঁটতেই নাকা-টোকারি এলাকাটা পার হয়ে এলেন দুজনে। বাক ঘুরতেই একেবারে

নির্জন প্রান্তর। শুধু পথের ধারে নয়ানজুলিতকু গাছ-গাছালির ঘন আচ্ছাদন। রূপেন্দ্র ডাকেন, এবার এস। ঘোড়ার উপর বসিয়ে দিই।

—না। —রাধারানী সড়কটা পার হয়ে একটা সাঁকোর পাঁচিলের উপর গিয়ে বসল।

—কী হল আবার?

—আগে বল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—বললাম তো। আমার রাজপ্রসাদে। ফরাসডাঙায়।

ফরাসডাঙায় রূপেন্দ্র ভেষগাচার্যের রাজপ্রসাদ থাকার কথা নয়। এটা জানা আছে। হয়তো সেখানে কোন পাঠশালায় একটা কামরা ভাড়া করেছে। সেখানেই নিয়ে গিয়ে ওকে তুলতে চায়। হেতুটা সহজবোধ্য। রাধারানী বলে, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?

—কেন নয়? এটাই তো তুমি মনে-মনে চাইছিলে, রাধা।

হঠাৎ রুখে ওঠে। বলে, না। তাহলে তুমি ভুল বুঝেছ আমাকে। আমি তো সেদিন বলেছিলাম গোসাঞি, মঞ্জুর ঘর ভাঙতে চাইছি না আমি।

—আমিও তো সেটা চাইছি না, রাধা।

—তাহলে মাহেশের বদলে আমাকে এখানে নিয়ে চলেছ কেন?

রূপেন্দ্র অর্ধটিকে গাছের ডালে বেঁধে ওর পাশটিতে এসে বসলেন, বললেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না, রাধা? আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারি? তোমার, অথবা মঞ্জুর? জেনে শুনে?

—তাহলে আমাকে কেন নিয়ে চলেছ ফরাসডাঙায়? মাহেশে কখন যাব?

—কাল সকালে। রাতটা এখানে কাটিয়ে।

হঠাৎ বারবারিয়ে কেঁদে ফেলল রাধারানী। বললে, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ ঠাকুর। আমি... আমি... তুমি যে আমার সব কথা জান না।

রূপেন্দ্র ওর হাতদুটি তুলে নিয়ে বললেন, আমি তোমার সব কথা জানি, শেফালী!

—শেফালী?

—হ্যাঁ। আমি তো সেই ছোট ছজুর নই! আমাকে ভয় কী?

হঠাৎ অশ্রুআর্দ্র মুখখানি মেলে ও আকুলভাবে বলে, তা তুমি পারবে?

—কী?

—এক বিছানায় শুয়েও...যদি আমার মন হঠাৎ বিধিয়ে ওঠে...

রূপেন্দ্র ওর করমুষ্টি আকর্ষণ করে ওর কপালে একটি চুম্বনচিহ্ন ঐকে দিলেন, বললেন, সে আত্মবিশ্বাস আমার আছে, রাধা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন তোমার গাত্রস্পর্শ করব? তুমিই না বলেছিলে, আমি—অসাধারণ!

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল! আত্মবিশ্মৃত হয়ে রাধারানী সবলে আকর্ষণ করে ধরল রূপেন্দ্রকে। তাঁর ওষ্ঠাধরে ঐকে দিল সুনিবিড় এক চুম্বনচিহ্ন। দীর্ঘ সময় ধরে। পরমুহুর্তেই আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে দু-হাতে মুখ ঢাকল।

রূপেন্দ্র অবিচলিত। ব্রত উদ্যাপন করছেন তিনি। অন্যসঙ্গে থাকার ব্রত।

পুনরায় ওর হাত ধরে আকর্ষণ করেন। বলেন, এবার এস।

ফরাসডাণ্ডা

—তুমি রাগ করনি?

—তোমার কি তাই মনে হল?

—না। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—বোঝ না যেন! তোমার ভাবখানা ছিল—না আবাহন, না বিসর্জন।

রূপেন্দ্র মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন। মেয়েটা বুঝে ফেলেছে! প্রখর বুদ্ধিমতী সে। এমন নিরাসক্ত থাকলে চলবে না। সক্রিয়ভাবে নিরাসক্ত হতে হবে।

রাধারানী বলে, কী ভাবছ, সত্যি করে বলবে?

—বলব! তোমার চুমু খাওয়া দেখে মনে হল—জীবনে তুমি এই বোধহয় প্রথম কোন পুরুষমানুষকে চুষন করলে—আর্যোবনের তৃষ্ণা নিয়ে।

রাধা সলজ্জে মুখ নিচু করে বললে, কথাটা কিন্তু ঠিকই। এই প্রথম।

—এর আগে কখনো খাওনি?

—না! আমাকে খেয়েছে, আমি খাইনি। যেমন এখন তুমি আমাকে খেলে না।

এবার রূপেন্দ্রই ওকে সবলে আকর্ষণ করে টেনে আনেন।

“অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দৌহার হৃদয় যেন দৌহে পান করে—

গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে॥”

তীর্থযাত্রা। তীর্থ শেষ নয়। এ তো শুধু কুসুমচয়নের পর্যায়।

এর পরিণতি “মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।”

কঠিন সে পরীক্ষা সম্মুখে!



রাজপ্রাসাদ দেখে চোখ কপালে উঠে যায়। এ যে সত্যিই কল্ললোকের রাজপুত্রের প্রকাণ্ড প্রাসাদ! গঙ্গার কিনার ঘেঁষে। সারি-সারি পলতোলা মর্মর স্তম্ভ, উপরে উর্ধ্বমুখ সহস্রদল। ‘কোরিন্থিয়ান-কলাম’ ও বেচারি কোথায় দেখেছে এর পূর্বে যে, বুঝবে? দ্বিতলে সারি-সারি পাখি-খড়খড়ির গবাঙ্ক। সেটা লাট বাহাদুরের আবাস। একতলায় পর্যায়ক্রম কক্ষ, মহাফেজখানা। প্রাচীর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড উদ্যান, কেন্দ্রস্থলে ফোয়ারা। তার মাঝখানে একটি জপূর্ব নারীমূর্তি—আহা! হাতদুটি ভাঙা! এত এত খরচ করেছে, আর এ সুন্দরী মর্মরমূর্তির ভাঙা হাতদুটি মেরামত করায়নি, কেন, গো? এ প্রশ্নের জবাব রূপেন্দ্র জানেন না। মনোপাণ্ডিত তিনি, কিন্তু জানেন না— কেন এ ভাঙা হাত দুটি মেরামত করা যায় না, যাবেনি। বস্তুত ভাস্কর ওর হাত দুটি আদৌ গড়েনি— কারণ ও যার ছায়ামূর্তি সেই গ্রীক নুভি অ্যাসকুইলিন ভেনাসকে ভয় অবস্থাতেই যে পাওয়া গেছিল। সে-কথা রূপেন্দ্র কেমন করে জানবেন?

উদ্যানের অপরপ্রান্তে দু-একটি বিচ্ছিন্ন মোকাম—অতিথিশালা। তারই একটা তখন গাঙ্গুলীমশায়ের বন্দোবস্তে রূপেন্দ্রের দখলে।

সিংদরোজার কাছেই দুজনে অবতরণ করেছেন। অস্থাবাসরক্ষক অশ্বটিকে নিয়ে গেছে। পদব্রজে ওঁরা অতিথিশালার দিকে অগ্রসর হয়ে আসেন। একতলা বাড়ি। দুটি মাত্র কক্ষ। সংলগ্ন স্নানাগার। খিদমদগার অগ্রসর হয়ে আসে। সেলাম করে। রাধারানীর হাত থেকে পোটলাটা নেয়।

প্রথমটি অভ্যর্থনা কক্ষ, ভিতরে শয়নাগার। প্রকাণ্ড পালঙ্ক, একটি মেজ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কেদারা। একটি আরাম-কেদারা। পুষ্পপাত্রের কুসুমস্তবক সুবিন্যস্ত।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। খিদমদগার খাশগেলাসের বাতিদানে আলো জ্বলে দিল। গবাক্ষগুলি রুদ্ধ—সন্ধ্যার ঝোঁকে না হলে ঝাঁক-ঝাঁক মশা ঢুকে পড়ে।

মেজ-এর উপর ভৃঙ্গার, পানপাত্র। নির্মল পানীয় জল।

পরিচারকটি জানতে চাইল, নৈশাহারের কী জাতীয় ব্যবস্থা হবে।

রূপেন্দ্র দুজনের মতো নিরামিষ আহার্যের বন্দোবস্ত করতে বললেন। লোকটা বিদায় নিল। রূপেন্দ্র তার পিছন পিছন বার হয়ে এসে বললেন, সে লোকটা এসেছে?

—জী নহী! বহু রহিম ওস্তাগর ন?

—হ্যাঁ। তার আসার কথা আছে। এলে, তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আমাকে খবর দিও।

—যো হুকুম, সরকার। —লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ঘরে ফিরে এসে দেখেন রাধা মেঝের উপর বসে আছে।

—ও কী! ওখানে বসেছ কেন? কেদারায় উঠে বস। ওরা দেখলে কী ভাববে।

রাধা চট করে উঠে দাঁড়ায়। কী করবে, কী বলবে যেন ঠাওর পায় না। রূপেন্দ্র বলেন, গা ধোবে? পাশের ঐ ঘরটা গোসলখানা। হাওয়া জল আছে, গামছাও আছে। এই বাতিটা নিয়ে যাও বরং।

ফান্সুনের শেষ। শীতের ভাবটা নেই। রাধারানী খুশি হল। ঘামে সে ভিজ়ে গেছে। পোটলাটা নিয়ে সে গোসলখানায় ঢুকে পড়ে। রূপেন্দ্র ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলেন আরাম কেদারায়। অনতিবিলম্বেই শ্রান্ত দেহে নিদ্রাগত হন। কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন জানেন না, হঠাৎ ললাটে একটি পেলব স্পর্শ লাভ করে চোখ মেলে তাকান। রাধারানীর স্নান সারা। সামান্য প্রসাধনও করেছে। না, শঙ্কার নয়, প্রসাধন! তিলকসেবা করেনি, তবে ধন্বিল্ল বেঁধেছে। ইতস্তত করতে করতে শেষমেশ পুষ্পপাত্র থেকে একটা নাম-না-জানা বিদেশী ফুল তুলে গুঁজে দিয়েছে চূড়ে করে বাঁধা কবরীবন্ধনে।

রূপেন্দ্র ওর সেই বাসকসজ্জা দেখে খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। আবৃত্তি করেন:

“বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভূজয়োঃ কাঞ্চনী চান্দ্রশ্রীর্

মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলঃ শিখণ্ডঃ।

কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং

বেশং কেবাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম্।”

রাধা এতক্ষণে মেনে নিয়েছে। গোসাই-ঠাকুর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—সন্ধ্যার ঘর ওরা ভাঙছে না।

ওমনাজেনমর

ধরা যদি দিতেই হয় তাহলে ধরাকে সরাঙ্গানই বা করবে না কেন? মঞ্জুর তো পড়ে আছে সারাটা জীবন—ওর জীবনে, হ্যাঁ! এটাই তো প্রথম ফুলশয্যা! হয়তো এটাই শেষ! আকৈশোর তো দাঁতে দাঁত দিয়ে অগণিত পিশাচের বলাৎকার সহ্য করে এসেছে এতদিন! তাই জানতে চায় ঐ সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা। রূপেন্দ্র বলেন, দেহে সূক্ষ্মবসন, ভূজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ, সুগন্ধ তৈলসুরভিত মসৃণ কেশদামে যুথির মালিকা, কর্ণে নবশশিকলার ন্যায় তালপত্রের কর্ণাভরণ—বঙ্গললনার এই বাসকসজ্জা কার না মনোহরণ করে?

বক্তা আর শ্রোতা দুজনেই জানেন, এ বর্ণনার সঙ্গে রাধার সজ্জার কোন মিল নেই। কিন্তু এ কথাও জানেন, তাতে শেষ পংক্তিটা উচ্চারণে কোনও বাধা নেই। সে কথাই বলে রাধা, একজনের মনোহরণ করলেই যথেষ্ট।

রূপেন্দ্র ফস্ করে বলে বসেন, কেন? ফরাসডাঙায় এসেও আর একজনের কথা তোমার মনে পড়ছে না, রাধা?

কেমন যেন চমকে ওঠে। বলে, মানে? কার কথা বলছ?

—ফরাসডাঙায় তোমার চেনা-জানা কি কেউ নেই?

এক ফুঁয়ে যেন প্রদীপটা নিবে গেল। বলে, সে হতভাগার কথাও বলেছে মুখপুড়ি?

—বলেছে। তখনি তো বললাম আমি, তোমার স—ব কথা জানি।

রাধা বসে পড়ল ওঁর আরামকেদারার হাতলে। বললে, তার কথা আজ থাক!

—কেন গো? রাম-দার কথা কি তোমার একটুও মনে পড়ে না?

চোখ দুটি জলে ভরে এল। তবু ঝরে পড়ল না। অশ্রুরন্ধকণ্ঠে বললে, অহেতুক কেন দাগা দিচ্ছ আমাকে? সে তো আর তোমার মতো অসাধারণ নয়। তার স্ত্রী আছে, সংসার আছে...

—তুমি নিশ্চিত জান?

—না, তা জানি না। আন্দাজ করতে পারি।

—তোমার ধারণাটা ভুল রাধা। আমি ফরাসডাঙায় এসে তার খোঁজ করেছি। দেখা পেয়েছি।

শিহরিত হয়ে ওঠে এবার। উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুমি তাকে দেখেছ?

—হ্যাঁ। আজই সকালে।

কী যেন প্রশ্ন করতে গেল। পারল না। আঙুলে অঞ্চলপ্রান্তটা অহেতুক জড়াতে থাকে।

—সে নিজেও একই অসুখে ভুগছে।

চকিতে মুখ তুলে তাকায়, একই অসুখে! মানে?

—যে অসুখে তুমি ভুগছ! তাই সে আজও বিয়ে করতে পারেনি। সে ভুলতে পারেনি তার ছেলেবেলার সঙ্গিনীকে: শিউলী।

আর ধরে রাখা গেল না। ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ল এবার। লজ্জা পেল না সে জন্য। অশ্রুস্রাব দু-চোখ মেলে বললে, এ কথাটা কাল সকালে বলা চলত না?

রূপেন্দ্র বিস্মিত। কেন, কেন? এখন বলায় কী ক্ষতি হল?

—বোঝ না? আমি... আমি যে আজ স্বাভাবিক হতে চাইছিলাম। এরপরি সে পরীক্ষা—কথাটা শেষ করতে পারে না।

ওর হাতদুটি ধরে নিজের দিকে টেনে আনেন। বলেন, সে যদি রাজী থাকে তাহলে কি পরীক্ষাটা তার সঙ্গেই করে দেখতে পার না?

কথাটা এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু যেন ওর মাথায় ঢুকল না। অর্থহীন দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে থাকে। রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, আজ সকালে সে আমাকে কী বলেছিল জান? বলেছিল, ‘পারলে একমাত্র শিউলীই পারে এই আধখানা মানুষটাকে আবার একটা গোটা মানুষ করে তুলতে।’ তুমি কি চেষ্টা করে দেখবে না, রাধা?

মাথাটা নিচু করে বলে, আমি তো তাকে ঠকাতে পারব না ঠাকুর। সে তো জানেই কত-কত পিশাচের....এ ফুলে তো আর পুজো হয় না।

—হ্যাঁ, জানে। সে কথাও তাকে বলেছিলাম। তার জবাবে সে কী বলল জানো? বললে, আমি তো কাকের নই বাবুজী। আল্লারসুলের কানুনে এটা স্ত্রীলোকের কোন পাপই নয়। তার কী কসুর বলুন?

রাধা প্রত্যুত্তর করে না।

রূপেন্দ্রই প্রশ্ন করেন, প্রেমের জন্য কি তুমি ধর্মত্যাগ করতে পার না?

রাধারানী নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করল।

রূপেন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, ধর্মত্যাগ এতই অসম্ভব তোমার পক্ষে? তোমার রাম-দার চেয়েও সেটা বড়?

এবার মুখ তুলে চোখে-চোখে রেখে জবাব দিল, সে-জন্যে নয়। আমি মুসলমান হয়ে যেতে পারি না। তাহলে সেই শয়তান কাজীটার কাছে আমাদের দুজনেরই হার হবে। এই তো চেয়েছিল সে।

—কিন্তু রামানন্দকে প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধান কি পণ্ডিতেরা দেবেন?

—দিলেও সে তা মানবে কেন? সে তো পাপ করেনি কিছু। কিসের প্রায়শ্চিত্ত? আমিই বা তাকে তা করতে দেব কেন?

ঠিক তখনই দ্বারে কার করধ্বনি হল।

রূপেন্দ্র দ্বার খুলে বাহিরে এলেন। খিদমদগার বললে, রহিম আ गया।

রূপেন্দ্র বেরিয়ে এলেন বাইরে। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল রহিম ওস্তাগর। রূপেন্দ্র এগিয়ে এসে তার হাতটা তুলে নিলেন। বললেন, রহিম। ঐ ঘরে শিউলী আছে। সে জানে না তোমার আসার কথা। সে তোমার প্রত্যাশাতে নেই। যাও। আর শোন। তুমি রাতটা এখানেই থাকবে। দুজনের খাবার ওরা দিয়ে যাবে।

—সেকি! আপনি? আপনি কোথায় থাকবেন?

—আমি মাহেশ ফিরে যাচ্ছি। কাল সকালে এসে শুনব তোমরা কোন সিদ্ধান্তে এলে। আমার মনে হয় মেরীমাতা তোমাদের দুঃখ বুঝবেন।

রূপেন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন অস্থাবাসের দিকে। রহিম অবাক বিস্ময়ে স্টেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আজব মানুষ ঐ কবিরাজ! বাঁকের মুখে রূপেন্দ্র মিজিয়ে যেতে সে অতিথিশালার দিকে ফিরল।

উন্মুক্ত দ্বারপথে দেখতে পেল সেখানে অনিবার্ণ শিখায় একটা প্রদীপ জ্বলছে।



পাখির পালকের মতো হালকা মন দিয়ে রূপেন্দ্রনাথ ফরাসভাঙা থেকে অশ্বারোহণে প্রত্যাবর্তন করলেন মাহেশে। রাত তখন প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত। পথ জনমানবহীন। এ সকল স্থানে সন্ধ্যা সমাগমের পরেই ঘনিয়ে আসে নৈঃশব্দ্য। প্রথম প্রহরের শিবাবধনিও হয়ে গেছে। রূপেন্দ্র তাঁর ব্রত নির্বিয়ে উদ্‌যাপন করেছেন:

“যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাব না!”

চরক তাঁর প্রথম অধ্যায়ের নবম সূত্রেই নির্দেশ দিয়েছেন,

“মৈত্রী কারুণ্যমার্ভেষু শক্যে প্রীতিরূপেক্ষণং
প্রকৃতিস্থেষু ভূতেষু বৈদ্যবশিষ্ঠচতুর্বিধাঃ॥”

—যে আর্ত, যে ব্যাধিগ্রস্ত, তাকে করুণা করতে হবে, তার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিন্তু সে হবে বন্ধুর মতো—এভাবেই বৈদ্য আরোগ্য-বিষয়ে তার আস্থা, তার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারেন। তাই এনেছেন ভেষগ্যাচাৰ্য! রাধারানীর সঙ্গে বন্ধুত্বের, শুধু পরমমিত্রের নয়, নাগরের মতো ব্যবহার করে তাকে আশ্বস্ত করেছেন। অথচ “দাক্ষং সৌচম্ ইতি জ্যেয়ং বৈদ্যাণ্ড চতুষ্টয়ম্”—নির্দেশও অতিক্রম করেননি। বৈদ্য তাঁর অন্তরের শুচিতা, আত্মপবিত্রতা সর্বদা রক্ষা করবেন। রাধারানীর রোগনির্ণয় তিনি ঠিকই করেছিলেন—“বিপ্রকৃষ্ট-রৌদ্রভৈরবাদ্ভূতবিষ্ট বীভৎস বিকৃতাদিক্রপদর্শনং মিথ্যায়োগঃ”—তার অন্তরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু ঘটনাচক্রে নরনারীর মধুর দৈহিক মিলনের কিছু “উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত এবং অতিশয় ঘৃণাজনক বিকৃতি মিথ্যাক্রপ” তার সামনে বারে বারে মেলে ধরা হয়েছিল। তিনি নিজেই তাকে স্বাভাবিকতার মালভূমে উন্নত করতে পারতেন; কিন্তু মঞ্জুর অজ্ঞানে সে কাজ করতে তাঁর কেমন যেন স্কেচ হচ্ছিল। তাঁর মতে স্বামীস্ত্রীর সমান দায়—একমুখীন পবিত্রতা রক্ষায়! পরম করুণাময়ের কৃপায় সুসময়ে সে দায়িত্ব রামানন্দ দত্তকে অর্পণ করে আসতে পেরেছেন। ঔষধ ও পথ্যের বিধান দিয়েছেন, সেটা সেবন করাবে ঐ রহিম ওস্তাগর মঞ্জুকে কি খুলে বলবেন সব কথা?

চরক ঋষির স্পষ্ট নিষেধ আছে: “নান্যং রহস্যমাগময়েৎ।”

‘আর্তের গোপন কথা কদাচ তৃতীয় ব্যক্তিকে জানাবে না।’ হোক সে তোমার নিকটতম বন্ধু অথবা ধর্মসঙ্গিনী। মঞ্জুকে সে কথা জানানোর অধিকার তাঁর নাই। শুধু চরকের নির্দেশ নয়, তাঁর বিবেকেরও তাই নির্দেশ!

অন্দর-মহলে পদার্পণমাত্র ছুটে এল তুলসী। মাথা থেকে উষ্ণীষটি খুলে নিয়ে বললে, স্নান! রাজপুত্রের মুখটি শুকিয়ে গেছে!

রূপেন্দ্র বলেন, যাবে না? সারাদিন কতটা অশ্বারোহণ করেছি তা তুমি জানবে?

তোমাদের ঐ ঘোড়াটাকে জিজ্ঞেস কর।

তুলসী বললে, লিঙ্গে ভুল হল জামাইবাবু! ওটা ঘোড়া নয়, ঘোটকী।

—তা হবে। আমি খেয়াল করিনি।

প্রগলভা শ্যালিকা একটা দ্ব্যর্থবোধক রসিকতা করল, সেটাই তো আমাদের মনোবেদনার হেতু, জামাইবাবু! কার পিঠে কখন চাপছেন তাও আপনাদের নজর হয় না!

ফুলপিসি এগিয়ে আসেন। বলেন, ওঁকে আর বিরক্ত করিস না তো। জিরুতে দে! হ্যাঁ বাবা, ছান করবে নাকি? এত রাত্রে গা ধুলে ঠাণ্ডা লাগবে না তো?

রূপেন্দ্র জানালেন তা সত্ত্বেও সারাদিনের এই ধূলিধূসরিত দেহটা পরিমার্জনা না করলে তার তৃপ্তি হবে না। তুলসী বললে, একটু গরম জল করে দিই বরং।

রাত্রে অনিবার্যভাবে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হল, রাধাদি কী বলল?

—তোমাকে না নিয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হল। উপায় কী? তবে দলের সঙ্গে আবার তো ত্রিবেণীঘাটে দেখা হবে।

রাধারানীর সঙ্গে তখন যে দেখা না-ও হতে পারে এ প্রসঙ্গটা উঠা রইল। সেটা চাপাই পড়ে গেল মঞ্জুর পরবর্তী যোজনায়। বললে, তোমার সঙ্গে হবে। আমার সঙ্গে হবে না।

—কেন? দোলপূর্ণিমার পর আমরা তো সেখানেই যাব।

—না গো। এত হাঁটতে আমার কষ্ট হয়। তুমি একাই তীর্থদর্শন করতে থাক। আমি মাস-ছয়েক এখানেই থাকব।

—হয় মাস! কেন? কী হল তোমার?

—বললাম তো এখনি—অত হাঁটতে আমার কষ্ট হয়। সেটা উচিতও নয়।

এজন্যই বোধহয় চরকের নির্দেশ—অতি প্রিয়জনের চিকিৎসা নিজে করতে নেই।

রূপেন্দ্র ওর রোগনির্যয় করতে পারলেন না। বললেন, বেশ তো, কিছুদিন না হয় বিশ্রাম নাও; আমি ভাগীরথীর দুই পারে তীর্থদর্শন সেরে আসি। কিন্তু সে তো পক্ষকালের ব্যাপার। ছয় মাস তোমাকে থাকতে হবে কেন?

মঞ্জু কী একটা কথা বলতে গেল। পারল না। এতবড় সংবাদটা কীভাবে জানাবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। নিজে সে নিঃসন্দেহ। আকৈশোরের একটা জৈবিক চক্রবর্তনই যে শুধু বন্ধ হয়েছে তাই নয়, আরও কিছু লক্ষণ নজরে পড়েছে তার। ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা। আশা করেছিল ভেষগাচার্য নিজেই তা বুঝে ফেলবেন। মুখ ফুটে তাঁকে কিছু বলতে হবে না। কিন্তু তিনি নজরই করতে পারছেন না।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, বেশ তো। অন্যান্য তীর্থে না যাও, ত্রিবেণীতে ছোঁ যাবে গুরুদেবকে প্রণাম করতে?

মঞ্জুর মুখটা রক্তবর্ণ ধারণ করে। নত নেত্রে সে নিশ্চুপ বসে থাকে।

—কী হল জবাব দাও? যাবে না?

—যাব। এখন নয়। পরে!

—হয় মাস পরে?

ইতিবাচক গ্রীবা সঞ্চালন করে নীরবে।

মাহেশ

—তোমার কী হয়েছে বল তো? দুজনে যাব, এমন কথাই তো ছিল?

—তা ছিল। এখন ভাবছি—দুজনে নয়, তিনজনে একসঙ্গে যাব!

—তিনজনে! তৃতীয় জন আমি কোথায় পাব?

মঞ্জু দু-হাতে মুখটা ঢেকে বললে, আমার কাছে!

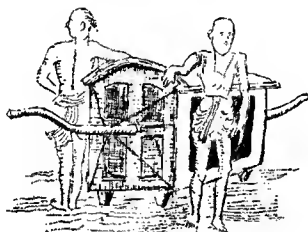
—তোমার কাছে?

—হ্যাঁ! আত্মদীপ!

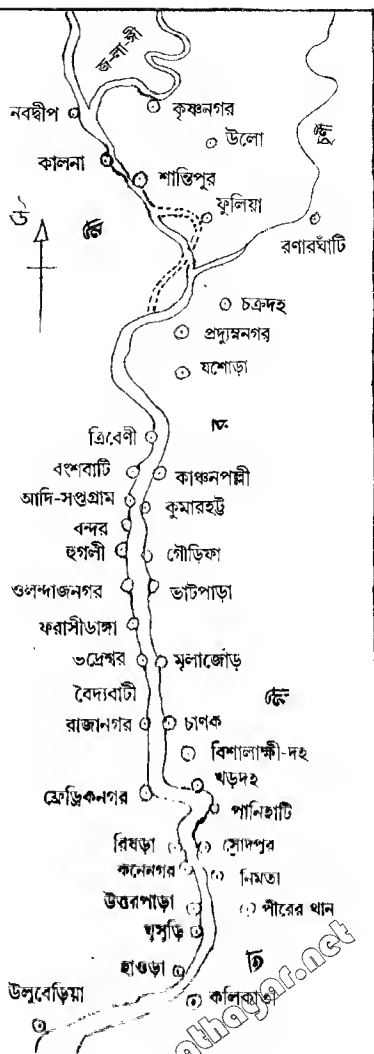
এর পরেও বুঝবেন না এতবড় মূর্খ নন! রীতিমতো চমকে ওঠেন। দুহাতে ওকে আকর্ষণ করে বলেন, সত্যি? তুমি নিশ্চিত?

ওঁর বুকে মুখ লুকিয়ে মঞ্জু কোনক্রমে শুধু বলতে পারে—হুঁ!

চুমায় চুমায় মঞ্জুর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম।



ভৌগোলিক নাম	
প্রাচীন	আধুনিক
ওলন্দাজনগর	চুড়া
কনেনগর	কোন্নগর
কাঞ্চনপল্লী	কাঁচড়াপাড়া
কুমারহট্ট	হালিশহর
গৌড়িকা	নৈহাটি
ঘুসুড়ি	বালী
চক্রদহ	চাকদহ
চাণক	ব্যারাকপুর
নিমতা	বেলঘড়িয়া
পীরের-থান	আগড়পাড়া
প্রদ্যুম্ননগর	পালপাড়া
ফরাসীডাঙ্গা	চন্দননগর
হেড্রিকনগর	শ্রীরামপুর
বন্দর	ব্যাণ্ডেল
বিশালাক্ষী	টিটাগর
ভাটপাড়া	কাঁকিনাড়া
মূলাজোড়	শ্যামনগর
যশোড়া	শিমুরালী
রাজানগর	শ্যাওড়াফুলি



ভাগীরথী

ভাগীরথী যে যে রাজ্য ধন্য করত তাদের নাম কুরু (দিল্লী), পাঞ্চাল (উত্তর প্রদেশ), কোশল (এলাহাবাদ অঞ্চল), মগধ (বিহার) অতিক্রম করে ব্রহ্মোত্তর (উত্তর-রাঢ়), বঙ্গ এবং সুফ (তাজলিগু) দিয়ে সগরমুনির আশ্রম। সপ্তদশ শতকে জাহানাবাদের কাছাকাছি গঙ্গার ধারা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একটি স্রোত বাঁকা-দামোদরের জলধারা আশ্রয়ী আর একটি ছিল সুন্দ-অভিমুখী। কবি ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যপাঠে সে রকম মনে হয়। অপরপক্ষে বিপ্রদাস পিপলাই-য়ের মনসামঙ্গলে চাঁদ-সওদাগরের যাত্রা-পথে একে একে পড়ছে—অজয় নদ, উজানী, কাটোয়া, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মীর্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কুমারহট্ট, ডাইনে ‘হুগলী’, বামে ভাটপাড়া—তারপর কাকিনাড়া, ‘মূলাজোড়া’, ভদ্রেশ্বর, ‘চাণক’, মাহেশ, খড়দহ, ‘শ্রীপাট’, ‘রিসিড়া’, ‘ঘুমুড়ি’, ‘চিএপুর’, কালীঘাট, পার হয়ে শেষমেশ সমুদ্র-সংগম:

“তাহার মেলান ডিঙা সংগমে প্রবেশ”

তীর্থকার্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে।”

ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামে তিনটি নদীর ‘মুক্তবেণী’র কথা অনেকেই বলেছেন, বিপ্রদাস পিপলাই (1495), কবি ক্ষমানন্দ (1640), ফান্ ডেন্ ব্রোক (1660)। তার ভিতর আজও সরস্বতীর কিছুটা হৃদিস মেলে—ভাগীরথীর কোল ছেড়ে কিছুক্ষণ দক্ষিণদিকে ‘ভেল-মারি কিং-কিং’ বলে একটা চক্র দিয়ে আবার বেতড়ের কাছে নিজের কোটে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু বিপ্রদাসের পঞ্চদশ শতকের ‘অতি বিশাল যমুনা নদী’ বেমালুম না-পাত্তা।

নদীমাতৃক বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এই ভাগীরথীর দুই-কিনার। গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত ‘গংগারিডি’ যথার্থ ‘গঙ্গাহ্রদি’। জননী তাঁর স্তনভাণ্ডারের নির্মল ধারায়, পলিমাটির আশীর্বাদে, নাব্য স্রোতধারায় এ-দেশকে দিয়েছেন পানীয়, খাদ্য, পরিবহনের সুযোগ। তাঁর দুই তীরে গড়ে উঠেছে বঙ্গ-সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র: নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, মূলাজোড়, কালীঘাট।

রূপেন্দ্রনাথ যে সদ্যবিবাহিত সহধর্মিণীর শাঁখাপরা হাতটি ধরে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন তা এই গঙ্গাতীরের অযুতনিযুত মন্দির-প্রাঙ্গণে শুধু ‘পেন্নাম’ করতেই নয়, বঙ্গসংস্কৃতির মূল ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হতে—‘পরশপাথর’ খুঁজতে।

আকৌশোর তিনি যে একটা স্বপ্ন দেখে আসছেন: ধর্মসংস্থাপনার্থ্য ‘তাঁর’ যে আসার কথা। যিনি এসে এই অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দেবেন। তার মোহভঙ্গ করে পথের নির্দেশ দেবেন। এটাই যে ভারত সংস্কৃতির ঐতিহ্য। এককালে যেভাবে সমাজকে ধরে নাড়া দিয়েছিলেন শাক্যসিংহ, আদি শঙ্করাচার্য বা অতি সম্প্রতি চৈতন্যদেব। তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন, হয়তো তিনি লুকিয়ে আছেন এখনো, প্রকট হননি। তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। থাকলে তিনি নিশ্চয় আছেন এই ভাগীরথী-বিশৌত কোমর একটি জনপদে। শাক্যসিংহ ছিলেন রাজ-পরিবারভূক্ত—রানী ভবানী বা কৃষ্ণচন্দ্রও তেঁা তাই। আদি শঙ্করাচার্য বা নিমাই পণ্ডিত সোনার বিনুকে দুষ্কপান করেননি শৈশবে—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বুনো রামনাথও তা করেননি। এদের মধ্যে কে এগিয়ে এসে ত্রৈলোক্য ধরবেন রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্যের হাতখানি—তাঁর স্বপ্ন সফল করে তুলতে?

মহাগরুড় আজ ভগ্নপক্ষ সম্প্রতি মতো ঝুকছে। কিন্তু কেন?

রূপেন্দ্রনাথের বিশ্বাস তার দুটি হেতু—

প্রথম কথা: তার পিঠে জগদল পাথরের বোঝা—যা পিঠে করে সেই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম মহাকাশে উড়তী হতে অশক্ত। সে বোঝা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবহেলিত উপেক্ষিত একদল শক্তিমান মানুষ, যারা অচ্ছৃত, জল-অচল, শূদ্র।

দ্বিতীয় বাধা: বিহঙ্গমের একটি পক্ষ শাতন করেছে ঐ কুপমণ্ডুক টুলো-পাণ্ডিতের দল। নারীসমাজ। তাকে অশিক্ষায়, অবজ্ঞায়, অন্ধকারে, অত্যাচারে জর্জরিত করে। তাকে 'নারকের দ্বার' রূপে চিহ্নিত করে। চৈতন্যদেব আচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন, কিন্তু হতভাগী বিধবাদের পুড়িয়ে মারার কদর্য ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কেউ রুখে দাঁড়াননি। উনি যাচাই করে দেখতে চান, এই ভাগীরথীতীরের দুই কিনারে মহা পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কী ভাবেন। এদের মধ্যে কে এগিয়ে আসবেন এই ব্রত উৎসাপন করতে।

হায়! রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি, সেই মহাপুরুষ তখনো অজাত। তাঁর আবির্ভাব হতে আরও তিন-দশক বাকি।

এস, তোমাদের হাত ধরে রওনা হয়ে পড়ি ঐ 'গঙ্গাহ্রদ'র দুই কিনারের মহাতীর্থের পথে। রূপেন্দ্রনাথ হয়তো সব কয়টি তীর্থে যাননি। তবে আমাদের যেতে বাধা কোথায়? রাজা রামমোহন আসন্ন—কিন্তু বঙ্গ সংস্কৃতির কোন পরিবেশে তিনি লড়াইটা শুরু করেছিলেন জানতে হলে গঙ্গাতীরের ঐ জনপদগুলির তদানীন্তন স্বরূপটুকু আমাদের চিনে নিতে হবে। সব তীর্থে হয়তো আমরাও যেতে পারব না, তবে ঐ যে কথা বলেছিল রাধা-বোষ্টমী—'হাড়ির ভাত সিদ্ধ হয়েছে কিনা বুঝে নিতে কয়েকটি তণ্ডুলকণা পরীক্ষা করাই যথেষ্ট' সেটাই আপাতত মেনে নেওয়া যাক।

সে আমলের 'দিন আনি দিন খাই'-দের কথা, মাঠে মাঠে যারা লাঙ্গল দিত, ফসল তুলতো, কুমোরের চাকা ঘোরাতে, তাঁত চালাতে, মাছ ধরতে, নৌকা বাইতে—তাদের কথা কেউ বলেনি, কেউ লিখে যায়নি। তাদের ছায়া মাড়ানোও যে পাপ। অন্দাজে কল্পনাআশ্রয় ছবি ঐকে তোমাদের উপহার দিতে সাহস হয় না—'সৌখিন-মজদুরি' করতে গিয়ে যদি তুল ছবি আঁকি? তাই হয়তো সেই হতভাগাগুলোর কথা আমারও বলা হল না।

নবদ্বীপ থেকে আমরা সাগরদ্বীপের দিকে যাব, ভাগীরথীর স্রোতরেখা ধরে। দু-পাশের জনপদগুলি দেখতে দেখতে—ঐ 'মারহাট্টা-ভিচ্'-তক্। তার ওপারে শহর কলকাতা। সেটা পরে দেখা যাবে, সুযোগ হলে রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে না হয় নাই হল।

নবদ্বীপ ও গোয়াড়ীকৃষ্ণনগরকে আগেই দেখা শেষ হয়েছে। আমরা বরং যাত্রা শুরু করি শান্তিপুর থেকে—

শান্তিদূর



ভাগীরথীর পূর্ব-পারে এই গ্রামটি অতি প্রাচীন—প্রায় হাজার বছর আগেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদের একটি শ্রীপাট। 'শান্ত' নামের জনৈক মুনি এখানে বাস করতেন কি না

শান্তিপুৰ

তার কোন হক-হদিস নেই। তোমরা বলতে পার : তাহলে ‘শান্তিপুৰ’ নামটা হ'ল কী করে ?

আমি প্রতিপ্রশ্ন করব—ঐ রবিবাউল তাঁর ‘শ্রীপাটে’র নাম ‘শান্তিনিকেতন’ রেখেছিলেন কেন গো ?

অদ্বৈত আচার্যের (জন্ম : 1434) আমল থেকে শান্তিপুৰের খ্যাতি। শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন কুবের আচার্য। তাঁরই পুত্র কমলাক্ষ—মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়সে এসে ভর্তি হলেন শান্তিপুৰের অন্তঃপাতী পূর্ণবাটী গ্রামের শান্ত বেদান্তবাগীশের গুরুকূলে। তাঁর কাছেই বেদচতুষ্টয় আয়ত্ত করে হলেন ‘বেদ-পঞ্চানন’। দীক্ষা গ্রহণ করলেন মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে। উপাধী লাভ করে কমলাক্ষ হলেন অদ্বৈতাচার্য। দীর্ঘজীবী তিনি—অনুমান একশ পঁচিশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। চৈতন্যদেবের জন্মসময়ে তিনি পঞ্চাশোৰ্ধ। অদ্বৈতাচার্য নাকি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় সেই 1486-খ্রীষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমারাত্রে অনুভব করেন যে, নিমাই জন্মগ্রহণ করেছেন আপামর জনসাধারণকে ত্রাণ করতে। তিনিই প্রথম বৈদিক মন্ত্র সহযোগে সচন্দন তুলসীপত্র সমেত নিমাই পণ্ডিতকে ভগবানরূপে প্রণাম করেন—স্বীকৃতি দেন। পুরীর রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে তিনি শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা করেন। শান্তিপুৰের ‘মদনগোপাল’ মূর্তির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। লোকাচার অপেক্ষা ভক্তিবাদে বিশ্বাসী। তাঁর পুত্র অচ্যুতানন্দ বাল্যকাল থেকেই মহাপ্রভুর সঙ্গী, পরে ভক্ত। আচার্য অদ্বৈতের জীবনী পাওয়া যাবে ‘অদ্বৈতপ্রকাশ’ গ্রন্থে—রচনা ঈশান নাগর; শৈশব থেকেই তিনি অদ্বৈতাচার্যের গৃহে প্রতিপালিত। ইনি লাউরিয়া কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত।

অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত ‘মদনমোহন’ মন্দিরের সন্ধান পাইনি; কিন্তু শান্তিপুৰে অন্তত তিনটি প্রাচীন মন্দির এখনো দেখতে পাওয়া যায়। শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ এবং জলেশ্বর মন্দির। শ্যামচাঁদের বিশাল মন্দিরটি নির্মাণ করেন স্থানীয় তন্তুবায়বংশজাত রামগোপাল ঋা চৌধুরী। নির্মাণ সমাপ্ত হয় 1726 খ্রীষ্টাব্দে—অন্য দুই লক্ষ তঙ্কা ব্যয়ে। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় স্বয়ং নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। মন্দির-প্রবেশের জন্য পাশাপাশি তিনটি অশ্বখুরাকৃতি খিলান—ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর। দুটি কালবুদের মধ্যবর্তী অংশে (স্প্যান্ডিল অংশে) যে নকশা তাও মুগলরীতির—প্রতিটি খিলানে এক জোড়া পদ্ম-নকশা ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

গোকুলচাঁদের মন্দিরটি আমাদের কাহিনীর কালে সদ্যসমাপ্ত—প্রতিষ্ঠা : 1740 খ্রীষ্টাব্দে।

জলেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করেন নদীয়া-মহারাজ রামকৃষ্ণের জননী প্রায় সমকালেই। এ মন্দিরে পোড়ামাটির নকশায় যে কারুকার্য তা ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দিরের অলঙ্করণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে!

শান্তিপুৰে পরবর্তী যুগে যীরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নামও এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে যাই। শ্রীরাম গোস্বামী, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি এবং রামনাথ তর্কবট্ট—উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন আশানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর একটি স্মৃতিস্তম্ভ হালে—1932 সালে—নির্মিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অসাধারণ বীর ও ক্ষমতাসালী। এক রাতে মুখুজ্জেশ্বরের কোন ধনী গৃহস্থের বাটীতে অতিথিরূপে বাস করছিলেন। স্থানীয় ডাকাতদলের দুর্ভাগ্য, তারা সেই রাতেই ঐ বাড়িতে ডাকাতি করতে আসে। আশানন্দ নিদ্রাভঙ্গ হয়ে মুশকিলে

পড়লেন—তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। অপরপক্ষে ডাকাতদলের হাতে নানান মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। টেকিশালে ছিল একটি প্রকাণ্ড টেকি। উপড়ে নিয়ে তিনি ডাকাত দলের সঙ্গে একলাই সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কয়জন ডাকাত হতাহত হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু তরোয়াল বা বল্লমের ধার যে টেকির ভারের কাছে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল এ তথ্যটা স্বীকৃত। রবি-বাউলের পুরাতন ভৃত্যটি নাকি ছিল ‘বুদ্ধির টেকি’; আশানন্দ হয়ে গেলেন: ‘শক্তির টেকি’।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়িও শান্তিপুরে।

শান্তিপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাঘ-আঁচড়ায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত বাগদেবীর মন্দিরটি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন, তার চেয়েও করুণ অবস্থা ব্রহ্মশাসন গ্রামে চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত অতিবৃহৎ মন্দির: চাঁদরায়ের শিবমন্দির। তাতেও ছিল অপূর্ব পোড়ামাটির কাজ।



ফুলিয়া

সংলগ্ন মানচিত্র দেখে তোমরা হয় তো ভাববে যে, আমি ভাগীরথীর তীর ছেড়ে তোমাদের নিয়ে চলেছি দক্ষিণপূর্ব দিকে। বাস্তবে তা নয়। যে আমলের গল্প তখন ভাগীরথী ঐ ফুলিয়ার কিনার ঘেঁষেই বইত।

আদি কবি নিজেই যে লিখে গেছেন তাঁর গ্রামের পরিচয়:

“গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।

দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।”

কাকতালীয় ঘটনা যদি বল তবে তাই সই। জন্ম: 1440 খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতীপুজার দিনে, মাঘী শুক্লা ত্রীপক্ষমীতে। পিতার নাম বনমালী ওঝা, মায়ের নাম মালিনীদেবী। ‘ওঝা’ নবাবী খেতাব। আসলে ওঁরা মুখুটি ব্রাহ্মণ। গুরুগৃহে শিক্ষা শেষ করে কৃতিবাস রাজপণ্ডিত হওয়ার মনোবাসনা সমেত রওনা দিলেন গৌড়েশ্বরের সভায়। কেউ বলেন, গৌড়েশ্বর নন, বাস্তবে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, কেউ বলেন রাজা গণেশ। মোট কথা, স্বরচিত পাঁচটি শ্লোক তিনি শুনিয়েছিলেন সেই রাজার দরবারে। রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, আমি তৃপ্ত। বলুন, কী পুরস্কার দেব?

এই তো মুশকিল এসব আধ-পাগলা কবিগুলোকে নিয়ে। যায় রাজকবি হওয়ার বাসনা নিয়ে, বেমক্কা চেয়ে বসে: রাজকণ্ঠের মার্লা! তাও সোনার নয়, ফুলের।

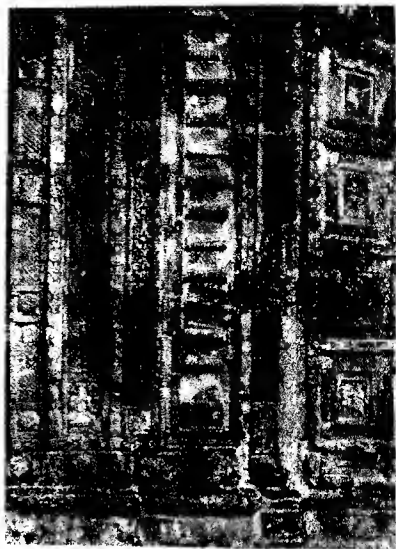
কৃতিবাস তা চাননি। পরিতৃপ্ত ভূস্বামীকে জানালেন তাঁর মনোবাসনা। বান্দীকি রামায়ণ তো দেশের সাধারণ লোক পড়তে পারে না, তাই সাদা বাঙলায় উনি সারা জীবনভর একটি ‘ভাষা-রামায়ণ’ রচনা করতে ইচ্ছুক।

রাজা বললেন, তথাস্ত। আপনার মাসোহারা বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে। লিখুন, যা মন চায়।

বাঙলা ভাষায় রামায়ণ-রচনা যে একটা অবাস্তব প্রস্তাব সে-কথা আর ঐ পাগলটাকে স্পষ্টাঙ্করে জানালেন না।

যুগলিয়া

জলেশ্বর মন্দির,
ফুলিয়া



কুন্ডিবাস স্তম্ভ,
ফুলিয়া

সারাজীবনে বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস রচনা করলেন তাঁর 'ভাষা রামায়ণ'।

না, বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নয়। অন্যান্য পুরাণ, ভাগবৎ থেকে কাহিনী চয়ন করে তিনি রচনা করলেন 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'। অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন—বাল্মীকির কী গরজ দশভূজা দুর্গার মহিমা প্রচারে? অথচ বাংলার জলহাওয়ায় মানুষ ঐ ওঝা পণ্ডিত কি দুর্গাপূজাকে বাদ দিতে পারেন? হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ-হরণও এক সংযোজন, যেমন মহীরাবণ বধ। সবচেয়ে সুন্দর সংযোজন লবকুশের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ ও পরাজয়। হয়তো এতে কবি কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যের প্রভাব পড়েছে; কিন্তু কাব্য হিসাবে ঐখানটা যে কী পরিমাণে উৎরেছে তা তোমরা বুঝবে না, দিদিবাই! দাদু-দিদাদের জিজ্ঞেস কর—তাঁরা দেখেছেন শিশির ভাদুড়ীর ঐ অংশের অভিনয়। বুঝিয়ে বলে দেবেন তোমাদের।

স্মৃতিস্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেন স্যার আশুতোষ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে।

বেলিং দিয়ে ঘেরা একটা চতুষ্কোণ মঠ-প্রতীক, উর্বাংশ সমচতুষ্কোণ শঙ্কু আকারের। মর্মরফলকে উৎকীর্ণ করা আছে:

“মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব—১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ, মাঘমাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবার
হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গলার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্তে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্রমে প্রণম।

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইল।

২৭ শে চৈত্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।”

সৌভাগ্য আমার—চাকরির প্রথম পর্যায়ে ফুলিয়াতে বদলী হয়েছিলাম। বারে বারে ঐ স্মৃতিস্তম্ভটির সামনে নতমস্তকে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছি। পাশেই 'কৃত্তিবাস কূপ', অনতিদূরে 'কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়'। এসব তো মানুষের কীর্তি। প্রকৃতিও ঐ সঙ্গে যোগ করেছে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য: একটি অতি বিশাল বটবৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অলংভেদী মহিমায় দণ্ডায়মান।

যেন প্রকৃতি-রোদ্য কৃত্তিবাস-বালজাকের মূর্তি গড়েছেন!

কৃত্তিবাসের জন্মভিটার অনতিদূরে যবন হরিদাসের 'গোফা'।

মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে 'হরিদাস' নামের কিছু বাড়াবাড়ি। বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, তার উপর আবার এই যবন হরিদাস। ঐর আদি নাম ব্রহ্ম ঠাকুর। হরির ভক্ত ছিলেন বলে নাম হয় 'হরিদাস'। কেউ বলেন ইনি মুসলমান পিতার সন্তান, আবার কেউ বলেন, তা নয়—আসলে বাল্যকালে তিনি এক সহৃদয় মুসলমানের গৃহে পালিত হয়েছিলেন। ঐর অসাধারণ হরিভক্তির কথা শুনে কাজী ক্ষেপে যান। মুসলমান হয়ে এ কী ধাষ্ট্যমো! দিবারাত্রী শুধু—হরিবোল? হরিবোল?

ফুলিয়া

গ্রেপ্তার হলেন যবন হরিদাস। মুসলমান ফৌজদার আর কাজী মিলে ফতোয়া জারী কবলেন ওদের এলাকায় বাইশটি হাটে বন্দীকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; আর হাটে-বাজারে লোক যখন জমজমাট, তখন বন্দীকে বেত্রাঘাত করা হবে। যাতে ভবিষ্যতে কোনও মুসলমান এ জাতীয় ‘পাপ কাজ’ না করে।



যবন-হরিদাস প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, ‘হরিদাস-গোফা’, ফুলিয়া

যবন হরিদাস বাইবেল পড়েছেন বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু প্রতিবার তিনি বাইবেল থেকে নির্ভুল উদ্ধৃতি শুনিতে গেলেন: প্রভু! এরা জানে না, এরা কী অন্যায় করছে। তুমি ওদের ক্ষমা কর। হরিবোল! হরিবোল!

অবশ্য তথ্যটা আমরা পাই ছন্দবদ্ধ পদে:

“এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।

মোরে দ্রোহে নহ এ সবার অপরাধ।”

বাইশ-বাজারে যবন হরিদাসকে দণ্ডভোগ করতে হয়নি, এটাই রক্ষে। দু-চার হাট পার করেই কোতোয়াল এসে জানিয়ে গেল শাস্তিদানের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? কাজী আর সুবেদারকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বলছে ‘জোড়া-পায়ণ্ড’; আর হরিদাস হয়ে উঠছেন সবার প্রণমা! শহীদ! অবতার!

বন্ধ হল অত্যাচার। বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল। ফিরে এলেন নিজের গোফায়। প্রতিষ্ঠা করলেন ছোট এক সারি বিগ্রহ—বলরাম, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা। অপূর্ব!

রানাঘাট



গঙ্গার এক উপনদী চূর্ণীর কিনারে আর একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। সেখানে ছিল অনেক আগেকার কালে অবশ্য—এক দস্যু সর্দার। তার নাম রণা-ডাকাতি। তার প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালীর ‘থানে’ নাকি সেকালে নরবলি হত। সেই ‘রণার ঘাট’ থেকে পরে জনপদটার নাম হয় : রানাঘাট।

এসব অবশ্য গালগল্প। শহরের ক্রোশ দুই দূরে চূর্ণীনদীর দুইতীরে ছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দুটি নদীনিবাস—হরধাম-আনন্দধাম। কে জানে যমুনার দুই পারে কৃষ্ণতাজ ও শুভ্রতাজ গড়ার শাহজাহানী খোয়াবে সে দুটি নির্মিত হয়েছিল কিনা। তার ধ্বংসস্তুপের কাছাকাছি আছে নদীয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত : চিন্ময়ী কালী।

রানাঘাট হচ্ছে বিখ্যাত জমিদার বংশ পালচৌধুরীদের আদি-নিবাস। আলোচ্য শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণকান্তি পাল। তাঁর নামটা স্মরণ করছি একটি বিশেষ হেতুতে। পলাশী যুদ্ধের পরে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ‘রাজা’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতে চান। স্বদেশিকতার প্রভাবে অনেকেই পরবর্তীকালে ইংরাজের দেওয়া খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। যতদূর জানি, কৃষ্ণকান্তি মহাশয়ই বোধহয় সেই জাত্যাভিমানীদের প্রথমসূরী। তিনি বিদেশী বেনিয়াদের দেওয়া সেই খেতাবটি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। সে-সংবাদে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—ই্যা, ততদিনে তিনি নিজে আর ‘রাজা’ নন, ‘মহারাজা’—ওঁকে ‘পাল-চৌধুরী’ উপাধি প্রদান করেন। সেই অবধি ওঁরা ‘পালচৌধুরী’।

রানাঘাটের সাড়ে-চার ক্রোশ দূরে ‘দেগাঁর টিবি’ একটি প্রাচীন জনপদ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেগাঁর দে-পাল রাজার উল্লেখ আছে; তিনি ছিলেন কুস্তকার শ্রেণীর এক ভূস্বামী। পরে এই জায়গাটি গভীর জঙ্গলে ঢেকে যায়। এখন অবশ্য বনজঙ্গল সাফা করে জনবসতি হয়েছে। ঝাঁরা নতুন করে বাড়ি বানাতে চান তাঁরা বনিয়াদ খুঁড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে অপরূপ কারুকার্য-করা পোড়ামাটির টালি উদ্ধার করে অবাধ হয়ে যান—এ জিনিস কোথা থেকে এল ?

ঐ দে-পাল বা দেবপালের নামে একটি লোকগাথা আজও শোনা যায়।

একবার স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তার সঙ্গে রাজা দেবপালের মনোমালিন্য হয়। দু-পক্ষই দিল্লীতে বাদশাহের কাছে দরবার করতে যান। যাত্রাসময়ে দেবপাল দুটি সুশিক্ষিত পাল্লার সঙ্গে নিয়ে যান। একটি শুভ্রবর্ণের, একটি কৃষ্ণবর্ণের—তাদের নাম জয় ও বিজয়। স্বীয় মহিষীকে এই নির্দেশ দিয়ে যান যে, যদি তিনি মামলায় জয়লাভ করেন তাহলে শুভ্রবর্ণের ‘জয়’কে আকাশে ছেড়ে দেবেন। সে দ্রুতগতিতে ফিরে এসে রাণীমাঝে শুভবর্তা জ্ঞাপন করবে। আর যদি সংবাদ অশুভ হয় তাহলে তিনি কৃষ্ণবর্ণের ‘বিজয়’কে উন্মুক্ত করে দেবেন।

দেবার টিবি

সে-ক্ষেত্রে স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তার অত্যাচার অনিবার্য হয়ে পড়বে। গঙ্গা বেয়ে রাজামশায়ের প্রত্যাবর্তনের জন্য দু-তিন মাস সময় লাগবে। প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান শাসনকর্তা সেই সুযোগে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। রানী সব শুনে বলেছিলেন, আপনি চিন্তা করবেন না, সে-ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য আমি যথাকর্তব্য করব।

কাহিনীটি করুণ। দিল্লীর বাদশাহ্ দেবপালের অনুকূলেই রায় দিলেন। মহারাজ মামলা জিতে তাঁর দিল্লীস্থ শিবিরে ফিরে এসে জয়কে বন্ধনমুক্ত করতে গিয়ে দেখেন যে, পিঞ্জরে দ্বিতীয় পারাবতটি অনুপস্থিত। তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারলেন, তাঁর একান্ত সহচর তথা দেহরক্ষীটিও পলাতক।

মুসলমান শাসনকর্তার পক্ষে মামলা পরিচালিত করতে যে লোকটি দিল্লী গিয়েছিল সে ছিল খলিফা। দেবপালের দেহরক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত করে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে।

দেবপাল তাঁর শুভবর্ণের পারাবতটিকে তৎক্ষণাৎ আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

জয় ও বিজয় দুজনেই অত্যন্ত দ্রুতগতি সংবাদবহ। সমান ব্যবধানে তারা একের পর এক এসে উপস্থিত হল রণার ঘাঁটির উপকণ্ঠে সেই দেগাঁর টিবিতে। কালীক ব্যবধান তিনদণ্ডের। আড়াই শ যোজন, অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার মাইল পথ উড়ে এসে শুভবর্ণের জয় দেখল রাজপ্রসাদ শোকে আচ্ছন্ন। প্রায় অর্ধদণ্ড পূর্বে রাজমহিষীর মৃতদেহ অস্তঃপুরস্থ পুষ্করিণী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে দেহ এখনো সংকার করা হয়নি। নিদারুণ শোকে প্রাসাদে সকলেই নিমজ্জমান। শুধু কার্নিশে নিঃশ্বাস বসে আছে তার সঙ্গী, বিজয়। ক্লান্ততনু, বিষন্ন, বকবকম্ করতেও ভুলে গেছে। সে যেন বুঝে উঠতে পারছে না: এত জোরে উড়ে এসেও সে কেন মালকিনকে খুশি করতে পারেনি!

দেবপাল দুইমাস পরে নৌকাযোগে ফিরে এলেন প্রাসাদে। নিদারুণ সংবাদে তিনিও আত্মঘাতী হলেন। মুসলমান শাসনকর্তা এবার নির্বিবাদে দখল করে নিল রাজপ্রাসাদ।

কাহিনীতে শুধু দুটি তথ্য অনুল্ল। দেবপালের সেই দেহরক্ষীকেই কি বিজয়দর্পী মুসলমান পরস্বাপহারক ঐ রাজার সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল? এবং সেই লোকটাই কি ছিল মীরজাফর আলী খাঁর গুরু-মুর্শেদ?

দেগাঁর টিবির অনতিদূরে চৌবেড়িয়া গাঁয়ের নাম শুনেছ? সেই গাঁয়ের এক দুরন্ত দামাল ছেলে কী-একটা নাটক বৃষ্টি লিখেছিল, যার ইংরেজী অনুবাদ করে যশোরের সাগরদাড়ি গাঁয়ের সেই জাত-খোয়ানো কবিটা, আর তার প্রায়শ্চিত্ত করতে 'লঙ-এর হল কারাগার'!

এই চৌবেড়িয়া গাঁয়ের মাঝখানে ছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ—তার চারিদিকেই যমুনা নদীর পরিখা, তাই তার নাম 'চতুর্বেষ্টিত দুর্গ'। সেই দুর্গের দুর্গাধিপ ছিলেন কালীনাথ রায়। পাঠান-বিজয়ে মোগল-বাহিনীকে সাহায্য করায় যিনি সম্রাট আকবরের কাছ থেকে 'সমরসিংহ' উপাধি লাভ করেন। এত কথা বলছি, কারণ 'নীলদর্পণের' মতো এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গের সঙ্গেও বাংলাসাহিত্যের একটি অচ্ছেদ্যবন্ধন ঘটেছিল পরবর্তী জমানায়। এই দুর্গটিই রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক কাহিনীর পটভূমি: 'বঙ্গবিজেতা'।

দুর্গটি বর্তমানে সম্পূর্ণ নদীগর্ভে। উপন্যাসটি কিন্তু সর্বোত্তম টিকে আছে বিভিন্ন বঙ্গসাহিত্য-প্রেমিকের সঞ্চয়ে।

চক্রদহ



চারকোশ দক্ষিণে চক্রদহ।

আদি নাম: চক্রদ্বীপ; অন্তিম নাম: চাকদা।

এমন নাম কেন হল গো? বলি শোন:

ভগীরথ রথে চেপে শঙ্খধ্বনি করতে করতে এগিয়ে আসছেন গোমুখ থেকে কপিল মুনির আশ্রমে। তাঁর পিছন পিছন আসছেন 'মা গঙ্গা'। রওনা হয়েছিলেন অক্ষয় তৃতীয়ায়; কিন্তু পথ বড় কম নয়! রাজমহল, গোড়, কর্ণসুবর্ণ অতিক্রম করে, কাটোয়া-নবদ্বীপ পার হতে হতেই নামল বর্ষা। এখানে প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে তাঁর রথের চাকা আটকে গেল কাদার দহে। ইতিমধ্যে পশ্চাদগামী গঙ্গাও এসে উপস্থিত। ফলে আদিগন্ত জল-থৈ-থৈ! ভগীরথ হতোদ্যম হবার মানুষ নন। টেনে তুললেন রথ ও রথাস্ব। তবে এখানটায় হয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড 'দহ', ঘূর্ণী। তারই নাম চক্রদহ। যে ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে রথটাকে টেনে তুলেছিলেন তার নাম চক্রদ্বীপ।

তোমরা হয়তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না; কিন্তু সে-আমলের লোকে তা অন্তর থেকে বিশ্বাস করত। এখন হয়তো চাকদার মানুষ—ঐ যারা ওপার-বাঙলা থেকে এসে নয়া-বসন্ত গড়ে তুলেছে—তারা জানেই না—তিন চারশ বছর পূর্বে চক্রদহ ছিল এক মহাতীর্থ। ঐ যেমন আজ মায়াপুরের রব্রবা! চাকদহ থেকে বনগ্রাম হয়ে শহর চণ্ডীকান (যশোহর) পর্যন্ত ছিল বাদশাহী পাকা সড়ক। চাকদহে খুঁজলে আজও দেখতে পাবে গঙ্গার মরা-খাত। অবশ্য বিগত বিশ ত্রিশ বছরে সেই মরা খাতের বুকে শালবল্লার পিন্ধু পুঁতে বৃন্তচ্যুত মানুষগুলো নতুন বসতি গড়ে তুলেছে। আহা, তারা সুখে থাকুক। কিন্তু ঐ মরা খাতে ভিত খুঁড়তে গিয়ে যদি শিশুর কঙ্কাল খুঁজে পাও তাহলে ঘাবড়ে যেও না। অমঙ্গলের কিছু নয়। ওগুলি শুভ প্রতীক। ঐ কচি কচি হাড়গুলো অক্ষয় স্বর্গলাভকারীর কিছু পার্থিব অবশেষ মাত্র। স্থানীয় পুণ্যকামীরা তো বটেই এমনকি যশোর-ঝুলনা থেকেও ঐ সড়ক ধরে আসত পুণ্যকামীরা—যাদের গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রা করার সঙ্গতি নেই। ঐ চক্রতীর্থের পূতসলিলে শিশু সন্তানকে নিক্ষেপ করে মহাপুণ্য অর্জন করত তারা। কোন কোন হতভাগিনী 'দিবি না ফিরায়ে?' বলে শিউরে উঠত কি না, ঠিক জানি না। সে-কথা আর কে লিখবে বল? রবি-বাউলের ঠাকুর্দাই যে তখনো জন্মাননি!

পুরাণ-টুরান তোমরা বিশ্বাস করতে চাও না—ইতিহাসকে তো মানবে? তাতেও চক্রদহের মহিমার হদিস পাবে। এখানেই মহারাজ মানসিংহ তাঁর বিরাট মুগল বাহিনী নিয়ে আটকে পড়েছিলেন বর্ষার প্রকোপে। সে কিস্সা আগেই শুনিয়েছি ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গে।

এন-এইচ থার্টিফোর ধরে ঐ বিপদজনক এলাকাটা পাড়ি দেবার বাসনা যদি চাগে, তাহলে দেখে নিও বাপু, গাড়িতে বাড়তি স্টেপ্লিন আর জ্যাক আছে কি মশা।

আধকোশ দক্ষিণে পালপাড়া। সে-কালের প্রদ্যুম্ননগর।

এখন তো ইস্টিশনও হয়েছে। রেলগাড়ির কামরায় বসেই দেখতে পাবে পালপাড়ার মন্দির।



গাড়িতে বসে হয়তো নজর হবে না, মন্দিরটি যে ভূখণ্ডে অবস্থিত তা নিকটবর্তী জমির তুলনায় অনেকটা উঁচু জমিতে। ছোট ছোট লাল পাথরে গাঁথা মন্দিরটি ভারী সুন্দর। আমার তো মনে হয়েছে তার বয়স অন্তত পাঁচ শ' বছর! কে কবে এটি নির্মাণ করেছিলেন তার হদিস নেই। কাছেই একটি দীঘি—প্রদ্যুম্ন সরোবর।



প্রদ্যুম্ননগরের দেউল, চক্রদহ

আবার পুরাণ কাহিনী শোনাই: শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন এই জনপদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চক্রতীর্থে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, একথাটা নিশ্চয়ই শুনেছ! বিশ্বাসী মানুষের ধারণা—সেই চক্রতীর্থ হচ্ছে ঐ চক্রদহ বা চাকদা। সাফল্যলাভ করে সেই তীর্থেই বসবাস শুরু করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণতনয়। তাঁরই নামে জনপদটির নাম হয়ে যায়: প্রদ্যুম্ননগর।

আবার সেই একই কথা বলি—তোমরা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা, পুরাণে বিশ্বাস কর না। বলি পুরাতত্ত্ব আর ইতিহাস তো মানবে? মন্দির সংলগ্ন ভূভাগের ঐ উঁচু জমি কি ইঙ্গিত করে না যে, ওখানে ছিল এক বর্ধিষ্ণু জনপদ? আর ইতিহাস প্রমাণত রঘুনন্দন 'তীর্থযাত্রাবিধি' গ্রন্থে ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রদ্যুম্ননগরের উল্লেখ করেছেন 'মুক্তবেণী'র স্থান নির্দেশ করতে।

যশোড়া



যশোড়া গণ্ডগ্রামকে না চেন, শিমুরালি-ইন্সটিশানকে নিশ্চয় চিনবে।

এখানে ছিল জগদীশ পণ্ডিত-এর শ্রীপাট। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবের মন্দিরটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। মূর্তিটি হুবহু পুরীর জগন্নাথের অনুসরণে। সাদৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে!

এ সম্বন্ধে যে লোকগাথা আছে তা এবার বলি। বিশ্বাস করা-না-করা তোমাদের অভিরূচি : জগদীশ পণ্ডিত যখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তখন স্নানযাত্রার প্রাক্কালে পুরীধামে যান তীর্থ করতে। নিশ্চয় শুনেছ যে, শ্রীধামের ঐ ত্রিমূর্তির নবকলেবর হয় দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধানে। দারুময় ব্রহ্ম! পুরাতন মূর্তি কীভাবে বিলীন হয়ে যায় তা নিয়ে নানা মত। কেউ কেউ বলেন তা সংব্রাম্ণেরা লোকচক্ষুর অন্তরালে সমুদ্রতীরে দাহ করেন—ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধি ইত্যাদি সহযোগে, চন্দন কাষ্ঠের বেদী গড়ে। তা সে যাই হোক, মোটকথা দেবতার নবকলেবর হলে সাধারণ মানুষ পূর্বযুগের জগন্নাথ-মূর্তিকে আর চর্মচক্ষুতে দেখতে পায় না।

বৃদ্ধ জগদীশ পণ্ডিত স্নানযাত্রার পূর্বে পুরীধামের প্রধান পাণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ করেন—তিনি অনুমতি করলে পূর্ব-প্রজন্মের পরিত্যাজ্য দারুময় ত্রিমূর্তিকে তিনি স্বগ্রামে নিয়ে যাবেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবেন।

এটি শাস্ত্রবিরোধী যাচুঞ্জ। বড়পাণ্ডা কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না। অদ্ভুত এক শর্ত আরোপ করলেন, আপনি পুরাতনী ত্রিমূর্তিকে স্বগ্রামে নিয়ে যেতে পারেন একটি শর্তে। ত্রিমূর্তির ভিতর জগন্নাথদেবের মূর্তিটি আপনি যদি স্বয়ং পদব্রজে বহন করে নিয়ে যেতে স্বীকৃত হন।

হয়তো প্রধান পাণ্ডার এ এক কৌশল। সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে একটি অবাস্তব শর্ত আরোপ করলেন তিনি। অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে পদব্রজে সমস্তটা পথ প্রত্যাবর্তনই এক অবাস্তব প্রস্তাব। তদুপরি ঐ জগদ্বল দারুমূর্তিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া তো নিতান্ত অসম্ভব। সকলেই অবাক হয়ে গেল বৃদ্ধের প্রত্যুত্তরে। তিনি শাস্ত্র কণ্ঠে বললেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! দারুময় ব্রহ্মকে স্বয়ং বহন করে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনাকে আরও একটি অনুমতি দিতে হবে প্রভু! আমি বৃদ্ধ; পথে যদি আমার জীবনাবসান হয় তাহলে যেখানে আমার মৃত্যু হবে সেখানেই ঐ মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হবে। তার ব্যয়ভার আমি বহন করব!

এ শর্তে স্বীকৃত না হওয়ার হেতু নেই!

বৃদ্ধ জগদীশ পণ্ডিত অসম্ভবকেই সম্ভব করলেন। স্বয়ং ঐ দারুময় ব্রহ্মকে বহন করে উপনীত হলেন স্বগ্রামে। প্রতিষ্ঠা করলেন দেবতাকে। আশ্চর্যের কথা আরপরও দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন তিনি। আজও—না, আজও বলা উচিত হবে না, আমাদের বাল্যকালেও—প্রতিবৎসর পৌষমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব হত। এ ছাড়া মাঘী পূর্ণিমাতেও গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষ্যে বহু তীর্থযাত্রীর

কলহনদল্লী

হত সমাগম।

শিমুরালীতে যদি যাও জগন্নাথদেবের দোলমঞ্চটিকে দেখে এস।

তার চিহ্ন বোধহয় আজও আছে!



জগন্নাথদেবের দোলমঞ্চ, যশোড়া (শিমুরালি)

আজকের হিসাবে চব্বিশ পরগণা জেলার সমাপ্তি আর নদীয়া জেলার শুরুতে এই কাঁচড়াপাড়া—প্রাচীন কাঞ্চনপল্লী। যা ছিল কাঞ্চন তা আজ কাঁচকড়াও নয়, একেবারে কাঁচড়া! ঐ যেখানে আজ দৈত্যের মতো রেলওয়ে ইঞ্জিনগুলোকে মেরামত করা হয়, দিবারাত্র গজগজ ফোঁসফোঁস করে, ওর নাম সেকালে ছিল বীজপুর! তখনো ওখানে ছিল দৈত্যাকার যন্ত্রচালিত কিছু ইঞ্জিনের মতো কালো মুষকো মানুষ—ডাকাত তারা। ছিল এক ডাকাতে-কালী। নরবলির আয়োজন করে তারা ডাকাতি করতে বার হত।

বৈষ্ণবসাহিত্যে এর পরিচয়: সেন শিবানন্দের পাট।

শিবানন্দ ছিলেন চৈতন্যপ্রভুর এক অনুগত ভক্ত। তাঁর ভদ্রাসনে পদধূলি দাখ্য করেছিলেন প্রেমের ঠাকুর। সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলের বাসিন্দা তখন রথযাত্রার প্রাক্কালে গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে সমবেত হতেন বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ—ঐ শিবানন্দের ভদ্রাসনে। তাঁদের বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা তো বটেই এমনকি অনেক দুঃস্থ

ভক্তকে পাথেয় পর্যন্ত যোগান দিতেন শিবানন্দ। তাঁর তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পুরীদাস। সর্বকনিষ্ঠ পুরীদাস ওরফে পরমানন্দ সেন ছিলেন পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় তিনখানি পুঁথি রচনা করেন: চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাঁকে উপাধি দান করেছিলেন: কবিকর্ণপুর পরমানন্দ।

সেন শিবানন্দ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়ের বাঙলা আটচালা মন্দিরটি নয়নাভিরাম। স্থাপত্যশৈলী শাস্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দিরের অনুসরণে—সম্মুখভাগে তিন-খিলান, অস্থখুরাকৃতি। এই মন্দিরটি



সেন-শিবানন্দ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়ের মন্দির, কাঞ্চনপল্লী

যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র রাঘব রায় পুনর্নির্মাণ করে দেন এবং দেবসেবার জন্য একটি নিষ্কর ভূখণ্ড দান করেন। দু-একশ বছরের ভিতর গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়ায় সে মন্দিরটিও গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে যে আট-চালা বাঙলা মন্দিরটি দেখা যায় তাঁর নির্মাণকাল ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। নির্মাণ ব্যয় যৌথভাবে বহন করেন শহর কলকাতার নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-৫৯) জন্মস্থানও এই কাঞ্চনপল্লী।

আরও একজনের কথা বলি: যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫—১৯০৪)।

‘আর্যদর্শন’ পত্রিকার এই সম্পাদক, গ্যারিবল্ডি-ম্যাটসিনি, জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন চরিত

বাহুবলদাসী-বংশবাটী

রচনা করে স্বাদেশিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাঙলার জাতীয় ভাব উদ্দীপনে বিদ্যাভূষণের প্রভূত দান। তাঁর সম্বন্ধে আর একটি তথ্য—যা প্রায়ই উল্লিখিত হয় না—এখানে লিপিবদ্ধ করে যাই। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা। যুবক বয়সেই তাঁর প্রথম পত্নীর মৃত্যু হয়। বাঁড়ুজে বংশের কুলীন পাত্র—এম. এ. পাশ, ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, এবং তখন তিনি সরকারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কন্যাদায়গ্রস্তের দল হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বিদ্যাভূষণ বেয়াড়া বায়না ধরলেন—বিপত্নীকের সঙ্গে বিবাহ হওয়া উচিত বিগতভর্তার। কোনও মানে হয়? উপার্জনক্ষম পুত্র—পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রখ্যাত ডাব্লু. সি. ব্যানার্জি নন) পুত্রকে ত্যাগ করতে পারলেন না, তবে ব্যাজার হলেন। আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করলেন তাঁকে। মহাপণ্ডিত একঘরে হয়ে প্রকাশ্যে বিবাহ করলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যাকে। গোপনেও কিছু করলেন তিনি—রচনা করেছিলেন কয়েকটি স্বদেশাত্মমূলক গ্রন্থ: প্রাণোচ্ছ্বাস, আত্মোৎসর্গ, কীর্তিমন্দির।

বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবীদের সদস্যদের সেগুলি অবশ্য-পাঠ্য ছিল।

কাঞ্চনপল্লী থেকে আড়াইকোশ দূরে কর্তৃত্ব সম্প্রদায়ের কেন্দ্র: ঘোষপাড়া। আউলেচাঁদের শিষ্য সদৃগোপ-বংশীয় রামশরণ পাল এই ঘোষপাড়াকেই তাঁর মূল কেন্দ্র করেন। রামশরণের স্ত্রী হচ্ছেন ‘সতী মা’। পীঠস্থানের অদূরে হিমসাগর দিঘি। সেখানে ডুব দিলে অন্ধও নাকি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

অদূরেই কুলিয়ার পাট বা অপরাধভঞ্জন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এখানে তিন দিন ব্যাপী মেলা হত। উপলক্ষ: ঐ তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামবাসী বৈষ্ণব-নিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেছিলেন।



চল, এবার গঙ্গার ওপারে যাওয়া যাক। কাঞ্চনপল্লীর ওপারে বংশবাটী। না, দিদি, স্টীমলঞ্চে পার হওয়া চলবে না। কেন? ভুলে গেলে নাকি হে, তুমি আমার যাত্রাসঙ্গিনী হয়েছ অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আমি এখন এই স্থবির বিংশশতাব্দীর পলিতকেশ কথাসাহিত্যিক নই, আমি এখন—‘কালিদাসকে’ হারিয়ে দিয়ে গর্বে বেড়াই নেচে’।

চল, পারানি নৌকায় তোমাকে ওপারে নিয়ে যাই।

পারানির কড়ি আছে তো তোমার ঐ ‘ফুটুনি-বটুয়ায়’? এক কড়ি লাগবে। নেই বুঝি? তা না থাক, পয়সা তো আছে? কপর্দক? তাও নেই। সর্বনিম্ন মুদ্রা কী আছে তাহলে? পাঁচ নয়া? অহো ভাগ্য! নিরানবই কড়া ভাঙানি পাব কোথায়? ঠিক আছে, আমিই না হয় তোমার পারানির কড়ি গুণে দেব। কী আর করা? যাত্রাসঙ্গিনী হতে যখন রাজী হয়েছ, তখন এক কড়া বেছেদো খরচই করা যাক।

তুমি-আমি পারানি-নৌকায় গঙ্গা পার হলাম।

ঐ দেখ, ঘাটোয়াল আমাকে চেনে। বলছে, হুঁসিয়ার ঠাকুর-মোমি ঘাট পিছল হৈ!

আমি ওকে বলতে গেলাম, ‘দুনিয়ার সব ঘাটই তো পিছল মাঝেমাঝে’—কিন্তু বলা হল না। নজর হল, তুমি ইতস্তত করছ নৌকা থেকে পিছল-ঘাটে পা বাড়াতে।

ঘাটোয়াল আমাকে ধমক দেয়, কেমন মানুষ আপনি ঠাকুর-মোসা! মাইজির হাতটো তো পাকড়ান!

শুধু তুমি নয়, আমিও লজ্জা পেয়েছি। ঘাটোয়াল ভুল বুঝেছে! লেখক-পাঠিকার সম্পর্কটাও নিবিড়—শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালোবাসার—কিন্তু তা কি জানে ঐ ঘাটোয়াল? তুমি সামলে নিয়ে বললে, না না, ভয় পাইনি, ভাবছিলাম আলতাটা ধুয়ে যাবে!

তা বটে! তোমার পায়ে তো হাই-হিল নেই, নূপুর-বেষ্টিত অলঙ্কার-আলিম্পন। কিন্তু তাই বলে আমি তো আর তোমাকে পাজা-কোলা করে পিছল ঘাটটুকু পার করে দিতে পারি না। হয়তো সে আশঙ্কাতেই তুমি আর ইতস্তত করলে না—থপ করে চেপে ধরলে আমার হাতটা।

শৈশবের হাঁট-হাঁটি পা-পা ছন্দে দুজনে উঠে এলাম শক্ত জমিতে।



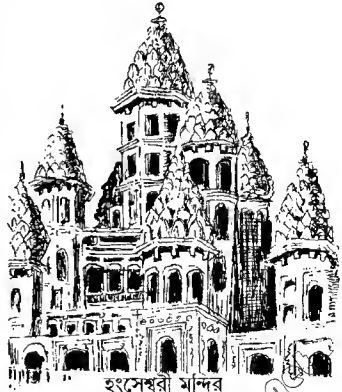
বংশবাটী

আমরা দুজন বংশবাটীতে পৌছলাম—সেই 1742 সালে। তখনো ওখানে হংসেশ্বরী মন্দিরটা নির্মিত হয়নি। সেটার নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল 1814 খ্রীষ্টাব্দে। তবে স্বয়ম্ভরা এবং অনন্ত বাসুদেবের মন্দির দুটি ছিল। কিন্তু সেসব গল্প দ্বিতীয়বার বলব না। ‘হংসেশ্বরী’-তে তা বিস্তারিত বলেছি। অনন্ত বাসুদেব মন্দিরটিই প্রাচীনতম।

*নির্মাণ কাল 1679; ঔরঙ্গজেবের জমানায়। বংশবাটী সম্বন্ধে যে দুটি তথ্য “হংসেশ্বরী” উপন্যাসে বলা হয়নি, শুধু তাই বলি। প্রথম কথা: দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটকে বর্ণিত নীলকুঠির অবস্থান এই বাঁশবেড়ের। দ্বিতীয় কথা: এখানে 1843 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার তত্ত্বাবোধিনী সভা একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিশোরমতি পড়ুয়ার দল বেদান্তের দিকে ঝুঁকে পড়ছে দেখে স্থানীয় পণ্ডিতেরা তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যান। একযোগে সবাই ছাত্রদের ছাড়িয়ে নিয়ে যান। বিদ্যালয়টি উঠে যায়।

আরও দুটি কথা প্রসঙ্গত বলি:

এক নম্বর: এখানে বহু পূর্বযুগে একটি গীর্জা ছিল। কারও কারও মতে সেটি বঙ্গদেশের প্রথম নির্মিত গীর্জা। সেটা বিতর্কমূলক, কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সেই গীর্জার প্রধান পাদ্রী ছিলেন প্রথম ভারতীয় পাদ্রী: তারাচাঁদ। ইংরাজী, ফরাসী এবং খ্রীষ্টগীর্জা তিন-তিনটি ভাষা জানতেন তিনি। বলাবাহুল্য, তার সঙ্গে বাঙলা, হিন্দি ও সংস্কৃত সম্ভবত আরবী-ফার্সিও!



হংসেশ্বরী মন্দির

দ্বিতীয়ত : তারাক্ষর তাঁর ‘রাধা’ উপন্যাসে দরাক্ষাজীর উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন, মনে পড়ে ? ব্যাধপৃষ্ঠে গাজীকে আসতে দেখে পাঁচিল-আসীন হিন্দু সন্ন্যাসী ‘পাঁচিল চেপে’ এগিয়ে আসেন ? সেই ঘটনাটি এই বাঁশবেড়ের। সন্ন্যাসীর নাম ভিখারীদাস। খামারপাড়ায় বাবাজীর আখড়াটির অবস্থান লোকে এখনো দেখায়।

ত্রিবেণী



ত্রিবেণী : ‘মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে’।

অতি প্রাচীন তীর্থ—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মহাসঙ্গমে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর ‘পবনদূতম্’ কাব্যে এর উল্লেখ আছে। বঙ্গাধিপ ফিরোজ এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাই, অনেক সময় একে বিকল্প নামে উল্লেখ করেছেন : ‘ফিরোজাবাদ’।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ণনা করছেন

“বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।

যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥”

স্থাপত্যের ছাত্রদের কাছে এখানে জনান্তিকে কিছু নিবেদন করি : ত্রিবেণীতেই আছে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রাচীনতম একটি মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন—জাফর খাঁ মসজিদের মিহরাবটি। সপ্তগ্রাম-বিজেতা জাফর খাঁর সমাধি আছে যে প্রাচীন মসজিদে সেটি ভাগীরথী ও সরস্বতী সঙ্গমস্থলে। এই সুবৃহৎ মসজিদটি প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের মিহরাবটি অন্য মসজিদ থেকে সংগৃহীত। তার গায়ে শিলালেখে উৎকীর্ণ করা আছে যে তারিখ, সেটা 1298 খ্রীষ্টাব্দ।

পর পর দুইটি শতাব্দীতে ত্রিবেণী বঙ্গসংস্কৃতিকে উপহার দিয়েছে দুটি দুর্লভ প্রতিভা। গোটা অষ্টাদশ-শতাব্দীব্যাপী পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং ঊনবিংশতি শতাব্দীতে বাঙলার এডমন্ড বার্ক : রামগোপাল ঘোষ (1815-68)।

রামগোপাল ‘সেই সময়’ কালের মানুষ, আমাদের এজিনিয়ারের বাহিরে। আমরা আছি ‘সেইতর সময়ে’, তাই শুধু জগন্নাথের কথা বলি :

জগন্নাথের যখন জন্ম হয় (1694) তখন তাঁর পিতৃদেব রুদ্রদেব তর্কবাগীশের বয়ঃক্রম তিনকুড়ি-ছয়। জগন্নাথের জননীকে যখন বিবাহ করেন তখনই তাঁর বয়স ষাটের উপর। তার পশ্চাতে এক অদ্ভুত লোকগাথা। জগন্নাথের-দাদামশাই বাসুদেব ব্রহ্মচরী একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে শুনতে পান যে, জরাজীর্ণ রুদ্রদেবের বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্রসন্তান হবে এবং সেই পুত্রটি হবে অলৌকিক গুণসম্পন্ন এক ক্ষণজন্মা। নিত্যা

পীড়াপীড়ি করে তিনি ব্যাজ্যেষ্ঠ রুদ্রদেবকে সম্মত করেন এবং তাঁকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। কেটে গেল দু-চার বছর—বাসুদেব ব্রহ্মচারীর দৌহিত্র আবির্ভূত হল না। তখন তিনি কন্যার পুত্রকামনায় পুরুষোত্তম ধামে চলে যান। পুরশ্চরণাদি পুত্রেষ্টী যজ্ঞ করেন। তাঁর প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়—‘তুমি গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাভর্তন কর।

তোমার কন্যা গর্ভবতী হয়েছে। পুত্র জন্মিলে নাম রেখ জগন্নাথ।’

বাসুদেব ফিরে এলেন ত্রিবেণীতে। শুনলেন, যা স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়েছে তা সত্য।

দৌহিত্রের নামকরণ তাঁরই ইচ্ছানুসারে হল : জগন্নাথ।

পাঁচ বৎসরে শিক্ষারম্ভ। অক্ষর-পরিচয় হওয়ার পূর্বেই নাকি তিনি মুখে মুখে ব্যাকরণের সূত্রগুলি শিখে ফেলেন। অসাধারণ মেধা, স্মৃতিশক্তি আর অলৌকিক প্রতিভাবলে তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই প্রায় সর্বশাস্ত্র আয়ত্ত করে নেন। যদিচ রুদ্রদেব তর্কবাগীশ একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, তাঁর প্রণীত ‘প্রবোধ চন্দ্রোদয়’ নাটকের টীকা সে সময়ে প্রামাণ্য, তবু পিতার আদেশে তিনি জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশবাটীস্থিত চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হলেন।



গাজীপুরে অবস্থিত, ফ্লাক্সম্যান-নির্মিত (1883) এ-মূর্তিটি কি জগন্নাথের ?

চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অশীতিপর পিতৃদেব এক সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। অতঃপর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন। পিতার মৃত্যু হল যখন, তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বৎসর। তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি—যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন—তা হল একটি পিতলের গাড়ু, একটি ‘অমৃতি’ জলপাত্র, অনধিক দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি এবং একটি ভগ্ন কুটীর। নিজের মৃত্যুকালে তিনি অন্যান্য এক লক্ষ টাকা নগদ, বার্ষিক চারি সহস্র তকা লাভের নিষ্কর ভূমি, তিন পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং তস্যপুত্রদের রেখে যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিদাস নিঃসন্তান, কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যাম সার্বভৌম ছিলেন অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন। স্বয়ং জগন্নাথ বলেছিলেন, ‘বাগদেবীর কৃপার আমি কিছু কিছু প্রসাদ পেয়েছি, কিন্তু ঘনশ্যাম যে প্রসাদ লাভ করেছে তা আমার সৌভাগ্যকেও অতিক্রম করে যায়।’

দুর্ভাগ্যবশতঃ জগন্নাথোত্তীর্ণ প্রতিভার সম্যক পরিচয় আমরা পাইনি। যৌবনকালেই তিনি ঘোর উন্মাদ হয়ে যান।

চতুষ্পাঠী থেকে ‘তর্কপঞ্চানন’ উপাধি লাভ করে জগন্নাথ নিজ ভদ্রাসনে একটি টোল খুলে বসেন। অনতিবিলম্বে তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভার যশ দিগবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সৌভাগ্যলক্ষ্মী এই

ত্রিবেণী

সরস্বতীর বরপুত্রটিকে একই ভাবে আশীর্বাদ করলেন। ক্রমে তদানীন্তন বঙ্গদেশের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্কপঞ্চাননের বিশেষ হৃদয়তা জন্মায়। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর, নবাবের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যার জন শোর প্রভৃতি। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি অগাধবিদ্য স্যার উইলিয়াম জোনস্ ছিলেন তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রায়ই স্যার জোনস্ নৌকাযোগে সঙ্গীক ত্রিবেণীঘাটে এসে ঐ ব্রাহ্মণটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। অন্যান্য সাহেবদের তুলনায় স্যার উইলিয়াম জোনস্ যে তাঁর দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন সেটাই স্বাভাবিক, কারণ স্যার জোনস্ ছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতি-বিশারদ। ওদিকে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক থেকে শুরু করে ইংরাজী, ফরাসী পর্তুগীজ, জার্মান আবার এদিকে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি তাঁর আয়ত্তে। ‘গ্রীস, ইটালী ও ভারতের দেবদেবী’, ‘হিন্দুরাজগণের কালক্রম’, ‘হিন্দু সঙ্গীত’, ‘জ্যোতিষ ও সাহিত্য’, ‘হিন্দু আয়ুর্বেদ’ জাতীয় মনোগ্রাম লিখে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা তাঁর প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র ‘এশিয়াটিক রিসার্চেস’ পত্রিকায় একে একে প্রকাশ করেছেন। সেইসব বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহমানসে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো মানুষের কাছে তাঁকে বারবার ছুটে যেতে হত। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে স্যার জোনস্ ‘হিন্দু জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা’ সম্বন্ধে যে মনোঞ্জ ভাষণ দিয়েছিলেন (1786) তার বহু তথ্যের সত্যাসত্য নির্ধারণে তাঁকে ঐ পণ্ডিতের কাছে আসতে হত। সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর অভিধানে লিখেছেন, “দেশে সে সময় ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জগন্নাথ সেই ভয়ে সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। এই ব্যাপারে অবগত হইয়া স্যার উইলিয়াম জোনস্ নিজ ব্যয়ে কয়েকজন বন্দুকধারী প্রহরী জগন্নাথের বাটীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।”

মিত্র মহাশয়ের অভিধানে যে তথ্যটা অনুলেখিত এবার তা তোমাদের জনান্তিকে জানাই। তথ্যটি আমি সংগ্রহ করেছি দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রামাণিক গ্রন্থ “বঙ্গালীর সারস্বত অবদান” থেকে—

স্যার জোনস্ ঐ বন্দুকধারীর ব্যবস্থা করে দেন জগন্নাথের বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার পরে। এই ডাকাতির জন্য জগন্নাথ নিজেই দায়ী! শোন তবে মজার কিসসা:

স্যার উইলিয়াম জোনস্-এর অনুরোধে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দুইখানি দায়-সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। একটির নাম “অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ” অপরটির নাম “বিবাদ-ভঙ্গার্ণব”। এর সাহায্যে সে-সময় এ-দেশে বিচারপদ্ধতি পরিচালিত হত। নানা লোক নানান বিষয়ে বিধান নিতে তাঁর দ্বারস্থ হত। উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে পণ্ডিতমশাই শাস্ত্রসম্মত নিদান হাঁকতেন। ঐ দুইখানি বিচার-বিভাগীয় গ্রন্থ রচনার পর তাঁর মক্কেলদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেল। পণ্ডিতজীর বিধান পেলে আদালত কিছু করতে সাহস পাবে না, এটাই ছিল সকলের ধারণা। বিশেষ দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন, এমনকি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জোনস্ও তাঁর বন্ধুস্থানীয়। বিচারের প্রয়োজনে ঐ পণ্ডিতকে দিয়ে গ্রন্থ লিখিয়ে নিচ্ছেন, মাসিক সাতশত টাকা সম্মানমূল্য দিয়ে (এ জন্য গ্রন্থ সমাপ্ত হবার পর মাসিক তিনশত টাকা পেন্সনও পেয়েছেন)।

একদিন পণ্ডিতমশায়ের কাছে এসে হাজির হল অপরিচিত একজন ‘মক্কেল’। পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী সে-সময়ে ব্যারিস্টার-সাহেবের চেয়ারে রূপান্তরিত। ‘জুনিয়ার’দের কাছে ঐ লোকটা তার নাম কিছুতেই জানাতে চাইছে না। বলছে, যা বলবার তা স্বয়ং পণ্ডিতমশাইকে বলবে জনান্তিকে। এমন আবদারও মেনে নেওয়া হল। বোধ করি আগন্তুক ‘জুনিয়ার’দের যথাযোগ্য কাঞ্চনমূল্যের ব্যবস্থা ঠিক মতোই করেছিল।

নির্জন কক্ষে পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পেল আগন্তুক।

জগন্নাথ তাকে বলতে গেলেন, কে বাবা তুমি? কী চাও?

বলা হল না। লোকটাকে দেখে মনে হল, ‘কুরুক্ষেত্র’ যাত্রার আয়োজন হলে আর সেই সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ঘাটোৎকচের ভূমিকাটি প্রদান করলে ‘মেক-আপ’-এর প্রয়োজন হবে না।

দশাসই জোয়ান লোকটি বিনয়ে বিগলিত হয়ে সট্টাসে প্রণাম করে বললে, ছিচরণের দাসের নাম শ্যাম মল্লিক আঞ্জে, বড় বিপদে পড়ি আপনার ছামুতে আস্যে পড়ছি ঠাউর। টুক চরণামুং দে উদ্ধার করি দেন।

জগন্নাথের পরিবর্তে পণ্ডিতটি রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত হলে এবস্থিধ অনুরোধে নির্ঘাৎ ঠ্যাঙ-জোড়া সামনে বাড়িয়ে ধরে বলতেন, নাও বাবা। চরণধূলি নিয়ে বিদেয় হও। আমার অনেক কাজ বাকি।

জগন্নাথ তা বললেন না। তিনি তো শুধু বাগ্‌দেবীরই বরপুত্র নন। বুঝলেন, ঐ শ্যাম-ঘাটোৎকচ বিপদে পড়ে ঔর বিধান নিতে এসেছে। ওর ‘অনুপপত্তি’ অন্য জাতের।

বলেন, ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছিস্ মনে হচ্ছে? জামিন দিলে?

—তা দিছে! গোটা একটা আসরফি বেমক্কা খর্চা হই গেল, ঠাউর!

—তা আমার কাছে মরতে এসেছিস্ কেন?

—মর্তে নয়, ঠাউর। ঝাচতি। টুক বিধান দে মোরে ঝাচায়ে দ্যান, কর্তা।

বোঝ ব্যাপার! ব্যাটা ডাকাতি করতে গিয়ে ফেঁসেছে। এখন শাস্ত্রের বিধান চাইতে দৌড়ে এসেছে ত্রিবেণী। হাঁকিয়ে দেবেন ভাবছিলেন, তার পূর্বেই শ্যাম-ঘাটোৎকচ ঔর চরণমূলে নামিয়ে রাখল এক মুঠি সিকা টাকা।

কাঞ্চনমূল্যে সব কিছুই শোধন হয়ে যায়। জগন্নাথ মা লক্ষ্মীর ঐ রূপালী আশীর্বাদ-কয়টা তুলে নিয়ে বললেন, বইপত্র দেখে রাখব, কাল আসিস্।

লোকটা পেন্নাম করে প্রস্থান করল।

‘ফী’ নিয়েছেন। তঞ্চকতা করতে পারেন না। ‘বিবাদ-ভঙ্গার্ঘ’ থেকে দু-ছত্র নিদান লিখে দিলেন ভূর্জপত্রে। একটি মর্মান্তিক উদ্ধৃতি। সে ‘অং-বং’ নিদানের সবটা তোমরা বুঝবে না দিদি ভাই—কী বলে ভাল, আম্মো বুঝিনি—তবে দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় বুঝেছিলেন। হুইই মাছি-মারা কেরানির ভূমিকায় নেমে পড়া যাক:

বিষ্ণুধর্মোত্তরে, পার্শ্বিকদ্যুতচৌর্য্যাদিপ্রতিরূপসাহসৈঃ। ব্যাজেনাপার্জিতং যচ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহতম্॥ ইতি বচনেন চৌর্য্যস্য স্বত্বজনকত্বম্। অতএব তচ্চদ্র্যস্য ঋণদানেইপি চৌরস্য বৃদ্ধিলাভঃ এবং তদ্ধনেন পুণ্যকর্মানুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ ফলং ভবতি। পিতামহচরণাশ্চ চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকৃৎবন্তি॥

ত্রিবেণী

সবটা না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝেছি। অনুবাদ করতে সাহস হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে আমার বইটি আইনের প্যাঁচে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা। চুরি-ডাকাতির সহায়তা করছি বলে থানা থেকেও আমার নিমন্ত্রণ আসতে পারে। কিন্তু তবুটা বিচার করে দেখার। সাহসী ডাকাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দূরন্ত বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তার বৃত্তিতে অবিচল। কলে ‘চোরিতদ্রব্যো চোরস্য স্বত্বং’ স্বীকার করা যাবে না কেন?

মোটকথা তুমি-আমি না বুঝলেও বিচারপতি আধাআধি বুঝতে পারলেন তাঁর আদালতের সংস্কৃতভাষী পণ্ডিতদের সাহায্যে। বাকিটা বুঝলেন প্রহর করে, টেল মি অন ওখ, ঐ নিদানের নিচে সিগনেচার জগন্নাট পণ্ডিতের আছে? করেই?

আদালতের পণ্ডিত ইতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করায় শ্যাম-ঘটোৎকচ বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

ভাবছ এটাই আমার কিসসার ক্লাইম্যাক্স? না গো। কিসসার আর কিছু বাকি আছে।

পরের সপ্তাহেই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভদ্রাসনে হল ডাকাতি। নগদ সিকা টাকা, সোনার অলঙ্কার, বাসনপত্র (সম্ভবত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গাডু ও অমৃতি জলপাত্র দুটি বাদে) ডাকাতেরা নিয়ে গেছে। পরিবর্তে রেখে গেছে একটি পত্র। ব্রজবুলিতে, দেবনাগরী হরফে। শ্যাম-ঘটোৎকচের ভাষায় অনূদিত করলে যার মর্মার্থ, ‘ফালতু ব্যামেলা করেন না ঠাকুর-মোশা। আমার জেব-এ জগু-পণ্ডিতের বেমহাত্ম আছে! কোন শালা কোতোয়াল আমারে ছেঁবেনি: বুয়েছেন?’

সম্ভবত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর ভদ্রাসনে ডাকাতির পশ্চাদপটে এবস্থিহ আতঙ্কিত হইয়াছেন।



জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বুদ্ধি, মেধা ও শ্রুতিধরপ্রতিম স্মৃতিশক্তির বিষয়ে নানান কাহিনী প্রচলিত। তার ভিতর একটি হয়তো শুনে থাকবে—সেই আদালতে সাক্ষী দেবার কিসসাটা। সেটা সুবলচন্দ্রের জবানীতে পেশ করি, “একদিন ইনি ত্রিবেণীর বাধাঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে একখানি বজরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বজরা হইতে দুইজন গোরা তীরে অবতীর্ণ হইয়া তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিল। কথাস্তর হইতে হইতে দুইজনে শেষে হাতাহাতি পর্যন্ত হইয়া গেল। জগন্নাথ আহ্নিক করিতে করিতে তাহাদিগের ঝগড়া আদ্যোপান্ত শুনিলেন। অতঃপর সাহেবদ্বয় পরস্পরের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারপতি জানিতে পারিলেন, সে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে আহ্নিক করিতেছিলেন। বিচারপতি কর্তৃক আহূত ও সাহেবদ্বয়ের বিবাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া তর্কপঞ্চানন বলিলেন, ‘উহারা মারামারি করিয়াছে, দেখিয়াছি। দুইজনের বচসাও শুনিয়াছি, কিন্তু ইংরেজী জানি না বলিয়া উহাদের কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, তবে কে কী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল, অবিকল বলিতে পারি।’ এই বলিয়া যে যাহাকে বলিয়াছিল, মধ্যাক্রমে সমুদায় অবিকল বলিলেন। ইহার এতাদৃশী স্মৃতিশক্তি অতি প্রাচীনকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কালিদাসের সংস্কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ইহার আদ্যোপান্ত কর্তৃকই ছিল।”

কোন প্রামাণিক গ্রন্থে আমি এই কাহিনীর সমর্থন পাইনি। অথচ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের

প্রসঙ্গে সুশিক্ষিত যার সঙ্গেই আলোচনা করেছি, লক্ষ্য করে দেখেছি, এ কাহিনীটি তাঁর জানা। যেন এটিই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ খণ্ডকাহিনীটি আদৌ বিশ্বাস করি না। জানি দিদিভাই, এবার তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে, বিশ্বাস যদি না-ই করেন তাহলে অতবড় উদ্ধৃতিটা না লিখে আপনার হাত আর আমাদের চোখকে নিকৃতি দিলেন না কেন? দিইনি অন্য একটি হেতুতে। বলি, শোন:

এটা বঙ্গ-সংস্কৃতির অধোগমনের একটি উদাহরণ। এই অতিভঙ্গ বঙ্গদেশে অনেক অনেক মনীষী এসেছেন, অনেক কথা বলে গেছেন। তুমি-আমি তার সারাংশ বর্জন করে ভূষিমালা নিয়ে বাহবা দিই। ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ আদ্যস্ত কঠস্থ থাকা কোন বাহাদুরী নয়। আমার ভগ্নিপতি ত্রিপুরারী চক্রবর্তী মশায়ের কঠস্থ ছিল আদ্যস্ত সংস্কৃত মহাভারত। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে দশপুত্রের বছর ধরে তিনি প্রতি সপ্তাহে মহাভারত পাঠ করেছেন—তোমরা তাঁকে দেখনি, দাদু-দিদারা দেখেছেন, শুনেছেন—তাদের জিজ্ঞেস কর, কোনদিন বক্তৃতামঞ্চে তাঁর হাতের কাছে ‘মহাভারত’ গ্রন্থটি থাকত না। চক্রবর্তী-মশাইকে আমি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার হেতু এ নয় যে, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত তাঁর কঠস্থ ছিল।

ভেবে দেখ, সুবল মিত্র মশায়ের কাহিনীটি যদি আমরা ‘হোল টুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য টুথ’ বলে স্বীকার করে নিই তাহলে সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে আমরা কোন নরকে নামিয়ে নিয়ে আসি। পাতা উল্টে এ বইয়ের 136 পৃষ্ঠাটি আর একবার দেখবে দিদিভাই? কী প্রভেদ তাহলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে দুর্গা-বুড়োর? দুজনেই আঙুলে পৈতে জড়িয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে কান-জোড়াকে সজাগ রাখেন—কে কী বলছে? একজন পটুভক্ত পরিধান করে পূজা ঘরে যজ্ঞচালিতের মতো অং-বং করছেন, আর জন সর্বাস্থে গঙ্গামস্তিকা মেখে গঙ্গাজলে আবক্ষ নিমজ্জিত করে জপ করার ঢং করছেন। ‘যথা সংহরতে চাযং কুর্মোহ্মানিব সর্বশঃ’^১ নির্দেশনা কেউই মানছেন না। রবিশঙ্করের সেতার অথবা জর্জদার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে, সাহিত্য-রচনা বা তার রসাস্বাদন করতে করতে তুমি-আমি যেভাবে তন্ময় হয়ে যাই, বাহ্যজ্ঞানশূন্য একাগ্রতায় তন্মিত্ত হয়ে যাই, তর্কপঞ্চানন সেটুকুও হতে পারতেন না? এ কি বিশ্বাস্য?

কিন্তু না! ভারতীয় সাধকদের এভাবেই বিচার করা হয়। কে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে মরা বাঁচিয়েছেন, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, অপুত্রের পুত্র আর নির্যনকে ধনদান করেছেন এই সব আঘাটে গল্পোই আমাদের অভিভূত করে। তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে ভুলে যাই আমরা। তাঁদের বিভূতিতেই অভিভূত হই, তাঁদের বাণী ও নির্দেশ হয়ে যায় বরাপাতার চেয়েও করা।

সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আশীর্বাদ তুল্যমূল্যভাবে লাভ করা কোন অপরাধ নয়। বুনো রামনাথ শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, সাধক। তর্কপঞ্চানন পণ্ডিত, বিদ্বান তথা বিষয়ী। সংসদ ‘বাকালী চরিতাভিধানে’ যে-কথা বলা হয়েছে—‘দীর্ঘজীবী এই পণ্ডিত একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতচর্চায় নবদীপের খ্যাতি প্রায় নিম্প্রভ করে তোলেন’—সেটাই কি কম কৃতিত্ব?

(১) কূর্ম যেমনভাবে তার হাত-পা দেখের ভিতর টেনে নেয় সেইভাবে ধ্যানরত যোগী তাঁর যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংহত করে ধ্যানস্থ থাকেন। —গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ত্রিবেণী

অথবা স্বয়ং রাজা রায়মোহনের মূল্যায়ন “Jagannath was universally acknowledged to be the first literary of his day and his authority has as much weight as that of Raghunandana.”^১

কথোপকথনে, বাকপ্রয়োগের চাতুর্যে তাঁর রসিকমনের পরিচয়।

একবার নবদ্বীপের একজন পণ্ডিত কথাপ্রসঙ্গে এক পণ্ডিতসভায় বলেছিলেন, সরস্বতী সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত হতে বাধ্য হন—কোন না কোন পণ্ডিতের ভদ্রাসনে—

ইঙ্গিতটি পরিষ্কার। নবদ্বীপে অসংখ্য পণ্ডিত, ত্রিবেণীতে একমেবাদ্বিতীয়ম্। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নবদ্বীপই শ্রেষ্ঠ।

জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলে ওঠেন, ওখানেই নবদ্বীপের সঙ্গে ত্রিবেণীর পার্থক্য। ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিব্যরাত্রি অধিষ্ঠান করেন।

চমকে উঠলেন সভাস্থ সবাই! এ কী দম্ভ! আশ্চর্যশংসা না আশ্চর্যহত্যা! সমতুল্য? তর্কপঞ্চানন এ কী বললেন? এতদূর স্পর্ধা! স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থায় বলেছিলেন, ‘ব্রহ্মিষ্ঠের পদে শতকোটি নমস্কার’, আর এ লোকটা...

জগন্নাথ ঠুঁদের বিস্ময়বিমূঢ় ভাব দেখে অটুত হাস্য করে ওঠেন। বলেন, কী আশ্চর্য! বুঝলেন না? এটা ‘শ্লেষ’ অলঙ্কার! ত্রিবেণীতে সরস্বতী-নান্দী নদী নিত্য প্রবহমান। নয় কি?

পণ্ডিত তথা বিদ্বৎসমাজে জগন্নাথের প্রভাব কী আকাশচুম্বী ছিল সেকথা বোঝাতে আর একটি কৌতুককর কাহিনী শোনাই।

রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁর মাতৃশ্রদ্ধে অযুত-নিযুত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেছেন। জনৈক পণ্ডিত সেই তালিকায় নিজের নামটি দেখতে না পেয়ে মর্মান্বিত হন। শুধু ভালমতো পণ্ডিত বিদায়টুকুই নয়, এ নিমন্ত্রণ-তালিকায় নাম-না-থাকার অর্থ পণ্ডিতসমাজে এক ধাপ নিচে নেমে যাওয়া। পণ্ডিত এসে মুরুবি পাকড়াও করলেন উপস্থিত-কবি কবিচন্দ্রকে। বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে একবার ত্রিবেণীর তর্কপঞ্চানন ঠাকুরকে অনুরোধ করুন। তিনি নির্দেশ দিলেই আমার নামটি তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে।

কবিচন্দ্র বললেন, তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নিজেই একজন আমন্ত্রিত, রাজা-বাহাদুরকে এ জাতীয় অনুরোধ করা কি তাঁর পক্ষে শোভন? আপনি বরং চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে ধরুন।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন হচ্ছেন মহাকবি বাণেশ্বরের পৌত্র, আমাদের এই খণ্ড-কাহিনীর কালে তিনি রাজা নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত।

উপেক্ষিত পণ্ডিত বলেন, শুনেছি তালিকাটি চূড়ান্তভাবে রাজাবাহাদুরের অনুমোদন লাভ করেছে। এত বিলম্বে চতুর্ভুজের এ ব্যাপারে আর হাত নেই।

উপস্থিত-কবি কবিচন্দ্র তখন বলেন, ‘চতুর্ভুজে ভুজো নাস্তি নির্ভুজং কিংকরিষ্যতি?’^২

এই ক্ষণজন্মা পুরুষটির দৈহিক বর্ণনা সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীরা যোজ্যে দিয়েছেন তাতে

(১) ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ৬৩।

(২) চতুর্ভুজ চার হাতে যার নাগাল পেলেন না ঠুঁটে জগন্নাথ তা কেমন করে পাবেন?

নিম্নোক্ত বিশেষণ তাঁর প্রতি প্রযোজ্য—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রিয়দর্শন, লোমশ, দীর্ঘ ভুজঙ্গ, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, মুণ্ডিত মস্তক, দীর্ঘ অর্কফলা।

গৌতম বুদ্ধদেবের সমকালে কোনও ভাস্কর তাঁর মূর্তি গড়েনি। শরদিন্দুর ‘চন্দনমূর্তি’ সাহিত্যসত্য মাত্র। সৌভাগ্যক্রমে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রায় সমকালে একজন প্রখ্যাত ভাস্কর তাঁর একটি মূর্তি গড়েছিলেন। তথ্যটি সংগ্রহ করেছি একটি প্রাচীন সূত্র^১ থেকে। লর্ড কর্নওয়ালিসের মৃত্যু হয় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে, যুক্তপ্রদেশের গাজীপুরে। সেখানে তাঁর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মর্মরমূর্তির পাদদেশে একজন মুসলমান গাজী এবং একজন হিন্দু পণ্ডিতের মূর্তি উৎকীর্ণ করার আদেশ দেওয়া হল ভাস্করকে। ভাস্করের নাম: ফ্যাক্সম্যান। তিনি হিন্দুপণ্ডিতের মূর্তির মডেল হিসাবে নির্বাচন করেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে। মূর্তিটি গাজীপুরে গেলে দেখতে পাবে। সে সুযোগ না হলে আপাতত আমার এই পিটুলি-গোলাতেই তৃপ্ত হতে হবে।

তাই বা কেন? চলে যাও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। দক্ষিণ প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে বাঁ-হাতি—গঙ্গার দিকে দেখতে পাবে উইলিয়াম বেটস্কে-এর একটি মর্মরমূর্তি। তার পাদদেশে সতীদাহের একটি অতি অনবদ্য ভাস্কর্য—অর্ধোৎকীর্ণ, অর্থাৎ ‘অলটো-রিলিভো’। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, ‘সতীদাহ’ বিষয়ে সেটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন। যদি কলকাতার বাসিন্দা হও এবং শিল্পবিষয়ে উৎসাহ থাকে তবে সেটি না-দেখা একটা অপরাধ। যখন দেখতে যাবে তখন এ বইটি নিয়ে যেও। আমার অক্ষম স্কেচ-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মূর্তিটি!

সতীদাহের নিষ্ঠুর নির্দেশ প্রত্যাহার করতে পারছেন না বলে সেই পণ্ডিত কী নিদারুণ মর্মপীড়ায় ভুগছেন!

অনবদ্য ভাস্কর্য!

কুমারহট্ট



গঙ্গার ওপারে, কাঞ্চনপল্লীর দক্ষিণে কুমারহট্ট। ইদানীং নাম হয়েছে: হালিশহর। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গলে’ (রচনাকাল আঃ ১৫৯৮-১৬০৬) হালিশহর নামটি আছে। অর্থাৎ আকবরের জমানাতেই নামটি প্রচলিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে গ্রামের ধূলিমুষ্টি তাঁর উত্তরীয়প্রান্তে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখছি তার নাম: কুমারহট্ট।

অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই নয়? যে প্রেমের ঠাকুরের চরণধূলি লাভের জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহারাজ প্রতাপরুদ্র থেকে জ্ঞানসাগর বাসুদেব সর্বভৌম পর্যন্ত লালায়িত, তিনি কেন হঠাৎ এ গাঁয়ের একমুঠি ধূলি কুড়িয়ে নেবেন? কারণ আছে।

হালিশহরে যদি যাও তাহলে জিজ্ঞেস কর: ‘হ্যাঁ গো, চৈতন্য গুড়িবাটা কোন বাগে?’

(১) Fisher : N. W. P. Gazetteer—Gazipur, 1883, pp 12-3.

কুমারহট্ট

না, না, রিকশা-আলা বা ডেলি-প্যাসেঞ্জার নয়, তারা কিছু জানে না—ঐ যে পড়ো দাওয়ায় তিন-মাথাওয়ালা থুথুরে বুড়োটা বসে বসে কাশছে—নাকে রসকলি, গলায় কষ্টী, ওরে শুধিয়ে দেখ। শুকনো আমসির মতো আঙুলটা তুলে লোকটা বলবে: ঐ হোথা।

পুরাতন পুষ্করিণী। বাস্তবে ডোবা। সর্বদে কচুবিপানার নামাবলী। সেটা আছে তো? প্রভু নিত্যানন্দই জানেন! অন্তত আমাদের বাল্যকালে ছিল। এখন হয়তো ডোবাটার বিক্রি-কোবালা হয়ে গেছে। ডোবা ভরিয়ে, পিন পুতে, কেউ নয়া-মোকাম বানিয়েছে। সেকালে একটা মঠ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা শুনেছিলাম, মনে হচ্ছে মঠে গৌর-নিতাই-এর যুগল-মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও ছিল। সেটা বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা জানা হয়নি। হালিশহরবাসী কোন পাঠিকা-পাঠক যদি, গৌরবিন্দের ইচ্ছেয়, আমাকে জানান, কৃতার্থ হব।

ঐ ডোবাটা পড়েছিল একটা খড়ো-ঘরের চরণ আঁকড়ে। সেই পর্ণকুটীরে এককালে বাস করতেন মহাত্মা ঈশ্বর পুরী। শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু। আর তাতেই ঐ উত্তরীয়প্রান্তে পদরেণু-সংগ্রহের আকৃতি।

শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদধন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের ভদ্রাসনও এই কুমারহট্টে।

আরও তিনজন ভক্ত কীর্তনীয়ার নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি: বাসুদেব ঘোষ আর তাঁর দুই ভ্রাতা—মাধব ও গোবিন্দানন্দ।

আমাদের কাহিনীর কালে—অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে—হালিশহরবাসী দুই প্রখ্যাত ব্যক্তি—রামপ্রসাদ সেন ও আব্দু গোসাই। দুজনেই পদকর্তা, একজন শ্যামাভক্ত, একজন শ্যামভক্ত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়ই হালিশহরের অস্থায়ী আবাসে এসে দুই পাগলকে নাচিয়ে মজা দেখতেন—‘চাপান-উতোরের’ গান শুনতেন।

রামপ্রসাদ সেন (আঃ 1720-81):



গল্পটা শুরু করি যিদিরপুন্ডের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল-মশায়ের দফতরখানায়।

কী বললে? ‘গোকুল ঘোষাল, না দুগ্ধা মিত্তির?’

এই ভোমাদের দোষ! গল্পো শুনতে চেয়েছ, শোন না বাপু। সব কথায় টিকটিক করা কেন? ক্রমাগত খালি: ‘দক্ষিণরায়? দক্ষিণরায়?’

বেশ, ফস করে যখন প্রহস্টা পেশ করেই বসেছ তখন বলি—

ঈশ্বর গুপ্তের মতে (সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ বঃ) ঘটনাটা ঘটে যিদিরপুরের গোকুল ঘোষাল অথবা কলকাতার দুর্গাচরণ মিত্রের ভদ্রাসনে। হরিমোহন সেনের বিশ্বাস (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৭৩ শক, ফাল্গুন) ঘটনাটা কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দফতরখানায়। আবার কেউ কেউ বলেন, ঘটনাস্থল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঠিকদার কেটমল্লিকের ডেরা। অন্য এক মতে: চুচুড়ায় শীলদের বাড়ি। তা সঠিক তথ্য জানতে হলে আমার কাছে কেন বাপু? অসিত বাঁড়ুঙ্ক-মশায়ের ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ ঘাঁটে থাক। তথ্যের লক্ষণগুণীর তো চারটি চৌহদ্দী—ধনাঢ্যব্যক্তি যেই হন তিনি ছিলেন সহৃদয়, গুণগ্রাহী, ঈশ্বরভক্ত আর সমরদার। নাম

যাই হোক না, দেখ, আমি সেই লক্ষণের গম্ভীর বাইরে পা দেব না।

যাক, যে-কথা বলছিলাম :

হরিহর আঢ়-মশাই দফতরে এসেই সুসংবাদটি পেলেন—জীবন কুণ্ড ফৌত হয়েছে। সুসংবাদ, তা বলে প্রকাশ্যে তো উৎফুল্ল হতে পারেন না। জিহ্বা ও তালু সহযোগে একটা শব্দ করলেন—শুনতে মনে হল 'সু-সু'। একটা দীর্ঘশ্বাস ভাগ করে বললেন, জীবন কুণ্ডও তাহলে দুনিয়ার মায়া কাটালো। আহা, ভালই গেছে। বহুদিন ভুগছিল।

আঢ়-মশাই হচ্ছেন গোকুল ঘোষালের তহবিলদার, আজকাল তোমরা যাকে বল 'কেশিয়ার'। নগদ লেনদেনটা তাঁর হাত দিয়ে। তাতেই দু-কপদক আটকে যায় আঙুলের ফাঁকে। জীবন কুণ্ড ছিল তাঁর অধীনে মুহুরী। মাস-তিনেক সাম্প্রতিক ভাবে ভুগছিল। বড়ই অসুবিধা চলছিল এ কয়মাস। শুধু নগদ জমা নয়, তার হিসাবও রাখতে হচ্ছিল ঠকেই। ইতিমধ্যে বার-কয়েক নায়েব শ্রীহরি গান্ধুলীর কাছে দরবার করেছেন; কিন্তু গান্ধুলী-মশাই সম্মত হননি। লোকটাকে তো অসুখে-ভোগার অপরাধে বরখাস্ত করা যায় না। হরি আঢ়ের গরজটা অন্যজাতের। বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয়পক্ষ করেছেন, নববধূর দাদা বেকার বসে আসে। বালিকাবধূর কাছে তিনি প্রতিশ্রুত, তার একটা হিল্লো করে দেবেন। এতদিনে সেই পথের কাঁটাটা দূর হয়েছে। কিন্তু আজই নায়েব-মশায়ের কাছে আবার প্রস্তাবটা তোলা কি ভাল দেখাবে? মৃত্যু-সংবাদ মাত্র আজই এসেছে। তা বলে দেয়ী করাও সুবুদ্ধির হবে না। দফতরের সব কটা হাড়-হাবাতে মুকিয়ে আছে—কারও ছেলে, কারও ভাইপো-ভাগ্নে। ইতস্তত করতে করতেই ডাক এসে গেল। কালী পেয়াদা এসে সসম্মত নমস্কার করে বললে, নায়েব-মশাই সেলাম দিয়েছেন।

'সেলাম দেওয়া' একটা দফতরী লব্ধ—সৌজন্যব্যঞ্জক। আসলে 'তলব করেছেন'। আঢ়-মশাই কাছটা ঠিকমতো সেটে নিয়ে নায়েব-মশায়ের দফতরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে যুক্তকরে নমস্কার করে বলেন, ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ, বসুন, কথা আছে।

নায়েব-মশাই কোনদিন ঠুকে বসতে বলেন না। এই পরম সৌভাগ্যলাভে একটু হকচকিয়ে যান। বসে পড়েন চৌকির একান্তে। নায়েব-মশাই বলেন, শুনেছেন নিশ্চয়, জীবন কুণ্ড ফৌত হয়েছে। আপনার এ কয় মাস খুবই আতঙ্কিতি যাচ্ছিল। আপনি বার-তিনেক তাগাদাও দিয়ে রেখেছেন। যা হোক, আপনার আর অসুবিধা নেই। বড়কর্তাকে বলে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এই ছোকরা আপনার নতুন মুহুরী। কী নাম যেন তোমার?

এতক্ষণে নজর হল দেওয়াল-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি শ্যামবর্ণ কিশোর।

এগিয়ে এসে যুক্তকরে আঢ়-মশাইকে নমস্কার করে বললে, শ্রীরামপ্রসাদ আজ্ঞে, ঠাকুরের নাম 'রামরাম সেন। নিবাস নদীয়ার কুমারহাট, ইদানীং লোকে বলে—হালিশহর।

হরিহর ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নায়েব-মশাইকে বলেন, এ কি পারবে? এর জো গোফই ওঠেনি এখনো।

নায়েব-মশাই তাঁর মোম-দিয়ে-পাকানো সূচালো গোফের প্রান্ত চুমড়িয়ে বললেন, মুহুরির পক্ষে গোফটা তো আবশ্যিক অনুসঙ্গ নয়, আঢ়-মশাই। আর গোফ-জোড়াও তো অনিত্য

খিদিরপুর

বস্তু। গজালেও কি তা সকলের বরাতে টেকে?

নিদারুণ লজ্জা পেলেন হরিহর। দুরন্ত ক্রোধও হল। রাগটা গিয়ে পড়ল ঐ ছোকরার উপর। এর পশ্চাতে একটি করুণ ইতিহাস ছিল! আঢ্য-মশায়ের আকেশারের পুরুষ কাঁচাপাকা গোফ-জোড়া অন্তর্হিত হয়েছিল তৃতীয় পক্ষ করার পরে। ভিতরের কথাটা অবশ্য কেউ জানে না—বালিকাবধূর সুড়সুড়ি লাগার গোপনবার্তাটা; কিন্তু তৃতীয়পক্ষ করা আর তার এক সপ্তাহের ভিতর গুফমুগুন ব্যাপারটাকে দফতরের ঐ ‘সুখুদ্বির-পো’গুলো ঠিক কাকতালীয় ঘটনা বলেও মেনে নেয়নি। হরিহর সামলে নিয়ে বলেন, তা নয়, ইয়ে হয়েছে, হিসাবপত্রের ব্যাপার! লেখাপড়া কদুর?

শেষ প্রশ্নটা ঐ ছোকরাকে। কিন্তু জবাব দিলেন নায়েব-মশাই স্বয়ং, বাঙলা, হিন্দি, সংস্কৃতই শুধু নয়, ও ফার্সিও শিখেছে।

বোঝ কাণ্ড। ছোকরা কটা ভাষা শিখেছে তা পর্যন্ত জানা, অথচ নায়েব মশাই সিন্ধু-মার্জারের ভূমিকায় মুখপাত করেছিলেন, ‘কী নাম যেন হে তোমার?’ হরিহর বুঝতে পারেন, নায়েবমশাই-এর শ্যালক না হলেও, ছোকরা তাঁরই সুপারিশে জীবন কুণ্ডুর চিতা নেবার আগেই টুলটা দখল করেছে। বেজার হয়ে বলেন, ভাষা নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আঁক-টাক জানে তো? গায়ের ছেলে, কলকাতার পথঘাটই হয় তো চেনে না।

নায়েব বলেন, আপনার হেপাজতে দিচ্ছি। শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন। ও তো আর ডাকহরকরার কাজ করবে না। পথঘাট বেশি না চেনাই ভাল। এ হল গিয়ে শহর কলকাতা।

আঢ্য-মশায়ের পিছন-পিছন ছোকরা দফতরখানায় এল। জীবন কুণ্ডুর টুলটায় গিয়ে বসল। দফতরের সব কটা চোখ এখন তার দিকে। বুঝতে আর কারও বাকি নেই। শিরোমণিমশাই বলেন, এ-ছোকরাই বুঝি কুণ্ডু-মশায়ের পদে বহাল হল?

শিরোমণি ঘোষাল-বাড়ির নিত্যপূজা করে যান। পূজাস্তে ক্যাশবাক্সে কিছু ফুল বেলপাতা ফেলে যাওয়া তাঁর নিত্যকর্মপদ্ধতি। সে-কাজেই এসেছিলেন দপ্তরে। বাহুল্য বোধে আঢ্য-মশাই জবাব দিলেন না। শিরোমণি কাঠের ক্যাশবাক্সে রক্তচন্দনের ফাঁটা দিয়ে, আঢ্য-মশায়ের মাথায় শান্তির জল ছিটিয়ে এগিয়ে এলেন ছেলেটির দিকে। বললেন, আজ তোমার শুভ কর্মারম্ভ। তোমার কপালেও একটা ফাঁটা দিয়ে যাই। এই নাও।

রামপ্রসাদ লজ্জা পেল। মাথা নিচু করে যুক্ত-করে দাঁড়িয়ে রইল। শিরোমণি সহাস্যে বললেন, আঁক-টাক জান তো, বাবা? বল তো, সাত আর পাঁচে কত হয়?

রামপ্রসাদ বুদ্ধিমান। বোঝে, এটা নিতান্তই কৌতুক। সতের বছরের ছেলেকে কেউ এ-জাতীয় অঙ্ক কষতে দেয় না। তাই সহাস্যে বললে, আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মায়ের পূজারী। এসব আঁকের সাত-পাঁচে তো আপনার জড়িয়ে পড়ার কথা নয়, ঠাকুরমশাই।

শিরোমণি উৎফুল্ল, বাঃ বাঃ। ‘সাত-পাঁচ’ শব্দটার উপর গ্লেশটা তো বড় জবর ছেড়েছে হে! বলি পদ্য-উদ্য লেখ না কি?

কিশোরের উজ্জ্বল চোখজোড়া উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। মাথা নিচু করে সলজ্জ বলে, আজ্ঞে পদ্য নয়, গান! মায়ের নামে!

—মায়ের নামে গান! সে আবার কী? কেউনের ঢঙে

—আজ্ঞে না। এ গান অন্য সুরে—

কথাটা শেষ হল না আচের ধমকে। তিনি শিরোমণিকে বলেন, আপনি এবার আসুন ঠাকুর মশাই! জাবদা-খাতার অনেক কাজ বাকি।

শিরোমণি রাগ করলেন না। প্রশান্ত হেসে ছেলেটিকেই পুনরায় প্রশ্ন করেন, তা বাবা*মায়ের নামে গান লেখার দিকে ঝোক, তুমি এই আঁকের সাথে-পাঁচে জড়িয়ে পড়লে কেন?

রামপ্রসাদ ঐ শিরোমণিকে ইতিমধ্যে ভালবেসে ফেলেছে। হেসে স্বরচিত গানের দুটি কলি শুনিয়ে দিল। সুর দিয়ে গাইতে সাহস হল না, আবৃত্তি:

“সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥”

শিরোমণি ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। স্থান-কাল-পাত্র এবং স্পর্শদোষের কথা বিস্মৃত হয়ে ঐ কিশোরটিকে বুকে টেনে নিলেন।

আঢ়-মশাই একটা স্বগতোক্তি করলেন, এ তো ভালো ঝামেলা হল!



রামরাম সেনের ছিল দুইটি বিবাহ। প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান নিধিরাম। দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ। জাতে বৈদ্য। মধ্যবিত্ত নয়, নিম্নবিত্তের সংসারী মানুষ। বিঘেকয়েক নিষ্কর ভূমি ছিল, সম্বৎসরের চাউল উৎপন্ন হত তাতেই। এ ছাড়া ছিল পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক কালীমূর্তি—দেবী শঙ্করী। তাঁর প্রণামীও কিছু জুটত। চারপুত্র, তিনটি কন্যা, দুই গৃহিণী একটি গাইগন্ধ—সংসার চলাই দায়। জ্যেষ্ঠপুত্র মায়ের পূজার ব্যবস্থাপনা করত। জমিজমাও দেখা-শোনা করত রামের দুই সহোদর দাদা। রামরাম কনিষ্ঠ পুত্রটিকে কৃতবিদ্য করতে চেয়েছিলেন। ভর্তি করে দিয়েছিলেন চতুপাঠীতে। ফার্সিও শেখাতে শুরু করেন। বাসনা ছিল ঐ কনিষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদ কোনও জমিদারী সেরেস্তায় কর্মসংস্থান করে নেবে। দুর্ভাগ্যবশত সে-কাজ সম্পূর্ণ হল না। তার পূর্বেই ওপারের ডাক এসে গেল। নিধিরাম বাধ্য হয়ে বৈমাত্রের ভ্রাতাকে টোল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। তাকে পাঠিয়ে দিলেন শহর কলকাতায়। রামপ্রসাদের মাতুল—তাঁর নামটা জানা যায় না—জোড়াসাঁকোর কাছে দয়েহাটায় বসবাস করতেন। ঐ মামার সঙ্গে চেনাজানা ছিল ঘোষাল-মশায়ের নায়েব শ্রীহরি গাঙ্গুলীর। এই সূত্রেই ঐ চাকুরি-লাভ।

রামপ্রসাদ বাল্যকাল থেকেই ভাবুক প্রকৃতির। কবি-কবি ভাব। স্বভাবভক্তও বটে। সমবয়সী বালকদের সঙ্গে ছটোপুটি করার পরিবর্তে দেখা যেত সে ঐ দেবী শঙ্করী মন্দিরে চুপচাপ বসে আছে! একটু বড় হয়ে সে মা-কালীর সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলত। লোকজন দেখলেই সলজ্জে চুপ করে যেত। এমন ভাবুক প্রকৃতির মানুষটিকে সংসারের পাঁচটে এসে যোগদান করতে হল বৈষয়িক ভূস্বামীর দফতরে। সাত-পাঁচের বন্ধনে পড়ল জড়িয়ে।

ভূস্বামী বৈষয়িক হলেও গোকুল ঘোষাল পাষণ্ড ছিলেন না। তিনিও শ্যামাভক্ত। স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করেছেন* তারা-মায়ের মূর্তি। ব্রাহ্মণ সন্তান—দৈনিক কয়েক ঘণ্টা ঐ মন্দিরে কাটিয়ে যেতেন। ধ্যান করতেন। সেকালের ভূস্বামীদের যেসব দোষ প্রত্যাশিত, তার কিছু ছিল, কিছু

কুমারহট্ট

ছিল না। মদ্যপান করতেন, বাইজীর গানও শুনতেন—বস্তুত গানবাজনার দিকে তাঁর দারুণ ঝোঁক; কিন্তু ম-কারান্ত মরাস্বক কু-অভ্যাসটি ছিল না। দুই পত্নীতেই সন্তুষ্ট, উপপত্নীর বালাই নেই। নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ। মাহিনা-করা ওস্তাদ ছিল তাঁর।

রামপ্রসাদ অবশ্য তাঁকে চোখেও দেখেনি কোনদিন।

আঢ়ি-মশাই দিনদিনই কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ছেন। ঐ ছোকরা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করে না। টুলে বসে নিরন্তর জাবদা-খাতায় যোগ অঙ্ক করে যায়। আর কাজ না থাকলে আপন মনে কী-যেন বিড়বিড় করে। লুকিয়ে লুকিয়ে কাগজে কী সব গোপন পত্র লেখে। কেউ নজর করছে দেখলেই লুকিয়ে ফেলে।

তুমি-আমি এক্ষেত্রে যে-জাতের সন্দেহ করতাম হরিহরের মনে সে জাতীয় প্রশ্ন আদৌ জাগল না। হেতু—কালের দোষ। স্থান: শহর কলকাতা, পাত্র: সতের বছরের উঠতি জোয়ান; কিন্তু কালটা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তখন ছোকরার দল না লিখত প্রেমের কবিতা, না প্রেমপত্র। বাংলা ভাষাটা তখনো কবিতা লেখার মতো পোক্ত নয়, আর প্রেমপত্র পাঠ করার পাঠিকা কোথায় সেই ‘সেইতর-সময়ে’? শহর কলকাতায় হাজার-করা একটি যুবতীরও অক্ষরজ্ঞান নেই; গোটা গৌড়মণ্ডলে লাখে একজন আছে কিনা সন্দেহ।

অক্ষর-পরিচয় আর অকালবৈধব্য যে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধেছে।

তাহলে ও ছোকরা কী লেখে লুকিয়ে লুকিয়ে?

আরও একটা কথা। দফতরে ছুটি হয়ে যাবার পর রোজ সাঁঝের ঝোঁকে ও ছোকরা খাল ধারের দিকে কোথায় যায়? ‘খাল’ বলতে ‘মারহাটা ডিচ’। ইংরেজ বেনিয়ার দল গোটা কলকাতা শহরকে বেঁটন করে খুঁড়েছে ঐ খাল—বর্গী-আক্রমণ ঠেকাতে। ঘোবাল-মশায়ের ভদ্রাসনটা যেখানে ছিল, বর্তমানে তার নাম ধর্মতলা। তার পূর্বে ঐ খাল। সেখানে ভদ্রপত্নী নেই—বস্তুত মনুষ্যবাসই নেই। সেটা শেয়াল আর শকুনের রাজত্ব। আছে একটা শ্মশান—খালের কিনার ঘেষে। ভদ্রলোকের নয়, ছোট জাতের—ঐ যাদের নিমতলা বা গঙ্গা কিনারে আর কোন শ্মশানে যাবার সঙ্গতি নেই। পরপর কদিনই লক্ষ্য করলেন—দফতর ছুটি হয়ে যাবার পর রামপ্রসাদ ঐ জনহীন খালপারের দিকে রওনা দিল। ব্যাপার কী? জানতে হবোঁ।

সন্ধান দিল কালী বেয়ারা। না, খাল-ধারটা একেবারে জনহীন নয়। শ্মশানের রশি-কয়েক দূরে একটা নুড়িয়া-খোলাব বস্তি আছে। ঘননিবদ্ধ গুটি আট-দশ পর্ণকুটীর। সেখানে বাস করে কিছু অস্বাভাবিক রূপোপজীবিনী। বাঙালী মেয়ে নয়, ওড়িয়া, তৈলঙ্গী, কিছু পশ্চিমা। ভদ্রঘরের বাঙালী বাবুরা সে পাড়ায় যায় না। তাদের খরিদারও ভিনদেশী মেহনতী মানুষ—ঐ যারা এসেছে জরু-গরু দেশে ফেলে রেখে, কজি-রোজগারের ধান্দায়, ঐই কলকাতা শহরে। বেশির ভাগ পালকি-বাহক।

হরিহরের নাক কুঁচকে ওঠে। বলেন, বলিস কী রে। ঐ যমের অকুচি রঙ বস্তিতে যায় রামপ্রসাদ। ভদ্র বৈদ্যবংশের সন্তান?

কালী নখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে খুঁটতে বলে, আর কোন নরকে মাঝে বলুন বড়বাবু? ও দিগড়ে তো কোন ভদ্রলোকের বাস নেই।

চকিতে একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল। কৰ্ত্তা-মশাই সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ। ও ছোকরার এই কলঙ্কের কথাটা তাঁর কানে তুলে দিতে পারলে কি ওর চাকুরিটা ভক্ষণ করা যায় না? ঝুঁকে পড়ে বলেন, সঠিক পাত্তা নিয়ে আসতে পারবি কালী? তোকে খুশী করে দেব।

—সঠিক পাত্তা মানে? কী খবর চাইছেন?

—ও কার ঘরে রাত কাটায়। কার সঙ্গে আশনাই?

সামাজিক বিধানে ফরাফরা আশমান-জমিন; কিন্তু নিজের গরজে বড়বাবু স্বয়ং ওর সমতলে নেমে এসেছেন। কালী বেয়ারা একগাল হেসে বললে, এ একটা কথা হল? রণ্ডি বাজারে কেউ কি আশনাইয়ের টানে যায় বড়বাবু? আজ গুলাবী, তো কাল মতিয়া, পশু রুক্মিণী—একটা হলেই হল।

তা বটে। তবু একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর যে প্রয়োজন। মা-কালীর নামে শপথ করে যে বলতে পারবে—সে স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখেছে। অনেক পীড়াপীড়িতে কালী সম্মত হল সরেজমিনে তদন্তটা করে দেখতে। নগদ বিদায়ও পেল কিছু।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই সে এসে যা বলল তাতে পিলে চমকে যাবার জোগাড়! ছোকরা রণ্ডি বস্তিতে আদৌ যায় না। মাগীগুলো ন্যাকামি করে, হাতছানি দিয়ে ডাকে কিন্তু রামপ্রসাদ ভ্রূক্ষেপও করে না। নিষিদ্ধ পল্লীটি অতিক্রম করে সোজা চলে যায় ঐ অন্তর্জ-পরিবারের শ্মশানঘাটে। নির্জন শ্মশানকালীর ছাপরায়। চক্‌মকি ঠুকে প্রদীপ জ্বালে। তারপর ধ্যানে বসে।

কালী বললে, ছোট মুখে বড় কতা হয়ে যাচ্ছে বড়বাবু, কিন্তু আপনার ভালোর জুনিই বলছি—অর পিছনে লাগবেননি। ছোকরা পিচাশসিদ্ধ!

—পিচাশসিদ্ধ! তুই কেমন করে জানলি?

কালী বিস্তারিত জানায়। একদিন সে মুহুরীবাবুর মুখোমুখি পড়ে গেছিল। মুহুরীবাবু অবাক হয়ে বলে, কালী! তুই এখানে?

কালী বুদ্ধি করে বলে, এ বাগে আসি ছিলাম। দূর থেকে ঠাওর হল আপনি মন্দিরে বসি আছেন। তাই আগায়ে এলাম। মায়ের ঠাণ্ডে কী করছিলেন?

—মন্দিরে মানুষে আবার কী করে? মায়ের পূজা।

—ভয়-ডর লাগে না? জনমানবশূন্য শ্মশান, শ্যাল-শকুনের পাড়া...

রামপ্রসাদ নাকি হেসে বলেছিল, দূর ভীতুর ডিম! ভয় কিসের রে? আমি যে মায়ের আদরের ছেলে! আমি যা চাইব, মা তাই দেবেন আমাকে।

—যা চাইবেন? তাহলে মরতে মুহুরীগিরি করেন কেন? সোনাদানা চাইলেই পারেন?

—সোনাদানা যারা চায় তারা মায়ের আশীর্বাদ পায় না। বুঝলি?

সব বস্তান্ত শুনে হাত-পা পেটের ভিতর সৈদিয়ে যাবার দাখিল। নায়েরবাবু এ কী আতান্ত্রিতে ফেললেন ওঁকে! 'পিচাশসিদ্ধ' মুহুরী! বোঝ বখেড়া!

তার কিছুদিন পরেই একটা মারাত্মক আবিষ্কার করে বসলেন হরিহর আঢ্য। জাবদা খাতায় রামপ্রসাদ তার মনোবাসনার কথা লিপিবদ্ধ করেছে। না, সে সোনাদানা চাইনি মায়ের ঠাণ্ডে। সরাসরি মৃত্যুকামনা করেছে আঢ্য-মশায়ের! জীবন কুণ্ডুকে ফৌত করে হয়েছিল মুহুরী, এখন জীবলদার হরিহর আঢ্যের মারণ-উচাটনে লেগেছে! তহবিলদার ফৌত হলে সে

খিদিরপুর

ঘোষাল-মশায়ের তহবিলদার হয়ে বসতে পারে! দু-ছত্র কবিতা পড়ে হাত-পা খরখর করে কাঁপতে থাকে:

“আমায় দে মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।”

‘নিমকহারাম’ কেন লিখেছে? ও ছোকরা কোন্ সূত্রে টের পেল যে, উনি শতকরা পাঁচকড়া-হারে দস্তরী নিয়ে থাকেন? সেটাই প্রথা! শহর কলকাতার যাবতীয় তহবিলদার ঐ হারে উৎকোচ গ্রহণ করে। সেটা উৎকোচ নয়, বাঁধা-রেট দস্তরী। তাহলে নিমকহারামীর কথাটা উঠছে কোন্ সূত্রে?

প্রথামাফিক আর্জিটা পেশ করার কথা নায়েববাবুর এজলাসে। আঢ়ি সে-পথে গেলেন না। নায়েববাবু স্বয়ং ঐ ছোকরার মুক্‌বিল। তিনি ঘোড়া ডিঙিয়ে তৃণভক্ষণে প্রয়াসী হয়ে পড়েন। জাবদা খাতাখানি বগলদাবা করে হাজির হলেন স্বয়ং বড়কর্তার বৈঠকখানায়।

বড়কর্তা ধৈর্য ধরে সব কিছু শুনলেন। কী মর্মান্তিক হেতুতে নায়েববাবুর কাছে সংবাদটি গোপন করে তহবিলদার একেবারে বড়কর্তার খাস-কামরায় আসতে বাধ্য হয়েছে, সে-কথাও। বড়কর্তা বললেন, খাতাখানা রেখে যাও। সেই মুহুরীটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ছেলেটির বিষয়ে দু-চার কথা ইতিপূর্বেই কানাদ্বারা শুনেছেন। নায়েব গাদ্দুলী-মশায়ের মতে ছোকরা কিছু অস্বাভাবিক; শিরোমণি-মশায়ের মতে সে কবি, পদকর্তা! সে নাকি মা কালীর নামে গান লেখে! মা কালীর নামে গান? সে আবার কী? গোকুল ঘোষাল ঐ দু-ছত্র পড়ে অনায়াসে বুঝতে পেরেছেন কিশোর কবির আকুলতা। এ কোন মারণ-উচাটন মন্ত্র নয়। কিশোর কবিশোপ্রার্থী “মায়ের কাছে ভক্তি-সিন্দুকের চাবিকাঠি চেয়েছে! এ কোনও পার্থিব কামনা নয়।

ছেলেটি এল। গরুড়পক্ষীর মতো যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রইল সম্মুখে। গোকুল ওকে বসতে বললেন। জানতে চাইলেন, জাবদা-খাতায় এ পদ্য তুমি লিখেছ?

যুক্তকরে ছেলেটি বললে, এবারকার মতো মাপ করে দিন হুজুর। আর কখনো হবে না।

—বাজে কথা বল না! এ পদ্য তোমার রচনা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ওটা পদ্য নয়, গানের পদ।

—গান। কী ঢঙে গাইতে হবে? কীর্তন, বাউল না ভাটিয়ালী?

কিশোর-কবি তখন মরিয়া। ফস্ করে বলে বসে, আজ্ঞে তিনটার একটাও নয়, ‘রামপ্রসাদী’ ঢঙে!

গোকুল ঘোষাল স্তম্ভিত। সঙ্গীতে তাঁর যথেষ্ট অধিকার। ধ্রুপদ-ধামার এবং যাবতীয় লোকাযত সঙ্গীত। ‘রামপ্রসাদী’-ঢঙ শব্দটা ইতিপূর্বে কখনো শোনেনি। চকিতে মনে পড়ে গেল ঐ ছোকরার নাম ‘রামপ্রসাদ’। তবে কি নিজের নামটাই বলছে? সোজা হয়ে বসে বলেন, ‘রামপ্রসাদী ঢঙে’ কাউকে গাইতে শুনেছ?

সতেজ শালচারার মতো সোজা হয়ে বসল-রামপ্রসাদ। বললে, আজ্ঞে না হুজুর। শুনিনি, কিন্তু গাইতে পারি।

ছোকরার এই অপরিসীম দাটে ক্রোধান্বিত হলেন না বড়কর্তা। বললেন, তাহলে শোনাও দেখি রামপ্রসাদী ঢঙে 'মায়ের নামে একখানা গান!'

রামপ্রসাদ ইতস্তত করল না। অনেক অনেক পদ রচনা করেছে সে। সুর দিয়েছে, গেয়েছে। শ্রোতা একমাত্র মা কালী। কেউ কোন দিন তাকে ডেকে বলেনি, মায়ের নামে একখানা গান গেয়ে শোনাও তো ভাই। এই তার জীবনের প্রথম শ্রোতা: মা আজ চোখ তুলে চেয়েছেন। তার গানের প্রথম শ্রোতা দশজনের দশমজন—লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগ্ম-বরপুত্র। চাকরি যায় যাক। আজ সে তার জীবনের প্রথম শ্রোতাকে গান শোনাবে। আবেশে মুদ্রিত হয়ে গেল কিশোর কবির ডাগর দুটি চোখ। বর্তমান অবলুপ্ত হয়ে গেল। এই বিলাসকক্ষ, ঐ ঝাড়লগুন, দেয়ালগিরি, খাট-পালঙ্ক তার মালিক বিলীন হয়ে গেল ক্রমে। মগ্নচৈতন্য সাধক স্বরচিত গান ধরল তার নিজস্ব ঢঙে:

“স্বত্বকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী ও মা॥
ইড়া-পিঙ্গলা নামা সুবুঝা মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ওমা॥”

গান যখন শেষ হল তখন গায়ক ও শ্রোতার চোখের জলে কাপেটি ভিজেছে।

রামপ্রসাদের চাকরিটা থাকল না!

কর্মচ্যুত রামপ্রসাদ ফিরে এল কুমারহাটে। ঘোষাল-মশাই গুণগ্রাহী, সমঝদার ব্যক্তি। গানটি শুনে এক কথায় ওর চাকরি খেলেন। নিদান হাঁকলেন, কিশোর-কবিকে আজীবন মাস-মাহিনার ত্রিশটাকাই বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হবে। সে স্বগ্রামে বসে যথেষ্ট মায়ের নামে গান বাঁধবে, সুর দেবে, গাইবে, গাওয়াবে—গৌড়মণ্ডলে শ্যামা মায়ের নামের বন্যা বইয়ে দেবে।

তাই দিয়েছিলেন রামপ্রসাদ।

ঠিকই বলেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন অমর হয়ে আছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই আড়াইশ বছর পরে বঙ্গদেশে সমকালীন মহাকবি ভারতচন্দ্রের নাম দৈনিক যতবার উচ্চারিত হয় তার তিনগুণ উচ্চারিত হয় রামপ্রসাদের নাম—বিশেষ্য-পদ হিসাবে নয়, বিশেষণ হিসাবে: ‘রামপ্রসাদী’ গান।

রামপ্রসাদ ছিলেন বীরাচারী তত্ত্ব সাধক। ‘পঞ্চ মকার’ সাধনা ও ‘পঞ্চমুণ্ডির’ আসন প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর পদে বারে বারে পাওয়া যায়। সারাটা জীবন তিনি সেই অধরাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন—মা কখনো রণরঙ্গিনী মহাকালিকা—‘ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে;’ আবার কখনো বা মা তাঁর মেয়ে, আদরের বেটি। দুঃখের কথা, দুঃখের কথা মন খুলে মাকে বলেছেন,

“দুঃখের কথা কই গো তারা, মনের কথা কই
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী॥

★ ★

কুমারহট্ট

কারও সঙ্গে শাল দো-শালা ভাতে চিনি-দই।

(আবার) কারও ভাগ্যে শাকে বালি যানে ভরা খই।”

দারিদ্র্যের বন্ধনমুক্ত হতে পারেননি কবি। তার অর্থ এই নয় যে, এতবড় ভক্তের কথা মায়ের কানে প্রবেশ করেনি। মা তাঁকে দিয়েছেন যথেষ্ট; কিন্তু কবির অর্থকৃন্তুতা যে তাঁর নিজের সৃষ্টি। এ বিষয়ে প্রামাণিক ইতিহাস শোনাই বরং, “কবির কিছু উপার্জন ছিল। তত্ত্বগণ প্রণামী দিত; তাহা ছাড়াও অনেক ধনাঢ্য ভূস্বামীর নিকট তিনি ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গ্রামের নিকটে চৌদ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত জমির মোট পরিমাণ পঞ্চাশ বিঘারও অধিক। সুতরাং কবি নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। কিন্তু অধিকাংশ অর্থ দানখ্যানেই ব্যয় হইয়া যাইত বলিয়া কবির দারিদ্র্য দুঃখ কোনদিনই ঘুচে নাই।”

এর পরে কবি যখন তান ধরেন

“কেন আসার আশা ভবে ভাসা আসা মাত্র হলো।

যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রইল॥

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।

ওমা, মিঠার লোভে তিত মুখে সরিষা দিন গেল॥”

তখন পার্থিব-জ্ঞানহী হলে হয় তো কল্যেতন: ন্যাকামি।

জগজ্ঞানহী তা বলেননি। তিনি জানতেন ঐ ‘মিঠা’ আর ‘তিত’ শব্দের ভিন্ন ব্যঞ্জনা ‘মিঠা’ অর্থ সোনা-দানা, জমি-জেরাং নয়, বিতুল ভক্তি!

বয়সে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের চেয়ে কিছু ছোট। তিনিও একখানি ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনা করেছিলেন। গবেষকদের মতে সেটি ভারতচন্দ্রের রচিত ‘বিদ্যাসুন্দর’ের পরে। একই বিষয়বস্তু নিয়ে কবি কেন ঐ কাব্য লিখেছেন সে বিষয়ে নানামুনির নানামত। কাব্য বিচারে পূর্ববর্তীকালের রচনা হলেও ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ উৎকৃষ্টতর। আমাদের মনে হয়, রামপ্রসাদের ধারণা হয়েছিল ভারতচন্দ্র ঐ কাব্যে মহাকালীর মহিমা যথোচিতভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। সেই ত্রুটি পূরণের জন্যই হয়তো রামপ্রসাদের প্রয়াস। কিন্তু তিনি কুত্রাপি ভারতচন্দ্রের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেননি।

কবি ভগিতায় নিজ নামের পূর্বে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি ব্যবহার করেছেন। এ উপাধি তাঁকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছেন বলে মনে করা স্বাভাবিক; কিন্তু 1759 খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে জমিদান করে যে দলিল সম্পাদন করেন, তাতে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি দেখা যায় না। অনেকের বিশ্বাস এ উপাধি কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত নয়। ‘মহাযাজী, দেশবন্ধু, নেতাজী’ প্রভৃতি উপাধির মতো সেটিও স্বদেশবাসীর স্বতঃপ্রদত্ত সম্মানের দ্যোতক। অপরপক্ষে রামপ্রসাদও সম্ভবতঃ পদকর্তার পদাঙ্ক-অনুসরণে ‘পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র’ের নাম তাঁর কাব্যে লিপিবদ্ধ করেননি।

‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’—অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব 1981, পৃ: 310-11

এই সাধক-কবির সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক গালগল্প, প্রবাদ ও জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে। মা অন্নপূর্ণা নাকি কালী থেকে হালিশহরে এসে তাঁর গান শুনে যেতেন, মা-কালী তাঁর বাগানে বেড়া-বাঁধার কাজে দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছেন অথবা তাঁর মৃত্যুসংক্রান্ত। সেসব কাহিনী সত্য বলে গ্রহণ করেন বিশ্বাসপ্রবণ তত্ত্বারা; কিন্তু না করলেও তাতে রামপ্রসাদের মহিমা খর্ব হয় না। সে সব কাহিনীর লৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, লেখক অবিশ্বাসী, পাগল!

এর পর যে গল্পটা শোনাব তার জন্যে এই সাফাইটুকু আগাম গেয়ে রাখলাম।

রামপ্রসাদের দুই পুত্র—রামদুলাল ও রামমোহন এবং দুই কন্যা পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। আর প্রতিবেশী অচ্যুত গোস্বামী বা সংক্ষেপে আজু গোসাঁই। তিনি বৈষ্ণব এবং উপস্থিত-কবি। কোন পুঁথি তিনি লিখে যাননি, কিন্তু শাক্ত প্রতিবেশী রামপ্রসাদকে আক্রমণ করে কয়েকটি পদ রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় “রাজা (অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন এবং আজু গোসাঁইকে একত্র করিয়া উভয়ের সম্মীত যুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ সেন কবীক্স ছিলেন, আজু গোসাঁই আধ-পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্যকবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন যখন জ্ঞানভক্তির বিষয়ে পদবিন্যাস করিতেন, ইনি তখন রহস্য ছলে তাহার উত্তর করিতেন।”

অসিতকুমারের মতে, “ঈশ্বর গুপ্ত ইহার (আজু গোসাঁই) সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহার অধিক বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।—ইনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাকে আধ-পাগলা বলিয়াছেন; তাহা বোধহয় ঠিক নহে। শুনা যায়, ইনি বৈষ্ণব সাধনমার্গের শিষ্য ছিলেন, অপরদিকে বেশ পরিহাসপটুও ছিলেন। রামপ্রসাদের কোন কোন শ্যামাসঙ্গীতকে তিনি বেশ রসবহুসের দ্বারা তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করিতেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া স্বভাবতই তিনি শাক্ত রামপ্রসাদকে ততটা পছন্দ করিতেন না।”

ঐতিহাসিক তথ্য এটুকু। এবার গল্প কাদা যাক। কিন্তু তার আগে আজু গোসাঁই কী-জাতের ‘উত্তর’ গাইতেন, তার দু-একটা নমুনা শোনাই:

রামপ্রসাদ হয়তো গাইলেন,

“আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালীকল্পভরতলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে যাবি॥”

নির্দোষ দুটি পংক্তি। কারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজু গোসাঁই প্রতিবাদ করে ওঠেন:

“কেন রে মন বেড়াতে যাবি?

কারও কথায় কোথাও যাস্ নে, রে মন,

মাঠের মাঝে মারা যাবি॥”

ভক্তকবি রামপ্রসাদ হয়তো তান ধরলেন,

“ডুব দে রে মন কালী বলে।

হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে॥”

কুমারহট্ট

বিশুদ্ধ ভক্তিরসের পদ। গান হচ্ছে হালিশহরে, মহারাজার কাছারিবাড়ি সংলগ্ন বিশ্রামগৃহে—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আগমন উপলক্ষ্যে। গণ্ডগ্রামের ভদ্রলোকেরা ফরাসে বসে আছেন আসনপিড়ি হয়ে। মহারাজ কিঞ্চিৎ উচ্চাসনে তাকিয়া ঠেশান দিয়ে। গানটি নিঃসন্দেহে তাঁর ভাল লেগেছে। তবু আজু গোসাইকে খোঁচা দিয়ে বলেন, গোসাই-কবি এবার একখানা শোনাও।

উপস্থিত-কবি আজু-গোসাই—তাঁরও আদ্ভুত প্রতিভা—মুখে মুখে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে ঐ রামপ্রসাদী সুরেই গেয়ে ওঠেন

“ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফোনাড়ী
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি
তোমার হলে পরে জ্বরজ্বারি
মন, যেতে হবে যমের বাড়ি॥”

তোমরা তুলনামূলক বিচার করে দেখ। রামপ্রসাদের ঐ দুটি ছন্দে কাব্যমাদুর্য নিঃসন্দেহে অধিক; বোঝা যায় যে, ভক্তকবির আকুলতা মিশে আছে তাতে। কিন্তু ভুললে চলবে না—রামপ্রসাদ পদটি লিখে এনে গাইছেন, আজু-গোসাই শ্রবণমাত্র তার ‘প্যারডি’ রচনা করেছেন। মুখে মুখে ছয়-পংক্তির অন্ত-মিল সমেত ‘উত্তোর’ রচনাও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আজু গোসাই যে শুধু লঘুভঙ্গিতে ‘উত্তোর’ গেয়েছেন তাও বলতে পারি না। এক এক সময় তীব্র শ্লেষের মাধ্যমে তিনি রামপ্রসাদের রচনার দোষত্রুটির সম্যক বিচারও করেছেন। যেমন উল্লেখ করা যায়, রামপ্রসাদ একবার গৌরীর বাল্যলীলার বর্ণনার মধ্যে কৃষ্ণলীলার অবতারণা করে বসলেন। পদাবলীর গোষ্ঠলীলার অনুপ্রেরণার একটি চিত্র অঙ্কিত করলেন—গৌরী গোধন নিয়ে গোচারণে এসেছেন, বাঁশী বাজিয়ে ধেনুদের ডাকছেন। আজু গোসাই-এর মতে এটি ‘রসাভাস’। লিখলেন,

“না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসব্ব

মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে?

তা যদি হইত যশোদা যাইত

গোপালে কি পাঠায় রে?”

অসিতকুমারের মতে, “এই বিদ্রূপের খোঁচা অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত হইয়াছে।”

আর একবার রামপ্রসাদ গাইলেন তাঁর বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত

“এবার কালী তোমায় খাব।

(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে যাব।

হাতে কালী, মুখে কালী সর্বাঙ্গে কালী মাখিবা।”

রামপ্রসাদের এই ভাবোন্মাদে আজ গোসাই 'উত্তোর' গাইলেন :

“সাধ্য কি তোর কালী খাবি ?

ওযে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি !

সর্বাস্তে নয়, উভয় গালে ভূষো কালি মেখে যাবি।”

অসিতকুমার এই দুটি উদ্ধৃতি শুনিযে বলেছেন, “আজু গোসাইয়ের ধর্মবিশ্বাসে রামপ্রসাদের যে গান অসঙ্গত মনে হইয়াছিল, তিনি শাগিত ব্যঙ্গোক্তি নিষ্ক্ষেপ করিয়া তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেন। দুঃখের বিষয় জনশ্রুতি ছাড়া এবিষয়ে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব দৃষ্টান্ত মিলিত।”

পাওয়া যখন নেহাৎ গেলই না, তখন কথাসাহিত্যের বাজারে কিছু আনন্দলাভে আপত্তি কিসের ? এস, গল্পো শোন :



মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন হালিশহরে আসতেন তখন উভয়-কবির জন্যই কিছু কিছু উপটোকন নিয়ে আসতেন। শাল দো-শালা থেকে ধূতি-চাদর, কবিপত্নীর জন্য মুর্শিদাবাদী শাড়ি থেকে ঘুণীর মৃত্তিকাশিল্প। একবার তিনি দুই কবিকেই উপহার দিলেন কিছু ফুলগাছের বীজ। বললেন, এই বীজ থেকে ফুলের চারা হবে, ফুল ফুটবে, তাতে কবিত্ব্য তাঁদের ইষ্টপূজার ব্যবস্থা সহজেই করতে পারবেন। রামপ্রসাদকে দিলেন জবা আর অপরাজিতার বীজ ; আর আজু গোসাইকে নয়নতারা আর শ্যামসোহাগী। দুই কবিই খুশি। নিজ নিজ বাগিচায় প্রয়োজনীয় ফুল ফুটলে কত সুবিধা।

দু-বাগানেই চারাগাছ জন্মালো। পাতা বার হল, ক্রমে ফুলও ফুটল।

কিন্তু কী বিড়ম্বনা ! মহারাজের ক্রমে বীজের পুলিন্দা ওলট-পালট হয়ে গেছে। গোসাইজীর বাগিচায় ফুটল রাঙা জবা আর নীল অপরাজিতা, ওদিকে শাক্তকবির বাগানে শ্যামসোহাগী ! কোন মানে হয়। রাজার উপহার দেওয়া ফুলগাছের চারা, না যায় উপড়ে ফেলা, না ছাগল দিয়ে খাওয়ানো। মহারাজ পরের বার পরিদর্শনে এসে সে-বার্তা শুনে বললেন, কবিরঞ্জন, এজন্যই চণ্ডী বলেছেন, “যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।” দেখুন দেখি কাণ্ড ! তা সে যাই হোক, ভুল জায়গায় ফুটেছে বলে তো ওদের প্রাণদণ্ড হতে পারে না ? আপনারা প্রতিদিন ফুল ও-বাড়ি দিয়ে আসবেন, এ-বাড়ি নিয়ে আসবেন।

দুজনের কেউই বুঝতে পারেননি, এটি মহারাজের ভাষ্টি নয় আদৌ। তিনি চেয়েছিলেন দুটি পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হোক। দুজনে বলতে গেলে প্রতিবেশীই। দুই ভদ্রাসনের মাঝখানে একটি মাত্র দিঘির ব্যবধান। একটি মাত্র পুষ্করিণী, কিন্তু তারও নাম দু-দুটো। রামপ্রসাদ তার নাম রেখেছেন “কালী দহ”, শুনে আজু গোসাই তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, না, ওটার নাম “কালীয়দমন দহ” !

রাজা-মশাই বললেন, আপনাদের দুজনেরই কন্যাসন্তান আছে। একদিন তুলসী কবিরঞ্জনের বাড়িতে পৌছে দেবে জবা, অপরাজিতা ; পরদিন জগদীশ্বরী গোসাইজীর বাড়িতে পৌছে দেবে

নয়নতারা আর শ্যামসোহাগী।

রাজ্যদেশ। লঙ্ঘন করা যায় না। আজ তবু আপত্তি তোলেন, ছোটখুকি বালিকা মাত্র, কিন্তু তুলসী ত্রয়োদশে পড়েছে, ঘরের বার হয় না যে মহারাজ।

ছোটখুকি অর্থে জগদীশ্বরী, রামপ্রসাদের কনিষ্ঠা কন্যা।

মহারাজ সহাস্যে বলেন, তা তুলসী যদি পথে বার না হয় তবে তার মা নিজেই সে কাজটা করে দিতে পারেন, একগলা ঘোমটা টেনে। এ তো বলতে গেলে পাশের বাড়ি! অবশ্য কবিরঞ্জনকে বাড়িতে খাড়া আছে, সেই ভয়ে যদি গৃহিণীকে ও বাড়ি না পাঠান...

গৌসাইজী সলজ্জে বাধা দিয়ে বলেন, না না, খাড়াকে আমি খোড়াই ডরাই!

মহারাজও সহাস্যে বলে ওঠেন, এই তো বীরের মতো কথা! ওঁর খাড়া আছে তো আপনারও বাঁশি আছে! আর বাঁশির ধর্মই হচ্ছে পরত্নীকে মোহিত করা! কবিরঞ্জনকেও নিজের ঘর সামলাতে হবে!

আলোচনাটা গৃহিণী-ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে দেখে দু-পক্ষই প্রসঙ্গান্তরে আসেন।

—এবার একটু গান-বাজনার আসর শুরু করা যাক মহারাজ।

যে তথ্যটা মহারাজ ছাড়া দুই কবিও জানতেন না তা এই—বাঁশি শাস্ত্র-ঘরের ছেলেও বাজায়, আর তাতে পরত্নী নয়, পরের ঘরের অনুভূত ত্রয়োদশীও মোহিত হয়ে যেতে পারে।

তাই গিয়েছিল। কবিরঞ্জনকে কনিষ্ঠপুত্রটি—রামমোহন, আজ গৌসাই-এর দাদার টোলে পড়তে যেত। বয়সে সে তুলসীর চেয়ে বছর তিন-চারের বড়। আলাপ না হওয়ার হেতু নেই, আর বয়সটা এমন যে, মুখ না হওয়ারও!

মহারাজের ইচ্ছা কিছুটা সফল হয়েছিল। ছোটখুকি বা তার মা সকালে শ্যামসোহাগী ফুলগুলি তুলে গৌসাই বাড়ি দিয়ে আসতেন আর সাজি ভরে নিয়ে আসতেন জবা আর অপরাজিতা। পরদিন গৌসাই গৃহিণী তার প্রতিদান দিতেন। ফলে সহজেই দুটি পরিবারের মধ্যে দেখা দিল সম্প্রীতি। কিন্তু দু-পক্ষই সজাগ—ঘি আর আশুন যেন পরস্পরের সন্নিকটে না আসে। শাস্ত্রবাড়ির ছেলে আর গৌসাই-বাড়ির মেয়ে। তারা যে কোথায় লুকিয়ে-চুরিয়ে সাক্ষাৎ করত তা কাকপক্ষীতে টের গেলেও অভিভাবকেরা টের পেতেন না।

এর মধ্যে আরও কিছু জটিলতা দেখা দিল। শ্যামচাঁদের পূজা হয় সকালে, মা শঙ্করীর পূজা রাত্রে। সুতরাং ফুল দিয়ে ফুল নিয়ে আসা চলে না। তাহলে সারা দিনে জবা-অপরাজিতা ফুলগুলি শুকিয়ে যায়। ফলে দান-প্রতিদানটা দৈনিক নয়, এ-বেলা ও-বেলার ব্যাপার। কখনো বা রামমোহন নিজেই গিয়ে তুলসীর তোলা ফুল সাজি ভরে নিয়ে আসত। তাতে দোষের কিছু নেই।

তারপর একদিন। ছোটখুকি যে সাম্প্রতিক জ্বরে শয্যাশায়ী সে খবরটাও জানা নেই কবিরঞ্জনকে। সংসার বিষয়ে তিনি উদাসীন। সারাদিন আছেন ভাবের ঘোরে। পদরচনা করা, তাতে সুর দেওয়া আর 'মাকে শোনানো।

সেদিন অপরাহ্নকালে উনি বাগানের বেড়া বাঁধছিলেন। তলতা-বাঁশের পিঠা-মুগি চাটাই। এপার-ওপার স্পষ্ট দেখা যায় না। ভরাট বাঁশের খুঁটি গুঁতেছেন চার হাত তফাৎ-তফাৎ। তলতা-বাঁশগুলি চেরাই করে বাঁধা হয়ে গেছে। এখন কাজ হচ্ছে সেটাকে খাড়া করা। একাজে

বেড়ার দু-পাশে দুজন লোক থাকলে ঝাঁপ দিতে সুবিধা হয়। রামমোহনের ঝোঁজ করেছিলেন, সে নাপাত্তা। গিল্লিকে যে এ-কাজে ডাকবেন তার সাহস নেই। সংসারের পাঁচকাজ সারতে সারতেই তাঁর নাকি হাড়-মাস কালি। হঠাৎ মনে হল, বেড়ার ওপাশ দিয়ে পা টিপে-টিপে ছোটখুকি কোথায় সটকে পড়ার তালে আছে। রামপ্রসাদ বুঝতে পারেন—ছোটখুকিটা বিচ্ছু। ঠিক বুঝে ফেলেছে এখনি হয়তো বাবামশাই ওকে ডাকবেন বেড়া-ঝাঁপার কাজে ফেরত দিতে। না হলে চোরের মতো পা টিপে টিপে সটকে পড়ার কী হেতু?

রামপ্রসাদ বজ্রগষ্ঠীর স্বরে হাঁকাড় পাড়েন: ছোটখুকি!

খমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ন যযৌ, ন তহৌ!

—কোথায় পালাচ্ছিলি?

ও-প্রান্তে তুলসী ততক্ষণে পাষাণ প্রতিমা। ছোটখুকির জ্বর হয়েছে সে জানে। তার মায়েরও 'হাত-অপসর' নেই। সামনে মাধব পঞ্চমী—মা আনন্দনাড়ু পাকাচ্ছে। মা-ই বললে, তুলসী, যা, চট করে ও-বাড়ি ফুলকটা পৌছে দিয়ে আয়। যাবি আর আসবি। ছোটখুকির সঙ্গে আড্ডা দিতে বসবি না।

তুলসী বলেছিল, ছোটখুকির জ্বর হয়েছে মা। তবে দেবি করব না। যাব আর আসব। তা ঠিক হয়নি। বনপথেই দেখা হয়ে গেছিল ওর রামদার সঙ্গে। ফুলের সাজিটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেই হত। প্রাণে ধরে তা পারেনি। কথাবার্তা বলতে বলতে অপরাহ্ন গড়িয়ে গেছিল সন্ধ্যার দিকে। শীথে ফুঁ-পড়তেই চমকে উঠে বলেছিল, আজ যাই রাম'দা, না হলে মা আমাকে আস্তে আস্তে খাবে না।

রাম খপ করে ওর হাতখানা চেপে ধরে বলেছিল, তাহলে কথা দাও, কাল আবার ঠিক এই সময়ে আসবে।

—কাল তো তোমার যাওয়ার কথা।

ঠিক তখনই বেড়ার ওপাশ থেকে ভেসে এসেছিল বজ্রগষ্ঠীর আহ্বান: ছোটখুকি!

রামমোহন তার গুঁঠামরে দক্ষিণ তর্জনীটা ছুঁইয়েছে। তুলসীর ছুটে পালাবার মতো সাহস নেই। বেড়ার ওপাশ থেকে রামপ্রসাদ ধমক দেন, দিনরাত শুধু পাড়া-বেড়ানো। মায়ের হাতে-হাতে কোন্ কাজটা করিস্ সারাদিনে?

সংসারও তুলসী নিশ্চুপ।

—স্থির হয়ে ওখানে দাঁড়া। আমি এদিক থেকে গুণ-সূচের ফোড় দেব, তুই ফের্তা দিয়ে সূচ এ বাগে ফিরিয়ে দিবি। বুঝলি?

তুলসী শুধু বললে, হঁ।

তারপর মুলিবাঁশের চাটাই শুধু এ-ফোড় ও-ফোড় হতে থাকে তুলসীর হৃৎপিণ্ডের মতো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে রামমোহন পা-টিপে এগিয়ে আসে। মক্ষিকারিতাড়ন মুন্ডায় তুলসীকে কেটে পড়তে বলে। তুলসী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিশেঙ্গে পালিয়ে যায়। রামমোহন অতঃপর ছোটখুকির ভূমিকায় বেড়ায় ফের্তা দিয়ে চলে, আর বাবা-মশায়ের হিতোপদেশ শুনতে থাকে। রামপ্রসাদ এক-তরফা বকবক করে চলেবেড়ার এপাড়

কুমারহট্ট

থেকে—দুদিন পরেই তো পরের ঘরে চলে যাবি, মা। তখন কি আর মাকে পাবি? যৌতুক পারিস মায়ের হাতে-হাতে সাহায্য করিস্। সে বেচারি একাহাতে আর কতটা পারে, বল? তুই ছাড়া আর তার কে আছে? আমি তো ভাবের ঘোরে পড়ে আছি, তোর দাদাটা তো দিন দিন একটা বঁাদর হচ্ছে...

রামমোহন কোন প্রতিবাদ করে না। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রামপ্রসাদ বলেন, আজ থাক, মা। আর দেখা যাচ্ছে না। তুই ইদিকে আয়।

এতক্ষণ সব আদেশ পালন করেছে। এইবারে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করল মেয়েটি। বাস্তবে ছেলেটি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হাঁকাড় পাড়েন, কী হল? ছোট খুকি? আয়!

কোন সাড়া নেই।

কাটারিখানা হাতে তুলে নিয়ে বেড়ার ফটক পার হয়ে এপারে এসে দেখেন ভোঁ-ভোঁ। কী-হল? মেয়েটা বাড়িতেই ঢুকল তো? কই নজরে পড়েনি তো। কিন্তু বাড়ি না ঢুকলে এই আধারে সে যাবেই বা কোন চুলোয়? ব্যস্ত-সমস্তভাবে ফিরে আসতে থাকেন ভদ্রাসনের দিকে। লক্ষ্য হল গৃহিণী শঙ্খ হাতে বার হয়ে এসেছেন দাওয়ায়। তাঁকেই প্রশ্ন করেন, ছোটখুকি ফিরে এসেছে বাড়িতে?

গৃহিণী শাঁখ বাজাতে তুলে গেলেন। কপালে করাঘাত করে বলেন, হা আমার পোড়া কপাল! কী মানুষ নিয়েই ঘর করছি। ছোটখুকি আজ দু-দিন জ্বরে বেইঁস, সে খবরটাও ঘরের মানুষটা জানে না।

—জ্বরে বেইঁস! কে? ছোটখুকি?

গৃহিণী রামপ্রসাদের রাম-দা সমেত হাতখানি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন ঘরের ভিতর। দেখিয়ে দিলেন, ঐ দেখ' সে নিজের চোখে!

বজ্রহত হয়ে গেলেন রামপ্রসাদ। তাহলে কে গুঁর হাতে-হাতে দড়ি ফিরিয়ে দিল এতক্ষণ? আহা মুখখানি দেখা যায়নি। ডুরে শাড়ির আভাসটুকু দেখেছেন। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চরণদুটি—তাতে আলতাপরা! বেইঁস ছোটখুকির পায়ে আলতার চিহ্নমাত্র নাই।

রামপ্রসাদ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন অসুস্থ কন্যার শয্যাপার্শ্বে। তাঁর দু-চোখে অশ্রুর বন্যা। মুখে বোল, এ তুই আমাকে কী হলনা করলি দয়াময়ী পাম্বলী!

বসে পড়েছেন কবিপত্নীও। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে। আধপাংলা নিয়ে ঘর করা যায়; এ যে বদ্ধ উদ্গাদ!



যে-কথা আগে বলেছি, আবার তাই বলি: কালিকা দেবী স্বহস্তে রামপ্রসাদের বেড়া ফিঁসিয়ে দিয়েছেন কি দেননি তার উপর নির্ভর করে না সেই মহা-সাধকের মহিমা। তাঁর নামে সুপ্রচলিত অলৌকিক কাহিনীর এই লৌকিক-ব্যাখ্যা স্বজ্ঞানে দিতে বাধ্য হচ্ছি তাঁকে তুচ্ছ করতে নয়, তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে। রজ্জুতে যে ব্যক্তির সর্পদ্রম হয়, তার 'সর্পজন্মভীতি'তে তিলমাত্র পার্থক্য হয় না। রামপ্রসাদ যে মা কালীকে কন্যারূপে ল্যভ কর্তে ফোটা কদমফুলের মত

রোমাঞ্চিততনু হয়েছিলেন সেই আনন্দ অনুভূতি, সেই পরমপ্রাপ্তির তুরীয়ভাব তো তিলমাত্র খাটো হচ্ছে না। ভক্ত রামপ্রসাদ তবু ভক্ত রামপ্রসাদই থাকছেন।

রামপ্রসাদের মৃত্যুর সম্বন্ধও এক অলৌকিক কাহিনী। এটাকে ‘অলৌকিক’ বলা ঠিক নয়। অনেক সাধক নিজের লীলা সম্বরণের বিষয়ে পূর্বাহ্নেই ইঙ্গিত পান। এ নিয়ে ঊনবিংশ শতকের অনেক ভারতীয় সাধকের নানান কাহিনী প্রচলিত। বিংশ শতাব্দীতেও তা আছে, আমাদের জমানায়। স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ নিজেদের তিরোভাবের ইঙ্গিত পূর্বেই জানিয়েছিলেন।

ফলে রামপ্রসাদের সম্বন্ধে ঐ প্রচলিত কাহিনীটি অসাধারণ হলেও অলৌকিক নয়। রামপ্রসাদের তখন পরিণত বয়স—একষট্টি। সেটা 1781 সালের কার্তিক মাস। ভক্তকবির জীবনের শেষ কালীপূজা। সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন তিনি। সারাদিন উপবাস করে কালীপূজা সম্পন্ন করলেন।

তারপর মায়ের সামনে স্বরচিত একটি গান গাইলেন কবি। এটাই তাঁর শেষ রচনা:

“তারা! তোমার আর কি মনে আছে?

ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে?

শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি, মা গো?

ওমা ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥

আর যদি থাকিত ঠাই, তোমাকে সাধিতাম নাই, মাগো।

ওমা, দিয়ে আশা, কটিলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥

প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়, মা গো।

ওমা, আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥”

গানের মধ্যে কেমন যেন অমঙ্গলের সুর। রামমোহন এগিয়ে এসে বাবা-মশায়ের হাতখানি ধরে বললে, এবার উঠে আসুন। সারা দিন-রাত উপবাসে আছেন, আর গান নয়।

কবি হেসে বলেন, হ্যাঁ রে রাম, ঠিক বলেছি! আর গান নয়। গানের পালা সাক্ষ হয়েছে আমার। ‘দক্ষিণা’ যে হয়ে গেল।

—আসুন, উঠে আসুন। এবার বিসর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, হ্যাঁ, বিসর্জন! চল ঘাটে যাই।

—না! আপনার যাওয়া হবে না। আমরাই বিসর্জন দিয়ে আসব।

কবি মাথা নেড়ে বলেন, কী পাগলের মতো কথা বলিস্। আজ যে বিসর্জন! মায়ের সঙ্গে হাঁ-ও যাবে। তোরা আয়, মা কে নিয়ে আয়। আমি ঘাটের দিকে চললাম।

হঠাৎ গৃহিণীর দিকে ফিরে বললেন, পেন্নাম করবে তো করে নাও। আমি কিন্তু আর ফিরছি না!

শিউরে উঠলেন কবিগল্পী। বলেন, ওমা! সে আবার কি কথা?

—শুনলে না, আজ বিসর্জন। দক্ষিণা হয়ে গেছে যে! ‘আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে।’

হালিশহর

কারও নিষেধ কোনদিন মানেননি। যা মন চেয়েছে চিরটাকাল তাই করেছেন। কালীপ্রতিমার সঙ্গে নাচতে নাচতে চললেন গঙ্গার দিকে। দরাজ গলায় গান গাইতে গাইতে। এ গান তিনি নাকি কালি-কলমে রচনা করেননি। শেষ বিসর্জনের যাত্রাকালে উপস্থিত-কবির মতো রচনা করে গাইতে গাইতে গিয়েছিলেন:

“কালীগুণ গেয়ে

বগল বাজিয়ে

এ তনু তবণী তরা করি চল ধেয়ে

ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে।।”



রামপ্রসাদের পঞ্চবটী, কুমারহট

বিসর্জনের পর গঙ্গান্নান করে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে। সবাই তাই ফিরল। শুধু কবি আর ফিরলেন না তাঁর খেলা-ঘরে। ফিরে গেলেন মায়ের কোলে। চিরশান্তির রাজ্যে।

নৈহাটি



কুমারহট বা হালিশহরের দক্ষিণে নৈহাটি। কেউ কেউ বলেন, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এখানে একটি নয়া হাট বসান—এ কাঞ্চনপল্লী আর ভাটপাড়া নামক দুটি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী গ্রামের মাঝামাঝি অবস্থানে, গঙ্গার তীরে। সেই নয়া হাট থেকে নয়াহাটি, ক্রমে নৈহাটি।

পূর্বে এর কাছাকাছি ছিল একটি ঐতিহাস্যম্পন্ন গ্রাম: গৌরিয়া।

ভাটপাড়া অথবা কাঞ্চনপল্লীর মতো এখানেও বাস করতেন অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-উনবিংশ শতকে এটি বাঙলার এক সাহিত্য-তীর্থ হয়ে ওঠে।

বর্তমান নৈহাটী স্টেশনের পূর্বদিকে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভিটেখানি ছিল। তার অনেকটা এখন রেলওয়ে ইয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত, তবু তাঁর বৈঠকখানা ও পৈত্রিক দেবালয়গুলি রক্ষা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কুলদেবতা বিজয় রাধাবল্লভ জীউর রথযাত্রা বোধকরি এখনো হয়ে থাকে। কাঁঠালপাড়ার সাহিত্যসেবীরা আজও সাহিত্য-সম্রাটের জন্মদিন পালন করেন, ‘বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলন’ করে থাকেন।

ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভদ্রাসনও ছিল নৈহাটীতে।

গৌরিফা গ্রামখানি নৈহাটী রেলওয়ে স্টেশানের কিছু উত্তরে। ‘নববিধান’ মতাবলম্বী বাম্পী ও সমাজ সংস্কারক ব্রাহ্মধর্মের মহান নেতা কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিধন্য।

উনবিংশ শতকের সেই ঐতিহ্য বহন করে আমাদের সমকালীন প্রথিতযশ কথাসাহিত্যিক বঙ্কুবর সমরেশ বসুও নৈহাটীতে বাগদেবীর পতাকা উড্ডীন রেখে গেছে।

ভাটপাড়া



নৈহাটীর ক্রোশখানেক দক্ষিণে ভাটপাড়া। সেকালের ঐ অতিবিখ্যাত জনপদটির অবস্থান জানাতে একালীন পাঠক-পাঠিকাকে বলে দিতে হবে: কাঁকিনাড়া ইস্তিশানের কাছে।

কাশী, নবদ্বীপ, ত্রিবেণীর সঙ্গে সমান তালে সংস্কৃত চর্চার দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন এখানকার পণ্ডিতসমাজ। কোন সামাজিক বিধানদানে ভাটপাড়ার অধিকার ছিল তুল্যমূল্য। ভাটপাড়া কথাটি এসেছে ‘ভট্টপল্লী’ থেকে। বলা বাহুল্য: ভট্ট অর্থে ব্রাহ্মণ।

এই জনপদের অযুত-নিযুত পণ্ডিতদের ভিতর দু-একজনের কথা বলি:

হলধর তর্কচূড়ামণি (জন্ম: 1790): স্ববংশীয় জনার্দন বিদ্যাভাষ্যপতি মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য। প্রখ্যাত ন্যায়াবীশ। নবান্যায়ের একটি ‘পত্রিকা’ প্রকাশ তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয়।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন (জন্ম: 1829): সীতানাথ বিদ্যাভূষণের সুযোগ্য পুত্র। প্রথমে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে নৈয়ায়িক হলধর তর্কচূড়ামণি এবং যদুনাথ সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবান্যায়ের তাঁর উদ্ভাবিত যুক্তি-কৌশল এখনো আলোচিত হয়। ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ যখন ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি বিতরণের আয়োজন করেন তখন প্রথম অটুজন মহাপণ্ডিতের ভিতর রাখালদাসকেও ঐ উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁর শিষ্য শিবচন্দ্র সার্বভৌমও পরে (1903) এই উপাধি লাভ করেন।

নিমাই তর্কপঞ্চানন—ইনিই নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কিনা ঠিক জানি না।

শিবচন্দ্র সার্বভৌম (জন্ম: 1847): রাখালদাসের সুযোগ্য শিষ্য। পশ্চিমদেশীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ভট্টপল্লীতেই বসবাস করতেন। প্রথম জীবনে পিতা রঘুনাথ বিদ্যাভূষণ ও খুল্লতাত জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট শিক্ষা করতেন। মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে ‘পাণ্ডুরগ্রাম’ নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করে বিখ্যাত হন। পরে মূল্যজ্ঞেয় সংস্কৃত কলেজে আমন্ত্রণ অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তখনই ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি লাভ করেন।



মূল্যজোড় : বর্তমান রেলস্টেশন শ্যামনগরে নেমে যেতে হয়।

স্টেশানের কাছেই ব্রহ্মময়ীর কালীমন্দির। সঙ্গে দ্বাদশ শিবমন্দির। কালীর প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি প্রাচীন লোকগাথা আছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এই মূল্যজোড়েই আমাদের কাহিনীর অন্যতম চরিত্র ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন। এই গ্রামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রিয় সভাকবিকে কিছু ব্রহ্মোত্তর দান করেছিলেন। কবি সেখানে একটি ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। তাঁর আজীবন-প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীকে পিত্রালয় থেকে নিয়ে এসে 'রাধানাথ'-রূপে জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর সানন্দে অতিবাহিত করেন।

মূল্যজোড়ের অনতিদূরে রহতা গ্রাম।

সে গ্রামের দুই পণ্ডিত আমাদের নমস্যা। দুই সহোদর ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (জন্ম : 1840) কিশোর বয়সেই সংসারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হওয়ায় কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেননি, কোন ডিগ্রিও পাননি। কিন্তু অসীম অধ্যবসায়ে স্বীয় প্রচেষ্টায় বাঙলা, ইংরাজী, সংস্কৃত এবং গণিতে সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। এবং আর একটি বড় কাজ করেছিলেন : অনুজ ভ্রাতাটিকে সুপণ্ডিত করে তুলেছিলেন। অর্থভাবে নিজ জীবনে যে ইচ্ছা পূরণ হয়নি, অনুজের ভিতর তা পরিস্ফুট করে তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

রঙ্গলাল বীরভূমে একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করতেন। ডিগ্রি থাকা না-থাক-সে-আমলে বিদ্যার কোনও মানদণ্ড ছিল না। ঐ কাজ করতে করতেই 1880 সালে কলকাতায় একটি ছাপাখানা খুলে বসেন। পরে সেটি স্বগ্রামে অপসারিত করেন। দুরন্ত আত্মবিশ্বাসে ঐ ক্ষুদ্র ছাপাখানায় তিনি ছাপতে শুরু করেন বাঙলা ভাষার প্রথম 'বিশ্বকোষ'। কী দুর্জয় সাহস! অর্থবল নাই, সাহায্যকারী বলতে একমাত্র তাঁর অনুজ। তবু তিনি ঐ বৃহৎ কাজে নেমে পড়লেন।

প্রথম খণ্ডটি সম্পাদনা করলেন তাঁর অনুজ : ব্রৈলোক্যনাথ।

হ্যাঁ, সেই আশ্চর্য মানুষটি। যঁার কলম থেকে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ব্যতিরেকেও জন্ম নিয়েছিল : কঙ্কাবতী, ডমরুচরিত! সমকালীন এক মহাপণ্ডিত। বিচিত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভা। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন কলকাতা সংগ্রহশালার (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের) সহকারী কিউরেটর। 1883 সালে সরকার তাঁকে বিলাতে পাঠান। প্রত্যাবর্তন করে লেখেন : ইউরোপ-ভ্রমণ।

রঙ্গলাল প্রবর্তিত এবং ব্রৈলোক্যনাথ সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এর সেই প্রথম খণ্ডের অঙ্কুর কালে মহীরূহে রূপান্তরিত হয় আর একজন মনীষীর কৃতিত্বে : নগেন্দ্রনাথ বসু।

আজও গবেষকগণ বারে বারে শরণ নেন ঐ বাইশ খণ্ডে সমাপ্ত মহাগ্রন্থে।

মূল্যজোড়ের নিকটবর্তী ঝাউগাছী গ্রামে একটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটি

নির্মাণ করিয়েছিলেন বর্ধমানের তদানীন্তন নাবালক-মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের জননী—বর্গী আক্রমণের আশঙ্কায়। অবশ্য কারও কারও মতে ঐ ধ্বংসাবশেষ একটি প্রাচীন নীলকুঠির।

এবার শ্যামনগর স্টেশানের কাছে ঐ ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরের উপকথাটি শোনাই:

তথ্যসূত্র একটি মাত্র পংক্তি: “কথিত আছে, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহনের সাত বৎসর বয়স্কা কন্যা ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হইলে তাহার শব গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মূলাজোড়ের ঘাটে গিয়া লাগে এবং সেখানে গোপীমোহন স্বপ্নাদেশ— পাইয়া এই মন্দির নির্মাণ করেন।”

ডিহি-কলিকাতা



কিন্তু মূলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী মন্দিরের গল্প শুনতে হলে ঐ খালটি তোমাদের পার হতে হবে, বাপু —‘মারহাটা ডিহ’; প্রবেশ করতে হবে ডিহি কলকাতায়।

সূতানুটি-গোবিন্দপুরের ইতিহাসস্বীকৃত আদিম বাসিন্দাদের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে জনার্দন শেঠ, আর রাজারাম মল্লিকের নাম, বলতে হবে বসাক আর পঞ্চানন কুশারীর কথা। ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে জনার্দনতনয় বৈষ্ণবচরণ শেঠ ছিলেন ‘The richest and the most honest merchant of his time.’ এই ধনকুবের পরিবার যে পণ্যদ্রব্যটি নিয়ে আদি যুগে ব্যবসা ফেঁদে ছিলেন তা হচ্ছে বিশুদ্ধ গঙ্গোদক! ‘কলিকাতার-কথা’-র প্রমথনাথ মল্লিক জানাচ্ছেন, “বৈষ্ণবচরণ শেঠের পিতার শীলমোহর করা গঙ্গাজল দেশে-বিদেশে যাইত ও ত্রৈলোক্যদেশে শ্রীশ্রী রামচন্দ্রের পূজায় ঐ জল ভিন্ন অন্য কোনও জল ব্যবহৃত হইত না।” বিশুদ্ধ গঙ্গাজল ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছিল নিকষিত সুবর্ণে! রাজারাম মল্লিক আদিতে বাস করতেন ত্রিবেণীতে। ব্যবসায় সূত্রে পরে চলে আসেন কলকাতায়। তাঁর দুই পুত্র—দুজনই আর্থিক মূল্যায়নে স্বনামধন্য: দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ মল্লিক। শেষোক্তের নামের বাজারটি আজও বর্তমান।

আমাদের কাহিনীর সূত্র: পঞ্চানন কুশারী। তিনি বাস করতেন আদি গঙ্গার ধারে।

শোনা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষ মহেশ্বর এবং তাঁর ভ্রাতা শুকদেব কুশারী পূর্বযুগে বাস করতেন যশোহরের বারোপাড়া গ্রামে। কী কারণে জানা যায় না, দুই ভাই তাঁদের যশোহরের আদি নিবাস ত্যাগ করে গোবিন্দপুর গ্রামে এসে ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। এখানেও এক জনশ্রুতি: তাঁদের একজন পূর্বপুরুষকে নাকি মুসলমান সুলতান অথবা কাজী নিষিদ্ধ মাংস ভোজনে বাধ্য করেছিল! সেই সুবাদে নাকি স্বগ্রামে তাঁদের বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওঁরা উঠে আসেন গোবিন্দপুরে।

পঞ্চানন কুশারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজী কারবারে যোগ দেন। তাঁর কাজ ছিল দেশী মেহনতি মানুষদের সাহায্যে বিদেশী বণিকদের জাহাজ থেকে মাল খালসু করা। ঐ সঙ্গে

ডিহিকশিকতা

আগন্তুকদের প্রয়োজনীয় খাদ্যপানীয় সরবরাহ করা। পঞ্চানন তাঁর কর্মস্থলের কাছাকাছি, অর্থাৎ আদি গঙ্গার ধারে শূদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলে নির্মাণ করেন এক ক্ষুদ্রায়তন ভদ্রাসন। সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। জল-অচল জাতের মানুষ তাদের পাড়ায় একঘর ব্রাহ্মণ পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল। ওঁরা পীরালী শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ। বামন মানুষ—নাম ধরে তো আর ডাকা যায় না, তাই সবাই তাঁকে ডাকত : ‘ঠাকুর-মশাই’। তা থেকেই উপাধিটা হয়ে গেল : ঠাকুর। ‘কুশারী’ উপাধী পরিত্যক্ত হল। সাহেবদের উচ্চারণে হল : টেগোর।

আমাদের কাহিনীর কালে, 1742 এ—অর্থাৎ মূল্যজোড়ে ব্রহ্মময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী পূর্বে, কলকাতায় জরিপের কাজ শুরু হয়। পঞ্চানন তাঁর দুই পুত্র—জয়রাম ও রামসন্তোষকে লাগিয়ে দিলেন জরিপের কাজে—আমিন হিসাবে। জয়রামের দুই পুত্র—অগ্রজ নীলমণি হচ্ছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ—যে শাখায় কালে আবির্ভূত হবেন রবীন্দ্রনাথ। আর অনুজ দর্পনারায়ণ (1731-93) হচ্ছেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

আমিন হিসাবে জীবন শুরু করলেও দর্পনারায়ণ পরে চাকুরী নিয়েছিলেন একটি ফরাসী কোম্পানিতে; ক্রমে ছইলার-সাহেবের দেওয়ান। শেষে ইস্তফা দিয়ে নিজ ব্যবসায়। অচিরেই অগাধ সম্পত্তির মালিক। জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলমণির সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কিছু মতান্তর হওয়ায় পৃথক হন। পাথুরিয়াঘাটার সাবেক ভদ্রাসনে রয়ে গেলেন দর্পনারায়ণ, প্রাচীন ক্ষুদ্রায়তন গৃহটির স্থলে নির্মাণ করলেন বিরাট প্রাসাদ; অগ্রজ নীলমণিও তৈরী করলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

মূল্যজোড়ের ব্রহ্মময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠাতা গোপীমোহন ঠাকুর (1760-1819) দর্পনারায়ণের পুত্র। বস্তুত পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের দ্বিতীয় পুরুষ, অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্য। অস্তুত অটটি ভাষায় তাঁর অধিকার : ইংরাজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, সংস্কৃত, ফারসী, উর্দু, হিন্দি ও বাঙলা। ব্রিটিশ সরকারে বরাবর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাক-রামমোহন যুগের এক আধুনিকমনা। পাশ্চাত্য-সংস্কৃতিকে চিনবার আগ্রহ তাঁর প্রবল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারকল্পে ‘হিন্দু কালজে’ স্থাপনের সময় এককালীন দশ-হাজার টাকা দান করেন এবং ‘হিন্দু-কালজে’র বংশানুক্রমিক গভর্ণর পদও লাভ করেন। সংস্কৃত-চর্চায় উৎসাহী এই ধনকুবের সঙ্গীতজ্ঞ এমনকি ব্যায়ামবীরদেরও প্রতিপালন করতেন। ঐরই কন্যা ব্রহ্মময়ী।

ব্রহ্মময়ীর অনুজ ভ্রাতা প্রসন্নকুমার (1801-1868)—কৃতবিদ্য পি. এন. টেগোর। যিনি রক্ষণশীল হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও রামমোহনের সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্ম হয় জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুর পর।

এতক্ষণ যে-সব কথা বলেছি তা তথ্যনির্ভর ইতিহাস। তোমাদের সঙ্গে ‘ব্লাইণ্ড’ খেলব না বলে সবার আগে হাতের সবকটা তাসই বিছিয়ে দিয়েছি টেবিলে। এবার শোনাই শ্যামনগরে ব্রহ্মময়ী মন্দিরে সংগৃহীত উপকথা, কথাসাহিত্যিকের কল্পনায় মিশিয়ে :

সন 1793—অর্থাৎ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণের মৃত্যু বৎসর।

কার্তিকের অমাবস্যা। পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদের দ্বিতলে দক্ষিণ-পূর্বে কঠিনমাটির শয়নকক্ষ। বৃন্দায়তন কামরা। উপরে ঝাড়লঠন, দেওয়াল-গিরিতে বাতি জ্বলছে। ঘরে বৃন্দাকার পালঙ্ক।

উপরে টানা-পাছা, এখন চলছে না। এটির ব্যবহার ধনাঢ্য-পরিবারে সদ্য-আমদানি। কায়দাটা শিখিয়েছে ওলন্দাজেরা—যেমন তারা নিজেরা শিখেছে বঙ্গদেশে এসে আলবোলায় তাম্বাকু সেবন। দেওয়ালে প্রকাণ্ড কয়েকটি তেলরঙে-আঁকা প্রতিকৃতি-চিত্র: জয়রাম, নীলমণি আর দর্পনারায়ণের। এগুলি এতদিন ছিল একতলার বৈঠকখানায়। কর্তামশাই শয়্যাশায়ী হয়ে পড়ার পর বর্তমানে তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁরই ইচ্ছায়। মানসিকভাবে তিনি ঐ প্রাচীনকালেই থাকতে ভালবাসেন। তৈলচিত্রগুলি একেছেন একজন বিদেশী চিত্রকর, গোপীমোহনের উদ্যোগে। জয়রামের চিত্রটি আন্দাজে, বর্ণনা শুনে শুনে। বাকি দুটি সামনে বসিয়ে।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। দীপাবলীতে কলকাতা শহর আলোকোজ্জ্বল। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় আতসবাজির রোশনাই। এটিও ঐ ফিরিসিদের অবদান। দীপাবলী ছিল—শোনা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের পর অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের সময়েও শহরে দীপসজ্জা হয়েছিল; কিন্তু ঐ হাউই আর তুবড়ির চল হয়েছে বিদেশীরা আসার পর।

দর্পনারায়ণের বয়স এমন কিছু নয়—তিনকুড়ি দুই। কিন্তু শরীর ভেঙে গেছে। বস্তৃত বুঝতে পেরেছেন, তাঁর কর্মময় জীবনের শেষ সীমান্তে উপনীত হয়েছেন তিনি। বিদায় নেবার দিন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন সংসারের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইদানীং তাঁর সুবহু পালকে তিনি একা শয়ন করেন না। তাঁর আদরের নাতনিটি এসে গুটিগুটি শুয়ে পড়ে বৃদ্ধের পাজর ঘেঁষে। গোপীমোহনের জ্যেষ্ঠাকন্যা—সপ্তমবর্ষীয়া ব্রহ্মময়ী।

‘ব্রহ্মময়ী’। নামটা উচ্চারণ করা শক্ত। কিন্তু কী করবেন? বাপের দেওয়া নাম—সেটাই চালু হয়েছে। পণ্ডিত ছেলে, উপেক্ষা করা যায়নি। সবাই ডাকে ‘বড়থুকি’। উনি ডাকতেন ‘ছোট গিন্নি’। তাতে এতদিন আপত্তি ছিল না ওঁর নাতনির। ইদানীং—কথাটার অর্থ বুঝতে পারার পর, সে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছে। তাই আজকাল ওকে ডাকেন ‘দিদিভাই’। গতবৎসর আত্মদ্বিতীয়ার পর থেকে। ব্রহ্মময়ীর ছোট ভাই নেই। সবাই ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়, ও বেচারি দিতে পারে না। তাই বৃদ্ধ সে দায়িত্বটুকু নিয়েছেন—ব্রহ্মময়ীর ‘দাদা’ সেজেছেন। ভারী ন্যাওটা মেয়েটা।

নিচে পূজাদালানে কর্মব্যস্ততা। আজ মধ্যরাত্রে মায়ের পূজা। বাড়িসুদ্ধ সবাই সেখানে জুটেছে। শুধু দলছুট দিদিভাই এসে টুমটুম হয়ে উঠে বসেছে দাদুর পালকে। সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হলে প্রতিদিন বৃদ্ধ ওকে বিগতযুগের গল্প শোনান। আজও তাই চলছিল। কেণ্টা—ওঁর ব্যক্তিগত খিদমদগার, মার্বেল-মেঝেতে থাপন জুড়ে বসে উর্ধ্বমুখে সে গল্প শুনছিল।

—তারপর? তারপর কী হল দাদু?

—তিন-দিন একটানা বৃষ্টির পর শুরু হল ঝড়! উঃ! সে কী ভীষণ ঝড়! গঙ্গার জল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ডিহি-কলকাতার পথে-ঘাটে শুধু কাদা আদ্র জল। সাহেবদের ব্রহ্মা, হাম্মসম বের হচ্ছে না, পাল্কি-বেয়ারা পথে নামতে পারছে না। পথঘাট ভোঁ-ভাঁ! যে-সব বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তখন তো এমন দোকান-বাজার ছিল না। ইণ্ডিয়ান দুর্দিন হাট বসত গোবিন্দপুরে—বেঙ্গতিবার আর রোববার। তা হাট বসবে কোথায়? সব তো জল থেঁ-থে! যে-যার ভাঁড়ারের চিড়ে-মুড়ি খেয়ে অথবা পেটে কিল মেরে পুড়ে আছে! এমন সময় এল

পাথুরিয়াঘাটা

ঝড়। তাতেও নিস্তার নেই। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেই হল ভূমিকম্প! আমার অল্প অল্প মনে পড়ে সে রাত্রের কথা! মনে হল—এবার সবাইকে একসঙ্গে মরতে হবে। দাদু আমাদের সবাইকে নিয়ে টোকিতে উঠে বসেছেন। কলকল করে ঘোলা জল ঢুকছে ঘরে...

ব্রহ্মময়ী জানতে চায়, আপনারা দোতলায় উঠে এলেন না কেন?

—কী পাগল মেয়ে রে তুই! তখন কি আমাদের পাকা দালান ছিল? আমরা সবাই থাকতাম খড়ো ঘরে, আদি গঙ্গার ধারে। আমরা তখন যে খুব গরিব—

—ঐ কেঁটদার মতো?

দিদিমণির এই বোকার মতো প্রশ্নে দারুণ লজ্জা পেয়ে কেঁটা মুখটা লুকায়। কানটা কিন্তু সজাগই থাকে। কর্তা-মশাই হাসতে হাসতে বলেন, না রে! কেঁটা তো পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির পেয়াদা—মস্ত বড়লোক—গায়ে পিরান চরায়! আমাদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ!

—তারপর? তারপর?

—সব কথা তো আমার মনে নেই। তখন আমার বয়স এই তোর মতো। পরে শুনেছি। সাহেবদের গীর্জার মাথাটা ভেঙে গেসল; গোবিন্দরামের নবরত্নমন্দিরের চূড়োটাও গেল ভেঙে! কত লোক যে ডুবে মরে গেল, কত বাড়ি ভেঙে পড়ল তার আর লেখা-জোখা নেই!

দর্পনারায়ণ বর্ণনা করছিলেন 1737 খ্রীষ্টাব্দের সেই ঐতিহাসিক দিনটির: এগারোই অক্টোবর। তখন তাঁর বয়স ছয়-সাত! তার ঐতিহাসিক বিবরণ পাব 'অনারেবল্ জন কোম্পানির গুড ওল্ড ডেজ'-এ!

হলওয়েল—সাহেব বলেছিলেন মতের সংখ্যা তিন লক্ষ। সেটা নেহাৎই বাড়াবাড়ি। হলওয়েল-এর বদ-অভ্যাস সব কিছুই বাড়িয়ে বলা। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কলকাতার লোকসংখ্যাই এক লাখের কম। তবে হ্যাঁ—বিশ-ত্রিশ হাজার মানুষ ভেসে গেছিল নিশ্চয়। গঙ্গার জলস্ফীতি হয় প্রায় চল্লিশ ফুট! সমকালীন Gentleman's Magazine-এ প্রকাশিত সংবাদে বোঝা যায় যে, কয়েক হাজার নৌকা ডুবে যায়, অন্তত বারোখানি বড় জাহাজও ডুবে যায়। কলকাতার ইতিহাসে এতবড় প্রাকৃতিক দুর্বিপাক আর কখনো হয়নি। প্রমথনাথ মল্লিকের 'কলকাতার কথা' অনুযায়ী “ঝড় থামিবার পর জলমগ্ন জাহাজের গর্ভ হইতে মাল উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয়। একে একে তিনজন ডুবুরি নামিয়া গেল, কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না। শেষে দেখা যায় যে, এক প্রকাণ্ড কুস্তীর সেই ডেকের মধ্যে উহাদিগকে জলপান করিয়াছে। পরে উহাকে বধ করিলে উহার উদর মধ্যে হইতে তাহাদের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়।”

শুধু কলকাতা নয়, সমগ্র দক্ষিণবঙ্গই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। পর-বৎসর রাত অঞ্চলে হয়েছিল অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ।

গল্পে বাধা পড়ল। নিভাননী ছারের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। অবগুষ্ঠনে মুখটি আবৃত করে। কর্তার সামনে সে প্রকাশ্যে কথা বলবে না; তাই কেঁটাকে উঠে গিয়ে কানে-কানে শুনতে ফুল্ল। কেঁটা পরিচারিকার বার্তাটিকে বাজায় করে তোলে, দিদিমণি, বড়মা ডাকছেন। এবার আকাশ-পিদিম তোলা হবে। ছাদে এস!

ব্রহ্মময়ী তার বেড়াবেগীবাধা মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদ করে, আমি ষাট ষাট আমি যে এখন গল্পো শুনছি।

দর্পনারায়ণ ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করান। কার্তিক মাস ভর ভদ্রাসনের শীর্ষে আকাশ প্রদীপ জ্বালাতে হয়; যাতে স্বর্গত পূর্বপুরুষেরা পথ চিনে এসে তাঁদের অধঃস্তন পুরুষদের আশীর্বাদ করতে পারেন। প্রদীপটি যখন কপিকলের সাহায্যে বংশদণ্ডের শীর্ষে ওঠানো হয় তখন পরিবারের সকলে গৃহশীর্ষে সমবেত হয়ে পূর্বপুরুষদের প্রণাম করেন। এটাই প্রথা। কিন্তু ব্রহ্মময়ীর যুক্তি অন্য জাতের: আজ তো এ-বাড়ির ছাদে শত শত প্রদীপ! দাদুর বাবা-দাদাদের আজ আকাশ-পিদিম দরকারই হবে না! দর্পনারায়ণ তখুটা ওকে বুঝিয়ে দেন। রাজী করান।

ব্রহ্মময়ী ছাদে উঠে গেলে বৃদ্ধ আবার অতীত কালের স্মৃতিচারণে অবগাহন স্নান করতে থাকেন। এখন তিনি উত্থানশক্তিহীন—গৃহশীর্ষে যাবার ক্ষমতা নাই। তাই এখানেই বসে বসে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন, প্রপিতামহকে, —পিতামহ, পিতা এবং জ্যেষ্ঠাভ্রাতাকে।

জ্যেষ্ঠাভ্রাতা নীলমণি স্বর্গে গেছেন মাত্র দুই বৎসর পূর্বে।

এককালে সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য হয়ে ছিল বটে; কিন্তু পৃথগ্ন হবার পর দু-ভায়ে সম্প্রীতি হয়েছিল পুনরায়। জয়রাম প্রয়াত হয়েছিলেন পলাশী যুদ্ধের পূর্ব বৎসর। তখন তাঁরা 'ধনসায়র' বাস করতেন। অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে ধর্মতলা স্ট্রীট এসে পড়েছে এসম্প্রানেডে। দর্পনারায়ণের পিতৃদেব এবং খুল্লতাত তাঁদের আমলেই আদিগঙ্গার ধারের পর্ণকুটীর ত্যাগ করে সরে আসেন 'ধনসায়র'-এ। দুই ভাই—জয়রাম আর 'রামসন্তোষের' সম্ভাব ছিল আজীবন, ছিলেন একানবর্তী পরিবারভুক্ত হয়ে। জয়রামের মৃত্যু-বৎসরে সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করে বসে শহর কলকাতা। তখন সিরাজের তোপের মুখে যেসব বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার ভিতর ছিল তাঁদের ভদ্রাসন। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর সিরাজের সেই 'হঠকারিতার' প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ নবাবের তহবিল থেকে কলকাতা-ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানিকে। ঠাকুর পরিবারও পেলেন খেশারং। সে অর্থে ধনসায়রের ভদ্রাসন মোরামত করার উদ্যোগ করতে করতেই এসে গেল ক্লাইভের ফতোয়া। সেটা 1758 খ্রীষ্টাব্দ। হুসুমন্নামা অনুযায়ী জানা গেল, ইংরেজ লালদীঘির ধারে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ বানাতে উদ্যোগী। সেই কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে যেসব 'জেন্টু'-র ভদ্রাসন পড়েছে তাদের অন্যত্র সরে যেতে হবে। এজন্য তারা ক্ষতিপূরণও পাবে।

এইসময় দুই ভাই—পরবর্তী জমানার নীলমণি আর দর্পনারায়ণ—সরে আসেন পাথুরিয়াঘাটায়। গড়ে তোলেন নতুন একটি মোকাম। মাঝারি আকার। কিন্তু তাতেই নির্বিবাদে বাস করতে থাকেন দুই ভাই—একানবর্তী হয়ে।

কেটে গেল এক দশক। তারপর নীলমণি ঠাকুর কোম্পানির দেওয়ানী-কাজ পেয়ে চলে গেলেন উড়িষ্যা। কালেক্টরের সেরেস্তাদার হিসাবে। তাঁর পরিবার রয়ে গেল পাথুরিয়াঘাটায়। এ কাজে নীলমণি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। দর্পনারায়ণ সে সময় ছিলেন ইংরেজ হুইলারের দেওয়ান। তিনিও প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। অর্থই নাকি 'সকল অনর্থের মূল'। মনোমালিন্য দেখা দিল। বিষয়-সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল। নগদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে নীলমণি পাথুরিয়াঘাটার এজমালি বাড়ি ও দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্থিত দর্পনারায়ণকে লিখে দিলেন। ততদিনে তিনি আবার ফিরে এসেছেন ডিহি-কলকাতায়। জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শ্রেষ্ঠের কাছ থেকে এক বিঘা জমি ক্রয় করেন জোড়াসাঁকোতে। নির্মিত করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। নির্মিত হল

দাথুরিয়াঘাটা

সেই স্বনামখ্যাত—‘দক্ষিণের বারান্দা’।

দর্পনারায়ণও দাথুরিয়াঘাটার মোকামটিকে রূপান্তরিত করলেন প্রাসাদে।

এইসব পুরানো দিনের কথাই বসে বসে চিন্তা করেন দর্পনারায়ণ। তৈলচিত্রগুলির দিকে নির্নিমেষ-নেত্রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। প্রাসাদশীর্ষ থেকে ভেসে এল শঙ্খধ্বনি। অর্থাৎ আকাশ-প্রদীপ উঠে গেল কার্তিক অমাবস্যার অন্ধকার আকাশে।

দর্পনারায়ণ যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করালেন।



গোপীমোহন চিন্তিতমুখে বসেছিলেন বার-মহলে। বৈঠকখানায়। ইঁকো-বরদার রূপোর আলবোলায় তামাক সাজিয়ে দিয়ে গেছে, ফরসির নলটা ঊঁর হাতে ধরা। কিন্তু টান দিচ্ছিলেন না। কুণ্ঠিত ভ্রুভঙ্গে তিনি চিন্তা করছিলেন—সংবাদটা কীভাবে বাবামশাইকে বলবেন? প্রায় দেড়-কুড়ি বয়স, সুন্দর সুগঠিত যুবাপুরুষ। সমকালীন প্রথা অগ্রাহ্য করে এই পীরালী ব্রাহ্মণটি একপত্রিক। একটিমাত্র সন্তান—কন্যা ‘ব্রহ্মময়ী’। বড় আদরের। কন্যার নামটি তাঁর দেওয়া। বিচিত্র হেতুতে। এমন নাম এ পরিবারের পক্ষে অপ্রত্যাশিত। তাঁর পিতৃকুল শাক্ত—মেয়েদের নাম হয় তারা, কালী, ঘোড়শী, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী। মাতৃকুল বৈষ্ণব—সে তরফে মেয়েদের নামগুলি লক্ষ্মী অথবা শ্রীরাধিকার ছায়া দিয়ে গড়া; যেমন তাঁর নিজের নামটি দাদামশায়ের দেওয়া। গোপীমোহন দুই-কুলের সমঝোতা করতেই এমন একটি নাম বেছে নিয়েছেন—এটাই ছিল সকলের বিশ্বাস। বাস্তবে তিনি নামটি চয়ন করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য হেতুতে। একটি কিশোরবয়স্ক ক্ষণজন্মা তার্কিকের প্রভাবে।

অপরাহ্নকালে কবিরাজ-মশাই এসে বাবা-মশায়ের নাড়ি দেখে গেছেন। জনান্তিকে গোপীমোহনকে জানিয়ে গেছেন—আপাতদৃষ্টিতে দর্পনারায়ণকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখাচ্ছে বটে—তিনি উঠে বসছেন, গল্পগাছাও করছেন—কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর জীবনীশক্তি তিল-তিল করে নিঃশেষিত হয়ে আসছে। যে-কোন মুহূর্তে তাঁর কর্ণমূলে ‘তারকব্রহ্ম’ নাম শোনানো শুরু করতে হতে পারে। গোপীমোহনকে পরামর্শ দিয়েছেন, শ্যামা-মায়ের নিরঞ্জন হয়ে গেলেই যেন গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করা হয়। দৃঢ় অভিমত জানিয়ে গেছেন—এমন অবস্থায় যেন কর্তামশাইকে পূজা-দালানে কোনক্রমেই নিয়ে আসার চেষ্টা না করা হয়।

এটাই ঊঁর দৃষ্টিভঙ্গর হেতু। ঠাকুরদালানে মা-কালীর মূর্তিপূজা হবে আর দর্পনারায়ণ সেখানে উপস্থিত থাকবেন না—এটা যেন চিন্তাই করা যাচ্ছে না। বাবামশাইকে রাজী করাতেই হবে। কিন্তু কীভাবে?

পূজা গভীর রাত্রে। আত্মীয়-স্বজনে ভরা বাড়ি। নিমন্ত্রিতেরা এখনো আসতে শুরু করেনি। গোপীমোহন বৈঠকখানায় একটি ইজি-চেয়ারে বসে চিন্তা করছিলেন। দ্বাররক্ষক শিউশরণ এসে নত হয়ে প্রণাম করল, জানায় দক্ষিণপাড়ার চাটুজ্জেশমশাই সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাঁর সঙ্গে আছে একটি কিশোর।

‘দক্ষিণপাড়া’ বলতে মারহাটা-খালের দক্ষিণ পার। সেটা আগাছা আর জঙ্গলে আকীর্ণ। শৃগাল প্রচুর, খটাশ ও খরগোশ দেখা যায় সে অরণ্যে। কিছু কিছু অংশ সাফা করে মানুষের ভদ্রাসন তৈরী করেছে। কারণ আছে। মানুষজন সেই জঙ্গল অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে

যায়—“মায়ের দর্শন লাভে। “মা” অর্থে কলিতীর্থ কালীঘাট। ‘দক্ষিণপাড়া’ অঞ্চলটার বর্তমান নাম: ভবানীপুর।

গোপীমোহন তাঁদের নিয়ে আসতে বললেন। দক্ষিণপাড়ার চিরসুহৃদ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের দীর্ঘ দিনের সৌহার্দ্য।

এলেন ওঁরা দুজন। চিরসুহৃদ পঞ্চাশোর্ধ্ব। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। উত্তরীরের ফাঁক দিয়ে দীর্ঘ সামবেদী উপবীত দেখা যায়। নগ্নপদ। মাথায় কাঁচাপাকা চুলের ভিতর থেকে অর্কফলা পরিদৃশ্যমান, তার শেষপ্রান্তে একটি কলকে ফুল। সঙ্গে তাঁর কিশোরবয়স্ক পুত্র—তাকেও চেনেন: মদনমোহন। তার উর্ধ্বাঙ্গে ফাঁস-দেওয়া বেনিয়ান। মাথায় পাগড়ি। গোপীমোহন উঠে এলেন, বৃদ্ধের পদধূলি নিয়ে বলেন, আসুন, আসুন চাটুজ্জেকাকা! কী সৌভাগ্য আমার! আজ বৃদ্ধরকার দিনে আপনার পদধূলি পেলাম।

চিরসুহৃদ ঠুকে আশীর্বাদ করে ফরাসের একান্তে ধূলিধুসরিত পদযুগল গুটিয়ে উঠে বসেন। মদনমোহনও গোপীমোহনের চরণবন্দনা করে উপবেশন করে।

বৃদ্ধ প্রথমেই জানতে চাইলেন, দাদার শরীর গতিক এখন কেমন আছে, গোপী?

গোপীমোহন সংক্ষেপে তা জানালেন। কবিরাজমশায়ের শেষ নিদানটা অনুক্ত রইল। ইতিমধ্যে হুকো-বরদার কড়ি-বাধা হুকোয় তামাক দিয়ে গেছে। চিরসুহৃদ দর্পনারায়ণের বন্ধুস্থানীয়। ফলে তাঁর সম্মুখে গোপীমোহন ভাষ্যকু সেবন করলেন না আর। পরবর্তী যুগের ‘বাবু কালচারের’ প্রভাবে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ যেভাবে আর্থিক মূল্যায়নে নির্ধারিত হতে শুরু করে, তখনো সেই প্রবণতাটা কলকাতা সংস্কৃতিকে গ্রাস করেনি। রাধাকান্ত দেব (1783-1867) অথবা কালীপ্রসন্ন সিংহ (1840-70)-এর আমলে এ জাতীয় শিষ্টাচার পরিহার্য হয়েছিল। কিন্তু গোপীমোহন তার আগেকার জমানার মানুষ। ফরসির নলটি তিনি সরিয়ে রাখলেন।

প্রশ্ন করলেন, আপনার জামাতা বাবাজীবনের কোন সংবাদ পেলেন, চাটুজ্জেকাকা?

—হ্যাঁ, বাবা, পেয়েছি। সেজন্যই তোমার কাছে আসা।

একটু অবাক হলেন। নিরুদ্দিষ্ট জামাতা-বাবাজীবনের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে গোপীমোহনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? পুনরায় প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার? সে এখন কোথায়?

—মনে হয়, কলকাতাতেই আছে। ঠিক কোথায়, তা জানি না।

—কোথায় সাক্ষাৎ পেলেন তার?

—নিজেই সে এসেছিল আমার ভদ্রাসনে। দেখা-সাক্ষাৎ করে চলে গেল আবার।

—সম্মাস নেয়নি তাহলে?

—মনে তো হল না। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তেমন তো কিছু আশঙ্কা হল না।

—সে কেন গৃহত্যাগ করেছিল তা জানি; তা এতদিন কোথায় ছিল? কী বলছে? বৃদ্ধকে কেমন যেন অসহায় মনে হল। বলেন, শুনলুম সে নাকি হিমালয় ডিঙিয়ে তিব্বতে চলে গেসল।

—তিব্বত! সে তো অনেক দূর। দুর্গম পথ! হঠাৎ তিব্বত কেন?

বৃদ্ধ হতাশার ভঙ্গি করলেন। বোঝা গেল কারণটা তাঁর অজানা। গোপীমোহন অসহিষ্ণু হয়ে

দাখুরিয়াঘাট

প্রশ্ন করেন, কী আশ্চর্য! আপনি তা জানতে চাননি?

চট্টজে-মশাই এবার স্বীকারই করলেন, কী জান বাবা? সম্পর্কে সে আমার জামাই। কিন্তু সত্যিকথাই বলছি গোপী—ওর চোখে-চোখ রেখে কথা বলতে আমার সাহস হয় না।

তা বটে! ঐ বিচিত্র জামাতা বাবাজীবনটিকে গোপীমোহন দেখেছেন। তার বিবাহে। তখন তার বয়স বছর পনের। চট্টজে-মশায়ের কন্যা উমার বয়স নয়। পরেও তাকে একবার দেখেছেন—রাধানগরে। গোপীমোহনের মাতুলালয়ে, খানাকুল কৃষ্ণনগর সন্নিহিত ঐ রাধানগর গ্রামে। একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে ঐ কিশোরবয়স্ক ছেলেটির—যার স্বশুরমশাই তার চোখে-চোখে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পান না—তার সঙ্গে কিছু জনান্তিক আলাপচারীও হয়েছে। গোপীমোহন প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং আধুনিকমনা শুনে সেই ষোড়শবর্ষীয় জামাতা বাবাজীবন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ করতে এগিয়ে আসে। প্রসঙ্গটা ছিল হিন্দুধর্মের তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিষয়ে। গোপীমোহন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সেই কিশোরটির মুখে ক্রমাগত আরবী-ফার্সি উদ্ধৃতি শুনে। হাফেজ, মৌলানা রুমি, শামী, তব্রিজ প্রভৃতির বয়েৎ শুনে। উনি নিজে ফারসি জানেন ভালই, আরবী জানেন না—যেমন ছেলেটি জানে না ইংরাজী, সংস্কৃত। কিন্তু ভাষা নয়, গোপীমোহন মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মৌলিক চিন্তাধারায়, তার ক্ষুরধার যুক্তিতে। ঐ কিশোরটির যুক্তি তিনি মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু খণ্ডনও করতে পারেননি। বলেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে তোমাকে ভাল করে সংস্কৃত অধ্যয়ন করতে হবে।

—জানি! এবার কাশীধামে যাব তাই। শুধু সংস্কৃত নয়, ইংরাজী, ফরাসীও শিখতে হবে।

পরে শুনেছিলেন, পিতৃদেবের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় কিশোর বিদ্রোহীটি গৃহত্যাগ করে। কিন্তু তিব্বতে গিয়েছিল কেন? যা হোক, এখন শোনা যাচ্ছে ছেলেটি আবার ভারত ভ্রমণে প্রত্যাবর্তন করেছে। হিসাব মতো এখন তার বয়স উনিশ-কুড়ি।

গোপীমোহন জানতে চান, আপনার জামাতার আরও দুটি বিবাহ, নয়?

—হ্যাঁ, তিনটি দার-পরিগহ করেছে বটে, কিন্তু প্রথমা পত্নী জীবিতা নাই। দ্বিতীয়া, বর্ধমান জিলার কুড়মন-পলাশী গ্রামের। কনিষ্ঠা আমার কন্যা, উমা।

—যা হোক, তা আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

বৃদ্ধ এবার সে-কথা সবিস্তারে নিবেদন করলেন।

ওঁর বৈবাহিক রাধানগর নিবাসী রামকান্ত বাঁড়ুজ্জে—না, বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, 'রায়'। রামকান্তের পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্শিদাবাদে নবাব-সরকারে 'শিকদার'-এর কাজ করতেন। নবাবী খেতাব পান: 'রায়'। তাঁর নাতি, অর্থাৎ ওঁর বৈবাহিক রামকান্ত রায়ের সঙ্গে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দ্য, দর্পনারায়ণই বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁকে শ্রদ্ধা করেন রামকান্ত। চট্টজে-মশায়ের ধারণা—ওঁর জামাতা বাবাজীবন যে হঠকারিতা করে বসেছে, যে কারণে সে গৃহত্যাগী—তার সুরাহা হতে পারে, যদি রামকান্ত পুত্রকে ক্ষমা করেন। দর্পনারায়ণ কি এ বিষয়ে রামকান্তকে একটি পত্র দিতে পারেন না? পুত্রকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে?

গোপীমোহন বললেন না যে, তাঁর পিতৃদেবের এখন এ জাতীয় পত্রচরনার দৈহিক ক্ষমতা নেই। বরং বলেন, কিন্তু ডাকলে কি আপনার জামাই যাবে?

এতক্ষণে কিশোর মদনমোহন যোগদান করে কথোপকথানে। বলে, দিদি বলেছিলেন, ঠুর বাবা ডেকে পাঠালে উনি যাবেন।

হিসাব মতো এখন উমারানী ষোড়শী। মদনমোহন তার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। মর্মান্তিক প্রয়োজন না থাকলে সে এই বড়োদের কথায় কথা বলত না। গোপীমোহন আন্দাজ করতে পারেন ব্যাপারটা। ঠুন্দের প্রতিশ্রুতি দেন, এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করা হবে।

স্থির করেন বাবা-মশায়ের জবানীতে পত্রখানি তিনিই লিখে পাঠাবেন।

নিশ্চিত হলেন চাটুজে মশাই।



সে রাতে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হল দর্পনারায়ণের।

কবিরাজ-মশায়ের নির্দেশটা মেনে নিতে হল। উপায় কী? পাথুরিয়াঘাটা-প্রাসাদের ঠাকুরদালানে মায়ের পূজা হবে, কিন্তু তখন কর্তামশাই সেখানে কুশাসনের উপর বজ্রাসনে বসে থাকতে পারবেন না। নাতনি এসে জনান্তিকে প্রশ্ন করেছিল, আপনার মনে মনে খুব কষ্ট হচ্ছে, না দাদু-ভাই?

—না রে। এটাই যে মায়ের ইচ্ছা। মা তো শুধু মন্ময়ী নন, তিনি যে চিন্ময়ীও বটে!

—তার মানে?

—তর মানে আমি এই পালঙ্কে বসে বসেই তাঁকে ধ্যান করব। সে মূর্তি তো আমার মনে আঁকা হয়ে আছে।

তা আছে। জয়রাম কুশারীর স্বপ্নে পাওয়া ধ্যানমূর্তি—‘হরউরে ললিতাসনে’ বসে আছেন জগজ্জননী। দক্ষিণ চরণ প্রলম্বিত—শতদল পদ্মজের উপর স্থাপিত, বামপদ দক্ষিণজানুর উপর ন্যস্ত। চতুর্ভুজা মূর্তি। খড়্গা, নুমুণ্ড, বর ও অভয়। নয়ন মুদ্রিত করলেই দেখতে পান।

নাতনি যখন তাঁর শয্যায় উঠে দাদুর পাজর ঘেঁষে শুয়ে পড়ল তখন বৃদ্ধ বিস্মিত হয়ে বললেন, একি রে? পূজা দেখবি না?

নাতনি বললে, নাঃ।

বৃদ্ধ জানেন তার হেতুটা। বলির ঐ মর্মান্তিক দৃশ্যটি বরদাস্ত করতে পারে না দিদিভাই। তাছাড়া অত রাত পর্যন্ত কি জেগে থাকতে পারে?

বাজি পটকার শব্দ—পূজাদালানে ঢাকের বাদি—তাতে নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হল না সপ্তমবর্ষীয়া নাতনির। দাদুর পাশে চুপটি করে শুয়েই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল। সারাদিন দৌড়ঝাপ, দুরন্তপনা তো কম করেনি। কিন্তু দর্পনারায়ণের চোখে নিদ্রার কোন আভাস নেই।

যত মোলায়েম ভাবেই বলে থাক, গোপীমোহনের কথায় উনি বুঝতে পেরেছেন ঠিকই—কবিরাজ-মশাই শেষ নিদান শুনিয়ে গেছেন। এখন বাঁধন ছেঁড়ার পালা। তিল-তিল করে যা সঞ্চয় করেছেন—এই প্রাসাদ, জমিদারী, আসবাব, ঘর-গেরস্থালী সব, স—ব পিছনে

ফেলে একলা চলার পথে রওনা হবার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। খেদ নেই বৃদ্ধের—যে রেখে গেলেন, অপব্যয় না করলে তা সপ্তপুরুষ নিঃশেষ করতে পারবে না। এই ভী দুনিয়াদারীর

নিয়ম—উপযুক্ত উত্তরাধিকারের হাতে সব কিছু সমর্পণ করে মায়ের জেলে ফিরে যাওয়া। ভরা সংসার পড়ে রইল পিছনে। গোপী, বধুমাতা, কন্যা-জামাতা, ব্রহ্মময়ী। গোপীমোহনের

পাথুরিয়াঘাট

পুত্রসন্তান এখনো হয়নি ; কিন্তু কী-বা বয়স তার ? ঘর আলো করে আসবে সোনার চাঁদেরা ।

ক্রমে ঘনিয়ে এল রাত্রি । গবাক্ষপথে দেখা যায়, প্রতিবেশীদের ভদ্রাসনে যেসব প্রদীপ জ্বলছিল তা একে-একে নিবে গেল । লক্ষ্য হল, প্রদীপগুলি নির্বাপিত হওয়ার আগে কেমন যেন দপ্-দপ্ করে ওঠে । উনিও কি সেভাবেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবেন নিবে যাবার আগে ? ঘনিয়ে এল কার্তিক-অমাবস্যা রাত্রির ঘনাক্ষকার । মাঝে-মাঝে হাউই উঠে যাচ্ছে কোনও উৎসববাড়ি থেকে—নৈশাকাশে আলোকের ছটা ছড়িয়ে দিয়ে অনিবার্য নিয়তির টানে ফিরে আসছে একমুঠি ছাই ! এ-ঘরেও একটি প্রদীপ জ্বলছে পিলশুজের উপর—সারারাত্রিই জ্বলে । কক্ষটা তাই আলো-আধারী । কেঁটা মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে শুয়েছে । সারারাত সে এঘরে থাকে, কর্তার কখন কী প্রয়োজন হয় ।

মধ্যরাত্রি । ঠাকুর-দালানে ঢাকের বাদ্যি প্রবলতর হয়ে উঠল ক্রমে । দর্পনারায়ণ বোধকরি কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন । ঢাকের বাদ্যিতে ঘুমটা ভেঙে গেল । উঠে বসলেন শয্যায় । পদ্মাসনে । ইতিমধ্যে কক্ষের প্রদীপটিও নির্বাপিত হয়েছে । বারান্দার দেওয়াল-গিরিতে জ্বলছে মোমের বাতি । তাতেই ঘরটা আলো-আধারী । নিম্নলিখিত নেত্রে দর্পনারায়ণ মায়ের ধ্যান করতে থাকেন ।

কতক্ষণ নিবাত নিরুদ্দিশ দীপশিখার মতো পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন তার আন্দাজ নেই । পূজা-দালানে ঢাকের বাদ্যি নিরবচ্ছিন্নভাবে শোনা যাচ্ছে । সহসা ঘ্রাণে লাভ করলেন অদ্ভুত একটা পদ্মগন্ধ ! বোধকরি ঠাকুর দালানে ওরা যে অগুরু ধূপ জ্বলেছে তারই সৌরভ ভেসে আসছে দ্বিতলে । ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন আঁখি-পল্লব দুটি উন্মীলিত হয়ে গেল । সম্মুখে অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন । মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের ভিতর মায়ের স্বরূপ অস্বেষণের প্রচেষ্টা । চমকে উঠলেন বৃদ্ধ ।

এ কী !

অন্ধকারের ভিতর তাঁর দৃষ্টিসম্মুখে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠল একটি মতমূর্তি !

না ! এ কোন দৃষ্টিবিভ্রম নয় ! স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয় ! চর্মচক্ষুতেই দেখছেন উনি । অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে যেন রূপান্তরিত হল ঠাঁর ধ্যানে-দেখা জননীমূর্তিতে ।

মা দিগাঙ্গনা নন, বামস্কন্ধের উপর আঁচলের আভাস । চতুর্ভুজাও নন—দ্বিভুজা । খপ্পর এবং নৃমুণ্ডকে পরিহার করে দুই হস্তে শুধু বরাভয় মুদ্রা । শয্যার অপরপ্রান্তে, একই পালঙ্কে শিবশবের উপর বসে আছেন জগজ্জননী—ললিতাসনে ! জননী যেন বালিকা !

সহসা গবাক্ষ-পথে ভেসে এল এক হঠাৎ-আলোর-ঝলকানি—কোন গৃহশীর্ষ থেকে হাউই বুঝি উঠেছে অমারাত্রির অন্ধকার ভেদ করে । সেই ক্ষণপ্রভার দুতিতে রহস্যভেদ হয়ে গেল বৃদ্ধের । রোমাঙ্কিত তনুদেহ শান্ত হয়ে গেল আবার !

বৃদ্ধ বললেন, দিদিভাই ?

—উ ?

—তুই ওখানে ওভাবে বসে আছিস কেন রে ?

উপাধানের উপর ললিতাসনে বসে ছিল ব্রহ্মময়ী—নিখর, নৈশন্দ ! বললে, আপনার জনেই তো আমি মা-কালী হয়ে বসে আছি । নইলে আপনি ধ্যান করবেন কী করে ?

নতুনিকে পাজর-সর্বস্ব বুকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ।



পরদিন। নিষ্ঠুর উদাত্তবজ্র নিয়তি যে এভাবে নেপথ্যে প্রতীক্ষা করছিল তা কেউ আশঙ্কা করেনি। অতর্কিতে নেমে এল সেই বজ্র পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদে। উৎসব-গৃহে মুহূর্তমধ্যে দেখা দিল শ্মশানের হাহাকার।

কর্তামশাই যে তাঁর কর্মময় জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন তা জানতে কারও বাকি ছিল না। মায়ের নিরঞ্জন সমাপনান্তে যে কর্তামশায়ের গঙ্গাযাত্রার আয়োজন হচ্ছে একথা গোপন রাখার চেষ্টা হলেও বস্তৃত সকলেরই জানা। সেজন্য মানসিকভাবে সকলে প্রস্তুত। কিন্তু এ কী হয়ে গেল! কেন, কেন এমনটা হয়?

প্রতিদিনের মতো প্রত্যুষে ব্রহ্মময়ী গিয়েছিল প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে, পুষ্পচয়নে। হঠাৎ তার গগনবিদারী আর্তনাদ শুনে লোকজন ছুটে গেল। যা হবার নয়, তাই হয়েছে। পুষ্পবিতানে এক বিষধর সর্প দংশন করেছে বালিকাকে।

এ উদ্যানে সাপের উপদ্রব ছিল না। তাছাড়া কার্তিক মাস। এসময়ে সর্পকুল তাদের শীতকালীন যোগনিদ্রায় অভিভূত থাকে। কিন্তু—“নিয়তি কেন বাধ্যতে?

ধরাধরি করে ওকে নিয়ে আসা হল বৈঠকখানায়। ছোটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি। ওঝা, গুণীন, কবিরাজ! কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দ্বিপ্রহরের পূর্বেরই সব সব যন্ত্রণার অবসান হল।

গোপীমোহন যেন পাথর হয়ে গেলেন। অন্তঃপুরে ব্রহ্মময়ীর গর্ভধারিণী মুর্ছাগতা; কিন্তু সেখানে তাঁর কোন কর্তব্য নাই। পিসিমাতা ঠাকরণ আছেন, বড়বাড়ির বৌঠানরাও দুঃসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন জোড়াসাঁকে! থেকে। আত্মীয়-স্বজনেরা যথাকর্তব্য করছে। সংবাদটি গোপন রাখার চেষ্টা হয়েছিল কর্তামশাইয়ের কাছ থেকে—সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বাবামশাই কী করছেন, জানেন না। গোপীমোহন প্রগাঢ় পণ্ডিত—সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করতে যাওয়া বৃথা। তাঁকে সাত্বনা দিতে এগিয়ে এল না কেউ। তিনি নিজেও কোন সাত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না।

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...”!

জীর্ণানি? সে যে ছিল টাটকা জুই ফুলের মতো তরতাজ! এ বাড়িতে সেই তো এসেছিল সবার শেষে। আজ কেন তাকে বিদায় নিতে হবে সবার আগে? কে দিয়েছে এই বিদ্বান? পরম করুণাময়ী?

প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য শোভাযাত্রার বিরাট আয়োজন হয়েছিল। প্রতিবাসীই হয়। সারি সারি গো-গাড়িতে সঙ-সাজানো আছে। চলন্ত গো-শকটে পুতুলনাচের আয়োজন। গুদামঘর থেকে

পাথুরিয়াঘাটা

বার করা হয়েছে নয়—জোড়া তেরমুখী কারবাইড গ্যাসের ঝাড়। বাজনাদারেরা বায়না পেয়ে হাজির হয়েছে। বিচিত্র সাজে। এমনকি পথের ধারে ধারে সমবেত হয়েছে মানুষজন, যারা প্রতি বছর এসে বসে থাকে পথের ধারে—পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির নিরঞ্জন শোভাযাত্রা দেখতে।

কেউ ঠাঁর পরামর্শ নিতে এল না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বড়দাই হুকুম দিলেন—শোভাযাত্রা হবে না। শাস্ত্রীয় বিধানে যেটুকু না করলেই নয়, তাই করা হবে। সম্ম্যালে প্রতীমা নিরঞ্জন করে বাহকেরা ফিরে আসবে।

রাত্রিই ব্রহ্মময়ীকে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে।

কে-যেন এসে খবর দিয়ে গেল—বাবামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

গোপীমোহন নিজেকে শক্ত করেন। অনিবার্য নিয়তিকে মেনে নিতে হয়। মনে পড়ে যায় বৃদ্ধের কথা। কী প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন তিনি! গতকাল অপরাহ্নে উনি গোপন করতে চাইলেও বৃদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন—কবিরাজ-মশাই কী নিদান দিয়ে গেছেন। নিজেই বলেছিলেন, মায়ের নিরঞ্জন হয়ে গেলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করিস, গুপী। কালীঘাটে।

বৃদ্ধ মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় শেষ মুহূর্তে তাঁকে পেতে হল এই কুলিশকঠোর আঘাত। দ্বিপ্রহরে পাথুরিয়াঘাটার রাজপ্রাসাদ যখন হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল আর্ত ক্রন্দনরোলে তখন বৃদ্ধের বোধহয় বুদ্ধিব্রংশ হয়ে যায়। তিনি নিজে-নিজে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়তে চান—কী-উদ্দেশ্য ছিল তা তিনিই জানেন—ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। পড়ে যান মেঝেতে। তারপর থেকে তাঁর বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত—বাম হস্ত ও বাম পদ।

ধীরপদে গোপীমোহন এসে দাঁড়ালেন পিতৃদেবের শয্যাপ্রান্তে।

বৃদ্ধ তাঁর ডান হাতে ধরলেন পুত্রের হাতখানি। আকর্ষণ করলেন নিজের দিকে।

গোপীমোহন এগিয়ে এলেন কাছে। বৃদ্ধ ঠুঁকে আকর্ষণ করলেন। মাথাটা টেনে নামিয়ে নিলেন নিজের বুকের উপর। আর আত্মসংযম করা সম্ভবপর হল না হিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতের। পিতার পাজরসর্বস্ব বুকে মুখ ঝুকিয়ে ছুঁ করে কেঁদে ফেললেন।

বৃদ্ধ ঠাঁর কর্ণমূলে হঠাৎ অদ্ভুত একটা কথা বললেন। নিতান্ত পাগলের প্রলাপ: দিদিভাইকে যেন চিতায় তুলিসনি গুপী! নরম শরীর! আগুনের তাপ সহিবে না!

দর্পনারায়ণ বোধকরি প্রবেশ করেছেন তাঁর দ্বিতীয় শৈশবে! তাঁর আদরের নাতনি যে শীতাতপ রাজ্যের ওপারে চলে গেছে সে বোধটুকুও নেই!

বিধান দিলেন শিরোমণি-মশাই। দু-দিক রক্ষা হল।

চিতায় না তুলে মরদেহ কীভাবে সৎকার করা যাবে? কবর তো দেওয়া যায় না। ওদিকে—হোক শিশুসুলভ চাপলা—পিতার এই অযৌক্তিক শেষ আদেশ লঙ্ঘনই বা কতটুকু কী করে? দু-দিক রক্ষা করে কুল-পুরোহিত বিধান দিলেন—সর্পদংশনে মৃত্যু হয় যদি, তাকে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া শাস্ত্রসম্মত। তাকে দাহ করতে নেই। লক্ষ্মীন্দ্রের মরদেহ এভাবেই সৎকার করা হয়েছিল। অগত্যা।

কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না গোপীমোহন। তাঁর বিশ্বাস, এ প্রথাটি বর্জনীয়। এতে গঙ্গার জল দূষিত হয়ে যায়। তাছাড়া আগুনের উত্তাপ যার সহ্য হয় না সে কি সহিতে

পারে কাক-শকুনের বীভৎস আক্রমণ? কামট-কুস্তীরের কদর্য দংশন! নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো তিনি জ্যাকবের মাধ্যমে আনিয়ে নিলেন একটি ছোট্ট কফিন। ব্রহ্মময়ীকে কফিনজাত করে ভাসিয়ে দেওয়া হল কলার ভেলায়। তখন গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। ছোট্ট মেয়েটা কপিলমুনির আশ্রমের দিকে গেল না। এগিয়ে চলল উজানে, ঢেউয়ের দোলায় নাচতে নাচতে। ঠিক যেভাবে আলতা-পায়ে, নোলক দুলিয়ে সে সারা বাড়ি নেচে বেড়াত।

পরদিন আবার ডাক পড়ল দ্বিতলের কক্ষে—কর্তামশাই ডাকছেন।

ইতিমধ্যে দুজনেই কিছুটা সামলেছেন। দিন কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। ব্রহ্মময়ীর গর্ভধারিণীও উঠে বসেছেন। সংসারের কাজ—যেটুকু না করলে নয়—করা হচ্ছে। শুধু মাত্র একটি দূরন্ত মেয়েকে আর সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যায় না।

কর্তামশাই এবার যে-কথা বললেন তাও অপ্রত্যাশিত।

তিনি অনুভব করেছেন, তাঁর সময় হয়েছে। গঙ্গাযাত্রার আয়োজন এবার করা চলতে পারে। তবে কালীঘাটে নয়। মূলাজোড়ে!

মূলাজোড়ে? কেন?

বিচিত্র হেতু। পূর্বরাত্রি দর্পনারায়ণ স্বপ্নে তাঁর নাতনিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। দিদিভাইকে উনি স্বপ্নে দেখেছেন প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ললিতাসনে! সে তার দাদুকে জানিয়েছে—তার কোন যত্নগা নেই, সে ব্রহ্মময়ীতে বিলীন হয়ে গেছে। আরও বলেছে, সে মূলাজোড়ের শ্মশানঘাটে তার দাদাভাইয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

—দেবী করবেন না যেন দাদাভাই, ভাইফোঁটা নিতে হবে না?

হোক মৃত্যুপথযাত্রীর প্রলাপ, পিতার আদেশ জীবনে কোনদিন লঙ্ঘন করেননি। আজও করলেন না। এ ব্যবস্থা করা আর কঠিন কী?

বজরা করে রওনা দিলেন ওঁরা। সঙ্গে আরও দুটি নৌকা। তাতে আত্মীয়স্বজনেরা। হরি-সংকীর্তনের দল। শিরোমণি-মশাই, কবিরাজ-মশাই ইত্যাদিরা।

মূলাজোড়ে ছুটে গেল অশ্বারোহী ব্যবস্থাপক। ওঁরা উপনীত হবার পূর্বেই সব আয়োজন সম্পূর্ণ। সংবাদ পেয়ে মূলাজোড় গ্রামের ইতর-ভদ্র সমবেত হয়েছে শ্মশানঘাটে। পাথুরিয়াঘাটার রাজামশাই—হুঁয়, রাজামশাই বইকি—দর্পনারায়ণকে সবাই এক ডাকে চেনে—কালীঘাটকে উপেক্ষা করে মূলাজোড়ে এসেছেন গঙ্গাযাত্রায়। জনসমাগম তো হতেই পারে।

মহাশ্মশানে জনারণ্য। কাতারে কাতারে মানুষ। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর বজরায় করে এসেছেন মূলাজোড়ে। কলিতীর্থ কালীঘাটকে উপেক্ষা করে। গঙ্গার তীরে খাটানো হয়েছে প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা। তার এক দিকে চিকের আড়াল। সেখানে অপেক্ষা করছেন পুরললনার দল—গোপীমোহনের সহধর্মিণী, পিসিমারা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহিলাবন্দ। পরের বজরায় এসেছেন তাঁরা। দর্পনারায়ণের দেহ একটি পালঙ্কে শায়িত। তাঁর অর্ধ-অঙ্গ গঙ্গাতীরে, অর্ধ-অঙ্গ গঙ্গানীরে। না, অর্ধ-অঙ্গ নয়, শুধু বলিবেখান্ধিত চরণদুটি জলস্পর্শ করছে। ছোট ছোট ঢেউ এসে আঘাত করছে চরণদ্বয়ে—ছলাৎ ছল, ছলৎ ছল। একদল কীর্তনীয়া

মুলাজোড়

পালঙ্কটি পরিক্রমা করছে হরিসংকীর্তন করতে করতে। গঙ্গায় পরিক্রমা করার সময় তাদের হাঁটু-জলে নেমে যেতে হচ্ছে। কিছু দূরে বসে শিরোমণি শ্রীমদ্ভগবৎগীতা পাঠ করে চলেছেন:

“নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্তাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥”

কবিরাজ-মশাই মাঝে মাঝে অগ্রসর হয়ে আসছেন, নাড়ির গতি পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। তাঁর দক্ষিণহস্তে একটি সাবেক বালুকা-ঘড়ি। বলছেন, তাঁর গণনা অব্যাহত—সূর্যাস্তকালে দর্পনারায়ণের প্রাণবায়ু পটাকাশে বিলীন হয়ে যাবে। দর্পনারায়ণের শিয়রের কাছে বসে আছেন গোপীমোহন। কিছুক্ষণ পরে পরে গঙ্গোদক ঢেলে দিচ্ছেন বৃদ্ধের বিশুদ্ধ ওষ্ঠাধরে। তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছেন। দর্পনারায়ণের বাম অঙ্গ পড়ে গেছে; তবু পূর্ণজ্ঞান আছে তাঁর। মাঝে মাঝে দু-একটি কথাও বলছেন। অধিকাংশ সময়ে নির্নিমেষ নয়নে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখছেন এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগৎকে।

মনে হল, বৃদ্ধ কিছু বলতে চান। গোপীমোহন তাঁর কর্ণমূল অগ্রসর করে দিলেন। প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবেন?

—হঁ! আজ তো শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি?

সেই পাগলের প্রলাপ! বৃদ্ধ বিদায়কালে জানতে চাইছেন, আজ ত্রাতৃদ্বিতীয়া কিনা। গোপীমোহন তাঁকে জানালেন।

—দি—দি-ভাই আসেনি?

এর কী জবাব?

ঠিক তখনই অগ্রসর হয়ে এলেন মুলাজোড়ের সর্বানন্দ বাচস্পতিমশাই। গোপীমোহনের পাশে এসে বললেন, আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে বড় বিব্রত বোধ করছি। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আসতে হয়েছে।

—বলুন?

—আমাদের একটি সমস্যায় আপনাকে কিছু বিধান দিতে হবে।

—বিধান? শাস্ত্রীয় বিধান? আমি দেব আপনাকে?

বাচস্পতিমশাই সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন সমস্যাটা এমন যে, শুধু শাস্ত্রজ্ঞ হলেই তার সমাধান লাভ করা যাবে না। তাকে ফেরঙ্গ ব্যাপারেও পণ্ডিত হতে হবে।

বাধ্য হয়ে ঘাটে উঠে এলেন গোপীমোহন। দেখলেন মুলাজোড়ের আরও কয়েকজন এসেছেন একই হেতুতে। বাচস্পতিমশাই তাঁদের সকলের হয়ে ঘটনাটি বিবৃত করেন।

গতকাল জোয়ারের সময় গঙ্গাপ্রোতে ভাসতে ভাসতে একটি কফিন এসে ঠেকেছে মুলাজোড়ের স্নানঘাটে। ‘কফিন’ বস্তুটাকে ওঁরা চেনেন—ফেরঙ্গরা ঐরকম কাঠের বাস্কে মৃতদেহকে রক্ষিত করে কবর দেয়—যেমন দেয় মুসলমানেরা। ফলে কফিনের ভিত্তরে যে দেহটি আছে—যতই ছোট হোক—সেটি বিধর্মীর। প্রশ্ন হচ্ছে, কফিনসমেত মৃতদেহকে ভূগর্ভস্থ গর্তে স্থাপিত করা হয় প্রথা—কী সাহেবদের, কী মুসলমানের। কোন দুজনে হেতুতে ওটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়েছে ওঁরা আন্দাজ করতে পারছেন না। জোয়ারের জলের সঙ্গে সেটি যদি ভেসে যেত তাহলে মুলাজোড়ের দায়িত্ব থাকত না; কিন্তু তা যায়নি। এক্ষেত্রে কী

করগীয়? মৃতদেহকে ওখানে পচতে দেওয়া যায় না—চণ্ডাল দিয়ে সংকার করানো অসম্ভব নয়; কিন্তু তাতে বিধর্মীরা আপত্তি করবে না তো? গোপীমোহন যেহেতু ফারসিতে আলিম, ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাই তাঁর নির্দেশ চাইতে এসেছেন ঔঁরা।

দর্পনারায়ণকে স্বপ্নে ঠিকই বলেছিল ব্রহ্মময়ী।

দাদাভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বলেছিল, ‘ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম-দুয়ারে পড়ল কাঁটা!’

তবে ভাই-বোন দুজনেই তখন যমদুয়ারের কষ্টকময় পথ অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত। একই চিন্তায় দাহ করা হল দুজনকে। দ্বিতীয়া তিথি তখনও ছিল।

তোমরা যদি শ্যামনগরে যাও ব্রহ্মময়ীর মন্দিরে প্রণাম করে এস।

ব্রহ্মময়ী নামটি অসামান্য পণ্ডিত গোপীমোহন ঠাকুরের দেওয়া; কিন্তু তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ সে নামটি তিনি চয়ন করেছিলেন যে কিশোরবয়স্ক বিদ্রোহীর প্রভাবে তিনি ‘অসামান্যতর’ পণ্ডিত। ইতিহাসে সেই দক্ষিণপাড়ার চাটুজ্জ-মশায়ের নিরুদ্দিষ্ট জামাতা বাবাজীবনের নাম:

রাজা রামমোহন রায়।



মাহেশ

‘তবু ভরিল না চিত্ত’!

দীর্ঘদিন ভাগীরথীর দুই তীরে তীর্থ পরিক্রমা করে রূপেন্দ্রনাথ ফিরে চললেন মাহেশে।

অনেক-অনেক কিছু দেখলেন। বর্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম, আলিবর্দীর শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে নির্বিঘ্নে। তাঁতিরা তাঁত চালায়, কুস্তকারেরা চাকা ঘোরায়ে, রেশমশিল্পীরা কাপড় বোনে। চাষীরা মাঠে মাঠে ফলায় সোনার ফসল। গ্রামজীবনের মধ্যমণি ব্রাহ্মণ-সমাজ—মহামহোপাধ্যায়েরা ন্যায়ের ভাষা নিয়ে চুলচেরা বিচার করেন। পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী—কিন্তু যে ‘পরশপাথর’ খুঁজছেন তার দেখা পেলেন না। কোন পাঠশালায় নজরে পড়ল না বেণী-দোলানো ডাগর-চোখো কোনও বালিকা অথবা কিশোরী। ওদের অক্ষর-পরিচয় হওয়া মানা, খাণ্ডের কলম স্পর্শ করায় নিষেধ, এমনকি কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানোতেও আপত্তি। সেসব নিষিদ্ধ কাজ তো শুধু বারবণিতাদের জন্য। ভদ্রধরের মেয়ে গান গাইবে কী? পুথির পাতা ওটাবে কী? বড়জোর মুখে মুখে শিখতে পারে কিছু শুভঙ্করীর আর্ঘ্য, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, নামতা।

জল-অচল অজুতেরা বাস করে অস্ত্রবাসীর মতো ভদ্রপল্লীর বাহিরে। তারাও গঙ্গাস্নান করে, তবে বামুন-ঘাটে নয়। পথেঘাটে সতর্ক হয়ে চলে, যেন তাদের ছায়াপাত না ঘটে বামুন-গায়ে।

সে নীরব্র অন্ধকারে রাজা-রাম, বিদ্যাসাগর বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের আভাসমাত্র নাই। প্রায় তিনশ বছর আগে যে বিদ্রোহী গৌড়মণ্ডলকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের বন্যায়, তাঁর প্রভাবও লুপ্ত হতে বসেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমুদ্বিলাভ করেছে সন্দেহ নেই, শাক্ত-গৌড়রাজ্যের পরিমণ্ডলে সে ধর্ম এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তা আচার-সর্বস্ব। মূল তত্ত্ব থেকে তারা সরে গেছে। তারা মাথা কামায়, তিলক সেবা করে, খঞ্জনী বাজিয়ে মাধুকরী করে ফেরে আর কিশোরী-ভজনের তাল খোঁজে। চৈতন্যদেবের যে ঋজু ধর্মমত—আচণ্ডালকে কোলে টেনে নিয়ে হরিনাম বিতরণ করা—তা থেকে ওরা সরে গেছে। কৃপমণ্ডক ব্রাহ্মণ্যসমাজের টুলো-পণ্ডিতদের বিধানে অথবা প্রতিপত্তিশালীদের ষড়যন্ত্রে যাদের জাত গেছে তারাই হয়েছে বোষ্টম; ঠিক যেভাবে প্রাক্-শঙ্করাচার্য যুগে জাত খুঁইয়ে দিশেহারা মানুষগুলো ঝুঁকেছিল বৌদ্ধধর্মের দিকে, নাথ-সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে। মুষ্টিমেয় কিছু সাত্ত্বিক বৈষ্ণব—প্রভু নিত্যানন্দের প্রভাবে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, তেঘড়া, ভটপাড়ায়, আর বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীর প্রভাবে তাঁদের উত্তরসাধকেরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় আজও সেই প্রেমের ঠাকুরের পবিত্র দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাবক্ষেত্র সীমিত—আখড়ার চৌহদ্দীতে, আশ্রমের সীমান্তে অথবা নিজ নিজ ভদ্রাসনে।

রূপেন্দ্র অনেক কিছু দেখলেন—বর্তমানের স্বরূপ, অতীতের উত্তরাধিকার; কিন্তু যা খুঁজছেন তার কোনও ইঙ্গিত নেই। এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় ‘তিনি’ এখনো এসে পৌছাননি—সেই যাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছেন: ‘পরিভ্রাণায় সাধুনাম, বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম।’

এতদিনে মনে পড়ে যাচ্ছে অতীত জীবনের কথা। দেশঘরের কথা। ফেলে আঁশ পথপ্রান্তের নানান স্মৃতি। দেশ ছাড়ার পর গঙ্গা-কাড় অথবা জগুপিসির কোন খবর পাননি। মৃত্যু? হিসাবমতো এতদিনে তার সেই পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কী হয়েছে তার? পুত্রবতী হতে পেরেছে কি?

পরিচিত মানুষ বলতে একটি মাত্র লোকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হয়েছিল একদিন। গঙ্গার পারানি-ঘাটে: নবা বায়েন। দূর থেকে ঝুঁকে দেখতে পেয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ছুটে এগিয়ে এসেছিল কাছে। ঘাড় থেকে ঢাকটা নামিয়ে ঘাটের পাষাণ রানায় রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। স্পর্শ বাঁচিয়ে। হঠাৎ গায়ের মানুষকে দেখে রূপেন্দ্রও আনন্দে ওকে বুকে টেনে নেন। নবা লজ্জিত হয়ে বলে, ছুঁয়ে ফ্যাললেন ঠাকুর।

—দূর বোকা। এ যে মা গঙ্গার ঘাট। এখানে কি ছোঁয়াছুয়ি হয়? এক অঞ্জলি গঙ্গা মাথায় ছিটিয়ে দিলেই তো সব শুদ্ধি! তারপর? তুই কোথায় যাচ্ছিস?

নবা জানায় সে ঢাক নিয়ে শহর কলকাতার দিকে চলেছে। কর্মসংস্থান মানসে। শুনেছে, অনেক-অনেক ধনাঢ্য-ব্যক্তি নতুন-নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন। বাঁধা-মাহিনার ঢাকী কিংকরও প্রয়োজন নেই?

কেন যে সে গ্রাম ত্যাগ করে কর্মসংস্থানে এ-ভাবে বার হয়ে এসেছে সেটা স্বীকার করল না। এমনকি রূপেন্দ্র যখন জানতে চাইলেন—ওর ভাই হয়েছে না বোন, তখনও মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, জামে ঠাউরমশাই। গায়ের খবর মোরে শুধোবেননি।

কী একটা বেদনার ভারে সে দেশত্যাগী। স্বীকার করতে পারছে না। রূপেন্দ্র পীড়াপীড়ি করেননি।

ওরা তো সব দূরত্বামের মানুষ, হাতের কাছে রাধা-বোষ্টমীর কী শেষগতি হল সে খবরটাও জানতে পারেননি। পরদিন ফরাসিডাঙার সেই যাত্রী-আবাসে সংবাদ নিতে গিয়ে চৌকিদারের কাছে খবর পান, তারা চলে গেছে—একত্রে, অথবা পৃথক পৃথক, তাও জানে না চৌকিদার। কোন গীর্জায় কি যুগলে গিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজে ছিল? না কি ভাঙা পাত্রে দুটি অংশ জোড় বাঁধেনি? জানেন না। মঞ্জুকে রাধা-বোষ্টমীর অন্তিম সংবাদটা আর জানাননি। সেই ‘মা বুয়াৎ...’ সূত্র অনুসারে।



সূর্য এখন বৃষরাশিতে। দেশভ্রমণের উপযুক্ত সময় এটা নয়। নির্মেষ আকাশে অনলবর্ষী দাবদাহ। সমস্ত প্রকৃতি রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গণে, কোন শুভ মুহূর্তে নৈকত-কোণ থেকে ধেয়ে আসবে পুরুষ মেঘের ‘কালবৈশাখী’ আশীর্বাদ। ক্রান্ত ঘূঘুর ঘুমজড়ানো কূজন, মাঝে-মাঝে ফটিক-জলের আর্তি।

রূপেন্দ্র মাহেশে ফিরে এসে কদিন বিশ্রাম নিলেন।

মঞ্জুর এখন অন্য এক রূপ—আসন্ন মাতৃহের: অপরিপুষ্পস্তবকানভ্রা—যেন পুষ্পমঞ্জুরীর ভারে নুয়ে-পড়া পল্লবশাখা। গতি হয়েছে শ্লথ, মুখাবয়বে একটা দীপ্তি। রূপেন্দ্র ওকে বিস্তারিত বর্ণনা দেন—এ কয়দিন কী দেখেছেন, দে-গাঁর রাজার সেই করুণ কাহিনী, যুগল-পারাবতের; রামপ্রসাদের কর্মচ্যুতির বিবরণ; জগদীশ পণ্ডিতের অসাধ্যসাধন; দারুময় ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র থেকে গৌড়মণ্ডলে বহন করে নিয়ে আসা। করলগ্নকপোলে মঞ্জু নিশ্চুপ শুনে যায়।

রূপেন্দ্র বলেন, অনেকদিন দেশের খবর পাইনি। তোমার তো এখনো মাস দুই-তিন বাকি, একবার চট করে সোণাই ঘুরে আসব?

মঞ্জু বললে, তা যদি বল, তাহলে বলব, অনেক আগেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল। যখন মীনুদি তোমার পথ চেয়ে ছিল।

রূপেন্দ্র লজ্জা পান। বস্তুত মঞ্জুর এই আসন্ন-মাতৃহের মূর্তিটাতেই তিনি কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল সেই নিভৃত সন্ধ্যাটির কথা। প্রায়াক্কার নির্জন কক্ষ। ওরা শুধু দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুর্গা-খুড়ো এগিয়ে গেছেন পালকি বেয়ারাদের সন্ধানে। অনবগুপ্তিতা মীনু-খুড়িমা অস্ফুটে সেদিন বলেছিল—সোনাদা! শেষ সময়ে আমি যদি তোমার পায়ে ধুলো নিতে হাত বাড়াই, তুমি পিছিয়ে যেও না যেন!

রূপেন্দ্র সলজ্জ বললেন, আমি কি শুধু মীনু-খুড়িমার জন্যই ব্যস্ত হয়েছি?

—হলেও লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। সে বেচারি তোমার ভরসাতেই ছিল তো?

—মানে?

মঞ্জু চোখে-চোখে তাকায়। বলে, দেখ, আমি লেখাপড়া শিখিনি। মুখ্য! কিন্তু তা বলে এটুকুও কি বুঝ না?

—কোনটুকু?

—মীনুদি তোমাকে কী-চোখে দেখে! কেন শোভারানী আমাদের সেই ফুলশয্যার রাতে অমনভাবে বিধেছিল মীনুদিকে, আর কেনই বা সে স্নান হয়ে গেছিল।

রূপেন্দ্র অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। তারপর কথা ঘোরাতে বলেন, জান, সেদিন নবা বায়েনের সঙ্গে হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়ে গেল।

মঞ্জু জানতে চায় নবা বায়েন লোকটা কে। রূপেন্দ্র বিস্তারিত সব কথা জানালেন। যমুনার সেই সতী হতে যাওয়ার কাহিনী। মঞ্জু সে-কথা ভাসা-ভাসা জানত। আজ বিস্তারিত জানল। দুজনে অনেক আলোচনা করেও স্থির করে উঠতে পারলেন না—কেন নবা বায়েন গাঁ-ছেড়ে বার হয়ে পড়েছে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। শেষে মঞ্জু বলে, আমার সঙ্গেও একজন চেনা লোকের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। দিন পনের আগে। ওরা যুগলে এসেছিল তোমার খোঁজে।

—ওরা! মানে? কাদের কথা বলছ?

—রাধাদি আর রাম-রহিম!

—রহিমও এসেছিল?

—রহিম নয় গো, ‘রাম-রহিম দরবেশ’!

বিচিত্র সংবাদ। রহিম অথবা রাধা প্রভু যীশু বা মেরী মাতার শরণ নিতে যায়নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুদার, কৃপমণ্ডুকদের নির্দেশে চলে; তবু ব্রাহ্মণ্যধর্ম উদার, সর্বসহা, যুগে-যুগে ঐ কৃপমণ্ডুকদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন সাধকবৃন্দ। সব সমস্যার সমাধান ঈর্জে পাবে এই ভারতে! রাম-রহিম তার সঙ্গিনীর হাত ধরে রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, জানাতে এসেছিল তার কৃতজ্ঞতা। তার পরিধানে তাম্বি-দেওয়া আলখাল্লা, হাতে একতারা, চুড়ো-করে বাঁধা তার বাবরি চুল। পাজর ঘেঁষে ওর সাধনসঙ্গিনী: রাধা।

ওরা কবীরপন্থী। জাত-পাত মানে না। সত্যসুন্দরের দিশারী।

গুরু রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে কবীর সর্ববিখ্যাত। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের গোঁড়ামি আর মোল্লাদের ধর্মান্ধতাকে তুল্যভাবে তিরস্কার করেন। সম্ভবত জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন জোলা। তাঁর দোহা—

“প্রথম হি রূপ জোলাহা কীছা।

চারি বরণ মোহি কানুন চীছা।

রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেখু।

গুরুপূজা কছু হম সোঁ লেহু।”

(১) প্রথমে আমি ছিলাম জোলা। চারি বর্ণের মধ্যে কেউ আমাকে চিনত না। গুরু রামানন্দ! তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদানের অনুমতি দাও।

মহাত্মা কবীর যে ধর্মমত প্রচার করেন তা না-হিন্দুর, না-মুসলমানের। তা মিলিত হিন্দু-মুসলমানের। জাত-পাতের বিভেদ তিনি মানেননি। অথচ তাঁর দেহাবসানের পর বিবাদ দেখা দিল দুই সম্প্রদায়ের—কীভাবে তাঁর মরদেহের সংকার হবে। অলৌকিক ভাবে সে লৌকিক বিবাদের মীমাংসা হয়ে যায়। তাঁর মৃতদেহ রূপান্তরিত হয়ে যায় এক মুঠি পদ্মফুলে। সে ফুলের অর্ধাংশ নিয়ে কাশ্মীরেশ বীরসিংহ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করেন, বাকি অর্ধেক গোরক্ষপুরে সমাধিস্থ করেন মুসলমান-নেতা বিজলিখান। কবীর বলেছিলেন:

“জাতি পাতি কুল কাপড়া যেহুঁ শোভা দিন চারি।

কহে কবীর শুনো হো রামানন্দ যেউ রহে ঝকমারি!!

জাতি হমারি বাণী কুল করতা উর মাহি।

কুটুম্ব হমারে সন্ত হায় কোই মুরখ সমবাল নাহি” ॥^১

তা বটে! বেদ-বেদান্ত গুলে খেয়েছেন রূপেন্দ্রনাথ, তবু সন্ধান দিতে পারেননি। ঐ রাম-রহিম আর রাধাকে বলেছিলেন হিন্দু-মুসলমান ধর্মে ওদের আশ্রয় হতে পারে না। বিদেশী ধর্মের দ্বারস্থ না হলে ওদের সমস্যার সমাধান নাই। অথচ ঐ অর্ধশিক্ষিত রাম-রহিম আর তার সঙ্গিনী সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছে এই ‘মহাভারতের’ ধর্মে। সন্ত কবীর ওদের দিশারী!

রাম-রহিম নাকি মঞ্জুকে বলেছিল, কই গো বৌঠান? আমার গুরু-মুর্শেদ কই? তাঁরে ডেকে দিন। সেলাম-পেলাম দুটোই তো করতে হবে।

মঞ্জু হেসে বলেছিল, তিনি তীর্থদর্শনে গেছেন।

রাম-রহিম দরবেশ বলেছিল, সে কী! গুরু-মুর্শেদ মন্দির-মসজিদে গেছেন মালা-টপকাতে? শুনুন বৌঠান:

“মন্কা ফেরং জনম গয়ো, গয়ো ন মন্কা ফের।

করকা মন্কা ছোড় কর মন্কা মন্কা ফের!!”^২

রূপেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ স্থির হয়ে কী-যেন ভাবতে থাকেন। তারপর মনস্থির করে বলেন, আজ তোমাকে একটা কথা বলব মঞ্জু। ভেবেছিলাম এ-কথা কোনদিনই জানাব না; কিন্তু মনে হচ্ছে তা গোপন করে যাওয়া অন্যায় হবে। তুমিও এতদিন বিস্তারিত জানতে চাওনি। আমি ঐ রাধা-বৌঠমী আর রাম-রহিমের কথাটা বলতে চাইছি।

ভারী মিষ্টি করে হাসল মঞ্জু। বলেন, থাক! তোমাকে বলতে হবে না। আমি তা জানি। আর একথাও জানি, কেন সন্কোচে সে-কথা এতদিনে আমার কাছে বলনি!

রূপেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে যান। বলেন, কে বলেছে? রাধা?

—শুধু রাধাদি বলবে কেন? আমি নিজের চোখেই তো দেখেছি!

(১) জাতি, পাতি, কুল, কাপড়া এসব শোভা তো দু-চার দিনের। কবীর বলেন, শুন গুরু-রামানন্দ! এসব বিলকুল ঝকমারি। আমার বচনই আমার জাতি; আমার হৃদয়েরই আমার কুল, আর সাধুজন আমার কুটুম্ব। কবে যে মূখগুলো এ-কথা বুঝবে!

(২) জপমালার গুটিক ঘূর্ণন করতে করতে জীবন বিকিয়ে গেল, অথচ মন্দির-মসজিদে ধোর কাটল না। ওরে ভাই, হাতের মালা টপকানো বন্ধ করে মনের মালা টপকানো অভ্যাস কর।

বিস্তারিত জানায়। সেই প্রথম দর্শনেই রাধা এসে যখন আচমকা রূপেন্দ্রনাথের হাত চেপে ধরে তখনই বুঝতে পেরেছিল মঞ্জু। মেয়েরা এ বিষয়ে ভুল করে না। তারপর সেই হাটতলার চণ্ডীমণ্ডপে শেষ রাত্রে যখন রাধা শয্যাভ্যাগ করে ঘনিয়ে এসেছিল রূপেন্দ্রর কাছে তখনও সে সব কিছু দেখেছে, শুনেছে। সাড়া দেয়নি। তারপরেও নানান ছোট ছোট ঘটনা।

রাধা ওকে বাকিটা জানিয়ে গেছে। অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। কোনও সঙ্কোচ করেনি। এমনকি ফরাসডাঙার নাকা-দরওয়াজা অতিক্রম করার পর নির্জন সাঁকোর ধারে ওদের ঘনিষ্ঠ প্রেম-বিনিময়। রাধা অসঙ্কোচে জানিয়ে ছিল, সে আত্মসংবরণ করতে পারেনি। রূপেন্দ্রনাথকে সবলে আকর্ষণ করে মুখচুষন করেছিল!

তারপর ওদের ফরাসডাঙার অতিথিশালায় আশ্রয় লাভ। কীভাবে রূপেন্দ্র তাকে তুলে দিয়েছিলেন রাম-রহিমের হাতে। নিঃশব্দে সরে গিয়েছিলেন অন্তরালে!

রূপেন্দ্রনাথ রীতিমতো অবাক হয়ে বলেন, আশ্চর্য! তুমি সব জান! কই আমাকে তো কিছু বলনি?

মঞ্জু হাসি লুকিয়ে বলে, তুমিও তো আমাকে কিছু বলনি!

—আমার গোপন করার একটা অর্থ হয়। বলতে পার, সঙ্কোচ, অথবা তোমাকে দাগা দিতে চাইনি বলে। কিন্তু তোমার ঈর্ষা হল না কেন? তুমি আমার কৈফিয়ৎ চাইলে না কেন?

—ঈর্ষা হবে কেন? গৌর তো ইচ্ছে করলে আমাদের ভাগ্যটা বদলে দিতেও পারতেন। তা তিনি দেননি, এতে কি ঈর্ষা হওয়ার কথা? এ তো আমার সৌভাগ্য!

—ভাগ্য বদলানো মানে?

—রাধাদির মুর্ছা রোগ হতে পারত, তাকেই গো-গাড়ি করে সেই মোহান্ত তোমার কাছে পাঠাতে পারতেন। আমি, আমি হয়তো সে ক্ষেত্রে ...

রূপেন্দ্রনাথ ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, তোমার আজ অন্য এক রূপ দেখলাম মঞ্জু। 'এ-তুমি' আমার অচেনা ছিলে এতদিন!

মঞ্জু আবেশে ঠুকে জড়িয়ে ধরে।

রূপেন্দ্র বলেন, তুমি আমাকে সন্তান দিয়েছ, তোমার একটা পুরস্কার পাওনা! বল, কী নিয়ে আসব তোমার জন্যে এবার তীর্থ করে ফেরার সময়।

ভারী সুন্দর জবাব দিল মঞ্জু। বললে, তুমি না প্রথম দিনই বলেছিলে স্বামী আর স্ত্রীর সমান অধিকার! তাহলে ও কথা বলছ কেন? 'আত্মদীপ' আসছে; কিন্তু কে-কাকে উপহার দিল তার তো হিসাব হয়নি আজও!

তা বটে! তবু রূপেন্দ্রনাথ বলেন, তা হোক, তুমি আজ যে উদার মনের পরিচয় দিলে সেটাকে পূরস্কৃত করা আমার কর্তব্য।

মঞ্জু বললে, তাহলে আমি যা চাইব তা দেবে?

—দেব, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়। বল?

—আমার বড় সাধ—ঐ বড়মার মতো তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার। তুমি আমাকে লেখাপড়া শেখাবে? লুকিয়ে লুকিয়ে?

রূপেন্দ্র শয্যাপ্রান্তে উঠে বসেন। এমন একটি গোপন বাসনা যেমঞ্জুর অন্তরে লুকিয়ে আছে

তা আন্দাজ করতে পারেননি। অবাক হয়ে বলেন, তোমার ভয় হয় না? লোকে বলে, লেখা-পড়া শিখলে ...

মঞ্জু তার হাতটা বাড়িয়ে চাপা দেয় ওঁর মুখ। বলে, ও-কথা বল না! বড়মা তো প্রমাণ করে দিয়েছেন সেটা ভুল। তুমিও তো তাই বলে থাক।

—তা বলি। কিন্তু বড়মাকে জেঠামশায়ের সঙ্গে কখনো তত্ত্বকথা বলতে শুনেছ?

—না, শুনিনি; কিন্তু রাধাদি তোমার সঙ্গে কীভাবে কথা বলত তা তো শুনেছি। আমি গান গাইতে পারি না, কেউ শেখায়নি, কিন্তু ...

—বুঝেছি। তাই হবে মঞ্জু। শেখাব, তোমাকে বাঙলা পড়তে-লিখতে শেখাব। সংস্কৃতও শিখবে। কিন্তু এখানে তো তা সম্ভবপর নয়। এখানে সুযোগ হবে না। জানাজানি হয়ে যাবে। গুরুজনেরা কেউ যদি একবার নিষেধ করেন ...

—না, না, এখানে নয়। সোণ্ডাই ফিরে গিয়ে।

—সেই ভাল। কথা দিচ্ছি, আত্মদীপের হাতেখড়ি দেবে তার মা, বাবা নয়। অক্ষর পরিচয়ও করাবে তার মা। সেই যেমন কাশী-রাজমহিষী মদালসা করিয়েছিলেন রাজপুত্র অলকের। কিন্তু এটা তো আমার ইচ্ছাপূরণ হল না, মঞ্জু?

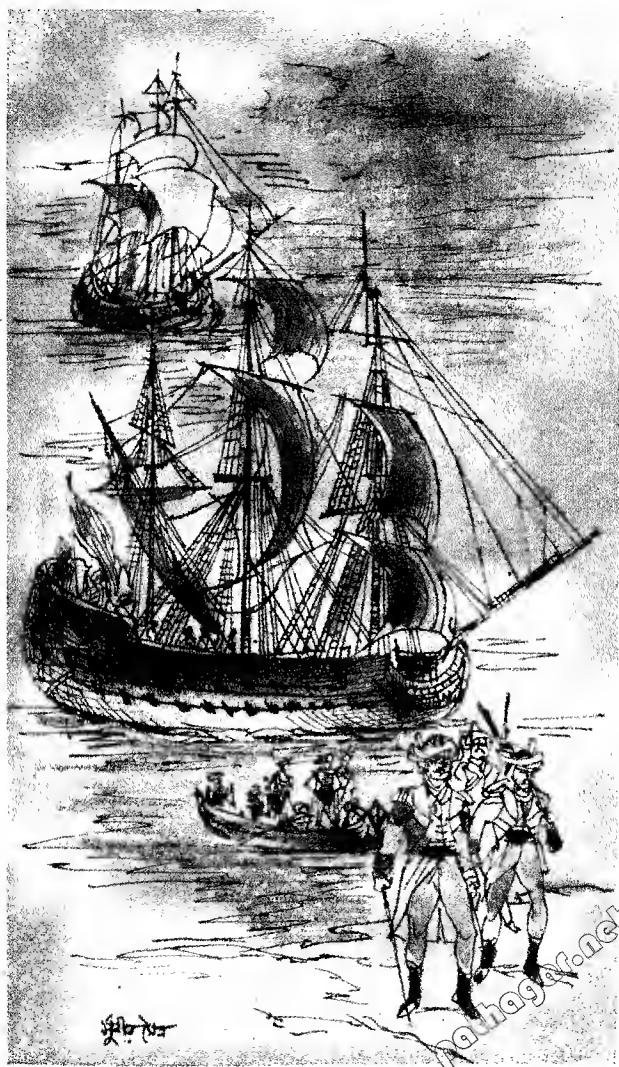
—হল না? তুমি চাও না আমি লেখাপড়া শিখি?

—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। সে-কথা বলছি না। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাইলাম, আর উল্টে তুমিই তা আমাকে করে দিলে!

মঞ্জু আবার মিষ্টি করে হাসল। বলে, কিন্তু সেটাই তো নিয়ম। দেওয়া আর নেওয়ার আনন্দ যদি সমান না হয় তবে কিসের এই স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক!

বাঃ! মাতৃহ-গৌরবে মঞ্জু আজ অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে!







বণিকের মানদণ্ড

1498—1757

ষষ্ঠ পর্ব

সমকালীন ভারতবর্ষ বুঝতে পারেনি তত্ত্বটা: 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার।' দু-তিন শ' বছরের ব্যবধানে সুবিধাজনক মালভূমিতে দাঁড়িয়ে সেজন্য তাকে দোষাবোপ করা ঠিক নয়। প্রথম কথা, সমকালে, একই কালীক সমতলে দাঁড়িয়ে

এ জাতীয় তত্ত্ব বোঝা যায় না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত। সক্রোটস বা যীশুখ্রীষ্টের বিচারকও তা বুঝতে পারেনি। প্রণিধান করতে পারেননি গ্যালিলেওর সমকালীন পোপ। দ্বিতীয় কথা, আদি যুগে পশ্চিমের দ্বার দিয়ে যারা এসেছিল তারা ঐ মন্তব্যটা বিশ্বাস করত না: 'দিবে আর নিবে'। তারা এসেছিল শুধু লুট করতে। ফলে, ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গিটাও হয়ে উঠেছিল প্রত্যাশিতভাবে শত্রুভাবাপন্ন।

আমাদের আরও একটা স্বভাবগত দোষ ছিল: ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ ছিল বড় বেশি সহিষ্ণু। তাই কুপমণ্ডুক টুলো পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে কোনও মার্টিন লুথার, রেজা খাঁ বা দেবী সিংহের বিরুদ্ধে কোনও অলিভার ক্রমওয়েল এখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। প্রতিবাদ হয়েছে, এখানে-ওখানে, গৌরবে তাকে আমরা বিদ্রোহও বলে থাকি; কিন্তু তা রাজ্যব্যাপী ব্যাপক আকার ধারণ করেনি।

সব কিছু 'বেদ-এ আছে' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। যুরোপ যখন চাষবাস জানত না, কাঁচা মাংস খেত তখন আমরা নগরের পশুন করছি, পরমপুরুষের স্বরূপ প্রণিধানে সচেষ্টি হয়েছি—একথা যেমন সত্য, তেমনই অন্ধযুগ অতিক্রমণে যুরোপ যখন রেনেসাঁয় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে তখন আমরা সতীদাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ জাতীয় কুসংস্কারে মগ্নচেতন্য হয়ে পড়ছিলাম এ কথাও সলজ্জে স্বীকার্য।

'বেঙ্গল রেনেসাঁ' বা বাঙলার নব জাগরণ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। নিন্সেন্দেহে তার প্রথম শঙ্কানির্ঘোষ করেছিলেন রাজা রামমোহন। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য ভাষার মাধ্যমে তৌল করতে চেয়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে—গ্রীক, রোমক, ফরাসী সভ্যতার তত্ত্বে। তিনিই প্রথম প্রণিধান করতে পেরেছিলেন পৌত্তলিকতায়, আনুষ্ঠানিক সংস্কারে কী-ভাবে রুদ্ধ হয়ে গেছে

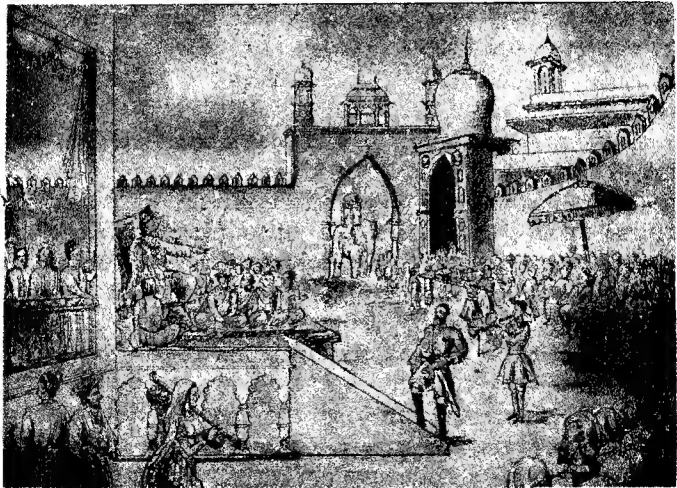
বেদ-উপনিষদের জ্ঞানচর্চা। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি স্বচক্ষে পশ্চিমখণ্ডের সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ মূল্যায়ন করতে ছুটে গিয়েছিলেন।

কিন্তু রাজা রামকে স্বয়ম্ভূ মনে করা ভুল। তাঁর প্রাথমিক যুগেও কেউ কেউ নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন ঐ পশ্চিমের দ্বার দিয়েই আসবে জ্ঞানের আলো। তাঁদের কথা আমরা জানতে পারি না। তাঁরা ইতিহাসে হারিয়ে গেছেন। আমার কল্পনায় তাঁদের এক সম্ভাব্য প্রতীক : পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর। যিনি পশ্চিমের পরকলায় জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন। কুসংস্কারচ্ছন্ন ও কুপমণ্ডক সমাজকে ভেঙে নতুন করে গড়ার প্রয়োজনটা নিশ্চয়ই অনেকে প্রণিধান করেছেন। তাঁরা সে সুযোগ পাননি তাঁদের জীবনে।

আবার বলি, আমার কল্পনায় তার আর এক প্রতীক : হটী বিদ্যালয়দ্বারের পিতৃদেব।

এই পশ্চিমের দরজাটা কী ভাবে ধীরে ধীরে খুলে গেল সে-কথা এবার বলি।

সেই ধারাবাহিকতা পৃথকভাবে বর্ণনা করব বলেই ভাগীরথী তীরের তীর্থ-পরিভ্রমণ কালে আমরা কয়েকটি জনপদের কথা অনুক্ত রেখেছিলাম : সপ্তগ্রাম, ব্যাণ্ডেল, হুগলী, ওলন্দাজনগর।



বণিকের মানদণ্ড

ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ বেঁটন করে কালিকট বন্দরে এসেছিল 1498 খ্রীষ্টাব্দে।

বলা বাহুল্য, সেই প্রথম যুরোপীয় নয়। স্থলপথে তার পূর্বে বহু বহু যুরোপীয় ভারত ভ্রমণে এসেছেন, সেই ম্যাসিডোনিয় সেকেন্দার শাহর আমল থেকে। জলপথেও দা-গামাই প্রথম আগন্তুক নয়। পূর্ববর্তী দশকে জলপথেই কালিকটে এসে পৌঁছেছিলেন আর একজন পর্তুগীজ ভাগ্যাস্থেষী : পেদ্রো দা কোভিলহাস। কিন্তু ইতিহাসের ঐ রেওয়াজ—আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে

বঙ্গদেশ

পদার্পণ না করেও কলহাস যেমন হয়েছেন আমেরিকার আবিষ্কারক, এভারেস্টের উচ্চতা না, মেপেও যেমন এভারেস্ট-সাহেব অমর, তেমনি আমাদের জানানো হয়েছে দা-গামাই এই সম্মানের অধিকারী।

দা-গামা আরব সাগরে নুশংস লুটতরাজ করে পর্তুগীজ নৌ-বাণিজ্যের স্বরূপটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। মক্কায় তীর্থযাত্রী আরব-জাহাজ মেরী-র যাবতীয় পণ্যসামগ্রী লুট করে কী-ভাবে তিনশজন নরনারীকে হত্যা করেছিল তার বিবরণ শরদিন্দুর ‘রক্তসঙ্ক্যা’। সে কাহিনী ইতিহাসের চেয়েও সত্য।

লুট আর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়ে মালাবার উপকূলের শান্তশিষ্ট জনপদগুলিকে শ্মশানে রূপান্তরিত করে দা-গামা ফিরে গেল স্বদেশে। সঙ্গে প্রচুর পণ্য ও ধনসম্পদ এবং অসংখ্য ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। লোভে-লোভে সে দ্বিতীয়বারও এসেছিল।

ভারতবর্ষে তখনও বাবুর বাদশাহ এসে পৌঁছাননি। পাঠানযুগ চলছে—লোদী বংশ। সব বৃত্তান্ত শুনে মুগ্ধ হলেন পর্তুগাল রাজ। পোপকে প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন আর ঐ সঙ্গে পূর্বদেশ-শোষণের ধর্মীয় অনুমতি। কাঞ্চনমূল্যে সব কিছুই শোষণ হয়ে যায়। পোপ অনুমতি দিলেন—পর্তুগালরাজ হয়ে গেলেন “Lord of the Navigation, Conquests and Trade of Aethiopia, Arabia, Persia and India.”

তত্বটা প্রণিধানযোগ্য। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা যা কিছু করেছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে-কাজে কোনও পাপ ছিল না। স্বয়ং পোপ-এর অনুজ্ঞাবলে তারা এট-‘হীদেন’দের প্রভু। তারা যদি সেটা না মানে তবে তাদের হত্যায় পাপ নেই।

পোপের আশীর্বাদ পেয়ে পর্তুগালরাজ এবার পাঠালেন তাঁর প্রতিনিধিকে—পর্তুগীজ ভাইসরয়: ঙ্গালিস্কো দ্য আলমেইডা (1505)। কোচিন সমুদ্রোপকূলে থানা গাড়লেন তিনি। খুলে বসলেন দপ্তর। কাজ একটাই: সুযোগমতো আরব বণিকদের জাহাজ লুট করা।

পরবর্তী ভাইসরয় আঁফাসো দ্য আলবুকার্ক। এবার স্থলভাগের দিকে নজর দেওয়া হল। দুই দশকের ভিতর অধিকৃত হল গোয়া, দমন, দিউ। কোচিন থেকে রাজধানী সরিয়ে আনা হল গোয়ায়।

তারপর দৃষ্টি পড়ল ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে। দুটি বন্দর তাদের লক্ষ্য: সমুদ্রের কাছাকাছি চট্টগ্রাম আর সরস্বতী তীরের সপ্তগ্রাম। ক্রমে তারা এল বঙ্গদেশে।

কিন্তু তার পূর্বেও সপ্তগ্রামের ইতিহাস আছে। এবার বরং ফিরে আসি ভাগীরথী তীরের বাকি কয়টি জনপদ দেখতে: সপ্তগ্রাম, ব্যাণ্ডেল, হুগলী, চুঁচুড়া।

সপ্তগ্রাম

বংশবাটীর কিছু দক্ষিণে আদি সপ্তগ্রাম। বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যযুগে তা ‘স্বর্ণনগরী’। তার সে-আদিমরূপ আজ চিন্তার বাইরে। বিপ্রদাসের ‘মনসামঙ্গলে’ দেখাছি চাঁদ সদাগর সপ্তগ্রামে 450



ভাসিয়ে চলেছেন সমুদ্রে—বিপুল বাণিজ্যসভার নিয়ে। পথে পড়ল সপ্তগ্রাম। দেখতে পেলেন :

“অভিনব সুরপুরী দেখি সব সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের বারা,
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাচ ঢাল
রাজমুক্তা প্রবালের ধারা।”

নামকরণের সূত্রটি পাওয়া যাবে পৌরাণিক ইতিহাসে—

কিংবদন্তি অনুসারে বহু বহুযুগ পূর্বে কান্যকুঞ্জে ছিলেন এক নৃপতি। নাম প্রিয়বন্ত অথবা প্রিয়ব্রত। তাঁর ছিল সাত-সাতজন জ্যোয়ান ছেলে। তাদের নাম : অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুস্মান, জ্যোতিস্মান, দ্যুতুমান, সর্বন ও ভব্য। রাজার ছেলে, কিন্তু মতিগতি রাজসিক নয়, সাধ্বিক। সাতভাই একযোগে একদিন গৃহত্যাগ করল। ‘যেনাহং নামৃতা স্যাম’—মন্ত্র তাদের, রাজসুখে বাধা পড়তে চায় না। দেশ-বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে থামল ভাগীরথীর কিনারে। গঙ্গা-যমুনার কিনারে সাতটি স্থানে তপস্যায় বসল তারা। সেই তপস্যাস্থলে গড়ে উঠল সাত-সাতটি গ্রাম : বাঁশবেড়িয়া, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, খামারপাড়া, দেবানন্দপুর, শিবপুর আর ত্রিশবিধা। এই সাতটি গ্রাম নিয়েই হল সপ্তগ্রাম। পাশেই ত্রিবেণী—ভাগীরথী, সরস্বতী আর যমুনার মুক্তবেণী সঙ্গম। এ কাহিনীরও উল্লেখ আছে বিপ্রদাসের ‘মনসামঙ্গলে’—

“বহিঃ চাপায়ে কূলে চাঁদ অধিকারী বলে

দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম

তথা সপ্তঋষিস্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান

শোক দুঃখ সর্বগুণধাম॥

জ্যোতি হইয়া এক মূর্তি ঋষিমুনি সেরে তথি

জপ-তপ করে নিরন্তর।

গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি

অধিষ্ঠান উমা-মহেশ্বর।”

মাধবাচার্যের ‘চণ্ডীমঙ্গল’, মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী রচিত ‘পবনদূতম্’ কাব্যে এবং ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ে আছে সপ্তগ্রামের বর্ণনা। আগেই বলেছি, গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে সপ্তগ্রাম চিহ্নিত।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মিশর দেশীয় ভূপর্ষটক ইবন বতুতা (1304-68) এসেছিলেন এখানে। আফ্রিকা ছাড়েন 1325-এ, ঘরে ফিরে যান আঠাশ বছর পরে। বাংলার মসনদে তখন সুলতান ফকরউদ্দীন। দিল্লীতে তখন দাস-বংশের গিয়াসুদ্দীন বলবন। ইবন বতুতা প্রসঙ্গক্রমে সপ্তগ্রামের অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকি বাজার দরও—“সপ্তগ্রামে একটা রূপোর দিহরামে পাওয়া যায় পঁচিশ রিখল চাউল।” হিসেবটা বুঝিয়ে বলি। তখন মুদ্রা হিসাবে চালু ছিল রূপোর দিনার—আজকের একটাকার মতো। আট দিহরামে এক দিনার। আর ‘পঁচিশ রিখল’ মানে প্রায় বিশ কিলোগ্রাম! দুগ্ধবতী একটি গাভীর দাম আজকের তিন টাকা। সুন্দরী সূন্দরী ক্রীতদাসীর দাম একটা সোনার দিহরাম।” অর্থাৎ দশ টাকা। শোনা কথা নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—“এ দামে

সম্ভ্রাম

আমি স্বয়ং একটি সুন্দরী বালিকাকে ক্রয় করেছিলাম। তার নাম লালুয়া।” -লিখে গেছেন ইবন বতুতা।

এক বৃদ্ধ বাঙালী মুসলমান নাকি বলেছিলেন, ‘সংসারে তিন তিনটি খাওয়াইয়া, মুই নিজে, এক বিবি, আউর এক কমবস্ত্র নোকর। সম্বৎসরে খাওনের খরচ হল গিয়ে পুরো এক দিনার!

ইবন বতুতা এ প্রসঙ্গে শেষ উপসংহারে বলেছেন, গোটা হিন্দুস্থানে শুধু নয়, গোটা দুনিয়ায় তখন বাংলাদেশের মতো সম্ভার বাজার আর ছিল না।

হায়রে কবে কেটে গেছে ইবনবতুর কাল!

আরও জানাচ্ছেন, ফলের বাজারে মিলত—আম, জাম, আঁড়ুর, ডালিম, নারকেল। আহা! পান-চর্বণের রেওয়াজ ছিল। দিন-আনি দিন-খাই চিবাতে পান সুপারি, সৌখীন ব্যক্তিদের জন্য করঙ্কবাহিকা হাজির করত রূপার রেকাবীতে ভিন্ন ভিন্ন খোপে: পান, গুবাক, চুন, অন্যান্য মশলা ও কর্পূর। অর্থাৎ পূর্বযুগে নৈষধচরিতে যে বর্ণনা পাই তা তখনো টিকে আছে। ঘরানা ঘরের মেয়েরা পথ চলত দোলায় চেপে; সেটা পাল্কির বিকল্প। ঢাকা থাকত রেশমের পর্দায়। রেশম আসত ঢাকা অঞ্চল থেকে। দেশে সতীদাহ প্রথা ছিল, তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে নাকি পুড়িয়ে মারা হত না।

আর একটি সূত্রে দেখছি—সাল তারিখ নিয়ে কিছু ভ্রান্তি আছে কিনা জানি না—ইবন বতুতার সপ্তগ্রাম দর্শনের প্রায় পঞ্চাশবছর আগে যখন রুকনউদ্দীন কৈকাউস শাহ্ গৌড়ধিপতি, তখন উলুগ-ই-আজম জাফর খাঁ বাহরাম ইংগীন সপ্তগ্রাম অধিকার করেছিলেন। তখন নাকি সেটাই ছিল গৌড়মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ নগরী। তার পূর্বে সপ্তগ্রাম ছিল হিন্দু রাজার অধিকারে। কোন রাজার হাত থেকে জাফর খাঁ এই অধিকার ছিনিয়ে নেন তাঁর নাম জানা যায় না। কবি কৃষ্ণরামের ‘ষষ্ঠীমঙ্গল’ কাব্যে অনুমান করা যায় তাঁর নাম শত্রুজিৎ। ঐ জাফর খাঁ একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ইনি নাকি 1295 থেকে 1313 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সপ্তগ্রামে অধিপতি ছিলেন, তাঁর মৃত্যুও হয় ওখানে। সরস্বতী ও ভাগীরথীর সঙ্গমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, সেখানেই তাঁর সমাধি। বিতর্কিত বিষয়টি হল এই যে, অনেকের মতে ইনিই হচ্ছেন সাধক দরোয়া খাঁ, যার নামে সংস্কৃতে রচিত একটি গঙ্গাভোত্র পাওয়া যায়।

দু-আড়াইশ বছর পরের কথা। সুলতান হুসেন শাহ-র (1493-1519) আমলে সপ্তগ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়—‘হুসেনাবাদ’। নামটি স্থায়ী হয়নি। হুসেন শাহকে নিশ্চয় চিনতে পারছ। তিনি বসন্ত বাঙলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক। তাঁর আমলে অনেক হিন্দু রাজপুরুষ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উজির ছিলেন পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু), এছাড়া দবীর খাস (রূপ গোস্বামী), সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামী), চিকিৎসক মুকুন্দ দাস। একদিকে যেমন রাজধানী গৌড়ে নির্মাণ করেছেন ছোট-সোনা মসজিদ, অন্যদিকে তাঁরই আদেশে ও অর্থানুকূলে মালাধর বসু বঙ্গানুবাদ করেন শ্রীমদ্ভগবৎগীতার। প্রতি জেলায় মসজিদসহ হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তগ্রামে তিনি একটি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রধান কর্মাধ্যক্ষও একজন হিন্দু। সপ্তগ্রাম-টাঁকশালে মুদ্রিত হুসেন শাহ, শের শাহ প্রভৃতির নামাক্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে।

সম্ভবত হুসেন শাহের আমলেও সপ্তগ্রামে পর্তুগীজ প্রভাক পড়েনি। দু-চারটি নৌকায়

পর্তুগীজ ব্যবসায়ী হয়তো এসেছে; কিন্তু বড়জাতের অভিযান ঘটেনি। পূর্ণেন্দু পত্নী অবশ্য লিখেছেন, “1533—বাংলা দেশে তখন হোসেন শাহী রাজত্ব। পাঁচটা জাহাজ আর দুশো লোক নিয়ে অ্যাফোনসো ডি মেলো বাংলাদেশে এসে হাজির। উদ্দেশ্যে বাণিজ্য।”^১ মনে হয় তথ্যটায় কোথাও কিছু ভ্রান্তি আছে। পর্তুগীজদের এই নাটকীয় আবির্ভাব যদি 1533 খ্রীষ্টাব্দেই ঘটে থাকে তবে তা হোসেনশাহী জমানায় নয়, কারণ হোসেন ফৌত হয়েছেন 1519 খ্রীষ্টাব্দে। সম্ভবত তখন মামুদ শাহ্ গৌড়েশ্বর।

সুলতান মামুদকে তারা নানান মূল্যবান উপঢৌকনে নজরানা দিল। কিন্তু ফল হল উল্টো। কোতোয়াল সনাক্ত করল সেগুলি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অপহৃত দ্রব্য! হার্মাদদের অপকীর্তি। ফলে সুলতান মামুদ ডি মেলোকে তার সাজোপাঙ্গ সমেত কয়েদ করলেন। দুঃসংবাদ পৌঁছালো কেন্দ্রীয় দফতরে, গোয়ায়। গোয়ায় পর্তুগীজ গভর্নর তখন নান্ ডি কুনহা। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পাঠিয়ে দিলেন আর এক নৌ-সেনাপতিকে, আন্তোনিয় ডি সিলভা মেজেসকে। মেজেস ঘাঁটি গাড়লেন চট্টগ্রামে। সেখান থেকে তদ্বির-তদারক চলতে থাকে। সুলতান নির্বিকার! বন্দীদের মুক্ত করার কোন গরজ নেই। মেজেস লুট করল চট্টগ্রাম। তাতেও কোন প্রতিক্রিয়া হল না। তখন মেজেস-এর সেনানায়ক দিয়ানো রিবেলো সৈন্য অবরোধ করল সপ্তগ্রাম বন্দর। ভাগীরথী দিয়ে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সবাই আশা করেছিল এইবার সুলতান মামুদ সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বেন ঐ পর্তুগীজ বোম্বটেগুলোর উপর। বাস্তবে তা হল না। বরং সুলতান মামুদ ওদের ডেকে এনে সন্ধি করলেন।

কারণ ছিল। সেটা 1536; দিল্লীর মসনদে তখন বাবর-তনয় হুমায়ুন। তাঁর সঙ্গে সুলতান মামুদের সম্ভাব আছে। কিন্তু বিহারে কে এক ভুঁইফোড় তরুণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাজারে গুজব সে কৈশোরে ডাকাতি করত। সাসারামে সামান্য এক সুবেদার হাসানের ত্যাজ্যপুত্র—নাম ফরিদ। লোকটা এই কিছুদিন আগেও বিহারের এক সুলতান—বাহার খাঁ লোহানীর কিল্লায় গৃহশিক্ষকের নোকরি করত—তাঁর নাবালক পুত্র জালাল খাঁর ‘আতালিখ’ অর্থাৎ গৃহশিক্ষক। তবে লোকটার যেমন দেহের ক্ষমতা তেমনি দুর্জয় সাহস। কোন এক বিজন বনে তাকে নাকি বাঘে আক্রমণ করে, আর লোকটা তরোয়ালের এক কোপে বাঘটাকে দুখণ্ড করে ফেলে। সুলতান লোহানী তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষককে একটা নয়্যা খেতাব দেন: শের খান।

জবর কিসমৎ লোকটার, আশমান ফুঁড়ে কিস্মতী-হুরী নেমে এসে ধরা দিল শের খাঁর হাতে। কাশীর কাছে চুনার কিল্লার অধিপতি তাজ খাঁকে বৃষ্টি তারই যুবকপুত্র হত্যা করেছিল কিল্লার দখল নিতে। সদ্যবিধবা লাদ মালিকা তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়ে দিল যুবক বীর শের খাঁর কাছে—সপত্নীপুত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার আর্জি সমেত। শের সৈন্য চুনারে এসে উদ্ধার করলেন লাদ মালিকাকে। কৃতজ্ঞ মেয়েটি উদ্ধারকারীর হাতে কিল্লাসম্মত তুলে দিলেন কিল্লাদারনিকে!

সেই ভুঁইফোড় লোকটা নাকি হুমায়ুনকে হিন্দুস্থান থেকে তাড়াতে চায়। স্বয়ং দুঃসাহস।

^১ ‘পুরনো কলকাতার কথাচিত্র’, পূর্ণেন্দু পত্নী, দেজ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি 1982, পৃ: 68.

সত্যদাম

আর সে-কাজের আগে দখল নিতে চায় বঙ্গাল-মুলুক। হুসেন শাহ তাই সে-সময়ে—সেই 1536 খ্রীষ্টাব্দে—আশঙ্কা করছিল পশ্চিমদিক থেকে শের খাঁর আক্রমণ। পর্তুগীজদের সে আল্লাতালার আশীর্বাদ বলে মনে করল। হাতে হাতে মেলালো।

শের খাঁ এ যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। পর্তুগীজদের সহায়তা সত্ত্বেও শের খাঁ-কে রুখতে পারল না মামুদ। তার অন্যতম হেতু—শের তালিয়াগাড়ির (আধুনিক সাহেবগঞ্জ) প্রচলিত পথে আদৌ আসেনি; শের জানত—সে পথে সুলতান হুসেন তার সৈন্য সমাবেশ করেছে। বনজঙ্গল ভেদ করে সে বাংলায় এল এক ঘুর পথে। সেই অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল গৌড়াধিপতি মামুদশাহ-র বাহিনী। বহু উপটোকন দিয়ে সুলতান মামুদ শের খাঁর বশ্যতা মেনে নিল।



কিন্তু ভারতেতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়, আমরা আলোচনা করছি সপ্তগ্রামের ইতিহাস। হুমায়ুন হিন্দুস্থান থেকে বিতারিত, শের খাঁ এখন দিল্লীস্থর শের শাহ শুর। তা হোক, পর্তুগীজেরা ঐ সুযোগে সুলতান মামুদের ছত্রছায়ায় সপ্তগ্রামে জাঁকিয়ে বসেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাঠান রাজত্বের অবসান; দিল্লীস্থর হয়েছেন আকবর।

সম্রাট আকবরের আমল (1556-1605)। গৌড়ে তখন সুলেমান কররানির সুলতানি। তাঁকে চিনতে না পারলেও তাঁর সেনাপতিটি তোমাদের অচেনা নয়: কালাপাহাড়। নঞর্থক ভাস্কর্যকীর্তিতে সে সারা পূর্বভারতে কুখ্যাত।

সুলেমান কররানি সেবার ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণের রাজ্যটি দখল করার মতলব ভাঁজছে। রুদ্রনারায়ণ সাহায্য চাইলেন তদানীন্তন কলিঙ্গরাজ মুকুন্দদেবের। এবং পেলেন। রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতিভ্রাতা প্রখ্যাত বীর রাজীবলোচন রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ এবং কলিঙ্গের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যপত্য গ্রহণ করেন। 1565 খ্রীষ্টাব্দে রাজীবলোচন মুসলমান সুবেদারের হাত থেকে সপ্তগ্রামকে পুনরুদ্ধার করেন। সপ্তগ্রামকে পুনর্বীর অধিকারে আনার সঙ্কল্প নিয়ে সুলেমান কররানি ও তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় উপর্যুপরি চারবার সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন এবং চারবারই ব্যর্থ হন। পরিশেষে রুদ্রনারায়ণকে প্রচুর উপটোকন প্রেরণ করে সন্ধিস্থাপন করেন।

সপ্তগ্রাম দীর্ঘদিন পরে আবার হয়ে গেল হিন্দুরাজার শাসনে একটি বন্দর।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি—অতঃপর সুলেমান কররানি কলিঙ্গরাজ মুকুন্দদেবকে উচিত শিক্ষা দিতে তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড়কে প্রেরণ করলেন উড়িয়া বিজয়ে। “ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে দুর্ভাগ্য পুনরুজ্জ্বলিত হয়েছে ক্লাস্তিকর এবারেও তাই ঘটল।” এই চরম দুঃসময়ে মুকুন্দদেবের অমাত্যবর্গ সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বঙ্গাল নিরুপায় কলিঙ্গরাজ কোণার্কের সূর্যমূর্তিটি পুরীর মন্দিরে স্থানান্তরিত করে (সম্ভবত জাজিও তা সেখানে আছে) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সে যুদ্ধে বকের বক্তৃতা দিয়ে মুকুন্দদেব তাঁর অমাত্যবর্গের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যান। আর কালাপাহাড়ের অপকীর্তি মহাকালের

শিলালেখে চিরস্থায়ী হয়ে রইল উড়িষ্যার নানান দেবদেউলে। এই মুকুন্দদেবই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা।”^১

হয়তো ভুল বলেছি। এ কাহিনী এ গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক। আমাকে এর পরের দশকে পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধটিও তো বর্ণনা করতে হবে—গৌড়দেশের শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাবের সেই মর্মভঙ্গ কাহিনীটি। ইতিহাস যে নিজের পুনরাবৃত্তি এই সূত্রে তা জানানো গেল।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সপ্তগ্রামের ভাগ্যে ঘটল দু-জাতের যুগান্তর। একটি ভৌগোলিক, একটি সাংস্কৃতিক।

ভৌগোলিক পরিবর্তনের হেতু সরস্বতী নদীর মহামুহূর্ত।

ষোড়শ শতকের ষষ্ঠ দশকে বিদেশী পর্যটক সীজার ফ্রেডরিকের বর্ণনায়—

“A good tides rowing before you come Satgan, you shall have a place which is called Buttor, and from thence upwards the Ships doe not goe, because that upwards the River is very shallow, and little water.

ভাষা বা বানান যাই হোক, ক্যাপিটাল অক্ষরের ব্যবহারে যতই যথেষ্টাচার থাক, বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না—সরস্বতী তিলতিল করে মরে যাচ্ছে। এককাল ঐ সরস্বতীর খাতেই প্রবাহিত ছিল ভাগীরথীর মূলধারা। দেশের বাণিজ্যের রাজপথ ছিল সেটাই। সপ্তগ্রাম এতদিন ছিল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর—তাহলিগু, চট্টগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সরস্বতীতীরের অনেকগুলি বন্দর ছিল সমৃদ্ধশালী: শিয়াখালা, সিন্ধুর, জনাই, চণ্ডীতলা, বেগমপুর, ঝাপড়দহ, মাকড়দহ, আব্দুল, হরিপাল প্রভৃতি। সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার পর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল গঙ্গাতীরবর্তী ছগলী বন্দর। সে-কথা যথাস্থানে।

ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন: বৈষ্ণব প্রভাব।

চৈতন্য-মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু সংসার জীবন প্রবেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন এই সপ্তগ্রামে।

গড়ে উঠল দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাটে প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিতাই বিগ্রহমন্দির। শ্রীকর দত্তের পুত্র উদ্ধারণ ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য। পৈত্রিক বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তিনি সুলতান হুসেন শাহর কাছ থেকে একটি জমিদারী ক্রয় করেন। কাটোয়ার কিছু উত্তরে। নিজ নাম অনুসারে তার নামকরণ করেন ‘উদ্ধারণপুর’। তিনি নিজেই করেন, অথবা উদ্ধারণকামী ভক্তবৃন্দ এ নামটি দেন তা জানা যায় না। প্রভু নিত্যানন্দ ঐ জনপদে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। শোনা যায়, নিত্যানন্দের বিবাহে উদ্ধারণ দশসহস্র সিন্ধা টাকা ব্যয় করেন।

দ্বিতীয়ত সপ্তগ্রামের আর এক গৌরব, রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন:

হিরণ্য গোবর্ধন নাম দুই সহোদর।

সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥

^১ ‘কাকুতীর্থ কলিঙ্গ’, নারায়ণ সান্যাল, ভারতী বুক স্টল, ১৯৮৭- পৃ: ১১৭.

সমুদ্রযাত্রা

হিরণ্য ও তাঁর ভ্রাতা গোবর্ধন মজুমদারের জমিদারীর আয় ছিল বার্ষিক বার লক্ষ টাকা। রঘুনাথ ঐ গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র। ধর্মানুরাগী পুত্রকে সংসারী করার অভিপ্রায়ে গোবর্ধন সপ্তদশবর্ষীয় কিশোরের সঙ্গে একটি সুন্দরী বালিকার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তবু বেঁধে রাখা গেল না। রাহুলমাতা বা বিষ্ণুপ্রিয়া নামটা অন্তত মনে রেখেছে ইতিহাস, রঘুনাথজায়ার নামটুকুও মুছে গেছে!

বিবাহের অনতিকাল পরেই রঘুনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বলরাম আচার্যের শিষ্য। দীর্ঘ ষোলো বৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর চলে যান শ্রীবন্দাবনে। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। বন্দাবনে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি রাধাকৃষ্ণ ও শ্যামকৃষ্ণ উদ্ধার। বহু গ্রন্থও রচনা করেন। শ্রীবন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্তর্গত এই পরমবৈষ্ণব সপ্তগ্রামের মানুষ। তাঁর স্মৃতিতে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ দ্বাদশী তিথিতে আজও সেখানে একটি বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ। একজন ইংরাজ বণিক এলেন সাতগাঁয়। নাম রাল্ফ কিচ। তিনি এসেছিলেন স্থলপথে, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে। প্রায় আট বছর ধরে ভ্রমণ করেন ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ (1583-91)। বিলাতে ফিরে গিয়ে তিনি এই পূর্বরাজ্যের এক সোনালী স্বপ্নের ছবি প্রকাশ করেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। সমসাময়িক বিলাতি পত্রিকায় সমালোচনায় বলা হল, “He thrilled London in 1591 with the magnificent possibilities of Eastern commerce.”

সম্ভ্রমবেলার আলোকসজ্জার প্রসঙ্গে যদি সকালবেলাকার পল্লভে পাকানোর কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে হয়, তাহলে 1600 খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথ যে ইংরেজ কোম্পানিকে সাম্রাজ্য আলোকসজ্জার ‘চাটটার’ দিলেন, তার সল্‌তেটি পাকিয়েছিলেন ঐ রাল্ফ কিচ।

ঊনবিংশ শতাব্দী : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ‘বেণের মেয়ে’তে ঐক্যেছেন সপ্তগ্রামের সম্পদের চিত্র। সমকালীন সপ্তগ্রামের নয়, অতীতের। বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে ‘কপালকুণ্ডলা’য় সপ্তগ্রামের পতন সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তা যথার্থ :

“পূর্বকালে সপ্তগ্রাম সমুদ্রকূলীয় নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে) সপ্তগ্রামে প্রাচীন সমুদ্রের লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতবতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সংকীর্ণরীরা হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্য-বাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্য-গৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। ষোড়শ একাদশ শতাব্দীতে হুগলী নতুন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতে ছিল। তথায় পর্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিত করিতেছিলেন।”

বিংশ শতাব্দী : ইস্টার্ন রেলওয়ে টাইম-টেবল্‌ খুঁজলে ছোট-হরফে আদি সপ্তগ্রাম নামটি দেখতে পাবে। কোন কোন লোকাল-ট্রেন ওখানে আজও দাঁড়ায় যে!



বঙ্কিমী পথপ্রদর্শন অনুসারে সপ্তগ্রাম ছেড়ে এবার হুগলী যেতে হয়।

আদি সপ্তগ্রামের ক্রোশখানেক দক্ষিণে দুটি জনপদ : ব্যাঙুল আর হুগলী। যেন হরিহরায়্যা। সরস্বতী নয়, ভাগীরথী তীরে। ‘ব্যাঙুল’ শব্দটাও বঙ্কিমীপথে এসেছে ‘বন্দর’ শব্দ থেকে : বন্দর → বন্দল → বঙল → ব্যাঙল → ব্যাঙুল।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি পর্তুগালরাজ পোপের সনদ পেয়ে নিজেকে পূর্বপৃথিবীর ঈশ্বর বলে ভাবতে শুরু করেছেন। পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিকে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে।

প্রথম ভাইসরয় ভারতবর্ষে এসে পৌঁছানেন 1505 খ্রীষ্টাব্দে : ফ্রান্সিস্কো দ্য আলমেইডা। পরবর্তী ভাইসরয় আফঁেসো দ্য আলবুকার্ক। রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল গোয়ায়। এবার দৃষ্টি পড়ল ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে। দুটি বন্দর তাদের লক্ষ্য—সমুদ্র উপকূলে চট্টগ্রাম আর সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম। কিন্তু সরস্বতী নদীর জলধারা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে আসছে, তাই ওরা উপনিবেশ গড়ল কিছু দক্ষিণে—ব্যাঙুল-হুগলীতে।

কেটে গেছে বছর-পঞ্চাশ। বাবর-হুমায়ুন শের শাহকে পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এসে গেছে আকবর-জমানা। আকবর নিরক্ষর, কিন্তু সর্বধর্মের মর্মকথা জানবার আগ্রহ তাঁর। তিলক কাটেন, নিরামিষ আহার করেন, রাজাস্তম্ভপূরে হোম পর্যন্ত হয়, মন্ত্রপাঠ চলে। একটি বিশেষ দরবারকক্ষই নির্মিত হয়েছে সর্বধর্মের মূল কথা অনুধাবনের জন্য : ইবাদত-খানা-ই খাশ।

1579। সম্রাট আকবরের বিশেষ দূত আবদুল্লা এক মোভাবীকে নিয়ে উপস্থিত হল গোয়ায়। বিচিত্র আমন্ত্রণপত্র। সম্রাট দু-জন জেসুইট পাদ্রীকে বাইবেল ও গসপেলের বিভিন্ন গ্রন্থ সমেত রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে আহ্বান করেছেন। জানিয়েছেন—তাঁর উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্মের মর্মকথা জানবার; পাদ্রীদের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব সম্রাটের।

এমন আজব কথা ভাইসরয় কল্পনা করতে পারেন না। তবে ঝুঁকিটা নিলেন। তিনজন পাদ্রীকে প্রেরণ করলেন আগ্রায়—দলনেতা রুডলফ অ্যাকোয়ভিভা। সম্রাট মন দিয়ে ওদের কথা শোনেন, মেরী মাতার একটি মূর্তিকেও স্থান দিয়েছেন রাজপ্রাসাদে; কিন্তু যে আশা নিয়ে পাদ্রীরা এসেছিলেন তা পূরণ হল না—সম্রাট খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন না।

কিন্তু বছরখানেকের ভিতরেই তাঁরা একটি সনদ পেলেন সম্রাটের কাছ থেকে—সুদূর বঙ্গদেশে হুগলীতে একটি কুঠি নির্মাণের অনুমতি। 1580 খ্রীষ্টাব্দে। তার বিশ-ত্রিশ বছর আগে থেকেই হুগলীতে পর্তুগীজদের একটা আস্তানা গড়ে উঠেছিল। কারণ ব্যাঙুল গীর্জার নির্মাণকালটা 1559; তবে এই প্রথম পাকাপাকি সনদলাভ।

পর্তুগীজদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিমুখী। কিছু এসেছিল বাণিজ্য করতে, কিছু সত্যই খ্রীষ্টের বাণী ও ধর্মপ্রচার মানসে। তারা গীর্জা বানাতে থাকে এখানে-ওখানে। কৃপামণ্ডক সমাজপতি আর

ক্ষমতাবান জমিদারদের প্রভাবে যারা হিন্দু-ধর্মচ্যুত হয় তাদের ওরা সাদরে গ্রহণ করে, দীক্ষিত করে, গড়ে তোলে প্রথম ইঙ্গবঙ্গ সমাজ। তৃতীয় দল—তারা ই সংখ্যাগরিষ্ঠ, নিছক দস্যু—এসেছে দেশটাকে লুট করতে। তারা জলে-ডাঙায় চালিয়ে যায় অকথ্য অত্যাচার—নির্বিরোধী মনুষ্য-বসতিতে। তাদের প্রধান ধাঁটি চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালি, সন্দীপ, বরিশাল। গ্রামের পর গ্রাম তারা শ্মশান করে দিয়েছে। সর্বস্ব লুণ্ঠন করে ধর্ম নষ্ট করেছে পল্লীবধূর—তারপর চালান দিয়েছে ক্রীতদাসীর হাতে। তাদের বলে : হার্মাদ। কথাটা এসেছে 'আর্মাডা' থেকে। কুঠিয়াল আর পাদ্রীরা প্রকাশ্যে বলেন—ওরা আমাদেরও শত্রু; কিন্তু গোপনে স্বজাতীয়দের প্রতি অনুকম্পা ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে।

ঘটনাচক্রে ঐ সময়ে শুকিয়ে যেতে থাকে সরস্বতী নদীর সাবেক জলধারা। সপ্তগ্রামের পতন আর হুগলীর উত্থান প্রায় সমকালীন ঘটনা। হার্মাদদের এই অত্যাচারে শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গের শান্তিই ব্যাহত হয়নি—এর পরোক্ষ ফল বিপর্যস্ত করে দিল গোটা বঙ্গসংস্কৃতিকেই। কারণ বহুশতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বাঙলার বহির্বাণিজ্যের পথ গেল চিররুদ্ধ হয়ে। সপ্তডিঙা, মধুকর ভাসিয়ে বাঙালী সওদাগর আর যেতে পারে না—সিংহল, চম্পা, চীন! ভাষান্তরে পশ্চিমের গবাক্ষপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে পর্তুগীজরা বন্ধ করে দিল আমাদের পূর্বের দরওয়াজা। ফলে ঐ বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল অভ্যন্তর-ভাগের বাজার মার খেল। কেটে গেল আরও পঞ্চাশ বছর। আকবরের দেহান্তে জাহাঙ্গীর এখন ভারতসম্রাট। জাহাঙ্গীরের জমানায় সেনাপতি মানসিংহ যখন দ্বিতীয়বার বঙ্গভূমে এলেন দ্বাদশ ভৌমিক বা বারো ভূঁইয়াদের বিদ্রোহ দমন করতে, তখন কিছু হার্মাদ নৌ-সেনাপতি বিদ্রোহীদের যোগ দিল; সুযোগ বুঝে—ফ্রান্সিস কার্ডালো, গঞ্জালেস, রডা এসে হাত মেলালো প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে।

সে সময়ে হুগলীর কুঠিয়ালরাও তাক বুঝে বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। ভাগীরথী বেয়ে কোন জাহাজ বা বাণিজ্যতরী যাতায়াত করলে তারা শুদ্ধ আদায় করতে শুরু করেছে। হিন্দু মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি ভাঙছে। মাঝে-মাঝে কুঠিয়ালরা সম্রাটের হারমে অপহরণ-করা সুন্দরী মেয়ে পাঠায়। জাহাপনার রাগ পড়ে যায়। কিন্তু অত্যাচারের নেশায় পর্তুগীজ দস্যুরা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে বসল একবার। এক জাহাজ হজযাত্রীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাদের হত্যা করল। জাহাপনা জাহাঙ্গীর আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাঙলার সুবেদারকে হুকুম দিলেন হুগলীর কুঠি ধ্বংস করে দিতে।

অচিরেই মুঘল বাহিনী এসে অধিকার করে নিল হুগলী-ব্যাঙেল জনপদ। কেবলা এবং গীর্জাটি হল ধ্বংস। বহু পর্তুগীজকে বন্দী করে পাঠিয়ে দেওয়া হল আশ্রয়, তার ভিতর ছিলেন ব্যাঙেল-গীর্জার সাদৃশ্য প্রকৃতির প্রধান ধর্মযাজক দাফ্রুজ। সম্রাট আদেশ দিলেন হস্তিপদতলে পিষ্ট করে তাঁকে হত্যা করতে হবে। অলৌকিকভাবে নাকি তিনি রক্ষা পান।

চার্টকে ক্ষমা করলেন, কিন্তু ব্যবসায়ীদের নয়। ওলন্দাজ কুঠির সঙ্গে বাণিজ্যের নয়া চুক্তি করলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। সেটা হুগলীর নয়, চুঁচুড়ার কাহিনী।

এ পর্যন্ত যা বলেছি তা ইতিহাস, ঐ উপাদানটুকু নিয়ে এবার গল্প ফাঁদা যাক :



1604 খ্রীষ্টাব্দ। সম্রাট আকবর অসুস্থ। বস্তুত মৃত্যুশয্যায়। টোডরমল্ল ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার ছকটা বানিয়ে ফেলেছেন। সেলিম অর্থাৎ যুবরাজ জাহাঙ্গীর ইতিমধ্যে একবার ‘খোকা-বিদ্রোহ’ করেছে—বাপের একমাত্র অপরাধ সে বড় বেশিদিন বেঁচে আছে। তা বুড়ো-হাবড়াকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারেনি। যেটুকু তার ক্ষমতায় কুলায় সেটুকুই করেছে বিদ্রোহীপুত্র—পিতার অকৃত্রিম বন্ধু, প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজলকে গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করিয়েছে।

অশ্বারোহণে ফাদার দাঁকুজ ফিরে আসছিলেন গীর্জায়। পরিধানে পাদ্রীর টিলেঢালা কালো পোশাক, মাজার কাছে ফাঁস দেওয়া। নিরস্ত্র তিনি। হঠাৎ বিরাট গীর্জা-চৌহদ্দীর গেটের বাহিরে অশ্বের গতিরোধ করেন। অবতরণ করে পদব্রজে এগিয়ে আসেন। সিংদরোজার বাহিরে একজন অত্যন্ত সুদর্শন মুসলমান যুবক নির্নিমেষনেত্র লক্ষ্য করছে গীর্জার স্থাপত্য-শিল্প। পোশাক-পরিচ্ছদ রাজপুরুষের, মাথায় জমকালো টুপি, কোমরে দীর্ঘ তরবারি। তার পাশেই একটি মহিলা। সর্বাঙ্গ কালো বোরখায় ঢাকা। শুধু দুটি চম্পকাস্থলি দিয়ে মুখ-ঢাকাটুকু তুলে সেও গীর্জার চূড়ায় ক্রুশকাঠটির দিকে তাকিয়ে আছে। চম্পক-গৌর বর্ণ, এগাফীবিিনিদিত দৃষ্টি। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যুবক পাদ্রী! রমণীদেহে এমন সৌন্দর্য তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেননি—না বাস্তবে, না শিল্প-কর্মে। রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলানের চিত্রসংগ্রহশালা তিনি দেখেছেন—রাফায়েল, তিজিয়ানো, করেজ্জিও তাঁর অপরিচিত নয়—কিন্তু এ কী!

অশ্বটো স্বগতোক্তি করেন পাদ্রী: আহোদিতে!

শব্দে পাশ ফিরে তাকায়। অপরিচিত পুরুষকে দেখে তৎক্ষণাৎ মুখাবরণটি স্বস্থানে নামিয়ে দেয়। এতক্ষণে লক্ষ্য হল মহিলার পাজর ঘেঁষে একটি ফুটফুটে ফুলের মতো মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁকুজ রাজপুরুষটিকে বললেন, বে-নস্ দীয়াস!*

সম্বোধনটি পতুগীজ নয়, স্প্যানিশ। দাঁকুজ বোধকরি ভেবেছিলেন, এ ভাষা অন্তত ওরা বুঝবে। যুবাপুরুষ কাঁধ ঝাকিয়ে খানদানি উর্দুতে বললেন, আপনার ভাষাটা আমার অজানা, মহাশয়। সম্ভবত আপনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ফলে, আমার জবাব, সেলাম আলাইকুম।

—আলাইকুম সালাম! —দাঁকুজ দীর্ঘদিন আছেন ভারতবর্ষে। ভাঙা ভাঙা উর্দু বলতে পারেন। বলেন, বাইরে কেন? আসুন, ভিতরে আসুন।

যুবাপুরুষ বলেন, আমরা বিধর্মী, মুসলমান—

—সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মা মেরীর গীর্জা সকল ধর্মের জন্যই অধারিতদ্বার। আমি

২য় অধ্যায়

এই উপাসনা-গৃহের প্রধান পুরোহিত—দা'ক্ৰুজ। আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ করছি।

আগন্তুক বলেন, অত্যন্ত প্রীত হলাম। আমার নাম শের আফকন। আমি বর্ধমানের সুবেদার। সত্বীক হুগলীতে এসেছিলাম। এটি আমার কন্যা: লাভলি।

—লাভলি নয়, লাভলি ! আর বেগম-সাহেবার নাম আমি জানি না ; তাঁর নাম হওয়া উচিত : আফ্রোদিতে !

শের আফকন আরবী-ফার্সিতে আলিম, কিন্তু বুঝে উঠতে পারেন না এ শব্দটির অর্থ। সঙ্গিনীকে বলেন, এস মেহের, পাদ্রী-সাহেব আমাদের ভিতরে যেতে ডাকছেন।

মেহেরুন্নিসা ফিসফিস করে স্বামীকে কী-ফেন বলে। শের বলেন, বেগমসাহেবা জানতে চাইছেন ভিতরে কি আপনার সহধর্মিণী আছেন ?

—আছেন, আছেন। গৃহস্বামিনীর তরফেই আমি নিমন্ত্রণ করছি।

শের আফকন সপরিবারে ভিতরে এলেন। গীর্জাটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। অল্টারের পিছনে রঙিন কাচের একটি অতি দীর্ঘ গবাঙ্ক। তাতে নানান নকশা। মাঝখানে মা মেরীর এক মর্মরমূর্তি। শিশুকোড়ে মাতৃমূর্তি। সংলগ্ন বাগিচায় নানান মরশুমী ফুল ; একান্তে কবরখানা।

একটি বেলা ওঁরা কাটিয়ে গেলেন ব্যাণ্ডেল-চার্টে। মাদাম দা'ক্ৰুজ মোহিত হয়ে গেলেন মেহেরুন্নিসার সৌন্দর্যে। মেহের সুযোগ মতো জানতে চায়, 'আফ্রোদিতে' শব্দটার অর্থ কী ?

মাদাম দা'ক্ৰুজ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন। বলেন, কে বলেছে ? ঐ পাদ্রী তো ? ওর দোষ নেই!—বুঝিয়ে দেন, 'আফ্রোদিতে' গ্রীকশিল্পীদের ধারণায় সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পাদ্রীসাহেবের নির্বন্ধাতিশয্যে 'আলমেয়ারাথোটা' সেখানে সারতে হল। দা'ক্ৰুজ ওঁদের আশ্বস্ত করলেন কোন ভোজ্যদ্রব্যে শূকরমাংস মিশ্রিত নেই।

কথাপ্রসঙ্গে শের বলেন, আপনি তো এদেশের ভাষাটা চমৎকার শিখে নিয়েছেন। মাদামও শিখেছেন দেখছি। কতদিন আছেন হিন্দুস্থানে ?

পাদ্রী দা'ক্ৰুজ রহস্য করে শুনিয়ে দিলেন একটি পর্তুগীজ ছড়া :

'Vicerei Va , vicerei vam
Padre Paulista sempredtem.'

পরবর্তী ঘটনাটি প্রায় বিশ বছর পরের।

ইতিমধ্যে সম্রাট আকবরের দেহান্ত ঘটেছে। নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর তখন ভারতসম্রাট। হুগলীর পর্তুগীজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে জাহাঙ্গীর হুকুম দিলেন হুগলীর দখল নিতে। সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ। অচিরেই মুঘল সেনাপতি দখল করে নিল পর্তুগীজ উপনিবেশ। হুগলী দুর্গ এবং ব্যাণ্ডেল গীর্জাকে ধ্বংসাং করে দেওয়া হল। বহু পর্তুগীজ খ্রীষ্টানকে বন্দী করে

(1) Almuerzo = মধ্যাহ্ন ভোজন।

(2) 'Vicerous come and Vicerous go, but the Jesuit Fathers are always there:

লাটেরা আসে লাটেরা যায়, চিরদিন কেউ থাকে না তারা। পাদ্রী-সাহেব বারোমাস ঠায় পড়িয়ে থাকেন একপায়ে খাড়া।

বঙ্গাল-মূলক থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আগ্রা। বন্দীদলে আছেন হুগলী গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক দা'ক্ৰুজ সন্তীক।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে রকমফের করতেন সেকথা আগেই বলেছি। স্বচক্ষে সেই মৃত্যুদৃশ্য দর্শন করা তাঁর এক বিলাস। এক্ষেত্রে জাহাঁপনা হুকুম জারী করলেন, ঐ পর্তুগীজ পাদ্রীটাকে হস্তিপদতলে দলিত-মথিত করতে হবে। মাদাম দা'ক্ৰুজ মহিলা—তাকে লঘুশাস্তি দেওয়া হল—শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুদৃশ্য দর্শন!

একাজের জন্য একটি সুশিক্ষিত হস্তী সম্রাট আকবরের জমানা থেকেই আছে। প্রকাণ্ড রণহস্তী। অদ্ভুত তার শিক্ষা। আগ্রা কিল্লায় বাদশাহ্ যখন দেওয়ান-ই-আম-এ দরবারে বসেন তখন ঐ গজদানবকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত করে মাছত। বাদশাহ্ আসেন দক্ষিণপূর্বের জাহাঙ্গীরী মহল থেকে, উঠে বসেন মসনদে। আকবরের কোন মহিষী প্রকাশ্য দরবারে বসতেন না। জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রে এটি হয়নি। তাঁর পাশে উপবেশন করেন ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ। তিনি আসেন পিছনের দরওয়াজা দিয়ে, খাশমহল থেকে, শীস্-মহল পথে।

বসেন অনবগুপ্তিত হয়ে। এটাও জাহাঙ্গীরের এক বিলাস—জগতকে দেখানো, তিনি শুধু ভারতেশ্বর নন, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার মরদ!

নূরজাহাঁ: জগতের আলো। অস্তুত এককালে ছিল বর্ধমানের সুবেদার শের আফকনের ঘরের ঘৃত প্রদীপ। আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গদিয়াল হয়ে জাহাঙ্গীরের প্রথম কাজ ঐ শের আফকনকে হত্যা করে মেহেরুমিসাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা। মেহের প্রথম কয়েক বছর স্বামীহস্তাকে স্বীকার করে নেয়নি। ক্রমে পোষ মেনেছে। শুধু তাই নয়, পোষ মানিয়েছে। বস্তুত জাহাঙ্গীর-জমানায় ভারত শাসন করেছে নূরজাহাঁ—জাহাঙ্গীর নয়। রাজকীয় দলিল, ফরমান, যেখানেই জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর সেখানেই নূরজাহাঁ। এমনকি স্বর্ণমুদ্রায় পর্যন্ত ছাপ দেওয়া হত 'বহুব্ধ শাহ্ জাহাঙ্গীর যাক্বৎ সদ জেবর/বনামে নূরজাহাঁ বদসহে বেগম অর।' অথচ এমনই তার কূটকৌশল যে, সম্রাট স্বয়ং অনুধাবন করতে পারতেন না—তিনি বেগমের হাতের পুণ্ডলীমাত্র!

জাহাঙ্গীর শাস্তি বিধান করলেন। হস্তিপদতলে বন্দীর মৃত্যু; সচরাচর এই মৃত্যুদণ্ডটি অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্যে, সভাভঙ্গে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হতভাগ্যকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ভূতলে ফেলে রাখা হয়। জাহাঙ্গীর জানান—মৃত্যুদণ্ড দীর্ঘায়ত করার মধ্যে একটা মজা আছে। সাধারণত আমীর, ওমরাহ—যারা এই নৃশংস দৃশ্য দেখতে চান না, তাঁরা উঠে চলে যান। নূরজাহাঁ স্থানত্যাগ করেন। তখন হত্যাউৎসবে মেতে ওঠেন বাদশাহ্। করতালি দিতেই মাছত সুসজ্জিত গজদানবকে পরিচালিত করে অগ্রসর হয়ে আসে। অদ্ভুত শিক্ষা গজরাজের। সে বন্দীর নিকটস্থ হয়ে শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করে একটি বৃহিত ধ্বনি করে। তারপর একটি পা তুলে ঐ ভূতল-শায়িত হতভাগ্যের মস্তকের উপর উৎক্ষিপ্ত করে অপেক্ষা করে। বাদশাহ্ যতক্ষণ না দ্বিতীয়বার করতালিধ্বনি করেন ততক্ষণ গজদানবকে তিন-পায়ে দেহভার রক্ষা করে প্রতীক্ষা করতে হয়। জাহাঙ্গীর এইসময় তাড়াহুড়া করেন না। শায়িত বন্দীর মুখচ্ছবি রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেন, কখনো বা তার মরণান্তিক আর্তনাদ। তারপর তালি বাজান। গজরাজ তার উৎক্ষিপ্ত চরণটি ধীরে ধীরে নামিয়ে আনে—দেহের অন্য কোনও অংশে নয়, ঠিক মস্তকের উপর। পাকা কয়েক-

বেলের মতো ফট করে সেটা ফেটে যায়! ভারী মজার সে দৃশ্য।

পাদ্রী দা'ক্ৰুজকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ভূতলশায়ী করা হয়েছে। তার মস্তকটি একটি পাষণথণ্ডের উপর ন্যস্ত। সুসজ্জিত হস্তীর উপর মাহুত প্রতীক্ষা করছে। আমীর-ওমরাহরা অনেকে উঠে গেলেন। জাহাঙ্গীরের লক্ষ্য হল নূরজাহাঁ স্থানত্যাগ করেননি। বলেন, এবার তুমি ভিতরে যাও। এখন মৃত্যুদণ্ড হবে।

নূরজাহাঁর লক্ষ্য হল, অদূর মাদাম দা'ক্ৰুজ শায়িত। দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে স্বামীর মৃত্যুদৃশ্যটি দেখানো যাচ্ছে না। তিনি মুহুঁত। নূরজাহাঁ বললেন, না, আমি থাকব। আমি দেখব।

সম্রাট কিছু বিচলিত। এমন তো কখনো হয় না! পেয়ারী বেগম তো এমন কথা ইতিপূর্বে কখনো বলেনি। জানতে চান তার হেতু।

নূরজাহাঁ বলেন, দীন-দুনিয়ার মালিক! আমি গতকাল রাতে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বয়ং পয়গম্বর যেন আমাকে এসে বলছেন—ঐ পাদ্রীটা আমার প্রিয় ভক্ত। ও আল্লাতালাকেই 'গড' নামে উপাসনা করে। তুই তোর স্বামীকে বল, ওকে মুক্ত করে দিতে!

জাহাঙ্গীর বিস্মিত হয়ে বলেন, তারপর? তারপর?

—তখন আমি পয়গম্বরকেই সালাম জানিয়ে বললাম, আপনি তো অসীম ক্ষমতাবান। আপনি নিজেই তো ওকে রক্ষা করতে পারেন। আমাকে কেন বলছেন? আমি জানি, আমার স্বামী কখনো অন্যায় করেন না, তাঁর রাজকার্যে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করি না। তারপর আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। তাই আমি দেখতে চাই তিনি ওকে রক্ষা করেন কিনা।

জাহাঙ্গীর কিছুটা বিচলিত। তারপর সজোরে করতালি ধ্বনি করে ওঠেন।

গজগমনে অগ্রসর হয়ে এল মহামাতঙ্গ। যথারীতি শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করে গজভাষে অভিনন্দন জানালো বাদশাহুকে। তারপর একটি পদ উৎক্ষিপ্ত করে প্রতীক্ষা করল। জাহাঙ্গীরের আজ ধৈর্য মানছে না। সজোরে করতালি দিয়ে ওঠেন তিনি।

কী আশ্চর্য! কী অপরিমিত আশ্চর্য! গজরাজ প্রত্যাশিত কর্ম করল না। উৎক্ষিপ্ত পদটি নামিয়ে আনল ভূতলে। নিপুণ-শুঁড়ে একটানে বন্ধনমুক্ত করে দিল বন্দীকে! যেন শুঁড় দিয়ে আদর করল তাঁকে! ধীর পদে ফিরে গেল তার স্বস্থানে।

বাদশাহ বিহুলের মতো বেগমের দিকে ফিরে বলেন, কী করতে বল এখন? নূরজাহাঁ একটি সেলাম করে বলেন, জাহাঁপনা। আপনার রাজকার্যে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করি না। কী করবেন তা আপনার বিবেচ্য। তবে পয়গম্বরের স্বপ্নাদেশ যদি মানেন...

বাকিটা অনুক্ত রইল।

জাহাঙ্গীরের আদেশে দা'ক্ৰুজকে মুক্তি দেওয়া হল। তাঁকে সসম্মানে হুগলীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশও দেওয়া হল। এমনকি রাজকোষ থেকে গীর্জাটি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থাও করা হল। কাহিনীর যে অংশটুকু নেপথ্যে আছে তা এবার বলি:

হুগলীতে ফিরে যাবার আগে মাদাম দা'ক্ৰুজ নূরজাহাঁর খাশমহলে এসে দেখা করেছিলেন। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলেন, আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু একটা কথা, ভারতেশ্বরী! এ কাজের জন্য মাহুতকে যে পরিমাণ অর্থ উৎকোচ দিয়েছেন সেটুকু আমাদের পরিশোধ করতে দিন।

নূরজাহাঁ স্মিত হেসে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, আপনার গীর্জায় যে নুন খেয়েছি তার দাম দিতে হবে না? সেটা যে নিমকহারামি হয়ে যাবে।

মাদাম দা'ক্ৰুজ বলেন, গ্রাথীয়াহুস! তাহলে কণ্ঠহারটি রাখুন। লাডলিকে দেবেন। প্রতিদান নয়, উপহার।

হাত বাড়িয়ে মালাটা নিতে হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভারতেশ্বরীর। মন খুলে মাদামকে বলতে পারলেন না—

উপহারটা লাডলি-বেগমকে দেওয়া যাবে না। মায়ের সঙ্গে সে কথা বলে না। পিতৃহন্তার অঙ্কশায়িনী জননীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।^২



হুগলী থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি। চল, সেখানে ফেরা যাক।

শাহজাহাঁ সিংহাসনে আরোহণ করে পর্তুগীজদের অধিকার থেকে হুগলী-ব্যাঙেল পুনরায় অধিকার করে নেন। তার একটি বিশেষ হেতু আছে। জাহাঙ্গীরের শেষাবস্থায় যুবরাজ খুররম ও একবার 'খোকা-বিদ্রোহ' করেন। মুঘল বাহিনীর হাতে লাঞ্চিত হয়ে পালিয়ে আসেন বঙ্গদেশে। সে-সময় তিনি হুগলীর পর্তুগীজ গভর্নরের কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু অভিজ্ঞ গভর্নর বুঝতে পারেন এ ব্যাপারে যুবরাজকে সাহায্য করা উচিত হবে না। খুররম প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। মসনদে বসে তারই প্রতিশোধ নিলেন এতদিনে শাহজাহাঁ।

সেটা সম্রাট শাহজাহাঁর শাসনকালের দ্বাদশ বৎসর। রাজধানী তখনো আগ্রা। দিল্লীর লালকেল্লায় পুরা-কদমে কাজ চলছে। এ-যুদ্ধে পর্তুগীজরা প্রায় তিনমাস কাল মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করে রেখেছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখে গেছেন—মুঘল সেনাপতি সেই সময় ভাগীরথীর উপর একটি 'সাঁকো' নির্মাণ করেন। স্থানটা শ্রীরামপুরের কাছাকাছি। সম্ভবত সেটি একটি 'পন্টুন-সাঁকো'—অর্থাৎ পাশাপাশি নৌকা সাজিয়ে বানানো সাঁকো—যা বানিয়ে ছিলেন জারেকশাস দার্দানালেস প্রণালীতে, বহু বহু পূর্বযুগে; আর যা বানিয়েছিলেন ইংরেজ স্থপতি বহু-বহু পরবর্তীযুগে—প্রথম হাওড়া ব্রীজ; যা তোমরা দেখনি, আমরা হামেহাল পার হয়েছি, জোয়ার-ভাটা খেয়াল করে। কারণ তদানীন্তন ভাগীরথীর বিস্তার ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞানের কথা মনে করে এটাই একমাত্র সমাধান। তবে মুঘল সেনাপতি সুবেদার কাশেম খাঁ দুর্গবেষ্টনকারী পরিখার বাধ দিয়ে জল নিকাশন করতে পেরেছিল। পরে বারুদ দিয়ে দুর্গপ্রকারের খানিকটা অংশ উড়িয়ে দেয়। সেই পথে মুঘল সৈন্য দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে। হুগলী দুর্গের পতন হয়।

বহু পর্তুগীজ নরনারী হতাহত হয়। ওদের অনেকগুলি জাহাজ ও গ্রাণ ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

—*) Gracias = লাখ-লাখ সুক্রিয়া,

২) বিস্তারিত বিবরণ লেখকের 'লাডলি-বেগম' উপন্যাসে।

বস্তুত এই যুদ্ধেই ভারতে পর্তুগীজ প্রাধান্য চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। মহামান্য পোপের সনদ যাই বলুক না কেন এই ঘটনার দুই দশক পরে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে পর্তুগীজদের পরিত্যক্ত ভূখণ্ডে ইংরেজরা একটি কুঠি বানায়। প্রথম দিকে ব্যবসায়ে তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারে না। পরে, অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশ বছর আগে এই কুঠি লাভবান হতে শুরু করে। সোরা, লবণ ও রেশমের ব্যবসায়ে। তবু মুঘল সুবেদারের সঙ্গে ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই ছিল। আরও দুই দশক পরে এই কুঠি থেকেই একদিন জোব চার্নক নেমে আসেন ভাগীরথীর মোহনার দিকে।

একদিন নোঙর গাড়েন : গোবিন্দপুরে। সেটাই কলকাতা পত্তনের সূচনা। জোব চার্নকের হুগলী ত্যাগের পর নবাবী ফৌজ হুগলী কুঠি দখল করে। সেটি পুনরুদ্ধার করেন রবার্ট ক্লাইভ পলাশীযুদ্ধের প্রাক্কালে।

ইংরেজ সৈন্য হুগলীর দুর্গ ও ফৌজদারের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে নেয়। এক সপ্তাহকাল হুগলী-ব্যাণ্ডেলের সংলগ্ন গ্রামগুলি নির্বিচারে লুট করে। বর্তমানে যেখানে হুগলীর কালেক্টর-সাহেবের বাসভবন দুর্গটি ছিল সেখানে।

বঙ্গসংস্কৃতিতে হুগলীর আর একটি দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য—বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয় এখানেই। রাজা-রাজদার কুকীর্তির কথা শোনাচ্ছিলাম এতক্ষণ; এবার দুটি মেহনতী মানুষের কথা বলি : পঞ্চানন কর্মকার আর মনোহর দাশ। তাঁদের যৌথ সহযোগিতা ভিন্ন উইলকিন্স-সাহেব এই ছাপাখানাটি বানাতে পারতেন না; হ্যালহেড-সাহেব এই ছাপাখানা থেকে যখন প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন তখনও রাজা রামমোহনের জন্ম হতে দু-বছর বাকি।

হুগলী ত্যাগ করে যাবার আগে পর্তুগীজদের প্রসঙ্গটা শেষ করে নিই।

দা-গাম্মা আর তার উত্তরসূরীরা এসেছিল এ দেশে লুট করতে। কিন্তু ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।’ এই দলের সঙ্গেই এসেছেন অনেক মহান পর্তুগীজ—যাঁরা মানুষের ভালো করতে চান। সবার আগে বলতে হয় সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের কথা (1506-52)। গোয়াতে এসে পদার্পণ করেন 1542-খ্রীষ্টাব্দে। “He laboured with equal zeal and success among the Corrupt Europeans and the native population.” বহু নির্যাতিত অচ্ছুৎকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পরে শ্রীলঙ্কা ও জাপানেও যান। তাঁর মরদেহ গোয়াতেই রক্ষিত।

এই পর্তুগীজরাই বাংলাভাষার প্রথম বই ছেপে প্রকাশ করে। ভারতে নয়, খোদ রাজধানী লিসবনে। হরফও বাংলা নয়, রোমান হরফ। সময়টা আমাদের কাহিনীর প্রায় সমকালে—1743 খ্রীষ্টাব্দে। মুদ্রিত হয়েছিল তিনখানি পুস্তক। প্রথমটির লেখক আন্তোনিও দো রোজারিও; পরের দুখানির লেখক : মানোয়েল দ্য আসসুম্প্‌স্যা। বইটির নাম—মূল্যে যা লেখা ছিল : Crepar Xaxtroer Orths. Bhed—Xixio Guror Bichar !

অর্থভেদ হল ? বঙ্গানুবাদে : “কৃপার-শাস্ত্রের অর্থভেদ—শিষ্যগুরুর বিচার।”

এ-ছাড়া বাংলাভাষায় মিশে আছে অসংখ্য পর্তুগীজ শব্দ : সাঁঝাম, আলমারি, জানলা, তোয়ালে, বালতি, বোতাম, ‘আলপিন’ থেকে ‘কামান’। আরও কত শব্দ : আলকাতরা, আচার,

কাকাতুয়া, চা, গিজল, মিলাম, তামাক, চাবি, ফিতা, গুদাম, লঠন, বারান্দা, ইম্পাত, কম্পাস, কামরা। অনেক ফুলফল তারা আমদানি করেছিল : আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, কামরাঙা, আলু, জামরুল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু এমনকি সেই ফুলটি—‘কালো যাকে বলে গাঁয়ের লোক’ : কৃষ্ণকলি।

সবার আগে এসেছিল পর্তুগীজ—তাদের আস্তানা হুগলী-ব্যাঙেল। তার পরে আসে দিনেমাররা। সব শেষে ইংরাজ আর ফরাসী। দিনেমারদের আস্তানা ছিল ওলন্দাজ-নগর বা চুঁচুড়া। পর্তুগীজ নাবিকেরা আফ্রিকা বেঁটন করে যে জলপথটি খুঁজে পেয়েছিল তার চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে লুকিয়ে রাখত—যেন ‘চিচিংফাক’ মস্ত। কিন্তু কিছু ওলন্দাজ নাবিক চাকরি সূত্রে ওদের জাহাজ বার কয়েক যাতায়াত করার ফলে গুপ্তধনের চাবিকাঠিখানি পেয়ে গেল।

ওলন্দাজ অধিকারের পূর্বযুগে চুঁচুড়ার ইতিহাস অজ্ঞাত। তখন সেটি ছিল এই গৌড়দেশের অযুত-নিযুত গ্রামের মতো গঙ্গাতীরবর্তী একটি শান্ত জনপদ। হুগলীতে যখন পর্তুগীজ প্রভাব বিনষ্ট হল, শাজাহানী-জমানায়, তখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ‘চুঁচুড়া’। সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। তারপর দেড়শ বছর ধরে ওরা ওখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে। তাদের চরম উন্নতি অষ্টাদশ শতকের অষ্টম দশকে।

হুগলীর কথায় ফিরে আসি :

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পারস্যের রাজধানী তেহরান থেকে আসেন—খাঁ জাহান খাঁ। হুগলীতেই থাকতেন। প্রথমে মুঘল, পরে ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানির কাছে সুবেদারী পেয়ে। বিলাসিতার চূড়ান্ত বাহ্যাদ্বয়ের তিনি ভাবায় স্থান পেয়েছেন। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা দেখলে আমরা বলি : লোকটা যেন নবাব খাজা খাঁ। তিনি নবাব ছিলেন না আদৌ।

দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীনের বিখ্যাত ইমামবাড়া হুগলীর এক দিকচিহ্ন।

আরও একজন হুগলীবাসী প্রবাদ কথায় অমর হয়ে আছেন।

‘—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন!’

গৌরী সেনও দানবীর। প্রচুর ধনসম্পত্তিও করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা গৌরীশঙ্কর দেউলটি আজও টিকে আছে। তা ধনী ব্যক্তি তো ডজন-ডজন, তার ভিতর কেউ কেউ মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। দানধ্যানও অনেকে করেন এ-কথা অস্বীকার করব না। তার ভিতর সেন-মশাই কী-করে প্রবাদবাক্যে নিজের ঠাই করে নিয়েছেন? বলি শোন :

সেন-মহাশয় অনেক বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন—যে লোকটা দান চাইতে আসে তার বড় সঙ্কোচ। হাত পেতে কিছু চাইতে হবে—সে বড় লজ্জা! কী করা যায়? উনি দারুণ এক বুদ্ধি খাটালেন। প্রাথমিকদকে সেই লজ্জা-সঙ্কোচের হাত থেকে রেহাই দিতে একটি অভিনব ব্যবস্থা করলেন। হুগলী বাজারে গিয়ে কয়েকটি বড় বড় দোকানে—মুদী-দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান, দশকর্ম ভাণ্ডারে বলে এলেন, ‘দেখ বাপু, আমার নাম করে কেউ যদি কিছু খরিদ করে তাহলে তোমরা তার দাম চেও না, ক্রেতার নামও জানতে চেষ্টা না। খরচটা শুধু খাতায় লিখে রেখ। মাসান্তে আমার কর্মচারী এসে দামটা মিটিয়ে যাবে।’

তাঁর সেই অপরিসীম বদান্যতার সুযোগ যে শুধু সমকালই নিয়েছে তা বলতে পারি না। আজও সরকারী চাকরি পেয়ে অথবা ভোটে জিতে তাঁর নামটি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি :

‘লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন!’



Pathagat.net





সতী

1742-57

ষষ্ঠ পর্ব

কাজী-সাহেব বলেছিলেন, মানুষের দুনিয়ায় যতটুকু বেহেস্তী মুবারকী আর যতখানি দোজখী-ইব্লিসি, সবটাই আমাদের যৌথ দায়িত্বে—‘অর্ধেক তার রচিয়াছে নর,

অর্ধেক তার নারী।’ হিসাবটা নিশ্চয় আঠারো-শতকেও প্রযোজ্য। কিন্তু পর্দার আড়াল থেকে যে পাপীয়সীরা পাপাত্মাদের কুপরামর্শ জুগিয়েছে, নরকের পথে টেনে নিয়ে গেছে, ইতিহাস তাদের কথা লিখে রাখেনি। অপরপক্ষে যারা মহাত্মাদের অনুপ্রাণিত করেছেন অথবা জনহিতার্থে নিজেরাই নিবেদিতপ্রাণা, তাঁদের সকলের কথাও আমরা জানি না। ইতিহাসকেই বা দোষ দিই কোন হিসাবে? ভাবীজীরা সেযুগে ছিলেন পর্দানসীন, বোঠাকরুণেরা অবশুষ্ঠনবতী। জাহ্নবীর জলোচ্ছ্বাসের মতো যারা দিগন্তব্যাপী পলিমাটির গেরুয়া আশীর্বাদ ছড়িয়ে গেছেন সেইসব রানী ভবানীদের কথা আলাদা, না হলে ইতিহাস তার পর্বতপ্রতিম নখীপত্রের মধ্যে কোন প্রান্তে বর্জাইস হরফে জনৈকা মহিমময়ীর কথা সলজ্জ লিখে রেখেছে কে তার হদিস পাবে? আজকের দিনে লাখে-একজনও কি খুঁজে পেত সম্যাসী বিদ্রোহের আমলে ঐতিহাসিক চরিত্র ভবানী পাঠকের এক ঐতিহাসিক শিষ্যা ঐ নামে বাস্তবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন ‘পরিব্রাণায় সাধুনা বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্’? সহজ সরল পথে ইতিহাস ঘেঁটে কেউ দেবী চৌধুরানীকে খুঁজে পেত না, যদি না সাহিত্যসম্রাট কথাসাহিত্যের বন্ধিমপথে দীপশিখাটি জ্বালিয়ে যেতেন। গবেষক ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতদ্রুত সাধনা ব্যতিরেকে আমরা সন্ধান পেতাম না অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই মহিলা বিদ্যালঙ্কারের।

তোমাদের ইতিহাস পড়ানোর বায়না নিয়ে আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসিনি বাপু ভৈরব হটী বিদ্যালঙ্কারের আবির্ভাবের পূর্বযুগের দু-একটি ‘কাব্যে উপেক্ষিতার’ কথা না বলেও প্রাণটা শান্ত হচ্ছে না। একজনের কথা বলি। কিন্তু নাম বললেও কি চিনতে পারবে তাঁকে?

শরফ উন্নিসা।

ঘেসেটি বেগমকে তোমরা চেন। না চিনবে কেন? বাপের সেইবসানে হারেমের অন্তরালে

থেকে নবাবী করার নূরজাহানী খোয়াবে সে গড়েছিল মতিঝিল, বেতনভুক সৈন্যদল মোতায়েন করেছিল অবৈধ প্রেমের নাযকের সহায়তায়। চেন আমিনা বেগম-সাহেবাকেও, সিরাজজননীরূপে। কিন্তু শরফ উননিসার নাম তোমরা শোননি। অথচ তিনি ছিলেন সে-আমলে মার্কিন-কেতায় সুবে বংগাল-মুলকের: দ্য ফার্স্ট লেডি!

তিনি ছিলেন আলিবর্দী ঠা মহব্বত জঙ-বাহাদুরের অধ্বিতীয়া বেগমসাহেবা।

আশ্চর্য মহিলা। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের ভাষায়:

আলিবর্দীকে মুর্শিদাবাদের বা বাঙ্গলার আকবর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মুর্শিদাবাদ নবাবদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সম্প্রীতি দেখাইয়া মহাবিপ্লবমধ্যেও শান্তভাবে প্রজাপালন করিতে তাঁহার ন্যায় আর কেহই সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রভু পূর্ববর্তী নবাব সুজাউদ্দীন এই হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সম্প্রীতির সূচনা করিয়া যান এবং আলিবর্দী তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিণত করেন। সেই কর্মবীর আলিবর্দী ঠা রাজনৈতিক জীবন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সহায়তায় পূর্ণতালাভ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আলিবর্দীর উচ্ছৃঙ্খল সংসার যেমন এই মহিলার তর্জনীতাড়নের অধীন ছিল, সেইরূপ বিপ্লবসাগরে নিমগ্ন সমগ্র বঙ্গদেশের শাসনও তাঁহারই পরামর্শানুসারে চালিত হইত। জ্ঞান, ঔদার্য, পরহিতৈশ্য ও অন্যান্য সদগুণে তিনি ধর্মগীগণের মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় হিতকর কার্য তাঁহারই পরামর্শের উপর নির্ভর করিত।^১

সুলতানা রিজিয়ার মতো তিনি সিংহাসনে আসীন হতে চাননি, নূরজাহাঁ বা ঘসেটি বেগমের মতো নেপথ্য থেকে কলকাঠি নেড়ে বিলাসবৈভবে আকর্ষণ নিমজ্জিত হতে চাননি। লোকচক্ষুর অন্তরালে যথার্থ মহারানীর ভূমিকা পালন করে গেছিলেন। নিখিলনাথ তো অনেক পরে (1898) ইতিহাস ঘেঁটে এ-কথা লিখেছেন, সমকালীন বিপ্লব-শিবিরের লোক কী লিখে গেছে?

এবার শোনাই ইংরাজ ঐতিহাসিক 'হলওয়েল'-এর জবানীতে। নবাব-সরকারের সব কিছুকেই তিনি কালিমালিপ্ত করতে বন্ধপারিকর। লক্ষণীয়, উদ্ধৃত-অংশেও মহিলার স্বামীকে 'নবাব' বা 'আলিবর্দী' নামে উল্লেখ না করে ক্যাপিটাল U-ব্যবহার করে বলা হয়েছে Usurper!

বেগম-সাহেবার প্রসঙ্গে হলওয়েল লিখছেন:

A woman whose wisdom, magnanimity, benevolence and every amiable quality, reflected high honour on her sex and station. She much influenced the Usurper's councils, and was ever consulted by him in every material movement in the state, except when sanguinary and treacherous measures were judged necessary, which he knew she would oppose as she ever condemned them when

prepetrated, however successful—predicting always that such politics would end in the ruin of the family.

অর্থাৎ হলওয়েল-সাহেবের মতে এই সর্বশৃঙ্খলিতা মহিমময়ী বেগমের পরামর্শে ‘পরস্বাপহারক’ রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি করতেন। কেবলমাত্র রক্তাক্ত ষড়যন্ত্র অথবা অন্যায় রাজনৈতিক চক্রান্তের পরিকল্পনাগুলি বেগমসাহেবকে জানানো হতো না। তিনি তা কোনকালেই অনুমোদন করতেন না। বলতেন, এই জাতীয় অন্যায় রাজনীতি অস্তিত্বে শুধু রাজপরিবারের সর্বনাশই ডেকে আনে।

আলিবর্দীর শাসনকালে সবচেয়ে বড় জাতের ‘রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রের’ কাহিনীটাই প্রথমে শোনাই। বেগমসাহেবার অগোচরে ঘটনাটা ঘটেছিল, কারণ তিনি কিছুতেই সেটা সমর্থন করতেন না। সমকালীন ঐতিহাসিকের দল এ-জন্য আলিবর্দীকে যথেষ্ট ভৎসনা করেছেন। যারা করেননি, তাঁদের সেজন্য ভর্তুকি হতে হয়েছে।^১

মসনদে উঠে বসার দিন থেকে আলিবর্দী বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিব্রত। দীর্ঘ পনের বছর বৃহত্তর বঙ্গের প্রজাসাধারণকে রক্ষা করতে এই বঙ্গাধিপ মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে ছোটোছুটি করেছেন বটে, কিন্তু একদিনের তরেও ‘নবাবী’ করার সুযোগ পাননি। একপাক্ষিক, হারমে উপপত্নী নেই, কোন রকম উচ্ছৃঙ্খলতাই বরদাস্ত করেন না, কিন্তু হতভাগ্য ‘নবাব’-এর কি দুদণ্ড শাস্তিতে নিদ্রা যাবার অধিকারটুকুও থাকবে না?

নবাব আলিবর্দী সিংহাসনে আরোহণ করে দেখলেন পূর্ব জমানা থেকেই দক্ষিণবঙ্গের মানুষজন মধ্য-বাঙ্গলার উর্বর ভূখণ্ডে ক্রমাগত চলে আসছে। হেতু, সুন্দরবন-অঞ্চলে পর্তুগীজ, হার্মাদ আর আরাকান প্রদেশের মগ ডাকাতেরা ঐ সব গ্রামে বৎসরান্তিক লুটতরাজ করে যায়। নবাব মগ-ফিরঙ্গি দমনে মন দিলেন। নবাব-সরকার থেকে ঢাকাপ্রদেশে প্রায় পৌনে আট শতটি রণতরী সর্বদা প্রস্তুত থাকত। এই রক্ষীবাহিনীর জন্য ‘জায়গীর নৌয়ারা’ মহালের সম্পূর্ণ রাজস্ব ব্যয় করার বন্দোবস্ত হল। এই ব্যবস্থা করতে করতেই পশ্চিম থেকে এসে উপস্থিত হল আর এক নতুন জাতের উপদ্রব: বর্গী।^২

প্রথম বর্গীর হাঙ্গামা বেয়াল্লিশ-শালে, আলিবর্দীর রাজত্ব শুরুর তৃতীয় বর্ষে। দ্বিতীয় আক্রমণ পরের বছর বসন্তকালে। আগেই বলেছি, আলিবর্দী ‘চৌথ’ দিতে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু

১) *Interesting Historical Events*, Holwell, Pt. I, Chap. II. pp. 170-71.

২) “Golam Hossein, the Mohamedan historian, has no words of blame for this atrocity.” H. Beveridge C.S. [এবং “মনকরার শিবির আলিবর্দীর কলঙ্কস্তম্ভে পরিণত হইল; কিন্তু মুসলমান ইতিহাস-লেখক তাহার জন্য একবারও আলিবর্দীর নিন্দা করিলেন না।”—*সিরাজুদ্দৌলা*, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃঃ 30.]

৩) ‘বর্গী’ শব্দটা মারাঠী, অর্থ মহারাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সর্বনিম্ন শ্রেণীর সৈনিক, যাদের না আছে নিজস্ব অশ্ব, না অস্ত্র। যখন যে বাহিনীতে যোগ দেয় তখন সেখান থেকে তা যোগান দেওয়া হয়। এক বিপরীতার্থবোধক শব্দটি ‘সিলাদার’, অর্থাৎ যার নিজস্ব অশ্ব ও তরবারি আছে। যে বাহিনীতে ‘তলব’ এবং লুটের হিস্যা লাভের সম্ভাবনা বেশি, সিলাদাররা ইচ্ছামতো সেই বাহিনীতে যোগ দেয়।

তখন ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করিনি। আলিবর্দী যখন দিল্লীশ্বরের বশ্যতা মানছেন তখন তাঁর আদেশ অমান্য করছেন কী হেতুতে? আলিবর্দীর যুক্তিটা যথেষ্ট জোরালো।

মুগল বাদশাহ মারাঠা-প্রধানের কাছে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা 'চৌথ' দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য বাধ্য হয়ে। কিন্তু প্রতিশ্রুতিটা দিয়েছিলেন কাকে? মহারাষ্ট্র দলনায়ক রাজা সাহুকে। রাজা সাহু তারপর নাগপুরের সেনানায়ক রঘুজী ভোসলেকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার চৌথ আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে স্বয়ং দিল্লীর মুগল বাদশাহ—কী কারণে বোঝা মুশকিল (সম্ভবত কিছু নগদ প্রাপ্তিযোগের বিনিময়ে)—পেশোয়া বালাজী রাওকে অনুরোধ করলেন রঘুজীকে চৌথ আদায় থেকে বিরত করতে। পেশোয়া বালাজী রাও আর রঘুজী ভোসলে দুজন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—মারাঠা শক্তির সর্বময় কর্তা হওয়ার আশায় প্রতিযোগিতা করে চলেছেন। ভাস্কর পণ্ডিত হচ্ছেন ঐ রঘুজীর দক্ষিণহস্ত। তিনি চৌথ আদায় করতে এলেনই লুট করতে করতে। রাজা সাহুর প্রাপ্য রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ কোন্ মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক সংগ্রহ করবেন সেটা যতক্ষণ না স্থিরীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ নবাব আলিবর্দী কী করে চৌথ দেন? ওদিকে ভাস্কর তার অত্যাচার চালিয়েই যাচ্ছে। সেবার আলিবর্দী মহাষ্টমীর দিন অতর্কিত আক্রমণে ভাস্করকে পলায়নে বাধ্য করেন।

পরবৎসর (1743) ভাস্কর পুনরায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর পিছন পিছন এসে হাজির পেশোয়া বালাজী রাও! আলিবর্দীকে বিশেষ কিছু করতে হল না। ঘাঁড়ের শত্রু বাঘে খেল। বালাজী রাওয়ের বৃহত্তর সৈন্যবাহিনীর কাছে তাড়া খেয়ে ভাস্কর পণ্ডিত নাগপুরের দিকে পালিয়ে গেলেন। যথারীতি প্রতিরোধহীন গ্রাম গুলি লুণ্ঠন করতে করতে।

পেশোয়া বালাজী রাও আর আলিবর্দী মিলিত হলেন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে 'চৌরিয়াগাছী' গ্রামে। পেশোয়া আলিবর্দীকে সাহু-রাজার ফরমান দেখালেন, 'চৌথ' আদায়ের অধিকারী তিনিই। নবাব স্বীকৃত হলেন সাহু-রাজার প্রাপ্য তাঁকে দিতে। উপরন্তু সৈন্যবাহিনীর খরচ বাবদ বাড়তি বাইশ লক্ষ তঙ্কা খেসারত দিতে।

বিভিন্ন জমিদারবর্গের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে নবাব এই অর্থ কোনক্রমে মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরলেন। ঠিক নিশ্চিন্ত হয়ে নয়; কারণ বর্গীর নতুন হাঙ্গামা আশঙ্কা করে তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে এবং ধনদৌলত ইতিপূর্বেই মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন—গোদাগাড়িতে, পদ্মা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে, যেখানে অস্থায়ী সৈন্যদের মহড়া নিতে পারবে নবাবের নৌবাহিনী।

এই বছরেই কলকাতার ইংরেজ বণিকেরা 'মারাঠা-ডিচ' খনন করে।

নয় মাস নিরুপদ্রবে কাটল। তেতাল্লিশের শ্রাবণ থেকে চুয়াল্লিশ সালের বৈশাখ পর্যন্ত। তারপরই শোনা গেল, ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় ফিরে আসছে উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের পথে—তৃতীয় বার! শোনা গেল, ভাস্কর নাকি রাগে অগ্নিশর্মা! তার প্রভু রঘুজী ভোসলের প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ বালাজী হতচ্ছাড়া বাইশ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে শুনে রাগ তো হতেই পারে। আগের বছর জগৎশেঠের গদি লুট করে কিছু জুটেছিল; কিন্তু এবার নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের পর্ণকুটির লুট করে ভাস্কর সে তুলনায় কী বা পেয়েছে?

আলিবর্দী দ্রুতগতি সংবাদবহ মারফৎ পেশোয়াকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করলেন।

পরিবর্তে পেশোয়া বালাজী রাও একটি বিচিত্র সংবাদ পেশ করলেন:

ইতিমধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা সর্দার রঘুজী ও বালাজী নাকি তাঁদের প্রভু রাজা-সাহুর দরবারে হাজির হয়েছিলেন; এবং রাজা-সাহু দুই দস্যুসর্দারকে খুশি করে সহজ ফয়সালা বাতলে দিয়েছেন; দুজনেই চৌখ আদায় করতে পারবেন। পেশোয়া বালাজীর ভাগে সাহাবাদ জেলা সমেত পাটনা ও উত্তর বিহার; আর রঘুজীর ভাগে উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ। উল্লেখ করা বাহ্যিক, ঐ দুই বাহিনী যখন নিজ নিজ অংশের হিস্যা বুঝে নিতে আসবেন তখন পথপ্রান্তের অরক্ষিত জনপদগুলি লুণ্ঠন করতে করতে আসবেন! তা তো বটেই!

এই চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েই বুদ্ধ নবাব—তখন তাঁর বয়স আটষট্টি—ঐ ষড়যন্ত্রের আয়োজন করলেন। এ ছাড়া তাঁর গত্যস্তর ছিল না।

ভাস্কর তাঁর বাইশজন সেনানায়ক সহ এসে ঘাঁটি গেড়েছেন সেই দাঁইহাটিতে, যেখানে বছর-দেড়েক আগে দুর্গাপূজা অসমাপ্ত রেখে তাঁকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিল। সেখানে এসে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন নবাবের দুই বিশ্বস্ত দূত, মুস্তাফা খাঁ আর দেওয়ান জানকীরাম। জানালেন, নবাব ভাস্করের সঙ্গে পৃথকভাবে সন্ধি করতে ইচ্ছুক। শর্তগুলো স্থির করতে পণ্ডিতজী যেন রাজধানীর কাছে মনকরা-ময়দানে শুভাগমন করেন।

ভাস্কর সন্দিগ্ধ। কিন্তু মুস্তাফা খাঁ কোরাণ স্পর্শ করে আর জানকীরাম তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে দিবি গেলে বললেন এর মধ্যে কোনও কারসাজি নেই। ভাস্কর স্বীকৃত হলেন, কিন্তু জানালেন সব কয়জন বর্গী সেনানায়কই তাঁর সঙ্গে সন্ধিমুণ্ডে যাবেন। বিশ হাজার সৈন্যও সঙ্গে যাবে।

চুয়াল্লিশ সালের মার্চ মাসের শেষ দিন। মনকরা-ময়দানে পড়েছে অতি প্রকাণ্ড এক তাঁবু। ভাস্করের মনে বেশ কিছুটা সন্দেহ ছিলই। তাই বাইশজন সর্দারের মধ্যে একশজন (একমাত্র রঘুজী গায়কোয়াড় অসুস্থতার কারণে সঙ্গী হতে পারেননি, এবং তাই প্রাণে বেঁচে যান) সর্দার ও বিশ হাজার বর্গী সৈন্য নিয়ে ময়দানে এসে উপস্থিত।

তাঁবুটি উপবৃন্তের আকারে। অতি প্রকাণ্ড। আধুনিককালের সার্কাসের তাঁবু যেন। তবে সেটি বিচিত্র কায়দায় নির্মিত। ডবল কানাতের। অর্থাৎ তাতে দু-দুটি পর্দার আচ্ছাদন। তার ফাঁক-ফোকরে নাক্সা তলোয়ার হাতে সর্বাস্থে বর্ম সেঁটে লুকিয়ে আছে নবাবের শতখানেক বাছা-বাছা যোদ্ধা। ভাস্কর সৈন্য অগ্রসর হয়ে তাঁবুর কাছাকাছি এলেন। বিশ হাজার অশ্বারোহী বর্গী সৈন্যকে পঞ্চাশ-হস্ত পরিমাণ ভূমির দূরত্বে অপেক্ষা করতে বলে একশজন সর্দারসহ অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হয়ে এলেন তাঁবুর প্রবেশদ্বারের দিকে। মুস্তাফা খাঁ আর দেওয়ান জানকীরাম তাঁবুর বাহিরে এসে আভূমি নত হয়ে আগন্তুক অতিথিকে কুনিশ করলেন।

ভাস্কর সন্দিগ্ধ; বার-কতক প্রবেশদ্বারের সমুখে অশ্বকে টহল দিয়ে ভিতরটা ভাল করে দেখে নিলেন। না! আশঙ্কার কিছু নাই! দূর-প্রান্তে আরাম-কেন্দরায় অর্ধশায়িত বুদ্ধ নবাব, তাঁর হাতে আলবোলা নল। পাশে কয়েকজন প্রবীণ আমীর ওমরাহ। দুদিকে দুই নিশানধারী—ওদেরই একজন বোধকরি নবাবের দেহরক্ষী। ঐ আটদশজন নবাবপক্ষের মানুষ ভিন্ন বিশাল তাঁবুটি জনশূন্য।

বর্গী-সর্দারেরা দলপতির ইঙ্গিতে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। নবাবের খিদমদগারেরা

এগিয়ে এসে অশ্বগুলির লাগাম ধরল। অতঃপর একুশজন সেনাপতিসহ দুর্ধ্ব মহারাত্রীর কালান্তক যম ভাস্কররাম পত্নী ধীরপদে অগ্রসর হতে থাকেন বিপরীতপ্রান্তে অর্ধশয়ান অসহায় বৃদ্ধটির দিকে। যাকে তোমরা আজকাল বল—‘মরাল-চরণ-ক্ষেপভঙ্গিমা’য়: ‘গুজ্-স্টেপ’-এ।

তারা যখন উপবৃত্তাকার পটমণ্ডলের মাঝামাঝি উপস্থিত তখন অন্তরীক্ষ থেকে ধ্বনিত হল তূর্য-নির্নাদ।

এ কী ভোজবাজি! তূর্যধ্বনি কানাতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসার আগেই দু পর্দা তাঁবুর ভিতরের কানাকাটা উঠে গেল। মুহূর্তমধ্যে মঞ্চসজ্জার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভাস্কর দেখলেন, তাঁর চতুর্দিকে শতখানেক সশস্ত্র ঘাতক। তাদের সর্বাস্থে বর্মের আচ্ছাদন, হাতে নাস্তা তলোয়ার! পর মুহূর্তেই তারা বিন্দুৎবেগে ধেয়ে এল। মারাঠা সর্দারেরা সকলে তরবারি কোষমুক্ত করার সময়টুকুও পেলেন না। চোখের পলক ফেলার আগেই তাঁবুর ভিতরে বাইশটি ছিন্নশির বর্গীনায়েকের মৃতদেহ।

পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ ভূমির দূরত্বে বিশ-হাজার অশ্বারোহী বর্গী সৈন্য। নাগপুর থেকে বিনা বাধায় লুট করতে করতে এসেছে এই গাঙ্গেয় মোহনায় শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবীদের দেশে। ইচ্ছা মতো লুট করেছে গ্রাম, গঞ্জ, জনপদ, নগর; আগুন ধরিয়েছে পাকা ধানের ক্ষেতে, পর্ণকুটিরে। বেছে বেছে তুলে এনেছে যৌবনবতী অসহায়াদের। শুধু গণধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, পৈশাচিক উল্লাসে তরোয়ালের কোশে কেটে নিয়ে গেছে তাদের মাতৃহের যুগল অমৃত-ভাণ্ডার!

ওরা জানে, সন্ধির শর্ত নিয়ে অনেক দরাদরি হবে। দু-পক্ষই দড়াদড়িতে টিল দেবেন, টান দেবেন। সময় লাগবে। তাই ওরা অবতরণ করেছে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। কেউ জমিয়ে বসেছে ঘাসের উপর, কেউ অর্ধশয়ান, কেউবা খইনি ডলছে। আচমকা তূর্যধ্বনি শুনে চমকে ওদিক পানে একবার তাকিয়েছিল,—ডবল-কানাতের জন্য বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায়নি। ওরা বুঝে নিল—ঐ তূর্যধ্বনি আর কিছু নয়, আগন্তুক মহান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে।

আসল ঘটনাটা কী, তারা বুঝল যখন অন্তরীক্ষ থেকে ছুটে আসতে শুরু করল কামানের গোলা!

নেতৃত্বহীন বর্গী সৈন্যদলের অতি অল্পসংখ্যকই সেবার নাগপুরে ফিরে যেতে পেরেছিল। জঙ্গল-মহাল পর্যন্ত নবাবের অশ্বারোহী বন্দুকধারীরা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, অগ্নিদগ্ধ পাকাধানের ক্ষেতে এবার ধ্বংসাত্মক নারীর চোখ থেকে নয়, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে টপ-টপ করে ঝরে পড়েছিল মারাঠা বর্গী! বস্তুত এই ঘটনার পর নাগপুরের রঘুজী ভৌসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসর থেকে চিরতরে নেমে গেলেন।

মারাঠাদের সঙ্গে আলিবর্দী চূড়ান্ত সন্ধি করেন 1751 সালে। কিন্তু তখন মারাঠা দস্যুদলের সর্দার—না বালাজী, না রঘুজী! বস্তুত সে সন্ধিপত্র বাঙ্গলার পক্ষে স্বাক্ষর করেন পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ আলিবর্দী এবং মারাঠা-পক্ষে একজন মুসলমান সেনানায়ক: মীর হাবিব। সে না হিন্দু, না মারাঠা!

কিন্তু সে-সব তো ইতিহাসের কথা। কথাসাহিত্যের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই—মুহূর্তমধ্যে ঐ গণহত্যা সংগঠিত হয়নি, তাহলে কল্পনা করতে পারি ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দীকে তিরস্কার করে হয়তো বলতো: রে নরাধম! পাপিষ্ঠ! এই কি যোদ্ধার ?

যোদ্ধার আচরণ! নরকের ভয় নেই তোর?

আলিবর্দী আরাম-কেন্দারায় সোজা হয়ে বসতেন, আলবোলা নলটি সরিয়ে রেখে বলতেন, শত শত গ্রামের সহস্র সহস্র অসহায় নরনারীকে যখন পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করেছিল তখন তোর দোজখের ভয় হয়নি? আমি তো বেহেস্তে যাব রে! তোদের মতো বাইশটি নরকের কীটকে হত্যা করে আমি তো বাইশ হাজার ঔরতের ইজ্জৎ রক্ষা করেছি!

পরস্বাপহারকের বৃত্তি গ্রহণ করে সংসারযাত্রা নির্বাহের আয়োজন করেছিল দস্যু রত্নাকর। তার বাপ-মাতুলী-পুত্র জানত, কী-ভাবে সংসার চলছে। কিন্তু পাপের হিস্যা নেবার প্রশ্ন যখন উঠল তখন কেউই রাজী হয়নি। আলিবর্দী এ ষড়যন্ত্রের কথা পরিবারবর্গের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন। তিন মেয়ে, তিন জামাই, এক পত্নী এবং নাবালকদের কথা বাদ দিলে একমাত্র দাদুভাই—চতুর্দশবর্ষীয় সিরাজ—কেউই কিছু জানত না! তাই বলে পাপের ষোল-আনা হিস্যা কী-করে বৃদ্ধের স্বন্ধে চাপাই? দু-আনা অংশ তো নিতে হবে মুস্তাফা খাঁ আর জানকীরামকে! পাপের ভাগ তো তারাও পেল।

দেওয়ান জানকীরাম রাত পোহালে হয়ে গেল ‘রাজা’ জানকীরাম। তার পুত্র দুর্লভরামকে করা হল কটকের শাসনকর্তা। আফগান সর্দার গোলাম মুস্তাফা খাঁকে দেওয়া হল নগদ অর্থ। তাছাড়া পাঁচ-হাজারী মনসবদারের পদ থেকে তাকে উন্নীত করা হল চৌদ-হাজার সৈনিকের সৈন্যপত্যে! কিন্তু মুস্তাফা তাতে খুশি নয়। সে দাবী করল বিহার প্রদেশের সুবেদারী। আলিবর্দী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—তা কেমন করে সম্ভব? সেখানে বর্তমান সুবেদার হচ্ছে জৈনুদ্দীন আহমেদ, নবাবের দামাদ (সিরাজদ্দৌলার পিতৃদেব)। তাকে তো বিনা অপরাধে পদচ্যুত করা চলে না। তাছাড়া গোলাম মুস্তাফা খাঁ চরিত্রগতভাবে যোদ্ধা, শাসক নয়—এটাই আলিবর্দীর ধারণা। ফলে, কালে হয়তো তাকে প্রধান সিপাহ-সালার করা যেতে পারে, কিন্তু শাসকের দায়িত্ব দেওয়া চলে না। মুস্তাফা ক্ষুব্ধ হল। পদত্যাগ করল। আলিবর্দী বললেন, তোমার পুরস্কারের নগদ অর্থ এবং সৈন্যদলের বাকি-বকেয়া মিটিয়ে নিয়ে তুমি চলে যেতে পার।^১ যে-কোন দিন আবার ফিরেও আসতে পার। আমার দুয়ার চিরকাল তোমার জন্য উন্মুক্ত।

ন্যায়, ধর্ম, ইমান, ইনসাফের প্রসঙ্গ ভুলেছিলে না তোমরা? এবার শোন: টাকা-কড়ির হিস্যা বুঝে নিয়ে মুস্তাফা খাঁ সোজা গিয়ে হাজির হল রঘুজী ভৌসলের দরবারে। তাকে আমন্ত্রণ জানালো বাঙ্গলা লুট করতে। রঘুজী আক্রমণ করল উড়িষ্যা। কটক অধিকার করে বন্দী করল

১) “Mustafa began to threaten him. An armed conflict in the capital seemed imminent; but Alivardi seduced some of the other Afgan captains and even a few of the lieutenants of Mustafa. The general at last resigned the Nawab's service, and left Murshidabad with his own contingent in February 1745, on his dues being paid in full.” *The History of Bengal*, Vol II, Muslim Period, Edited by Sir Jadunath Sarkar, The University of Dacca, Ramna; Dacca, 1948 (3rd impression: Aug '76, P. 462).

জানকীরামের পুত্র দুর্লভরামকে। আর মুস্তাফা স্বয়ং আক্রমণ করল পাটনা। আলিবর্দী ছুটে এলেন মুর্শিদাবাদ থেকে। কোনক্রমে রক্ষা পেল পাটনা। মুস্তাফা ঋণ পালিয়ে গেল চুনারের দিকে।

আটচল্লিশ সালের প্রথম দিকে শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতের ভাগ্যই দেখা দিল এক অভিশাপ। দিল্লিজয়ী নাদির শাহর উত্তরাধিকারী আহমদ শাহ দুরানী আক্রমণ করল পাঞ্জাব আর দিল্লী। এই সুযোগে নবাব আলিবর্দীর প্রাক্তন আফগান সর্দারেরা—গোলাম মোস্তাফা, সমশের ঋণ, সর্দার ঋণ প্রভৃতি সম্মিলিতভাবে পাটনা আক্রমণ করে বসল। রঘুজী ভৌসলের কিছু মারাঠা সৈন্যও এই আক্রমণে অংশ নেয়। সিরাজদ্দৌলার পিতা সুবেদার জৈনউদ্দীন আহমেদ সম্মুখ যুদ্ধে একপক্ষকে প্রতিহত করেন। মোস্তাফা ঋণ প্রথমে হত হয়। অন্যান্য সর্দারেরা তাতে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। জৈনউদ্দীন তখন সেই বিদ্রোহী আফগান সর্দারদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হন। ঠিক যেভাবে ডাক্তার সন্ধি-মণ্ডপে নিহত হন, সেইভাবেই অতর্কিত আক্রমণে সন্ধির মণ্ডপে জৈনউদ্দীনের শিরশ্ছেদ করা হল। আফগান সর্দারেরা সদ্যোবিধবা আমিনা বেগম ও তার সন্তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে উন্মুক্ত শকটে পাটনা শহর পরিক্রমা করায়। জৈনউদ্দীনের পিতা, অর্থাৎ আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমেদকে অশেষ যত্নশীল দিয়ে হত্যা করে।

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ বলছেন:

নবাব এই সংবাদশ্রবণে হৃদয়ে এতদূর আঘাতপ্রাপ্ত হন যে, আফগানদিগের দমনে কী উপায় করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জামাতা জৈনউদ্দীনের ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার তাদৃশ শোচনীয় পরিণামে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। স্নেহপুতলী কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদিগের নির্যাতন ও অবমাননায় নবাব স্ত্রীলোকের ন্যায় কাতর হইলেন।^১

আমিনা-বেগমের দুই পুত্র ও এক কন্যার উল্লেখ পেয়েছি। জ্যেষ্ঠপুত্র সিরাজদ্দৌলা মায়ের কাছে পাটনায় থাকত না। নবাব ঐ আদরের দাদুভাইকে সর্বদা কাছে কাছে রাখতেন। গোলাম হুসেন সালিমের ‘রিয়াজ-উস-সালাতিন’ পাঠে, অন্তত আবদুস সালামকৃত তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে জেনেছি—‘নবাব সম্পূর্ণ হতোদ্যম হয়ে পড়েন। শিশুর মতো ক্রন্দন করতে থাকেন। এই সময়ে তাঁকে উজ্জীবিত করেছিলেন বেগমসারাহ। তাঁরই প্ররোচনায় নবাব প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর হন।’

সমস্ত প্রাসাদ যখন শোকে মুহ্যমান তখন এই পলিতকেশা বৃদ্ধা হারেম থেকে বার হয়ে এলেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রূপসজ্জায়। যেন মুক্তকেশী পাঞ্চালী! ঘটোৎকচ অথবা অভিমন্যু বধের পর পাণ্ডব শিবিরে নেমে আসা চরম হতাশার মুহূর্তে যেন জ্বলন্ত যান্ত্রসুন্দরী।

আলিবর্দী থমকে গেলেন। ধর্মপত্নীর তীব্র ভৎসনায় সম্মিত ফিরে পেলেন যেমন মনে পড়ল—ঐ বৃদ্ধার পাজর-সর্বস্ব বুকেও তো শেলটা একইভাবে বিদ্ধ হয়েছে। তবু তো সে ভেঙে পড়েনি! উৎসাহ জোগাচ্ছে স্বামীকে, নাতিকে! স্কাব্রতেজে ছুঁতে উঠলেন আলিবর্দী।

মুর্শিদাবাদ

সমস্ত সেনানায়ককে একত্র করে বাহাভুর বছরের বৃদ্ধ রণলক্ষ্যার দিয়ে উঠলেন। সব সেনাপতি নবাবের পদতলে তরবারি রেখে আমৃত্যু সংগ্রামের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। অক্ষয়কুমার এখানে লিখেছেন, “সিরাজদ্দৌলা বালক হইলেও এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পিতা ও পিতামহ উভয়েই শত্রুহস্তে নিহত, মাতা বন্দিনী, সিরাজদ্দৌলা নীরবে এই সকল সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। অসহিতে মাতামহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সিরাজ বালক হইলেও বীর বালক। নবাব তাহাকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

অন্ধের হিসাবে সিরাজের বয়স তখন আঠারো। কেন যে তাকে মহাপণ্ডিত বারে বারে ‘বালক’ বলেছেন জানি না। সে যাই হোক, আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করলেন সেই ‘লীপ-ইয়ার’-এর বাড়তি দিনটায়: 29.2.1748 তারিখে। ভাগলপুরের কাছাকাছি নয়া মারাঠা-নায়ক মীর হাবিবের সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করলেন মার্চের মাঝামাঝি। এ যুদ্ধে অসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সিরাজ। গঙ্গার দক্ষিণতীরে পাটনা শহরের ছাব্বিশ মাইল পূবে রানীসরাইয়ের ময়দানে সংযুক্ত আফগান ও মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলেন যোলই এপ্রিল। এখানেও সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধক্ষেত্রে অপারিসীম বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তারপর ওরা উপনীত হলেন পাটনায়। দখল করলেন দুর্গ। ভূগর্ভস্থ অন্ধ কারাগার থেকে আমিনা-বেগম আর নাতি-নাতনিদের উদ্ধার করতে যখন ছুটে গেলেন বৃদ্ধ নবাব, তখনো তাঁর পাজর-ঘেঁষে হাজির ছিল আঠারো-বছরের জওয়ান নাতি।

দূর্ভাগ্য সেই বাংলার শেষ নবাবের। আজও আফিংখোর বুড়ো ইতিহাস বলে চলেছে, ‘না হল তার যুদ্ধবিদ্যা শেখা, না হল তার রাজকার্য চালানোর কোনও জ্ঞানগম্যি।’

বাহাভুরে বুড়োর এই ‘ভীমরথী’র কথাটা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে ইতিহাস। কিন্তু সেই মিলিত আফগান-মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে নাতি-দাদুর অবিশ্বাস্য যুদ্ধজয়ের নেপথ্যে এক বাষট্টি বছরের বুড়ি দিদার নথ-নাড়া আর মুখ-ঝামটর অনুপানটুকুর কথা ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে। আফিংখোর বুড়ো ইতিহাসেরও এ এক চিরকেলে ভীমরথী! যার যা পাওনা তা ন্যায্য হিস্যায় ভাগ-বাটোয়ারা করতে তার ভুল হয়ে যায়: কত নারী দিল মাথার সিঁদুর লেখা নাই ইতিহাসে।

সিরাজের কুকীর্তির কথা আর কী বলব? বেহুদ্যো এ কেতাবের কলেবর কয়েক ফর্মা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। কী দরকার? সে-সব তো তোমরা জানই:

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঔদ্ধত্য-লাম্পটি-কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যেন আরো বেড়ে যেতে লাগল। বুন্দো স্বভাব যেন আরও বন্য হতে চলল। না হল তাঁর যুদ্ধবিদ্যা শেখা, না হল তাঁর রাজকার্য চালানোর কোনো জ্ঞানগম্যি। এক কাব্যকাহিনী ছাড়া আর কিছুতে তো সিরাজদ্দৌলাকে কোনক্রমে শহীদ বানাতে পারা যাচ্ছে না। কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী ইংরেজ, কী ফ্রেঞ্চ, কী ডাচ একজনও কেউ তাঁকে একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে যাননি। ২

১) সিরাজদ্দৌলা/অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়/পৃঃ 34

২) পলাশীর যুদ্ধ/তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়/চতুর্থ মুদ্রণ/পৃঃ 103.*

এরপর আমাদের সমকালীন লেখক দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন কাশিমবাজার ফরাসি-কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ ল-সাহেবের স্মৃতিচারণ থেকে। প্রথমটায় এক নবাবী-খেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

বর্ষাকালে যখন ভাগীরথী জলে-জলে টেটুসুর হয়ে দুকূল উপছে পড়ছে তখন সিরাজদৌল্লা তাঁর অনুচরদের মারফত কৌশলে যাত্রীদের খেয়াপারের নৌকাগুলিকে উলটিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। যাত্রীরা যখন প্রাণের দায়ে চীৎকার করত আর তারপর নিরুপায় হয়ে হাত-পা ছুঁড়ে এক-এক করে জলে ডুবে মরত তখন তাই দেখে সিরাজদৌল্লা আমোদ পেতেন।
ফরাসী লেখকের স্মৃতিচারণ অবলম্বনে তপনমোহন আরও জানিয়েছেন,
কোন সুন্দরী হিন্দু-স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নানে নেমেছেন দেখলেই সিরাজদৌল্লার চরেরা ত খুনি গিয়ে তাঁকে সেই সংবাদ জানাত। তারপর সেই স্ত্রীলোক একেবারে নিখোঁজ। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা কেউ আর কখনকালেও তার সন্ধান পেতেন না।^৩

স্বীকার্য, মস্যুয়ে জাঁ ল ইংরাজের বিপক্ষদলের লোক। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাশিমবাজারে বসে হওয়া সম্ভবপর নয়। তথ্য সংগ্রহ করেছেন কোন সূত্র থেকে? নবাবের পক্ষে তখন কেউ নেই। পরেও নেই। এইসব জনশ্রুতির অন্য কোনও সূত্র থেকে সমর্থনও নেই। সিরাজ যে বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই দাদুর অতি আদরে অতিরিক্ত মদ্যপান ও নারীসঙ্গ করত এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। হিন্দু রাজা-রাজড়া এবং মুসলমান আমীর ওমরাহরা নিজ নিজ নানান স্বার্থে সিরাজকে সরিয়ে অন্য কোনও উত্তরাধিকারীকে আলিবর্দীর পর গদীতে বসাতে চেয়েছিলেন। পুত্র-সন্তানহীন নবাবের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রই যে গদীর হকদার এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে সকলেই উঠে পড়ে লেগেছিলেন সিরাজের দুর্নাম রটাতে। যাতে সবাই সিরাজের সিংহাসন লাভে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সিরাজ নিজেই মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র; ফলে তার কাম-বিকারের চিত্রগুলি আরও বীভৎস করে পরিবেশিত হতে থাকে। শোনা যেতে থাকে, সিরাজের এক বিলাস—গর্ভিণী নারীর নিম্নোদর বিদীর্ণ করে সন্তানদের বার করে দেখা।^৪ শোনা গেল, রানী ভবানীর বিধবা কন্যা তারা দেবীকে বজরার ছাদ থেকে দেখতে পেয়ে সিরাজ না কি ক্ষেপে ওঠেন। পাইক পাঠিয়ে তারাহরণের প্রচেষ্টা করেন! জগৎ শেঠের এক কুলবধূকে একবার স্বচক্ষে দেখবার জন্যও নাকি সিরাজ ক্ষেপে ওঠেন!

যুবরাজ সিরাজ মদ্যপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত—একশ বার! কিন্তু নবাব সিরাজ?

একটা কথা বলিয়া রাখি, বাঙ্গলার ইতিহাসে সিংহাসনে আরোহণের পরেও সিরাজকে যে ঘোরতর মদ্যপায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। যৌবনারম্ভে সিরাজ মদ্যপান করিতেন বটে কিন্তু আলিবর্দী মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে কোরান স্পর্শ করাইয়া

১ ও ২) এ [মূল তথ্য: *Memoire sur l' Empire Mogul*, by Jean Law, ed. by Martinéau (Paris, 1913).

৩) 'সিরাজদৌলার সমসাময়িক ইংরাজ এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ তাঁহার জীবনকালে যে-সকল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার অনেক কুর্কীর্তির উল্লেখ আছে; কিন্তু গর্ভবিদারণ, নৌকাসিংহিত ভাগীরথীগর্ভে নরনারী-নিমজ্জন প্রভৃতি অদ্ভুত অত্যাচারের কোনও উল্লেখ নাই। বলাবাহুল্য যে, ইহার আধিকাংশই নিছক রটনা।'—সিরাজদৌলা/অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়/পৃ: ৫৭.

মুর্শিদাবাদ

ভবিষ্যতে মদ্যপান না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন এবং সিরাজ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মাতামহের সেই হিতকর অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই।*

তাই অবাক হয়ে যাই যখন 1953 সালে প্রকাশিত ‘পলাশীর যুদ্ধ’ গ্রন্থে তপনমোহন বললেন, তিনি ‘নবাব’ সিরাজের স্বপক্ষে কারও কোনও সার্টিফিকেট খুঁজে পাননি, নবীন সেনের কবিতা ব্যতিরেকে।

নিখিলনাথ হিন্দু এবং তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচনা করেছেন মুর্শিদাবাদ কাহিনী। কিন্তু তথ্যসূত্রের ইঙ্গিতও তো তিনি দিয়ে গেছেন:

I have before mentioned Siraj Dowla, as giving to hard-drinking; but Allyverde, in his last illness, foreseeing the ill consequences of his excess, obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxicating liquor; which he ever after strictly observed (“An Enquiry into our National Conduct to Other Countries”, Chap II, p. 32)

লেখক ইংরাজ ঐতিহাসিক। পাছে নিখিলনাথকে ঐতিহাসিকেরা অবিশ্বাস করেন, তাই সক্ষেপে তিনি গত শতাব্দীতে লিখেছিলেন:

“ইহা একজন ইংরেজের কথা, দেশীয়ের নহে।”

হায় নবাব সিরাজ! আজও তোমার বরাতে একটা ‘গুড-কন্ডাক্টের’ সার্টিফিকেট জোগাড় হল না ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে।

তবে হ্যাঁ, সিরাজের একটি বিশেষ অপকীর্তির কথা আলোচনা না করে প্রসঙ্গান্তরে যেতে পারছি না। একটি অসমাপ্ত হত্যা-মামলার তদন্ত।

ইতিহাস কী-ভাবে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইতিহাস যারা লেখেন তাঁরা যদি রচনার পূর্বকাল থেকেই একটি বদ্ধ-ধারণার বশবর্তী হয়ে কলম নিয়ে বসেন তাহলে সেটা হয়ে পড়ে আরও বিভ্রমনার।

সিরাজের এই অপকীর্তিটার বিবরণ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জবানীতেই শোনাই: সম্ভ্রান্ত লোকেরা সিরাজের নাম শুনলেই আতঙ্কে সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন। কার যে কখন তাঁর হাতে মাথা কাটা যায় এই ভয়ে তাঁদের কারো রাত্রে ঘুম হয় না। একদিন প্রকাশ্য রাজপথেই হোসেন কুলী খাঁ বলে একজন আমীর লোককে সিরাজউদ্দৌলা খুন করলেন। হোসেন কুলী খাঁর সঙ্গে তাঁর বড় মাসী ঘসেটা বেগমের গুপ্ত-প্রণয় ছিল বলে লোকে সন্দেহ করত। ঘসেটা বেগমের এ-বিষয়ে বড়ই দুর্নাম। আত্মীয়-স্বজনের কাছে সিরাজ তাই দোহাই পাড়লেন। দেখা যায় যে-দোষটা নিজের খুব বেশী, সে-দোষটা অপরের চরিত্রে দেখলে লোকে আর সেটাকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আসলে অন্য একটা কারণ ছিল। সকলের কাছে হোসেন কুলী খাঁর প্রতিপত্তি দিন দিন খারকম বেড়ে উঠছিল তাতে সিরাজউদ্দৌলার মনে তাঁর সম্বন্ধে খুবই ভয় ঢুকে গিয়েছিল। আর বেশি

* মুর্শিদাবাদ কাহিনী/নিখিলনাথ রায়/পৃঃ 115.

বেড়ে ওঠবার আগেই তাঁকে এ-জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়াটা সিরাজউদ্দৌলা অনেক আগে থেকেই স্থির করেছিলেন। তাই প্রকাশ্যে সাফাই গেয়ে বলে বেড়ালেন হোসেন কুলী খাঁ-ই তাঁকে খুন করবার জন্য সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।^১

দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম, 1953 সালে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি থেকে, শুধু দেখাতে যে, আমরা কী-ভাবে পণ্ডিতদের দ্বারা বিভ্রান্ত হই! এ গ্রন্থ প্রকাশের পঞ্চাশ বছর আগে নিখিলনাথ যে অরণ্যরোদন করেছেন তা ব্যর্থ:

ঐতিহাসিকেরা একটি ঘটনার জন্য সিরাজকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার কারণটি জানিতে পারিলে কেহই সিরাজকে তজ্জন্য বিশেষরূপে দায়ী করিবেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ঐতিহাসিকগণ ... মনের আবেগে সিরাজকে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। ... কারণটি সেই নৃশংস হত্যা অপেক্ষা কোন অংশে অল্প গুরুতর নহে। আলিবর্দী খাঁ ও তাঁহার বেগমের ন্যায় মহিলা যে-সংসারের কর্তা ও কহীন্সরূপ ছিলেন, দুঃখের বিষয়, সেই সংসারে ব্যভিচার ও পাপ প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে সর্বদা সহস্র বৃশ্চিকদংশনের মন্ত্রণা প্রদান করিত। বলিতে দুঃখ ও লজ্জা বোধ হয় যে, আলিবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটী ও কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা উভয়েই আপনাদিগের পবিত্র চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঘসেটী অনেকদিন হইতে পাপপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জৈনুদ্দীনের (সিরাজের পিতা) মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী আমিনাও ভগিনীর পথের অনুসরণ করেন। এই আমিনাই সিরাজের মাতা। দুই ভগিনীই হোসেনকুলী খাঁর প্রণয়ভাগিনী হইয়া উঠেন। ...কিন্তু...আমিনা স্বামীর মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে হোসেনকুলী খাঁ তাহার সহিত গুপ্তপ্রণয় স্থাপন করেন। ...কন্যাগণের কুপথগমনের কক্ষা জ্ঞাত হওয়া অবধি নবাব-বেগম তাহা নিবারণের জন্য অশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে যখন তাঁহাদের গুপ্তপ্রণয় কথা লইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন নবাব-বেগম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা পূর্বে সচরিত্রা থাকিয়া এক্ষণে অধঃপাতের দিকে ম্লানহইতেছে দেখিয়া এবং হোসেনকুলী খাঁকেই সেই অধঃপতনের কারণ জানিয়া তিনি তাহার প্রতিবিধানে যত্নবতী হইলেন। সিরাজ স্বীয় জননীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া...২

কী বলবেন এরপর?

সমকালীন ইংরাজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের মানসিকতা প্রণিধানযোগ্য। একটা দেশে বাণিজ্য করতে এসে শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিতে হলে এছাড়া উপায় কী? ন্যায্যশাসককে বঞ্চিত করতে যদি তার সেনাপতিকে ঘুষ খাওয়াতে হয়, তখন ইতিহাসে লেখার প্রয়োজন হয়: 'গিলি-গিলি হোকাস-পোকাস!' সমকালীন হিন্দু-মুসলমান রাজা-রাজড়ার এবং আমীর-ওমরাহরাও তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার কৈফিয়ৎ হিসাবে—দেশী শাসককে পিছন থেকে

১) পলাশীর যুদ্ধ/তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়/চতুর্থ মুদ্রণ/পৃ: 105

২) মুর্শিদাবাদ কাহিনী/নিখিলনাথ রায়/পৃ: 84

মুর্শিদাবাদ

ছুরি মেরে বিদেশীকে ডেকে আনার যৌক্তিকতা হিসাবে—সিরাজ চরিত্র নানাভাবে কলঙ্কিত করেছেন। এটুকু সহজেই বোধগম্য। কিন্তু বিংশশতাব্দীর ইতিহাস লেখকের এমন মানসিকতা হল কেন? বিশ্বাস করা কঠিন যে, তপনমোহনবাবু ‘পলাশীর যুদ্ধ’ রচনার পূর্বে নিখিলনাথের ‘মুর্শিদাবাদ কাহিনী’ পড়েননি। এ যেন ‘গিবন’ না পড়ে রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সম্বন্ধে একখানা নয়া-কেতাব লেখার প্রচেষ্টা। বেশ, না-হয় তর্কের খাতিরে তাও ধরে নেওয়া গেল। কিন্তু তপনমোহন তো ক্রমাগত ‘মুতাস্করীন’-গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই তথ্যটি সেই ইংরাজি অনুবাদেও ’ তো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত! তাহলে?

তবু তপনমোহন বুঝে উঠতে পারেন না— কেন সিরাজ বলে বেড়ালো যে, হোসেনকুলী খাঁই তাকে খুন করতে চায়! তা না বলে হতভাগ্য সিরাজ কী বলে বেড়াবে—“ওগো, তোমরা ভুল শুনেছ! শোন, বুঝিয়ে বলি! বড়মাসী নয়। হোসেনকুলী ছিল আমার বিধবা মায়ের গুপ্তপ্রণয়ী। তাই দিদার হুকুমে...”

আচ্ছা, আবার না হয় ধরে নিই—মুতাস্করিনের প্রথমখণ্ডের ঐ 647 নম্বর পৃষ্ঠাটি তপনমোহনের নজর এড়িয়ে গেছে; কিন্তু সেই বাইশ-বছরের বাইশ-সেরী ওজনের বাঈজীর ঐতিহাসিক উক্তিটা? সমকালীন ভারতের সে নাকি ছিল শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। সেটা শোনা কথা। কিন্তু সে যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর রেকর্ড করে গেল। আর সবচেয়ে বড় কথা : মৃত্যুমুহুর্তে তার মুখের পেশীতে কোথাও কুণ্ঠনরেখা দেখা যায়নি!

নারীর প্রেম যে বাজারের পণ্য নয়, তার দেহটাই কেনা-বেচা করা যায়, এই তত্ত্বটা একটা জ্বলন্ত প্রমাণ রেখে মৃত্যুঞ্জয়ী হল মেয়েটি। তার মৃত্যুমুহুর্তে কেউ উপস্থিত ছিল না, কোন সাক্ষী নেই। সে ছিল পালঙ্কে শুয়ে। পায়ের কাছে জড়ো করা ছিল স্তূপাকার জরোয়া গহনা। আমার তো মনে হয় মৃত্যুমুহুর্তে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার আগে সে শেষ কথা যেটা বলে গেছে আপনমনেই, তাঃ আমি মৃত্যু চেয়ে বড়!

সেই ফৈজী ফয়জান-এর বিশ্বরণের-অতীত ঐতিহাসিক—উভয় অর্থেই ঐতিহাসিক—উক্তিটা ইতিহাস ঘেঁটে জেনে নেবার সৌভাগ্যও কি হয়নি তপনমোহনের?

ফৈজী ফয়জান ছিল দিল্লীর নটী। অতি বিখ্যাত নর্তকী। রূপের খ্যাতিই বেশি। “মুর্শিদাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তৎকালে ফৈজীর ন্যায় সুন্দরী সমগ্র ভারতবর্ষ দ্বিতীয় কেহই ছিল না।” তার ওজন মাত্র বাইশ সের। সিরাজ এই অদ্বিতীয়া রূপবতীর কথা শুনে মোহিত হয়ে যায়। তখন সে নবাবজাদা। এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ফৈজী বাইজীকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসে। হারেমজাত করে।

অর্থমূলে কেনা-সখের চুনকো জিনিস। মালিকানা ক্রেতার। হকের ধন। কিন্তু ঐ যে এক-বেয়াড়া দেবতা আছেন না, যাকে ভয় করেও পরে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন মহাদেব, তিনি ঐ সহজ হিসাব মানতে নারাজ। মুর্শিদাবাদে এসে ফৈজী প্রেমে পড়ল এক আশু যুবকের—বলিষ্ঠ, সুগঠিতনু, অপূর্ব সুন্দর তার রূপ : সৈয়দ মহম্মদ খাঁ। লোকটা সিরাজে ভয়িপতী। অন্তঃপুরে তার অবাধ যাতায়াত।

সিরাজের গুপ্তচর সর্বত্র। খবর পেল। বিশ্বাস হল না। তবে তাকে তাকে থাকল। তারপর একদিন হাতেনাতে ধরে ফেলল দুজনকে। সৈয়দ মহম্মদ পালিয়ে বাঁচে। সিরাজ তার পশ্চাদ্ধাবন করল না। নিজের ভগিনীপতি! তাকে তো আর কোৎল করা যাবে না। সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ল ঐ কসবির উপর। তরবারি কোষমুক্ত করে সিরাজ চাপাগলায় হিস্‌হিসিয়ে ওঠে : ওরা তাহলে ঠিকই বলে! বেশ্যা কোথাকার!

খোলা তলোয়ারের সামনে দাঁড়িয়েও মেয়েটি ভয় পেল না! মাথা খাড়া রেখেই বললে, সে কী নবাবজাদা! লাখটাকা দিয়ে রঙিবাজার থেকে যখন আমাকে কিনে এনেছিলেন তখন ও কথাটা জানতেন না? ও-গালাগালে আমার সরম হবে কেন? কথাটা বরং আপনার মাকে বলে দেখবেন—সত্যি হলেও দেখবেন, তিনি তা সহিতে পারবেন না!

সিরাজ বজ্রাহত হয়ে গেল! ধীরে ধীরে কোষবদ্ধ করল তরবারি। তাহলে সেদিন দিদা যেকথা বলেছিল তা তো মিথ্যা নয়! গোটা মুর্শিদাবাদ একথা জানে!

ধীরপদে গৃহত্যাগ করল সিরাজ। কোন আঘাত না করে। পরেও কেউ ঐ সিরাজ-জননীর লাঞ্ছনাকারিণীকে স্পর্শ করেনি। শুধু সিরাজের আদেশে মীর মুন্সি এসে সেই ঘরের জানলা-দরজাগুলি পাকা ইটের গাঁথনিতে বন্ধ করে দিয়ে গেল। ফৈজী টু শব্দটি করেনি। দু চোখ মেলে দেখেছে রাজমিস্ত্রি আর মজুরদের গাঁথনির কাজ। কথা বলেনি, কিন্তু একে-একে তার গা থেকে খুলে ফেলেছিল বহুমূল্য হীরে-জহরৎ-বসানো অলঙ্কার। ভয়ে কণ্ঠ রোধ হয়ে এল মীর-মুন্সির। এ আচরণের তো একটাই অর্থ! ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি হস্তান্তর করে মেয়েটি প্রাণ-ভিক্ষা চাইবে—কিন্তু কার কাছে? মীর মুন্সি, প্রহরী না নবাবজাদা?

আশ্চর্য! কারও কাছেই সে প্রাণ-ভিক্ষা চাইল না। শুধু শেষ ইটখানা বসিয়ে যখন কর্নিক দিয়ে ঠুকতে গেল—ভুলও হতে পারে—মীর মুন্সির মনে হয়েছিল ঐ বাইশ বছরের মেয়েটির কণ্ঠ থেকে অস্ফুটে উচ্চারিত হয়েছিল একটি মাত্র শব্দ : অম্মাহ!

অনেক-অনেকদিন পরে প্রাচীর ভেঙে সে গৃহে প্রবেশ করেছিল রাজপ্রহরী। দেখে, পালঙ্কে শায়িত অবস্থায় এক নারীর কঙ্কাল! তার পায়ের কাছে স্তূপাকার করে রাখা আছে মণি-মাণিক্যে গাঁথা নানান অলঙ্কার—নবাবজাদার প্রণয়োপহার! মৃত্যুপথযাত্রিণী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত! ফৈজী ফয়জানের দিক্‌কার কেন 'ঐতিহাসিক', জান? এ তিরস্কার ফৈজী করেনি নবাবজাদাকে! বিশ্ববারাঙ্গনার তরফে পুরুষশাসিত মনুষ্যসমাজের বিরুদ্ধে এ দিক্‌কার! জান দিয়ে ফৈজী ফয়জান বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল: নারীর প্রেম অর্থমূল্যে কেনাবেচার বেসাতি নয়।

নবীন সেন থেকে শচীন সেনগুপ্ত কেউই দাবী করেননি যে, সিরাজউদ্দৌলা ছিল ধোওয়া তুলসী পাতাটি! কিন্তু 'ডেভিল'কে কেন বক্ষিত করা হচ্ছে তার 'ডিউ' থেকে? দাদুর মৃত্যুর আগে আর পরে সিরাজ যে ভিন্ন চরিত্র এটা ইতিহাস আর কবে মেনে নেবে? জাঁ ভাল্‌ফাঁ লোকটা তো সেই জন্যই 'মিজারেবল্'! কারণ দুনিয়া মেনে নিতে পারেনি যে, বিংশ শতাব্দীর বাতিদান চুরি করার আগে আর পরের মানুষ দুটো ভিন্ন ব্যক্তি!

পলাশীর যুদ্ধের পর দু'শ' বছর তো কেটে গেছে। বিজয়ী লর্ড ক্লাইভ অস্তিত্ব করে মুক্তি পেল, 'ইম্পিচড' হল ওয়ারেন হেস্টিংস, মীরজাফর দীর্ঘদিন যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠরোগে ভুগে প্রাণ দিল আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে। ব্যভিচারিণী ঘস্‌টে-আমিনা দু-বোনের হল

মুর্শিদাবাদ

যৌথ সলিল-সমাধি! মীরন মরল বজ্রঘাতে। সকলের সব পাপের তামাম শুদ! মায়।
জেতা-সাম্রাজ্যটা 'কুইট' করে ইংরেজ এই তো সেদিন ফিরে গেছে তাদের নিজের দেশে।
বাকি আছে একমাত্র ঐ : লা মিজারেবল্।

এখনো পণ্ডিতেরা তাকে কবর থেকে টেনে তুলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেন :
সবুর কর! তোমার বিচারটা বাকি আছে হে! হোসেনকুলী হত্যা মামলা!

এখনো ঐতিহাসিকেরা মেনে নিতে পারেননি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র গবেষণাগ্রন্থের
একেকবারে শেষ পংক্তিটি :

“Sherajaddaulah was more unfortunate than wicked!”



বড় অভাগা ঐ দিদাও — বেগম শরফ উননিসা।

না, দ্রুপদনন্দিনী যাক্ষসেনীর মতো নাথবতী অনাথবৎ নয় সে; পাঁচ-ভাতারি আতান্তরিতে
ভুগতে হয়নি তাকে। ওদিকে প্রজাপালনের অজুহাতে একমাত্র বেগমকে বনে পাঠাবে এমন
খসম-এর ঘরও করতে হয়নি তাকে। তবে শেষ জীবনে নানা দিক থেকে মৃত্যু এসে তখনছ
করে দিল তার সোনার সংসার। তৃতীয়বার কন্যাসন্তান জন্মানোর পর ওর জোয়ান খসমকে
বলেছিল, ‘আমার নসিবে নেই গা, তুমি আর একটা নিকে কর!’ ওর স্বামী কথাটা হেসেই
উড়িয়ে দিয়েছিল; বলেছিল, ‘ছাওয়াল নিয়ে কী করব গো? মসনদ কাকে দিয়ে যাব সে চিন্তা
তো নেই! দিন আনি, দিন খাই — মেয়েরাই বুড়ো বয়সে দেখভাল করবে।’

তখন ওর স্বামী, মীর্জা মহম্মদ আলী দিল্লী থেকে বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে
চাকুরির সন্ধানে এসে সদ্য প্রত্যাখ্যাত হয়ে কটকে গিয়ে যাহোক একটা নোকরি জুটিয়ে
নিয়েছে। সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহমদ। সেখানে সে নায়েব সুবার দরবারে পারিষদ আর
কিছুদিন পরে একটি জেলার ফৌজদার হয়। তার পরেই কিসমতের খেল হল শুরু। দুই
ভাইয়ের বৃদ্ধিতে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর সুজাউদ্দীন উঠে বসলেন বাঙলার মসনদে। নবাব
সুজাউদ্দীন খুশি হয়ে মীর্জা মহম্মদ আলীকে আলিবর্দী উপাধি দিয়ে রাজমহলের ফৌজদার
করে দেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে সরফরাজ খাঁ মসনদে বসলে, দুইভাই বিদ্রোহ ঘোষণা
করেন। 1740 সালে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে হারিয়ে বাঙলার গদীতে উঠে বসেন শরফ
উননিসার খসম একটা জবরদস্ত উপাধি নিয়ে: ‘সুজা-উল-মুলক-হেসামুদ্দৌলা মহব্বৎ জঙ্
বাহাদুর’।

তখনো কিন্তু শরফ-উননিসা তার খসমকে রাজী করাতে পারেনি। তখন অবশ্য আলিবর্দীর
বয়স চৌষটি, বেগম-সাহেবার চুয়ান্ন। আলিবর্দী বলেছিলেন, চিন্তার কী আছে? দাদুভাই তো
সে সমস্যার সমাধান করেই রেখেছে!

আলিবর্দী যখন মসনদে বসেন, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের বয়স দশ।

তিন মেয়েরই ততদিনে বিয়ে হয়ে গেছে ওঁর ভাসুরের তিন ছেলের সাথে।

বেগম-সাহেবা সর্বক্ষণ তাঁর স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও! হয়তো সম্মুখ যুদ্ধে নয়, কিন্তু সমরক্ষেত্রের অদূরে মূল-শিবিরে অপেক্ষা করতেন, যাতে দিনান্তে স্বামীসেবা থেকে একটি দিনও বঞ্চিত না হতে হয়।

একবার এক কাণ্ড হল। বর্গীদের সঙ্গে নবাবের লড়াই চলছে। বর্গীনায়েক খবর পেলে স্বয়ং বেগম-সাহেবা মাইল দশেক দূরে নবাবের মূল-শিবিরে অবস্থান করছেন। ওরা বুদ্ধি খাটালো—কোনক্রমে যদি বেগম-সাহেবাকে বন্দি করা যায় তাহলে নবাবকে কজা করা যাবে। বর্গীনায়েক একদল দক্ষ সেনা নিয়ে রণস্থল এড়িয়ে এগিয়ে চলল নবাবের অস্থায়ী ছাউনির দিকে। বর্গী নায়েকের এই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন নবাবের একজন সেনানায়েক, ওমর খাঁ। তিনি তরিংগতি তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন বেগম-সাহেবাকে স্থানান্তরিত করতে। সৌভাগ্যক্রমে বেগমের হেপাজতে ছিল একটি প্রকাণ্ড রণহস্তী—‘লণ্ডা’ তার নাম। বেগম একাকী পলায়ন করতে অস্বীকৃতি হলেন। তখন ওমর খাঁর পুত্র মোসাহেব খাঁ বেগম-সাহেবাকে হাওদায় উঠিয়ে স্বয়ং হস্তী পরিচালিত করে ঐ প্রকাণ্ড রণহস্তীর মারফতেই মারাঠা আশ্বারোহীদেরকে পর্যুদস্ত করেন।^১

নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপে নবাব-বেগমের সহিত গাঢ়ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। পত্নীর এই অসাধারণ প্রতিভার জন্য আলিবর্দী খাঁ রাজধানী হইতে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে অনেক সময়ে বেগমের প্রতি রাজকার্যের দায়িত্ব প্রদান করিতেন। তজ্জন্য তিনি বাদশাহ-দরবার হইতে বিশেষ আদেশ লইয়াছিলেন।^২

আলিবর্দীর মৃত্যুসময় বেগম-সাহেবার বয়স প্রায় ষাটযাত্রী। তার পূর্বেই তাঁর তিন কন্যা বিধবা হয়েছে। বড় মেয়ে ঘসেটী-বেগমের নিজের কোন সন্তান ছিল না। সিরাজের ছোট ভাই আক্রামউল্লাকে তিনি পুষ্টি নিয়েছিলেন। আলিবর্দীর পর ঐ আক্রামকে শিখণ্ডী করে পর্দানবাসী অবস্থায় বাঙলা শাসনের স্বপ্ন দেখছিলেন ঘসেটী। দুর্ভাগ্যক্রমে আক্রাম বসন্ত-রোগে বেমক্লা মারা গেল। তার শোকে কিছু দিনের মধ্যেই ঘসেটীর স্বামী নোয়াজিশ খাঁও মারা গেলেন। তার দু-মাস যেতে না যেতে মেজো মেয়ে হল বিধবা। বছর না ঘুরতে বেগম-সাহেবা নিজেই বিধবা হয়ে গেলেন।

চৌদ্দমাস নবাবী করে সিরাজ ফৌজ হল পলাশী-প্রান্তরে যৌথ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে। নিখিলনাথ সক্ষেদে লিখছেন—

যে বেগমের পরামর্শে নবাব আলিবর্দী খাঁ সমস্ত রাজনৈতিক কার্য সম্পন্ন করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শবলে নবাব আলিবর্দী খাঁর আদর্শ-শাসনে বঙ্গের প্রজাগণ বিদ্রোহের মধ্যেও শক্তিশাল্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে অতুলনীয় রমণীরদ্বারা দেশীয় ও বিদেশীগণ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন, তাঁহারই অগ্নে ও সংসারে প্রতীপালিত হইয়া

১) রিয়াজ-উস-সালাতিন, পৃঃ 339.

২) মুর্শিদাবাদ কাহিনী/নিখিলনাথ রায়/পৃঃ 85.

মুর্শিদাবাদ

মীরজাফরের পুত্র 'ছোট-নবাব' মীরন তাঁহার প্রতি যেকপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে গেলে, দুঃখে ও ঘৃণায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আলিবর্দীর বেগম ও তাঁহার কন্যাদ্বয় ঘসেটী ও আমিনা এবং সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে অযথা কষ্ট প্রদান করিয়া বন্দীভাবে রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় তাঁহারা চূড়ান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিলে, তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকায় নির্বাসিত করা হইল।^১

ঢাকায় তাঁদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় বাস করতে হয়েছিল। মীরন ঐ সময় ঢাকার নায়েব যেশারৎ খাঁকে নির্দেশ পাঠায় ঐ মহিলাবৃন্দকে গোপনে হত্যা করতে। যেশারৎ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে স্বীকৃত না হওয়ায় মীরন তার একজন বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্রকে মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়। তারই বন্দোবস্তে ঘসেটী আর আমিনা বেগমকে নৌকা থেকে নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। নবাব আলিবর্দীর বেগম ও সকন্যা নবাব সিরাজের বেগম নিতান্ত ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়ে যান।^২

পরে দুই জমানার দুই ফার্স্ট-লেডি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসার সৌজন্যলাভ করেন লর্ড ক্লাইভের হস্তক্ষেপের ফলে।^৩

একটি সূত্রে দেখছি 1765 সালেও শরফ-উননিসা জীবিত ছিলেন। তাহলে তাঁর বয়স তখন উন-আশি। আর কোনও খবর পাইনি। বছর দশেক আগে শিল্পী ইন্দ্রদুগার, শিল্পী রথীন মৈত্র এবং শিল্পরসিক দ্বিজেন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। নবাব আলিবর্দীর সমাধির নিচের দিকে একটি সমাধি দেখিয়ে স্থানীয় রক্ষক বলেছিল সেটি আলিবর্দী-মহিষীর কবর। উর্দু-হরফে কী লেখা ছিল পড়তে পারিনি, তবে তথ্যটা মনে নিতে অসুবিধা হয়নি। এমন সত্যিসাধীর ঠাই আর কোথায় হতে পারে? তার একটি স্কেচও করে এনেছিলাম মনে আছে।

এ বিশাল উপন্যাসটি যে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছি তার পৃথক পৃথক নামকরণও করা গেছে। বর্তমান পর্বের নামঃ 'সতী'। সে প্রসঙ্গে তো এখনো আসা হয়নি। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এবার আমাদের ত্রিবেণী যাবার সময় হয়েছে, তাই মুর্শিদাবাদের 'সতী'-র কাহিনীটা এবার সেরে নেওয়া উচিত।



১) মুর্শিদাবাদ কাহিনী/নিখিলনাথ রায়/পৃঃ ৪৭.

২) Holwell's India Tracts, pp—40-42, as also Vansittart's Narrative, Vol. I, p. 153.

৩) 'Sharaf-un-nisa and Lutf-un-nisa'; and the latter's young daughter escaped the violent watery grave which ended the sorrows of Ghasiti and Aminah. They were released through the exertions of Lord Clive, the Governor of Bengal and came back to Murshidabad." Begams of Bengal, Brajendranath Banerji, pp. 36.

ঋষি গৌতম সত্যকামকে বলেছিলেন, ‘তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।’ পাণ্ডবাগ্ৰজ মহাবীর কর্ণও বলেছিলেন মানুষের জন্ম দৈবায়ত্ত, শুধু কর্মেই তার অধিকার। আমরা মুর্শিদাবাদের যে মহিমময়ীর কথা এবার আলোচনা করব সে সেই অর্থেই: ‘সতী’!

তার পিতৃপরিচয় নেই, হয়তো পতিতালয়েই তার জন্ম; মৃত স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে জীবন্তে অগ্নিশুদ্ধও হয়নি মেয়েটি। তার সম্বন্ধে নানা গুজব। না! তাকে নিয়ে গল্প ফাঁদব না। ইতিহাস হাংড়ে ঠিক যেটুকু পেয়েছি—নিরপেক্ষ তথ্যসম্ভারীর মতো, শুধু সেটুকুই তোমাদের কাছে পেশ করব। কারণ তাকে নিয়ে অনেকেই অনেক ছবি ঝুঁকছেন—নবীন সেন-এর পলাশীর যুদ্ধ, ডি.এল. রায়ের ‘বঙ্গে বর্গী’, শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদৌলা’য় তা হয়েছে সর্বত্রই স্বনামে নয় অবশ্য। তবে নারীচরিত্রগুলি তারই জীবনের উপাদানে গঠিত। আমি সিরাজের বেগম-এর কথা বলছি লুৎফ-উন্নিসা।

সিরাজের কয়জন স্ত্রী তা নিয়ে নানামুনির নানামত। নথীপত্র ঘেঁটে আমাদের মনে হয়েছে আইনসম্মতভাবে দাদুর মতো নাতিও ‘একপত্নিক’! মৌলভী ডেকে কলমা পড়ে একবারই সিরাজ বিবাহ করেছিলেন। আলিবর্দীর ইচ্ছা ছিল তাঁর দাদা হাজী আহম্মদের দৌহিত্রী, অর্থাৎ আতাউল্লা খাঁর কন্যার সঙ্গে দাদুভাই-এর সাদীর এত্তেজাম করবেন। কিন্তু আল্লারসুলের মর্জি তা নয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগেই হতভাগিনী ফৌত হল। তখন বাধ্য হয়ে আলিবর্দী তাঁর বিশিষ্ট অমাত্য মর্জা ইরাজ খাঁর কন্যা ওমজাৎ উন্ন-নিসার সঙ্গে সিরাজের সাদী দেন। এই বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। তিন দিন ধরে মুর্শিদাবাদে আতসবাতি পুড়তে থাকে। মুতাক্করীনে সে বিবাহ-উৎসব বিস্তারিতরূপে বর্ণিত। সমকালীন ইতিহাসে সিরাজের দ্বিতীয়বার আনুষ্ঠানিক বিবাহের কোনও বিবরণ পাইনি। আন্দাজ হয়, দুজনে প্রায় সমবয়সী ছিলেন। বিবাহকালে তাঁদের বয়স চৌদ্দ-পনের। ওমজাৎ-উন্ন-নিসার সন্তানাদি কী হয়েছিল তার হক-হদিস পাইনি, কিন্তু তিনি যে নিঃসন্তান ছিলেন না, তার একটি প্রমাণ পেয়েছি। কারণ ইংরাজ-সরকারের দৃষ্টিতে তিনিই সিরাজের আইনসম্মত বেগম—সবচেয়ে বেশি মাসোহারা পাওয়ার হক্কারগী। Board of Revenue-এর Proceeding-এ 1780 খ্রীষ্টাব্দে দেখছি লেখা আছে “Miscellaneous Indend—Jageer, Jessore. Application from Umdat-ul Nissa Begam, daughter of Mirza or Nabab Muhomed Ariffee Kawn or Eratch Khan, and widow of Seroje-ul-dowlah, for continuance to her the jageers ... on the applicant's claim with a list of the family ... including the daughters of the Nabab for the support of ...”

এই সূত্র থেকেই অনুমান করছি, ওমদাৎ উন্ন-নিসার গর্ভে সিরাজের দু-একটি কন্যা সম্ভান জন্ম গ্রহণ করেছিল। ওমদাদের সমাধি খোসবাগে আছে।

এই আইনসম্মত বর্ণপত্নী ব্যতিরেকে সিরাজের পর্যায়ক্রম শয্যা-সঙ্গিনী হিসাবে আরও তিনটি রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তার ভিতর অগম্যলো কীং ফেজী ফয়জান্নের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। বাকি রইল দুজন। অনেকের সন্দেহ এই দুইজন এক এবং দুইজন। আমরা দুই তরফের যুগ্মেই বিচার করে দেখব। একজন লুৎফ উন্ন-নিসা, অপরিচিত মোহনলালের ভগিনী। বেভারিজ তো ভুল করে লুৎফ উন্ন-নিসা এবং ওমদাৎ উন্ন-নিসাকেই অভিন্ন বলে ধরে

নিরেছিলেন। নিখিলনাথ যুক্তি দিয়ে সে ভ্রান্তি অপনোদন করেছেন (পৃঃ 118-19) কিন্তু মোহনলালের ভাগিনী আর লুৎফ-উননেসা যে পৃথক এটা প্রমাণিত হয়নি।

নিখিলনাথ বলছেন, মূল সাযর মুতাক্করীনে লুৎফ উম্মেসাকে সিরাজের জারিয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (মূল মুতাক্করীনে ১৮১ পৃঃ)। জারিয়া শব্দে ক্রীতদাসী বুঝায়; কিন্তু জারিয়াগণ নিতান্ত হীনভাবের দাসী নহে। তাহারা যে সংসারে প্রবৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভাৰ্য্যাক্রূপে গ্রহণ করিতে পারেন। মুতাক্করীনের ইংরেজী অনুবাদক জারিয়াকে Bond-maid বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, (Mutaqherin Eng. Trans., Vol I., p. 614).

এই তথ্যসূত্র অনুসারে লুৎফ উননেসা বাল্যে অথবা কিশোরী বয়সে ক্রীতদাসীরূপে নবাব আলিবর্দীর হারেমে প্রবেশ করে। আন্দাজে মনে হয়, সিরাজের চেয়ে বয়সে সে রহুর চার-পাঁচের ছোট। সুতরাং লুৎফ-উননেসা যখন রাজাস্তঃপুরে বয়ঃসন্ধি অতিক্রমণে পূর্ণ যুবতী হয়ে ওঠে তার পূর্বেই সিরাজ বিবাহিত, হয়তো ফৈজী-ফয়জান নিহত! লুৎফও অসামান্য সুন্দরী। ফৈজীর মৃত্যুতে সিরাজের হৃদয়ও তখন শূন্য! আবার নিখিলনাথের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার শরণাপন্ন হতে হল—

লুৎফ উম্মেসার প্রতি সিরাজের অধিকতর ভালবাসার আর একটি কারণ ছিল। সিরাজ কোন একটি রমণীর সৌন্দর্যতরঙ্গে একবার আপনাকে ভাসাইয়াছিলেন। রূপে পাগল হইয়া যাহাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দান করেন, সে কিন্তু ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। এই রমণীর নাম ফৈজী ফয়জান ... ফৈজীর বিশ্বাসঘাতকতায় রমণীজাতির উপর সিরাজের আন্তরিক ঘৃণা উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি যখন লুৎফ উম্মেসার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন যে, সে হৃদয় অটল! তাহার প্রবাহ কেবল একই দিকে প্রবাহিত হয়। ফৈজীর হৃদয় যেরূপ পৈশাচিক, লুৎফ উম্মেসার হৃদয় তদোধিক পবিত্র; তাই লুৎফ উম্মেসার প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনিই সিরাজের প্রিয়তমা মহিষী বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। (পৃঃ 116-18)

আমরা কিন্তু এখানে নিখিলনাথের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। না! কী কারণে লুৎফ সিরাজের প্রিয়তমা মহিষী হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে মহাপণ্ডিতের বিশ্লেষণে আমাদের আপত্তি নেই; কিন্তু প্রসঙ্গত তিনি ফৈজী ফয়জানের বিষয়ে যে বিশেষণ ও মন্তব্য আরোপ করেছেন সেখানেই আমাদের আপত্তি তবে নিখিলনাথকেও পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দাঁড়িয়ে—তাঁর ঐ কথা মনে হতে পারে বটে। ওটা কালের দোষ!

কিন্তু আজ এই নারী প্রগতির যুগে আমরা কী দেখছি? ফৈজী কেন বিশ্বাসহীনা? যে হেতু সিরাজ তার পূর্বতন মালিককে লক্ষ ভস্মা দাম মিটিয়ে দিয়েছিল, তাই নাকি উপপত্নীকে দামী-দামী অলঙ্কার কিনে দিয়েছিল বলে? শরফ-উননেসা যদি আলিবর্দীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেন তাহলে সে-কথা উঠতে পারত, কারণ নবাব আলিবর্দী সমস্ত জীবনভর দ্বিতীয় কোনও রমণীকে বক্ষে ধারণ করেননি। কিন্তু সিরাজ? একাধিক পোষা পাখি ছিল তার। লাখটাকা খরচ

করে আরও একটা ময়না পুষেছিল সে; ময়নাও প্রতিরাত্রে যথারীতি ‘রাধাকৃষ্ণ’ বুলি কপচেছে; ‘গাঙ্গা কৃষ্ণভক্তি সিরাজ আশা করে কোন দাবীতে? না, ফৈজীর হৃদয়ের ভালবাসা ‘পৈশাচিক’ ছিল না।

অর্থমূল্যে যে নবাবজাদা তার দেহটা কিনেছে তাকে দেহ দিতেতো সে কার্পন্যে করেনি; কিন্তু যে মুঞ্চ-শ্রমর ওর নারী-হৃদয়টিকে বিনামূল্যে কিনে নিয়েছিল তার প্রতি তো সে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। প্রেমের অমর্যাদা করে প্রাণভয়ে ক্ষমাভিক্ষা চায়নি একবারও! মাথা খাড়া রেখে মৃত্যুবরণ করেছিল।

না, নিখিলনাথদাদু, আমরা জানি : অর্থমূল্যে নারী-দেহ আজও বিক্রীত হয়, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস : নারীর সাক্ষাৎ প্রেম আনমোলমোত্তি, কোন যুগেই তা ‘বিক্রীত’ও হয় না, ‘বিকৃত’ও হয় না।



লুৎফ-এর কথায় ফিরে আসি।

আমাদের অনুমান, এটা ওর পিতৃদত্ত নাম নয়। কেন? কারণ ‘লুৎফ’ মানে প্রেম; ‘উন্’ বোঝায় সেরা-মাত্রা; superlative degree. আর ‘নেসা’ হচ্ছে পত্নী। ফলে ‘লুৎফ-উন্নেসা’ অর্থে ‘প্রিয়তমা পত্নী’। ইতিহাস সিরাজের এই প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীকে সর্বত্র বলেছে লুৎফ-উন্নেসা। শুধু ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে সে ‘আলেয়া’।

‘নাম’ হচ্ছে ‘রাপের’ সংজ্ঞা। কী দার্শনিকদের ‘দর্শনে’, কী চক্ষুস্থানদের ‘দর্শনে’। কিন্তু ‘নাম’ বলতে আরও একটা জিনিস তো বোঝায়! যেটা সদ্যোজাত লাভ করে—বাপ-মা-দাদু-দিদা, নেহাৎ সমকালীন কবি-সাহিত্যিকের কাছ থেকে। আমাদের ধারণা, সিরাজের এই ‘প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী’র সেই অর্থে নামটা ছিল না : ‘লুৎফ উন্নেসা’।

স্বীকার করি, এর পশ্চাতে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য আমরা দাখিল করতে পারছি না। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, এটা সিরাজের দেওয়া আদরের ডাক, যা ইতিহাস মেনে নিয়েছে। সদ্যোজাত সন্তানের নাম কি কেউ দেয় : প্রেয়সী?

তাহলে কী দাঁড়ালো?

সিরাজের ঐ প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর পিতৃদত্ত নামটা পাওয়া যাচ্ছে না।

আশ্চর্যের কথা, মোহনলালের ভগিনীর নামটাও ইতিহাসে ঝুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! না তার পিতৃদত্ত নাম, প্রাকবিবাহ সংজ্ঞা, না সিরাজ-হারেমে প্রবেশ করার পর।

দ্বিতীয়ত মোহনলাল যে স্বীয় ভগিনীকে সিরাজকে উপহার দিয়েছিলেন, নিখিলনাথের বিশ্বাস “ইহা ইংরেজী অনুবাদকের কথা। আমরা মূল মুতাক্করীনে তাঁহার কোন উল্লেখ দেখিতে

পাই না।” ইংরেজী অনুবাদে পাচ্ছি “This Mohonlal had made present of his sister to Seradjeddoulah which sister was a true Indian beauty; smart and delicate. Nothing is more common amongst Indians, when they want to give an idea of surpassing beauty, than to say : *when she ate paan you might have seen through her skin the coloured liquid run down her throat and she was so delicate, as to weigh only twenty-two seers (about fifty lbs averdupois), which, by the by : was, they say, the weight of that beloved girl, which Seradj-eddoulah ordered to be immured alive.*” ২

মুতাক্করীনের সাতশ সতের পাতায় মোহনলালের ভগিনীর এই রূপ বর্ণনার এবার পাঠ কর ছয়শ’ চৌদ্দ পৃষ্ঠায় ফৈজী ফয়জানের রূপবর্ণনা :

She was, says the amorous chronicle of that capital, complete Indian beauty of that right golden hue, so much coveted all over that region, and of that delicacy of person, which weighs only two and twenty seers, or about fifty pounds averdupois; a small delicate woman with a cool retract being the *summum bonum* of an Indian. This last girl, Faizy, had been a knecheni (dance-girl) at Delhi, from where *her attendance had been supplicated* (and this was the expression used), at the court of Moorshoodabad, the request being accompanied by no less than a draught of one lac of rupees” ৩

এই দুটি বর্ণনা লক্ষ্য করে নিখিলনাথ বলছেন,

মুতাক্করীনের অনুবাদকের মতে ফৈজী ও মোহনলালের ভগিনী স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ কিন্তু দুইজনের রূপবর্ণনা ও কৃশাঙ্গত্ব একই হওয়ায় দুই জনকে অভিন্ন মনে করা অসঙ্গত নহে। কেবল রূপবর্ণনা ও কৃশাঙ্গের কথা হইলে আমরা যথেষ্ট মনে না। কিন্তু দুই জনেরই ওজন যখন বাইশ সের বলিয়া উল্লিখিত, তখন সেই ধারণা প্রবল হইয়া উঠে। কৃশাঙ্গত্ব ভারতবর্ষে সৌন্দর্যের পরিচায়ক বটে, কিন্তু ঠিক সের’ ওজন যে প্রতিটি নারীর সৌন্দর্যের লক্ষণ, তাহা তো কখনো শুনা যায় কথাটা ভাববার!

তাছাড়া আরও একটা কথা। ওমদাদ-উয়েসার কবর আছে, লুৎফ উয়েসার কবর ‘দুজনেই সিরাজের মৃত্যুকালে জীবিত। ফৈজী ফয়জানের মৃত্যু সিরাজের জীবিতকালে।

১) নিখিলনাথ, পৃ 117.

২) Muaqherin, Vol I, Note P: 717.

৩) Mutaqherin, Vol. I. Note, p. 614.

ভগিনী? তার আদিও নেই অন্তও নেই—আছে যৌবনকালের উপস্থিতিটুকু!

নামহারা!

তোমরা আমাকে একটা পরামর্শ দেবে, দিদিভাইয়ের দল? গল্পেটা যদি এইভাবে ফাঁদি? মোহনলাল একজন বঙ্গ কায়স্থ। বাড়ি পুরুলিয়া, বীরভূম অঞ্চলে। সে যখন কিশোর তখন ছোট বোনটিকে বর্গী দস্যুরা হরণ করে নিয়ে যায়, কিশোরী কিশা বালিকা বয়সেই।

মেয়েটি কোনক্রমে গ্রামে ফিরে আসে; কিন্তু সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়।

ক্ষোভে দূরত্বে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যায় মুর্শিদাবাদে, নাম লেখায় নবাবী ফৌজে।

এ পর্যন্ত নাট্যকার ডি. এল. রায় আমাদের স্বপক্ষে।) খবর পায় না, হাত-ফিরি হতে হতে তার সামান্য রূপবতী ভগিনীটি গিয়ে উপনীত হয়েছে দিল্লীর রণ্ডি-বাজারে। সিরাজের হারেমে

আবিষ্কার করে শুভিত হয়ে যায়। অর্থাৎ ফৈজী ফয়জানই মোহনলালের ভগিনী। এক

আমরা তাহলে তিন-তিনটে সমস্যা-পাখিকে মেরেছি: কেন মোহনলাল ভগিনীর নাম

যাচ্ছে না, কেন তার শেষ পরিণতি জানা যাচ্ছে না, কেন সিরাজ মোহনলালের

উপপত্নী করে রাখা সত্ত্বেও মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে সিরাজপক্ষে অটল ছিলেন।

কিন্তু না! একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে! ফৈজী ফয়জানের ঐ অমানুষিক হত্যার পরেও কি

অনুগত্য অটুট থাকতে পারে?

তার চেয়ে বরং সহজতর হবে দ্বিতীয় বিকল্প মতটা মেনে নেওয়া:

বেভারিজের মতে লুৎফউল্লাহ হিন্দুরমণী—মোহনলালের ভগিনী। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রক্বী খাঁ বাহাদুরেরও এই মত। মুতাক্করীনে কিন্তু লুৎফ উল্লাহ জারিয়া অর্থাৎ ক্রীতদাসী বলিয়া অভিহিত—রিয়াজুস সালাতীন নামক গ্রন্থে মোহনলালকে কায়স্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইতে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন কিনা বুঝা যায় না।

এতক্ষণে সমাধানে পৌছানো গেছে। আমাদের ইকোয়েশনটা হচ্ছে লুৎফা = মোহনলালের হ্যাঁ, সে ক্রীতদাসী তো বটেই! দস্যুদ্বারা অপহৃত এবং সমাজ দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা এতক্ষণে মোহনলালের ভগিনীর নাম, তার অস্তিত্ব গতি সব জানা গেছে। নিজ সিরাজের উপপত্নীরূপে দেখা সত্ত্বেও কোন্ দুর্ভাগ্য হেতুতে মোহনলাল আজীবন লড়াই করে গেল তাও বোঝা যাচ্ছে! আমার হাতে সময় নেই, এই ঐতিহাসিক প্লটটা তোমাদের উপহার দিলাম। দেখ কিছু খাড়া করতে পার কিনা!

সিরাজের এই প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী সূর্যমুখী ফুলের মতো সর্বক্ষণ একমুখী। উদয়াচলে সিরাজ যখন ফৈজীর প্রেমে বার্লুক-রক্তিম, তখন ঐ সূর্যমুখী ছিল কুঁড়ি। সিরাজ যখন যৌবনের মধ্যগগনে তখন তার চোখ ঝাঁপিয়ে গেছিল দ্বিপ্রহরের মার্জওতেজে। তারপর যখন সেই

চলে পড়লেন পশ্চিম গগনে, একে-একে সব সুদিনের বন্ধু তাঁকে ত্যাগ করে গেল—সেই যখন পলাশীর প্রান্তর থেকে বিশ্বাসঘাতক মীরজাঁফর আলির বক্ষবিদ্ধ খঞ্জরখানা ধরে মানসিক রক্তক্ষরণে অসুস্থ নবাব ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে, তখনো সে তাঁর পাশে।

কোন কোন বিশ্বাসী বন্ধুর কথায় সিরাজ একবার নগররক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

আবার বিশ্বাসঘাতকেরা পরামর্শ দিল—পলায়ন কর, নতুন তোমার নিস্তার নাই।

খুশবান

সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য অনেককেই করিলেন।... কেহই তাঁর সেই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এমন কি তাঁহার পর্যন্ত তাঁহার সহিত একপদ গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না।^১

গভীর রাতে সিরাজ একাকী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ তরবারি — দাদু-সাহেবের দেওয়া উপহার। তখন সেই ঘনাক্ষরে কে-যেন নবাবের হাতখানি চেপে ধরল। সিরাজ দেখলেন লুৎফ। ক্রোড়ে নিদ্রাগত চার-বছরের শিশুকন্যা জহুরা!

নৌকাযোগে ওঁরা রাজমহলের কাছাকাছি পৌঁছান। বস্তুত তিন দিন তিন রাত্রি ওঁরা অভুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে ঘাটে নৌকা লাগিয়ে সিরাজ স্থানীয় দোকান থেকে কিছু চাল-ডাল-নুন কিনে আনতে যান। লুৎফ নদীতীরে ইটের সাহায্যে একটি উনান বানিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন দানাসাহ নামে এক ফকির নবাবকে চিনে ফেলে। গোপনে মীরজাফরের জামাতাকে খবর পাঠায়। সিরাজ সপরিবারে ধৃত হন। মুর্শিদাবাদে নীত হওয়ার পর মীরনের আদেশে মহম্মদী বেগ সিরাজের শিরশ্ছেদ করে। নবাব নাকি মৃত্যু-মুহুর্তে ঐ মহম্মদী বেগ-এর কাছে একটি অস্তিম আর্জি পেশ করেছিলেন — অজু করে শেষবারের মতো নামাজ পড়ার অনুমতি। মহম্মদী বেগ নবাবের এ আর্জি খারিজ করে ঋণ্ণাঘাত করে।

তারিখটা: দোশরা জুলাই, 1757.

পরদিন একটি হাতির পিঠে সিরাজের মৃতদেহ চড়িয়ে সমস্ত মুর্শিদাবাদ শহরটা পরিক্রমা করানো হয়। মীরন না মীরজাফর কার হুকুমে জানা যায় না, উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। সিরাজ-সমর্থকেরা স্বচক্ষে দেখে নিক লোকটা ফৌত হয়েছে।

হাতি চলেছে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। তিন বছর আগে ঠিক এইখানেই সিরাজ হোসেন কুলী থাকে খুন করিয়েছিলেন। লোকে সভয়ে তাকিয়ে দেখল, সিরাজের দেহ থেকে দু-ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে এসে সেইখানকার মাটিতে পড়ল।^২

গজায়ুবর্দ-সংহিতায় বলা হয়েছে হাতির স্মৃতিশক্তি বিস্ময়কর। তিন বছর পরে রাজপথের সেই চিহ্নিত স্থানটি চিনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়, যদি ধরে নিই হোসেন কুলীর সঙ্গে তার দোষ্টি ছিল। কিন্তু মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা পরে মৃতদেহ থেকে দু-ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে একথা চরক- সূত্রত কি কোথাও বলেছেন?

তারপর হাতিটাকে নিয়ে যাওয়া হল সিরাজের বাড়ির সমুখে। তিন বিধবাকে দৃশ্যট দেখাতে — লুৎফ-উননেসা, আমিনা-বেগম আর আলিবর্দী-মহিষী বৃদ্ধ শরফ-উননেসা শেবোক্তের অগ্নেই মীরন প্রতিপালিত। স্ত্রী, মা, আর দিদা। এদের মধ্যে কে করেছিলেন, কে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, কে বে—পর্দা হয়ে পড়েন তার ঠিক ইতিহাসে লেখা নেই। অতঃপর সিরাজের মৃতদেহটা বাজারে চকের সামনে ঝুঁড়ে ফেলা হল।

১) মুর্শিদাবাদ কাহিনী/নিখিলনাথ রায়/পৃ: 122.

২) পলাশীর যুদ্ধ/তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়/পৃ: 184

মীর্জা জৈন-উল-আবেদীন নামে এক ওমরাহ সাহস করে এগিয়ে এলেন। নিজ ব্যয়ে প্রাক্তন নবাবের দেহটা প্রাক্তনতর নবাবের সমাধির পাশে গোর দেবার ব্যবস্থা করলেন। খুশবাগে, দাদু আর নাতি পাশাপাশি এতদিনে নিশ্চিন্ত হয়ে পশ্চিমদিকে মুখ করে শুয়ে আছেন। বর্গী অথবা বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কজার বাইরে।

মীরজাফর হল নয়-নবাব। ক্লাইভের হুকুমে চলতে হত বলে লোকে আড়ালে তাকে যে খেতাবটা দিয়েছিল সেটাও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখেছেঃ ক্লাইভের গাথা। সে মসনদে চড়ে বসার পর 'ছোট-নবাবসাব'—মীরন, লুৎফ উন্নিসার কাছে দূতী প্রেরণ করে, নিকার বিনীত প্রস্তাব। শোনা যায়, লুৎফ উন্নিসা অকুতোভয়ে দূতীকে জানায়, তোমার মালিককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল, চিরটাকাল যে হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে কাটিয়েছে সে কি আজ গাধার বাচ্চার পিঠে চাপতে পারে? ছিঃ!

মীরনের ক্ষমতা ছিল, না লুৎফ-এর ঘরের জানলা-দরজাগুলো পাকা ইট গোঁথে বন্ধ করে দেবার; কারণ তার বাপের গদী ততক্ষণে টলমল করতে শুরু করেছে। অনেক অনেক ঘুষের ঢাকা দেওয়া যে বাকি!

এরপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (1790) লুৎফ-উন্নিসা বেগম-সাহেবা প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিরাজের কবরের উপর একটি করে চিরাগ জ্বালিয়ে যেতেন, ক্লাইভের হস্তক্ষেপে ঢাকা থেকে যখন মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন অতি বৃদ্ধা দিদি-শাস্ত্রীর সাথে। 1782 সালে একত্রিশে আগষ্ট তারিখে ফর্সটার নামে একজন ইংরেজের লেখা একটি চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে; তিনি বিলাতে তাঁর স্ত্রীকে লিখছেন^১, সন্ধ্যাবেলা তিনি প্রাক্তন নবাবের সমাধি দেখতে গিয়ে হঠাৎ ধমকে গিয়েছিলেন; দূর থেকে নজরে পড়ে পদানতীন এক বৃদ্ধা আর একটি যুবতী চিরাগ হাতে ঐ সমাধির দিকে অগ্রসর হয়ে আসছেন। তাঁদের জীর্ন, ধূলিমলিন বোঝা! তাঁরা কে তা উনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

এর সাত বছর পরে গোলাম মোস্তাফা এক সন্ধ্যায় দৃশ্যটা দেখতে পান, 1789 খৃষ্টাব্দে। সেদিন লুৎফা ছিলেন একল্যা। দূর থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর নজরে পড়ে—সিরাজের জীর্ণ-সমাধি-প্রস্তরের উপর জনৈকা বিধবা লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন।^২

বাল বিখারকে টুটি কব্রোপো

জব কোই মেহেজবীন রোহুতি হয়

মুঝকো অখসর খয়াল আতা হয়:

মৌং কিংনি হাসিন হোতি হয়।^৩

১) *Journey from Bengal to England*, Forster p. 10.

২) *Mutaqherin*, Vol I., p. 643.

৩) 'বিকীর্ণমুখবজা' অবস্থায় ভাঙা কবরের উপর/যখন কোন বিধবা লুটিয়ে পড়ে কাঁদে/আমার তখন।

আহা! মৃত্যু কী সুন্দর।

কদম্ভରୀ

नारায়ण सान्याल

२

RUPAMANJARI. Part II

Rs. 80/-

NARAYAN SANYAL

Published by :

Sudhangshu Sekhar Dey

Dey's Publishing

13, Bankim Chatterjee Street

Calcutta—700 073

রচনাকাল : 1992-1996

প্রথম প্রকাশ :

বইমেলা, মাঘ ১৪০৪

জানুয়ারি 1998

গ্রন্থক্রমিক : 115

প্রকাশক :

সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা—700 073

অলঙ্করণ : সুধীর মৈত্র, লেখক

প্রচ্ছদ : গৌতম দাশগুপ্ত, আলোকচিত্র : বিপুল বসু

ISBN-81-7612-268-8

শব্দসজ্জা :

লেজার ইম্প্রেশন্স, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা—700 004

মুদ্রক :

সপনকুমার দে, দে'জ অফসেট, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা—700 073

প্রুফ নিরীক্ষা : অনূপম ঘোষ

© সবিতা সান্যাল

দাম : ৮০ টাকা

উৎসর্গ

ককণাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীচরণাবিন্দেষু,

নারীজাতিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা করতে তুমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছিলে—তাদের শিক্ষিত করতে, স্বনির্ভর হতে, বৈধব্যযোগের অপরিসীম সামাজিক নির্যাতন থেকে তাদের মুক্তি দিতে। প্রতিদানে সমাজ তোমাকে নানাভাবে অসম্মান করেছে। বাঙ্গ, বিদূষ করেছে।

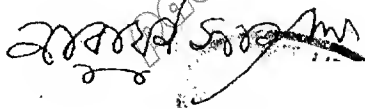
শেষ জীবনে তুমি সাঁওতাল-পরগণার কান্টাচারে অস্ত্রবাসীর একান্তচারী জীবন বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলে।

একশ বছর স্বর্গবাসের পর তুমি কি আমাদের ক্ষমা করতে পেরেছ ?

তাহলে

খুলিধূসরিত বিদ্যাসাগরী চটির প্রান্তে এই অর্ঘ্যটি সমর্পণের সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না।

শ্রদ্ধাবিনয়



নারায়ণ সান্যালের প্রকাশিত গ্রন্থ (পূজা, 1997 পর্যন্ত)

[প্রকাশের ক্রম অনুসারে সজ্জিত। A-R গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সূচক। নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে : (A) শিশু ও কিশোর সাহিত্য; (B) সদাসাধু; (C) না-মানুষ আশ্রয়ী; (D) বিজ্ঞান-আশ্রয়ী; (E) চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য; (F) ভ্রমণ; (G) স্মৃতিচারণধর্মী (H) মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী; (I) প্রয়োগ বিজ্ঞান; (J) গোয়েন্দা; (K) গবেষণাধর্মী; (L) উদ্ধাস্ত-সমস্যা সংক্রান্ত; (M) ইতিহাস-আশ্রয়ী; (N) জীবনী-আশ্রয়ী; (O) দেবদাসী-সম্পর্কিত; (P) নাটক; (Q) সামাজিক উপন্যাস; (R) প্রবন্ধ/কাহিনী সংকলন * তারকা-চিহ্নের নির্দেশ--পাওয়া যায় না; লেখকের ইচ্ছানুসারে পুনর্মুদ্রিত হবে না। ♡ চিহ্নিত বই যুবকগণবর্জিত, নিতান্ত শিশুদের জন্য।]

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. মুশকিল আসান, P | 29. কাকতীর্থ কলিঙ্গ, E |
| 2. বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প, L | 30. গজমুক্তা, C/Q/K |
| 3. বন্ধীক, L | 31. আমি রাসবিহারীকে দেখেছি, N/Q |
| 4. গ্রাম্যবস্তু, B | 32. বিধাসম্বাদক, D/Q/K |
| 5. পুরিকল্পিত পরিবার, B | 33. হে হংসবলাকা, D/K |
| 6. বাস্তববিজ্ঞান, I | 34. সোনার কাঁটা, J |
| 7. ব্রাত্য, Q | 35. মাছের কাঁটা, J |
| 8. দশেমিনি, B | 36. এলীলতার দায়ে, Q/K |
| 9. মনামী, H, Q | 37. লালকিরকোণ, Q/K |
| 10. অরণ্যদগুণ, L/Q | 38. আজি হতে শত বর্ষ পরে, D |
| 11. দণ্ডকশবরী, I/Q | 39. অবাধ পৃথিবী, D/Q |
| 12. Handbook on Estimating, I | 40. নক্ষত্রলোকের দেবতাঘা, D/Q |
| 13. অলকনন্দা, Q | 41. পঞ্চাশেক্ষেপ, G/R |
| 14. মহাকালের মন্দির, M/Q | 42. পথের কাঁটা, J |
| 15. নীলিমায় নীল, Q | 43. চীন-ভারত লগনাই, K/M |
| 16. পথের মহাপ্রাণ, F/K | 44. হংসেশ্বরী, M/N/Q |
| 17. সত্যকাম, Q | 45. পাঁচবোলা স্যার, Q |
| 18. অস্তলীনা, H/Q | 46. ঘড়ির কাঁটা, J |
| 19. অজ্ঞাত অপরাধী, E/F/K | 47. কুণের কাঁটা, P |
| 20. তাজের স্বপ্ন, Q/H | 48. আমন্দ স্বপ্নাঙ্গী, M/N/Q |
| 21. নাগচম্পা, I/Q | 49. কিশোরী, M/M/Q |
| 22. নেতাজী রহস্য সম্বন্ধে, K/F | 50. ডিম-ডিমিডিল, C/K/Q |
| 23. আমি নেতাজীকে দেখেছি, N | 51. কিশোর অমনিবাস, A |
| 24. পাখি পড়িত, Q | 52. ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন, I/K |
| 25. কালোকালা, A | 53. গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা, I |
| 26. শার্লক হোবো, A | 54. গ্রামের বড়ি, I |
| 27. জাপান থেকে ফিরে, I/M/K | 55. অগ্নিগামি, A |
| 28. আবার যদি ইচ্ছা কর, Q/N | 56. লা-জবাব দেহলী, I/K |

57. না-মানুষের পাঁচালী, C/A
58. সূতনুকা একটি দেবদাসীর নাম, O/K
59. সূতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয়, O/Q
60. রাস্কেল, A/C
61. Immortal Ajanta, E/F/K
- *62. Erotica in Indian Temples E/K
63. রোদা, N/M/E/K
64. যটি-একযটি, G
65. মিলনান্তক, Q
66. নাক উচু, A
67. ডিজনেল্যাভ, A/F
68. উলের কাঁটা, J
69. লাডলিবেগন, M/N/Q
70. পূর্ববৈয়া, E/N/Q
71. প্রবঞ্চক, E/N/Q
72. অ-আ-ক-খনের কাঁটা, J
73. পরোমুখম, K/F
74. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'-এক, C/K/D/A
75. অচ্ছেদ্যবন্ধন, Q
76. না-মানুষের কাহিনী, A/C
77. সারমের গেলুকের কাঁটা, J
78. ছয়তানের ছাওয়াপ, Q
- ψ 79. হাতি আর হাতি, A
80. আবার সে এসেছে ফিরিয়া, G/K
81. হোঁবল, Q
82. রূপমঞ্জরী-এক, Q/N/K
83. না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'-দুই, C/K/D/A
84. কাঁটায়-কাঁটায়, এক, J

85. কাঁটায় কাঁটায়, দুই, J
- ψ 86. পাছ-মা, A
87. মন মানে কচু, Q
88. আতপালী, Q
89. স্বর্গীয় নরকের দ্বার, R/K/E
90. লেখনীদের নোটবই, R/K/E
91. এসনটা তো হয়েই থাকে, Q/M
92. রিস্তেদারের কাঁটা, J
93. কৌতুহলী কনের কাঁটা, J
94. যাদু এ তো বড় রসের কাঁটা, J
95. অভি-নী-অল-এর কাঁটা, J
96. নায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা, J
97. দি-বৈবাহিক কাঁটা, J
98. যনদুয়ারে গড়ল কাঁটা, J
99. বাস্তুশিল্প, I
100. এক. দুই.. তিন..., P/K
101. রানী হওয়া, Q
102. হিন্দু না ওরা মুসলিম, Q/K
103. কাঁটায়-কাঁটায়-তিন, J
104. বিয়ের কাঁটা, J
105. স্বনির্বাচিত সেরা গল্প, R
106. খোলামনে, R
107. 'বুলাডোজার লেডি', K/R/N/Q
108. খাঁওবদাহন, G/K
109. দেবদাসী সূতনুকা, O
- ψ 110. সবাই ভাল, A
- ψ 111. কড়ুর ও থুফুনা A

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি : অত্যন্ত অন্যায্য হয়ে গেছে। এই দ্বিতীয়খণ্ডটা প্রকাশ করতে প্রচুর দেরি হয়ে গেল। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল নব্বই সালে— আটবছর আগে। প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ-ক্রমিক সংখ্যা ছিল বিরাশি; তারপর খানকিশেক বই ছাপা হয়ে গেছে — রূপমঞ্জরীর দ্বিতীয় খণ্ডটা প্রকাশিত হয়নি। অমার্জনীয় অপরাধ। তবে একথাও বলব, এজন্য শাস্তিও বড় কম পাইনি। পথঘাটে যত্নতত্র এ জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। প্রথম ধমক খেয়েছিলাম পুত্রের কাছে। বইটা তাকে ‘বুকপোস্টে’ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পড়ে সে জবাবে লিখেছিল, “তুমি তো আচ্ছা মানুষ! পাঠকের কাছ থেকে নগদ আশিটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে অস্নানবদনে বলেছ: পড়ুন, পড়ুন। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন। আর গল্পটা? সেটা পরে বলব।— ভিউ-পার্ট-এ।”

ইদানিং পথ-ঘাটে কত লোক যে তাগাদ দিয়েছে তার আর লেখাজোখা নেই। আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলতে চেয়েছি, ‘দেখুন, হটি বা হট বিদ্যালঙ্কার, অর্থাৎ বাস্তব রূপমঞ্জরীর জীবনে কী ঘটেছিল সেটুকু তো আমি প্রথমখণ্ডেই জানিয়ে দিয়েছি’। এ মেয়েটি তো আমার আত্মজা—

শ্রোতা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ধমকে উঠেছে, নেই অধিকারে গল্পটা আপনি শেষ করবেন না? এটা কেমন যুক্তি?

কেউ জানতে চেয়েছেন : ‘আমাদের জিজ্ঞাস্য রূপমঞ্জরী কোন সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন? ‘রূপমতী’র মতো আত্মহননের পথ, না কি সত্যবর্তীর মতো স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ধর্মিতা হওয়া?’

কেউ বললেন, ব্যাসকামীতে ত্রৈলোক্যমী হটী বিদ্যালঙ্কারকে হঠাৎ ও-কথা বললেন কেন?

‘জীবাত্মাকে বন্দী করে রাখতে নেই— মুক্ত নীলাকাশের দিকে, পরমাত্মার দিকে মিস্ত্রিত হবার সাধনা তার। ক্যা রে বেটি? কুছ সমঝি?’

হটীর অধিকারে সেই দুর্লভ বিপরীতবর্ত শব্দটাই বা এল যেমন করে? স্বীকার অর্থ, তা তো এখনো অনুল্লভ?

আবার একজন পাঠক প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রথম খণ্ডের কৈফিয়তে আপনি লিখেছিলেন, “ঐতিহাসিক চরিত্রের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় কল্পনার আশ্রয় নিরেছি তা গ্রন্থমধ্যেই স্বীকার করা গেছে। যেমন ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রাধার প্রথম সাক্ষাৎ, রামপ্রসাদের বাগানের বেড়াবাঁধার প্রসঙ্গ, অথবা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পরিবারে সতীদাহ।”— এই শেবোক্ত বিষয়টি গ্রন্থমধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না কিন্তু

সবিনয়ে অপরাধ স্বীকার করছি। কৈফিয়তে আমি আরও বলেছিলাম “আলোকচিত্রগুলি কোথা থেকে সংগৃহীত সে বিষয়ে গ্রন্থশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা গেছে।” দূর্ভাগ্যবশত তা বাস্তবে করা হয়নি। আমি এছাড়াও লিখেছিলাম, অষ্টাদশ শতাব্দীর নারায়ণদাসের আত্মজা

হট্ট এবং সোএগ্রাই গাঁয়ের হট্টা বিদ্যালয়স্বাক্ষরের পূর্ণপরিচয় পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা গেছে, যাতে ঐ দুইজন অসামান্যর বাস্তবজীবনের উপাদানের মিশ্রণে এই বিংশশতাব্দীর নারায়ণদাসের মানসকন্যার জীবনীটা আপনাদের কাছে বিশাসযোগ্য মনে হয়।” সে প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা যায়নি। কিন্তু কেন যায়নি তাও আমি জানিয়ে দিলাম—“ডিসেম্বরের (১৯৪৯) প্রথম সপ্তাহে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। দ্বিতীয়বার নার্সিং হোম থেকে ফিরে আসার পর সিদ্ধান্ত নিতে হল— আপাতত ‘অসমাপ্ত গানে’ই থামতে হবে।”

দ্বিতীয় খণ্ডের কৈফিয়তে যতদূর সম্ভব পাপস্থালন করি:

ব্যাসকাকীতে ত্রৈলোক্যস্বামী বিপরীতবর্তী দুর্লভ শব্দের প্রসঙ্গ কেন তুলেছিলেন সে-কথা এখনো অনুভবই রইল। যেটা তৃতীয় খণ্ডে বোঝা যাবে। তবে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পরিবারে সতীদাহর কথা কেন বলেছিলাম তা এবার নিশ্চয় বোঝা যাবে। হট্টা এবং হট্টা বিদ্যালয়স্বাক্ষরের তথ্যনির্ভর বাস্তব জীবনী এবার পরিশিষ্টে দিলাম। সেটুকুই প্রামাণ্য ইতিহাস। প্রথম খণ্ডের আলোকচিত্রগুলি ইস্টার্ন রেলওয়ে কর্তৃক চল্লিশের দশকে প্রকাশিত ‘বাল্যায় ভ্রমণ’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত; শুধু দুটি মাত্র আলোকচিত্র—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ধানে পাওয়া জগদ্ধাত্রী-মূর্তি’ (পৃ: ২৬৩) এবং ‘কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পূজামণ্ডপে জগদ্ধাত্রী (পৃ: ২৬৫) আমাকে সরবরাহ করেছে। বাল্যবন্ধু, কৃষ্ণনগরের সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়।

প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলাম এবারও তাদের সহায় সাহায্য পেয়েছি। তদুপরি দুজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রথমজন ব্রহ্মচারী অত্যাশ্রয় প্রামাণিক। তার গবেষণা-গ্রন্থ অবলম্বন করেই শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন রেখা ধরে রূপেন্দ্রনাথকে শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত শ্রীমান অনুপম ঘোষ—যত্ন নিয়ে সে প্রুফ দেখেছে এবং বইটি সাজিয়েছে। তার সাহায্য না পেলে হয়তো এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে আরও বিলম্ব ঘটত।

আমি মর্মান্বিতভাবে দুঃখিত: দ্বিতীয় খণ্ডে রূপমঞ্জরীর কাহিনীটি সমাপ্ত করতে পারলাম না। দোষ আমার নয়— দোষ ওঁদের দুজনের। প্রথমত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনের ঘনশ্যাম সার্বভৌম। দ্বিতীয়ত সোএগ্রাই গাঁয়ের সেই মেয়েটি: পীত-ঠাংয়ের কন্যা মৃণ্ময়ী। যে মেয়েটি আগবাড়িয়ে রূপেন্দ্রনাথের বিয়েতে ঘটকালি করেছিল। ওঁদের দুজনের কথা বলতে বলতে এতই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে, কালের গ্রীষ্মে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায়নি। পরিকল্পনা ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তত রূপমঞ্জরীর পিতৃবিয়োগ পর্যন্ত অগ্রসর হবে; অর্থাৎ তার বিবাহ ও বৈধব্যযোগ পার করে দেব। হল না। বোটের বিয়েটা পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারলাম না এবার।

বয়ঃজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদে আর বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রার্থনায় যদি আরও বছর পাঁচেক টিকে থাকতে পারি তাহলে নিশ্চিত তৃতীয় খণ্ডে কাহিনীর যবনিকা টানব। উইথ নো রিগ্রেস্‌স, অ্যান্ড নো ডিউ পাট।

জানুয়ারি ১৯৯৪

রূপমঞ্জরী

pathagar.net





রূপমঞ্জুরীর সন্ধানে

1744

সপ্তম পর্ব

দ্যাখ না-দ্যাখ আমি যদি লোটাকম্বল কাঁধে নিয়ে
রূপমঞ্জুরীর সন্ধানে রওনা হয়ে পড়ি তাহলে
আপনাদের আপত্তি করার সঙ্গত কারণ থাকতে
পারে, — বিশেষ যাঁরা প্রথম খণ্ড ‘রূপমঞ্জুরী’
এখনো পড়েননি। আমি আশা করব : ‘পেরথম
ভাগ’ শেষ করে তারপর আপনারা ‘দ্বিতীয় ভাগ’

বা ‘কথামালায়’ হাত দেবেন। কিন্তু দু-একটি ক্ষেত্রে যদি তা না হয় তাহলে সেই ব্যতিক্রম
পাঠক-পাঠিকাকে গল্পের ধরতাইটা আমাকেই ধরিয়ে দিতে হবে।

প্রথম প্রশ্ন: ‘রূপমঞ্জুরী’ লোকটা কে? তার দুটি উত্তর। প্রথমত, এটা যদি মাতৃতান্ত্রিক
সমাজ হতো তাহলে বলতে পারতাম — ‘রূপমঞ্জুরী আমার দিদিমার দিদিমার-দিদিমা টু দ্য
পাওয়ার টেন’ — অর্থাৎ ‘দশম-নারী’ পর্যন্ত উজানে গেলে তাঁকে পাবেন। সে হিসাবে
রূপমঞ্জুরী হচ্ছেন উত্তর-খ্রীষ্টোত্তর ও প্রাক-খ্রীরামমোহন যুগের প্রথম নারী বিদ্রোহিণী।

দু-দুটি ঐতিহাসিক নারী গতদশকের শেষাংশে আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন।
দুজনের মধ্যে কালের ব্যবধান বা ভৌগোলিক দূরত্ব তবু কিছুটা আছে, কিন্তু নাম, রূপ ও
চরিত্রে বিশেষ ফারাক নেই। দুজনেই অসামান্য বিদূষী, দুজনেই পুরুষশাসিত অষ্টাদশ শতাব্দীর
বঙ্গদেশীয় সমাজকে নস্যাতকরেছিলেন। প্রতিবেশী রাজ্যে মৌলবাদী ধর্মাবাদীদের নাকে ঝামা
ঘষে দিয়ে তসলিমা নাসরিন যে ভাবে তাঁর স্কন্ধস্থিত মাথাটি নিয়েই ইউরোপে চলে গেছেন,
হটী বিদ্যালঙ্কারও প্রায় সেইভাবে গৌড়মণ্ডলকে তাগ করে চলে গিয়েছিলেন কাশীধাম। হটী
বিদ্যালঙ্কার (1743—1810) চিত্রাভিষ্ট অবস্থায় কাশীধামে উপস্থিত হলে এক মহাপণ্ডিতের
ভদ্রাসনে আশ্রয় পান। তাঁরই পালিতাকন্যারূপে ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, নব্যন্যায় অধ্যয়ন করে
অসামান্য জ্ঞানের অধিকারিণী হন। কাশীর পণ্ডিতসমাজ যখন তাঁকে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি
প্রদান করেন তখনো রাধানগরে খ্রীরামমোহনের আবির্ভাব হতে প্রায় এক দশক বাকি।
তদানীন্তন কাশীর কটর পণ্ডিতেরা — ঠিক এই দু-আড়াইশ বছর পরে পূরীর ধর্মাবাদ
‘শঙ্করাচার্য’ যেমন নিদান হেঁকেছেন — বলেন খ্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নেই।
এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে একটি বিচারসভায় এ নিয়ে তর্ক হয়। হটী বিদ্যালঙ্কার

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করে প্রমাণ করেন, স্ত্রীলোকের বেদপাঠের অধিকার হিন্দুধর্মে স্বীকৃত। অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন কাশীর চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাদান করেছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিবেজিও যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন তার পরের বছর হটী কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। প্রথম যুগে — আন্দাজ করা যায় — অধ্যাপিকা এবং ছাত্ররা প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন! তিনি প্রকাশ্যে পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে যোগ দিতেন এবং পণ্ডিতদের প্রাপ্য দক্ষিণাও গ্রহণ করতেন।

দ্বিতীয়া, হটী বিদ্যালয়কার — বয়সে হটী অপেক্ষা তিন দশকের অনুজ। জন্ম : কলাইবাটি, বর্ধমান (আঃ 1775—1875)। পিতা পরম বৈষ্ণব নারায়ণ দাস। কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় লাভ করে তিনি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার নির্দেশে আত্মজার বাল্যবিবাহ দানে অস্বীকৃত হন। পরিবর্তে তাকে নানান বিদ্যাচর্চায় শিক্ষিতা করে তোলেন : ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়, নব্যন্যায় এবং আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যা। ঐরূপ ডাকনাম হটু; কিন্তু পোশাকী নাম : রূপমঞ্জরী !

হটু তরুণী বয়সে সরগ্রামনিবাসী আচার্য গোবুলানন্দ তর্কালঙ্কারের গুরুগৃহে বাস করে সাহিত্য এবং চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি চিরকুমারী। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, ইনি পুরুষদের মতো মস্তকমুণ্ডন, শিখাধারণ ও উত্তরীয় পরিধান করতেন। সমাজ তা মেনে নিয়েছিল।

এই দুই অলোকসামান্য মহিলার সন্ধান পাই আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি বইতে : সাহিত্যসাধক চরিতমালা সিরিজের প্রামাণিক সূত্রে : চতুষ্পাঠীর বিদূষী মহিলা।

স্বীকার করতে কষ্ট নেই, বিগত দশকে এঁরা দুজন আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন যখন হামাগুড়ি দিতে শেখেননি, তখন কোনও পিতৃহীন বাঙালি বালবিধবা চিত্রাশ্রম পরিচয়ে বারানসীধামে উপনীত হয়ে অন্তিমে ‘বিদ্যালয়কার’ উপাধি গ্রহণ করছেন, অথবা বিচারসভায় পুরুষ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করছেন — লেখকের কল্পনায় নয়, বাস্তবে — এটা প্রণিধান করে গর্বে বুকটা ফুলে উঠেছিল। কিংবা রামমোহনের প্রায় সমবয়সী একটি বাঙালি মহিলা আজীবন অবিবাহিতা থেকে পুরুষের বেশে সগ্রামে নর-নারী নির্বিশেষে চিকিৎসা করছেন; ছাত্রদের শারীরবিদ্যা শেখাচ্ছেন, এমি কি কম বড় কথা ?

রূপমঞ্জরীর দ্বিতীয় পরিচয় : তিনি আমার দিদিমার-দিদিমার-দিদিমার দিদিমা...নন। সে আমার কন্যা ! তাকে আমি নতুন করে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম আমার উপন্যাসের পাতায়। ওই দুই অসামান্য — হটী আর হটুর সংমিশ্রণে।

রচনা কিছুটা অগ্রসর হবার পর — গত দশকের শেষ বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে—কিছু ‘চিত্রাশ্রম’ অনুভব করি। একটি নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এক কালো মুখোশধারীর সঙ্গে আমার কিছু তর্ককার হয় — একটি প্রত্যঙ্গের দখলদারী নিয়ে। সওয়া তিনকুড়ি বছরের সত্বাধিকার আগ্রহ করে সে আমার হৃদপিণ্ডটা জবরদখল করতে চাইছিল। অনেক লড়াই করে বাড়ি ফিরে এসে দেখি ইতিমধ্যে আমার সেই মেয়েটি হারিয়ে

গেছে। 'বামি'র হাতের প্রদীপশিখাটির মতো।

তাই এই: 'রূপমঞ্জুরীর সন্ধানে'!



কিন্তু ওটা তো আত্মনেপদী কৈফিয়ৎ। আপনাদের গল্পের ধরতাইটা সংক্ষেপে ধরিয়ে দিই: পর্বশ্রমপদী কৈফিয়ৎটা : ইংরেজি 1744 খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ ক্রান্তিকারী পলানীযুদ্ধের পূর্বদশকে, সদ্যোবিবাহিত একটি দম্পতি — হবু-রূপমঞ্জুরীর পিতা ভৈষগচার্য রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা মঞ্জুরী নৌকাযোগে তীর্থদর্শনে বার হয়ে পড়েন। রূপেন্দ্রনাথের পৈত্রিক নিবাস বর্ধমানের সোএরই গ্রামে, দামোদরের তীরে। ওঁরা কিছুটা পদব্রজে, কিছুটা নদীপথে এসে ভাগীরথীর দুই তীরে সেকালীন বর্ধিষু জনপদগুলির — বনার ঘাটি, চক্রদহ, প্রদ্যুম্ননগর, ত্রিবেণী, বংশবাটি, সপ্তগ্রাম, ওলন্দাজনগর, মূলাজোড়, বৈদ্যাবাটি প্রভৃতির— বিভিন্ন মন্দিরে দেবদর্শন করছিলেন ক্রমে ক্রমে। পথে পড়ল 'নাহেশ' — সেখানে বাস করতেন শ্রীবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়, রূপেন্দ্রের পিসাশুওর। অগত্যা সেখানে আশ্রয় নিতে হল কদিনের জন্য। এ-ঘটনা রূপেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় দেড়বছর পরে। মুশকিল হল এই যে, মঞ্জুরীর পিসিমার অভিজ্ঞ সোখে ব্যাপাট্টা আর গোপন রইল না। রূপেন্দ্র জানতে পারলেন, তাঁর স্ত্রী পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। পিসাশুওর ওঁদের যৌথ তীর্থভ্রমণ বন্ধ করে দিলেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পাশে গৃহের বাহিরে যাওয়াটাই অনুমোদনযোগ্য নয়। অগত্যা রূপেন্দ্র একলাই ভাগীরথীর দুই তীরে তদানীন্তন গৌড়বদেব সংস্কৃতিতে কী যেন একটা খুঁজে বেড়াতে থাকেন।

তিনি কী খুঁজছিলেন জানতে হলে রূপেন্দ্রনাথের চরিত্রটাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করতে হবে।

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পিছনে কী যেন একটা উপাধি ছিল; কিন্তু এখন আর তার কোন নিশানা নেই। রঘুনাথ শিরোমণি; বাসুদেব সার্বভৌম অথবা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো তাঁর ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল না বটে, কিন্তু ওঁর গ্রামাঞ্চিকে কেন্দ্রবিন্দু করে পঁচিশ জোশ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত টানলে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে দেখা যেত সে-আমলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত: রূপেন্দ্রনাথ নামে নয়; দুটি পুথকিত অভিধায় : 'একবল্লাঠাকুর' আর 'ধর্মজ্ঞার'।

প্রথম উপাধিটা তাঁর চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কারণ সমকালের ধারণায় তিনি এক সুদূরভূত ব্যতিক্রম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক আধুনিকমনা প্রগতিবাদী। প্রতিটি শাস্ত্রীয় অনুশাসন তিনি নিজের বিবেকের বকযন্ত্রে চোলাই করে গ্রহণ করতেন। তা বেদবাক্য হলেও।

ৰূপমঞ্জৰীৰ সন্ধান

দ্বিতীয় উপাধিটা তাঁৰ অসাধাৰণ চিকিৎসাশাস্ত্ৰৰ জ্ঞানৰ জন্য। বাল্যকালে তিনি চলে যান ত্ৰিবেণী। জগন্নাথ তৰ্কপঞ্চননৰ চতুৰ্পাঠীতে ব্যাকৰণ, ন্যায়, নব্যন্যায়, দৰ্শন ইত্যাদি শেষ কৰে তিনি চলে আসেন সৰগ্ৰামনিবাসী স্নানামধ্য কবিরাজ আচাৰ্য গোকুলানন্দেৰ পিতামহেৰ কাহে। দীৰ্ঘ সাত বছৰ আয়ুৰ্বেদশাস্ত্ৰ, চৰক, সুশ্ৰুত ও নিদান আয়ত্ত কৰেন। গোকুলানন্দেৰ নিৰ্দেশে তিনি স্থীৰোগেৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন — যা নাকি সমকালে এক সুদুৰ্লভ ব্যতিক্ৰম। তবে কোনও যোগিণীৰ দেহস্পৰ্শ কৰাৰ সময় গুৰুৰ আদেশে একটি শৰ্ত তিনি আৰোপ কৰতেন — ওই সময় প্ৰাপ্তবয়স্ক দ্বিতীয় একটি ৰমণীৰ উপস্থিতি আবশ্যিক।

‘মধুচন্দ্ৰিমা’ শব্দটা তখনও অভিধানে ওঠেনি। ওমা! কী বোকাৰ মতো বলছি। বাংলা ‘অভিধান’ বস্তুটাই তো তখনও জন্মায়নি* মোট কথা, যে-আমলেৰ কথা, তখন সদ্যোবিবাহিতাকে নিয়ে ‘হনিমুন’ তো ছাড়, প্ৰচলিত নিৰ্দেশটি ছিল : পথি নারী বিবৰ্জিত।

তবে ওই! একবন্ধা-ঠাকুৰ ছিলেন ব্যতিক্ৰম। তাই বছৰ না-ঘূৰতেই সহধৰ্মিণীৰ শাখাপৰা হাতটি ধৰে ঘৰ ছেড়ে পথে নেমেছিলৈন পিতৃমাতৃহীন ৰূপেন্দ্ৰনাথ। সোণাই গ্ৰামেৰ বাড়িতে পড়ে রইলৈন বৃদ্ধা পিসিমা জগুঠাকুৰন, এক পিসতুতো বোন কাতায়নী আৰ তাৰ ঘৰজামাই স্বামী।

বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে উনি সত্ৰীক তীৰ্থযাত্ৰা কৰেছিলৈন ভাগীৰথীৰ দুই কিনাৰে। নদীমাতৃক বঙ্গ-সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ এই ভাগীৰথীৰ দুই তীৰ। গ্ৰীক ঐতিহাসিক বৰ্ণিত ‘গঙ্গাৰিভি’ যথার্থ গঙ্গাহ্ৰদ। জননী তাঁৰ স্তনভাওৱেৰ নিৰ্মল ধাৰায়, পলিমাটিৰ আশীৰ্বাদে, নাৰ্য শোভধাৰায় এ-দেশকে দিয়েছেন পানীয়, শস্য, পৰিবহনেৰ সুযোগ। তাই ভাগীৰথীৰ দুই-তীৰে গড়ে উঠেছে বঙ্গ-সংস্কৃতিৰ মূল কেন্দ্ৰগুলি : নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, সপ্তগ্ৰাম, ত্ৰিবেণী, ভাটপাড়া, মূলাজোড়, কালীঘাট।

গঙ্গাতীৰেৰ অযুত-নিযুত মন্দিৰে ‘পেন্নাম’ ঠকতে নয়, তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন একটা ‘পৰশপাথৰ’।

আকৈশোৰ তিনি যে একটা স্বপ্ন দেখে আসছেন :

‘ধৰ্মসংস্থাপনার্থায়’ ‘তাঁৰ’ যে আবার আসাৰ কথা।

ঠিক যেমন অদ্বৈতাকাৰ্য প্ৰতীক্ষা কৰেছিলৈন নবদ্বীপে প্ৰায় তিনিশো বছৰ আগে। তিনি আবার আসবেন, তাকে আসতেই হবে। এই অষ্টাদশ শতাব্দীৰ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে ধৰে আবার তিনি একটা বাঁকি দেবেন। এটাই ভাৰত-সংস্কৃতিৰ ট্ৰাডিশন। শাক্যসিংহ এভাবে সমাজকে ধৰে নাড়া দিয়েছিলৈন দু-আড়াই হাজাৰ বছৰ আগে। দিয়েছেন আদি শঙ্কৰাচাৰ্য। দিয়েছেন সম্প্ৰতি চৈতন্যদেব। ৰূপেন্দ্ৰনাথৰে বিশ্বাস, সেই তিনি আবার ওঁৰ

* প্ৰসঙ্গত মনে কৰিয়ে দিই : ৰূপমঞ্জৰীৰ (বাত্তৰ হটা বিদ্যালয়কাৰেৰ) জন্মেৰ পূৰ্ব বংসৰ ‘কুপাৰ শাস্ত্ৰেৰ অৰ্থভেদ’ এবং ‘বাঙলা ব্যাকৰণ’ প্ৰকাশিত হয়েছিল পৰ্তুগালেৰ লিসবন শহৰ থেকে — মানোএল-দা আসুন্সাঁও-এৰ প্ৰচেষ্টায়।

সমকালে আবির্ভূত হয়েছেন — এখনও প্রকট হননি, এই যা! তাহলে তিনি লুকিয়ে আছেন এই ভাগীরথী-বিধৌত কোনও একটি পুণ্যতীর্থে। শাক্যসিংহ ছিলেন রাজপরিবারভূক্ত — রানী ভবানী বা কুম্ভচন্দ্রও তাই। আদি শঙ্করাচার্য বা নিমাই পণ্ডিত শৈশবে সোনার বিনুকে দূধ খাননি — যেমন তা করেনি বুনো রামনাথ বা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। এঁদের মধ্যে কে এগিয়ে আসবেন রূপেন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক হতে?

ভারতীয় সংস্কৃতি আজ ভগ্নপক্ষ সম্প্রতিতির মতো ধুকছে।

কিন্তু কেন?

রূপেন্দ্রনাথের ধারণা, তার দুইটি হেতু।

প্রথমত, ব্রাহ্মণ সমাজপতির চাপিয়ে দিয়েছে তার পিঠে এক জগদল বোঝা। তা পিঠে নিয়ে আকাশে ওড়া মহাশক্তিমান গরুড়-এর পক্ষও সম্ভবপর হচ্ছে না। সেই বোঝা অবহেলিত, উপেক্ষিত একদল শক্তিমান মানুষ — টুলো-পণ্ডিত সমাজের নিয়ন্ত্রকদের মতো যারা অচ্যুত, জল-অচল, শূদ্র।

দ্বিতীয় বাধা, বিহঙ্গমের একটি পাখা বিদীর্ণ করা হয়েছে। করেছেন, ওই মহামহা পণ্ডিত তথা কৃপমণ্ডকের দল: নারী-সমাজ। অশিক্ষায়, অবজ্ঞায়, অন্ধকারে, অত্যাচারে নারীসমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাকে 'নরকের দ্বার' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্য। চৈতন্যদেব যখন হরিনামকে বৃকে টেনে নিলেন। আচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন, কিন্তু হতভাগী বিধবাদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি! রূপেন্দ্রনাথ ভাগীরথীর দুই তীরের নানান জনপদে সন্ধান করে ফিরছেন সেই পরশপাথরটি—

রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি, সেই মহাপুরুষটি তখনও অজাত।

রাধানগরে তাঁর আবির্ভাব হতে তখনও তিন দশক বাকি।



দীর্ঘ তীর্থপরিক্রমা সমাপ্ত করে রূপেন্দ্রনাথ যেদিন মাহেশে ফিরে এলেন, ষটনাচক্রে সেদিনই মঞ্জুরীর প্রসব-বেদনা উঠেছে। ভবতারণ গঙ্গাপাধ্যায়-মশায়ের গৌশালার পাশে নবনির্মিত একটি সূতিকাগারে যন্ত্রণায় কাতবাচ্ছে মঞ্জুরী।

দুর্ভাগ্য একেই বলে। সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে প্রাণ দিল মঞ্জুরী। 'মৃত্যু'টা ট্রাজেডি নয় — মৃত্যু তো ছায়ার মতো ঘুরছে জীবনের পিছু পিছু। মঞ্জুরী প্রাণ দিল মাত্র বিশ বছর বয়সে — সেটাও বেদনার সূচীমুখ নয় — চরম ট্রাজেডি হল : সূতিকাগারে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না আচার্য গোবিন্দানন্দের শ্রেষ্ঠ ছাত্রটিকে, প্রসূতিবিদ্যায় যাকে 'ধনুস্তরী' আখ্যা দিয়েছিল গায়ের মানুষ। রূপেন্দ্রনাথ — জীবনে যিনি কখনও মাথা নিচু করেননি, তাঁর শশুরালয়ের প্রতিটি মানুষের কাছে করজোড়ে মিনতি করেও অনুমতি পাননি — ওই

কুপমঞ্জরীর সন্ধান

সূতিকাগৃহে প্রবেশের। অথচ তাঁর দুচ বিশ্রাস নিজে হাতে প্রসব করাতে পারলে তিনি সন্তান ও জননীকে বাঁচাতে পারতেন। জটিলতাটী কী তিনি বুঝেছেন, কিন্তু সেটা বুঝতে বা শুনতে রাজি হল না বৃদ্ধা ধাত্রী !

— কী অসংগত কথা গো ! আঁতুড়ে বেঁটাছেলে !

প্রসূতির কী জাতীয় জটিলতা হচ্ছে, কেন সে মর্মান্তিক কাতরাচ্ছে তা কানে শুনতে হল অশিক্ষিতা ধাত্রীর কাছে। আন্দাজে বিধান দিতে গেলেন। তাও সে শুনলো না। বললে, ছেলে বিইয়ে বিইয়ে চুলগুলো সব সনের দড়ি হয়ে গেল, ওই একফোঁটা লেডাডার কাছে বিধান নিতি হবে? ক্যানে গো? গলায় দড়ি জোটে না মোর !

নিখল অক্রেমশে শৃঙ্খলাবদ্ধ শার্দুলের মতো ত্রিযামারাত্রি পায়চারি করে ফিরেছেন তারাবড়া আকাশের নিচে — সূতিকাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে। দ্বিতল বাড়ি। পুরুষেরা যে-যার শয়নকক্ষে নিদ্রাগত। আজ রাত্রে অনেকেই শয্যাসজিনীবধিত। কারণ মহিলাদের অধিকাংশই সূতিকাগৃহের অনাচে-বানাচে। বর্ষীয়সী কয়েকজন আর পরিবারের তিনকাল-গিয়ে-এককাল-ঠেকা এক বৃদ্ধা ধাত্রী রয়েছে সূতিকাগারের অভ্যন্তরে। গোয়ালঘরের পাশে এটি একটি নবনির্মিত সাময়িক অচ্ছাদন — বুকা-পিঠা মুলিবাঁশের চৌখুপি দেওয়াল, বেনাধাসের একচালা। প্রতিবারই পরিবারে কোনও স্মিটসোহাগিনীর সন্তানবতী হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে এখানে সাময়িক খড়ে-চলা নির্মিত হয়। পাকা প্রসূতি-আগার নাকি নিয়ম-বহির্ভূত। ঠিক জানা নেই — হয়তো স্মরণ মনুর বিধান। হবেও বা — স্মরণ জগজ্ঞাতা যীশুখ্রিস্টকেও তাই আবিস্কৃত হতে হয়েছিল অশ্রাব্যের একান্তে।

দ্বার রুদ্ধ। গৃহভ্যন্তরে কী ঘটছে জানতে পারছেন না। দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু মাঝে মাঝে স্কর্গে শুনছেন ধর্মপত্নীর মর্মান্তিক আর্তনাদ। সে আর্তনাদ — মনে হচ্ছিল রূপেন্দ্রনাথের — শুধু দৈহিক যন্ত্রণায় নয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুপমঞ্জুরদের এই নৃশংস ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যেন এক জাল্‌ব প্রতিবাদ!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ক'মাস আগেকার কথা। এই বাড়িরই ওই উপরের ঘরে। যেদিন মশারি-ফেলা জনান্তিকে একপ্রহর রাত্রে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে কুসুমমঞ্জরী প্রথম স্নান করত। সে মা হতে চলেছে। রূপেন্দ্র ওকে বুকে টেনে নিয়ে মুখচুষন করে বলেছিলেন, তুমি আমাকে সন্তান দিয়েছ, তোমার একটা পুরস্কার পাওনা। বল মঞ্জু, কী নিয়ে আসব তোমার জন্য এবার, তীর্থ থেকে ফেরার সময়?

ভারি সুন্দর জবাবটি দিয়েছিল মঞ্জু। বলেছিল, তুমি না জিজ্ঞাস্যার রাতেই আমাকে বলেছিলে : স্বামী আর স্ত্রীর সমান অধিকার ! তাহলে ও-কথা বলছি কেন? কে কাকে উপহার দিল তার তো হিসেব নেই।

তা বটে। তবু রূপেন্দ্রনাথ ওকে বলেছিলেন কিছু চাইতে। আজকের এই রাত্রিটি, এই বিশেষ মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখতে একটা স্মারকটিফ দিতে চান তিনি।

কুসুমমঞ্জরী বলেছিল, তাহলে আমি যা চাইব তাই দেবে?

—দেব, যদি আমার সাধের মধ্যে হয়।

—আমার বড় সাধ লেখাপড়া শেখার। তুমি আমাকে শেখাবে? লুকিয়ে লুকিয়ে?

রূপেন্দ্র শয্যাশ্রান্তে উঠে বসেছিলেন। এমন একটি গোপন বাসনা যে কুসুমমঞ্জরীর অঙ্কুরের গভীরে সন্ধানপনে লুকিয়ে আছে তা আন্দাজ করতে পারেননি। যে-কালের কাহিনী সে-কালের প্রচলিত সংস্কার ছিল ক্রীলোকের অঙ্কুর পরিচয় হলে তার বৈধব্যযোগ অনিবার্য! তাই রূপেন্দ্র অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী বলছো মঞ্জু? তোমার ভয় হয় না? লোকে বলে, লেখাপড়া শিখলে...

মঞ্জু তার শাঁখা-পর্য হাতটা বাড়িয়ে ওঁর মুখে চাপা দিয়েছিল। বলেছিল, ও-কথা বলো না! তুমিই তো বলেছো সেটা ভুল, সেটা মূর্খদের কুসংস্কার!

তা বলেছেন। গার্মা-মৈত্রের কাহিনী শুনিয়েছেন ধর্মপত্নীকে। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, তাই হবে, মঞ্জু। শেখাব, তোমাকে বাঙলা পড়তে, লিখতে শেখাব। সংস্কৃতও শেখাব। কিন্তু এখানে তো তা সম্ভবপর নয়। এখানে সুযোগ হবে না। জানাজানি হয়ে যাবে। তোমার পিসিমা বা পিসেমশাই যদি একবার নিষেধ করে বসেন —

—না, না, এখানে নয়। সোঁগ্রাই ফিরে গিয়ে।

—সেই ভাল, কথা দিচ্ছি ওঁর হাতেখড়ি দেবে ওঁর মা, বাবা নয়। অঙ্কুর পরিচয়ও করা হবে তার মা। ঠিক যেমন পৌরাণিক যুগে কাশীর রাজমহিষী মদালসা শিক্ষিত করেছিলেন, দীক্ষা দিয়েছিলেন রাজপুত্র অলকেশ্বর।

মঞ্জু বুদ্ধিমতী। বুঝেছিল ঠিকই, তবু দুটু মি করে শুনতে চেয়েছিল, কার কথা বলছ তুমি?

—আত্মদীপের।

মঞ্জু সলজ্জে মুখ লুকিয়েছিল ওঁর বুকে।

আত্মদীপ। নামটা রূপেন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বেই স্থির হয়ে আছে! নামকরণ করেছিলেন রূপেন্দ্রনাথের বয়স্য, সমকালীন বঙ্গ-সরসতীর প্রিয়তম সেবক — অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

বিবাহের পূর্বে রূপেন্দ্রনাথ বিশেষ কারণে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কবিগৃহে। কবি একাই থাকতেন — প্রোষিতপত্নীক; অতিথি রূপেন্দ্রনাথ অবিস্মৃতিত। যদিও বিবাহের দিন..ও পাত্রী নির্বাচন তার পূর্বেই হয়েছিল। বিদায়ের দিনেও রূপেন্দ্র বন্ধুবর ভারতচন্দ্রকে সুসংবাদটি জ্ঞাপন করেন এবং বিবাহরাত্রি সোঁগ্রাইগ্রামে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন।

কবির বলেছিলেন, রূপেন্দ্র, তোমার আমন্ত্রণ আমি সন্মানে গ্রহণ করলাম; কিন্তু বুঝতেই পারছি, এত দূরের পথে আমার পক্ষে নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। হয়তো তোমাতে-আমাতে আর কখনও দেখাই হবে না। তাই — তুমি যদি অনুমতি দাও — আমি তোমার-আমার বন্ধুত্বের একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিতে ইচ্ছুক, যাতে আমার কথা তোমার বারে বারে মনে পড়ে যায়। তোমার শুভবিবাহে এই দীন কবি আর কী উপহার দিতে পারে বল?

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

—কী উপহার ? শুনি আগে — জানতে চেয়েছিলেন রূপেন্দ্র।

—মদনারিরিপুর আশীর্বাদে তোমাদের মিলন সার্থক হবেই। সেই অনাগত মানবশিশুটির নামকরণ আমি করে দেব। তাকে যতবার ডাকবে ওই সূত্রে ততবারই এই দীন কবির কথা তোমার স্মরণ হবে।

রূপেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বীকৃত হয়েছিলেন। প্রশ্ন করেন, বল ? কী নাম ?

—তোমার পুত্রের নাম দিও : আত্মদীপ।

—আত্মদীপ ?

—হ্যাঁ। বিবেকনির্দেশে জীবনে পথ খুঁজে এগিয়ে যাওয়াই তোমার ব্রত। কোনও শাস্ত্রবাক্যকেই বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করো না। শোন, মহাকারণিক গোতম বুদ্ধ যখন কুশীনগরে শেষশয্যায় শায়িত, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য আনন্দ। তিনি জানতে চেয়েছিলেন : ‘আপনার মহাপরিনির্বাণের পর আমরা কর কাছে যাব পথনির্দেশ যাক্স করতে ?’ জীবনের শেষনিশ্বাসের সঙ্গে পরমকারণিক তথা পরমবুদ্ধ অন্তিম নির্দেশ দিয়েছিলেন :

‘আত্মদীপো ভব !

আত্মশরণো ভবো !

অনন্যশরণো ভব !’

নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালাও। কারও কাছে পথের সন্ধান চাইতে যেও না। নিজের বিবেকের আলোয় জীবনের পথ পরিক্রমা করো।

রূপেন্দ্র হেসে বলেছিলেন, বন্ধু ! তুমি অপূর্ব নামকরণটি করেছ। আমার পুত্রসন্তান হলে নিশ্চয় তার নাম দেব : ‘আত্মদীপ’, কিন্তু তুমি কউর স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো এ-পরামর্শ দিলে; কিছু মনে করো না বন্ধু, ঠিক — কবির মতো নয়।

—কবির মতো নয় ? কেন, কী ত্রুটি হল আমার ?

—তুমি কবি হিসেবে বিস্মৃত হয়েছো — এই রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শময় জগতের আধিক্য একা পুরুষের নয়। এ-বিবাহ সার্থক হলে পুত্রের পরিবর্তে আমার প্রথমে কন্যা-সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, তাই নয় ?

ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, ঠিকই বলেছ বন্ধু। পুত্রের নামকরণ করেছিল কউর বামুনপণ্ডিত; এবার কন্যার নামকরণ করবে : ‘কবি’। রূপেন্দ্রনাথ আর কুসুমমঞ্জরীর যৌথ মনসিজ-সাধনার ফলশ্রুতি যদি কন্যারূপে আবির্ভূত হয়, তবে তাঁর নাম হোক : রূপমঞ্জরী।

সহসা চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল রূপেন্দ্রনাথের। সূতিকাগৃহের অভ্যন্তর থেকে ভেসে এল এক মিলিত ক্রন্দনরোল।

শেষ হয়ে গেল ! সব শেষ হয়ে গেল ! আত্মদীপ নয়, রূপমঞ্জরী নয় — কেউই এল না। অকালে বিদায় নিল তাদের মা ! বিনা চিকিৎসায় ! কুসংস্কারের বলির পশু ! সূতিকাগারের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করে সম্মিলিত নারীকণ্ঠের ক্রন্দনরোল তারই প্রমাণ।

রূপেন্দ্রনাথ বাঁশের খুঁটিটা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন। মাথার ভিতর টলে উঠেছিল

তার। পরমুহূর্তেই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। অপরিসীম নির্বেদে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার। মুহূর্তে জীবনের অর্থটাই যেন হারিয়ে গেল। আশঙ্কা হল এখনি হয়তো শ্মশুরবাড়ির গুরুজনেরা — যাঁরা কুসংস্কারের কৈঙ্কৰ্ষে আদরের মেয়েটাকে বাঁচতে দিলেন না — তাঁরা সহনুভূতি জানাতে হড়মুড়িয়ে ছুটে আসবেন। সেটা সহ্য হবে না ওঁর। সম্মোহিতের মতো পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এলেন বাহিরে। তারায় ভরা আকাশের নিচে। টুপ-টুপ করে শেষ রাতের শিশির বারে পড়ছে গাছ থেকে। এক আকাশ কৌতূহলী তারা। পূব আকাশটা সবে ফসাঁ হতে শুরু করেছে। পাখ-পাখালির কিচিমিচি এখনো শুরু হয়নি বনে-বনান্তরে। ধীরে ধীরে সমুখপানে মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে চললেন রূপেন্দ্রনাথ — নগ্ন গায়ে, নগ্ন পদে, রূপর্দকহীন অবস্থায়। চেতনহীন সম্মোহিতের মতো।



নিজেকে আবিষ্কার করলেন পুণ্যতোয়া মা গঙ্গার তীরে। একপ্রহর বেলায়। ছয় ক্রোশ দূরে। ফ্রেডরিক নগরের পারানিঘাটের একান্তে এক বিশাল বটবৃক্ষের নিচে বসে আছেন তিনি। সামনে দিয়ে লোকজন চলেছে গঙ্গাঙ্গনে। গঙ্গায় সারি সারি নৌকা — ছিপ, পান্সি, মাছমারাদের নৌকা, বজরা। মাঝ-গাঙে ভাসছে এক বিচিত্র জলযান — অর্গবপোত।

মাহেশ আর রাধাবল্লভপুর — দুখানি পাশাপাশি গ্রাম। রাধাবল্লভপুরে আছে রুদ্রপণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের অপূর্ব মূর্তি; আর মাহেশের রথ তো সুবিখ্যাত। মনে আছে নিশ্চয়, বঙ্কিমের মানসকন্যা রাধারানীও হারিয়ে গেলছিল এই মাহেশের রথযাত্রার মেনাতেই। আমরা অবশ্য এখন আছি বঙ্কিম-জন্মের প্রায় একশ বছর আগে। এই দুই বর্ষিষ্ণু গ্রামের গঙ্গাতীরে ফ্রেডরিক নগর। তোমরা বোধকরি ও-নামে চিনবে না। তাই বলি, তার বর্তমান নাম শ্রীরামপুর। সেকালে তা ছিল দিনেমারদের ঘাঁটি। অদূরেই, কাহিনী-বর্ণিত স্থানকালের পরবর্তী যুগে, এখানে কবরস্থ হবেন: মার্শম্যান, ওয়ার্ড আর কেরীসাহেব। বাঙলা ছাপাখানায় প্রথম সংবাদপত্রটি যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন: ‘সমাচারদর্পণ’।

রূপেন্দ্রনাথ নিশ্চুপ বসে বইলেন ঘাটের কিনারে। অম্লত, অদ্ভুত। স্বী করবেন স্থির করে উঠতে পারছেন না। স্বপ্ন ছিল তীর্থপরিক্রমা সমাপ্ত করে সপুত্র, সন্তীক প্রত্যাবর্তন করবেন পৈত্রিক ভিটেতে — সোণাই গ্রামে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর ক্রোধমতে সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। না, ভুল হল, ভাগ্য নয়, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কিছু পণ্ডিতপুণ্ড্রের সংস্কারের কৈঙ্কৰ্ষে। গ্রামে ফিরে পুনরায় কবিরাজ বৃত্তি গ্রহণের বাসনা নেই। সে দীর্ঘস্থ বুকিয়ে দিয়ে এসেছেন এক প্রিয় শিষ্যকে।

হঠাৎ নজর পড়ল মাঝগঙ্গায় ভাসমান সুবিশাল অর্গবপোতটির উপর। ফ্রেডরিক নগরের বন্দরে আরও দু-তিনটি সমুদ্রগামী বড়জাহাজ জাহাজ ভাসছে। আকারে ওটি তাদের সমতুল;

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় মাস্তুলের উপরিস্থিত অভিজ্ঞান।

তিন-তিনটি মাস্তুলে পাঁচ স্তরে পনেরোটি পাল। যুদ্ধজাহাজ নয়, কামান নজরে পড়ছে না। বাত্মীবাহী বা মাল্‌বাহী জাহাজ। কেন্দ্রীয় বৃহত্তম মাস্তুলের উপরে একটি ধাতব চক্রচিহ্ন — সূর্যালোকে ঝলমল করছে এবং তৎসংলগ্ন ত্রিকোণাকৃতি গরুড়-ধ্বজা বলে দেয় এটি ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ বা দিনেমারদের জাহাজ নয়। বাঙালির জাহাজ এবং হিন্দুর — যা বহু-বহুদিন নজরে পড়েনি রূপেন্দ্রের। বঙ্গোপসাগর আছে আজ কয়েক শতাব্দী বিদেশীদের কজায় — বিজয়সিংহ, চাঁদননগর, লক্ষ্মিন্দর, ধনপতিদের কীর্তি ও কাহিনী ক্রমশ চলে গেছে মহাকাালের নেপাথ্যে টিকে আছে শুধু মঙ্গলকাব্যের পুঁথিতে।

বঙ্গোপসাগরে বিদেশীদের আগমন ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি — গৌড়েশ্বর মামুদ শাহের আমলে। তারা ছিল পর্তুগীজ। তারা ঘাঁটি গেড়েছিল প্রধানত মগের মূল্যকে — চট্টগ্রামে: ক্রমে ভাগীরথী বেয়ে হুগলি-বান্ডেলে। তারপর এল দিনেমারেরা। ওদের ঘাঁটি ছিল ওলন্দাজনগর, যার বর্তমান অভিধা: চুঁচুড়া। সবশেষে এসেছে ইংরেজ আর ফরাসী। প্রথমজন ইজারা নিয়েছে সূতানুটি-গোবিন্দপুর-কালীঘাট অঞ্চল; ফরাসীরা চন্দননগর। দু-আড়াইশো বছরে নিঃশেষ হয়ে গেছে বাঙালি বণিকদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি, সিংহল থেকে চম্পাঙ্গর পর্যন্ত ছিল তাদের বিচরণভূমি, বিজয়সিংহের স্মৃতিবাহী: মধুকর, সপ্তভিঙা, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি অর্ণবপোতা।

তাই অস্মাত, অভুক্ত ক্লান্ত মানুষটি উদাসনেত্রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন ওই বিচিত্র জলযানটিকে। কার জাহাজ? কোথায় চলেছে? কোন ভরসায় চলেছে বোম্বেটে-অধুষিত বঙ্গোপসাগরে?

ইহাং লক্ষ্য হল, ওই বিশাল জলযান থেকে একটি ডিঙি নৌকো জলে ডাসানো হল। দুজন মাঝি দাঁড় বেয়ে ঘাটের দিকে নিয়ে আসছে একমাত্র আরোহীটিকে। লোকটার মাথায় শামল্য ধরনের শিরক্কা, পরিধানে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে পিরাণ ও উত্তরীয়। নৌকাটি ঘাটে এসে ভিড়ল। মাঝি দুজন সাহায্য করল বাবুশাইকে ঘাটে নামতে। জুতো-জোড়া হাতে নিয়ে তিনি জল ছপছপ করতে করতে ঘাটে উঠে এলেন। রূপেন্দ্রের মনে হল লোকটি ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। উনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। কাছাকাছি এসে লোকটি পদ-স্পর্শ করে ওঁকে প্রণাম জানিয়ে বললে, ঠাকুরমশাই, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটলো বলে মার্জন চাইছি। কর্তার নির্দেশে আপনার কাছে একটি প্রাণের প্রত্যুত্তর জানতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন...

রূপেন্দ্র প্রতিমস্কর করে বলেন, কর্তা বসন্ত?

—জ্যে, ওই জলযানটা যিনি ভাড়া নিয়েছেন। আমার নিয়োগকর্তা — বঙ্গাধিপতি শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের অধীনস্থ নায়েব কানুনগো — বর্ধমানভুক্তির ইজারাদার বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্ত! আমি তাঁরই গেমস্‌মাত্র।

[এইখানে বোধহয় বলে রাখা ভালো যে, ওই 'বঙ্গাধিপতি' শব্দটা একটা উপাধিমাত্র। আমাদের কাহিনীর কালে বাস্তবে বঙ্গাধিপতি সিরাজ-উদ্দৌলার দাদামশাই নবাব আলিবর্দি খাঁ।]

রূপেন্দ্র বলেন, আপনাদের কর্তা কী করে জানলেন যে, আমি এখানে বিশ্রাম করছি ?

—আজ্ঞে, দূরবীনের সাহায্যে।

—বুঝলাম। কী তাঁর প্রশ্ন ?

—মহাশয় কি বর্ধমান সোএগ্রাই গাঁয়ের ধনুত্তরি কবিরাজমশাই ?

রূপেন্দ্র বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার পৈত্রিক নিবাস সোএগ্রাই গ্রাম এবং পেশায় আমি কবিরাজ বটে ; তবে — উপাধি ঐ যেটা বললেন, তার কোনও ভিত্তি নাই।

—তাহলে মহাশয়কে অনুগ্রহ করে আমাদের আতিথা গ্রহণ করতে হবে। কর্তামশাই আপনার সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

হঠাৎ স্মরণ হল রূপেন্দ্রের। হ্যাঁ, নগেন দত্তের আমন্ত্রণে তিনি দত্তমশায়ের স্ত্রীর চিকিৎসা করতে বছর দেড়েক পূর্বে বর্ধমান শহরে গিয়েছিলেন বটে। রোগিণীকে পরীক্ষা করেছিলেন, ঔষধের ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চিকিৎসকের প্রাণা সম্মানমর্যাদা গ্রহণ করেননি — এতদ্বন্ধে সব কথা মনে পড়ে গেল।

রূপেন্দ্র সম্মত হলেন। গোমস্তামশাই ওঁকে ডিঙিনৌকায় তুলে ওই অর্গবপোতের দিকে নিয়ে চলেন।

একে একে সব কথা মনে পড়ছে। নগেন দত্ত টাকার কুমির। বর্ধমান মহারাজের পরেই গোটা বর্ধমানভুক্তিতে ধনিকশ্রেষ্ঠ। বয়স আড়াইকুড়ি কিন্তু শরীর মজবুত। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়স বিশ-বাইশ। মূছারোগে ভুগছিলেন। স্থানীয় চিকিৎসকেরা বলেছেন রোগটার নাম: মৃগী।

কুমারী অবস্থায় কোনও উপসর্গ ছিল না। বিবাহের পর প্রথম ছয়মাসও উপসর্গ ছিল এখন ঘন ঘন মূছা হয়। শান্তি-স্বস্তান, তাবিক-কবচ, হাকিমী-কবিরাজীর হৃদমুদ করে নগেন্দ্রনাথ নৌকা পাঠিয়ে ‘ধনুত্তরি’কে পাকড়াও করে এনেছিলেন সোএগ্রাই গ্রাম থেকে।

রূপেন্দ্র প্রথামতো দ্বিতীয়া মহিলার উপস্থিতিতে রোগিণীকে পরীক্ষা করার পর নগেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন, কী বলেন বলুন, কোবরেজমশাই। আমার স্ত্রীর ওই ভুতুড়ে অসুখ সারবে ?

রূপেন্দ্র বলেছিলেন, সারবে। যদি আপনার সামর্থ্যে কুল্যায়।

সুজ্ঞিত হয়ে গিয়েছিলেন ধনকুবের: মানে ?

—আর সবাইকে চলে যেতে বলুন। কথটা গোপন। জনান্তিকে বসতে চাই।

ঘর নির্জন করে গৃহস্থমী বললেন, এবার বলুন ?

—আপনার স্ত্রীর অসুখটা দৈহিক নয়, মানসিক। রোগের মূল হেতু — যেহেতু তিনি আপনার কাছ থেকে যথাপ্রত্যাশিত স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছেন না।

বিস্ময়ে সুজ্ঞিত হয়ে গিয়েছিলেন নগেন দত্ত। বলেন, কী বলছেন আপনি ? স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছে না ! সে তো যা চায়, তাই পায়।

—না, পান না। নিশ্চয় জানেন, চিকিৎসকের কাছে কোন কিছু গোপন করতে নেই ? এবার বলুন তো দত্তমশাই — আপনি কতদিন পূর্বে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেছেন ? কবে আপনার স্ত্রীর মর্যাদা শেষবার মিটিয়েছেন ?

রূপমঞ্জুরীর সন্ধানে

নগেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল আরক্ৰিম হয়ে উঠল। রুদ্ধস্বরে বললেন, আপনার স্পর্শার তো একটা সীমা থাকবে, কোবরেরজমশাই? কতদিন আগে আমি স্ত্রীকে নিয়ে এক শয্যায় শয়ন করেছি, এই অশ্লীল প্রশ্নটা করতে আপনার বাধল না?

—প্রশ্ন করতে আমার বাধেনি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন, উত্তর দিতেই না বাধছে আপনার? শুনুন, ক্ষুৎপিপাসা-নিদ্রার মতো এও এক জৈবিক বৃত্তি। শুধু পুরুষের নয়, স্ত্রীলোকেরও! আমি জানি না, আপনার বাগানবাড়ির আয়োজন থাকে সন্তোষ কেন আপনি এই বয়সে পুনরায় দরপরিগ্রহ করেছেন। আমি পরীক্ষা করে দেখিনি, কিন্তু আমার আশঙ্কা আপনার স্ত্রী অশক্তযোনি!

—চোপরাও বেয়াদপ! — গর্জন করে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ। পিজ্জারাবদ্ধ শার্দূলের মতো বার-কয়েক কক্ষমধ্যে পায়চারি করে ফিরে এসে ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যথেষ্ট হয়েছে! আমার স্ত্রীর চিকিৎসা আপনাকে আর করতে হবে না। কী বৈদ্যবিদ্যায় দিতে হবে বলুন?

রূপেন্দ্রনাথও আসনত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। শান্ত স্বরে বলেছিলেন, আমি আপনার দেউড়ির বাইরে গিয়ে সড়কের উপর অপেক্ষা করছি। আমার জিনিসপত্র সব লোক দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিন।

নির্গমনদ্বারের দিকে রূপেন্দ্রনাথ চলতে শুরু করামাত্র নগেন্দ্রনাথ ছুটে আসেন। যেন সঙ্গিত ফিরে পান। কবিরাজমশায়ের দুটি হাত ধরে বলেন, আমার মাথার ঠিক ছিল না। অন্যায় হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না...

রূপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, না, আমি কিছু মনে করিনি। আপনি প্রচুর অর্থের মালিক। শিক্ষাদীক্ষা বোধকরি কিছু জোটেনি। আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারবেন না, এ তো প্রত্যাশিত।

এত বড় অপমান ধনকুবেরকে ইতিপূর্বে কেউ করেনি। তবু তিনি সেটা গায়ে না মেখে বলেছিলেন, আমি আপনার হাত ধরে মার্জনা শিক্ষা করছি ভেষগাচার্য। ঠিকই বলেছেন আপনি। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ আমার হয়নি। বলুন, ক্ষমা করেছেন?

—করেছি।

দুজনেই উপবেশন করেছিলেন অতঃপর। নগেন্দ্রনাথ বলেন, এরপর বলুন, কী চিকিৎসা করতে চান? ঔষধপত্রের ব্যবস্থা...

—চিকিৎসার প্রয়োজন তো আপনার স্ত্রীর নয়। আপনার। মদ্যপান রাতারাতি ত্যাগ করতে বলছি না, ধীরে ধীরে কমান। কিন্তু সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। সাত দিন ওই ঔষধই চলবে। গৃহবরোধে পরিমিতি মেনে মদ্যপান। অষ্টম দিনে তাঁর কাছে গিয়ে বলতে হবে, এইমাত্র আমাকে যা বললেন।

—বুঝলাম না। কাকে কী বলতে হবে?

—বলবেন আপনার ধর্মপত্নীকে। যেকথা এখন আমাকে বলেছেন: ‘আমি তোমার হাত ধরে ক্ষমা চাইছি। বল, ক্ষমা করেছো।’

নগেন্দ্রনাথ নতনেত্রে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। তারপর জানতে চাইলেন, শুধুমাত্র এতেই ও ভালো হয়ে যাবে ?

—আমার তাই ধারণা। বাগানবাড়ি, বাগ্‌জী বা উপপত্নীকে যে আপনি একেবারে ত্যাগ করতে পারবেন এতটা আশা করি না। কিন্তু আপনার স্নেহ, প্রেম, সোহাগ না পেলে কোনও ওষুধে ওঁর এই মূর্ছারোগ সারবে না।

নগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমি চেষ্টা করে দেখব। ক্ষমা যখন করেছেন এবার বলুন, কী বৈদ্যবিদায় দেব ?

—আজ নয়, দত্তমশাই। আমাকে বৈদ্যবিদায় দেবার অধিকার আপনাকে অর্জন করতে হবে। আত্মসংযমের মাধ্যমে। আমি যে ব্যবস্থা দিয়ে গেলাম তা যদি যথাযথ পালন করতে পারেন, আপনার ধর্মপত্নীকে সুস্থ করে নবজীবন দান করতে পারেন, তাঁকে সন্তানবতী করে তুলতে পারেন, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমি বৈদ্যবিদায় নিয়ে যাব।

—কিন্তু বৈদ্যের কাছে পরামর্শ নিয়ে বৈদ্যবিদায় না দিলে যে নরকদর্শন করতে হয়।

—একথা আয়ুর্বেদে কোথায় লেখা আছে তা আমার জানা নেই; কিন্তু জনমানসে এমন একটা সংস্কার যে আছে, তা জনি। বেশ তো, অন্তত সেই আতঙ্কেই আপনি যদি আপনার জীবনযাত্রার ছকটা পালটাতে পারেন, তাহলেই আমি খুশি।

সেই ওঁদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ।



ডিঙি নৌকাটা জলযানের গায়ে এসে ভিড়ল।

গঙ্গার জলতল থেকে অর্ণবপোতের পাটাতনের সমতল এক-মানুষ উঠতে। দড়ির মই বেয়ে জাহাজে উঠতে হল। রূপেন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হল জলযানের অভ্যর্থনাকক্ষে। উপরের ডেক-এ। নগেন দত্ত বসেছিলেন একটি আরামকেদারায়। সমস্ত্রমে গাত্ৰোত্থান করে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন আগন্তুককে। নগেনের বয়স রূপেন্দ্রের দ্বিগুণ; কিন্তু এটাই ছিল সেকালের শিল্পাচার। সোৎসাহে দত্তজী বলে ওঠেন, আমার দূরবীন তাহলে মিছে বলেনি! আপনি যথাযথই ধন্যন্তবি কোবরেজ মশাই! তা সারাটা সকাল গঙ্গাতীরে এমন নিশ্চূপ বসেছিলেন কেন? স্নানাহার তো কিছুই হয়নি আপনার। চেহারাটাই বা এমন বাড়ুজলের মতো হল কেন?

রূপেন্দ্র প্রতিশ্রুতি করে বললেন, আমার বোগিণী কোথায় ?

রূপমঞ্জুরীর সন্ধানে

—কোথায় আবার? বর্ধমানে, তাঁর অন্দরমহলে। ‘পাখি নারী বিবর্তিতা’ শোলোকটা নিশ্চয় আপনার জানা আছে, কোবরেজমশাই। আপনিও তো দেখছি ধর্মপত্নীকে বাড়িতে রেখে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে এসেছিলেন।

রূপেন্দ্র হান হাসলেন। নিজ ধর্মপত্নীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, এখন শারীরিক কেমন আছেন দত্তগৃহিণী?

—ভালো, খুব ভাল। অতিশয় ভাল। মূর্ছা আর হয় না। এখন তো তিনি শুধুমাত্র আমার স্ত্রী নন, মাসখানেক হল আমার খোকনের মা! আমার প্রতি তাঁর নজরই পড়ে না।

এবার তৃপ্তির হাসি হাসলেন রূপেন্দ্র। ঘর ফাঁকা হলে নগেন্দ্র স্বীকার করেন, মদ্যপান একেবারে ত্যাগ করতে পারিনি, বুয়েছেন না? তবে পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছি। উপপত্নীটিকেও তড়িয়ে দিতে মন সরেনি। বেচারি যাবে কোথায়? তবে আপনার বিধান আমি যে মেনে নিয়েছি, সেকথা ইতিপূর্বেই বলেছি। এবার বলুন, আপনাকে মূলতুবি বৈদ্যবিদ্যারটা দিয়ে ঋণমুক্ত হতে পারি কি না?

সরাসরি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রূপেন্দ্র বলেন, এই বিশাল অর্ণবপোত নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সিংহল, না কি চম্পানগর?

—বলব, সব বলব। তার পূর্বে আপনার স্নানাহার হোক।

রূপেন্দ্রর মনে পড়ে গেল মাহেশে ওরা বোধহয় এতক্ষণে হিরিনিচয় বৃক্কেছে যে, রূপেন্দ্র নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করেছেন। ফলে শববাহীরা তাঁর অনুপস্থিতিটাকে মেনে নিয়ে এতক্ষণে শ্মশানের দিকে যাত্রা করেছে। এমন অবস্থায় স্নানাহারে রুচি হল না ওঁর। বললেন, আমার একটি ব্রত আছে আজ, দত্তমশাই। সমস্ত দিন উপবাস। সন্ধ্যার পর হয়তো কিছু ফলাহার করব। আপনি সব কথা খুলে বলুন। এ নৌকায় কারা আছেন, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন?

নগেন দত্ত ধীরে ধীরে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন। অর্ণবপোতটি চলেছে দক্ষিণাভিমুখে। ফ্রেডরিক নগর থেকে পানিহাটি, সোদপুর, পীরের থান, উত্তোরপাড়া, ঘুসুতি হয়ে কালীঘাট। তারপর আরও দক্ষিণে হীরকবন্দর, সাগরদ্বীপ হয়ে কপিল মূনির আশ্রম। সেখানে ওঁরা গৈরিকবর্ণা গঙ্গাকে পিছনে ফেলে আশ্রয় নেবেন নীলাম্বরশির কোলে, বন্দোপসাগর। যাবেন দক্ষিণ-পশ্চিমে। বড়িবালামের মোহনায় বালেশ্বর অতিক্রম করে মহানদীর ব-দ্বীপে। তারপর মহানদীর ‘বডগঙ্গা’ ধরে কটক। সেখান থেকে পদব্রজে একামুকনাম সাধীগোপাল-কমলপুর-আঠাঝোনালা হয়ে নীলাচলের শ্রীক্ষেত্র। ওঁদের গন্তব্যস্থল সেই: আদি অকৃত্রিম-সর্বতীর্থসার: পুরুষোত্তমক্ষেত্র।

রূপেন্দ্র জানতে চাইলেন, সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়েই যখন যাচ্ছেন তখন আংশিক তীর্থপথ পদব্রজে যেতে হচ্ছে কেন? কেন সবদিকি পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই জাহাজ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না?

জবাবে দত্তজা বুঝিয়ে বললেন, পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা পুরী সমুদ্রতীরে বটে, কিন্তু সেখানে কোনও বন্দর নেই। বেলাভূমি থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ সমুদ্রের ভিতরে ছাড়া জাহাজ নোঙর

করা যায় না। জাহাজের তলদেশ আটকে যায়। এজন্য তাম্রলিপ্তি বা কটকের বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো ছাড়া উপায় নেই। যাত্রীরা বাকি পথ যখন পদব্রজে যাবে ও আসবে ততক্ষণ বন্দরে জাহাজকে প্রত্যাবর্তন যাত্রার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বণ্ড ফেরাতে হবে। টুকটাক মেরামত করতে হবে। বহু পূর্বযুগে — বাঙালার বাগিঙ্গা যখন মধ্যগগনে, তখন এভাবেই গৌড়বাসী শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যেত। পরে এ-পথ পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারে বন্ধ হয়ে যায়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য কাটোয়া-শান্তিপুর থেকে যাত্রা শুরু করে গঙ্গাঘাট থেকে ভাগীরথী ত্যাগ করে মেদিনীপুরের অরণ্যপথে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন।

রূপেন্দ্র বললেন, জানি। একসময়ে আমার গুরুদেব শ্রীমৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীচৈতন্যদেবের পদরেখা ধরে জগন্নাথধামে পদব্রজে যাবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে আমার গুরুদেবের পিতৃদেব রঘুদেব তর্কবাগীশও শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্নরেখা ধরেই শ্রীক্ষেত্রে তীর্থদর্শনে যান। তাঁর শ্বশুরমশাইও যান এবং সপ্পাদেশ পান যে, তাঁর কন্যার গর্ভে এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুত্রের জন্ম হবে। বস্তুত, স্বয়ং জগন্নাথ সপ্পাদেশে আমার গুরুদেবের নামকরণ করেছিলেন: জগন্নাথ। সে যাই হোক, গুরুদেবের নির্দেশে সে-সময় আমি বিভিন্ন গ্রন্থ বিচার করে শ্রীচৈতন্যদেবের পথ পরিক্রমার একটি সম্ভাব্য মানচিত্র প্রণয়ন করেছিলাম।

নগেন দত্ত বলেন, এ তো বড় আশ্চর্যের কথা! ঠিক ওই কাজটিই যে বর্তমানে করানো হচ্ছে জগৎশেঠের অর্থনুকূল্যে। রাজা জগৎ শেঠ সেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পদচিহ্নলঙ্ঘিত তীর্থপথটি সংস্কার করতে চান। আপনি এ-বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন?

রূপেন্দ্র বলেন, এ-বিষয়ে আমার আদৌ কোনও উৎসাহ নেই। শ্রীচৈতন্যদেব যে-পথে জগন্নাথধামে গিয়েছিলেন সেই পথরেখা ধরে একটি রাজপথ নির্মিত হলে আমি খুশিই হব; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হব দেখলে যে ধনকুবের জগৎশেঠ উৎসাহী হয়েছেন অন্য একটি সামাজিক পথের সংস্কার করতে যে-পথে যুগাবতার যেতে পারেননি; কিন্তু যে-পথে যেতে পারলে খুশি হতেন।

নগেন দত্ত বলেন, বুঝলাম না।

—স্বাভাবিক। এ-বক্তব্যের গূঢ়ার্থ সহজে বোঝা যায় না দত্ত-মশাই। তবে আপনি যে-পথের সন্ধান করছেন, তার ইঙ্গিত পাবেন কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বাই, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এবং মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি পুঁথিতে সন্ধান করলে। মোটামুটি আমার স্মৃতিপটেও আছে — তাম্রলিপ্তি থেকে মেদিনীপুর আস্তিত্ব করে উনি নারায়ণগড়, দত্তপুর, জলেশ্বর, রেমুণা হয়ে ভদ্রক জনপদে এসেছিলেন চত্বরপুর বাজপুর-পুরুষোত্তমপুর-চৌধুরা হয়ে শহর কটক। বাকি পথ তো আপনারাই পরিক্রমা করবেন: একাধিকানন, সাক্ষীগোপাল, আঠারোনালা হয়ে শ্রীক্ষেত্র।

নগেন দত্ত ওঁর হাত দুটি ধরে বলেন, পথের বর্ণনা তো দেখছি আপনার মুখস্থ। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে যাবেন? আমাদের জলখানে একশো বাইশজন নরনারী-

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

—অধিকাংশ বর্ধমানভুক্তির। সঙ্গে কোনও কবিরাজ নেই! আপনার যদি উপস্থিত কোনও আরদ্ধ কাজ না থাকে...

রূপেন্দ্র বললেন, কিন্তু আমি যে বর্তমানে কপর্দকহীন, একবস্ত্রে নগ্নপদে গঙ্গাতীরে বিজ্রাম করছিলাম, এ তো আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন!

নগেন দত্ত বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আজ্ঞে না কবিরাজমশাই! আপনি আদৌ কপর্দকহীন নন। আমাকে ঋণমুক্ত হবার অনুমতি দিলে আমি স্বয়ং এ-দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি। যাত্রীদের সকলে আপনার প্রতি আনুত্যা কৃতার্থ হয়ে থাকবে। যেহেতু আমাদের দলে একজনও চিকিৎসক নেই। ঘটনাচক্রে আপনাদের সোএগ্রই গ্রামের একজন বৃদ্ধও চলেছেন আমাদের সঙ্গে। গ্রাম সম্পর্কে আপনার খুঁজামশাই — শ্রীদুর্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

যেন প্রতিবর্তী প্রেরণ। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ গাঙ্গুলীমশায়ের চতুর্থপক্ষটির কথা — রূপেন্দ্রের বাল্যসহচরী মৃন্ময়ী — মীনু। রূপেন্দ্রের চেয়ে নয় বছরের ছোট, প্রতিবেশী পীতাম্বর মুখজ্জের কন্যা। গুরুগৃহ থেকে বাৎসরিক একমাসের জন্য প্রত্যাবর্তনের নিয়ম ছিল জগন্নাথ পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে — শারদীয় অকালবোধনের সময়। নাহলে পিতামাতা, পরিবার থেকে ছাত্র মার্মনিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে — এই ছিল ত্রিবেণীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের অভিমত। তাই রূপেন্দ্রও বছরে একবার করে সোএগ্রই গ্রামে ফিরে আসতেন। বছরে বছরে দেখেছেন মীনুকে — বালিকা থেকে কিশোরীতে রূপান্তরিতা হতে।

“পহিলে বদরিসম, পুনঃনবরজ। দিনে দিনে অনঙ্গ আবরিল অঙ্গ”। দুজনের অন্তরের অন্তরালে যে রঙ ধরেছিল সেটা উপলব্ধি করা গেল বড় বিলম্বে। উপাধি নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে রূপেন্দ্র দেখেছিলেন নয় বছরের অনুজা মীনু ইতিমধ্যে হয়ে গেছে গুঁর খুঁড়িমা। রূপেন্দ্র যখন সঙ্গীক তীর্থ পরিক্রমায় যাত্রা করেন, তখন দুর্গা গাঙ্গুলীর ওই চতুর্থপক্ষের পত্নীটি ছিলেন সম্মানসম্ভবা।

সে-কথাই মনে পড়ে গেল। তাই বললেন, গাঙ্গুলীখুঁড়ো তীর্থে চলেছেন? এ তো বড় অদ্ভুত সংবাদ। তিনি তো তাঁর তেজরতি কারবার নিয়েই মেতে ছিলেন তিনকুড়ি বছর —কোনদিন গাঁয়ের বাইরে যাননি।

নগেন দত্ত বলেন, জানি। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। সেই আঘাতেই বৃদ্ধ কেমন যেন ভেঙে পড়েছেন। ডাকব তাঁকে? কথা বলবেন?

রূপেন্দ্র শিউরে উঠেছিলেন মৃন্ময়ীর মৃত্যুসংবাদে। কোনক্রমে বললেন, না! না! না!

নগেন্দ্র সে-আর্তনাদে রীতিমত অবাক হয়ে যান। তিনি তো জানেন না, ওই যুবকটি একই দিনে পেল দু-দুটি নারীর মৃত্যুসংবাদ, যারা-দুজনই তাঁকে প্রাণাধিক ভালবেসেছিল!



রূপেন্দ্রনাথ স্নিকৃত হয়েছেন। এই তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে জগন্নাথক্ষেত্রে যাবেন তিনি। হেতুটা যে কী, তা আন্দাজ করতে পারেননি নগেন্দ্র। এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন মানসিকভাবে রূপেন্দ্র পীড়িত। কী একটা অস্বাভাবিক বেদনা গোপনে বাহে বেড়াচ্ছেন। সে এমন একটি আঘাত যার ক্ষতচিহ্ন নীরবে নিভতে লুকিয়ে রাখতে হয়। সর্বদাই আত্মমগ্ন হয়ে বসে থাকেন। পূর্বের মতো প্রাত্যহিক পূজা-অর্চনাদি করেন না তিনি — কিন্তু ধ্যান করেন। কথাবার্তা বড় একটা বলেন না কারও সঙ্গে। কখনও কখনও লক্ষ্য করেছেন নগেন্দ্র — এ নিঃসঙ্গ নায়কটি মধ্যরাত্রে একা বসে আছেন পদ্মাসনে নৌকার গলুইয়ে। নগেন দত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। হেতুটা জানতে চাননি। ব্রাহ্মণকে আত্মস্থ থাকতে দিয়েছেন। এমনকি তিনি প্রথম দিন যেভাবে দুর্গাচরণের সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেন, তাতে সংবাদটা তিনি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছেও গোপন রেখেছেন। কবিরাজমশায়ের যাবতীয় নিতানৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জীবনযাপনের উপকরণ লোক পাঠিয়ে সংগ্রহ করেছেন — ধূতি, পিরাণ, পাদুকা ইত্যাদি।

রূপেন্দ্র জগন্নাথক্ষেত্রে যেতে স্নিকৃত হলেন এ-কারণে নয় যে, পত্নী-বিয়োগে তীর্থ তাঁকে আকর্ষণ করছিল; এ-কারণে নয় যে, এই নৌকার শতাধিক নর-নারীর অসুখ-বিসুখে তিনি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করার নেই। তিনি মনস্তির করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন হেতুতে:

তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন। কুসুমমঞ্জরী তাঁকে মুক্তি দিয়ে গেছে। মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁকে পাথের ইঙ্গিতও দিয়ে গেছে। যুগাবতার এসেছেন, এখনও প্রকট হননি, এই বিশ্বাসে আজীবন পরশপাথর খুঁজে মরার কোনও অর্থ হয় না। যেটুকু ওঁর ক্ষমতার ভিতর সেটুকুই করবেন। ‘কর্মণ্যেবাহিকারস্তে’। সমাজের দু-দুটি হিমালয়াজিক ত্রুটি সম্বন্ধে ব্যথিত হয়েছেন উনি। কিন্তু হিন্দু-সমাজের ওই বিরাট অবহেলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ — যাদের ডল-অচল, অচ্ছুৎ করে সরিয়ে রেখেছে কুপমণ্ডক ব্রাহ্মণ্যসমাজ, তাদের নিয়ে আন্দোলন একা-হাতে করা যায় না। অপর ক্ষতটার নিরাময়ের চেষ্টা তিনি নিজেই করতে পারেন। অন্তত শুরু করতে পারেন। নিখাতিতা নারীসমাজকে স্বমহাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মৈত্রেয়ী গাণীর যুগ চলে গেছে। বৈদিকযুগের ত্রিশিষ্কার দ্বিধারা — ব্রহ্মবাদিনী ও সদোদ্বাহা — অবলুপ্ত হয়ে গেছে বহু বহু যুগ অতীতে। বহুত, আর্ষাবর্তে মুসলমান আগমনের পর থেকেই। তার পূর্বযুগে বৈদিক ও উপনিষদের যুগে পুরুষের মতো স্ত্রীলোকদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার ছিল। তাঁদের উপনয়ন হতো, তাঁদের ব্রহ্মচর্য পালন করতে হতো। যাঁরা আজীবন দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় নিরত থাকার স্বপ্ন করতেন, তাঁদের বলা হতো ‘ব্রহ্মবাদিনী’। তাঁদের পক্ষে আশ্রমিক, চিরকুমারী বা বিগতভর্তী হবার কোনও আবশ্যিক পূর্বশর্ত ছিল না। অনেকেই সীমন্তিনী। সংসারধর্ম পালনের অবকাশে তাঁরা

রূপমঞ্জুরীর সন্ধান

যোগসাধনা করতে পারতেন। রাজবৈভব যেমন রাজর্ষি জনকের সাধনমার্গে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি, ঠিক তেমনি কাশীরাজ-মহিষী মদালসাও স্মী-সংসার-পুত্র-কলত্র-দাসদাসী পরিবেষ্টিত হয়েও রাজান্তঃপুরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী হতে পেরেছিলেন। পঙ্কসরোবরে ভাসমান রাজহংসীর মতো মহারানী মদালসা রাজবৈভবের মধ্যেও ছিলেন নিম্নলঙ্ঘ। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। সীমন্তিনী হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মচারিণী।

এছাড়া ছিল আর এক শ্রেণীর ছাত্রী। তারা ঈশ্বরতত্ত্বের সন্ধানী নয়। তাদের অক্ষর-পরিচয় হতো, কিছুটা ব্যাকরণ, এবং অলঙ্কার, নানা শ্রেণীর কাব্য। সচরাচর প্রাগ্‌বিবাহ কালেই বিদ্যাচর্চার আয়োজন হতো বটে, তবু প্রথম যুগে বিবাহিতা ও বিগতভর্তা অবস্থাতেও কেউ কেউ এ-জাতীয় বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন। তাঁদের বলা হতো; 'সদ্যোদ্ধায়া'।

এই দু-শ্রেণীর বিদ্যোৎসাহিনী মহিলার দলই প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো নিঃশেষে অবলুপ্ত।

রূপেন্দ্র স্থির করলেন: সেই পরিবেশটি উনি ফিরিয়ে আনবেন। ধর্মপত্নীর কাছে উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কুসুমমঞ্জুরীকে হিনিয়ে নিয়েছেন মহাকাল, কুপমণ্ডক সমাজপতিদের সাহায্য পেয়ে। তাই রূপেন্দ্র স্থির করলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণ করবেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সেএগ্রই প্রত্যাবর্তন করে তিনি শুধুমাত্র স্থীলোকদের জন্য একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। অনেক অনেক বর্ষকু পরিবারে তিনি চিকিৎসক হিসাবে অপরিদীম প্রদ্বার মানুষ। 'একবগ্না ঠাকুর'কে সবাই ভালবাসে। জমিদার ভাদুড়ীমশাই ঠেকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বিদ্যায়তনটি শুধুমাত্র বালিকাদের জন্য হবে না, যুবতী এবং বিবাহিতা, বিধবাদের জন্যও। বুদ্ধিমান রূপেন্দ্রনাথ বুঝেছেন, ওঁর এই প্রচেষ্টায় মুষ্টিমেয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গ্রামবাসী গোপনে সহানুভূতি জানালেও তাঁকে কুপমণ্ডক স্মার্তপণ্ডিতদের করতলগত বিরাট সংস্কারচ্ছন্ন মানুষের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। তারা যুক্তি বোঝে না, নিজেদের মজল বোঝে না, সমাজের উন্নতি বোঝে না — বোঝে অর্কফলার আন্দোলন, বোঝে শাস্ত্রাবাক্য: 'তট-তট-তট-তোটয়'।

তাই উনি স্বীকৃত হয়েছেন এই তীর্থযাত্রীদের সহযাত্রীরূপে জগন্নাথধামে যেতে। ওঁর লক্ষ্যস্থল পুরীমন্দিরের সেই ত্রিমূর্তি নয়, সমুদ্রতীরে গোবর্ধন মঠের মঠাধীশ শ্রীমৎ স্মী-শঙ্করাচার্য।

শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য দশনামী সম্প্রদায়কে একসূত্রে আবদ্ধ করে ভারতবর্ষের চারপাশে চারটি মঠ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। বহুধারায় বিচ্ছিন্ন হিন্দুধর্মকে দশনামী সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করার সেই প্রথম প্রয়াস:

দ্বারকাশ্রমে সামবেদাশ্রয়ী সারদামঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: পশ্চিমখণ্ড: সিদ্ধ, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতানা এবং কাথিয়াবাড়।

বদরীকাশ্রমে অথর্ববেদাশ্রয়ী যোশীমঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: উত্তরখণ্ড: কুরু, পাঞ্চাল, পঞ্জাব, কাশ্মীর, কপোজ এবং গঙ্গা-যমনাব্দ অববাহিকার মধ্যবর্তী অর্ধবর্তে ভূভাগ।

রামেশ্বরমাশ্রমে যজুর্বেদাশ্রয়ী শূদ্রেরীমঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: দক্ষিণখণ্ড: অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাটক, কেবল ও মহারাষ্ট্র।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ঋকবেদাশ্রয়ী গোবর্ধন মঠ, যার ভৌগোলিক সীমানা: পূর্বখণ্ড: অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও পূর্বাঞ্চল।

ভেষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য গোবর্ধন-মঠাধ্যক্ষ পূর্বাঞ্চলের শঙ্করাচার্য। আদি শঙ্করাচার্য বিধান দিয়ে গেছেন এই চার ধামের চার মঠাধ্যক্ষ সমস্ত ভারতবর্ষে অতঃপর হবেন হিন্দুধর্মের রক্ষক ও অভিভাবক। ফলে অস্তুত পূর্বাঞ্চলে — অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে — হিন্দুসমাজের কাছে ‘নিদান’ হাঁকার অধিকার গোবর্ধনমঠের শঙ্করাচার্যের। তিনি যদি রূপেন্দ্রনাথকে ভূক্তিপত্রে এক স্বীকৃতিপত্র লিখে দেন যে, হিন্দুধর্মে খ্রীশিক্ষার বিষয়ে কোনও বিধিনিষেধ নাই তবে সেই সনদটিই হবে রূপেন্দ্রনাথের অধিকারপত্র। কৃপমণ্ডক সমাজপতি-জ্যেষ্ঠের মুখে ঐ সনদটি হবে লবণের মতো। গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি নিঃসংশয় যে, ভূম্যধিকারী আধুনিকমনা ভাদুড়ীমশাই ওঁকে সমর্থন করবেন। এই বিদ্যায়তনটি হবে খ্রীশিক্ষাসদন। শুধু বালিকা নয়, কিশোরী, যুবতী, বিবাহিতা, বিগতভর্তার দলও এসে অনায়াসে-ভর্তি হতে পারবে তাঁর খ্রীশিক্ষাসদনে। তারা শিখবে প্রাচীন বাংলা হরফ, দেবনাগরী হরফ; পড়বে কৃত্তিবাস থেকে কালিদাস। কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ — না, দর্শন আবশ্যিক পাঠ্য নয়, কিন্তু অঙ্ক, নৃদকযা, হিসাবরাখা, এবং সজ্ঞানপালনের আদিপাঠ হবে আবশ্যিক। সোঃগ্রাই গ্রামে ওই জয়ধ্বজটি প্রোথিত করে, রূপেন্দ্র যাবেন দিগবিজয়ে। আদি শঙ্করাচার্য করেছিলেন ভারতবিজয়, উনি করবেন বঙ্গবিজয়। প্রথমে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে। নদীয়ারাজ ওঁর পৃষ্ঠপোষক। জনশ্রুতি তিনি প্রাচীনপন্থী, কিন্তু নিঃসন্দেহে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান। রূপেন্দ্র নিশ্চয় পারবেন তাঁকে স্বমতে আনতে। নিশ্চয় তিনি গোয়াড়িতে, শান্তিপুরে, উলায়, নবদ্বীপধামে খ্রীশিক্ষাসদন প্রতিষ্ঠা করবেন। তারপর বর্ধমানরাজ। উত্তরে নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায় যৌর দেহাবসানে রানী ভবানী পাঁচ বছরের ভিতরেই হবেন নাটোরের শাসনকর্ত্রী — তারপর মুর্শিদাবাদে গিয়ে ধরবেন জগৎশেঠকে।

রূপেন্দ্রের মনোগত ইচ্ছা গোবর্ধনমঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কাছ থেকে খ্রীশিক্ষা বিষয়ক অনুমতিপত্রটি লাভ করার পরে তিনি তাঁর কাছে হিন্দুসমাজের আর একটি মারাত্মক কুপ্রথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন: সতীদাহ। এই নৃশংস লোকাচার তো মুসলমান সমাজে নেই, খ্রিস্টানদের ভিতর নেই। তাদের সমাজে তো বিগতভর্তার দল সম্মানে টিকে আছে। সমাজের কাঠামো তো কই ভেঙে পড়েনি। তাহলে হিন্দুসমাজেই বা ওই নির্দয় প্রথাটিকে বাঁচিয়ে রাখার কী অর্থ? বৈদিক শাস্ত্রে তো নয়ই, এমনকি পৌরণিক যুগেও সতীদাহের প্রসঙ্গ সামান্যই। সম্ভবত স্বেগুলি পরবর্তী যুগের কৃপমণ্ডকেরা সুকৌশলে পুঁথি অনুলিপিকালে যোগ করেছে। তাই প্রামাণিক কোনও শাস্ত্র এ-নির্দেশ দেয়নি যে, স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় তুলে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারতে হবে। এ-বিষয়ে রূপেন্দ্রের ব্যক্তিগত ভিত্তি অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এই কুপ্রথাটি রদ করার বিষয়েও তিনি আগ্রহী। গোবর্ধনমঠের শঙ্করাচার্য যদি উৎসাহ দেখান, তাহলে তিনি ওই প্রস্তাব নিয়ে ভারত-পরিক্রমা করবেন। চার মঠের শঙ্করাচার্য-চতুষ্টয়ের যৌথ সনদ নিয়ে দিল্লীশরের কাছে দরবার করবেন। প্রয়োজনে ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে।

নগেন দত্ত এসব কিছু অনুমান করেননি। রূপেন্দ্রও তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনও আলোচনা করেননি। নগেন দত্ত ধনী, কিন্তু এসব সামাজিক কুসংস্কার নির্মূল করার বিষয়ে

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

তত্ত্বকথা আলোচনা করার মতো শিক্ষা তাঁর নেই।

দুর্গা গাঙ্গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে; কিন্তু কী-জানি-কেন তিনি রূপেন্দ্রকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। সামান্য কুশল প্রশ্ন করেই অন্তরালে সরে গেছেন। রূপেন্দ্রের মনে হল, তিনি ওঁকে দেখে খুশি হতে পারেননি। দুর্গা যেন কী এক অপরাধবোধে ভুগছেন। কুসুমমঞ্জরীর প্রশ্ন আদৌ উত্থাপন করেননি। রূপেন্দ্র খুড়িমার প্রসঙ্গ তোলার উপক্রম করতেই দুর্গা গাঙ্গুলি বললেন, সে তো ভাগ্যবতী রূপেন — আমাকে ফেলে রেখে সতীলক্ষ্মী ডাংডেঙিয়ে স্বর্গে চলে গেল। আমারই ভবিতব্য—

বলেই পাশ কাটালেন।

মীনুর কথা মনে পড়ে। মীনু আর ওঁর পিসতুতো বোন কাত্যায়নী সমবয়সী, বান্ধবী। সেই সূত্রে বালিকা বয়স থেকেই পীতু মুখুজ্জের ওই মেয়েটি — মীনু — এ-বাড়ি আসতো। দিনরাত রূপেন্দ্রের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করত। রূপোদার হাত ধরে রথের মেলায়, গাজনের সঙ দেখতে বা গীরপুরে মহরমের তাজিয়া দেখতে গেছে। ঘুমিয়ে পড়লে কোলে করে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। তখন মীনুর বয়স-পাঁচ-ছয়, তাহলে তার রূপোদার কত ? চোদ্দ-পনের।

তারপর মীনু যখন মৃন্ময়ী, তখন ? মনে পড়ছে আর একদিনের কথা। মীনু তখন একাদশবর্ষীয়া কিশোরী। বঙ-দোলের দিন। মীনু এসেছিল তার রূপোদার বাড়ি কাতুকে রঙ দিতে। কাতু কোথায় বসি লুকিয়ে বসেছিল ঘাপটি মেরে। মীনু আনাচে-কানাচে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল রূপোদার। রূপোদার হাতে একটা আবীরের গুটিলি। দোর আগলে সে বলেছিল, এবার ?

বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠেছিল কিশোরী মেয়েটির। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে, কেউ কোথাও নেই। কী সর্বনাশ ! এখন যদি ওই তালচাঙা ছেলোটা ওকে বুকে টেনে নেয়। ওর মুখে, বুকে, সর্বদে...

দূরন্ত লজ্জায় থমকে থেমে দু-হাতে মুখ ঢেকে মীনু বলে উঠেছিল, ন-না।

রূপেন্দ্রনাথ ও থমকে থেমে গিয়েছিল। ওর অতঙ্কতড়িত কচি মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। অবাধ বিস্ময়ে জানতে চেয়েছিল, কী ব্যাপার রে মীনু ? কাকে এত ভয় ? আমাকে না আবীরকে ?

মুখ থেকে হাত সরায়নি। ও শুধু পুনরাবৃত্তি করেছিল : ন-না।

রূপেন্দ্রনাথ বলেছিল, দূর বোকা ! আবীরের দাগ কি চিরকাল মুখে থাকে ? ও তো ধুলেই উঠে যায়।

ছেড়ে দিয়েছিল মীনুকে।

আজ বুঝতে পারেন, মৃন্ময়ী হতাশ হয়েছিল তাকে বোকা মেয়েটা আশা করেছিল — এ তালচাঙা ছেলোটা ওর আপত্তিতে কান দেবে না। জোর করে বুকে টেনে নিয়ে ওর মুখে, গলায়, বুকে... সেদিন তা বুঝতে পারেননি রূপেন্দ্র।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের — সেই বাল্যসহচরী মৃন্ময়ী — মীনু—আজ অমর্ত্যলোকের বাসিন্দা।



অর্ণবপোত ইতিমধ্যে দক্ষিণদিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ঘুসুড়ি, হাওড়া, কালীঘাট, উলুবেড়িয়া অতিক্রম করে রূপনারায়ণের মিলনস্থল। জাহাজের কর্ণধার এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। নদীপথে জাহাজ চালানোতে তার কোনও ভূমিকা নেই। জাহাজের দায়িত্বে আছে ‘গাঙ-সারেঙ’। নদীপথে সব কিছু তার নখদর্পণে। সে জানে কোন্ দিকে, কোথায় চড়া পড়েছে, কোথায় ডুবো-চর, আর কোন দিকে বড়গঙ্গার গভীরতর খাদ। তার দুই সহকারী জলযানের দু’পাশে বসে ক্রমাগত জল মেপে যাচ্ছে : একবাম মে-লে-না; দু’বাম মে-লে-না।

রাতে জাহাজ চলে না। তার দক্ষিণাভিমুখে ভেসে-চলা শুধু দিবাভাগে। হাওয়া এখন দক্ষিণ দিক থেকে। ফলে পাল অকেজো। জোয়ারেব সময় জাহাজ নোঙর করে রাখতে হয়। শুধুমাত্র তাঁটার অমোঘ আকর্ষণে জাহাজ এগিয়ে চলে দক্ষিণাভিমুখে কপিলমুনির আশ্রমের দিকে।

জাহাজ যখন নোঙর করা থাকে, তখন শুরু হয় সমবেত হরিসংকীর্তন। যাত্রীদের বৃকোদরভাগ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। খোল-করতাল সঙ্গে নিয়েই এসেছে তারা। নগেন দত্ত রূপেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন প্রতিদিন কিছু কিছু করে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে, যাতে যে-পথে ওরা যাচ্ছে বা যাবে, তার সম্বন্ধে কিছুটা পূর্ব-পরিচয় হয়ে থাকে। রূপেন্দ্রনাথ কথক নন, তবু তিনি যখন দেখলেন তাঁর শ্রোতার দল অত্যন্ত আগ্রহে তাঁকে বারে বারে অনুরোধ করছে, তখন তিনি স্নিক্ত হলেন। সূর্যাস্তের পর জাহাজ চালানো বিপদজনক। তাই সন্ধ্যায় গাঙ-সারেঙ লোহার নোঙর নামিয়ে দিত। জলযান স্থির হত। অল্প অল্প দুলত মা-গঙ্গার দোলনিতে। রোজ ঝরু দল বেঁধে এসে বসতো — সন্ধ্যার সময়। রূপেন্দ্রনাথ বর্ণনা করতেন শচীনন্দনের প্রথম নীলাচল অভিযানের কাহিনী :

তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁর কয়েকজন প্রিয় শিষ্যসহ শান্তিপুর থেকে পুরষোত্তম-ক্ষেত্রের তীর্থপথে যাত্রা করলেন। আচার্য অদ্বৈত শহরপ্রাপ্ত পর্যন্ত এসে প্রাণের ধন নিমাইকে আশ্রয় করে বিদায় নিলেন। সাশ্রলোচন শান্তিপুরবাসীদেরও ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

সঙ্গে চললেন কয়েকজন মাত্র শিষ্য। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখেছেন :

“নিত্যানন্দ গৌসাক্ষি, পণ্ডিত জগদানন্দ

দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ।”

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

ওই সঙ্গে যোগ দিতে হবে শ্রীগোবিন্দ দাস কর্মকারের নাম। কারণ নিজ কড়চায় গোবিন্দদাস লিখেছেন : “প্রভুর সহিত যাই নাচিতে নাচিতে।”

ভাগীরথীর পূর্ব-উপকূল ধরে দক্ষিণাভিমুখে চললেন ওঁরা। কোনও পাথের সঙ্গে নেবার অনুমতি ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি শুধু সন্ন্যাসদণ্ড, করঙ্গ, কৌপীন আর বহির্বাস। জীবনধারণের আব কী উপকরণ চাই? আহর?

“প্রভু যারে যে দিনে বা না লিখেন আহর।

রাজপুত্র হউ তভো উপবাস তার।।”



চরিতকারেরা শান্তিপুর এবং আঁটিসারাব মধ্যবর্তী স্থানগুলির কোনও উল্লেখ করেননি। এইখানে কিছু ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এ পথের সন্ধান কোথা থেকে কী করে পেলাম। সেটি পেয়েছি বর্তমান লেখকের অনুজপ্রতিম ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দের গ্রন্থে। অচ্যুতানন্দ অনুমান করেছেন ভাগীরথীর পূর্ব তীর দিয়ে “ত্রিবেণী, নৈহাটি, খড়দহ, পানিহাটি, চিত্রপুর, কালীঘাট, চূড়াঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রসা গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাইনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর পার হয়ে প্রভু বারুইপুর গ্রামের কাছে আঁটিসারায় এসে উপস্থিত হলেন।”

চৈতন্যভাগবত এসব স্থানের উল্লেখ করেননি। সংক্ষেপে বললেন, “উত্তরীলা আসি আঁটিসারা নগরেতে।”

আঁটিসারা গঙ্গাতীরের অতি প্রাচীন একটি গ্রাম। বর্তমান নাম আটঘরা। বারুইপুরের পুরনো বাজারের ভিতর দিয়ে দেড়-দু’মাইল এগিয়ে গেলে লুপ্তশ্রোতা গাঙ্গের মরা খাত এখনো দেখা যায়। তার পলিমাটির স্তরের নিচে এখানে প্রাচীন রোমক, মুদ্রা, মৌর্য ও কুষাণযুগের তৈজস ও পোড়মাটির যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই আঁটিসারা গ্রামে প্রভু মিলিত হয়েছিলেন তাঁর পরমভক্ত অনন্তরাম পণ্ডিতের সঙ্গে। মিলনস্থলে একটি চৈতন্যমন্দির আজও বর্তমান। এখনও বৈশাখ মাসে সেই অনন্তরামের ক্রীড়াতে পঞ্চকালব্যাপী মেলা হয়, অষ্টগ্রহর চলে নামসঙ্কীর্তন।

শ্রীচৈতন্য অতঃপর গঙ্গার তীর ধরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে চলেছেন। পশ্চিম পাড় নয়, পূর্ব পাড়। চৈতন্যের সমকালীন গৌড়ধিপতি নবাব হুসেন শাহর রাজ্যের দক্ষিণতম সীমা ছিল ‘হরভোগ’। চৈতন্যদেব নামগান করতে করতে এগিয়ে চলেছেন সেই হরভোগের

দিকে। পথে গঙ্গাতীরের যেসব জনপদ পড়ল, আজ তারা হুগলি নদী থেকে অনেকটা দূরে। কারণ ভাগীরথীর জলধারা সরে গেছে। গৌরসুন্দরের পদরজ্জ্ব সেই সব জনপদের নাম : বারুইপুর, দক্ষিণ বারাসাত, সরিষাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটি। শেষ সীমান্ত : ছত্রভোগ।

“এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।

আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতূহলে।”

সে-আমলে ছত্রভোগের জমিদার ছিলেন রাজা রামচন্দ্র খান। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় চৈতন্যদেব গঙ্গার ওপারে, অর্থাৎ পশ্চিমপারে যাবার চেষ্টা করলেন। কাজটি কঠিন। এখানে গঙ্গার বিস্তার ভয়ানক — ঢেউ প্রচণ্ড; কিন্তু আসল বিপদ রাজনৈতিক। গঙ্গার পশ্চিমপার উৎকলরাজের শাসনাধীন। চৈতন্যদেবের সমকালীন গৌড়ধিপতি হুসেন শাহর সঙ্গে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেবের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। খেয়াঘাটের বন্দোবস্ত নেই। এপারের মানুষ ওপারে যায় না। ওপারের লোক এপারে আসে না।

তবু রাজা রামচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় একটি বড় নৌকার আয়োজন হল। স্থির হল রাতারাতি নৌকায় যাত্রীরা ওপারে যাবেন। শান্তিপুর থেকে আঁটিসারা পদযাত্রার বর্ণনা পদকর্তারা অধিকাংশই সংক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু এই গঙ্গা পারাপারের বর্ণনায় প্রায় সকল কবিই বাধ্য।

বিভিন্ন কড়চা অব্ধেষণ করে চৈতন্যদেবক অনুজপ্রতিম ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দ গঙ্গা পারাপারের যে বর্ণনাটি দিয়েছেন (নীলাচল অভিসার) তারই সংক্ষিপ্তসার এখানে লিপিবদ্ধ করি। ধরে নেওয়া যাক, নগেন দত্তের অর্ঘবপোতে যাত্রীদের কাছে আমাদের কাহিনীর নায়ক রূপেন্দ্রনাথও এই বর্ণনা দিয়েছিলেন :

ছত্রভোগের রাজা রামচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় এক ভক্ত ব্রাহ্মণের ভদ্রাসনে সশিষ্য চৈতন্যদেবের অতিথের ব্যবস্থা হয়েছে। ভক্তের ভিটায় ঘর মাত্র দুটি। এতগুলি শিষ্যের শয়নব্যবস্থা কী করে হবে? ওঁরা স্বামী-স্ত্রী বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেও। আহ্বারের আয়োজনই বা কী করবেন? সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন নিত্যানন্দ। বিব্রত ভক্ত বৈষ্ণব দম্পতিকে অন্তরালে টেনে এনে বললেন, শয়নের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছেন কেন? আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। চাঁদের আলোয় আমরা তো সরাসরাত আপনার প্রাঙ্গণে নামগান করব। আপনি বরং তুলসীমূলে কিছু আলপনা দেবার ব্যবস্থা করুন। আর একটি কাংসপাত্রে কিছু বাতাসা — ‘হরির চুট’ দিতে হবে তো!

ব্রাহ্মণ প্রতিবাদে কী যেন বলতে গেলেন। বলা হল না। তার পরেই তেঁসে এল সমবেত নামগান :

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

ব্রাহ্মণ তবু কিছু বলতে গেলেন। ফলে ধমক খেতে হল প্রভু নিত্যানন্দের কাছে : কেমনতর বৈষ্ণব আপনি? নামগান শুরু হয়ে গেছে — এখনও আহ্বার-নিদার কথা চিন্তা করছেন?

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

ব্রাহ্মণীর দিকে ফিরে বললেন, আপনি মা, ওই আলপনা আর বাতাসার ব্যবস্থাটুকু করে দিন শুধু। বাদবাকি দায়দায়িত্ব এই ছেলের উপর দিয়ে যান।

অবগুণের আড়ালে সম্মতি জানিয়ে ব্রাহ্মণী ছুটলেন অন্দরে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এলেন রাজা রামচন্দ্র। পণ্ডিত জগদানন্দকে জনান্তিকে টেনে নিয়ে এসে বললেন, নৌকা প্রস্তুত। এই শেষ রাত্রিই প্রশস্ত সময়, সেই সময় উৎকলী প্রহরীদের একাগ্রতা স্বাভাবিকভাবেই শিথিল হয়ে যায়। ওরা নিদ্রা যায়। প্রভু শিষ্য হয়তো অলক্ষিতে ওপারে পৌঁছে যেতে পারবেন।

পণ্ডিত জগদানন্দ হেসে বললেন : প্রভু জগদানন্দদর্শনে যাচ্ছেন — সেটা কোনও চৌরকার্য নয়। তবু শুধু হুতি-নারায়ণের কথা শুনলেই তো চলবে না, মাহুত-নারায়ণের কথাও শুনতে হবে। আমি প্রভুকে নিয়ে এখনি রওনা হব।

রাত্রির তৃতীয় যামে তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গা পার হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলছেন : নৌকায় উঠেও প্রভুর শিষ্য নামসঙ্কীর্তন থামতে চায় না। নৌকা উথাল-পাখাল দুলছে, যতটা চেউয়ের দাপটে তদধিক বৌধ নর্তনকর্দনে।

“অবুধ নাইয়া বোলে হইল সংশয়
বুঝিলাও আজি আর প্রাণ নাহি রয়।।...
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই
তাবত নীরব হও সকল গৌসাক্ষি।।”

চেতনাদেব যে ঘাট থেকে গঙ্গা পার হয়েছিলেন, তাকে কেউ বলেছেন ‘প্রয়াগঘাট’, কেউ ‘গঙ্গাঘাট’। সম্ভবত সেটা বর্তমান কুলপির কাছাকাছি। গঙ্গাঘাট নামে একটা গ্রাম ওই অঞ্চলে এখনো আছে, কিন্তু ভাগীরথী সেখানে নেই। এর কাছাকাছি ছিল তিন-তিনটি নদীর সঙ্গম : সরস্বতী, দামোদর আর মন্ত্রেপুর (বর্তমান রূপনারায়ণ)। তাই এর আর এক নাম : প্রয়াগঘাট।

‘তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচেতন্য’-গ্রন্থের লেখক ভূপতিরঞ্জন দাস লিখেছেন, “বৈশ্বের মানচিত্র দৃষ্টে মনে হয়, মহাপ্রভুর সময়ে ছত্রভোগের কাছ থেকে বেশ প্রশস্ত নাকি একটি খাড়া বর্তমান ভারানগর ও গঙ্গাধরপুরের পাশ থেকে পশ্চিমমুখী হয়ে কাকদ্বীপের সামান্য দক্ষিণে বুধোখালির কাছে মুড়িগঙ্গা বা বারাতলা নদীতে মিশেছিল ও সাগরদ্বীপের মাঝামাঝি ফুলডুবি খাল ছিল অতি প্রশস্ত। সম্ভবত মহাপ্রভুর নৌকা ছত্রভোগ থেকে এই পথে গিয়ে মেদিনীপুরের কটাই মহকুমার বসুলপুর নদীতে প্রবেশ করে। তিন নদীর সঙ্গম বলে সম্ভবত বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই স্থানটিকে প্রয়াগঘাট বলেছেন।”

...প্রথম সন্ধ্যায় কথকঠাকুর রূপেন্দ্রনাথ এখানেই থামলেন — অর্থাৎ প্রভুকে উৎকলরাজ্যে নামিয়ে দিয়ে। সকলে সমস্তবে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে : জয় গৌর। জয় নিতাই।

তাবপর গুরু হয়ে যায় খোল-করতাল সহযোগে নামসঙ্কীর্তন।

ইতিপূর্বে একদিন দেখেছিলেন। সন্দেহ ছিল। তাই রূপেন্দ্রনাথ পুনরায় তৃতীয় সারির সেই নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে দৃকপাত করলেন। দেখলেন এখন আর অবগুণবতীর মুখটি দেখা যাচ্ছে না।

রূপেন্দ্রনাথ উঠে পড়েন। নিজের কক্ষে চলে যান। মেয়েটিকে — বলা উচিত 'মহিলাটি'কে — ভাল করে দেখবার সুযোগ হয়নি। সচেতনভাবেই হোক অথবা ঘটনাচক্রেই, সে বসেছিল একটু পিছনে, তৃতীয় সারিতে, একটা আলো-আঁধারি পরিবেশে। শ্রীচৈতন্যের 'নীলাচল অভিসার' বর্ণনা করতে করতে উনি বারে বারেই শ্রোতৃবৃন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। অধিকাংশই শ্রোতা-শ্রোত্ৰী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। দু-চারজন তরুণ-তরুণী। অনেকেই নাকে রসকলি, মালা-চন্দনে বৈষ্ণব রূপটা প্রকটিত। দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওই সধবা মহিলাটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কথকের দিকে। চোখাচোখি হতেই অবগুষ্ঠন টেনে দেয়।

রূপেন্দ্র রীতিমত চমকে উঠেছেন। প্রথম দৃষ্টিভ্রমে ওঁর মনে হয়েছিল ও কুসুমমঞ্জরী। তাই ওঁর চমকটা বেশ জোরদার। মেয়েটি অবগুষ্ঠনে মুখ ঢেকে ফেলার পরমুহুর্তেই ওঁর মনে হল — ও কুসুমমঞ্জরী নয়, হতে পারে না। তবে তার মুখের সঙ্গে ওই মেয়েটির মুখের আদলে কোথায় যেন মিল আছে — তাই এত চেনা-চেনা লাগছে। না, চিত্তচাক্ষুস্য কিছু হয়নি — রূপেন্দ্রনাথের আত্মসংযম অত লঘু নয়। তবে দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল : কে ওই মেয়েটি? কেন ওকে মনে হল এত চেনা-চেনা। রোগিণী হিসাবে কি কোথাও ওর চিকিৎসা করেছেন? মনে করতে পারলেন না।



উড়িষ্যা, অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর জেলায়, প্রবেশ করে চৈতন্যদেব বুঝলেন, রাজপথ ধরে অগ্রসর হওয়ায় নানান জাতের অসুবিধা। গৌড় থেকে শ্রীক্ষেত্রে যাবার সেই কালীন ওই রাজপথের নাম ছিল 'জগন্নাথ সড়ক'। অসুবিধা দুই জাতের। প্রথমত এই সময় উৎকল-অধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের সঙ্গে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের যুদ্ধ চলছে। জগন্নাথ সড়কে অত্যধিক দু-পাক্ষের সৈন্যদলই মাঝে মাঝে এসে পড়ে। হাতি-ঘোড়া-পদাতিকের কোলাহল। তীর্থযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করে অশ্বারোহী রাজপুরুষেরা ঘোড়া ছোঁটায়। দ্বিতীয়ত, এ-পথে 'দানীর' অত্যাচার। 'দানী' অর্থে উড়িষ্যা রাজ্যের পক্ষে 'পথকর' আদায়কারী। পদকর্তার অনেকেই এই 'দানী'দের অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব কারণে 'জগন্নাথ সড়ক' পরিহার করে চৈতন্যদেব অরণ্যপথে বা গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে চলতে থাকেন।

শিয়াখালা গ্রামের মধ্য দিয়ে ওঁরা এসে উপনীত হলেন রূপনারায়ণ নদের তীরে

রূপমঞ্জুরীর সন্ধান

তাম্রলিপ্তে। নদের তীরে কপালমোচন তীর্থে মায়েব মন্দির। বাহান্নপীঠের একপীঠ, ‘বর্গভীমা’
মায়ের মন্দির। তাম্রলিপ্তি অতি প্রাচীন বন্দর। খ্রিস্টপূর্ব প্রাগৈশোক যুগেও ছিল তার প্রসিদ্ধি।
শোনা যায়, এই তাম্রলিপ্তি বন্দরে নির্মিত জাহাজ নিয়ে, এখান থেকেই বাংলার নৃপতি
সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ সিংহলদ্বীপ জয় করেন। আন্দাজ করা হয়, সময়টা ভগবান বুদ্ধের



মহাপরিনির্বাণের সমকালীন। বিজয়সিংহের এই সিংহলবিজয় কাহিনীটি সবিস্তারে আঁকা আছে
অজন্তর দ্বিতীয় গুহবিহারে।

বর্গভীমা মূর্তিতে আছে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের দেবী উগ্রতারার ছাপ। হিন্দুদের তত্ত্বমতে,
এই শক্তিপীঠে পতিত হয়েছিল সতীর বাম গুলফ। দেবীর নাম ভীমরূপা; ভৈরব : কপালী।

রায়গুণাকর কবি ‘অন্নদামঙ্গল’-এ লিখেছেন:

“বিভাষেতে বাম গুলফ ফেলিলা কেশব
ভীমরূপা ভৈরবী আর কপালী ভৈরব।”

শ্রীচৈতন্য যে শিয়াখালার পথে তমলুকে এসেছিলেন তার প্রমাণ শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায়:

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবনদ পার হৈএগ

উত্তরিলা তমোলিগুে সেয়াখালা দিয়া।।

এখানে ‘দেবনদ’ কিন্তু রূপানারায়ণ নয়, দামোদর। গোবিন্দদাসের কড়চায়, ওঁরা হাজিপুর গ্রামের পথে তমলুক থেকে এসে উপনীত হলেন মেদিনীপুর। কংসাবতী নদীর তীরে ধনবান বণিক কেশব সামন্ত চৈতন্যদেবের সঙ্গে কৌতুক করতে এসেছিল। গোবিন্দদাস বর্ণনা করেছেন, কীভাবে কেশব সামন্তকে প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়ে ‘হরিনামসর্বস্ব’ করে প্রভু শ্রীক্ষেত্রের পথে রওনা হলেন। নারায়ণগড়েও ঘটল একই ঘটনা: বীরেশ্বর আর ভবানীশঙ্কর নামে দুই মহাধনী সহোদর ভ্রাতা চতুর্দোলায় চেপে প্রভুকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁরাও কৃষ্ণপ্রেমে মত্তমুগ্ধ হলেন। চতুর্দোলা ফিরে গেল। ওঁরা আখড়ায় রয়ে গেলেন।

নারায়ণগড়ের পরবর্তী স্থান: দত্তপুর।

‘দত্তপুর’-এর মহিমা অতিপ্রাচীন। মেদিনীপুর জেলার ‘দাঁতন’ কড়চা-বর্ণিত ‘দত্তপুর’ হতে পারে; কিন্তু ‘মহাভাষ্য’ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে যে ‘দত্তপুর’-এর বর্ণনা আছে, এই দাঁতন বোধ হয় তা নয়।

আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতকে মগধসম্রাট মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। তার পূর্ব যুগ থেকেই অর্থাৎ খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকেই কলিঙ্গের রাজধানী ছিল দত্তপুর। ‘কুরুধম্ম জাতক’ এবং ‘মহাভাষ্য’ একথা বলা আছে। বুদ্ধশিষ্য ফেঁম বুদ্ধদেবের চিতা থেকে সংগৃহীত একটি শব্দন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত সেই দাঁতটির উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। সূর্য্যকাল ঐ স্তূপে বুদ্ধদেবের শ্ব-দন্তটি পূজিত হতে থাকে। কথিত আছে — ওই দস্তুর প্রভাবে কলিঙ্গরাজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ ঘটতে থাকে। তাই দেখে মগধরাজ ওই শ্ব-দন্তটি স্থায়ী রাজধানী পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। করদরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রতিবাদ করতে পারেননি। কাহিনী অনুসারে — কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত ছিলেন ধর্মমতে বৌদ্ধ। অর্থাৎ তাঁর সম্রাট মগধরাজ ছিলেন শৈব। ওই শ্ব-দন্তটি পাটলিপুত্রে নিয়ে আসার পর মগধসম্রাটের মতিগতির পরিবর্তন হতে থাকে। তিনি বৌদ্ধভাবাপন্ন হয়ে যান। ইতিমধ্যে ওই দত্তবিশয়ে নানান অলৌকিক কাণ্ডও ঘটতে থাকে। ফলে সম্রাটের ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সভাসদেরা দন্তটিকে বিদায় করতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। কাহিনী মতে, কলিঙ্গরাজ গুহাশিবের কন্যা হেমবালা এবং জামাতা, উজ্জয়িনীর রাজপুত্র (তাঁর নামই হয়ে যায় দত্তকুমার), ওই অমূল্য শ্ব-দন্তটি সিংহলে পাচার করেন। তাঁরা ওই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন, যে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সম্ভ্রমিত্রা বৌদ্ধধর্মের চারা নিয়ে যান সিংহলে। এই কাহিনী অনুসারে সিংহলের অনুরোধপূর্ব্বক জগদ্বিখ্যাত স্তূপের ভিতরে রাখা আছে গৌতমবুদ্ধের সেই শ্ব-দন্তটি।

দত্তপুরের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কনিংহ্যামের মতে, গোদাবরী-তীরবর্তী রাজমহেন্দ্রী ছিল সেই প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী এবং দত্তপুর হচ্ছে নীলাচল বা পুরীধাম।

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

দত্তপুত্র থেকে জলেশ্বর, বাঁশদহ, রেমুণা, ভদ্রক হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব সশিষ্য এসে উপনীত হলেন যাজপুরে। বিরজাদেবীর পাঠস্থান এই যযাতিপুর। এখানে উপনীত হয়ে সকলে যখন রাত্রের মতো বিশ্রামের চাই খুঁজছেন তখন কাউকে কিছু না জিনিয়ে চৈতন্যদেব সহসা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে প্রভুর দর্শন না পেয়ে ভক্তেরা বিহুল হয়ে পড়লেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অন্তর্যামী! সঙ্গীদের ব্যাকুলতা দেখে তাঁদের বললেন — তোমরা ব্যাকুল হয়ে না। প্রভু আজ বিশেষ কারণে অপ্রকট হয়েছেন। আগামীকাল এখানেই আমরা তাঁকে পাব।

“আজি থাকি, কালি প্রভু আইব এথাই।”

...এই পর্যন্ত বর্ণনা করে কথকঠাকুর — রূপেন্দ্রনাথ — সহসা থেমে গেলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগল: অতঃপর ওদের সেই প্রশ্নটাই বাস্তব হয়ে উঠল প্রথম সারিতে উপবিষ্ট নগেন দত্তমশায়ের কণ্ঠে: তারপর কী হল?

রূপেন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন, আজ এই পর্যন্তই! আগামী কাল আমরা এখানেই তাঁকে পাব — “আজি থাকি, কালি প্রভু আইব এথাই।”

কথকের দৃষ্টি পতিত হল শ্রোতৃবৃন্দের একটি বিশেষ একান্তে। কপাটের আড়াল থেকে একজন বিশেষ শ্রোত্রী তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। তাঁর সর্বাবয়ব দরজার কপাটের আড়ালে, শুধু অনবগুপ্তিত মুখখানি দেখা যায়। তন্ময়তাজনিত কারণে তার অবগুপ্তন যে কখন খসে পড়েছে তা সে নিজেও জানতে পারেনি। রূপেন্দ্র দেখলেন, মেয়েটি সধবা, তার কপালে কুমকুমের টিপ, সিঁথিতে সিন্দূর, সর্গমণ্ডিত কর্ণভরণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা।

উনি নিশ্চিত: মহিলাটি ওঁর পরিচিত। সুপরিচিত। শুধু রোগিণী হিসাবেই ওঁর সান্নিধ্যে আসেননি।

নিঃসন্দেহ হলেন যখন সঙ্গিত ফিরে পেয়েই মেয়েটি অবগুপ্তনের আড়ালে আত্মগোপন করল। মহিলাটি ওঁর পূর্বপরিচিতা, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক সে আত্মপ্রকাশ করতে অনিচ্ছুক! আলো-আঁধারিতে প্রতিদিন সে এসে বসছে ইচ্ছা করেই — যাতে কথকঠাকুর তাকে চিনতে না পারেন! কেন?

পরদিন শ্রীচৈতন্যের নীলাচল অভিসারের বর্ণনা করতে বসে রূপেন্দ্রনাথ দর্শকমণ্ডলীর ভেতর সেই বিশেষ মেয়েটিকে সনাক্ত করতে পারলেন না। প্রতিদিন সে ঠিক একই স্থানে এসে বসত। কপাটের আড়ালে। নিজে অন্ধকারে থেকে লক্ষ্য করত কুণ্ডলকে। গতকাল মহিলাটির অসতর্কতায় ক্ষণিকের জন্য হলেও চার চোখের মিলন হয়েছিল। আজ তাই সেখানে অন্য একজন অনবগুপ্তনবতী প্রোঢ়। মেয়েটি কি বুঝতে পেরেছে যে, উনি তাকে দর্শকদলে অন্তর্ভুক্ত করেন? তাই যদি হয়, তাতে কুণ্ডার কী আছে? যদি সে ওঁর পরিচিতা হয়, তাহলে এগিয়ে এসে সে-তো সচ্ছন্দে ওঁকে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিতে পারে। সর্বসমক্ষে সেটা করতে সঙ্কোচ হলে সে তার স্মৃতিকে বলতে পারে। আঠারো-বিশ বছরের একটি সধবা রমণী একা-একা তীর্থদর্শনে যাচ্ছে না নিশ্চয়! তাহলে?

—বলুন, কোবরেজ মশাই? ঠাকুর যাজপুরে এসে অপ্রকট হলেন কেন?

রূপেন্দ্র বললেন, সে-কথাই আজ বলব। আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, জীবনে এমন

একটা পর্যায় আসে যখন মানুষে আত্মগোপন করতে চায়। ধরুন, আপনি আমাকে চেনেন, খুব ভাল ভাবেই চেনেন। আপনাতে-আমাতে একদিন অনেক কথা হয়েছে, হয়তো প্রাণের কথাও। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, সর্বসমক্ষে আপনি সে-কথা স্বীকার করতে পারছেন না। তখন আপনি আড়ালে সরে যাবেন। একবারও ভেবে দেখবেন না, সেজন্য আমি কী পরিমাণে ব্যথিত হচ্ছি। হয়তো আমি আপনাকে চিনতেও পেরেছি, তাই আপনার ঐ দুবে সরে যাওয়া আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক হচ্ছে। আমি ভাবছি: লোকলজ্জাটাই বড় হল! আমাদের ভালবাসাটা নয়?

নগেন দত্ত বসেছিলেন সামনে। প্রশ্ন করেন, হঠাৎ এ-কথা বলেছেন কেন, কোবরেজমশাই? ঠাকুরের কি তেমন কোনও সমস্যা হয়েছিল?

—আমি জানি না। কী কারণে যাজপুরে গৌরান্দেব প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য আত্মগোপন করেছিলেন তার কোনও কৈফিয়ৎ নেই। পরদিন সকালে সত্যিই গোরাচাঁদ এসে হাজির। হারানো মানিক ফিরে পেয়ে সবাই হরিধ্বনি দিয়ে ওঠে। প্রভু নিত্যানন্দ বলেন, তোমরা দেখলে তো! আমি বলেছিলাম।

এই রহস্যময় সাময়িক অন্তর্ধানের কথা অনেকেই বলেছেন। স্পষ্ট না বললেও ইঙ্গিত দিয়েছেন কৃষ্ণদাস গোসাঁই, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত বা গোবিন্দ দাস কর্মকার। কিন্তু কার্যকারণ-সম্পর্ক সহজে স্পষ্ট কিছু লেখেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীজয়ানন্দ মিশ্রের ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’:

“চৈতন্য গোসাঁঞের পূর্বপুরুষ আছিল যাজপুরে।

শ্রীহট্ট দেশেতে পলাইয়ে গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে।।

সেই বংশের পরম বৈষ্ণব কমললোচন নাম।

পূর্ব জন্মের তপে গোসাঁঞ তার ঘরে করিলা বিশ্রাম।।”

জয়ানন্দ মিশ্র বয়সে চৈতন্যদেবের ছাব্বিশ বছরের অনুজ। তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ শিষ্য নন, অভিরাম গোপালীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি গৌরসুন্দরের স্নেহধন্য। বস্তুত তাঁর পিতৃদত্ত নাম ‘জয়ানন্দ’ নয়, এ নাম চৈতন্যদেবের দেওয়া। জয়ানন্দ ‘চৈতন্যমঙ্গল’ রচনা করেন চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর পরে। কিন্তু তাঁর রচনা নীলীন ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। সম্ভবত এক্ষেত্রে তিনি শ্রীচৈতন্যের সাময়িক আত্মগোপনের হেতুটি যথার্থ বর্ণনা করতে পেরেছিলেন:

গৌরান্দেবের পূর্বপুরুষেরা উৎকলখণ্ডের যাজপুরে বসবাস করতেন। মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের (যাঁর উপাধি ছিল ভ্রমর) অত্যাচারে পণ্ডিত মধুকরমিশ্র সপরিবারে যাজপুর থেকে পালিয়ে পূববাংলার শ্রীহটে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা উৎকলবাসী, মাত্র কয়েক পুরুষ তাঁরা শ্রীহটে এসে বাঙালি হয়েছেন। মধুকর মিশ্রের বংশধর, নিমাই পণ্ডিতের পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র আবার শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, নবদ্বীপে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর নিমাই পণ্ডিত শ্রীহটে গমন করেন এবং সেখানে কয়েকমাস পিতৃকুলের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যা বিতরণ করেন। সেখান



থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে নিমাই পণ্ডিত জানতে পারেন যে, তাঁর প্রথম পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে।

পদকর্তা জয়ানন্দ জানাচ্ছেন যে, শ্রীচৈতন্যের জনককুলের এক জ্ঞাতিভ্রাতা পরমবৈষ্ণব

কমললোচন মিশ্র যাজপুরেই বসবাস করতেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর সংসারশ্রমের আত্মীয়তা স্বীকার করে লৌকিক সৌজন্য দেখানো নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি? ঈশ্বরের অবতার পরমভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব তেমনই এক সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। প্রেমের অবতার পরমবৈষ্ণব কমললোচনকে কৃপা করতে চান, তার আতিথ্যগ্রহণ করতে চান, তার সহস্র শ্রদ্ধা শাক্য গ্রহণ করতে চান — হেতু এ নয় যে, কমললোচন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা, পরন্তু কমললোচন পরমভক্ত! কিন্তু এই তত্ত্বকথাটা সাধারণ বুদ্ধির শিষ্যদল বুঝতো না। তারা এটাকে অজুহাত দেখিয়ে ব্রাত্য হবার কৈফিয়ৎ খুঁজতো। হয়তো — এ আমাদের অনুমান মাত্র — হয়তো তাই, ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য করুণার অবতার অপ্রকট থেকে দুই কুল রক্ষা করলেন। গৌরানন্দসুন্দরকে সহস্রপক শাক্য সেবা করে কমল তার মানবজীবন সার্থক করল। শিষ্যরাও কিছু জানল না। অর্থাৎ লাঠিটাও ভাঙল না, সাপটাও — না, মরল না, নির্বিঘ্ন হয়ে গেল মাত্র।

এদিন সন্ধ্যা কথকঠাকুর নিমাই সন্ন্যাসের অনুগামী হয়ে মানসপ্রমণে যাজপুর থেকে এলেন পুরুষোত্তমপুর। সেখান থেকে চৌদ্বার হয়ে মহানদী তীরের বন্দর কটক। বললেন, কটক থেকে জগন্নাথক্ষেত্রের পথ-বর্ণনা আমি জাহাজে বসে করব না। সে-পথে আপনারা পদব্রজে যাত্রা করবেন। সম্ভবত কটকের পর চার রাত আমাদের চটিতে, যাত্রীনিবাসে বা মন্দির-প্রাঙ্গণে কাটাতে হবে—একাকানন, সাক্ষীগোপাল, কমলপুর যাত্রী-আবাসে সন্ধ্যা কাটাতে সেসব তীর্থের মহাত্মা বর্ণনা করব। আমরা এখানেই আসর ভাঙছি। কালই আমরা সমুদ্রে পড়ব। সেখানে জাহাজ খুব দুলবে, এমন স্থির হয়ে বসে গল্প করার হয়তো অবকাশ থাকবে না।

রূপেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। অনেকেই ব্রাহ্মণের পদধূলি নিতে এগিয়ে এল। অভ্যাসমতো উনি সমভঙ্গে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলতে থাকেন, ওঁ নমঃ নারায়ণায়।

সহসা লক্ষ্য হল, অন্ধকার থেকে অবগুষ্ঠনবতী একজন সখা এগিয়ে আসছে। তার পরিধানে সেই বাসন্তী রঙের কল্যাণাড় মুর্শিদাবাদী বেশমের শাড়িখানাই — যা-ওঁর পরিচিতি। মেয়েটি ওঁর কাছাকাছি এসে স্পর্শ-বাঁচানো একটি প্রণাম করল গলায় আঁচল দিয়ে। রূপেন্দ্র নিমীলিত নেত্র যথারীতি উচ্চারণ করলেন : ওঁ নমঃ নারায়ণায়।

মেয়েটির আজ কী যেন হয়েছে! সন্ন্যাসজীবনের নিয়মবিরুদ্ধ জানা সত্ত্বেও প্রেমের ঠাকুর ভক্তের আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন — তাঁর মানবজন্ম সার্থক করেছিলেন ওঁনই বোধহয় সে আজ আর স্থির থাকতে পারেনি। সর্বসমক্ষে মাথার ঘোমটা অল্প একটু সরিয়ে দিয়ে বললে, রূপোদা! বৌঠান কোথায়?

সে-কণ্ঠস্বরে বজ্রাহত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। স্বন্দ-কাল-পাণ্ড বিস্মৃত হলেন মুহূর্তে। দুই বলিষ্ঠ মুঠিতে ওর দুই বাহুমূল চেপে ধরে বকলেন, মীনু! তুই বেঁচে আছিস?

দৃঢ়হস্তে ওর দুই বাহুমূল ধরে আছেন বলেই ও ভুলুপ্তি হ'ল না। না হলে ওর পদযুগল ঠিক সেই মুহূর্তে বোপখুমান দেহটি হয়তো ধরে রাখতে পারত না।

হাঁ-হাঁ করে ওপাশ থেকে শশব্যস্তে ছুটে আসেন দুর্গা গাঙ্গুলী। ধরে ফেলেন স্বীর

রূপমঞ্জরীর সন্ধানে

পতনোন্মুখ দেহটি। বলেন, ছি, ছি, ছি, ছি। ও কী করছে ছোটবউ? রূপাকে কি পেন্নাম করতে আছে? তুমি যে ওর খুড়িমা!

মুন্সরী ততক্ষণে সামলেছে। দুই পুরুষের মুঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। অবগুষ্ঠনে পুনরায় ঢেকেছে আরক্তিম আনন।

রূপেন্দ্র দুর্গা গাঙ্গুলীর দিকে ফিরে বললেন, তাহলে সেদিন কেন বললেন: ‘তোমার খুড়িমা ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে চলে গেছেন?’

অনেকেই ঘটনাটা লক্ষ্য করেছে, পিছনের দিকের মানুষজনও আন্দাজ করেছে ওখানে কৌতুককর কিছু ঘটছে। সকলে ঘনি়ে আসে।

দুর্গা আমতা-আমতা করেন, কী আশ্চর্য! সে তো তোমার বড়-খুড়িমা, মানে শোভার মা। ছোট-বউ সগোঁ গেছে তা আমি মুখ ফসকেও বলিচি?

রূপেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখেন মুন্সরী পায়ে পায়ে অন্ধকারের দিকে সরে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চাইছে। উনি বললেন, বুঝছি!

একজন বর্ষীয়সী মহিলা রূপেন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, ওই মেয়েটি কি তোমার খুড়িমা? ওই যে এখন তোমারে পেন্নাম করল?

রূপেন্দ্র বললেন, ও সম্পর্কে আমার ছোট বোন।

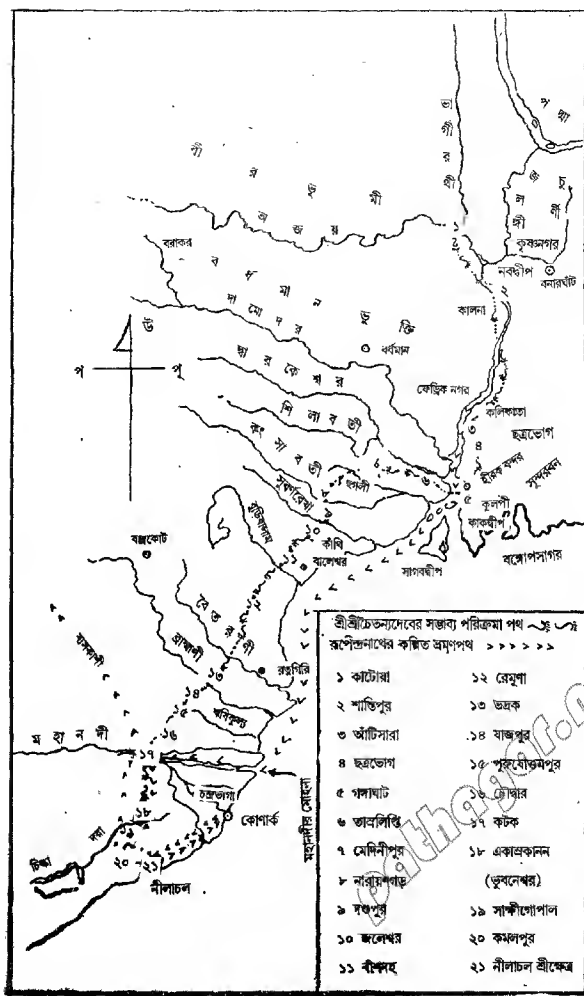
—তাইলে ওই বামুনঠাকুর কেন বললেন, ও তোমার খুড়িমা?

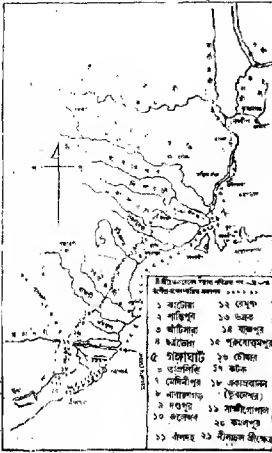
এবার মহড়া নিতে এগিয়ে এলেন রীতিমতো বৃদ্ধা একজন। সাড়ে তিন-কুড়ি পাড়ি দিয়েছেন বিধবা। এগিয়ে এসে বর্ষীয়সীকে ধমক দিয়ে ওঠেন, তোমার মাথায় গোবর গোরা, কায়েত-বউ। বুঝলে না? ওই মেয়েটি আমাদের কথকঠাকুরের সম্পর্কে ছোট বোন, আর ওই তিন-কাল-গে এককালে-ঠেকা বুড়োটা তারে তৃতীয়পক্ষ করেছে। কী গো বুড়ো বামুনঠাকুর? ঠিক বলিচি তো? তৃতীয়? নাকি চতুর্থ?

দুর্গা গাঙ্গুলী ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। রূপেন্দ্রও পিছন ফিরে নিজের ঘরের দিকে চলতে শুরু করেছিলেন। তবু শুনতে পেলেন কায়েতগিন্নির প্রশ্নটা, তা যাই বল কেনে বাউনদিদি, খুড়িমা যখন একবার হয়ে গেছে তখন আর পুরনো সম্পর্কের জের টেনে ওর পেন্নাম করাটা ঠিক হয়নি। ধম্মে তা সইবে না।

বামুনদিদির অস্তিত্ব নিদানটাও তাঁর কানে যায়: তুই আর আমারে ধম্মে শোনাতে আসিস না, কায়েতবউ! সন্ন্যাসী হয়েও প্রেমের ঠাকুর যদি পুরনো সম্পর্কের জের টেনে জ্ঞাতিভাইয়ের শাকার সেবা করতে পারেন তাইলে ওই আবাবগি রাটের মড়ার বউ হবার অপরাধে দাদারে এঁটা পেন্নাম করতেও পারবেনি? এটা তোমার কোন পণ্ডিতের বিধেন? অ্যাঁ?

রূপেন্দ্র দ্বার রুদ্ধ করে দেন।





অভিমানিনী মৃন্ময়ী

1744

অষ্টম পর্ব

জাহাজ আজ কদিন ধরে নীলাসুরাশিতে। উপকূল থেকে দু-তিন ক্রোশ দূর দিয়ে চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখন পাল খাটানো হয়েছে — যদিও বাতাসের গতিমুখ দক্ষিণ দিক থেকেই। দক্ষ নাবিকেরা জানে পাল কতটা বোঁকিয়ে, হাল কতটা হেলিয়ে জাহাজের গতিমুখ দিগদর্শন-

যন্ত্রের নির্দেশ মোতাবেক দক্ষিণ-পশ্চিমে রাখা সম্ভবপর। তাছাড়া জাহাজের তলদেশে সমুদ্রতলের কিছু উপরে দুই সারিতে বারো-দুকুনে চব্বিশ জন দাঁড়ি একসঙ্গে দাঁড় টানে। অনুমান, পল্লুকাল পার হওয়ার পূর্বেই মহানদীর মোহনায় উপনীত হওয়া যাবে। সেখানে পৌঁছাতে পারলে বড়-সারেঙের বিশ্রাম; কারণ নদীর মোহনা থেকে মহানদী বেয়ে কটক বন্দর পর্যন্ত জাহাজ চলানোর দায়িত্ব স্থানীয় উৎকলী গাঙ-সারেঙের।

জাহাজ এখন প্রচণ্ড দুলছে। অনেকেই রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

দেয়াল ধরে ধরে টলতে টলতে দুর্গা গাঙ্গুলী উপরের ‘ডেক’-এ রূপেন্দ্রের বিশ্রামকক্ষে এসে হাজির। রূপেন্দ্র আর নগেন্দ্র ওপরের ডেকে পাশাপাশি দুটি ছোট ছোট কামরায় থাকেন। জাহাজীরা বলে ‘কেবিন’।

রূপেন্দ্র শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলেন। বললেন, বসুন, গাঙ্গুলীখুড়ো, এই টলটলারমান অবস্থায় আপনি হঠাৎ?

দুর্গা কোনওক্রমে আসন গ্রহণ করে বলেন, বাধ্য হয়ে এয়েছি বাবাজী। তোমার খুড়িমা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পেটে কিছু থাকচে না, ক্রমাগত বমি হয়ে যাচ্ছে।

রূপেন্দ্র বলেন, সকলের একই অবস্থা, খুড়ো। এর কোনও ঠিকিৎসা নেই। সহ্য করতে হবে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই ঘূমের ওষুধটা নিরুপমান। জল দিয়ে খাইয়ে দেবেন। হয়তো ঘুমুতে পারলে একটু ভালো লাগবে।

—তুমি নিজে গিয়ে একবার দেখবে না, বাবা?

—আজ্ঞে না! বললাম তো। জাহাজসুদ্ধ সকলেরই এক অবস্থা।

—তা বটে। আর একটা কথা বলি রূপেন, কিছু মনে কর না — সেদিন কি তুমি

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

আমার ওপর রুষ্ট হয়েছিলে ?

—কোন দিন ?

—যেদিন ছোটবউ তোমারে দ্যাখ-না-দ্যাখ বেমকা পেলাম করে বলল আব আমি সবার সমুখে বলে দিলাম, ও তোমার খুঁড়িমা ?

রূপেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, আপনি সত্যি করে বলেন তো গাঙ্গুলীখুঁড়ো — আপনি কি সজ্ঞানে মিথ্যা বলেননি ? ইচ্ছে করেই আমাকে বিশ্রান্ত করতে চাননি ? যাতে আমি ধরে নিই মীনু মারা গেছে ?

দুর্গা গাঙ্গুলী জবাব দিলেন না। নতনেত্রে নীরবে বসে রইলেন।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, কেন খুঁড়ো ? হঠাৎ মিছে কথা বলতে গেলেন কেন ?

এবারও গাঙ্গুলী নতনয়নে নীরব রইলেন।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, আমি যখন তীর্থভ্রমণে বার হই, তখন ও গর্ভবতী ছিল—

—‘ও’ মানে ? তোমার খুঁড়িমা ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি মৃন্ময়ীর কথাই বলছি — মীনু — আপনার চতুর্থ পক্ষের ধর্মপত্নী

— তার কী হ্যাঁছিল ? পুত্র না কন্যা ?

—না বাবা, রূপেন, পুত্র-সন্তানই হতো তার। হল না। কার পাপে জানি না, মৃত সন্তান প্রসব করেছিল ছোটবউ।

—ও !

দুজনেই কিছুটা চুপচাপ।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, আপনি কিন্তু আমার ও-প্রশ্নটার জবাব এখনও দেননি, গাঙ্গুলীখুঁড়ো। কেন আপনি আমাকে ওই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী করতে চেয়েছিলেন ? আজই বা আমাকে কী বলবার জন্য এসেছেন, বলেন তো ? মীনু তো জাহাজে একা অসুস্থ হয়নি — সবাই হয়েছে, এমনকি আপনি-আমিও। তাহলে সেই ছুতোয় এত কষ্টস্বীকার করে আমার কাছে কেন এসেছেন ? কী বলতে এসেছেন এই নির্জনে ?

গাঙ্গুলী অধোবদনে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, তুমি প্রখর বুদ্ধিমান ! আমি জানি। হ্যাঁ, বাবা তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আলোচনা করতেই এয়েছি। খোলাখুলি বলবো ?

—বলুন, আমি খোলাখুলি জানতেই তো চাইছি। সঙ্কোচ কিসের ?

—দেখ বাবা, ঘি আর আগুন কাছাকাছি রাখতে নেই। তোমার খুঁড়িমার বয়স সতেরো, তোমার এক কুড়ি ছয়। আর আমার তিন কুড়ি পুরেচে অনেকদিন। আমরা তিনজনেই এক গাঁয়ের বাসিন্দা। জানতে তো আমার কিছু বাকি নেই মৃন্ময়ীর বাপ পীতু — পীতাপুর মুকুঞ্জ — তোমার পাশের বাড়ির বাসিন্দা। তুমিও জান, আমিও জানি — তোমার খুঁড়িমা দেড়-দুবছর বয়সে বিনি-ঘুসিতে তোমাদের দাওয়ায় ইমা দিগে ফিরেচে। তুমি তারে কাঁধে করে ঠাকুর দেকিয়ে বেড়িয়েচ। তোমাদের দুজনেরই দুজনের প্রতি ইয়ে ছিল, তাও আমার অজানা নয়...

রূপেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন, তাহলে, খুড়ো, আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, কেন আপনি পীতৃকাকার কাছে এই বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলেন? যখন আমি গাঁয়ের বাইরে ত্রিবেণীতে পড়াশোনা করছি? আপনি তো ‘পুত্রার্থে’ ভার্য্য চেয়েছিলেন, তাই না? বিনা বরপণে? সেক্ষেত্রে অসংখ্য কন্যাদায়গ্রস্তের অরক্ষণীয়া ভো আপনায় জানা ছিল। আপনি তো নিজেই বলছেন যে জানতেন, আমাদের দুজনের প্রতি দুজনের ‘ইয়ে’ ছিল...

—কী করব বল? পীতৃ মুকুঞ্জের যেরকমভাবে আমার হাতে-পায়ে ধরলে — ওকে কণ্ঠ দিয়ে...

—‘ও’ মানে? আপনার বাবা?

—আমার বাবা?

—বাঃ! আপনার স্ত্রী যদি আমার ‘খুড়িমা’ হন, তাহলে আমার খুড়িমার বাবা আপনার ‘বাবাই’ তো হবেন? শশুরমশাইকে আপনি কি পীতৃ মুকুঞ্জের বলে ডাকেন নাকি?

—পিতৃ আমার চেয়ে বয়সে ছোট! আমাকে বরাবর ‘দাদা’ ডেকে এয়েছে।

—তাতে কী হল? খুড়িমাও তো বয়সে আমার চেয়ে ছোট! জন্ম থেকে আমাকেও বরাবর ‘দাদা’ ডেকে এসেছে।

—তুমি কি আমার গায়ে পা তুলে ঝগড়া করতে এয়েছ?

—আমি তো আসিনি, খুড়ো। আপনিই আমার কাছে এসেছেন, কী যেন একটা জরুরি কথা বলতে। খোলাখুলি কথা বলতে আপনি ভালবাসেন বললেন, তাই বলছি।

দুর্গা গাঙ্গুলী অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, আমি তোমার কাছে একটি সাহায্য চাইতে এয়েছি রূপেন। গাঁ-সম্পর্কে আমি তোমার খুড়ো হই। তুমি কি আমার এ-বিপদে সাহায্য করবে?

—বিপদটা কী, এবং সাহায্যটা কী জাতীয় না জেনে কী করে বলব?

—তা’হলে কতা দাও, সাহায্য না করলেও তুমি কথাটা গোপন রাখবে।

—বেশ তো, বলুন না?

—তুমি বুদ্ধিমান! নিশ্চয় আন্দাজ করেচ কেন এই বয়সে আমি সস্ত্রীক জগন্নাথক্ষেত্রে তীর্থে যাচ্ছি।

অকুণ্ঠন হল রূপেন্দ্রের। বললেন, পুণার্জন ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য আছে নাকি? তাহলে সীকার করব — আমি আন্দাজ করিনি। ভাবিহীন।

—আমি একটি পুত্রসন্তান চাই, বাবা রূপেন। সেকত্রে তৌমারি অনেকদিন আগেই বলেছিলাম। তুমি ব্যবহৃদিও দিয়েছিলে। সেই বৃক দেখার মন্তরটা নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে আমি তোমার বাড়িতে সস্ত্রীক গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি...

—সেসব পুরনো কানুন্দি আর নাই ঘাঁটলেন, খুড়ো। আমাকে সরাসরি বলুন, আমার কাছে কী সাহায্য চাইছেন?

—সন্তান উৎপাদনের ক্ষামতা এই দেড় বছরে আমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছি রূপেন। তোমার খুড়িমা দিনমানে আমার সেবা যত্ন করে। কিন্তু রাত হলেই সে এক্কেবে

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

বাধিনী। আমারে কাছে ঘেঁষতেই দেয় না। তুমি কবরাজ, নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমার অরস্থ। তুমি জান, চার-চারবার বে করেছি, কিন্তু আজও পিণ্ডদানের কোনও ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। এই আমার শেষ চেষ্টা...

রূপেন্দ্র সোজা হয়ে উঠে বলেন : কী আপনার শেষ চেষ্টা?

— গুরুদেবের একটি আশ্রম আছে জগন্নাথধামে। তিনি আমার জন্য পুতোটি যজ্ঞের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর প্রণামী আমি আগাম মিটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি বড়ো মানুষ, বিদেশ-বিভূইয়ে যদি আতঙ্করিতে পড়ি — তাই বলছিলাম, গাঁয়ের মানুষ হিসেবে তুমি কি আমারে টুক সাহায্য করবে?

রূপেন্দ্র কৃষ্ণিতক্ৰান্ত্রে বলেন, পুত্রো-যজ্ঞ। জগন্নাথক্ষেত্র? মীন জানে?

— বাঃ, সে জানবে না? নিচ্চয়! তাকে জানিয়েই তো সব ব্যবস্থা হয়েছে!

— জাহাজের আর কে কে জানে?

— না, বাবা! আর কেউ জানে না। পুরীধামে আমরা পৌঁছালেই গুরুদেবের নির্দিষ্ট পাণ্ডাজী আমাদের দুজনকে তাঁর পৃথক যাত্রী-আবাসে নিয়ে যাবেন। যজ্ঞ-উল্লব সব কিছু সেখানেই গোপনে সারা হবে।

রূপেন্দ্র নতুনয়নে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, মীনকে জানিয়ে ব্যবস্থা করেছেন বললেন, কিন্তু যজ্ঞের অন্তরালে যে নেপথ্য ব্যবস্থা সেটা কি আপনি মীনকে বুঝিয়ে বলেছেন? সে ব্যাপারটা কি ও জানে? বুঝেছে?

দুর্গা গাঙ্গুলী বিহ্বলভাবে বললেন, তুমি কী বলছো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বাবা। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?

রূপেন্দ্র কঠিনস্বরে বলেন, বলবো। তার পূর্বে আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, কোন বিকল্পটা আমি ধরে নেব? আপনি নিজেই কিছু না বুঝে-শুনে মূর্খের মতো গুরুদেবের কাছে অগ্রিম প্রণামী দিয়ে মাথা মুড়িয়েছেন; নাকি সব জেনে-বুঝে আজ আমার কাছে ন্যাকা সাজছেন?

গাঙ্গুলী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন।

— ‘বিনিয়োগ প্রথা’ শব্দটা শুনেছেন? ‘ক্ষেত্রজ পুত্র’ শব্দটা? যুগকাল্টে ফেলে ছাগশিশুকে যেমন বলি দেওয়া হয়, সে-ভাবে পুত্রো-যজ্ঞের উত্তরে আড়ালে একটি সীমান্তীকে হাত-পা বেঁধে বলি দেওয়া হয়, তা জানান না বলতে চান?

গাঙ্গুলী এবার অধোবদনে কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা-ভাবনা করলেন। বললেন, তোমার কাছে লুকিয়ে কী লাভ রূপেন? তুমি বিচক্ষণ! কবিরাজ! সবই তো আন্দাজ করেচ! কিন্তু এছাড়া ‘পুন্মাম’ নরক থেকে এ বৃদ্ধের উদ্ধারলাভের আর কী পথ আছে বল?

— না, নেই। আপনার সংস্কারবশে আপনি যেভাবে ‘পুন্মাম নরক’-এর কথা কল্পনায় একে রেখেছেন, তা থেকে আপনার উদ্ধারের পথ নেই! কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো

— যাঁরা আজন্ম ব্রহ্মচারী, যেমন আদি শঙ্করাচার্য তাঁরা কি ‘পুন্মাম’ নরকে যমদূতের ডাঙা খাচ্ছেন?

—তারা যে ঋষি, সন্ন্যাসী! আমি যে গৃহী, বাবা?

—আপনিও সন্ন্যাস নিন না! আমি ব্যবস্থা করে দেব। সন্ন্যাস নেবার বয়সও তো হয়েছে। আপনার খড়ম-জোড়া মীনকে দিয়ে যান। ও চেষ্টা করে দেখুক — মা-বিশ্বপ্রিয়ার মতো একান্ত সাধনায় সে জগন্নাথের কৃপা পায় কি না পায়?

নিদন্ত হাসি হাসলেন দুর্গা গাঙ্গুলী। সে হাসি বিষণ্ণ। বললেন বিষয়-বিষ যে আমার মজ্জায়-মজ্জায় আজও জড়িয়ে আছে, রূপেন! আমি যে ওটা পারব না।

—বুঝলাম। কিন্তু পুত্রোষ্টি-যজ্ঞে আপনার যে পুত্রসন্তান লাভ হবেই একথা কেন ধরে নিচ্ছেন?

—গুরুদেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কন্যাসন্তানের বদলে পুত্রসন্তান উৎপাদনের জন্য তিনি 'যে আগাম দু-গুনো পেনামী নিয়েছেন, বাবা।'

—আপনার গুরুদেবের কোনও অধিকার নেই যজমানকে ও জাতীয় প্রতিশ্রুতি দেবার। আপনার স্ত্রী বন্ধ্যা নয় — এটা প্রমাণিত — ফলে গুরুদেব আপনাকে এ-প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, পুত্রোষ্টি-যজ্ঞের মাধ্যমে সে পুনর্বীর সন্তানবতী হবে। একরাত্রির উৎসীড়নে না হলে, বারে বারে তার উপর বলাৎকার করে, যতক্ষণ না হতভাগিনী গর্ভবতী হয়। কিন্তু 'পুত্র'-সন্তান দানের ক্ষমতা তাঁর নেই। কন্যা-সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশভাগ।

দুর্গা গাঙ্গুলী যেন চিরতার রস খেয়েছেন। মুখটা বিকৃত করে বলেন, এত ধরচপাতি করে, এত কাঠখড় পুড়িয়ে, আবার মেয়ে? তা হলে গুরুদেব কেন বললেন: নিশ্চিত পুত্রসন্তান?

—রূঢ়স্বরে রূপেন্দ্র বলেন, আপনার গুরুদেব সম্পক্ষে কোনও মন্তব্য করা আমার পক্ষে শোভন নয়, তবে এইভাবে অনেক ভণ্ড লোক গুরুবাদী সাধারণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায় — এটা প্রত্যক্ষ সত্য! এদের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। দৃষ্টান্তবশত সমাজ আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। কিন্তু আপনি কৌশলে আমার প্রশ্নের জবাবটা বরাবর এড়িয়ে যাচ্ছেন, খুড়ো।

—কী প্রশ্ন, বাবা?

—এই 'নেপথ্য'-ব্যবস্থাটা — বিনিয়োগ-প্রথার কথাটা কি মীন জানে? আণ্ডাজীর নিয়োজিত যে পুরুষটার শয্যাসজিনী হতে তাকে আপনি বাধ্য করছেন, তাকে কি সে দেখেছে? সে কি তাকে অনুমোদন করেছে? পছন্দ করেছে?

খুড়ো মাথা নেড়ে বললেন, না, আমিই তারে দেখিনি এখনো, প্যাস্ত। তবে গুরুদেব বলেছেন, কুষ্টিং নয়, এই তোমারই বয়সী।

আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিন : মীন কি জানে যে, আপনার পুত্রকামনায় তাকে ধর্মের ভেঁঙে আসলে পরপুরুষভজনা করতে হবে?

জেরার মুখে কোণঠাসা আসামীর মতো হঠাৎ আত্মসমর্পণ করে বসেন দুর্গা গাঙ্গুলী। ঝাঁক পড়ে রূপেন্দ্রের দুটি হাত ধরে বলে ওঠেন, না, বাবা। যজ্ঞের আসল ব্যাপারটা সে জানে না, তারে বলা হয়নি। আমার ঠিক সাহস হচ্ছে না...মানে, তুমি এটুকু উল্লার করে

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

দেবে, বাবা? তোমারে সে খুব শ্রদ্ধা করে...

—শ্রদ্ধা, না 'ইয়ে'?

—তা যদি বল তো তাতেও আমি রাজি। কাকপক্ষীতে টের পাবে না। যজ্ঞ-উজ্জ্বল কিছুরই দরকার নেই। তুমিই এ-দায়িত্ব নাও। পুরীতে গৌছে একটি ঘর ভাড়া নেব। তোমরা দুটিতে থাকবে। ও আমার কাছে বাঘিনী, তোমার কাছে মোহিনী হয়ে যাবে। তোমার দুটি হাত ধরছি, আমাকে পুত্রসন্তান দাও বাবা রূপেন।

জাহাজ তখন প্রচণ্ড দুলছে। না কি এই প্রস্তাবে ওঁর মাথার মধ্যেই টলে উঠল? তবু রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, বেরিয়ে যান।

—তুমি, তুমি... আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, রূপেন।

—সেজন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবেন। আপনি অনাহত ফিরে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমার দৃষ্টির বাইরে না গেলে...

—কিন্তু জাহাজ যে প্রচণ্ড দুলছে, বাবা। আমি ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছি না।

—তাহলে চার-হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যান। আপনার প্রস্তাবের সঙ্গে সেই গমনভঙ্গিমাটা সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যান।

দেয়াল ধরে ধরে দুর্গা গাঙ্গুলী কোনক্রমে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রূপেন্দ্রনাথ সংলগ্ন স্নানক্ষেত্রে গিয়ে মুখে-মাথায় জলের ঝাপটা দিলেন। টলতে টলতে আবার এসে বসলেন আসনে।

উপায় নেই। কেউ রূপেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। 'বিনিয়োগ প্রথা', 'ক্ষেত্রজ পুত্র' সমাজে স্বীকৃত। স্মার্তপণ্ডিতদের পরিচালিত এই কুপমণ্ডক সমাজব্যবস্থায় 'ভৃত্য' আর 'ভার্য্যার' সমান মর্যাদা। দুটিই এক ধাতুতে গড়া — √ভূ+য—অর্থাৎ ভরণীয়। যাকে খাওয়া-পরা দিয়ে কাজ করতে হয়। ভৃত্য শব্দের দুটি অর্থ — এক : দাস; দুই : ভার্য্য। ভৃত্য সংসারের ভিতরে করে নানান জাতির কাজ, চাষের খেতে করে শস্য উৎপাদন। ভার্য্যও করে সংসারের ভিতরে নানান জাতের কাজ, শয্যায় করে সন্তান উৎপাদন। তাই মনু বলেছেন : ভার্য্য ভৃত্যই! "অবশ্যভরণীয়পুত্রদারাদিবর্গ"। মনু আরও বলেছেন, "ভৃত্যকে দান করবে ব্যবহৃত পোশাক, যা জীর্ণ হয়ে এসেছে এবং ভার্য্যাকে দেবে "ভুক্তৈরান্নং বৈধৈব দদাৎ"।

দুর্গা গাঙ্গুলীও নিশ্চয় তা দিয়ে থাকেন — ভুক্তবশিষ্ট!

ভৃত্যকে যদি পরের সেবায় নিয়োগ করা যায়, ভার্য্যাকে কেন যাবে না? সমাজ দুর্গা গাঙ্গুলীর পক্ষে। 'একবন্ধা' ঠাকুরের বিপক্ষে।

তার মানে রূপেন্দ্র যদি মৃন্ময়ীকে বাঁচাবার জন্য সহযোগীদের সাহায্য চান, কেউ এগিয়ে আসবে না। ক্ষেত্রজ পুত্র দাবি করার অধিকার আছে স্বামীরা। এতে আছে তার সামাজিক অধিকার — স্ত্রী তার মালিকের নির্দেশমতো বিরক্ত হয়ে অজানা-অচেনা পুরুষের বিছানায় গিয়ে শুতে বাধ্য। অবশ্য ওদিকে ততক্ষণ যজ্ঞ হতে থাকবে। পুত্রোষ্টি যজ্ঞ। কঁাসরঘাটায় বেমন বলির পশুর মৃত্যুব্রতগার স্মার্তি ঢাকা পড়ে যায়, তেমনি যজ্ঞের কোলাহলে শোনা যাবে না

নির্ধাতিতা হতভাগীর জাস্তব আত্ননাদ! এ বলাৎকার শুধু আইনসম্মত নয়, ধর্মসঙ্গত।

মহান হিন্দুধর্ম!

কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে খরজিহু যাত্রীদের কাছে সেটা একটা মজাদার কেছা হয়ে উঠবে মাত্র। তামাক টানতে টানতে পুরুষেরা আড়চোখে মেয়েটিকে দেখিয়ে রসিকতা করবে : ঐ মেয়েটিই সেই বলির পণ্ড, তাই না? তা গাঙ্গুলীবুড়ো খরচ পত্তর করে মরছে কেন? আমাকে বললেই তো বিনকড়িতে তার কাষোদ্ধার করে দিতাম। মাগীর গতির তো কানায়-কানায়। পান-জর্দায় রাগ্না মহিলাদেরও রক্তিম জিহ্বা পার্শ্ববর্তিনীর কর্ণমূলে কিছু অল্লীল রসিকতা করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে মাত্র।

আশ্চর্য মতিগতি সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী সমাজের।

ঠিক যেন এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ।



যাত্রীদল কটক থেকে পদব্রজে একান্তকাননে এসে পৌঁছেছে।

জাহাজটি মহানদীর বন্দরে এসে ভিড়েছিল পূর্ণ-জোয়ারকালে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যাত্রীদের নামিয়ে অর্ণবপোত আবার কাটজুড়ির মাঝগাঙে ফিরে গেছে। জোয়ার-ভাঁটা মেনে জাহাজকে বন্দরের পাটাতনে ভেড়াতে হয়। নাহলে সমুদ্রগামী বড় জাহাজের তলদেশ বলির চড়ায় আটকে যায়। কটক একটি অর্ধ প্রাচীন বন্দর। কেশরীবাংশীয় নৃপতি মকরকেশরী প্রতিষ্ঠিত। মহানদীর এক শাখা কাটজুড়ি-গঙ্গার এ-বন্দরে সেকালে অনেক অর্ণবপোত নোঙর করতো। হাঁটাপথে শ্রীক্ষেত্র এখান থেকে চার-পাঁচ দিনের পথ। অধিকাংশ যাত্রীই যাবে পায়ে হেঁটে। সামান্য কিছু ধনবান যাত্রীর জন্য পালকি বা চৌদোলার আয়োজন। গো-গাড়িও ভাড়া পাওয়া যায়। ছয়-ছয়জন একত্রে গো-গাড়ি ভাড়া করতে পারেন — যাতায়াতের কড়ারে। এক পক্ষকাল তীর্থবাস করতে পারেন যাত্রীরা। সে ক্ষেত্রে যাতায়াতের পথে গো-শকট চালকের খাদ্যের ব্যবস্থা যাত্রীদের করতে হয়। অবশ্য পুরীতে যে পক্ষকাল থাকবেন, তখন চালককে খোরাকি দিতে হয় না। যদি না অবশ্য যাত্রীরা স্থানীয় তীর্থগুলি গোয়ানেই দেখে নিতে চান। এটাই ছিল সেকালীন ব্যবস্থা।

অভিমানিণী মৃন্ময়ী

নগেন্দ্র দত্ত একটি সুদৃশ্য চৌদোলায় রওনা হয়ে গেলেন। তিনি রূপেন্দ্রনাথের জন্যও একটি পালকির বন্দোবস্ত নিজ ব্যয়ে করে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রূপেন্দ্র কিছুতেই স্বীকৃত হলেন না! তিনি সংখ্যাগুরু পদযাত্রীদের দলে রয়ে গেলেন। দুর্গা গাঙ্গুলী সঙ্গীক কিসে রওনা হলেন বোঝা গেল না। সম্ভবত গোয়ানে, অথবা, কে জানে, হয়তো জোড়া পালকিতে। রূপেন্দ্র টের পাননি। বস্তুত, সেই যেদিন মৃন্ময়ী ওঁকে সর্বসমক্ষে হঠাৎ প্রণাম করতে গিয়েছিল তার পর থেকে মীনুকে উনি আর দেখতে পাননি। গাঙ্গুলীমশাই তাকে বরাবর আঁড়াল করে রেখেছেন। সেই যেদিন রূপেন্দ্র বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে চতুষ্পদভ্রমিতে খুড়োকে ওঁর ঘর থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

এখন সূর্যের তেজ কম। তবু যাত্রীরা অতি প্রত্যাষে ডেরা-ডাঙা গুটিয়ে নিয়ে রওনা দেয়। তখনো নির্মেষ আকাশে তারা দেখা যায়। সূর্যোদয়ের আগেই না-হোক তিন-চার ক্রোশ পথ পাড়ি দেওয়া যায়। তারপর একটু বিশ্রাম। পথের ধারে দোকানে প্রাতরাশ। যাত্রীদের জন্য অতি প্রত্যাষে পথপার্শ্বের বিপণীতে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। খাজা, জিবেগজা, জিলাবি ইত্যাদি মিষ্টান্ন। গোধুমচূর্ণের নানারকম ঘৃতপক্ক মুখরোচক — ইদানীং তার চল হয়েছে, নাম : লোচিকা।

কিন্তু সে-সব লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি অর্থবান তীর্থযাত্রীদের জন্য। সাধারণ যাত্রীর বোলাতে থাকে চিপটিচক আর ইস্কাগুড়। ফেনি আর মঠ।

একপ্রহর বেলায় একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা। সূর্য যখন মধ্যগগনে, তখন মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম। মন্দির কাছে-পিঠে থাকলে ভোগ পাওয়া যায় কড়ির বিনিময়ে। তাতেই ক্ষুদ্রবৃত্তি। তারপর দু-দণ্ডের বিশ্রাম। আবার অপরাহ্নে সূর্যের তেজ একটু কমে এলে পদযাত্রা। গুরুপক্ষ হলে রাতের প্রথম প্রহরের সমাপ্তিসূচক শিবাধ্বনি পর্যন্ত। জগন্নাথ সড়কের ধারে ধারে প্রতাপরত্নদেবের নির্মিত যাত্রীশালা। যারা দানীদের 'পথকর' প্রদান করে আদায়কারীর পাঞ্জাছাপ সংগ্রহ করেছে তাদের বিনামূল্যে সেখানে রাত্রিকাসের আয়োজন। অন্যান্যদের আশ্রয় কড়ির বিনিময়ে অথবা গাছতলায়। প্রতিটি যাত্রীনিবাসে আছে সংলগ্ন জনাশ্রয় — দীর্ঘিকা অথবা পাকা ইঁদুরা।

ওঁরা সদলবলে একপ্রকাননে এসে পৌঁছলেন পড়ন্ত বেলায়। কে কোন যাত্রীনিবাসে আশ্রয় নিয়েছে, কে খোঁজ নেয়? ধনবান দু-দশজন যাত্রীকে কটকেই পাকড়াও করেছে পুরীর পাণ্ডা বা তাব ছড়িদার। নাম-গোত্র জেনে নিয়ে তারা খেড়ে-খাতী ঘেটে বার করেছে কে কার যজমান। নগেন্দ্র দত্তের পাণ্ডাজীর পুত্র স্বয়ং তাঁকে গ্রেপ্তার করেছেন কটকের জাহাজঘাটায় : স্বনামধন্য পাণ্ডাজী : “জনার্দন মহাপাত্র ‘তিনিপুত্র’ মনমোহন মহাপাত্র”। মহাপাত্রজীর লাল খেরো খাতায় নগেন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষের পরিচয় উদ্ধার করা গেছে।



কটক থেকে জগন্নাথক্ষেত্র যাবার পথে সর্বাঙ্গেক্ষা বিখ্যাত তীর্থ মন্দিরনগরী একপ্রকানন। একাদ্র-পুরাণের পঞ্চবিংশতি থেকে দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে একটি দেব-দানবের যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণকার বলছেন, গঙ্গাবতী নদীর তীরে এক আম্রকাননে দেবতারা শিবপূজার নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করামাত্র দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ সৈন্যে এসে যজ্ঞনাশ করে। দেবরাজ ইন্দ্র পরাভূত হয়ে পলায়ন করেন এবং মহাদেবের শরণ নেন। অতঃপর দেবাদিদেব ত্রিশূলহস্তে স্রয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, হিরণ্যাক্ষকে সৈন্যে পরাজিত করেন — দৈত্য-সেনাপতি কালনৈমী নিহত হয় এবং হিরণ্যাক্ষের সৈন্য সন্নিকটকস্থ সারি সারি পর্বতগুহায় আশ্রয় নেয়।

এ নিছকই গল্পকথা। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ শব্দের দিকে আমাদের নজর পড়ে। প্রথমত, ‘গঙ্গাবতী নদী’; এই শৈবমন্দির নগরীর পাশ দিয়ে যে নদীটি আজও প্রবহমান, তার নাম গঙ্গাবতী বা গাঙ্গোয়া। দ্বিতীয়ত, সারি সারি পার্বত্যগুহায় উল্লেখ। মন্দিরনগরী ত্রিভুবনেশ্বরের অনতিদূরে পাশাপাশি দুটি পর্বতে অগণিত বৌদ্ধ ও জৈনগুহা — উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। আর নিকটেই আছে দুটি গ্রাম। তাদের নাম ‘যগমরা’ ও ‘যগসারা’। বলা হয়, প্রথমটিতে হিরণ্যাক্ষ দেবতাদের পরাভূত করে যজ্ঞনাশ করে এবং দ্বিতীয় গ্রামের কাছাকাছি মাঠে মহাদেব দৈত্যদলকে পরাভূত করেন এবং দেবতারা শিবপূজা সম্পন্ন করেন।

ওই একাদ্র-পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়েই শিব ও ব্রহ্মার একটি কথোপকথন লক্ষ্য করার মতো। পিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে বলছেন যে, মর্ত্যে যেখানে দেবাদিদেব কালনৈমীকে বধ করেছিলেন, সেই পুণ্যতীর্থে ব্রহ্মা স্রয়ং একটি শৈবমন্দির নির্মাণে ইচ্ছুক। প্রত্যুত্তরে মহাদেব বলছেন, যে পিতামহ বিভূতেশ্বর, এই সামান্য কাজ আপনাকে শোভা পায় না। বলিয়ুগের একপাদ অতিক্রান্ত হলে আমার মস্তকস্থিত ‘শশাঙ্ক’ ভুতলে অবতীর্ণ হবেন — একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন এবং ওই একপ্রকাননের সন্নিকটে ত্রিভুবনেশ্বরে আমার জন্য একটি অক্ষয় মন্দির নির্মাণ করবেন।

অনুমান করা যথেষ্ট হেতু আছে, ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন গৌড়রাজ শশাঙ্কই। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতবর্ষে একই সঙ্গে আরিভূত হয়েছিলেন কয়েকজন ক্ষমতাসালী নৃপতি — কান্যকুব্জের হর্ষবর্ধন, প্রাগজ্যোতিষপুরের ভাস্করবর্মা, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী এবং গৌড়রাজ শশাঙ্ক। পরাক্রমশালী নৃপতির মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কের প্রতিই



विशाखाईती (देवदेवी)

ইতিহাস সুবিচার করেনি। তার একটি বিশেষ হেতু আছে। এ-যুগের ইতিহাসের মূল দুটি উপাদান। একটি বাণভট্টের হর্ষচরিত, অপরটি এক বিদেশীর দিনপঞ্জিকা : 'চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ। যেহেতু শশাঙ্ক শৈব — বৌদ্ধদের, তথা হর্বের, বিপক্ষ শিবিরে, তাই তাঁকে প্রায় নর-রাক্ষসের আকৃতিতে চিত্রিত করা হয়েছে।

কিন্তু শশাঙ্ক সম্বন্ধে হিন্দু পুরাণশাস্ত্র ভিন্ন কথা বলে। একান্ত-পুরাণ মতে, সম্রাট শশাঙ্ক কলিঙ্গ বিজয় করে ত্রিভুবনেশ্বরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন — তিনিই কলিঙ্গে শিবপূজার প্রথম ভগ্নীপথ। স্বর্ণাদিমহোদয়, একান্ত-চন্দ্রিকা এবং কপিলসংহিতায় স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে যে, ত্রিভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মূর্তির ওপর একটি অপূর্ব মন্দির গঠন করাই হচ্ছে কলিঙ্গে সম্রাট শশাঙ্কের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বলাবাহুল্য, শশাঙ্ক কোনও শিবলিঙ্গ বা শিবের মূর্তি নির্মাণ করেননি। একটি স্বয়ম্ভু-শিলাকেই শিবের প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এভাবে অনাদিকালের ভূগর্ভ-ভেদ-করা প্রস্তরখণ্ডকে বহু মন্দিরেই শিবের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কাশীর কেদারেশ্বরে এবং হিমালয়ের কেদারতীর্থেও। হাতের কাছে আমাদের তারকেশ্বরও একটি উদাহরণ। আমরা বর্তমানে ভুবনেশ্বরে যে বিশাল মন্দিরটি দেখি, সেটি শশাঙ্ক-নির্মিত দেউল নয়। শশাঙ্ক-নির্মিত দেবদেউল মহাকালের স্থূল হস্তাবলম্বনে ভূতলশায়ী হয়েছিল। পরবর্তী রাজন্যবর্ণ একই স্থলে বৃহত্তর মন্দিরটি নির্মাণ করান। কিন্তু শশাঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত বিন্দু সর্বোপরটি আজও বর্তমান, যদিও পরবর্তী উৎকলরাজগণের অর্থানুকূল্যে তার আকার ও আয়তন সমূহ বৃদ্ধিলাভ করেছে।

শ্রোতৃবর্গের প্রথম সারিতে বসেছিলেন বৃদ্ধা বামুনদিদি। তিনি রূপেন্দ্রনাথকে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আজ তোমার বক্তৃত্তে বড় রসকরহীন হয়ে যাচ্ছে কথকঠাকুর। দেবতাদের মহিমার গল্পের বুলি কি তোমার ফুইরে গেল নাকি গো?

কথা হচ্ছিল মন্দির-চাতালেই।

রূপেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, না দিদি, ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোনও গল্প আমার জানা নেই। তবে কাল সন্ধ্যাবেলা আপনাদের সেরকম একটা জমিট গল্পো শোনাব — সাক্ষীগোপালে। তবে ঠাকুরদেবতার গল্প শুনতে চাইলেন যখন, তখন একটা প্রশ্ন করি। ঐ বিরাট কষ্টিপাথরের মাতৃমূর্তিটি লক্ষ্য করে দেখুন। কোনও অসঙ্গতি নজরে পড়ছে?

সকলেই চোখ তুলে দেখল। সিংহপৃষ্ঠ সমারূঢ়া এক পার্বতীমূর্তি। চতুর্ভুজ; কিন্তু চারটি হাতই ভেঙে গেছে। মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট। মায়ের বামদিকে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। পদতলেও তাই।

সকলেই লক্ষ্য করতে থাকে। নগেন দত্ত বলেন, এটি কি লক্ষ্মীমূর্তি?

রূপেন্দ্র বলেন, না। এটি পার্বতী। ঐর নাম 'নিগু-পার্বতী'। এবার বলুন, কিছু অসঙ্গতি আপনাদের নজরে পড়েছে?

একজন প্রোঢ়া বললেন; মায়ের বাঁ পায়ে একটা গয়না আছে, ডানপায়ে নেই। এমনটা তো হয় না। মায়ের সাজ ঠিক হয়নি বাপু!

রূপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেন দাক্ষণ নজর করেছেন মা। ঐটিই এ মূর্তির

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

অসম্প্রতি। আর ঐ এক পায়ের মল দেখেই সনাক্ত করা যায় যে, এটি সাধারণ পার্বতী মূর্তি নয় : ইনি নিশা-পার্বতী।

—নিশা-পার্বতী! এ নাম তো শুনিনি?

—শুনুন তাহলে। দিনা গল্পো, শুনতে চেয়েছিলেন; তাই এ প্রসঙ্গ তুলেছি। একবার মহাদেব নাকি ধ্যানে বসেন। অতি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পরেও তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয় না। তখন দেবকুল সমুদ্র হয়ে পড়েন। অথচ শিবের ধ্যান ভঙ্গ করার হিম্মত কারও নেই। অনন্দদেবের ভঙ্গ হয়ে যাবার পরের ঘটনা এটি। তাই উর্বশী-মেনকা-বম্বা কোন নৃত্যপটয়সীই ও দুঃসাহস দেখাতে রাজি হয় না। তখন পার্বতী সন্মত সে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অন্যান্য দেবতাদের বললেন দৃষ্টিপথের বাহিরে চলে যেতে। অরণ্য নির্জন হলে গভীর পূর্ণিমাত্রাে তিনি ধ্যানস্থ মহাদেবের সম্মুখে নৃত্যারম্ভ করেন। পার্বতী নাচছেন। শিবের ধ্যান ভাঙে। চোখ চেয়েই নৃত্যরতা পার্বতীকে দেখে মহাদেব খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। তৃতীয় নয়নের অগ্নি নয়, অপর দুটি নয়নেই ফুটে ওঠে প্রেমের প্রতিচ্ছবি। নিশাকালে নৃত্যরতা এই মূর্তির নাম : নিশা-পার্বতী। ভাস্কর্যে এর উদাহরণ খুবই সুদূরলভ। শিল্পী প্রচলিত অলঙ্কার শাস্ত্রকে (উভয় অর্থেই) অস্বীকার করে মায়ের একটি পায়ে একটি মাত্র নূপুর পরিয়েছেন। বোঝাতে — হে দর্শক! ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত নিও না। নৃত্যরতা হওয়া সত্ত্বেও ইনি নর্তকী নন :— ভবভাবিনী, ভবতারিণী।

আসর ভেঙে গেল। বড়ি গিয়ে নিশা-পার্বতী মূর্তির চরণস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। বললেন, আমাদের কথকটাকুরটি সব জানেন।

সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। এখন যাত্রীরা মন্দিরপ্রাঙ্গণ ফাঁকা করে দেবে, মন্দিরের দ্বারপালেরা লণ্ডুহস্তে ঘুরে ঘুরে মন্দিরের বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্রামরত যাত্রী-যাত্রিণীদের সর্বিনয়ে মন্দির খালি করে দেবার অনুরোধ জানাচ্ছে : সিং-দরজা বন্ধ হই যিবে, সে-পাকে চল।

রূপেন্দ্রের নজর হয়েছিল আজ শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর দুর্গা গাঙ্গুলীকে আদৌ দেখতে পাওয়া যায়নি। তাঁর সহধর্মিণী, বলাবাহুল্য, না-পাত্তা। দলে দলে সকলে নির্গমনদ্বারের দিকে চলেছে। নগেন্দ্র রূপেন্দ্রের বাহমূল ধরে একটু জনান্তিকে সরে আসেন। ওঁর কর্ণমূলে বলেন, আমাদের পাণ্ডাজী জানালেন, আজ শুক্লা দশমী— রাত্রের দ্বিতীয় প্রহরে নটমন্দিরে রুদ্রাণীর নৃত্য পরিবেশিত হবে। আমি আসব; আপনি কি দেখতে চান?

রূপেন্দ্র বলেন, রুদ্রাণী কে?

—এ-মন্দিরের দেবদাসীদের প্রাধান্য — ‘অলঙ্কারা’। শৈবমন্দিরে প্রধান দেবদাসীকে বলা হয় ‘রুদ্রগণিকা’; সঙ্গোদনে : রুদ্রাণী। বৈষ্ণব-মন্দিরে — কৈশোর পুত্রীর জগন্নাথ মন্দিরে, প্রধান অলঙ্কারার নাম : ‘গোপিকা’।

রূপেন্দ্র হেসে বলেন, আপনি তো ও বিষয়ে অনেক খবর রাখেন দেখছি।

নগেন্দ্র বলেন, আপনিও তো তীর্থমাহাত্ম্য আর মন্দিরতত্ত্ব নিয়ে...

বাধা দিয়ে রূপেন্দ্র বলেন, বুঝছি। যাদুশী ভাবনার্যসা...

—তার মানে?

—তার মানে ‘রুদ্ধাবী’-নৃত্য দেখবার বাসনা আমার নাই। আপনি বরং একাই আসবেন... কিংবা...

—কিংবা?

রূপেন্দ্র আন্দাজে একটি শব্দভেদী বাণ ছাড়লেন, দুর্গা গাঙ্গুলীমশাইকে নিয়ে। তিনি এ-বিষয়ে আগ্রহী। ভাল কথা, আজ কদিন তাকে দেখছি না তো?

শব্দভেদী বাণটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। নগেন্দ্র বললেন, কী জানি কোথায় গেছে। আর থাকলেও সেই বুড়োটাকে এই দেবদাসী-নৃত্যের আসরে আমি নিয়ে আসতাম না।

ওঁরা পায়ে পায়ে মন্দিরের বাহিরে চলে আসেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বাহিরে নগেন্দ্রের চৌদোলা প্রতীক্ষায় ছিল। একজন ওঁর শুঁড়তোলা নাগরা চটিজোড়া হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে। নগেন্দ্র পাণ্ডাজীর বিশেষ অতিথি। রূপেন্দ্র তাঁর অতিথ্য স্বীকার করতে রাজি হননি। তিনি জনতা দলের সঙ্গে রাত্রিবাস করেন সাধারণ যাত্রিশালায়।

যাত্রিশালায় এক-এক কোণে এক-এক দল। ক্লাস্ত পদযাত্রীরা পাশাপাশি কাঁথা বিছিয়েছে। ঝোপে-ঝাড়ে জোনাক জ্বলছে। সন্ধ্যা থেকেই নির্মেষ আকাশে চাঁদের আলো। রূপেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসেছিলেন। বামুনদিদি ইতিমধ্যে দু-দুবার ঘুরে গেছেন। তৃতীয়বার এসে দেখেন রূপেন্দ্র শয়নের আয়োজন করছেন। বামুনদিদি এগিয়ে এসে বললেন : ও কী গো। শুয়ে পড়লে যে ঠাকুর। রাতের সেবা করলে না?

রূপেন্দ্র হেসে বললেন, পরমবৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যভাগবতে কী লিখেছেন জানেন না? “প্রভু যারে যেদিন বা না লিখেন আহাৰ/রাজপুত্র হউ তত্তো উপবাস তার।!”

—ঠিকই তো লিখেছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে যে, প্রভু তোমার ললাটে আজ উপাস লিখে রেখেছেন? ওঠ দিকিন, এই মালপোটুক সেবা কর। তোমার নাম করি দোকান থেকে নে এয়েচি।

রূপেন্দ্র উঠে বসলেন। বামুনদিদির করঙ্গে জল ছিল। তাতে হাত ধুয়ে শালপাতার চোঙায়-আনা মালপোটুক মুখে দিলেন। বললেন, দিদার সব দিকে নজর।

—থাকবেনি? কথকঠাকুর নিতিদিন সাঁঝের বেলায় ঠাকুর-দ্যাবতার কত শোনায় — পাব্বনি নেয় না — এটুকুও নজর রাখতে হবেনি? তবে আজ দাদাভাই, আমি এয়েচি একটা সমিসে নিয়ে। তোমারে একটা উল্লার করতে হবে, দাদা।

—বলুন? কী করতে হবে?

—শুনেচ তো, কাল আমাদের যাত্রানাস্তি। এখানেই সবাই ঠাকুর-ঠাকুর দেখে বেড়াবে — অনন্তবাসুদেব মন্দির, মহিষমর্দিনী মূর্তি, বিন্দু সরোবরে ছান করবে। আসলে কী জান, দাদা? আমাদের দলে বিশ-পঁচিশটা আবাগী — মানে, বেথুয়া। কাল একাদশী তো? — নিরুদ্ধ উপাস। তাই একটা দিন সবাইকে রুখে দেওয়া। এই আর কী। নইলে আবাগীগুলো পারবে কেনে?

এ-তথ্যটা জানা ছিল না। মনে মনে খুশিই হলেন রূপেন্দ্র। এখানে কয়েকটি মন্দিরের

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

কারুকার্যের স্মৃতি শুনেছেন — মুক্তেশ্বর, ব্রজেশ্বর, রাজারানী মন্দির — অদূরে আছে ধৌলীপর্বতের পাদদেশে সঙ্গ্রহিত অশোকের শিলালেখ, আর উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে জৈন গুহামন্দির। যাত্রীদল এসব বিষয়ে আদৌ আগ্রহী নয়। কিন্তু জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের শিষ্যটি এসব স্চক্ষে দেখে নিতে চান। খোদাই করা ব্রাহ্মী লিপ্যক্ষর ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি রূপেন্দ্র।

মিষ্টান্ন আহ্বাস্তে হাত ধুয়ে জানতে চান, এবার বলুন দিদা, কী আপনার ‘সমিসো’ আর আমাকে কী ‘উগ্গার’ করতে হবে?

— আজকাল আর সারা রাত উপুস করতে পারি না। সাড়ে তিন-কুড়ি পাড়ি দিয়েছি তো! তাই সুখী ডুবলে ইষ্টদেবকে জল-টল দে’ এক বামুনরে সেবা করি। তাঁর অনুমতি নিয়ে বাতাসটুক মুখে দে’ জল খাই! তা দাদা, তুমি কাল আমার সেবা নিয়ে আমারে অনুমতি দেবা?

— এ আর শব্দ কথা কী? সুখী ডোবার আগেই আপনাকে অনুমতি দিতে পারি — তার আগেই যদি আমার পেট ভরে যায়।

বৃদ্ধা হেসে বললেন, না, না, অতটা উগ্গার করতে হবেনি।

ইঠাৎ কী মনে হয়। রূপেন্দ্র বৃদ্ধার কাছে ঘনি়ে এসে বলেন, এবার আপনি আমার একটা উগ্গার করবেন, ঠাম্মা? কথাটা কিন্তু খুব গোপন! এটা আবার আমার এক গোপন ‘সমিসো’!

বৃদ্ধা গম্ভীর হলেন। রসিকতায় যোগ দিলেন না। বললেন, বল?

— কথাটা পাঁচকান হবে না তো?

— রাসুবামনি তেমন কানপাতলা নয়, বলদিনি কী তোর সমিসো?

রূপেন্দ্র নামোল্লেখ না করে বৃদ্ধিরে বলেন যে, যাত্রীদলের ব্যক্তিবিশেষের — সে পুরুষ কি স্ত্রী, তাও বলেন না — একটা প্রচণ্ড বিপদ ঘনি়ে এসেছে। জীবন-মৃত্যুর ‘সমিসো’! কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় তিনি ওই ব্যক্তিবিশেষকে তার বিপদের কথাটা জানাতে পারিছেন না।

— কেনে? তারে আর দেখতে পাচ্ছি না বলে?

— হ্যাঁ, এ-ক’দিন তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু দেখা পেলেও গোপন কথাটা তাকে বলবার সুযোগ পাব না!

বৃদ্ধা দম ধরে অনেকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, বিপদটা কী জাতের?

— তাও আমি তোমাকে বলতে পারব না, ঠাম্মা! আমি সত্যবন্ধ! কথাটা পাঁচকান করব না। কথা দিয়ে রেখেছি।

— বেশ তো! পাঁচকান না করিস, দু-কান করতি তো বাধা নেই?

— ‘দু-কান করা’ মানে?

— যার বিপদ, তারে কানে কানে বলা!

রূপেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বলেন, আঃ! তোমাকে কেমন করে বোঝাই? তাকে কানে কানে বলার সুযোগ যে আমি পাচ্ছি না, পাব না।

—সে সমিস্যের মওড়া আমি নেবনে। আমি তোরে সুযোগ পাইয়ে দোব। তুই আমারে কিছু না বলে, তারই কানে-কানে তার বিপদের কতটা বলে দিস! বুঝলি?

রূপেন্দ্র কুণ্ঠিত দ্রাভঙ্গে বলেন, আমি কার কথা বলছি বল তো, ঠাম্মা?

—ওমা আমি কোতায় যাব! তোর ওই পাড়াচুতো ছুট বুনটা তো? তোর সাথে বে-র সঙ্গ হবার আগেই যাবে ওই ঘাটের মড়া হোঁ-মারি তৃতীয় পক্ষ করি ফেলিছিল! তাই তো? নাকি চতুর্থ?

রূপেন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বৃদ্ধার কথায়। বলেন, তুমি কেমন করে আন্দাজ করলে, ঠাম্মা?

—এ তো জন্মাক্রও একন বুঝে ফেলবে রে। আমার তো শুধু বাঁ-চোখটায় ছানি। তা সে আবগীর বিপদটা কিসের?...ও, না, না, সে তো তুই আমারে বলবি না। পাঁচকান হই যাবে! তা বেশ, তারেই বলিস। কানে-কানে। সাক্ষীগোপালে কিংবা জগন্নাথধমে।

রূপেন্দ্র জানতে চান, কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?

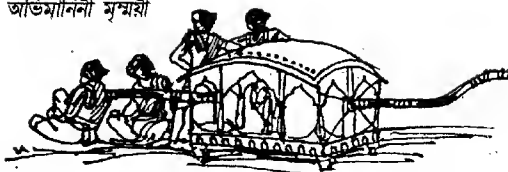
বৃদ্ধার চটজলদি জবাব : ফুস-মন্তরে! সে তোরে ভাবতে হবেনি। কায়দাটা তারে শিখায়ে দেবনে। ও বলবে ওর পেটে শূলব্যথা উটেচে। আমরা পাঁচজনে তড়িঘড়ি তোরে ডাকি পাঠাব। জানিস তো — কোবরেজে যখন সোমন্ত বউরে পরীক্ষা করে, তখন সোয়ামিরে সেখানে ডেঁড়িয়ে থাকতি নেই। আমি পাহারা দেব নে — বুড়োডরে তাইড়ে। তাইকো থাকব। কতায় বলে : পরইখিরি! নইলে ধম্মে সহিবে না। তবে আমি দু'কান বন্ধ করি থাকব অনে। কতটা চারকান হতি দোব না।

রূপেন্দ্র বলেন, তোমার তো দারুণ বুদ্ধি, ঠাম্মা! কেমন করে ফন্দিটা মাথায় এল? বৃদ্ধা বললেন, ওমা আমি কোতায় যাব। জানিস না — রাস্বামনির ভারি বুদ্ধি। এই দ্যাখ না — বুড়োকত্তা বিশ বিঘে ব্রহ্মোত্তর লাখেরাজ আর বাস্তুভিটে রাখি গেল। মাত্তর বিশটি বছরে সব উইড়ে-পুইড়ে দে' আমি তুলসীর মালা নে' পতে নেমেছি। কেউ ঠেকতি পারল?

রূপেন্দ্র বিস্মিত হয়ে বলেন, তার মানে? দাদুর সম্পত্তি কোথায় গেল?

—ভকিল-মোক্তারের গব্বরে। আমার তিন-তিনটি জোয়ান বেটা আর তাদের তিন-দুকনে ছয়টা জাঁহাজ বউ! মহা ধুমধাম কবি কাজীর কাছে হকিয়াত করছে আজও। আমার কী? আমি দেখতে পাচ্ছি? দিবি শান্তিতে আচি! পতে-পতে জয় গৌর, জন্ম শিত্তেই গেয়ে বেড়াচ্ছি! বিষয়-বিষে আমারে কেউ বিষিয়ে দিতি পেরেচে?

আশ্চর্য মানুষ তো!



জগন্নাথধামে পৌছে যাত্রীদল গোটা শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। কটক বন্দর থেকে কবে জাহাজ ছাড়বে তা সকলেরই জানা। নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌছাতে পারলেই হল। নগেন দত্ত এবার আর ছাড়েননি। রূপেন্দ্রও আপত্তি করেননি। কারণ এবার পাণ্ডাজী যে যাত্রীনিবাসে ওঁদের থাকতে দিয়েছে, সেটি একেবারে সমুদ্রতটের উপরে। স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি। ছাদে বসে নীলাম্বরশির অবিরাম উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করা যায়।

সেখানেই গাঙ্গুলীখড়োকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এল ওঁর পাণ্ডাজীর ছড়িদার। ওঁরা আশ্রয় নিয়েছেন মন্দিরের কাছাকাছি একটি যাত্রীনিবাসে। গাঙ্গুলী রোগিণীর উপসর্গের বর্ণনা করে বললেন, এ কী আতঙ্করিতে পড়লাম বল তো, বাবা। তুমি একবার চল, গিয়ে দেখবে।

রূপেন্দ্র এই জাতীয় উপসর্গের আশঙ্কাই করছিলেন। কিন্তু অসুখের আক্রমণটা নিতান্ত ঘটনাচক্রে কাকতালীয়ভাবে সত্য হতে পারে। এজন্য ঔষধের পুটলিটাও সঙ্গে নিলেন। নগেন দত্ত জিজ্ঞাসা করেন, দোকান থেকে অখাদ্য-কুখাদ্য কিছু খেয়েছিল কি?

গাঙ্গুলী বিহ্বলভাবে জবাবে বলেন, ও যা খেয়েছে, আম্মো তাই খেইচি। অখাদ্য-কুখাদ্য কিছু হলে দু'জনারই তো হবার কতা।

—তা বটে।

রূপেন্দ্র বলেন, চলুন তাহলে — আর দেরি করব না। রোগিণীর কাছে পাহারায় আছে কে? জল-টল খেতে চাইলে—

—আছে বাবা, আছে, আমাদের দলেরই কয়েকজন।



কোবরেরজমশাই আসামাত্র মহড়া নিতে এগিয়ে এলেন রাসুদিদি। বলেন, তুমি ভালো করি দেখ তো দাদাভাই — এ-আবাগীর পেটে কী ঢুকিচে। বমি হয় না, দান্ত হয় না — অতচ তলপেটে শূলবেদনা।

রূপেন্দ্র দীর্ঘসময় রোগিণীর নাড়ির গতি লক্ষ্য করলেন। জিব দেখলেন, চোখের পাতা টেনে-টেনে দেখলেন। তারপর ঝোলা থেকে বার করলেন একটা বিচিত্র যন্ত্র। সেটা দেখেই এত যন্ত্রণার মধ্যেও রোগিণী ফিক করে হেসে ফেলল। মুখের ওপর আঁচলটা চাপা দিল।

রূপেন্দ্র দুর্গা গাঙ্গুলীর দিকে ফিরে বললেন, বুকটা একবার দেখবো? আপত্তি নেই তো?

দুর্গাখুড়ো মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

রাসুবামনি অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠেন, ওমা আমি কোতায় যাব! জিব দেখলে, চোখ দেখলে, নাড়ি দেখলে তাও তোমার আশ্ মটলনি? সোমন্ত মেয়ের বুক দেখবে কি গো!

দুর্গা বলে, ও কিছ নয়, দিদি। কোবরেজ এমন দেখে থাকে। দেখ।

রূপেন্দ্র বললেন, আপনারা সবাই ঘরের বাইরে যান। না, বামনদি, আপনি শুধু থাকবেন।

দুর্গা গাঙ্গুলী নিজেই উৎসাহী হয়ে বাকি দর্শকদের ঘর থেকে বার করে দিলেন। বুক দেখার এ-যন্ত্রটা তাঁর পরিচিত। ওই যন্ত্রটা নিয়েই বছর দুয়েক আগে একটা ভুল বোঝাবুঝিতে রূপেন্দ্রের সঙ্গে ওঁর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। সেবার মন্ময়ীও ওঁকে ভুল বুঝেছিল।

যে-কালের কথা, তখনও ‘স্টেথোস্কোপ’ যন্ত্রটা আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তাব একটি আদিম রূপের ব্যবহার ছিল আরব-পারস্যে। মুঘল যুগে হাকিম-উল-মুলকদের মাধ্যমে সেই বিচিত্র যন্ত্রটা পৌঁছেছে হিন্দুস্থানেও। দু-মুখো ক্ল্যারিওনেট জাতীয় একটা যন্ত্র। তার দু’প্রান্তে দুটি ভেকচর্ম। একপ্রান্ত রোগীর বক্ষস্থলে স্থাপন করলে অপরপ্রান্তে চিকিৎসকের কর্ণমূলে হৃদস্পন্দনের শব্দ শোনা যায়। চিকিৎসক তাতে অনুমান করতে পারেন হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা। রূপেন্দ্রনাথের পুলিশদায় তেমনি একটা যন্ত্র বরাবর থাকে। প্রথমবার — মন্ময়ী তখন সদ্যবিবাহিতা — দুর্গা গাঙ্গুলীর বাড়িতে তিনি যখন বলেছিলেন, ‘এবার বুকটা একবার দেখবো’, তখন বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিল মন্ময়ী। সেবারও গৃহস্বামীকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে একান্তে রোগিণীকে পরীক্ষা করছিলেন এবং সেবারও ওঁর নিয়মানুসারে কক্ষে উপস্থিত ছিল শোভারানী — মীনের বড় সতীনের মেয়ে, অনুচা হলেও বয়সে সে মীনের বড়।

শোভারানী ইতিপূর্বে ‘কবিরাজ’ জীবটিকে কখনও দেখেনি। চিকিৎসা-পদ্ধতি কী-জাতীয় হয়, তার ধারণা ছিল না। কবিরাজ জিব দেখলেন, নাড়ি দেখলেন, এবার বুক দেখতে চাইছেন...

নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো সে বলে উঠেছিল, এটাই নিয়ম, ছোটমা! আমি পিছন থেকে কাঁচুলির বাঁধন খুলে দিচ্ছি। লজ্জা করবেন না। উনি এবার আপনার বুক দুটো দেখবেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। কী সর্বনাশ! ওঁর উচ্চারিত ‘বুক’ শব্দটা সহসা দ্বিভাষনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার মুহূর্তমধ্যে বুকে ফেললেন — ওদের কী মর্মান্তিক ভ্রান্তি হয়েছে! কিন্তু তিনি কিছু প্রতিবাদ করার পূর্বেই গৃহস্বামীর উন্মোচিত হয়ে গেল। বোঝা গেল, গৃহস্বামী দৃষ্টিসীমারই বাহিরে ছিলেন, প্রতিসীমার নয়। ঘরের ভিতরে এসে শোভারানীকে বললেন, তুই ভিতরে যা।

শোভারানী তার বিমাতার পৃষ্ঠদেশে কঞ্চুলিকার কাঁসটা সবোত্তম টেনে খুলেছে। বক্ষাবরণ অপসারিত করেননি তখনও। নিদারুণ আতঙ্কে, লজ্জায় আরতিম-আননে মন্ময়ী যেন বাধা দিতেও ভুলে গেছে।

বুক দুটোর বলে উঠেছিলেন, তোমার রুগী দেখা শেষ হয়ে গেছে, রূপেন্দ্র। এসো আমার সঙ্গে, এ-ঘরে এসো। ওর চিকিৎছে তোমাতে করতে হবেনি।

সেদিন ওই ভ্রূদ্ধ বৃদ্ধকে রূপেন্দ্রনাথ বোঝাতে পারেননি — তিনি কী বলতে চান। দীর্ঘদিন পরে দুর্গাচরণ নিজের ভুলটা বুঝতে পারেন, যখন সর্বসমক্ষে ওই রূপেন্দ্রনাথই

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

জমিদারগণিকে বলেছিলেন — ওই একই কথা : আপনার বুকটা একবার দেখব, জ্যাঠাইমা।

বৃদ্ধাও সর্বসমক্ষে অনায়াসে বলেছিলেন, দ্যাখ।

যন্ত্র দিয়ে বুক দেখা যে চর্মচক্ষে নয়, শ্রুতিপথে, তাতে অলীলতা যে কিছু নেই — ‘বুক’ যে হৃদপিণ্ডকে বোঝাচ্ছে — এসব কথা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন।



ঘর খালি হল।

রাসুদিদি সবাইকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। নিজে বসলেন ঘরের দূরতম প্রান্তে। ভূমিশয্যাতেই। হাতে ছিল জপের মালা। টপকাতে শুরু করলেন।

রূপেন্দ্র কিছু বলার আগেই মৃন্ময়ী শয্যা থেকে নেমে পড়ল। বললে, দাঁড়াও, সবার আগে প্রণামটা সেরে নিই। সেদিন...

রূপেন্দ্র বাধা দিলেন না। প্রণাম সেরে মীনু প্রথমেই জানতে চাইল, বৌঠান কোথায়, রূপোদা?

এই প্রথম একজন পরিচিত ব্যক্তি সেই হতভাগিনীটার কথা জানতে চেয়েছে। রূপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল — এই মীনুই একদিন তাঁর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল কুসুমমঞ্জরীকে বাঁচাতে — বিবাহ করে বাঁচাতে! মৃন্ময়ী ততদিনে ওঁর খুঁড়িমা। রূপেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তার সব জ্বালা এতদিনে জুড়িয়েছে রে, মীনু।

মৃন্ময়ী স্থিরদৃষ্টি তাকিয়ে রইল একমুহূর্ত। তারপর বললে, আমিও তাই আশঙ্কা করেছি। তাতেই তোমার এই বাড়িগুলের মতো হাল।

রূপেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন, আমার কথা থাক রে। আমি তোকে একটা খুব জরুরি কথা জানাতে এসেছি। তোর একটা বিপদের কথা। দ্রাবিড় বিপদ...

মৃন্ময়ী একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওঁকে থামিয়ে দেয়। নিম্নস্বরে বলে, জানি।

— জানিস! কিন্তু কতটুকু জানিস? তাকে কতটা বুঝতে দিয়েছে খুঁড়ো?

মৃন্ময়ীর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। কিন্তু শব্দ বের হল না কোনও।

রূপেন্দ্র বুকে পড়ে বলেন, তুই কি এটুকু বুঝতে পেরেছিস, মীনু যে, যজ্ঞ-টজ্জ সব ফক্কিয়ারি? আসলে তোকে একটা অন্ধকার ঘরে...

প্রচণ্ডভাবে মাথা বাঁকিয়ে মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুমি আমাকে কী ভাবো রূপোদা?



কোনার্ক : ১৮৩৭

ফাগুসনের আঁকা স্কেচ অবলম্বনে

কচি খুকি? বাঁচেনি — কিন্তু আমি তো একছেলের মা। তা তুই মন?

—তার মানে তুই সব জানিস? সব জেনে-বুঝে

ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল মুন্সয়ী। বসে পড়ল আবার।

মারাপথেই থেমে গেলেন রাপেন্দ্র। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। বললেন, তাও তো বটে! কী করতে পারিস তুই? এটাই তো এই অবক্ষয়ী সমাজের ব্যবস্থা!

মুন্সয়ী কী একটা কথা বলতে গেল। পারল না। মুখের ভিতর আঁচলের অনেকটা ঢুকিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

তোমরাই বল! শু-কথা কি বলা যায়? কী বলবে? কী করে বলবে? বললে তো বলতে

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

হতো — না, রূপোদা! আমি কিছুই করতে পারি না। কিন্তু তুমি পারতে। তুমি এখনো পার। অন্ধকার ঘরে একটা নারীমাংসলোলুপ নরপিশাচের হাত থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে এখনো বাঁচাতে পার। তুমি পার না? তুমি রাজি না হবার পরেই না বুড়োটা আমাকে সব কথা খুলে বলেছে। জাহাজেই সেই বুড়োটা টলতে টলতে তোমার ঘরে গেছিল না? আমাকে উদ্ধার করার প্রস্তাব নিয়ে?

একথা হতভাগী কেমন করে বলবে? এ প্রত্যাখ্যান যে তার নারীত্বের চরম অপমান। বোধকরি সেই অচেনা নারীমাংসলোলুপটার নিষ্পেষণে ভূতলশায়ী হওয়ার চেয়ে বড় জাতের আঘাত!

দুজনেই চুপচাপ। মুখোমুখি। দূর থেকে বামুনদিদি লক্ষ্য করল। ওখান থেকেই চিৎকার করে প্রশ্ন করে, কী দেখচ বলদিনি? পেটটা কি ফুলেছে?

রূপেন্দ্র বসেছিলেন বিছানায়। মীনু ভুতলে। দুজনেই বৃষ্কার দিকে তাকিয়ে দেখেন। বৃদ্ধা নিঃশব্দে নিজের ওষ্ঠাধরে তর্জনী স্পর্শ করে আবার জপে বসল।

রূপেন্দ্র বললেন, সবই যদি জান, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন?

মীনু তার ডাগর দুটি চোখ মেলে তাকালো তার রূপোদার দিকে। বললে, তোমার কাছে একটা জিনিস ভিক্ষা চাইব বলে। দেবে? কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করব না, আর কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইব না—

—অমন করে বললিস কেন রে? বল না কী চাস? আমার ক্ষমতায় কুলালে যা চাস নিশ্চয় দেব।

‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’ রচনার দুশো বছর আগেকার ঘটনা। না হলে এখানে হয়তো রূপেন্দ্রনাথ বলে বসতেন, ‘আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, আর/যাহা আজ্ঞা কর দিব...’

মীনু বললে, না, রূপোদা, তা তোমার অদেয় নয়। এর আগেও তা তোমার কাছে চুপিচুপি একজন চেয়েছিল আর লুকিয়ে তা পেয়েওছিল।

কুণ্ঠিত শ্রাব্ধে রূপেন্দ্র জানতে চান : কে সে?

—আন্দাজ করতে পারছ না? বৌঠান! মঞ্জরী বৌঠানী!

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পর্শের মতো আসন্ন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন। শূন্যে দৃষ্টিপাত করে গভীরকণ্ঠে বললেন, ভুলে যেও না মীনু, সে আমার ধর্মপত্নী ছিল।

প্রথমটা ও অবাক হয়ে যায়। বুকের ভিত্তিতে পারে না, তার রূপোদার কথার মর্মার্থ। তারপর তিল তিল করে তা ওর বুদ্ধিতে ধরা দেয়। মৃন্ময়ীও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। দু-হাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়তে নাড়তে আর্তনাদ করতে থাকে : ছি। ছি। ছি। আর কত অপমান করবে আমাকে, রূপোদা? আমি অমৃত চাইনি। ভিখারির মতো পরপুরুষের

প্রেমভিক্ষা করতেও আসিনি। আমি চেয়েছিলাম : বিষ! তীব্র কালকট! কেন, বৌঠান তা চায়নি? বৌঠান তা পায়নি? তখন তো সে তোমার ধর্মপত্নী ছিল না?

রূপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল অতীত কথা। কুমারী অবস্থায় কুসুমমঞ্জরী তার চিকিৎসকের কাছে একই জিনিস চেয়েছিল — তার ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে। রূপেন্দ্রনাথ সেবার তাকে তা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিষ কুসুমকে পান করতে হয়নি, তার আগেই রূপেন্দ্র তার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। সেসব কথা অন্যত্র বলেছি। তোমরা হয় তো জান, নয় তো জান না। থাক ওসব অবাস্তব কথা—

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের। বললেন, তার মানে তুই ওই কুপ্রথায় সীকৃত হসনি?

—ও নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে রূপোদা! বল। দেবে। যা চাইলাম? মীনা তো তোমার কাছে আর কোনদিন কিছু চাইতে আসবে না। দেবে?

হঠাৎ মনস্তির করলেন। আত্মহত্যা মহাপাপ! রুগ্নী প্রার্থনা করলেও শারীরিক যন্ত্রণা উপশমের জন্য ভেষজচার্য তাকে বিষ দিতে পারেন না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্পষ্ট নিষেধ আছে। কিন্তু রূপেন্দ্রনাথ তা মানেন না। নিজের বিবেকের বকযন্ত্রে সব শাস্ত্রব্যক্তি চোলাই করে নেন। তাই সিদ্ধান্তে এলেন : আত্মহত্যা যদি মহাপাপ তবে ধর্মরক্ষার্থে ভারতীর নারীর জহরত্রাত পালনেও শাস্ত্র অধিকার। এ তো শারীরিক যন্ত্রণা নয়, এ যে বলাৎকারের যন্ত্রণা! বলতে গেলেন, তাই তোকে দিয়ে যাব রে, মীনা। নারীমাংসলোলুপ পিশাচটা অন্ধকারে তোর অঙ্গস্পর্শ করার আগেই তুই মৃত্যু পাবি।

বলা হল না। তার আগেই রুদ্ধদ্বারে মীনুর আতঙ্কগস্ত পরম গুরু করাঘাত করলেন : কী গো? তোমাদের হল?

বামুনদিদি দোর খুলে দিয়ে বললেন, এসো বাবা। হয়েছে। কোবরেজমশাই ওষুধ দিয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই। এসো, দ্যাকো।



রূপেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন জগন্নাথধামের অনতিদূরে, বঙ্গত-একদিন-পথ দ্বয়ে, সমুদ্রতীরে একটি জীর্ণ সূর্যমন্দির আছে — এককালে তার নাম ছিল অর্কতীর্থ। এখন তা বিগ্রহহীন, পরিত্যক্ত। কিন্তু একজন আরবি-ফার্সি জানা মৌলবি ঠুঁকে জানিয়েছিলেন আকবর বাদশার সভাসদ মহাপণ্ডিত আবুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে ওই মন্দিরটির বিশালত্ব এবং গঠন-সৌকর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পূর্বা মন্দিরে রক্ষিত ‘মাদলাপঞ্জী’ অনুসারে জানা যায় খুদার রাজা নরসিংহদেব ওই মন্দির দর্শন করতে যান 1628 খৃষ্টাব্দে। সেসময় উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন বাখর খাঁ, যিনি দিল্লীশ্বর শাহজাহাঁর প্রতিনিধি হিসাবে

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

উড়িয়াশাসন করতেন। মাদলাপঞ্জী মতে, খুঁদার রাজা কোণার্ক মন্দিরে সূর্যমূর্তির বিগ্রহটি দেখতে পাননি। কাবণ, তার পূর্বেই স্বৰ্ণ আক্রমণের ভয়ে ওই মূর্তিটি অপসারিত হয়েছিল। তবে খুঁদার রাজার পরিদর্শনকালে মূল মন্দিরটি অটুট ছিল, শুধু খাতব ধ্বজাটি ছিল না। স্বৰ্ণের সেটা সোনার মনে করে সম্ভবতঃ অপহরণ করেছিল।

স্বৰ্ণ আক্রমণের সময়কালটা আকবরের শাসনকালে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে। গোড়-বাঙলার আফগান নবাব সুলেমান করনানি অতর্কিতে উড়িয়া আক্রমণ করে। নবাবের সেনাপতি ধর্মসিং কালাপাহাড় এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারে বারে যে দুর্ভাগ্যকে ঘনিষ্ঠে উঠতে দেখেছি — প্রাক-স্বাধীনতা যুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে, বর্তমানে ভোটের রণাঙ্গনে আজও যা দেখছি — উড়িয়ার ক্ষেত্রে সেবারও তাই হল। ওই চরম দুঃসময়ে উড়িয়ারাজ মুকুন্দদেবের অমাত্যরা সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মুকুন্দদেবের একক ক্ষমতায় কালাপাহাড়কে প্রতিহত করা সম্ভবপর হল না। মুকুন্দদেব নিরুপায় হয়ে কোণার্ক তীর্থের বিগ্রহটি নিরাপদ স্থানে অপসারিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সে যুদ্ধে বৃকের রক্ত দিয়ে মুকুন্দদেব তাঁর বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন। আর কালাপাহাড়ের অপকীর্তি মহাকালের বৃকে চিরস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন হয়ে রইল উড়িয়ার নানান দেবদেউলে। ওই মুকুন্দদেবই উড়িয়ার শেষ স্বাধীন রাজা।

খুঁদারাজের কোণার্কদর্শনের ঠিক দুশো বছর পরে পাঁচি ওই মন্দির সম্বন্ধে কলানুসরে পরবর্তী একটি বিবরণ — এ. স্টারলিঙ-এর। সেটি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের। তখন জগন্মোহনটি অটুট থাকলেও মূল রেখদেউলটি ছিল ভগ্নাবস্থায়। স্টারলিঙের বিবরণে দেখছি লেখা আছে: “রেখদেউলটি তখনও কোনক্রমে দাঁড়িয়ে ছিল। উচ্চতায় প্রায় একশ পাঁচশ ফুট। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পালতোলা একটি জাহাজ।” জেমস ফাউন্টন মন্দিরটি দেখেন তার বারো বছর পরে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর একটি স্কেচের অনুসরণে ছাপানো বইতে পাওয়া যায়।

আমাদের কাহিনী অনুসারে রূপেন্দ্রনাথ পুরীতে এসেছেন ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ খুঁদারাজার পরিদর্শনের পরবর্তীকালে এবং স্টারলিঙ-এর প্রত্যুত্তরের গবেষণার পূর্ববর্তীকালে। মূল মন্দিরটি তখনও অটুট, যদিও বিগ্রহ নেই। আমরা এখন জগন্মোহন/মন্দির সাদপীঠে যে কারুকার্য দেখি, চব্বিশটি প্রকাণ্ড অর্ধোৎকীর্ণ রথচক্র, তা তখন দেখা যেত না। খুঁদার রাজা বা স্টারলিঙ তা দেখেননি। সেসব সময়ে তা ছিল বালির গর্ভে ঢাকা। সেসময় ওখানে কোনও লোকালয় ছিল না আদৌ।

রূপেন্দ্রনাথের বাসনা ওই কোণার্ক-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া। কিন্তু যাত্রীদের ভিতর কেউই রাজি হল না। নিতাপূজা হয় না, দেববিগ্রহ নেই, এমনকি জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই — সেখানে কে যাবে? কিন্তু ‘একবাক্স-টাকুর’ অত সহজে নিবৃত্ত হবার মানুষ নন। সন্ধান নিয়ে জানলেন, সমস্ত রাত্রি সমগ্রীপকলের বালুকাবেলার পথ ধরে গো-গাড়ি চালালে পরদিন প্রভাতে কোণার্কতীর্থে পৌঁছানো যায়। আহুর্ষ-পানীয় এবং গোরুর খাদ্য সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় রওনা হলে সারা রাত্রে ফিরে আসা যায়। দু-একজন গো-শকট মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল যারা জীবনে দু-একবার এমন

নাছোড়বান্দা যাত্রীকে ওই সূর্যমন্দির দেখিয়ে এনেছে। চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই — কারণ যাত্রীদের কাছে একদিনের খাদ্যপানীয় ছাড়া কিছু লুটের মাল থাকেই না! নগেন দত্তকেও রাজি করানো গেল না। তিনি সারাদিন পুরীধামের তীর্থ দেখে বেড়ান এবং সন্ধ্যায় — দেবদাসীন্যতা।

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল। না, গো-শলট নয়, উনি যাবেন অশ্বারোহণে। একটি ভাল জাতের আরবীয় অশ্বের ব্যবস্থা করে দিলেন পাণ্ডাজী, আর ওই সঙ্গে নটুদীদলের কাছ থেকে ভাড়া করে আনলেন একটা বিচিত্র পোশাক। বললেন, আপনি এই পোশাক পরে যান ঠাকুরমশাই — দূর থেকে মনে হবে উড়িষ্যারাজের কোনও সৈন্যাধ্যক্ষ। চোর-ডাকাত ত্রিসীমানায় ভিড়বে না। আর নিরস্ত্র যাবেন না। এটা নিন।

মাজায় বেঁধে দিলেন একটা তরবারি।

স্থির হল পরদিন প্রত্যুষে উনি যাত্রা করবেন। একলাই। সঙ্গে থাকবে একদিনের মতো আহাৰ্য-পানীয়। সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

কিন্তু এ পরিকল্পনাও বাতিল করতে হল শেষ পর্যন্ত। বাধা দিলেন দুর্গাখড়ো স্বয়ং, তুমি যদি আপত্তি না কর, বাবা, তাইলে আমরাও তোমার সঙ্গে যেতে চাই। গো-গাড়িতে। আমরা দুজন।

সবাই বিস্মিত হল। একবন্ধা না হয় আধাপাগল, কিন্তু দুর্গা গাঙ্গুলী কেন কোণার্ক যেতে চাইছেন? সেখানে না আছে পূজা-পাঠনের ব্যবস্থা, না কোন ঠাকুর-দেবতা। গাঙ্গুলীমশায়ের যুক্তি অন্যরকম : মন্দির ভেঙে গেলেই কি দেবতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়? ওঁর পাণ্ডাজী বলেছেন ওই অর্কতীর্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নাকি রোগমুক্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রভাগা নদী যেখানে সমুদ্রে বিলীন হয়েছে, সেই কুন্তরশির মধ্যবর্তী অগ্নিকোণ দ্বাপরযুগে ছিল মহাতীর্থ। স্বয়ং শাম্ব ওই কোণার্ক মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বিগ্রহ আছে কি নেই, এটা বড় কথা নয়। ওঁর মনোবৃত্তি বাসনা সেই চক্রতীর্থে সস্ত্রীক তিনটে ডুব দেওয়া। কোন যাত্রী যেতে রাজি হচ্ছে না বলে উনি এতদিন নীরব ছিলেন। এখন, যখন শুনলেন কবিরাজমশাই স্বয়ং কোণার্কতীর্থে যাচ্ছেন, তখন উনি ভরসা করে এগিয়ে এসেছেন।

রূপেন্দ্র গো-যানে যেতে স্নীকৃত হলেন না। তবে একই সঙ্গে অশ্বারোহণে যেতে আপত্তি করলেন না। গো-গাড়ির সঙ্গে অশ্বারোহী একই তালে যেতে পারে, মাথার তলে পাথর যখন বিপদ কিছু নেই, তখন আগে-পিছে গেলে ক্ষতি নেই। বড় পাণ্ডা আরও সংবাদ দিলেন যে, কোণার্ক সম্পূর্ণ জনহীন নয়। তিন-চার ঘর মানুষ ওখানে বাস করে। খুঁদারাজার নিষ্কর প্রজা তারা। সপ্তাহান্তে পিপিলির হাটে তারা বাজার করত আসে। খুঁদারাজা তাদের নিয়োগ করেছেন, যাতে আশপাশের গৃহনির্মাণেচ্ছুরা ওই ভাঙা মন্দিরের পাথর তুলে নিয়ে না যায়। বড় পাণ্ডা তাদের দলপতি মহানন্দ দাসপাত্রকে একটা হাতচিঠি লিখে দিলেন, যাতে ওই তিনজন যাত্রীর ঠিকমতো দেখভাল করা হয়। অবশ্য দাসপাত্র এবং তার তিনঘরের আত্মীয়-

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

সজনেরা সবাই নিরঙ্কর। চিঠি পড়তে পারবে না। তা হোক, অন্তত পাঞ্জাছাপটা চিনবে।

শুক্রা চতুর্দশীর সন্ধ্যারাত্রি গো-বানে যাত্রা করলেন সঙ্গীক দূর্গা গান্ধুলী। মধ্যরাতে শুক্রা চতুর্দশীর নিশাপতি এখন প্রায় মধ্যগগনে — খ-মধ্যর কাছাকাছি। আকাশ নির্মেষ, তবু বাঁধভাঙা চাঁদের উপচে-পড়া জ্যোৎস্নায় নক্ষত্রকুলরমণীরা আজ নিম্প্রভ। ফাল্গুনের মাঝামাঝি। সূর্য এখন কুস্তুরাশিস্থ। আগামীকাল পূর্ণিমা। তাহলে এই মধ্যরাতে সূর্যদেব কু-বিন্দুর কাছে-পিঠে। হিসাবমতে এখন পূর্বগগনে বৃশ্চিকরাশির উদয় হবার কথা। হ্যাঁ তাই — রূপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য হল রক্তনক্ষত্র জ্যোষ্ঠা পূর্বসমুদ্রে অবগাহন সেরে সবে উদিত হয়েছেন। গণিত-জ্যোতিষে রূপেন্দ্রনাথের কিশোরকাল থেকেই আগ্রহ। পিতৃদেবের কাছে এবং শুরু তর্কপঞ্চাঙ্গনেনব সাহায্যে রাশিচক্রের গতিহুন্দ্র এবং জ্যোতিষদের মধ্যে উজ্জ্বল অনেক নক্ষত্র ভালই চিনতে পারেন। অশ্বের গতি সংবরণ করে উর্ধ্বগগনে পূর্ব থেকে পশ্চিমে একবার তাকিয়ে দেখলেন। বৃশ্চিকরাশির প্রশ্নবোধক চিহ্নের পূর্ববর্তী তুলা রাশির নক্ষত্র-চতুষ্টয় পূর্ণচন্দ্রিমার প্রভাবে আজ অপ্রকাশ। কন্যারশির চিত্রা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে সমুদ্রতীরের ওই একক অশ্বারোহিকে। সিংহরাশির মঘা চন্দ্রসন্নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য নয়; পশ্চিমাকাশে অপিনীকুমারদ্বয়কে সনাক্ত করা যায়-কি-না যায়। রক্তবসনা রোহিণী এখনো অস্তমিত হননি। চিত্রার অদূরে জ্বলজ্বল করেছে স্যাতী। উত্তরাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল বাতিরেকে সনাক্ত করা যায় স্বর্গীয় বীণায় অভিজিৎকে; এবং হংসবালাকার শীর্ষে কী-নাম-যেন উজ্জ্বল সাদা নক্ষত্রটিকে। এছাড়া চন্দ্রের অনতিদূরে সজ্ঞানপ্রভায় ভাস্বর দেবগুরু বৃহস্পতি। বাদবাকি শতসহস্র কৌতুহলী নক্ষত্রললনা — যারা অমাবস্যার রাতে তারকাপুত্রীর অসংখ্য বাতায়নপথে উকিঝুঁকি দেয় — আজ তারা পূর্ণচন্দ্রের মায়ায় সুসুপ্ত।

জগন্নাথধামের অধিকাংশ ভদ্রাসনেই নেমে এসেছে মধ্যরাত্রির গাঢ় তন্দ্রিমা। তবু শহরের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে এই মধ্যরাতেও আলোর আভাস। আগামীকাল দোলপূর্ণিমা। বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ পুণ্যাহ। নন্দলালার রঙিন উৎসব — অরীহ-ফাগ-রঙদোলের হোরি। আবার অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরমগুরু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথি। দুই শত সাতান্ন বৎসর পূর্বে এমনই এক দোলপূর্ণিমার পুণ্য-রাত্রি শচীমাতার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পেরিচাঁদ। ফলে বেশ কিছু গৃহাভ্যন্তরে এই মধ্যরাতেও কর্মব্যস্ততা। মিঠাই-এর দোকানে স্নাত-জাগরণক্লাস্ত ভিয়েনের আয়োজন।

অর্ধদশের মধ্যেই এইসব আলোকোজ্জ্বল ব্যস্ততার এলাকা অতিক্রম করে এলেন অশ্বারোহী। এখন বিশ্বচরাচরে তিনি নিতান্ত একা। দু-একটি নিশাচর পক্ষী এখনো বালুকাবেলায় শিকার-অন্বেষণে ব্যস্ত। অশ্বের আকর্ষিত গতিশব্দে তারা জোড়া-পায়ে দূরে সরে সরে যায়। পদতলে আদিগন্ত বেলাভূমি। সমুদ্র আর মহাকাশ হরিয়েছে তাদের পৃথক সত্তা। রূপেন্দ্রনাথের দক্ষিণে ভরা কোটালের অভদ্র জলোচ্ছ্বাস আর বামে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশ্চুতি প্রকৃতি।

সন্ধ্যারাত্রে গো-শকটে গাঙ্গুলীখুড়েকে সস্ত্রীক বণ্ডনা করে দিয়েছেন। মীনু একদিনের সংসার পাতার নানান সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে গেছে — চাল, ডাল, আনাজপাতিও নিয়ে চলেছে। রসিকতা করে রূপেন্দ্রনাথকে বলেছিল, কাল আমার পুনিমের বেরতো, ঠাকুরমশাই! আমাদের গাছতলায়-পাতা সংসারেই দুটি অন্তসেবা করে আমাদের গো-জন্ম উদ্ধার করবেন। রূপেন্দ্রনাথও হাসতে হাসতে বলেছিলেন, উপায় কী? না হলে দেলপূর্ণিমার দিন 'উপুস' করতে হবে। বড়জোর কাঁচা ফলার। তার চেয়ে তোমার 'বকনা-জন্ম' উদ্ধার করাই ভাল।



কালীক-হিসাবে তিনি দুই হ্রহরকাল পশ্চাৎবর্তী। উনি আশা করে ছিলেন — অর্ধরাত্রির ব্যবধান থাকলে গো-যান ও অশ্বারোহী একই সময়ে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবে। বাস্তবে হিসাবটি মেলেনি। দু-তিন প্রেণশ দূর থেকে কোণার্ক মন্দিরের চূড়াটি চন্দ্রালোকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু সারা পথে গো-শকটটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। বলুবেলার উপর মাঝে-মাঝেই একজোড়া সমান্তরাল চাকার দাগ অবশ্য নজরে পড়েছে। তাতে বুঝেছেন, গো-শকট ওঁর পূর্ববর্তী। পল্লীবালা মীনুর ভাগ্যের মতো টলতে টলতে গোয়ানের বজ্রচিহ্ন কোন অলক্ষ্য দিগন্তেব দিকে চলেছে। অর্কতীর্থে যখন উপনীত হলেন, তখনও সূর্যোদয় হতে অর্ধদণ্ড বাকি। পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। দেবরিগুরু শুভ্রাচার্য সমুদ্রতলের কাছাকাছি। পাখির কাকমিন জেগেছে বনে-বনান্তরে। মন্দিরের অদূরে প্রবল এক অশ্বখ বৃক্ষমূলে মীনু কিলিখুর্কি বিছিয়ে তার সাময়িক সংসার পাতছে। ওঁকে দূর থেকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে রূপেন্দ্রনাথ একটি ছদ্ম অভিবাদন করলেন।

মীনু বললে, তোমাকে কী দারুণ দেখাচ্ছে সোনাদা! যেন সত্যিকারের রাজপুত্র। মাথায় উষ্মীয়, মাজায় তরোয়াল, পক্ষিবাজ ঘোড়ায় চড়ে চলেছ কোন রাক্ষসপুরীতে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে!

রূপেন্দ্র বললেন, আর কুঁচবরন রাজকন্যা তার মেধবরন চুল এলিয়ে কোথায় বীণা বাজাবেন, তা নয় তিন-পাথরের উনানে কাঠিকুঠি গুঁজে ফুঁ পাড়ছেন। খুড়ামশাইকে দেখছি না যে?

মীনু চেখ বড় বড় করে বললে, কে? রাক্ষসরাজ? কালরাত্রে তাঁর জ্বর এসেছে। গো-

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

গাড়িতেই শুয়ে আছেন। নামেননি।

গরু দুটিকে খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে সামনে-পিছনে ঠেকো দিয়ে গাড়োয়ান গো-যানটি ভূমির সমান্তরালে বেখেছে। উপরে টাপর তোলা। রূপেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করলেন দুর্গা গাঙ্গুলীকে। না, এখন জ্বর কমে গেছে। তবে নাড়ির গতি ভাল নয়। সর্বাত্মক বেদনা।

গাঙ্গুলী বললেন, ও কিছু নয়, পুনিমে তো! এসময় বাতের ব্যাথাটা চাগায়। তার ওপর কাল সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সারাটা পথ 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ' কেতন গাইতে গাইতে এয়েছি যে, গো-গাড়ির ভিতরে।

রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঔষধের পুলিন্দাটা নিত্যসঙ্গী। কী একটা শিকড় বার করে খল-নুড়িতে বেটে মধু সহযোগে খাইয়ে দিলেন। বললেন, অল্পগ্রহণ আজ আর না-ই করলেন। দেখি, কাঁচা ফলার কী পাওয়া যায়।

গাঙ্গুলী বললেন, সেসব ব্যবস্থা তোমার খুঁড়িমা জগন্নাথধাম থেকেই করে এনেছেন। ফলমূল-মিষ্টান্ন সবই সঙ্গে মজুত আছে। এখন মুশকিল হচ্ছে, চন্দ্রভাগা নদীর মোহনাটা কোতায়? এ ব্যাটা গাড়োয়ান তো কিছুই জানে না দেখছি! অর্কতীর্থের নামই শোনেনি গঙ্গুডটা!

রূপেন্দ্রনাথ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-সংবাদ সংগ্রহ করলেন। জীর্ণ দেবদেউলের পশ্চাতে, কিছুদূরে দু'-তিন ঘর মানুষের বাস। একটু এগিয়ে যেতেই একটি ঘর থেকে বার হয়ে এলেন নগ্নপাত্র এক প্রৌঢ়। উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে দেখে দণ্ডবৎ হলেন। তাঁর পিছন পিছন বার হয়ে এসেছিল দুটি শিশু। বড়টি ঔর কন্যা — বছর দশ-বারো; ছোটটি পুত্র, বছর ছয়-সাত। তারা ধমক খেল, যেহেতু দণ্ডবৎ হতে ভুলেছে তারা। হ্যাঁ, ইনিই দাসপাত্র। কন্যার নাম সুভদ্রা, আজে। লেড়াটি মান' এ অধম দাসর পুত্র, বলাই আইজ্ঞা।

বড়পাণ্ডার পাঞ্জা-ছাপ দেখেই চিনলেন। চিঠিখানা পড়ে শোনানোর প্রয়োজন হল না। গো-যান এবং অশ্বারোহী দেখেই বাকিটা দাসপাত্র আন্দাজ করে নিয়েছেন: অতিথি সংকারে উনি পরাঙ্মুখ নন।

তাঁর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল: চন্দ্রভাগা নদীটি কোর্গাক মন্দিরের বিগ্রহের মতো অঙ্কিত। গর্ভমন্দিরের শূন্য সিংহাসন যেমন প্রমাণ দেয়, এককালে এ-মন্দিরে মূর্তি ছিল — সূর্যদেব, পুষ্প, হরিদশ, যাই হোক — তেমনি চন্দ্রভাগার মরা খাত দেখে অনুমান করা যায় কোথায় সেকালে ছিল অর্কতীর্থ। সচ্ছতোয়া চন্দ্রভাগার খাত-নিজ জোয়াব-ভাঁটায় স্তরের পর স্তর বালিতে সম্পূর্ণ বুজে গেছে। এখন সেখানে গেজালি ডোবে-কি-ডোবে না। স্নান করার প্রশ্নই ওঠে না। দাসপাত্র আরও জানালেন, এখানে সমুদ্রস্রোত নিরাপদ নয়; তবে সিকি ক্রোশ উত্তরে খুঁদারাজের প্রতিষ্ঠিত পদ্মদিঘিতে এখনো জলের অভাব হয়নি। অবগাহন স্নানে অসুবিধা নাই।

গাঙ্গুলী বললেন, আমার তো মাতা খাবাপ হয়নি যে, এই জ্বর গায়ে চষাক্ষেত ঠেঙিয়ে দিঘিতে হান করতে যাব।

দাসপাত্র তার বিচিত্র উৎকলী ভাষায় যা বলল, তার অর্থগ্রহণ হল না গাঙ্গুলীর; কিন্তু রূপেন্দ্রের কানদুটি লাল হয়ে উঠেছে। আর মীনু কী জানি কী করে বুঝে ফেলেছে — হাসির

দমকে ওর পেট ফেটে যাবার জোগাড়। গাঙ্গুলী বলেন, সব কতায় শ্যালের মতো অমন খাখখাক করে হাস কেন বল দিকিনি?

রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, কী বলচে ও?

রূপেন্দ্রনাথ ঠিকমতে অস্বয় ব্যাখ্যা করলেন না। দাসপাত্রের বক্তব্যের সারাংশটুকু শুধু দাখিল করলেন: ও বলছে, কর্তামশাই যদি স্নান করতে না চান তাহলে বলভদ্র তাঁর কাছে বসে পাহারা দিতে পারবে; আমাদের দুজনকে সুভদ্রা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে দিখিতে।

বুদ্ধ বলেন, অ! তা এতে হেসে গড়িয়ে পড়ার কী হল?

মীনের সঙ্গে রূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি-বিনিময় হল। কিন্তু কেউই হাসলেন না। দাসপাত্র একটু অপ্রস্তুত। বেচারি বুকে উঠতে পারেনি যে, মীন ওই বুদ্ধের চতুর্থ পক্ষ। সে ভেবেছিল — ব্যাটা-ব্যাটাও নিয়ে বুদ্ধ তীর্থভ্রমণে এসেছেন। তাই সে বলতে চেয়েছিল পিতৃদেবকে বালকের জিন্মায় রেখে রূপেন্দ্র সঙ্গীক পদাধিষিটে অবগাহন করে আসতে পারেন।

মীনের নির্দেশমতো রূপেন্দ্র বললেন, আমরা এখানে অন্নপাক করে মধ্যাহ্ন-আহার করব। আর সুভদ্রা আর বলভদ্র আমাদের সঙ্গেই মধ্যাহ্ন-আহার সারবে।

দাসপাত্র সানন্দে স্বীকৃত; সিটা তো মহাপ্রভুর আশীর্বাদ, আইজে। ব্রাহ্মণের প্রসাদঅ।



বিগ্রহ নাই! তাতে কী হল? কোণার্ক মন্দির-ভাস্কর্যের খ্যাতি যে আগৌড় প্রসারিত। গাঙ্গুলীখড়োর অত আদিখ্যেতা নেই: বিগ্রহহীন মন্দিরে মূর্তি দেখে বেড়ানো। অগত্যা রূপেন্দ্রনাথ মীনকে নিয়ে মন্দির-ভাস্কর্য দেখতে এগিয়ে গেলেন। দাসপাত্র দু'জনের হাতে দুটি লাঠি ধরিয়ে দিল। ভাঙা পাথরের স্থূপে সাপের আধিক্য। পৌষ-মাঘ তারীণ্ডীষ নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। এই ফাল্গুনে সদ্য দীর্ঘ নিদ্রান্তে তারা গর্তের বাহিরে আসে। নাগ খোঁজে নাগিনীকে। বসন্তকাল যে মিলনের ঋতু।

দাসপাত্রের ভ্রান্তি এখনো অপনোদিত হয়নি। বিশেষ হেতুতে তাই সে নিজেও সঙ্গে গেল না মূর্তিগুলো দেখিয়ে দিতে — পুত্রকন্যাকেও স্মেতে দিল না। মন্দিরের বাহিরে কী জাতির মূর্তি আছে, সে-কথা তার অজানা নয়।

আগেই বলেছি, আমাদের কাহিনীর কালে কোণার্ক মন্দিরের পোতা পর্যন্ত প্রোথিত ছিল বালির গর্ভে। রথচক্রগুলি তাই অদৃশ্য। পরিকল্পনাকার যে সূর্যরথের পরিকল্পনা করেছিলেন তা তখন বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু বর্তমানকালে জগন্মোহনের পূর্বদিকে যে প্রকাণ্ড নবরত্নের ‘স্লাব’টা দেখা যায় — এখন যার নিত্যপূজা হয়—তা তখনো ভেঙে পড়েনি। সেটি

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

ছিল জগমোহনের প্রবেশদ্বারের উপর স্বল্পনে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসেই কী একটা নজরে পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মৃন্ময়ী।
রূপেন্দ্রও একটু ভেবে নিয়ে বললেন, চল, আমরা বরং ওদিকটা দেখি—

‘ওদিক’ বলতে কোন দিক? মন্দিরের চতুর্দিকেই তো একই জাতের মূর্তি। অতি বিশাল অসংখ্য নরনারীর নগ্নশৃঙ্গারদৃশ্য — অতি-অন্তরঙ্গ রতিরঙ্গের মিলন-দৃশ্য! এমনকি বিকৃতকামের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুগল-মূর্তি।

মৃন্ময়ী চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। বললে, যাক রূপোদা, আমার সখ মিটেছে! চল ফিরে যাই। ভাল লাগছে না।

—চল! উপর-পোতালের দেবদাসীদের মূর্তিগুলি কিন্তু অপূর্ব!

—তা হোক, গা ঝিন্ধিন করছে! চল ফিরে যাই।

—চল।

দুজনে পায়ে পায়ে ফিরে আসতে থাকেন। মৃন্ময়ী গভীরভাবে বলে, এতক্ষণ বুঝতে পারছি, কেন সুভদ্রা আর বলাইকে উনি আসতে দিলেন না—

—কেন?

—বাঃ! ওই অল্লীল মূর্তিগুলো কি ভাইবোনের একত্রে দেখা উচিত?

—উচিত কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু একথা তো নিশ্চয় যে, ওদের বাড়ি যখন এত কাছে, তখন ওই প্রকাণ্ড মন্দিরের যাবতীয় মূর্তি ওরা ভাইবোনে বারে বারে দেখেছে। দেখেনি? একসঙ্গেও দেখেছে!

—হ্যাঁ, তা দেখেছে নিশ্চয়। কিন্তু কী বুঝেছে ওরা?

রূপেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন না। পায়ে পায়ে দুজনে গাঙ্গুলীমশাই যে-বটবৃক্ষের নিচে বিক্রম করছেন সেদিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। মৃন্ময়ী পুনরায় বলে, আর সেই জন্য দাসপাত্রমশাই আমাদের মন্দির দেখাতে নিজে এলেন না—

—‘সেই জনোই’ মানে?

মীনু আড়চোখে তার রূপোদার দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে: আহা! বোঝা না যেন...

—ও হ্যাঁ! উনি তো আমাদের স্বামী-স্ত্রী ভেবে বসে আছেন।

হঠাৎ থমকে থেমে পড়ে মৃন্ময়ী। বলে, একটা কথা বল তো রূপোদা, আমার বদলে যদি সত্যিই তোমার সঙ্গে আজ কুসুম-বৌঠান থাকত, তাহলে তোমরা দুজন বোধহয় ঘুরে ঘুরে ওই মূর্তিগুলো দেখতে, তাই নয়?

রূপেন্দ্রনাথ হেসে প্রশ্নটা উড়িয়ে দিতে চান, কী বলে, কী হত, সে গবেষণা থাক!

হঠাৎ দৃঢ়মুহিতে মৃন্ময়ী গুঁর একখানা হাত চেপে ধরে। বলে, না। থাকবে না। সত্যি করে বল তো — তোমার মনোগত ইচ্ছেটা কী? তুমি ওই মূর্তিগুলো দেখতে চাও, তাই না? — তা যাও না, দেখে এসো! আমি বরং একাই ফিরে যাই!

রূপেন্দ্র বললেন, হাতটা ছাড়, মীনু! দূর থেকে দাসপাত্রমশাই দেখলে তাঁর দ্রাস্ত ধারণাটা...

মীনু তৎক্ষণাৎ ওঁর হাতটা ছেড়ে দেয়।



রূপেন্দ্রনাথ বলেন, দেখ মীনু, এখানে তো জনমানব নেই। আর এটাও অনস্বীকার্য যে, মূর্তিগুলো অতি অনবদ্য ভাস্কর্য। তা আমার সঙ্গে একসঙ্গে দেখতে যদি তোমার সন্মোচ হয়, তাহলে আমি বরং এখানে অপেক্ষা করছি। তুমি একচক্রর দেখে এস। তুমি ঘুরে এলে আমি যাব। একসঙ্গে না হয় নাই দেখলাম।

—না। তুমি যাও, তোমার যখন অতই ইচ্ছে তখন দেখে এসোগে। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। যাব না। আমি যাব না। আমার লজ্জা করবে।

—কার কাছে? নির্জনে নগ্নমান করতে কারও তো কখনো লজ্জা করে না।

—কেমন করে জানলে? তুমি নিজে কখনো করেছো?

—কী? নির্জনে নগ্নমান? নিশ্চয়। কেন তুমি করনি?

মীনু আবার আড়চোখে ওঁকে একবার তাকিয়ে দেখল। বলল, তুমি কৌশলে আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছিলে। বল না, আজ আমার বদলে যদি কুসুমবোঁটান তোমার সঙ্গে থাকত, তাহলে তোমরা যুগলে ওই মূর্তিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে। তাই নয়?

রূপেন্দ্রনাথ সত্যকে এবার আর অস্বীকার করতে পারলেন না। বললেন, হ্যাঁ, দেখতাম। সে রাজি হলে। জানি না, ঐ মূর্তিগুলির যৌনতার উর্ধ্বে যে শিল্পসৌন্দর্য তার নাগাল সে পেত কি না। হয় তো সেও তোমার মতো এর মধ্যে শুধু নরনারীর অন্তরঙ্গতাটুকুই দেখতে পেত। কোণার্ক মন্দিরের ভাস্কর্য অনবদ্য।

মীনু অধোবদনে কী যেন ভাবল একমুহূর্তের জন্য। তারপর বললে, সে নিশ্চয় রাজি হতো! সে তো তোমার স্ত্রী। তোমার কাছে তার আবার লজ্জা কী?

রূপেন্দ্র বললেন, এটা যুক্তি গ্রাহ্য নয়। 'লজ্জা' একটা অদ্ভুত মনোবৃত্তি। তুমি তো একা-একাও ওগুলি ঘুরে দেখতে রাজি হলে না — আমি বলা সত্ত্বেও যে, কোণার্ক মন্দিরের ভাস্কর্য গোটা হিন্দুস্থানের মধ্যে অতি অনবদ্য এক দ্রষ্টব্য! কেন রাজি হলে না মীনু? যেহেতু, তুমি নিরাসক্ত হতে পারছ না; তোমার অবচেতনের একান্তে ওই বোধটা জাগ্রত রয়েছে যে, তোমার রূপোদা জানতে পারছে যে, তুমি এগুলি দেখছো! অথচ তুমি যদি কুসুমমঞ্জরী হতে, তাহলে সানন্দে আমার সঙ্গে মন্দির পরিভ্রমণ করতেন...না, না, বাধা দিও না মীনু...আমার বলবোটা শেষ হয়নি — তুমি আমার 'খুঁড়িমা' হলে তোমার লজ্জা করা সঙ্গত — কিন্তু ভাইবোনের সম্পর্কটা যদি সত্য হতো, তাহলে...ভেবে দেখ, ওই বলভদ্র আর সুন্দরা — ভেবে না ওরা কিছু বোঝে না—

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

কথাটা তাঁর শেষ হল না, অন্তরীক্ষ থেকে দৈববাণী হল যেন, সব দেখিলেন, আইজ্ঞা? অল্লানবদনে মিথ্যা কথা বলে যবনিকাপাত ঘটালেন রূপেন্দ্র, হ্যাঁ, দেখে এলাম। এবার স্নানের আয়োজন করা যাক। বোদের তাপ বাড়ছে...

—আইজ্ঞা! সুভদ্রা সে-পাকে আছে। আপনকারদের পদ্মদিধি লই যিবে।



পদ্মদিধিতে শুধু জলই নয়, পদ্মও এখনো আছে। পাথর-বাঁধানো প্রাচীন ঘাট জীর্ণ এবং বিপদজনক। বাঁশ ও কপিল দিয়ে বানানো আর একটি ঘাটের কাছে সুভদ্রা ওদের পৌঁছে দিল। তার ভাই বলাই বুদ্ধের কাছে পাহারায় আছে। পদ্মদিধির চারধারে ঘন বন-জঙ্গল। স্নানের ঘাট সম্পূর্ণ নির্জন। কিন্তু ঘাট একটাই — পুরুষ-স্ত্রীর পৃথক ঘাট নেই। মৃন্ময়ী সুভদ্রার দিকে ফিরে বলে, তুই ছান করতে এলি আর একটা শুকনো কাপড় নিয়ে এলি না? কী বোকা রে তুই?

সুভদ্রা নতনয়নে নীরব রইল।

রূপেন্দ্র এই জনহীন জলাশয়ের পদ্মফুলগুলিকে দেখছিলেন। দর্শকের অভাবে তারা সৌন্দর্য বিকাশের পথে কোনও বাধা মানেনি। কোণার্কশিল্পী — যাঁরা ওই অনবদ্য ভাস্কর্যগুলি গড়েছিলেন — তাঁরা নিশ্চয় দর্শকের অস্তিত্ব সঙ্গন্ধে সচেতন ছিলেন — কিন্তু এই পদ্মবনের অযুত-নিযুত পদ্ম গড়েছেন যে প্রকৃতি তিনি দর্শক সঙ্গন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। হুঁতু রূপেন্দ্র বলে বসেন, এবারও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছো, মৃন্ময়ী। এটা ওই কিশোরীর নিবুদ্ধিতাজনিত হেতুতে নয় — জগন্নাথধামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ওকে তোমার একটি ব্যবহৃত বস্ত্র দান করে যেও...

—মানে?

—মানে, লোকসমাজে পরিধানের উপযুক্ত ওর স্বীকৃতি আচ্ছাদন নাই! সচরাচর এই নির্জনে ও নগ্নগ্নান করে থাকে, যা আজ সম্ভবপর নয়। সিন্ধু বসনেই ওকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সুভদ্রা কিছুই বুঝতে পারে না। যাতে না পারে তাই রূপেন্দ্র অত্যন্ত দ্রুত উচ্চাবগে বিশুদ্ধ বস্ত্রভাষে মৃন্ময়ীকে বস্ত্রব্যাটা জানিয়েছেন। মৃন্ময়ী বলে, বুঝলাম। ওর না হয় দারিদ্র্যজড়িত বিড়ম্বনা — ঠাকুরমশায়ের ক্ষেত্রে হেতুটা কী? মহাশয় কেন একবস্ত্রে এসেছেন?

—আমি অস্বাভাবিকভাবে এসেছি। ওজন কমাতে চেয়েছি। একবেলা সিঁদুরবস্ত্রে থাকলে আমার অসুখ করবে না।

—হয়েছে মশাই, হয়েছে। একজন তো জুরে কাঁধ হয়েছেন, আর একজনও হোন।
[আমার মাথায় এই বিদেশ-ভূঁইয়ে আকাশ ভেঙে পড়ুক।

—তার মানে আমাকে স্নান করতে বারণ করছ?

—আজ্ঞে না, মশাই। আপনি একটু আড়ালে যান। সুভদ্রা তিন ডুব দিয়ে এক ছুটে বাড়ি চলে যাবে। আর আমি স্নান সেবে ওই ঝোপের আড়ালে গিয়ে ভিজ়ে শাড়ি পালটাবো। তারপর ওই ভিজ়ে শাড়িটা জলকাতা করে দেব, তাই পরে আপনি ছান করবেন।

—আমি তোমার শাড়ি পরবো?

—কেন? জাত যাবে তাইলে?

—না, যাবে না। তোমার কাছে আমার অথবা আমার কাছে তোমার আবার সন্ধ্যা কিসের? এই তো সেদিন দুর্গাখুড়ো বলছিলেন, ‘তোমার খুড়িমা তো বিনা-ঘুনসি-যুগে তোমাদের দাওয়ায় হামা দিয়ে ফিরেছেন।’

—‘বিনা-ঘুনসি-যুগে’ মানে?

—মানে নিতান্ত শৈশবে। যখন পরিধেয় বস্ত্র তো ছাড়, তোমার মাজায় ঘুনসি বাঁধার কথাও কারও মনে পড়েনি।

মীনু দু-হাতে মুখ ঢেকে — কী অসভ্য তোমরা!

—তাহলে আড়ালে যাই? তা আড়ালেই যদি যেতে হয় তাহলে তুমিই বা শুধু শুধু শাড়িটা ভিজ়াবে কেন? এখানে তো ত্রিসীমানায় লোকজন নেই।

মুম্বয়ী অবাক হয়ে বললে, তার মানে?

—মানেটা বোঝা কি এতই শক্ত? আমি ‘বিনাঘুনসি-স্নানের’ কথা বলছি।

মুম্বয়ী ছোট একটা পাথর ছুঁড়ে মারল রূপোদাকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

রূপেন্দ্র বললেন, ফসকে গেল তো? চলি!

মুম্বয়ী বললে, না। একটু দাঁড়াও রূপোদা।

—আবার দাঁড়াব? কেন?

—স্নানের আগে তোমার পায়ে একটু আঁবীর দেব। আজ দোলপূর্ণিমা।

ওর পেটকোঁচড়ে যে আঁবীরের পুঁটলি ছিল, এতক্ষণ তা নড়াইরে পড়েনি। মুম্বয়ী তা থেকে একটু আঁবীর নিয়ে রূপেন্দ্রের পায়ে দিল, সুভদ্রার মুখে মাখিয়ে দিল। রূপেন্দ্র বললেন, আমাকে একটু আঁবীর ধার দেবে মীনু? তাহলে আমিও সুভদ্রার কপালে টিপ পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করতাম।

মুম্বয়ী তার কোঁচড় থেকে পুলিন্দাটা বার করে দিল। রূপেন্দ্র ওই কিশোরীর কপালে-গালে আঁবীর মাখিয়ে দিলেন। সুভদ্রা দুজনকে প্রণাম করল। রূপেন্দ্র মুম্বয়ীর দিকে ফিরে বললেন, মনে আছে মীনু — তুমি যখন ওই সুভদ্রার বয়সী, তখন এক দোলপূর্ণিমায়ে আমি

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

তোমার মুখে আবার দিতে চেয়েছিলাম। তুমি দৃঢ় আপত্তি করে দু-হাতে মুখ ঢেকে বলেছিলে : না।



বিনা আঁবীরেও মৃন্ময়ীর গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। বলল, বল তো রূপোদা, সে সময় কে বেশি বোকা ছিল? তুমি না আমি?

—দুজনই সমান নির্বোধ ছিলাম। তাই আমি তোমার আপত্তিটা মেনে নিয়ে বলেছিলাম: ‘বোকা মেয়ে। এত ভয়।’ নির্জনে পেয়েও তোমার কপালে শুধু একটি টিপ পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। গালে-মুখে মাখাতে সাহস হয়নি।

—আজ বুঝি তার শোধ নিতে যাও? সুভদ্রার সামনেই?

রাপেন্দ্র জবাব দিলেন না। দু-হাতে আঁবীর নিয়ে মাথিয়ে দিলেন মীনুর মুখে-মাথায়-গালে-গলায়।

মীনু থরথর করে কঁপে উঠল। আর ঝিলঝিল করে হেসে উঠল সুভদ্রা। পরমুহূর্তেই পদপঙ্কুরের অতলতলে কাঁপিয়ে পড়ল মীনু।



অপরাহ্নের দিকে দুর্গা গালুলীর জুড়টি ছেড়ে গেল; কিন্তু তিনি কিছুতেই সে-রাঙে জগন্নাথধামে প্রত্যাবর্তনে স্নীকৃত হলেন না। সর্বাক্ষে ন্যাক প্রচণ্ড বেদনা। পূর্ণিমা না ছাড়লে বাতের বাথ্যাটাও কমবে না।

বুদ্ধি যোগালো দাসপাত্র।

তার এক ভাইপো নাকি পৃথগ্ন হয়ে বাস করে পাশের বাড়িতেই। শ্যালিকার বিবাহ-উপলক্ষে সে দিনতিনেক হল সপরিবারে পিপুলি গেছে। বাড়িটা খালি। বাড়ি বলতে অবশ্য মাঝারি মাপের একটা উলুখড়ের ঘর আর সংলগ্ন একচালা। ঘরে প্রায় ঘর-জোড়া তক্তাপোষ। তার উপর শীতলপাটি বিছানো। দাসপাত্রের ভ্রাতৃপুত্র ওই তক্তাপোষে সপরিবারে শয়ন করে ছেলে-মেয়েসহ সস্ত্রীক। ওঁদের তিনজনের স্নানভাব হবার কথা নয়। রূপেন্দ্র আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই দুর্গাখুড়ো বলে ওঠেন — আই হল পাকা মাতার বুদ্ধি। কতায় বলে ‘হলে সূজন, তেঁতুল পাতায় নজন’! ঠিগাছে! তাই ব্যবস্থা কর!

দাসপাত্রের ঘরনী মৃন্ময়ীকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে তার বিচিত্র ভাষায় যা বললে তার মর্মার্থ: তীর্থের পথে শয়নের কোন বাধা কি যাত্রিনিবাসে বা ‘চটি’তে মানা চলে? শুধু দেখতে হবে কে কারে কোল-পাঁজরে নিয়ে শুলো। ব্যস! হাসতে হাসতে প্রৌঢ়া বললেন, ‘আপনার কর্তাটির কহিবে কি গোটে রাত্তির জন্য সুভদ্রাদেই হই যিবে।’ — অর্থাৎ দেবী সুভদ্রা যেমন একপাশে বলরাম অপরপাশে জগন্নাথদেবকে নিয়ে নিত্যশোভমানা, মৃন্ময়ীর কর্তাও যেন তেমনি একরাত্রের জন্য একপাশে পিতা, অপর কোলপাঁজরে পত্নীকে নিয়ে শয়্যাগ্রহণ করেন। এতে দোষ নেই।

মৃন্ময়ী প্রথমটা বুঝে উঠতে পারেনি, পরক্ষণেই তার কানদুটি লাল হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে কীভাবে কর্তার ভ্রাতৃ গৃহিণীতে সংক্রামিত হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভুলটা ওরা ভেঙে দেয়নি — না মৃন্ময়ী নিজে, না রূপেন্দ্রনাথ। প্রয়োজনও বোধ করেনি। একটা রাত যে থাকতে হতে পারে, এটা তো আগে আন্দাজ করেনি। এখন — এত বিন্দে, কী করা উচিত মৃন্ময়ী বুঝে উঠতে পারে না।



এ-বেলায় তিনজনেরই পূর্ণিমার পারণ — কাঁচা ফলার। মৃন্ময়ী অবশ্য পূর্ণিমায় দু-বেলাতেই অন্তসেবায় অভ্যস্ত; কিন্তু আজ অবস্থা বিপাকে সেও কলাটা-শশাটা দিয়ে মিষ্টান্ন-সহযোগে পিষ্টিরক্ষা করল। সূর্যাস্ত হবার তর সইছে না আজ পূর্ণচন্দ্রের। কোণার্ক মন্দিরের বিমান আর জগমোহনের ফাঁকে — ওই যেখানে বিশাল ঝাম্পান-সিংহটা মারাত্মকভাবে ঝুঁকে আছে, পড়তে পড়তে পড়ছে না, সেই ঝাঁজে উঠল রূপোর থালাখানা। ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলছে অগুনতি জোনাকি। সমস্ত প্রকৃতি জ্যোৎস্নামদিরায় যেন মোহগ্রস্ত।

দাসপাত্র বাইরের দাওয়ায় একবারলতি জল আর একটি পিতলের গাড়ু রেখে গেলেন।

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

একটি লাঠিও। পরামর্শ দিলেন, রাত্রে যদি কোনও দরকারে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে বেশিদূরে যাওয়া ঠিক হবে না। আর প্রতি পদক্ষেপে লাঠি ঠুকে-ঠুকে যাওয়াটা জরুরি। না, ‘বড় শেয়ালের’ উপদ্রব নেই — বনবিড়াল বা গুলবাঘারা মানুষকে ডরায় — তবে ভাঙা পাথরের স্তূপে বাস করেন ‘তেনারা’ — সেই যাদের নাম ‘রেতের বেলা’ করা মানা।

কুলুদিতে একটি পিতলের প্রদীপে যথেষ্ট রেড়ির তেল ঢেলে জ্বেলে দিলেন। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, কোনও প্রয়োজন নেই — তাঁদের আলোই তো আছে। তা আছে, জানলা দিয়ে একমুঠো জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শীতলপাটিতে। কিন্তু বৃদ্ধ বললেন, না, বাতিটা জ্বলুক। নতুন জায়গা। রাতে ঠোকার খাওয়ার ভয় আছে। তাঁকে রাতে বার দুই-তিন বাইরে যেতে হয়।



দাসপাত্র-গৃহিণীর মতো শয়নের ব্যবস্থা অবশ্য করা হয়নি। দুর্গা গাঙ্গুলী মধ্যমণি। গো-গাড়িতে আসার সময় মৃন্ময়ী দুটি কার্পাস-উপাধান এনেছে। সে দুটি গুঁদের দুজনকে দিয়ে নিজে একটা পুঁচিল মাথায় দিয়ে একপ্রান্তে শুয়েছে। দুর্গা একটি খেদোক্তি করলেন, বৃথাই গা-গতরে ব্যথা হল, টাকাগুলান জলে গেল! ‘অক্লীষা’ না কোন ঠাকুর-দেবতা, না হল ‘তীথাস্তান’!

রূপেন্দ্র বললেন, মন্দির-ভাস্কর্য কিন্তু অনবদ্য।

দুর্গা একটা বিজুস্তগমিপ্রিত প্রশ্ন করলেন, তোমরা দুটিতে ঘুরে-ঘুরে তাই দেখলে বুঝি সকালে?

—না! খুঁড়িমা আর দেখলেন কোথায়? উবড়ো-খাবড়া পাথুরে জমিতে হাঁটতে গুর পায়ে লাগছিল। আমি একাই দেখলাম, দুপুরে।

মৃন্ময়ী অবাক হল। মানুষটা নিপাট সাদিক! কিন্তু আজকাল মিছে কথা আটকায় না ওর জিবে। আশ্চর্য!

‘দুর্গা শ্রীহরি’ বলে পাশ ফিরলেন মধ্যমণি। ধর্মপত্নীমুখো হলেন এতক্ষণে। মৃন্ময়ী সারা গায়ে আঁচলটা টেনেটেনে তাঁর দিকে পিছন করে পাশ ফিরল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল বৃদ্ধের নাসিকাধ্বনি। রূপেন্দ্রের নিশ্বাসও সমতালে শোনা যেতে থাকে। দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না মৃন্ময়ীর। তার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছে সারা দিনের অভিজ্ঞতা। মুখে আধীর মাথা, স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন, চুরি করে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা — শাড়ি পরে সন্ধ্যাত্রে রূপেন্দ্রের স্নানদৃশ্য। — আচ্ছা, সে যখন স্নান করছিল, তখন উনিও কী... না... তা হতেই পারে না। কিন্তু দুপুরে একা-একা ওই বিশি পাথরের মূর্তিগুলো তো ঘুরে-ঘুরে দেখেছেন। তখন তো বিবেকে বাধেনি? ...মনে পড়ে গেল, একঝলক-দেখা দণ্ডায়মান দুটি নরনারীর অন্তরঙ্গ সঙ্গমদৃশ্য। এক-সন্তানের জননী মৃন্ময়ীর এ-বিষয়ে কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। দাম্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গ পর্যায়

বলতে ও বোঝে নীরব্র অন্ধকারে এক বুদ্ধের কামেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করা। নায়িকাও যে সক্রিয় হতে পারে, হয়, এটা ওর ধারণার বাইরে। ...মনে হচ্ছে, ভুল করেছে ফিরে এসে। নিশ্চয় শুধু চোখের দেখায় দোষের কিছু ছিল না — থাকলে, রূপোদা একা-একা তা ঘুরে-ঘুরে দেখতো না।

নিঃশব্দে মৃন্ময়ী উঠে বসে। স্বামীকে ডিঙিয়ে ও-পাশের ঘুমন্ত মানুষটাকে দেখে। নগ্নগাত্রে চিৎ হয়ে আছেন রূপেন্দ্র। একমুঠো চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে, বুকে। নিশ্বাসের তালে তালে উপবীতশোভিত কবাচিবক্ষটা উঠছে-নামছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মীনু; ওর মনে পড়ে গেল কুসুমবোঠানের কথা। আচ্ছা কুসুমমঞ্জরীরও কি এমন ঘুম-না-আসা চাঁদনী রাতে ওই মানুষটাকে এমন করে লুকিয়ে দেখত? শুধুই দেখত? তারপর কি ইচ্ছে হলে পাথরের মূর্তির ওই নায়িকার মতো...

দুর্গা গাঙ্গুলী কাশলেন।

তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ল মৃন্ময়ী। দুর্গা উঠলেন। বসলেন। ইতি-উতি কী যেন খুঁজছেন তিনি। মৃন্ময়ী মৃদুভাষে প্রশ্ন করে: কিছু খুঁজছেন?

এই এক বিড়ম্বনা। ও-পাশে রূপেন্দ্র ঘুমোচ্ছে বলে নয়, গাঙ্গুলীর এই চতুর্থপক্ষ তাঁর সন্তানকে জঠরে ধারণ করতে পারল, কিন্তু আজও 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'র নৈকট্যে আসতে পারল না।

বুদ্ধ বললেন, না খুঁজছি না কিছু। কোন দিক দিয়ে নামব তাই ভাবছি।

মৃন্ময়ী জবাব দেবার আগেই রূপেন্দ্রনাথ একলাফে নেমে পড়েন টোকে থেকে। বলেন, আসুন, এদিক দিয়ে। বাইরে যাবেন বুঝি?

—হ্যাঁ, লাঠিগাছখান দাও দিনি। তোমরা ভিতর থেকে দোরটা বন্ধ করে দাও বরং।

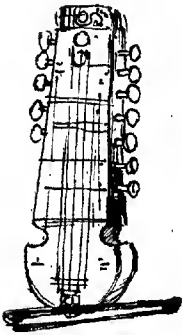
—কেন? আপনার কি ফিরতে দেরি হবে?

—না না, দেরি হবে কেন? এমন কিছু বেশি দেরি হবে না।

—তাহলে দরজা বন্ধ করার কী দরকার? আমি জেগেই বসে আছি। আপনি ঘুরে আসুন।

বুদ্ধ বিরক্ত হলেন, আঃ! সব কতায় তক্কো কর কেন বলতো? দোর খালি পেলেই তেনারা লতিয়ে লতিয়ে টোকাট ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকে। ঐ বেতে যাঁদের নাম করতে নেই। দোর বন্ধ করে দাও। আমি ফিরে এসে টোকা দিলে খুলে দিও বরং।

বুদ্ধ যাবার সময় দোরটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন। রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। দরজা বন্ধ করতে



অভিমানিনী মুন্সায়ী

এগিয়ে গেলেন না। ফিরে এসে তত্ত্বাপোষে বসলেনও না ফের। দরজার পাশে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলেন। মুন্সায়ী বসে আছে। শোয়নি। প্রদীপটা জ্বলছে। রূপেন্দ্রনাথের ছায়া পড়েছে বিপরীত দেওয়ালে। মধ্যগগনে উন্নীত চাঁদের একমুঠো চৌকো নকশাটা, জানলার ফোকর দিয়ে চুরি করে ঘরে ঢুকে যেটা এতক্ষণ চৌকির ওপর লুটোপুটি খাচ্ছিল — সেটা নেমে পড়েছে বিছানা থেকে। যেন রূপেন্দ্রকে অনুসরণ করে। মুন্সায়ী বললে, দাঁড়িয়ে কেন? বস, রূপোদা।

—না, ঠিক আছে।—দাঁড়িয়েই জবাব দিলেন রূপেন্দ্র।

ভ্রুকুঞ্জন হ'ল মুন্সায়ীর। পরক্ষণেই বললে, ও! সে-কথাটা আমার খেয়াল হয়নি। ঠিক আছে, আমিই না হয় দাঁড়িয়ে থাকছি। বস, তুমি। কিন্তু নির্জন ঘরে এক বিছানায় তো আমরা আগেও বসেছি, রূপোদা? বসিনি?

হঠাৎ হেসে ওঠেন রূপেন্দ্র: দূর পাগলি! না, না, সেসব কিছু নয়। বস তুই। এই তো আমি বসছি।

যথেষ্ট দূরত্ব রেখে দুজনে চৌকির দু'প্রান্তে বসলেন। মধ্যবর্তী অন্তর্হিত বৃদ্ধের উপস্থিতি সম্বন্ধে দুজনেই সচেতন।

রূপেন্দ্র বলিশে ঠেশান দিয়ে আধশোয়া, মুন্সায়ী কিন্তু বসে আছে। হঠাৎ বললে, দুপুরে মন্দির দেখতে আবার যখন গেলে, তখন আমাকে ডাকলে না কেন?

—বাঃ! তুই তো দেখবি না বললি?

—মানুষের মন কি বদলায় না? তুমিও তো এককালে বলতে সারা জীবনে বিয়েই করবে না...

রূপেন্দ্র তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে দিলেন, ঠিক আছে বাপু! তুই যদি চাস, কাল সকালে আমরা আবার মন্দির ঘুরে দেখতে পারি।

—তোমার খুড়োমশাই কি জানেন, মন্দিরে কী জাতের মূর্তি আছে?

—বোধহয় না। কেন?

মুন্সায়ী 'কেন'র জবাব দিল না। জানতে চাইল, তোমার খরাপ লাগেনি, রূপোদা? গা খিনখিন করেনি?

—না তো! গা খিনখিন করবে কেন? মূর্তিগুলো তো অনবদ্য।

—চূড়ান্ত 'অশ্লীল' নয়?

—অন্তত আমার কাছে নয়। 'শ্লীল-অশ্লীল' শব্দগুলো আপেক্ষিক। যুগে-যুগে তার সংজ্ঞা বদলায়।

—বুঝলাম না।

—স্বাভাবিক। যেহেতু 'শিল্প' সম্বন্ধে তোর কোনও প্রাথমিক জ্ঞান নেই। কিন্তু খুড়ো এখনো ফিরছেন না কেন? একটু এগিয়ে দেখবি?

মুন্সায়ী জবাব দিল না। রূপেন্দ্র নিজেই উঠে গেলেন। দোর খুলে বাইরে বের হলেন। পূর্ণিমার আলোয় বহু দূর পর্যন্ত পরিষ্কার নজর যাচ্ছে। ত্রিসীমানায় বৃদ্ধকে দেখা গেল না। রূপেন্দ্র দাওয়া থেকে নেমে পড়লেন। এদিক-ওদিক রীতিমতো সন্ধান করে অনেকক্ষণ পরে

ফিরে এলেন। মৃন্ময়ী একই ভঙ্গিতে বসে আছে, হাঁটুর ওপর চিবুকটা রেখে। রূপেন্দ্র বললেন, আশ্চর্য, খুড়েকে ত্রিসীমানায় কোথাও দেখতে পেলাম না।

মৃন্ময়ীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললে, এখন কী করবে?

—তাই তো ভাবছি।

—ওঁর কোনও বিপদ হয়েছে বলে কি তোমার মনে হচ্ছে, রূপোদা?

—বিপদ! না, বিপদ কী হতে পারে? নরখাদক বাঘ এ-তল্লাটে নেই, তা দাসপাত্র আগেই বলেছেন। খুড়োর কাছে কানাকড়ি নেই। তিনি যুবতী নারীও নন — যে কেউ অপহরণ করবে। তাছাড়া তেমন কিছু ঘটলে তো খুড়ো চিৎকার করতেন।

—তাহলে?

—‘তাহলে’ মানে?

—ওঁর এই ব্যবহারের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে তো!

হঠাৎ এই সমস্যার সমাধানটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওঁর কাছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওঁর। গভীর হয়ে বললেন, তুমি কি এটা জানতে, মৃন্ময়ী?

তৎক্ষণাৎ টোঁকি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মীনু। ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললে, বিশ্বাস কর রূপোদা, আমি... আমি কিছুই আন্দাজ করিনি। উনি এই যড়যন্ত্রের কথা মনে রেখেই এখানে ভাঙা-মন্দির দেখতে এসেছেন। আমাদের দুজনকে এভাবে একঘরে বন্দি করার ফন্দি এঁটে! কিন্তু এই বিশ্রী যড়যন্ত্রের কথাটা আমি কিছুই জানতাম না।

—তাহলে, আমার আগে তুমি ব্যাপারটা এমন চট করে আন্দাজ করলে কেমন করে? তুমি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী বলে?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মীনু। বললে, না, না, না! অমন করে বল না, রূপোদা! আমরা দুটিতে যড়যন্ত্র করে এই দুর্ঘটনাটা ঘটাইনি। তোমার আগে আমি ওটা বুঝতে পেরেছি, তার দুটো কারণ। প্রথমত, ওই ফন্দিবাজ খুড়োটাকে তুমি ঠিক চেন না, আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। দ্বিতীয়ত, আমি একটা কথা জানি, যা তুমি জান না—

—সেটা কী?

—তোমার খুড়েকে আমি শাসিয়ে রেখেছি — ওই যন্ত্র-টন্ত্র করার আগে আমি গলায় দড়ি দেব! তোমার খুড়ো বুঝতে পেরেছে...ওভাবে হবে না। বিশ্বাস কর...

রূপেন্দ্র বোধকরি বিশ্বাস করলেন। বললেন, আঃ! পা ছাড়া যা চোঁকিতে উঠে বস। আর বসবিই বা কেন? অনেকটা রাত বাকি। শুয়ে পড়।

—আর তুমি?

—আমিও শোব। চোকির এদিকে। অহেতুক রাত জাগবো কেন?

—আমাকে নিয়ে এভাবে এক বিছানায় শুতে তোমার আপত্তি হবে না?

জবাব না দিয়ে রূপেন্দ্র এগিয়ে গেলেন দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করতে।

—ও কি করছো, রূপোদা? দরজা কি ভেতর থেকে বন্ধ থাকবে?

অভিমানিনী মুন্ময়ী

—থাকবে না? যে লোকটা আমাদের এ-ঘরে থাকতে দিয়েছে, তার কী দোষ? তার সব কিছু চুরি হয়ে যাবে না, দোর খোলা থাকলে?

মুন্ময়ী জবাব দিল না। দুজনেই উঠে বসলেন তক্তাপোষে। দুজনে শুয়েও পড়লো—যথেষ্ট দূরত্ব রেখে।



দুজনেই জেগে। এবং দুজনেই জানেন যে, দুজনেই জেগে।

—রূপোদা?

—বল?

—তুমি বলতে পারবে ঠিক কতক্ষণ ধরে তুমি আমাকে ‘তুমি’র বদলে ‘তুই’ বলছো?

—না। খেয়াল নেই। একথা কেন?

—তুমি আমাকে ‘তুই-তুমি-আপনি’ তিনরকম সম্বোধনই করেছ। জীবনের এক-একটা পর্যায়ে। তোমার কিছুই খেয়াল নেই, না?

—না! বল্‌ শুনি। ঘুম যখন হবেই না।

—সত্যি তোমার মনে পড়ে না, ঠিক কবে ‘তুই’ ছেড়ে আমাকে ‘তুমি’ বলতে শুরু করেছিলে?

—বলছি তো, মনে নেই। বল্‌ না।

—সেও ঠিক এমনি এক দোলপূর্ণিমাত্রে। হঠাৎ ‘তুই’ ছেড়ে আমাকে ‘তুমি’ বলতে শুরু করেছিলে? বলেছিলে, ‘বোকা মেয়ে! রঙ মাগতে তোমার এত ভয়?’

—আশ্চর্য! তোর মনে আছে ঠিক কবে তাকে প্রথম ‘তুমি’ বলেছিলাম?

—থাকবে না? সেই প্রথম যে তোমার চোখে আমি ‘খুকি’ ছেড়ে একটি পুরোপুরি ‘মেয়ে’ হয়ে গেলাম। যাক সে-কথা, কিন্তু আজ ঠিক কোন মুহূর্ত থেকে আমি ‘তুমি’ থেকে ‘তুই’ হয়ে গেছি বলতো?

—জানি না। তুই-ই বল?

—ঠিক যখন বুঝতে পারলে, আমি এ-ষড়যন্ত্রের অংশীদার নই; আর বুঝতে পারলে আমাকে এই ঘরে অরক্ষিত একা রেখে তুমি চলেও যেতে পারবে না। আমাদের দুজনকেই এই চৌকিতে শুয়ে বাকি রাতটা কাটাতে হবে। তাই না? নিজের মনকে তুমি ঠিক তখনই বোঝাতে চাইলে যে, আমি পরস্ত্রী নই, আমি যুবতী নই, আমি তোমার সেই ছোট্ট মীনু। বল? ঠিক বলিনি?

—তুই চিরটাকালই পাগলি রয়ে গেলি, মীনু। নে, এবার ঘুমাবার চেষ্টা করা যাক!

হঠাৎ উঠে বসল মৃন্ময়ী। বলল, না! এমন একটা অন্ধ রাত আমার জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে না। আমি ঘুমাব না, সোনাদা!

—সোনাদা?

—হ্যাঁ, তোমার মনে নেই? ছোটবেলায় তোমার ওপর খুশি হলে আমি তোমাকে ‘রূপোদা’র বদলে ‘সোনাদা’ ডাকতাম।

রূপেন্দ্র হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ রে, মনে আছে। কিন্তু আজকে হঠাৎ আমার উপর খুশি হয়ে ওঠার কারণটা কী?

—তুমি যে মেনে নিলে, আমার একমাত্র পরিচয় এটাই নয় যে, আমি তোমার খুড়িমা, আমি পরস্ত্রী। আমি আজও সেই পড়শি-মেয়েটাই আছি, তোমার চোখে সেই মীনুই।

রূপেন্দ্র জবাব দিলেন না। কথা বাড়লেই কথা বেড়ে যায়।

—তোমারও ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু, সোনাদা।

—নাকি? কেমন?

—আগে তুমি কিছুতেই মিছে কথা বলতে পারতে না। এখন কিন্তু অনায়াসে বল। এই তো একটু আগে তোমার খুড়েকে বললে, পাথুরে জমিতে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি তোমার সঙ্গে মন্দির ঘুরে দেখিনি।

রূপেন্দ্র বললেন, দ্যাখ, মীনু, মিছে কথা আমি আগেও বলতাম না, এখনো বলি না। তবে ‘সত্য’ বস্তুটার সংজ্ঞা ক্রমে ক্রমে বদলে যাচ্ছে আমার ধারণায়। আগে মনে হতো, যা বাস্তবে ঘটেছে সেটাই সত্য, এখন মনে হয় : শিব ও সুন্দরের সঙ্গে যা সম্পৃক্ত শুধু সেটাই সত্য। বাস্তবে তা ঘটুক-না-ঘটুক।

—বুঝলাম না।

—স্বাভাবিক। এ-সব কথা বুঝবার মতো শিক্ষার সুযোগ তো তোরা পাস না।

—আচ্ছা, বৌঠানকেও কি তুমি এভাবে কথায়-কথায় ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে?

রূপেন্দ্রনাথ লজ্জা পেলেন। বললেন, আমি দুঃখিত। তুই এ কথায় আঘাত পাবি তা ভাবিনি। আমি কিন্তু সাধারণভাবে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। অর্থাৎ ক্রীতদাসের অভাবে হিন্দুসমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে চিত্তবিরাজ্যে একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে।

—এবারও আমার বলার কথা : ‘বুঝলাম না’; কিন্তু তা আমি বলবো না — কারণ তুমি তাতে বিরক্ত হবে। বরং তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা সোনাদা, আমার অনুরোধে তুমি খুড়েকে একটা মিছে কথা বলতে পারো? আমার ভালোর জন্যে?

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

—ভূমিকা না করে সোজাসুজি বল না : কী কথা?

—না, সামান্য একটু ভূমিকা আমাকে করতেই হবে। কথাটা ‘কী’ তা বলার আগে আমি বলে নিতে চাই : আমি মরতে চাই না, সোনাদা! জীবনে যা চেয়েছিলাম, তা পেলাম না। কোনদিন পাবও না। অর্থের অভাব আমার নেই; কিন্তু অর্থ তো চাইনি আমি, যখন ছেলেবেলায় শিবপূজো করতাম, পুঁনি পুকুর করতাম? হ্যাঁ, জীবনে আমি সুখী নই; কিন্তু তাই বলে বাঁচবার ইচ্ছে আমার শেষ হয়ে যায়নি।

—ঠিক কী বলতে চাইছিস, মীনু?

—কল তুমি তোমার খুড়োকে একটা মিছে কথা বলবে?

—‘মিছে কথা’। কী কথা?

—বলবে : যজ্ঞ-টঙ্গর দরকার নেই। ওসব ব্যবস্থা ওকে করতে হবে না।

—আমার কথা সে শুনবে কেন? ও-কথা তো আমি খুড়োকে আগেও বলেছি।

দপদপ করে প্রদীপটা নিবে গেল। তাই দু-হাতে মৃন্ময়ীকে আর মুখটা ঢাকতে হল না। তার দু-চোখ ছাপিয়ে যে অশ্রুর বন্যা নেমেছে তা ওর সোনাদা দেখতে পাচ্ছে না। অতিমৃদু স্বরে মৃন্ময়ী বললে, এবার শুনবে। যদি তুমি মিছে করে বলতে পার — আজ রাতের পর আর ওসবের দরকার নেই, বলবে... আমি, ... আমি, ... কীভাবে বোঝাবো তোমাকে? বলবে আমি... আজ রাতেই আবার ‘মা’ হয়ে গেছি।

রূপেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসলেন। প্রদীপ নিভে গেলেও এতক্ষণে চাঁদের আবহা আলোয় চোখটা সয়ে এসেছে। মীনুকে দেখা যাচ্ছে না ভালো করে, কিন্তু তার অবস্থানটার অভাস পাওয়া যায়। মেয়েটা উবুড় হয়ে শুয়েছে, দু হাতে মুখ ঢেকে। রূপেন্দ্রনাথ বঝতে পারেন, মীনু কী নিদারুণ পরিস্থিতিতে পড়েছে। একথা কি মুখ-ফুটে বলার? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। বললেন, তুমি জান না, মীনু, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও-কথা বলা যায় না।

—বিজ্ঞানসম্মতভাবে কী-কথা বলা যায় না!

—ঐ যা তুমি বললে, নরনারীর এক রাত্রেই মিলনেই মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে যাবে।

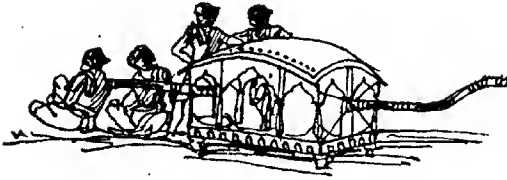
—তোমার খুড়ো তা জানে না। ও ঝাড়-ফুক-কবচ-মাদুলি সব বিপ্লব করেছে, তোমার মতো ধর্মস্তরির মুখের কথাই সে বেদবাক্য বলে মেনে নেবে।

রূপেন্দ্রনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ধব, নিল! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তো তুই ধরা পড়ে যাবি?

—যাব। কিন্তু ততদিনে আমরা সেওরাই পৌঁছে যাব। সেখানে আমি এতটা অসহায় নই। আমার জা আছে, শোভারানী আছে, দেওর আছে। সেখানে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ও যা-খুশি তাই করতে পারবে না।

কথাটা যুক্তিযুক্ত। রূপেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক আছে রে, মীনু। তোকে কোনদিনও হাতে করে কিছু দিতে পারিনি। আজ তোর মুখ চেয়ে এই মিছে কথাটাই না-হয় বলব আমি। তাছাড়া, আমার মতে এই মিথ্যা ঘোষণার সঙ্গে ‘শিব’ এবং ‘সুন্দর’ সম্পৃক্ত — তাই এ ‘সত্য’। তোব হাতে যে বিষ ভুলে দিতে হল না, এতেই আমি সুখী। কিন্তু আর কথা নয়। এবার ঘুমাবার চেষ্টা কর বরং।

আবার দুজনে শুয়ে পড়লেন। চৌকির দু-প্রান্তে। মাঝখানে অনেকটা জায়গা খালি পড়ে থাকল। রূপেন্দ্র জানতেও পারলেন না অদূরে নিঃশব্দ অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে একটি অনিদ্রিতা যুবতী। অনিদ্রিতা এবং অনাদৃত্য।



রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চাঁদ অস্ত গেছে, অথবা পশ্চিম দিগন্তে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। এদিকে ফর্সা হতে শুরু করেছে পূর্বের আকাশ। সূর্য আসন্ন। এখনও জ্বলজ্বল করে জ্বলছে শুকতারা। গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালির কলকাকলি শুরু হয়ে গেছে — কিন্তু তা সুষুপ্ত রূপেন্দ্রনাথের শ্রুতিতে প্রবেশ করলেও মস্তিষ্কে কোন অনুরণন জাগাচ্ছে না। শেষরাতের একটা গা-সিরসির মিঠে হাওয়া বইছে।

রূপেন্দ্রনাথ সুষুপ্তি থেকে সৃষ্টির রাজ্যে — নির্জান থেকে সংজ্ঞান স্থরে উন্নীত হয়ে এখন ‘সপ্নদর্শন’ চেতনার তলে রয়েছেন। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখছেন তিনি : কুসুমমঞ্জরী এসেছে ওঁর কাছে। বিছানায় ঠিক ওঁর পাশেই শুয়ে আছে। কোল ঘেঁষে।

প্রায় প্রতিরাতেই ইদানীং কুসুমমঞ্জরীকে স্বপ্ন দেখেন। বোধকরি সজ্জন চিত্তায় তার কণ্ঠ্যই বেশি করে স্মৃতিচারণ করেন বলে। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে কুসুমমঞ্জরী দেখা দেয় একটা কালো অবগুষ্ঠনে মুখখানি ঢেকে। বোধকরি ওটা মৃত্যুলোকের কৃষ্ণ-চীনাংশুক যবনিকা। রূপেন্দ্রনাথ প্রতি রাতেই তাকে অনুরোধ করেন অবগুষ্ঠন উন্মোচিত করতে, কিন্তু মঞ্জরী তা করে না, অথবা করতে পারে না। রূপেন্দ্র সেই স্বপ্নে-দেখা মঞ্জরীকে দু-হাত বাড়িয়ে ধরতে যান আর সে ক্রমেই দূরে সরে যায়। স্বপ্নমঞ্জরী প্রতিদিনই কী-একটা কথা বলতে চায়, যা বলতে পারে না, বলা হয় না — তার আগেই ওঁর ঘুমটা ভেঙে যায়।

আজও-তাই হল। কুসুমমঞ্জরী এসেছে। কিন্তু এ কী! আজ আর নেই কোনও অবগুষ্ঠন, কৃষ্ণ যবনিকার রহস্যান্তরাল। শুধু তাই নয় — চিরব্রীড়বনতা মঞ্জরী, আজ উদ্দাম — তার বক্ষাবরণ অন্তর্হিত। তার কামনা-বাসনা যেন যুগল সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো উদবেলিত। রূপেন্দ্রনাথ দুই হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে টেনে নিতে গেলেন — আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! চির লাজনমা কুসুমমঞ্জরী দূরে সরে গেল না। বরং বাঁপিয়ে পড়ল ওঁর কবচিবক্ষে

অভিমানিনী মুম্বয়ী

— কোণার্ক-জগমোহনের উপর-জঙ্ঘায় খোদিতা বিপরীতরতাতুরা রমণীর মতো!

রাপেন্দ্র ওর কর্ণমূলে বললেন, ধরা দিলে শেষ পর্যন্ত?

ওর সর্বাবয়ব তখন রতিরঙ্গে থরথর করে কাঁপছে। বোধকরি ওর অবচেতনে প্রত্যাখ্যাত হবার একটা আশঙ্কা ছিলই — সেটা অপসৃত হতেই ও উদ্ভ্রম হয়ে উঠল। রাপেন্দ্রর প্রশ্নের জবাবে কী একটা কথা বলতে গেল, বলা হল না — তার পূর্বেই রাপেন্দ্রর ওষ্ঠাধর নিবিড় নিষ্পেষণে নীরব করে দিল মেয়েটিকে। পরিব্রজ্য কণ্ঠলীনার বাক্যস্ফূর্তির ক্ষমতা রইল না আর।

ক্ষণ-পল-দণ্ড নিয়ে তা মাপা যায় না — দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় — আযৌবনের চূড়নতৃষ্ণা মিটিয়ে যেন ক্ষান্ত হল রতাতুরা। নিশ্বাস নিতে আলিঙ্গনমুগ্ধ হল। আর তৎক্ষণাৎ স্বপ্নস্তর ত্যাগ করে জাগর-বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করলেন রাপেন্দ্রনাথ। অনুভব করলেন, তাঁর বৃকের ওপর উবুড় হয়ে যে মেয়েটি শুয়ে আছে, নিজ দেহভারে যার স্তনদুগল ওঁর রোমশবক্ষে নিষ্পেষিত, সে কুসুমমঞ্জরী নয়! বালার্কসূর্যের আলোয় তাকে চিনতে পারলেন। স্বপ্নভঙ্গের তীব্র ক্ষোভে উঠে বসলেন, ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। মুম্বয়ী পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল ওঁর বৃকে — দুই দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেললেন ওর দুই বাহুমূল। যেন প্রতিবর্তী-প্রেরণায়। শুধু বললেন : ছিঃ!

বজ্রাহতা হয়ে গেল মুম্বয়ী। এর মানে কী? ওর চোখে বলির পশুর দৃষ্টি! কাঁঠালপাতা খাওয়াতে খাওয়াতে আর আদর-সোহাগ করতে করতে হঠাৎ যখন ঘাতক খড়্গখানা হাতে তুলে নেয়, তখন বোধকরি এমনই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হাগশিশু। জানতে চায় : হঠাৎ কী হল?

হতভাগিনী মুম্বয়ী, বেচারি বোঝেনি যে, এতক্ষণ যে মেয়েটি রাপেন্দ্রর আদর-সোহাগ উপভোগ করছিল সে এক স্বপ্ননায়িকা — যার ভূমিকায় অজান্তে আযৌবন-উপেক্ষিতা মীনু অভিনয় করেছে কয়েকটি খণ্ডমুহূর্ত!

রাপেন্দ্র টোঁকি থেকে নেমে পড়েছেন। পোশাক পরিধান করতে শুরু করেছেন। মাথায় চড়ালেন উফ্যীষ, মাজায় বেঁধে নিলেন তরবারি। এখনো পর্যন্ত দুজনেই নির্বাক। মীনু ইতিমধ্যে তার আঁচল দিয়ে সারা দেহ ঢেকে নিয়েছে। অপরিণীম লজ্জায় চরম অপমান আর সহ্যাতীত বেদনায় যেন পাথর হয়ে বসে আছে। রাপেন্দ্রনাথ দ্বারের অর্গল উন্মোচনের উপক্রম করতেই কোনক্রমে বলল, কোথায় যাচ্ছে?

ঘরে দাঁড়ালেন রাপেন্দ্রনাথ। এই প্রথম সংযম হারালেন উনি। বললেন, কাল ভূমি গা ঘিনঘিন করার কথা বলেছিলে, না মীনু? আমি যাচ্ছি পুণর্দ্রাঘিতে একটা ডুব দিয়ে আসতে।

নির্জলা মিথ্যাভাষণ। কিন্তু কেন? রাপেন্দ্র পাণ্ডিত্য, রাপেন্দ্র জ্ঞানী! তাহলে তিনি কেন এটুকু বুঝলেন না যে, স্বপ্নজগতে তিনি যে আশ্রয়লাভ করেছেন সেজন্য তাঁর আত্মধিকার নিষ্প্রয়োজন — আর আত্মধিকার দেওয়ার প্রয়োজনে ওই হতভাগিনীর কাটা ঘায়ে লবণ-নিষ্ক্ষেপ অহৈতুকী ধর্ষকামিতার বিকার!

রাপেন্দ্রনাথ দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন। সকাল হয়ে গেছে। দেখলেন, অশ্বখবৃক্ষতলে দুর্গাখুড়ো মুখপ্রক্ষালন করছেন। তাঁর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হল। কিন্তু কেউ কোন সন্জাষণ করলেন

না। রূপেন্দ্রর অশ্বটি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করছিল।

বিনা সম্ভাষণে রূপেন্দ্র অশ্বারোহণে যাত্রা করলেন — জগন্নাথধামের দিকে।

সূর্য তখনো ওঠেনি। পূর্বগগনে জেগে আছেন শুধু তামসাতারী দেবারিকুলের গুরু শূক্ৰাচার্য।

রূপেন্দ্র চলেছেন তাঁর বিপরীতে — দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে।



কাহিনীটি দীর্ঘ — অতি দীর্ঘ। সব কথা গুছিয়ে বলার না আছে সময়, না পরিবেশ। বস্তুত আমি — এ-কাহিনীর লেখক — এখনো অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি — কীটদষ্ট পুরাতন গ্রন্থের পাতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগকে। রূপমঞ্জরীর সন্ধানে আমার হালও সেই : ‘খাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর!’

তোমরা অবশ্য ও-কথা বলতে পার : বাপু হে, লেখক! এতক্ষণ ধরে ধানাই-পানাই করলে — রূপেন্দ্রনাথের কথা বলেছো, কুসুমমঞ্জরীর কথাও, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম নারী-বিদ্রোহিণী রূপমঞ্জরীর কোনও আভাসও তো এ-পর্যন্ত দিতে পারিনি। সে কোথায়?

তা বটে। এবার সংক্ষেপে শেষ করে সে-কথাই বলি :

যতদূর জানতে পেরেছি, রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে জগন্নাথধামের গোবর্ধনমঠে সমকালীন শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎকারটি আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি। শঙ্করাচার্য জানতে চেয়েছিলেন : কামাভিজ্ঞ হায় রে, বেটা?

রূপেন্দ্রনাথ বিস্মিত সংস্কৃতে প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে, তিনি গৌড়মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বর্ধমানভূক্তির এক ভৈষগ্যচার্য। গোবর্ধনমঠে এসেছেন পূর্বাঞ্চলের ধর্মগুরুর নিকট কিছু সামাজিক অনুশাসন সংক্ষেপে অবহিত হতে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে, বাল্যবিবাহনিরোধ বিষয়ে, সহমরণপ্রথা-বর্জন বিষয়ে।

ধর্মগুরুর ভাস্মাস্থাদিত ভ্রূয়ুগল কুণ্ডিত হয়েছিল। তিনি এবার সংস্কৃত ভাষায় জানতে চাইলেন : প্রশ্নকর্তা দশনামী কোন সম্প্রদায়ভুক্ত।

রূপেন্দ্র জানিয়েছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী নন, গৃহী। তিনি মজ্জদীক্ষাও গ্রহণ করেননি, সংস্কৃতির সন্ধান পাননি বলে।

শঙ্করাচার্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, সর্বপ্রথমে সংস্কৃতির সন্ধান কর, দীক্ষা গ্রহণ কর, জপ-তপ-সাধন কর — না হলে মুক্তি পাবি না।

অভিমানিনী মৃদায়ী

অস্ত্রের বিরক্তি চেপে এবার রূপেন্দ্র বলেন, আমি মৃত্তির সন্ধানে আসিনি, আচার্যদেব! আমি জানতে এসেছি : ক্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ এবং সহমরণপ্রথা সম্বন্ধে আপনার কী সামাজিক অনুশাসন?

শঙ্করাচার্য ওঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন : না, ব্রাহ্মণকন্যার আট বছর পর্যন্ত সারস্বত-সাধনায় বাধা নাই। অবশ্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের বালিকাদের অক্ষর-পরিচয় নিষ্প্রয়োজন — তারা বার-ব্রত-পূজাবিধি শিখবে। ওই অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত। কারণ : অষ্টমবর্ষেতু ভবেৎ গৌরী। তারপর বালিকাদের ধ্যানজ্ঞাননিদিধ্যাসন শুধুমাত্র তাদের পরমপতিদেবতা! বিধবা? তার সম্মার্গ : সহমরণ! অন্যথায় দীক্ষাগ্রহণ, গুরুচরণারবিন্দ-আশ্রিত নিষ্ঠাময়ীর জীবন।

চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে রূপেন্দ্রনাথ নিষ্ক্রান্ত হলেন গোবর্ধনমঠ থেকে। এখানে হল না। হবে না। সংস্কারমুক্ত মহাজ্ঞানীর সন্ধান কোথায় পাবেন? ছারকা? রামেশ্বরম? হিমালয়? নাকি যড়গোস্বামী-অনুসারী উত্তরসূরীর পদরজধন্য বৃন্দাবনধাম?

নিতান্ত ঘটনাচক্রে এই সময় পথিপার্শ্বে এক ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। পাকদণ্ডী পথে রূপেন্দ্র হনহন করে এগিয়ে চলেছেন। গাছের ছায়ায় শুয়েছিলেন অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসী। সাদা বাঙলায় ডাক দিয়ে বললেন, বাবা। একটু এদিকে আসবি?

রূপেন্দ্র থমকে থেমে পড়ে বলেছিলেন, আমি কপর্দকশূন্য, সন্ন্যাসীঠাকুর।

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একগাল হেসে বৃদ্ধ বলেছিলেন : তোরা কাছে কপর্দক তো ভিক্ষা করিনি, একবগ্লা-বেটা।

রূপেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত। এগিয়ে এসে বলেন : আপনি আমাকে চেনেন? এর আগে কখনো দেখেছেন?

—না রে বেটা! তবে এটুকু জানি, তুই একবগ্লা-কোবরেজ, আর জানি গোবর্ধনমঠের গোয়ালে পাঁচনবাড়ির ঠ্যাঙানি খেয়ে কেন্দ্রাপসারী পথে নিরুদ্ধে ছুটে চলেছিস।

—‘কেন্দ্রাপসারী’ বললেন ঠাকুর?

—ভুল বললাম নাকি রে? বলবিদ্যায় কেন্দ্রের অভিমুখের আকর্ষণকে তো কেন্দ্রাভিকর্ষী বলে! তার মানে কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়াকে...তবে পড়াশুনা ভৌরহাদিন করি না — সব ভুলে গেছি রে, বেটা...

রূপেন্দ্র ওঁর পদপ্রান্তে বসে পড়ে বলেন, ডাকছিলেন কেন, বৃন্দ?

—খুনির আগুনটা নিবে গেছে। চকমকি ঠুকতে পারি না। হাত জোর নেই। আগুনটা জ্বেলে দিবি?

—দেব, নিশ্চয় দেব।

খুনি জ্বেলে দিলেন, টিকেয় আগুন দিয়ে বড় ছিলিমটা ধরিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসীর প্রাণপণ বাধা সত্ত্বেও তাঁকে মকরধ্বজ জাতীয় কী-একটা ওষুধ খাইয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এবার বলুন, কী করে জানলেন আমার নাম, আর আমি যে গোবর্ধনমঠে ব্যর্থকাম হয়েছি।

ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীই দিলেন পথের সন্ধান। স্বীকার করলেন, সাধনার প্রথম স্তরে কিছু কিছু ‘বিভূতিলাভ’ করে উনি ভুল করে বসে আছেন। ছলনাময়ীর লীলা! মানুষজনকে

দেখলেই বুঝতে পারেন, সে কালো না ভালো! তার 'সামান্য পরিচয়'!

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, আমি কী খুঁজে বেড়াছি তা জানেন?

—না রে, বেটা, তবে এটুকু জানি : তোরে নিজের মুক্তির পথ নয়!

রূপেন্দ্র তখন সব কথা খুলে বলেন। কী তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

সন্ন্যাসী বললেন, তোরে সমস্যার সমাধানের কথা আমি বলতে পারব না বাপু! কিন্তু যে পারবে তার হুক-হুদিস বাতাতে পারি। না — দ্বারকা, রামেশ্বরম, যোশীমঠ নয়, বৃন্দাবনধামও নয়। তুই সোজা কাশীধামে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণজোড়া জড়িয়ে ধর!

রূপেন্দ্র সহাস্যে বললেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর! বাবা বিশ্বনাথ লিঙ্গমূর্তি। তাঁর চরণজোড়া আমি পাব কোথায়, যে জড়িয়ে ধরবো?

—পাবি রে, বেটা পাবি! অচল বিশ্বাস রাখ! তাহলেই অচল বিশ্বনাথ নয়, সচল বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ পাবি! কাশীতে নয়, ব্যাসকাশীতে। তাঁরই চরণজোড়া জড়িয়ে ধরিস। সেই ন্যাংটাবাবা যদি না পারে, তাহলে ভূ-ভারতে আর কেউ পারবে না। যাঃ!

সন্ন্যাসী নিদ্রাভিভূত হলেন।

রূপেন্দ্র এটাকে দৈবনির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করে চললেন উত্তরমুখে — শেরশাহী বাদশাহী সড়ক ধরে : কাশীধাম।



সচল বিশ্বনাথ! তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া কি অতই সহজ?

কখন কোথায় থাকেন টেরই পাওয়া যায় না। এই শোনা গেল বাবা আছেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। দৌড়ালো শত শত দর্শনাধীর দল। গিয়ে গুনল, বাবা ভাসতে ভাসতে চলে গেছেন কেদারঘাটে। অসি থেকে বরুণা তিনি ক্রমাগত সম্ভরণে অতিক্রম করেন — ঘাট দিয়ে পায় — হেঁটে নয়। তিনি যে দিগম্বর! সমস্ত রাত্রি হয়তো আকণ্ঠ গদ্যজলে নিমজ্জিত হয়ে বসে আছেন — কী শীত, কী গ্রীষ্ম। তাবপর যেই গঙ্গার ঘাটে প্রথম স্নানার্থীর অবির্ভাব ঘটে অমনি বাবা সাঁতরে চলে যান ব্যাসকাশীতে। জনশ্রুতি — তিনি দক্ষিণাত্যের সন্ন্যাসী। কাশীধামে যখন প্রথম আসেন, তখনো বেলীমাধবের ধ্বজাটা মাথা খাড়া করে ওঠেনি। আগরদজের মৃত্যুই তো হয়েছে ছত্রিশ বছর আগে, 1707 খৃষ্টাব্দে। জনশ্রুতি এই সন্ন্যাসী নাকি প্রায় আড়াই শত বৎসরকাল ওই কাশীধামের বিপরীতে ব্যাসকাশীতে লীলাময় হয়েছিলেন।

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

নানান ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে আমাদের কাহিনীর নায়ক একদিন এসে পৌঁছালেন কাশীধামে। জেব-এ নেই পারানির কড়ি। সম্ভরণে অতিব্রত করলেন গঙ্গা। ও-পাড়ে জনমানবশূন্য বালিয়াড়ি। দূর থেকে তাঁর দর্শন পাওয়া গেল। বসে আছেন পদ্মাসনে, জনহীন প্রান্তরে, বালির ওপর। চোখ দুটি নিম্নলিখিত। ধ্যানস্থ। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তবে ঊরু মধ্যদেশে এতই স্ফীত যে, মেদের মৈনাকে তাঁর — না, ভুল হল, তাঁর নয়, দর্শনার্থীর — লজ্জানিবারণ হয়ে থাকে। বিশালকায় পুরুষ। মুণ্ডিত মস্তক। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই এই সন্ন্যাসীর। একজন কাশীবাসী পরামানিকের কীর্তি এটি।

জপ-তপ, পূজা-উজা সে কিছুই করে না। বিশ্বনাথদর্শন বা গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন হয় না তার। সগর্বে বলে, ‘কোন শালা যমদূত মরার পর আমাকে ছুঁতে পারবে না।’ কারণ তার সাধনমার্গ বড় বিচিত্র। সপ্তাহে দুদিন — ‘বৃধ ঊর এতোয়ার’ সে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতের বাধা মানে না। ব্যাসকাশীতে চলে আসে নৌকা বেয়ে। ধ্যানস্থ বাবাকে ফৌরি করে দিয়ে যায়। বাবা টেরও পান না।

ভক্তরা যা ফলমূল-মিষ্টান্ন নিবেদন করে যায়, তা পড়ে থাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কাক-গাঙশালিক আর শূগাল নির্দিধায় তাতে উদরপূর্তি করে যায়। বাবা অচল বিশ্বনাথই জানেন ধ্যানভঙ্গ হলে সচল বিশ্বনাথ সেই বায়স ও শিবাকুলের উচ্ছিষ্টে উদরপূর্তি করেন কি না।

ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মলক্ষ্মীকে সন্তোষে প্রণাম করলেন রূপেন্দ্র। বাবা টেরও পেলেন না। এখন নিরন্তর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। ততক্ষণে চৈতালী রৌদ্র প্রখর হতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, চৈতালী রৌদ্র। পুরো তের মাস সময় লেগেছে কপর্দকহীন অবস্থায় পুরী থেকে কাশীধাম আসতে। এমন কত চৈতালী দিনে উদয়ভানু অস্ত্রচলে উপনীত হয়ে দেখেছেন সমস্ত দুপুরের ‘লু’-এর ঝড়ে বাবার সর্বাক প্রায় ঢেকে যেতে বসেছে; অথচ তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়নি।

নিতান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে। বাবার ধ্যানভঙ্গ হল।

অতলাস্ত একজোড়া চোখ মেলে বাবা বললেন, ক্যা মাংতা হয় রে, বেটা?

আগন্তুক করজোড়ে বললেন, আশীর্বাদ, প্রভু!

রুখে উঠলেন দুর্বাসা : কিউ? ভট্টাচার্যীকো কিউ আশীর্বাদ করু?

রূপেন্দ্র স্তম্ভিত। জ্ঞানত জীবনে কখনো কোন পাপ করেননি। সজ্জানে সজ্জাপথ থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হননি। আর বাবার দৃষ্টিতে তিনি : ভট্টাচার্যী।

করজোড়ে বললেন, কহিয়ে প্রভু, ক্যা পাপ কিয়া হয় মাংয়নে?

—ক্যা তু গঙ্গাপূত্র পিতামহ ভীষ্ম তো ন হো?

এ-প্রশ্নের কী জবাব? রূপেন্দ্র নীরব রইলেন। পরক্ষণেই বাবা মস্ত্রোচ্চারণ করেন :

ন তপস্তপ ইত্যাহ ব্রহ্মচর্যং তপস্তপম।

উর্ধ্বরেতা ভবেদ যন্তু স দেবো ন তু মানবঃ।*

* সর্বপ্রকার জপ-তপ-পূজাচরণবিধির শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ব্রহ্মচর্য।

যিনি ‘উর্ধ্বরেতা’ তিনি মানুষ নন, দেবতা।।

—হ্যাঁ, মায়নে মানলি। লেकिन মহাভাবতকার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন व्यासदेवजी? वह क्या था? देवता? ब्रह्मचारी? इये अष्टाचारी? कैँও रे वेटा, तू तो महापण्डित हो। बाता ना तू?

केन एভাবে तिरस्कृत হচ্ছে তা বুঝতে পারেন না; কিন্তু নিশ্চয় তাঁর কোন অজ্ঞান অপরাধে অসন্তুষ্ট হয়েছেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। তাই প্রশ্নের জবাবে যুক্তকরে নিবেদন করলেন : মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন व्यासदेवजी तो महान ब्रह्मचारी, परमভাগবত थे, प्रभू!

—কैसे? विदुरजननीको उन्होंने लाथ तो नेहि मारा था, ना?

आबार सब कुछ गुलिये याচ্ছে। की বলते चान उर्नि? सन्यासी एकई निश्चासे বলে चलেন, सोच ले मूर्ख! यो मन्दभागिनी तेरि कृपा मांगनेको लिये आयी थि वह तो माता अधिककि तरह आँध बन्द नेहि की! माता अश्लिककि तरह पागुर भि न हो गयी। तो?...

দুরন্ত বিস্ময়ে এবার সাদা বাংলায় প্রশ্ন করেন, কার কথা বলছেন প্রভু?

রূপেন্দ্র নিজের অজ্ঞাতসারে হিন্দি ছেড়ে বাংলায় প্রশ্ন করেন।

এবার ত্রৈলোক্যমীও হিন্দি ছেড়ে সংস্কৃতে প্রত্যুত্তর করলেন। গদ্যে নয়, তাৎক্ষণিক ছন্দোবদ্ধপদে — শার্দূলবিক্রিড়িতছন্দে :

“बालचापल्योः किशलय, कैशोर्योः अर्धश्रुट कूसुमकलि आर यौवनेन लीलाकमल।

सृष्टियज्ञे पूर्णहति दिते अर्थाडालि सज्जिये ऐसेछिल सौमंतिनी नारी॥

येन परमभगवत ब्रह्मचारी व्यासदेवजीर चरणप्राप्ते माता विदुरजननी।

अहोवत। की निदारुण नियति। नायिकार ललाटलिखन शुधु निष्ठुर पदाघात॥”

রূপেন্দ্রনাথ বজ্রাহত! এ কী! এ কী বলছেন বাবা? কামার্তা মুন্সরীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে কখনো তো কোন অনুশোচনা হয়নি। পরদারগমন পাপ নয়? অথচ এই ত্রিকালজ্ঞ সংসারত্যাগী মহাসন্যাসী ছন্দোবদ্ধপদে व्यासदेव আর विदुरजननीর প্রসঙ্গ টেনে এনে...

করযোড়ে সবিনয়ে বলেন, अगर आप निर्देश दें तो मय्य गुयापस् या के उनसे माफि मांग लूंगा।

सन्यासी गर्जे ओठेन : माफि? हाः! क्या वह बैठि हय तेरे लिये?

—तो?

सन्यासी তাঁর বিচিত্রভাষে বুঝিয়ে দেন, तोर ‘वचपन-कि-साथी’ तोर काछे ‘अमृ’ चाईल, तूई दिलि ना। से तोर काछे ‘जहर’ चाईल, ताओ दिलि न तूई। आर की कबते पारत से हतभागिनी? धर्मरक्षार तागिदे, तार सगीनियुक्त तामसाचारी पणुर हात थेके नारीधर्मके रक्षा कबार प्रयोजने गलाय फाँस दिये সেই अडिमानिनी तो सीतामयीर मतो पातालप्रवेश करेछे।

ধরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বালির উপর বসে পড়লেন শ্রোতা। মীন, মুন্সরী, সেই একফোঁটা মেয়েটা...যে মেয়েটা শেষ সাক্ষাতে বলেছিল, ‘জীবনে আমি সুখী নই, তবু মরতেও আমি চাই না, সোনাদা’, ...আর যাকে উনি শেষ সম্ভাষণ কবে এসেছেন, ‘গা ঘিনঘিন

অভিমানিনী মৃন্ময়ী

করছে বলে ডুব দিতে যাচ্ছি' — সে নেই। সে আজ অমর্ত্যলোকের বাসিন্দা। সে তার কথা রেখেছে : 'আর কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইতে আসব না, সোনাদা।' — না, আর কেউ কোনদিন তার নারীত্বকে অপমান করতে পারবে না — না তার সাতপাকের নিষ্ঠুর অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ জরাগ্রস্ত অক্ষম স্বামী, না পুত্রোষ্টি-যজ্ঞের অছিলায় কোনও বামাচারী কামাচারী, না ঔষধবোতা থাকার অহঙ্কারে কোনও আত্মাভিমানী ব্রহ্মচারী।

তাকিয়ে দেখলেন, মহাসন্ন্যাসী পুনরায় ধ্যানস্থ।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন।

হল না, কিছুই হল না। নারীমুক্তির স্বপ্ন সার্থক হবার নয়। এখন একমাত্র লক্ষ্য : সেই অলক্ষ্যলোক — যেখানে প্রতীক্ষা করে আছে সীমন্তিনী কুসুমমঞ্জরী তার স্বামীর পথ চেয়ে, আর মীন তার সোনাদার।

চলতে শুরু করতেই পিছন থেকে আহ্বান এল : লৌচকর আ যা!

করজোড়ে ধুরে দাঁড়ালেন আবার।

সন্ন্যাসী নিমীলিতনেত্র, কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটা ডানে-বামে দুলছে : এক দফে গলতি কিয়া, বেটা। বাস্! দূসরে দফে, নহী।

রূপেন্দ্র আদৌ বিস্মিত হলেন না। ওঁর আত্মহননের সঙ্গল্লাটা যেন ওই সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুমান করা নিতান্ত জাগতিক কার্যকারণসূত্রে। বাবা এবার তাকালেন, বুঝিয়ে বললেন, যাদের লীলাখেলা শেষ হয়ে গেছে, তাদের শান্তি বিয়িত করিস্ না। কিন্তু যাবৎ-জীবন কর্মণ্যেবাধিকারস্তে! তোর কাজ তো শেষ হয়নি। নারীমুক্তি? নারীশিক্ষা? সতীদাহনিবারণ? তুই না তোব ধর্মপত্নীকে জবান দিয়ে বসে আছিস? তাকে সরস্বতীমাদয়ের পায়ের তলায় পৌছে দিবি?

বারবার করে কেঁদে ফেললেন রূপেন্দ্র। বললেন, কী করব, বাবা? কী করতে পারি, আপনিই বলুন? মৃত্যু এসে যে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

—তো ক্যা হয়্যা? তোর মা, তোর জনমভূমি, যে তোর পথ চেয়ে বসে আছে রে বেটা! তার মায়ের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করার ব্রত যে তোর মায়ের! সে তাকে ডাকছে, তুই শুনতে পাচ্ছিস না?

হতবুদ্ধির মতো রূপেন্দ্র বলেন, আমার মা? তাঁর মায়ের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবেন বলে আমার সাহায্য চাইছেন? কে তিনি, কোথায় তিনি?

—হ্যাঁ রে বেটা! তেরি চুন্নিমুন্নি মায়ী!

বুঝিয়ে বললেন, কুসুমমঞ্জরীর সাধনা ব্যর্থ হয়নি। সাধনায় প্রাণ দিয়েছে সে, কিন্তু বিদায়ের পূর্বে নতুন প্রাণকে প্রাণবন্তও করে দিয়েছে। মহাকবি ভারতচন্দ্রের আশীর্বাদী ব্যর্থ হবার নয় : “মদনারিরিপুর বিধানে এ মিলন সার্থক হবেই।”

রূপেন্দ্রনাথ এবার পূর্বাভিমুখী।

গঙ্গার স্রোতধারার পথে চলেছেন গৌড়মণ্ডলের দিকে।

জন্মভূমির সন্ধানে, আত্মজার সন্ধানে।

: রূপমঞ্জরীর সন্ধানে।



ঘনশ্যাম সার্বভৌম

নবম পর্ব

রূপেন্দ্রনাথ এবার পূর্বাভিমুখী।

গঙ্গার স্রোতধারায় যাত্রীবাহী বজরায় এবার চলেছেন গৌড়মণ্ডলের দিকে। জম্মভূমির সন্ধানে, আত্মজা-জননীর সন্ধানে, রূপমঞ্জরীর সন্ধানে। বজরা এসে ভিড়ল নবদ্বীপের ঘাটে প্রায় তিন মাস পরে। সেদিন রূপেন্দ্রনাথের মনটা চনমন করে উঠল। এখানে নেমে নৌকা বদল করে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় জলাঙ্গী বেয়ে,

কৃষ্ণনগরে। সেখান আছেন গুঁর পরমসুন্দর রায়গুণাকর কবি — রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। প্রাকবিবাহ জীবনে রূপেন্দ্র একবার কৃষ্ণনগরের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ব্যবধবজের চিকিৎসা করতে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে আলাপ হয়েছিল মহাকবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে। বস্তুত যে কয়দিন কৃষ্ণনগরে ছিলেন ঐ প্রোষিতপত্নীক কবির ভদ্রাসনে অতিথি হিসাবে বাস করে যান। তখন কুসুমমঞ্জরীর সঙ্গে রূপেন্দ্রনাথের বিবাহ স্থির হয়েছে। রূপেন্দ্রের কাছে সে খবর শুনে কবি ভারতচন্দ্র বলেছিলেন তোমাদের যদি পুত্রসন্তান হয় তবে তার নাম দিও : ‘আত্মদীপ’ আর যদি কন্যাসন্তান হয় তবে তার নাম দিও : ‘রূপমঞ্জরী’। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, ‘রূপমঞ্জরী’ শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। সহজ, সরল দ্বন্দ্বসমাস। আমাদের দুজনের নামের অংশবিশেষ, কিন্তু কবি! ঐ ‘আত্মদীপ’ শব্দটির তাৎপর্য কী?

ভারতচন্দ্র বুঝিয়ে বলেছিলেন, এতবড় পণ্ডিত হয়েও সেটা তুমি ধরতে পারলে না? শোন! অশীতিপর শাক্যসিংহ যখন কুশীনগরে শেষশয্যায় শায়িত, তখন তাঁর মহাপরিনির্বাণ শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র বুদ্ধশিষ্য : আনন্দ। তিনি গৌতমবুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রভু! আপনার মহাপরিনির্বাণের পরে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হবো আমরা সমাধানের জন্য কার কাছে যাব?

মহাজ্ঞানী প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন :

আত্মদীপো ভব।

আত্মশরণো ভব।।

অননাশরণো ভব।।



ঘনশ্যাম সার্বভৌম

বলেছিলেন, নিজেকে প্রদীপ করে জ্বলিও। সেই বিবেক-নির্দেশিত পথে গমন কর। অপরের কথায় জীবন পরিচালিত কর না। ভাই রূপেন্দ্র! আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, বুদ্ধদেবের ঐ নির্দেশটি তুমি জানো বা না জানো — জীবনে সেই পথনির্দেশটি তুমি কঠোরভাবে মেনে চল। যেন ওটাই তোমার জীবনের মূলমন্ত্র। তাই এই নামকরণ করলাম তোমার পুত্রের।

আজ রূপেন্দ্রের তাই ইচ্ছা হল নবদ্বীপের ঘাট থেকে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে চলে যেতে। মালতীর বেড়া দিয়ে ঘেরা কবির সেই পর্ণকুটীরে। গিয়ে বন্ধুকে দু-বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করতেন। বলতেন, ‘আত্মদীপের’ পরিবর্তে ‘রূপমঞ্জরী’ অবতীর্ণ হয়েছে এ ধরাধামে। ঐ মেয়েটিকেই দীক্ষা দেবেন তিনি আড়াই হাজার-বছরের ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রটায় : “আত্মদীপো ভব।”

কিন্তু তা হল না। ‘মাহেশ’ গ্রামখানি ওঁকে টানছে। স্তনভারনম্র গাভী যেমন বাছুরকে ডাকে, রূপেন্দ্রের আত্মজা-জননী যেন ব্রতউদযাপনের তাগিদে ওঁকে সে ভাবে ডাকছেন। সবার আগে ওঁকে মাহেশ যেতে হবে। বজরা ছাড়ল। অতিব্রহ্ম হল কালনার ঘাট। এখান থেকে পশ্চিমমুখা রওনা হলে নদীপথে যাওয়া যায় তাঁর পিতৃভূমিতে : সোএগুই গ্রামখানিতে। কিন্তু না। রূপেন্দ্র সে পথেও গেলেন না। নৌকাটি যাবে ফ্রেডরিকনগর পর্যন্ত। উনি নৌকা থেকে অবতরণ করবেন তার পূর্বই — ফরাসীডাঙার ঘাটে। আজ যার নাম চন্দননগর। কারণ ওঁর পিসামণ্ডরের ভদ্রাসনটি যে গ্রামে, সেই মাহেশে যেতে হলে ঐ ঘাটেই নামতে হবে।

তাই নামলেন। ফরাসী অধিকৃত ফরাসীডাঙার ঘাটে। পট্টলিটি বগলে নিয়ে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলেন মাহেশের দিকে, রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

মঞ্জরী নেই। কুসুমমঞ্জরী অকালে কবে গেছে; কিন্তু বার্থ হয়নি তার আত্মদান—মহাসাধক ত্রৈলোক্যস্বামী তাই বলেছেন। যাবার আগে সে রেখে গেছে রূপমঞ্জরীকে। সেই মহাসাধকের নির্দেশমতো রূপেন্দ্র কন্যাকে নিয়ে যাবেন স্বগ্রামে : সোএগুই গ্রামে। সেখানে আছেন বৃদ্ধা জগুপিসিমা, আছে কাত্যায়নী। তারাই শিশুটিকে মানুষ করে তুলবে, শিশুকাল থেকে যত্ন না নিলে মানসিক গঠন অন্যরকম হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন তীর্থ পরিভ্রমণ করেছেন। ভাগীরথীর দুই তীরের বহু বর্ষিষ্ণু জনপদ। তারপর শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাম্রলিপ্ত, দত্তপুত্র, ভদ্রক, পুরুষোত্তমপুর, কটক, একাম্বকানন (ভুবনেশ্বর), সাক্ষীগোপাল হয়ে নীলাচল শ্রীক্ষেত্র। সেখানে বার্থ হয়ে পদব্রজে অরণ্যভূমির অজানা পথে এসে বাদশাহী সড়ক (জি. টি. রোড)। তারপর আর পথসন্ধান নিতে হয়নি। বাদশাহ শের শাহ-এর সরলীকরণ পৃথি সোজা বাবা সচল বিশ্বনাথের চরণতলে। সেখানেই পেলেন নির্দেশ : রূপমঞ্জরীকে ‘অত্মদীপ’-মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতে হবে।

তীর্থপরিভ্রমণ কালে অনেক-অনেক কিছু দেখেছেন। ওঁর এখনো বিশ্বাস : ‘ধর্মসংস্থাপনার্থায়’ তিনি যখন আসবেন — যদি আজও না এসে থাকেন — তবে তাঁর লীলাক্ষেত্র ঐ ভাগীরথী-বিস্তৃত ‘গঙ্গাহদির’ কোন একটি জনপদ। পুরীতেও নয়। কাশীধামেও নয়।

কিন্তু বদভূমের কী অবস্থা! গঙ্গার দুই তীরে গায়ে-গায়ে গড়ে-ওঠা বর্ষিক গুণ্ডগ্রাম। অলিঙ্গিত সূশাসনে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলছে নির্বিলে। বেশমশিল্লীরা কাপড় বোনে। কুস্তকারেবা চাকা ঘোরায়, তাঁতিরা তাঁত বোনে। দিগন্ত-অনুসারী মাঠে টোকা-মাথায় কৃষকদল সোনা ফলায়। গ্রামজীবনের মধ্যমণি ব্রাহ্মণ-সমাজ! মহামহোপাধ্যায়ের ন্যায়ের ভাষা নিয়ে চুল-চেরা বিচার করেন : তৈলটা পাত্রাধার অথবা পাত্রটা তৈলাধার! পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী—কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবেও কোন পাঠশালায় দেখতে পাননি বেণী-দোলানো ডাগর-চেখে কোনও বালিকা বা কিশোরীকে! ওদের অক্ষর-পরিচয় হওয়া মানা। স্ত্রীলোকের অক্ষর-পরিচয় মাত্রই অনিবার্য অকালবৈধব্য। কোন যুক্তিতে? বাঃ। কোন গুণ্ডমূখ এটা জানে না! ন্যায়রত্ন মশাই স্নায়ু বিধান দেছেন। শাস্ত্রে নাকি তাই নেখা আছে!

জল-অচল অঙ্কুরের বাস করে ভদ্রপল্লীর বাহিরে। তারা অস্ত্রবাসী। গঙ্গানান তারা করতে পারে। তবে ঐ আঘাটায়। পথেঘাটে তাদের সন্তস্ত পদক্ষেপ : বামুন-গায়ে যেন ছায়াপাত না ঘটে যায়।

সে নীরঞ্জ অন্ধকারে রাজ-রাম, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সম্ভাবনার আভাসমাত্র নাই।

প্রায় তিনশবছর পূর্বে এই ভাগীরথী-বিশ্বীত নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক বিদ্রোহী যুগাবতার। তিনি গৌড়মণ্ডলকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের বন্যায়। যবন হরিনাসকে তিনি কোলে টেনে নিয়েছিলেন। আচণ্ডাল ভক্তকে এক মন্ত্রে আবদ্ধ করে শিথিয়েছিলেন ‘হরিনাম’-ছাড়া এ কলিযুগে যুক্তির আর কোনও পথ নেই। যুক্তি নয়। ভক্তি আর বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। কিন্তু মাত্র তিনশ বছরের ভিতরেই তাঁর প্রভাব লুপ্ত হতে বসেছে। সম্প্রদায় হিসাবে বৈষ্ণবেরা সমৃদ্ধিলাভ করেছে বটে — শাস্ত্র গৌড়মণ্ডলে সে ধর্ম এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত — কিন্তু তা নিতান্ত আচারসর্বঙ্গ। মূল তাত্ত্বিক লক্ষ্য থেকে তারা সরে গেছে। তারা মাথা কামায়, তিলক সেবা করে, খঞ্জনী বাজিয়ে দোরের দোরের মাধুকরী করে ফেরে, আর কিশোরী-ভজনের তাল খোঁজে। চৈতন্যদেবের ঋজু ধর্মবিশ্বাস থেকে তা অনেক দূরে সরে গেছে। কৃপমণ্ডক ব্রাহ্মণসমাজপতিদের চণ্ডীমণ্ডপের বিধানে যাদের জাত গেছে তাই ক্রমে দলে দলে হয়েছে নেড়া-নেড়ি — বোটম-বোটমী। ঠিক মেভাবে প্রাক-শঙ্করাচার্য যুগে সমুদ্রযাত্রা করার অপরাধে জাত খুইয়ে দিশেহারা শত শত দক্ষ নাবিক বাঁকেছিল বৌদ্ধধর্মের দিকে, নাথ সম্প্রদায়ের দিকে।

মুষ্টিমেয় কিছু সাদৃশ্য বৈষ্ণব — প্রভু নিত্যানন্দের প্রভাব — নবদ্বীপ, শান্তিপু, খড়দহ, ত্রিবেণী, তেঘড়া আর ভাটপাড়ায় হয়তো সেই প্রেমের ঠাকুরের পবিত্র দীপশিখাটি আজও জ্বলিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব আখড়ার চতুঃসীমায় বৃহত্তর বঙ্গসমাজে তার প্রভাব নেই।

এই কৃপমণ্ডক সমাজে কাশীধাম থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন রূপেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম প্রতিজ্ঞা — যা পরবর্তী শতাব্দীতে পুনরুজ্জীবিত হবে বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহনের মাধ্যমে — সেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। আত্মতাকে তিনি নিয়ে যাবেন মহেশ্বরের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাতাবরণ থেকে। নিয়ে যাবেন তাঁর সোএগ্রই গাঁয়ে। যেখানে আছেন তাঁর গিসিমা, আছে ছোট বোন

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

কাত্যায়নী, তার স্বামী গঙ্গারাম আর আধুনিকমনা বৃদ্ধ জমিদার : ভানুদীমশাই।

রূপমঞ্জরীর বয়স এখন কত? হিসাবমতো দু-আড়াই বছর। এতটুকু শিশুকে মানুষ করার অভিজ্ঞতা বা পারদর্শিতা তাঁর নাই। কিন্তু কাত্যায়নী আছে। পিসিমা আছেন। তারা দেখভাল করবে! ইতিমধ্যে না সেই ছোট্ট মেয়েটির হাতেখড়ির বয়স হয়। কথা ছিল, হাতেখড়ি দেবে ওর মা। সে কথা আর রক্ষা করা গেল না।

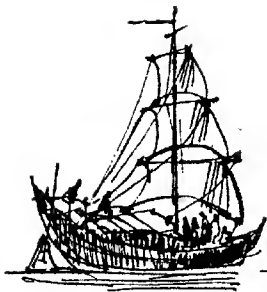
না। এই অর্বাচীন কুসংস্কারটা উনি আদৌ স্বীকার করেন না : অক্ষর-পরিচয় হলে, শিক্ষিতা হলে একটি কুমারী মেয়ে অকাল-বৈধব্যের দিকে পদক্ষেপ করে। যাজ্ঞবল্ক্যজায়া মৈত্র্যেয়ীর স্বামী অতি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। গার্গী এক দুর্লভ প্রতিভা। বান্দীকির শিষ্য আত্রেয়ী ছিলেন মহাপণ্ডিতা : বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে কী-করে স্বহস্তে গোপনপত্র লিখে পাঠান, যদি তিনি নিরক্ষর হয়ে থাকেন? রূপেন্দ্রনাথের মতে ঋগ্বেদের সূত্রকারদের ভিতর অনূন সাতাশজন মহিলার নাম পাওয়া যায়। গার্গীপ্রণীত ঋগ্বেদের টীকা আজও প্রামাণ্য। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত অনূন আঠাশটি সূত্রের মন্তব্যই হচ্ছেন একজন অত্রি-বংশীয়া মহাপণ্ডিতা : বিশ্বারা! কাশীধামের পৌরাণিক মহারাজা অলকেশ্বর জননী মদালসা এক আশ্চর্য পণ্ডিতা। রাজপুত্র অলককে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য কোনও গুরুতর আশ্রমে যেতে হয়নি। রাজাভগ্নপুত্র তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন রাজমহিষী মদালসার কাছে।

তাহলে?

সোএগই-গ্রামের ব্রাহ্মণ্যসমাজ যদি ওঁর আত্মজাকে কোন চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করতে অনুমতি না দেয়? তাহলে তিনি নিজেই একটি চতুষ্পাঠী খুলে বসবেন। প্রয়োজনে তাতে একটি মাত্র ছাত্রীই থাকবে : রূপমঞ্জরী!

হয়তো এই অপরাধে সমাজ ওঁকে জাতিচ্যুত করবে। করে করুক। উনি ক্ষম্যেপ করবেন না। রোগযন্ত্রণায় যখন কুপমণ্ডুক সমাজপতির কাতর হবে তখন তাদেরই এসে জাতিচ্যুত রূপেন্দ্রনাথের কাছ থেকে আয়ুর্বেদিক ঔষধ নিয়ে যেতে হয় কি না তিনি দেখতে চান। কন্যার বিবাহ না হয় নাই দিলেন! নিমন্ত্রণ কাউকে করবেন না, ফলে নিমন্ত্রণ রাখতে যাবার বিড়ম্বনাও নাই। ফার্মে কাপড় কাচলে রজক নিষ্প্রয়োজন। চুল-দাড়ি-গোঁফ না কামালে নাপিতেরই বা প্রয়োজন হবে কেন?

একঘরে বা জাতিচ্যুত হবেন ধরে নিয়েই তিনি চলেছেন নদীর ঘাট থেকে স্বশ্রদ্ধায়। আত্মজাকে সঙ্গামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।



ফরাসীডাক্সার ঘাটে পুটলি-বগলে যখন নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন, তখনও আকাশে তারা ছিল। চেনা পথ, আলিবর্দীর শাসনে চোর-ডাকাত ঠেঙাড়ের দল অন্য জাতির জীবিকা বেছে নিয়েছে। রূপেন্দ্রনাথ নির্ভয়ে আমকাঁঠালের ছায়াঘেরা বনপথে দিয়ে শেষরাতে যখন মাহেশে এসে পৌঁছলেন ততক্ষণে পূর্ব আকাশটা সিঁদূর-বরণ হতে শুরু করেছে। ফরাসীডাক্সার বাজারে কিছু পথচারী সারমেয়-শীংকারে আর বনপথে একটানা বিকিপোকোর ডাক ছাড়া জীবনের সাড়া পাননি। মাহেশের কাছাকাছি এসে দেখলেন, মানুষজন শয্যাভ্যাগ করেছে। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের দিকে। পথে-ঘাটে অপরিচিত বহিরাগতকে দেখতে সেযুগের মানুষ আদৌ অভ্যস্ত ছিল না। অধিকাংশ মানুষই গ্রামের চেনা-চোহন্দীতে পাক খেত, কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো। রূপেন্দ্রনাথ ভ্রক্ষেপ করলেন না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন মাহেশের সেই সবচেয়ে বড় চক্ষুমেলায় প্রসাদের দিকে। নায়েব ভবতারণ গাঙ্গুলী মাহেশের সব চেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি। স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দক্ষিণ হস্ত। ইন্দ্রনারায়ণ ছিলেন চন্দননগরে ফরাসী গভর্নর ডুপ্রেস্তের দেওয়ান। অর্থকৌশলিন্যে ইন্দ্রনারায়ণকে বলা যায় নাটোরের রানী ভবানী বা কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমকক্ষ। সুতরাং সেই ইন্দ্রনারায়ণের দক্ষিণহস্ত ভবতারণও মাহেশে হাতে মাথাকাটার কতিবন্ধ অধিকারী।

নগ্ন পদে, নগ্ন গাত্রে, শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়-সর্বস্ব রূপেন্দ্রনাথ এসে থমকলেন দেউমানুষ উর্চু পাঁচিল-দেওয়া দেউড়ির প্রবেশদ্বারে। ঢালাই-লোহার শিক-দেওয়া পেট। খুলে দিলে চার ঘোড়ার চৌকুড়ি অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। গাদাবন্দকধারী দ্বাররক্ষক এগিয়ে এসে জানতে চাইল: ক্যা চাইয়ে বাবুজি?

‘বাবু-কালচার’ ডিহি-কলকাতায় সদা জন্মেছে। দারোয়ান কলকাতাইয়া লবজটা আয়ত্ত করেছে: ‘বাবুজী’।

রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, গঙ্গোপাধ্যায়-মশাই কি উঠেছেন?

—বড়াসা’ব? জী নেহি। ওর একঘণ্টা পিছে আনা...

দারোয়ান সাহেব-সুবোদের নিয়ে কারবার করে, ‘ঘণ্টা’ ‘মিনিট’ চেনে। সাহেব-বিবি-

ফনশ্যাম সার্বভৌম

গোলামের ফারাক বুঝতে পারে। রূপেন্দ্র লোহার গেটের এপারে দাঁড়িয়ে-কী করবেন স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। সহসা একটি চকিত এবং সুললিত বামাকণ্ঠে চমকিত হয়ে ওঠেন:

—বাঁড়ুজ্জমশাই না?

শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলেন। দু-বছরে পঞ্চদশী হয়েছে, সপ্তদশী — কিন্তু তুলসীকে চিনতে অসুবিধা হল না ওঁর। বললেন, ভাল আছ, তুলসী?

ভবতারণের অনুচা কন্যা। মঞ্জরীর পিসতুতো ছোট বোন। ওঁর শালিক। ভোরবেলা পাঁচিল-ঘেরা বাগানে পূজার ফুল তুলতে এসেছে। সদ্য স্নান করেছে। মাথায় ভিজ্ঞে চুল। সকালে মেয়োর বাড়িতে বক্ষবন্দনী বা জ্যাকেট ব্যবহার করত না। তুলসী তার আঁচলটাই সাবধানে মাজায় জড়িয়ে নিজেছিল। তবু তার হৃদয়ের যুগ্ম-উচ্ছ্বাসের আভাস লুকানো সন্তকণ্ঠ হয়নি।

তুলসীর আদেশে দ্বারপালকে গেট খুলে দিতে হল।

ওরা দুজনে পায়ে-পায়ে প্রকাণ্ড উদ্যান অতিক্রম করে লাল সুরকি বিহানো পথে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। তুলসী বলে, একটু দাঁড়ান, জামাইবাবু, পেটামটা সেরে নিই।

—তুমি সদ্য স্নান করেছ, আর আমি সাত রাজ্যের ময়লা পথ অতিক্রম করে আসছি, এখন আমার পদস্পর্শ নাই করলে, তুলসী।

তুলসী শুনল না। পথের মাঝেই ওঁকে থামিয়ে পদস্পর্শ করে প্রণাম করল। বলল, কোথায় ছিলেন এতদিন? একবস্ত্রে বেরিয়ে গেলেন, কেমন করে দু-দুটো বছর কাটালেন? হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, সে অতি দীর্ঘ কাহিনী। ইতিমধ্যে নীলাচলের শ্রীক্ষেত্র আর কাশীধাম ঘুরে এলাম।

—পুরী-কাশী দুটোই? সে তো অনেক অনেক দূরের পথ। নয়?

—সেজন্যই তো এত দেরি হল।

—চুল-দাড়ি কাটেন না কেন? বাঁউগুলের মতো!

রূপেন্দ্র সে-কথার জবাব এড়িয়ে বললেন, তোমার বাবা-মশাই আর মা ভাল আছেন? বাড়ির আর সবাই?

তুলসী জবাব দেবার আগেই ও পাশের খিড়কির দরজা খুলে বার হয়ে এলেন এক শ্রোতা। তুলসীর মা।

তুলসী বললে, ঐ তো মা!...মা, দেখ, কণ্ঠে কণ্ঠে এনেছি।

ভবতারণজায়া মাতঙ্গী যেন ভূত দেখলেন। মাথার উপর ঘোমটা তুলে দিয়ে বললেন, তুই ভিতরে যা, মেজ। আমি দেখছি।

রূপেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন। স্পর্শ বাঁচাতে মহিল: দুপা পিছিয়ে গেলেন। বললেন, এতদিনে মনে পড়ল আমাদের কথা?

রূপেন্দ্র অপরাধীর মতো, সলজ্জ নীরব রইলেন।

—কী কঠিন প্রাণ গো জামাই, তোমার! মেয়েটার হেবাদ পয়ান্ত তর সইল না? এক

কাপড়ে কাউকে কিছু না বলে ঘর ছাড়লে?

রূপেন্দ্র নতনেত্রে বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছেন মা, আমি আজও অশৌচ পালন করে চলেছি। চুল-দাড়ি কাটি না, মাথায় তেল দিই না। একাদশীতে উপবাস করি...

শ্রীমতী বিস্মিতা হলেন। বললেন, কেন? কেন? একাদশীতে উপবাস কর কেন?

—আমি মনে করি: দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব। স্বামীর প্রয়াণে স্ত্রী যদি একাদশীতে উপবাসী থাকে, তাহলে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীকেও একই ভাবে একাদশী পালন করতে হবে।

শ্রীমতীর বাক্যস্বর্তি হল না। সঙ্গিত ফিরে এল পাশ থেকে বর্ষীয়সী পরিচারিকা কানাইয়ের-মায়ের কণ্ঠস্বরে, মা! কর্তামশাই বললেন, 'ঐ ওঁনারে বৈঠকখানায় বসতে বলতি। আর আপনারে এঁটু ভিতরবাগে আসতি বললেন।

শ্রীমতী কিছু বলার আগেই কানাইয়ের মা রূপেন্দ্রকে বললে, আয়েন, জামাইবাবু, আমার লগে লগে...

পথ দেখিয়ে সে নিয়ে এসে ওঁকে বসালো ভবতারণের শ্যান্ডেলোর-শোভিত প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরে। ঘরের একদিকে একটি বিশাল পালঙ্ক। তাতে ধপধপে ফরাস ও চাদর পাতা। তাকিয়া ছড়ানো। আশপাশে কিছু কেদারা। মর্মর পিলসুজে মার্বেলের ভেনাস, ব্যাকাস, সাটির, ফন। ফরাসী অনুকরণে গ্রীক ভাস্কর্য।

কানাইয়ের মায়ের নির্দেশমতো একটি কেদারায় গিয়ে বসলেন। ঘরের ও-প্রান্তে আর একজন খিদমদগার বাড়ন দিয়ে আসবাবের ধুলো ঝাড়ছিল। সে আড়চোখে বার-দুই দেখল ওঁকে। কানাইয়ের মায়ের কাণ্ডজ্ঞান আছে। লোকটাকে বললে, ঝাড়-পোঁচ থাক এখন, ধুলো ওড়াস না। তুই বরং টানা-পাখাটা একটু টান দিনি, কালিপদ...

কালিপদ প্রতিবাদ করে, এত সাত-সকালে? এখন তো ঠাণ্ডা!

রূপেন্দ্র বলে ওঠেন, না, না। টানা-পাখা টানতে হবে না।

কালিপদ আর কানাইয়ের মা ভিতর বাড়িতে চলে গেল।

একটি বিলাতী ঘড়ি ঢং ঢং করে ছয়বার শব্দে জানান দিল সময় বয়ে চলেছে। বাহিরের বাগানে অগুনতি পাখির প্রভাতী কলকাকলি। চুপচাপ বসে রইলেন রূপেন্দ্র। প্রায় এক দণ্ড পরে ভিতরবাড়ি থেকে আবির্ভূত হলেন গৃহস্বামী। দু-বছরে একটু স্থূলকায় হয়েছেন। সদ্য স্নান করে এসেছেন। উর্ধ্বাঙ্গে একটি রেশমের উত্তরীয়, নিম্নাঙ্গে ফরাসডায়াস বোনা ধুতি। পায়ে চন্দনকাঠের খড়ম। তিনি দীর্ঘ পদক্ষেপ এগিয়ে এসে বসছেন পাঁজকে, তাকিয়াটা টেনে নিলেন। হাঁকোবরদার আসছিল পিছন-পিছন। আলবোলাটা নামিয়ে রোপ্যনির্মিত ফরসির নলটা এগিয়ে দিল কর্তামশায়ের দিকে।

রূপেন্দ্র উঠে এসে প্রণাম করলেন পিসমশুরকে। সাবধানে, স্পর্শ বাঁচিয়ে। ভবতারণ বললেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবাজীবনের?

—আজ্ঞে আপাতত কাশীধাম থেকে। নৌকায় প্রায় তিনমাস লাগল।

—অ। তা চুলদাড়ি কামানো হয় না কেন? অশৌচ? নাকি সময় হয় না? অথবা সংসারে বিাতরাগ?

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

রূপেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, গৌড়মণ্ডলে আজই এসে পৌঁচেছি।
এদিককার সংবাদ কুশল?

—না, বাবাজী। রাজনৈতিক সংবাদ আদৌ শুভ নয়। গৌড়দেশ একটি উদগীরণ-উন্মুখ
আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে। কিন্তু সেসব প্রসঙ্গ থাক। তোমার বেশবাস দেখে মনে হচ্ছে
না যে, দেশের হালচাল নিয়ে তোমার কোনও কৌতূহল আছে। তুমি বরং প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি
সেরে নাও। মনে হচ্ছে বাসিমুখে জলও দাওনি। সকালে প্রাতঃরাশের পূর্বে আফিক-টফিক
করা হয়?

রূপেন্দ্র জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না। তার পূর্বেই ভবতারণ হাঁকাড় পাড়লেন,
ওরে, কে আছিস?

খামের আড়াল থেকে তৎক্ষণাৎ রঙ্গমাঞ্চে যুক্তকরে আবির্ভূত হল একজন খিদমদগার।
কর্তা তাকে বললেন, জামাই-বাবাজিকে অতিথিশালার গোছলখানায় নিয়ে যা। খাজাফিবাবুকে
বলে এক জোড়া ধূতি আর...

কথার মাঝখানেই ভৃত্যটি বলে উঠল, যে আছে!

রূপেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রশ্ন করেন, আপনি দফতরে যাবেন কখন?

—কেন বল তো? সে খোঁজে তোমার কী প্রয়োজন?

—মানে যে-কারণে আমি এসেছি, যে-কথা বলতে এসেছি...আপনি দফতরে বেরিয়ে
যাবার আগেই সেই আর্জিটা পেশ করতে চাই।

—বেশ তো। একেবারে বাসিমুখে সে-কথা নাই বা বললে। বিনা এক্সেলায় তুমি এ
বাড়ি ছেড়ে যেতেও পার, আবার বিনা সংবাদে ফিরে আসতেও পার — কিন্তু তাই বলে
আমরা তো ভুলতে পারি না — তুমি আমাদের জামাই। যাও ওর সঙ্গে।



স্নানান্তে রূপেন্দ্র তাঁর পুটুলির ভিতর থেকে একটি কাচা-ধূতি বার করে পরিধান
করলেন। মার্বেল-পাথরে-মোড়া গোছলখানার আলনায় থিলো-করা ‘পৌন-ধনু’-বহরের
শান্তিপূরে ধূতিখনি অস্পর্শিত পড়ে রইল। স্নানান্তে অতিথিশালার একুটি কামদার কক্ষে গুঁকে
নিয়ে গিয়ে বসালো সেই খিদমদগারটি। জমিদার-মশায়ের দেওয়া ধূতি পরিধান করবার জন্য
সে কোনও আর্জি নিজে থেকে রাখিল কবল না।

*একধনু = ষাট ইঞ্চি; ফলে পৌনধনু = 45" = 1.14 মিটার।

অতিথিশালায় পাশাপাশি তিন-চারখানি কক্ষ। বিভিন্ন মহাল থেকে জমিদারির কাজে যাবার আসেন, দু-চারদিন যাঁদের থাকতে হয়, তাঁদের ব্যবহারের জন্যই এই অতিথিশালা। রূপেন্দ্র ইতিপূর্বে এখানে কোনদিন আসেননি। তিনি বুঝলেন, কুসুমমঞ্জরীকে হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলে জামাই আদর পাওয়ার সৌভাগ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কর্তামশাই কয়টার সময় অশ্বারোহণে ফরাসীডাঙায় যাবেন; কিন্তু প্রশ্নটা করা হল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই পর্দাটা দুলে উঠল। বৃদ্ধা কানাইয়ের-মা একটি অল্পবয়সী পরিচারিকাকে নিয়ে ঢুকল ঘরে। অতিথিশালার কক্ষে মেজ ও কেদারা দুইই ছিল; কিন্তু কানাইয়ের-মা অন্য রকম ব্যবস্থা করল। মার্বেল মেঝের একাংশ মুছে নিয়ে পেতে দিল পশমের আসন। সন্দিগ্ধ এবার নামিয়ে রাখল পাথরের থালায় প্রাতরাশ; গৃহদেবতা 'শ্যামসুন্দরের' বাল্যভোগের প্রসাদ। তিন-চার রকম কাটা ফল, মুগ ভিজ়ে, লোচিকা, মিছিরির সরবৎ, পায়োস।

রূপেন্দ্রনাথ বিনাবাক্যব্যয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। পাখা হাতে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকল কানাইয়ের-মা।

আচমন করে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, কর্তামশাই কি এখনো বৈঠকখানাতেই আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার অপেক্ষায়। আসেন আপনি—

কানাইয়ের মা উচ্ছিষ্ট পাথরের থালাখানা উঠিয়ে নিয়ে অন্দরের দিকে বিদায় হল। সেই খিদমদগারটি পথ দেখিয়ে ওঁকে আবার নিয়ে এল বড়কর্তার দরবারকক্ষে। ইতিমধ্যে সেখানে সাত-আটজন উমেদার বা প্রার্থী এসে জুটেছে। তারা বসে আছে কাপেটের উপর উবু হয়ে। রূপেন্দ্রকে নিয়ে ভূতটি সে-কক্ষে প্রবেশ করতেই কর্তামশাই ওদের বললেন, আজ এই পর্যন্তই। তোরা যা। আমার জরুরি কাজ আছে ঐ কোবরেজমশায়ের সঙ্গে। তোরা কাল আসিস।

রূপেন্দ্র বসলেন ওঁর মুখোমুখি। ঘর নির্জন হল।

ভাবতারণ প্রশ্ন করলেন, স্নানাদি হয়েছে? প্রসাদ পেয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আপনি অনুমতি করলে আমার অর্জিটা পেশ করতে পারি।

—তাড়া কী, বাবাজীবন? দু-চারদিন বিশ্রাম করে যাও না আমার এই পরিবর্তনায়। অতিথিশালা তো খালিই পড়ে আছে...

বোধকরি আর সহ্য হল না রূপেন্দ্রর। তাঁর নাসারক্ত কিঞ্চিৎ স্ফূর্তিত হয়ে উঠল এই দার্জিক ভূম্যধিকারীর বাচালতায়। বললেন, গাদুলীমশাই! আপনি প্রথমে স্থির করুন, আপনার-আমার মধ্যে সম্পর্কটা কী? কোবরেজমশায়ের সঙ্গে জরুরি কথা বলার অজুহাতে আপনি সমবেত প্রার্থীদের বিদায় করলেন। এখন আমাকে সস্বার্থ করছেন 'বাবাজীবন' বলে। দুনিয়াদরীতে আপনি অভিজ্ঞ — প্রথমে মনস্তির কক্কনা 'বাবাজীবন' হলে আমার স্থান অতিথিশালায় হয় না। হয় অন্দরমহলে, মায়ের কাছে। সেখানে কানাইয়ের-মা নয়, তুলসী আমার প্রাতরাশ নিয়ে আসবে। আর কোবরেজমশাই বলে মেনে নিলে আমার কিছু সম্মানদক্ষিণাও প্রাপ্য। অথচ না ডাকতেই আমি এসেছি — নিশ্চয় চিকিৎসক হিসাবে নয়।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

ফলে, প্রথমই স্থির হয়ে যাক আপনার-আমার সম্পর্কটা কী?

—তুমি এককালে আমার কন্যাপ্রতিম কুসুমঞ্জরীর সান্নিধ্য ছিলে। যে স্ত্রীর সংস্কারের ব্যবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, শ্রদ্ধা পর্যন্ত ধৈর্য না ধরে তুমি পালিয়ে গেছিলে। এই তো আমাদের সম্পর্ক!

—এগুলো তো কতকগুলো বাস্তব তথ্যের উপর আপনার ব্যাখ্যা, আপনার টিকা-টিপ্পনি! আমার বিচারে যেমন: আপনি ছিলেন আমার পিসাশুশুর — যে ব্যক্তিটি কুসুমঞ্জরের কৈঙ্কর্যে প্রসূতিবিদ্যায় বিশেষভাবে শিক্ষিত গোকুলানন্দ আচার্যর শ্রেষ্ঠ ছাত্রটিকে সূতিকাগারে প্রবেশ করতে না দিয়ে আদরিণী কন্যাপ্রতিম প্রসূতিকে বসন্ত হত্যা করেছেন! যার ফলে আপনার জামাতা তীব্র ধূণায় একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিল। এটাও আমাদের সম্পর্ক!

ভবতারণ ফরাসের নলটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, তখন তুমি বলেছিলে — কী একটা বিশেষ কথা আমাকে বলতে এসেছে। সেটা কী?

—আমি আমার কন্যাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কন্যা! তোমার কন্যা! সে জীবিতা আছে এ-কথা কেমন করে জানলে?

—এ-প্রশ্ন অবান্তর। আপনি অস্বীকার করতে পারেন: কুসুমমঞ্জরী একটি জীবিতা কন্যাসন্তানকে প্রসব করেনি? সেই দু-আড়াই বছরের মেয়েটি আপনার ভদ্রাসনে নেই।

—না নেই!

এ কথা বলেই গাত্রোথান করলেন ভবতারণ, বললেন, তোমার অভিরুচি হয় দু-চার-দশ দিন আমার এই ভদ্রাসনে অতিথিশালায় বাস করতে পার। তাতে স্বীকৃত না হলে এখনই স্থানত্যাগ করতে পার।

বিদ্যুৎস্পর্শের মতো গাত্রোথান করলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, নেই? রূপমঞ্জরী বেঁচে নেই?

—রূপমঞ্জরী! সে কে?

—রূপেন্দ্রনাথ আর কুসুমমঞ্জরী কন্যা।

—ও। না, না, সে আছে। আমার বাড়িতে এখন নেই। এই যা।

—কেন? আপনার এতবড় বাড়িতে এ একফোঁটা মেয়েটার স্থানভাব ঘটল কেন?

—তার পূর্বে বল, সে এ বাড়িতে থাকলে তুমি কী করত?

—তাকে নিয়ে যেতাম। সেওগই গায়ে। আমার পিতৃপুরুষের ভিটেতে। তাকে মৈত্রেয়ী-গার্গী-মদালসার উত্তরসারিকা করে তুলব আমি। তার মূলমন্ত্র হবে শাক্যসিংহের সেই অন্তিম অনুশাসন: আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব, অনুরাশরণো ভব!

ভবতারণ বিম্বিত হয়ে লক্ষ্য করলেন রূপেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডলে কী একটা দীপ্তি ফুটে উঠেছে। বোধকরি উত্তেজনা। বললেন, বুঝলাম না, বাবাজী—

—আপনার পক্ষে এ-কথার মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন। তার প্রয়োজন নেই। আপনি বরং বলুন — সে কোথায়? রূপমঞ্জরী?

—তোমার আগমনমাত্র আমি তাকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছি।

—সে কী! কেন?

—যাতে পিতৃস্মৃতি বলে তার মস্তিষ্কে কোন ছাপ না পড়ে। তাকে আমি অন্যভাবে মানুষ করতে চাই।

—অন্যভাবে। কী ভাবে?

—আর পাঁচটা মেয়ে যেভাবে মানুষ হয়। তোমার খপ্পরে পড়লে তা হবে না। সে 'একবছা' হয়ে উঠবে!

বহুক্ষণ নিরব রইলেন রূপেন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, গাঙ্গুলীমশাই! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, বিচক্ষণ। আপনার তিন তিনটি কন্যা। আপনি তাদের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী মানুষ করুন —আমি তো বাধা দিতে আসছি না; কিন্তু আমার সন্তানকে...

মাকপথেই উনি বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, তুমি সন্তানপালনের কী জান? কী তোমার অভিজ্ঞতা যে, এ এক ফোঁটা মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছ?

—হ্যাঁ, পিসেমশাই, এ-কথা আপনি বলতে পারেন। শিশুপালনের কোন অভিজ্ঞতা আমার নাই। কিন্তু পৈত্রিক ভিটাতে আমার পিসিমাতা আছেন, আমার পিসিতুলো বোনও আছে। তারা...

একটা হাত সামনে বাড়িয়ে ভবতারণ রূপেন্দ্রনাথকে মাকপথে থামিয়ে দিলেন। বিচিত্র হেসে বললেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে তুমি কতটা সংসার-অভিজ্ঞ! শোন বাবাজী! তোমার পূজাপাদ পিসিমাতা ঠাকুরানী আজ একবছর হতে চলল স্বর্ণলাভ করেছেন। তুমি সে খবরটুকুও রাখ না। তার উপর তোমার ভগিনী আর ভগিনীপতিও বর্তমানে সোএগ্রাই গাঁয়ে থাকে না। বর্ধমানের পত্নিনিদার নগেন দত্ত গঙ্গারামকে বর্ধমানের মানকরে ত্রিশবিধে জমি লাখেরাজ বন্দোবস্ত দিয়েছে, একটি পাক মোকামও বানিয়ে দিয়েছে। তার মাতৃশ্রদ্ধের দান। তোমাকেই দেবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। তোমাকে না পেয়ে তোমার ভগিনীপতিকেই মাতৃশ্রদ্ধে নিয়ে এসে দিয়েছে। কুসুম মরে বেঁচেছে। তার শ্বশুরের ভিটেতে আজ সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ জ্বালে না, শাঁখে ফুঁ পাড়ে না। যাও, বাবাজীবন, গাঁয়ে ফিবে গিয়ে দেখ — জানলাদরজাগুলো স্বস্থানে আছে কি না। গত বর্ষায় কখন ঘর মুখ খুবড়ে পড়েছে তার হিসেব করগে।

রূপেন্দ্রনাথ কোন প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না।

এবার সোজা হয়ে বসলেন ভবতারণ। বললেন, শোন, রূপেন্দ্রনাথ! একটি শর্তে আমি স্বীকৃত হতে পারি। তোমার শিশুকন্যাকে তোমার হাতেই সমর্পণ করিতে পারি। তুমি শর্তটা রাখবে?

ওঁর চোখে চোখ রেখে রূপেন্দ্র বললেন, কী শর্ত?

—না, ধনকভাঙা কোন পণ নয়। জীবিয়োগে সার্বপ্রিয় সুহৃদমস্তিষ্কের মানুষে যা করে থাকে। স্ত্রী বর্তমানেও করে। তোমার ভগিনীপতি শ্রীমান গঙ্গারাম যা দেড় দশ বার করতে পেরেছিল...

—পুনর্বিবাহ?

—হ্যাঁ! পাত্রীর সন্মানে তোমাকে ভূ-ভারত দাবড়ে বেড়াতে হবে না। তার যোগান দেব আমিই! তোমার মেয়েকে যে মেয়েটি নিজের মেয়ের মতো এই আড়াই বছর ধরে মানুষ

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

করছে, সেই তুলসীর কথাই বলছি আমি। আমরাও নৈকশ্য কুলীন, তোমাদের পাল্টি ঘর। তুলসীকে তুমি ঘনিষ্ঠভাবে চেন, দেখেছ। কুসুমমঞ্জরীর মৃত্যুর পর আমি একটি দুঃখবতী ধাত্রীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলাম; কিন্তু তোমার কন্যা আজও তুলসীকে ‘মা’ বলেই জানে।

দীর্ঘক্ষণ রূপেন্দ্রনাথ নতনেত্র চিত্তমগ্ন রইলেন। তারপর বললেন, আমাকে মার্জনা করবেন, পিসেমশাই। বিবাহ করব না এই রকমই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কৈশোরকালে। সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি — নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। আমি কুসুমমঞ্জরীকে বিবাহ না করলে তার সঙ্গে এক বৃদ্ধের...

—জনি বাবাজী, আমি পূর্ব-ইতিহাস সবই জানি। শোন। একবার উপরোধে পড়ে যখন টেঁকি গিলতে পেরেছ, তখন দ্বিতীয়বারই বা পারবে না কেন? এবারও তো তুমি নিতান্ত নিরুপায়। লাঠিয়াল নিয়ে এসে তোমার মেয়েকে আমার দেউড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, এ-কথা তুমিও জান, আমিও জানি। তাহলে দ্বিতীয়বার টোপর-মাথায় এসে এই শস্তরবাড়ি থেকেই সজীক কন্যাটিকে সঙ্গ্রামে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হচ্ছে কেন বাবাজী?

রূপেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে শিরশ্চালন করে তাঁর অসম্মতিটাই পুনরায় জ্ঞাপন করলেন।

ভবতারণ রূঢ়স্বরে কী-একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই বৃদ্ধা কানাইয়ের মা অতর্কিতে আবির্ভূত হল অন্তঃপুর থেকে। বললে, বড়-মা বললেন অঁরে ভিতর বাড়িতে নে যেতে।

ভবতারণ গর্জে উঠতে গিয়ে সামলে নিলেন। বুঝলেন, বাকি কাজটা তুলসীর মায়েরই বটে। পাইক-বরকন্দাজ-লাঠিয়াল দিয়ে আর যেকোন কাজই উদ্ধার করা যাক না যাক, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। বললেন, ঠিক আছে। যাও।



কানাইয়ের মায়ের পিছন-পিছন অনেকটা পথ যেতে হবে। সদর আর অন্দর এই দুই মহলের মাঝখানে যে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ তাতে হা-ডু-ডু শ্রেণী যায়। রূপেন্দ্রের মনে পড়ে গেল প্রথমবার ঐ অন্দরমহলে পদার্পণের কথা। সেবার নতুন জামাইয়ের অবস্থা হয়েছিল সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মতো। না — উপমাটা ঠিক হল না। বরং বলা উচিত অভিমন্যুর বাপের মতো। প্রমীলাবাজ্যে পদার্পণের পরে। নতুন জামাই দেখতে একবাঁক প্রজাপতির মতো সুন্দরী ভিড় করে এসে জুটেছিল। ভবতারণের দুই বিবাহ, ফলে রূপেন্দ্রের দুই

পিসশাশুড়ী! কোনটি আসল, কোনটি নকল তখনো চিনে ওঠার অবকাশ পাননি। তার উপর তাঁদের দুই জা, তিন ননদ, পূত্রবধূ — সর্বোপরি রাগেন্দ্রের তিন শ্যালিকা। বড়দি বিবাহিতা, শ্বশুরবাড়িতে, মোজদি: পঞ্চদশী: তুলসী, আর কনিষ্ঠা একাদশী: শেফালি। সে এক প্রজাপতির হাট। কে যে প্রণম্য আর কার প্রণাম গ্রহণ করতে হবে বুঝে উঠতে পারেননি।

এবার কিন্তু তা হল না। কানাইয়ের-মা ওঁকে নিয়ে এল একটি কক্ষ — যা বাহির-মহলেরও নয়, আবার অন্দর-মহলেরও নয়। বলা যায় তা: ঘরেও নহে, পারেও নহে।

প্রাক-ইংরাজ যুগে বাঙলার জমিদার বাড়ির স্থপত্যে এই কক্ষটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন গবেষক আলোচনা করেছেন বলে জানি না। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই কক্ষটির নামকরণ: ‘অন্তরাল’।

পাঠক-পাঠিকা আমাদের মার্জনা করবেন। ঔপন্যাসিককে খামিয়ে এখানে স্থপতিবিদ কিছুটা বকবক করবে। আপনারা ক্ষমা-ঘেরা করে মেনে নেবেন।

মন্দিরের একটি অঙ্গের নাম: ‘অন্তরাল’। মণ্ডপ থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের পথে ছোট্ট একটি স্থান। হিন্দু মন্দিরে মণ্ডপ বা জগমোহন থেকে সরাসরি গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। ঐ অন্তরালের ক্ষুদ্র পরিসরে থমকে দাঁড়াতে হয়। মনটাকে সংযত করতে হয়, তৎগত করতে নয়। তন্নিষ্ঠ করতে হয়। সূর্যের আলো থেকে প্রদীপালোকে অভ্যস্ত হতে, দৃষ্টিকে সূচীমুখ করতে, মস্তিষ্ক কিছুটা সময় চায়। তারপর তদগত চিত্তে গর্ভগৃহের মূলাধারে প্রবেশ করতে হয়।

‘প্রাক-ফেরদ’ যুগের স্থপতি ঐ ভাবটিই গ্রহণ করেছিলেন রাজপ্রাসাদ নির্মিতিতে। যদিও এখানে ‘অন্তরালের’ প্রয়োজন ও ব্যবহার ভিন্ন প্রকারের। রানী-মায়াদের অথবা বধূমাতাদের বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব নিয়ে বা তত্ত্বতালার্শ নিতে কখনো কখনো এমন মানুষ আসেন — নায়ব, গোমস্তা, এমনকি দেওয়ানজী, অথবা দূর-সম্পর্কের খুড়ো, মামা, মামাতো-পিস্তুতো ভাই — যাঁদের সরাসরি অন্দরমহলে ঠাই দেওয়া যায় না। তাঁরা আশ্রয় নিতেন বাহির-মহলের সদর-সংলগ্ন অতিথিশালায়। তা তো হল, কিন্তু ‘চোরে-কামারে’ সাক্ষাৎ হয় কোথায়? বহিরাগত আগন্তুক যেমন অন্দর-মহলে আসতে পারেন না, ঠিক তেমনি রানী-মা অথবা বধূমাতাও যেতে পারেন না সদর-সংলগ্ন অতিথিশালায়।

স্থপতিবিদ এই সমস্যার চমৎকার একটি সমাধান করেছিলেন, দুই মহলের মাঝামাঝি ঐ একটি ‘অন্তরাল-কক্ষ’ নির্মাণ করে। কখনো কখনো সে-কক্ষের মাঝখানে এড়োএড়ি একটি চিকিটাস্থানের ব্যবস্থাও থাকে। শরদ্দিন্দুর ভাবায় য়ানীকি ‘স্বতাত্ত্বীসদৃশ-সচ্ছ’! প্রোথিতভর্তৃকা অথবা বিগতভর্তা রানীর যাতে দেওয়ান অথবা ডকিলবাবুর সঙ্গে বৈয়াক আলোচনা করতে পারেন। তাই ঐ চিকের ‘অন্তরাল’। হয়তো তা থেকেই কক্ষটির নামকরণ।

যাক ও-সব স্থপত্যের কচকচি। যে-কথা বলছিলেন। কানাইয়ের মা বিরাট প্রাঙ্গণ পার হয়ে রাগেন্দ্রকে অন্দরমহলে নিয়ে এল না। চোখের পলকে একটি পর্দা সরিয়ে ওঁকে ডাক দিল: আসেন!

এখন দিবাভাগের প্রথম-প্রহর, তবু কক্ষটি আলো-আঁধারী। জানলা নেই, একটিই

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

দরজা। অনেক উঁচুতে পায়রাখোপ ফোকর, যেমন আছে নাসারামে শেরশাহ সূরের সমাধিতে। সেই ফোকর দিয়ে স্থপতির কেবামতিতে আলো এসে কক্ষটিকে স্নিগ্ধ মায়াজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঘরে একটি মেজ, দুটি মাত্র কামদার কেদারা। পিছনের দেওয়ালে একটি ফরাসীদেশীয় দেওয়াল ঘড়ি।

রূপেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র কেদারা থেকে উঠে দাঁড়ালো তুলসী। তার পরিধানে এখন সিঁদূরবরন রেশমের শাড়ি। ব্রোকেডের কাজ করা জ্যাকেট। মাথায় এক-বিনুনী। দুই কানে টেডি-বুমকো। গলায় জড়োয়া শতনরী। দুই হাতে কাচের ও সোনার চুড়ি। কপালে কুমকুমের টিপ, নাকে নোলক।

রূপেন্দ্র সবিস্ময়ে তাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। তারপর কানাইয়ের মাকে বললেন, তুমি যে তখন বললে বড়-মা আমাকে ডেকেছেন?

কানাইয়ের মাকে জবাব দিতে হল না। তার আগেই আগ বাড়িয়ে তুলসী বললে, ও মিছে কথা বলেছিল বাঁড়ুজ্জমশাই। ওর দোষ নেই। আমিই ওকে মিছে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ফলে, আপনাদের শাস্ত্রে এজন্য যদি নরক দর্শনের বিধান থাকে তাহলে ও যাবে না, আমাকেই নরকে যেতে হবে। বসুন। অনেক কথা আছে।

তুলসী এবার এপাশ ফিরে কানাইয়ের-মাকে বললে, এবার তুমি নিজের কাজে যাও কানাইয়ের-মা। আমি দরজায় আগড় দেব।

কানাইয়ের-মা চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে যীশুখ্রিস্টের ভঙ্গিতে দুই হাত দুদিকে বাড়িয়ে চেপে ধরল দোরের দুই পাল্লা। অনুচ্চ অথচ দৃঢ়স্বরে শুধু বললে: না।

তুলসী সবিস্ময়ে বললে: 'না' কী না?

—ঐ দোরে আগড়-দ্যাওনের কথাডা! আমি হেথায় ডাঁইবে থাকব, কিংবা বসব গে ঐ দূরের রোয়াকে। তোমরা কতা-কও, আশ মিটিয়ে কতা কও — আমি শুনতে আসপনি; কিন্তুক বাস! ঐ পর্যন্তই। দোরে আগড় দেওয়া চলবেনি।

তুলসী লজ্জিত হয়, অপমানিতও বোধ করে। রুক্ষস্বরে বলে, তুমি কী বলছ কানাইয়ের মা? তুমি কি আমাকে বিশ্বাস...

কথাটা বৃদ্ধা শেষ করতে দিল না। মাঝপথেই বলে ওঠে। দেখ মেজদি, আমি না-বিইয়ে কানাইয়ের মা হইনি। তিন-কুড়ি বয়স হল আমার। তাই বলি, এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কতা নয়। এটাই হল নিয়ম। তোমার মা-মাসিরেও এই ঘরকে পলপুরুষের সাথে কতা কইতে দেখিছি। তাতে দোষ নাই; কিন্তুক বাস। ঐ পর্যন্তই। দোরে আগড় দেওয়া চলবেনি। বাড়ির নিয়মডা তো মানবে? না কী?

রূপেন্দ্র বললেন, ও তো ঠিক কথাই বসছে, তুলসী। তোমার যদি বিশেষ কোন গোপন কথা বলার থাকে তাহলে পরিবারের হিতৈষিণী ঐ বৃদ্ধার সামনেই তা বলতে হবে।

কানাইয়ের মা বললে, অ্যা — অ্যাঁই! বলেন কেনে জামাইবাবু। আমি কি বে-হক কতা কইছি কিছু?

জবাবের জন্য সে অপেক্ষা করল না। গটগট করে চলে গেল কিছুটা দূরে। শ্রুতিসীমার ওপারে, কিন্তু দৃষ্টিসীমার ভিতরেই, থাপন-জুড়ে বসে কানে একটা পাখির পালক গুঁজে সুড়সুড়ি দিতে থাকে। নজর কিন্তু এদিক পানে।

রূপেন্দ্র তাগাদা দিলেন, এবার বল তুলসী, কেন ডেকেছ। সময় কম।

তুলসী সামলে নিল নিজেকে। বললে, সেটাই তো সমস্যা, জামাইবাবু। সময় বড় কম, জীবন বড় ছোট। তার মধ্যে ‘অন্তরালে’ আলাপচারী করার মতো দুর্লভ মুহূর্ত শুক্তির ভিতর মুক্তির মতো দূপ্রাপ্য। বেশিক্ষণ তোমাকে আটকাবো না। আর সে অধিকারই কি ছাই আছে নাকি আমার? আমি...

রূপেন্দ্র কথার মাঝখানেই বলে ওঠেন, একটা কথা। তুমি কিন্তু আমাকে বরাবর ‘আপনি’ বলে কথা বলে এসেছ, তুলসী।

—আজ্ঞে না হুজুর। আপনার ভুল হল। সেটা দু বছর অতীতের কথা। তখন আমি ছিলাম পঞ্চদশী, এখন সপ্তদশী। তখন আমি ছিলাম শুধুই শ্যালিকা, এখন...

—এখন?

—স্বকণ্ঠেই তো শুনে এলাম বাবামশাইয়ের প্রস্তাব আর তোমার প্রত্যাখ্যান। আর তাছাড়া ইতিপূর্বে ‘অন্তরাল’-এ এমন নির্জন প্রেমলাপ তোমার-আমার তো কথখনো হয়নি, সোনাদা।

—সোনাদা। মানে?

—গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির পদস্পর্শ করার অধিকার আমি কোনদিনই পাব না জানি — তুমি সে অধিকার আমাকে দেবে না — কিন্তু এই ‘অন্তরাল’ পর্যন্ত যে আসতে পেরেছি এটাই বা সারাজীবন ভুলব কেমন করে? তাই আমার এই কিছুক্ষণের প্রণালভট্টকু স্নিকার করে নিও — এ সঙ্গোপন মীনুদির অনুকরণে। কয়েকটা খণ্ডমুহূর্তের জন্য আমার রূপোদা হয়ে গেছে: সোনাদা।

—মীনুর কথা তোমার দিদি তোমাকে বলেছে দেখছি—

—শুধু মীনুর কথা? সে তো সব সময় তোমার কথাই বলত। তোমার প্রেমে পাগলিনী রাই সর্বক্ষণ শুধু বলত তোমার সব কথা, স—ব কথা। লিদি আমাকে রাধাদির গল্পো শুনিয়েছে।

—রাধাদি। কোন রাধাদি?

—বাঃ! এরই মধ্যে ভুলে গেলে? রাধাবোষ্টমী! ফরসীডাঙা যাবার পথে যে তোমার চোটে চুমু খেয়েছিল। তুমি বাধা দিয়ে নিজের মুখ সরিয়ে নিতে পারনি মনে নেই?

—আমাকে এইসব কথা বলবার জন্যই কি তুমি আমাকে এখানে ডেকে এনেছ?

—না তো কী? তুমি কি ভেবেছিলে রাধাবোষ্টমীর মতো সংযম হারিয়ে তোমার মুখে চুমু খাবার জন্য?...না, না, মুখখানা অমন প্যাঁচার মতো কর না, সোনাদা। আমি রাধাবোষ্টমীর মতো বোকাও নই, হাংলাও নই। আমি অতীতে তোমার শ্যালিকা ছিলাম, ভবিষ্যতেও তাই থাকব। সুতরাং ঠাট্টা-তামাশা করবার অধিকারটা তুমি কেড়ে নিতে পারবে না। আরও একটা অধিকার তুমি কেড়ে নিতে পারবে না আজ। সেটা কী জান? তোমার চুল্লিমুনি মেয়ের মুখে

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

আমাব 'মা'-ডাক! তোমার জী আমি কোনদিন হব না, কিন্তু তোমার মেয়ের মা আমি ইতিপূর্বেই হয়ে গেছি।

রূপেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন, শোন তুলসী! তোমাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, কেন আমি সংসারী হতে পারছি না।

তুলসী তার কাঁকন-পরা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে চেপে ধরল রূপেন্দ্রের মুখ। বলল, থাক সোনাদা! ঐ এক-কথা তুমি জীবন কতবার আর বলবে? আমি ওদের মতো বোকা নই। নিজের মনকে আমি ঠিক মতো বুঝ দিতে পারব।

—কাদের কথা বলছ তুমি? কাদের মতো বোকা নও?

—তোমাকে নিয়ে আর পারি না, সোনাদা! সমোঙ্কৃত-শাস্ত্রের অত কচকচি তোমার মাথায় ঢোকে আব এই সহজ সবল কথাটা বুঝতে পারছ না? শোন! তুমি কি জান যে, তুমি দেখতে খুব সুন্দর? দারুণ, দা-রুণ সুন্দর? মেয়ে-মন আপনাই মোহিত হয়ে যায় তোমার সেই পৌরুষময় ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তিতে। মীনুদি, দিদি, বাধাবোষ্টমী... আর হ্যাঁ, অঙ্গীকার করে লাভ কী... এই পোড়াবমুখি... জানি না, আরও কেউ-কেউ এসেছিল কি না তোমার গোপন জীবনে। লক্ষ্মীটি, তুমি আমাদের উপর রাগ কর না, সোনাদা! তোমার আগুন-বরন গায়ের রঙ, অথবা দাহিকাশক্তির জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, ঠিক তেমনি আমরাও আমাদের এই পতঙ্গবৃত্তির জন্য দায়ী নই। আমরা জানি, কাপ দিলে নিশ্চিত মৃত্যু — তবু লোভ সামলাতে পারি না। গুড়ে মরি।

রূপেন্দ্রনাথ অভিভূত হলেন। পঞ্চদশী তুলসী ছিল প্রগলভ্য, এখনো সে তাই; কিন্তু ওর কথার পিছনে কিছু জোরালো যুক্তিও আছে।

তুলসীই আবার বলে, মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর না যেন, বাবামশাই অত্যন্ত জেদী, সময়-সময় অত্যন্ত নিষ্ঠুরও। পরাজয় স্বীকার করা ওঁর ধাতে নেই। কাজীর বিচারে যদি বাপের অধিকার স্বীকৃত হয় তাহলে হয়তো মেয়েকে পাবে, জীবিতা নয়। তার চেয়ে, অনিবার্য নিয়তিকে মেনে নাও। সে আমাকেই মা বলে জানে। তাই তাকে জানতে দাও। আর নাও — এটা ধর।

আঁচলের তলা থেকে একটা ভেলভেটের পুলিন্দা বার করবে ধরে।

—কী আছে এতে?

—দিদির গায়ের গহনা। তোমাদের গায়ের জমিদার-মশায়ের উপহার। দিদি আমাকে গিয়ে গেছিল।

—ও! কিন্তু সেগুলো তো আমি নিতে পারব না, তুলসী। এগুলো তোমার দিদি তোমাকে দিয়েছিল। এ তোমার।

—না! তা হয় না বাঁড়ুঞ্জ-মশাই। আপনি নিজে হাতে এই আশীর্বাদ-অলঙ্কার আমার গায়ে পরিয়ে দিতে অস্বীকার করেছেন। শালী হিসাবে এই করুণার দান আমি নেব কেন?

রূপেন্দ্রনাথ ওর দুটি হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। বললেন আমি মনে-মনে সন্ধ্যাস নিবেছি, তুলসী। তুমি এগুলো প্রত্যাখ্যান করলে কুসুমমঞ্জরী সর্গে বসে চোখেব জলে ভাসবে।

আমি তোমাকে মিনতি করছি ‘রূপার-মা’!

—কী? কী বললে?

—হ্যাঁ, তাই! তুমি যখন নির্দিধায় দিদির হাত থেকে একফোঁটা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছিলে তখন তো তুমি রূপমঞ্জরীর বাবার কথা ভাবনি, তুলসী। আমার অজ্ঞাতেই তুমি আমাকে কৃতার্থ করেছ। রূপমঞ্জরীর জননীত্ব তুমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছ। রূপার বিয়েতে এই অলঙ্কার পরিয়ে তুমি তাকে সাজিয়ে দেবে, রূপার মা!

তুলসী বাঁ-হাতে চোখটা মুছতে গেল। গণ্ডে লাগল কজ্জলচিহ্ন। নিচু হয়ে প্রণাম করল রূপেন্দ্রনাথকে। উনি তাকে দুই বাহুমূল ধরে তুললেন। মুদিতনেত্র কপালে একটি চূষনচিহ্ন একে দিয়ে অক্ষুটে কী যেন আশীর্বাদ করলেন।



“অঙ্গাদী ভাবমজ্জাতা কথং সামথ্যানর্গয়ঃ?”

পশ্য টিউভিমাত্রাণ সমুদ্রঃ বাকুলীকৃত।।”

ছোট টিউভ-টিউভী-পক্ষী। খঞ্জনার মতো জোড়া-পায়ে সমুদ্রের পারে ভিজা বালিতে দুজনে লফিয়ে লফিয়ে বেড়ায়। তারপর সমুদ্রতীরের খাড়া পাহাড়ের ফোকরে টিউভী ডিম পাড়ল। বাপ-আর মা পালা করে পাহারা দেয়। ডিমে তা দেয়। এদিকে চাঁদ যতই প্রতিপদ থেকে অমাবস্যার দিকে এগিয়ে চলে সমুদ্র ততই ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে জোয়ারের টানে। টিউভ-টিউভনী কিচির-কিচির করে গাল পাড়ে। সমুদ্রকে সাবধান করতে চায়। না হলে সমুদ্রের ঢেউয়ে ওদের চুন্নু মুন্না ডিমটা ভেসে যাবে যে!...কোথায় দিগন্তস্থিত স্বাদঃপতি নীলাশুধি আর কোথায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টিউভ-দম্পতি!

শেষমেশ টিউভ দম্পতি এসে দরবার করল পক্ষিকুলতিলক গরুড়-এর কাছে। গরুড় মহা-শক্তিদর; কিন্তু সমুদ্রের কাছে তাঁর ক্ষমতাই বা কতটুকু? ফুলে গরুড় দরবার করেন তাঁর প্রভু স্বয়ং নারায়ণের কাছে : দীনদয়াল! তুমি না বাঁচানো তো রক্ষা করা যাবে না ঐ টিউভ-দম্পতির সম্ভারকে!...শ্রীহরির যোগনিদ্রা ভগ্ন হল। সমুদ্রকে ডেকে আইসা কড়কে দিলেন যে, সমুদ্র ভাঁটার টানে পিছিয়ে গেল কয়েক যোজন!

তোমরা জান কি জান না জানি না, মহাপণ্ডিত এ. এল. ব্যাশমের মতে হিতোপদেশ রচিত হয়েছিল এই অতিভঙ্গ, তবু রঙ্গভরা বঙ্গভূমেই। লেখক জনৈক নারায়ণ-পণ্ডিত! বাঙালি! মোটকথা আমাদের নায়ক পণ্ডিত রূপেন্দ্রনাথের পড়া ছিল পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এই হিতোপদেশ কাহিনী।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

এখানে একাধিক উপমান, একাধিক উপমেয়।

ক্ষমতাগর্বে ধরাকে সরা জান করছেন যিনি সেই ভবতারণ জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিতে চান টিউভ-দম্পতির ভালবাসার শেষ অবশেষ, ঐ একফোঁটা মেয়েটাকে। যদি তার বাবা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বিপদটা বুঝতে না পারে, তুলসীর মতো সুন্দরী মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করে। কেন? ওঁর চেয়ে রূপেন্দ্রকে কৌলিন্যমর্যাদা আর করও দেবার হিম্মত আছে? রূপেন্দ্র কি বাজার যাচাই না করে কথা দেবে না? তিনিও দেখে নেবেন — কী করে ঐ এক ফোঁটা মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে যায় ঐ হাড়-হাবাতে একবঙা কোবরেজ।

কিন্তু রূপেন্দ্র জানতেন, ফরাসী-গভর্নর ডুপ্লেস্সের দক্ষিণহস্ত ইন্দনারায়ণের সঙ্গে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সখ্যতার সম্পর্ক। প্রাকবিবাহ জীবনে ঝষধবজ নামে এক ধনবান ব্যবসাদারের চিকিৎসা করতে রূপেন্দ্র একবার সোএরই থেকে কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন। সেই সময়েই সখ্যতা হয়েছিল ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সঙ্গে। তিনি তখন ‘অন্নদামঙ্গল’ শেষ করে ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনা করছেন। ঐ সূত্রে মহারাজের অন্দরমহলেও একদিন তাঁকে যেতে হয়। মহারানীকে পরীক্ষা করে ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা দিতে এবং মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ রাখতে। সেসব কথা অন্যত্র বিস্তারিত বলেছি। রূপেন্দ্র স্থির করলেন মহারাজের মাধ্যমে ইন্দনারায়ণকে ধরবেন। ভবতারণ তাঁর নিয়োগকর্তার আদেশ অমান্য করতে পারবেন না নিশ্চয়।

ফরাসীডাঙার ঘাট থেকে আবার গঙ্গা বেয়ে উজানে চললেন নবদ্বীপ। সেখান থেকে জলাঙ্গী বেয়ে কৃষ্ণনগর তো একবেলার জলপথ। রাজবাড়ি থেকে খেয়াঘাট পর্যন্ত টানা উত্তর-দক্ষিণ খোয়া-বাঁধানো সড়কটার নাম সেকালে ছিল ‘রাজপথ’। পরে যার চলিত নাম হয় ‘হাই স্ট্রিট’, স্বাধীনতার পর এখন যা ‘আর. এন. টেগোর রোড’। তার দুপাশে অতি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিশুগাছ, মাঝে দুটি তালগাছ, তিনটি বড় ইঁদার। তখনো গো-আড়ি গ্রামে জনবসতি বিশেষ ছিল না। ঐ খেয়াঘাটে ছিল কিছু মালো, মৎস্যজীবীদের আবাস। জলাঙ্গীর স্রোতধারা ধরে ক্রোশ দুই উজানে গেলে মৃণালিনীর গ্রাম। হাস্যার্ণব গোপাল ভাঁড়ের বাস সেখানে।

রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পুঁটুলি বগলে ঐ রাজপথ ধরে দক্ষিণমুখে-রাজপ্রাসাদের দিকে চলেছেন। পথে লোকজন আছে। অধিকাংশই পদব্রজে চলেছে, কিছু গো-গাড়ি, কচিৎ কখনো কোন রাজপুরুষ অশ্বরোহণে ধূলার ঘূর্ণি তুলে ছুটছেন। হঠাৎ একটা দু-ঘোড়ার সৌখীন গাড়ি এসে থেমে গেল ওঁর পাশে — ‘রোথকে! রোথকে!’ শব্দে।

গাড়োয়ান এবং আরোহী উভয়েই নির্ভেজাল রাঙালি; কিন্তু আদেশ ও গালাগালের সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্য-বাঙালি উত্তরভারতের ভাষা ব্যবহার করতেন। ক্ষমতায় কুলালে উর্দু, না-কুলালে হিন্দি।

গাড়ি থেমে গেল। পিছনের একমাত্র আরোহী সৌখীন লোক। উর্ধ্বাঙ্গে বেশমের পিরান, বেশমের উত্তরীয়। মাথায় উষ্ণীয়, পরিধানে মলমলের কোঁচানো ধুতি। তাঁর বাঁ হাতে একটা শিকরে-বাজপাখি।

গাড়ি থেকে মুখ বার করে যুবকটি বললে, কোবরেজ-মশাই না?

রূপেন্দ্র চোখ তুলে দেখলেন। চিনতে পারলেন। উলার বর্ধিষ্ণু ডুম্মাধিকারী রসিকলাল। তিনি বলেন, উঠে আসুন গাড়িতে। কবে এসেছেন? গঙ্গারাম কোথায়?

রসিকলাল ধনীবাক্তি। আনুষঙ্গিক সবকয়টি চরিত্রদোষও আছে। রূপেন্দ্র ওঁর সঙ্গে পছন্দ করেন না বিশেষ। রাস্তায় দাঁড়িয়েই বলেন, আজ এইমাত্র এসেছি। গঙ্গারাম ভালই আছে।

—তা গো-আড়ি গাঁয়ে থাকবেন কোথায়? আপনার বয়সকে তো মহারাজ দেশছাড়া করেছেন, শুনেছেন নিশ্চয়।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যে আর কৃষ্ণচন্দ্র (তখনো তিনি মহারাজ নন, রাজা — কিন্তু মুখেমুখে সবাই মহারাজই বলে) রায়ের সভাকবি নন এ তথ্যটা জানা ছিল না। উনি স্থির করেছিলেন ভারতচন্দ্রের ভদ্রাসনেই অতিথ্য গ্রহণ করবেন; এখন বুঝলেন সেটা সম্ভবপর নয়। তাই বললেন, মহারাজের অতিথিশালায় উঠব স্থির করেছি।

—ইচ্ছে করলে আমার গরিবখানাতেও থাকতে পারেন। তবে সেটা রাজবাড়ি থেকে বেশ দূরে, উলায়।

—না। আমার প্রয়োজনটা গো-আড়িতেই।

—তা বেশ তো। উঠে আসুন। রাজবাড়িতেই নামিয়ে দেব। উলা যেতে সেটা তো আমার পথেই পড়বে।

অগত্যা উঠতে হল গাড়িতে। গাড়ি ছাড়ল। রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, আমার বন্ধু তো দেশছাড়া, আপনার বয়স কেমন আছেন? ঝয়ধবজ দন্ত?

—ঝাঝা? হতভাণ্ডা ফৌত হয়েছে। কুষ্ঠ হয়েছিল। হবেই। পাপে আকুণ্ঠ মগ্ন হয়ে থাকত ইন্দনীং।

রূপেন্দ্র বুঝতে পারলেন। কুষ্ঠ নয়। রতিজ রোগ উপদংশ। পরবর্তী শতাব্দীতে যার নাম হবে 'সিফিলিস!' কিন্তু সে-কথা বললেন না।

রাজবাড়িতে এসেও দুঃসংবাদ পেলেন। রাজামশাই মুর্শিদাবাদে গেছেন নবাবী তুলিব পেয়ে। কবে ফিরবেন তা দেওয়ানজী হয়তো জানেন, তাঁর দপ্তর জানে না। তবে অতিথিশালায় আশ্রয় পেতে কোনও অসুবিধা হল না। নারোব ওঁকে চিনতে পেরেছে। কুশলপ্রশ্ন করে ওঁর যাবতীয় বন্দোবস্তের আয়োজন করল। একটু পরে স্বয়ং শিবচন্দ্র এল রূপেন্দ্রের তত্ত্বতালাশ নিতে। শিবচন্দ্র রায় কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র — যুবরাজ। রূপেন্দ্রকে প্রণাম করে বললে, বাবামশাই মুর্শিদাবাদ থেকে কবে ফিরে আসবেন তার খবর নেই। আপনার অভিরূচি হলে এখানে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারেন। আর আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজনটা যদি আমাকে জানানো সম্ভবপর হয় তাহলে আমিও চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রূপেন্দ্র কী জবাব দেবেন স্থির করে উঠতে পারেন না।

শিবচন্দ্র নিজে থেকেই বলে, বুঝেছি। আপনাকে আর একটা কথা বলার আছে। আপনি এসেছেন সংবাদ পেয়ে বড়না একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে চান। কখন আপনি অন্দরমহলে পদধূলি দিতে আসবেন বলুন। আমি সেইমতো ব্যবস্থা করে দেব। সব চেয়ে ভাল হয় যদি স্নানান্তে বড়মার মহলে মধ্যাহ্ন-আহার সেবা করেন।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

রূপেন্দ্র জানতে চাইলেন, কেমন আছেন. তোমার বড়মা?

—ভালই আছেন। আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের দুই-বিবাহ। শিবচন্দ্রের জননীকে আগের বার চিকিৎসক হিসাবে পরীক্ষা করতে হয়েছিল। রূপেন্দ্র সম্মত হলেন।

কৃষ্ণনগর রাজবাটিতেও একটি ‘অস্ত্রাল’ আছে। ইতিপূর্বে রূপেন্দ্র সেখানে বসেই মহারাজের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-আহার করেছিলেন। তারপর রাজসমভিষাহারে বড়মার মহলে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। এবার শিবচন্দ্র তাঁকে সরাসরি বড়মার অন্দর-মহলে নিয়ে এসে একটি ‘প্রতীক্ষা-কক্ষে’ বসালো।

একটু পরেই বড়-রানীমা এলেন। রূপেন্দ্রের প্রায় সমবয়সী। উনি রানীমার প্রণাম গ্রহণ করেন না। তাই রানীমা বুঁকে নমস্কার করলেন। রূপেন্দ্রও আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও নত হয়ে প্রতিনমস্কার করলেন।

রানী-মা জানালেন, এ তিনবছর তিনি অনেকটা ভাল আছেন। শিরঃপীড়া এবং বুকের ব্যথাটা আর হয়নি। জানতে চাইলেন, আপনার ঔষধ-বটিকা প্রায় বছরখানেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আগ্নি বর্ধমানে সো-এই গাঁয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি তীর্থ করতে গেছেন। এখন যখন ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল তখন বলুন — ঐ ঔষধবটিকা কি আরও খেতে হবে?

রূপেন্দ্র বললেন, না, রানীমা। মাথা বা বুকের বেদনা যখন সম্পূর্ণ সেরে গেছে তখন ঐ ঔষধটা আর খেতে হবে না। কিন্তু ঐ সঙ্গে আপনাকে আরও নির্দেশ দিয়েছিলাম রোজ প্রত্যবে কুলখকলাই ভিজানো এক ঘটি জল পান করতে। সেটা কি করছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আপনার নির্দেশে শিশির-ভেজা ঘাসে সূর্যোদয়ের পূর্বে খালি পায়ে বেড়াই। সে নির্দেশটাও মানি — মানে, বর্ষাকাল বাদে।

—খুব ভাল কথা। ও দুটি নির্দেশ মেনে চলবেন। তাতে উপকারই হবে। একটা কথা শুনলাম রানীমা, গো-আড়ি গাঁয়ে এসে — ভারতচন্দ্র নাকি আর মহারাজের সভাকবি নন?

রানীমা হেসে বললেন, কথাটা বুঝি ঐভাবে প্রচার পেয়েছে? তা নয়। আজ্ঞা ব্যাপারটা শুনুন :

বিদ্যাসুন্দর রচনা শেষ করে কবি কিছু ক্লান্তি অনুভব করেন। পাঠকদের ভিতর কাব্যের মিশ্র প্রতিক্রিয়াতেও বোধ করি ওঁর মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। উনি শহর থেকে দূরে কিছুদিন থাকবেন বলে স্থির করেন। রাজা সানন্দে স্বীকৃত হন। কবিকে বিদ্যাসুন্দর রচনার পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ তাঁকে মূল্যজোড় গ্রামখানি বার্ষিক-ঈশত টাকা রাজস্বের বিনিময়ে ইজারা দেন এবং ঐ গ্রামের যে কোন প্রত্যন্তদেশে একটি গৃহ নির্মাণের জন্য একশত টাকা দান করেন। কবি নাগরিক জীবন ত্যাগ করে গ্রামবাসী হলেন। আযোবন প্রোষিতভর্তা প্রিয়াকে নিয়ে এসে মূল্যজোড়ে বসবাস করতে থাকেন। রানীমা আরও জানালেন ইতিমধ্যে বর্গীর উৎপাতে ভীত হয়ে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র মূল্যজোড়ের পার্শ্ববর্তী কাউগাছি গ্রামে এসে কয়েক মাস ছিলেন। গ্রামখানি বর্ধমানরাজমাতার পছন্দ হয়ে যায়। তিনি ঐ গ্রামটি নিজের

নামে পতনি নিলেন। আর একজন কর্মচারীকে পতনিন্দার নিযুক্ত করলেন। বর্ধমানরাজের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সদ্ভাব কোন কালেই ছিল না। কৈশোরে ভারতচন্দ্র বর্ধমানরাজের কারাগারে আবদ্ধও হয়েছিলেন। বিদ্যাসুন্দর রচনায় বর্ধমানরাজ বোধ করি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। মোটকথা, কাউগাছি গ্রামের পতনিন্দার রামদেব নাগ পার্শ্ববর্তী গ্রাম মূলাজোড়ের ইজারাদার অর্থাৎ কবি ভারতচন্দ্রকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করেন। নাগরিক জীবন ত্যাগ করে গ্রামে বাস করা কবির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতচন্দ্র নিরুপায় হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে সংস্কৃতে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে দেন। কবিতাটির নাম : ‘নাগষ্টক’। কবিতাটির প্রত্যেকটি শব্দের শেষ পংক্তি ছিল—“সমস্তং মে নাগো গ্রসতি-সবিরাগো হরি হরি।”^১

মহারাজ বললেন। তিনি কবিকে পরামর্শ দেন নাগ-মহাশয়ের নাগালের বাহিরে গুপ্তে গ্রামে গিয়ে বাস করতে। গৃহনির্মাণের ব্যয়ভার দিতেও তিনি স্বীকৃত হয়েছিলেন।

রানীমা জানালেন, কবি এখন নতুন গ্রামে নতুন ভদ্রাসনে যাওয়ার আয়োজন করছেন।^২

এবার রানী-মা বললেন, আপনি রাজমশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। শিবচন্দ্রকে সে কথা জানাতে আপনি ইতস্তত করেছেন — শিবচন্দ্রই বলল। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে আমাকে তা জানাতে পারেন। আমার ক্ষমতায় কুলালে এখনি তার প্রতিবিধান করব। অন্যথায় মহারাজ প্রত্যাবর্তন করলে তাকে জানাব। আপনি অবশ্য তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে পারেন। কিন্তু ততদিন হয়তো আপনার সহধর্মিণী—

রূপেন্দ্র ঠুঁকে খামিয়ে দিলেন। স্থির করলেন রানীমাকেই সব কথা খুলে বলবেন। কুসুমমঞ্জরীর মৃত্যু, কন্যাসন্তান প্রসব, ভবভারণের বিরূপতা।

রানীমা সব শুনে একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেই ফেললেন, গান্ধুলী-মশায়ের দ্বিতীয়া কন্যা তুলসী দেখতে কেমন?

রূপেন্দ্র লজ্জিত হলেন। মাথা নেড়ে বললেন, না, রানীমা। সেসব কারণে নয়। তুলসী খুবই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। যেকোন সংসারে সে বাঞ্ছনীয়, উপযুক্ত। কিন্তু আমি আর দ্বিতীয়বার সংসারী হব না বলে স্থির করেছি।

—এটা একটা কথা হল? আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ...

১. অনন্তনাগের উপর সুষুপ্ত শ্রীহরিকে স্মরণ করে কবি জানাচ্ছেন যে বিরাগবশত নাগেই কবির সব কিছু গ্রাস করছে।

২. কাহিনীর বহির্ভূত হলেও এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে, মূলাজোড়ের গ্রামবাসী এ ব্যবস্থাপনায় বাধা দেয়। তারা কবিকে ভালবেসে ফেলেছিল। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় রামদেব নাগ বেশি বাড়িবাড়ি করলে গ্রামবাসী সম্মিলিতভাবে প্রতিবিধান করবে। আনন্দের কথা : কবি সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হন এবং মূলাজোড়েই বাকি জীবন সানন্দে কাটিয়ে যান।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

বাধা দিয়ে রূপেন্দ্র বললেন, সমাজের গড়লিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়াটাকেই আমি জীবনের পরমার্থ বলে মনে করি না। আমার ইচ্ছা রূপমঞ্জরীকে পণ্ডিতা করে তুলব। এটাই হবে আমার জীবনের ব্রত। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে হয়ে উঠবে নতুন যুগের মৈত্রেয়ী, গার্মী, মদালসা। একা সে নয় — গৌড়মণ্ডলের বালিকাদের বিদ্যাদানের সুযোগ এনে দেবার জন্য আমি প্রাণপাত চেষ্টা করব। আমার মতে সমাজের অধঃপতনের দুটি মূল হেতু। একটি জাতিভেদপ্রথা — সমাজের একটা বলিষ্ঠ এবং বৃহৎ অংশকে জল-অচল করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়টি, সমাজের অর্ধাংশকে — নারীদের — অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। খ্রীষ্টেতনাদের প্রথম সমস্যাটা নিয়ে লড়াই করেছিলেন, আচণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন — কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটা নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউই কোনও চেষ্টা করেননি। এ বিষয়ে আমি মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। গ্রামে গ্রামে তিনি চতুষ্পাঠী খুলে চলেছেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে এই নদীয়াতেও কিছু কাজ আজ পর্যন্ত করা হয়নি।

রানীমা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, সেটা হবে না পণ্ডিতমশাই। গৃহাভ্যন্তরে ব্রাহ্মণকন্যার অক্ষর পরিচয়দানে মহারাজের আপত্তি নেই — এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বালিকাবয়সেও কোনও স্ত্রীলোক গৃহ্যবোধের বাহিরে পাঠশালায় গিয়ে পড়াশুনা করুক — এটাতে তাঁর দৃঢ় আপত্তি। ওঁর স্থির বিশ্বাস : কলিযুগে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হলে সমাজের বনিয়াদ ধসে পড়বে। ফিরিস্তি মেমসাহেবদের মতো তারা ব্রট্টচরিত্রের বিবি বনে যাবে। তাঁর মতে কন্যাদের অষ্টমবর্ষেই গৌরীদান করা বিধেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রনাথের।

রানীমা বললেন, আপনাকে আরও একটা গোপন কথা বলি। অপ্রিয় সত্য; কিন্তু আপনাকে জ্ঞাত করানোই মঙ্গল। প্রথম কথা : ফরাসীডাঙার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে মহারাজের সম্পর্কটা ইদানীং ভাল নয়। দ্বিতীয় কথা : নৈতিক কারণেও সম্ভবত মহারাজ বোধহয় আপনার পরিবর্তে আপনার পিসাঙ্গুর গাঙ্গুলীমশাইকেই সমর্থন করবেন। হিন্দুধর্মে আবহমান কাল ধরে যেসব লৌকিক প্রথা প্রচলিত সেগুলি উনি পরিবর্তন করতে চান না। তাঁর মতে, কুলীন ব্রাহ্মণ হিসাবে আপনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে অস্বীকার করে সামাজিক বিধানকে অগ্রাহ্য করছেন।

রূপেন্দ্র বললেন, মহারাজের কথা বরং থাক, রানীমা। আপনি আমাকে নিজের কথা বলুন। আপনি কি অন্তর থেকে এইসব লোকাচারকে সমর্থন করেন?

—কোন সব লোকাচার?

—ধরুন সতীদাহ?

—‘সতীদাহ’ লোকাচার হতে যাবে কেন? এতো হিন্দুধর্মের একটা অঙ্গ।

—আদৌ নয়। কোনও প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থে এর সমর্থন নেই। অথবা ধরুন, বঙ্গ্যানারী যে মানত করে থাকে সন্তানবতী হলে সে তার সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবে? এই কুপ্রথা আপনি সমর্থন করেন? মুসলমানেরা চারটির অধিক বিবাহ করতে পারে না, আর কুলীন ব্রাহ্মণেরা পঞ্চাশ-ষাট-একশটি মেয়েকে বিবাহ করছে। এগুলো কুপ্রথা নয়? মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণ, তিনি সমাজের মধ্যমণি — তাঁর পক্ষে এইসব কুপ্রথা রোধ করার চেষ্টা করা উচিত বলে মনে করেন না আপনি?

রানীমা বললেন, আমার মনে করায় না করায় কিছুই যায়-আসে না পণ্ডিতমশাই। আমি বরং অন্য একটি প্রসঙ্গ আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

—বলুন?

—চিন্তা করে দেখুন, আপনার কন্যা রূপমঞ্জরীর বয়স মাত্র দুই আড়াই বৎসর। পাঠ্যভ্যাসের বয়স তার হয়নি। মায়ের অভাব সে অনুভব করে না; পিতার অভাব সম্পক্ষে এখনো সে অনবহিত। আপনার পিসাখণ্ডরের রাজবাড়িতে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে তার শৈশব কাটাচ্ছে। অপরপক্ষে আপনি নিজেই জানেন না, সে এগুই গাঁয়ে আপনার ভিটার কী অবস্থা। আপনার পিসিমা স্বর্গে গেছেন। জনমানব সেখানে বাস করে না। বাস্তবীকটাকানি খাড়া আছে কি না তাও আপনি জানেন না। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করে আপনি কোন বিচারে মেয়েটিকে সে এগুই নিয়ে যেতে চাইছেন?

রূপেন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না।



ঠিকই বলেছিলেন রানীমা। রূপেন্দ্রনাথ যে নারীমুক্তি, নারীজাগরণ এবং সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ করতে চাইছেন, তাতে কোনক্রমে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পাওয়ার আশা নাই। কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী ছিলেন। ভারতীন্দ্র, রামপ্রসাদ, শঙ্কর তর্কবাগীশ, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি, গোস্বামী, শিবরাম বাচস্পতি, বিশ্ণুনাথ ন্যায়ালঙ্কার, হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত ইত্যাদি প্রভৃতি অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সকলকেই নিজের ভুক্তি দান করেছিলেন, চতুষ্পাঠী স্থাপনে অর্থসাহায্য করেছিলেন। সেকালে নদীয়াতে একটি প্রবচনই প্রসিদ্ধি লাভ করে : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান গ্রহণ যিনি করেননি তাঁর ব্রাহ্মণত্বেই সন্দেহ জাগে।

বলাবাহুল্য একমাত্র ব্যতিক্রম : রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—

‘বুনো রামনাথ’।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

সে-কালে পাঁচবছর বয়সে বালকদের চুড়াকরণ ও বিদ্যাকরণ শুরু হত। ইদানীং যাকে আমরা 'হাতে-খড়ি' বলি। প্রথমে তারা অ-আ-ক-খ; শুভঙ্করী আর নামতা মুখস্ত করত। তারপর ক্রমে ক্রমে ছাত্রকে শেখানো হত ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ (গণিত ও ফলিত), ষড়দর্শন, এবং বৈদিক ছন্দ তথা বৈদিক ব্যাকরণ। সারা বাংলাতেই গ্রামে ও নগরে ছিল চতুষ্পাঠী। বঙ্গদেশের এইসব চতুষ্পাঠীতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গৌড়দেশের বাহির থেকেও যথেষ্ট ছাত্র আসত — এতই খ্যাতি ছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রামের চতুষ্পাঠী আর টোলের। কবি রামপ্রসাদ বর্ধমানের একটি চতুষ্পাঠীর বর্ণনায় লিখছেন :

চৌদিকে চৌপাড়িময় পাঠ চায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা গ্রিহচ বাড়ি বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী।^১

সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান ছিল টোল। চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপনান্তে উৎসাহী ছাত্ররা টোলে উচ্চতর জ্ঞানের জন্য উপস্থিত হত।

ডঃ আলোককুমার চক্রবর্তী লিখছেন^২

তৎকালীন বাংলার চবিশ পরগণার ডাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া, কুশদহ, বর্ধমান, ত্রিবেণী, হাওড়ার বালী, ঢাকার রাজনগর ও বিষ্ণুপুর ইত্যাদি বহু স্থানে সংস্কৃতশিক্ষার টোল ছিল। ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ, বেদ, পুরাণ, অভিধান ইত্যাদি পড়ানো হত। ছাত্ররা ন্যায়শাস্ত্র শিখবার জন্য নবদ্বীপ যেত। অনেকে আবার দর্শন ও স্মৃতিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মিথিলায় যেত। ব্যাকরণ, অলংকার ও বেদ-এ উচ্চতর জ্ঞানের জন্য ছাত্ররা কাশী যেত। শিক্ষান্তে সাধারণতঃ তারা নিজ নিজ গ্রাম বা শহরে ফিরে চতুষ্পাঠী ও টোল খুলে ছাত্রদের শিক্ষা দিত। ...এডামের অনুমান তখন সারা বাংলায় ১,৮০০টি টোল ও ১২,৬০০ অধ্যাপক ছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা মন্ডব ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।... ছাত্রদের মন্ডবে আরবী, উর্দু, ফারসী, বর্ণমালা লেখা ও পড়া, প্রাথমিক অংক এবং ইসলামী ধর্মশাস্ত্র শেখানোর ব্যবস্থা ছিল।... মাদ্রাসাগুলি বেশীর ভাগ মসজিদ বা ইমামবাড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রদের কোরাণ, হাদিস, সরাহ, আরবী, ফারসী সাহিত্য, আরব দেশের বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র শেখানো হত। এগুলি নবাব, অভিজাত, আমির ও ধনী মুসলমানদের অর্থানুকূল্যে পড়ানো হত।

১ 'সাধক কবি রামপ্রসাদ'—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৯৫৪, পৃ: ৩৯৪-৯৯.

২ 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'—ডঃ আলোককুমার চক্রবর্তী, প্রোগ্রেসিভ বুক কোরাম, ১৯৮৯, পৃ: ৭৯.

তুলনায় সেযুগে — কী-হিন্দু, কী-মুসলমান — স্বীকৃতির শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, নাটোর, বা ঢাকার রাজবল্লভ তাঁদের এলাকায় স্বী-শিক্ষার বস্তুত কোন ব্যবস্থাই করেননি। আট বছর পর্যন্ত হিন্দু বালিকারা পিতামাতা বা গুরুস্থানীয় কোনও পুরুষের কাছে পাঠগ্রহণ করত। সচরাচর সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনে যতটুকু পড়াশুনা দরকার, তার বেশি তাদের শেখানো হত না। শুভকরী অংক, নামতা, কিছু ছড়া, চিঠি লেখার কায়দা। ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা হলে অশুদ্ধ উচ্চারণে কিছু স্তবস্তোত্র — গদ্য, শিবের। বছর-আঠেক বয়সের আগেই ‘গৌরীদান’ করে তাদের গোত্রান্তরের আয়োজন। তারপর তো ভিন্ন গোত্রের সদ্যপরিচিত একটি পুরুষের “ভুক্তবাচ্ছিষ্টংবধৈব দদাৎ” [আহারান্তে যা খেতে পারলে না সেই ভুক্তবশিষ্ট-সমেত এঁটো পাতাখানা ধর্মপত্নীকে ধরে দিও—(গৃহসূত্র ১/৪/১১)] আইনে জীবনধারণের আয়োজন। যতদিনে না স্বামীসেহাগিনীরূপে তার চিতায় ওঠার সৌভাগ্য হয়। হিন্দু বালিকাদের তুলনায় দরিদ্রশ্রেণীর মুসলমান মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেত আরও অল্প। তাদের চিতায় উঠতে হত না, তালুক যেতে হত।

অথচ আর্থিক দিক দিয়ে সম্বল, ধনাঢ্য পরিবারে অবস্থাটা সবসময় এমন ছিল না। কী হিন্দু, কী মুসলমান। স্বীশিক্ষার বিষয়ে মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিল, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ধনবানদের গৃহাভ্যন্তরে স্বীশিক্ষার অভাব সবক্ষেত্রেই ছিল না। সরফরাজ খাঁর জননী জিয়তুনুসা, এবং ভগ্নী জাফিসা বেগম বিদুষী ছিলেন। সুজাউদ্দীনের কন্যা দরদানা বেগমও পড়াশুনায় আলিম ছিলেন। রিয়াজ-উদ্-সালাতীন (লেখক, গোলাম হুসেন সলিম, ইংরেজি অনুবাদ আবদুস সালাম, ১৯০৪) আলিবর্দির প্রধান বেগমসাহেবা : শরফ উন্নিসাকে বলেছেন সমকালীন বঙ্গদেশের “সুপ্রীম পলিটিকাল অফিসার”। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের (মুশিদিবাদ কাহিনী) মতে “...কর্মবীর আলিবর্দি খাঁর রাজনৈতিক জীবন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সহায়তায় পূর্ণতালাভ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আলিবর্দির উজ্জ্বল সংসার যেমন এই মহিলার তর্জনীতাড়নের অধীন ছিল, সেইরূপ বিপ্লব সাগরে নিমগ্ন সমগ্র বঙ্গদেশের শাসনও তাঁহারই পরামর্শানুসারে চালিত হইত। জ্ঞান, ঔদার্য, পরহিতৈষিতা ও অন্যান্য সদৃশ্যে তিনি রমণীগণের মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় হিতকর কার্য তাঁহারই পরামর্শের উপর নির্ভর করিত।”

মুসলিম-শাসনে প্রথম পর্য্যয়ে পাঠান যুগে স্বীশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না; অন্তত এ গ্রন্থের লেখক ইতিহাসকারদের গ্রন্থ ঘাঁটিঘটি করে তেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি; কিন্তু মুগল-জামানার আদি যুগ থেকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে হারেমের ভিতর বিদুষীদের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্তত গ্র্যান্ড-মুগল জামানায় আওরঙ্গজেবের পরবর্তী যুগে মুগলগরিমার সবকিছুর মতো এই স্বীশিক্ষার গৌরবময় ঐতিহ্যও পশ্চিমে ঢলে পড়ে। তুলনায় বাবর থেকে আওরঙ্গজেব প্রতিটি যুগে হারেমসারাই-র (বেগম-মহলের সর্বময়ীকর্ত্রী) সকলেই আরবী-ফার্সিতে আলিম। বাবুর-বাদশাহর আত্মজ্ঞা গুলবদন বেগম দিয়ে তার সূচনা। তিনি আজীবন হুমায়ূনের সঙ্গেই বিচরণ করেছেন এবং “হুমায়ুননামা” রচনা করেছেন। বস্তুত তাঁর ঐ জীবনী গ্রন্থ থেকেই ইতিহাস বাবরতনয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে। যেত

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

হুমায়ূনের ভাগিনেয়ী সালিমা সুলতানাও ফার্সিতে আলিম ছিলেন। জাহাঙ্গীরপত্নী নূরজাহাঁ, মমতাজমহল, জাহানআরা এবং জেব-উন-নিসা প্রত্যেকেই আরবী ও ফার্সী দুটি ভাষাতেই মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ জীবনীধর্মী গ্রন্থ, কেউ শয়ের, কেউ বা কাব্যগ্রন্থ। আলিমগীরের কন্যা জেব-উন-নিসা বেগমের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সঞ্চয় নাকি বিস্ময় উদ্রেক করত। জাহানআরার একটি শয়ের এত উচ্চমানের হয়েছিল যে, সয়ং সাতোন দন্ত মুগ্ধ হয়ে তার বঙ্গানুবাদ করে যান। অপ্রাসঙ্গিক হলেও সেটি উদ্ধৃত না করে থামতে পারছি না। হতভাগিনী জাহানআরা তাঁর সমাধিমূলে উৎকীর্ণ করার জন্য যে ফার্সি শয়েরটি রচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ কৃত তার অনুবাদ :

গরিব গোরে দীপ জ্বেল না

দিও না কেউ ফুল ভুলে ;

প্রজাপতির না পোড়ে পাখ

দগা না পায় বুলবুলে।।

আরও বলি, এই মুঘল যুগেই আকবরের হিন্দুপত্নী অমরমহিষীর প্রেরণায় শাহ-এন-শাহ আকবর চেষ্টা করেছিলেন হিন্দুদের ভিতর প্রচলিত নিষ্ঠুর সতীদাহপ্রথা রদ করতে। সে-হিসাবে আকবর বাদশাহ রাজা রামমোহনের পূর্বসূরী।

হিন্দুসমাজের উচ্চকোটি মহলেও চিত্রটি একই রকম। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুই রানীই বিদূষী ছিলেন। নাটোরের রানী ভবানী অসাধারণ বিদূষী ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। রাজবল্লভের আত্মীয়া কবি ও পণ্ডিতা আনন্দময়ী সন্দক্ষে একটি তথ্য পাওয়া যায় : রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত-ধারণ উপলক্ষে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন কিন্তু যজ্ঞবেদীর মাপ কী হবে তা নির্ণয়ের সময় মতানৈক্য দেখা দেয়। বিদূষী আনন্দময়ী অথর্ব বেদ ঘেঁটে প্রামাণ্য মন্তব্য উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করে এ প্রত্যেকের মীমাংসা করেন। সে-কথা শুনে মনে পড়ে যায় পৌরাণিক কালে রাজা জনকের সভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি কি-না তাই বিচার করতে সমবেত পণ্ডিতবর্গকে সরিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন মহাপণ্ডিতা গার্গী।

এ কিন্তু ব্যতিক্রমের চিত্র। সমগ্র বঙ্গভূমির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে স্থলোকেরা অক্ষরপরিচয়হীন। হিন্দুঘরের মেয়েরা বালিকাবয়সে ‘পুনিপুকুর’ করে, ‘সুবচনী’র পূজা করে, ইত্যাদি করে, ভাদুপূজা করে। বামনবাড়ির মেয়ে হলে বোম্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করে, পাঁচালী পড়ে অথবা মুখস্ত বলে। বড় জোর পূর্বে স্নানান্তে গাম্ভীর্য ভিজে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে তোতাপাখির মতো আওড়ায়, “দেবি সুরেশ্বরী ভগবতী গুহে...”

মুসলমান মেয়েদের অবস্থা আরও করুণ। তারা শাদির দলিলে মৌলভির নির্দেশে নির্দিষ্টস্থানে কালো কালির টিপছাপ দেয়।

প্রাক-পলাশীযুদ্ধের আমলে বঙ্গদেশে মেয়েদের জন্য কোনও পৃথক বিদ্যালয়ের উল্লেখ কোথাও পাইনি। কোম্পানির আমলে বোধ করি প্রথম স্কুলটি খোলেন কলকাতায়, মিসেস হুজস 1760 খৃষ্টাব্দে। তাতে বাঙালি মেয়ে — কী হিন্দু, কী মুসলমান — আদৌ পড়তে

যেত বলে মনে হয় না। সম্ভবত সেটি ছিল কোম্পানির ইংরেজ অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কর্মচারীদের কন্যাদের শিক্ষার আয়োজনে।

আলোককুমার চক্রবর্তীর মতে (মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, 1989) “এ যুগের (প্রাক-পলাশীযুদ্ধ) বিদ্যার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হলেন মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন, আলিবর্দী, বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ ও তিলকচাঁদ, বীরভূমের আসাদুল্লাহ ও বদিউজ্জামান খানের পরিবার, নাটোরের রামকান্ত ও তাঁর স্ত্রী রানী ভবানী, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহ, ঢাকার রাজবল্লভ সেন এবং নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকরূপে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এমন পৃষ্ঠপোষকতা বাংলার আর কোন ব্যক্তি করেছেন বলে জানা নেই।”

এই এতগুলি খনকুবেরের মধ্যে কেউ কোথাও ব্যতিক্রম হিসাবেও বালিকাদিগের জন্য একটিমাত্র বিদ্যায়তনের ব্যবস্থা করেছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের দৃষ্টির আড়ালে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত বাতাবরণে কোন কোন দূরদর্শী পণ্ডিত নিশ্চয় তা করেছিলেন। ক্ষুদ্র পরিসরে — হয়তো নিজের ভদ্রাসনেই। দু-পাঁচ-দশটি বালিকা বা রমণীকে নিয়ে তাঁরা বসেছেন। বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করেছেন। আমার এ প্রতীতি অনেকটা ‘প্লুটো’ গ্রন্থকে দ্রবীনে দেখতে পাওয়ার আগেই নেপচুন গ্রহের গতিচ্ছন্দে হেরফের লক্ষ্য করে ‘প্লুটো’র অস্তিত্বকে মেনে নেওয়ার মতো। অথবা প্লুটোর চেয়েও দূরবর্তিত ‘এল্ডা’-গ্রন্থকে স্বীকার করে নেওয়া। সেই অজানা-অনামা মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হচ্ছে বাস্তব কিছু সমকালীন পণ্ডিতাদের উপস্থিতিতে। না হলে কেমন করে ষোড়শ শতাব্দীর পাটবাড়ি-মৈমনসিংহে কবি চন্দ্রাবতী রচনা করেন : ‘মৈমনসিংহ-গীতিকা’? কেমন করে হট্ট বিদ্যালঙ্কার (1743?-1810) কাশীর পুরুষপণ্ডিতদের পরাজিত করেন? কেমন করে হট্ট বিদ্যালঙ্কার (1775-1875) সগ্রামে নরনারী নির্বিশেষে আত্মরোগীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে সক্ষম হন? এঁরা কেউ তো কৃষ্ণচন্দ্র-বর্ধমানরাজ-রানী ভবানীর দানধন্য নন।

সূত্রাং রূপমঞ্জরীর পিতার, রূপেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা — অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা — অব্যর্থ ‘লেককল্লনা’ নয়। যদিও স্বীকার্য, আমরা তার প্রামাণ্য দক্ষিণ প্রমাণ দাখিল করতে অক্ষম।



কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীতে লিখেছিলেন :

“বামদিকে হলিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।”

গঙ্গাতীরে সেই ত্রিবেণীতেই আমাদের কাহিনীর কালে-বাস করতেন রূপেন্দ্রনাথের শিক্ষাগুরু ভারতবিখ্যাত মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চনন, যাঁর পাণ্ডিত্য-মূল্যায়নে রামমোহন লিখেছেন,

“Jagannath was universally acknowledged to be the first literary of his day and his authority has as much weight as that of Raghunandana.”

জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা এবং প্রতিধ্বংসপ্রতিম স্মৃতিশক্তির বিষয়ে নানান কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। সংসদ ‘বাঙালী চরিতাভিধানে’ তাঁর প্রশংসা বলা হয়েছে — “দীঘজীবী এই পণ্ডিত একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতচর্চায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রায় নিশ্চয় করে তোলেন।”

দীঘজীবী — সন্দেহ নাই। — একশ তের বছর! শতাধিক বর্ষ বয়সের পণ্ডিত তবু দুই একটি দেখেছি; কিন্তু ‘চেমবাস বায়োগ্রাফিক্যাল ডিক্সনারী’ ঘেঁটে আমি তো জগন্নাথ ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন প্রতিভার সন্ধান সারা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে পাইনি যার পদপ্রান্তে একটা গোটা শতাব্দী বুড়িয়ে বুড়িয়ে ফুরিয়ে গিয়ে শেষ-প্রণাম জমিয়ে বাধ্য হয়ে বিদায় নিয়েছে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের জন্ম 1694 খ্রষ্টাব্দে — সপ্তদশ শতাব্দীতে; প্রয়াণ 1807 খ্রষ্টাব্দে — ঊনবিংশ শতাব্দীতে। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী ইহলোকে তাঁর অনুজ — পরলোকে : ‘সেথা তুমি অগ্রজ আমার।’

এই পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের শিক্ষা ছিলেন আমাদের কাহিনীর নায়ক, রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরে মহারানীর কাছে ব্যর্থ হয়ে রূপেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন ত্রিবেণীতে — গুরুদেবের আশ্রমে।

জগন্নাথ একই সঙ্গে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেয়েছেন। তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি — যা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছিলেন — সুবল মিত্র মশায়ের অভিধানের হিসাবে

দেখছি, তা একটি পিতলের গাড়ি, একটি ‘অমৃতি’ জলপাত্র, অনধিক দশবিঘা নিষ্কর ভূমি এবং একটি একচালা পর্ণকুটির। নিজের মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান : অনুন এক লক্ষ টাকা নগদ, বার্ষিক চারিসহস্র তঙ্কা লাভের নিষ্কর ভূমি, তিন পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং তস্যপুত্রদের।

আমাদের কহিনীর কালে — যখন রূপেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, — পলাশীর যুদ্ধের নয় বৎসর পূর্বে — সেই 1748 খৃষ্টাব্দে, তখন তর্কপঞ্চাননের বয়স চ্যুন্ন। তখনই তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রের প্রচণ্ড ভিড়।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীর টানা বারান্দায় কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি পাঠন-পাঠনের আয়োজন। গৃহভাস্তুরে ন্যায়, নবন্যায়, দর্শন, বিশেষ করে বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা। পণ্ডিত মশাই এসব শ্রেণীতে পড়ান না। তাঁর একটি পৃথক গবেষণা-গৃহ আছে। উন্নত শ্রেণীর ছাত্ররা পর্যায়ক্রমে সেখানে আসে। কোনও অনুপপত্তি থাকলে তার মীমাংসা জেনে যায়। সচরাচর টোল ও চতুষ্পাঠীর শিক্ষকেরা সেখানে পাঠ নিতে আসেন। অবসর সময়ে পণ্ডিতমশাই অধ্যয়ন করেন, অথবা রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি — ‘বিবাদভঙ্গার্ণব’ গ্রন্থ রচনা আরও চল্লিশ বছর পরের ঘটনা। বস্তুত ইংরেজ কোম্পানি বাঙলার দেওয়ানি লাভ করার পর এ দেশীয় বিচার পদ্ধতি ও আইন প্রস্তুতির জন্য জগন্নাথ পণ্ডিতের দ্বারস্থ হয়। স্মৃতি-সমুদ্র মন্বন করে তর্কপঞ্চানন ঐ গ্রন্থটি রচনা করেন 1788 থেকে 1792 খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এজন্য তিনি মাসিক সাতশত তঙ্কা বেতন পেতেন।

রূপেন্দ্রনাথ-সুযোগমতে গুরুদেবকে তাঁর সমস্যার কথা জানালেন। রূপেন্দ্রনাথের জী-বিয়েগের সংবাদ তর্কপঞ্চানন পেয়েছিলেন, কিন্তু সে যে একটি কন্যাসন্তান রেখে গেছে তা জানতেন না। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বললেন, তা বাবা রূপেন্দ্রনাথ, ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় তো অন্যায় কিছু বলছেন না। তুমি যদি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না কর, তাহলে তোমার কন্যাকে সোণাই নিয়ে যেতেই বা চাইছ কেন? একহাতে কী করে শিশুপালন করবে?

কৃষ্ণনগরে রানীমাকে যে যুক্তি শুনিয়েছিলেন এখানেও সেই একই কথা অনর্গল বলে গেলেন। দুর্ভাগ্য রূপেন্দ্রনাথের; দেখা গেল পুরীর শঙ্করাচার্য, নদীয়ারাজ মহিষী এবং পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একই মতের পোষক।

দেশে এখন মুসলমান শাসন। শাসক সম্প্রদায় — কী হিন্দু, কী মুসলমান — কী অঙ্গে, বঙ্গে অথবা কলিঙ্গে ক্রীশিক্ষা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। ইসলামের কী নির্দেশ জানা নেই, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ঘরানা ঘরের মুসলমান মহিলা গৃহাবরোধের বাহিরে আসেন না। নিতান্ত বাধ্য হলে বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে পথে নামেন।

হিন্দুস্থানে, প্রাক-মুসলমান যুগে, নারীসমাজের এতটা বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারা অনায়াসে অনবগুণ্ঠিতা অবস্থায় পথে ঘাটে যাতায়াত করত। অজন্তাগুহার কোনও প্রাচীর চিত্রে অবগুণ্ঠিতা নারী চিত্রায়িতা হয়নি। অজন্তা ষোড়শ গুহাবিহারে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

পাঠশালায় একটি বালিকার চিত্র আজও দেখতে পাওয়া যায়। নারীর বিদ্যাভ্যাসে কোনও বাধানিষেধ ছিল না। প্রাচীরচিত্রটি প্রাক-মুসলমান যুগে, অষ্টম শতাব্দীতে অঙ্কিত।

কিন্তু ভারতের শাসনভার যখন ক্রমে ক্রমে বহিরাগত মুসলমান আগন্তুকদের কজায় চলে গেল তখন হিন্দুনারীরা হারালো তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা। পথে-ঘাটে অনবগুপ্তিত পরিভ্রমণ হয়ে উঠল অত্যন্ত বিপদজনক। আরব-পারস্য থেকে পুরুষ মুসলমানেরাই এসেছে দলে দলে, নারীরা নয়। ফলে হিন্দুনারী অপহরণের মাত্রা অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাধ্য হয়ে হিন্দুনারীদেরও গৃহাবরোধের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার আয়োজন হল। অনবগুপ্ত নিরঙ্কুশ মুক্তি এবং বোরখায় সর্বায়ববের বন্ধনদশার মাঝামাঝি ব্যবস্থা হল : অবগুপ্তন। মাপে তা ছোট-বড় করা যায় প্রয়োজন অনুসারে। বয়ঃকনিষ্ঠ ঠাকুরপোর সম্মুখে যা ‘আধো-ঘোমটা’, ঠাকুর বা ভাণ্ডারের সামনে তাই ‘আবক্ষা’

মৈত্রী, গার্গী, বিশ্ববারা, মদানসার উভরসূরীরা সামাজিক বিবর্তনে ডাইনোসর-ডোডোদের সমাগোত্রীয় হয়ে উঠলেন। মনুসংহিতায় প্রক্ষিপ্ত হল কালোপায়োগী নববিধান : ‘অষ্টম বর্ষে তু ভবেৎ গৌরী;’ ‘পথি নারী বিবর্জিতা’ এবং

‘পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্মাতস্ত্যমহীতি।’

এই যুক্তিগুলিই ওনিয়ে গেলেন তর্কপঞ্চানন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে।

রূপেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করলেন না, তর্ক করলেন না, নীরবে নতমস্তকে শুধু শুনে গেলেন। সেটাই ছিল সে-কালের শিষ্টাচার। অগাধবিদ্য হওয়া সত্ত্বেও, অসীম প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর গুরু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সেই অনবদ্য বিনাসুতোয় গাঁথা ‘ভারত-সংস্কৃতি মালার’ একটি রত্নখণ্ড হতে পারবেন না কোনদিন — রূপেন্দ্রনাথের যে মালিকায় গাঁথা আছেন : বাম্মাকি — বশিষ্ঠ — বেদব্যাস — যাজ্ঞবল্ক্য — ঋষি গৌতম — বুদ্ধ গৌতম — অশোক — শঙ্করাচার্য — নানক — শ্রীচৈতন্য।

গুরুদেব প্রশ্ন করলেন, কী করবে অতঃপর? কী মনস্থ করেছ?

—এখনই তা স্থির করে উঠতে পারছি না।

—আমার কথা শোন : পুনরায় দারপরিগ্রহ কর। ভবতারণের কন্যাটিকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে আমাকে বল, আমি তোমার মনোমত একটি সংবংশের সর্বদ্বন্দ্বসুন্দরী কুলীনকন্যার ব্যবস্থা করে দিই।

রূপেন্দ্র যুক্তকবে বলেন, এমন আদেশ করছেন না, গুরুদেব।

—না, না, আদেশ নয়, পরামর্শ।

—গুরুদেবের পরামর্শ মানেই আদেশ। আমি পুনরায় বিবাহ করব না, এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়েছি।

—তাহলে এক কাজ কর। আমার বিদ্যানিকেতনে নিজেকে যুক্ত করে দাও। ত্রিবেণীতে নয়, উখুড়া পরগণায়। সেখানে নদীয়ারাজ আমাকে সাতশত বিঘা আউশ ধানের জমি দান করেছেন। তার ভিতর কিছু বন্ধা উষর ভাঙা জমি আছে। তুমি সেখানে একটি গৃহনির্মাণ কর। সেখানে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের আয়োজন কর। চতুর্বেদের আলোচনা ত্রিবেণীতে আমিই করছি — তুমি পঞ্চমবেদ অর্থাৎ আয়ুর্বেদ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ কর। যাবতীয় ব্যয়ভার আমার। তোমাকে উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা প্রদানের ব্যবস্থাও থাকবে।

এবারও অস্বীকৃত হলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, বাবামশাই আমাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে যখন পাঠিয়েছিলেন তখনই বলেছিলেন, সোএগ্রাই গ্রামের ত্রিগীমানায় কোনও কবিরাজ নাই। তুমি স্বগ্রামে আর্তের সেবা করবে। এ জন্য নদীয়ারাজের প্রস্তাব পর্যন্ত আমি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় কথা : আমি যেখানেই বসবাস করি না কেন, সেখানে একটি পাঠশালা খুলব, ভ্রমণে চতুষ্পাঠী। তাতে শুধু বালিকা এবং কিশোরীরাই সারস্বত সাধনায় ব্রতী হবে। সে কাজ উখুড়ায় হবে না। নদীয়ারাজ স্বীকৃতি বিস্তারের বিরুদ্ধে। আপনিও তো দেখছি তাই।

জগন্নাথ বাধ্য হয়ে রূপেন্দ্রকে বিদায় জানাতে সীকৃত হলেন। ভাল একটি অধ্যাপক হাতছাড়া হয়ে গেল। উপায় কী? লোকটা পণ্ডিত, কিন্তু ঐ : একবন্ধা!

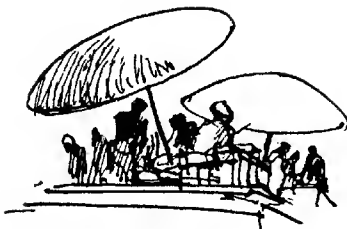
বললেন, ঠিক আছে রূপেন্দ্রনাথ, তুমি যদি নিতান্তই সোএগ্রাই গাঁয়ে ফিরে যেতে চাও আমি বাধা দেব না। তবে যাবার আগে আমার একটি আত্মীয়কে একবার দেখে যাও। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা তো দূরের কথা — রোগটা কী তাও নির্ণীত হয়নি। বড়ই দুর্ভাগা সে।

—রোগীটি কে? আর রোগের উপসর্গ কী?

—রোগী আমার ভাগিনেয়। আর রোগ — আমরা এ পর্যন্ত যা অনুমান করেছি তা বিচিত্র। সে বন্ধ উন্মাদ হয়ে থাকে দু-তিন মাস অথবা বছরের পর বছর, তারপর হঠাৎ তার জ্ঞান ফিরে আসে, পাঁচ-সাত দিনের জন্য। তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। কেন যে উন্মাদ হয়ে যায়, আবার কেনই বা তার জ্ঞান ফিরে আসে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না।

—তাঁর বয়স কত? কতদিন ধরে এ রোগের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? তাঁর সম্বন্ধে আর কী কী তথ্য জানাতে পারেন?

—বলছি বাবা। শোন বিস্তারিত।



রোগীর নাম ঘনশ্যাম সার্বভৌম। আমাদের কাহিনীর কালে তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। ঘনশ্যাম ছিলেন অলোকসামান্য ক্ষণজন্মা এক মহাপণ্ডিত। বিশ্বাস করা কঠিন যে, তিনি সে-কালীন গোড়মণ্ডলের সববিখ্যাত মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চননকে প্রতিটি বিষয়ে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন — বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা এবং, হ্যাঁ, স্মরণশক্তিও।

এখানে ঔপন্যাসিক হিসাবে কিছু কৈফিয়ৎ অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে ‘ঘনশ্যাম সার্বভৌম’ একজন ঐতিহাসিক বাস্তব চরিত্র। তিনি ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই অলোকসামান্য পৌত্রটির প্রসঙ্গে সয়ং জগন্নাথ লিখে গেছেন, “বাগদেবীর কৃপায় আমি তাঁহার প্রসাদ কিছু কিছু লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু পৌত্র ঘনশ্যাম যে প্রসাদ লাভ করিয়াছে তাহা আমার সৌভাগ্যকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবনকালেই সে ঘোর উন্মাদ হইয়া যায়” (“সংবাদপত্রে সেকালের কথা” অনুসারে)।

অথচ ‘সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান’ অনুসারে, “প্রথম সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চননকে প্রধান পণ্ডিতের পদগ্রহণে আহ্বান করা হয়। তিনি অস্বীকৃত হলে পৌত্র ঘনশ্যাম এই পদে নিযুক্ত হন।”

মনে হয়, কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে। “যৌবনকালেই ঘোর উন্মাদ” হয়ে গেলে জগন্নাথের শেষ জীবনে ঘনশ্যাম সুপ্রীম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত হতে পারেন না।

তবে এসব গবেষণা ঐতিহাসিকদের জন্য মূলতঃ বি থাকুক আমরা সাহিত্যরসের কারবারী। ইতিহাসের কাছ থেকে একটি ব্যর্থ ক্ষণজন্মার নামটুকু গ্রহণ করেছি মাত্র। আমাদের কল্পনায় এই ঘনশ্যাম পৃথক চরিত্র। তিনিও অসাধারণ পণ্ডিত, যৌবনেই ঘোর উন্মাদ হয়ে যান। কিন্তু তিনি মহাপণ্ডিত জগন্নাথের পৌত্র নন, ভাগিন্যয়।

ঔপন্যাসিক-কল্পিত ঘনশ্যামের পিতা অর্থাৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের ভগিনীপতি গঙ্গাপ্রসাদ তর্কতীর্থের ঐ একটিই বৃদ্ধবয়সের সন্তান। আঠার বৎসর বয়সে পুত্রের পুনরায় মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখে জগন্নাথের পরামর্শেই তিনি ডিডিঘড়ি পুত্রের বিবাহ দিলেন। পাত্রী ধনীর দুলালী, কুলীন এবং জগন্নাথের পৃষ্ঠপোষক যজমান। একটি বংশধরের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল গঙ্গাপ্রসাদের। দত্তকপুত্র গ্রহণে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। দানপত্রে দত্তকপুত্রের ব্যবস্থা নেই।

হেতুটি বিচিত্র, জটিল এবং মর্মস্পিক।

গঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী এক বিশাল দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়ত। সাতপুরুষ ধরে ওঁরা এই সম্পত্তি ভোগ করে আসছেন দেবতার অছি হিসাবে। বংশের আদিপুরুষ, প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে, ছিলেন নিতান্ত গরিব, জমিদারের গৃহদেবতার নিত্যপূজার পুরোহিত। কিন্তু তাঁর ছিল একটি রূপসী লক্ষ্মীপ্রতিমাশ্রীতিম সুন্দরী কন্যারত্ন : সতী।

তদানীন্তন জমিদার মশাই পুরোহিত-কন্যার রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিনা পণে পুত্রবধু করে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! রাজসুখ সেই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটির ভাগ্যে লেখা নেই। সর্পাঘাতে জমিদার পুত্রের মৃত্যু হল। সদ্যবিবাহিতা, স্নানামধ্যম সতী, সহমরণে গেল। বধুমাতার স্মরণে জমিদার শর্তসাপেক্ষে একটি সতীমায়ের মন্দির ও একটি তালুক চক্রবর্তী পরিবারকে দান করেন যান। গোটা তালুকের আদায় থেকে রাজসরকারের খাজনা দিয়েও প্রচুর উদবৃত্ত থেকে যায়। শর্তটি অকিঞ্চিৎকর। অদি সতীমায়ের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রতিটি পুরুষে বংশের জ্যেষ্ঠপুত্রের দেহান্তে তাঁর সহধর্মিণীর ভিতর অন্তত একজনকে সহমরণে ষেতে হবে। চক্রবর্তী পরিবার প্রায় ছোটখাটো একটি জমিদারই।

ঘনশ্যামের পিতামহী বংশের শেষ সতী। গঙ্গাপ্রসাদের দেহান্ত হলে তাঁর দুই সহধর্মিণীর মধ্যে যে কোন একজন সহমরণে যাবেন। কিন্তু তার পরের পুরুষে ঘনশ্যাম অপুত্রক অবস্থায় লোকাভিরিত হলে চক্রবর্তী পরিবার সেবায়তের অধিকার হারাবে। সম্পত্তি জমিদারে খাস হয়ে যাবে। জমিদার নূতন সেবায়ত নিয়োগ করবেন।

মাত্র সতের বৎসর বয়সেই ঘনশ্যাম ‘সার্বভৌম’ উপাধি লাভ করেছে বাণেশ্বর বিদ্যাবিনোদের চতুষ্পাঠী থেকে। সে দিবারাত্র পুঁথি মুখে নিয়ে পড়ে থাকে। পাগলের মতো কীসব সাধন-ভজনও করে। পিতা চতুর্দশবর্ষীয়া যে মেয়েটিকে পুত্রবধু করে ঘরে আনলেন ঘনশ্যাম তার প্রতি কৌতূহলী হল না আদৌ। বাস্তবে সে তখন উন্মাদ; বছর-কয়েক অপেক্ষা করে পৌত্রের অগমন সন্ধান না দেখতে পেয়ে গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র ও পুত্রবধুকে নিয়ে পুরুষোত্তমধামে চলে যান। পুত্রবধুর সজ্জন কামনায় সাড়ম্বরে পুত্রশরণাদি দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁর উপর প্রত্যাশা হয়, “তোমার পুত্রবধু গর্ভে এক অমূল্যরত্ন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার নাম রাখিও বলভদ্র।”

অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের ক্ষেত্রেও। প্রভেদ এই যে, জগন্নাথের পিতা রত্নদেব তর্কবাগীশের বয়স তখন ছিল ছয়বছর আর ঘনশ্যাম মাত্র বাইশ বৎসরের যুবক।

গঙ্গাপ্রসাদের স্বগ্রামে প্রত্যাভবনের কয়েক মাসের ভিতরেই তাঁর পুত্রবধুর গর্ভসম্ভারের লক্ষণ দেখা গেল। কালে তিনি নাতির মুখ দেখলেন। বকরাহল্য তার নাম রাখা হল : বলভদ্র চক্রবর্তী।

ঘনশ্যামের মস্তিষ্কবিকৃতির অবশ্য কোনও উন্নতি হল না। ক্রমে ক্রমে তিনি ঘোর উন্মাদ হয়ে গেলেন। শুধু কী-এক বিচিত্র কারণে বছরের মধ্যে দু-চারবার তিনি স্বাভাবিক হয়ে যান।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

সচরাচর পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তারপর পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উদ্ভিত হলেই পূর্ণচন্দ্রদর্শনে ঘনশ্যামের চিত্তর পারম্পর্য হারিয়ে যায়। আহারে রুচি থাকে না, পরিধানে থাকে না বস্ত্রখণ্ড। বাক্যলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ। পদ্মাসনে বসে থাকেন প্রহরের পর প্রহর। আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকেন। ইদানীং বছরে নয় মাস!

আজ বিশ বছর হল ঘনশ্যাম চিকিৎসার বাহিরে।

ইতিমধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ স্বর্ণলাভ করেছেন। সহমরণে গেছেন ঘনশ্যামের বিমাতা। আইনত ঘনশ্যামই এখন সেবায়ত্ত। তাঁর আমমোক্তারনামা নিয়ে বাস্তবে ঘনশ্যামের যুবকপুত্র বলভদ্রই এখন সতীমা-তালুকের আদায়পত্র দেখে, বস্ত্রত তালুকদারী করে।

রোগীর যাবতীয় পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হয়ে রূপেন্দ্র এবং তাঁর গুরু এসে উপস্থিত হলেন সতীমা-তালুকের ‘মায়ের বাড়ি’ গাঁয়ে। এখানকার তালুকদার-বাড়িই হচ্ছে চক্রবর্তীবাড়ি। জগন্নাথের বোনাইবাড়ি। ভগিনীপতি গঙ্গাপ্রসাদ গত হয়েছেন, ভগিনীও গেছেন সহমরণে; কিন্তু ঘনশ্যামের প্রতি জগন্নাথের একটা দুর্বলতা বরাবরই আছে। আহা! কী প্রতিভার কী পরিণাম!

সে দিন সকালে জগন্নাথ এলেন পালকিতে, রূপেন্দ্র অশ্বারোহণে। সংবাদ দেওয়াই ছিল। বলভদ্র আদর-আপ্যায়ন করে ওঁদের নিয়ে গিয়ে বসালো বৈঠকখানায়। প্রণাম করল দুজনকেই।

জগন্নাথ বলভদ্রকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলভদ্রের পিতা সার্বভৌম, পিতামহ তর্কতীর্থ অথচ বলভদ্র পাঠশালার চৌকাঠ ডিঙাতে পারল না। বংশের কুলাঙ্গার। বলভদ্র সে-কথা জানে; তর্কপঞ্চননকে শ্রদ্ধা না করলেও সে ভয় করে যথেষ্ট। উপরমহলে তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি। কোতোয়াল তাঁর ইচ্ছামাত্র যেকোন মানুষের হাতে মাথা কাটে।

দ্বিতলের একটি কক্ষে বলভদ্র নিয়ে এল ওঁদের দুজনকে। শয়নকক্ষটি বাহির থেকে অর্গলবদ্ধ ছিল। অর্গল মোচন করে ওঁরা তিনজনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। কক্ষটি বৃহৎ। ঘরের একপ্রান্তে বড় পালঙ্ক। কিন্তু গৃহের একমাত্র বাসিন্দা বসে আছেন পদ্মাসনে ভূশযায়। সম্পূর্ণ নগ্ন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। একমুখ দাড়ি-গৌফ। রুদ্ধহারের অর্গলমোচন হল, ঘরে তিনজন আগন্তুক প্রবেশ করলেন, কিন্তু কক্ষের একমাত্র বাসিন্দার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তর্কপঞ্চনন বললেন, কী? কেমন আছ ঘনশ্যাম?

উন্মাদ নির্বাক। নিম্পন্দ। জগন্নাথ তাঁর দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই বাধা দিল বলভদ্র। বলল, বাবামশাই মাঝে মাঝে একেবারে ক্ষেপে ওঠেন। আক্রমণ করে বসেন। ওঁর কাছে যাবেন না। দূর থেকে যা হয় করুন।

জগন্নাথ জানতে চাইলেন, সকাল-সন্ধ্যা একে আহার-পানীয় দিয়ে যায় কে? শৌচাগারে নিয়ে যায়, স্নান করিয়ে দেয় — কে?

—ছেট-মা। একমাত্র তাঁকেই উনি সহ্য করেন। আমাকে অথবা বড়মাকে একেবারেই সহ্য করেন না। কি-চাকর কেউ কাছে যেতে সাহস পায় না।

রূপেন্দ্র বলে ওঠেন, সে-ক্ষেত্রে তোমার ছোটমাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আর তুমি

ঘরের বাইরে যাও। ওঁর মেজাজটা খারাপ করতে চাই না।

বলভদ্র এককথায় মেনে নিল। তার প্রস্থানের একটু পরেই একটি যুবতী আবক্ষ-অবগুষ্ঠনে মুখ ঢেকে দ্বারের থ্রাশে এসে দাঁড়ালেন। জগন্নাথ তাঁকে বললেন, ভিতরে এস ছোট বৌমা। ইনি আমার একজন প্রিয় ছাত্র। বর্তমান গৌড়মণ্ডলের বিস্মৃতকীর্তি শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। ওকে আমি নিয়ে এসেছি ঘনশ্যামের চিকিৎসার জন্য। ও যা যা জানতে চাইবে অকুণ্ঠচিন্তে জানাবে...

রূপেন্দ্র বললেন, গুরুদেব। আপনি সম্পর্কে ওঁর মামাশুশুর। ওঁদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে আমি হয়তো এমন প্রশ্ন...

বাক্যটা শেষ হল না। জগন্নাথ বললেন ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমিও না হয় বাইরে যাই।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন তাই যান। বলভদ্রকে আগলে রাখবেন। দেখবেন, এ-ঘরে কোনমতেই কেউ যেন না আড়ি পাতে।

জগন্নাথ প্রথর বৃদ্ধিমান। গ্রীবাসঞ্চালনে সন্মতি জানিয়ে নিষ্কান্ত হলেন। রূপেন্দ্র ভিতর থেকে কবচটি অর্গলবদ্ধ করে যুবতীর দিকে ফিরে বললেন, মা! আমি চিকিৎসক। আপনার স্বামী মানসিক রোগী। আমার কাছে লজ্জা করলে তো চলবে না, মা! আপনি অবগুষ্ঠন অপসারিত করুন।

মেয়েটি লজ্জা পেল না। অকুণ্ঠচিন্তে মাথার ঘোমটা কিছুটা সরিয়ে রূপেন্দ্রর চোখে-চোখে তাকালো। এগিয়ে এসে রূপেন্দ্রর পদধূলি নিল। অকতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে স্বামীর পদপ্রান্তেও নামিয়ে রাখল অস্পর্শিত একটি প্রণাম। ঘনশ্যাম নির্বিকার। পদ্মাসনে বসে আছেন। চোখ দুটি কিন্তু খোলা। সে-চোখে পাগলের ঘোলাটে দৃষ্টি।

রূপেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখলেন, মেয়েটির বয়স উনিশ-কুড়ি। শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী। পল্লীবাঙলার একটি শ্যামগ্রী যেন তার কানায়-কানায় ভরা তনুদেহকে ঘিরে আছে। ওর অঙ্গে আভরণ অল্প, পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ। বাঙলামায়ের প্রতিমূর্তি।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, উনি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন না?

অজান্তেই 'তুমি' সম্বোধন। ওঁর কেন যেন মনে হল ছোট বোন কাত্যায়নীর সঙ্গে কথা বলছেন, অথবা মৃণ্ময়ী, কিংবা মঞ্জুরীই।

মাথা নেড়ে মেয়েটি জানালো : না।

—দুর্ব্যবহার তো করেন না, কিন্তু আদর-সোহাগ? নির্জন ঘরে?

নিরতিশয় লজ্জায় এবার নতনেত্র হল। জবাব দিল না।

রূপেন্দ্র বললেন, তুমি যদি আমাকে সব কথা খোলামেলা না বল, মা, তাহলে আমি ঐ মানসিক রোগীর চিকিৎসা কেমন করে করব বল? ও পাগল তো নিজে থেকে কোন কথা বলবে না। এইমাত্র শুনলাম একমাত্র তোমাকেই সে বরদাস্ত করে, তোমার কথা শোনে। ফলে, তোমাদের দাম্পত্য জীবনের সব কথা, হ্যাঁ স—ব কথা আমাকে জানাতে হবে। আমি চিকিৎসক, ধনস্তবির কাছে আমার প্রতিজ্ঞা করা আছে যে, রোগীর গোপন কথা আমি গোপন

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

রাখব। আমার কাছে লজ্জা করতে নেই, মা। বল, কত দিন হল বিবাহ হয়েছে তোমাদের?

—গত ফাল্গুনে। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ তৃতীয়ায়।

—তার মানে তের মাস। দীর্ঘ সময়! বিবাহের সময় উনি সুস্থ ছিলেন?

নেতিবাচক গ্রীবাভঙ্গি করে মেয়েটি।

রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, তাহলে বিবাহের মন্ত্র উনি উচ্চারণ করলেন কেমন করে?

—করেননি তো!

—তাহলে বিবাহটা সিদ্ধ হয় কী করে? কুশপ্তিকার প্রতিজ্ঞা, মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে তো বিবাহ সিদ্ধ বলে গ্রাহ্য হবে না!

মেয়েটি এতক্ষণ নতনত্রে জবাব দিয়ে যাচ্ছিল, এবার হঠাৎ রূপেন্দ্রের চোখে-চোখ তাকিয়ে বললে, ত্রিবেণীর মহাপণ্ডিত বিধান দিলে সেই অশাস্ত্রীয় বিবাহও সিদ্ধ! অস্বীকার করবার হিম্মৎ কার আছে বলুন?

অবাক হলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, তার মানে ঐ পাগলটাকে তুমি অন্তর থেকে নিজের স্বামী বলে মান না, যেহেতু তোমাদের বিবাহটাই অসিদ্ধ। তবে যেহেতু ত্রিবেণীর মহাপণ্ডিত নিদান হেঁকেছেন তাই...

মেয়েটি বাধা দিয়ে বলল, আপনি আমার কথা কিছুই বুঝতে পারেননি। আমি মোটেই তা বলতে চাইনি। ওঁকে আমি স্বামী বলেই মানি। আমার পতিদেবতা বলেই মনে-প্রাণে স্বীকার করি। উনি পাগল কি স্বাভাবিক, উনি কুশপ্তিকায় কোন্ কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না! আমি নিজের বিবেকের নির্দেশে চলি।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, তোমার কথায় আমি ভ্রমেই মুগ্ধ হয়ে উঠছি, মা! তুমি বস। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। প্রথমে বল, তোমার নামটি কী?

—মালতী।

—বাঃ সুন্দর নাম। তুমি বললে, বিয়ের সময় তোমার স্বামীর মানসিক সুস্থতা ছিল না। তবে তিনি স্বাভাবিক হলেন কত দিন পরে?

মালতী নতনত্রে বললে, ঐ ফাল্গুনের কৃষ্ণ ষষ্ঠী তিথিতে।

—বাঃ! তিথিটাও তোমার মনে আছে?

একটু চিন্তা করে পুনরায় বললেন, ও! বুঝেছি। তার হেতুটি কি এই যে, সেটা ছিল তোমাদের ফুলশয্যার রাত? তৃতীয়া থেকে ষষ্ঠী — তিনটি তিথি!

মালতী আঁচল দিয়ে মুখটা ঢাকল। গ্রীবা সঞ্চালনে স্বীকার করল কিন্তু। রূপেন্দ্রনাথ অমানবদনে পরস্ত্রীর মণিবন্ধটি ধরলেন। মালতী শিউরে উঠল। রূপেন্দ্র জোর করে ওর মুখ থেকে আঁচলটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘মা’ বলে ডেকেছি তোমাকে। আমাকে সবকথা বলতে হবে, মালতী! বল, কতদিন তিনি সেবার সুস্থমস্তি ছিলেন?

মালতী বললে, পূর্ণিমা পর্যন্ত।

—তার মানে পাঁচিশ দিন। সে তো দীর্ঘ সময়। তার মধ্যে তোমাদের ভাবসাব হয়নি? উনি তোমাকে স্ত্রী হিসাবে কি মেনে নিয়েছিলেন এই পাঁচিশদিনের ভিতর?

মালতী সঙ্কোচ করল না। বলল, জ্ঞান ফিরে আসার পর একবার মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আপনি কে? এখানে কেন?’ তারপরেই ফুলে-ছাওয়া বিছানাটা দেখে বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন ‘ও! তোমার সঙ্গে আমার বুঝি বিয়ে হয়েছে? তোমার বুঝি আজ ফুলশয্যা?’ —এই পর্যন্ত বলে মালতী থামল।

রূপেন্দ্র বলেন, তারপর?

—কী তারপর? আপনি কি সব কিছুই শুনতে চান? তা কি বলা যায়?

রূপেন্দ্র বলেন, না, বলা যায় না। আমি জানি—বুঝিযে তা বলা যায় না। সব কথা বলা যায় না। কিন্তু রোগনির্ণয়ের জন্য যেটুকু আমার জেনে নেওয়া দরকার সেটুকু যে আমাকে জানতেই হবে, মালতী।

মালতী অসহায়ের মতো তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখে। পদ্মাসনে নির্বাক বসে আছে পাগলটা। এঁদের কথোপকথন হয়তো ওর শ্রুতিতে প্রবেশ করছে, মস্তিষ্কে কোনও অনুরণন জাগাচ্ছে না। রূপেন্দ্র বলেন, তোমাকে বউ বলে চিনতে পারার পরে, ওটা তোমাদের ফুলশয্যা এ কথা বুঝতে পারার পরেও তোমাকে আদর-সোহাগ করেননি? চুমু-টুমু খাননি?

দুরন্ত লজ্জায় মেয়েটি আবার দু-হাতে মুখ ঢাকে। রূপেন্দ্র সহজ হবার জন্য বলেন, তোকে দেখতে ঠিক আমার ছোট বোন কাতায়নীর মতো। আমি কিন্তু কাতুর কাছে স্বীকার করেছিলাম যে, ফুলশয্যার রাতেই আমি...

মালতী মুখ থেকে কঁকন-পরা হাত দুটি সরালো। কৌতূহলী দু-চোখে অন্যদিকে মেলে অপেক্ষা করল অসমাপ্ত বাক্যের শেষাংশ শোনার জন্য। রূপেন্দ্র নীরব আছেন দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার চোখে-চোখে তাকালো। বলল, কী? কী-কথা?

—ঐ যে কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। চুমু খাওয়ার কথা।

আবার ওর মুখটা নেমে পড়ল বৃকের উপত্যকায়।

রূপেন্দ্র এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, তোমার বিয়েতে বোধহয় বরপণ লাগেনি। না?

আবার চোখে-চোখে তাকালো। বলল, বরপণ? কী বলছেন আপনি! বলভদ্র আমার মামাকে পাঁচ শ সিকা তঞ্চা কন্যাপণ দিয়েছে। তাছাড়া পঞ্চাশ বিঘে ধানীজমি।

—কেন? মামাকে কেন? তোমার বাবা...

—না! কেউ নেই আমার। বাবা-মা-ভাই-বোন — নিজের বলতে কেউ নেই। মামার সংসারে মানুষ হচ্ছিলাম। মামার তিন-তিনটে আইবুড়ো মেয়ে। মামার কুলীন। অনেক টাকা লাগবে। তাই তো আমি...

—কী? জেনে-বুঝে পাগলকে বিয়ে করলে?

মৌনতা যদি সম্মতির লক্ষণ হয় তবে বলতে হবে মালতী অভিযোগটা স্বীকার করে নিল। রূপেন্দ্র তখন প্রশ্ন করেন, পাগলকে বিয়ে করছ, শুধু এটুকুই কি জানতে? নাকি...

—নাকি?

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

—বিয়ের আগে তুমি জানতে অত টাকা খরচ করে বলভদ্র কেন তার বাপের বিয়ে দিয়ে আনল?

রূপেন্দ্রের চোখে-চোখে রেখে মালতী বলল, জানি। জানতাম। ওর নিজের মাকে চিতার আঙুন থেকে বাঁচাতে। না হলে সেবাসেই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

রূপেন্দ্র বিনাস্বিধায় ওর শাঁখা-পরা হাতটা চেপে ধরে বললেন, তাও যদি জান মালতী, তাহলে কেন আমাকে সাহায্য করবে না? ঐ বলভদ্র আর তার মায়ের পৈশাটিক চক্রান্ত ব্যর্থ করতে? বল? সব কথা খুলে বল আমাকে। ঘনশ্যাম যখন স্বাভাবিক থাকেন তখন কি তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন? তোমাকে নিয়ে বিছানায় শোন? তোমার নারীজন্ম সার্থক করতে...

মালতী হঠাৎ বরবর করে কেঁদে ফেলে। রূপেন্দ্র সলজ্জে ওর হাত ছেড়ে দেন। মালতী ও-পাশ ফিরে তার স্বামীর দিকে চকিতে দৃকপাত করে। রূপেন্দ্রনাথ তিলমাত্র নড়াচড়া করেন না। কারণ তিনি প্রথম থেকেই এমন একটি স্থানে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন যেখানে দাঁড়িয়ে গ্রীবা সঞ্চালন না করেও প্রাচীরে প্রলম্বিত একটি দর্পণে রোগীকে দেখা যায়। না ঘনশ্যাম, না মালতী, কেউই জানে না — রূপেন্দ্র এতক্ষণ প্রণয় করছিলেন মালতীকে কিন্তু লক্ষ্য করে চলেছেন সে প্রশ্নের কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তার পিছন দিকে উপবিষ্ট ঐ পাগলটার মুখে —দর্পণ প্রতিবিম্ব। এবারও দেখলেন ঘনশ্যাম না-য়ের ভঙ্গিতে গ্রীবা-সঞ্চালন করলেন। রূপেন্দ্র স্থিরসিদ্ধান্তে এলেন। বললেন, ঠিক আছে, মালতী, তুমি এবার যাও। কিন্তু তুমিও দেখ, কেউ যেন আড়ি না পাতে। তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য।

মালতী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শয়নকক্ষ থেকে নিষ্কান্ত হল। রূপেন্দ্র কবাটটি অর্গলবদ্ধ করে ঘনশ্যামের মুখোমুখি হলেন। ঘনশ্যাম নির্বিকার। রূপেন্দ্র উপবীতটিকে ব্যতিক্রম করে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিবদ্ধ হলেন। উদাম পাগলের অনুকরণে উদাম উলঙ্গ।

ঘনশ্যাম বসেছিলেন পদ্মাসনে। উনি বসলেন বদ্ধ-পদ্মাসনে। এক বদ্ধ পাগলের মুখোমুখি আর এক বদ্ধ পাগল!



আমরা মনে ভাবি : পাগলে যা খুশি তাই করতে পারে। তা কিন্তু পারে না সে। সঙ্গত কারণে সে হাসতে পারে না, নিদারুণ দুঃখজনক ঘটনায় বেচারি কঁাদতেও পারে না। বিষ্ময়কর ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখলে অবাক হবার অধিকার তার নেই। ঘনশ্যাম যেন পাগল, রূপেন্দ্র তো তা নয়। তিনি যখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ওঁর সামনে বসলেন পদ্মাসনের উপর টেকা দিয়ে বন্ধপদ্মাসনে, তখন ঘনশ্যাম বিস্ময়ে বিস্ময়িতনেত্র হতে পারলেন না। সামান্য নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন, কত্নম?

পাগল মানুষ তো — তাই শাদা-বাঙলায়, ‘তুমি কে?’ প্রশ্নটা মাথায় এল না।

কিন্তু রূপেন্দ্র যে আরও বড় জাতের পাগল! পাগলামির প্রতিযোগিতায় হার মানবেন কেন? বললেন : ‘যাজ্ঞবল্ক্যোহম’।

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ মেনে নিলেন। এমনটা তো হতেই পারে! ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এসে বন্ধপদ্মাসনে বসেছেন ওঁর সামনে। তাই বিশুদ্ধ বৈদিক ভাষার প্রশ্ন করলেন, ভো ভো যাজ্ঞবল্ক্য! এক্ষণে এই জটিল প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করহ। এই যে নভোলোকের উর্ধ্বস্থিত দ্যুলোক তাহারও উর্ধ্ব কী রহিয়াছে? এবং তৎসহ ইহাও কহ : এই যে অধস্ত পৃথিবী তাহার তলদেশে কী বর্তমান? অপিচ : এই যে নিরবলম্ব দ্যুলোক-ভুলোক তাহারও অভ্যন্তরে কোন ধারণশক্তি রহিয়াছে যাহাতে তাহার বিযুক্ত বা কক্ষচ্যুত হইতেছে না?

রূপেন্দ্র বললেন, শৃঙ্গস্থ সুপণ্ডিতা গাণী! দ্যুলোক-ভুলোক আদৌ নিরবলম্ব নহে। তাহারা একমেবাদ্বিতীয় সূত্রাত্ম্য গ্রথিত। অপিচ অবধান কর : সেই সূত্রতাই ব্রহ্ম।

ঘনশ্যাম ঘন ঘন মাথা নাড়লেন। মনে হল উত্তরটি তাঁর মনমতো হচ্ছে। তিনি আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পেলেন। রূপেন্দ্র একটি হস্তবাঁড়িয়ে দিয়ে বললেন, ক্ষান্ত হোন, সার্বভৌম। আপনি আর অতি-প্রশ্ন করবেন না। এর পরেও পাগলের ঢং ধরে বসে থাকলে আপনার মস্তকপাতন হবে।

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ পদ্মাসন পরিত্যাগ করে শবাসনে শয়িত হলেন।

রূপেন্দ্রও যোগাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। বজ্রতে প্রলম্বিত একটি গাত্রমার্জনী নিয়ে সার্বভৌমের কোলের উপর ফেলে দিলেন। নিজেও বস্ত্র পরিধান করতে করতে বললেন, এবার বলুন, এভাবে কেন পাগল সেজে বসে আছেন?

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

ঘনশ্যাম উঠে বসলেন। বস্ত্রখণ্ডটি কটিদেশে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, আপনি আমার অপরিচিত নন। আপনি যখন মাতুলশ্রীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতেন তখন আপনাকে দেখেছি...

রূপেন্দ্র বলেন, এটা আমার প্রশ্নের সদুত্তর হল না, সার্বভৌমমশাই।

—জানি। বলছি। তার পূর্বে বলুন, কেমন করে বুঝলেন যে, আমি উম্মাদের অভিনয় করছি মাত্র, উম্মাদ নই?

প্রাচীরে প্রলম্বিত দর্পণটিকে নির্দেশ করে রূপেন্দ্র বললেন, এ গৃহে প্রবেশমাত্র এটি আমার নজরে পড়েছিল। তাই এমন স্থানে মহড়া নিয়েছিলাম যেস্থান থেকে ঘাড় না ঘুরিয়েও পিছনে অবস্থিত আপনাকে লক্ষ্য করা যায়। আপনার স্ত্রীর নিকট পেশ করা প্রতিটি প্রশ্নে আপনার উপর কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা আমার নজর এড়ায়নি। শেষ প্রশ্নটিতে আপনি যে ঘাড় নেড়ে স্ত্রীকে নিষেধ করলেন তাও লক্ষ্য করেছি। এবার বলুন? কেন এমন পাগল সেজে আছেন?

ঘনশ্যাম প্রাচীরে প্রলম্বিত দর্পণটি লক্ষ্য করে মূদু হাসলেন। তারপর বললেন, বিচার্য বিষয়ের সংজ্ঞার্থ প্রথমে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। 'উম্মাদ'-এর সংজ্ঞা কী?

—যার চিন্তার পারস্পর্য নেই। নিজের মঙ্গল যে বোঝে না। যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে যে অশক্তি, সে : 'উম্মাদ'।

—এটাই যদি উম্মাদবস্থার সংজ্ঞা হয়, তাহলে স্বীকার করছি ভেষগাচার্য — আমি মাঝে-মাঝে উম্মাদ হয়ে যাই। কখনো দুই-তিন মাস, কখনো কয়েক বছর ঐ অবস্থায় থাকি। তখন যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নেওয়া তো দুবের কথা, নিদ্রা, মূত্রতাগ বা বিরেচন প্রভৃতি দেহকর্ম আমার নিয়ন্ত্রণানুসারে হয় না। আহা! স্পৃহা থাকে না। হয়তো দীর্ঘদিন ঐ অবস্থায় থাকি। তারপর কীভাবে জানি না — ঠিক যেমন মানুষের ঘুম ভাঙে, সুশুপ্তির অজ্ঞানবস্থা থেকে মানুষ জেগে ওঠে তেমনি নিজের অভিজ্ঞান ফিরে পাই। উম্মাদ অবস্থায় কী করেছি তা স্মরণে আনতে পারি না — কিন্তু প্রাণ্ডান্নাদনাবস্থায় বা অধ্যয়ন করেছি, যে জ্ঞান অর্জন করেছি তা সবই স্মরণে আনতে পারি। ঠিক যেমন ঘুম ভেঙে যাবার পর স্মরণাজ্যে কী কী করেছি তা কখনো আবছা মনে পড়ে, কখনো কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু পূর্বদিনের সবকথাই স্মরণ করা যায়। আমার অবস্থাও ঠিক সে রকম হয়।

—এঁরা বলছেন, সাময়িক অবস্থায় থাকেন পরবর্তী পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত। সেটা কি সত্য? ঘনশ্যাম বললেন, আপনার প্রশ্নটা আয়ুবুর্দ শাস্ত্রসম্মত কি না জানি না, ন্যায়শাস্ত্র সম্মত নয়।

—কেন?

—উপাধানের পার্শ্বে একটি বালু-ঘটিকা স্থাপন করলে আপনি কি পরদিন সকালে উঠে বলতে পারবেন ঠিক কয়টার সময় আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

রূপেন্দ্র বললেন, ঠিক কথা! না, পারব না! এমন অদ্ভুত রোগলক্ষণ আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। এটি সম্পূর্ণ মানসিক রোগ। দীর্ঘদিন আপনার সঙ্গে একত্র বসবাস করলে,

আপনার অন্তরের অন্দর-মহলের নির্জ্ঞান অঞ্চলে কী জটিলতা আছে তার হয়তো সন্ধান পাব। তখনই চিকিৎসার প্রশ্ন উঠবে। সে-ক্ষেত্রে আমাদের দুজনের মধ্যে বাধাবন্ধহীন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা প্রয়োজন। কেউ কারো কাছে কিছু গোপন করব না।

ঘনশ্যাম বললেন, তথ্যস্তু। তবে তার প্রথম পর্যায় এই মুহূর্তেই শুরু হতে পারে রূপেন্দ্র, যদি আমরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকি। ‘তুমি’-র নৈকট্যে সরে আসি।

রূপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত। বলেন, প্রথমে বল তো ঘনশ্যাম, তোমার মনে আছে প্রথমে কবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন?

ঘনশ্যাম বললেন, হ্যাঁ, আছে। আট বছর বয়সে। কী পারিপার্শ্বিক ঘটনায় মুহূর্তমধ্যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলাম সেটাও মনে আছে। কিন্তু তার পূর্বে বল : তুমি আমাদের সম্বন্ধে কতটা জান। এই যে আমাদের পরিবারের ধনৈশ্বর্য, এই প্রাসাদ, এই অনায়াস পরিশ্রমহীন ভোগের আয়োজন, এর মূলে কী আছে?

—কিছুটা শুনেছি।

—এই সব কিছুর বনিয়াদে আছে একটি মর্মান্তিক কুসংস্কার। বংশের আদিপুরুষ তাঁর একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে জীবন্ত দগ্ধ করে এই সম্পত্তি বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করার অধিকার লাভ করেছিলেন।

—হ্যাঁ, জানি। তার সঙ্গে তোমার এই মানোরোগের কী সম্পর্ক?

—সম্পর্ক অসঙ্গতি এবং অতি ঘনিষ্ঠ। তাহলে আমার জীবনকথা বিস্তারিত শুনতে হবে।

—তাই তো শুনতে চাইছি, বন্ধু। রোগের ইতিহাস না জানা থাকলে রোগীর চিকিৎসা সম্ভবপর নয়। বিশেষত মানোরোগ!

ঘনশ্যাম তখন তাঁর জীবন ইতিহাস বিস্তারিত জানাতে থাকেন।

আত্মতুষ্টি ঘরেই ঘনশ্যাম মাতৃহীন। তাঁর মনুষ্য করেন তাঁর মাসি আর পিতামহী। অতি শৈশবকাল থেকেই বংশের এই সন্তানটি প্রখর বুদ্ধিমান বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। মাত্র চার বছর বয়সেই জগন্নাথ তাঁর ভগিনীপতির কাছে তবিসাধাণী করেছিলেন — এ ছেলে জীবিত থাকলে ভারতজোড়া খ্যাতির অধিকারী হবে। নিতান্ত শিশুকালেই ঘনশ্যাম বুঝতে পেরেছিলেন — কীভাবে ওঁদের বংশের সমৃদ্ধি। জ্ঞানবুদ্ধি হবার বয়স তখনো হয়নি — মাত্র ছয় বৎসরের বালক — কিন্তু ক্ষণজন্মা পুরুষদের কীর্তি-কাহিনী এ রকমই হয়। একদিন ছয় বৎসরের শিশু তার পিতার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল ‘সতীদাহ’ প্রথা নিয়ে। শিশুর মতে — এটা একটা বর্বর ব্যবস্থা। গঙ্গাপ্রসাদ শিশুপুত্রকে ধমক দিয়ে খামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যা বুঝিস না, ইচ্ছে পাকার মতো তা নিয়ে কথা বলিস না। হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ তুই কী বুঝিস রে? সমস্ত ভারত-ভূখণ্ডে এই প্রথা প্রচলিত আছে, তা জানিস? বিনা হেতুতে?

ছয় বছরের বালক বলেছিল, সারা দেশের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের পরিবারে এই কুপ্রথাটি কেন আপনি এবং আপনার পিতা-পিতামহ বংশানুক্রমে জিইয়ে রেখেছেন? সেটা ধর্মের অঙ্গ বলে? না, নিজেদের স্মার্থ্যে?

কে বলবে ছয় বৎসর বয়সের বালকের কথা! কখনো উঠেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ : কেন?

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

—না হলে ‘সতীমায়ের’ সেবায়তী আমাদের বংশের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি পুরুষে এক-একটি বিধবাকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। আপনাদের এই জমিদারীর টাট বজায় রাখতে।

—কে? কে বলেছে তোকে এসব অবাস্তব কথা?

—কে বলেছেন, সেটা বড় কথা নয়, বাবামশাই। কথাটা যে মিথো নয় তা তো মানছেন? গঙ্গাপ্রসাদ গর্জে উঠেছিলেন, বেরিয়ে যা! দূর হ আমার সমুখ থেকে। তুই...তুই আমাদের বংশের কুলান্দার!

ঐ বালক বয়সেই পিতার সঙ্গে প্রথমে মতান্তর, পরে মনান্তর হয়ে যায়। ভাগিনেয়র এই সব দুর্বিনীত প্রশ্নের কথা শুনে স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপাষণন এসেছিলেন তাকে বোঝাতে। ফলে শুধু পিতা নয়, মাতুলের সঙ্গেও বাক্যলাপ বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় থেকেই উনি ঠাকুরমার আরও ন্যাওটা হয়ে পড়েন। বস্তুত মায়ের নিজের ছোট বোন, মাসিমা — যাঁকে শৈশবকাল থেকেই উনি ‘মা’ ডাকতেন — এবং ঐ বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে ঘিরেই ওঁর শৈশবকাল গড়ে ওঠে। মাসিমা অবশ্য সংসারের নানা কাজে সর্বদা ব্যস্ত। গৃহস্থামিনীর বিকল্প তিনি। কুলীন ব্রাহ্মণঘরের অরক্ষণীয়া অনুচা কন্যা। এসেছিলেন এ সংসারে বড়বোনের দেহান্তে তার ছেলেটিকে কোলে তুলে নিতে। আর বাপের সংসারে ফিরে যাওয়া হয়নি। তিনি সদা-ব্যস্ত। তাই ঘনশ্যামকে কাছে টেনে নিলেন তাঁর পিতামহী। তাঁরই কাছে মুখে-মুখে রামায়ণ-মহাভারতের নানান কাহিনী শুনেছেন। প্রব-নালক-নটিকেতার উপাখ্যান। বস্তুত অক্ষর-পরিচয় হবার পূর্বেই। পিতামহীর নিজেবও অক্ষরপরিচয় ছিল না। কিন্তু কথক ঠাকুরদের কলাগে সে-কালীন যাবতীয় বামুন-ঘরের বর্ষীয়সীর মতো পুরাণ-ভাগবতের নানান কাহিনী ছিল ঠাম্মার ঠোটুহ।

ঘনশ্যামের পিতামহ ছিলেন দীর্ঘদিনের শয্যাশায়ী রোগী। তাঁর সঙ্গে ঘনশ্যামের ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তবে মাঝেমাঝে তাঁর শিরের কাছে গিয়ে বসতেন। পাঞ্জার হাওয়া করতেন। তিনি ইঙ্গিত করলে গঙ্গাজল ঢেলে দিতেন বৃদ্ধের কণ্ঠনালীতে।

ঘনশ্যামের বয়স যখন আট তখন তাঁর পিতামহের দেহান্ত হল। ঠাকুরমা নাতিকে ছেড়ে সহমরণে যেতে চাননি। কিন্তু কেউ সেকথায় কর্ণপাত করেনি। ঘনশ্যাম বিদ্রোহ করলেন। প্রথমে পিতা ও মাতুলের চরণযুগলের উপর আছাড়ি-পিছাড়ি কাঠা : ‘বাবাগো! মামাগো! ঠাম্মাকে আপনারা পুড়িয়ে মারবেন না।’ অবোধ বালকের কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। তখন ঘনশ্যাম পিতামহের পরিত্যক্ত লাঠিগাছখানা কুড়িয়ে নিয়ে লড়াই করতে এগিয়ে এল। মাটির কলসী, ঘড়া, সরা, কাচের সেজবাতি চূর্ণ হয়ে গেল। ষষ্ঠীপ্রহরে পাঁচ-সাত জন জোয়ান মানুষ জড়িয়ে ধরল বালককে।

ঠাকুরদার নিষ্পন্দ দেহটা ওরা খাটিয়ায় তুলে দিল : বল হরি, হরি বোল!

তারপরেই একটা পাক্ষিতে সিদ্ধচর্চিত ও স্নানভক্ষরঞ্জিত এক পুরুষের বৃদ্ধা। তিনি চীৎকার করে কী-ধেন বলছেন, শোনা যাচ্ছে না। গ্রামবাসীদের কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে আর শতশত ধর্মিকের সমবেত পুকারে : ‘সতী মাইকী জয়া’

বালক ঘনশ্যাম সুকৌশলে খড়ো-চাল ঘরের বাঁশের বাতা আব উলুখড় ভেদ করে

বেরিয়ে এসেছিল রুদ্ধদার-কক্ষের বাহিরে। ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হয়েছিল শ্মশান ঘাটে। বৃদ্ধার সেই মর্মান্তিক সহমরণ প্রত্যক্ষ করেছিল আড়াল থেকে। সহসা বৃদ্ধান্তরাল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে — বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ছুটে যায় জ্বলন্ত চিতার দিকে। বৃদ্ধার তখনো জ্ঞান ছিল। চিৎকার করে উঠেছিলেন : পাগলা, এখানে আসিসনি। পুড়ে মরবি!

তিন-চারজনে ওঁকে চেপে ধরে; কিন্তু তার পূর্বেই বিগ্রীভাবে ওঁর হাত-পা পুড়ে যায়। উনি অজ্ঞান হয়ে যান। পুরোপুরি তিন দিন অজ্ঞান অচেতন্য অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকেন। তারপর যখন উঠে বসলেন তখন বালক ঘনশ্যাম ঘোর উন্মাদ।

সেই তাঁর প্রথম আক্রমণ।

সেবার যে কতদিন ঐ অবস্থায় ছিলেন কেউ তার হিসাব রাখেনি। উন্মাদ, কিন্তু কোনও উপদ্রব নেই। আপন মনে বসে থাকে। খেতে দিলে খায়, না দিলে খায় না। ঠাঙ্গা নেই, মাসিমা সংসারের পঞ্চাশটা কাজের সঙ্গে আঁটেপুটে বাঁধা। বালক ঘনশ্যামকে সেবা-যত্ন করত প্রতিবেশিনীর একটি অনুচা কন্যা। বয়সে সে ঘনশ্যামের চেয়ে মাত্র দু-বছরের ছোট। প্রতিবেশী বিপ্লবের ঘোষালের আত্মজা। বিপ্লবেরও ব্রাহ্মণ, তবে কুলীন নন, শ্রোত্রীয়। উন্মাদ ঘনশ্যামের কাছে যেতে অনেকেই ভয় পায়, সুভা পায় না। সুভা যে ওর খেলার সাথী নিতান্ত শৈশবকাল থেকে। মেয়েটির ডাক নাম সুভা — ‘সুভাষিণী’ নামের অপভ্রংশ। নিদারুণ দুঃখের কথাটা এই : বিপ্লবের যখন কন্যার নামকরণ করেন তখনো বালিকার বোল ফোটেনি। তাই পরে ঘোষালমশাই প্রণিধান করেছিলেন বিশনিয়ন্তা কী নিষ্ঠুর কৌতুক করেছেন তাঁকে নিয়ে। বোল ফোটার বয়স হলে দেখা গেল : সুভাষিণী মুক ও বধির।

সে ছিল ঘনশ্যামের শৈশবের নির্বাক খেলার সাথী, উন্মত্তাবস্থায় নীরব সেবাত্রতী।

কবে জ্ঞান ফিরে এল মনে নেই; তবে এটুকু মনে আছে যে, জাগতিক সব কিছুর উপরেই তাঁর তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মেছে। পিতা, মাতা, মাতুল, সহাধ্যায়ী — কারও সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না, বন্ধুত্ব তো নয়ই। একমাত্র ব্যতিক্রম ঐ অসহায় মুক মেয়েটি। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নে অস্বীকৃত হওয়ায় গঙ্গাপ্রসাদ বালককে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বাণেশ্বর বিদ্যাবিনোদের চতুষ্পাঠীতে। ঘনশ্যাম দিবারাত্র অকুণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতেন পুঁথির জগতে। ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, বউদর্শন, ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করলেন সবকিছুই। চতুষ্পাঠীতে সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে বিশেষ বাক্যালাপ করতেন না, বাড়িতেও কারও সঙ্গে কথাবার্তা নেই। একমাত্র ঐ মুক-বধির শুভাকে দেখলেই উনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। চতুষ্পাঠী ও টোলার শেষ পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হলেন তখন ঘনশ্যামের বয়স অষ্টাদশ। সুভা তখন ষোড়শী। এ বাড়ি যাওয়াত তার বন্ধ হয়ে গেছে। হোক পাশের বাড়ি। তবু খরজিছু প্রতিবেশিনীদের বাক্যবাহ থেকে রক্ষা করতে ওর মা বোবা মেয়েটাকে আগলে রাখতেন।

এই সময় ঘনশ্যাম তাঁর মামিমার কাছে সংবাদ পেলেন যে, গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করছেন। মাতুলশ্রী জগন্নাথের সঙ্গে এ বিষয়ে পিতৃদেবকে দু-একবার ঘনিষ্ঠ আলোচনা করতে শুনলেন।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

ঘনশ্যাম সোজা কথার মানুষ — ওঁদের সেই গোপন আলোচনা সভায় একদিন অযাচিত উপস্থিত হয়ে দুজনকে প্রণাম করে বললেন, মামিমার কাছে শুনলাম আপনারা নাকি আমার বিবাহের আয়োজন করছেন। সে বিষয়ে দু-একটি কথা নিবেদন করতে এলাম। আপনারা অনুমতি দিলে...

গঙ্গাপ্রসাদ গর্জে ওঠেন, এমন দুবিনীত, নির্লজ্জ কখনো দেখিনি। নিজের বিবাহ-সংক্রান্ত কথাবার্তা নিজেই বলতে এসেছ তুমি। লজ্জা হল না! যাও! অনুমতি দিলাম না!

তর্কপঞ্চনন ওঁকে থামিয়ে দিলেন; আহা হা! মাথা গরম করছে কেন গঙ্গা? এ কি মাথা-গরম করার বিষয়, না সময়?... হ্যাঁ, বল ঘনশ্যাম, তোমার বিবাহ সম্বন্ধে কী বলতে এসেছ?

—আমি বলছিলাম যে, আমি তো ঠিক স্বাভাবিক নই। মাঝে-মাঝে উন্মাদ হয়ে যাই। এ-ক্ষেত্রে একটি অনুচা কন্যার ভাগ্য কি আমার ভাগ্যের সঙ্গে বিজড়িত করা উচিত?

জগন্নাথ বললেন, তুমি বুদ্ধিমানের মতোই কথাটা বলেছ, ঘনশ্যাম। তোমার অস্বাভাবিকত্বের বার্তাটা আমরা কন্যার পিতার কাছে গোপন করব না। তিনি যদি সব জেনে-বুকেই কন্যা সম্প্রদান করেন তাহলে আপত্তির কথা ওঠে না।

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বলেছিলেন, ওঠে বইকি, মতুলশ্রী! পাগলের ঘর করতে তো পাত্রীর অভিভাবক আসবেন না। আর মেয়েটির মতামত গ্রহণের কথা নিশ্চয় আপনাদের পরিকল্পনায় নেই, তাই না?

গঙ্গাপ্রসাদ রুখে উঠে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে আবার থামিয়ে দিয়ে জগন্নাথ বলেন, তুমি চুপ করে থাক গঙ্গা, কথাবার্তা আমাকেই বলতে দাও।... হ্যাঁ, তাহলে তোমার কী সিদ্ধান্ত, বাবা ঘনশ্যাম? চিরকুমার থাকা? ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা? সন্ন্যাস নেওয়া?

—আজ্ঞে না। তেমন কোন সিদ্ধান্ত এখনো করিনি। আমি বরং চাইছি এমন একটি পাত্রীকে আপনারা নির্বাচন করুন যে, এই পাগল মানুষটাকে সেবায়ত্ত করতে স্বেচ্ছায় স্নীকৃত!

গঙ্গাপ্রসাদ আর স্থির থাকতে পারেন না। বলেন, সেটা কীভাবে হবে? গাঁয়ে গাঁয়ে মেউড় দিতে হবে বোধকরি : ওগো তোমাদের গাঁয়ে কোন আধাপাগলী পাত্রী কি আছে, যে আমার পুরোপাগল ছেলেটিকে বিবাহ করবে?

ঘনশ্যাম প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই গর্জে উঠলেন তর্কপঞ্চনন। গঙ্গা! তুমি ওঠো। ভিতর বাড়িতে যাও! যা—ও!

গঙ্গাপ্রসাদ এ কর্তৃত্বকে চেনেন। গোটা জীবনী চেনে। মাথা নিচু করে তিনি ভিতর বাড়িতে চলে যান। জগন্নাথ অন্দরের দিকের কবাটটা রুদ্ধ করে দিয়ে ফিরে এলেন। নিজ আসনে বসে শান্তস্বরে বললেন, বেশ তো ঘনশ্যাম। এ উত্তম প্রস্তাব। কন্যা যদি স্বেচ্ছায় এ রকম রোগাক্রান্ত স্বামীকে বরণ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে আমরা আপত্তি করব কেন? এমন কোন পাত্রীর সম্ভান কি তোমার জানা আছে?

ঘনশ্যাম বলছিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘোষালখুঁড়োর একমাত্র কন্যা সুভা : সুভাষিণী।

জগন্নাথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, কী বলছ ঘনশ্যাম। বিশ্বস্তর ঘোষালের কন্যাটি

তো মুক এবং বধির। না, না, না। এ বিবাহ সম্ভবপর নয়। তাছাড়া বিশ্বজ্ঞর কুলীন নয়, শ্রোত্রীয়। কুলীন পাত্র যদি শ্রোত্রীয় ঘরের কন্যাকে বিবাহ করে তাহলে কুলীনঘরের অবক্ষণীয়দের গতি হবে কী? কৌলীন্যপ্রথা তো ক্রমে ক্রমে ভেঙে যাবে!

ঘনশ্যাম বলেছিলেন, মামা! আপনাকে এ-কথার প্রত্যুত্তরে যে-কথা জানাব তা আমার মতুলকেই শুধু বলছি না আমি, বলছি গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণ্য-সমাজের অন্যতম স্তম্ভকে। আপনি বিবেচনা করে দেখুন, সুভা, অর্থাৎ সুভাষিনী মুক-বধির হওয়ার জন্যই হয়তো আজীবন উপেক্ষিতা অনুভব হয়ে থাকবে। তার বিবাহ হবে না। এদিকে আমিও সুভার মতো একদিক থেকে পঙ্গু — আমার মানসিক ভারসাম্য মাঝে-মাঝে হারিয়ে যায়। আমরা দুজনে আংশিকভাবে পঙ্গু। কিন্তু হয়তো যৌথভাবে নয়। স্বকল্পিত খণ্ড সহধর্মিণীর নির্দেশে অন্ধমানুষ সংসারে উপলব্ধির পথ অতিক্রম করতে পারে। আমাদের দু-জনের এ রাজঘোঁটকে কেন বাধা দিচ্ছেন আপনারা? আর কৌলীন্যপ্রথা? আমি তো অন্তর থেকে বিশ্বাস করি এই বর্বরপ্রথা বিলুপ্ত হলেই হিন্দু-সমাজের, ব্রাহ্মণ্যসমাজের মঙ্গল। গৌড়মণ্ডলের অন্যতম সমাজপতি হিসাবে আপনি কি তা উপলব্ধি করেন না?

জগন্নাথ গভীর হয়ে বলেছিলেন, কৌলীন্যপ্রথা বা গোটা ব্রাহ্মণ্যসমাজের ভালমন্দ বিষয়ে আলোচনা আমি তোমার সঙ্গে করতে বসিনি, ঘনশ্যাম। আমরা তোমার বিবাহের প্রস্তাব আলোচনা করছিলাম। আমাদের বংশে এবং তোমাদের বংশেও কেউ কোনদিন স্মরণ পাত্রী নির্বাচন করেনি। পিতৃস্থানীয়দের নির্বাচন আবহমান কাল ধরে মেনে এসেছে। দ্বিতীয়ত, না আমাদের বংশে, না তোমাদের বংশে — কেউ কখনো কোন মুকবধির কন্যাকে সম্মানে গৃহবধু করে আনেনি।

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না মামাশ্রী। আপনার বক্তব্যটি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নয়। ‘কেউ কোনদিন করেনি’ এটা কোনও যুক্তি নয়। আমাদের বংশে কেউ কোনদিন গৌড়মণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে ইতিপূর্বে স্বীকৃতি গ্রহণ করেননি। ‘কেউ কোনদিন করেনি’ যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে আপনি তা করেছেন। তাতে ক্ষতি তো, কিছু হয়নি। আমরা গর্বিত হয়েছি। ঠিক তেমনি একটি মুক-বধির কিশোরীর নারীত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে না হয় আমিই প্রথম ব্যতিক্রম হলাম। স্ত্রীর মুকবধিরত্বের জন্য অসুবিধা যখন আমি দেখছি। সহ্য করতে রাজি, তখন আপনাদের অনুমতি দিতে বাধা কোথায়?

ঘনশ্যাম জানেন না প্রকৃত বাধাটা কোথায় ছিল। মাসিমা সম্মত হয়েছিলেন : আহা। আবাগিটা খোঁকাকে সত্যিই প্রাণ ঢেলে ভালবাসে।

গঙ্গাও শেষপর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছিলেন, ছেলোটা পাগল। যা হয় করুক।

কিন্তু সম্মত হতে পারেননি জগন্নাথ তর্কপন্থনন। ঘনশ্যামের মনে হল — জগন্নাথ এটাকে ভাগিনেয়র নিকট পরাজয় বলে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত।

অচিরেই এক অন্তর্জলী-যাত্রী বিপত্রীক বৃদ্ধের সঙ্গে সুভাষিনীর বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের এক সপ্তাহের মধ্যেই বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠলোকে যাত্রা করলেন। সুভাষিনী গেল সহমরণে। এমন “সতী” কেউ কোনদিন দেখেছ! লেখিতান আশিষিখার আবেষ্টনীতে মুকবধির মেয়েটি

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

আর্তনাদ করেনি একটুও।

এবারও সেই সহমরণ রুখতে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ছুটে গিয়েছিলেন ঘনশ্যাম। ফিরে এলেন পুনরায় বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায়, পালকিবাহকদের কাঁধে চেপে।

অষ্টাদশ থেকে চতুর্বিংশতি—দীর্ঘ ছয় বৎসর উনি উন্মাদ হয়ে গৃহবন্দি অবস্থায় পড়েছিলেন। এবার কী করে ওঁর অভিজ্ঞান ফিরে এল তা মনে নেই; কিন্তু ক্রমে ক্রমে ওঁর দৃষ্টি হল স্বচ্ছ। আশপাশে যেসব কথাবার্তা কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে তার অর্থ বুঝতে পারছেন। ঐ সময়ে লক্ষ্য করেন; একটি সুন্দরী যুবতী মহিলা অনায়াসভঙ্গিতে ওঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করছেন, নানান জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছেন, আবার বেরিয়েও যাচ্ছেন। মেয়েটির বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হবে — ওঁদের আত্মীয়-স্বজন নিশ্চয় নয়, তাহলে চিনতে পারতেন। মহিলা সধবা, মাথায় আবক্ষ অবগুণ্ঠন; কিন্তু ঘনশ্যামের নির্জন শয়নকক্ষে এসে মাঝে-মাঝে মাথার ঘোমটা ফেলেও দিচ্ছেন। তখনি নজরে পড়ছে — ওঁর সিঁথিতে সিঁদূর, নাকে নোলক, কপালে কুমকুমের টিপ্ আর মুখে শ্বেতীর বিশ্রি দাগ। কথা বলছেন না, কিন্তু মাঝে-মাঝে ওঁর দিকে তাকিয়ে মৃদুমৃদু হাসছেন। সন্কার পর একবার পাথরের বাটিতে কী-একটা পানীয় নিয়ে এসে ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, খাও।

ঘনশ্যাম একটু অবাক হলেন। অপরিচিতা যুবতী মহিলাটির ‘তুমি’ সম্বোধনে। পানীয়টি গ্রহণ করলেন। কপিত্ত সুরভিত তরু। পানান্তে ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মেয়েটি খিলখিল করে কিছুক্ষণ হাসল। হাসির দমকে সে পালঙ্কে লুটিয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ পালঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে রুদ্ধদ্বারের অর্গল মোচন করে বেরিয়ে গেল বাইরে। ফিরে এল পরক্ষণেই। তার ক্রোড়ে একটি নিদ্রিত শিশু। বৎসরখানেক বয়স। পুত্রসন্তান। দেখ-না-দেখ শিশুটিকে ওঁর কোলে নামিয়ে দিয়ে বললে, এটি তোমার পুত্র, নাম ‘বলভদ্র’। এখন বুঝতে পারছ আমি কে? হুঁশ ফিরেছে?

দুরন্ত বিস্ময়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন ঘনশ্যাম। ডাকলেন : মা!

মাসিমা বোধকরি রান্নাঘরে ছিলেন। নিদারুণ চমকে উঠলেন। এ কণ্ঠস্বর তো ভুল হবার নয়। ছুটে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে, কী বাবা?

মাসিমা দেখছিলেন, ঘনশ্যাম দাঁড়িয়ে আছেন অন্দরমহলের বারান্দায়, একটা কাজকরা খাম্বিরার পাশে। দেখছিলেন ঘনশ্যামের ধৃতি মাটিতে লুটছে না, তার চোখে আর সেই পাগলের ঘোলাটে দৃষ্টি নেই। ছেলে ওঁর ভাল হয়ে গেছে।

ঘনশ্যামও দেখছিলেন, মাসিমা দাঁড়িয়ে আছেন পাকঘরের সমুখে। তাঁর পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা-খাড়ু, মাথায় ঘোমটা আর সিঁথিতে সিঁদূর।

বিমাতা বারান্দার ও-প্রান্ত থেকে ছুটে এসে বললেন, খোকা! তুই ভাল হয়ে গেছিস? চিনতে পারছিস আমাকে?

ঘনশ্যাম ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন জিজ্ঞেস করতে যে, ঘরে ঐ মহিলাটি কে, শিশুটি কার সন্তান। কিন্তু সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হল না। বললেন : মা! তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? বাবার সঙ্গেই তো?

ঘরের ভিতর থেকে ভেসে এল যুবতী নারীর খিলখিল হাসি আর শিশুর কান্না!

ক্রমে ব্বালেন। তীক্ষ্ণধী ঘনশ্যাম তিল-তিল করে প্রণিধান করলেন পরিস্থিতিটা। তাঁর দীর্ঘদিনের বিস্মরণকালের মধ্যে কী কী ঘটেছে!

ঘনশ্যামের পিতা ইতিমধ্যে বিবাহ করেছেন তাঁর গর্ভধারিণীর অনুজাকে। এবং মাতুলশ্রীর ব্যবস্থাপনায় উন্মাদ অবস্থাতেই তিনি নিজে বিবাহ করেছেন জগন্নাথের এক ধনী যজমানের একমাত্র কন্যাটিকে। বলভদ্রজননীকে। ক্রমে সকলকেই চিনলেন। বলভদ্রের গর্ভধারিণী সুভদ্রাকে, শশুর-শাশুড়িকে, মায় বলভদ্রকেও। নিজের সন্তান! না চিনবেন কেন? শুধু একটা সমস্যার সমাধান হল না : সুভদ্রার পিতা হাবীকেশ রায়চৌধুরী প্রচুর সম্পত্তির মালিক — জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের একজন প্রধান শিষ্য! কুলীন তিনি; কিন্তু সব জেনে বুঝে কেন তিনি এমন উন্মাদকে জামাই করলেন?



ঘনশ্যামের সুদীর্ঘ রোগ-ইতিহাস শুনে রূপেন্দ্রনাথ বললেন, ভাই ঘনশ্যাম, তোমার সমস্যার অনেক কিছু বুঝছি, অনেক কিছু বুঝিনি। তাতে ক্ষতি নেই। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমাকে আমার সঙ্গে সোএগই যেতে হবে। তোমাকে থাকতে হবে আমার চোখের সম্মুখে। তাছাড়া তোমার মতো দুর্লভ প্রতিভা তো এখানে পড়ে নষ্ট হতে পারে না। তুমি সর্বান্তঃকরণে আমার কর্মযজ্ঞে বাঁপিয়ে পড় — দেখবে উন্মাদ হবার অবকাশই পাবে না।

ঘনশ্যাম হাসতে হাসতে বলেন, সোএগই গ্রামে তুমি কী জাতির কর্মযজ্ঞ শুরু করতে চাও? চতুষ্পাঠী, টোল, না মন্দির-টন্দির ঘিরে আশ্রম?

—তিনটের একটাও নয়। শোন বলি—

ওঁর যা জীবনের লক্ষ্য, যে সাধনা তা বললেন — কী কারণে হিন্দু সমাজ ক্রমবর্ধনতির অতলান্ত গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। তার দুটি হেতু। এক: দেশবাসীর সুবৃহৎ অংশকে ব্রাহ্মণসমাজপতির দূরে সরিয়ে রেখেছে। জল-অচল, অচ্ছুৎ আত্মা দিয়ে। দুই: সমাজের অর্ধাংশ — নারী জাতিকে — যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। স্বাধীনতার কোন ব্যবস্থা সারা দেশে কোথাও নেই। এ ছাড়া আছে নানান জাতির কুসংস্কার, সর্বপ্রধান : সতীদাহ। তারপর কৌলীন্য প্রথা — কুলীনদের বিশ-পঞ্চাশ-শতাধিক বিবাহ মেনে নিচ্ছে সমাজ। অভ্যন্তরভাগে এখনো বহু কালীমন্দিরে নরবলি হয়। প্রকাশ্যে মান্তি করে সন্তান বিসর্জন দেয় বন্ধা নারী, গঙ্গার জলে! যারা সমাজপতি হয়ে এসব কুপ্রথা রদ করতে পারতেন, তাঁরা আশ্চর্যভাবে নীরব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সতীদাহ ও গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী, গৌরীদান

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

প্রথার সপক্ষে। তিনি শুধু সংস্কৃত চতুষ্পাঠী খুলে যাচ্ছেন একের পর এক। বর্ধমান মহারাজও একই পথের পথিক। এমন কি নাটোরের মহারানীর মতো বিদুষীও এ বিষয়ে উদাসীন। একের-পর-এক মন্দির গড়ে যাওয়ার মধ্যেই তিনি ধর্মসেবার পরমার্থ খুঁজে পেয়েছেন। সকলেই গড়লিকাপ্রবাহে স্বর্গে দন্মুন্নি বাজানোর আয়োজনে ব্যস্ত।

রূপেন্দ্র বললেন, সো-এই ফিরে যাচ্ছি আমি। সেখানে আমার প্রথম কাজ হবে গৌরমণ্ডলে এই সহস্রাব্দিতে প্রথম নারী পাঠশালার উদ্বোধন। যেখানে ছাত্র থাকবে না, থাকবে শুধু ছাত্রী। আমার প্রস্তাব : এখানকার সব কিছু বলভদ্রকে লিখে দিয়ে তোমরা দুজন আমার সঙ্গে চল। আমি বিপত্নীক, আমার ভিটায় স্ত্রীলোক নেই। তোমরা দুজন যদি বালিকাদের সারস্বত সাধনায় সহায়তা কর...

ঘনশ্যাম বাধা দিয়ে বললেন, ছিবচন নয়, বয়স্য, একবচন। তোমার বৌঠান সাক্ষর নন। তা হোক তিনি তোমাকে অন্য নানাভাবে সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু প্রথমে, বল, এতগুলি সমস্যার মধ্যে ক্রীশিক্ষার ব্যবস্থাপনাটাই কেন প্রথম কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে চাইছ?

রূপেন্দ্র জানালেন, কাশীধামের পরপারে ব্যাসকাশীতে তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এক ত্রিকালজ মহাযোগীর : ত্রৈলোক্যমী। সেই অলৌকিক-ক্ষমতাসম্পন্ন মহর্ষির কাছ থেকে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছেন : গৌরমণ্ডলে ক্রীশিক্ষা প্রবর্তনের মধ্যেই তাঁর সাধনার সূচনা হওয়া উচিত। রূপমঞ্জরীকে বেদাশ্রয়ী করে তোলা।

যে যুক্তির কোন অর্থ খুঁজে পাননি ভবতারণ গাঙ্গুলী, নদীয়ার বিদুষী রাজমহিষী, কাশীর শঙ্করাচার্য, এমনকি ফুরধারবুদ্ধি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, সে যুক্তি বিনা তর্কে, বিনা ব্যাখ্যায় সর্বস্বত্বের প্রাধান্য করলেন ঘনশ্যাম সার্বভৌম। বললেন, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, বন্ধু। কিন্তু বিশেষ হেতুতে আমি তোমার সহযোগী হিসাবে এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারছি না। মালতী হয়তো পারবেন — যদি তিনি স্বীকৃত হন, যদি তুমি তাঁকে স্বীকার করে আশ্রয় দাও।

রূপেন্দ্র বলেন, কী বলছ পাগলের মতো। তুমি না গেলে তিনি কেমন করে যাবেন?

সার্বভৌম বলেন, পাগল মানুষ তো! পাগলের মতো কথাই বলব ভাই! আচ্ছা সেসব কথা পরে আলোচনা করা যাবে, আপাতত এস, আমরা আলোচনা করি : স্ত্রীজাতিয়ার বিদ্যায়তনে কী ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে?

রূপেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলেন, একই ধরনের। সারা দেশে শত শত চতুষ্পাঠীতে ছাত্ররা যা-যা শেখে — এমনকি বৈদিক শাস্ত্র — মেয়েরাও ঠিক তাই তাই শিখবে। কোন প্রভেদ থাকবে না। আমার মতে পুরুষ-স্ত্রীর অধিকার ও স্বাধীনতা (অভিন্ন) কোনও পার্থক্য থাকবে না।

ঘনশ্যাম বললেন, উত্তেজিত হয়ে না, বন্ধু! সামাজিক অধিকার নিয়ে আমি এ তর্ক করছি না; কিন্তু এ-কথা তো মানবে যে, স্ট্রিকচার বিধানে পুরুষ ও স্ত্রী কখনই সমান নয়? তাদের ক্ষমতা, তাদের অধিকার, সমাজে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমান নয়?

রূপেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি তা মানি না! এ-সমস্তুই পুরুষশাসিত সমাজ-অধিপতিদের একদর্শী চিন্তাধারার প্রতিফলন।

—না, রূপেন্দ্র, জীজাতীয়ার গর্ভধারণের ক্ষমতা আছে, সন্তান প্রসবের ক্ষমতা আছে। পুরুষের নেই। কিন্তু প্রমীলারাজ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হতে পারে না, যতক্ষণ না সে-রাজ্যে পুরুষের পদার্পণ ঘটে।

রূপেন্দ্র বললেন, সে তো দৈহিক পার্থক্য। জৈবিক হেতুতে।

—মানলাম! তা থেকেই ‘গুণকমিভাগ’ হয়েছে। প্রতিটি সংসারে। পুরুষ উপার্জনে সক্ষম হবার প্রয়োজনে নানান শিক্ষা গ্রহণ করে — কামারের ছেলে হাতুড়ি চালানো শেখে, সূত্রধরের ছেলে শেখে করাত চালাতে, তন্তুবায়ে পুত্র তাঁত চালাতে। কোনও শাঁখারির মেয়ে যদি শাঁখা কাটে, বা কোন তাঁতীর বৌ যদি তাঁত চালায় তাহলে বুঝতে হবে সে কর্তব্যের বেশি করছে; ঠিক যেমন চাষীভাই মাঠ থেকে ফিরে এসে যদি বলে, কই দুধের বাটি আর কিনুকটা দাও খোকনকে আমিই খাইয়ে দিচ্ছি। তাই পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয়ার পাঠশালায় একই বিষয়ে শিখবে না। শুধুমাত্র ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, আর দর্শন নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের চলবে না, রূপেন। বিজয়সিংহের মধুকর, সপ্তডিঙা, ময়ূরপঙ্কজী হারিয়ে গেছে — সমুদ্র জয় করে হাজার হাজার যোজন দূর থেকে যারা এদেশে বাণিজ্য করছে সেইসব পর্তুগীজ, দিনেমার, ইংরেজ শিক্ষিত; কিন্তু তারা ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় পড়েনি। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য হল: আগামীযুগে গৌড়মণ্ডলকে উন্নততর করতে হলে পুরুষ ও স্ত্রী-জাতীয়া বাঙালির পাঠক্রম ভিন্ন ধরনের হবে। স্ত্রীলোকের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে এ নিয়ে তোমাকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। মেয়েরা শিখবে ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, গার্হস্থ্যবিধির স্বাস্থ্যসম্মত বিধান ইত্যাদি... শুধু তর্ক, ন্যায়, নব্যন্যায় নয়।

রূপেন্দ্র বললেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ-ভাবে তো ভাবিনি কোনদিন। তুমি আমার জীবনে এত দেরি করে কেন এলে, ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম সহাস্যে বলেন, ফুলশেষের রাত্রে এ প্রশ্নের জবাবে নববধূ বলে, আজকের এই মিলনমধুর রাত্রিটি সার্থক হবে বলে।

রূপেন্দ্র বন্ধুর দুটি হাত সাগ্রহে নিজ করমুষ্টিতে গ্রহণ করে বললেন, কথা দাও, আমার সঙ্গে সোএগ্রাই যাবে। আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে?

ঘনশ্যাম হঠাৎ কী-জানি কেন স্নান হাসলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, কাল তোমার এ-প্রশ্নের জবাব দেব। একটা রাত আমাকে একটু ভাবতে দাও। কিন্তু আমারও একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ আছে, বন্ধু: কথা দাও! আমি যদি কোনও অনিবার্য কারণে তোমার আশ্রম নির্মাণের কাজে যোগ দিতে না পারি, তাহলে তুমি তোমার ঐ বৌঠানকে এই ‘সুতী-মা’ গাঁ থেকে নিয়ে যাবে? তোমার আশ্রমে ঠাই দেবে?

—সে কী! তুমি যদি পুনরায় তোমার অভিজ্ঞান হারিয়ে ফেল, যদি উন্মাদ হয়ে যাও, তখন তাঁর উপস্থিতিটাই যে সবচেয়ে প্রয়োজন হবে তোমার...

—না। উন্মাদ নয়, ধর আমি যদি সন্মাস নিই, অথবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে আমার যদি আকস্মিক মৃত্যু হয়, তাহলে কথা দাও বলভদ্রের ঐ কারাগারে ওকে রেখে যাবে না?

ভূকৃষ্ণন হল রূপেন্দ্রের। বললেন, আমরা দু-জনেই পরস্পরের কাছে প্রতিক্রমত যে,

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

কোন কিছু গোপন রাখব না...

—ঠিক কথা। কিন্তু আমরা দুজনেই বিবাহিত। স্ত্রীর গোপন কথা তো বন্ধকেও বলা যায় না।

—ঠিক আছে। তাহলে তোমার ঐ প্রশ্নটির প্রত্যুত্তরও মূলতঃই থাক। তুমি সন্ধ্যাস গ্রহণ করলে বৌঠানের দায়িত্ব আমি নেব কি নেব না।

ঘনশ্যাম বললেন, তাহলে আজ রাত্রিটা তুমি এখানেই বিশ্রাম নিয়ে যাও। এস আমরা তোমার ঐ স্ত্রীশিক্ষার পরিকল্পনাটা আজকেই মোটামুটি ছকে ফেলি। কী হবে ওদের পাঠক্রম? ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণদের পাঠক্রম কি একই জাতির হবে? ওরা কি একই সঙ্গে পড়তে বসবে, না কি একই পাঠশালায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে? স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করছি শুনলেই গোঁড়া বামনেরা তেড়ে আসবে, বাধা দেবে, তার উপর কি একই সঙ্গে জাতের বাধা দূর করার প্রচেষ্টা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে? সব কথাই আলোচনা করি। কে বলতে পারে — আগামী কাল এসব আলোচনা করার মতো মানসিক স্ফূর্তি হয়তো আমার থাকবে না।

দুই-বন্ধু নানান বিষয়ে আলোচনা করলেন। সতীদাহ প্রথা থেকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, তা থেকে ক্রমে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন। ওঁরা জানতেও পারলেন না অজাত রামমোহন-মদনমোহন তর্কালঙ্কার-বিদ্যাসাগর-ডেভিড হেয়ারের জীবনব্যাপী সাধনার অঙ্কুরোদগম হতে থাকে ওঁদের দুজনের মস্তিষ্কের রক্তে রক্তে। নৈশ আহ্বারান্তেও দুই বন্ধু উঠে গেলেন ছাদে। সূর্য এখন মেঘরাশিতে। প্রায় মধ্যরাত্রে — যখন খ-মধ্যবিন্দুর দিকে হাত বাড়িয়েছে বৃশ্চিকরাশির অনন্ত জিজ্ঞাসা — তখন দুজনে নেমে এলেন নিচে। ঘনশ্যাম বন্ধুকে পৌঁছে দিলেন নিচের বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে একটি চৌকিতে মশারি পাতা। ঘনশ্যাম দেখে নিলেন শয্যাপার্শ্বে পানীয় জল ও ঘটি আছে কি না, চিনি দিয়ে দিলেন শৌচাগারের দিকে যাবার গলিপথ, তারপর প্রদীপে তৈলের পরিমাণ লক্ষ্য করে সেটিকে এমনস্থানে স্থাপন করলেন যাতে শায়িত রূপেন্দ্রের চোখে আলো না লাগে।

রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ছোট বৌঠান কোথায়?

—সারাদিন পরিশ্রম করে, এতক্ষণে বোধহয় ঘুমিয়ে কাদা। এবার তুমিও শুয়ে পড় বন্ধু!

—আর তুমি?

—আমার এখনো কিছু কাজ বাকি আছে। যাই, তাহলে?

রূপেন্দ্র বললেন, 'যাই' বলতে নেই, বল, 'আমি'!

হঠাৎ কী যেন হল। ঘনশ্যাম সার্বভৌম নিজস্ব ভাবাবেগে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন রূপেন্দ্রকে। পরক্ষণেই আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বিম্মিত রূপেন্দ্রনাথ এর কোনও কার্য-কারণ সূত্র খুঁজে গেলেন না।



ঘুমটা ভেঙে গেল কোলাহলে।

শয্যাভ্যাগমাত্র সচরাচর ইষ্ট-স্মরণ করেন রূপেন্দ্র। আজ ভুল হয়ে গেল তাঁর। মনে হল, দ্বিতল থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল।

সূর্য ওঠেনি, কিন্তু আলো ফুটেছে। বাসিমুখে জল দেওয়াও হল না। দ্রুতপদে রূপেন্দ্রনাথ উঠে এলেন দ্বিতলে। ঘনশ্যামের গৃহের সম্মুখে একটা জটলা। কক্ষের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ক্রন্দনধ্বনি। এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

নিদারুণ দুঃসংবাদ। গৃহস্থানী উদবন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁকে সদ্য উদবন্ধন দশা থেকে মুক্ত করে পালঙ্কে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশেই মুর্ছিতা হয়ে পড়ে আছে মালতী।

রূপেন্দ্র ভিড় সরিয়ে এগিয়ে এলেন। ঘনশ্যামকে পরীক্ষা করার কিছু নেই। দেখেই বোঝা যায় মেরুদণ্ডের সঙ্গে তাঁর মস্তকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন — তিনি মৃত। মালতীর হাতটি তুলে নিয়ে মণিবন্ধে নাড়ির গতি লক্ষ্য করলেন। সে মূর্ছাগতামাত্র। হাতটি তুলে ধরার সময় লক্ষ্য হল ওর মুঠিতে কয়েকটি ভূর্জপত্র। পৃথির পৃষ্ঠা। সাবধানে সেটি খুলে নিয়ে অঙ্গরাখার পকেটে রেখে দিলেন। কক্ষ অধিকাংশই স্ত্রীলোক। একজন মাত্র ভৃত্যশ্রেণীর পুরুষ। তাকে প্রশ্ন করলেন, বলভদ্র কোথায়?

—কোতোয়ালরে খপর দিতি ঘোড়া ছুইটে তিনি চলি গ্যালেন আইজ্ঞে।

—আর তোমানের বড়-মা?

—তা তো জানি না, কোবরেজমশাই। আছেন ভিতরবাগে কুথান্দে। দ্রৈখপ?

রূপেন্দ্র পরিচারিকাদের বললেন, মালতী মুর্ছা গেছে মাত্র। ভয়ের কিছু নাই। তার মুখে-চোখে জল দাও। নীবিবন্ধের বাঁধন অলগ্না করে দাও। ভিড় করে ধিরে ধর না। ওকে বাতাস থেকে নিশ্বাস নিতে দাও।

ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন কক্ষ থেকে। বাড়ি থেকে উদ্যানে। সূর্য উঠেছে। গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালির সদ্য-জাগরিত কলকাকলি। ঘনশ্যাম সার্বভৌম নামের এক উন্মাদ — যার সম্ভাবনা ছিল জগন্নাথোত্তর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার — সেই লোকটা এ শুকতারার সঙ্গে ভবে গেল অকাশের নীলিমায়। প্রকৃতিতে সে জন্য কোনও পরিবর্তন হয়নি। পূব-

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

আকাশ প্রতিদিনের মতোই লালে-লাল। ইতিমধ্যে খবরটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে কৌতুহলী জনতা সহানুভূতি জানানোর অহিলায় ভিড় করে ছুটে আসছে। উদ্যানের এক দূরতম অর্জুন গাছের তলায় গিয়ে বসলেন।

কেন ঘনশ্যাম আত্মহত্যা করলেন? কিন্তু আত্মহত্যাই তো? হত্যা নয়? আগে খুন করে পরে কেউ দড়ি থেকে ঝুলিয়ে দেয়নি?

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল রূপেন্দ্রের। এত তড়িঘড়ি বলভদ্র কোতোয়ালিতে খবর দিতে নিজে ছুটল কেন? বোধহয় লোক জানাজানি হবার পূর্বেই কোতোয়ালের উপস্থিতিতে মৃতদেহটা সংস্কার করে ফেলতে চায় — আর ঐ সঙ্গে জ্ঞানহীন মালতীর দেহটা চিতায় তুলে দেওয়া চাই। তাহলেই শর্তানুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বলভদ্র।

ওঁর মনে হল কালবিলম্ব না করে এখনি ত্রিবেণীতে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে পড়া দরকার। একটা তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন — এটা হত্যা, না আত্মহত্যা?

উঠে দাঁড়াতেই অঙ্গরাখা থেকে একটুকরো ভূর্জপত্র পড়ে গেল মাটিতে। তখনই মনে পড়ে গেল রূপেন্দ্রের — এটি মুছাতুরা মালতীর মুঠি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আবার বসে পড়েন গাছতলায়।

কী আশ্চর্য! মুছাতুরা মালতীর মুঠিতে যা ধরা ছিল তা কোন পুঁথির ছিন্নপত্র নয়। এটি একটি লিপি। মৃত্যুকে বামমুঠায় কজা করে মহাপণ্ডিত ঘনশ্যাম তা রচনা করেছেন খাগের কলমে, ভূর্জপত্রে। এটি ঘনশ্যামের শেষ পত্র। সার্বভৌমের স্বেচ্ছায় আত্মহননের স্বীকৃতি পত্র। কিন্তু লিখেছেন তাঁর অহোরাত্রের বন্ধু রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মগণকে সম্বোধন করে। ভাষা সংস্কৃত কিন্তু লিপ্যঙ্কর ব্রাহ্মী। যে লিপ্যঙ্করে সম্রাট অশোক লিখিয়েছিলেন তাঁর যাবতীয় শিলালেখ-অনুশাসন। সম্ভবত সার্বভৌম এ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে। যাতে ওঁর পত্রটি কোন অবতীনের হাতে পড়লে সে পাঠোদ্ধার করতে না পারে। বুঝবেন রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য। এবং বুঝবেন মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন:

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্

বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্বজ্জহরাগমেনো,

ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উজ্জিং বিধেম।।

বন্ধুবর রূপেন্দ্রনাথ,

আত্মহননের অন্তিম সমাধান ভিন্ন আর কোন পথ ছিল না বলিয়াই এই মর্মাস্তিক সিদ্ধান্ত। তুমি আমার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের গোপনকথা জানিয়াছ। নিশ্চয় ভেষগাচার্য হিসাবে প্রাণিধান কৃষ্টিয়াই যে, আমার যে-রোগ — মাঝে-মাঝে আমি যে মানসিক ভারসাম্যচ্যুত হইয়া যাই, — তাহার জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী একটি সর্বব্যাপী সামাজিক কুসংস্কার: সত্যিদাহ। আমার ব্যক্তিগত জীবনে সে জন্য দায়ী আমার স্বর্গত পিতৃদেব এবং পরমপূজ্য মাতুলশ্রী মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

তোমাকে বলিয়াছি, আমি প্রথমবার বিবাহ করি উন্মাদ অবস্থায়। কুশপ্তিকায় প্রতিজ্ঞা করি নাই, কোন মন্ত্রোচ্চারণের ক্ষমতাই আমার ছিল না। কিন্তু পিতৃদেবের একটি পৌত্রের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাই এই অশাস্ত্রীয় বিবাহের আয়োজন। যেহেতু স্বয়ং দ্বিভূজ জগন্নাথ এ বিবাহ-বাসরে বরকর্তা, তাই এই অশাস্ত্রীয় বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইল।

অভিজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর স্ত্রীকে প্রথম দেখিলাম। সপুত্র। লোকমুখে শুনিলাম, পিতৃদেব সদ্যবিবাহিত দম্পতিকে বিবাহের অব্যবহিত পরে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেখানে সাড়ম্বরে পুরশ্চরণাদি যজ্ঞ করার ফলশ্রুতি হিসাবে আমার অজ্ঞাতে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হন। আমার প্রথমা পত্নী একথা জানিয়াই আমাকে বিবাহ করেন যে, আমি ঘোর উন্মাদ। তিনি মাতুল মহাশয়ের এক ধনবান যজ্ঞমানের কন্যা। দুর্ভাগ্যবশত মুখে বীভৎস শ্বেতীর নাগ থাকায় তাঁহার কোনও কুলীন পাত্রে বিবাহ হওয়া অসম্ভব ছিল — একেবারে অন্তঃকলিয়াত্রার জ্ঞানহারা কুলীন বৃদ্ধ ব্যতিরেকে। কন্যার পিতা তাই আমাকে জামাতা হিসাবে গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন নাই। কৌলীন্যও বজায় রহিল, কন্যাও শাঁখা-সিঁদুর লইয়া সখ্যার জীবন যাপনের অধিকার পাইল।

তুমি জান, জন্ম-সময়েই আমার গর্ভধারিণীর মৃত্যু হইয়াছিল। ফলে মাসিমাতার নিকট মানুষ হইয়াছি। আমি পুনরায় উন্মাদ হইলাম আমার পিতার মৃত্যুতে। ততদিনে আমার ক্ষেত্রজ পুত্র বলভদ্র উঠতি জোয়ান। পাইকের সাহায্যে তাহার উন্মাদ পিতাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আমার মাসিমা তথা বিমাতাকে পুড়িয়া মারিল: সহমরণ। বলাবাহুল্য 'ত্রিবেণীর গর্ভ' পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুমতানুসারেই শুধু নয়, বর্বর উপস্থিতিতে। সেবার আমি দীর্ঘদিন উন্মাদ হইয়া রহিলাম। সকলে হিরসিন্ধবাস্তে আসিল, আমি চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছি। বলভদ্র আমাদের ভদ্রাসনেই একটি কারাকক্ষ বানাইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বেশ কয়েক বৎসর সেখানে পড়িয়া ছিলাম। হয়তো এভাবেই জীবনের শেষ হইত। হইল না। কেমন করিয়া হইবে? মাতুল মহাশয়ের সেই ধনী যজ্ঞমানের কন্যার তো একটা গতি করা দরকার। ফলে বলভদ্র তাহার বাপের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিল। এবারও উন্মাদ অবস্থায় টোপের পরিলাম, চন্দন-চর্চিত হইলাম এবং কুশপ্তিকায় মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া হিন্দু বিবাহ করিলাম। কেন করিব না? বিবাহ বাসরে সমস্তক্ষণ খাড়া ছিলেন জগন্নাথ। ঠুটো জগন্নাথ নয়। গোঁড়মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দ্বিভূজ জগন্নাথ তর্কপঞ্চনন। যজ্ঞমানের স্বার্থে।

অতিশয় বিস্ময়ের কথা, এবার ফুলশয্যা বাত্রে আমার অভিজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম — নববধূ আমাকে ভয় পাইতেছে না। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, সে পিতৃমাতৃহীনা — মাতুলের অন্ত্রাধার পরিশোধ করিতে উন্মাদকে বিবাহ করিয়াছে, যে উন্মাদের দেহান্তে সে সহমরণে যাইতেও স্বীকৃতা। স্ত্রী না

হইলে ফুলশয্যার রাত্রে আমি তাহাকে প্রণাম করিতাম, রূপেন্দ্র।

আমাদের বিবাহ দেড় বৎসরও হয় নাই। কিন্তু আমরা পরস্পরকে প্রাণাধিক ভাল বাসিয়াছিলাম। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গঙ্গাফড়িং যেভাবে নিজের অজান্তে ঘাসের বগু ধরে, আমিও তেমনি আত্মরক্ষার্থেই পাগলের চণু ধরিলাম। নববধূ ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে, বাহ্যদৃষ্টিতে যে লোকটা বদ্ধ উন্মাদ সে আদৌ পাগল নহে।

বিচিত্র হেতুতে তাহার পর এই দীর্ঘদিন পাগল সাজিয়াই ছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল, বলভদ্র বিষপ্রয়োগে আমাকে হত্যার চেষ্টা করিবে। সেজন্যই পাগলের ভেক পরিত্যাগ করি নাই। বাপের দ্বিতীয়বার বিবাহ না দিয়া আমাকে সে হত্যা করিতে পারিতেছিল না; কারণ সেক্ষেত্রে তাহার গর্ভধারিণীকে পোড়াইয়া মারিতে হয়। বলভদ্রের মুশকিল হইল এই যে, বাপের বিবাহ দেওয়ার পর আমাকে বিষপ্রয়োগ করা তাহার পক্ষে কঠিনতর হইয়া পড়িল। নববধূর সতর্কতায়।

এইবার বলি: কেন আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিলাম:

বলভদ্রের প্রতি মাতুলমহাশয় আদৌ প্রীত নহেন। কিন্তু যজ্ঞমানের কন্যাটিকে রক্ষা করার জন্য তিনি নিরতিশয় যত্নশীল। সেই সূচ্যগ্রবৃদ্ধি ত্রিবেণীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতটির যড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারিলাম বলিয়া সানন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছি। মাতুলশ্রীর গ্রন্থাগারে মা সরস্বতী এবং ধনাগারে মা লক্ষ্মী যুগপৎ বসিনী। কিন্তু পুত্রস্থানীয়ের নিকট পরাজয়েই তো শ্রেষ্ঠ আনন্দ। আজ তাই তাঁহারও আনন্দের দিন।

শরীরবিদ্যা সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে দৃঢ়স্বরে বলিতে পারি: আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী মালতী বর্তমানে চারিমাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমার ক্ষেত্রজপূর বলভদ্র তা অপ্রমাণ করিতে উৎকোচ দিয়া একাধিক ধাত্রীর মতামত গ্রহণ করিবে। সেজন্য তোমার উপস্থিতিতেই আত্মহননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল। ত্রিবেণীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মতে তুমি বর্তমানে গৌড়মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ভেষজচার্য। এ কথা আজই তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। তুমি মালতীকে পরীক্ষা করিয়া তথ্যটা সকলকে জ্ঞাত করাইও। বিশেষ, আমার মাতুলকে।

কারণ সেই মহাপণ্ডিত সবিশেষ জ্যোত্স্নি আছেন: মনুসংহিতা-মতে আমার কনিষ্ঠা পত্নী মালতী সহমরণে যাইবার অনাধিকারী। নারদীয় পুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে মহামুনি নারদ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—গর্ভবতী অবস্থায় কেহই সহমরণে যাইতে পারিবে না। টীকাকার ঋষি বৃহস্পতিও একই নির্দেশ দিয়াছেন। বস্তুত ত্রিবেণীর অবিসংবাদিত মহাপণ্ডিত একাধিক ক্ষেত্রে সদ্যমৃতের শ্মশুরকে এই বিধানটি ভূর্জপত্র লিখিয়া দিয়া বহু আকবরী মোহর প্রণামী লইয়াছেন। তাঁহার যজ্ঞমানেরা ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি দিতে দিতে বিষবা কন্যাকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

অস্বার্থ? আমার প্রথমা পত্নীর ক্ষেত্রজ-পুত্র বলভদ্র যদি ঐ বিষাক্ত দেবোত্তর সম্পত্তিলাভের মোহমুক্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার সম্মুখে একটিই রাজপথ উন্মুক্ত রহিল: পাইক বরকন্দাজের সাহায্যে দাদামহাশয় এবং তস্যা গুরুকে বজ্রবদ্ধ করিয়া আমার মৃতদেহের সহিত স্নায় গর্ভধারিণীকে চিতায় দগ্ধ করা। সম্ভবত অর্থলোভে সে সতী-মায়ের জয়ধ্বনি দিয়া তাহাই করিবে। করুক! সে দ্বৈরথ সমর আমি দেখিতে পাইব না। দ্বৈরথ-সমর নিঃসন্দেহে। যজ্ঞমানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দ্বিভুজ জগন্নাথ বনাম অর্থলোভে মাতৃহতায় উদ্যত বহুভুজ বলভদ্র! স্বামী হিসাবে আমার কর্তব্য ছিল সহধর্মিণীকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করা। আক্ষরিক অর্থে তাহাই করিয়া গেলাম।

বন্ধু বলিয়া স্নিকার করিয়াছ। তাই কিছু দায়িত্ব দিয়া গেলাম:

এক : আমার মুখাণ্ডি করিবে দ্বিতীয়া স্ত্রী মালতী — ক্ষেত্রজ পুত্র নহে।

দুই : আমার শ্রাদ্ধাধিকারিণী আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী।

তিন : মালতীকে সোণাই লইয়া যাইও। লোকলজ্জাকে ভূক্ষেপ করিও না। তাহার প্রসব তুমি নিজে করাইবে। কোন ধাত্রী নহে। মালতী যেন দ্বিতীয়া কুসুমঞ্জরী না হয়।

চার : মালতীর কন্যাসজ্জন জন্মিলে সে তোমার পাঠশালায় পড়িবে। পুত্র সজ্জন জন্মিলে তাহাকে ত্রিবেণী পাঠাইও না। পরন্তু নদীয়ায় পরমারাধা-মহাত্মা রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের চতুপ্পাঠীতে প্রেরণ করিও।

আমার পরমপূজ্য মাতুল-মহাশয়কে আমার অর্বুদকোট প্রণাম জানাইও।

কী দুঃখের কথা রাপেন্দ্র। কী অপরিসীম দুর্ভাগ্যের কথা: বগ্নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ-কুলে কেন আমার জন্ম হইল? আহ যদি ক্ষেত্র হইতাম! যদি খৃষ্টান হইতাম। মুসলমান হইতাম। নিতান্ত পক্ষে যদি অচ্ছুৎ চণ্ডালবংশে জন্মিতাম (আজ্ঞে হ্যাঁ, মাতুলস্ত্রী। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়াইয়া আমি পুনরায় উন্মাদ হইয়া গিয়াছি। আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন!) তাহা হইলে তোমাকে অনুরোধ করিতাম : বন্ধুবর রাপেন্দ্র! তুমি সতীদাহপ্রথা রদ করিয়াই ক্ষান্ত হইও না! বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ব্যবস্থা করিও। স্বয়ং উদাহরণ স্থাপন করিও হতভাগিনী মালতীকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া।

তাহার নায় কল্যাণময়ী, শুচিশুভ্র অস্তুরকরণ, নিঃস্বার্থ প্রেম, নিরলস সেবা—কী বলিব? — দক্ষিণাবর্ত শুক্তির গর্ভে লুকাইত মুক্তার মতোই সুদুর্লভ।

বিদায় বন্ধু!

ঘনশ্যাম দেবশর্মগঃ॥



রূপেন্দ্রনাথ যখন ত্রিবেণীতে এসে পৌঁছালেন তখন এক প্রহর অতিক্রান্ত। গঞ্জ ও শহরে কর্মচঞ্চলতা শুরু হয়েছে। অশ্বারোহণে তর্কপঞ্চননের চতুঃপাশীতে পৌঁছে অশ্বটিকে একটি আমগাছের সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ করে এগিয়ে এলেন। প্রতিটি শ্রেণীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপন শুরু হয়েছে। সংবাদ নিয়ে জানা গেল, তর্কপঞ্চনন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান সেরে অনেকক্ষণ ফিরেছেন। তাঁর আফিক ও প্রসাদ গ্রহণও শেষ হয়েছে। ভদ্রাসন থেকে টোলে আসবার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। রূপেন্দ্রনাথ সেই সময় ওঁর সর্বতোভাবে গিয়ে দেখা করলেন।

তর্কপঞ্চনন বললেন, এত সকাল-সকালই ঘনশ্যাম তোমাকে ছেড়ে দিল যে বড়? আহ্নিক হয়েছে?

তারপর রূপেন্দ্রের দিকে ভাল করে তাকিয়েই তীক্ষ্ণবী পণ্ডিত অনুধাবন করলেন অপ্রত্যাশিত কিছু দুখটনা ঘটেছে। প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে রূপেন্দ্র? তোমাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

রূপেন্দ্র বললেন, মর্মাত্তিক দূঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, গুরুদেব। কালী শেষ রাতে সার্বভৌম দেহত্যাগ করেছেন।

—দেহত্যাগ করেছে। বল কী! ঘনশ্যাম? কিন্তু তার স্বাস্থ্য তো...?

—ঘনশ্যাম আত্মহত্যা করেছে। উদ্ভ্রমণে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পণ্ডিতজী। সংবাদটা পরিপাক্য কবান্তে কিছুটা সময় লাগল। তারপর নিম্নস্বরে বললেন, তুমি নিঃসংশয়? আত্মহত্যা? অন্য কিছু নয়?

—অন্য কিছু?

—মৃত্যুর পর তাকে কেউ কড়িকাঠ থেকে বুলিয়ে দেয়নি?

—আজ্ঞে না, হত্যা নয়। সার্বভৌমা সজ্জানে, স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে। একটি স্বীকৃতিপত্রে সে আমাকে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে গেছে। সেটি জাল-পত্র হতেই পারে

না; কারণ লিপাক্ষর ব্রাহ্মী-হরফ, ভাষা সংস্কৃত। আপনি-আমি এবং লেখক বাতীত সে জাতীয় পত্র এ অঞ্চলে কেউ রচনা বা পাঠ করতে পারবে না।

—স্বীকৃতিপত্রটি কি সে তোমাকে লিখেছে, না আমাকে?

—আমাকেই লিখেছে। তবে পত্রে সে অনুরোধ করেছে সেটি আপনাকে দেখাতে।

রূপেন্দ্রনাথের হাত থেকে ভূর্জপত্রগুলি — বাব্বার কাঁটায় পৃষ্ঠাগুলি পরপর গ্রথিত — নিয়ে জগন্নাথ ধীরে ধীরে পাঠ করতে থাকেন। সৌজন্যবোধে নিঃশব্দে রূপেন্দ্রনাথ গৃহস্থাব অতিক্রম করে বাহিরের টানা-বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। ঘনশ্যাম তাঁর মাতুলকে অব্যবহাতি প্রণাম জানিয়েছেন বটে কিন্তু মৌলবাদী মামার অন্যায় আচরণের জন্য তাঁকে শ্লেষাত্মক শণিত ভাষায় বারংবার তীব্রবিক্ত করতেও পরাজয় হননি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দ্বারের কাছে সরে এসে বললেন, ‘নিয়তি কেন বাধাতে!’ অত বড় মহাপ্রাণ অকালে চলে গেল। ওর যদি ঐ জাতির বাধি না থাকত, আমি নিশ্চিত বলতে পারি রূপেন, ও রঘুনন্দনের সমপর্যায়ের পণ্ডিত হয়ে উঠত।... সে যাই হোক, তুমি কি বোমাকে পরীক্ষা করে দেখেছ?

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে শতকরা শতভাগ সুনিশ্চিত না হলে ঘনশ্যাম ও-কাজ করত না।

—তা বটে! তাহলে চল, এখনি বেরিয়ে পড়ি। তুমি কালিপদকে বল পালকি বাহকদের খবর দিতে। সতী-মা গায়ে যাব। তুমিও যাহোক কিছু মুখে দিয়ে নাও। আমাদের ফিরতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

রূপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য হল, জগন্নাথ একটি টাকার খলি কোমরে গুঁজে নিলেন। কার্যকারণসূত্র বোঝা গেল না, কারণ দাহকার্যের জন্য বলভদ্রের নিশ্চয় অর্থের প্রয়োজন হবে না।

অর্ধদণ্ডের মধ্যেই দুজনে পুনরায় রওনা দিলেন সতী-মা তালকের অভিমুখে। আট বেহারার কাঁধে পালকিতে তর্কপঞ্চানন এবং অশ্বপুটে রূপেন্দ্রনাথ। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই পালকি অন্য এক ভিন্ন পথে ঝাঁক নিল। রূপেন্দ্র বাধা দিলেন না। পথ জগন্নাথ খুব ভাল ভাবেই চেনেন; এ-দিকে মোড় নেওয়ার নিশ্চয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। একটু পরেই কী-এক গায়ে উঁচু পাঁচিল-দিয়ে-ঘেরা একটি ধনিক ব্যক্তির গৃহের কাছাকাছি পালকি নামানো হল। দশরথ লাঠিয়াল — জগন্নাথের নিত্যসঙ্গী দেহরক্ষী — ঐ মোকামের দিকে এগিয়ে গেল। উড়ুনি-কাঁধে তর্কপঞ্চানন পাল্কির বাহিরে এসে খড়ম খটখট করতে করতে এগিয়ে এসে বসলেন একটি অশ্বখগাছের বাঁধানো বেদিমূলে। রূপেন্দ্র কোনও কৌতূহল প্রদর্শন করলেন না। তিনি জানেন, এ-সব ক্ষেত্রে কেউ কৌতূহলী হলে পঞ্চাননঠাকুর বিরক্ত হন। একটু পরেই গৃহভাস্ত্রের থেকে নিষ্কান্ত হলেন একজন মুসলমান বৃদ্ধ ভদ্রলোক। নগ্নগাত্র, লজ্জি পরিধান করে। এক মুখ পাকা দাড়ি, এক বুক পাকা চুল। এগিয়ে এসে বললেন, সেলাম আলেকম ঠাকুরমশাই! আপনে এই সাত-সকালে? হইছেডা কী? তা আমাদের টুক ডাক দিলিহ তো হাজির হতাম আমি।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

জগন্নাথ বললেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি তাই নিজেই চলে এসেছি, হাজী-সাহেব। এ দিকে সরে আসুন। আমি চাই না কথাটা পাঁচ কান হোক।

‘হাজী-সাহেব’ বলে যাক ডাকলেন, সেই বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন, স্পর্শ-বাঁচানো ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে। পঞ্চানন-ঠাকুর তাঁকে নিম্নস্বরে কিছু বললেন। বৃদ্ধ ঘনঘন শিরশ্চালনে স্বীকৃত হলেন। তারপর পিছন ফিরে গৃহাভিমুখী হতেই জগন্নাথ ওঁকে আবার ডাকলেন। বললেন, ছেলেমেয়েদের কিছু মিষ্টি খেতে দেবেন।

বলে, সিক্কা টাকা-ভর্তি থলিটা আলগোছে ওঁর হাতে ফেলে দিলেন। হাজী-সাহেব বললেন, আরে এসব কী-কাণ্ড! এর কোনও প্রয়োজন আছিল না ঠাকুরমশাই। তবে পোলাপানদের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য দিচ্ছেন, আমি আপত্তি করনের কে?

বৃদ্ধ গৃহে ফিরে যেতেই একটি ছোট ছেলে ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তার দু-হাতে দুটি ছাড়ানো ডাব; কিন্তু মুখ-কাটা নয়। বগলে কাটারি। দশরথ ছেলেটির হাত থেকে ডাব কাটারি নিয়ে মুখ কেটে জগন্নাথ ও রূপেন্দ্রকে দিল। ওঁরা মুসলমান বাড়িতে জাতি-বাঁচানো সৌজন্য রক্ষা করলেন। তারও কিছুক্ষণ পরে হাজী-সাহেব ফিরে এসে জগন্নাথের পাশে স্পর্শ-বাঁচানো একটি পত্র দাখিল করলেন। জগন্নাথ সেটি তুলে নিয়ে তাঁর হাত-বটুয়ায় রাখলেন।

হুমব্রো-হুমব্রো রবে পালকি চলল সতী-মা তালুকে।

তালুকদারের বাড়িতে লোকে-লোকারণ্য। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে খবর পেয়ে মানুষজন ছুটে আসছে। সতীমায়ের স্বর্গারোহণ দেখতে। যারা জীবনে কখনো মিছে কথা বলেনি, কোন পাপ কাজ করেনি, তারা স্বচক্ষে দেখতে পায় স্বর্গ থেকে রথকে নেমে আসতে — চিত্রা থেকে সতী-মাকে তুলে নিয়ে আবার স্বর্গের সেই সোনার রথ স্বর্গে ফিরে যায়। অধিকাংশ দর্শকই তা আবছা দেখতে পায় ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে। না-হলে যে মেনে নিতে হয় তারা মিছে-কথা বলে থাকে।

তর্কপঞ্চাননের পালকি এসে থামল তালুকদারের বাড়ির সামনে। ভিড় দু-ফুট হুয়ে গেল ওঁর পরিচয় পেয়ে। ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল বলভদ্র — নগ্নপদ, নগ্নগাত্র — সে এসে হাউমাউ করে কী বলল তা বোঝা গেল না।

জগন্নাথ দৃঢ়হস্তে তার বাহমূল চেপে ধরে বললেন, চল! ভিতরে চল। তোমার ঘরে। এ সময় কি অত উতলা হলে চলে? এস...

বলভদ্রের ঘরে এসে উনি একটি কেদারায় বসলেন। বলভদ্র ভূশয়াতেই কন্ডলের টুকরো পেতে বসল। বলল, এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল, দাদু।

সে-কথার জবাব না দিয়ে জগন্নাথ প্রশ্ন করলেন, কোতায়ালিতে খবর দিয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়-দারোগা ঘোষাল-সাহেব এসেছিলেন। স্বচক্ষে দেখে চলে-গেছেন।

তাঁর পাবণীও মিটিয়ে দিয়েছি। দাহ করার অনুমতি দিয়ে গেছেন।

—কোথায় ফিরে গেলেন তিনি? কোতায়ালিতে, না নিজের মোকামে?

—আজ্ঞে না। উনি বললেন শশানে অপেক্ষা করবেন। শশানকালীর পূজা করবেন।

দাহকার্য হয়ে গেলে সব মিটিয়ে বাড়ি যাবেন। সহমরণের ব্যাপার তো! বড় হুজোং হয়! প্রতিবারই তিনি তাই করেন। কাজী-সাহেবের তাই নির্দেশ।

জগন্নাথ বলেন, একটা গোপন কথা বলব বলে তোমাকে আড়ালে ডেকেছি বলভদ্র! ছোট বোমা মালতী গর্তিণী। সে তো সহমতা হতে পারবে না। শাস্ত্র সেরকম নির্দেশ নেই। বলভদ্রের চোম্বালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, কে বলেছে?

—তোমার বাবা আত্মহত্যা করার আগে একটি স্বীকৃতিপত্র তা জানিয়েছেন।

—আমি বিশ্বাস করি না। এ হিরু পালের ষড়যন্ত্র! কই, দেখি সেই স্বীকৃতিপত্র?

জগন্নাথ তাঁর পুঁটলি থেকে ভূর্জপত্রটি বাব করে দেখালেন। বললেন, যে ভাষায় লেখা তা তোমার বোধগম্য হবে না, বাবা। কিন্তু আমার কথাটা মেনে নাও বলভদ্র!

—মেনে নেব? আপনার কথা মেনে নেব? মেনে নিয়ে কী করব? বুড়ো আঙুল চুষব? আর ইদিকে অবস্থাটা নিজ চোখে এসে দেখুন।

এবার জগন্নাথের বাহমূল পাকড়াও করে বলভদ্রই ওঁকে নিয়ে এল অন্দর-মহলে। উঠোনের মাঝখানে একটা চৌকির উপর বসানো হয়েছে একটি জলটোঁকি। যাতে দর্শকদের দৃষ্টিপথে বাধা না পড়ে। তার উপর বসে আছে মালতী। একবস্ত্রা। লালপাড় পট্টবস্ত্র। তার পায়ে আলতা, হাতের তালুতে আলতা, মাথায় ব্রহ্মতালু পর্যন্ত লালে-লাল সিন্দুর। এয়োস্ত্রীরা তাকে ঘিরে আছে। শাঁখ বাজাচ্ছে, মাঝে-মাঝে হলুধবনি দিচ্ছে। নিজ নিজ সৌভাগ্য সিন্দুরের কৌটা মালতীর পায়ে ছুঁইয়ে নেবার জন্য হড়াহড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। কাঁসর-স্বর্নাটার ঠ্যাঙাঠ্যাঙ লেগেই আছে।

বলভদ্র বললে, এখন ও-কথা কে শুনবে বলুন? শেষে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে, দাদু! এরা অনেকেই এসেছে ভিন গাঁ থেকে। এখনো সার দিয়ে গো-গাড়ি আসছে তো আসছেই! আমার এতবড় বুকের পাটা নেই যে, এখন গিয়ে ওখানে বলব — ছোট মা সতী হবেন না। তাঁর 'পেট' হয়েছে।

—তুমি না পারলে আমি বলব। আমার কথা ওরা মেনে নেবে। তুমি চিন্তা কর না।

—কিন্তু ছোট-মা সতী না হলে তালুক যে আমাদের বেহাত হয়ে যাবে দাদু?

—তা তো যাবেই। যদি না... ভাল কথা, তোমার গর্ভধারিণী জননী কোথায়?

—তিনি সকাল থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সান নেই।

—রূপেন্দ্রনাথকে বলব গিয়ে দেখতে?

—না না! ভয়ের কিছু নেই। জ্ঞান আপনিই ফিরবে। আপনি ইদিকে রং সেরে আসুন।

কতা আছে।

জনান্তিকে পুনরায় জগন্নাথকে টেনে এনে বলভদ্র বললে, আপনি আর অমত করবেন না, দাদু! কাকপক্ষীতে জানে না যে, ছোট-মার পেটে বাচ্চা। ওঁর মামাকে আমি অনেক টাকা গুনে দিয়েছি — শুধু এই দিনে এই উল্লাহটি করার জন্যই। যারা সিঁদুর সংগ্রহ করতে এসেছে তারা বামনবাড়িতে রীতিমতো প্রণামী দিয়েই সিঁদুর সংগ্রহ করছে। অনেকে সিঁদুর নিয়ে চলেও গেছে। তারা ছাড়বে কেন? শেষে লাঠালটি শুরু হয়ে যাবে!

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

জগন্নাথ দৃঢ়স্বরে বলেন, বলভদ্র! আমি যখন নিদান হেঁকেছি তখন তার আর কোন পরিবর্তন হবে না। তোমার ছোটমা মালতী বৌমা সহমরণে যাবেন না। এখন কী-করবে? সম্পত্তির আশা ত্যাগ করবে, না গর্ভধারিণীকে পোড়াবে? কী চাও তুমি?

বলভদ্র তৎক্ষণাৎ নিজমূর্তি ধারণ করল। বলল, তিনি শুধু আমার গর্ভধারিণী? না কি আপনারও যজ্ঞমানের মেয়ে?

—হ্যাঁ তাই। দুটোই সত্য। সে জন্য আমার পরামর্শ: সম্পত্তির আশা তুমি ত্যাগ কর। ঘনশ্যামের সঙ্গে কেউই সহমরণে যাবে না।

বলভদ্র বললে, ইল্লি! ভাববেন না আমি তৈরি নই। আপনার ঐ দশরথ লেঠেলকে দরকার হলে আমাব বাপের সঙ্গে চিত্তেয় তুলে দিতে পারব। এমন আশঙ্কা ছিলই। তবে আমার আনজাদ ছিল বাধা দিতে আসবে ছিরু পাল। এই তালুকটার উপর তার অনেকদিনের নজর। শুনুন, পঞ্চানন-ঠাকুর! ইদিক-উদিক খরচপাতি যা করার করেছে। একশ লেঠেল মোতায়ন করেছে কাঞ্চোদ্ধারের জন্যে! সূত্রাং ঐ নিদেন-হাঁকার কেরামতি আপাতত হিকৈয় তুলে রেখে বাড়ি যান। ছোট-মার যে পেট হয়েছে, তা আশ্রো আনজাদ করেছে। তবে কতটা এখনো পাঁচ কান হয়নি। কাক-পক্ষীতে টের পাবে না। রোদের তেজ বাড়ছে। আপনি দয়া করে বাড়ি যান।

—তুমি আমার কথাটা শুনবে না?

—আমার বাপ পাগল ছিল মানছি! আশ্রো তো পাগল নই।

জগন্নাথ আর কথা বাড়ালেন না। উঠে পড়লেন। প্রতিবেশী গ্রামের সধবা মহিলারা তখনো সার বেঁধে অন্দরের দিকে চলেছেন। বলভদ্র পিছন থেকে বললে, মনে করবেন না ঠাকুর যে, আপনারে অচ্ছেদ্য করছি। অশৌচ চলছে, তা নইলে ত্রিবেণীর পঞ্চাননঠাকুরকে এট্টা পেল্লম অন্তত করতাম।

জগন্নাথ বললেন, চলে এস রূপেন। ও আমার কথা শুনবে না।

রূপেন্দ্রনাথ সবিম্বয়ে বললেন, এই অনাচারের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করব না?

জগন্নাথ পালকিতে উঠে বসেছিলেন। বললেন, তুমি আমার সঙ্গে আসবে, নোঁ এখানেই তামাশা দেখতে থেকে যাবে?

রূপেন্দ্রনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে অঙ্গারোহণ করলেন।

জগন্নাথের নির্দেশে পালকিটা এসে থামল শ্মশানে। একটা প্রকীর্ণ গোলকটাপা গাছের তলায়। জগন্নাথ পালকি থেকে নেমে দশরথকে ডেকে বললেন, দেখ তো রে দশরথ। ঘোষাল দারোগা ঘাটে আছে কি না। শ্মশানকালীর পূজা দিতে এসেছে। অর্থাৎ মদ গিলতে। শিবঅ কে চিনিস তো?—শ্মশান-চণ্ডাল —ও বলতে পারবে।

অনতিবিলম্বেই বড় দারোগা সহদেব ঘোষালকে নিয়ে দশরথ ফিরে এল। সহদেব যথারীতি এই সাত সকালেই শ্মশানকালীর ঠাণ্ডে কিছু কারণবারি পান করেছে — বলভদ্রের হাত থেকে এক মুঠো কাঁচা সিঁকাটাকা পেয়ে। কিন্তু ত্রিবেণীর পঞ্চানন ঠাকুরকে চিনতে ভুল হবার মতো নয় সে নেশার পরিমাণ। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললে, শ্মশানে এয়েছেন কেন,

দাবতাব? আমাৰে এটু জানান দিলেই তো আপনাৰ ঠায়ে দৌড়ে যেতাম।

জগন্নাথ আগুৱাখা থেকে এক-টুকুৰো কাগজ বাৰ কৰে ঘোষালৰ হাতে দিলেন। বললেন, পড়তে পাৰবে? না পড়ে শোনাব?

—আজ্ঞে না! কী যে বলেন ঠাউৰ! এ তো কাজী-ছায়েবৰ হুকুমনামা। বন, পড়ে দেখি।

চিঠিখানা কিছুটা পড়ে সে বক্তান্ত ঘোলাটে চোখদুটো জগন্নাথৰ মুখে মেলে বললে, আমো তই আন্দাজ কৰেছিলাম। শালা, বাপকে খুন কৰে ফাঁসিতে লটকেছে। এখন কী কৰণীয়?

—দেখ, গোটা চিঠিটা পড়ে দেখ। কাজীসাহেবই তোমাকে নিৰ্দেশ দিয়েছেন।

ঘোষাল বললে, কিছু মনে কৰবেন না ঠাউৰ-মশাই, কাজী-সাহেবৰ হাতের লেখাটা বড় জড়ানো। মনে লাগে, পুরো বোতল কালীমার্কী সেবন কৰে তারপর খাগেৰ কলম হাতে নিয়েছিলেন। আর তাছাড়া এই উল্টোমুখে ফাৰ্চি হৰফগুলো...

জগন্নাথ ওৰ হাত থেকে চিঠিখানা ফেরত নিয়ে পড়ে শোনালেন। কাজী-সাহেব বড় দাৰোগাৰ উপৰওয়ালা। হুজু সেৱে এসেছেন বলে সবাই কাজীৰ বদলে ওঁকে হাজী বলে। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বড় দাৰোগাকে নিৰ্দেশ দিচ্ছেন : “আশঙ্কা কৰাৰ যথেষ্ট হেতু বৰ্তমান যে, পণ্ডিত জগন্নাথ তৰ্কপঞ্চননৰ ভাণীনেয় উন্মাদ ঘনশ্যাম সাৰ্বভৌমকে সম্পত্তিৰ লোভে তস্যপুত্র বলভদ্র কষ্টৰোধ কৰিয়া হত্যা কৰিয়াছে। এবং তৎপরে ফাঁস ৰঙ্কু হইতে ঝুলিয়া দিয়া প্রমাণ কৰিবাব চেষ্টা কৰিয়াছে যে ঘনশ্যাম আত্মহত্যা কৰিয়াছেন। ফলে শ্মশানযাত্ৰীরা শ্মশানে উপস্থিত হওয়ামাত্র আসামী বলভদ্রকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবে। ঘনশ্যাম সাৰ্বভৌমৰ কনিষ্ঠা পত্নী মুখাণি এবং শ্মশানৰ যাবতীয় কৃত্যাদি কৰিবেন। ত্ৰিবেণীৰ পণ্ডিত জগন্নাথ তৰ্কপঞ্চননৰ আদেশানুসাৰে ঐ বিধবা সহমরণে যাইবাৰ অধিকাৰী নহেন। ঘনশ্যামৰ প্রথমা পত্নীকেও যেন সহমরণৰ জন্য চিতায় তোলা না হয়। ঘোষাল দাৰোগা স্বয়ং শ্মশানে উপস্থিত থাকিয়া এই দাহকাৰ্য সুসম্পন্ন কৰাইবেন। ইতি—”

জগন্নাথ বললেন, শোন ঘোষাল। আমাৰ এই ছাত্ৰ ও শিষ্য ৰূপেন্দ্ৰনাথ ভেগাচাৰ্য তোমাকে সাহায্য কৰতে শ্মশানেই থেকে যাবেন। তুমি তোমাৰ একটা পাইক কোতোয়ালিতে পাঠিয়ে দাও। কিছু বন্দুকধাৰী সেপাই আনাবাৰ বন্দোবস্ত কৰ। বলভদ্রৰ সঙ্গ শতখানেক লাঠিয়াল আসবে। শ্মশানযাত্ৰীদেৰ আসতে দেখলে প্রথমেই আকাশেৰ দিকে দু-চাৰটা ফাঁকা আওয়াজ কৰবে। তাতেই ওদেৰ ঢোল-কাঁসিৰ বাদ্য থেমে যাবে। তখন সরকারি আদেশটা ঘোষণা কৰবে। বলভদ্রকে হাতকড়া পৰাবে, মাজাৰ দড়ি দেবে। তাহলেই ওৰ লেঠেলৰা থমকে যাবে। স্ত্রীলোকদেৰ জিনিয়ে দেবে নবাবী ফৰ্মান অনুযায়ী মৃতদেৰ কোন স্ত্ৰী সতী হতে পাৰবেন না। ...আমি ত্ৰিবেণী ফিৰেই এই পালকিটো পাঠিয়ে দেব। দাহকাৰ্য সম্পন্ন হলে বলভদ্রকে চালান দেবে আৰ মালতী — অৰ্থাৎ সদ্যবিধবাকে — আমাৰ পালকিতে কৰে ত্ৰিবেণী পাঠিয়ে দেবে। পালকিৰ সঙ্গ আসবে একজন বন্দুকধাৰী সেপাই আৰ আমাৰ শিষ্য ৰূপেন্দ্ৰনাথ ভেগাচাৰ্য। ঠিক ঠিক মতো বুঝতে পেরেছ তো?

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

ঘোলাটে চোখ মেলে ঘোষাল দারোগা পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললে, প্রভু! আমার অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছেন। বুঝতে কিছু ভুল হলে কোবরেজ-মশাই শুধরে দেবেন। উনি তো রইলেনই।

—হ্যাঁ, আমার অবর্তমানে ওর আদেশই আমার আদেশ। আর, ও, হ্যাঁ — ঘোষাল! ঘনশ্যামের শ্রদ্ধা আমার ভদ্রাসনেই হবে। তুমি সপরিবারে নিমজ্জন রাখতে আসবে। তোমাকে যাতে ভালমতো ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ব্যবস্থা করা হয়, সেটা আমি দেখব।

ঘোষাল বললে, জয় জগন্নাথ প্রভু।



দিন-দশেক পরের কথা। আজ ঘনশ্যাম সার্বভৌমের আদ্যশ্রাদ্ধ। নিজ বাটিতে নয়, মাতুল-মহাশয়ের ভদ্রাসনে। জগন্নাথ বেশ বড় মাপের আয়োজনই করেছেন। ত্রিবেণীর পণ্ডিতেরা সকলেই চিনতেন, ঘনশ্যাম সার্বভৌমকে —জগন্নাথের ভাগিনেয় বলে শুধু নয়, অসাধারণ সজ্জনাময় এক নবীন পণ্ডিত হিসাবে। সূতরাং নিমজ্জিতের তালিকাটি সুবৃহৎ হয়ে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী জনপদ থেকেও অনেক এসেছেন। স্বর্গত পণ্ডিতের দুই বিধবাই উপস্থিত — কারও সহমরণে ঝাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু বলভদ্র অনুপস্থিত। না, কারাগারে সে আবদ্ধ নেই। ঘনশ্যামের পুত্রাঙ্গি গঞ্চাঙ্কলে বিসর্জন দেবার পর বাড়-দারোগা কাজী-সাহেবের আদেশে বলভদ্রকে মুক্তি দেন। ইতিমধ্যে জানা গেছে, ঘনশ্যাম আত্মহত্যা করেছেন। হত্যার ঘটনা এটি নয়।

বলভদ্র মুক্তি পেয়ে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সে নাকি যাবার আগে বলে গেছে, ছেরাদ্দ করার দায় আমার নয়। যে পাগলটা পটল তুলেছে সে আমার বাপ ছিল খোড়াই।

শ্রাধানে মৃতের মুখাঙ্গি করেছিল মালতী। তর্কব্রজ মগাই একটা ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিলেন — পুত্রের অবর্তমানে, পৌত্র বা নিকট আত্মীয় শ্রাধানে উপস্থিত না থাকলে মৃতের স্ত্রী মুখাঙ্গি করতে পারেন বটে; কিন্তু গভিণী অবস্থায় তা পারেন না। যে-কারণে সদ্যোবিধবাকে সহমরণে তোলা গেল না, সেই হেতুটাই এ-ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতান্তর দেখা দেয়। মালতী রূপেন্দ্রনাথকে জনাস্তিকে জানিয়েছিল, স্বামীর শেষ ইচ্ছা সে ঐকান্তিকভাবে পূরণ করতে ইচ্ছুক। তাই রূপেন্দ্রনাথ পণ্ডিতদের বাধা দিয়ে বলেছিলেন, দেখুন, আপনারা সকলেই মহামহা পণ্ডিত। কিন্তু এই বিধানটি দিয়ে গেছেন আমার পূজাপাদ

গুরুদেব স্বয়ং পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। আপনাদের কারও যদি ভিন্ন মত থাকে—

পণ্ডিতেরা একযোগে বলে ওঠেন, সে-ক্ষেত্রে তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। নিশ্চয় কোনও সংহিতায় বিকল্প কোন সূত্র আছে, যা আমাদের জানা নেই। তবে আর বিলম্বে কাজ কী? মুখাঙ্গির আয়োজন করা হোক।

মালতীই মুখাঙ্গি করেছিল, ঘনশ্যাম পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবার পর চিতায় জলও ঢেলে দিয়েছিল।

ঘনশ্যামের প্রথমা পত্নীর মূর্ত্তা সারাদিনেও ভাঙেনি।

শ্মশানযাত্রীর ফিরে এলে তিনি মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি পেলেন।

হোট-জা বহাল তবীয়তে দ্বিবেণী চলে গেছেন। তার পরিবর্তে বলভদ্রকে ফাটকে পাঠানো হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তাঁর মূর্ত্তাভঙ্গ হল।

বিধবার শাঁখা-নোয়া অপসারণের পর বড় বধুমাতার পিতৃদেব তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন।

শ্রাদ্ধ-বাসরে দুই বিধবাই উপস্থিত। তর্কপঞ্চাননের নির্দেশে কনিষ্ঠাই শ্রাদ্ধ করছে। এবার আর ঐ প্রশ্নটা কেউ তুলতে সাহসই পাননি: গর্ত্তিণী অবস্থায় কোনও সদ্যোবিধবা শ্রাদ্ধাধিকারিণী হতে পারে কি না।

রূপেন্দ্রনাথের কাছে অধিকাংশ নিমজ্জিতই অপরিচিত। তর্কপঞ্চাননের অযুত-নিযুত শিষ্য। ‘ভূতে আনে গন্ধর্ব্ব বয়’ নীতিতে শ্রাদ্ধবাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম এগিয়ে চলেছে। মালতী মানসিক হৈর্য হারায়নি। এ-কয়দিন প্রাণভরে কঁদে নিয়ে আজ সে দাঁতে-দাঁত দিয়ে স্বামীর শেষ কাজ করতে বসেছে। তার মামা নিমজ্জিত হয়ে এসেছেন। ভায়ীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেননি। তার কতটা বেদনায়, কতটা লজ্জায়, তা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু ওর তিন মামাতো বোন ওকে জড়িয়ে ধরে যখন হ-হ করে কঁদে উঠল, তখন মনে হল — দিদি বিধবা হওয়ায় ওরা যতটা ব্যথিত, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি দিদি জ্বলন্ত চিতা থেকে ফিরে আসায়। দিদিবে! ওরা সবাই প্রাণাধিক ভালবাসত।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সর্বতোভদ্র গদ্যর ধারে, প্রায় বিশ ঘিষা জমির উপর তার একদিকে চতুষ্পাঠী, এক দিকে টোল। এক প্রান্তে মন্দির, পুষ্করিণী, অপর প্রান্তে স্নানবাগান। ঐ আম-বাগানের একান্তে পণ্ডিতের ভদ্রাসন। রূপেন্দ্রনাথ একটু ফাঁকায় গিয়ে একটি উঁচু টিলার উপর একটি ছাতিম গাছের ছায়ায় এসে বসলেন। সম্ভবত এখানে একটি পৃথক মাটির ঘর ছিল। স্মৃতিকাগ্ধ কি? কয়েক দশক আগে তা ভূমিসাৎ হয়েছে। তবুই ভগ্নস্তূপের উপর গজিয়েছে এই সপ্তপর্ণীর গাছটি।

একটা অপরিচীত নির্বেদে মনটা আজ ওঁর ভারজলন্ত ক্রোশধাম থেকে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন গৌড়মণ্ডলে। ফরাসীভাষায় পৌঁছেই গেলেন প্রথম ধাক্কাটা। আত্মজাকে বুক জড়িয়ে ধরার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। চোখের দেখাও দেখতে দিলেন না ভবতারণ গাঙ্গুলী। বললেন, তাহলে নাকি শিশুর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। রূপেন্দ্র দরবার করতে গেলেন নদীয়ারাজের কাছে। সুবিধা হল না। রাজমতিষী জানিয়ে দিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

দ্বীশিক্ষা-বিস্তারের বিপক্ষে। অর্থাৎ ভবতারণের সপক্ষে। তারপর উনি ছুটে এলেন ওঁর গুরুদেবের কাছে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ‘নিদান হাঁকলে’ গৌড়মণ্ডলে কেউ তার প্রতিবাদ করতে সাহসী হবে না। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলেন রূপেন্দ্রনাথ। গুরুদেব ওঁকে শর্ত-সাপেক্ষে সমর্থনে স্বীকৃত। শর্তটি মারাত্মক: বিপত্নীক কুলীন ব্রাহ্মণটিকে পুনর্বিবাহ করতে হবে। ভবতারণ গাঙ্গুলীর কন্যাটিকে পছন্দ না হলে গুরুদেব তাঁর গণনাভীত যজ্ঞমানের ভিতর থেকে কুলীনঘরের একটি রাঢ়ী শ্রেণীর ভিন্নগোত্রের সর্বগুণাধিতা কুমারীকে নির্বাচন করে দিতে চাইলেন। রূপেন্দ্র প্রত্যাখ্যান করায় গুরুদেবও মুখ ফেরালেন।

ইতিমধ্যে নানান দুঃসংবাদও পেয়েছেন: জগুঠাকরুণ স্বর্গে গেছেন। রূপেন্দ্রের অন্তঃকরণে ঐ বৃদ্ধার প্রতি একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা ছিল। পিসিমাতা ঠাকরুণ স্কন্যা ভাইয়ের সংসারে ফিরে এসেছিলেন তাঁর স্বামীর জীবিতকালেই। এমনকি স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েও শব্দরালে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে যাননি। সোএই গাঁয়েই শাঁখা-সিন্দুর ঘুচিয়ে থান পরে কন্যা কাত্যায়নীকে দিয়ে পৃথকভাবে চতুর্থাঙ্গ করিয়েছিলেন।

হেতুটি সমকালীন বিচারে সামান্য অঞ্চ রূপেন্দ্রনাথের বিচারে অসামান্য। পিসিমার এই বিদ্রোহের হেতু বৃদ্ধ বয়সে পিসেমশাই একটি গঞ্চদশীকে দ্বিতীয় পক্ষে ঘরে এনেছিলেন। সে আমলে অভিযোগটা ছিল হাস্যকর। গ্রামশুদ্ধ মহিলা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল: ওমা, আমি কনে যাব। কুলীন বামুন — আড়াইকুড়ি বয়সে মান্তর দ্বিতীয়-পক্ষ করল, আর তাও সইলনা বুড়ি জগুঠাকরুণের।

সেই তেজদীপ্ত জগুঠাকরুণ দুনিয়ার মায়ী কাটিয়েছেন। বার্তাটা শুনতে হল ভবতারণের ভৎসনা এবং ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে। রূপেন্দ্র জানেন না, কোন ঘটনাটি আগে ঘটেছে। খঞ্জ-গঙ্গারামের হাত ধরে কাত্যায়নী আগে ভিন্গাঁয়ে চলে গেছে, না আগেই জগুঠাকরুণের সব জ্বালাযন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। প্রথমটি সত্য হলে বিধবা কি শেষ সময়ে এক ফৌঁটা জলও পাননি? কে তাঁর শবদাহ করল? কে শ্রাদ্ধ করল? কিছুই জানেন না।

হতাশা যখন সব দিক থেকে জড়িয়ে ধরেছিল তখন নিতান্ত ঘটনাচক্রে লিপ্ত করলেন এক অপ্রত্যাশিত অসাধারণ বন্ধুকে। এই মৌলবাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে প্রথম সাক্ষাৎ পেলেন একটি মানুষের যিনি, আধুনিকতায় বোধ করি রূপেন্দ্রনাথের অপেক্ষাও কয়েক-দশক এগিয়ে।

রূপেন্দ্রনাথ কখনো আক্ষেপ করতে পারতেন না: ‘কেন! নেছ হইলাম না, কেন মুসলমান হইলাম না, অন্ততপক্ষে কেন অচ্ছুৎ চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিলাম না...’

কিন্তু, ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। মাত্র একদিনের ঘনিষ্ঠতায় দুজনে-দুজনের প্রাণের বন্ধ হয়ে উঠলেন। আবার একরাত্রির অন্তেই এল চিরবিচ্ছেদ। ছাতিম গাছতলার বসে বসে রূপেন্দ্রনাথ চিন্তা করছিলেন, সেদিন কী-কী বিষয়ে দুজনের আলোচনা হয়েছিল। গৌড়মণ্ডলে বালিকাদের জন্য প্রথম পাঠশালা খোলা হলে — যদি আদৌ খোলা সম্ভবপর হয় — তবে পাঠ্যসূচী কী হবে? সেখানে শিক্ষালাভ করতে আসবে কারা? — শুধুই ব্রাহ্মণ কন্যা? শুধুই

বর্ণহিন্দু? জল-অচল অচ্ছুতের স্নানমুখী আত্মজার দল কি সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হবে?

—এই শোন, তুমি আমাদের বুড়ি হবে?

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল মধ্যপথে। দেখলেন, শিক্ষাবঞ্চিতা স্নানমুখী বালিকার দল মুহূর্তে এক ঝাঁক প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। প্রশ্নটা যে পেশ করেছে সে একটি বালিকা। হিমালয়-দুহিতা উমা-মাকে বোধ করি এমনিই দেখতে ছিল, তিন-চার বছর বয়সে। অথবা 'মা গঙ্গাকে, গোমুখ-গঙ্গোত্রীর উৎসমুখে। উপলব্ধির বরনার মতো ওরা ঘনিষে এসেছে রূপেন্দ্রনাথের চারিদিকে। রূপেন্দ্রনাথের যে ধ্যানভঙ্গ করেছে তাঁর নাকে মুক্তোর নোলক, কপালে জড়োয়া টায়রা, গলায় সোনার হার, পরনে বিচিত্র ফ্রক। মসলিনের কাপড় কিন্তু উবুড়-করা-গামলার মতো তা ফুলে ফুটে আছে। রূপেন্দ্রনাথ ফরাসী-গাউন জীবনে দেখেননি। ফুটফুটে সুন্দরী। আধফোটা কমলকলির মতো গাত্রবর্ণ। আর সব চেয়ে অবাক-করা ওর দুটি... কিন্তু এ কী। এই ভ্রমরকালো চোখ দুটি কেন এত চেনা চেনা লাগছে? আর দেবীপ্রতিমার মতো মুখের ডৌলটা?

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কী বললে? কী চাইলে তুমি?

—কতা বোঝ না? বলি-কি: তুমি বুড়ি হবে?

রূপেন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, তা কেমন করে হবে, মা? বুড়ো হতে পারি যদি বছর ত্রিশ-চল্লিশ অপেক্ষা কর; কিন্তু 'বুড়ি' হবে কোন মন্ত্রবলে?

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। আবার চমকে ওঠেন। এই হাসির বরনার শব্দটাও যেন খুবই পরিচিত। এ বরনার জলে যেন স্নান করেছেন কোন বিস্মৃত অতীতে। শিশু গিরিরাজসূতা বললে, তুমি এত বোকা কেন গো? আমি কি তোমারে খুনখুনে জটবুড়ি হতে বলেছি? 'বুড়ি'! মানে গোছাছুট খেলার বুড়ি। আমরা দৌড়ে এসে শুধু তোমারে ছোঁব। বাস!

—শুধু ছোঁবে? তাহলে আমি রাজি নই। বল, গালে চুমু খাবে?

মেয়েটি হতাশ হয়। বিরক্তও। সঙ্গিনীদের বলে, এ বোকাডারে দে হবেনি। আমি কী বলনু আর এ কী বলছে!

ওর পাশের মেয়েটি বলে, চল হটি, আমরা অন্য আর কারেও পাকড়াও করি।

রূপেন্দ্রনাথ ওর হাত ছাড়েননি। বলেন, 'হটা'! তোমার নাম বুঝি হটা? কী বিদঘুটে নাম গো তোমার। 'হটা' কখনো এমন একটি ফুটফুটে মেয়ের নাম হতে পারে?

মেয়েটি তার টোবলাগালে আঙুল ঠেকিয়ে বললে, কী বোকা গো! তুমি! কেন হবে না? এই তো আমার হয়েছে। অবিশ্যি তুমি আমারে 'হটা'ও ডাকতে পারি। দাদু আমারে ডাকে 'হটা' আর দিদা ডাকে 'হটা'।

ওর বাহুবীরা ততক্ষণে রূপেন্দ্রনাথকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

রূপেন্দ্র বললেন, ও-সব 'হটা-হটা' হচ্ছে ডাক নাম। তোমার পোশাকী ভাল নামটা কী গো? সেটাই আমাকে শোনাও।

মেয়েটি রুখে ওঠে, কেন? 'হটা-হটা' দু-দুটো নাম বলনু, তোমার পছন্দ হলনি?

ওর ভাষা এবং বাচনভঙ্গিতে একটু বিস্মিত হলেন রূপেন্দ্র। মেয়েটি অতি সুন্দরী।

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

তার সাজ-পোশাক, অলঙ্কার দেখে বোঝা যায় যে, সে অভিজাত ধনী বংশের সন্তান। তাহলে তার কথাভাষা এত গ্রাম্য কেন? বোধকরি ও মানুষ হচ্ছে পরিচারকবর্গের মাধ্যমে। তাদের ঘরেই থাকে চৌপার দিন। তাদের ভাষাটাই আসে জিহ্বাগ্রে।

রূপেন্দ্র ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, না, মা। পছন্দ হয়নি তা বলিনি। ও দুটি ডাকনামও খুব ভাল। কিন্তু ও-দুটো তো দাদু-দিদার দেওয়া নাম। মা কিংবা বাবা তোমাকে বেশ জমকালো একটা নাম দেয়নি? যা তোমার এই সুন্দর চেহারার সঙ্গে মানানসই হয়?

মেয়েটি ঠোট উল্টে বলে, হুঃ! মা-বাবা থাকলে তো? বাবা তো একটা বদমাশ বাউণ্ডুলে!

রূপেন্দ্রের হৃকুঞ্চন হল, বললেন, ‘বদমাশ-বাউণ্ডুলে!’ এসব ভাষা তুমি শিখলে কোথায়? কে তোমার বাবাকে ও কথা বলেছে?

—দাদুই বলে। যখন-তখন বলে, আমার মা আঁতুড়ে মরে যেতেই সেই বদমাশ বাউণ্ডুলেটা আমারে ফেলে পাইলে গেল।

থরথর করে কঁপে উঠলেন রূপেন্দ্রনাথ। একটা বিন্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল যেন তাঁর সর্বব্যববে। তাই তো। তাই এত চেনা-চেনা লাগছে। তাই বৃকের মধ্যে এমন মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে। সেই চোখ। সেই মুখ। কোথাও কিছু নেই, মেয়েটিকে উনি সবলে বৃকে টেনে নিলেন। চুমায়-চুমায় ওর টোবলা গাল দুটো ভরিয়ে দিলেন।

—এই ছাড়ো, ছাড়ো। বী করছ তুমি? আমার লাগে না বৃকি?

রূপেন্দ্র বললেন, ছাড়ব; কিন্তু তার আগে বল: তোমার মা — ছোট-মা — কি কখনো তোমাকে বলেনি যে, সেই বাউণ্ডুলে বাপটা তোমার জন্যে একটা দারুণ সুন্দর পোশাকী নাম দিয়ে গিয়েছিল?

—ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ছোটমা বলেছিল বটে! আমার একটা জমকালো নামও আছে: রূপোমনচুরি।

—মন চুরি। হ্যাঁ, ঠিক কথা। রূপোর মন তো চুরিই করলি রে তুই। — আবার টেনে নিলেন বৃকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কোন অন্তরাল থেকে ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হলেন ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়। উর্ধ্বাঙ্গে রেশমের বেনিয়ান, মাথায় প্রাক-রামমোহনী শামলা, পরনে চুনট-করা ফরাসডাঙার ধুতি, পায়ে প্রাক-বিদ্যাসাগরী গুঁড়তোলা চটি। ছুটেএসে চেপে ধরলেন শিশুটির মোমের মতো নরম হাত। একটা হাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিলেন বাপের বক্ষিত বৃক থেকে।

—একা-একা এখানে এসেছি কেন, হতচ্ছাড়া!

মেয়েটি ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। অস্ফুটে বললে, একা তো আমি নি দাদু, এ-রা সকলেই তো...

—আবার মুখে-মুখে চোপা! — কোথাও কিছু নেই ওর কচি গালে ঠাস করে বসিয়ে দিলেন বিরশি-সিকার একটা চড়। রাগটা রূপেন্দ্রনাথের উপর, কিন্তু চপেটাঘাতের বেগটা সহ্য করতে হল অতটুকু শিশুকে। গালে হাত দিয়ে ধুলোর মধ্যেই বসে পড়ল বেচারি। তার

নরম গালে দাদুর পাঞ্জাছাপ ফুটে উঠেছে।

দুরন্ত ত্রোণে উঠে দাঁড়ালেন রূপেন্দ্রনাথ। বলিষ্ঠ গঠন যুগাপুরুষ। মেদসর্বস্ব ভবতারণ তাঁর অপেক্ষা অন্তত পাঁচিশ বছরের বড়। মাথায় একবিঘ্ন ছোট। রূপেন্দ্রের একটি মুষ্টিাঘাতে ঠিক এভাবে চোয়ালে হাত দিয়ে ধুলোর উপর বসে পড়তেন দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নায়বমশাই। কিন্তু নিতান্ত ঘটনাচক্রে সে দু'ঘটনা ঘটল না। তার পূর্বেই অস্ত্রীক্ষ থেকে বজ্রগঞ্জীরস্বরে যেন দৈববাণী হল! — ক্ষান্ত হও রূপেন্দ্রনাথ!

রূপেন্দ্রনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন, পূর্বমুহূর্তে আড়াআড়িভাবে উদ্যানটা অতিক্রম করছিলেন গৃহস্থানী স্বয়ং। সমস্ত ঘটনাটা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দীর্ঘদেহী মানুষটি বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন ঘটনাস্থলে। প্রথমেই ধুলো থেকে কোলে তুলে নিলেন, প্রায় জ্ঞানহীন বালিকাটিকে। তারপর এদিকে ফিরে বললেন, তুমি ওকে ওভাবে মারলে কেন, ভবতারণ?

ভবতারণ ততক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন, বললেন, দিন ওকে—

দুটি হাত বাড়িয়ে দিলেন নাতনিকে কোলে নিতে।

এক-পা পিছিয়ে গেলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। বললেন, কথা ঘুরিও না ভবতারণ। প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার এই চণ্ডালী ত্রোণের কৈফিয়ৎ দাও।

ভবতারণ স্পষ্টই বিরক্ত বলেন। বললেন, কৈফিয়ৎ আবার কী দেব? অন্যায্য করেছিল, তাই শাসন করেছি। আমার নাতনিকে আমি শাসন করতে পারব না?

—পারবে। তোমার ভদ্রাসনের চৌহদ্দিতে। এখানে এই বাড়িতে তোমার মতো এই শিশুটিও আমার নিমজ্জিত অতিথি। ফলে, আমাকে ব্যাপারটা সমঝে নিতে হবে বইকি, গঙ্গুলী। বল, শিশুটি কী-এমন অন্যায্য করেছিল, যাতে এ-ভাবে ওকে চপেটাঘাতে অজ্ঞান করে দিলে।

ভবতারণ কুণ্ঠিত হয়ে হলেন, না, না, কী বলছেন। অজ্ঞান কেন হবে? দিন ওকে আমার কোলে—

বজ্রগঞ্জীরস্বরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বললেন, না। উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে দৌহিত্রীকে কোলে নেবার অধিকার তুমি চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলেছ, ভবতারণ। এখন থেকে ও থাকবে ওর পিতার কাছে।

—মানে? আপনি কি সেই জন্যই এভাবে ষড়যন্ত্র করেছেন? কৌশলে-ইটাকে কেড়ে নিয়ে নিজের শিষ্যের হাতে তুলে দিতে চান? তাই অন্যেই কি আমার সপরিবার নিমজ্জন হয়েছে এই শ্রদ্ধা বাড়িতে?

জগন্নাথ বললেন, তুমি আমার অতিথি। তাই আজ তোমার এই ঘণিত অভিযোগের জবাব আমি দেব না। তবে এটা জেনে রাখ, এ শিশুটিকে আর তুমি ফেরতও পাবে না।

ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় ফরাসীভাষার ডাকসহিটে শায়েব। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দক্ষিণহস্ত। যে ইন্দ্রনারায়ণ হচ্ছেন ফরাসী গভর্নর ডুপ্লেক্সের দেওয়ান এবং অর্থকৌলিন্যে একমাত্র জগৎশেঠ ছাড়া গৌড়মণ্ডলের আর সকলের সঙ্গেই যিনি টেক্কা দিতে পারেন—বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, নাটোরের রানী। ভবতারণের দশটে বাঘ-গরুরতে একঘাটে জল খায়। টুলোপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে তিনি থোড়াই কেয়ার করেন। বললেন, কাজটা

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

যত সহজ হবে মনে করছেন, অতটা সহজ হবে না কিন্তু, ঠাকুরমশাই। ত্রিবেণী থেকে হটীর বাপ সোএগ্রই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না, যদি না উপযাচক হয়ে নিজেকে কোলে করে আমার নাতনিকে ফরাসডাঙায় আমার ভদ্রাসনে ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

জগন্নাথ পুরো দশ-মুহূর্ত অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন ভবতারণ গাঙ্গুলীর দিকে — নির্বাক, নিম্পন্দ। তারপর বললেন, কেন গাঙ্গুলী? তোমার সৈন্যবল আছে, তাদের বন্দুক আছে, গাঙে যে ফরাসী জাহাজ ভাসছে তাতে কামান বসানো আছে! সেই জন্য?

—আপনি তো সবই জানেন। তবে একটি কথা আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, পঞ্চনন-ঠাকুর। জীবিতকালে ঘনশ্যাম সার্বভৌমের প্রতি আপনি অনেক অন্যায্য করেছেন — তার শ্রাদ্ধটাও নির্বিঘ্নে হতে দিলেন না, নিজের দস্তে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ অভূক্ত ফিরে যেতে বাধ্য হবে আপনি যদি আমার নাতনিকে ফিরিয়ে না দেন।

এবারও দীর্ঘসময় জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে জগন্নাথ তাকিয়ে রইলেন অতিথির দিকে। তারপর কোন কথা না বলে ঘুমন্ত শিশুটিকে কোলে নিয়েই বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন বার-মহলে।

দ্বিতলের অলিম্প থেকে তুলসী অনেকক্ষণ ধরে ঘটনাটা দেখছিল। বস্ত্রত রূপেন্দ্রনাথ যখন ছাতিম গাছতলার নির্জনে এসে বসেন তখন থেকেই। সম্পর্কে শালী, তবুও নিমন্ত্রণ বাড়িতে সর্বসমক্ষে সে সাহস পাচ্ছিল না ওঁর দিকে এগিয়ে যেতে। কে-কী মনে করবে। এখন সে দ্রুতপদে নেমে এল নিচে। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছালো ঘটনাস্থলে। বললে, কী হয়েছে বাবা? ঠাকুরমশাই হটিকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন?

ভবতারণ বললেন, সে-সব কথা তোর না জানলেও চলবে। তুই ভিতরে যা। তোর মাকে চলে আসতে বল। আমরা এখনই ফরাসীডাঙায় ফিরে যাব। এখুনি!

—এখুনি? মানে? আমাদের কারও তো মধ্যাহ্ন আহার হয়নি? তুমি খেয়েছ?

—আমরা কেউই এই শ্রাদ্ধবাড়িতে জলস্পর্শ করব না। যা, তোর মা-কে ডেকে নিয়ে আয়। এই মুহূর্তে।

তুলসী ঘুরে দাঁড়ালো। রূপেন্দ্রনাথের মুখোমুখি। তিনি যে ভঙ্গিমায়ে বাহুবল্লীপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন যোটিকে আর দেড়-দুশ বছর পরে বলা হবে বিবেকানন্দের দ্যায়-বিকশিত সমুন্নত ভঙ্গি। তাঁকেই প্রশ্ন করল তুলসী, কী এমন ঘটল বাঁড়জে-মশাই ইতিমধ্যে, যাতে...

গর্জে উঠলেন ভবতারণ, তুই ভিতরে যাবি, না তাকেও হটীর মতো শাসন করতে হবে?

তুলসী তার বাপের দিকে ফিরে তাকালো। কী-একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না, তার পূর্বেই ওদিক থেকে এগিয়ে এলেন চতুষ্পাঠীর জনৈক অধ্যাপক। নগ্নগাত্র উত্তরীয়, নগ্ন পদ, মাথায় অর্কফলার বৈজয়ন্তী, মস্তকের সম্মুখভাগ বিদ্যাসাগরী-রীতিতে ক্ষৌরীকৃত। যুক্তকরে ভবতারণ ও রূপেন্দ্রকে নমস্কার করে বললেন, আমার নাম হররাম বাচস্পতি। আমি এই টোলে ন্যায় ও বেদান্তের অধ্যাপনা করি। আপনাদের দুজনকে ডাকতে এসেছি।

আপনাদের দুজনকে বৈঠকখানা ঘরে ডাকছেন।

ভবতারণ বলেন, কে? আপনাদের মালিক পঞ্চানন-ঠাকুর?

ওঁর বাচনভঙ্গিতে একটি ক্ষুব্ধ হলেন হররাম। ভ্রূয়ুগলে একটি কৃষ্ণনরেখা জেগেই মিলিয়ে গেল। বললেন, আজ্ঞে না। আপনাদের আহ্বান করেছেন ফরাসীভাষার দেওয়ান মহিমার্গব ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী!

ভবতারণ একটি চমকে ওঠেন। বলেন, তিনি এসেছেন? কতক্ষণ? তাঁরও আসার কথা ছিল তা তো জানতাম না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছেন। এই কিছুক্ষণ হল। সস্ত্রীকই এসেছেন। আপনাদের দুজনকে ডাকছেন।

—চলুন।

তুলসী ভিতরবাড়ির দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল; বাচস্পতি বললেন, আপনাকেও ডেকেছেন, মা-লক্ষ্মী। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে।

তুলসী অবাক হয়ে বলে, আমাকে? আমাকে তো দেওয়ানজী চেনেনই না।

—আজ্ঞে না। আপনাকে ডেকেছেন আমাদের গুরুদেব তর্কপঞ্চানন-ঠাকুর।

—ও আচ্ছা। চলুন।



পঞ্চানন-ঠাকুরের বৈঠকখানাটি প্রকাণ্ড। ঘরের মাঝামাঝি বিশাল একটি নিচু জাজিম-ফরাস বিছানো চোকির সঙ্গে জোড়া দেওয়া চৌকি। ইতস্তত তাকিয়া ছড়ানো দেয়ালের প্রাচীর বরাবর কাঁঠাল-কাঠের হাতলহীন কেদারা। তার উপর পশম অথবা কুশের আসন। সেগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্য, যাঁরা জাজিম-ফরাসের স্পর্শ বাঁচিয়ে দরবার করতে চান। মাথার উপর প্রকাণ্ড টানা-পাখা। যে দুজন টানে তারা থাকে পাশের ঘরে। শ্রমতি ও দৃষ্টিসীমার বাহিরে। কক্ষের দূরতম প্রান্তে একটি বেতের আরাম-কেদারা। পাশে একটি কাঠের সাদামাঠা টুল। তার উপর তাম্বুট-সেবনের আয়োজন — আলবোলা।

ভবতারণ, রূপেন্দ্রনাথ আর বাচস্পতি ঘরে ঢুকে দেখলেন, আরামকেদারায় অধশায়িত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। রাজকীয় পোশাক, মস্তকে হীরকখচিত রেশমী উষ্ণীষ। তাতে

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

একছড়া মুক্তার মালা জড়ানো। কণ্ঠেও মুক্তমালা। কটিদেশে বিলম্বিত তরবারি — মোঘল-পাঠান ঢঙের বঙ্কিম তরোয়াল নয় — ফরাসী-বীরিতর স্বজু কৃপাণ। জগন্নাথ তর্কগঙ্গানন বসে আছেন কাছাকাছি কাঠাসনে। কুশাসনে। তাঁর কাঁধে ঘুমন্ত বালিকাটি। বোধ করি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওঁরা তিনজনেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন। তুলসী কপাটের বাহিরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওঁদের দেখতে পেয়ে ইন্দ্রনারায়ণ ফরসির নলটি নামিয়ে রাখলেন। ভবতারণকে আহ্বান করলেন, আরে এস, এস, গাঙ্গুলী। কতক্ষণ এসেছ? বস এইখানটায়।

ভবতারণ যুক্তকরে নমস্কার করে ফরাসের একান্তে একটি তাকিয়া টেনে নিয়ে বসলেন; কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিছু বলার পূর্বেই ইন্দ্রনারায়ণ পুনরায় বাত্ময় হয়ে ওঠেন, আর উনিই বুঝি সেই ভেষগাচার্য? মন্তবলে যিনি বর্গীসদারকে দামোদরে হস্তিসমেত ডুবিয়ে মেরেছিলেন?

রূপেন্দ্রনাথ করজোড়ে প্রতিবাদ করেন, এ-সব বিশ্বাসপ্রবণ গ্রাম্য লোকের রটনা মাত্র। বর্গীসেন্যদের প্রতিহত করেছিল গ্রামের প্রতিরোধশক্তি — বিশেষ করে কিছু অচ্ছুত সম্প্রদায়ের ধানুকীর দল।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, তাই বুঝি? আর বর্ধমানের নায়ব-কানুনগো নগেন দত্তজার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী? তার মৃগীরোগটা সারালো কে? কী ভাবে? শুনেছি, গতবছর দত্তজা পুরুষোত্তমধামে গেছিল?

স্তুভিত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। ফরাসীডাঙায় বসে ঐ দেওয়ানজী কেমন করে জ্ঞাত হলেন, নগেন দত্তের পরিবারের এই গুহ্য তথ্য! তিনি কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু এবারেও ইন্দ্রনারায়ণ তার পূর্বেই বলে ওঠেন, আর প্রবেশদ্বারের বাহিরে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎঝলক নজরে পড়ল মনে হচ্ছে। মালক্ষীর ইতস্তত করার হেতুটা কী?

তুলসী সব সঙ্কেচ ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এল, সর্বপ্রথম প্রণাম করল — না, বৈঠকখানার মধ্যমণি দেওয়ানজীকে নয়, নগ্নগাত্র পণ্ডিতমশাইকে। তারপর পর্যায়ক্রমে সকল ব্রাহ্মণকেই।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, তোমাকে আগে একবারমাত্র দেখেছি তুলসী-মা। কিন্তু জগদ্ধাত্রীকে তো ভোলা যায় না। তাই তোমার শাড়ির বিদ্যুৎঝলক প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি দেখেই চিনেছি। তোমাকে একটি দায়িত্ব দিচ্ছি তুলসী, মা। অন্দরমহলে গিয়ে তোমার জননী এবং জেঠিমা, অর্থাৎ আমার সহধর্মিণীকে, খুঁজে বার কর। বাচস্পতি-মশাই ব্যবস্থা করে দেবেন। তাঁর কোন ছাত্র একটি পৃথক কক্ষে তোমাদের আর আমাদের পরিবারের মহিলাদের পংক্তি-ভোজনে বসিয়ে দেবেন। শ্রাদ্ধকার্য এখনো সমাপ্ত হয়নি, ঠিক কথা, ষোড়শ-শ্রাদ্ধ এত শীঘ্র সমাপ্ত হয়ও না; কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে আমাদের অবিলম্বে ফরাসীডাঙায় ফিরে যেতে হবে। পংক্তি-ভোজন শুরু হয়ে গেছে, সত্যিই এতে আপত্তির কিছু নেই।

তুলসী কোন কথা বলার আগেই ইন্দ্রনারায়ণ বাচস্পতি-মশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, ঠাকুরমশাই! আপনার কোন দায়িত্বশীল ছাত্রকে বলুন, অন্দরমহলে একটি একান্ত কক্ষে আমার এবং গাঙ্গুলীর পরিবারস্থ সকলকে পংক্তি-ভোজন বসিয়ে দিতে। আর আমাদের দুজনকেও বাহির-মহলের কোন একটি পৃথক কক্ষে...

বাচস্পতি একটি নমস্কার করে বললেন, এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ভবতারণ কী-যেন বলতে চাইছিলেন; তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, তোমাকে এখনো বলাই হয়নি। সাহেব সন্ধ্যা ছয়টার সময় তাঁর কাসুল-এ আমাদের দেখা করতে বলেছেন। একান্তে তোমাকে আর আমাকে। কারণটা জানি না।

বলাবাহুল্য ‘সাহেব’ অর্থে ফরাসী গভর্নর-জেনারেল ডুপ্লেস্স।

বাচস্পতি ততক্ষণে নিঃশব্দ হয়ে গেছেন। জগন্নাথ এ পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। তুলসী আদিত্য হয়েও প্রাচীর-সই সই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ, সে বিস্মৃত হয়নি, বাচস্পতি-মশাই তাকে বলেছিলেন ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

ভবতারণ নড়ে-চড়ে বসলেন। প্রণিধান করলেন, এটি তর্কপঞ্চাননের একটা ‘ওটসাই-কিস্তি’। আগেভাগেই ইন্দ্রনারায়ণকে কজা করে জানিয়েছেন যে, তাঁর নায়েব ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় জলস্পর্শ না করে শ্রাদ্ধবাড়ি থেকে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প জানিয়েছেন। তাতেই ইন্দ্রনারায়ণ দক্ষ অসিচালকের মতো চতুর্দিকে লক্ষ্য রেখেই আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করে চলেছেন।

ভবতারণ বললেন, একটা কথা! আমি কিছু আহ্বার করতে পারব না এখানে। আমাকে মার্জনা করবেন। আপনি মধ্যাহ্ন আহ্বার সেরে নিন, তারপর আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বরং ফরাসীডাঙায়...

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি। ক্ষুধামান্দ্য। তা তো হতেই পারে। তোমার বেশ মেদবৃদ্ধি হয়েছে গাঙ্গুলী। মাসে দু-একদিন উপবাস তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই। তবে কী জান, ভবতারণ? তোমারই গরহজম হয়েছে—নাগ, কূর্ম, কুকরায়, দেবদত্ত আর ধনঞ্জয়ের তো তা হয়নি। সুতরাং পশমের আসনে বস। পঞ্চদেবতাকে অন্ন নিবেদন কর। তদনন্তর যেটুকু তোমার উদর অনুমতি দেয় সেটুকুই সেবা কর। তারপর আচমন করে উঠে যেও। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভব, এখানে কোন লাস্যময়ী সুন্দরী এসে তোমাকে পীড়াপীড়ি করবেন না: ‘এটা খাও, ওটা খাও, নাইলে আমার মাথা খাও!’ উপরোধে টেঁকি গিলতে হবে না তোমাকে। সেজন্যই এই বার-মহলের একান্তে ব্যবস্থা করতে বলেছি।

ভবতারণ একগুঁয়ে বলিবর্দের মতো ঘাড় নিচু করেই রইলেন। হঠাৎ বলে ওঠেন, আমাকে মার্জনা করবেন। আমার সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূর্বেই গৃহস্থমীকে জ্ঞাপিয়ে দিয়েছি: আমি এ শ্রাদ্ধবাড়িতে জলগ্রহণ করতে পারব না।

যে স্থূল কদর্য কথাটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য এত কল্কাকৌশল, এত কৌতুক, এত হাস্যরস, তা সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। যেন পঙ্ককুণ্ড থেকে উঠে-আসা এক বন্যবরাহের স্থূল দেহবলেপনে ফেনশুভ্র ফরাসিটি কর্দমলিপ্ত হয়ে গেল। ইন্দ্রনারায়ণ চারিদিকে দৃকপাত করলেন। বাচস্পতি প্রস্থান করেছেন, তুলসী কপাটের আড়ালে আত্মগোপন করেছে, রূপেন্দ্রনাথ মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি, আর জগন্নাথ নিমীলিতনেত্র।

ঘনশ্যাম সাবভোম

সোজা হয়ে উঠে বসলেন ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, তুমি একটা সুপরিচিত চাণক্য শ্লোক বিস্মৃত হয়েছ ভবতারণ: “স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।” ফরাসীডাঙার চৌহদ্দির বাইরে প্রবল প্রাথাপাতিত নায়েব ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়কে কেউ চিনতে পারবে না। ঠিক যেমন গাঙ্গেয় গৌড়মণ্ডলের বাহিরে এই হীরক-উষ্মীষ শোভিত ইন্দ্রনারায়ণের পরিচয় হচ্ছে: ‘কেই আনজান শেঠ হোণা সায়েদ!’ কিন্তু বদরীকাস্ত্রম থেকে কন্যাকুমারিকা, কামাক্ষ্যা থেকে দ্বারকা — তুমি ঐ নগ্নপদ-নগ্নগাত্র টুলো পণ্ডিতটার নাম উচ্চারণ করে দেখ, ভবতারণ, — প্রতিটি জনপদের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ওঁকে চিনবেন। উদ্দেশে হাত তুলে প্রণাম জানাবেন। আজ থেকে একশ বছর পরে এই গৌড়দেশে তোমার-আমার নাম যদি আদৌ উচ্চারিত হয়, তবে তা কেন হবে জান? আমরা দুজনে ছিলাম যুগান্তকারী মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমকালের মানুষ। তুমি তোমার ঐ চণ্ডালে ত্রৈলোক্যকে মূলধন করে অমন একজন সর্বভারতীয় সর্বজনমান্য মহাপণ্ডিতকে অপমান করবে, আর আমরা তা নীরবে সহ্য করে যাব? তুমি ভেবেছটা কী?

ভবতারণ বললেন, কিন্তু আমার দৌহিত্রী — হটী। উনি যে কায়দা করে তাকে অপহরণ করলেন?

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমার বক্তব্যটা বৃদ্ধার মতো শিক্ষা ও বুদ্ধি তোমার নেই, তাই বলতে পারলে ‘কায়দা করে অপহরণ করলেন।’ হ্যাঁ, শোন, ভবতারণ। দৌহিত্রীকে ওভাবে আটকে রাখাটা তোমার অন্যায়া হচ্ছিল। সামাজিক অন্যায়া। নৈতিক অন্যায়া। ফরাসী ভাষাটা আমি যতটা যত্ন নিয়ে শিখেছিলাম, সংস্কৃতটা ততটা যত্ন নিয়ে শিখিনি। তবু কৈশোরে শেখা একটা শ্লোকের কিছুটা আজও মনে আছে। পুরো শ্লোকটা আজ আর মনে নেই — তোমার কৌতূহল হলে তর্কপঞ্চানন ঠাকুর তোমাকে শুনিয়ে দেবেন। তার প্রথম চরণটি ছিল: ‘পিতা রক্ষতি কৌমারে...’ অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় অন্তা কন্যার যাবতীয় দায়দায়িত্ব তার জনকের। পিতার ‘লতায়-পাতায়-সম্পর্ক-ধরে’ কোনও পিসপুত্রের নয়। কন্যা পিতার ভদ্রাসনে...

মাঝপথেই গর্জে ওঠেন ভবতারণ: ভদ্রাসন! ছিল তো কল্ল একটি পর্ণকুটীর, ইতিমধ্যে তা মাটিতে মিশিয়ে গেছে। মাথার উপর একখানা ছাদও নেই। ঐ কপর্দকহীন বস্তুণের নিজের অন্তঃস্থান কীভাবে হবে তারই স্থিরতা নেই। আমার নাতনিকে সে খাওয়াবে কী?

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবার নিজমূর্তি ধরতে বাধ্য হলেন। বললেন, ভবতারণ। ভদ্রসমাজে যদি ভদ্রভাষায় বাক্যালাপ করা ভুলে গিয়ে থাক, তাহলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। একবার বলেছি, দ্বিতীয়বার বলেছি: দূর-সম্পর্কের ঐ নাতনির উপর তোমার কোনও অধিকার নেই। না আইনত, না ন্যায়ত, না ধর্মত। তুমি শুনলাম তর্কপঞ্চানন ঠাকুরকে আরও একটি যুক্তি নাকি দেখিয়েছ — বাহবলের যুক্তি। সেটার কথা ভুলে যাও ভবতারণ — কারণ সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে স্বপক্ষে পাবে না, পাবে বিপক্ষে। রূপমঞ্জরী আজ থেকে ভেয়গাচারের কাছে থাকবে। এই মুহূর্ত থেকে। ওঁর ভদ্রাসন না থাকলে বাপ-বেটিতে গাছতলায় শয়ন করবে। অথবা হয়তো মন্দির চাতালে শোবে, কিংবা খোলা আকাশের নিচে। বাপবেটিতে হয়তো শাকসবজি খাবে, অথবা উপবাস করবে। এ বিষয়ে কোন অনধিকার চর্চা তুমি করতে

যেও না ভবতারণ, তার ফল ভাল হবে না। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মতো বসে রইলেন ভবতারণ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চনন। ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন তুলসীর দিকে। তার পিঠে একটা হাত রেখে ইঙ্গিত করলেন গুঁকে অনুগমন করতে। দুজনে বেরিয়ে গেলেন। পাশের একটি নির্জন কক্ষে — বোধকরি এটিও দুই মহালের মাঝখানে ‘অন্তরাল’ — প্রবেশ করে পঞ্চনন ঠাকুর বললেন, তুলসী, এবার এটাকে নে-মা। হতভাগী কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তুলসী ইতস্তত করল। শেষে বলেই ফেলল, আমি কেন নেব ঠাকুরমশাই? এইমাত্র তো স্থির রূপমঞ্জরীকে তার পিতার হাতে সমর্পণ করা হবে। মাঝখান থেকে আমি কেন?

জগন্নাথ হাসলেন: পাগলি মেয়ে। হাঁরে, বাপে সন্তান লাভ করে কি গুরুদেবের হাত থেকে? ওটা যে মায়ের জাতির কাজ। রূপমঞ্জরীর মা হতভাগিনী এ’ সৌভাগ্য লাভ করতে পারল না। অন্তত তার ছোট-মাই কাজটা করুক। তুই নিজে হাতে গুঁকে তুলে দিবি বাপের কোলে। আমি শুধু পথের বাধাগুলো সরিয়ে দিয়ে গেলাম। কী আক্ষেপের কথা। রূপেন্দ্র একটা অনড়ন। একটা বলির্বাদ। কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের বিপত্নীক যুবক। কন্দর্পকান্তি রূপ। জিদ্দিবাজি না করলে শুধু কন্যাসম্মান নয়, তার ছোট-মাকেও বরণ করে ঘরে তুলতো আজ। কিন্তু না। তা হবার নয়। একবল্লা-ঠাকুর বিস্বাস করে হিন্দু-বিধবা যদি পুনর্বিবাহ করতে না পারে তাহলে হিন্দু বিপত্নীকও পুনর্বিবাহের অধিকারী নয়। এ মুখামির কোনও অর্থ নয়?

তুলসী বলল, হয়-কি-না হয় তা আমি কী জানি ঠাকুরমশাই? শাস্ত্রে কী বিধান আছে তা আপনাই জানেন। তবে জামাইবাবু যা বলেন — পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার সমান হওয়া উচিত — সে কথা স্বীকার করলে, কথটা অযৌক্তিক নয়।

পণ্ডিত বললেন, তোরা দুটোই উন্মাদ।

তুলসী নিঃশব্দে ঘুমন্ত রূপমঞ্জরীকে বৃদ্ধের কোল থেকে নিয়ে নিল।

বৃদ্ধ বললেন, একটা কথা, মা। তুই কালপরশুর মধ্যে ওর পুতলা-পুতলিগুলি আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি।

—পুতলা-পুতলি! তার মানে?

—বুঝি না? কাল থেকে শুরু হবে ওর কৃষ্ণসাধনা। দাদামশায়ের প্রাসাদে বিলাসের দিন শেষ হয়ে গেল ওর। ঐ-সঙ্গে হতভাগিনী নতুন করে মাতৃহীন হল। ঐ অনড়নটার জিদ্দিবাজিতে! বাপকে সে চেনে না, দ্বিতীয়বার হারালো মাকে। পুতলিগুলো না পেলে ও বাঁচবে কী নিয়ে?

তুলসী অবাক হয়ে গেল ঐ কটুর পণ্ডিতের অন্তরে প্রবাহিত স্নেহ-জাহ্নবীর পরিচয় পেয়ে। বৃদ্ধকে প্রণাম করে বলল, আপনি কাল আপনার কোন বিশ্বস্ত ছাত্রকে ফরাসীভাষায় পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে হাতচিঠি দিয়ে — যাতে ছাত্রটিকে চিনতে পারি।

—তোর অক্ষর পরিচয় হয়েছে?

—তা হয়েছে। আমি চিঠি দিতে বলছি এজন্য যে, আমি আপনার ছাত্রের হাতে দিদির

ঘনশ্যাম সার্বভৌম

গহনাগুলিও পাঠিয়ে দেব একটা তালিকা সমেত। এগুলো দিদির বিবাহ-যৌতুক। সোএগ্রাই গাঁয়ের জমিদারমশাই ওকে দিয়েছিলেন। জামাইবাবুকে আমি সেগুলি ফেরত দিতে চেয়েছিলাম, তিনি গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, হটীর বিবাহে সেগুলি যৌতুক দিতে। আজ যখন হটীকেই ফেরত দিতে হচ্ছে তখন অলঙ্কারগুলিও আমি প্রত্যাগণ করতে চাই।

জগন্নাথ বললেন, ঠিক আছে। তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি সেই হস্তিমূখ অনঙ্গনটাকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরেই রূপেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত দ্বারপ্রান্তে। প্রশ্ন করলেন, ভিতরে আসতে পারি?

তুলসী তখনো মুখে কাপড় গুঁজে হাসছে। হাসতে হাসতেই বললে, আসুন, আসুন শ্রীযুক্ত হস্তিমূখ অনঙ্গন।

রূপেন্দ্র ভিতরে এসে বলেন, হঠাৎ এমন গৌরবময় সম্বোধন?

—না, বাঁড়ুজ্জৈ মশাই। এটা আপনার শ্যালিকার দেওয়া উপাধি নয়। আপনার গুরুদেবই বলে গেলেন। কেন জানেন? যেহেতু আপনি বিকল্প-মাতা সহ কন্যাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। এই নিন, আপনার বুক-জুড়ানো ধন।

অতি সাবধানে রূপেন্দ্রনাথ ঘুমন্ত শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, তুমি তো জানই তুলসী, কেন আমি...

—বাস! বাস! আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে না। আমি জানি আপনার মতামত: যতদিন না বিধবাদের বিবাহ সমাজে গৃহীত হচ্ছে, ততদিন বিপত্নীকেরাও বিবাহ করার অধিকারী নয়। তাই তো?

—তুমি কি এই যুক্তিটা মান না?

—আমার প্রশ্ন তা নয়। আমার জিজ্ঞাস্য: যতদিন সতীদাহ প্রথা রোধ না হচ্ছে ততদিন স্বীর বিরোধে বিপত্নীক স্বামীদের সহমরণে যেতে বাধ্য করতে কেন আপনি আন্দোলন করছেন না?

—কৌতুকের সময় নেই তুলসী। হয়তো এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। আজ তোমার বাবার যা অবস্থা হয়েছে, তাতে প্রাক্তন জামাতা হিসাবে তোমাদের বাড়িতে যদি কোনদিন মাথা গলাই...

—থামুন আপনি। তাই বলে আমাদের আর কখনো দেখা হবে না কেন? মহান্নদ যদি পর্বতের কাছে না আসতে পারেন, তাহলে পর্বতই যাকে মহান্নদের কাছে।

—তার মানে? তুমি সোএগ্রাই আসবে? পিসেমশাই অনুমতি দেবেন? কক্ষনো নয়।

তুলসী ঠোট উল্টে বললে, ঠিকই বলেছেন আপনার গুরুদেব। আপনি একটি হস্তিমূখ অনঙ্গন। দেওয়ানজী যে উদ্ভট শ্লোকটা শোনালেন — যার জোরে আপনি আজ হটীকে ফেরত পেলেন — তার পরের চরণটি মনে নেই? “ভর্তা রক্ষতি যৌবনে!” আপনি, মুখ ফিরিয়ে রইলেন বলে আমি তো সারা জীবন ‘থুবড়ি’ হয়ে থাকব না। আমার মালিকানাও বদলাবে। তেমন সুদিন এলে সোএগ্রাই তীথেই বা বাব না কেন?

—এস, তুলসী। আমার নিমন্ত্রণ রইল।

—সেদিন কিন্তু আমার আজকের দান কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিতে হবে। বুঝেছেন?

রূপেন্দ্রর হ্রস্বশ্বাস হয়। বলেন, না, বুঝলাম না!

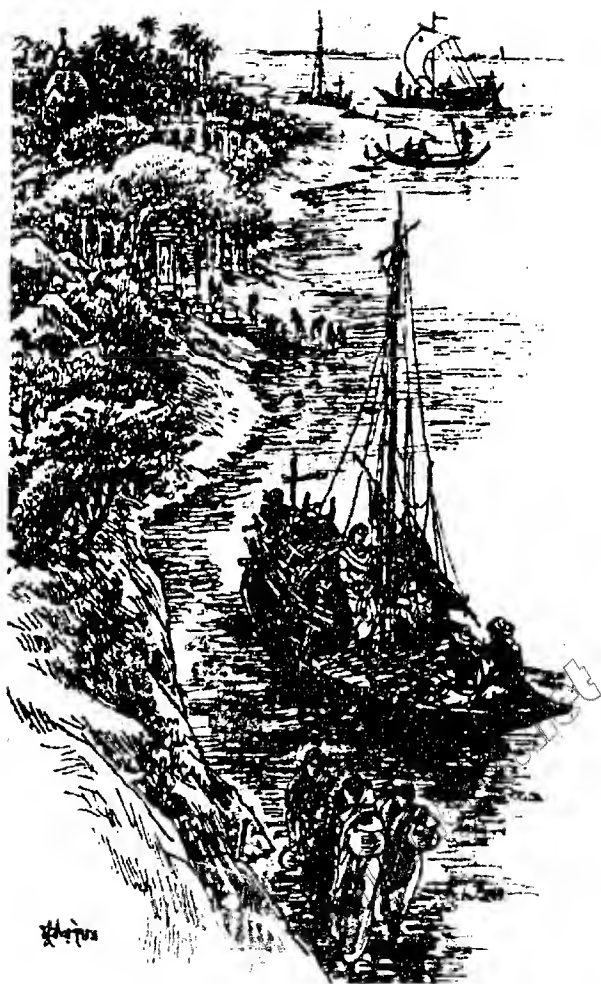
নতনয়নে তুলসী বলল, দিদির জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটল, আমি তা ঘটতে দেব না আমার জীবনে। আপনি শুধু আমার ভগ্নিপতি নন, আপনি ভেষগাচার্য। তাই সন্ধোচ করব না। স্পষ্টই বলছি, তেমন-তেমন অবস্থা যেদিন হবে সেদিন আমি পাল্কি চেপে সোঁঞই চলে যাব। আমার বুকজোড়া ধন আজ আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। সেদিন আপনি তা আমাকে ফেরত দেবেন।

রূপেন্দ্রর কণ্ঠে রসিকতার বাষ্পমাত্র রইল না। বললেন, ঠিক কথাই বলেছ তুলসী। তোমার বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ হবে না; কিন্তু তোমার সন্তানকে জন্ম দেবার সৌভাগ্য থেকে যেন বঞ্চিত কোরো না আমাকে।

তুলসী নত হয়ে প্রণাম করল রূপেন্দ্রকে।

রূপেন্দ্র যুক্ত করে বললেন: ওঁ নমো নারায়ণায়।

pathagor.net





রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

1748

দশম পর্ব

বৈশাখের শেষ সপ্তাহ। মেঘরাশিস্থে ভাস্করে, শুক্রে পক্ষে, তৃতীয়াং তিথৌ। অর্থাৎ পুণ্যাহঃ অক্ষয় তৃতীয়া। সময়কালটা আজ থেকে প্রায় আড়াই শ বছর অতীতের। সঠিক হিসাবে এগারো শ' পঞ্চাশ বঙ্গাব্দ। যাবনিক বিচারে খ্রিস্টীয় 1748 সাল।

রঘুনন্দনের মতানুসারে এই পুণ্যাহেই ভগীরথের প্রার্থনায় জহ্নু-তনয়া হিমালয় থেকে অবতরণ করেছিলেন গাঙ্গেয় মর্ত্যভূমে—সগরপুত্রদের উদ্ধার করতে। শুধু তাই নয়, এই অক্ষয় তৃতীয়াতেই গুরু হয়েছিল বর্তমান কল্লের সত্যযুগ।

বর্ধমানভুক্তির একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম : সোএগ্রাই। দামোদর নদের সমান্তরালে বিস্তৃত। ভদ্রপল্লী সবই দক্ষিণ তটে ; ওপারে—উত্তরপাড়ে, জল-অচল অক্ষুৎদের বাস। ঘননিবিড় গাছ-গাছালির মধ্যে উলুখড়ের একচালা ; কখনো বা দোচালা। মটির দেওয়াল, কঞ্চির বেড়া। গ্রামের সীমানা—অস্তগামী সূর্যকে শ্রেষপ্রণাম জানাতে পশ্চিমে তেঁতুলবট ; উদয়ভূমিকে প্রথম প্রণাম জানাতে ভোলাবাবার মন্দিরের ধাতব ত্রিশূল। উত্তরে দামোদর নদ আর দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের শেষ প্রান্ত।

এই গ্রামেরই মেয়ে আমাদের কাহিনীর প্রধানা চরিত্র : ইটা বিদ্যালঙ্কার : রূপমঞ্জরী। যাঁর কথা শোনাব বলে এত আয়োজন, অথচ এখনো সেই গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই এসে পৌঁছাননি। এবার আসছেন : এই দশম পর্বে! পিতৃহীন হতে।

সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকেই আজ দামোদরের ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড়। জমিদারের অর্থানুকূলে চণ্ডা সোপানশ্রেণী নেমে গেছে জলে। মাঝখান দিয়ে দু' ভাগ করা। একদিকে পুরুষদের ঘাট তাঁটির দিকে ; অপরদিকে, উজ্জল স্নানার্থীদের স্নানঘাট। মাঝখানে ঘাটোয়াল লহমপ্রসাদের বিরাট গোলপাতার 'ছত্র'। স্নানান্তে পুণ্যার্থীরা ঘনিয়ে আসে, পাণ্ডাজী প্রতিষ্ঠিত শিউরী মহারাজের মাথায় ফুল বেলপাতা চড়ায়। কমণ্ডলু থেকে গঙ্গোদক ঢেলে দেয় শিবের মাথায়—হাঁ, এই অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিনে দামোদরের জল গঙ্গাজলের মতো

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

পবিত্র। স্নানার্থীরা দু-পাঁচ কড়ি প্রণামীও দেয়। পরিবর্তে কপালে নেয় চন্দনছাপ, শ্বেতচন্দনের মাসলিক চিহ্ন। গ্রহণ করে চরণামৃত, প্রাসাদী ফুল ও পোঁড়া।

পুরুষদের ঘাটে পুণ্যস্নান করছিলেন গ্রাম্য জমিদার তারাশ্রম ভাদুড়ী। বয়স দেড় কুড়ির কাছাকাছি। সঙ্গে তাঁর বালকপুত্র—বংশের সম্ভাবনাময় সন্তান। তার বয়স আট বৎসর। নাম : শুভপ্রসন্ন। শুভ্রের স্নান ও ঝাপাইজোড়া শেষ হয়েছে। ভিজা কাপড় ভূতা কালিপদকে দিয়ে, কাচা কাপড় পরে সে উঠে গেছে পাণ্ডাজীর ছত্রছায়ায়। হাঁটু গেড়ে বসেছে ললাটে কৃষ্ণজীর আশীর্বাদ চরণছাপ নিতে। তারাশ্রম দামোদর নদে আবক্ষ নিমজ্জিত অবস্থায় বাল্মীকি বিরচিত গঙ্গাষ্টকং আবৃত্তি করছিলেন : মাতঃ শৈলসূতাসপত্তি বসুধাশ্চন্দারহরাবলি স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি ভগবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়...”

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত এই গঙ্গাশ্লেষ, কী ছন্দে, কী সমাসবদ্ধতায় বেশ কঠিন। আর-সকলেই সেজন্য অবগাহনস্নানকালে যে গঙ্গাস্তব আবৃত্তি করে তা আদি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত, অতি পরিচিত “দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে।” কিন্তু তারাশ্রমের স্বর্গগত পিতৃদেব ছিলেন বিচিত্র মেজাজের মানুষ। গড়লিকাপ্রবাহে গা-ভাসাতে গররাজি। সব বিষয়েই! এমনকি গৃহাবরোধের ভিতর জীবনসঙ্গিনীকে সংস্কৃত শিথিয়ে দুজনে শ্বেদারসের আশ্বাদন করতেন। কালিদাস, ভবভূতি, ভাস-এর সঙ্গী হয়ে। তাই শৈশবেই পুত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়েছিলেন বাল্মীকি-বিরচিত এই বিচিত্র গঙ্গাস্তবটি।

আগেই বলেছি, বর্ধমানভূমির জনগণের বিশ্বাস : অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যাহে দামোদরের জলও মা-গঙ্গার জলের মতো পবিত্র হয়ে ওঠে। এই ধারণাটা এসেছে অজয়নদ-তীরবর্তী গ্রামবাসীদের বিশ্বাস থেকে। গঙ্গা নাকি কালনা-কাটোয়া থেকে উজানে অজয় তীরবর্তী গ্রামে ঐ পুণ্যাহে আগমন করেন। দামোদরে তা হওয়ার উপায় নেই। দামোদর গঙ্গায় পাড়েনি। কিন্তু সে যুক্তি মানতে চায় না... দামোদরের তীরবর্তী গ্রামের মানুষজন। আর মানেই বা কী করে? মনকে কিছু একটা বুঝ দিতে হবে তো!

তারাশ্রমের সহসা নজর হল পূর্বদিক থেকে একটা প্রকাণ্ড মহাজনী গৃহস্থার-নৌকা পালের পর পাল তুলে শুভ্র রাজহংসের মতো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। যদিও নৌকাটি মাঝ-দরিয়ায় এবং এই বৈশাখের শেষ সপ্তাহে দামোদর নদ শীর্ণকায়, তবু বড় বড় ঢেউ এসে ভাঙছে পাড়ে। ছোট-খাটো ডিঙিতে সামাল-সামাল বুঝ উঠেছে। ঘাট থেকে যারা সাঁতরে মাঝনদে চলে গিয়েছে তারা মজাসে ঢেউ খাচ্ছে। গৃহস্থার-নৌকা সচরাচর হয় বহুযাত্রীবাহী। মাল বহন করে না। এটি ঠিক তা নয়। এটিতে যাত্রী ব্যতিরেকে মালও বহন করা হয়। পাঠাতনের নিচে সার দেওয়া কলসি। গঙ্গাজলে পূর্ণ। উপরের ঐ ‘ও’ লেখা গৈরিক নিশানটি দেখে সবাই চিনতে পেরেছে। এ-নৌকা একপক্ষে একবার করে নবদ্বীপ-কাটোয়া হয়ে এই সোএগ্রই পর্যন্ত আসে। আর একপক্ষে বাকা হয়ে চলে যায় শহর বর্ধমান। নৌকার মালিক বর্ধমানের ধনকুবের নগেন্দ্র দত্ত। বাঙলার নবাব-আলিবর্দীর রাজ-সরকারের তরফে ইজারাদার। তারাশ্রম আরও জানেন, মাসে একবার এই নৌকায় আসে দুর্গা গাঙ্গুলীর ‘আগ-মার্কা’ গঙ্গাজল। দুর্গা এই সোএগ্রই গ্রামের একজন অত্যন্ত ধনী মহাজন। কুলীন, ব্রাহ্মণ,

অর্থবান, ফলে সমাজের শিরোমণি। তাঁর কারবার দুই জাতেব—তন্তুবায়-শোষণ এবং গঙ্গাজল বিতরণ। ওঁর বিশ্বাস, প্রথমটির সঞ্চিত পাপ দ্বিতীয়টির পুণ্য ধুয়ে মুছে যায়। গঙ্গাজল ছাড়াও আসে লবণ। দুটিই গ্রামজীবনের আবশ্যিক উপাদান। লবণের নৌকা কিছু দেবী করে এলে তবু গ্রামের জীবনযাত্রা থেমে থাকবে না—বড় জোর আলুনি ব্যঞ্জনে অথবা কাঁচা-ফলারে গ্রামবাসী মনিয়ে নেবে; কিন্তু দুর্গা গাঙ্গুলী মশায়ের ‘ওঁ-গঙ্গা ছাপ-মারা গঙ্গাজলের নৌকা যদি দেবী করে আসে তবে সয়ং ‘সুঘিঠাউর মাঝ-আকাশে থমকে ভেঁড়িয়ে পড়বেন মনে লাগে।’

নৌকাখানি পারানি খোয়াঘাটের পাটাতনে এসে ভিড়ল। বড়-সারেঙ নামিয়ে দিল প্রকাণ্ড নোঙর, দামোদরের গর্ভে। তারপর অবতরণ করতে শুরু করল এক দিক দিয়ে গঙ্গাজলের কলসি, অন্য দিক দিয়ে যাত্রীরা।

হঠাৎ একটি চেনা-মানুষ দেখে চমকে উঠলেন ভাদুড়ী মশাই। মন্তোচ্চরণ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর : রূপো বন্দ্যোঘটি নয়? হ্যাঁ, তাই তো। সঙ্গে একটি বছর-তিনেকের ফুটফুটে মেয়ে। টুকটুকে গায়ের রঙ, মাথায় বেড়া-বিনুনি। দলের সঙ্গে একজন বিধবা স্ত্রীলোক।

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শো-এগই গাঁয়ের স্বনামধন্য কবিরাজ। আজ ছয় বছর প্রবাসে ছিলেন। জনশ্রুতি ‘জগন্নাথধামেও গিয়েছিলেন। বওনা হন সস্ত্রীক, বিবাহের কয়েক মাস পরেই। তারপর দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে আজ পুণ্যহের দিনে গ্রামে ফিরে আসছেন।

কিন্তু...

রূপোর সঙ্গে ঐ বিগতভর্তা ভদ্রমহিলাটি কে? শাদা খান, আবক্ষ অবগুষ্ঠন। মুখখানি তাই দেখা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ নিরাভরণা, দুটি শ্যামবর্ণের সুডৌল বাছ। আন্দাজে তারাপ্রসন্নের মনের হল, বয়স এক কুড়ির এপারে-ওপারে। প্রায় চার বছর পূর্বেই দুঃসংবাদটি পেয়েছিলেন, —পিতৃগৃহে একটি কন্যাসন্তানকে প্রসব করে রূপেন্দ্রনাথের সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী কুসুমমঞ্জরী স্বর্গলাভ করেছেন। সূতরাং ঐ কুন্দ ফুলের মতো সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি—ঐ যে বাপের হাত ধরে সাবধানে নৌকা থেকে নেমে আসছে—সে নিঃসন্দেহে কুসুমমঞ্জরীর মাতৃহীনা আত্মজা। কিন্তু ঐ অপরিচিতা বিধবাটি? শ্যামাঙ্গী যুবতীটি? কে উনি?

চকিতে আরও একটা কথা স্মরণে এল তাঁর...

—আঃ! ছি, ছি, ছি! আজ ঐই অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যাহে অমন একটা বিস্মী কথায় যেন ভেসে এল স্মরণপথে? পরক্ষণেই নিজের মনকে ধিকার দেন : না। উনি মীনু-খুড়িমা নন। হতে পারেন না। দুর্গা-খুড়ো তো বহাল-তবীয়ৎ! এ তো বিধবা। তবে কি দুর্গা খুড়োও ফৌত হয়েছেন ইতিমধ্যে?

পায়ে পায়ে তারাপ্রসন্ন এগিয়ে এলেন পারানি ঘাটের কাছে। ছোট মেয়েটি তখন শক্ত ডাঙায়। ওদের মালপত্র, বাক্স-প্যাঁটরা, পুঁটলিও নেমেছে। এখন রূপেন্দ্রনাথ ঐ যৌবনবতী বিধবাটির নিরাভরণ বামমণিবন্ধটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে অবতরণ করছিলেন। নৌকোর উপর থেকে কর্দমপিচ্ছিল ঘাটে।

: আস্তে, আস্তে, বৌঠান, খুব পিচ্ছিল আছে কিন্তু...

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

শব্দ জমিতে পা পড়তে—সে পায়ে নেই অলঙ্কার-চিহ্ন, কিংবা রূপার চটকি—
রূপেন্দ্রনাথ ঠাঁর মণিবন্ধকে মুক্তি দিলেন। ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল তারাশ্রমের
সঙ্গে।

: তারাদা না?

এগিয়ে আসেন প্রণাম করতে। তারাশ্রম বাধা দিলেন। বুকে টেনে নিলেন আগন্তুককে।
বলেন, তুমি আমার চেয়ে মাত্র চার বছরের ছোট, রূপেন। তুমি সেদিক থেকে আমার বয়স
স্বীকার কর। তারপর? এতদিনে সোণাই মায়ের কথা মনে পড়ল? কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে
গো তোমার?

ছয় বছর আগে সদ্যবিবাহিত রূপেন্দ্রনাথ যখন সস্ত্রীক তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন তখন
তাঁর ক্রয়গুলোর উপর বিষণ্ণ-খানেক ছিল সবত্রে ক্ষৌরিকৃত। মাথার পিছন দিকে গুচ্ছবদ্ধ
অর্কফলায় রক্তকরবী অনুবিদ্ধ। ক্ষৌরিকৃত ওষ্ঠলোম ও শাশ্রু। ললাট চন্দনচর্চিত, পরিধানে
ফসারিডাঙার মিহি-বুনটের পৌনধনু* গিলে-করা ধুতি।

আর আজ যখন গ্রামের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এল তখন তার একমাথা তৈলতৃষিত ঘনকৃষ্ণ
কেশদাম। শাশ্রু ও ওষ্ঠলোমে অমন সুন্দর মুখখানা পূর্ণগ্রাস চন্দ্রের মতো আবৃত। পরিধানে
অর্ধধনু মলিন বস্ত্র—হাঁটু ঢাকেনি তাতে। উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, যদি সামবেদী দীর্ঘ উপবীতটিকে
অঙ্গাবরণ বলে গণ্য করা না হয়। বলা বাহুল্য : নগ্নপদ।

রূপেন্দ্রনাথ সে-কথার প্রত্যুত্তর না করে বলেন, এটি তো শুভ? হাঁারে : তুই তো
মস্ত বড় হয়ে গেছিস।

শুভশ্রম পাণ্ডাজীর হাত ফসুকিয়ে ঘনিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পারানি ঘাটে। সেও চিনতে
পেরেছে রূপেন-খড়োকে। এগিয়ে এসে প্রণাম করল—বয়ঃজ্যোষ্ঠ তিনজনকেই। বিধবা কিছু
না বুকেই ছেলেটিকে কাছে টেনে নিলেন।

রূপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য হল, তাঁর কন্যাটি শিষ্টাচারসম্মত প্রণাম করতে এগিয়ে এল না।
দোষ তার নয়, এ-শিক্ষা সে পায়নি এতদিন। তাই তাকে বললেন, ঐকে প্রণাম কর, সোনা-
মা।

মেয়েটির পরিধানে দাদামশায়ের দেওয়া রক্তিম রেশমবস্ত্র। দু-হাতে দু-গাছি করে
আয়নারোঁচ সোনার চুড়ি। নাকে নোলক, কানে পাংলা টেঁড়ি-ঝুমকো; আর বিনা-কাজলে
কাজলকালো অতলান্ত দুটি হরিণ নয়নে অপার বিশ্বয়। পিতার আদেশে সে এগিয়ে এল।
বোঝা গেল, মেয়েটি বুদ্ধিমতী—কেউ শেখায়নি, কিন্তু শুভশ্রমের অনুকরণে সে শুধু
তারাশ্রমকে প্রণাম করেই থামল না—অপর দুজনকেও পদস্পর্শ করে প্রণাম করল।

শুভশ্রম বললে, এই মেয়েটা, ভেল্‌ভেল্‌টা। তুই আমাকে প্রণাম করলি নে যে?
চার বছরের বালিকটি এতদিনে দাসদাসীদের কাছে যে ভাষা শিখেছে সেই ভাষাতেই
বললে, ওমা, আমি কনে যাব। তুমি কি বাঁড়ল? তোমার গলায় কি পৈতে আছে?

রূপেন্দ্রনাথ মর্মাহত হলেন। কন্যার ভাষায়, তার বাচনভঙ্গিতে। কিন্তু দোষ তো তাঁরই।

* এক ধনু = 60 ইঞ্চি; ফলে পৌনধনু = 45" = 1143 মি. মি.

অনাদৃত আত্মজার শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হয়নি এতদিন।

জবাবে শুভপ্রসন্ন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলেন তারাপ্রসন্ন : হিঃ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অমন কাগড়া করে না!

তারপর রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, একে তো ঠিক...

গ্রামে পদার্পণমাত্র এই অনিবার্য প্রশ্নটির সম্মুখীন যে হতে হবে, এ-কথা জানা ছিল। ওঁর ভদ্রাসন এখন জনমানবহীন। সেই জীর্ণকুটিরে একজন যৌবনবতী বিধবাকে নিয়ে এক বিপত্নিকের পক্ষে বাস করাটা সমাজ মেনে নেবে না। ওঁর গুরুদেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও এযুক্তি দেখিয়েছিলেন। মালতীও বলেছিল। কিন্তু একবগ্না ঠাকুর কারও পরামর্শে কণপাত করেননি। এখন লক্ষ্য হল, মালতী মরমে মরে গিয়ে দামোদরের স্রোতধারার দিকে তাকিয়ে প্রস্তরমূর্তির মতো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, 'উনি আমার বোঁঠান।

—বোঁঠান! তোমার কোন বড় ভাইয়ের কথা তো কখনো শুনিনি?

—না, তারাদা, রক্তের সম্পর্ক নেই। এঁর স্বামী ছিলেন আমার বড় ভাইয়ের মতো। আমার গুরুদেবের নিজের ভাগিনেয়—মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি : ঘনশ্যাম সার্বভৌম। সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাই নিয়ে এলাম। উনি এ গাঁয়েই থাকবেন।

তারাপ্রসন্নের কৌতূহল এতক্ষণে বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বলেন, বল কী রূপেন। ত্রিবেণীর মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয়? পণ্ডিতমশায়ের প্রকাণ্ড ভদ্রাসনে এঁর স্থানসঙ্কলান হল না? শুনেছি, তর্কপঞ্চাননের সর্বতোভদ্রে প্রতিবেলায় শতধিক কলাপাতা পড়ে।

রূপেন্দ্র বলেন, ঠিকই শুনেছ, তারাদা। এর ভিতরে অনেক কথা আছে। মাঝ-সড়কে দাঁড়িয়ে তা আলোচনা না করলেও চলবে। বলব তোমাকে সব কথা। জ্যেষ্ঠামশাই কেমন আছেন?

—বাবামশাই? ও। তুমি তো কিছুই জান না। তিনি আজ দু-বছর হল গোলকে গেছেন। আগামী শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতে তাঁর তৃতীয়-বার্ষিক শ্রাদ্ধ।

—বল কি! জ্যেষ্ঠামশাই নেই।

মর্মান্বিত হলেন রূপেন্দ্রনাথ। সমগ্র গোড়বঙ্গে ঐ একটি মানুষকে নিশ্চিতভাবে স্বপক্ষে পাবেন, এই আশা ছিল মনে। বর্ধমানরাজ নয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নয়, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও নয়—সোএই গাঁয়ের সেই আধুনিকমন জমিদারটিই ছিলেন তাঁর অধ্বৈতন মনের একমাত্র ভরসা। মুহূর্তমধ্যে যেন মনে হল, পায়ের তলা থেকে মাটি স্তরে যাচ্ছে। গ্রাম্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রূপেন্দ্রনাথের বিদ্রোহে তাহলে কে হবে সহায়? তারাপ্রসন্ন স্বভাবতই নির্বিরোধী—এবং প্রাচীনপন্থী।

জানতে চাইলেন, আর জেঠিমা?

—বাবামশায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পর্যন্ত তিনি গ্রামেই ছিলেন। তারপর বায়না ধরলেন, কাশীবাসী হবেন। তুমি তো জানই, কাশীর চৌষড়িযোগিনী ঘাটে গঙ্গার উপর আমাদের একটি

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

মোকাম আছে। এখন তিনি সেখানেই আছেন। স্বপাক আহাৰ করেন, গঙ্গাস্নান করেন আর মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিয়ে বেড়ান।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল রূপেন্দ্রের। হঠাৎ বলে বসলেন, “নিয়তি কেন বাধ্যতে?”

তার প্রসন্ন মূৰ্ত্তি হেসে বললেন, মনে আছে সে-কথা? তোমার ঐ প্রশ্নের জবাবে মা একদিন বলেছিলেন, ‘মনসা’!

রূপেন্দ্রনার্থ বললেন, জপের মন্ত্ৰ কি তোলা যায়?

শুভপ্রসঙ্গের শিক্ষারম্ভ হয়েছে। শিক্ষা বলতে সংস্কৃত। সে জানতে চায় : ও-কথার মানে কি, বাবামশাই?

তার প্রসন্ন বুদ্ধিতে দেন, ‘নিয়তি কেন বাধ্যতে?’ মানে, ‘নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে?’ প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে উত্তর : অর্থাৎ নিয়তি অপ্রতিরোধ্য। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। তোমার ঠাকুমা তা মানতে চাননি। তাই তোমার ঠাম্মা বলেছিলেন : ‘মনসা’! অর্থাৎ ‘মনের জোর’!

বালক প্রশ্ন করে, মনের জোরে ভাগ্যলেখা বদলানো যায়?

রূপেন্দ্র বলেন : যায় শুভ! তোমার পিতামহী তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। আমাকে মনে করিয়ে দিও, সে গল্প একদিন তোমাকে শোনাব।

মেয়েটি বাবার ধুতির খুঁট ধরে টানে : চলুন না?

তার প্রসন্ন নিম্নকণ্ঠে বললেন, একটা কথা রূপেন! তুমি ঠিক কথাই বলেছ—মাঝ-সড়কে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলে না। কিন্তু জরুরী কথাটাকে তো চাপা দেওয়াও চলে না, ভাই। সে-এগুই গ্রামখানি তোমার অচেনা নয়। খরজিহু সমাজপতিরা হিত্রাশেষণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তোমার পৈত্রিক ভদ্রাসনটির বর্তমান অবস্থা যে কী, তা তোমার অজানা। আমি জানি। সেখানে এখনই তোমাদের পক্ষে আশ্রয় পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তোমাদের পুত্রের ঘরখানা ভেঙে পড়েছে, উত্তরের ঘরখানিও বাসোপযোগী নয়। শুধু ঐ দক্ষিণ দুয়ারী ঘরখানি এখনো খাড়া আছে। ভাঙা চালার নিচে জানলা-দরজা এখনও চাপা পড়ে আছে, চুরি হয়ে যায়নি। নেহাত বামুনের বাড়ি বলে। ...শোন, রূপেন! আমার পালকি ঘাটেই অপেক্ষায় আছে। আমাদের নিয়ে এসেছিল। তাতে চেপে ছেলে-মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে বৌঠান বরণ আমাদের বাড়িতে চলে যান। শুভপ্রসন্ন ওঁদের নিয়ে যাবে তার মায়ের কাছে। ইতিমধ্যে তুমি আর আমি পদব্রজে সেখানে পৌঁছে যাব। ত্রিরাত্রি না হয় আমাদের বাড়িতেই অতিথি হলে। মানে, যতদিন না তোমার ভিত্তি স্থান বাসোপযোগী করে তোলা যায়।

রূপেন্দ্র তাঁর ঝাঁকড়া চুলে ভর্তি মাথাটা নেড়ে বললেন, তা হয় না, তারাদা। এটা যদি সে-এগুই গাঁ না হত, তাহলে ত্রিরাত্রি কেন মাসিক কাল সানন্দে তোমাদের বাড়িতে পড়ে থাকতাম। কিন্তু গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে যদি খুলো-পায়ে প্রথমে বাস্তবদর্শনে না-যায়, তাহলে স্বর্ণে পিতৃপুরুষের অভিমান হয়। সবার আগে সেই ভাঙাভিটার চৌকাঠে মাথা ঠেকাবার অনুমতিটা আমাকে দিতে হবে তারাদা।

এই সময় একজন অল্পবয়সী জোয়ান এগিয়ে এসে দণ্ডবৎ হল। রূপেন্দ্রকে জিজ্ঞেস

করল, পেনাম হই দা-ঠাউর! বাস্ক-প্যাঁটির। গুলান মাতায় করি আপনার ঠেঁয়ে নে-যাব দ্যাবতা?

রূপেন্দ্র বললেন, তোমাকে তো চিনতে পারছি না, ভাই? এ-গাঁয়ের ছেলে? কী নাম গো তোমার?

—আজ্ঞে মোরা জেতে তাঁতি—মোর নামটো লবা শুই এজ্ঞে। জল-অচল নই। মালপত্তর ছুলি পরে...

রূপেন্দ্র রুখে ওঠেন, তোমার জাতি জানতে চেয়েছি আমি? বোকা কোথাকার! ঠিক আছে, মাল তোলো। আর শোনো—তোমার নামটা ‘লবা’ নয়, ‘নবা’। ভাল নাম নবীন, বুঝলে?

লোকটা প্রচণ্ড মাথা ঝাঁকানি দিয়ে প্রতিবাদ করে, এজ্ঞে না, ঠাউরমশাই, বোঝলাম না। বোকা হই, মুফু হই, মোর নামটো ‘লবা’।

তারাশ্রম ধমকে ওঠেন, একটা চড়ে তোর মুণ্ড ঘুরিয়ে দেব, লবা! তুই জানিস্ কার সঙ্গে তর্ক করছিস্? উনি কত বড় পণ্ডিত তা জানিস্?

লোকটা বাস্ক-প্যাঁটির মাথায় ওঠাতে শুরু করেছিল। বললে, সে-কতা তো বলচিনি। বলছি কি মোর নামটো মূই জানবনি, পণ্ডিতে এসে বিধান দিলি জান্তে পারব? সেই ন্যাংটো বয়স থিকে সবাই মোরে ডাকে ‘লবা’! আপনার ঐ বিরশিশিক্কে চড়ে বাপের নামটো ভুলতি পারি, কিন্তুক নিজের নামটো ভুলি ক্যামনে?

তারাশ্রম বিরক্ত হয়ে বলেন, তুই বড় তর্ক করিস্ লবা। নে চল।

কোথাও কিছু নেই থিলথিল করে হেসে ওঠে রূপমঞ্জরী।

তারাশ্রম তার দিকে ফেরেন। বলেন, তোমার আবার কী হল? এত হাসি কিসের?

ছোট্ট মেয়েটি বললে, আপনি অরে গালমন্দ করছেন বটে, কিন্তু প্রতিবারই ডাকছেন ‘লবা’ নামে, ‘নবা’ নয়।

তারাশ্রম অবাক হলেন। রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললেন, ভায়া, তোমার এ-মেয়ে কালে তর্কালঙ্কার হবে।

নেহাৎ রসিকতা। কিন্তু সগ্রামে পদার্পণমাত্র ভবিষ্যৎ-মহাপণ্ডিতা হটী শুনলেন, এক অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী। না ‘তর্কালঙ্কার’ উনি হননি—হয়েছিলেন ‘বিদ্যালঙ্কার’। বোধকরি ভারতভূখণ্ডে উপাধিদানপ্রথা প্রচলিত হবার পর প্রথম মহিলা ‘বিদ্যালঙ্কার’। কিন্তু সে সম্ভাবনার কথা এ রসিকতার ভিতর বাস্পমাত্রও ছিল না। বিস্মিত হয়েছিলেন রূপেন্দ্রনাথও। আশ্চর্য! তারাশ্রমের যুক্তি যে স্বয়ংবিরোধী এটা তো তাঁর নিজেরও খোয়াল হয়নি! অথচ ঐ এক ফোঁটা মেয়েটা নজর করেছে।

তারাশ্রম শুভকে প্রশ্ন করেন, রূপেন খুড়োর ভিটেটা চিনিস তো? তোরা তিনজনে পালকিতে রওনা দে, আমরা পায়ে হেঁটে আসছি।

মালতী পালকিতে ওঠার আগে স্পর্শ বাঁচানো একটি প্রণাম করল তারাশ্রমকে পাঞ্জিবাহকেরাও দেখাদেখি প্রণাম করল রূপেন্দ্র, মালতী ও মালিককে। সর্দার পালকিবাহক বলে, ছোটকর্তার চিনতে হবে কেন গো, কর্তামশাই? ধনস্তর-বাবাঠাউয়ের ভিটে না চিনে

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

কুন সুসুন্ধির পো?

শুভপ্রসন্ন আর রূপমঞ্জরীকে উঠিয়ে নিয়ে মালতী রঙনা দিল পালকিতে। পিছন-পিছন ভিজে-কাপড় নিয়ে অনুগমন করল নীরবকর্মী কালিপদ। নবা-ই হোক অথবা 'লবা', বাস্তব-প্যাঁটরা মাথায় নিয়ে চলল পালকির পিছু-পিছু। রূপেন্দ্র চলবার উপক্রম করতেই তাঁর হাতখানা চেপে ধরলেন তারাশ্রম। রূপেন্দ্র আন্দাজ করলেন হেতুটা। তবু বললেন, কী হল আবার?

—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করা কি ঠিক হবে রূপেন? সমাজ এটা কিছুতেই মেনে নেবে না। নিতে পারে না।

—কেন? আমরা অনায়াসে তো কিছু করছি না। আমার যদি নিজের বড় ভাই থাকতেন, তাহলে তাঁর বিধবা...

—কী হলে কী হত সে আলোচনা থাক। জগু-পিসিমা অথবা কাত্যায়নী যদি তোমার ভিটায় থাকতেন তাহলে আমি আপত্তি করতাম না—

—তোমারও আপত্তি? সমাজপতি হিসাবে? জ্যাঠামশাই নেই বলে?

—তারাশ্রম মাথা নেড়ে বললেন, জিদিবাজি কর না, একবগ্না। এ হয় না, হতে পারে না। নিঃসম্পর্কীয় দুটি মানুষ—একজন ত্রিশ বছরের বিপত্নিক যুবাপুরুষ, অপরজন বিংশতিবর্ষীয়া বিধবা—অন্য প্রাপ্তবয়স্কের অনুপস্থিতিতে এক ঘরে রাত কাটাতে পারে না। তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মনি কি না সে প্রশ্ন অবাস্তব। নবাবী ফতোয়ার মতো, সামাজিক আইনও ব্যক্তি বিশেষের চারিত্রিক দোষগুণে পরিবর্তিত হতে পারে না।

রূপেন্দ্র বললেন, আমি নিরুপায়, তারাদা। তুমি ব্রাহ্মীলিপি পড়তে পার?

—ব্রাহ্মীলিপি? সেই অশোকের অনুশাসন যে ভাষায় লেখা হত? না, পারি না। তা এর মধ্যে হঠাৎ ব্রাহ্মীলিপির প্রসঙ্গ এল কেন?

—বলব, তারাদা; সবকথা তোমাকে বুঝিয়ে বলব। আমি নিরুপায়। সমাজ যদি আমাকে একঘরে করে, শাস্তি দেয়, আমি আক্ষেপ করি না। এটুকু তোমাকে বলি: ওঁর আমি ঘনশ্যাম সার্বভৌম ছিলেন এক অলোকসামান্য মহাপণ্ডিত। মৃত্যুকালে আমাকেই অনুরোধ করে গেছেন তাঁর বিধবাকে আশ্রয় দিতে। বোঠানের পিতৃকূল-মাতৃকূলে কেঁথাও ঠাই হবে না। আমার গুরুদেবের আশ্রয়েও উনি থাকতে রাজি হলেন না, বিশেষ হেতুতে—বস্তুত বোঠানের ধারণা ঘনশ্যামের মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার গুরুদেব। তাই প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে ওঁর। ভেবে দেখ, তারাদা—আমি বিপত্নিক, একটি মাতৃহারা চরিরছরের শিশুকে নিয়ে গ্রামে নিজের ভিটেতে এসে উঠছি—এখানে কেউ নেই। পিসিমা নেই, কাত্যায়নী নেই। এক্ষেত্রে আমরা দুজন তো পরম্পরের সমসার সমাধামঞ্জী। আমি গুঁকে জোগান দেব আশ্রয়, আহাৰ্য, লজ্জানিবারণের বস্ত্র এবং নিরাপত্তা। ঋণীময়ে বোঠান আমার সংসারটা দেখবেন। সন্ধ্যাবেলায় আমার বাস্তভিটায় তুলসীমূলে প্রদীপ দেবেন। আমার সন্তানকে মানুষ করবেন। এতে আপত্তির কী আছে?

—আপত্তি তোমাদের দুজনের বয়সে। আপত্তি তোমাদের বাড়িতে তৃতীয়ব্যক্তির

অনুপস্থিতি। এমন সহজ কথাটা কেন বুঝ না? তুমি কুলীন, বিপ্লবিক, অত্যন্ত সুদর্শন, সুপাত্র...

—তাতে কী হল?

—কী আশ্চর্য! কেন বুঝ না, রূপেন? এ-গাঁয়ে তোমাদের পালটি ঘরের এক কুড়ি অবক্ষণীয়া কুলীন কন্যার নাম আমি এখনি বলে দিতে পারি। তারা এবং তাদের অভিভাবকদের খরজিহা লকলক করে উঠবে না এমন মুখরোচক কেছায়?

—কেছায়?

—নিশ্চয়ই! একটিমাত্র ঘরে চারবছরের মেয়েটিকে নিয়ে তোমরা কীভাবে শয়ন করবে? বৌঠান কি মাটিতে শোবেন, না তুমি? না কি আর পাঁচটা সদ্যসন্তানগর্ভিত দম্পতি যেমন সন্ধ্যারাতে বাচ্ছটাকে মাঝখানে রেখে খাবড়ে খাবড়ে ঘুম পাড়ায়, আর তারপর...

—আঃ! থাম তুমি, তারাদা!

তারাপ্রসন্ন হেসে বলেন, তোমার ধমকে আমি না হয় থামলাম, বিশেষ আমি ভালকরেই চিনি একবগ্না ঠাকুরকে। কিন্তু দুর্গা গাঙ্গুলী? ন্যায়রত্ন মশাই? সদু-জ্যাঠাইমা? শশাঙ্ক ঘোষাল? নন্দ চাটুজ্জৈ? এদের খরজিহাকে তুমি খামিয়ে দিতে পারবে? তার চেয়ে এক কাজ কর। ঐ ওনাকে—ঘনশ্যাম সার্বভৌমের বিধবাকে—আমাদের বাড়িতে রেখে দিয়ে এস। তুমি যদি ওঁকে আশ্রয়, আহাৰ্য, বস্ত্র এবং নিরাপত্তা দিতে পার, রূপেন, তাহলে বাপ-ঠাকুদার আশীর্বাদে আমিও তা দিতে পারি। উপরন্তু আমি ওঁকে আরও একটি দুর্লভ বস্তুর জোগান দিতে পারি, যা তুমি পার না—

—সেটা কী?

—খরজিহু, কুংসারটনাকারীর আক্রমণ থেকে মুক্তি। আমার স্ত্রী বর্তমান, তোমার তা নেই। অস্তুত যতদিন না তোমার ভদ্রাসনে দু-খনি শয়নকক্ষ খাড়া করা যাচ্ছে ততদিন তুমি আমাকে বাধা দিও না, রূপেন। এই আমার শেষকথা।

রূপেন্দ্র সম্মত হলেন। বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু ঠিক ঐ কয়দিনই। বৌঠান না হলে মনে ভাবতে পারেন আমি তাঁকে গলগ্রহ মনে করছি। আর তাছাড়া আমার কন্যাকে মানুষ করা, আমাদের ভিটায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো ইত্যাদি করবে কে? দেখছ না দাসদাসীদের মধ্যে মানুষ হয়ে আমার মেয়ের মুখের ভাষাটা কী বিপ্রি হয়ে গেছে?

চলতে শুরু করেছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। হঠাৎ তারাপ্রসন্ন আবার ওঁর হাতটা চেপে ধরেন : ভাল কথা মনে পড়ে গেল! এটু এদিকে সরে এস, ভোঁ একটা গোপন কথা আছে।

ক্রকৃৎসন হয় রূপেন্দ্রনাথের। বিনাবাক্যব্যয়ে সড়ক ছেড়ে একটু ফাঁকা জায়গায় দুজনে সরে আসেন। তারাপ্রসন্ন বললেন, আর একটি বিষয়ে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন। হয়তো এ গ্রাম্য রটনাটার বিষয়ে তুমি এখনো কিছু জান না। যে-কোন সময়ে যে-কোন দিন থেকে অতর্কিত আক্রমণ আসতে পারে। তাই সতর্ক করা—

—রটনা! কী বিষয়ে রটনা?

—গেল বছর অগ্নানমাসে গাঙ্গুলী-খুড়ো সস্ত্রীক পুরীধামে তীর্থ করতে গেছিলেন। প্রায়

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারস্ত

ছয়মাস পরে গাঁয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু একা! একা কেন? সবাই শুপায়, খুড়ো রা কাটে না। প্রথম কিছুদিন কাউকেই কিছু বলেনি। পীতুখুড়ো—মানে মীনুর বাবা গিয়েছিল জিজ্ঞেস করতে। দুর্গা খুড়ো তাকে মারতে বাকি রেখেছে। তারপর সে ধীরে ধীরে নানা মজলিসে নানান গুজব ছড়াতে থাকে। কখনো বলে, ‘আমার পোড়া কপাল’, কখনো বলে, ‘সে আবাগীর কপালে সর্গসুখ সইবে কেন?’ আবার কখনো বা জুৎসই সঙ্গী পোলে বলে, ‘সে কলঙ্কের কথা আর শুনতে চেও না ভায়া, আরে ছা-ছা-ছা!’ কার মাধ্যমে কী-করে কথাটা প্রথম রটল জানি না, একদিন দেখা গেল গাঁ-শুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে, তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তোমার নাকি আচমকা দেখা হয়ে গেছিল! সত্যি কথা?

—হ্যাঁ! নিতান্ত ঘটনাচক্রে। ফরাসীডাঙার ঘাটে। বর্ধমানের ইজারাদার নগেন দত্ত আমাকে হঠাৎ ঘাটে বসে থাকতে দেখেন। চিনতে পারেন। নৌকায় তুলে নেন।

—তাহলে রটনাটা সত্যি! তুমি ঐ তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে এক বজরায় গেছিলে?

—হ্যাঁ সত্যি। তাতে কী হল?

—নগেন দত্তের স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলে তুমি?

—হ্যাঁ, করেছিলাম। কিন্তু এসব কী জেরা শুরু করলে তুমি! কেন এসব প্রশ্ন করছ বলত? পালকি ওদিকে পৌঁছে গেছে।

—যাক। যা জানতে চাইছি তা বল। তুমি আগে থেকে জানতে না যে, নগেন দত্ত একটা বিরাট বজরা নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছে, আর তীর্থযাত্রীদলে আছে গাঙ্গুলী খুড়ো আর মীনু খুড়িমা? তুমি ফরাসীডাঙায় ওদের বজরার জন্যে ঘাটে প্রতীক্ষা করছিলে না?

এবার রূপেন্দ্রনাথ কিছুটা আঁচ পেলেন: গুজবটা কী আকারে ছড়িয়েছে। বললেন, না। আমি তো আগেই বলেছি, তারাদা। বজরায় বসে নগেন দত্ত দূরবীন দিয়ে চারিদিক দেখছিলেন। ঘটনাচক্রে আমাকে দেখতে পান, চিনতে পারেন, এবং প্রায় জোর করে বজরায় তুলে নেন। আমি গঙ্গার ঘাটে বসেছিলাম খালি গারে, খালি পায়ে। একবস্ত্রে। তুমি হয়তো জান না, নগেন দত্তের সহধর্মিণীর চিকিৎসা আমি করেছিলাম; কিন্তু বৈদ্যবিদ্যায় নিহিনি। বলেছিলাম, তিনি রোগমুক্ত হলে তার পর আমি বৈদ্যবিদ্যায় গ্রহণ করব। নগেন দত্ত তাই আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন শ্রীক্ষেত্রে। সমস্ত খরচপত্র তাঁর, মাথি আমার পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত কিনে দিয়েছিলেন।

—শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছবার পর গাঙ্গুলী খুড়ো, তুমি আর মীনু খুড়িমা তিনজনে মিলে কী একটা ভাঙা মন্দির দেখতে গিয়েছিলে? যেখানে মূর্তি নেই, নিত্য পূজার ব্যবস্থা নেই, লোকালয় নেই? সেখানে একরাতি বাসও করেছিলে?

—হ্যাঁ, কোনার্কের সূর্য মন্দির। ওঁরা দুজনে গো-গাড়িতে যান, আমি ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিলাম। কেন বল তো?

—কেন সেখানে গেছিলে রূপেন? সে মন্দিরে তো দেবতা নেই, নিত্যপূজার ব্যবস্থাও নেই। আর ভাঙা মন্দিরে নাকি সারি সারি অশ্লীল মিশুনমূর্তি!

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, এ তো আজব কথা শোনাতে তারা! কোনাৰ্ক সূৰ্যমন্দিবের নাম তুমি শোননি অথচ এটুকু জান যে, সেখান ‘সারি সারি অশ্লীল মিথুনমূৰ্তি’।

—ঐ মন্দির সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি তা দুৰ্গা-খড়োর কাছে। খড়ো বলেছিল, সেখানে তোমরা তিনজন একরাত মাত্র ছিলে। আর তুমি একেবারে ভোররাতে ঘোড়া ছুটিয়ে পুরীতে ফিরে এসেছিলে। খড়োকে কিন্তু না জানিয়ে।

—এসেছিলাম। না জানিয়ে নয়। ভোর রাতে যখন আমি ঘোড়া ছুটিয়ে পুরীধামের দিকে রওনা দিই তখন খড়ো আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁকে না জানিয়ে আমি চলে আসিনি।

—আর মীনু খুড়িমা ?

—কী মীনু খুড়িমা ?

—সে তখন কোথায় ?

—কী বলতে চাইছ ? খোলাখুলি বল দিকি, তারা!।

তারাপ্রসন্ন এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে প্রথমে নির্জনতার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। তারপর নিম্নস্বরে বললেন, দুৰ্গা খড়ো এক-একজনকে এক-এক রকম গল্প বলেছেন। বাবামশাই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খবর নিতে, কেন মীনু খুড়িমা ফিরে আসেনি। আসলে তার আগে মীনুর বাবা— পীতৃ মুখুজ্জ গোপনে দরকার করতে এসেছিলেন বাবামশাইয়ের কাছে। তাঁর মেয়েটা কেন স্বামীর সঙ্গে ফিরে এল না, জানতে। বাবামশাইয়ের কাছে দুৰ্গা খড়ো যে কথা বলেছিল তা এই: ঐ সূৰ্যমন্দিরের এক পাণ্ডার বাড়িতে তোমরা তিনজনে রাত্রিবাস করেছিলে। একঘরে খড়ো আর খুড়িমা। অন্য ঘরে তুমি একা। ভোর রাতে দুৰ্গাখড়োর ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বসে দেখে সে একা শুয়ে আছে। খাটের পাশের অংশটা খালি। খড়ো প্রথমে কিছুটা অপেক্ষা করে—ভেবেছিল, মীনু খুড়িমা বুঝি বাগানে গেছে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। কিন্তু আধঘণ্টা পার হয়ে যেতে সে তোমার ঘরে গিয়ে করাঘাত করে। আশ্চর্য। সে ঘরে কেউ ছিলো না। সেই ভোররাতে। মীনু খুড়িমাকেও তারপর থেকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, এই কথা জ্যাঠামশাইকে বলে ছিল দুৰ্গাখড়ো ?

—হ্যাঁ। কিন্তু নন্দ চাটুজ্জেকে সে অন্য এক গল্পো শুনিয়েছে। বলেছে, সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত— বোধহয় দোলপূর্ণিমা। শেষ রাতে ঘোড়ার হেঁচকিনিতে গুরু ঘুম ভেঙে যায়। পাশের বিছানা খালি দেখে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। আর চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় তুমি মীনু খুড়িমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়েছ। হবহ সংস্কারবর্ণ। বৃদ্ধের চোখের সম্মুখে তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে ধু-ধু করা সমুদ্রের তটরেখা ধরে মীনুকে নিয়ে চলে গেলে— কী জানি কোথায়। তারপর থেকে দলের কেউ আর তোমাদের দুজনকে দেখেনি। না তুমি, না মীনু খুড়িমা !

দুরন্ত ক্রোধ সংবরণ করে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন রূপেন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, এখনই চল, তারা!। দুৰ্গাখড়োর ভিটেতে ! আমার চোখে চোখ রেখে এতবড় মিথ্যা কথাটা সে বলতে পারে কি না আমি দেখতে চাই। উঃ ! কী পৈশাচিক মিথ্যাচার ! খড়ো

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

জানে, মীনু কোথায় !

—কোথায় ?

—সে গলায় দড়ি দিয়েছিল ! কেন জান ? খুড়ো তাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে পুরীধামে নিয়ে গিয়েছিল একটি ক্ষেত্রজ পুত্র সমেত প্রত্যাবর্তন করবে বলে। মীনু প্রথমে বুঝতে পারেনি বুড়োর চালাকি। বুঝলে, সে তীর্থে যেতই না। যখন বুঝল তখন সে প্রতিবাদ করেছিল। অজানা অচেতন। একটা পুরুষের বলাৎকারকে সে ধর্মের অঙ্গ বলে মেনে নিতে পারেনি। তাই আত্মহত্যা করেছিল। সে আত্মহত্যা ঘটনার অন্তত দু'শ সাক্ষী আছে। অন্তত বর্ধমানভুক্তির ইজারাদার নগেন দত্ত— যিনি বজরা ভাড়া করে দু'শ যাত্রী নিয়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করেছিলেন—তিনি জানেন ! সম্ভবত তাঁরই খরচে পুরীর স্বর্গদ্বারে মীনুর সংকার হয়; আর ঐ নরপিশাচই নিশ্চয় মুখাঙ্গি করেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তারাপ্রসন্নের। বললেন, বাবামশাই তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু একটা কথা, তুমি কেন সেক্ষেত্রে যাত্রীদের সঙ্গে ফিরে এলে না ?

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, সেসব গবেষণা পরে কর, তারাদা, সবার আগে দুর্গা খুড়োর ভিটেতে চল দেখি !

তারাপ্রসন্ন বলেন, না ! গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরলে সবার আগে তাকে ধুলো-পায়ে বাস্তুভিটাতে গিয়ে চৌকাঠে মাথা ঠেকাতে হয়।

থমকে যান রূপেন্দ্রনাথ !

—তাহাড়া আরও একটা অসুবিধা আছে। দুর্গা-খুড়ো এখন গ্রামে নেই। ফাগুনের শেষাংশে তিনি গাঁ-ছাড়া হয়েছেন।

—কোথায় গেছে ?

—আবার সঙ্গীক পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে চলে গেছেন। ওঁর সেই গুরুদেবের ব্যবস্থাপনাতেই। এবার পুত্রলাভ নির্ঘাৎ। কারণ এবার সঙ্গে আছে জোড়া-বউ ! উপর্যোপরি বলাৎকারে দুটোই যতদিন না নিশ্চিত গর্ভবতী হচ্ছে ততদিন খুড়ো 'হত্যা' দিয়ে পড়ে থাকবে। একটান্নে একটার পুত্রসন্তান হবেই। হবে না ?

না। থামিয়ে দেওয়া যায়নি। বার্থ হয়েছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইসব ন্যাকারজনক সামাজিক বিধান চালু ছিল। প্রতিবাদের কণ্ঠ কোথাও সোচ্চার হয়ে ওঠেনি।

অধ্যাপক অসিতকুমার অপরিসীম আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন, “ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (1707) হইতে পলাশীর যুদ্ধের (1757) কাল— এই অর্ধশতাব্দীই জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কার্য। মুঘল-মহিমা অনেক পূর্বেই অন্তিমত হইয়াছে, শাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, দুই-একজন সুবেদার বাংলা শোষণ করিয়া ঐশ্বর্যবিলাসে ঘৃণ্য জীবন যাপন করিয়া বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অনেক পূর্বেই অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমাজেও তখন ঘৃণ ধরিয়াছিল। পুরাতন ভূস্বামী-সম্প্রদায় ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, শিক্ষাদীক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিয়াছিল,— এই অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা দেশের পক্ষে চূড়ান্ত

হতাশার কাল; চারিত্র, মনুষ্যত্ব, সুস্থ জীবন— সব দিক দিয়াই বাঙালী জীবনে ক্ষয়ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।... রাষ্ট্র ভাঙিল, সমাজ ভাঙিল, জীবনের সুস্থ আদর্শ ভাঙিল এবং জীবন হইতে যে-সহিত্যের জন্ম হয় তাহাও ভাঙিয়া পড়িল। তাই বাংলা দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধকে ‘ভাঙিয়া পড়ার ইতিহাস’ বলা যাইতে পারে।”*

কিন্তু শুধু প্রথমার্ধটুকুই বা কেন? গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীই তো বঙ্গ-সংস্কৃতিতে ভেঙে পড়ার ইতিকথা—একবারে অন্তিম দুই দশক বাদে। যখন রামমোহন রায় সাবালকত্ব লাভ করে ঐ আদ্যন্ত ক্রোদাক্ত পর্বতাকার পুরীষ হারকিউলিসের মতো পরিমার্জনা করতে উদ্যত হলেন।

শতাব্দীর উষ্মাঞ্চে বাঙালার দক্ষিণাঞ্চলে শুরু হয়েছিল মগ-আরকান-পর্তুগীজ বোম্বেটে জলদস্যুদের অত্যাচার, যার ফলে, রাজশক্তির ব্যর্থতায় অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রায় সহস্রাব্দীব্যাপী বাঙালির বাণিজ্য এবং সমুদ্রযাত্রা। তারপরেই শুরু হল বর্গীর হান্ধামা (1742)। একটিমাত্র দশকে উড়িষ্যাসমেত বাঙালার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ শ্মশান হয়ে গেল। সে পর্ব মিটতে না মিটতেই পলাশী প্রান্তরে বৌদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতায় সধীনতা হারালো গৌরবঙ্গ। শহীদ হলেন মীরমদন, মোহনলাল। কেউ খোঁজ নিল না: হিন্দু না ওরা মুসলিম! এল কোম্পানির রাজত্বের অরাজকতা। ক্রমান্বয়ে মীরজাফর, রেজা খাঁ এবং দেবীলালের নির্মম শোষণ। এবারেও কেউ খোঁজ নিল না: হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওদিকে বেনিয়া ইংরেজের রাজশক্তিলাভে অবলুপ্ত হয়ে গেল বাঙালার তাঁত আর বেশম শিল্প, যাবতীয় কুটিরশিল্প এবং লবণ-ব্যবসায়। দেশ-বিদেশ থেকে বাঙালি সওদাগর নানান বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে আসত সিংহল, কাসোজ, চীনদেশ থেকে: নানা জাতের মশলা, এলাইচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল, জাফরান, চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত আর পরিবর্তে সেসব দেশে পৌঁছে দিতে মসলিন, কাঁসার কাজ, রূপোর ফিলিগ্রি, হাতির দাঁতের শিল্প। এসব চারু ও কারু শিল্প তো শতাব্দীর প্রারম্ভেই বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবর্তে চালু হয়েছে মুসলমান রেজা খাঁ কিংবা হিন্দু দেবীলালের মতো পিশাচের নির্মম-নিষ্ঠুর কর আদায়। বন্যাই হোক অথবা খরা—মাঠে ফসল হোক বা না হোক কৃষিজীবী মানুষকে বউ-বেটি-বেচে কর যোগাতে হবে।

এইসব কিছু মিলিত ক্ষয়ক্ষতি ছিয়াত্তরের মঙ্গস্তর (1769)। আমরা এখনো তার দ্বারদেশে এসে উপনীত হই। তবু তিল তিল করে সেই মহামৃত্যুর অভিমুখেই চলেছি। মহামৃত্যু! অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্রোদাক্ত ইতিহাস! তাহলে সেই মানবিকতার চরম অবমাননার কথা যেন শোনাতে বসেছি তোদের? এ প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি— রূপমঞ্জরীর প্রথমখণ্ডের ‘কৈফিয়ত’-এ। দশবছরের পরিশ্রমে এতদিনে রূপমঞ্জরীকে তার সঙ্গামে পৌঁছে দিয়ে আবার সেকথা কেন বলছি জানিস, দিদিভাই? কারণ: জপমন্ত্রে পুনরুজ্জীৱিত দোষ হয় না।

কারণ আমি বিশ্বাস করি: নিষ্প্রভাত অমরাব্রতি হয় না।

* বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।। তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব: ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 1982,

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

আমি সম্মান করতে চেয়েছি—এই রোনাল্ড পরিবেশে কী করে, কোন কার্যকারণসূত্রে, রাধানগরে অবিরত হলে নূতন যুগসূর্য। স্বয়ম্বু লিঙ্গের মতো কোন অলৌকিক ক্ষমতায় মেদিনী বিদীর্ণ করে এই শ্মশানে এসে উপস্থিত হননি রাজা রাম। এমনটা হয় না, হতে পারে না। একথাই শিখিয়েছে সভ্যতার ইতিহাস। বিবর্তনের একটি ফলুধারা নিশ্চয় প্রবাহিত ছিল, যা আমরা নজর করিনি। লোকচক্ষুর অন্তরালে কেউ-না-কেউ নিশ্চয় পৌছে দিয়েছিলেন মশালটিকে— নদীয়ার সেই প্রেমানন্দে পাগল বিদ্রোহী পণ্ডিতের পূর্ণকূটীর থেকে রাধানগরের রাজপ্রাসাদে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় যখন প্রত্যক্ষ সত্য, তখন এ তথ্য অবধারিত যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে কে বা কারা করে গেছেন ‘রাত্রির তপস্যা’

বুড়ো-ইতিহাস সে-কথটা বেমানম ভুলে বসে আছে।

তাই খুঁজতে শুরু করেছিলাম কীটদ্রষ্ট পৃথিবী পৃষ্ঠায় সেই সব সাধকদের নাম। দেশসেবক আর সমাজসেবক। শুধু অধ্যাত্ম সাধক নয়।

তোমরা যদি জিজ্ঞেস কর: কেন গো দাদু? কী দায় পড়েছে তোমার? এই বৃদ্ধ বয়সে হরীতকীর বদলে ‘সরবিল্টেট’ চুষতে চুষতে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছ সেই অতীত ইতিহাস? কেন জানতে চাও এ বিস্মৃত মানুষগুলোর কথা? বাস্তবের এ হট্ট, হট্ট, দ্রবময়ী অথবা বুনো রামনাথের কথা? অথবা তোমার মানসলোকের ঘনশ্যাম, রূপেন্দ্রনাথ অথবা রূপমঞ্জরীর অন্তরঙ্গ কথা?

তাহলে জবাবে আমি বলব: কী জানিস দিদিভাই? তোরা খেয়াল করে দেখিসনি। পাতার মাথায় সালটা বদলে গেছে। 1748 নয়, আমি আছি 1996-এ। আড়াইশ বছর প্রগতির পথ অতিক্রম করে এসে আমড়াতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে এই পরিচ্ছেদটা রচনা করছি। আমরা আজ স্বাধীন। ভোট দিয়ে আমাদের শাসক-শেষক নির্বাচন করতে পারি, করছিও। লাল-নীল-গেরুয়া-সবুজ। রাজশত্রয় উপস্থিত আছেন গুরুদেব, মীরজাফর, রেজা খাঁ আর দেবীলাল। যাকে ইচ্ছে বেছে নিয়ে তোরা গদীতে বসাতে পারিস।

সমাজ আছে একই অবস্থায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অসিতকুমারকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, বিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদে কি আমরা চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিতে পারিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে? আজ বাঙলা ও বিহার কি রেজা খাঁ দেবীলালকে হারিয়ে দিতে পারেনি? ক্রাইভ আর ওয়ারেন্ট হেস্টিং যে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন তা কি আমাদের স্বাধীন ভারতের ষড়যন্ত্রীমশাইদের যৌথ উৎকোচের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর নয়? কলকাতায় বসে পুরীর নিশ্চলানন্দজী (বর্তমান শঙ্করাচার্য) নিদান হেঁকেছেন (জানুয়ারি '94): নরীর বেদপাঠের অধিকার নেই। কেন?

নিশ্চলানন্দর যুক্তি: যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তিই বেদপাঠের অধিকারী। যজ্ঞোপবীত গ্রহণের জন্য কৌপীনধারী হিসাবে, উন্মুক্ত উরুসে ভিক্ষা চাইতে হয়। এই ধরনের ধর্মচরণের লজ্জা থেকে মেয়েদের অব্যাহতি দিতেই শাস্ত্রের এই নিষেধাজ্ঞা। কী অসাধারণ যুক্তি! প্রণাম জানাই যিনি এই সন্ন্যাসীর উপাধি দিয়েছিলেন: নিশ্চলানন্দ! সার্থকনামা এই শঙ্করাচার্য! কেউ প্রতিপন্ন করতে পারবে না: তাহলে বেদের একাধিক শ্লোক কীভাবে রচনা করেছেন

বিশ্ববারানাসী মহাপণ্ডিতা? কীভাবে কণ্ঠস্থ ছিল বেদের সূক্ত — গার্গী, মদালসা, মৈত্রেয়ী থেকে ঐতিহাসিক হটী বিদ্যালঙ্কারের? একথা নিশ্চলানন্দকে কেউ প্রশ্ন করেনি। কারণ প্রধানমন্ত্রী থেকে অনেক ডি. আই. পি. তাঁর শিষ্য — অক্ষসুরক। যিনি যত বড় ‘ফোর-টোয়েন্টি’ তিনি তত বড় অন্ধ ভক্ত।

দুঃখ হয় আদি শঙ্করাচার্যের জন্য। তাঁর সৃষ্টি পুরীধামের পীঠে আজ যে নিশ্চলানন্দ অধিষ্ঠিত তিনি জানেন না যে, সে-কালে ভারতবর্ষে স্ত্রী-জাতীয়াবা ছিলেন দুই প্রকারের — ‘ব্রহ্মবাদিনী’ এবং ‘সদ্যদ্বায়ী’। তার ভিতর ব্রহ্মবাদিনীরা মৌলীবন্ধন, উপনয়ন, বেদাধ্যায়ন এবং স্বগৃহভ্রাতৃরে ভিক্ষাচার্য্য ব্রহ্মচারিণীর সকল ব্রতই পালন করতেন। ‘সদ্যদ্বায়ী’রা স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে ধর্ম্মাচারণ করতেন।

বুদ্ধযম-সংহিতার তাই নির্দেশ আছে :

পুরা-কল্লে কুমারীণাং মৌলীবন্ধনমিয়াতে।

অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥

পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈমিষ্যাপয়েৎপর?।

স্বগৃহে চৈব কন্যায়্য ভিক্ষাচার্য্যা বিধীয়তে।

বর্জয়েদজিনং চীবং জটধারণমেবচ॥

অর্থাৎ, পুরাকল্লে কুমারীদিগের মৌলীবন্ধন (মেখলা-ধারণ, অর্থাৎ আজানুলবিত কটিবস্ত্রধারণ) বেদাধ্যায়ন এবং সাবিত্রীপাঠের ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা গৃহভ্রাতৃরে পিতা, পিতৃব্য এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট অধ্যয়ন করতেন। কৌপীনধারী নয়, কটিবস্ত্রধারিণী হিসাবে উন্মুক্ত উরসে শুধু জননীর কাছ থেকে স্বগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করতেন—ব্রহ্মচারিণী হিসাবে। জটা, বন্ধন এবং অজিন ব্রহ্মচারিণীর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণ চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করে বেদাধ্যয়নাদি করতেন। ব্যাপকভাবে আজ তা প্রচলিত নয় বটে; কিন্তু পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ যদি ‘নিশ্চল’ না থেকে ভারতের যে-কোন সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে পদধূলি দেন, তা হলে আজও তা দেখতে পাবেন। এই কলকাতা শহরেই একাধিক সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম আছে—সারদামায়েব নামে, আদ্যাপী... ভূতি।

কিন্তু নিশ্চলানন্দ সেসব খোঁজ রাখেন না। অন্ধ বিশ্বাসে ভ্রান্ত নির্দেশ জারি করে সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছেন।

শুধু এই ভারতে নয়—সর্বত্র। থোমেনি ফতোয়া জারি করে বসে আছেন সলোমন রুসদির মুণ্ড চাই। প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে তসলিমা বিতাড়িত। মৌলীবাদি অঞ্চলের দুলালি বেগমের উপর ১০১ বার বেত্রাঘাত করার ফতোয়া জারি করেছেন কোরগঞ্জ মসজিদের বড়-ইমাম (18.1.96)। দুলালির অপরাধ? চার-বিবির অধিকারে স্বধীকারপ্রমত্ত দুলালির খসম তাকে উপেক্ষা করত। ফলে সে এক বন্ধুর প্রীতি অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। শুনেছি, এ ফতোয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বাংলাদেশ মহিলামণ্ডল। সাময়িকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন ইমাম। শেষ সংবাদ জানি না। তাহোক। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরীর যে শঙ্করাচার্য রূপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন— সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত, স্ত্রীশিক্ষা বর্জনীয়,

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

গঙ্গাবক্ষে সন্তানবিসর্জন অনুমোদনীয়, সেই কৃপমণ্ডকের সঙ্গে আড়াইশ বছর পরেকার নিশ্চলানন্দের কোন পার্থক্য আছে কি ? একটি প্রভেদ আছে অবশ্য — তখন শঙ্করাচার্যের রাজনৈতিক সমর্থন ছিল না। এখন আছে। এখন সি. বি. আই. সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যাদের কোটি কোটি টাকা অবৈধ উপার্জনের জন্য তদন্ত করছে তারা ঐ ধর্মের গোঁড়ামির সমর্থক। শঙ্করাচার্য থেকে বাল থাকারে।

ভিজা-কাপড়ের পুটলিটা নিয়ে কালিপদ সরাসরি চলে গেছে জমিদার বাড়ি। তারাশ্রম তাকে গোপন নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন— মধ্যাহ্নভোজন আরও দু-জন করবেন। তিনি নিশ্চিত, বাস্তবিতা দর্শনান্তে রূপেন্দ্রনাথ জমিদারবাড়িতে আতিথ্যস্বীকারে বাধ্য হবেন।

এদিকে পালকিটা এসে পৌঁছেছে ভগ্নস্থূপের সামনে। পালকি থেকে নেমে মালতী অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল রূপেন্দ্রনাথের বাস্তবিতার ভগ্নস্থূপ। শুভপ্রসন্ন আর রূপমঞ্জরীর ঝগড়া-বিবাদ থেমেছে। পালকির মধ্যে মালতীর মধ্যস্থতায় তাদের ভাব হয়ে গেছে। হাত ধরাধরি করে তারা ধ্বংসস্থূপের দিকে অগ্রসর হতেই নিষেধ করল পালকি-বাহকদের সর্দার, ওদিকপানে যেওনি সোণামনিরা ! মানবের বাস তো লাই। তেনারা থাকতি পারেন।

রূপমঞ্জরী তার ডাঙর-চোখ মেলে বলে, তেনারা কে গ ?

মালতী ওদের দুজনকে কাছে টেনে নেয়। বলে, ও সাপাখোপের কথা বলছে। তোমরা ঐ গাছতলায় গিয়ে বস। ওঁরা এখনি এসে যাবেন।

লবা তার মাথার বোঝাটা দেখিয়ে শুধালো, এগুলান খুব কুখ্য ?

সর্দার-বাহক ধরাধরি করে বাস্তবিতার নামালো। বলল, দেখতিই তো পাছ, বাপ, এ-ঠায়ে মানবে বাস করতি পারবেনি। কল্যামশাইরে আসতি দাও, তারপর ব্যবস্থা হবেন।

একটু পরেই এসে গেলেন ওঁরা। তারাশ্রম বললেন, চক্ষুর্কণের বিবাদ ভঞ্জন হল তো ? চল এবার, সবাই মিলে আমাদের বাড়ি।

রূপেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন ভগ্নস্থূপ। শুধু দক্ষিণদুয়ারি ঘরখানা দাঁড়িয়ে আছে গৃহস্বামীর প্রতীক্ষায়। পূবদুয়ারি আর উত্তর-দুয়ারি ঘরদুটি বস্তোঘটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তুলসীমঞ্চটা ভেঙে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য, তুলসীর গাছ আছে খাড়া। কেউ জল দিত কি ? আর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে সৌরীন্দ্রনাথের স্মৃতিরূপিত কলমের আম গাছটা। পিতৃদেবের স্মৃতিরূপিত সেই অম্বুবক্ষে এসেছে নতুন মঞ্জরী। কুসুমমঞ্জরী চলে গেছে, কিন্তু রূপমঞ্জরীকে সর্ব্বনা জানাতে প্রতীক্ষায় আছে গাছটা। উপাদমস্তক রসালমঞ্জরী নিয়ে।

রূপেন্দ্রনাথ বাস্তবিতার প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়ান হয়ে উপবেশন করলেন। প্রবেশদ্বারের কাঁঠালকাঠের চৌকাঠের উপর কপালটা ঠেকালেন। ব্রাহ্মণের বাস্তবিতাকে প্রণাম করল মালতীও। রূপমঞ্জরীকে কেউ কোন নির্দেশ দেয়নি। দেখাদেখি সেও চৌকাঠে তার ছেড়ি কপালটা ঠেকালো।

রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে মালতীকে বললেন, দিন চারপাঁচ লাগবে, বৌঠান। তার মধ্যেই দু-একখানা ঘর খাড়া করে ফেলব। আপনি এ কয়দিন মঞ্জরীকে নিয়ে তারাদার ভদ্রাসনেই

থাকুন। তারাদা আমার বড় ভাইয়ের মতো। ঐ যে দীঘির ধারে চিকিৎসালয় দেখছেন তা গড়ে দিয়েছেন ঐ তারাদার বাবামশাই—আমি তাঁকে জেঠামশাই ডাকতাম। ওঁরা এ গ্রামের জমিদার।

মালতী জানতে চায়, আর আপনি? আপনি কী করবেন?

—আমাকে এখানেই থাকতে হবে, বৌঠান। নতুন করে ঘর তুলবার ব্যবস্থা করতে।

হঠাৎ নজর হল মাঠের ও-প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এদিকে এগিয়ে আসছে জীবন দত্ত। উঠতি জোয়ান। সূতাম দেহাবয়ব। জীবন ছিল রূপেন্দ্রনাথ কবিরাজের প্রিয় ছাত্র। এই গ্রামেরই ছেলে। মহিম দত্তের বড়ছেলে। আয়ুর্বেদ শিক্ষা করতে রূপেন্দ্রনাথের শিষ্যত্বগ্রহণ করে। একেই দাতব্য-চিকিৎসালয়ের যাবতীয় দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পাঁচ-ছয় বছর পূর্বে রূপেন্দ্রনাথ সঙ্গীক তীর্থযাত্রা করেছিলেন।

জীবন এসে পথের উপরেই সটাক্ষে প্রণাম করল তার গুরুদেবকে। তারপর প্রণাম করল তারপ্রসন্নকে। কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে দেখল অবগুষ্ঠনবতী বিধবাটির দিকে। রূপেন্দ্রনাথ বললেন, আমার বৌঠান।

জীবন বোধকরি মালতীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ—দু-চার বছরের। তবু সে-কালীন শিষ্টাচার অনুসারে ঐ ব্রাহ্মণের বিধবার চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করল। রূপেন্দ্রনাথকে বলল, এতদিনে গাঁয়ের কথা মনে পড়ল?

রূপেন্দ্র হেসে বললেন, গ্রামে বাস করতেই তো এসেছি, জীবন, কিন্তু...

—আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, গুরুদেব। আমি এখনি ওপাড়ে যাচ্ছি, পীরপুরের তোরাবকে খবর দিতে। যাবার পথে নন্দদাদুর গোলাতেও খবর দিয়ে যাব। বাঁশ, দড়ি আর খড়ের জন্য। উলুখুড়েই ছাইবেন তো? না ধানখড়?

—না, না, উলুখুড় তো নিশ্চয়ই। তোরাবকে বল, দিন চারপাঁচের মধ্যে মোটামুটি দু-খানি ঘরের ছাড়নি করে দিতে হবে। কাদার দেওয়াল তুলতে সময় লাগবে। আপাতত তোরাব যেন মনিরুদ্দির কাছ থেকে তল্লা-মুলিবাঁশের চটাই নিয়ে আসে। বুকা-মুলি নয়, পিঠামুলি।

জীবন মাথা নেড়ে বলল, যে-আঙে! কিন্তু এ তিনচার দিন আপনি থাকবেন কোথায়? আমাদের বাড়িতে...

—না, জীবন। দেখতেই তো পাচ্ছ—তারাদা দামোদরের ঘাটেই আমাকে গ্রেপ্তার করেছেন। এত বেলাতেও পালকি নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন। ধরে নিয়ে যাবেন। তবে তারাদা—মধ্যাহ্ন আহার সেরে আমি আবার এখানে ফিরে আসবও রাতিটা এখানেই থকব। এখন বোশেখ মাস। ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। নির্মেষ আকাশ। আমার অসুবিধা হবে না।

তারাপ্রসন্ন বললেন, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না, রূপেন। দীর্ঘ-দীর্ঘ দিন পরে ভিটেয় ফিরে এসেছ। নাই বা থাকল কেউ কাছে টেনে নেবার। বাস্তুদেবতা তো আছেন। তিনিই তোমাকে কোলে আশ্রয় দেবেন। লোক দিয়ে আমি টোঁকি আর বিছানা পাঠিয়ে দেব। মশারি খাটাতে ভুল না হয়। বোশেখ মাস হলে কি হয়, মালায়োরি হচ্ছে গ্রামে। হস্ত দেবেন কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পেতে আমাদের বাড়ি যেতে হবে।

রূপমঞ্জুরীর বিদ্যারম্ভ

রূপেন্দ্র বলেন, আজ্ঞে না। আমি একাহারী। তাছাড়া আমার আহারে কিছু বিশিণিষেধ আছে। বৌঠান জানেন—তারাবৌঠানকে উনি বুঝিয়ে বলবেন সে-সব কথা।

—তবে ঐ কথাই রইল।

—একটু দাঁড়ান। আপনাকে একটি মঞ্জুষা গচ্ছিৎ রাখতে দেব। জেঠামশাই এগুলি দিয়েছিলেন রূপমঞ্জুরীর মায়ের বিয়েতে। আমার ভাঙা ঘরে এগুলো রাখা ঠিক হবে না। নিয়ে যান রূপমঞ্জুরীর বিয়ের সময় কাজে লাগবে।

মালতী নিরুপায়। তার বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আবার পালকিতে উঠলেন। এখান থেকে জমিদারবাড়ি কাছেই। মঞ্জুরী আর শুভ্র পালকিতে চাপতে রাজি হল না। তারাপ্রসন্নের পিছন পিছন দলটা জমিদার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। তারাপ্রসন্ন গহনার মঞ্জুষাটি সযত্নে স্বহস্তে বহন করে নিয়ে চলছেন।

জীবন জানতে চায়, আচ্ছা, ঐ ফুটফুটে মেয়েটি .

—চিন্তে পারলে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনেছি। হবহ মায়ের মুখ পেয়েছে। আমি তাহলে পীরপুরের দিকে রওনা দিই, গুরুদেব?

—এই অবেলায়? তোমার ফিরে আসতে ভো অপরাহ্ন হয়ে যাবে, জীবন। দুটি অন্নসেবা করে গেলে হত না?

—আজ্ঞে, আমি সকালে ভাল করে জলখাবার খেয়ে নিয়েই রোজ বের হই। রুগি-টুগি দেখে ফিরতে প্রায় বিকাল হয়ে যায়। মা জানেন।

—তুমি কি ইতিমধ্যে বিবাহ করেছ?

—আজ্ঞে না। বাবামশাই, মা আর আমি। আর আমার ছোট ভাই শিবনাথ। সবাই ভালই আছে।

—আমাদের চিকিৎসালয়ে রুগি আছে কজন?

—সব শয্যাই ভর্তি। সেসব কথা কাল হবে—

—বেশ। এস তাহলে।

pathagana.net



জীবন রওনা হবার পর নিস্তর হয়ে গেল। শুধু কুবোপাখির একটানা কক-কক-কক-কক। আর নিদাঘ বিপ্রহরে ক্লান্ত ঘুমুর ডাক। সে ডাকে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। ভগ্নস্থপের ভিতর কোনও কাঠবিড়ালীদম্পতি বোধহয় নিশ্চিন্ত মনে বাসা বানিয়েছিল শেষবসন্তে। বাছাগুলো এখনো লায়েক হয়নি। তাই লোকজনের আনাগোণায় কাঠবিড়ালীদম্পতি আমগাছে চড়ে ক্রমাগত প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে। রূপেন্দ্রনাথ সেদিকে ফিরে বললেন, তোরা অহেতুক রাগারাগি করছিস, বাপু। বাড়িটা আমার—আমি বাস করতে আসব না? তোরাও থাক, আমিও থাকি।

হঠাৎ পদশব্দে এ পাশ ফিরে দেখেন একজন অচেনা মানুষ ভাঙা কাঠকুঠো সরিয়ে ঊঁর দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরের প্রবেশপথট: সাফা করছে। আর একজন স্ত্রীলোক—বছর ত্রিশ বয়স—নারকেলকাঠির সম্মার্জনী দিয়ে ঐ গৃহের সংলগ্ন একচালাটা পরিষ্কার করছে। পুরুষটি উদ্‌য়-গা, মালকোচা-সাঁটা, কিন্তু স্ত্রীলোকটি ভদ্রঘরের। তার দু-হাতে সোনার মকরমুখী বালা। পরিধানে শান্তিপুত্রী ডুরে-শাড়ি। সে-আমলে, বিশেষ উৎসব বা অনুষ্ঠান-বজ্রনা না হলে সম্রাটঘরের মহিলারাও একবস্ত্রা থাকবেন। “কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে পুরুষ-স্ত্রী-নির্বিশেষে সাধারণ বাঙালী সামান্য পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত।... বাঙালী মহিলারা একটামাত্র শাড়ি দিয়ে শরীর আবৃত করত। বাঙালী মহিলারা মাথায় ঘোমটা দিত না।”[১] মনে হয় অলেকজান্ডার ‘অবিবাহিতা’ মহিলাদের কথা বলতে চেয়েছেন। বিবাহিত্ত্বগুণ অবগুণ্ঠনবতী হতেন।] তবে শাড়ি পবিধানের বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যে, কখনও অসতর্কতায় যুক্ত-উরসের আভাস চমচকে দেখা যেত না।

* The History of Hindustan, by Alexander Duff. Vol I. 1770, London. p. 119

রূপমঞ্জুরীর বিদ্যারত্ন

রূপেন্দ্রনাথ গাছের ছায়ায় এতক্ষণ শুয়ে পড়েছিলেন। উঠে বসে প্রশ্ন করেন, কে তোমরা?

লোকটা পিছন ফিরে দেখল। স্রোতের কলসি না। যা করছিল সেই কাজই করতে থাকে। মহিলাটি সম্মার্জনী নামিয়ে রাখে। পিতলের কলসি (কলসি? সেটা কখন এল দ্বার প্রান্তে?) থেকে ‘ফেরো’য়^৭ জল গড়িয়ে হাতটা ধুয়ে ফেলে। এগিয়ে এসে গলবস্ত্র হয়ে পদধূলি নেয় রূপেন্দ্রনাথের।

—শোভা না? কখন এলে তোমরা?

দূরত্ব বজায় রেখে শোভা গাছতলাতেই বসে পড়ে। দুর্গা খুড়োর অনুচা কন্যা। বলে, অনেকক্ষণ এসেছি রূপোদা, আপনি টের পাননি। গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে। উঠুন, মুখে হাতে জল দিন। মাদুর পেতে দিয়েছি। তাতে উঠে শুয়ে পড়ুন আবার। তবে কৃষ্ণগোবিন্দজীর প্রসাদ নিয়ে এসেছি। মুখচোখ ধুয়ে একটু প্রসাদ মুখে দিন।

রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন। নিজের অজান্তেই কাঠবিড়ালীদের লাফালাফি দেখতে দেখতে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। উনি আপত্তি করেন না। শোভা কলসি থেকে ফেলোয় করে জল ঢেলে দেয়। উনি মুখে-চোখে জল দেন। বৈশাখী মধ্যাহ্নে তাতে আরামই বোধ করেন। প্রশ্ন করেন, তুমি কী করে জানলে আমি এসেছি?

—সেসর গল্প পরে হবে। আপনি তো ছানটাও এখনো করেননি। এই গরমে ছান না করলে বিকালের দিকে শরীর অস্থির-অস্থির করবে। আমি শিশিতে করে তেল নিয়ে এসেছি। প্রসাদটুকু মুখে দিয়ে ‘আভান’ করে সারা গায়ে তেল মাখুন। ইন্দির একটা ছত্র নিয়ে এসেছে। আপনাকে ছত্র ধরে দামোদরে নিয়ে যাবে। ছানটা সেবে একেবারে সোজা তারাদার বাড়ি চলে যাবেন। গামছা-কাপড় আছে তো সঙ্গে?

—সেটুকুও থাকবে না?

—কী জানি! যেমন বাউণ্ডলের মতো চেহারা করেছেন। কতদিন গায়ে তেল মাখেননি বলুন তো?

—চার বছর।

—চার বছর! কেন?

—তোমার বৌঠান যেদিন সর্গলাভ করেন সেদিন থেকে।

শোভার মুখে প্রশ্নটা এসেছিল। সমলে নিল নিজেই। দীর্ঘ চারবছর ধরে অশৌচ পালনের কী অর্থ? এ তো নিছক পাগলামী। শোভা ভিতরের অনেক-অনেক কথা জানে। অনেক গোপনতত্ত্ব আবার জ্ঞানও না। কিন্তু এই প্রশান্ত ক্লান্ত মানুষটাকে এখন এসব প্রশ্ন করতে ওর মন সরল না।

^৭ ফেরো = পিতল বা কাঁসের খাট বিশেষ।

রূপেন্দ্রনাথ মুখ হাত ধুয়ে নিলে শোভা গাছ তলায় জল ছিটিয়ে একটা কলপাতা পেতে তাতে কৃষ্ণগেবিন্দজীর প্রসাদ সাজিয়ে দিল—পেঁপে, শশা, কলা, মুগ-ভিজা, কদমা, বাতাসা, খুর্মো আর সন্দেশ।

রূপেন্দ্রনাথ ইষ্ট স্মরণ করে খরমথ্যাঁহে প্রাতরাশে বসলেন।

শোভা—কী হিসেবি মেয়ে—একটা হাতপাখাও নিয়ে এসেছে। বাতাস করতে করতে প্রশ্ন করে, দূর থেকে তারাদার সঙ্গে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকেও দেখলাম...

—হ্যাঁ, যাবার আগে ওকে রেখে গেছে তোমাদের কুসুমবোঠান।

—ভাবি সুন্দর দেখতে। কী নাম রেখেছেন?

—ওর দাদামশাই, মানে আমার পিসা-শুশুর নাম রেখেছিলেন হট্টা। আমি ডাকি 'রূপমঞ্জরী' নামে।

—রূপমঞ্জরী। বাঃ! ভাবি সুন্দর নাম।

—নামটা আমার এক বয়স্যের দেওয়া। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তুমি তাঁর নাম শুনেছ, শোভা?

—আজ্ঞে না।

—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম?

—না। কোথাকার মহারাজা তিনি?

—নদীয়ার। কৃষ্ণনগরের। তাঁরই সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। নামকরণের অর্থটা বুঝেছ?

—সেটুকু বুঝেছি, রূপোদা। রূপেন্দ্রনাথের 'রূপ' আর কুসুমমঞ্জরীর 'মঞ্জরী'। তাই তো বলছিলাম—ভাবি সুন্দর নামটি। যেমন দেখতে, তেমনি নাম। আর সঙ্গে যে বিধবা মহিলাটিকে দেখলাম, উনি...

—সম্পর্কে আমার বোঠান। উনি এখানেই থাকবেন।

—এই সোঞ্জাই গাঁয়ে? কোথায়? এই বাড়িতে?

হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, হ্যাঁ। এ বাড়ির ঘর তিনখানি আবার খাড়া হয়ে উঠবার পর। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তারাদার আশ্রয়ে থাকবেন উনি, রূপমঞ্জরীকে নিয়ে।

শোভা চুপ করে বসে রইল। রূপেন্দ্র বললেন, জানি তুই কী ভাবছিস।

অজান্তেই 'তুমি' থেকে 'তুই' সঙ্গোধন। ওঁর যেন হঠাৎ মনে হল, স্বাত্ত্ব ওঁকে বসে থাওয়াচ্ছে।

শোভা চকিতে একবার ওঁর দিকে তাকিয়েই মাথা নিচু করল। বলল, সমাজপতির কি এটা মেনে নেবেন, রূপোদা?

—না, নেবেন না। কিন্তু তাদের একবছর-ঠাকুরকে তো তুই চিনিস শোভা। আমি লড়াই করে যাব।

শোভা হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, আর একটা কথা বলবেন? ছোটমা...

রূপেন্দ্রনাথের আহ্বার শেষ হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি জলে মুখ প্রক্ষালন করে কৌঁচার খুঁটে

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

হাত-মুখ মুছলেন। বললেন, তুই কতদূর, কী শুনেছিস জানি না, তবে এটুকু জেনে রাখ, তোরা ছোটমার সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

—সেটা কোথায়?

—পুরীতে।

—মৃত্যুসময়ে তুমি উপস্থিত ছিলে, রূপোদা?

শোভাও সজ্ঞানে খেয়াল করে দেখেনি যে, সে ‘আপনি’ থেকে নিজের অজান্তে ঐ যুবকটিকে ‘তুমি’ সম্বোধন করছে—যে যুবকটির সঙ্গে কোন এক বিস্মৃত অতীতে তার বিবাহ-সম্বন্ধ উত্থাপিত হয়েছিল।

—না, আমি ছিলাম না। আমি তখন কাশীধামের পথে।

—বাবামশাই ছিলেন?

—মৃত্যুমুহুর্তে ছিলেন না। তবে তিনিই সংকার করেছিলেন। মুখাণ্ডি করেছিলেন। না-করার কোনও হেতু নেই।

—এ ঘটনার কোনও সাক্ষী আছে?

—আছে। অন্তত দেড়-দুশ জন। বর্ধমানের ইজারাদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত—যার সঙ্গে তোমার বাবার কারবার, এ ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

—আমার একটা পরামর্শ শুনবে, রূপোদা?

—কী ব্যাপার?

—তুমি লোক পাঠিয়ে সেই নগেন দত্তর কাছ থেকে একটা হাতচিঠি আনবার বন্দোবস্ত কর। যেন ইজারাদারের পাঞ্জাছাপ থাকে সে চিঠিতে। তিনি যেন সে পত্রে স্বীকার করেন যে, আমার ছোট মায়ের মৃতদেহ তিনি সচক্ষে দেখেছেন। তিনি শাশানযাত্রী ছিলেন। দাহ হতে ও দেখেছেন।

—বুঝেছি। হ্যাঁ, আমার নামে যে কলঙ্ক রটেছে তার কথা আমি শুনেছি। তোরা পরামর্শটা আমার স্মরণে থাকবে।

—ছোটমার মৃত্যু হল কেমন করে?

—সেসব কথা তুই শুনতে চাস না, শোভা!

—অসুখে ভুগে? কী অসুখ? তুমি চিকিৎসা করেছিলে?

—বললাম তো! সে-কথা থাক!

—না, থাকবে না। আমার মন বলছে, ছোটমা, রাগে, দুঃখে অভিমানে, তীব্র ঘৃণায় গলায় দড়ি দিয়েছিল। আমাকে ছুঁয়ে বল, সত্যি কি না।

শোভা হাত বাড়িয়ে রূপেন্দ্রনাথের পদস্পর্শ করে।

রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, হ্যাঁ রে শোভা। তুই ঠিকই আশঙ্কা করেছিস—

—মীন আত্মঘাতী হয়েছিল।

শোভাও বিদ্যুৎস্পষ্টের মতো উঠে দাঁড়ায়। অসঙ্কোচে রূপোদার হাতখানি টেনে নিয়ে বলে, আর একটা প্রশ্ন—মাত্র একটা। এটাই শেষ। বল, রূপোদা। ছোটমা আত্মঘাতী হয়েছিল কবে? তার সর্বনাশের আগে না পরে?

রূপেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ওঁর মুঠি থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। বলেন, কী বলতে চাইছিস? ‘সর্বনাশ’ মানে?

শোভা বলে, আমি কচি খুকি নই, রূপোদা। কুলীন ঘরে না জন্মালে আদিনি তিনছেলের মা হতাম। আমি জানি। সব জানি। আমার পূজ্যপাদ বাবামশাই আমার জোড়া নতুন-মাকে নিয়ে আবার কেন তীর্থদর্শনে গেছেন, তা কি বুঝি না আমি? সব বুঝি, রূপোদা। সব বুঝি। তুমি শুধু আমাকে জানাও ছোটমা কখন গলায় দড়ি দেয়? পুত্রোষ্টি যজ্ঞের আগে, না পরে? ভেব না, এ আমার মেয়েলি কৌতুহল। এই সংবাদটুকু জানবার জন্য চার-চারটি বছর দাঁতে-দাঁত দিয়ে প্রতীক্ষা করে আছেন একজন—তোমার ফেরার পথ চেয়ে।

—কে? কার কথা বলছিস শোভা?

—ঐ হতভাগিনীর মা! মুখুন্ডে-খুড়ার ধর্মপত্নি—খুড়িমা। সে দারুণ খুশি হত, খুশি হবে, জানলে যে, তুমি ছোটমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ঐ পিশাচটার নাগের ডগা দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চলে গিয়েছিলে।

—পিশাচটা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার পরমশ্রদ্ধেয় বাবামশায়ের কথাই বলছি। কিন্তু খুড়িমা জানে, ছোটমার অতবড় সৌভাগ্য হবে না।

সুজিত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। মনে পড়ে গেল ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সেই তিরস্কার : “ক্যা তু গঙ্গাপুত্র পিতামহ ভীষ্ম তে : হো?”

কী আশ্চর্য। কী অপরিমীম আশ্চর্য!! তিনি সংযম হারালে শুধু মীন নয়, শুধু ব্রহ্মজ্ঞানমী নন, এই সুদূর সোঞাই গাঁয়ের একটি মহিলা—যিনি জেনে-বুঝে তাঁর আত্মজাকে সামাজিক যুপকাঠে বলি দিতে পাঠিয়েছিলেন তিনিও মনে মনে দারুণ খুশি হতেন।

সোঞাই গাঁয়ের গীতাস্বর মুখুন্ডের আত্মঘাতী মেয়ে—মীন, লেখকের কল্পিত চরিত্র; কিন্তু ত্রিবেণীর কাছে বিশপাড়া গ্রামের দরিদ্রব্রাহ্মণ ভূষণ রায় তো তা নয়। সমাজদেবতার যুপকাঠে যুগলকন্যাকে বলি দিয়েও ভূষণ মুক্তি পায়নি। ইতিহাস বলছে,

ত্রিবেণীর কাছে বিশপাড়া গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুত হলেন। সমাজের আশায় তিনি সেদিনের হিন্দু সমাজপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র আর্থিক দিক থেকে তেমন লাভবান হবেন নাচমানে করে সেই ব্রাহ্মণের সমদয় করলেন না। পরে সেই ব্রাহ্মণও ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চননের শরণাপন্ন হলে জগন্নাথ তাঁর সমদয় করে দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথের এই বীরোচিত আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ‘বাজপেয়’ যজ্ঞের পনের দিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানকালে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চননকে বাদ দিয়ে নানাদেশীয় বিভিন্ন পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন।*

* মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী, 1989, p. 104.

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

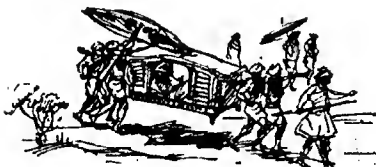
কৃষ্ণচন্দ্র মনে করেছিলেন এতে জবর অপমান করা হল তর্কপঞ্চাননকে। কিন্তু ক্ষুব্ধাবস্থায় জগন্নাথ যে পালটা চালটি দিলেন তাকে দাবার ভাষায় বলা যায় ‘ওঠসাই কিস্তি’। বিনা অমন্ত্রণেই যজ্ঞের পঞ্চমদিনে একশত ছাত্র নিয়ে জগন্নাথ ত্রিবেণী থেকে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে এসে হাজির: “মহারাজের জয় হৌক! আপনি তো মহারাজ দক্ষের মতো বিরাট শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। তাই অনিমন্ত্রিতই এসেছি।”

কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রস্তুতের একশেষ! মহারাজের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করে তাঁর খাটিয়ে জগন্নাথ যজ্ঞস্থানের কাছাকাছি শিশিষ অবস্থান করেন। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নিজে বহন করেন। যজ্ঞ শেষে প্রথা মতো কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথকে প্রণাম করেন, “বাজপেয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়েছে তো?” জগন্নাথ প্রত্যুত্তর করেন, “রবাহত জগন্নাথের স্বীকৃতির কি কোনও মূল্য আছে, মহারাজ? আপনি অন্যান্য নিমন্ত্রিত-পণ্ডিতদের মত নিন।”

কৃষ্ণচন্দ্র এ ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জা পেলেন।

জগন্নাথ ত্রিবেণীতে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর অপমানের কথা সবিস্তারে জ্ঞাপন করলেন ‘মহারাজ’ নন্দকুমারকে। নন্দকুমার তখন নবাবের দেওয়ান। নন্দকুমার কৃষ্ণচন্দ্রকে সমুচিত শাস্তি দিতে নবাবের পাওনা বারো লক্ষ টাকা চেয়ে পাঠালেন। কৃষ্ণচন্দ্র অসমর্থ হওয়ায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হল! পরে “গলদেশে কুঠার বন্ধন” করে জগন্নাথের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে জগন্নাথের সুপারিশেই নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে মুক্তি দেন।

এসব ইতিহাসের কথা। কিন্তু ইতিহাসে লেখা নেই বিশপাড়া গ্রামের সেই অরক্ষণীয় কন্যাছয়ের শেষপর্যন্ত কী হল। কতদিন বা কয় সপ্তাহ পরে বৃদ্ধের সঙ্গে তাদের দুই বোনকে সহমরণে যেতে হল।



1748 থেকে 1996 – আড়াই শ বছর হতে আর মাত্র দু-বছর বাকী আজ সাতশে অক্টোবর, 1996 তারিখে সংবাদ পত্র থেকে একটি উদ্ধৃতি না দিয়ে ধুমতে পারছি না :

কথা ছিল সামনের অগ্রহায়ণে বিশেষ করে বসিরহাটের তরুণী সোমা ঘোষের। পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছিল। কিন্তু পাত্র গৌতম ঘোষের অতিরিক্ত পণের দাবিতে সূর্য কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল... নারায়ণপুর হাইস্কুলের শারীর শিক্ষক গৌতম ঘোষের সঙ্গে সোমার বিয়ের ব্যাপারে প্রায় এক বছর ধরে কথাবার্তা চলছে। বাঙলায় অনার্স পাট টু পাঠরতা সূত্রী সোমাকে দেখে পছন্দ হয়েছিল গৌতমের। কিন্তু পণের টাকার

এবং যৌতুকের জিনিসপত্র নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পাত্রপক্ষের নানারকম বায়নাঙ্কার ফলে বিয়ের সজ্জাবনা ফাঁপ হতে থাকে। সোমার বাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। বেতন যা পান, তাতে সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়। তার উপর পাত্র গৌতমের পরিবার দাবি করে বসল নগদ সত্তর হাজার টাকা, ফ্রিজ, গোলরেজ আলমারি, আসবাবপত্রসহ খাট ড্রেসিং টেবিল, ইত্যাদি। সোমার বাবা কৃষ্ণপদবাবু আত্মীয় স্বজনের কাছে ধর নিয়ে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজিও হয়ে যান। কিন্তু টাকার অঙ্ক কমাতে বলায় গৌতম এর পর দাবি করে একটি রঙিন টি. ভি.। সোমার বাবা বলেন, বিয়ে হয়ে যাবার এক বছরের মধ্যেই রঙিন টি.ভি. কিনে দেবেন। কিন্তু পাত্রপক্ষ তাতে রাজি হয়নি।

পাত্রপক্ষের দাবির কথা জানার পর সোমা এগারই অক্টোবর সরাসরি পাত্র গৌতম ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। অতিরিক্ত পণ কেন দাবি করা হচ্ছে জানতে চান। সেদিনই গৌতম সোমাকে জানিয়ে দেয় যা যা চাওয়া হয়েছে সবই দিতে হবে। সোমা তাঁদের অর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা আবার ভালভাবে জানি-ন। কিন্তু তাতেও গৌতমের মন গেলনি। বাড়ি ফিরে আসার পর থেকে সোমা মনমরা হয়ে পড়েন। অবশেষে মদলবার বিজয়া দশমীর বিসর্জনের দিনে সোমা নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন। কৃষ্ণপদবাবু এবং তাঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখেছিলেন ভাল পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু শিক্ষক পাত্রও যে পণের লোভে একটি তরুণীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে পারে, সে-কথা ভাবতে পারেননি ঘৃণাকরেও। বসিরহাট থানার কর্তৃপক্ষ সোমার আত্মহত্যার ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নায়ের করেছে। কিন্তু সমাজ কী চিনে রাখবে গৌতম ঘোষের মতো পণলোভী পাত্রদের? প্রশ্নটি সাংবাদিককে করলেন সোমার শোকহত বাবা-মা। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের জবাব কে দেবেন জানা নেই।

প্রশ্নটি তুলেছেন ‘সংবাদ প্রতিদিন’ পত্রিকার বসিরহাটের নিজস্ব সংবাদদাতা। আমি যদি সাহিত্যসেবীর বদলে সমাজসেবী হতাম। আর বয়স, যদি বছর দশেক কম হত তাহলে বলতাম “জবাব দেব আমি।”

চলে যেতাম বসিরহাটে। খুঁজে বার করতাম—সোমাদের সাঁইপাল। এলাকাতো না হলেও—বসিরহাট অঞ্চলে কোনও-না-কোন প্রগতিবাদী নারী-সংগঠনকে থানা ‘অস্বাভাবিক’ মৃত্যুর মামলা নিয়ে কিছুই করতে পারবে না। সোমাকে কেউ আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল এটা প্রমাণ করা শক্ত। দুর্গা গাঙ্গুলিকেই কি আজকের দিনে দায়রায় সোপর্দ করা যেত, মিনুকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল বলে? ঘৃণার প্রকাশ আপনিই হয়। লক্ষ্য করে দেখুন, সংবাদদাতা পাঁচটি পাঠবতাকে বরাবর ‘আপনি’ সম্বোধন করেছেন, অথচ তার চেয়ে বয়সে বড়, স্কুলের শিক্ষককে ‘আপনি’ সম্বোধন করতে প্রতিবারেই সাংবাদিকের কলম বিদ্রোহ

কপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

করেছে। এই পণলোভী পিশাচের দল ও অপমানটুকু গায়ে মাখে না।

নারী-সংগঠন, স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁরা ব্রতী, তাঁরাই পারেন প্রতিবাদ করতে প্রতিবিধান করতে। এইসব পাত্রকে নারী-সমাজের সমবেতভাবে বয়কট করা উচিত। পুলিশ কী করেছে, বিধায়ক বা গ্রাম-পঞ্চায়েতী, রাজনীতি-ব্যবসায়ী দাদারা কী করছেন, তা জানার দরকার নেই। নারী সংগঠনগুলির কর্তব্য এ-সব ক্ষেত্রে নিজেরা অগ্রসর হয়ে পাত্র ও পাত্রীপক্ষের সঙ্গে কথা বলা। যদি মহিলা সংগঠন সিদ্ধান্তে আসেন যে, পাত্রপক্ষের পণের দাবির জন্যই কোনও অনুদা কন্যা আত্মহত্যা করেছে—সেক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবেন। ঐ পাত্রটি যাতে কোনও বিবাহযোগ্যকে বিয়ে করতে না পারে তার জন্য আন্দোলন করতে পারেন। পোস্টার দিতে পারেন, স্থানীয় সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে সম্পাদকীয় লেখাতে পারেন—নিজেরাও প্রবন্ধ লিখতে পারেন। মোটকথা ঐ সব পণলোভী বর্বরদের সুস্পষ্টরূপ চিহ্নিত করা দরকার।

সংবাদদাতা বলেছেন, কৃষ্ণপদবাবু নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি ভাল পাত্র। পাত্র তো ভাল বটেই। শারীর শিক্ষার শিক্ষক। অন্তত ‘গঙ্গারাম’-এর তুলনায়—না, ভুল হল—গঙ্গারাম কোনও পণ দাবি করেছিল বলে জানা নেই। উনিশটিবার ম্যাটিক পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গঙ্গারামের পাত্র হিসাবে কী বাজারদর ছিল, তা আমরা জানি না। এখানে তা জানি।

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, কোনও পাত্রের ওজন সত্তর কিলোগ্রাম, এবং সে যদি সত্তর হাজার টাকা দর হাঁকে—পাত্রী স্বয়ং এসে অনুরোধ করা সত্ত্বেও (দু’জনের পরিচয় ছিল কি না বলা হয়নি) সত্তর হাজার টাকা দর কমাতে রাজি না হয়, তাহলে অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে সে পাত্রের বাজার দর হাজার টাকা/কে.জি./তা ভালজাতের জ্যাকু পাঁঠার দর যখন একশ টাকা/কে.জি. তখন গঙ্গারামতুল্য সুপাত্রের দর তো হাজারটাকা/কে.জি. হতেই পারে। মুশকিল এই, কৃষ্ণপদবাবু মেয়ের বিয়ের বাজার করতে গিয়ে—সে যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন অবশ্য—গোটা-পাঁঠা, নাও কিনতে পারতেন। কিন্তু পাত্রের ক্ষেত্রে রাঙা-এর মাংস, মেটলি বা কলিজার মাংস কেনা যাবে না। গোটা পাঁঠাই কিনতে হবে—ঐ হাজারটাকা/কে.জি. দরে!

সোমা ঘোষ আজ আমার নাগালের বাইরে। ছোট্ট সোমা, তুমি আজ অমর্ত্যালোকের বাসিন্দা—‘সেথা তুমি অগ্রজ আমার।’ আমার লেখা আর সেই বাঙালী অনার্সের ছাত্রীটি পড়তে পারবে না। তাই সোমার মতো দিদিভাইদের কাছে এই সুযোগে দুটো মনের কথা বলে নিই। জানি, এটা ধান ভানতে উয়ার দীর্ঘ হচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটল উমামায়ের বিসর্জনের দিনেই। আমি থাকি-না থাকি, উমা-মা ফিরে আসবেন, আগামী বছর—তাই তাঁকে ‘পুনরাগমনায় চ’ মন্ত্রে বিসর্জন দিয়েছি। অভিমনিনী সোমা-মা ফিরে আসবে না কোনদিন।

প্রতি সপ্তাহেই অন্তত দু-তিনটি সংবাদ নজরে পড়ে—অভিমনিনী আত্মহত্যা করেছে। পরিসংখ্যান হাতের কাছে নেই, মনে হয় আত্মঘাতীর অপেক্ষা আত্মঘাতিনীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যাটা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেকেন্ডারি, হায়ার-সেকেন্ডারি, বা, বার্ষিক-পরীক্ষার সময়ে। এরা খারাপ

ফলের আশঙ্কায়, ‘ফেল’-করার আশঙ্কায়, আব্রাহনন করে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে জীবনে সাফল্যলাভের একটা ক্ষীণ সম্পর্ক আছে বটে; কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষীণ। বিভিন্ন পর্যায়ে—স্কুলে, কলেজে, যাদের ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে ‘দেখেছি তাদের অনেক-অনেককেই অফিসের বড়বাবু, মাঝারি ব্যবসায় বা স্কুলশিক্ষক হিসাবে জীবন শেষ করতেও দেখেছি।’ অপরপক্ষে জীবনে কখনও ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়নি এমন সহপাঠী সর্বভারতীয় সুনাম লাভ করেছে। সহপাঠী সত্যানন্দ প্রামাণিক পূর্বভারতের অসিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ অ্যানাসিস্ট হয়েছিল—সর্বভারতীয় সংস্থার প্রেসিডেন্ট ছিল সে। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জিমুকুল দত্ত বি.ই.-মিনিট’রি সার্ভেয়ার হিসাবে এভারেস্টের উচ্চতা মেপে সেটা সংশোধন করেছিল। বাদল সরকার নাট্যজগতে আজ প্রবাদপুরুষ। আমার এইসব সহপাঠীর তিতর কেউই পরীক্ষায় প্রথম-দ্বিতীয় হয়েছিল বলে তো মনে পড়ছে না। আমি নিজেও অঙ্কে একবার একশয় সতের পেয়েছিলাম। পরে ম্যাট্রিক অঙ্কে লেটার পাই এবং বি.এস.সি.-তে অঙ্কে অনার্স নিই। আইনস্টাইনের স্কুল-শিক্ষক নাকি ছাত্রের অভিভাবককে লিখেছিলেন, ‘হেলেটির রচনাশক্তি ভাল, বুদ্ধিও আছে, তবে অঙ্কে কাঁচা। ‘ম্যাথস’ বাদে যে কোন বিষয়ে ও পারদর্শিতা দেখাতে পারবে।’

তাই স্কুল, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রক তাদের ইঁদুর নৌড়ে বাধা করেছে, তা করুক। সেটাই জীবনের শেষ কথা নয়। স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা, হয়তো বাড়ির অভিভাবক/অভিভাবিকার দল, বন্ধু-পড়শীরা বুঝিয়েছে পরীক্ষার ফলই জীবনের পরমার্থ। কথাটা—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। জীবন অনেক বড়, অনেক ব্যাপক। তার সাফল্যের মাপকাঠি অন্যরকম। এই প্রপঞ্চময় জগতকে ভালবাসা, তা থেকে আনন্দ আহরণ করা—আনন্দ দেওয়া, ভালবাসতে পারা এবং ভালবাসা পাওয়া—অনেক-অনেক বড় জাতের প্রাপ্তি।

প্রেমে বার্থ হয়ে অথবা অভিভাবকদের কন্যাদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্তি দিতে অনেকে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়; যেমন সোমা দিল। কী অপরিসীম দুঃখের কথা। কথামাকে বারণ করে দে, বলে দে যে, যে-মানুষ নিজের উপার্জনে স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম—এমনকি সখের রঙিন টি.ভি.টাও শওরের ঘাড় ভেঙে আদায় করতে চায়—তেমন নশ্বরশবকের গলায় তোরা মালা দিবি না। হাজার টাকা দর থেকে নামতে নামতে একশ টাকায় কে.জি. দরে যদি পৌঁছায় তবু ঐ জাতির বোকা-পাঁঠা কিনিস না।

‘অত্নহত্যা’ ব্যাপারটা আজকাল বড় ‘জল-ভাত’ হয়ে গেছে। কেন বল তো? মাস চারেক আগে একদিন খবরের কাগজে একটা বিচিত্র খবর পড়লাম। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। বাড়ির গিন্নি-মা তাই খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করলেন। বাজার বসেনি, ফলে ঘরে যা ছিল তাই হল অনুপান। আলু, আর পঁপের-ভাজা। আক ছিল দুটো ডিম। হল ডবল ডিমের অমলেট। বাবা-মা; মেয়ে বড়, হেলে ছোট। মেয়ে নাকি ঝায়ানা ধরল ডবল ডিমের অমলেটটা গোটাই খাবে সে। মা বললেন, বাবু! তা কি-করে হয়? আমি না হয় খাব না, তিন ভাগ তো করতে হবে!

রূপমঞ্জরীর বিদ্যাবৃত্ত

মেয়ে উঠে চলে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিল। সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে!

সংবাদটা একাধিক সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশন করেছেন। ফলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিদারুণ দুঃখজনক সংবাদ! মেয়েটির বাবা-মায়ের জন্য পূর্ণ সহানুভূতি সত্ত্বেও লিখতে বাধ্য হচ্ছে—কোথাও কিছু একটা ত্রুটি হয়েছিল। মেয়েকে মানুষ করে তুলতে। কতটা অবদান স্কুলের, কতটা বাড়ির, বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশীর তা জানি না—কিন্তু বাবা আর ছোট ভাইকে বঞ্চিত করে গোটা ডবলডিমের অমলেটখানা পেল না বলে যে মেয়ে আত্মহত্যা করে...

আমার নিজের একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলি। বছর-পাঁচেক আগেকার কথা। আমি নিজে হাসপাতাল থেকে সদ্য ফিরে এসেছি। বেশ দুর্বল। হঠাৎ রেজিস্ট্রি ডাকে একটি চিঠি পেলাম। লিখেছে আমার রচনার একজন অপরিচিতা পাঠিকা। সাধারণ কাগজে—কোনায় তার নাম-ঠিকানা লেখা। ধরা যাক মেয়েটির নাম লিপিকা। ঠিকানাটা বহির্বাংলার। সংক্ষিপ্ত পত্র :

লিখেছে ওর বয়স ত্রিশ। গত বৎসব বিবাহ করেছে। এখনো বিবাহ-বার্ষিকী আসেনি। সেটা কত তারিখে হবে তা জানায়নি; তবে তারিখটা যে প্রত্যাসন্ন এটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। লিপিকা লিখেছে, সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে ভালবেসেই করেছে—বাবা-মার ব্যবস্থাপনায় নয়। কিন্তু এই সন্তানহানেক হল সে জানতে পেরেছে যে তার স্বামী—কর্মোপলক্ষ্যে তখন দিল্লিতে পোস্টেড—প্রাকবিবাহ-জীবনে একটি বিধবাকে ভালবাসত এবং ওদের দুজনের একটি অবৈধ সন্তানও আছে। এই সংবাদে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে লিপিকা স্থির করেছে সে আত্মহত্যা করবে। প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে। ওর স্বামী জানিয়েছে যে, ছুটি পাবে না—ওর কাছে আসতে পারবে না। লিপিকার আন্দাজ : বিধবা মেয়েটি তখন দিল্লিতেই কোথাও ছিল। সে আমাকে লিখেছিল, “কবে আত্মহত্যা করব তা স্থির করেছি, কিন্তু কীভাবে করব তা বলতে পারছি না। কারণ আমার ভাইবি—শ্যামলী বসু আসানসোলে উষাগ্রাম হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ে—সে আমাকে ভীষণ ভালবাসে। তার কাছে লুকতে চাই যে, আমি আত্মহত্যা করেছি। কারণ সে তার পিসিকেও দারুণ ভালবাসে।... আপনাকে এ চিঠি লিখছি একটি বিশেষ কারণে। আমার এই ত্রিশ বছরের জীবনের ড্রাজেডিটা ডায়েরি আকারে বিস্তারিত লিখেছি। আপনাকে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেব। আপনাকে সমন্বিত অনুরোধ : সেইটা অবলম্বনে একটা বই লিখবেন এবং তার এক কপি আমার স্বামীকে পাঠিয়ে দেবেন। আমাদের নামধাম বদলে দেবেন : স্বামীর নাম-ঠিকানা আমার ডায়েরিতে থাকবে। আশা করি মৃত্যুপথযাত্রীর এই অনুরোধটুকু রাখবেন।

বোম্ব কাণ্ড।

আমি তৎক্ষণাৎ চিঠির জবাবটা লিখে ক্যুরিয়ার-সার্ভিসে লিপিকাকে পাঠিয়ে দিলাম। সংক্ষিপ্ত চিঠিতে আমি ওর পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করে লিখেছিলাম, “আমি দুঃখিত! তোমার অনুরোধটা রাখতে পারব না। আমার উপন্যাসের নায়িকা ঐ অবস্থায় পড়লে হয় তার

সমীকে সংশোধনের চেষ্টা করত অথবা তাকে ডাইভোর্স করে নতুন করে সংসার পাতত। কিছুতেই আত্মহত্যা করত না। তুমি ইতিমধ্যে তোমার ডায়েরিটি যদি পাঠিয়ে দিয়ে থাক তাহলে আমি সেটি গ্রহণ করব। পড়ব না। রেজিস্ট্রি ডাকে আসানসোলে নবম শ্রেণীর শ্যামলী বসুকে উষাগ্রাম স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের কেয়ারে পাঠিয়ে দেব। তার জানা থাকা দরকার : পিসি কীভাবে জীবনে হার মেনে নিয়েছিল। তাহলে নিজের জীবনে সে ঐ একই ভুল করবে না।”

তোমরা খুশি হবে শুনলে : প্রায় মাস-খানেক পরে লিপিকা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল। এবার লেটার হেড। সে এম.বি. বি.এস ডাক্তার—গাইনোতে ডিপ্লোমা আছে। একটা হাসপাতালে কর্মরত। কী জানি চিঠির মাধ্যমে আমি তার গালে একটা থাপ্পড় না কষালে সে হয়তো সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ঐ সোমা ঘোষের মতো আত্মহননের পথটাই বেছে নিত। লিপিকার সঙ্গে আর আমার পত্রালাপ হয়নি। সে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েছে কি না, তাও জানি না। বলাবাহুল্য নামধাম সব বদলে লেখা। ঘটনাটা আদ্যন্ত সত্য।

মানছি, এই অনুচ্ছেদটা মূল-কাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। কিন্তু খোলামনে এই কথাগুলো না বলে শান্তিও পাচ্ছিলাম না, রে। ভূষণ রায়ের দুই অরক্ষণীয়া কন্যা আত্মহত্যা করেনি—সমাজ তাদের হত্যা করেছে। তারা তো মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে মৃন্ময়ী সামাজিক পৈশাটিকতাটা মেনে নেয়নি। তার কোনও উপায় ছিল না—আত্মহনন বাতিরেকে। যে-অবস্থায় পাড়ে শত শত রাজপুত্র রমণী জহররত পালন করেছেন মীনু খুড়িমা পড়েছিল সেই অবস্থায়। হয় নারীধর্ম, নয় জীবন—একটা তাগ করতে হবেই। সে জীবনটাকেই বেছে নিয়েছিল।

কিন্তু, দিদিভাইয়েবা। তোরা মীনুর চেয়ে অড়াই শ বছর এগিয়ে আছিস—বুড়ো দাদুর এই কথাটা ভুলিস না। কিছুতেই হার সীকার করিস না। আবার বলি : জীবন ব্যাপক। জীবন মহান। ‘মনেরে আজ কহ যে/ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যারে লও সহজে।’



আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। অর্থাৎ কাপেদ্মনাথের স্মরণে প্রত্যাবর্তনের প্রায় দিন দশ-বারো পরের কথা। ভেবেছিলেন, দিন-তিনেকের ভিতরেই দু-খানি ঘর বাসোপযোগী করে ফেলবেন। বাস্তবে তা হয়নি। পিঠামলি বাঁশের দেওয়াল বাঁধা, উপরতক্তির ছাউনি, ভিত ভরাট করিয়ে নিকানো, জানলা-দরজা স্থানে স্থাপন করতে প্রায় একপক্ষকালই লেগে গেল। তারপর গোপনে আসতে শুরু করল মালপত্র, আসবাব। খাট-পালঙ্ক, তোরঙ্গ, তৈজসপত্র—মায় লক্ষ্মীর পট, গৃহদেবতা এবং তার সিংহাসন। পূজার নানা তৈজস—তাম্রপাত্র, ঘণ্টা, পিলসূজ,

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

জলশঙ্খ, শঙ্খ, কোষাকুশি—সব কিছু। কালবৈশাখী ঝড়ে যখন বন্দোঘটি পরিবারের বাস্তুখানি পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে তখন পঞ্চায়েতের নির্দেশে জমিদার তারাশ্রম সেই অনুপস্থিত গৃহস্থের যাবতীয় অস্থাবর নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এটাই ছিল সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামীণ ব্যবস্থাপনা। কোন গৃহস্থ সপরিবারে বিদেশে গেলে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব হলে পঞ্চায়েতে স্বয়ং-প্রবৃত্ত হয়ে ঐ গৃহস্থের যাবতীয় অস্থাবরের নিরাপত্তার বিধান করত। ইতিহাসে এ-কথা লেখা নেই—আর এই এতভঙ্গ বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস কেই বা লিখে রেখেছে! কিন্তু দু-একজন শিক্ষিত ভূমালিকার প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ ও রোডনামাচা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি। জমিদারের খাজাঞ্চিবাবু তালিকা ধরে অনুপস্থিত রূপেন বাড়ুজের প্রতিটি গচ্ছিত-সম্পদের হিসাব দিলেন—মায় অঙ্গমার্জনারবস্ত্র, সৌরীন্দ্রনাথের বাতিল বৌলহীন খড়মজোড়া এবং সেই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, যাতে রূপেন্দ্রজনীর অলঙ্করণগরজিত চরণদ্বয়ের ছাপ নেওয়া হয়েছিল শ্মশানযাত্রার পূর্বে—রূপেন্দ্রনাথ তখন শিশু।

ঘটনাচক্রে এবার বৈশাখী পূর্ণিমা পড়েছে বৃহস্পতিবারে। তারাশ্রম বললেন, এই দিনটি শুভ। ঐ দিনেই নৃতন করে গৃহপ্রবেশ কর হে রূপেন। একে পূর্ণিমা, তায় লক্ষ্মীবার। ঐ সঙ্গে সত্যনারায়ণের একটা পূজার আয়োজন করে ফেল।

মালতীও জনান্তিকে তাতে সায় দিল, তাই করুন, ঠাকুরপো। সত্যনারায়ণের সিন্ধি নিতে পাঁচবাড়ির মহিলারা আসবেন। সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে যাবে এই সুযোগে।

বোধকরি মালতী মনে মনে আশা করছিল যে, সত্যনারায়ণ পূজার সিন্ধি-প্রসাদ পেতে এসে প্রতিবেশিনীদের খরজিহ্না শাণিত হবার অবকাশ পাবে না। রূপেন্দ্রনাথের বৌঠান হিসাবে গ্রাম্যনারীসমাজে সে স্বীকৃতি পাবে। শোভারানী—দুর্গা গাঙ্গুলীর অরক্ষণীয় মেয়েটিও নিত্যা হজিরা দিয়ে চলেছে, সে-ও বললে, সবার প্রথমে একটা সত্যনারায়ণের পূজা লাগিয়ে দিন, রূপোদা। আপনি না হয় এ বাড়িতে ছেলেবেলায় কাটিয়েছেন রূপো-সোনো তো তার জীবনের প্রথম রাতটা কাটাবে আজ এর বাস্তবতার ছায়ায়।

কথাটা মনে ধরল রূপেন্দ্রনাথের। রাজি হয়ে গেলেন তিনি। একবার স্ত্রী আপত্তি করতে গিয়েছিলেন, আর্থিক অনটনের কথা বিবেচনা করে—তারাশ্রম তাকে মারতে বাকি রেখেছেন। তারাশ্রমের যুক্তিটাও ফেলে দেবার নয়। ঐ ধনুস্তরী-কবিরাজের অলৌকিক চিকিৎসার আয়োজন না হলে ছয়-সাত বছর আগেই তারাশ্রম মাতৃহীন হয়ে যেতেন। যে মহিলাটির গদ্যযাত্রার আয়োজন সুসম্পন্ন সেই বুদ্ধাকে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন সংসারে। আজও তিনি কাশীধামে বর্তমান। সেই অবিদ্যায় চিকিৎসার পর থেকেই রূপেন্দ্রনাথ হয়েছেন : ধনুস্তরী।

রূপেন্দ্র বলেন, সে জন্য জেঠামশাই তো আমাকে স্থায়ী বৈদ্যবিদ্যায় দিয়েছিলেন, তারাদা।

তারাশ্রম বলেন, জানা আছে আমার। বাবামশাই তোমাকে দিয়েছিলেন একটা গ্রামীণ চিকিৎসালয় আর একটা একবগ্গা দীঘি। এই তো? সে তো তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসাবাদ! কিন্তু আমাকে যে প্রায় একদশককাল মাতৃহীনদশা থেকে তুমি মুক্তি দিয়েছ, তার প্রতিদান আমাকে

দিতে দেবে না? তাছাড়া, এ তো আমি তোমাকে বৈদ্যবিদ্যায় দিছি না। আমার ভগ্নী কুসুমমঞ্জরীর একমাত্র কন্যা রূপমঞ্জরী এই পূর্ণিমাতে তার বাস্তুভিটায় গৃহপ্রবেশ করবে। তাই আমি আর তোমার বৌঠান সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করছি। তুমি বাধা দেবার কে? সব ব্যয়ভার আমার। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, এরপর আর কথা চলে না।

একটু কী-যেন চিন্তা করে তারাপ্রসন্ন জানতে চেয়েছিলেন, তুমি মহাপ্রসাদ মুখে দাও না, অথচ 'বৃথামাংস' গ্রহণে তোমার বিকার নেই! সত্যনারায়ণ পূজায় তোমার নৈতিক আপত্তি নাই তো, রূপেন?

রূপেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, না, তারাদা, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি বৃন্দদেবকে প্রণাম শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাই বলে আমি নাস্তিক নই। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যধর্মের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে সত্যনারায়ণকেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

তারাপ্রসন্ন অবাক হয়ে বলেন, ও আবার কী কথা? কেন?

—কারণ গ্রামীণ ভারতবর্ষে প্রধান যে দুটি সম্প্রদায়—হিন্দু আর মুসলমান—তারা ঐ দেবতার দরবারেই মিলিত হয়। 'সত্যনারায়ণের' পরিপূরক 'সত্যপীর'। দোল-দুর্গোৎসব-দীপাবিতার বিপ্রতীপ উৎসব গ্রামীণ মুসলমান সমাজে অপ্রচলিত—আবার মহরম, ফতেয়া-দোয়াজ-দাহম, বকর-ঈদ-এর বিপ্রতীপ উৎসব প্রচলিত নেই হিন্দু সমাজে। স্বীকার্য, রঙ দোলে অন্তত বাঙলার গ্রামে মুসলমানেরাও রঙ মাখে, মহরমে হিন্দুর ছেলে হাসান-হুসেনের দুগুণে বুক চাপড়ে কাঁদে—কিন্তু সেটা 'সত্যনারায়ণ-সত্যপীরের' মতো একসুরে বাঁধা নয়। এই লৌকিক দেবতা বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাখিবন্ধন করেছেন।

—কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বল তো, রূপেন। তুমি শাক্ত বাড়ির সন্তান, পাঁঠার মাংস খাও—

—না, তারাদা, বিপ্লবীক হবার পর...

—জানি, আমি তার আগেকার কথা বলছি। সতীক তীর্থযাত্রা করার পূর্বে তুমি আমিষ আহার করতে অথচ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করত না! তাই না? কেন?

—তুমি কী করে জানলে?

—আমি জানি, অনেকদিন আগেকার কথা—তুমি দুর্গা খড়োর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলে। শুনেছি, তার কারণটা ঐ—'মহাপ্রসাদ' গ্রহণে তোমার আপত্তি। কারণটা কী জানি না।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, খাদ্য-খাদকের সম্পর্কটা মানুষের সৃষ্টি নয়। এটা জীবগতের অনস্বীকার্য আইন। হরিণ, গরু, খরগোশ ঘাসপাতা খায়। ঘাসপাতার প্রাণ নেই। ফলে জীবহত্যা না করে তারা জীবনধারণ করতে পারে—বনের ঝাড়-সিংহ তা পারে না। এ নিয়ম প্রাকৃতিক। বিষ্ণু-প্রপঞ্চ, মিনি সৃষ্টি করেছেন এ তাঁর নিয়ম। তাই মাংস বা মাংস-ভক্ষণে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু যাকে তোমরা 'মহাপ্রসাদ' বল, অর্থাৎ বলিদান করা পশুর-মাংস তো দেহধারণের জন্য, জৈবিক বৃত্তির জন্য খাওয়া হয় না—সেটা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে ভক্ষ্য। তাতেই আমার আপত্তি। আদিয়েণে শক্তি উপাসকেরা নির্দেশ দিয়েছিলেন : মায়ের বেনীসম্মুখে বলি

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

দিতে হবে অন্তরের যড়রিপুকে — ‘কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য’কে। তারই প্রতীক হিসাবে বলি দেওয়া হত একটি কুশ্মাণ্ডকে। ক্রমে কুশ্মাণ্ডর স্থলে এল একটি ছাগশিশু— যড়রিপুর প্রতীক। কালে মানুষ ভুলে গেল : কী ছিল মূল উদ্দেশ্যটা। যড়রিপুকে বলি দেওয়া নয়, ঐ ছাগশিশুর মাংসে উদরপূর্তি করার মধ্যেই তারা মুক্তি পথ খুঁজতে থাকে। ‘পঞ্চ ম-কার’-এর পঞ্চকুণ্ডে ভেসে গেল তাদের শুভবুদ্ধি, ব্যভিচারের পঙ্খিল পাপকুণ্ডে। আমার ঐ সিদ্ধান্ত এই ধর্মীয় ভ্রান্তির প্রতিবাদে।

তারাশ্রম ওঁকে থমিয়ে দিয়ে বলেন, কিন্তু তোমার ঐ নীরব প্রতিবাদে কী লাভ হল সমাজের? কেউ তো তা জানতে পারবে না।

—নিশ্চয় কিছুটা লাভ হবে। এই তো, দেখ না, তোমার দীর্ঘদিনের কৌতূহল চরিতার্থ করতে তুমি প্রসঙ্গটা আজ উত্থাপন করলে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের একজনকে তো তত্ত্বটা বলার সুযোগ হল? হল না? তারপর ধর, কথাটা যদি তোমার মনে ধরে থাকে তবে হয় তো আজ রাতেই তুমি বৌঠানকে সবিস্তারে কেছাটা শোনাবে।

—‘একবল্লা’ কেন ‘মহাপ্রসাদ’ ভক্ষণ করে না জান? সে এক আজব কাণ্ড। শোন বলি—’। কাল সকালে বৌঠান হয়তো বলবে গুটুবানীকে।



সাদবরে সত্যনারায়ণ পূজা সারা হল। সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে গৃহস্থ তার প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করতে যায় না; তবে সংবাদটা জানাতে হয়। সে দায়িত্ব নিয়েছিল শোভারাগী আর জীবন দত্ত। শোভারাগী রূপমঞ্জরীকে শিখিয়ে দিয়েছিল আমন্ত্রণের কায়দা : “আমার বাবামশাই হচ্ছে ভেষগাচার্য-রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা গায়ে ফিরে এসেছি। আজ রাত থেকে আমরা আমাদের সাবেক ভিটেতে আবার বসবাস শুরু করব। তাই আজ আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা হবে। আপনারা সিনি প্রসাদ নিতে আসবেন।”

শুনে পাঁচ বাড়ির মেয়েরা হেসেই বাঁচেন না—ওমা। কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি হয়েছে। রূপোদার/রূপোকাকার/রূপো ঠাকুরপোব।

একবেলার মধ্যেই সারা গায়ে ‘রূপমঞ্জরী’ পরিচিতি হয়ে গেল। শোভারাগী ওকে জমিদার বাড়িতেও নিয়ে গেল। তারাসুন্দরী রূপোকে কোলে করে সব মহলে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন।

পূজা কিন্তু রূপেন্দ্রনাথ নিজে করছেন না। পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত করলেন শিরোমণি-মশাইকে—যাঁকে চিবকাল জন্তু-ঠাকুরগ ডেকে আনতেন পূজা-পার্বণে। বার-বরতে। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থপূজাব আয়োজনে। রূপেন্দ্রনাথ আস্তর গভীরে অদ্বৈত-বৈদান্তিক! তাছাড়া সাবেক

পুরোহিতের রুজি-রোজগারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করবেন কেন?

উঠানের মাঝখানে একটি ছোট্ট চাঁদোয়া। তার নিচে সত্যনারায়ণের সিংহাসন। উঠোনজোড়া আলপনা। শোভাবাগী আর হরিমতি আলপনা দিয়েছে। আহ! আজ কাতুটা থাকলে কত খুশি হত! আর জগুপিসি।

হ্যাঁ, এতদিনে সংবাদ পেয়েছেন—সেই নারী বিদ্রোহিনী, ওঁর পিতৃস্বরূপ জগুঠাকুরের প্রয়াণের মাসছয়েক পরে এ ভদ্রাসন ত্যাগ করে কাতায়নী। তার খঞ্জ স্বামীকে নিয়ে নতুন সংসার পাততে গিয়েছিল। বর্ধমান-সরকারের নায়েব-কানুনগো নগেন দত্ত মশায়ের, মাতৃশ্রদ্ধার দান গ্রহণ করে নতুন বাস্তব বাঁধতে ওরা স্বামীস্ত্রী ভিন্নগাঁয়ে চলে যায়। আহ! তারা সুখে থাক। রূপেন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে প্রার্থনা করেন। যাক, তাহলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে জগুপিসি একটু গঙ্গাজল পেয়েছিল মেয়ের হাতে। বৈকুণ্ঠলোক যদি আদৌ থাকে—আহা-পিসি যেন সেখানে একটু ঠাই পায়।

পাঁচ-প্রতিবেশীর এয়োস্ত্রী, কন্যা এবং বিগতভর্তার দল ভিড় করে এসেছিলেন সত্যনারায়ণের পূজায় সিমি পেতে। রূপেন্দ্রনাথকে সবাই আন্তরিক ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রটাকে ভয়ও করে। রূপোদাটা যেন কালাপাহাড়। বলে কি যে, ‘মহাপ্রসাদ’ মুখে দেব না। কী-অসৈরণ কতা। তা হোক, সমাজপতিরা যেখানে অন্যায় জুলুম করেন সেখানে ঐ প্রতিবাদী মানুষটাই বৃক্ চিতিয়ে দাঁড়ায় দুর্বলের পক্ষ নিয়ে। ঐ কন্দর্পকান্তি মানুষটিই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বেঁটা-বায়েনের গর্ভবতী স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে। বেঁটার সেই শিশুটি এখন হামা-দেওয়া ছেড়ে হাঁটতে শিখেছে। সে তো জীবন পেয়েছে ঐ রূপো-ঠাকুরপোর দম্মাতেই।

ছোট্ট উঠানটিতে যেন সুন্দরীদের হাট। জমিদারবাড়ি থেকে এসেছেন তারাসুন্দরী, তাঁর ননদ পুটুরাগী, ননদের মেয়ে, নন্দদুলালের দুই সহধর্মিণী, তার ভগ্নী, ভাগিনেয়ী। কন্যা হরিমতি। মন্মথীর মা আর বৃদ্ধা পিসিমা বালবিধবা গিরিবালা। দুর্গা গাঙ্গুলীর কন্যা আর ভীষ্মি—আরও কত কত বাড়ি থেকে। পুরুষেরা বসেছে ছিড়িয়ে ছিটিয়ে। রূপমঞ্জরী আর শুভপ্রসন্ন একেবারে পুরোহিতের নাকের ডগায়। হাত ধরাধরি করে। আর মালতী এক গল্প ঘোমটা দিয়ে প্রায় সর্বত্র।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন পীতাম্বর মুখার্জেয়।

—এই যে বাবাজীবন। আদিনি গাঁয়ের কতা মনে পড়ল।

রূপেন্দ্রনাথ মন্মথীর পিতাকে প্রণাম করে বললেন, বড় দর দর তীর্থ ঘুরে এলাম, খুড়ো। পুরী এবং কান্দীধামও।

—ওনেছি। তুমি একটু ইদিকে সরে আসবে, বাবা। তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কতা ছিল—

রূপেন্দ্র একটু আড়ালে সরে এসে বললেন, আপনি যা জানতে চান তা আমি মোটামুটি তারাদাকে জানিয়েছি। শোভাবাগীকেও বলেছি। জানি, আপনি বা খুড়িমা আরও বিস্তারিত

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

জানতে চান—মীনুর বিষয়ে, তাই তো—কিন্তু এখন, এই পরিবেশে...

—বটেই তো, বটেই তো। আমি কাল সকালে আর একবার আসব বরং। খুঁকির প্রসঙ্গ ছাড়া আরও কিছু আলোচনা করা যাবে।

—বেশ তো আসবেন। সব কথাই খুলে বলব আপনাকে। শুনব।

নন্দ চাট্‌ক্ষেত্র ও ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে—তাঁর বাতের ব্যাথাটা আবার চাগিয়েছে—ঘনিয়ে এলেন। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে সরে গেলেন পীতাম্বর মুখুজে। গ্রামসম্পর্কে খুড়ো-মশাইকে প্রণাম করতে হল রূপেন্দ্রনাথকে। নন্দ বললেন, চিরায়ুমান হও বাবা! শুনলাম বৌমা নাকি ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে গেছেন। প্রসব হতে গিয়ে, না কী? অন্য কোনও ব্যাধিতে? নন্দের কর্ণমূল মুখটা নিয়ে এসে রূপেন্দ্র বললেন, সেসব কথা পরে আলোচনা করব খুড়ো। সত্যনারায়ণের পাঠ শুরু হয়ে গেছে।

সত্যি কথা। শিরোমণি ঠাকুর পাঁচালী পাঠ শুরু করে দিয়েছেন। অবগুণ্ঠনবতীরা গলায় আঁচল দিয়ে যুক্ত কর হয়েছেন। পুরুষেরাও গুড়ুক সেবনে ক্ষান্ত দিয়ে শান্ত হয়ে বসেছেন। নন্দ সেদিকে একটু দেখে নিয়ে বললেন, অ! তা এটু বাইরে এস না, রূপেন। একটা জরুরী কথা ছিল...

—জরুরী কথা? কী বিষয়ে?

—তোমার সঙ্গে নাকি একই নৌকায় একটি যুবতী বিধবা...

জনতার ভিতর থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় ধমক দিয়ে ওঠেন, আস্তে। কথা বলবেন না। ব্রতকথা পাঠ শুরু হয়ে গেছে।

রূপেন্দ্রনাথ ওষ্ঠাধরের উপর দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটা স্থাপন করে নন্দকে ইঙ্গিত করলেন।

সমাজপতি বাধ্য হয়ে নীরব হলেন।

আপাতত।



একপ্রহর রাতের শিবাধ্বনি হওয়ার আগেই শেষ হল ব্রতকথা। পাঁচ বাড়ির এয়োরা এগিয়ে এল প্রসাদ নিতে এবং বিতরণ করতে। ছোট-ছোট করে কাটা কলা-পাতায় নানা ফল, লোচিকা, ব্যাঞ্জন, পরমান্ন, বাতাসা, খুর্মা, পাটলি, আর সিনি। প্রসাদ পাওয়ার নিয়ম হচ্ছে—বাতাবিলেবু বা আতা জাতীয় ফলের বীজ ছাড়া পাতায় কিছু পড়ে থাকবে না। বীজগুলি হাতে তুলে নিয়ে ‘পাঁদাড়ে’র দিকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। আর দু-হাতে কদলীপাতটা লেহন করে সাফ্য করতে হবে। সিনি প্রসাদ পাওয়ার পর হস্তপ্রক্ষালনের বিধি নাই। হাতটা মাথায় মুছে ফেলতে হয়। এ-কারণে খুব সাবধানে সবাই সিনি-প্রসাদ গ্রহণ করে। বাতাসা বা পাটলিকে চামচ হিসাবে ব্যবহার করে।

বাঁশঝাড়ের মাথার উপর বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ উঠল আসর ভাঙতে ভাঙতে। ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। সকলেই যে-যার বাড়ি পানে রওনা দিল।

শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম। মীনুর পিসিমা অর্থাৎ পীতৃ মুখুজ্জের দিদি গিরিবালা একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছেন। বললেন বাব্বা। মাজাটা ধরে গেছে। আমি আর পরিবনি বাপু, এতটা পথ হেঁটে যেতে।

‘এতটা পথ’ মানে দীঘির ও-পার। রূপেন্দ্র বললেন। বললেন, বুঝছি। তা খুড়িমাকে বলে রেখেছেন তো যে, রাত্রে আপনি ফিরবেন না?

গিরি-পিসিমা বললেন, আমি আবার ভাবে কী বলব? সেই তো আমিই বললে, তুমি রাতটা রূপোর ঠাণ্ডেই থেকে যেও। মালতী বেচারি একা-একা ভয় পাবে। ওর সাথে শুয়ো।

মালতী সলজ্জে নতনেত্রে বলল, হ্যাঁ, কথাটা উনি আমার সামনেই বলেছিলেন। পিসি আর আমি ঐ পশ্চিমের ঘরটায় শোব। আপনি মঞ্জুরীকে নিয়ে উত্তরদুয়ারি ঘরে বড় পালঙ্কে শোবেন।

সেই মতোই ব্যবস্থা হল রাত্রিবাসের।

সৌরেন্দ্রনাথের আমলের বিরাট সাবেক পালঙ্ক। কর্তামশাই এককালে এই শয্যাতেই শয়ন করতেন। বাপের কোল ঘেষে টুমটুম হয়ে শুয়ে পড়ল রূপমঞ্জুরী। বললে, আমারে আট্টা কিছ্‌ছা শোনাবে বাবা?

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

—শোনাব। যদি তুমি ভাল করে আমাকে কথাটা বলতে পার!

—‘ভাল করে’? কী খারাপ বলনু আমি?

—‘বলনু’ নয় মা-মণি, ‘বললাম’ বা ‘বলেছি’। তুমি লক্ষ্য করে দেখ, আমরা সবাই কী ভাষায় কথা বলি। মালতী, বৌঠান, তারাদা, শুভপ্রসন্ন কী ভাষায় কথা বলে। তোমার কোন দোষ নেই—এতদিন তুমি বি-চাকরদের মাঝখানে মানুষ হচ্ছিলে। শুনে শুনে তাদের কথাভাষাটাই বলতে শিখেছ। তোমাকে আমি লেখাপড়া শেখাব। সংস্কৃত শেখাব, ফার্সি শেখাব। তার আগে নিজের চেষ্টায় তোমাকে শুধু বাংলা বলতে হবে। ঐ শুভপ্রসন্নের মতো। আমি কী বলছি, বুঝতে পারছ, সোনা-মা?

রূপমঞ্জরী তার ছোট্ট মাথাটা ইতিবাচক ভঙ্গিতে নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

—তুমি এবার ঐ শুভপ্রসন্নের মতো ভদ্র ভাষায় আমাকে বল তো মা-মণি—যে-কথাটা একটু আগে বলেছ।

রূপমঞ্জরী সাবধানে একটা-একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল : আমাকে একটা গল্প শোনাবে, বাবা?

রূপেন্দ্রনাথ ওকে কোলে টেনে নিয়ে গালে চুমু খেলেন। বললেন, এই তো। ঠিক বলেছ! ‘আমারে’ নয় ‘আমাকে’; ‘আট্টা’ নয়, ‘একটা’, ‘কিছা’ নয়, ‘গল্প’। শুধু একটা ভুল হয়েছে— ‘বলবে’ নয়, ‘বলবেন’।

...তোমরা অবাঁক হচ্ছ, তাই না, দিদিভাই? তোমরা শুধু ‘মাকে’ নয়, হয়তো ‘বাবা’কেও ‘তুমি’ বল। আমার নিজের ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিরাও তাই বলে। কিন্তু আমি বা আমার দাদা-দিদিরা শুধু বাবা-মশাই বা কাকা-জেঠাদের নয়, নিজের নিজের দাদা-দিদিকেও, এমনকি মাকেও ‘আপনি’ বলতাম। অষ্টাদশ-শতাব্দীতেও সেটাই ছিল শিষ্টাচার।



রূপেন্দ্রনাথ বললেন, আজকের এই দিনটি একজন মহাপুরুষের জন্মতিথি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কপিলবস্তুর রাজপ্রাসাদে। রাজার সন্তান তিনি।

—আপনি কি রাজপুত্রের গল্প বলছেন, বাবা?

চমৎকৃত হলেন রূপেন্দ্রনাথ। প্রশ্নধান করলেন, অতি ক্ষরধার বুদ্ধি তাঁর আত্মজার। একবার মাত্র নির্দেশই সে সংশোধন করে নিয়েছে নিজেকে। তার বর্ষচতুষ্টয়ের

প্রাকৃতজনপ্রভাবিত বালভাষ্য মূহূর্তমধ্যে সংশোধন করে নিতে পেরেছে। রূপেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিকই বলেছ মা, তবে কথটা ‘রাজপুত্র’ নয়, ‘রাজপুত্র’। শোন এবার গল্পটা—

আমাদের কাহিনীর সেই ছোট্ট নায়িকাটি—যিনি বিবেকনির্দেশিত পথে পুরুষশাসিত অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে নারীজাতিকে সম্মানে প্রতিষ্ঠার ব্রত সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন—সেই অলোকসামান্য তাঁর সপ্তপুরুষের পদব্রজধন্য বাস্তুভিটায় প্রথম রাত্রিযাপনের অবকাশে পিতৃদেবের কাছে প্রাকৃত ভাষায় শুনলেন এক মহা-‘রাজপুত্রের’ গল্প। যে-রাজপুত্র বিবেকনির্দেশে গড়লিকা শ্রোত শামিল হতে অস্বীকার করেছিলেন। নিন্দা করেছিলেন সেই যজ্ঞবিধিকে যা অবোধপণ্ডকে বলিদানের মাধ্যমে পরমার্থলাভের সন্ধান করত। রাজপুত্র বস্তুতঃ জ্ঞাননিধূতকল্যায় পরমবুদ্ধ। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দকে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শেষ নির্দেশ :

আত্মাদীপো ভব।

আত্মশরণো ভব॥

অনন্যশরণো ভব॥*

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম মহিলা বিদ্যালয়িকেন্দ্র—শুধু গৌড়মণ্ডলে নয়, বোধকরি এযুগের ভারতের প্রথম স্ত্রীশিক্ষানিকেন্দ্র। বিনা আড়ম্বরে, বিনা শঙ্কনির্ঘোষে, নীরবে, নিভৃতে তার প্রতিষ্ঠা হল দামোদরতীরের এক গণ্ডগ্রাম—সোএরাই-এ। জ্যেষ্ঠের মাঝামাঝি। এ প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ক্রীজাতীয়দিগের শিক্ষাব্যবহার আয়োজন। ছাত্রীসংখ্যা মাত্র আট। বহু আয়াসেও তদপেক্ষা অধিক ছাত্রী যোগাড় করা যায়নি। উপায় কী? অক্ষর পরিচয় এবং বৈধব্যযোগে যে পণ্ডিতমশাইদের মতো বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত।

আটজনের পরিচয় একে-একে দাখিল করা যাক।

সর্বযোঃজ্যোষ্ঠা ছাত্রীটির বয়স তিনকুড়ির ওপারে : গিরিবালাদেবী বালবিধবা—মুহূর্তমধ্যে নূতন করে বৈধব্যযজ্ঞগার ব্যবস্থা করতে সয়ং যমরাজও অশক্ত। তিনি হচ্ছেন পীতাম্বর মুখুজ্জের জ্যোষ্ঠা ভগিনী—মুম্বয়ীর পিসিমাতা ঠাকুরানী। সেই যে সত্যনরায়ণ পূজার দিন বৈশাখী পূর্ণিমায় এই বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে পদার্পণ কবেছেন তারপর আর সঙ্গহে প্রত্যাবর্তন করেননি। রূপেন্দ্রনাথ সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন এটি তাঁর হিতৈষীবর্ণের গোপন ব্যবস্থাপনা। নীত মুখুজ্জে আর তারাপ্রসন্নের যোগসাজশে গিরিবালা এই চণ্ডবুঝেছেন : ‘অমি আর চলতে পারবনি বাপু।’

* নিজেকে প্রদীপের মতো প্রজ্বলিত কর। সেই আত্মদহনকারী দীপশিখার আলোকে জীবনপথ অতিক্রম করে চল। অপরের আগুবাঞ্চে প্রভাবিত হয়ে কাজ করবে না।

রূপমঞ্জুরীর বিদ্যারত্ন

রূপেন্দ্রনাথকে তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানাননি। জানাতে সাহস হয়নি। কী-জানি একবগ্না যদি বেয়াক্ক রুখে দাঁড়ায়। তাই তাঁরাসুন্দরী আর মীনুর-মা গোপনে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মালতীকে। প্রকাশ্যে বলা হল : গিরিবালা ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাঁড়ুজ্ঞ-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। স্থির হল রূপেন্দ্রনাথকে লুকিয়ে পীতাম্বর দিদির জন্য আতপ চাউল গোপনে যুগিয়ে যাবেন মালতীর ভাঁড়ারে। মালতী মনে-মনে স্থির করে এসেছিল সোণ্ডাই গাঁয়ে বাস করতে এসে ঐ সত্যনিষ্ঠ কন্দর্পকান্তির কাছ থেকে কিছুই গোপন করবে না। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা গেল না। বঝাল, গিরিপিসি নিজে থেকে এ ভিটায় বাস করতে না এলে—একটি বিপত্নীক যুগপুরুষ এবং একজন নিঃসম্পর্কীয়া যৌবনবতী বিধবার একত্রবাস গ্রাম্যসমাজ ভালচোখে দেখত না।

তাছাড়াও একটি গুরুতর কারণ ছিল। কিন্তু মালতী সেকথা নিজের কাছেও স্বীকার করতে লজ্জা পায়। গিরিপিসি আসাতে সে খেড় প্রাণ পেল।

রূপেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় হেতুটার বিন্দুবিসর্গও আঁচ করেননি; কিন্তু প্রথম যুক্তিটা সহজেই আন্দাজ করলেন। স্বীকার করলেন না। বললেন, পিসি, ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, বেশ করেছেন। কিন্তু এ-বাড়িতে আপনাকে থাকতে দেব একটি শর্ত মেনে চললে। আপনাকে লেখাপড়া শিখতে হবে।

গিরিবালা আঁৎকে ওঠেন : ওমা আমি কোথায় যাব। আমার বয়স যে তিনকুড়ি পেরিয়ে গেছে রে। এই বুড়ি বয়সে তালপাতায় আঁক করব?

—না। অল্প শিখতে হবে না আপনাকে। শিখবেন ভাষা। অ-আ, ক-খ। নিজে-নিজে কুস্তিবাস ওঝার রামায়ণখানা পড়তে হচ্ছে করে না?

এবার থমকে গেলেন পিসি : পারব?

—আলবৎ। তিনমাসের মধ্যে। যদি না পারি...

—না, না, দিবি-দিলেস দিস্নি রূপো। তুই তো জানিস না, আমার মাথায় শ্রেফ গোবর। তোর পিসেমশাই বলতেন।

বিদ্যানিকেতনের বাকি সাতজন ছাত্রীর কথা বলি; যারা সমাজপতিদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ওঁর অবৈতনিক পাঠভবনে নিত্য হাজিরা দিতে আসতেন।

দ্বিতীয়ত তারাসুন্দরী। জমিদারের ঘরনী। তাঁর শাশুড়ি ঠাকরুণ কর্তার কাছে জনান্তিকে সাক্ষর হয়েছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। সেসব কথা আগেই বলেছি। ওঁরা দুজনে লুকিয়ে কালিদাস-ভবভূতি-ভাস পাঠ করতেন। পড়তেন ও শুনতেন। শালা করে। প্রথম যুগে শব্দার রস। ক্রমে মহাকাব্য। শেষে ‘যম-নটিকেতা সপ্তক’, ‘পাগীয়াজ্ঞক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’, শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা। এ সংবাদ প্রথম দিকে গোপন ছিল, অল্প দিন ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পিতৃদেব জীবিত ছিলেন; তারপর এ-কথা গ্রামে কারও জানতে পারি ছিল না। কই ব্রজসুন্দরীকে তো অকাল বৈধবায়ত্ত্বা ভোগ করতে হয়নি। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ পবিগত বয়সে স্বর্গলাভ করেছেন। ব্রজসুন্দরী তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদন করে বার্ষিকে বারাগসীধামে চলে গেছেন।

তারাসুন্দরীর কর্তার না আছে সময়, না ধৈর্য, না উদ্যম। তবে বাধাও তিনি দেননি।

মাথায় অধো ঘোমটা টেনে জমিদারগৃহিণী তাই প্রত্যহ রূপেন-ঠাকুরপোর ভিটায় হাজিরা দিতেন। বাংলা, ক্রমে সংস্কৃত শিখবেন বলে। একটু সঙ্কোচ অবশ্য ছিল। বয়সটার জন্য। রূপেন আর তারাসুন্দরী প্রায় সমবয়সী। দুজনেই ত্রিশ-বত্রিশ। তা সে বাধাও ঘুচে গেল পুঁটুরাণীর আগ্রহে। সে এসে বললে, 'ভূমি দাদাকে বল বোঠান, আমি রূপোদার পাঠশালায় পড়তে যাব। আমার তো আর ও-ভয় নেই।

না তা নেই। যমদূতগুলো আহাম্মকের বেহুদ। চোখ মেলে দেখল না : পুঁটুরাণী নিরক্ষরা। সিঁথের সিঁদূর মুছে মেয়ের হাত ধরে যে ফিরে এসেছিল বাপের বাড়ি।

ফলে পুঁটুরাণী হল তিনি নম্বর ছাত্রী। তার পাঁচবছরের কন্যাটি চার নম্বরের। বয়ঃপ্রাপ্তা অনুঢ়া ছাত্রী মাত্র একজন : শোভারাণী। রীতিমতো লড়াই করে সে ভর্তি হল রূপোদার পাঠশালায়। শোভারাণী সুন্দরী নয়। কুসুমমঞ্জরী বা মৃন্ময়ীর মতো চম্পকগৌর গাত্রবর্ণ থেকে সৃষ্টিকর্তা তাকে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু তাই বলে স্বগ্রামের ঐ অনিন্দ্যকান্তির দিকে সে মনে মনে আবৃষ্ট হবে না কেন? না, রূপোদার শুধু রূপ নয়, শোভারাণী তার বেড়া-বিন্দু-বাঁধা যুগ থেকে দেখে আসছে ঐ গ্রাম্য বিদ্রোহীর অপরিসীম দাড়া। সমাজপতিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে বারে-বারে দেখেছে তাঁকে সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো রুখে দাঁড়াতে। সব কিছু সে বুঝতে পারেনি, আজও পারে না—বেচারির সে শিক্ষাটাই যে হয়নি। কিন্তু এটুকু বুঝেছে যে, ঐ রূপোদাই আসলে সেই পক্ষিরাজে-চড়া রাজপুত্র, যার কথা সে শুনেছে বহু জোনাকজ্বলা সন্ধ্যায়, ঠান্ডার কোল ঘেঁষে বসে। প্রায় যৌবনোন্নির্গা ঐ অরক্ষণীয়ার মর্মবেদনাটা কি তোমরা বুঝতে পার না? স্বীকৃতি ভাল কি মন্দ, লেখাপড়া শিখলে আর দুটি হাত গজায়-কি-গজায় না তা জানে না শোভারাণী। জানতে চায়ও না। কী লজ্জার কথা—তার আসল উদ্দেশ্য ঐ আজব মানুষটাকে সে রোজ কাছে থেকে বসে দু-চোখ মেলে দেখতে পাবে, তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। প্রয়োজনে এক-‘ফেরো’ ঠাণ্ডা জল কলসি থেকে গড়িয়ে এনে বলতে পারবে, রূপোদা আপনার তেষ্ঠা পেয়েছে নিশ্চয়। খান!

এর বেশি সেই মেয়েটি আর কিছু প্রত্যাশা করে না। করতে সাহস পায় না।

দুর্গা গাঙ্গুলী সমাজপতি। কউর প্রাচীনপন্থী। স্বীলোক সাক্ষর হবে এমন ‘অসৈর্য-কৌতু’ তিনি নিশ্চয় বরদাস্ত করতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি গ্রামে অনুপস্থিত। দুই হোঁরনবতী সদ্যোবিবাহিতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুনরায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থ করতে গেছেন—পুন্ড্রানন্দরক থেকে নিস্তার পাওয়ার আশা নিয়ে। ফলে শোভারাণীর বর্তমান অভিভাবক গাঙ্গুলীবাড়ির সেজতরফের বড়কর্তা, অর্থাৎ দুর্গাচরণের অনুজ কালীচরণ। তিনি প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলেন। শোভারাণী কর্ণপাত করেনি। কালীচরণ বাধ্য হয়ে শরণ নিয়েছিলেন দ্বিতীয় সমাজপতি নন্দ চাটুজ্জের মশায়ের দরবারে। নন্দও চেষ্টা করতেন। শোভারাণী হাত দুটি জোড় করে বলেছিল, আমাকে বাধা দেবেন না, ফুলকা! তারা-বোঠান এতটা বয়সে ওঁর পাঠশালায় আসছেন, পুঁটুদি আসছেন। আমারই কী দোষ হল?

নন্দ ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, গাধার মতো কতা বলিস না শোভা! ওরা হল বারিন্দির। ওঁদের নিয়মকানুন সব আলাদা। ওরা কি বামুন? ওঁদের ছেলেমেয়ের বে-তে পাকা দেখা

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারম্ভ

হয় না, হয় 'করণ'! তাই তো তারা-ভাদুড়ীর মা লুকিয়ে লুকিয়ে দিগ্গজ পণ্ডিত হতে চেয়েছিল...

শোভারাগী তখনো যুক্তকর। বলেছিল, দিগ্গজ পণ্ডিত হোন বা না হোন তিনি সমোঙ্কৃত পুঁথি পাঠ করতে শিখেছিলেন। আর সেই অপরাধে কোনও যমদূতের হিংস্র হয়নি তাঁর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিতে।

—দায়নি? তারা-ভাদুড়ীর মা সম্ভবা অবস্থায় ড্যাংডেঙিয়ে সগ্যে যেতে পেরেচে? বিধবা হ'য়ে কাশীবাসী হতে হয়নি তাকে?

শোভারাগী তখনো যুক্তকর। জবাবে বলেছিল, আমিও ড্যাংডেঙিয়ে সগ্যে যেতে চাই না, ফুলকাফা। শেষ বয়সে আমিও না হয় বিধবা হতে রাজি। কিন্তু বিধবা হতে হলে একটা 'বর' তো প্রথমে যোগাড় করতে হয়ে? বাবামশাই তো নিজের বিয়ে নিয়েই সারাটা জীবন ব্যস্ত। আপনিই আমাকে তাই একটা যোগাড় করে দিন না? কানা-খোঁড়া-বুড়ো, যেমনটাই হোক। নাহলে বিধবা হব কি করে? লেখাপড়া আমি শিখবই।

নন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মুখবা মেয়েটির বাচালতায়। দাঁতে-দাঁত দিয়ে বলেন, এক ফোঁটা মেয়ে তুই! বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস দেখছি।

শোভারাগী এবার হঠাৎ নন্দখুড়োর ঠাং থেকে এক-খামচা একটা 'পেনাম' উঠিয়ে নিয়ে বলে, আপনি মেহের চোখে দেখেন, তাই নজর হয়নি। মেঘে মেঘে দেড়-কুড়ি বয়স হয়ে গেছে আমার। কুলীনঘরে না জন্মালে অ্যাদিনে তিন ছেলের মা হয়ে যেতাম।

বজ্রাহত নন্দ বলেন, ঘোর কলি একেই বলে। লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছিস? আসুক তোর বাবা ফিরে।

একগাল হেসে শোভারাগী বলেছিল, না, ফুলকাফা! উনিশ-কড়া কলি! ঘোর কলি হতে এখনো এক কড়া নাকি। সেটা হবে মেহেরউল্লিসা যখন ভর্তি হবে রূপোদার পাঠশালায়।

—কে? মেহেরউল্লিসা! মানে? সে কে?

—শোনেননি বুঝি? সে এক বেহেশতের হরি! রূপোদা তারেও ভর্তি করে নিতে রাজি হয়েছে। আমার মতো বুড়ি নয়। ছোট ফুলখুড়িমার বয়সী!

কথাটা মিথ্যা নয়। নন্দের শেষ ধর্মপত্নী বছর বাইশ।

তারা-পুঁটু-সুজাতা একুনে তিন;

শোভা-মালতী-রূপমঞ্জরী, আর গিরিবালা, 'ইল সাত। রূপেন্দ্রনাথের অষ্টম ছাত্রী একজন যবনী : মেহেরউল্লিসা! পীরপুরের মৌলবী কলিমুদ্দিন সা'ব-এম্ ভাগিনী। হ্যাঁ, খবরটা মিথ্যা নয়। কুলীন ব্রাহ্মণ রূপেন্দ্রনাথ মৌলভীসাবকে 'দ্বাধান' দিয়েছেন : তাঁর পাঠশালায় এ যবনীকেও ভর্তি করে নেবেন। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর যখন সব পঞ্চশোধর্বা! বোঝা কাণ্ড!

দুঃসাহসিকতার একটা সীমা থাকবে তো!

কিন্তু রূপেন্দ্র নির্বিকার। বিবেকনির্দেশী তিনি মৌলভীসাবকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। বিচিত্র ঘটনা পরম্পরা। শোন বলি :

আয়ুর্বেদশিক্ষা সমাপনান্তে রূপেন্দ্রনাথ একসময় প্তির করেছিলেন বর্ধমানের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলমান হেঁকিমের কাছে হেঁকিমীবিদ্যাও শিক্ষা করবেন। হেঁকিমসাহেব তাঁকে

বিদ্যাদান করতে স্বীকৃতও হয়েছিলেন; তবে বলেছিলেন শিক্ষাব্যবস্থার পূর্বে ছাত্রকে আরবী-ফার্সি দুটো ভাষাতেই অলিম হতে হবে। রূপেন্দ্রনাথ সে জন্য সোএগ্রই গ্রামে ফিরে আসার পর গীরপুরের মৌলভীসাবকে অনুরোধ করেন ঐ দুটি ভাষায় শিক্ষা দিতে। গীরপুর দামোদরের ওপারের একটি মুসলমান-প্রধান গ্রাম। মৌলভী কলিমুদ্দিন সা'ব স্বীকৃত হয়ে যান। প্রত্যহ পড়ন্ত বেলায় তিনি সোএগ্রই-গাঁয়ে চলে আসতেন—জুম্মাবার বাদ দিয়ে। সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত রূপেন্দ্রনাথকে ঐ দুটি ভাষা শেখাতেন। তারপর রূপেন্দ্রের পিসিমা জগুঠাকরুন একগলা ঘোমটা টেনে নিয়ে আসতেন কিছু প্রসাদী। ফলমূল-বাতাসা-খুরমো-কদমা। মৌলভীসাব পদ্মদীপিতে অঙ্ক করে সাম-ওয়াজের নামাজটা সেবে নিতেন। তারপর ঐ প্রসাদটুকু মুখে ফেলে বিদায় নিতেন। ফিরে যেতেন পারানি ঘাটে, দামোদর পার হয়ে গীরপুর গাঁয়ে।

সেসব গত দশকের কথা। তারপর ঘটনাচক্রে রূপেন্দ্রনাথের বর্ধমান যাওয়া হয়নি। হেকিমীবিদ্যা শেখাও হয়নি। তবে আরবী না হলেও ফার্সিটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন ঐ মৌলভী সাহেবের সহায়তায়।

তাই এতদিন পরে তিনি ঐ উদারচেতা মুসলমান মৌলভীসাবকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি।

...কিন্তু ওঁর দুঃসাহসিকতার পরিমাণটা তোমরা একবার বিচার করে দেখবেন দিদিভাই? রাধানগরে যুগাবতার রামমোহন রায়-মশায়ের আবির্ভাব হতে তখনো উনিশ বছর বাকি—বর্ধমানভুক্তির একটি প্রত্যন্ত গ্রামে একজন কুশীন ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র স্ত্রীলোকদের জন্য একটি বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠা করছেন—কন্ডিবাস-কাশীরাম এবং খানকয় মদলকাব্যের লিখিত পুঁথি আর রায়গুণাকরের কিছু গ্রন্থ ব্যতীত বঙ্গভাষায় সে-সময় কোন কিছু ছিল না—আর সেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত জিজাতীয়ার বিদ্যালয়ের আটটি ছাত্রী অষ্টম বিদ্যার্থী হচ্ছেন : মেহেরউন্নিসা বেগম।

যবনী!!

রূপেন্দ্রনাথ সেই আয়োজনই করেছেন। বিবেকনির্দেশে। গৌড়দেশে কথা ভাষা বাঙলা। মেহেরউন্নিসার মাতৃভাষাও বাঙলা—উর্দু নয়, ফার্সি নয়। কোন যুক্তিতে সেই ছাত্রীটিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে? তারাসুন্দরী-মালতী-রূপমঞ্জরীর চেয়ে ছাত্রী হবার দাবি তার কম কিসে?

কিন্তু মৌলভীসাবই বা এমন বয়োভা অনুরোধ করে যসমেন কেন? তাহলে মূলকাহিনীটা মূলত্ববী রেখে মেহেরউন্নিসার কিসসাঁই লিপিবদ্ধ করতে হয় প্রথমে:

মেহের হচ্ছে মৌলভীসাহেবের ভগিনী। প্রায় মালতীসাবই বয়সী—বাইশ-চব্বিশ। সদ্যোবিবাহিতা এবং সদ্য-স্বামীভক্তা। হেতুটা মর্মান্তিক।

মেহেরের বৃকে, তলপেটে, উরুতে শেতির দীপ আছে। মুখে নেই। এই অপরাধে মেহেরের খসম সাদির সাতদিনের মধ্যেই তাকে তিন-তালক গুনিয়ে দিয়েছে। মৌলভীসাব সত্যশ্রয়ী। পাণ্ডের আব্বাজানকে সত্য কথা সাদির অনেক পূর্বেই নিবেদন করেছিলেন। পিতা সে বার্তা পূত্রকে জ্ঞাত করিয়েছিলেন কি না সেটা ইতিহাসের অকথিত অধ্যায়। মেহেরের

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

খসম-এর দাবি ওটা শ্রেতি নয়। কুষ্ঠা বিচক্ষণ হেকিম এবং স্বয়ং রূপেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, রোগটা আদৌ কুষ্ঠ নয়, শ্রেতি। সচরাচর শ্রেতির দাগ মুখেই ফটে ওঠে। কোন কোন ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে তা দেহের অন্যান্য স্থানে দৃষ্ট হয়। কাসেম অঙ্গী—মেহেরের খসম—স্বেদ কথা কানেই নেয়নি। ধর্ম ও আইন তার পক্ষে। বিবাহের যাবতীয় দৌত্যক হাতিয়ে নিয়ে সে তিন-তালুক দিয়ে মেহেরকে ঘাড় থেকে নামিয়েছে। মৌলভী সা'ব দ্বিতীয়বার মেহেরের নিকার আয়োজন করেননি। খোদাতা'লার ইচ্ছায় তাকে এভাবে জীবনটা কাটাতে হবে। উনি কর্মসম্মানে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন। গত বছর। আলিবর্দীর মীর মুঙ্গীর সঙ্গে ওঁর খাতির ছিল। একই মৌলভিবে দুজনে পড়েছেন। ফলে সহায়্যায়ী, দোস্ত। মীর মুনসী ওঁকে একটা আজব খবর দিলেন। নবাব আলিবর্দী নাকি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্যবুদ্ধি-মানসে দুটি গ্রন্থ রচনায়ে ইচ্ছুক হয়েছেন। একটি বঙ্গভাষে কুরান-সরীফ। দ্বিতীয়টি ফার্সিতে কুতুবাসী রামায়ণ। এজন্য তিনি উপযুক্ত পণ্ডিত নিয়োগ করতে ইচ্ছুক—যাঁরা বাঙলা এবং ফার্সি দুটি ভাষাতেই অলিম। মৌলভী সা'ব কুতুবাসী রামায়ণের একটি বিশেষ কাণ্ড—অরণ্যকাণ্ড—ফার্সিতে অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মীর মুনসির কাছে দলিলে দস্তখত করে অগ্রিমও নিয়ে এসেছেন। ফার্সিতে তিনি অলিম, কিন্তু বাঙলা হরফ চেনেন না। কথা ভাষাটা তো মাতৃভাষা—ভালো রকমই জানেন। আশা ছিল কোনও পণ্ডিতকে নিয়োগ করে হরফগুলো চিনে নেবেন—বাংলা পড়তে শিখবেন। দুর্ভাগ্য মৌলভী সাহেবের—কোনও ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঐ যবনকে বিদ্যাদান করতে সীকৃত হননি। মুর্শিদাবাদে নয়, কৃষ্ণাঙ্গের নয়, নবদ্বীপেও নয়। মৌলভী সাহেবের তখন স্মরণ হয়েছিল সোএগ্রই গাঁয়ের সেই আজব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির কথা : একবগ্না বাঁতুজ্জে।

একদিন সে ছিল ছাত্র। আজ সে নিশ্চয় রাজি হবে গুরু হতে। মৌলভী সাহেব ফিরে এলেন পীরপুরে। সাক্ষাৎ করলেন সেই ব্যতিক্রম পণ্ডিতটির সঙ্গে।

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, আমার যে এখন মরবার সময় নেই। মৌলভী সা'ব।

সে কথা সত্যি। তিনি যখন শয্যাভ্যাগ করেন তখনো ঋগ্বেদের ঋষির বর্ণনায় “উষো যাতি সসবস্য পত্নী” * সুসম্পন্ন হয়নি। ভুলকো তারা জুলজুল করছে পূর্বাকাশে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেবে, মধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে তিনি সূর্যোদয় মুহূর্তে উপস্থিত হ'লেন দাতব্য চিকিৎসালয়ে। জীবন দণ্ডের সমভিব্যাহারে প্রতিটি রোগাক্রান্তের তত্ত্বতাল্লাস মেন। ব্যবস্থাদি দেন। তারপর অশ্বারোহণে দূর-দূর গ্রামে রুগী দেখতে যান। ফিরে আসেন মধ্যাহ্নে। আহারান্তে বসেন ব্রীজাতীয়ার বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আটটি ছাত্রীকে শিক্ষা দিতে। বাঙলা-সংস্কৃত-অঙ্ক। গার্হস্থবিদ্যা, পূজাবিধি, শিশুপালন। যে ছাত্রীরা যেটি প্রয়োজন। তারপর সন্ধ্যা সমাগমে নিজের পড়াশুনা। তাঁর সময় কোথায়?

মৌলভী কলিমুদ্দিন সা'ব হঠাৎ বলে ওঠেন, মেনে নিলাম আপনার সওয়াল। আপনার পাঠশালাতে এসে আমি বসতে পারি না। কারণ পাঁচ মেহমানের ঔরৎ এসে আপনার কাছে লিখাপড়ি শিখবেন। সেখানে আমার হাজিরা সরম-কী-বাং। লেकिन-উঠানের একান্তে যদি

* সূর্যপত্নী উষা স্বামী পূর্বে আবর্জিতা হন।

মেহের এসে বসে—মাদুর সে নিজেই নিয়ে আসবে—তাহলে তাকে কি বাঙলা হরফ শিখিয়ে দিতে পারেন না? বুঝতেই তো পারছেন, পণ্ডিতমশাই, এ বিনাটা মেহের আয়ত্ত করতে পারলে আমরা ভাই বহিন দুজনে মিলে নবাব সরকারের চাহিদা মেটাতে পারব। ঐ তালুক-হুদী বন্দনসিঁব লেড়কি রোজগার করতে পারবে। খেয়ে-পরে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করতে পারবে।

রূপেন্দ্রনাথ এককথায় সম্মত হয়ে গেলেন। মেহের ভাষাটা জানে—বাঙলা তার মাতৃভাষা। অক্ষর-পরিচয় সমাপ্ত হলেই সে অনায়াসে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহজ পয়ার ছন্দ পাঠ করতে পারবে। আর উচ্চারিত হলেই—অক্ষর পরিচয় থাক বা না থাক—মৌলভী সা'ব তার অর্থ বুঝতে পারবেন। হয়তো মেহেরের কাছ থেকে তিনি নিজেও বাঙলা হরফ, আ-কার ই-কার এবং যুক্তাক্ষর, চিনে নিতে পারবেন। তখন অনায়াসে কৃত্তিবাসী রামায়ণের ফার্সি অনুবাদ করতে পারবেন। নবাব আলিবর্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধনের একটি সম্প্রীতির সোপান অতিব্রান্ত হবে। হিন্দু কৌতূহলী হলে, উৎসাহী হলে জানতে পারবে কুরান-সরীফে কী লেখা আছে। মুসলমানও কৌতূহলী হলে জানতে পারবে রামায়ণ কাব্যের উপজীব্য।

দুর্ভাগ্য এ দেশের। আলিবর্দীর ঐ শুভপ্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। 1756 সালে আলিবর্দী খাঁ মহববত জঙ-বাহাদুর বেহেশ্তে চলে গেলেন। মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আসীন হল সিরাজউদ্দৌল্লা—সপ্তদশ বর্ষীয় ইন্দিয়াসব্দে অপরিণতবুদ্ধির এক কিশোর। আলিবর্দী আর তাঁর একমাত্র পত্নী শরফ উননিসা বেগমের শুভ প্রচেষ্টার আসান ঘটল। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের ভাষায় :

আলিবর্দীকে মুর্শিদাবাদের বা বাঙলার আকবর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মুর্শিদাবাদ-নবাবদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সম্প্রীতি দেখাইয়া মহাবিপ্লবমধ্যেও শান্তভাবে প্রজাপালন করিতে তাঁহার ন্যায় আর কেহই সমর্থ হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধনের নবাবী উদ্যোগের সেই বেহেশ্তী মূবারকীর অবসান ঘটল; সিরাজের আমলে ঘনিয়ে এল দোজখী-ইবলিসি।

না কুরান-সরীফের বাঙলা-অনুবাদ, না রামায়ণের ফার্সি অনুবাদ; কিছুই আত্মপ্রকাশ করেনি। অথচ মোহনলাল আর গীরমদন সেই মেলবন্ধকে সার্থক করে পলাশী প্রান্তরকে লালে লাল করে রেখে গেছে। আলিবর্দীর প্রয়াণের পর বছর না ঘরতেই।



আদ্যুগে সেই আদিমতম স্ত্রীজাতিয়ার বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানেব আয়োজন হয়েছিল চারটি পর্যায়ে। আজকের দিনের ভাষায় বলা যায় সওয়া ঘণ্টার চারটি পিরিয়ড। প্রথম পাঠ সূর্য যখন মধ্যগগনে। রোগী দেখে ফিরে এসে রূপেন্দ্রনাথ বসতেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠা ছাত্রী তিনটিকে নিয়ে গিরিবালা, পুটুরানী আর তারাসুন্দরী। এঁরা শেখেন বাঙলা ভাষা। অক্ষর পরিচয় করানো হয়। রূপেন্দ্রনাথ মুখে মুখে শোনান উপনিষদের কাহিনী—গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসার ইতিকথা; নটিকেতা-সত্যকাম—উদ্বালকের উপাখ্যান। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের সার কথা। সংস্কৃত সেখানে পড়ানো হত না।

দ্বিতীয় পাঠের আসরেও তিনজন ছাত্রী : মালতী, শোভারানী এবং পুনরায় তারাসুন্দরী। এখানে বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃতও শেখানো হয়। গার্হস্থধর্মের নীতিকথা, শিশুপালন, আত্মের সেবাপদ্ধতি এবং ধর্মের মূলতত্ত্ব।

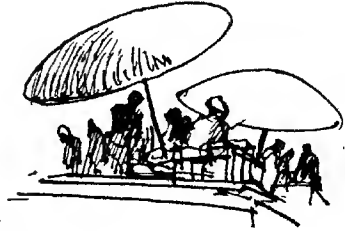
তৃতীয় পাঠের আসরে, দুটি ছাত্রী এবং একজন ছাত্র—বালক ও বালিকা। রূপমঞ্জরী, সূজাতা আর শুভপ্রসন্ন। প্রথম দুজন শিখত বাঙলা, শুভপ্রসন্ন বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃত। বয়সে সে ওদের অপেক্ষা বছর চারেকের বড়।

চতুর্থ পাঠের আসর পড়ন্ত বেলায়। প্রথম যুগে সেখানে উপস্থিত থাকত মাত্র একজন : মেহেরুউল্লিসা। পর্দার ওপাশে, দৃষ্টিসীমার, বাহিরে, কিন্তু শ্রুতিসীমার ভিতরে এসে বসতেন মৌলভী সাব। তারপর যখন দেখা গেল রূপমঞ্জরী ব্যতিরেকে আর কেউ মেহেরের সহায়্যী হতে সীকৃত হল না তখন রূপেন্দ্রনাথ মৌলভী সাহেবকেও পাঠের আসরে ডেকে নিলেন।

তিনচার মাসের মধ্যেই মোহের আর তার দাদা বাঙলা হরফ এবং যুক্তাক্ষর চিনে নিল। তখন মেহের সুর করে রামায়ণ পাঠ করত। পাশে নিম্নলিখিত নৈত্রে বসে শ্রবণ করতেন মৌলভীসাব। রূপেন্দ্র অপ্রচলিত শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। অলঙ্কারের ব্যাখ্যা করে দিতেন। ক্রমে শুভপ্রসন্ন আর রূপমঞ্জরী এসে যোগ দিল সে আসরে। কিম্বদন্ত্যন্তঃপরম। তারপর সেই যবনীর রামায়ণপাঠের আসরে এসে বসতে শুরু করলেন মালতী এবং গিরিবালা। পর্দার ওপাশে। দৃষ্টিসীমার বাহিরে, শ্রুতিসীমার নয়।

পাঠান্তে মেহের আল্লাতালকে নমস্কার করে পুঁথি বন্ধ করে রাখত। ভাই-বহিন

পদ্মদীপিতে অঙ্ক করে সাম-ওয়াক্তের নামজটা সেরে আসতেন। গিরিবালা দুটি ছোট-ছোট কলাপাতায় সাজিয়ে নিয়ে আসতেন দেবতার প্রসাদ। ফল-বাতাসা-খুর্মো পাটালি। এস. ওয়াজেদ আলীর ভাষায়—ভারতবর্ষের ট্যাডিশন অজেদ্যবন্ধনে চলতেই থাকত।



ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক। অর্থাৎ ব্যতিক্রম থাকে বলেই সামাজিক নিয়মকে নিয়ম বলে মানি। রূপেন্দ্রনাথ প্রথমে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে তাঁর বিদ্যালয়ে কোনও ছাত্র থাকবে না—সবই ছাত্রী। একাধিক হেতুতে। প্রথম কথা : তাঁর প্রতিবাদ সমাজপতিদের গোঁড়মির বিরুদ্ধে। কী হিন্দু, কী মুসলমান। সমাজপতিরা জীলোকদের অন্ধ সেবাদাসী করে রাখতে চায়। অসূর্যস্পর্শার দল যেন জ্ঞানসূর্যালোকের সম্মান না পায়। কারণ পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ‘নারী’ একটি ভোগ্যপণ্য। সে বিনা প্রতিবাদে পুরুষের সেবা করে যাবে। সন্তান উৎপাদন করবে। প্রতিপালন করবে—স্বামীর দেহান্তে সহমরণে যাবে। মুসলমান সমাজে সহমরণ প্রথা নাই—তালাকপ্রথা প্রচলিত। গৃহকর্তার মর্জি হলে পাঁচ সন্তানের জননী, যৌবনোত্তীর্ণা সেবাদাসীটিকে তিন তালাক দিয়ে ‘গর্দান-পাকাড়কে নিকাল’ দেওয়া যাবে। পরিবর্তে একটি নতুন যৌবনবতী ‘গুড়িয়া’কে সংসারে নিয়ে আসায় ধর্মীয় বা সামাজিক কোন বাধা নাই। বিলাতে শিক্ষিত বাজীর গান্ধীর কৃপায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশকে নস্যাৎ করে আজও সেই ধর্মীয় আইন বলবৎ। জীলোক যদি ভাষাজ্ঞান লাভ করে তবে সবার আগে সে যে আয়ত্ত করবে : প্রতিবাদের ভাষাটাকেই তা সে বঙলাতেই হোক অথবা উর্দুতে। রূপেন্দ্রনাথ ঐ প্রতিবাদটাই চান। এজন্য একটি ‘নারী-বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নিজের ভিটেয়। তিনি জানতেন, গ্রামবাসীরা তাদের গৃহের লুলুনাচুরে দৌঁ বিদ্যালয়ে সহজে প্রেরণ করতে সীকৃত হবে না। কিছুটা কুসংস্কারের প্রভাবে, কিছুটা সমাজপতিদের আতঙ্কে কিছুটা বা স্বার্থান্ধ হয়ে। অপবপক্ষে পুত্র-পৌত্রাদিদের প্রেরণ করতে চাইবে রূপেন্দ্রনাথের চতুষ্পাঠীতে। ফলে বালিকাদিগের সঙ্গে কিছু বালককে ভর্তি করাতে সীকৃত হলে, জৈবিক নিয়মে, বিবর্তনের পরিচিত সূত্রে, একদশকের ভিতরেই কোণঠাসা ছাত্রীরা হয়ে যাবে বিলুপ্ত প্রাণী; ছাত্ররা জাঁকিয়ে বসবে। গুঁর বালিকা বিদ্যালয় মিশে যাবে গৌড়দেশের অগণিত চতুষ্পাঠীতে—শুধুমাত্র ছাত্রসমবিত বিদ্যালয়তন।

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

দ্বিতীয় কথা : পুরুষছাত্র একই শ্রেণীতে বিদ্যাভ্যাস করলে অনেক প্রাচীনপন্থী পরিবারকর্তা সে-কারণেই হয়তো বাড়ির মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে স্বীকৃত হবেন না। রূপেন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হবে।

তাহলে ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যতিক্রমটি কেন?

ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। মহিলা-বিদ্যালয়কেতনের ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে। রূপেন্দ্র যখন থাকবেন না তখনো যেন ঐ বিদ্যালয়টি চালু থাকে। আজকের অজ্ঞাত ললনাকুল ভবিষ্যতেও যেন সে-এগুই গাঁয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে পায়, সেখানে তারা বাণীবন্দনার অধিকার লাভ করবে।

মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালেই রূপেন্দ্রনাথ গ্রামের জমিদারকে প্রশ্ন করেছিলেন, তারাদা, শুভপ্রসঙ্গের তো আট বৎসর বয়স হয়ে গেছে, ওকে কোনও গুরুগৃহে প্রেরণ করছ না কেন? তোমাকে জ্যেষ্ঠামশাই অবশ্য কোনও চতুষ্পাঠীতে পাঠাননি; কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। তোমাকে যথারীতি শিক্ষা দিয়েছেন নিজেই।

তারাপ্রসন্ন স্বীকার করেছিলেন, না ভাই, রূপেন। কিছু সংস্কৃত স্তব-স্তোত্র আমার মুখস্থ আছে বটে—বাঙলায় কৃতিবাস, ভারতচন্দ্র অথবা মদলকাবা পড়তে পারি; কিন্তু ঐ দেবনাগরী-হরফে ক্রমাগত হেঁচট খাই। বড় বড় সমাসবন্ধপদ দেখলে পুঁথি বন্ধ করে দিই। দোষ আমারই। বাবামশাই হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর শিক্ষকতার বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন মায়ের উপর। আমি শুধু জমিদারী সেরেস্তার কাজটুকু শিখেছি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি তোমার পুত্রের ক্ষেত্রে কী করতে চাও? আমার মতো সে গুরুগৃহে যাবে, না তোমার মতো শুধু জমিদারী সেরেস্তার কাজটুকুই শিখবে?

তারাপ্রসন্ন প্রতিপ্রশ্ন করেন, হঠাৎ এ-কথা কেন রূপেন?

—বিশেষ কারণ আছে বলেই জানতে চাইছি। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি শুভ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ঠিক মতো গুরু পেলে ও কালে মহামহোপাধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

—হ্যাঁ। বাচস্পতিমশায়ও একদিন সেকথা আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, সে-এগুই গাঁয়ের কাছে-পিঠে কোনও চতুষ্পাঠী নেই। আর আমার পুত্রসন্তান তো মাত্র একটাই। শুভর মা ওকে দূরে কোন গুরুগৃহে পাঠাতে রাজি নন।

তখন রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পনার কথা খুলে বলেছিলেন। তিনি সে-এগুই গাঁয়ে একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর সেই সাবেক যুক্তি: হিন্দুসমাজের পতনের দ্বিবিধ হেতু। প্রথম কথা : সমাজপতির সমাজের আধুনিকায়ণে অশিক্ষা-কুশিক্ষা-অন্ধকুসংস্কারে ঢেকে রাখতে চাইছে। স্বীলোকদের শিক্ষাদানে, তাদের মুক্তিতে, তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় কৃপমণ্ডুক সমাজপতিদের দৃঢ় আপত্তি। দ্বিতীয় কথা : একটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে ‘জল-অচল’ বলে দূরে সরিয়ে রাখা। যুগাবতার শ্রীচৈতন্য দ্বিতীয় বাধিটা নিরাকরণের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন—যখন হবিদাসকে কোল দিয়েছিলেন—বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সমান অধিকারে নামগানের আসরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু স্বীজাতীয়ার মুক্তির কথা আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেননি। রূপেন্দ্রনাথ সে-এগুই গ্রামে সেই

নারী-স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করে যাবেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর কোন পুত্রসন্তান নেই—হবার সম্ভাবনাও নেই। রূপমঞ্জরীকে তিনি গাণী-মৈত্রের মতো শিক্ষিতা করে-তুলবার আশ্রয় চেষ্টা করবেন। কিন্তু কপমঞ্জরী কালে সংসারী হবে, স্বামীর সহধর্মিণী হবে, স্বামীর গ্রামে জীবন অতিবাহিত করতে যাবে। এটাই প্রত্যাশিত, নিজের স্বার্থে, বিদ্যালয়ের স্বার্থে যদি তিনি রূপমঞ্জরীকে চিরকুমারী করে রাখেন তাহলে স্বর্গে বসে কুসুমমঞ্জরী মর্মান্বিতা হবে।

রূপেন্দ্রনাথ শুভপ্রসন্নকে ভিক্ষা করেছিলেন। তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের একমাত্র ব্যতিক্রম—যাবৎ বয়ঃসন্ধিকাল। তারপর শুভপ্রসন্নকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে দূরদেশের কোন গুরুগৃহে—ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চননের চতুষ্পাঠীতে, অথবা কৃষ্ণনগরে শঙ্কর তর্কবাগীশের মহাবিদ্যালয়ে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আরণ্যক অধ্যাপক মহাপণ্ডিত বুনো রামনাথ তর্কসিকান্ত স্নায়িত হন। মোটকথা, দু-তিন বছর গুরুগৃহে বাস করে উপাধিলাভ করে সে ফিরে আসবে সো-এই গাঁয়ে। এবার সে শিখবে আয়ুর্বেদ। রূপেন্দ্রনাথ নিজে যখন থাকবেন না, জীবন দত্ত যখন থাকবে না, তখনো সো-এই গাঁয়ের চিকিৎসালয় চালু থাকবে।

আর চালু থাকবে : ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যালয়কেও।

হ্যাঁ, সেই মহীয়সী অলোকসামান্যর নামেই হবে বিদ্যালয়। যিনি কুপমঞ্জরী সমাজের নির্দেশকে ছেঁড়া-কাগজের কুলিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীসঙ্গে যৌথভাবে করেছিলেন সারস্বতসাধনা। ‘নিয়তি কেন বাধ্যতে?’ প্রশ্নের জবাবে যিনি বলতে পেরেছিলেন : মনসা!

তারাপ্রসন্ন এককথায় রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে।

তোমার সব প্রস্তাব আমি মেনে নিচ্ছি, রূপেন। তুমি সো-এই গাঁয়ে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা কর। শুভপ্রসন্নকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিলাম। চতুষ্পাঠীর যাবতীয় ব্যয়ভার আমার। কিন্তু একটিমাত্র শর্তে : ওটা ‘বালিকা’ বিদ্যালয় হবে না। হবে চতুষ্পাঠী।

রূপেন্দ্রনাথ অটুহাস্য করে উঠেছিলেন।

—হাসছ যে?

—মনে হচ্ছে, আমি যেন একটা বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে এসেছি তোমার দরবারে আর তুমি তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছ একটিমাত্র শর্তে। বিবাহে বর থাকবে, বরযাত্রী থাকবে, বরকর্তা থাকবে—আসর-বাসর-বন্ধনটোকী-ছাঁদনতলা ফুলশয্যা সব; সব, থাকবে—শুধু একটি জিনিস রাখা চলবে না : কনে!

তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন, তুমি বুঝ না, একবগ্না! তুমি স্ত্রীলোকদের নিয়ে একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে গ্রামপঞ্চায়েত তোমাকে ক্ষমা করবে না। নিশ্চিত একঘরে করবে।

—দেখা যাক গ্রাম-পঞ্চায়েতের হিম্মৎ!

—তুমি চিরটাকাল একবগ্নাই রয়ে গেলে, রূপেন!



সেই যেদিন শোভারানী তার ফুলকাঁকাকে এক দামোদর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তার পরেই।

দীর্ঘদিন ধরে সো-এণ্ডাই গাঁয়ের অন্যতম প্রধান সমাজপতি মনে মনে ফুঁসছিলেন ঐ একবগ্না ছোঁড়াটার উপর। ছেলেটার সব সময় কেমন যেন ‘গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল’ ভাব। দুর্গাদার মতো মানী সমাজপতির মুখের উপর ছেলেটা বলে দিয়েছিল, আপনার বাড়িতে ‘মহাপ্রসাদ’ পেতে যেতে পারব না; তবে হ্যাঁ, ‘ব্থামাংস’ হলে কবজি ডুবিয়ে সাঁটতে পারতাম! কী আশ্পর্ধা! এসব দুর্বিনীত কালাপাহাড়কে ‘হেঁটোয়-কাঁটা-মুড়োয়-কাঁটা’ করে ডালকুন্ডা দিয়ে খাওয়ানো উচিত। দুর্গাদা তখনই বলেছিল ছেলেটাকে একঘরে করতে। নন্দ স্নীকৃত হননি। উনি চান, চণ্ডীপুণ্ডে বোলো আনার ডাক দিয়ে অপরাধীকে একবারই ধরে আনা হবে—যখন তাঁর পালাবার আর কোনও পথ থাকবে না। এক কিস্তিতেই মাং।

ছোকরা বারে-বারে পাকাল মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে গেছে। নেহাত বরাত-জোরে। সে-বার গাঁ-সুন্দ্র মানুষ একমত হল কেষ্টার রাঁড়কে সহমরণের চিতায় তুলতে হবে—মায় জমিদারের সেই ভুল-করে লালপাড়-শাড়ি দেওয়ার ঘটনাকে কায়দা করে তারাপ্রসাদকে পেড়ে ফেলেছিলেন—হঠাৎ কোথা থেকে ষোড়ায় চেপে এসে হাজির হল ঐ কালাপাহাড়ি। এসেই নিদান হাঁকল : কেষ্টার বেধবা পোয়াতি। কোন মানে হয়? বহু বহু দিন পরে গাঁয়ে একটা জমকালো সহমরণের আয়োজন হয়েছিল। পাঁচ গাঁয়ের মানুষজন ভিড় করে দেখতে এসেছিল হিন্দুধর্মের মহিমা! দিল ছোকরা সব কিছু ভেস্বে।

এতদিনে ঐ দুর্বিনীত ছোকরাকে কজা করার একটা নির্দিষ্ট সুযোগ পাওয়া গেছে। এক নম্বর : একবগ্না ত্রিবেণী থেকে নিয়ে এসেছে খিন্তি খরা একটা ডাঁটো-খাটো বেধবাকে। জেনে-বুঝে যে, তার ভিটেতে জগুঠাকরুণ, কাতু বা তার বউ নেই। তাহলে তার মানোটা কি দাঁড়ালো? রূপো-ছোঁড়া তো আগে থেকে জানিত না যে, নীতু মুখুজ্জব সিদি ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওর ভিটেয় এসে অশ্রয় নেবে! তাহলে? তুই হচ্ছিস কুলীন ঘরের বামুনের বোটা! মন চাইলে তো পাঁচ-সাতটা অগ্নিসাক্ষী-ময়না পুষতে পারিস—অবশ্য আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে হিন্দুও থাকা চাই—তা নয়, এক ছামুতে বেধবা মেয়েছেলে পোষা।

কিন্তু এমন রগরগে অভিযোগটা ধোপে ঢিকলো না। দ্যাখ-না-দ্যাখ পীতু মুখুজ্জের দিদি ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে একবগ্গার ছামুতে এসে আশ্রয় নিল।

আসল ঘটনা তো তাই? নাকি বড় খোকা যা বলছে তাই সত্যি? পীতু মুখুজ্জের কায়দা করে বালবিধবা দিদিটিকে ঘাড় থেকে নামিয়েছে? একবগ্গাকে একটা নলুচের আড়াল সরবরাহ করতে? কিন্তু পীতুর স্বার্থটা কি? ঐ একবগ্গা হারামজাদাই তো পীতুর ডব্বা মেয়েটাকে ঘোড়ার তুলে নিয়ে দুর্গাদার নাকের সামনে সংযুক্তহরণ করেছিল! তাহলে?

তারপর ধর গিয়ে একবগ্গার ঐ পৈশাচিক বেলেল্লাপনা! পাঁচবাড়ির সধবা-বেধবা, ছুঁড়ি-বুড়িকে নিয়ে দুপুরে-মাতন! কী? না মেয়েছেলের চতুপ্পাঠী! বাপের জন্মে শুনেছ তোমরা? কী হবে তোদের লেখাপড়া শিখে? বারোহাত কাপড়ও তোদের কাছে মোছলমানের লুঙ্গি-কাছা দিতে পারিস না—কী হবে দস্তখৎ করতে শিখে? ‘সংগ্যের অন্ধরী’দের মতো পিঠে কি এক জোড়া করে ডানা গজাবে? ফুরুৎ করে উড়ে দাঁড়ে গিয়ে বসবি? ঠিকই করেছে বড়খোকা বউ-এর পিঠে আঙ চ্যালকাঠ ভেঙে।

বড়খোকাকার ধর্মপত্নী—অর্থাৎ নন্দ চাটুজ্জের মেজ পুত্রবধূ বিষ্ণুর-মা আবদার ধরেছিল তারা জেতিমার মতো সেও রূপোদার পাঠশালায় নাম লেখাবে। লজ্জা-সরমের বালাই নেই। বিষ্ণু-এখনো তোর বুকের দুধ খায়, তুই পাঠশালায় ভর্তি হবি? বেশ করেছে বড়খোকা বউকে ঠেঙিয়ে।

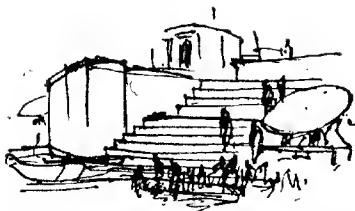
ঠিকই বলেছেন শিরোমণি মশাই : গৃহস্থবধূরা ‘বিদ্যোধরী’ হলে বাস্তবে ‘ব্যাপিকা’ হয়ে উঠবে। রক্ষণাদি গৃহকর্মে তখন আর তাদের মন থাকবে না। পতিসেবা দূর-অন্ত, পুত্রকন্যাদের মলমুত্রাদি ষোঁত করার কাজও স্বামীদেবতার স্নেহে চাপিয়ে দেবে। এ সর্বনাশ অন্ধুরেই বিনষ্ট করা দরকার! না হলে সোএগ্রই গ্রামে আজ যে ব্যভিচার শুরু হচ্ছে তাতেই ক্রমে গোটা হিন্দুসমাজে ধবস নামবে।

সমাজপতি নন্দ ঘরে-ঘরে গিয়ে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বড়খোকা-ছোটখোকা যুবকদের মতামত গ্রহণ করেছে। বাচস্পতিমশাই অথবা ঘোষালখুড়োর মতো দু-একজনকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরলে গোটা গ্রাম এককাট্টা। এ সর্বনাশ শুরুতেই রূখতে হবে। একবগ্গা যদি তার জিদ্দিবাজি ছাড়তে রাজি না হয় তবে নবাব-সরকাবে শিকায়ের করা হবে।

বড়খোকা, কালু, গজেন প্রভৃতি নব্য যুবাব দল অবশ্য ভিন্ন মন পোষণ করে। তাদের মতে একবগ্গা ঠাকুর মেনে নেয় ভাল, না হলে তার ঘরের চালায় আঙুন দিয়ে বাপ-বৌটিকে জীয়েন্তে পুড়িয়ে মারাই উচিত!

এই যখন অবস্থা, তখন শোনা গেল চরমতম বেলেল্লাপনার স্বববট—বাকুদের স্থপে যেন আঙুনের ফুলকি : একবগ্গার পাঠশালায় ভর্তি হতে চলেছে এক মোছলমানের নিকা করা ডব্বা ছুঁড়ি! রমজানের মাসটা শেষ হলেই!

এবার নন্দ নিজেই বললেন : ঠিকই বলেছিলি তোরা। ধম্মে সইবে না। দে, রূপো-বাঁড়ুজ্জের ঘরের চালায় আঙুনই ধরিয়ে দে।



অনেকেরই আশঙ্কা ছিল একবগ্না আসবে না। তাকে ধরে বেঁধে আনতে হবে। দেখা গেল, তাঁদের আশঙ্কা অমূলক। নির্ধারিত সময়ে কাঁধের উপর উড়ুনিটা চাপিয়ে জীবন দত্তকে সঙ্গে করে রূপেন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন চণ্ডীপুণ্ডে। ‘ষোলো আনার ডাকে’। এটাই ছিল সেকালীন বিধান। তারাস্বরের ‘চণ্ডীমণ্ডপ’ উপন্যাসে তার বর্ণনা আছে। সেটা অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। গ্রামে সরকার নিয়োজিত চৌকিদার আছে। প্রহরে প্রহরে সে হাঁকাড় পাড়ে—‘হুঁ-শিয়ার’। সিঁদেল চোরদের হাত থেকে গৃহস্থকে সজাগ রাখতে। সেই চৌকিদারটিই পৃথক বেতন পায় পঞ্চায়েতের তরফে। পঞ্চায়েত-সমাজপতিদের হুকুম হলে সে পাড়ায়-পাড়ায় টেঁড়া বাজিয়ে জানান দেয়—কবে, কখন চণ্ডীমণ্ডপে সমাজপতিরা সমবেত হবেন, কে বাদী, কে প্রতিবাদী। সচরাচর সেটা হয় গুরুপক্ষে, সন্ধ্যার পর, তেঁতুল বটের বাঁধানো চাতালে। ছোট-খাটো অভিযোগ থাকলে বাদী-প্রতিবাদী বা সাক্ষী ছাড়া সমাজপতিরা দু-তিনজন আসেন। বাদীর অভিযোগ শোনে। প্রতিবাদীর কৈফিয়ত শ্রবণ করেন। প্রয়োজনে সাক্ষীদের জবানবন্দীও নেওয়া হয়। তারপর সমাজপতিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অপরাধীর শাস্তির বিধান করেন।

চুরি-চামারি, জোর করে অপরের ক্ষেতে ধান-কাটা অথবা অনধিকার প্রবেশ। ‘পরহীকাতরতার’ অভিযোগ এভাবেই সমাজপতিরা মিটিয়ে দেন। খুন, জখম, ডাকাতি হলে চৌকিদার কোতোয়ালকে খবর দেয়। নবাব-সরকারের তরফে তখন কাজী অপরাধীর বিচার করেন। কিন্তু গ্রামবাসীর ভিতর কেউ যদি বড় জাতের অপরাধ করে—যাতে কোতোয়ালকে সংবাদ প্রেরণ অপ্রয়োজনীয় অথচ সামাজিক অপরাধটা রীতিমতো গুরুতর, তখন হয় : ‘ষোলো-আনার ডাক’।

সে-ক্ষেত্রে পল্লিগ্রাম পীলত যেভাবে যীশাস-এর বিচার করেছিলেন সমাজপতিরা ঠিক সেভাবেই গ্রামের সাধারণ মানুষকে বলেন, জেরমা দু-পক্ষের কথাই শুনলে। এবার বল আসামী দোষী, না নির্দোষ।

জনগণ তখন ‘জুরী’। তাদের রায় শুনে সমাজপতিরা নির্ধারণ করতেন আসামী দোষী না নির্দোষ। দোষী হলে কী শাস্তি দেওয়া হবে তাও নির্ধারণ করতেন ঐ সমাজপতিরাই।

এই ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রামীণ বিচার-ব্যবস্থা।

জনগণের আদালত।

চণ্ডীমণ্ডপে জনসমাগম বড় কম হয়নি। ধনস্ত্রী-বাবাকে ভালবাসে গাঁয়ের সাধারণ মানুষ। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি সকলকেই ঔষধপত্র বিতরণ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমাজপতিরা কী অভিযোগ এনেছেন তা অধিকাংশ লোকেই জানে না। সকলেই কৌতূহলী। গুরুপক্ষের চতুর্দশী। জ্যৈষ্ঠ মাস। আলোয় চারদিক ফুটফুট করছে। রূপেন্দ্রনাথ জীবন দ্বন্দ্বকে সঙ্গে করে সহাস্যবদনে এগিয়ে এসে বললেন, কী ব্যাপার নন্দ খুড়ো? আমার বিরুদ্ধে কে কী অভিযোগ এনেছে, বলুন? আমি কৈফিয়ত দিতে একপায়ে খাড়া হয়েছি!

কথার সঙ্গে সঙ্গে তেঁতুলবটের বাঁধানো চাতালে গাঁথা তেলসিঁদুরে রাঙা প্রস্তরখণ্ডে দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করিয়ে কপালে ঠেকালেন।

নন্দ বললেন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই, বাবাজী। লোকজন এখনো আসছে। বাচস্পতিদা এখনো এসে উপস্থিত হননি। তুমি বস এখানে।

নির্দেশমতো চাতালের একান্তে উপবেশন করলেন রূপেন্দ্রনাথ। স্বভাববশে পদ্মাসনে।

একটু পরে বাচস্পতিমশাই এসে গেলেন। সমাজপতিদের মধ্যে তিনিই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। রূপেন্দ্রনাথ তাঁর পদধূলি নিয়ে জানতে চাইলেন, বাতের বাখাটা আর চাগায়নি তো, খুড়ো?

—না বাবা, ধনস্ত্রী! রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে।

শিরোমণি বলে ওঠেন, সবাই এসে গেছেন মনে লাগে। ঘোষালনা, চক্কোতি খুড়ো, বাচস্পতিমশাই,—হ্যাঁ সবাই এসেছেন। এবার বল, নন্দভায়া, রূপেন বাঁড়ুজের বিরুদ্ধে সমাজের অভিযোগটা কী?

নন্দ নড়ে-চড়ে বসলেন। বললেন, অভিযোগ তো একটা নয় যে, এক কথায় মিটে যাবে। একে একে বলি। কিন্তু অভিযোগটা দাখিল করার আগে আমি কিছু তথ্য যাচাই করে নিতে চাই। জানা কথাই, তবে প্রথমে কবুল করিয়ে নিলে সুবিধা হবে। বাবা রূপেন, তুমি কি বছর-দু-তিন আগে বদমানের নগেন দত্তের বজরায় চেপে পুরীধামে তীর্থ করতে গেলি?

রূপেন্দ্র বললেন, আঞ্জে হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

—এবার বলতো ভায়া, সেই বজরায় কি এ গাঁয়ের সমাজপতি শ্রীদুর্গা আতুলী আর তাঁর ধর্মপত্নী মীনু, মানে আমাদের গাঁয়ের পীতাম্বর মুখুজের কন্যা মুখুয়ীও গেলি?

রূপেন্দ্রনাথের ল-যুগলে বিরক্তির কুঞ্জন দেখা গেল। গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি একটা তথ্য বিস্মৃত হয়েছেন, খুড়ো। এটা কোন বোশগল্লেব আসর নয়। গ্রামপঞ্চায়েত আমাকে আসামী হিসাবে তলব করেছে এবং আমি হাজির হয়েছি। আপনি প্রথমেই আমাকে বলুন : বাদী কে? আমার বিরুদ্ধে কী তাঁর অভিযোগ? এই তথ্য দুটি পেশ করার পরেই সমাজপতি হিসাবে আপনার অধিকার বর্তাবে আমাকে সওয়াল করার। কী বাচস্পতিকাকা? আমি কি পঞ্চায়েত-নিয়মবিরুদ্ধ কিছু দাবি করছি?

রূপমঞ্জুরীর বিদ্যারত্ন

বাচস্পতি কিছু বলার আগেই নন্দখুড়ো বলে ওঠেন, বাদী হচ্ছে দুর্গা গাঙ্গুলী, যার বউ পুরীতে বেমকা চুরি গেছে!

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, সেক্ষেত্রে আমার প্রথম দাবি : চণ্ডীমণ্ডপে বাদীকে উপস্থিত করুন। তাঁর যা অভিযোগ তিনি ব্যক্ত করুন। তারপর আমার বিচারের প্রশ্ন উঠবে।

নন্দ বললেন, এ তো তোমার অনায়াস আবদার, রূপেন। সবাই জানে দুর্গাদা এখন গাঁয়ে নেই। তাকে আমি এখন কী করে হাজির করব?

বাচস্পতি বললেন, সে-ক্ষেত্রে এ অভিযোগের বিচারটাও মূলতুবি থাকবে, নন্দ, যতদিন না দুর্গা গাঁয়ে ফিরে আসে।

নন্দ রুখে ওঠেন, কিন্তু দুর্গাদা আমাকে নিজমুখে বলেছে...

বাচস্পতি তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেন : না। তা হয় না। বাদী যেখানে অনুপস্থিত সেখানে বিচার হতে পারে না।

নন্দ বললেন, বেশ। তাহলে মীনুর কেঁজাটা মূলতুবি থাক। দুর্গাদা ফিরে এলে তার ফয়সালা হবে। আমি দু-নম্বর অভিযোগের কথা বলি। এবার আমি নিজেই বাদী। রূপেন তার নিজের ভিটের পক্ষকাল হল একটা আজব চতুষ্পাঠী খুলেছে। সেখানে নাকি ছাত্র থাকবে না, বেবাক ছাত্রী। ইতিমধ্যেই নানান বয়সের সাত-আটটি স্ত্রীলোককে ও পাকড়াও করেছে। তার মধ্যে সধবা-বেধবা-অরক্ষণীয়-পুঁচকে সব রকম চিড়িয়াই আছে। দুর্জনে একথাও বলছে যে, সেখানে নাকি একটি মোছলমান মেয়েছেলেও দুদিন পরে আসবে। বামূনের ভিটেয়! বামুন-কায়ত-জল-অচল যবনী সব এক পংক্তিতে! জাত-ধম্মা বলতে আর কিছু রইলে না! কী রূপেন? আমি কি মিছে কথা বলছি?

রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আঙে হ্যাঁ। সত্য কথা। তবে চতুষ্পাঠী নয়। এখানে চতুর্বেদের চর্চা আদৌ হবে না। এটি হবে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি ‘মহিলা বিদ্যানিকেতন’। মহিলাদের এখানে অক্ষর পরিচয় করানো হবে। ছাত্রীরা প্রয়োজনমতো শিখবে শুধু বাঙলা ভাষা অথবা বাঙলা ও সংস্কৃত। এছাড়া সেখানে হবে মহিলাদের গার্হস্থধর্ম, রোগীর সেবা, শিশুপালন, স্নানবিধি প্রভৃতি... আর হ্যাঁ, ঐ কথাটাও সত্য। বমজানমাসের বাকি কটা দিন পাব হলে একটি মুসলমান মহিলাও আমাদের বিদ্যালয়টিতে বাঙলা ভাষা শিখতে আসবেন।

নন্দ বললেন, বাবা রূপেন! এমন আজব কথা আমার বাপের জন্মে শুনিনি। তুমি বল তো, গৌড়দেশে, অথবা গোটা আর্যাবর্তে আর কোথাও এমন আজব বিদ্যালয় কি একটিও আছে, যেখানে শিক্ষক ব্যতিরেকে আর কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই, শুধু সুন্দরী রমণী—মানে, বৃন্দাবনলীলার প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে প্রশ্ন করছি আমি।

জবাব দিতে কিছু বিলম্ব হল রূপেন্দ্রনাথের। তবু নন্দ চাটুজের প্রচ্ছন্ন বিদ্‌পাকে উপেক্ষা করে জবাবে বললেন, না, আমার জ্ঞানমতে মহিলা-বিদ্যালয় আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানি না।

—সেক্ষেত্রে, ভূ-ভারতে যে জিনিস নেই—হিন্দুধর্মে যে বস্তুটি সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ স্ত্রীজাতীয়ের অক্ষর-পরিচয়—সে জাতীয় বৃন্দাবনলীলার কথা তোমার উর্বর মস্তিষ্কে কী-ভাবে গজিয়ে উঠল, বাবা একবল্লা?

রূপেন্দ্র প্রাণধান করলেন যে, প্রতিবাদ না করলে নন্দর বাদ-বিদ্রূপের মাত্রা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হতে থাকবে। অথচ তিনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ, সমাজপতি! তাই এবার বাচস্পতি-মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, প্রশ্নকর্তার ভাষা ও বাচনভঙ্গিতে আমার দৃঢ় আপত্তি আছে, বাচস্পতিকাকা। পঞ্চায়েতের আহ্বানমাত্র আমি এসেছি। আমি কী করছি, কেন করছি কার স্বার্থে করছি, তা জানাতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু কোনও অবচীন প্রশ্নকর্তার অশালীন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আমার এই অভিযোগ সম্বন্ধে আপনার বিচারের পর এ প্রশ্নের জবাব দেব।

নন্দ বুঝতে পারেন, একবল্লা ঘুরিয়ে তাঁকে অবচীন বলল। কিন্তু তিনি কিছু বলতে ওঠার পূর্বেই বাচস্পতি তাঁকে থামিয়ে দিতে বলে ওঠেন, তুমি থাম, নন্দ। শুকে বুঝিয়ে বলতে দাও : ও কী করতে চাইছে, কেন করতে চাইছে, কার-স্বার্থে করতে চাইছে। ও বলুক।

রূপেন্দ্রনাথ তখন একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে। প্রাক-মুসলমান যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্ত্রীলোকদের বিদ্যাদানের যে ব্যবস্থা ছিল, বৌদ্ধধর্মে যে ‘থেরিগাথা’ রচিত হয়েছিল তা বুঝিয়ে বললেন। স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে বৈধব্যযোগ সে সম্পর্কহীন সে-কথা মৈত্রেয়ী থেকে ব্রজসুন্দরীর উদাহরণ দাখিল করে প্রমাণ করতে চাইলেন। সোএগই, গ্রামবাসীকে তিনি নিজ-নিজ পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে তাঁর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ‘ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যালিকেতনে’ প্রেরণ করতে অনুরোধ করলেন। না—গুরুদক্ষিণা কিছু দিতে হবে না। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

নন্দ এবং শিরোমণি গুঁর বক্তৃতার মাঝখানে দু-তিনবার বাধাদানের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাচস্পতি-মশায়ের হস্তক্ষেপে তা প্রতিহত হল। উপসংহারে রূপেন্দ্রনাথ বললেন নন্দ খুড়ো জানতে চেয়েছিলেন ভূ-ভারতে বর্তমানে যা নেই তা কেন প্রবর্তন করতে চাইছি আমি। জবাবে আমি বলব—চিরটাকাল যা বলে এসেছে সঁটাই যে বাঞ্ছনীয় তা সবসময় ঠিক নয়। এক সময়ে আদিম মানুষ অগ্নি-প্রজ্বলন-প্রক্রিয়া জানত না, কৃষিকর্ম জানত না। যে যুগাবতার প্রথম সে-কাজ করেছিলেন তিনি সমাজের ক্ষতি করেনি—উন্নতিই করেছেন। অগ্নি প্রজ্বলিত করে, কৃষিকর্মের প্রবর্তন করে।

নন্দ ফাঁক বুঝে হঠাৎ বলে ওঠেন, তুমিও বুঝি তেমনি একজন যুগাবতার?

রূপেন্দ্রনাথ নন্দ খুড়োর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন : নন্দ-খুড়ো! আপনি ভূ-ভারতে সোএগই গাঁয়ের একবল্লা দীঘির মতো কোনও সংরক্ষিত পুকুরিণী দেখেছেন? আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে আন্ত্রিক-রোগ প্রবলভাবে চালু আছে অথচ একবল্লা দীঘি থেকে যারা পানীয় জল সংগ্রহ করেন সেসব পরিবার থেকে আন্ত্রিক

রূপমঞ্জরীর বিদ্যারত্ন

রোগ সম্পূর্ণ বিদূরিত? নন্দ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই বাচস্পতি বললেন, এ ব্যাপারে নন্দের মতামত নিষ্পয়োজন। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। রূপেন বাবাজী সোণাই গাঁ থেকে আন্ত্রিক রোগ...

কথার মাঝখানে নন্দ বলে ওঠেন, আপনি এভাবে বারে-বারে আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারেন না। সমাজপতিরা এ বিচারসভায় সবাই পর্যায়ক্রমে কথা বলবেন। এটাই প্রথা।

বাচস্পতি সামলে নেন নিজেকে। বলেন, বেশ তো, বল না নন্দ, কী বলতে চাও?

নন্দ এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালেন। দুটুসরে বললেন, আজ্ঞে না, বাচস্পতিদা বড়তা দেবার অভ্যাস আমার নেই, তা আমরা কেউ দেবও না। তবে আমি গাঁয়ের ইতর ভদ্র সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। রূপেন বাঁড়ুজের ঐ মেয়েছেলের চতুষ্পাঠী—যাতে হিন্দু-মোহলমান একসাথে অ-আ-ক-থ শিখবে—তা আমরা বরদাস্ত করব না। হতে দেব না। বিশ্বেশ না হয় তো আপনি সবাইকে শুধিয়ে দেখুন। সবাই এ বিষয়ে একমত।

বাচস্পতি রূপেন্দ্রের দিকে ফিরে বললেন, আশা করি এতে তোমার আপত্তি নেই, রূপেন? তোমার বক্তব্য তুমি বলেছ—গাঁয়ের পঞ্চজন তার অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন কি না জানি না; কিন্তু সংখ্যাগুরু মানুষের সিদ্ধান্ত তুমি নিশ্চয় মেনে নেবে। কী বল?

রূপেন্দ্র বললেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু তার পূর্বে আপনি নিশ্চয় আসামীকে তাঁর শেষ বক্তব্যটা পেশ করার অনুমতি দেবেন?

—তোমার আরও কিছু বলার আছে?

—তা আছে, বাচস্পতিকাকা।

—তবে বল?

রূপেন্দ্রনাথ উঠেঃসরে বললেন, আমার এই 'ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যানিকেতন' প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে রায়দানের আগে আপনাদের একটি কথা আমি নিবেদন করতে চাই। আমার গুরুদেব ত্রিবেণীর মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চনন-মশাই এবার আমাকে সকল্য সোণাই গাঁয়ে প্রত্যাবর্তনে বাধা দিয়েছিলেন। তাঁকে বর্ধমানরাজ প্রায় হাজার বিঘা নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেছেন। গুরুদেবের বাসনা সেখানে একটি আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। আমাকে তিনি অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন একশত তরু মাসিক বেতনে। তদ্বিত্ত বিনামূল্যে আমাকে বাসস্থান এবং সংবৎসরের চাউল প্রদান করা হবে। আমি সেই লোভনীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে সোণাই গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছি। দুটি হেতুতে। প্রথম কথা : আয়ুর্বেদবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমাকে যখন আমার স্বর্গত পিতৃদেব গুরুগৃহে প্রেরণ করেন তখনি তিনি আদেশ করেছিলেন : 'ফিরে এসে এই সোণাই গ্রামেই তুমি গ্রামবাসীর চিকিৎসা করবে। এ গ্রামে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই।' তাঁর আদেশ আমি শিরোধার্য করেছিলাম। অক্ষরে অক্ষরে এতদিন পালন করে এসেছি। দ্বিতীয় কথা : আপনারা রাজি হন বা না হন আমি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবই।

বাচস্পতি বলেন, সোণাইবাসীর অধিকাংশ মানুষ যদি তাতে আপত্তি জানায়, তদসত্ত্বেও?

রূপেন্দ্রনাথ সহস্রো বললেন, চণ্ডীমণ্ডপে বর্তমানে শতকরা শতভাগই পুরুষ। মহিলা—যাঁদের স্বার্থে আমি বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, তাঁরা এখানে অনুপস্থিত, কাকা।

নন্দ বলে ওঠেন, অন্তঃপুরচারিণীরা কোনদিনই চণ্ডীমণ্ডপে এসে তাদের মতামত জানায়নি। জানায় না। এটাই প্রথা।

—সেই প্রথাটাই আমি পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর। তবে এটাও জানি আমি জোর করে আমার ভিটেয় ঐ বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আপনারা আমার ঘরের চালায় আগুন ধরিয়ে দেবেন।

—সেটাও জান? বাঃ তাহলে আর বেহুদো কপ্‌চাচ্ছ কেন?

—আপনাকে বলছি না, নন্দ-খুড়ো। আমি সোএগ্রইবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলছি : তোমরা যদি চাও, আপনারা যদি চান, তাহলে পিতৃআদেশের বন্ধন আর আমার থাকবে না। ঠিক যেভাবে একদিন পিতার মুখাঙ্গি করেছিলাম, সেইভাবেই আমার বাস্তুভিটার চালায় স্বয়ং অগ্নিসংযোগ করে গ্রাম ত্যাগ করে আমি ত্রিবেণীতে ফিরে যাব। সেখানে আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করব এবং জেনে রাখুন, সেখানে একটি মহিলা বিদ্যানিকেতনও প্রতিষ্ঠা করব। আপনাদের তাতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হবে এইমাত্র। পরিবারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ত্রিবেণীতে লোক পাঠাতে হবে। সর্পদংশনের ক্ষেত্রে অবশ্য ওষা ডাকতে হবে। ত্রিবেণী থেকে আমার পক্ষে সর্পদংশনের চিকিৎসা করতে আসা সম্ভবপর হবে না।

সভায় পক্ষিপালকপতনের নিম্ভঙ্কতা।

রূপেন্দ্রনাথ এবার বাচস্পতিমশায়ের দিকে ফিরে মৃদু হাসলেন। বললেন, গ্রামবাসীকে আমার যা বলার ছিল তা বলেছি, বাচস্পতিকাকা। আমাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে কিছু রুগী এখনো মরতে বাকি আছে। তাদের কাছে যেতে হবে এবার। তবে আমার শিষ্য জীবন দত্ত আপাতত এখানে থাকল। তার মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেবেন, ‘ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যানিকেতনটা’ আমি কোথায় প্রতিষ্ঠা করব—সোএগ্রই গ্রামে, না ত্রিবেণীতে।

জীবন এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এবার বলল, আপনি আবার গ্রাম ত্যাগ করে গেলে, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাব, গুরুদেব।

রূপেন্দ্র বললেন, তোমার সিদ্ধান্তটি নন্দ-খুড়ো জানিয়ে দিও জীবন। সেক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি উঠে যাবে। নন্দ-খুড়ো আর পাঁচজন সমাজপতির সঙ্গে যুক্তি করে স্থির করবেন—ওখানে কোন দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে; ওলাবিবি, মনসা না শীতলা। চিকিৎসকের অভাবে গুঁরাই-তোণ্ডা-ভরসা।

রূপেন্দ্রনাথ চলবার উপক্রম করতেই ভিড়ের ওপাশ থেকে খনখনে মহিলাকণ্ঠে কে যেন বলে উঠলেন, এটু ডেরিয়ে যা, বাবা রূপেন্দ্র।

রূপেন্দ্রনাথ থমকে গেলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন মৃন্ময়ীর বৃদ্ধা পিসিমা : গিরিবালা। দু-পা এগিয়ে এসে তিনি বাচস্পতিমশাইকে সন্মোদন করে বললেন, কতটা আমি তোমারই বলতে চাই, ঠাকুরপো!

—বলুন! বলুন! আপনি কখন এলেন?

রূপমঞ্জুরীর বিদ্যারত্ন

গিরিবালা বললেন, রূপেন দেবতা। রাগ-অভিমানের বাইরে। তাই ও কারেও শাপ-শাপান্ত করতে পারবেনি, আমি জানি। কিন্তু সে যদি তোমাদের বিধেন শুনে নিজের হাতে নিজের ভিটেয় মুখাগ্নি করে গাঁ-ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে বন্দ্যখটি বংশের সাতপুরুষের বেম্হ শাপ অনিবায্য! সেই মহাভারতের জন্মেঞ্জয়-পরিষ্কিতের বেভান্ত। তা বেম্হশাপের ফলটা কোন সমাজপতি মাথা পেতে নিচ্ছেন সেটা আগে থির হোক।

হঠাৎ নন্দ চাটুজ্জের দিকে ফিরে তিনি পুনরায় খনখনে গলায় বলে ওঠেন, কি গো নন্দ-ঠাকুরপো? তোমার গলাটিই এতক্ষণ বেশি শোনা যাচ্ছিল, মনে লাগে। তা তক্ষকসাপের বিষটুকু তুমিই সপরিবারে হজম করতে রাজি আছ তো? চণ্ডীমণ্ডপের ঐ তেলসিঁদুরমাখা পাতরখানা ছুঁয়ে আগে কবুল খাও দিনি। তারপর তোমার সমাজপতিগিরি কর!

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

pathagana.net

পরিশিষ্ট

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—৮৯ পুস্তিকার লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৫৮ বাঙ্গলা অঙ্গে। তখন তার মূল্য ছিল ৬০ ন.পা.; পরে দ্বিতীয় সংস্কারণটি প্রকাশিত হয় ১৩৭০ অঙ্গে ২.৫০ দামে। চতুষ্পাঠীর যুগে তিনজন বিদুষী মহিলার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন। বইটি দীর্ঘদিন আউট-অফ-প্রিন্ট। আমাকে শ্রীচণ্ডীনাথ চট্টোপাধ্যায় এককপি সংগ্রহ করে উপহার দিয়েছিলেন ১৩৯৫-তে। এই সুপ্রাপ্য পুস্তিকা থেকে চতুষ্পাঠীর যুগে দুই বিদুষী মহিলার কাহিনী এখানে পুনর্মুদ্রণ করে দিলাম : হটী এবং হটু বিদ্যালঙ্কার। এঁদের দুজনের বাস্তব জীবনকাহিনীর উপাদানে আমার “রূপমঞ্জরী” গ্রন্থের প্রণয়ন প্রচেষ্টা :

।।ক।। হটী বিদ্যালঙ্কার

নবান্যায়ের শেষ পরিণতকালে শঙ্কর তর্কবাগীশ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ যখন বঙ্গদেশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজমান, সেই সময়ে “অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, হটী বিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারানসীক্ষেত্রে মঠ নির্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন।” বঙ্গদেশে—বিশেষ করিয়া রাঢ়দেশে হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল।

হটী ছিলেন রাঢ়দেশের কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। তাঁহার পিতা এক কুলীন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। অধিকাংশ কুলীনকন্যার ন্যায় বিবাহের পর হটীকেও পিত্রালয়ে দিন কাটাইতে হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; কন্যাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা করেন। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে বিধবা হয়, তখনকার দিনের এই ধারণা কুসংস্কারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই; হটীও কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরে বিধবা হন। অল্পদিন পরে তাঁহার পিতারও পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। পিতৃবিয়োগের পর হটী দুরবস্থায় পড়িলেন। সংসারে বীতরাগ হইয়া তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প করেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি স্মৃতি ব্যাকরণ ছাড়া নবান্যায়ও পারঙ্গম হইয়া উঠেন। অবশেষে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া হটী অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী হইলেন; দেশ-বিদেশ হইতে আগত বহু ছাত্রকে তিনি নবান্যায় পড়াইতে সুক্ক করিলেন। এই সময়ে তিনি “বিদ্যালঙ্কার” এই উপাধিতে ভূষিতা হলেন। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার ‘সেকাল আর

রূপমঞ্জরীর সন্ধানে

একাল' পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন:—“হটী বিদ্যালঙ্কার একজন বিদ্যাবতী বাঙালী ব্রাহ্মণ কন্যা। ইহার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সোএগ্রাই গ্রাম। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্যের ন্যায় বিদায় লইতেন।”

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে হটী বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়। শ্রীরামপুর-মিশনের উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮০৬-৭ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁহার ‘হিন্দু’ গ্রন্থের ১ম খণ্ড রচনা করেন, তখন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু: অক্টোবর ১৮০৭) ও হটী বিদ্যালঙ্কার উভয়েই জীবিত; তিনি ইহাদের দু-জনেরই কথা স্মার্য গ্রন্থে* লিখিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় খ্রীশিক্ষার ইতিহাসে হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। সেকালে একজন সহায়সম্মলহীনা বাঙালী বিধবা বারানসীর মত বিদ্যাকেন্দ্রে গিয়া অধ্যাপনা দ্বারা বিপুল যশের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, এ কথা ভাবিয়া বাঙালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। হটী বিদ্যালঙ্কারের পিতৃদেবের নাম পাওয়া যায় না। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সোএগ্রাই গ্রাম। রাজনারায়ণ লিখেছেন “বৃদ্ধবয়সে কাশীতে টোল করিয়া...” এ থেকে আন্দাজ করেছি তাঁর মৃত্যু প্রায় সাড়ে তিন-কুড়ি বছর বয়স হয়। তা সত্য হলে হটীর জন্মবৎসর আন্দাজ ১৭৪৫ এর কাছাকাছি [প্রসঙ্গত আমার কাহিনীর কল্পিত নায়িকার জন্মবৎসর ১৭৪৪]

‘হটী’ কখনো কোন বাঙালী মেয়ের নাম হিসাবে আর কোথাও পাইনি। শব্দটা চলচ্চিত্র বা সংসদ অভিধানে নেই। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রামাণ্য অভিধানে অবশ্য ‘হট’ শব্দের কিছু প্রাচীন যুগ প্রচলিত অর্থের হদিস দিয়েছেন। ‘হট’ সেখানে এইসব শব্দের সমার্থ হিসাবে ব্যবহৃত: দ্রোহবুদ্ধি, বিদ্বেষ, শত্রুতা, বিবাদ এবং চলিত-বাঙলায় ‘জিদ্দিবাজি’। উদাহরণ হিসাবে হরিচরণ উদ্ধৃত করেছেন এই শতাব্দীর উষ্মযুগে প্রণীত দুর্গাপঞ্চরাত্রি (কাশীবিনাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত): “আজি হবে এ সঙ্কট, তেঁই হর বৈলা হট।” তাই আন্দাজ করছি ‘হট’ শব্দটিকে ‘জিদ্দিবাজি’-র সমার্থ ধরে নিয়ে বালিকাবয়সে বিদ্যালঙ্কারের পিতৃদেব এই নামকরণ করেন। নিঃসন্দেহে, ‘ডাক-নাম’। তাঁর ভাল নামটা হারিয়ে গেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, “পিতৃবিয়োগের পর হটী দূরবস্থায় পড়িলেন। সংসারে বীতরাগ হইয়া তিনি কাশীবাসেরে সঙ্কল্প করেন।” যুক্তিটা মেনে নিতে পারিনি। সংসারে বীতরাগ হয়ে কাশীযাত্রা করলে তিনি সেখানে বিদ্যালঙ্কার হয়ে চতুর্পাত্রী খুলে বসতেন না। কৃপমণ্ডক সোএগ্রাই গ্রামপ্রধানদের দুর্ব্যবহারে ঐ চিতাব্রষ্টা বিধবা দেশত্যাগ করেছিলেন বলে মনে হয়।

মনে রাখা দরকার ১৮১০ সালে যখন হটীর মহাপ্রয়াণ হয় তখনও রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারেননি এবং মাইকেল, ভূদেব, রাজনারায়ণের মন্ত্রগুরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও মাত্রক্রেড়ে—এক বৎসরের শিশুমাত্র!

* Account of the Writings, Religion, and Manners of the Hindoos
Vol. I. Jan. 1811. pp. 195-96

।।খ।। হুঁ বিদ্যালঙ্কার

হুঁ বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ব্রাহ্মণকুলসম্প্রদায়। কিন্তু তদানীন্তন বাংলার ব্রাহ্মণের সমাজেও যে বিদ্যুষ্ণী মহিলা একেবারে বিরল ছিলেন না, তাহার প্রমাণ—রূপমঞ্জরী, ওরফে হুঁ বিদ্যালঙ্কার। রূপমঞ্জরীর পিতা য়োরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে নিজের একমাত্র কন্যার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের মনে বিশ্বাসের উদেক করে। ছাত্রদের সহিত একত্রে গুরুগৃহে বাস করিয়া রূপমঞ্জরীর বিদ্যা অর্জন, চিরকুমারী থাকিয়া তাঁহার অক্লান্তভাবে জ্ঞানের সাধনা—এই সমস্ত কাহিনী রূপকথার মত বিশ্বাসকর মনে হয়। শুধু সাহিত্য ব্যাকরণ শাস্ত্রদি নয়, জটিল বৈদ্যকশাস্ত্র পর্যন্ত অধিগত করিয়া রূপমঞ্জরী যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বাংলার নারীসমাজে বাস্তবিকই তাহার তুলনা খাঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এই প্রতিভাশালিনী মহিলার চিত্তাকর্ষক জীবনকথা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

রাঢ় প্রদেশে বর্ধমান জেলাতে কলাইবুটি নামে একটি পল্লীগ্রামে, বাঙ্গলা দ্বাদশ শতাব্দীতে, নারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি পরম বিষুভক্ত ছিলেন। সুধামুখী নামে এক রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলেরই অকালে কালপ্রাপ্তি ঘটে। অবশেষে বাঙ্গলা ১১৮১ (অর্থাৎ ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে) কি ৮২ সনে তাঁহাদের এক কন্যাসন্তান জন্মে। পিতা মাতা মড়াধে সন্তান বলিয়া কন্যাকে হুঁ বলিয়া ডাকিতেন—কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম রাখিয়াছিলেন রূপমঞ্জরী। রূপমঞ্জরী কীরূপ রূপবতী ছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি যে গুণবতী ছিলেন, তাহা আমরা বেশ বলিতে পারি।

বালিকা বয়সে রূপমঞ্জরীর ওরফে হুঁর মাতুলব্রিয়োগ হয়। তখন নারায়ণ দাসই তাহার মাতৃ-পিতৃ উভয় স্থানীয় হইলেন। নারায়ণ দাসের ঘরে সুধামুখী গৃহিণী নাই—বার্ধক্যের অবলম্বন পুত্র সন্তান নাই। নারায়ণ দাস যেমন রূপমঞ্জরীর মাতৃ-পিতৃ স্থানীয় হইয়াছিলেন, রূপমঞ্জরীও তেমনি তাঁহার পুত্র-কন্যা স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইল। বৈষ্ণব নারায়ণ দাসের বিষয়কর্ম কিছু ছিল না, তাঁহার অবসরকাল কাটে না। সংসারের একমাত্র বন্ধন কন্যাকে অরিসর কাটানোর উপায় করিয়া লইলেন,—হুঁকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। হুঁর বৈষ্ণ প্রখরা বুদ্ধি ছিল; তিনি যা কিছু শিখাইতেন, সে তাই টপ টপ করিয়া শিখিয়া ফেলিত। কন্যার এরূপ মেধা-শক্তি দেখিয়া পিতা অধিকতর আগ্রহের সহিত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন,—প্রতিবেশী পরিজনেরা হুঁর বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাহাকে ব্যাকরণ অধ্যাপনার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিল। ক্রীলোকে বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিধবা হয়, যে দেশে একরূপ কুসংস্কার, সেই দেশের লোকে হুঁর পিতাকে কেন এরূপ সদুপদেশ দিয়াছিল, বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, হুঁর যখন ১৬।১৭ বৎসর বয়স, তখন নারায়ণ দাস তাহাকে নিকটবর্তী কোন গ্রামে এক বৈয়াকরণিকের গৃহে রাখিয়া আইসেন। বৈয়াকরণিক জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন,—তাঁহার এক টোল ছিল। ষোড়শবর্ষীয়া রূপমঞ্জরী সেই টোলের ছাত্রদের সঙ্গে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এখানেও আর এক দেশাচারবিরুদ্ধ ঘটনা দেখা

রূপমঞ্জরীর সন্ধান

যাইতেছে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী অবিবাহিতা রহিয়াছে,—পুরুষের সঙ্গে একই বিদ্যাগারে শিক্ষা লাভ করিতেছে। জানি না, বৈষ্ণবসন্তান বলিয়া এরূপ হইয়াছিল কি না। কিন্তু রূপমঞ্জরী কেবল এই গুরুগৃহে নহে,—আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া নির্মল, নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—তিনি মৃত্যু সময় পর্যন্ত কুমারী ছিলেন, অথচ নীচতম শত্রু পর্যন্তও তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন দিন একটি কথাও বলিতে অবসর পায় নাই।


তিনি যখন গুরুগৃহে ব্যাকরণ অধ্যয়ন জন্য বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। তিনি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য স্বগ্রামে গমন করিলেন। পিতার সংস্কারান্তে আবার গুরুগৃহে ফিরিয়া গেলেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ হইলে, তিনি গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কার নামক এক অধ্যাপকের নিকট সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সাহিত্য অধ্যয়ন শেষ হইলে, তিনি পিতামাতার প্রেতঃকৃত্য সম্পন্ন জন্য গয়াধামে গমন করেন,—তথা হইতে কাশীধামে যাইয়া কিছু কাল বাস করেন। কাশী বাস কালে তিনি দণ্ডীদের নিকট নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যাপকেরা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতেন। এইরূপে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি জন্মভূমি রাঢ়দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন,—দেশে আসিয়া “হট্ট বিদ্যালঙ্কার” নামে অভিহিত হইলেন।

কিন্তু কেবল বিদ্যালোচনাতে তাঁহার প্রাণে শান্তি দিতে পারিল না;—নারীর কোমল হৃদয়ের মেহধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণে জন-সেবা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন মানসে সরগ্রাম নিবাসী সাহিত্য-গুরু গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের নিকট আবার গমন করিলেন। তাঁহার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি এরূপ সুখ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, অনেকে আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, চরক, নিদান প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে আসিত;—অনেক ধাতনামা কবিরাজ চিকিৎসা সম্বন্ধে সময় সময় তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

দু-একটি বিষয়ে ইহার একটু ক্ষেপামি ছিল। তিনি বেশভূষা অনেকটা পুরুষের মত করিতেন। রমণী-সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ কেশের উপর তাঁহার তত শ্রদ্ধা ছিল না,—মাথা মুড়াইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত শিখা রাখিতেন; পুরুষের মত করিয়া উভরীয় বস্ত্রধারণ করিতেন।


বঙ্গলা ১২৮২ (অর্থাৎ ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দের) সনের ১৫ই পৌষ তারিখে প্রায় এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাধারমণ দাস নামে এক ব্যক্তিকে তিনি পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তিনি আজও জীবিত আছেন,—আমাদের এই “হট্ট বিদ্যালঙ্কারের” গৃহেই তিনি বাস করেন। সুতরাং কাল্পনিক গল্প বলিয়া চিরকুমারী রূপমঞ্জরীর কথা উড়াইয়া দেওয়ার যো নাই। বঙ্গদেশের—বাল্লীর অধঃপতনের চূড়ান্ত সময়ে রূপমঞ্জরীর ন্যায় বিদূষী রমণীর ইতিবৃত্ত শুনিলে প্রাণে কতই না আনন্দ হয়!...এরূপ রমণী যে, সমাজে—যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সমাজের ও সেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।”

(গগনচন্দ্র হোম: “হট্ট বিদ্যালঙ্কার”—‘সখা,’ আগস্ট ১৮৯০)।



কদমঞ্জরী

নারায়ণ সান্যাল



রূপমঞ্জরী

তৃতীয় খণ্ড

স্বাধীনতা



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩



ৰূপমঞ্জৰী

নাৰায়ণ সান্যাল



RUPAMANJARI (PART III)

A Research Oriented Historical Bengali Novel by NARAYAN SANYAL

Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing

13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041

e-mail : dcypublishing@hotmail.com

Rs. 150.00

ISBN : 81-295-0547-9

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১২, ডিসেম্বর ২০০৫

অলংকরণ : সুধীর মৈত্র, রঞ্জন দত্ত

প্রচ্ছদ : গৌতম দাশগুপ্ত

অক্ষরবিন্যাস-নিরীক্ষা :

সুচিত্রা সান্যাল-জয়ন্ত সান্যাল, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, সুবাস মৈত্র

দাম : ১৫০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রহণ : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট প্রিজারগ্রাফিক্স

২ চাঁপাতলা ফাস্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

ভারতপথিক

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

শ্রীচরণাবিন্দেষু

হটী বিদ্যালঙ্কারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব তুমি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলে। নারীজাতিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলে। ধর্মীয় গোড়ামির অঙ্ককার দূর করে, পৌত্তলিকতার বেড়া জাল ভেঙে তাদের আলোয় আনার ব্রত গ্রহণ করেছিলে। সতীদাহ-প্রথার মতো বর্বর নিয়মকে তুমি দূর করেছিলে। নানাভাবে অসম্মানিত, ব্যঙ্গ-বিদ্রোপে জর্জরিত হয়েও নিজের পথ থেকে তুমি সরে আসোনি।

তোমার রেখে যাওয়া কাজ আমরা কি সমাপ্ত করতে পেরেছি?

তোমার চরণপ্রাপ্তে এই অর্ঘ্যটি সমর্পণের সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।

শ্রদ্ধাবিনম্র

স্বাধীনতা

কৈফিয়ৎ

রূপমঞ্জরীর প্রথম খণ্ডে আমার পিতৃদেব—লেখক শ্রীনারায়ণ সান্যাল—‘কৈফিয়ৎ’এ বলেছেন :

“রূপমঞ্জরী ও তার বাবা দুজনকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই অর্ধে দুই সংকটজনক অবস্থায় ফেলে রেখে অসমাপ্ত গানে আচমকা থামতে বাধ্য হয়েছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে, ব্যক্তিগত কারণে।”

যমদূতের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটি নিয়ে সেই অসমযুদ্ধ থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিলেন সেবার তিনি কলমটি বুকে করে। সেটা ১৯৯০। তারপর বারবার জীবন-মৃত্যুর টু..বি খেলার ফাঁকে আমাদের উপহার দিয়েছেন তিনটি খণ্ডে ‘রূপমঞ্জরী’র গল্প আর ফাউ হিসাবে ‘মৃত্যোর্মা’, ‘প্রেম’, ‘আর্টিমিসিয়া’ সহ আরও গোটা পনেরো বই।

উনবিংশ শতাব্দীতে ‘বাঙলা রেনেসাঁসের’ যে স্বর্ণময় যুগ সে সময়কালকে লেখব তুলনা করেছেন শরতের আকাশের সঙ্গে—

সাদায়-কালোয় মেশানো। যেন মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি। একদিকে বাইজী বেড়ালের বিয়ে—বুলবুল লড়াই—বাবু কালচার, ওদিকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অতন্ত্র সাধনার আশীর্বাদ। তুলনায় বক্ষ্যমাণ তার আগের শতাব্দীটি নীরত্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্রাবণের অমরাত্রি ... ক্রেদান্ত, পূতিগন্ধময় পুরীষ। ... কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় যখন প্রত্যক্ষ সত্য তখন কেউ-না-কেউ নিশ্চয় গোপনে কণ্ঠে গেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অমানিশায় অতন্ত্র ‘রাত্রির তপস্যা’।

আশ্বাস রেখেছিলেন লেখক তাঁর কাহিনীর নায়ক সেই নিঃসঙ্গ ক্লান্ত বিহঙ্গটি মতো, যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিল ‘আছে শুধু পাখা, আছে মহান অঙ্গন।’

অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে আবিষ্কার করলেন—নায়ক তো নয়, নায়িকা হটী-বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার, দ্রবময়ী, চন্দ্রাবতীর মতো অসামান্য বিদূষী প্রতিভাদীপ্ত চরিত্র। প্রথম দুজনের জীবনের নির্যাসে রচিত হল লেখকের ‘কল্পনাসৃষ্ট মানস-কন্যা—তথা জননী : রূপমঞ্জরী।’

“রাজা রামমোহন যদি স্বয়ম্ভু লিঙ্গের মতো অলৌকিক ক্ষমতায় গজিয়ে উঠতে না পারেন তাহলে হটি বা হটু বিদ্যালঙ্কারও তা পারেন না। পারে না আমার মানসকন্যাও। তাঁদেরও প্রয়োজন এক-একজন পূর্বসূরী। শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিটি রক্তকণিকার প্রতিটি

‘জীন’-এ চাই সেই পূর্বসূরীর আশীর্বাদ। বাস্তব রূপমঞ্জরীর পিতৃদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর নারায়ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কিন্তু সেই তৃণাদপি সূনীচকে দেখা গেল কূপমণ্ডুক সমাজের বিরুদ্ধে বজ্রাদপি কঠোর হতে। হটীর পিতৃদেবের নাম মনে রাখতে পারেনি বুড়ো ইতিহাস। তবে এটুকু তার স্মরণে আছে—সমাজপতিদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তিনি আত্মজার অক্ষর-পরিচয় করিয়েছিলেন, সহমরণের চিতা থেকে নাবালিকাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে এনেছিলেন।

সে অজ্ঞাতনামা বজ্রাদপি কঠোর টুলো পণ্ডিতই আমার উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র।”
রূপমঞ্জরীর তৃতীয় খণ্ড সেই পিতা-পুত্রীর জীবনসংগ্রাম গাথা।

২০০৪-এর এপ্রিল মাসে আবার হাজিরা দিতে হল লেখককে হাসপাতালের দোরগোড়ায়। দু-তিন সপ্তাহ কাটল বন্দীদশায়। এরই মাঝে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, ডাক্তার-নার্সদের চোখ ফাঁকি দিয়ে লেখা হল রূপমঞ্জরীর তৃতীয় খণ্ড। প্রকাশিত হতে থাকল ‘নবকল্লোল’ পত্রিকায় ধারাবাহিক—১৪১১ বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত। বাকি ছিল একটি মাত্র সংখ্যা—‘চৈত্র’ সংখ্যাটি। শেষ সংখ্যা।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫-এ ব্রাহ্মমহর্ষিতে লেখক চিরকালের মতো তাঁর লেখার খাটটি ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা তোলপাড় করে খুঁজলাম—কোথায় চৈত্র সংখ্যার শেষ পাণ্ডুলিপি? এই খোঁজায় পেয়েছি অনেক অমূল্য সম্পদ। তাঁর অনেক হাতে-আঁকা ছবি, অবশ্যে ধুলিমাখা। অনেক লেখার টুকরো, অনেক দরকারি-অর্থকরী সম্পত্তির কাগজপত্র। কিন্তু কোথায় রূপমঞ্জরীর শেষ?

কোথাও খুঁজে পাইনি। তাঁর ভাষায় ‘মগজস্থ’ থাকলেও এবং আমাদের তিন-চারজনকে বিভিন্ন সময়ে, আলাদা ভাবে শেষটা শুনিয়ে থাকলেও, শেষপর্যন্ত শেষপর্বটি তিনি নিজে হাতে লিখে যাননি।

এরপর শেষ করার ভার যখন আমার ওপর এসে পড়ল স্বীকৃত হতে পারিনি প্রথমে। সে দুঃসাহস ছিল না। বাকি তিনজনের কাছ থেকে শেষটা মিলিয়ে নিয়েছিলাম কেবল নিজের কাছে, পাঠিকা হিসাবে গল্পের শেষটা জানার তাগিদে।

বেশ কিছুদিন পর, আমেরিকায় ফিরে এসে এক অভিজ্ঞতার সামিল হলাম। আমার চারপাশে ইয়াক্সি বুলি, জগবম্প সুর, জীবনে স্পুটনিকের গতি। তার মাঝে এক নিঝুম দুপুর এল। শূন্য বাড়িতে ‘রূপমঞ্জরী’ পড়তে পড়তে ভেসে এল শৈশবে শোনা আমার বাবার গলায় স্তোত্রপাঠের সুর। ফুটে উঠল দুশো বছর আগেকার সোঞাই গ্রামের ছবি। যেন গুনতে পেলাম—

“খেয়ালে-বেখেয়ালে কোন গানের তান যে ধরে বসবে ঐ সাধের লাউ তা কি বাউল নিজেই আগেভাগে টের পায়? আঙুলের সঙ্গে গুণগুণির আঁতাত, কণ্ঠকে গলা মেলাতেই হয়।”

নানান গবেষণার মাঝে গত পনেরো বছর ধরে ‘রূপমঞ্জরী’র গান গুনগুনিয়েছে

তাঁর গলায়, বয়ে গেছে কলমের খোঁতে। তাতেই বিভোর ছিলেন। অসমাপ্তগানে যে আচমকা থামতে হবে আবার কোনদিন এ খেয়াল তো বাউলের হবার কথা নয়।

রূপমঞ্জরীর গাথা তো শেষ হবার নয়। শেষ নেই যে রূপমঞ্জরীদের সংগ্রাম-সমরের। এ গান যে থামতে দিতে নেই; ধূয়ো তুলেই নিতে হয়, এগিয়ে এসে গুণগুণি আঙুলে জড়িয়ে, চোখের জলে ভেসে।

তুলে নিই কলম। দেখি, ‘জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্র হেন ভারী, এ যে তোমার তরবারি।’

নিজেকে বোঝাই—হোক বেসুরো, তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে—‘আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।’

এই প্রচেষ্টায় কয়েকজন আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীপ্রদীপ দত্ত লেখকের সঙ্গে শেষ ক’দিন ঘনিষ্ঠভাবে কাটাবার সুযোগ পান ও স্থিরনির্দিষ্ট করেন যে শেষাংশ লেখক নিজে হাতে লিখে যাননি। শ্রীপ্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত গল্পের শেষাংশ যেমন শুনেছিলেন স্বয়ং লেখকের মুখ থেকে তা মিলিয়ে নিতে আমাকে সাহায্য করেন এবং নানান তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেন। ‘দেব সাহিত্য কুটীর’-এর শ্রীপ্রবীর মজুমদার এবং দে’জ পাবলিশিং-এর শ্রীসুধাংশুশেখর দে এবং পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স-এর শ্রীঅনুপম ঘোষ ও শ্রীমতী সুরতা ঘোষ—সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সহযোগিতার জন্য। এবং সর্বশেষে আমার দাদা শ্রীসুবাস মৈত্র—তাঁর সাহচর্য ও উৎসাহ না পেলে আমার লেখাটি গুরু বা শেষ করার সাহস ও উদ্যম সম্ভব হতো না।

এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

২৮ অক্টোবর ২০০৫

অনিন্দিতা বসু

বিশেষ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : মহামহোপাধ্যায় স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রী অনন্তলাল ঠাকুর স্বর্গীয় লেখকের প্রতি তাঁর সম্মেহ অনুরাগ প্রকাশ করে বেদ-উপনিষদ-ভাগবত-কালিদাসাদি উদ্ধৃতির পাঠনিশ্চয় ও বর্ণাঙ্কিত সংশোধন করে দিয়েছেন। সপরিষ-প্রতিষেধক বিষয়ে অধুনাতম তথ্য (পৃ: 291) সরবরাহ করেছেন ডাঃ অপরাজিতা চৌধুরী ও তথ্যসংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন শ্রীমতী সুদক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাহিত্যপথিক

স্বর্গীয় নারায়ণ সান্যাল

শ্রীচরণাবিন্দেষু

আজ আপনি অমৃতধামনিবাসী। কিন্তু সুদীর্ঘকাল পার্থিব জগতে থেকেও আপনি ঊর্ধ্বলোকের কোন্ আলোকধামের যাত্রী ছিলেন, কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে আপনি ধরায় আমাদের ধরা দিয়েছিলেন, তা কাছে থেকেও আমরা ধরতে পারিনি। চিরজীবন কোন্ বিপুল সুদূরের বাজানো কোন্ ব্যাকুল বাঁশরী আপনাকে ‘অস্ত্রবাসী’ অনিকেত করেছে, সাহিত্যের দিক্দিগন্তে পথচারী করেছে, তা আমরা কেউই জানিনা।

এইটুকু শুধু জানি, সেই ব্যাকুল পথচারিতার পথেই আপনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন মহীয়সী হট্টা বিদ্যালঙ্কারের অনালোকিত জীবনকে দুই বাংলার পাঠিকা-পাঠকের কাছে আলোকিত করার দায়িত্ব। ফলশ্রুতি ‘রূপমঞ্জরী’। কিন্তু বাঁরা বই পড়েন তাঁরা আপনার ‘সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলার সলতে পাকানোর’ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের খবর পাননা। তাঁদের জ্ঞাতার্থেও এই প্রয়াস।

আপনার মনে থাকবে বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে ‘সাহিত্য সংসদ’-এর ‘বাঙালী চরিতাভিধান’-এ চোখে পড়েছিল কয়েকটি অসাধারণ নারী চরিত্র—হট্টা ও হট্টা বিদ্যালঙ্কার; ভারতে প্রথম এম.বি. ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র; হরিপ্রভা তাকেদা—যিনি একশো বছর আগে একজন জাপানীকে বিবাহ করে জাপানযাত্রা করেন ও ফিরে এসে ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ গ্রন্থ রচনা করেন; চণ্ডাল মহিলা দ্রবময়ী—যিনি প্রায় দেড়শো বছর আগে তাঁর গ্রাম-চৌকিদার স্বামীর মৃত্যুর পর ‘পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর অসামান্য দৈহিক শক্তি ও লাঠিখেলায় অপরূপ নৈপুণ্য দেখিয়ে চৌকিদার-পদ লাভ করেন।’

আজ তখন ‘কাঁটায় কাঁটায়’ নিজেকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছেন! আপনার শুভানুধ্যায়ী কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী, শিল্প-সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র, চিরবিপ্লবী আজিজুল হক ও অন্যান্য অনেকেই আপনাকে অনুরোধ করেন এই কণ্টকময় জগৎ থেকে বেরিয়ে আপনার ‘না-মানুষী বিশ্বকোষ’ শেষ করতে, মিকেলাঞ্জেলো ও লিওনার্দোকে নায়ক করে যে দুটি বই লেখবার জন্য আপনি প্রভূত তথ্যসংগ্রহ ও নোট করেছিলেন তার সদ্যবহার করতে। আপনি হেসে বলেছিলেন ‘একটু relax করতে দিন’। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শেষজীবনে সারাদিন ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিক সাধন নিয়ে ডুবে থাকতেন, আর ‘relax’ করতেন Integral Calculus এর দুর্ভাষ সব অঙ্ক কষে! তেমনি আপনিও...

যাই হোক, তখন আপনি বলেছিলেন ‘চরিতাভিধান’-এর ঐ বিশেষ পাতাগুলোর কাগজ লাগিয়ে রেখে দিতে—‘পরে সময় হলে দেখা যাবে’। তারপর ৮-১০ বছর কেটে যায়। আমি সেগুলোর কথা ভুলেছিলাম। আপনি ভোলেননি। এইখানেই আপনি আপনি! রূপমঞ্জরীর প্রথম খণ্ড দেখেই বুঝেছিলাম আপনার ‘সময় হয়েছিল’ এবং হট্টা-হট্টীকে আপনি মনশ্চক্ষে জীবন্ত প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ‘চরিতাভিধান’ এর ১/৪ পাতা থেকেই ‘আপন মনের মাদুরী’ মিশিয়ে রচনা করলেন সুদীর্ঘ তিন খণ্ডের ১,০০০ পাতা!!

‘অমাবস্যার গান’-এর অঙ্ককার অষ্টাদশ শতাব্দী আলোকিত হলো আপনার রূপেন্দ্রনাথের চরিত্রালোকে আর দীপ্তিময়ী রূপমঞ্জরীর চরিত্রচিত্রণে।

পূর্বোক্ত অধ্যায়ের অন্যান্য নারী চরিত্রগুলিকেও আপনি এই বইয়ের শেষে উদ্ভাসিত করবেন বলেছিলেন—কোথায় কীভাবে জানিনা—তা করে উঠতে পারলেন না। বলেছিলেন অ্যানি বেসান্ত আর মার্গারেট স্যাংগারের ‘জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন’ নিয়েও আলোচনা করবেন পরিশেষে। বিশেষত মার্গারেট স্যাংগার। আপনার কাছেই শুনেছি তাঁর বইগুলির কথা—‘What Every Mother Should Know’, ‘My Fight for Birth Control’, ‘Motherhood in Bondage’। আজ থেকে আশি বছর আগে তিনি নাকি ভারতে আসেন জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ভারতবাসীকে সচেতন করতে। প্রথম দেখা করেন তখনকার ভারতের ‘মুকুটহীন সম্রাট’ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে—তিনিই পারবেন ভারতের কোটি কোটি জনগণকে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না। ভারতবাসীর পক্ষে ব্রহ্মচর্যই যথেষ্ট বলে তিনি মনে করতেন। বিফলমনোরথ স্যাংগার এলেন শান্তিনিকেতনে।

আপনি বলেছিলেন, “এইখানে দ্যাখো রবীন্দ্রনাথের আধুনিকমনস্কতা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি। তিনি বিষয়টি শুধু বুঝলেন তাই নয়, Birth Control না হলে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ বিভ্রমনার কথাও বললেন। আজ আমরা তাঁর দূরদৃষ্টির তারিফ করি। স্যাংগারকে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

‘I am of opinion that the Birth Control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity... In a hunger-stricken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children to existence than could properly be taken care of...To wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and untimely death for no fault of their own is a great social injustice which should not be tolerated.’ ”

আপনার মনে আছে বোধহয়, এর পর আপনাকে একটু অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিলাম! বলেছিলাম, “রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’ থেকে ‘সভ্যতার সংকট’, ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’ থেকে B.C.র চিঠি মুখস্থ রেখেছেন অথচ আজ পর্যন্ত একটা বইও তো তাঁকে উৎসর্গ করেননি!!’

উত্তরে আপনি কান ধরে টেনে একটি থালুড় কবালেন! অন্তত আমার সেইরকমই মনে হয়েছিল। অথচ হেসেই বললেন, “অবাক করলে তুমি! এরপর তো বলবে বরুণদেব আর পবনদেবকে একটা করে বই উৎসর্গ করতে—কারণ জল-হাওয়া না হলে তো আমি বাঁচবো না। তাহলে সূর্যদেবকেও একটা বই উৎসর্গ করতে হয়, তিনি না থাকলে তো আমরা কেউই নেই! শোনো, রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে জল-হাওয়া-সূর্যালোকের মতোই।’ বলেছিলেন বটে, কিন্তু পরের বইটি—‘অনির্বচনীয়’—আপনি উৎসর্গ করেছিলেন সেই ‘শাস্ত্রতত্ত্ববনক্ষত্র’কেই!

জানিনা আপনার পাঠিকা-পাঠকবৃন্দ আপনার এই সব নেপথ্যকথনে কতখানি উৎসাহিত। তবু বোধহয় রূপমঞ্জরীকে চিনতে হলে তার স্রষ্টাকেও কিছুটা চিনতে হবে, মেয়েদের প্রতি আপনার অপরিণীম শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ তাঁদের কিছুটা বুঝতে হবে।

আর এই জনাই রাজা রামমোহনের প্রতি ছিল আপনার অনন্য ভক্তি। আপনি একবার বলেছিলেন, “দ্যাখো, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘first man of new regenerate India’ মনে করেন, বিবেকানন্দ বলেন ‘রামকৃষ্ণ আমার দীক্ষাগুরু, রাজা রামমোহন আমার

শিক্ষাওর।' সত্যিই তিনি ভারতের গত দুশো বছরের নবজাগরণের আদিপুরুষ।
ডায়েরি নাকি একবার বলেছিলেন যে টলস্টয়, তুগেনিয়েফ, চেখফ, তিনি
মিজে—সবাই বেরিয়েছিলেন রশ সাহিত্যের আদিপুরুষ গোগোলের 'ওভারকোট'-এর
পক্ষে থেকে! আমি বলি ভারতে রামমোহন-পরবর্তী প্রতিটি প্রজন্মের প্রতিটি প্রতিভা
বেরিয়েছেন রাজা রামমোহনের ঐ বিশিষ্ট শিরোভূষণের ভাঁজ থেকে!!”

“আমার পাঠক-পাঠিকাদের আমি মনে করিয়ে দেবো কবিগুরু মূল্যায়ন—
'Rammohun rose up a luminous star in the firmament of India's history,
with prophetic purity of vision, and unconquerable heroism of soul. He
shed radiance all over the land...he is the great path-maker.'

“তারা যেন মনে রাখে, শুধু সতীদাহ নিবারণ আর নারী-জাগরণই তাঁর অবদান নয়।
আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে যে সবথেকে বেশি দরকার আধুনিক
বিজ্ঞানশিক্ষার সেকথা তিনি দুশো বছর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন—‘promote a
more liberal and enlightened system of instruction, embracing
Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful
sciences.’ এরই ফলশ্রুতি জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর, সত্যেন বোস থেকে
সাহা ইন্সটিটিউট, ‘বিশ্বপরিচয়’ থেকে আজকের software engineering।”

আপনার এই বিজ্ঞানমনস্কতার প্রকাশ ‘বিশ্বাসঘাতক’, ‘নক্ষত্রলোকের দেবতাস্ত্রা’ ও
অন্য বহু লেখায়। শুধু তাই নয়, বহু বইতে আপনি পরবর্তী সংস্করণে অধুনাতন তথ্য
জানিয়েছেন—যেমন ‘বিশ্বাসঘাতক’-এ ফুটনোটো কাপিংজা বিষয়ে।

‘রূপমঞ্জরী’ নবকলোলে বেরোবার সময়ও আপনি বলেছিলেন, “রূপেন্দ্রনাথের
সর্পদংশন সম্বন্ধে একটা ফুটনোটো দিলাম। বই বেরোবার সময় ও বিষয়ে নতুন কোনো
তথ্য পাওয়া যায় কিনা দেখো।” দেখেছিলাম। পেয়েও ছিলাম। তবে একটু
দেরীতে—আপনাকে দেখাতে পারলাম না। তবু আপনার পাঠক-পাঠিকার জন্যে তা
এখানে দিলাম—এই প্রার্থনা সমেত যে এটা যেন কখনো তাঁদের দরকার না লাগে!

আপনি লিখেছিলেন (পৃ: 186) : ‘শঙ্কুচূড়ের প্রতিষেধক...ভারতে...আজও অলভ্য’।
কিন্তু বর্তমানে (জানুয়ারি 2006) সব রকমের সর্পবিষের প্রতিষেধক ভারতে সহজলভ্য :

‘POLYVALENT ANTI-SNAKE VENOM (Price about Rs. 400/-) is
prepared in Haffkine's Institute in Mumbai by injecting horses with snake
venom of both cobra and viper variety. If anti-snake venom is not
available, or, the patient is hypersensitive to it, then POLYVALENT
ANTI-VENENE, a drug prepared at Kasauli, is used as substitute.
CORTISONE, ADRENALIN, ANTI-HISTAMINIC and
NIKETHAMIDE are used as supportive treatment.’

(PRINCIPLES OF FORENSIC MEDICINE—Dr. Apurba Nandi)

* * *

‘রূপমঞ্জরী’র এই খণ্ডে শেষের দিকে আপনি দুটি সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করবেন
বলেছিলেন। করে উঠতে পারেননি। বিশেষত আপনার পাঠিকাদের জন্য শ্লোক দুটি
উদ্ধৃত করলাম :

‘ভার্য্য শ্রেষ্ঠতমঃ সখা’।—(মহাভারত ১.৭৪.৪১)

‘ন চ ভার্য্য সমং কিঞ্চিদ বিদ্যাতে ভিষজম মতম

ঔষধং সর্বদুঃখেষু সত্যমেতদ ব্রবীমি তে’।—(মহাভারত ৩.৬১.২৯)

দ্যুতে পরাজিত রাজা নল একা বনে যাইবার সময় রানী দময়ন্তী তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়া এই শ্লোকটি নলরাজাকে বলিয়াছিলেন :

‘মহারাজ, আপনাকে এই সত্য কথাটি বলিতেছি, শুনুন :

—সর্বদুঃখে বৈদ্যসম্মত ঔষধ হইল স্ত্রী।

অর্থাৎ, স্ত্রীর মতো সহানুভূতিশীলা, সুখদায়িনী আর কেহ হইতে পারে না।’

(অনুবাদ : শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর)

* * *

পিতার আরক্ত কর্মযজ্ঞ অসমাপ্ত থাকলে সাধারণত উপযুক্ত পুত্রই পূর্ণাঙ্গুতি প্রদান করে। বহুব্যবহৃত তা ঘটেছে। মহর্ষির ব্যক্তিগত শান্তির নিকেতন তাঁর পুত্রের হাতে হয়ে উঠেছিল বিশ্ববিশ্রুত ‘শান্তিনিকেতন’; মহাকবি বানভট্টের অসমাপ্ত ‘কাদম্বরী’-কাব্যের পূর্ণরূপ দেন তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট; বিভূতিভূষণের ট্রিলজি ‘অপূর’ ‘পথের পাঁচালী’ আর ‘অপরাজিত’ জীবনদর্শনকে পরিপূর্ণতা দেন তাঁর পুত্র তারাদাস—সমাপ্ত করেন ‘কাজল’। আপনার ‘রূপমঞ্জরী’ ট্রিলজির পূর্ণাঙ্গুতি দিলেন আপনার উপযুক্ত সুকন্যা অনিন্দিতা। তাঁর লেখা তাঁর নাম সার্থক করে কিনা তার বিচারক—আপনার ভাষায়—‘পাঠক-পাঠিকা জুরীবন্দ!’

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি। আপনার সুযোগ্য প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর দে, আপনার সহধর্মিণী শ্রীমতী সবিতা সান্যাল, আপনার পুত্র শ্রীমান তীর্থরেণু ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মৌ নিশিচিন্ত বিশ্বাসে এই তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করার নিরঙ্কুশ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন অনিন্দিতা ও আমার ওপর। তাঁরা কেউই কোনো খবরদারি করেননি। সেজন্য তাঁরা আমাদের দুজনের ধন্যবাদার্থ। তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারলাম কিনা জানিনা। ভালো-মন্দর বিচারে প্রশংসা-ভাগ আপনার আর অনিন্দিতার প্রাপ্য, অঙ্কুশ-ভাগ আমার রইলো।

* * *

5 ফেব্রুয়ারি 2005, শনিবার, ভোরবেলা আপনি ডেকে বলেছিলেন :

“এরপর আমার আর কোনো বইয়ের প্রফ আমি দেখাবোনা। সব দায়িত্ব তোমার। যে কটা দিন আছি সে’কটা দিন শুধু লেখা নিয়েই থাকবো—না-মানুষী, ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন, লিওনার্দো...—সবকটা একটা একটা করে শেষ করবো।”

পঞ্চাশ বছরের সাহচর্যেও আপনার কথার কোনোদিন নড়চড় হতে দেখিনি।

এবারও আপনার কথার প্রথমার্শ্বে আপনি রক্ষা করলেন—

দুদিন পরেই ব্রাহ্মমূর্ত্তে হলেন অনন্তধামযাত্রী।

আমাকে নাহয় অঁথে জলে ফেলে গেলেন। কিন্তু আপনার কথার শেষ অংশটা তো আপনি রক্ষা করলেন না! কথার খেলাপ করলেন!! আপনি!!!

এ অনুযোগও আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা জানাবো?

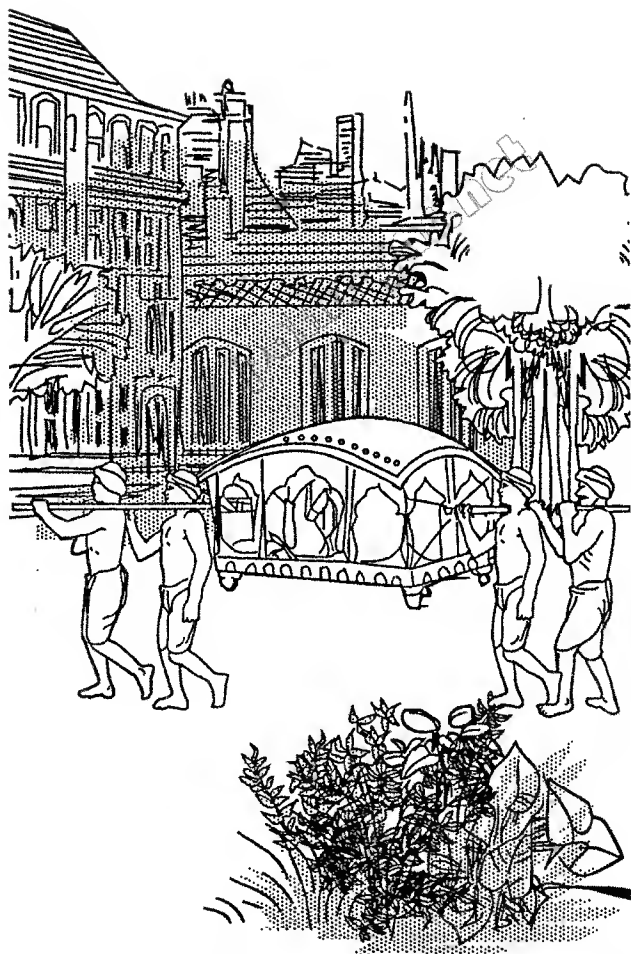
সব শেষে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করি।—

জানিনা, আপনার রেখে যাওয়া কাজ আমরা কি সমাপ্ত করতে পেরেছি?

তবু, আপনার চরণপ্রাপ্তে এই অর্ঘ্যটি সমর্পণের সৌভাগ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

শ্রদ্ধাবিনম্র

সুবাস মৈত্র



প্রাককথন

[প্রথম খণ্ডে হটী বিদ্যালংকারকে আমরা শেষ দেখেছি 1763 খ্রিস্টাব্দে। কাশীতে নিজ চতুষ্পাঠীতে বন্দিনী রূপে। তখন তাঁর বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ। গুরু দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের নিকটে তিনি সদ্য বিদ্যালংকার উপাধি লাভ করে কাশীধামেই একটি চতুষ্পাঠী খুলে বসেছিলেন। সেই অপরাধে কাশীনরেশ রাজাসাহেব পুরন্দর ক্ষেত্রী তাঁর কঠিন শাস্তিবিধান করেছেন। আমরা আরও জেনেছিলাম বুদ্ধ বিদ্যার্ণব তাঁর আদরিণী কন্যাটিকে নিয়ে গঙ্গার অপরপারে ব্যাসকাশীতে গিয়েছিলেন মহর্ষি ত্রৈলোক্যস্বামীর শরণ নিতে, মুক্তিপথের সন্ধানে। মহাসাধক বিদ্যার্ণবকে যে কী নির্দেশ দিলেন তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। তিনি রূপমঞ্জরীকে তির্যকভাষায় ভৎসনা করে বলেছিলেন “তু ঔরং হো-কর শঙ্খ বজ্রানা ভুল গয়ী? ইয়ে তো হ্যায় তেরি অপ্নি বনায়ি স্বয়ি বদনসিবি” তার অর্থ দ্বারকেশ্বর বা তাঁর পণ্ডিত কন্যা প্রণিধান করতে পারেননি। আমরাও কিছু বুঝিনি, মহাসন্ন্যাসী আরও বলেছিলেন, “জীবাত্মাকে অসীম নীলাকাশে মুক্ত করে দেওয়াই সাধকের কৃত্য।” তারই বা অর্থ কী?

এরপর কাহিনির ঘূর্ণাবর্তে আমরা উপনীত হয়েছিলাম পূর্ববর্তী প্রজন্মে। রূপমঞ্জরীর পিতামাতার যৌবনে। 1742-43 খ্রিস্টাব্দে।

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা জেনেছি, রূপেন্দ্রনাথ তাঁর মাতৃহারা কন্যাটিকে নিয়ে সোএণ্ডাই গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তখন হটীর বয়স মাত্র চার। রূপেন্দ্রনাথ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ঘনশ্যাম সার্বভৌমের সদ্যবিধবা গর্ভবতী মালতীকে। আধুনিকমনা রূপেন্দ্রনাথ নিজগ্রামে একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। সেই অপরাধে সোএণ্ডাই গ্রামের সমাজপতিরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা। পঞ্চায়েতে বোলোআনার ডাকে রূপেন্দ্রনাথের বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু পীতাম্বর মুখুজ্জের বালবিধবা দিদি গিরিবালা এমন প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়ান যে, পঞ্চায়েত-প্রধান নন্দ চাটুজ্জের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

এটুকু ধরতাই থেকে যদি আপনারা কাহিনির সূত্র তুলে নিতে না পারেন তাহলে আমি নাচার। সে-ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে ওই দুটি খণ্ড আপনারা নেড়েচেড়ে দেখতে হবে।]



রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

(1748-1757)

একাদশ পর্ব

যোলো-আনার ডাকে একবন্ধাকে কবজা করা গেল না। নন্দ চাটুজে যৎপরোনাস্তি মর্মান্বিত। গ্রামের প্রায় সবকয়টি মাতব্বরকেই তিনি কবজা করতে পেরেছিলেন—শিরোমণি মশাই, চক্কোতি

খুড়ো, ঘোষালদা ইত্যাদি। নব্যযুবকের দল—বড়খোকা, কালু, গজেনরা তো ছিল একপায়ে খাড়া। হুকুম পেলেই তারা ওই একবন্ধার চালাঘরের ভিটায় আগুন ধরিয়ে দিত। কিন্তু রূপেন্দ্র যে এভাবে দাবা ধরে ওঠসাই কিস্তি দিয়ে বসবে তা কে জানত? লোকটা ঘোর নাস্তিক, দুবিনীত, বেয়াদব—একশোবার! কিন্তু নন্দ চাটুজেও স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোবরেজ হিসেবে ওই কালাপাহাড়টা পঞ্চগ্রামে একটা মাড়া ফেলে দিয়েছে। জমিদারগিন্নি জ্ঞানসুন্দরীর সেই তাকলাগানো চিকিৎসের দিন থেকে, ব্রজসুন্দরীর অন্তর্জলিয়াত্রার সব আয়োজন যখন সমাপ্ত তখন ওই একবন্ধা ধম্বন্তরি যমদূতদের রুখে দিয়েছিল। সবাই তাজ্জব। অথচ সহজ হিসেবটা কেউ বুঝল না! ভাদুড়িগিন্নি তো জীবন ফিরে পেলেন অন্য কারণে : জমিদারের কুলগুরু দেবতার মন্দির চাতালে যে মহাযজ্ঞটা করলেন সেটা কি নজরে পড়ল না তাদের? কয়েক মন গাওয়া ঘি পুড়ে ছাই হয়ে গেল—ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় চতুর্দিক অন্ধকার। যমদূতেরা পালাবার পথ পেল না। এই সোজাকথাটা ওই অশিক্ষিত চাষাভূষাগুলো বুঝল না! তারা ওই একবন্ধার ওপর দেবত্ব আরোপ করে বসল।

পঞ্চায়েতের যোলোআনার ডাকে রূপেন্দ্রনাথ চরিত্রগত দার্ঢ্যে ঘোষণা করেছিলেন, ‘ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যালয়’ অমর! সোএগ্রাই পঞ্চায়েত যদি বাধ্য করেন তবে তিনি এ গ্রামের বাস উঠিয়ে দেবেন। চলে যাবেন ত্রিবেণীতে। তাঁর গুরু মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আশ্রয়ে। তিনি নিশ্চয় সানন্দে স্বীকৃত হবেন

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধবা

তাঁর আশ্রমের একান্তে এই মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। ভারত ভূখণ্ডের প্রথম স্ত্রীলোকের বিদ্যালয়ের স্থানান্তর ঘটতে পারে, তার মৃত্যু নেই। হতে পারে না।

সোএই গাঁয়ের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষেরা পঞ্চায়েতের বিধানে সন্তুষ্ট হয়নি। মেয়েরা বারোহাত কাপড়ে কাছা দেয় না। তাদের পাঠশালা কোথায় থাকবে, আদৌ থাকবে কি থাকবে না এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। তাদের এক কথা : ধন্বন্তরি বাবাঠাকুরকে তারা গাঁ-ছাড়া হতে দেবে না। এই তাদের পণ! ওরা বুঝতে শিখছে, ওলাবিবি-শীতলা-মনসা মাথায় থাকুন; কিন্তু ধন্বন্তরির প্রয়োজন আছে। বিন্-চিকিচ্ছেয় মরতে তারা আর রাজি নয়। তাই ধন্বন্তরি বাবাঠাকুর গাঁয়ে থাকবেন। ব্যস! শেষ কথা! হক্কতা!

পঞ্চায়েত বিচারসভা থেকে বিজয় গৌরবে ফিরে এলেন বটে কিন্তু শেষরক্ষা বোধহয় করা গেল না। হারাধনের দশটি ছেলের মতো তাঁর প্রথম যুগের আটটি ছাত্রী একে একে নেপথ্যে সরে যেতে থাকেন।

আদিযুগে ব্রজসুন্দরী স্ত্রীশিক্ষায়তনে বিদ্যারম্ভ করেছিলেন এই গ্রামের সাতজন মহিলা এবং একটি বালক—একুনে : আট। চারটি পর্যায়ে। একালের ভাষায় বলা যায় চারটি ‘পিরিয়ড’—এ। ব্রাহ্মমূর্ত্তে শয্যাভ্যাগ করে রূপেন্দ্রনাথ অশ্বপৃষ্ঠে বেরিয়ে যেতেন গ্রাম-গ্রামান্তরে। রুগি দেখা সারা করে ফিরে এসে বসতেন প্রথম পর্যায়ের বিদ্যাদান আয়োজনে। সেটা বয়োজ্যেষ্ঠাদের শ্রেণি। তিনটি ছাত্রী। পীতাম্বর মুখুজ্জের দিদি—তিন কুড়ি পাড়ি দেওয়া গিরিবালা। তাঁর অন্তিম লক্ষ্য কৃতিবাসী রামায়ণ নিজে-নিজে পড়তে পারা। ব্যস! আর কিছুর নয়। তিনি নাকি ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করে বর্তমানে রূপেন্দ্রনাথের সংসারে আশ্রয় নিয়েছেন। দুঃখের ছাত্রী তারাসুন্দরী। রূপেন্দ্র অপেক্ষা সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠা। জমিদার তারাপ্রসন্নের সহধর্মিণী। পিতৃদত্ত নাম তাঁর নিশ্চয় একটা ছিল, কেউ তা জানে না। জমিদারবাড়ির চিরকালের রেওয়াজ বিবাহহারাএই নববধূকে তার জীবনসঙ্গীর নামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। পিতৃদত্ত নামটা কনকাজলির থালায় তাকে পিতৃদেবকেই ফিরিয়ে দিতে হয়। যেমন তারাসুন্দরীর শাশুড়ি-মায়ের নাম ছিল ব্রজসুন্দরী। যেহেতু শ্বশুরের নাম ব্রজমোহন ভাদুড়ী।

তিন নম্বর ছাত্রীটি পুঁটুরানি। সেও বিধবা হবার পর বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। এঁরা তিনজনে শিখতেন বাংলাভাষা। বাংলা অক্ষর পরিচয়ের কোনও বই ছিল না। থাকবে কোথা থেকে? হরফ নির্মাণ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার—খাঁর গড়া হরফে প্রথম ছাপা বই প্রকাশিত হবে—তিনি তখনো জন্মাননি। বই ছিল না ঠিকই, তবে পুঁথি ছিল। ফলে বাংলা হরফও ছিল। খাগের কলমে লেখা ভাষাটাও ছিল। চর্যাপদের প্রাকৃত পৈঙ্গল নয়, আ-মরি বাংলা ভাষা। কৃতিবাসী রামায়ণ সহজ সরল বঙ্গভাষে। তার লিখিত রূপ ছিল পণ্ডিতবাক্তির স্মৃতিকোষে। রূপেন্দ্রনাথ সেই অক্ষরই পরিচয় করাতে উদ্যোগী। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপেন্দ্র তাঁদের মুখে মুখে শেখান কিছু ধর্মকথা।

ঐপনিষদের তত্ত্ব, পুরাণ আর মহাকাব্যের নানান কাহিনি। শুধু সতী-সীতা-সাবিত্রী নয়—গার্গী, মৈত্রেয়ী, মদালসা, বিশ্ববারার উপাখ্যান। সেই সঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের কথাও।

দ্বিতীয় পাঠের আসরে দুইজন ছাত্রী। প্রথম, ঘনশ্যাম সার্বভৌমের বিধবা, মালতী। বর্তমানে তিনি ত্রিবেণী ত্যাগ করে এসে বাস করছেন রূপেন্দ্রের ভদ্রাসনে। তাঁর স্বামী ছিলেন মহাজ্ঞানী, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন নিরক্ষর। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তিনি বাংলা পড়া শেষ করতে চান। দ্বিতীয়, শোভারানি। দুর্গা গাঙ্গুলীর অনুঢ়া কন্যা। কুলীন গ্রামাণের ঘরে জন্মানোর অপরাধে দেড় কুড়ি পাড়ি দিয়েও যে সিঁথিতে সিঁদুর লাগাতে পারেনি। তার পাঠে যে খুব কিছু মনোযোগ আছে তা মনে হয় না। দুর্গা গাঙ্গুলী বর্তমানে গ্রামে অনুপস্থিত কিন্তু পরিবারের সকলেই শোভারানির বিদ্যালোভের বিরুদ্ধে। মেয়েটা তবু রোজ আসে। চুপচাপ বসে কাপড়ের কথা শোনে। তাঁকে দেখে দুচোখ মেলে। তার মূল আকর্ষণ যে মা-সরস্বতী এমন মনে হয় না।

তৃতীয় পাঠের আসরে দুটি ছাত্রী এবং একজন ছাত্র। রূপমঞ্জরী আর শুভপ্রসন্ন। তারা শেখে বাংলা। পুটুরানির চার বছরের মেয়েটি এসে বসে থাকে চুপচাপ। তার এখনো অক্ষর পরিচয় হয়নি। বলা যায় নার্সারি ক্লাসের ছাত্রী। শুভপ্রসন্ন বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতও শিখতে শুরু করেছে। বয়সে সে রূপমঞ্জরীর চেয়ে বছর চার-পাঁচের বড়।

আর চতুর্থ পাঠের আসর বসে পড়ন্ত বেলায়। দামোদরের ওপার থেকে ছাত্রী আসে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে। মৌলবিসাব মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকার থেকে একটি বিচিত্র বৃত্তিলাভ করেছেন : রামায়ণের একটি বিশেষ ‘কাণ্ড’ ফার্সিতে অনুবাদ করে দেওয়ার দায়িত্ব। নবাব আলিবর্দির খেয়াল। হিন্দু-মুসলমান প্রজার মধ্যে সম্প্রীতি আনার প্রচেষ্টায় আলিবর্দি এ কাজে হাত দেন। রামায়ণ ফার্সিতে অনূদিত হবে আর কোরানসরিফ বাংলায়। মৌলবিসাবের মাতৃভাষা বাংলা। কৃতিবাস বা কাশীরাম দাস পঠিত হলে বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু অক্ষর পরিচয় নেই। মৌলবিসাবকে তো আর মহিলা বিদ্যায়তনে ভর্তি করা যায় না, তাই এই বিকল্প আয়োজন। মেহের বোরখা পরে এসে বসে পাঠশালা সংলগ্ন মেঠো দাওয়ায়। মৌলবি বসে থাকেন সাবেক আমগাছের ছায়ায়। ঋতিনীমার ভিতরেই। তাঁর আশা : বাংলা হরফ শিখে মেহের একদিন কৃতিবাসী রামায়ণ ওঁকে পড়ে শোনাতে পারবে। বোরখার নিচে মেহেরের মুখটি কখনো দেখেননি রূপেন্দ্রনাথ। তালাক পাওয়া এ হতভাগিনীর মুখখানি বিধাদমাখা কিনা জানা নেই। তবে তার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, তার মেদহীন দীর্ঘায়ত দেহে যৌবনের নানান উপচার।

গোল বাধল এই যবনীকে নিয়েই।



শনের দড়ি টানলে বাড়ে। হক কথা। কিন্তু সে বৃদ্ধির একটা শেষ সহ্যসীমা আছে। সেটা অতিক্রম করলে দড়ি ছিঁড়ে যায়। এই সহজ কথাটা মানতে রাজি নন একবগ্না-ঠাকুর। অষ্টাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি তিনি বিদ্যাসাগর-মশাই বা মদনমোহন তর্কালংকারকে ডিঙিয়ে একেবারে রোকেয়া সাকাওয়াৎ খাতুন বেগমসাহেবার জমানায় চলে আসতে চান। তা কি ‘ধম্মে সহিবে’? ‘বাউনের’ সাতপুরুষের ভিটেয় মেহেরউল্লোসা? যবনী!!

সামনাসামনি তর্ক করতে কেউ এগিয়ে এল না। কয়েকজন আচমকা অনুপস্থিত হতে শুরু করলেন। প্রথমে তারাসুন্দরী আর পুটুরানি। পরে শোভারানিও। তবে পাকাপাকিভাবে নয়। এভাবেই টালমাটাল কদিন চলল। তারপর পাকাপাকিভাবে নাম কাটাতে এলেন মৌলবিসাবই। সঙ্গে সেই বোরখা-ঢাকা বহিনজি।

মৌলবি এসে বললেন, ভাইসাব! আপনাকে লাখ লাখ শুক্রিয়া। लेकिन আমার বদনসিবে বাংলা শেখার সৌভাগ্য হল না। আমরা দু-ভাই বহিন্ এসেছি আপনার কাছে মাফি মাংতে আর বিদায় নিতে।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, কেন বড়ভাই, আমার কী কসুর ছিল?

—না, ভাইসাব কসুর আপনার নয়, কসুর আমার বদনসিবের। শুনুন বলি : দুর্ভাগ্যই বটে। মৌলবিসাব-এর তলব এসেছিল সদরের বড়া-ইমাম-এর কাছ থেকে। তিনি ডেকে নিয়ে ওঁকে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছেন। এ কী বেলেল্পাপনা! নিজের বহিনকে প্রতিদিন হাত ধরে এক কাফেরের বাড়িতে নিয়ে যাস! লজ্জা করে না! বেশরম কাঁহাকা! শুনেছি তোরা দুজন নাকি ওই পুতুলপুজোর মেওয়া-মেঠাই খাস! হক কথা?

মৌলবি বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলেন যে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে তিনি বাংলা ভাষাটা শিখতে চান। আর কোনও হেঁদু পণ্ডিত রাজি হয়নি। বলেন, আপনি যদি আদেশ করেন এখন থেকে ওবাড়ির জলম্পর্শ করব না। लेकिन বাংলা ভাষাটা আমাকে শিখতে হবেই।

—কেন রে? ওই কাফেরদের ভাষা শিখে কী হবে?

মৌলবি বলেননি যে, যে ভাষায় ওঁরা দুজন বর্তমানে কথা বলছেন সেটা উর্দু, ফারসি বা আরবি নয়। শুধু বলেছিলেন যে, তিনি নবাব সরকার থেকে বায়না নিয়ে বসে আছেন। একটি বাংলা পুঁথি ফারসিতে অনুবাদ করার জন্য।

কায়দা করে বইটার নাম উল্লেখ করেননি। বড়া-ইমাম ওঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আলিবর্দির সে খোয়াব-দেখা শেষ হয়েছে। বাংলা হরফে কোরানশরিফ রচনার ইবলিসি পরিকল্পনা, আর ফারসিতে ওই কাফেরদের কী-সব কিস্মা! আরও বললেন,

শায়ানা যেটা পেয়েছিস সেটা গায়েব করে দে। নবাবের মীর মুন্সির সঙ্গে আমার শান্তিৎ খতম হয়ে গেছে।

আলিবর্দি ততদিনে তাঁর বিবি এবং জামাতাদের ষড়যন্ত্রজাল বিদীর্ণ করতে সতাই শাস্ত হয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সে খোয়াব আঁতুড়ঘরেই মারা গেল।

দীর্ঘদেহী যুবতীটি কেনও কথা বলেনি। নীরবে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় নিয়েছিল। সেই প্রথম ভাঙন!

হারাধনের আঁটটি মেয়ের একটি কুপোকাত।

কাফের বাড়ি প্রসাদ পাওয়ায়। রইল বাকি সাত।



কিন্তু তারাসুন্দরী আর পুঁটুরানি আসে না কেন?

খোঁজ নিতে গেলেন জমিদার বাড়িতে। তারাপ্রসন্ন ওকে সমাদর করে বসালেন তাঁর বৈঠকখানায়। অভ্যর্থনায় ক্রটি হল না। আবক্ষ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে একটি দাসী ব্রাহ্মণের জন্য রেখে গেল কাঁসার থালায় কৃষ্ণগোবিন্দজির বৈকালি ভোগ আর বেলের পান্না।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, কদিন ধরে বউঠান আর পুঁটুরানি আমাদের বিদ্যায়তনে আসছেন না। তাই খবর নিতে এলাম। ওঁদের শরীর-গতিক ভালো তো?

—হ্যাঁ গো! শরীর-গতিক বেজুতের হলে তুমিই তো সবার আগে খবর পেতে, কিন্তু সেসব কথা পরে। প্রথমে মুখ হাত ধুয়ে প্রসাদটুকু সেবা কর দিকিনি।

সেসব পালা মিটলে রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, এবার বল তারাদা?

—শোন ভাই। তোমাকে খোলাখুলিই বলছি। শুভ তোমার বিদ্যাপীঠে যাবে, কিন্তু তোমার বৌঠান বা পুঁটুর পক্ষে আর তা সম্ভবপর নয়। মানে, তোমার ভদ্রাসনে তারা যাবে—একশোবার যাবে—কিন্তু ওই বিদ্যায়তনে তাদের পক্ষে আর পড়াশুনা করতে যাওয়া সম্ভবপর নয়।

—কেন তারাদা? ওই যবনী ছাত্রীটির জন্যই তো? শোন। তোমাকে সে-কথাই জানাতে এসেছি। মেহের আর কাল থেকে বিদ্যায়তনে আসবে না। তুমি যদি চাও তাহলে গাঙ্গুলীখুড়োর বাড়ি থেকে বিশুদ্ধ গঙ্গাজল এনে আমি ওই দাওয়াটা গোময় দিয়ে নতুন করে নিকিয়ে নেব। কিন্তু ওঁদের লেখাপড়া শেখাটা তুমি বন্ধ করে দিও না। এ আমার সনির্বন্ধ নিবেদন তারাদা।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

—না, রূপেন! এটাতে আমার কোনও হাত নেই। আমি নিতান্ত অপারগ। তোমার কাছে আমি মার্জনা চাইছি। স্ত্রীলোকের অক্ষর-পরিচয় হলে তারা 'ব্যাপিকা' হয়ে যাবে, এমন কুসংস্কার আমার নেই। আমার জননী স্বয়ং ছিলেন বাংলা ও সংস্কৃত দুটি ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিতা। তুমি জান। ফলে অমন একটা ভুল ধারণা আমার নাই।

—তাহলে বাধা কোথায়?

—দিনতিনেক আগে আমাদের কুলগুরু একটি পত্রে আমাকে আদেশ করেছেন এ জাতীয় ধর্মবিরুদ্ধ কাজ থেকে আমি যেন বিরত থাকি।

—ধর্মবিরুদ্ধ কাজ! জেঠিমা কি তাহলে....

—তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না, ভাই। কিন্তু আমার অবস্থাটাও বুঝে দেখ। তিনি আমাদের কুলপুরোহিত, কুলগুরু! তাঁর আদেশ আমি লঙ্ঘন করতে পারি না। তবে শুভ যাবে!

নতমস্তকে স্বগৃহে ফিরে এসেছিলেন রূপেন্দ্রনাথ।

হারাদানের সাতটি মেয়ের দুটি হল গত।

কুলগুরুর অমোঘ বিধান! রইল বাকি কত?



তার ঠিক পরেই সোএগ্রই গাঁয়ে হয়ে গেল এক ইন্দ্রপতন!

সেদিন সকালে হঠাৎ গাঙ্গুলীবাড়ির সেজ-তরফের বড়কর্তা কালিচরণ হস্তদত্ত হয়ে ছুটে এলেন গুঁর বাড়িতে। পিছন পিছন শোভারানি।

কালিচরণ হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, তুমি খবরটা পেয়েছ তো রূপেন?

—খবর? কী খবর? কার খবর?

—বড়দা যে কাল একপ্রহর রাতে তীর্থ থেকে ফিরে এয়েছেন। চৌদোলায় চেপে। পুরীর পাণ্ডাঠাকুরের এক ছড়িদারকে সঙ্গে করে। খুবই কাহিল। বোধহয় এ যাত্রা আর তাঁকে বাঁচানো যাবে না। পিত্তিপুরুষের ভিটেয় যে প্রাণটুকু নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন এটা আমাদের পুণ্যফল।

রূপেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে যান। কালিচরণের বড়দা মানে দুর্গা গাঙ্গুলী। তার মানে, সেই ক্রোদান্ত প্রসঙ্গটা আবার উঠে পড়বে। যে করুণ ইতিহাস উনি বুকের পাজরের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন দীর্ঘদিন। মীনুর বাবা অথবা মাকে মন খুলে বলতে পারেননি। এমন কি শোভারানিকেও নয়। দুর্গা গাঙ্গুলী ফিরে আসায় সেই খিতিয়ে যাওয়া নিস্তরঙ্গ হৃদে আবার জাগবে পঙ্কিল আলোড়ন। সোএগ্রই গাঁয়ের মানুষ হঠাৎ

উৎকর্ষ হয়ে উঠবে। খরজিহু নরনারী যাচাই করতে চাইবে গাঁয়ের মেয়েটা কোথায় গেল শেষ পর্যন্ত? শ্রীক্ষেত্রের কোন লালবাতিজ্বলা দেহব্যবসায়ীর চাকলায়? নাকি একবগ্নাঠাউর সতিই গাঙ্গুলীবুড়োর নাকের ডগা দিয়ে তার ডবকা বউটাকে নিয়ে সংযুক্ত-হরণ করেছিল? বুড়োটা তো সে কতাই বলেছিল। তাই নয়?

কালিচরণ বলেন, কাল রাতে আর তোমাতে বিরক্ত করিনি। কিন্তু উনি সারারাত যন্তুন্মায় কাতরেছেন। তা আজ বাপু তোমাকে একটিবার আসতেই হবে। বাঁচবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর যন্তুন্মাটা চোখ চেয়ে দেখা যায় না।

কথাগুলো রূপেন্দ্রের কর্ণগোচর হল কি না বোঝা গেল না। দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে তিনি নিশ্চল দাঁড়িয়েই রইলেন। কী ভাবছিলেন তিনি? মীনুর কোন কথাটা? বিষ প্রার্থনা? নাকি কোনার্ক তীর্থে আবির মাখানো? অথবা তার সেই বাঁধনছেঁড়া রাতের উন্মত্ত অভিসার? তৎক্ষণাৎ কে যেন ওঁর কর্ণমূলে হুক্কর দিয়ে উঠল : ক্যা রে বেটা, তু গঙ্গাপুত্র পিতামহ ভীষ্ম তো নহি হো?

—রূপোদা! —নারীকণ্ঠের সনির্বন্ধ আকৃতি।

—উঁ?—সম্মিত ফিরে পেলেন শোভারানির ডাকে।

—বাবাকে দেখতে একটিবার আসবেন না?

ম্লান হাসলেন ভেষগাচার্য। বললেন, না শোভা। তোমার বাবার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের কোনও স্পৃহা আমার নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কালিচরণের। অস্ফুটে যেন আপন মনেই বলে ওঠেন, এমন একটা আশংকা আমার ছিলই। সেকথাও ওঁর কানে গেল না বোধহয়। একই নিশ্বাসে বলে ওঠেন, তবে আর্তরুগীর চিকিৎসায় আমাকে যেতে হবে বইকি। চল—



উনি শুধু একাই খবরটা পাননি। দুর্গা গাঙ্গুলী যে শ্রীক্ষেত্র থেকে সশরীরে ফিরে এসেছেন, তিনি যে মৃত্যুশয্যায়া শায়িত এ সংবাদটা সোঞাই গাঁয়ে আর কারো জানতে বাকি নেই। কালিচরণ আর শোভারানি যখন ও বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল তার অনেক আগেই সারা গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসেছে। কিছু নিকট-আত্মীয়, ওঁর সম্পত্তির ওয়ারিশানরা, আর অধিকাংশই প্রজা, খাতক অথবা গঙ্গাজল সরবরাহ কারবারের কর্মী। এসেছেন গাঁয়ের মাতব্বরেরাও—নন্দ চাটুজ্জ, শিরোমণি মশাই, চক্কোত্তি অথবা ঘোষাল খুড়ো। একটু দূরে বসে আছেন দুর্গা গাঙ্গুলীর পূজাপাদ স্বশুরমশাই—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়। মীনু নেই, তা হোক, বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ জামাতা বাবাজীবন আজ মৃত্যুশয্যায়া

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

একথা শুনে তিনিও এসে হাজির হয়েছেন, সস্ত্রীক। মীনুর-মা ঘরের অপরপ্রান্তে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছেন একগলা ঘোমটা টেনে। এ বাড়ির পুরললনাদের ভিড়ে।

কোনওদিকে দৃকপাত না করে ভেষগাচার্য কালিখুড়োর অনুগমন করে এগিয়ে গেলেন রোগীর দিকে। প্রকাণ্ড বড় ঘরটি। কর্তামশায়ের শয়নকক্ষ। বিরাট পালঙ্ক। সাবেককালের কারুকার্যখচিত দ্বৈতশয্যা। চিত হয়ে নিমীলিতনেত্রী গুয়ে আছেন গৃহস্থানী। একেবারে কঙ্কালসার। মুণ্ডিতমস্তকে বিরলকেশ-অর্কফলা। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। শিয়রের কাছে কে-এক অবগুষ্ঠনবতী একটি তলিপত্রের পাখায় বীজন করে চলেছেন। রোগীর ললাটে একটি সিন্ধুবন্ধ। মাঝে মাঝে সেটিকে ভিজিয়ে কপালে পত্টি দিচ্ছেন। তিনি বড় খুড়িয়া না ছোট, তা রূপেন্দ্রের আন্দাজ হল না। কক্ষটি বিরাট, তবু আগন্তুকের ভিড়ে তা 'উপচীলমান'। রূপেন্দ্রনাথ বললেন, রোগীর ঘরে এত ভিড় কেন? ঘরটা ফাঁকা করে দিন। ওকে নিশ্বাস নিতে দিন।

মহড়া নিতে এগিয়ে এলেন নন্দখুড়ো। ঠিক কথা। এত ভিড় কীসের? অঁয়া? এ কি রথ, না দোলমঞ্চ? যাও, তোমরা সব বাইরে যাও।

সুড়সুড় করে অনেকেই চলে গেলেন। ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল। গ্রামের মাতব্বর কজনই রইলেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। নন্দ আবার তাঁর গদি-মোড়া কেদারায় উপবেশন করে থেলো কড়িবাঁধা বামুন-হুঁকায় তাম্বকুট সেবন করতে থাকেন।

রূপেন্দ্র এগিয়ে এসে রোগীর জ্বর তাপ লক্ষ্য করলেন। না, দেহের উত্তাপ অধিক নয়। অবগুষ্ঠনবতীকে—বড় অথবা ছোট খুড়িকে—বললেন, আর জলপাটি দিতে হবে না, মা। তবে পাখার হাওয়াটা চলবে।

রোগী নিমীলিতনেত্রী। পাঁজরসর্বস্ব বক্ষদেশ ওঠাপড়া করছে নিশ্বাসের তালে-তালে। জ্ঞান আছে কিনা বোঝা গেল না। হয়তো অজ্ঞানেই কাতরাচ্ছেন বৃদ্ধ।

রূপেন্দ্র ওঁর বলিরেখাক্ষিত শীর্ণ হাতটি নিজ মুষ্টিতে তুলে নিয়ে বলেন, কী খুড়ো, আমাকে চিনতে পারেন?

বৃদ্ধের নিমীলিত কোটরগত চোখ দুটি খুলে গেল। ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে প্রশ্নকর্তার দিকে দৃকপাত করলেন। বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল ক্ষীণ কণ্ঠস্বর : একবন্ধা।

—এই তো চিনতে পেরেছেন। তাহলে আর ভয় কি? বলুন, কী কষ্ট হচ্ছে? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

—পেটে। না, না বুকে!

—পেটে না বুকে?

—ঠিক মধ্যখানে।

রূপেন্দ্রনাথ ওঁর নাড়ির গতি লক্ষ্য করতে থাকেন। নিমীলিতনেত্রী। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম একাগ্র করে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ওই শয্যালীন বৃদ্ধের শারীরিক বৈকল্যবার্তা। সবাই স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। শুধু মাঝে মাঝে কী একটা 'গুড়ুক গুড়ুক' শব্দ! ভেষগাচার্যর তন্ময়তা ভঙ্গ হল। কালিচরণের দিকে ফিরে বললেন,

সেজখুড়ো, যাঁরা হুঁকো খাচ্ছেন তাঁদেরও ঘরের বাইরে যেতে বলুন। শব্দে আমার অসুবিধা হচ্ছে।

নন্দখুড়ো শশব্যস্তে একজন খিদমদগারের হাতে থেলোহুঁকোটা বাড়িয়ে ধরেন। ঘনিয়ে আসে পক্ষিপালকপতন নৈঃশব্দ্য। দীর্ঘকাল নাড়ি দেখার পর ধ্যানভঙ্গ হল। রোগীকে বললেন, জিবটা বার করুন তো।

দেখলেন। জিহ্বা, চোখের কোল, বুকের স্পন্দন। উদরে কয়েকটি টোকা মেরে কী যেন বুঝে নিতে চাইলেন। তারপর প্রশ্ন করেন, যন্ত্রণাটা ঠিক কোথায় হচ্ছে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিন তো।

শীর্ণ তর্জনী সংকেতে বৃদ্ধ দেখিয়ে দিলেন বক্ষপঞ্জর ও উদরের মিলনস্থলটি।

রূপেন্দ্র তাঁর পুলিন্দা হাতড়ে বার করে আনলেন একটি কষ্টিপাথরের খলনুড়ি। কী একটি ভেষ্যচূর্ণ তাতে রেখে মধু সহযোগে পিষ্ট করলেন। ব্রক্ষণটি বিনুকের চামচে নিয়ে স্পর্শ করালেন রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে। বললেন, এটা লেহন করুন।

বৃদ্ধ বিনা বাক্যব্যয়ে চেটে চেটে ওষুধটা খেয়ে নিলেন।

রূপেন্দ্রনাথ ব্যজনকারিণীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, পথ্য কী পড়েছে? এখানে আসার পর? কাল রাত থেকে কী খেয়েছেন?

অবগুণ্ঠনবতীর পাণ্ডাসঞ্চালন বন্ধ হল। পরিবর্তে গুরু হল শিরঃসঞ্চালন।

—কী বলতে চাইছেন, খুড়িমা? ‘আপনি জানেন না’, নাকি, ‘কিছু খাননি’?

কালিচরণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, ও...ইয়ে...তোমার খুড়ি নয়, ও হল গিয়ে মোক্ষদা।

সর্বসমক্ষে তার নামটা ঘোষিত হওয়ায় দাসীটি বোধহয় লজ্জা পেল। তালপাখাটা পালঙ্কে নামিয়ে রেখে দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে মিলিয়ে গেল।

রূপেন্দ্র জানতে চান, খুড়িমাদের দেখছি না কেন? তাঁদের কাউকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

শোভারানি চোখে আঁচল দিল। ঘরে এক অস্বাভাবিকর নীরবতা। আত্মীয়েরা পরস্পরের দিকে তাকায়। কালিচরণ অশ্রুটে বলেন, মানে...ইয়ে...বড়দা কাল রাতে একাই এয়েছেন। বৌঠানরা কেউ আসেননি।

—মানে? উনি এই অসুস্থ শরীরে একাই...

—না, না। একা নয়! পুরীর পাণ্ডাজির একজন ছড়িদার ছিল সঙ্গে। নৌকা থেকে চৌদোলা চেপেই এয়েছেন।

—তা তো বুঝলাম। উনি তো চতুর্দোলায় চেপে এলেন। তাহলে খুড়িমারা কোথায়? শ্রীক্ষেত্রে?

কালিচরণ নিঃশব্দে দুদিকে মাথা নাড়লেন।

রূপেন্দ্রনাথ বুঁকে পড়েন রোগীর দিকে।

—আপনি অন্তত কিছু বলুন? খুড়িমারা দুজন...?

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

কোথাও কিছু নেই ডুগারে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ। সেই সঙ্গে শুরু হল হিঙ্কা! শোভারানি ঝুঁকে পড়ে বাবার পাঁজর বার-করা বুকে হাত বুলাতে থাকে। রূপেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হননি। অপেক্ষা করেন। বৃদ্ধ হিঙ্কার ধকলটা সামলে নিয়ে বলেন, আমার সন্ধানশ হয়ে গেছে, রূপেন! সতীলক্ষ্মী দুজনই দ্যাখ-না-দ্যাখ ড্যাংডেঙিয়ে সগো চলে গেল। এই অভাগা বুড়োটোর দিকে ফিরেও চাইল না একবার!

—স্বর্গে গেছেন? দুজনই? কবে? কোথায়?

—ওই হিরিক্কেট্রেই। স্বগোদ্বারে দাহ করতে হল। আমিই দুজনের মুখাণ্ডি করেছি।

রূপেন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন। ওঁর ইচ্ছে করছিল ওই শায়িত মৃত্যুপথযাত্রীকে ধরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি দিতে। কিন্তু কিছুই করলেন না তিনি। এমনকি জানতেও চাইলেন না মৃত্যুর হেতু। কী লাভ? সেই পক্ষিল মৃত ইতিহাস ঘেঁটে? হয়তো ক্ষেত্রজ সন্তান প্রসব করতে গিয়ে। কিংবা এই বাধ্যতামূলক পরপুরুষভজনার অপমান সহিতে না পেরে মীনুর মতো উদ্বন্ধনে। অথবা উপযুপরি বলাৎকারের যন্ত্রণা সহিতে না পেরে রক্তাক্ত মৃত্যুবরণ করেছিলেন খুড়িমা!।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। বললেন, আমার প্রাণের জবাবটা কিন্তু মূলতুবি আছে। কাল এবাড়ি আসার পর রাত থেকে এখন পর্যন্ত কী খেয়েছেন উনি?

শোভা এতক্ষণে সামলেছে। বললে, ঢোক গিলতে পারছেন না ভালো করে। কিছুই খেতে চাইছেন না। আমি জোর করে আধবাটি দুধ খাইয়েছি। আর গঙ্গাজল। বারে বারে।

রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। দুর্গাখুড়ো তৎক্ষণাৎ চেপে ধরেন ওঁর হাতটা। বলে ওঠেন, রূপো! আমি বাঁচব তো?

ওষুধটা ধরেছে। কণ্ঠস্বর আর মিনমিনে নয়! আশ্চর্য! বেঁচে থাকার কী উদগ্র বাসনা! তীব্র যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রশ্ন : বাঁচব তো? আবার এই দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর রসাস্বাদন করতে পারব তো? অর্থের বিনিময়ে?

—কী হল রূপো? কতা কইছ না কেন? এ যাত্রায় বাঁচব তো?

রূপেন্দ্র বললেন, কবিরাজ যন্ত্রণার উপশমের চেষ্টাই করতে পারে, মরা-বাঁচায় কি মানুষের হাত আছে?

—আছে, রূপো, আছে। মানুষের নেই। ধম্বস্তরির আছে। বোঠেনকে তুমিই তো...

—বোঠান! কে বোঠান?

নন্দ আগবাড়িয়ে শাকুরভাষ্য দাখিল করেন, উনি ভাদুড়ীবাড়ির গিল্লীমার কথা বলছেন।

—ও! না খুড়ো। আমি তাঁকে বাঁচাইনি। খুড়িমা পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন নিজের সুকৃতিতে, নিজের পুণ্যে! নিজের ধর্মে!

—ধম্ম! তা বাবা, আম্মো তো ধম্মকম্ম কিছু কম করিনি। বল? এই তো ক'মাস আগে ২জগন্নাথদেবের সোনার মুটুক গড়িয়ে দে'-এলাম।

—তবে আর চিন্তা কী? আপনিও পুনর্জন্ম লাভ করবেন! কিন্তু এবার আমি উঠব খুড়ো! আরোগ্য-নিকেতনে যেতে হবে!

কালিচরণের দিকে ফিরে বলেন, ওখানে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। ওষুধ আর নিদেন লিখে দেব। ওষুধটা তাড়াতাড়ি পড়া দরকার।

দুর্গা হয়তো বুঝলেন। এবার কালিচরণের দিকে ফিরে বলেন, আমার বালিশের নিচে সাতটা মোহর আছে। একটি একবন্ধাকে দাও। বৈদ্যবিদায়।

রূপেন্দ্র প্রবল আপত্তি জানালেন, না। আমাকে মার্জনা করবেন। বৈদ্যবিদায় আমি গ্রহণ করব না!

সকলেই স্তম্ভিত। কালিচরণ বলেন, কিন্তু বৈদ্যবিদায় না দিলে যে, বড়দার...

—আমি মার্জনা চাইছি!

শিরোমণি-মশাই এবার মহড়া নিলেন, এটা যে তোমার অন্যায্য আবদার হয়ে যাচ্ছে রূপেন। তুমি বৈদ্যবিদায় গ্রহণ না করলে যে ওঁর জীবাত্মা মুক্তি পাবে না। এটাই শাস্ত্রের বিধান!

রূপেন্দ্রনাথ একে একে ঘরের প্রতিটি উদগ্রীব মানুষকে একনজর দেখে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ তাই! কপর্দকমাত্র বৈদ্যবিদায় না নিলে ওঁর নরকযন্ত্রণা অনিবার্য! আপনাদের শাস্ত্রে নাকি তাই লেখা আছে!

—আমাদের শাস্ত্র? তোমার নয়?

রূপেন্দ্র সে কথার প্রত্যুত্তর না করে অন্য কথা বললেন, ঠিক আছে! খুড়োকে নরকযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিতে আমি বৈদ্যবিদায় গ্রহণ করতে পারি; কিন্তু একটি শর্তসাপেক্ষে।

মরা পাবনা মাছের মতো দুটি চোখ মেলে দুর্গা গাঙ্গুলী শুধু তাকিয়েই রইলেন। জানতে চাইলেন না, শর্তটা কী?

কালিচরণের সে হিম্মত হল না।

এতক্ষণে সরব হলেন নন্দখুড়ো। হাজার হোক, তিনি সমাজের মাথা। সবাই যখন হেঁটমুণ্ড তখন তাঁরই এগিয়ে আসার কথা। তিনি এবার প্রতিপ্রশ্ন করেন, তোমার শর্তটা কী, বাবা?

স্পষ্টভাবে রূপেন্দ্র বললেন, দুর্গা খুড়ো একদিন এক সতীসাক্ষী রমণীর মাথায় সজ্ঞানে একরাশ মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন...

বাধা দিয়ে শিরোমণি-মশাই বলে ওঠেন, কার কথা বলছ রূপেন? কী মিথ্যা কলঙ্ক?

রূপেন্দ্র তাঁর দিকে ফিরে বলেন, আপনার স্মরণশক্তি তো এত দুর্বল নয় শিরোমণি-খুড়ো। মনে নেই, পঞ্চায়েতের ডাকে নন্দখুড়ো কী নালিশ করেছিলেন?—আপনিও তো তাতে সায় দিয়েছিলেন। বাচস্পতিমশায়ের বিধানে সেদিন সেটা মূলভূমি রাখা হয়েছিল, মনে পড়ে না?

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

রূপেন্দ্র থামলেন। কেউ কোনও কথা বলে না।

—কী হল? কারও স্বরণ হচ্ছে না? সেই যে দুর্গা-খুড়োর নাকের ডগা দিয়ে কোন এক ব্যভিচারী অশ্বপুষ্ঠে সংযুক্ত-হরণ করেছিল? দুর্গা-খুড়ো ফিরে আসার প্রত্যাশায় সে-বিচারটা মূলতুবি রাখা আছে। তা আজ উনি ফিরেছেন। মনে পড়ছে এবার? সেই প্রসঙ্গেই বলছি : দুর্গা-খুড়ো যদি আজ গাঁয়ের পঞ্চজনার সমুখে স্বীকার করেন যে, অত্যাচার সইতে না পেরে মীনু গলায় দড়ি দিয়েছিল, আর উনি নিজেই তার মুখাঙ্গি করেছিলেন, তাহলেই আমি প্রথামতো বৈদ্যবিদায় নিতে স্বীকৃত!

হঠাৎ ও-পাশ থেকে ভেসে এল একটা চাপা ক্রন্দনের শব্দ।

রূপেন্দ্রনাথ সেদিকে ফিরলেন। মীনুর মা। দু-চোখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত আর্তিতে ভেঙে পড়েছেন। শোভারানি-ছুটে গেল সেদিকে। জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

মরা পাবদা মাছটার জ্ঞান ফিরে এসেছে। একদাগ ওষুধেই কাজ হয়েছে। তিনি বললেন, নন্দভায়া, এটু এদিকে সরে এস তো?

নন্দ তাঁর কাছে এগিয়ে আসতেই মৃত্যুপথযাত্রী তাঁর হাতটা টেনে নিয়ে স্বীকারোক্তি করেন, তোমার কাছে স্বীকার যাচ্ছি, নন্দ। রূপো বাঁড়ুজ্জে যা বলছে তা হক কথা! সেটাই নিঃজলা সত্যি! সেবার আমি তোমারে মিছে কথা কয়েছিলাম। মীনুটা গলায় দড়ি দিয়েই মরেছিল! আমাদের মাপ করে দাও ভাই। ওই একবগ্নাটা বৈদ্যবিদায় না-নিলে আমার নরকদর্শন অনিবাধ্য।

নন্দ নড়েচড়ে বলে ওঠেন, আমি তোমারে মাপ করার কে? মাপ যদি চাইতেই হয় তবে মীনুর বাপের কাছে চাও। পীতুর কাছে....

পীতাম্বর তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। রূপেন্দ্রনাথকে কী যেন বলতে গেলেন। পারলেন না। উদ্ভাত অশ্রুর আবেগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি এগিয়ে গেলেন—ভিড় ঠেলে একেবারে ঘরের বাইরে।

কালিচরণ যন্ত্রচালিতের মতো তাঁর বড়দার বালিশের তলা থেকে কী একটা বার করে আনার উপক্রম করতেই রূপেন্দ্র তাঁর হাত চেপে ধরেন : না!

—না? কিন্তু তুমি যে বললে...

—হ্যাঁ, শর্ত আমি পালন করব। খুড়োকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে দেব না। তা বলে ওইটা নয়। শোভারানি! একটু এদিকে এগিয়ে এস তো। বৈদ্যবিদায়ের ফর্দটা তোমার হাতেই ধরিয়ে দেব।

শোভারানির হাতখানি ধরে তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মীনুর মা তখন অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন।



একপ্রহর পরের কথা। সূর্য এখন প্রায় মধ্যগগনে। শল্যচিকিৎসাগার থেকে বার হয়ে এলেন রূপেন্দ্রনাথ। প্রসব নির্বিঘ্নে হয়েছে। পুত্রসন্তান।

এই শল্যচিকিৎসাগারটি আরোগ্য-নিকেতনে নতুন সংযোজন। আদিকালে এটি ছিল না। রূপেন্দ্র যখন তাঁর তরুণী ভার্যাকে নিয়ে স্বীয়দর্শন করতে যান তার পরে এটি নির্মিত হয়েছে। অস্ত্রোপচার বা প্রসব করানোর সময় এ কক্ষটি ইদানীং ব্যবহার করা হয়। একবগ্না-দিঘির জলের সঙ্গে প্রচুর নিমপাতা মিশিয়ে সেই জলে সে ঘরের মেঝে দিনে দুবার মার্জনা করা হয়। এটি নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেছেন তারাশ্রম এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এটি নির্মাণ করিয়েছে গুঁর শিষ্য জীবন দত্ত।

রূপেন্দ্র আরোগ্য নিকেতনের উদ্যানে একটি আমগাছের নিচে বাঁধানো চাতালে গিয়ে বসলেন। বৈশাখের শেষ। আমগাছে মুকুল এসেছে। আমমুকুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত। জীবন বোধহয় এখনো ভিতরে ব্যস্ত। রূপেন্দ্র উত্তরীয়টি খুলে পাশে রাখলেন। চরাচর নিস্তব্ধ। নিদাঘ দ্বিপ্রহরে ঘুমপাড়ানো ঘুমুর একটানা শব্দ। দু-তিনটি শালিক কী নিয়ে যেন ঝগড়া করছে। আকাশ থমকে আছে। হাওয়া নেই একেবারে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। দূরে কোন মন্দির থেকে ভেসে আসছে কাংসধ্বনি। বোধকরি মধ্যাহ্ন ভোগ শুরু হল।

রূপেন্দ্রের মনটা আজ খুশিয়াল। এইমাত্র যে প্রসূতিটি পুত্রসন্তান লাভ করল সে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক সম্পন্ন ঘরের বধু। এতদিন এরা সন্তানবতী হত কাঁচা আঁতুড়ঘরে। আনাড়ি দাইয়ের মাধ্যমে। শিশুমৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত বেশি। সূতিকারও ছিল প্রাবল্য। বহুস্তরির আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ইদানীং দু-একটি সন্তানুঘরের সন্তানবতী পালকি চেপে এখানে মা হতে আসে। অবিকাংশ ক্ষেত্রে প্রসব করায় শিক্ষিতা ধাত্রী। তারা জমিদার-মশায়ের কাছ থেকে বৃত্তি পায়। তাছাড়া রোগীর বাড়ি থেকেও 'সিধা' পায়। কোনও কোনও জটিল ক্ষেত্রে রূপেন্দ্রনাথ স্বয়ংও প্রসব করান। যেমন আজ। হয়তো একদিন পালকি চেপে আসবে তাঁর আদরের শ্যালিকা তুলসী। সে কথা দিয়ে রেখেছে।

একটু পরে সদ্যজননীর স্বামী ও আত্মীয়রা গুঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, প্রণাম করে গেল। রূপেন্দ্র বললেন, মা-ছেলে দুজনেই ভালো আছে। চিন্তার কিছু নেই। পাঁচদিনের মাথায় পালকি পাঠিয়ে দেবেন।

কপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

—না বাবা! ছয়-ষেটো সেরেই নিয়ে যাব, সাতদিনের মাথায়।—প্রসূতির শাওড়ি বললেন।

—বেশ তাই হবে। সেক্ষেত্রে উমাকে আমরা অন্য একটি ঘরে রাখব। কারণ ইতিমধ্যে শল্যচিকিৎসাগারটির প্রয়োজন হতে পারে।

সদাপিতা হাত দুটি জোড় করে বললে, খোকার অন্নপ্রাশনে কিন্তু আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে ঠাকুরমশাই।

—বেশ তো। যাব। সবাক্ষব নিমন্ত্রণ তো? জীবনকেও নিয়ে যাব তো?

—নিশ্চয়ই। তাঁকেও আমি পৃথক নিমন্ত্রণ করে যাব।

ওরা চলে যাবার পর আবার নিদ্রা মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। ঘুঘুপাখিটা কোথায় উড়ে গেছে। এবার তার বদলে গুরু হয়েছে কুবোপাখির একটানা কুক কুক-কুক-কুক।

অনেক অনেকদিন পরে মনটা আজ খুশিয়াল। ওঁর বালাসঙ্গিনীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। সারা গায়ে আজ ঘরে ঘরে তার নামটা উচ্চারিত হবে। মীনু মেয়েটা কলঙ্কিনী ছিল না!

একটু পরে জীবন এসে বসল ওঁর পায়ের কাছে। কিছুতেই চাতালে উঠে বসতে রাজি হল না। একটু অনুযোগও করল, আজকাল আর আপনি আরোগ্য নিকেতনের দিকে ঠিকমতো নজর দিচ্ছেন না গুরুদেব। আপনার সারা মনটা দখল করে আছে ওই মহিলা বিদ্যালয়।

মনটা খুশি খুশি। তাই শিষ্যকে রসিকতা করে বলে বসেন, সেটাই যে হয় জীবন। রাজা মশাইদের দেখনি? বড়রানি হয়ে যায় দুয়োরানি আর নতুন রানি সুয়োরানি।

জীবন লজ্জা পেল। বললে, আজে না, সেকথা বলিনি। তবে...

—ওই 'তবে'টাই যে বড় বিধে জীবন। আমার মহিলা বিদ্যালয়ে ছিল আট জন। এখন সেটা কমে গিয়ে হল পাঁচ। নতুন ছাত্রী জোগাড়ই হচ্ছে না। অথচ এটাই যে আমার জীবনের ব্রত।

—কিন্তু আমার সমস্যাটা? আমার আরোগ্য-নিকেতনে একজন মহিলা চিকিৎসক না হলে ...মানে, অনেক পরিবারে...

—জানি জীবন! মহিলা চিকিৎসক জোগাড় করার আগে আমাকে তো কিছু 'শিক্ষিতা মহিলা' তৈরি করতে হবে? তবে তুমি কিছু চিন্তা কর না। আর বছর-দশেক পরেই মঞ্জরী সে দায়িত্বটা নিতে পারবে। সংস্কৃতটা একটু রপ্ত হলেই ওকে আয়ুর্বেদ শেখাব আমি। শুধু আমি একা কেন? তুমিও শেখাবে তাকে।

ঠিক তখনই আরোগ্য-নিকেতনের কক্ষ-বেড়ার টাটি খুলে এগিয়ে আসতে থাকে একজন চাবাভুষো গোছের মানুষ। আদুল গা, আ-হাঁটু খেটো খুতি। অল্প বয়স। ওই জীবনেরই বয়সি। তার হাতে একটি পুঁটলি।

রূপেন্দ্রনাথ কৌতুক করে বলেন, ওর হাতে পুঁটুলিতে কী আছে বলতে পার?

—তা কেমন করে বলব? আমি তো গণৎকার নই!

—আমি পারি। শোন! ওর পুঁটুলিতে আছে একমুঠি আতপ তণ্ডুল, একটা বস্ত্রখণ্ডে একমুঠি কাঁচামুগের ডাইল, একটা কাঁচকলা, একটা পান পাতা, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচটা পাতাসা আর পাঁচটা কড়ি!

লোকটা ততক্ষণে ঝোলা নামিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে ফেলেছে। সে কিছু বলার আগেই রূপেন্দ্রনাথ বলেন, তুমি চুপ করে বসে থাক। বুঝেছি! দেখ তো জীবন—ঠিক ঠিক মিলেছে কিনা।

জীবন দত্ত একেবারে আকাশ থেকে পড়ে। রূপেন্দ্র বললেন, এটা আমার বৈদ্যবিদায়। বলেছিলাম এখানে পৌঁছে দিতে। আরও বলেছিলাম যে, ফর্দর বাইরে কোনও কিছু থাকলে আমি সবকিছু ফেরত দেব। কী নাম গো তোমার?

শেষ প্রশ্নটা আগন্তুককে। লোকটা বলে, এজ্ঞে মোরা জাতে তাঁতি—মোর নামটো লবা গুঁই এজ্ঞে।

—আবার বলে ‘লবা’! সেদিন বলে দিলাম না, তোমার নাম ‘লবা’ নয় ‘নবা’। ভালো নাম নবীন গুঁই, বুঝলে? এত বোকা কেন তুমি?

লোকটা প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে বলে, এজ্ঞে না, বোকা হই, মুখু হই, মোর নামটো ‘লবা’ আজ্ঞে।

তারপর জীবন দত্তের দিকে ফিরে বলে, আপনে বলেন তো ঠাউর, মোর নামটো মুই জানবনি? পণ্ডিতে আস্যে বিধান দিলি জানতি পারব?

রূপেন্দ্রনাথ অটুহাস্য করে ওঠেন। বলেন, একে চিনে রাখ জীবন। এ হচ্ছে সোএগই গ্রামের ‘দু-নম্বর একবন্ধা’!

তারপর বললেন, তোমাকে এবার একটা কাজ করতে হবে জীবন। পূবপাড়ার কালীমন্দিরের পশ্চিম পাশে বটগাছের নিচে একজন খঞ্জ সন্ন্যাসী থাকেন, দেখেছ?

—আপনি কি একমুঠি বাবার কথা বলছেন? যিনি দিনে একবার মাত্র ভিক্ষা নেন। সঞ্চয় যাঁর ধাতে নেই। তাঁকে কে না চেনে সোএগই গাঁয়ে!

—হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। তাঁকে ওই ‘সিধাটা’ পৌঁছে দেবে। আজ এক রোগিবাড়ি গিয়েছিলাম। তারই ‘বৈদ্যবিদায়’। কিন্তু ওগুলো আমি বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না, জীবন।

—বৈদ্যবিদায়! পাঁচ কড়ি? আপনার?

—হ্যাঁ। হাত পেতে নিতে হল। না হলে মৃত্যুপথযাত্রী ধনকুবেরের নরকদর্শন নাকি অনিবার্য! কী করব বল?



‘আজ সকালে আর ফল-টল কাটিনি রে রূপো। মীনুর মা তোর নাম করে একবাটি পরমাম পাঠিয়ে দিয়েছে। সেটাই সেবা কর।’

এটা ওঁর প্রাতরাশের সময়। অশ্বারোহণে কৃষি দেখতে যাবার আগে কিছু কাটা-ফল আহার করেন। পূজার নৈবেদ্য। আজ তার ব্যতিক্রম হল। গিরিপিসিমার ভ্রাতৃবধূ, মানে মীনুর মা, তাঁর নাম করে একবাটি পরমাম পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর কীভাবেই বা কৃতজ্ঞতা জানাতে পারতেন খুড়িমা? ভেষগাচার্য যে ওঁর এত বছরের দমবন্ধ করা রুদ্ধ কান্নাটা কাঁদবার সুযোগ করে দিলেন একদাগ ওষুধে।

এ পরমাম তাই বৈদ্যবিদায়।

উঠানের ওপাশে রান্নাঘর থেকে ভেসে এল মালতীর কণ্ঠস্বর। ‘এটু অপেক্ষা করুন, ঠাকুরপো। মামণি আপনার জন্যে একটা জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। প্রসাদী পরমামটা তাই দিয়ে সেবা করবেন।’

‘প্রসাদী পরমাম’! তার মানে মীনুর মা কোনও মন্দিরে গিয়ে পূজোও দিয়েছেন। দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। তা না হবে কেন? দেবতার কী অসীম করুণা! ওঁর একমাত্র কন্যাটিকে তরুণী বয়সেই উদ্বন্ধনে মৃত্যুর সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। উনি মনে-মনে ভাবছিলেন, ঞেোনোভাবে মীনুর বাবা-মাকে জানিয়ে দিতে হবে যে, পুত্রোপ্তি-যজ্ঞে তাঁদের আদরের মেয়েটির চরম সর্বনাশের আগেই সে হতভাগি বৈকুণ্ঠলোকে যাত্রা করতে পেরেছিল। কিন্তু কার মাধ্যমে, কীভাবে এটা জানানো যায়? গিরিপিসিমা বা বৌঠান নয়, শোভারানির কাছেও ওঁর সংকোচ হবে। সবচেয়ে ভালো হয় তারাদার সাহায্যে তারা-বৌঠানের মাধ্যমে মীনুর মাকে জানানো।

একটু পরে মালতী এল। সঙ্গে রূপমঞ্জরী। মালতীর হাতে দুটি কাঁসার থালায় ঘৃতপক্ক একটি বিচিত্র খাদ্য। দুজনের সামনে দুটি থালা নামিয়ে দিল। রূপমঞ্জরী তার মাসিকে বলে, না, না, ওই থালাটা বাবার, এটা আমার।

রূপমঞ্জরীর লক্ষ্য হল দুটি পাত্রেই একই মাপের দুটি করে ঘৃতপক্ক আহাৰ্য রয়েছে, তাদের মাপও প্রায় একরকম। তাই মেয়েকে প্রশ্ন করেন, কেন রে মামণি? চারটে লোচিকাই তো সমান মাপের।

—বা রে! ও দুটো যে আমি ভেজেছি। খুন্তি নেড়ে নেড়ে। তোমার জন্য।

মালতী বলে, ভেবেছিলাম আপনাকে অবাক করে দেব। তা আর হল না। আপনি তো এর নাম জানেন—‘লোচিকা’।

—হ্যাঁ বৌঠান! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদে এটি আশ্বাদন করেছি। কিন্তু কী-ভাবে এগুলি নির্মাণ করা যায় তা জানি না। জীবনে এই দ্বিতীয়বার এর স্বাদ পাব আজ।

মালতী পাখা-হাতে সামনে বসে পরেছে ততক্ষণে। বললে, এর উপাদান তিনটি—গোধূমচূর্ণ, গব্যঘৃত আর জল। তবে বানানোর কায়দা আছে। কারণ এগুলি প্রথমে ‘বেলতে’ হয়—বেলুনি আর চক্রতির সাহায্যে। কায়দাটা আমি শিখে নিয়েছিলাম আমার মামাশ্বশুরের বাড়ি। এক মচ্ছোবে বড়ঠাকুর এগুলি ভাজছিল।

রূপেন্দ্র ইষ্ট স্মরণ করে ততক্ষণে পরমায়ের বাটিতে লুচি ডুবিয়ে চর্বণ শুরু করেছেন। চোখবুজ্জেই আশ্বাদন করতে করতে বললেন, কথাটা ‘মচ্ছোব’ নয় বৌঠান, ‘মহোৎসব’।

মালতী বলে, সে যাই হোক, স্বাদ কেমন লাগল তাই বলুন।

—স্বাদ তো অপূর্ব! পরমায়ের সঙ্গে লোচিকা। সে তো মর্ত্যের অমৃত। কিন্তু আপনার আর পিসিমার জন্যে আরও আছে তো?

—প্রচুর। আপনারদেও আবার দেব। গরম-গরম খেতে হয়। দাঁড়ান, আরও কিছু ভেজে আনি।

—দাঁড়াব?

—না, না, মানে বসুন। অপেক্ষা করুন। আপনার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি। আমি আসছি।

একটু পরেই একটা ‘বোগনো’তে আরও খান-ছয়েক লোচিকা নিয়ে ফিরে এল মালতী। দুজনের পাতেই দিল নতুন করে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, তা আপনি এ বাড়িতে বেলুনি আর চক্রতি পেলেন কোথায়?

—কোথায় আর পাব? হাতেই টেনে টেনে লম্বা করে বানিয়েছি। ও যন্তর হাটে-বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।

—‘যন্তর’ নয়, কথাটা ‘যন্ত্র’।

মালতীর জকৃৎখন হল। হঠাৎ বলে বসে, আচ্ছা ঠাকুরপো, কুসুমদি, মানে মামণির মা যখন আপনার সঙ্গে মনখুলে গল্পগাছা করতেন, তখনো আপনি এভাবে তাঁর উচ্চারণ সুধরে দিতেন?

রূপেন্দ্রের সাহস হল না বলতে, কথাটা ‘উচ্চারণ’ নয়, ‘উচ্চারণ’!

ইতিমধ্যে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন গিরিপিসিমা। ঘরের ভিতরে আসেন না। দু-হাতে চৌকাঠের দুটি কাঠ ধরে বলেন, কিরে রূপো, বউমা কেমন লোচিকা বানিয়েছে?

—চমৎকার! তবে বৌঠান কি একা-একা পারতেন? ‘রূপোমনচুরি’ ওঁকে সাহায্য করেছিল বলেই না? মামণির ভর্জিত লোচিকাগুলিই বেশি ফুলেছে কিন্তু।

পিসি বলেন, এ তোর একচোখোমি। মেয়ের দিকে টেনে কথা কইছিস। শোন

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

রূপো, বৌমাকে ওই কী যেন যন্ত্র—বেলুনি আর চক্কোন্টি—একজোড়া বানিয়ে দিতে হবে। তুই লখা-সুধাধারকে ডেকে পাঠাত একবার।

রূপেন্দ্র বলেন, যন্ত্রটা চক্কোন্টি নয়, চক্রতি, অপভ্রংশে চাকতি আর লক্ষ্মণের উপাধি ‘সুধাধার’ নয়। সূত্রধর।

মালতী ত্রিংশ করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনি না—একেবারে অসৈরণ! কথায়-কথায় সবার উচ্চারণের ভুল ধরেন।

রূপেন্দ্র সহাস্য বলেন, কী করবেন বৌঠান! আমি লোকটা যে একবগ্না!



দিনতিনেক পরে সকালে উনি রুগি দেখতে যাবেন বলে তৈরি হচ্ছেন। গিরিপিসি এসে দুঃসংবাদ দিলেন, বেরুবার আগে তুই একবার বউমারে দেখে যাস, রূপো! ওর শরীর-গতিকটা জুতের নয়।

—কেন? কী হয়েছে বৌঠানের? জ্বর?

—না, জ্বর হবে কেন? বাট-বালাই! কাল রাতে তিন-চারবার বমি করেছে। ওর পেটে কিছু ঢুকেছে, ক্রমাগত গা-গুলচ্ছে।

রূপেন্দ্র নতমুখে বললেন, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় পিসিমা, সদ্যপ্রসূতির এমনটা হয়েই থাকে। একটু কুলের আচার বা আমচুর—যা খেতে চান উনি—তাই দিন। মুখে জল আসবে। বমনের বেগ বন্ধ হবে।

গিরিপিসি রুখে ওঠেন, তুই আর আমারে এই বুড়ি বয়সে ‘বদ্যিগিরি’ শেখাতে আসিস না রূপো। পোয়াতি মাগির যে ‘ওয়াক’-আসে তা এই তিনকুড়ি বয়সে জানবনি? তা হোক, তুই একটিবার দেখে দিলে আমি সোয়াস্তি পাই।

রূপেন্দ্রনাথের সাহস হল না পিসিমার ‘প্রাকৃতভাষ’ মার্জনা করে দেবার। বললেন, ঠিক আছে। বৌঠানকে নিয়ে আসুন। আমি ওঁকে পরীক্ষা করে দেখব। আপনিও তখন উপস্থিত থাকবেন কিন্তু।

পিসিমা মালতীর ঘরের দিকে চলে গেলেন। রূপেন্দ্রর মনে হল, সত্যিই কর্তব্যে হয়তো কিছু অবহেলা হয়ে গেছে। এটা বৌঠানের পঞ্চম মাস। একেবারে আদ্যুগেই ওঁর গুরুদেব জানতে চেয়েছিলেন, ‘তুমি বউমাকে পরীক্ষা করে দেখেছ?’ আর উনি জবাবে বলেছিলেন, ‘পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই গুরুদেব, শতকরা শতভাগ নিশ্চিত না বুঝলে সার্বভৌম আত্মহত্যা করতেন না।’ সে কথা ঠিক। কিন্তু সেদিন যে

পায়োজনে পরীক্ষা করার প্রশ্ন উঠেছিল, আজ তা নয়। আজ প্রসূতির স্বাস্থ্য সুরক্ষার পায়োজনে চিকিৎসক হিসাবে এটা ওঁর কর্তব্য।

একটু পরেই মালতীর হাত ধরে পিসিমা ফিরে এলেন।

মালতী বলে, আপনি আমাকে ডেকেছেন ঠাকুরপো?

—হাঁ। কিন্তু মামণি কোথায়?

গিরিপিসিমা বলেন, ও এখনো ঘুমুচ্ছে।

—ও! তা বৌঠান, কাল রাতে আপনার কি বারবার বিবমিষার বেগ আসছিল?

মালতী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, না তো!

রূপেন্দ্র বিস্মিতভাবে দৃকপাত করলেন পিসির দিকে।

তিনি বুঝিয়ে দিলেন, না, বাবা, ‘বিবমিষা-টিষা’ কিছু হয়নি। ব্যরকতক বমি করেছিল শুধু। এই পর্যন্ত!

মালতী বহুকষ্টে হাস্য সংবরণ করে বলে, হ্যাঁ, তা হয়েছে, বমি করেছি। বার-চারেক। ‘বিবমিষা-টিষা’ কিছু হয়নি।

রূপেন্দ্র গভীর হয়ে বলেন, আপনি এই শয্যায় উপবেশন করুন। আমি আপনাকে পরীক্ষা করব।

—পরীক্ষা করবেন? কেন? আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়িনি। এ অবস্থায় ‘বমি’ তো অনেকেরই হয়।

—সেটা আমার জানা আছে। বসুন আপনি।

মালতী সাবধানে শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করে।

—আপনার পায়ের পাতা কি ফুলেছে একটু? দেখি!

ত্রিৎ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় মালতী—না, না, আপনি আমার পায়ে হাত দেবেন না।

—কেন?

—না-না-না! আমার সুড়সুড়ি লাগে।

এবার গিরিপিসিমাই ধমক দেন, এ তো তোমার অসৈরণ কতা, বউমা। সম্পর্কে ও তোমার দেওর! তায় কেবরেজ।

মালতী আঁচল দিয়ে তার পা-দুটি মুড়ে ফেলে : ন-না!

রূপেন্দ্র পিসিকে প্রশ্ন করেন, আপনার কী মনে হয় পিসি? ওঁর পা কি ফুলেছে?

গিরিপিসিমা বলেন, আমার তো তা মনে হয়নি। কই দেখি—

আশ্চর্য! মালতী এবার প্রতিবাদ করল না। পিসিমা ওর দুটি পায়ের পাতা টিপে-টিপে দেখলেন। বললেন, না। ফোলেনি তো।

মালতী উঠে পিসিকে প্রণাম করে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, এটা তো পঞ্চম মাস? জ্ঞানের নড়াচড়ার কোনও আভাস পান?

মালতী জবাব দিল না। নতনেত্রে দুদিকে মাথা নেড়ে জানাল, না!

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

—আপনি শুয়ে পড়ুন তো। আমি আপনার উদরে হাত দিয়ে কিছু অনুভব করব।
মালতী দাঁতে-দাঁত দিয়ে আবার বললে, না।

গিরিপিসি আবার ধমক দেন, ন্যাকামি করিস না মালু!

জোর করে ওকে শুইয়ে দিলেন বিছানায়।

রূপেন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন। মালতী তা দেখতে পায় না। তার চোখ দুটি বোজা। রূপেন্দ্রনাথ অতি সাবধানে ওর নীবিবন্ধের গ্রন্থি উন্মোচন করে সাদা থানটা নিচের দিকে টেনে নামিয়ে দিলেন। শালীনতার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। তখনো মালতী নিম্নলিখিত নেত্র। সে জানে না, এটা কার করস্পর্শ—পিসিমার, না ওর। কিন্তু তার অনাবৃত কিঞ্চিৎ-স্বীত উদরদেশটা তির-তির করে কাঁপতে থাকে। গাড়ীর গলকম্বলে আদর করলে যেমন শিহরণ জাগে তার সর্বাস্থে। রূপেন্দ্র ইতিমধ্যে ওর শয্যাপার্শ্বে নতজানু ভঙ্গিতে বসেছেন। ওর সেই নিরাবরণ উদরদেশে কর্ণস্পর্শ করানোর সঙ্গে সঙ্গে মালতীর চোখ দুটি খুলে গেল। শিউরে উঠল সে। উঠে বসতে গেল। রূপেন্দ্রও রীতিমতো চমকে ওর চোখে-চোখে তাকান : কী হল?

দু-জনের মুখ খুব কাছাকাছি। এক বিষতের ব্যবধানে। প্রচণ্ডভাবে শিউরে উঠল মালতী। ক্রতহাতে তার নীবিবন্ধের গ্রন্থিটা ঠিক করতে থাকে।

—কী হয়েছে বলুন তো আপনার?

মালতী তখন থর থর করে কাঁপছে।

ওকে আশ্বস্ত করতে, ভরসা দিতে ওর দুই বাহুমূল ধরে বলেন, এতো কাঁপছেন কেন আপনি?—বৌঠান?

চোখ তুলে একবার তাকাল। চোখাচোখি হতেই ছিটকে সরে গেল মালতী। তারপর হঠাৎ পিছন ফিরে চোখে আঁচল চাপা দিল।

বিস্মিত রূপেন্দ্রনাথ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অবাক হয়ে পিসিকেই প্রশ্ন করেন, ওঁর কী হল বলুন তো?

গিরিপিসি তখন একদৃষ্টে দেখছিলেন পিছন-ফেরা ওই বেসখুমানা বিগতভর্তা তরুণীটিকে। কান্নার কোনও শব্দ হচ্ছে না—কিন্তু পিঠটা মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠছে। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, এখনো বুঝিসনি? আবাগিটা মরেছে!

—মরেছে! মানে?

গিরিবালা আপনমনেই গজগজ করে বলেন, আমি তখন বলেছিলাম পীতুকে। এ হয় না, হতে পারে না! আমি পারবনি বাপু! শুনল? সেই অঘটনটাই তো ঘটল। আমি কী করব? এদিকে লকলকে আগুনের শিখা আর উদিগে ওই বোকা-হাঁদা শ্যামাপোকাটা। বাঁপ তো ও থাকেই।

উদ্ধাত অশ্রুর বেগ সম্বরণ করে ভেসে এল মালতীর আর্ত প্রতিবাদ : পিসি।

—এখন আমারে ডাকলি কী হবে? এ রোগের চিকিৎসা নেই। আমি পারবনি বাপু।—গজগজ করতে করতে কক্ষত্যাগ করলেন গিরিবালা।

রূপেন্দ্রনাথ এতক্ষণে বুঝেছেন! এ ওঁর নিয়তি! শ্যামাপোকার দল ক্রমাগত গ্নিষ্ণিখায় ঝাঁপ দিয়ে চলেছে! কিন্তু উনি কী করতে পারেন? কী অপরাধ করেছেন তিনি? অথচ ওঁর জীবনে একের পর এক সেই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি—মীনু, রাধারানি, তুলসী আর আজ আবার মালতী। একটু পরে মালতী শান্ত হল। মুখ থেকে আঁচলটা সরাল। চোখ তুলে কিন্তু তাকাতে পারছে না এখনো।

—বৌঠান?

নতনেন্দ্র মেয়েটি যেন পাষাণমূর্তি। সাড়া দিল না।

—সত্যি কি তেমন কিছু হয়েছে? পিসিমা যা বলে গেলেন?

আবার মুখটা ঢাকে। অসীম আয়াসে কোনওক্রমে বলে, আপনি এখন যান, ঠাকুরপো। পরে কথা হবে। আমাকে এটু সামলে নিতে দিন।

দীর্ঘশ্বাস পড়ে রূপেন্দ্রের। ধীরপদে নিজের দিকে যান ঘর থেকে।

ঠিকই বলেছেন গিরিপিসিমা : ‘এ রোগের চিকিৎসা নেই।’



শ্রাবণের ঘন মেঘে সমস্ত আকাশ যখন আবৃত হয়ে যায় তখনও সূর্যদেব তাঁর চরৈবেতিমস্ত্রে দীক্ষিত। সূর্যদেব থামতে জানেন না। যন্ত্রচালিতের মতো রূপেন্দ্রনাথও মগ্ন হয়ে গেলেন তাঁর নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে। কাজ মিটল দ্বিপ্রহরে। সচরাচর এ সময়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। আজ কিন্তু মন সরল না। অশ্বটিকে চালিত করলেন আরোগ্য নিকেতনের দিকে। একজন অগ্রসর হয়ে এসে ওঁর অশ্বটির লাগাম ধরল। উনি এগিয়ে গেলেন সেই সদ্যপ্রসূতির ঘরের দিকে।

ওঁকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল জীবন। বললে, সকাল থেকে একজন আপনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন। উনি এসেছেন ভিন গাঁ থেকে। তাঁকে ডেকে দেব?

—দাও!

আগন্তুক ব্রাহ্মণ। গৌরকান্তি, স্বাস্থ্যবান। রূপেন্দ্রনাথেরই প্রায় সমবয়সি। ললাটের উপরিভাগ ক্ষৌরিকৃত। পশ্চাতে অর্কফলা। গায়ে উড়নি। করজোড়ে বললেন, প্রাতঃপ্রণাম ভেষগাচার্য। আমি আসছি তিজলহাটি থেকে। অধমের নাম শ্রীতিনকড়ি ঘোষাল, পিতাঠাকুরের নাম ঈশ্বর এককড়ি ঘোষাল। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষাল। আমরা রাঢ়ীশ্রেণির। দাদার কনিষ্ঠ পুত্রটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বোধকরি সামি্পাতিক। গুরুদ্বিতীয়ার দিন জ্বর এসেছিল, আজ নয় দিন ধরে

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

একটানা জ্বরে ভুগছে। এতদিন ওকে দেখছিলেন আমাদের গাঁয়েরই কবিরাজ-মশাই; কিন্তু তিনি ঠিক ভালো বুঝছেন না। আপনাকে সংবাদ দিতে বললেন।

—বয়স কত আপনার ভাতৃপুত্রের?

—ত্রয়োদশ বর্ষ। নদীয়ার কৃষ্ণনগরে একটি গুরুগৃহে অধ্যয়নরত ছিল। এ মাসে তার উপনয়ন হবার আয়োজন করেছেন দাদা। কিন্তু এসেই সে জ্বরে পড়েছে।

—কী নাম বালকটির?

—আজ্ঞে সৌম্য। সৌম্যসুন্দর ঘোষাল।

—ভালো। ভালো।

—ভালো? কী বলছেন কোবরেজ মশাই? উপনয়নের অনুষ্ঠানে নিজ ভিটেয় প্রত্যাবর্তনমাত্র রোগে আক্রান্ত হল, আর আপনি বলছেন, ‘ভালো’?

—না ঘোষালমশাই। সে কথা বলছি না। আপনার পুণ্যশ্লোক পিতৃদেব ছিলেন ঈশ্বর এককড়ি ঘোষাল, দাদা পাঁচকড়ি আপনি তিনকড়ি। আমার আশঙ্কা হয়েছিল বালকটির নাম হবে ‘সাতকড়ি’। সে যে ‘সৌম্যসুন্দর’ হয়ে উঠতে পেরেছে এতেই আমি আনন্দিত।

—আপনি কি কাল-পূর্ণের মধ্যে সময় করে একবার...

—না, না, সান্নিপাতিক জ্বরে কালবিলম্বে রোগীর ক্ষতিই হয়। আপনি নিশ্চয় অশ্বপূর্থে এসেছেন, তাই নয়? আমি এখনি রওনা হব। আমার অশ্বে।

শিবনাথ দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। জীবন দণ্ডের ছোটভাই। বললে, এখনি কি করে যাবেন? আপনার তো মধ্যাহ্ন-সেবা এখনো হয়নি—

—না, শিবনাথ। আজ শুক্লা একাদশী। আমার উপবাস। তোমার দাদা জানে। সৈনগুপ্তকে কিছু দানা-পানি দেবার ব্যবস্থা কর। আমি তৈয়ারই আছি।

সৈনগুপ্ত রূপেন্দ্রনাথের প্রিয় অশ্বটির নাম।

তারপর হঠাৎ আগন্তকের দিকে ফিরে বললেন, তিজলহাটির শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষাল আপনার দাদা, বললেন না? আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, সৌম্যসুন্দর কি বছর কয়েক পূর্বে সর্পদংশিত হয়েছিল?

—আজ্ঞে না। আপনার মনে আছে তাহলে? সাপে কামড়েছিল সৌম্যের দাদাকে, সাতকড়িকে। সেবার আপনিই তো তার প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

—হ্যাঁ, স্মরণে আছে আমার, তিজলহাটি থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে একটি বিশ্রী সতীদাহের আবর্তে পড়ে যাই।

—সে কথাও জানি। আপনারই হস্তক্ষেপে সেবার বায়েনপল্লির একটি বিধবার সে সৌভাগ্য হয়নি। পঞ্চগ্রামের সবাই সে ইতিহাস জানে।

সৌভাগ্য হয়নি! রূপেন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস পড়ে।



তিজলহাটির পাঁচকড়ি ঘোষাল রীতিমতো সম্পন্ন গৃহস্থ। একান্বতী পরিবার। ধ্বাশ বিঘে আউশের খেত, তিন-জোড়া 'হেলে-বলদ'। এ ছাড়া একটি দি-দোকানেরও মালিক। বর্ধমান-কাটোয়া থেকে তিজলহাটি অঞ্চলে বণ-সরবরাহের একচেটিয়া কারবার।

রোগীকে পরীক্ষা করলেন সযত্নে। সৌম্যসুন্দর সতিই সৌম্যসুন্দর। গৌরবর্ণ, জ্ঞানাসা, কিন্তু নয়দিনের সামিপাতিক জ্বরে বেচারী নিতান্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। কটু আগে থেকে চিকিৎসা করলে হয়তো সৌম্যকে বাঁচানো যেত। এখন তারীবনের আশা খুবই ক্ষীণ। স্থানীয় কবিরাজ-মশাই জানালেন, ইতিপূর্বে কী জাতীয় ঠিকিৎসা হয়েছে, কী পথ্য পড়েছে।

রূপেন্দ্রনাথ বালকটির পিতাকে আড়ালে ডেকে বললেন, বড় দেরি করে আমাকে াংবাদটা পাঠালেন, ঘোষালমশাই। ওর অবস্থা ভালো বুঝছি না। তবে আশা আমি াড়িনি। বৈদ্যকে নিরাশ হতে নেই। আমি যথাসাধ্য করে যাব। আপনারাও এখনি নেরাশ হবেন না। সৌম্য মনে হল অপুষ্টিতে ভুগছে। এমন তো হবার কথা নয়, াপনাদের সচ্ছল সংসারে।

পাঁচকড়ি স্নান হয়ে গেলেন। বললেন, আমারই ভুল। আমারই অপরাধ। ওকে গুরুগৃহে পাঠাবার পর থেকেই ও ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে পড়েছে। অথচ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ও কিছুতেই নদীয়ার সেই গুরুগৃহ ত্যাগ করে আসতে স্বীকৃত হচ্ছে না।

—কী নাম ওর গুরুদেবের? কার চতুষ্পাঠীতে ও পড়েছে?

—নদীয়ার স্বনামধন্য পণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত!

স্নান হাসলেন রূপেন্দ্র। হাতদুটি এক করে উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

—আপনি তাঁকে চেনেন?

রূপেন্দ্র বললেন, সমগ্র আর্ষ্যবর্তের সংবাদ আমি জানি না। তবে গৌড়মণ্ডলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সর্বাগ্রগণ্য অধ্যাপক!

—ত্রিবেণীর মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কি তাই নন?

পুনরায় উদ্দেশে প্রণাম করে রূপেন্দ্রনাথ বললেন, তিনি আমার গুরুদেব। তাঁর চতুষ্পাঠীতে আমি কিছুদিন অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু এ আলোচনা পরেও হতে পারবে। আপাতত সৌম্যের দিকেই আমাকে নজর দিতে দিন।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

তাই দিলেন। মধ্যাহ্নের সূর্য ক্রমে পশ্চিমে ঢলে পড়ল। রূপেন্দ্রনাথ প্রতি অর্ধদণ্ডে কয়েক ফাঁটা করে তরল পানীয় বালকটির মুখবিবরে প্রদান করে নাড়ি ধরে কী যেন লক্ষ্য করতে থাকেন। শেষে পড়ন্ত বেলায় বললেন, ঘোষালমশাই, এবার আমাকে বিদায় দিতে হবে। রাতে কী ওষুধ পড়বে, কতক্ষণ পরে, পরে তা আপনার কবিরাজ-মশাইকে বুঝিয়ে দিয়েছি। রাতটুকু তিনিই পাড়ি দেবেন। কাল প্রত্যুষে আমি আবার আসব।

—আপনি যা ভালো বোঝেন। আমি কী বলব? তাহলে এই পুঁটলিটা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন। আপনার বৈদ্যবিদায়।

—না, ঘোষালমশায়। আমি তো কালই আবার ফিরে আসছি।

—তা হোক। এটা ধরুন। না হলে আমার ভূপ্তি হবে না।

—সেক্ষেত্রে আমাকে একমুষ্টি আতপ-তণ্ডুল আর পাঁচটি কড়ি এনে দিন। সৌম্যকে সুস্থ করে তুলি, তারপর আপনার মনঃতৃপ্তির মতো বৈদ্যবিদায় আমি গ্রহণ করব। কথা দিয়ে যাচ্ছি।

অপরাত্নবেলায় উনি রওনা দিলেন। দূরত্ব এমন কিছু নয়। মাত্র তিন-চার ফ্রোশ। সমস্তদিন আকাশ থমকে ছিল। হঠাৎ পথেই ঘনিয়ে এল কালবৈশাখী। প্রথমে জোরে ঝোড়া ছুটিয়েছিলেন; কিন্তু প্রভঞ্জন-গতিতেই ধেয়ে এল প্রভঞ্জন। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হল একটি দেবালয়ের মণ্ডপে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। গ্রামে যখন ফিরে এলেন ততক্ষণে সন্ধ্যা সমাগত। প্রথম প্রহরের শিবাবধনি অবশ্য এখনো শোনা যায়নি, কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়েছে। ঝোপে-ঝাড়ে লাখ-লাখ জোনাকির নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির দোরগোড়ায় যখন এসে পৌঁছালেন ততক্ষণে মেঘ সরে গিয়ে শুক্লা-একাদশীর চাঁদ রূপালি আভরণ বিছিয়েছে গ্রামের বনবীথিকায়। বড় বড় ফাঁটায় গাছ থেকে তখনো জল ঝরছে।

পৈতৃক ভিটার সম্মুখে এসে দেখেন দোরের পাশে চাদর মুড়ি দিয়ে কে-যেন বসে আছে। রূপেন্দ্র হাঁকাড় পারেন, কে? কে ওখানে?

এগিয়ে এল লোকটি। বললে, আজ্ঞে, আমি শিবু।

—শিবনাথ? তুমি এখন এখানে?

—আজ্ঞে, দাদা বললেন, দুপুরে আপনি ফেরেননি। তারপর তো প্রচণ্ড ঝড়-জল গেল। আমাকে বললেন এখানে অপেক্ষা করতে। আপনি নিরাপদে ফিরে এলে সেই খবর নিয়ে আমি বাড়ি যাব। কিন্তু আপনার এতটা দেরি হল যে?

—রোগীর অবস্থা ভালো নয়, শিবনাথ।

—আপনি তো একেবারে ভিজ়ে গেছেন?

—যাবনা? বৃষ্টিটা কি কম হয়েছে?

উনি অশ্ব থেকে অবতরণমাত্র শিবনাথ এসে লাগামটা ধরল। সৈনগুপ্ত শিবনাথকে ভালোই চেনে। রূপেন্দ্রনাথের গৃহে ভৃত্যস্থানীয় কেউ নেই। উনি নিজেই সৈনগুপ্তের

দানাপানি দেন। কখনো বা শিবনাথ। সৈনগুপ্তকে নিয়ে সে অশ্বাবাসের দিকে চলে গেল। ‘অশ্বাবাস’ শব্দটি গৌরবে। বাস্তবে উদ্যানপ্রান্তে তলতা বাঁশের একটি একচালা। শীতাতপ এবং বৃষ্টি থেকে কিছুটা রক্ষা করার প্রয়াস। শিবনাথ সৈনগুপ্তকে নিয়ে ঘোড়াশালের দিকে রওনা হবার পর উনি সদর দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে আসেন। এতক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়োছে। বেল-জুই-হাসনুহানার একটি মিশ্র মৃদু সৌরভ। ঠেলে দেখলেন সদর দ্বার ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ। গৃহস্থ বাড়িতে সেটাই হবার কথা। উনি করাঘাত করামাত্র ভিতর থেকে সশঙ্ক বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হল, কে?

—আমি বৌঠান। ফিরে এসেছি।

হড়কো-খোলার শব্দ। কাঁঠালকাঠের দুটি পাল্লা গেল খুলে। ও প্রান্তে প্রদীপহস্তা শুভ্রবসনা মালতী, মাথার আধো-ঘোমটা। একই প্রশ্ন করল সে, এত রাত হল যে ফিরতে?

—না রাত নয়, তবে দেরি হয়েছে কিছুটা। এখন তো সব সন্ধে।

পিছন ফিরে সদর-দরজাটি আবার অর্গলবদ্ধ করে দিলেন।

—আপনি তো একেবারে ভিজ়ে গেছেন?

—তা তো যাবই। কী বৃষ্টিটা হল! ঝড়ে কাঁচা-আম পড়েনি?

—আপনি কি এখন আম-কুড়োতে যাবেন নাকি?

—না, না। কী যে বলেন! মামণি কই?

—ভাদুড়ীবাড়ি। সকালবেলাতেই পুঁটুদি এসেছিলেন, শুভ্রকে নিয়ে। মামণিকে নিয়ে গেছেন। আবার কাল সকালে পৌঁছে দেবেন।

—কেন?

—ওঁরা যে জানেন, আজ আমাদের বাড়িতে অরন্ধন। দুটি বিধবা একটি বিপত্নীক। আজ আমাদের সকলেরই তো একাদশী। উনুন জ্বলবে না।

—আর গিরিপিসিমা? তাঁর সাড়া পাচ্ছি না যে? জপে বসেছেন?

মালতী নিঃশব্দে জলের ঘটিটা এগিয়ে দিল। জবাব দিল না।

রূপেন্দ্র সেই জলে হস্তপদ প্রক্ষালন করলেন। অঙ্গমার্জনবস্ত্রে হাতপা মুছে পুনরায় বললেন, কী বৌঠান? পিসিমা কোথায়? বললেন না যে?

—তিনি তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেছেন। রাতে ফিরবেন বলে মনে হয় না।

জরুপ্পন হল রূপেন্দ্রের। বলেন, সে কি! মীনুর বাবার সঙ্গে কী যেন বিবাদ করে না এ বাড়িতে এসে উঠেছিলেন? বিবাদ কি মিটে গেল?

মালতী নতনেত্রে বলল, ও-বেলা নিজের কানেই তো শুনলেন। ওসব বাজে ওজর। ঝগড়াঝাঁটি কিছুই হয়নি। মীনুদির বাবা ওঁকে এখানে পাঠিয়েছিলেন পাহারা দিতে।

কথাটা কানে বাজল। রূপেন্দ্র সে কথা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, রাতে পিসি ফিরবেন না? তাই বলে গেলেন?

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

—রাতে কেন? তিনি আর এ বাড়িতে আসবেনই না। তাই বলে গেলেন!

একটু বিহ্বল হয়ে পড়লেন যেন। তারপর হঠাৎ বলেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি আসছি—

—আগে ভিজা কাপড়টা ছাড়ুন?

—না। ওকে ধরতে হবে। ও যেন না বাড়ি চলে যায়?

—ওকে মানে? কাকে ধরতে হবে?

রূপেন্দ্র সে কথার জবাব না দিয়ে আবার বার হয়ে গেলেন। সদর দরজার ছড়কো খুলে—জ্যোৎস্নান্নাবিত বাগানে। মালতী প্রদীপ হাতে শুরু হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

একটু পরেই ফিরে এলেন আবার। বললেন, শিবনাথকে বলে এলাম। ও বাড়ি চলে গেল। রাতের আহার সেরে ও আবার ফিরে আসবে। এই দাওয়াতেই শোবে। মশারি আর কিঞ্জর সে নিজেই নিয়ে আসবে।

ধীরপদে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। পালকে মশারি টাঙানো। সন্ধ্যার আগে মশারিটা টাঙিয়ে না ফেললে ভিতরে মশা ঢুকবে যায়। পালকটি বড়—সাবেক পালক। ওঁরা বাবাবেটিতে এ ঘরে শয়ন করেন। মালতী আর পিসিমা রাত্রিবাস করেন পুর্বের ঘরে। আজ দুজনেই একক শয়্যায় শয়ন করবেন। অবশ্য দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকবে শিবনাথ। রূপেন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায়।

কিন্তু শিবনাথ ঠাকুরপোকে উনি কী বললেন? কী ভাষায় বললেন?

রূপেন্দ্র ভাঁড়ারঘর থেকে ততক্ষণে দুটি ডাব বার করে এনেছেন। কাটারিটাও। বললেন, দুটি পাত্র নিয়ে আসুন তো, বোঁঠান।

—দুটি?

—হ্যাঁ, ডাবে জল আছে যথেষ্ট।

ডাব দুটির মুখ কেটে একটি পাথরের গেলাসে ডাবের জল টেনে নিলেন নিজের হাতে। একটি বাড়িয়ে ধরলেন মালতীর দিকে।

মালতী অবাক। নতমুখে বললে, একাদশীতে আমি নির্জলা উপবাস করি ঠাকুরপো।

—জানি। আজ থেকে ‘সজলা’ উপবাস করবেন। নিন ধরুন।

—আপনি আমাকে মার্জনা করবেন!

—ও! আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন না? ঠিক আছে। তবে থাক।

—সেকি? আপনিও খাবেন না?

—কী করে পান করব? আমি যে ওই বোকাটিতে বিশ্বাসী। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার! অনেকটা অস্বাভাবিক এয়েছি তো, তাই বড় তৃষ্ণা পেয়েছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে? আসুন, ঘরে যাই। দুজনেই নির্জলা একাদশী পালন করি।

মালতী নীরবে পাথরের গেলাসটি উঠিয়ে নিল। ওঁর দিকে পিছন ফিরে ঢকঢক করে পাত্রটা নিঃশেষ করে দিল।

রূপেন্দ্র খুশি হলেন। পিছন থেকেই ওর অবগুণ্ঠনাবৃত মস্তকে হস্তস্থাপন করে বললেন, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো দূরে সরে গেল মালতী। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে তার। রূপেন্দ্রনাথের স্নেহস্পর্শে। রূপেন্দ্রনাথ ততক্ষণে নিজের পানপাত্রটি নিঃশেষ করেছেন। সহাস্যে বললেন, কী হল? অমন চমকে উঠলেন যে? পায়েও হাত দিতে দেবেন না আবার মাথাতেও নয়?

নতমুখী মালতীর কণ্ঠে স্বর ফুটল না। রূপেন্দ্র নিজেই বলতে থাকেন, কী জানেন, বৌঠান, মাসে দুদিন উপবাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। কিন্তু নির্জলা নয়—উপবাসের দিন অধিক পরিমাণে জল পান করা উচিত। দুধ্ব হলেই ভালো। বিকল্পে পাতিলেবুর সরবত অথবা ডাবের জল।

এবারও মালতী কোনও জবাব দিল না।

রূপেন্দ্র ভাঁড়ারঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেখেন, মালতী ইতিমধ্যে দাওয়ায় একটি শীতলপাটি বিছিয়ে রেখেছে। ক্রান্ত গৃহস্থামীর দিবসান্ত বিশ্রামের আয়োজন। গৃহাভ্যন্তর থেকে একটি উপাধানও এনে রেখেছে পাশে। একটু দূরে, পায়ের দিকে পিলসুজে একটি প্রদীপ জ্বলছে। শুক্লা একাদশীর ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠানে লুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু দাওয়ায় এখনো আধো-অন্ধকার। জ্যোৎস্নালোক অতদূর হাত বাড়তে সাহসী হয়নি।

রূপেন্দ্র শীতলপাটিতে উপবেশন করলেন। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে মালতী তাঁর পায়ের দিকে গিয়ে বসল। রূপেন্দ্র বললেন, শিবনাথকে তখন বলেছিলাম, কিঞ্জর নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই। তা আমার ভদ্রাসনেই আছে। ওকে আরও বলেছিলাম, পিসিমা আজ অনুপস্থিত। তাঁর শয্যাটাও শূন্য পড়ে আছে। কিন্তু সে স্বীকৃত হল না। নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণীর বিছানায় কি শোয়া যায়?

মালতী দূর থেকেই প্রশ্ন করে, কিঞ্জর কী?

রূপেন্দ্র তাঁর বক্তব্যের টীকাটপ্পনি পেশ করেন, ‘মাদুর’ আর কি।

—ও! তা শিবনাথকে আপনি কী বললেন? কেন তাকে এখানে এসে রাত্রিবাস করতে হবে?

—বলেছিলাম, পিসিমা আজ বাড়ি নেই। আমি পেশায় বৈদ্য তো? রাত-বিরেতে কোনও রুগিবাড়ি থেকে আহ্বান এলে আমাকে যেতেই হবে। তখন আপনি বাড়িতে একা পড়ে যাবেন, ভয় পাবেন। এই আর কি?

—সেটাই কি সত্যিকথা?

—নয়?

—আমার জ্ঞানমতে নয়। আপনি তো মিছে কথা বলেন না। তাহলে ওভ্যাবে ছলনার আশ্রয় নিলেন কেন?

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

মৃদু হাসলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, সত্যং ক্রয়াৎ, প্রিয়ং ক্রয়াৎ, মা ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্!

—উনস্বর-বিসর্গগুলো বাদ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন?

—দেখুন বৌঠান, শিবনাথকে আমি যা বলেছি তা অন্ততভাষণ নয়। আবার তা পুরোপুরি সত্যও নয়। কিন্তু এ কথা তো মানবেন যে, সত্য সর্বদা সুন্দরের সঙ্গে সম্পৃক্ত! নগ্ন সত্যটা প্রকাশ করলে সেটা কদর্য শোনাতো। শিবনাথ বুদ্ধিমান, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, কেন তাকে আজ রাত্রে এ বাড়িতে থাকতে বললাম। অথচ আমার বাকপ্রয়োগে সেই নগ্নসত্যটা, সেই অসুন্দর তথ্যটা অবারিতই রইল। যে কথায় কারও ক্ষতি হয় না, শোভনতা এবং সৌন্দর্যের বিকাশ হয়, তা কি সত্য নয়?

মালতী যেন আর নিজেকে সামলাতে পারল না। প্রশ্ন করে বসে কিন্তু আসলে আপনার ভয়টা কাকে? আমাকে, না কি লোকনিন্দা?

—যদি বলি ‘নিজেকে’?

—তাহলে আবার বলুন ‘আপনি সত্যি কথা বলেছেন না।’ আপনি সিদ্ধপুরুষ। নিজের ওপর আপনার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। যথেষ্ট আস্থা আছে।

আবার হাসলেন রূপেন্দ্র। বলেন, তাহলে আমি ও কথা কেন বললাম?

—নিজেকে আমার সমতলে নামিয়ে আনতে। আপনি যে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী! আমি যে-ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। তাই আপনি ভয় না পেয়েও ভয়-পাওয়ার অভিনয় করে আমাকে সাহুনা দিতে চান। তাই ওকথা বলেছেন।

রূপেন্দ্র বলেন, বড় সুন্দর করে বলেছেন কথাটা। কী জানেন বৌঠান, কথাটা ‘লোকনিন্দা’ না হয়ে ‘লোকাচার’ বললে আমি সেটা স্বীকার করে নিতাম।

—কী প্রভেদ ও দুটো শব্দে? ‘লোকনিন্দা’ আর ‘লোকাচার’?

—‘লোকনিন্দা’ অর্থে ‘লোকে নিন্দা করবে এই ভয়ে।’ আমি একবাক্য—আপনি জানেনই। ‘লোকনিন্দা’-র ভয় থাকলে আমি স্বীকার করতাম না যে, বিপত্নীক হবার পূর্বযুগে আমি ‘বৃথামাংস’ গ্রহণ করতাম, অথচ ‘বলি’র মাংস আহার করতাম না। সে ভয় থাকলে আমি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসতাম না।

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন। আপনি আপনার গুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে যখন সোণাই গাঁয়ে নিয়ে এলেন তখন তো আপনি জানতেন না যে, পিসিমা তাঁর ভাই-এর সঙ্গে আপসে ঝগড়া করে আমাদের দুজনকে পাহারা দিতে উপস্থিত হবেন! জানতেন?

—না, সেদিন তা আমার জানা ছিল না, তেমনি সেদিন তো আমার একথাও জানা ছিল না যে, আপনি হঠাৎ এমন...

মাঝপথেই থেমে যান। মালতী দু হাতে নিজের মুখটা ঢাকে।

একপ্রহরের শিবাধ্বনি হল হঠাৎ। যেন ব্যঙ্গ করে উঠল মালতীকে।

দুজনেই নীরব। রূপেন্দ্র শয়নের উপক্রম করলেন। মালতী পাছাটা উঠিয়ে নিয়ে বীজন করতে থাকে। মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে। রূপেন্দ্র উপাধানটি টেনে নিতেই একটা ধাতব শব্দ হল। উপাধানের পার্শ্বে রক্ষিত একটি কাঁসার রেকাবি উঠানে গড়িয়ে পড়ল দাওয়া থেকে। আর তখনই হঠাৎ একরাশ জুঁই ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল। মালতী বলল, আহা পড়ে গেল ফুলগুলো?

মাদুরের উপর ছড়িয়ে পড়া জুঁই ফুলগুলো টুকিয়ে টুকিয়ে হাতে তুলতে থাকে।

—ফুল ছিল নাকি থালাতে? জুঁই? দেখি দেখি—

কোথাও কিছু নেই মালতীর মুষ্টিবদ্ধ হাতটি টেনে মুঠি খুলে দিলেন। এবার আর শিউরে উঠল না মেয়েটি। কেমন যেন অবশ হয়ে পড়ে। কেমন যেন মোহমুগ্ধ আবেশে নেতিয়ে পড়ে! মুঠি তার আপনিই খুলে যায়। হাতটি তুলে নিয়ে আশ্রয় করলেন রূপেন্দ্রনাথ। অজান্তে তাঁর আনন্দোচ্চাস বেরিয়ে এল মুখ থেকে : আহ!

ছেড়ে দিলেন হাতটা। মালতী নিঃশব্দে দাওয়া থেকে গড়িয়ে-পড়া ছোট রেকাবিটা তুলে নিয়ে ফুলগুলি আবার তাতে সাজিয়ে রাখল। একটু দূরে সরে বসল। নীরবতা যেন সহ্য হচ্ছিল না তার। তাই একটা অহৈতুকী প্রশ্ন করে বসে, ফুল ভালোবাসেন না আপনি? জুঁই ফুল?

—বাসি। কে না ভালোবাসে? তবে গাছ থেকে তোলা ফুল নয়— যে ফুল আপনিই মাটিতে ঝরে পড়েছে সেই ঝরাফুল!

মালতীর স্রুকুণ্ডল হয়। একথার মধ্যে কি কিছু তির্যক ইঙ্গিত আছে? ওঁদের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন মালতী ছিল সীমন্তিনী। এক ঘনশ্যাম ঝজু পাদপকে বেঁস্টন করে সে মালতীলতা পুষ্পিতা হয়ে মৃদুন্দ বাতাসে তখন দোল খেত। আর আজ সে ঝরাফুল। তবু এবার আর সাহস করে প্রশ্ন করতে পারল না : কেন?

রূপেন্দ্রনাথ জোনাকজ্বলা চন্দ্রাহতা বনভূমির দিকে তাকিয়ে যেন স্বগতোক্তি করতে থাকেন। কী জানেন বৌঠান, আমি উপনিষদের ওই বাণী বিশ্বাস করি। এ বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রাণময়। আকাশ-বাতাস, এই ‘নক্তম্’, ওই বনস্পতি সবই মধুময়। এরা সবাই প্রাণিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ‘প্রাণ’ যদি সত্য হয় তবে বিশ্বসংসারে ‘মৃত্যু’ও সত্য! ‘প্রাণবন্ত’ হওয়ার অনুসিদ্ধান্ত ‘প্রাণনাশ’ হওয়া জুঁই ফুলগুলি যতক্ষণ ফুটেছিল ততক্ষণ তারা প্রাণিত ছিল, ঝরে পড়ার পর তারা মৃত। তবু তারা এখনো সৌরভমণ্ডিত। তারা জীবনের আশীর্বাদ সুগন্ধ এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে!

তারপর হঠাৎ কী খেয়াল হল। বললেন, এবার আমি কিন্তু ‘অং-বং’ বলিনি, বৌঠান। কী বললাম তা বুঝতে পারছেন?

মালতী তা স্বীকার করল না। অস্বীকারও নয়। বললে, ‘নক্তম্’ মানে কী?

—রাত্রি! আপনার-আমার কাছে আজ যে ‘অবাক রাতটা’ ধরা দিয়েছে তার কথা বলছি আমি।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

মালতীর মনে হল, ওই মানুষটা বড় একা। ওকে কেউ কোনওদিন চিনতে পারেনি। কুসুমমঞ্জরীও নয়। ওকে পরিক্রমা করা যায়। ওর মনের ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। তাই শ্যামাপোকার দল ওকে ক্রমাগত পরিক্রমাই করে চলে। যে হতভাগী ওর অন্তলীন সত্তাকে স্পর্শ করতে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে তার মৃত্যু অনিবার্য—ঝরেপড়া জুঁই ফুলের মতো।

এখন হঠাৎ সে একেবারে ভিন্ন একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করল। এখন আমি কী করব, ঠাকুরপো?

রূপেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর যেন প্রস্তুত। বললেন, সিদ্ধান্তটা আপনাকেই নিতে হবে, বৌঠান! আমি শুধু তা কার্যকরী করব!

—বাঃ! দারিদ্ৰ্যটা কি শুধু আমার একার। আপনার গুরুদেব তো আমাকে ত্রিবেণীতে তাঁর ভদ্রাসনেই আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। আপনিই তো—

রূপেন্দ্রনাথ কী ভাবে জবাবটা দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না।

মালতী নিজেই বলে, স্বীকার করছি, তখন আপনি জানতেন না যে, আমার... আমার...

উদ্ভ্রান্ত অশ্রুর আবেগে শেষ করতে পারে না কথাটা। রূপেন্দ্রনাথ এবার কিন্তু হাতটা বাড়িয়ে দিতে পারলেন না ওর মাথায়। অথবা সাহস হল না ওর হাতটা ধরতে। কী জানি—যদি হতভাগিনী মুর্ছিতা হয়ে লুটিয়ে পড়ে ওঁর বুকের উপরেই।

দুজনেই সামলে ওঠেন। রূপেন্দ্রনাথ বলেন, নিজেকে ওভাবে ভৎসনা করবেন না, বৌঠান! মানুষ তার নিজের মনটাকেই বা কতটুকু চিনতে পারে? মাঝে মাঝে সকলেরই মনের লাগামটা ছিড়ে যায়—

—আপনারও?

—হ্যাঁ, আমিও তো মানুষ! আবার কখনো কখনো অন্তলীন আবেগকে রুদ্ধ করার জন্যই লাগামটা বেশি জোরে টেনে ধরেছি। সেজন্য ভৎসিতও হয়েছি।

—ভৎসিত হয়েছেন!! আপনি? কার কাছে?

—নাম বললে কি চিনতে পারবেন? কাশীধামে ত্রৈলোক্যস্বামীর কাছে!

—কে তিনি?

—তাঁর কথা থাক। আপনার সামনে এখন তিনটি বিকল্প পথ। আপনি নিজেই নির্ণয় করুন : কোন পথে বাকি জীবন পরিক্রমা করবেন। প্রথমত, আপনি ত্রিবেণীতে মামাশ্বশুরের সংসারে ফিরে যেতে পারেন।

—বিনা আমন্ত্রণে? তাছাড়া সেক্ষেত্রে আপনার যে চরম অপমান হবে। লোকে ভুল বুঝবে। ভাববে আপনার হাত থেকে রক্ষা পেতেই আমি আবার ফিরে গেছি ত্রিবেণীতে। ভাববে : যে রক্ষক, সেই ভক্ষক!

—তার মানে ‘লোকনিন্দা’?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। আপনি লোকনিন্দার পরোয়া করেন না জানি। আমি করি।

—আমার কথাটা তখন শেষ হয়নি, বৌঠান। আমি বলেছিলাম, ‘লোকনিন্দার’ পরোয়া আমি করি না, কিন্তু ‘লোকাচার’ মেনে চলি।

—দুটো কথার তফাত কী?

—তাই বলতে শুরু করেছিলাম। কথাটা শেষ হয়নি। আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম। সংসারে থাকতে হলে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে বাস করতে হলে, অর্থাৎ সমাজের কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নিতে হলে, তার কিছু-কিছু অনুশাসন আমাদের মেনে চলতে হবে। তাই নয়?

—‘কিছু কিছু’?

—হ্যাঁ, সমাজের যে অনুশাসন মঙ্গলময়, সত্য-শিব-সুন্দর সম্পৃক্ত। যেটা তা নয় তার প্রতিবাদ করবার অধিকার আছে প্রতিটি সমাজবদ্ধ জীবের। যেমন আমি প্রতিবাদ করতে চাই সতীদাহের বিরুদ্ধে, ক্ষেত্রজাত-সন্তান উৎপাদনের বিরুদ্ধে, স্ত্রীলোককে অশিক্ষিত রাখার কুপমণ্ডকতার বিরুদ্ধে। কিন্তু সমাজের নির্দেশে লজ্জানিবারণ বস্ত্র পরিধান করি, বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান জ্ঞানাই, দেবমন্দিরে প্রণাম করি....

—‘দেবমন্দিরে প্রণাম’? সেটা তো আপনার ধর্ম! সামাজিক নির্দেশ কেন হতে পারে?

—না বৌঠান, আমি শাক্তবংশের সন্তান হলেও অন্তর্লীন চেতনায় আমি ‘অদ্বৈত বৈদান্তিক’। আমার দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টিতে, আমার বিশ্বাস মতে, শালগ্রাম শিলা আর পাথরের নুড়িতে কোনও প্রভেদ নেই। তবু সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা তো করেছিলাম। সামাজিক হেতুতে।

মালতী নতনেত্রে কী যেন ভাবল। তত্বটা বুঝে নিতে চাইল সম্ভবত। তারপর বলল, ও-কথা থাক। আপনি তিনটি বিকল্প পথের কথা বলেছিলেন। একটা তো হল। মাথা মুড়িয়ে, উলেটো গাধায় চেপে ত্রিবেণীতে মামান্দ্রশুরের বাড়ি অনিমন্ত্রিত ফিরে যাওয়া। বাকি দুটো?

—আপনি রাজি থাকলে, তারাদাকে বলতে পারি। তাঁর সংসারে এমন অনেকে বাস করেন, যাঁদের সঙ্গে ওঁদের রক্তের সম্বন্ধ নেই, আত্মীয়তার বন্ধন নেই!

—দাসীগিরি?

—সেভাবে নিচ্ছেন কেন?

—কিন্তু ভাদুড়ীমশাইকে কী বলবেন? শিবনার্থকে যে ‘সত্য-সুন্দর’ যুক্তি দেখিয়েছিলেন সে যুক্তি তো এবার খাটবে না। আবার পিসির মতো মুখ ফুটে বলতেও পারবেন না—‘কী করব? আবাগি মাগিটা যে মরেছে!’

এবারও মালতীর ‘প্রাকৃতভাবে’ আপত্তি করতে পারলেন না।

কথাটা ভেবে দেখার। সোএরাই গ্রাম পদার্পণমাত্র তারা প্রসন্ন বলেছিলেন, ‘এ হয় না।’ আর উনি প্রতিবাদ করেছিলেন, ‘কেন হবে না?’ আজ কোন মুখে উনি গিয়ে

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

বলবেন, 'আমিই ভুল বলেছিলাম, তারাদা—এ হয় না, হবার নয়।' উনি মুখে না বললেও সবাই ধরে নেবে সেই মেয়েছেলেটা এমন অশালীন আচরণ শুরু করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত একবন্ধাকে জমিদারের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে যেতে হল।—না, না, ও কথা বল না তোমরা—ধন্যন্তরি-বাবা জিতেদ্রিয় সম্মাসী মানুষ। ও মাগিই শয়তানী! কাঁচা বয়স তো! তাছাড়া চোখের সামনে অমন আগুনবরণ মানুষটা। দেখলে না—পীতু মুখুজ্জের দিদিটার পর্যন্ত সহ্য হলনি?

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরব। নিজ নিজ চিন্তায় বিভোর। তারপর মালতীই বলে ওঠে, আর তৃতীয় বিকল্পটা?

—আপনি যদি নিজের মনকে বশে রাখতে পারেন। কোনওক্রমেই নিজের মনকে রাশছাড়া হতে দেবেন না।

একটু নীরব থেকে মালতী বলে, আমি কি তা দিয়েছি? মনকে রাশ ছাড়া হতে?

—না দিলে পিসি কেমন করে আপনার মনের কথা জানতে পারলেন?

—আপনিও পেরেছিলেন?

—প্রথমটায় নয়। কিন্তু আজ সকালে আপনার আচরণে সেটা নির্বোধেও বুঝে ফেলবে। আপনার উদরে স্পর্শ করা মাত্র আপনি....। তাছাড়া আজ বিকালে আপনার মাথায় হাত রাখতে আপনি অকারণে শিউরে উঠলেন। একটু আগে নিতান্ত কৌতূহলে আমি দেখতে গেলাম আপনার হাতে কী আছে, আর আপনি...

—চূপ করুন।

—করলাম। প্রসঙ্গটা আপনিই তুলেছিলেন বোঁঠান।

আবার দুজনে নীরব। আবার মালতীই বাত্ময় হয়ে ওঠে, তৃতীয় বিকল্পটা কী?

—ওই যে বললাম। আপনি ইচ্ছা করলে মন্ত্রদীক্ষা নিতে পারেন। সাধনভঞ্নে মনটাকে বশে আনার চেষ্টা করতে পারেন।

এতক্ষণ নতনত্রে কী যেন ভাবছিল। এবার বলে, আপনি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দেবেন?

—না। আমি উপযুক্ত গুরুর ব্যবস্থা করে দেব।

—কেন? আপনি নিজে কেন তা দিতে পারেন না?

—আমি মন্ত্রদীক্ষা দিই না, মালতী! কখনও দিইনি।

মালতী? বোঁঠান নয়? মালতী এবার চোখে-চোখে তাকাবার সাহস পেল। বলল, তাতে কী? কখনও বিবাহ করেননি—একবারই তা করেছেন। তাই নয়? কখনও সস্তানের পিতা হননি—একবারই তা হয়েছেন।

রূপেন্দ্রের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মনস্থির করে বললেন, না। বাধা আছে!

—সেটাই তো জানতে চাইছি আমি। বাধাটা কোথায়? কীসের?

—গুরুকে মনের সব কথা খুলে বলতে হয়!

—তাই তো বলছি আমি। অস্বীকার তো কিছু করিনি।

—কিন্তু গুরুকেও যে সবকথা শিষ্যাকে খুলে বলতে হয়!

—আপনি তা পারবেন না?

—একথার জবাব আমি দেব না, মালতী।

কী বুঝল তা সেই জানে। হঠাৎ তার সংযমের বাঁধ গেল ভেঙে। সামনের দিকে কটু সরে এসে দু-হাতে ওঁর বাহমূল ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে, কেন? কেন? কেন? কেন জবাব দেবেন না?

ঠিক তখনই নৈশ স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে বাইরে থেকে কে-যেন ডেকে উঠল, বাঠাকুর!

রূপেন্দ্রনাথ সাড়া দিলেন, কে? শিবনাথ? আসছি আমি!

সসংকোচে লাফিয়ে সরে গেল মালতী। প্রবেশ করল তার একান্ত কক্ষে। সশব্দে হু হু হয়ে গেল তার শয়নকক্ষের দ্বার।

রূপেন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সদর দরজার অর্গল মোচন করতে।



তিন-চার দিনের মধ্যেই সৌম্যসুন্দর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। একাদশীর দিন উনি যখন রোগীকে প্রথম দেখেন তখন তার জ্ঞান ছিল না। এখন সে লোকজন চিনতে পারছে। ক্ষীণস্বরে কথাও বলতে পারছে। ভেয়গাচার্য পরপর তিন দিনই এসে খবর নিয়ে গেছেন। ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থাদি করেছেন। আজ সকালে উনি পুনরায় এসেছেন। আজ গুরুাচতুর্দশী। উনি প্রশ্ন করলেন, আজ কেমন আছ বাবা?

সৌম্যসুন্দর সপ্রতিভভাবে বলে, ভালো আছি ঠাকুরমশাই।

—শরীরে কোনও কষ্ট নেই?

—আজ্ঞে না। তবে বড় দুর্বল লাগছে।

—সেটা আরও দু-একদিন থাকবে। শরীর সুস্থ হতে কিছুটা সময় নেবে। মস্তিষ্কটা সুস্থ থাকলেই হল। আজ দুই সপ্তাহ তো অধ্যয়ন বন্ধ আছে। ব্যাকরণের সূত্রগুলো সব মনে আছে তো?

রোগাক্রান্ত ম্লান হাসল। প্রত্যুত্তর করল না।

—দেখি তোমাকে পরীক্ষা করে। বলতো বাবা, ‘নিপাতনে সিদ্ধ’ কাকে বলে?

সৌম্য শান্তস্বরে বলল, ‘যা ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে সিদ্ধ নয়, অথচ যা ভাষা বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে, যা অর্থবহ এবং ভাষার উপকারসাধন করে।’

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

রূপেন্দ্রনাথ বললেন, বাঃ। সব কিছুই তো তোমার মনে আছে দেখছি। আচ্ছা, এবার তার একটা উদাহরণ দাও তো ওই ‘নিপাতনে সিদ্ধ’-র।

বালকের চোখ দুটি কৌতুকে নৃত্য করে উঠল। নতনয়নে বললে, যেমন—আপনাদের সোণাই গ্রামের ‘একবগ্না দিঘি।’

রূপেন্দ্র বোধকরি এরূপ প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু অবাচ হয়ে বলেন, তাই নাকি? সেটা ‘নিপাতনে সিদ্ধ’? কোন সূত্রে?

—জলাশয়টা দীর্ঘিকা-নির্মাণের ব্যাকরণ মানেনি। দিঘির প্রতিটি প্রান্ত বিপরীত প্রান্তের সমান্তরাল হবার কথা। ওর তা হয়নি অথচ দীর্ঘিকাটি সিদ্ধ, স্বীকৃত এবং গ্রামের উপকারসাধন করে চলেছে।

রূপেন্দ্র মুগ্ধ। ওর মাথায় হাত রেখে বলেন, তুমি সে দীর্ঘিকা দেখেছ কখনও, সৌম্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, গতবছর মহাষ্টমীতে দাদা আমাকে আর বৌঠানকে আপনাদের গ্রামের জমিদারবাড়িতে দুর্গা-প্রতিমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ‘একবগ্না দিঘি’কেও দেখে এসেছি।

রূপেন্দ্র গৃহস্থামীর দিকে ফিরে বললেন, ঘোষালমশাই, আপনার এ ছেলে বেঁচে থাকলে একদিন মহামহোপাধ্যায় হয়ে যাবে। একবগ্না দিঘিটা যে ‘নিপাতনে সিদ্ধ’ এমন কথা তো আমার ইতিপূর্বে খেয়াল হয়নি।

ঘোষাল বললেন, ওইটাই বড় কথা ভেষগাচার্য—‘বেঁচে থাকলে’।

—না, না, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। একপক্ষকালের মধ্যেই ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। বল, সৌম্য, তোমার কী খেতে ইচ্ছে করে?

—তিস্তিড়ী-আচার।

অট্টহাস্য করে ওঠেন রূপেন্দ্র। বলেন, মণ্ডা-মিঠাই, পরমান্ন-মৎস্য-মাংস কিছুই নয়? শুধু তিস্তিড়ী আচার? তিস্তিড়ী পত্রের ঝোল নয় তো?

বালক প্রত্যুত্তর করল না। মুখ লুকিয়ে হাসল।

ঘোষালমশাই সবিস্ময়ে বলেন, সেটা কী রকম? তেঁতুলের পাতা দিয়ে ঝোল হয় নাকি?

—হয়তো আপনার-আমার ভক্ষ্য নয়, শুধু ক্ষণজন্মা পুরুষেরাই তা গলাধঃকরণ করে থাকেন। আপনাকে জনান্তিকে বুঝিয়ে বলব। এটা আমাদের দুজনের একটা গোপন-ব্যাপার। তাই নয়, সৌম্য?

এবারও বালক জবাব দিল না। মুখ লুকিয়ে হাসল শুধু।





নদীয়া রাজ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত গৌড়মণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। দূর-দূর গ্রাম থেকে মেধাবী ছাত্রেরা দল বেঁধে তাঁর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে আসে। কিন্তু রামনাথ শহরাঞ্চলে বাস করেন না। আরণ্যক পরিবেশে তাঁর অন্তর্বাসীর আশ্রম। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যাতে তর্কসিদ্ধান্ত সদর কৃষ্ণনগরে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন—রাজকোষ তাঁর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত। কিন্তু আরণ্যক সারস্বতসাধক তাতে স্বীকৃত হতে পারলেন না। তিনি বনচারীই থাকতে ইচ্ছুক। অবশেষে মহারাজ তাঁর সুঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিছু অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে। পণ্ডিতকে বলেন, আপনার এখানে তো কোনো হাট-বাজার নেই। আপনার আশ্রমে কিছু সবজির বাগানও করেননি—

রামনাথ বাধা দিয়ে বলেছিলেন, না না, সবজি-বাগান নয়। প্রথমত, সবজির প্রয়োজনই হয় না। দ্বিতীয়ত, সবজির বাগানের তত্ত্বাবধানে বহু সময় নষ্ট হবে। তা আমারই হোক, অথবা ছাত্রদের।

—তাহলে আপনি কীভাবে অন্নসেবা করেন?

—কেন? আশ্রমে একটি তিস্তিড়ী-বৃক্ষ আছে। তার কচি পাতার ঝোল ব্রাহ্মণী তৈয়ার করেন। তাতেই তৃপ্তি সহকারে অন্নসেবা করি।

সেই তিস্তিড়ী-পত্রের ঝোলের ইঙ্গিত করেছিলেন রূপেন্দ্রনাথ।

সে হিসাবে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত বঙ্গ সংস্কৃতিতে একজন ‘নিপাতনে সিদ্ধ’!

তিন দিনে সৌম্যের স্বাস্থ্যের উন্নতি হল বটে, কিন্তু রূপেন্দ্রর গৃহে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেখা গেল না। উনি পারতপক্ষে বাড়ি ফেরেন না—কী-জানি যদি মামণি কোথাও খেলতে গিয়ে থাকে! তাহলে নির্জন পরিবেশে আবার তাঁকে মুখোমুখি হয়ে পড়তে হবে সেই হতভাগিনীর। শিবনাথকে অবশ্য দ্বিতীয়বার বলতে হয়নি। প্রতিদিনই একপ্রহর রাত্রে সে এসে এবাড়িতে হাজিরা দেয়—কী-জানি রাত-বিরেতে যদি বাবাঠাকুরের ডাক আসে! মালতীর সঙ্গে তার একটি স্নেহ-সৌহার্দ্যর বন্ধনও সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার দাদা আছে, দিদি নেই। এতদিনে একটি দিদি পেয়েছে। তাই শুধু সন্ধ্যারাত্রিই নয়, দিনের বেলাতেও সে এসে মাঝে-মাঝে হানা দেয়। মালতীকে নানান গৃহকারণে সাহায্য করে। জীবন দণ্ডে বুদ্ধিমান—গিরিপিসিমা যে তাঁর সাবেক ভিটেতে প্রত্যাৰ্পণ করেছেন এ সংবাদ সে রাখে। তাই আরোগ্য নিকেতনে শিবনাথের যেসব নিত্যকর্ম ছিল তা থেকে যতদূর সম্ভব নিষ্কৃতি দিয়ে দিয়েছে তাকে। শিবনাথ ছিল

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

নিরক্ষর। এই সুযোগে সে মামণির কাছে বাংলা-হরফ চিনে নিতে শুরু করেছে। একটি স্লেট ও পেনসিল জোগাড় হয়েছে। সময়ে-অসময়ে রূপমঞ্জরী তার প্রথম ছাত্রটিকে বাংলা ভাষা শেখায়। বলে, 'এটা কী লিখেছ শিবুদা? আমি বললাম তোমাকে 'বক' লিখতে, তুমি লিখেছ 'বর'!' 'ব'য়ের নিচে শূন্য দিলে তো 'র' হয়ে যায়। 'ক' কি অমনি করে লেখে? 'ক' লিখতে 'ব'য়ের পাশে আঁকড়ি দিতে হয়। এই দেখ আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

মালতী এগিয়ে এসে বলে, শিবুভাই তোকে 'বক' দেখাতে চায়নি, তাই ওটা লিখেছে। তোর জন্য ও একটা 'বর' খুঁজছে। শোন শিবু, এখন পড়াশুনা একটু বন্ধ থাক। বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। তোমার বাবাঠাকুরমশাই গুরুবারের হাটটা করেননি। ঘরে আনাজপাতি কিছু নেই। কী করি বল তো?

শিবনাথ স্লেট-পেনসিল রেখে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনাদের পশ্চিমের বাগানে গাছে বেশ বড় বড় এঁচোড় এসেছে। একটা পেড়ে এনে দেব?

—তাই দাও ভাই। আজ এঁচোড়ের ডালনা করব। তুমি বরং দস্ত-খুড়িমাকে বলে এস দুপুরে এই বামুনবাড়িতেই দুটি প্রসাদ পাবে। কেমন?

শিবনাথ চলতে গিয়েও ফিরে আসে। বলে, দিদি, আমাদের চালে বেশ বড় বড় চার-পাঁচটি চালকুমড়ো ধরেছে। মাকে বলে তাও একটা নিয়ে আসব?

মালতীকে ইতস্তত করতে দেখে নিজেই আবার সংযোজন করে। চালকুমড়োর খানিকটা তরকারি আপনি বরং একটা বাটিতে করে দিয়ে দেবেন। সন্ধ্যাবেলা আমি নিয়ে যাব। আমার বাবামশাই চালকুমড়োর তরকারি খুব ভালোবাসেন।

এভাবেই চলছে রূপেন্দ্রনাথের নড়বড়ে সংসার।

কিন্তু এটা তো নিতান্ত সাময়িক সমাধান। এভাবে কতদিন চলতে পারে? মামণি তো কালকে ওকে সরাসরি প্রশ্নই করে বসল, বাবা, আপনি কি সোনা-মাকে বকেছেন?

মালতীকে সে 'সোনা-মা' ডাকে। রূপেন্দ্র বলেছিলেন, না তো, মামণি। বকিনি তো! বকব কেন?

—তাহলে সোনা-মা সারাদিন অমন কাঁদেন কেন?

—সারাদিন কাঁদেন?

—না, সারাদিনই নয়। প্রায়ই কাঁদেন। লুকিয়ে-লুকিয়ে। আমি দেখেছি।

—ওঁর বোধহয় বাড়ির জন্যে মন কেমন করে।

—কী যে বলেন বাবা! বাড়িতে ওঁর কে আছে যে, তাঁদের জন্যে মন-কেমন করবে? মা-বাবা, ভাই-বোন কেউই তো নেই সোনা-মার।

রূপেন্দ্রনাথ কী জবাব দেবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। রূপমঞ্জরী আবার বলে, আমারও তো মন কেমন করে। তাই বলে আমি কি কাঁদি?

—তোমারও মন-কেমন করে? কার জন্যে? দাদুর?

—ধুস্। তা কেন হবে। মামণির জন্যে।

হতভাগিনী জন্মমুহূর্তেই মাতৃহীনা। বিকল্প-মা পেয়েছিল তুলসীকে। তার জন্য ওর মন কেমন করবে না? তুলসীকে সে 'মামণি' ডাকত।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, তুলসীর সঙ্গে কিন্তু আবার তোমার দেখা হবে। তোমার মামণি এখানে আসবেন।

—এখানে? সত্যি? কবে বাবা? দাদু তাঁকে আটকে দেবেন না?

—না। তুলসীর যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন সে তো আর তোমার দাদুর কাছে থাকবে না। ওর স্বশুর-স্বামীই তো ওকে আসবার অনুমতি দেবেন। তোমার মামণি তখন আসবেন এখানে।

—তুমি ঠিক জান?

—নিশ্চয়, তোমার মামণি যে আমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

—তার মানে 'কথা দিয়ে রেখেছেন', তাই না বাবা?

—হ্যাঁ মা, তাই, 'প্রতিশ্রুতি দেওয়া' মানে 'কথা দেওয়া'। তোমার মামণির তখন ছোট্ট একটা বাচ্চা হবে। তোমার ছোট্ট ভাই।

—বোনও হতে পারে। পুঁচকে একটা বোন, তাই না বাবা?

রূপেন্দ্র নিজেকে সংশোধন করে নেন, হ্যাঁ তাও হতে পারে।

—আর সোনা-মার? তাঁর কী হবে? আমার ভাই না বোন?

—তোমাকে কে বলেছেন?

—দিদা। তবে সে কথা কাউকে বলতে বারণ করেছেন। আমিও দিদাকে কথা দিয়ে রেখেছি, মানে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

—তাহলে আমাকে বলে দিলে যে?

—বা-রে! আপনি তো বাড়ির লোক।



রূপেন্দ্রনাথ সারাদিন বাইরে-বাইরে কাটান। মনটা পড়ে থাকে বাড়িতে। কিন্তু সাহস হয় না। আন্তর-উদ্বেগে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই চান। এদিকে শিবনাথ সারাদিন পড়ে থাকে এখানে। অতীত দিনের নানান কাহিনি শোনায়। রূপমঞ্জরী সেসব ইতিহাস জানেই না। মালতীও অবশ্য আবছা শুনেছেন—ঠিকমতো জানা নেই। অথচ শিবনাথের অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ সত্য। কীভাবে রূপেন্দ্রনাথ ব্রজসুন্দরীর মৃত্যুশয্যায় যমদূতদের বিতাড়িত করেছিলেন, কীভাবে দামোদরে অকাল বন্যায় বর্গী সর্দারকে

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

জলমগ্ন করেন। কীভাবে বায়েনপাড়ার এক সদ্যবিধবার ‘সতীদাহ’ আচমকা বন্ধ করে দেন।

মালতী জানতে চায়, তার কী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত? ছেলে না মেয়ে?

—তা আমি জানি না, দিদি। কিছু একটা হয়েছিল নিশ্চয়। তারপর ওই যে বাবাঠাকুর এখন তিজলহাটিতে গিয়ে একটি ছোট ছেলের চিকিৎসা করছেন না—, রূপমঞ্জরী বাধা দিয়ে বলে, ‘চিকিৎসা’ নয় শিবুদা, কথাটা ‘চিকিৎসা’।

শিবনাথ তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করে নেয়। বলেন, হ্যাঁ, চিকিৎসাই— তা ওর দাদাকে একবার সাপে কামড়েছিল। একেবারে জ্ঞান সাপ! মানে নাগ! বাবাঠাকুর একচুমুকে বিষটা খেয়ে ফেললেন!

—খেয়ে ফেললেন!! কিছু হল না তাঁর?

—হবে কী করে? উনি যে মনসামায়ের বরে সপ্যসিধ্য।

রূপমঞ্জরী আবার প্রতিবাদ করে। কথাটা ‘সপসিদ্ধ’।

এবার আর শিবনাথ নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পায় না। তার পূর্বেই মালতী খিলখিল করে হেসে ওঠে—ঠিক বাপের মতো হয়ে উঠছে দিন দিন। গল্পে মন নেই। দিবারাত্র মানুষের ‘উদ্ভাষণ’ শুদ্ধ করে দেওয়া!

ঘুম-না-আসা রাতে রূপেন্দ্র বিছানায় ছটফট করেন। পাশেই শুয়ে আছে মামণি। গভীর ঘুমে অচেতন। ওঁর মনে হয়, মালতীকে তিনটি বিকল্প পথের কথা সেদিন বলেছিলেন। কিন্তু সেটাই তো শেষ কথা নয়। আরও একটি বিকল্প সমাধান আছে। মালতীর তা নজরে পড়েনি। পড়ার কথাও নয়। সেটা অবাস্তব, অসম্ভব কথা, কিন্তু তार्কিক পণ্ডিতটিকে নিজের কাছে স্বীকার করতেই হয়! আরও একটি সমাধানের পথ আছে। সেটা অভাবনীয়, কিন্তু অসম্ভব নয়; অকল্পনীয় কিন্তু অপ্রাকৃত নয়। সে পথে যদি উনি পা বাড়াতে পারেন তাহলে ওই ভুলুগ্ধতা মালতীলতা আবার সজীব হয়ে উঠবে। পুনরায় একটি ঝজু পাদপের কাণ্ড বেটন করে জীবনমুখী হয়ে উঠবে। সূর্যালোকের আশীর্বাদভিক্ষু মালতীলতা নতুন বৃক্ষকাণ্ডকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে দুলে উঠতে পারে!

মামণি—ওই যে মাতৃহীন বালিকা ওঁর পাঁজর ঘেঁষে অঘোর ঘুমে অচেতন—ও আবার মায়ের স্নেহস্পর্শ ফিরে পাবে। মা—যাঁর অপার শুভকরুণা মানবজীবনে প্রভাতসূর্যের আশীর্বাদ বহন করে আনে তাকে হারানো কি সহজ কথা? এভাবে ওকে বারম্বার মাতৃহীন করাই কি রূপেন্দ্রনাথের ধর্ম? ওই ছোট্ট জীবনে সে দু-দুবার মাতৃহীন হয়েছে। একবার আঁতুড়ে—সে-কথা বেচারি জানেই না, দ্বিতীয়বার ওঁর মামণির কাছ থেকে রূপেন্দ্রনাথ যখন ওকে ছিনিয়ে আনলেন। সেই মামণির জন্য ওর আজও নাকি মন-কেমন করে। তবে বাপের মুখ চেয়ে সে কাঁদে না—এই যা।...কুসুমমঞ্জরীও তো ওঁকে স্বপ্নের মধ্যে এসে সে কথাই বলে যায়। বলে, রাখাদিকে ফিরিয়ে দিয়ে ভালোই

বয়েছিলো। সে তার কাক্ষিত স্বর্গে পৌছে গেছে। তুলসীর জন্যও চিন্তা নেই—বড়ঘরেই পড়বে সে। পাবে সব কিছু—বাকমকে ঘর, তকতকে বর, বকবকে বাচ্চা। কিন্তু মালতী? আমি তো আর ফিরে আসব না। তুমি মালতীকে পায়ে ঠাই দাও!

কিন্তু কী করে দেবেন? 'বিধবাবিবাহ' তো সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। ভূভারতে কোথাও হয়নি, কখনও হয়নি। শুধু সোএগ্রাই গ্রামের পণ্ডিতসমাজ নয়, সমগ্র আর্যাবর্তের হিন্দুসমাজ তা মেনে নেবে না। হ্যাঁ পারেন, যদি রাধারানির মতো আউল-বাউল সম্প্রদায়ে গিয়ে দয়াভিক্ষা করেন। সেই আউলচাঁদের শিষ্য কতীমশাইয়ের আখড়ায় গিয়ে হাজির হন। মালতীর হাতটি ধরে। না সেটাও কোনও সমাধান নয়।

আউলিয়া-সম্প্রদায়ের আত্মা নাই একান্ত প্রেমে। তাদের দৃষ্টিতে সব পুরুষই 'কৃষ্ণ', সব প্রকৃতিই 'রাধা'। প্রতিরাত্রে তারা জোড়-ভাঙে, জোড়-গড়ে। সেটা রূপেন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারবেন না। পারবে না মালতীও।

ফলে একমাত্র সমাধান; যদি উনি কাটোয়ার বড় ইমামসাহেবের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন; আমাদের দুজনকে কলমা পড়িয়ে আপনি ইসলামে দীক্ষা দিন!

সেক্ষেত্রে কিন্তু তাঁকে সর্বস্বত্যাগে স্বীকৃত হতে হবে। গ্রাম-গোত্র-ব্রাহ্মণত্ব—নাম এবং রূপ। হয়তো ভেষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথ দেবশর্মার নতুন নামরূপ হবে; হেকিম মহম্মদ ইমানুল হক! একবুক দাড়ি, পরনে লুঙ্গি, মাথায় সফেদ তালশির টুপি। জীবনের মূল আদর্শটাকেই বিসর্জন দিতে হবে। আর কোনওদিন সতীদাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার থাকবে না, অথবা ক্ষেত্রজপুত্র-উৎপাদনের পৈশাটিকতার বিরুদ্ধে।

পরদিন প্রাতে রোগী দেখতে বার হবার সময় মালতীকে সংক্ষেপে বললেন, আজ আর আমি মধ্যাহ্নে আসব না, বৌঠান। আপনারা দুজনে আহালাদি সেরে নেবেন। আমার ফিরতে সেই সন্ধ্যা।

মালতী ডাগর দুটি চোখ মেলে নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট্ট মেয়েটা কিন্তু আপ্তবাক্য এককথায় মেনে নিল না। বললে, কেন বাবা? আজও কি তোমার উপবাস?

ওকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, না মামণি। আজ মধ্যাহ্নে তিজলহাটিতে আমার আহারে নিমন্ত্রণ আছে।

তারপর মালতীর দিকে ফিরে বললেন, আজ সৌম্যসুন্দর প্রথম অন্নপথ্য করবে। সেই উপলক্ষেই এ নিমন্ত্রণ।

মালতী এখনও নিশ্চূপ। পরিস্থিতিটা সহজ করে তুলতে উনি আরও বলেন, সে অবশ্য পথ্য পাবে সিঙিমাছের ঝোল আর ভাতের মাড়। আমার জন্য নিশ্চয় কিছু বিকল্প আয়োজন হবে।

রূপমঞ্জরী জানতে চায়, সৌম্যসুন্দর কে বাবা?

—ওই যার অসুখ করেছিল। এখন ভালো হয়ে গেছে।



তিজলহাটি গ্রামটিও দামোদরের ধারে। কায়স্থদের বাস। নদের দক্ষিণপাড় বরাবর ঘন বসতি। জমিদারও কায়স্থ।

পাঁচ-সাতঘর ব্রাহ্মণের বাস। রাঢ়ী-শ্রেণির। আর মধ্যে ঘোষালমশাই সবচেয়ে ধনী। সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাবান।

উনি তিজলহাটিতে গিয়ে পৌঁছালেন দ্বিপ্রহরে। ঘোষাল বাড়ির দ্বারদেশে উপনীত হতেই একটি ভৃত্যশ্রেণির লোক এসে ওঁর অশ্বটির লাগাম ধরল। সামনের দাওয়া থেকে এগিয়ে এলেন তিনজন ভদ্রলোক। পাঁচকড়ি, তিনকড়িকে চিনলেন—ওঁদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে এলেন আর একজন সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়। চুনট করা ধুতি-কুর্তা। পায়ে গুঁড়তোলা নাগরা, হাতে হস্তিদন্তমুণ্ড যষ্টি। সসন্ত্রমে দু-হাত তুলে বললেন, প্রাতঃপ্রণাম ভেষগাচার্য! আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

পাঁচকড়ি তাঁর পরিচয় দিলেন, আমাদের ভূস্বামী শ্রীপ্রসন্নকান্তি মিত্র, পিতা ঈশ্বর দুর্লভকান্তি মিত্র-মহাশয়।

রূপেন্দ্র বললেন, যাতায়াতের পথে আপনার সিংহ-দরজাওয়ালা ভদ্রাসনটি নজরে পড়েছে। আপনার নামও শোনা ছিল। আজ আলাপ করে প্রীত হলাম।

সকলে এসে বৈঠকখানায় উপবেশন করলেন। হাঁকাবরদার দু-হাতে দুটি হাঁকা নিয়ে এগিয়ে এল। কড়ি-বাঁধা হাঁকাটি গ্রহণ করলেন ঘোষাল-মশাই। তারপর মিত্রমশায়ের দিকে ফিরে বললেন, না। উনি তাম্বকুট সেবন করেন না।

দ্বিতীয় হাঁকাটি এবার গ্রহণ করলেন প্রসন্নকান্তি। দু-টান 'গুড়ুক' টেনে বললেন, ভেষগাচার্য! এতদিন দূর থেকে দেখেছেন। এবার কিন্তু গরিবের ভিটেয় একবার পদধূলি দিতে হবে। সেজন্যই এখানে অপেক্ষা করে বসে আছি—গুড়ুক...গুড়ুক!

রূপেন্দ্র অপেক্ষা করলেন। হাঁকাটি হস্তান্তরিত করে উনি বললেন, আমার বধুমাতাকে আজ অপরাহ্নে একবার দেখে যেতে হবে। প্রথম সন্তানটি তার নষ্ট হয়ে গেছে। প্রসবকালেই। দোষ ধাত্রীর কি আমার ভাগ্যের জানি না। এবার আমি আপনার শরণ নিতে চাই। শুনেছি, সোঞাই গ্রামে একটি প্রসূতি-আগার গড়ে তুলেছেন আপনি—

—আজ্ঞে না, গড়েছেন আমাদের জমিদার ভাদুড়ীমশাই। আমি তত্ত্বাবধানে আছি মাত্র। এ তো শুভ প্রসঙ্গ। এটা তাঁর কত মাস?

—পঞ্চম।

—তাহলে আজই ও-বেলায় তাঁকে দেখে যাব।

—তাহলে ওই কথাই রইল। আমি চলি। আপনি স্নানাহার করুন।

পালকি-বেহারার দল সচকিত হয়ে এগিয়ে এল। তাঁর প্রস্থানের পর ঘোষালমশাই প্রশ্ন করলেন, স্নান করবেন তো?

—প্রাতঃকালেই একবার স্নান করে এসেছি। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের গরম! আর একবার করতে পারলে ভালো লাগত।

—কোনও অসুবিধা নেই। দামোদরেও যেতে পারেন আবার শ্যামসায়রেও স্নান করতে পারেন। ওই মিত্রমশায়ের পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী। তাঁর পিতার নামে। কাছেই।

রূপেন্দ্র জানতে চান, গ্রামে পাকা পুষ্করিণী কয়টি। উনি জবাবে জানালেন—ছোটো-ছোটো অনেকগুলি ডোবা আছে। বাঁধানো ঘাট নেই। প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী দুটি। শ্যামসায়র আর রাধাসায়র।

—বাঃ! নামের বেশ মিল আছে তো? দুটিই কি মিত্রমশাইদের প্রতিষ্ঠিত?

—আজ্ঞে না। মিল শুধু ওই নামেই। রাধাসায়র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমার বাবামশাই। আমার ঠাকুমার নামে। আর সেটা রীতিমতো রেযারেবি করে।

—রেযারেবি? অসম্মার্থ?

শুনলেন সে কাহিনি। প্রসন্নকান্তির পিতৃদেব ছিলেন রাশভারি জমিদার। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পুকুরে অন্ত্যজ ব্যতিরেকে বর্ণহিন্দু নরনারীর স্নানের অধিকার ছিল। কিন্তু দিনের একটি বিশেষ সময়—কর্তামশাই যখন স্নান করতে যেতেন—তখন স্নানঘাটে আর কারও নাকি প্রবেশাধিকার ছিল না। ঘোষালমশাইয়ের এক পিতৃদ্বন্দ্ব বৃদ্ধি জ্ঞানবশত নিষিদ্ধ সময়কালে স্ত্রীলোকদের ঘাটে অবগাহন স্নানে গিয়েছিলেন। প্রহরীরা তাঁকে রুখে দেয়। তাই এককড়ি ঘোষাল পাল্লা দিয়ে আর একটি পুষ্করিণী খনন করান। তাঁর মাতৃস্মৃতিতে। প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী যথারীতি উৎসর্গ করা হয়। নাম হয় : রাধাসায়র। এখন একটি অলিখিত নির্দেশ মেনে চলেন তিজলহাটির বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়—শ্যামসায়রে শুধু পুরুষদের স্নানের অধিকার; আর রাধাসায়র থেকে জল নিয়ে যান কাপড় কাচেন, স্নান করেন শুধু মহিলারা।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, তার মানে, রাধাসায়র আমার পক্ষে নিষিদ্ধ অঞ্চল। আমি কিন্তু শ্যামসায়রে যাব না। দামোদরে স্নান সেরে আসি।



রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য



ভোজনকক্ষটি আকারে বৃহৎ। স্নানান্তে রূপেন্দ্রনাথকে সে-কক্ষে নিয়ে গেলেন পাঁচকড়ি ঘোষাল। মাত্র দুইজনের জন্য আসন পাতা হয়েছে। তিনকড়ি-সাতকড়ি-নকড়িরা অন্যত্র বসেছেন অথবা পরে বসবেন। মহিলারা তো আহারে বসেন পুরুষদের পালা শেষ হলে। সৌম্যসুন্দরের স্নানপথ্যও সমাপ্ত।

মাঝখানে দুটি পশমের ফুলকাটা আসিন। তার সম্মুখে দুটি প্রকাণ্ড কাঁসার থালা। সে দুটিতে বেঠন করে আছে একসার বাটি—কিছু কাঁসার কিছু পাথরের। একটু দূরে বসে আছেন তিন-চারজন বয়স্কা মহিলা। গরম আছে। মক্ষিকাও আছে। এঘরে টানাপাখার ব্যবস্থা নেই, ফলে গিনিমায়েরা হাতপাখা নিয়ে বসেছেন।

রূপেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখলেন, বিরাট কাঁসার থালার কেন্দ্রস্থলে এক একটি শঙ্খ আকারের ভর্জিত অন্নচূড়া। বিচিত্র তার বর্ণসত্তার। পাঁচটি রং। পাঁচ দিক থেকে তা চূড়ো রচনা করেছে। লাল, হলুদ, নীল, সবুজ ও শুভ্র। প্রতিটি অংশে বর্ণবৈশিষ্ট্য মেনে পাঁচটি পুষ্প অঙ্গে প্রোথিত। যথাক্রমে জবা, কলকে ফুল, অপরাজিতা, তুলসীমঞ্জরী এবং বেলফুল। এরূপ আয়োজন রূপেন্দ্র ইতিপূর্বেও দেখেছেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদে। সেখানে ফুলের ব্যবস্থা ছিল না। সেটি ছিল ‘অপলান’, এটি পুষ্পান। বললেন, রন্ধনশিল্পের শেষ যবনিকাপাত পরিবেশন-পারিপাট্যে। বাঃ! সুন্দর! কিন্তু শিল্পীটি কে?

ঘোষাল তৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, নকড়ির গর্ভধারিণী! তবে বধুমাতা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

ঘোষালগৃহিণী একটু নড়েচড়ে বসলেন। তাতেই তাঁকে শনাক্ত করা গেল। আকণ্ঠ অবগুষ্ঠনবতী। তবু ঘোমটার ভিতর দিয়েই দেখা গেল তাঁর নাকে টানা-নথ। রূপেন্দ্র বলেন, বধুমাতা অর্থে নকড়িনী নিশ্চয়? কই তিনি?

রূপেন্দ্রের সম্মুখেই বসেছিল খাসা-মসলিন পরিহিতা এক অবগুষ্ঠনবতী। তার বাম হস্তে রতনচূড়। দক্ষিণ হস্তে তালপাখা। পিছনেই বসেছিলেন এক বৃদ্ধা বিধবা। তাঁর অবগুষ্ঠন শিরঃসীমায়। তরুণীর পৃষ্ঠদেশে একটি স্নেহস্পর্শ হাত রেখে বললেন, এইটিই আমাদের নাতবউ। ভা-রী লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে।

রূপেন্দ্র বলেন, অন্নগ্রহণের পূর্বে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, বৌমা। তোমাকেই জিজ্ঞাস্য করব। কিন্তু অত বড়ো অবগুষ্ঠন থাকলে তো পারব না।

দিদা ওর পিঠের দিকে খাসা-মসলিনে একটু টান দিয়ে বলেন, বাবাঠাকুরের কাছে আবার অত লজ্জা কীসের লা?

অবগুণ্ঠন এবার ললাটস্পর্শী হল।

রূপেন্দ্র দেখলেন। লক্ষ্মীপ্রতিমাই বটে। নাকে নোলক, কপালে টায়রা। চোখে কাজল; কিন্তু নিমীলিত নেত্র।

ঘোষাল জানতে চান, আপনার প্রশ্নটি কী বিষয়ে? এই ‘পঞ্চরং পুষ্পাম’ কীভাবে সম্ভবপর হল? এই বর্ণবৈচিত্র্যের গুঢ় বিদ্যার বিষয়ে প্রশ্ন তো?

রূপেন্দ্র বলেন, আজ্ঞে না, ঘোষালমশাই। সে রন্ধনচাতুর্য সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। এমনটা তো হতেই পারে। বল বউমা? জবাবফুলের অংশে পুষ্পাম লজ্জায় রাঙা হয়েছে কোচিনীলের করস্পর্শে। কলকে-ফুলের হরিদ্রাভা জাফরানের সঙ্গে মিতালী করায়। অপরাজিতার বর্ণসঙ্গী নীলম্বর ধারণ করেছে সুপূরিচূর্ণ মিশ্রিত কালোজাম-রসের গাঙে অবগাহন্যস্তে। আর সবুজ তো হলুদ-নীল রঙে হোরি খেলায় মেতে। কী বৌমা? ভুল বলেছি কিছু?

গৃহস্বামী স্তম্ভিত। উনি ‘কবিরাজ’ না ‘রাজকবি’? নাকি ‘রন্ধনচণ্ড’? ঢোক গিলে বধুমাতার দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, কী বউমা? তাই? উনি যা যা বললেন?

পঞ্চদশীর কঙ্কললাঙ্ঘিত নিমীলিত হরিণ নয়ন দুটি ততক্ষণে বিস্ফারিত। রন্ধনবিদ্যার এই গুপ্তরহস্য ওই অং-বং-চং উনঃস্বর-বিসর্গের মানুষটি কোথায় পেলেন? শ্বশুরমশাই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় সে সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গি করল। দুলে উঠল টেড়ি-ঝুমকো ওর কানে। আর দুলতে থাকে নাসিকাগ্রে মুক্তার নোলকটি।

ঘোষাল বলেন, এ তো বড়ো আজব কথা শোনালেন।

রূপেন্দ্র সহাস্যে বলেন, তাহলে আপনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি?

—‘যেতে রাজি!’ কোথায়? কেন?

—ওই বাংলা গ্রাম্য ছড়াটা শোনেননি; ‘জাদু, এ তো বড় রঙ্গ, জাদু এ তো বড় রঙ্গ/পাঁচ রং দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গে!’

—না, না, রঙ্গ-রসিকতা নয়, এ তথ্য অত নিখুঁতভাবে জানলেন কেমন করে?

—ও আপনি বুঝি জানেন না? এ আমার একটি দৈবলব্ধ বিভূতি। কেউ আমার চোখে-চোখে তাকালেই আমি তার মনের সব কথা জানতে পারি। বউমা যেই আমার চোখের দিকে তাকালেন...

বধুমাতা শিউরে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ নতনয়ন। পিছন থেকে দিদা ওর ঘোমটা আবন্ধ নামিয়ে দিতে দিতে বলে ওঠেন, ওমা! এ কী সবেবানেশে কতা গো?

বউমার বুক তখন ধড়াস ধড়াস করছে। ওই আজবমানুষটি তার অন্তরের কোন কোন গোপনবার্তা জেনে ফেলেছেন ইতিমধ্যে?

রূপেন্দ্রনাথ অটুহাস্য করে ওঠেন, না, না, বউমা! এ শুধু কৌতুক। আমি অন্তর্বাসী নই। ঘটনাক্রমে আমি এ গুহ্য রন্ধনবিদ্যার কথাটা জেনেছি মাত্র!

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

কোন কথাটা সত্যি আর কোনটা কৌতুক, তা ওঁরা বুঝে উঠতে পারেন না।

রূপেন্দ্র বললেন, সে যাহোক। আমার প্রশ্নটি মূলতুই আছে। ভোজ্যতালিকার এই পঞ্চপুষ্পের অন্তিম গতি কী হবে? এগুলি ভক্ষ্য?

মেয়েটি জবাব দিল না। তখনও তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে। কক্ষমধ্যে সকলেই নতনয়ন। কেউ আর ভরসা করে ওঁর চোখে-চোখে তাকাতে পারছেন না। ঘোষাল বলেন, ও! এই কথা? আজ্ঞে না। ওই পঞ্চপুষ্প পঞ্চদেবতার প্রাপ্য নাগ-কূর্ম-ককরায়-দেবদত্ত আর ধনঞ্জয়।

রূপেন্দ্র সহাস্যে বলেন, পঞ্চদেবতা রক্ষা করেছেন। এই কোমলদেহ কুসুমগুলিকে রাক্ষসের মতো চর্বণ করতে হবে না। আসুন, এবার তাহলে শুরু করা যাক।



অপরাত্নে ভেষগাচার্যকে নিয়ে ঘোষালমশাই জমিদারের ভদ্রাসনে এলেন। অভ্যর্থনার ক্রটি হল না। কিছু কুশল বিনিময়ের পর রূপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার আপনি ভিতরে খবর দিন। আমি বধূমাতাকে পরীক্ষা করব। আর আপনার পুত্রটিকে একটু ডেকে দেবেন। তাকে দু-একটি প্রশ্ন করব জনান্তিকে।

ওঁরা দুজন পদব্রজে এসেছেন। সৈন্যগুপ্ত ঘোষালের ভদ্রাসনেই অপেক্ষা করছে। মিত্রমশাই ভেষগাচার্যের জন্য পালকি পাঠাতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বীকৃত হননি। এ কথাও বলেননি যে, জীবনে তিনি মনুষ্যবাহিত পালকিতে কখনও ওঠেননি। বরং বলেছিলেন, অপরাত্নে কিছু পদচারণা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

ঘোষালমশাইকে তাই অপেক্ষা করতে হল। তাছাড়াও কারণ ছিল। রূপেন্দ্রনাথ এখনও বৈদ্যবিদ্য গ্রহণ করেননি।

একটু পরেই এসে গেল জমিদারের পুত্রটি। প্রফুল্লকান্তি রূপেন্দ্রের সমবয়সিই হবে। সে কিন্তু সেকালীন শিষ্টাচারে দুই ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচকড়ি বলেন, আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি উদ্যানে কিছু পদচারণা করে নিই। মধ্যাহ্নে কিছু গুরুপাক আহার হয়েছে।

ঘোষাল নিষ্ক্রান্ত হলে রূপেন্দ্রনাথ প্রফুল্লকান্তিকে বসতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার কাছে গুনলাম তোমার স্ত্রীর একটি সন্তান ইতিপূর্বে নষ্ট হয়েছে। সেটা কতদিন পূর্বে।

—আজ্ঞে দু-আড়াই বৎসর।

—তোমার স্ত্রীর নাম কী? বয়স কত?

—ওর নাম ব্রজরানি। বয়স দ্বাবিংশতিবর্ষ।

—ঠিক কত তারিখে এবার ওর মাসিক চক্রাবর্তন বন্ধ হয়েছে?

প্রফুল্লকান্তি চূপ করে রইল।

—এ সংবাদটি জরুরি। তুমি বধূমাতাকে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানিয়ে দিও।

একটু পরেই গৃহাভ্যন্তর থেকে আহান এল। এবার একটি বয়স্ক্য দাসী এসে বলল, আপনি ভিতরে আসুন বাবাঠাকুর।

ওকে অনুসরণ করে তিনি প্রফুল্লের শয়নকক্ষে উপস্থিত হলেন। ঘরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন গৃহস্বামিনী। লালপাড় শান্তিপুরী শাড়ি। গায়ে জ্যাকেট, যা সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা ইদানীং পরেন। কপালে গিনি-মাপের অথবা গিল্লি-মাপের সিঁদুরের টিপ। প্রৌঢ়াও অনায়াসে প্রণাম করলেন যুবক ভেষগাচার্যকে। বললেন, আসুন বাবা। বৌমা এঘরে।

রূপেন্দ্র প্রবেশ করলেন শয়নকক্ষে। শয্যাপ্রান্তে বসেছিল ব্রজরানি। যথারীতি প্রণাম করল ওঁকে। শাওড়িকেও।

রূপেন্দ্র বললেন, বস মা। আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। কিছু পরীক্ষাও করব।

তারপর জমিদার-গৃহিণীর দিকে ফিরে বললেন, আপনিও থাকবেন মা। দরজাটা বরং বন্ধ করে দিন ভিতর থেকে।

অনেক কিছু প্রশ্ন করে এবং যথাবিহিত পরীক্ষা করে গিল্লিমাকে বললেন, বৌমা ভালোই আছেন। চিন্তার কিছু নেই। এবার আমি বাইরের ঘরে যাব।

বৈঠকখানায় মিত্রমশাইকেও সব কিছু জানালেন। প্রসূতি ও জ্ঞান স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছে। ইতিমধ্যে প্রফুল্লকান্তি ওঁকে জনান্তিকে জানিয়ে গেছে প্রসূতির মাসিক চক্রাবর্তন ছন্দ ঠিক কোন তিথিতে বন্ধ হয়েছে। ফলে উনি গণনা করে জমিদার মশাইকে বললেন, আন্দাজ করছি আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রসব হবে। আপনি যদি আমাদের আরোগ্য-নিকেতনে সে ব্যবস্থা করতে বলেন, তাহলে আশ্বিনের দশ-বারো তারিখের ভিতর পাল্কিতে করে বৌমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁকে আমি নিজ তত্ত্বাবধানে দিন দশ-পনেরো রাখতে চাই। ওঁর খাদ্যতালিকার একটি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন উনি যেন প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায় উদ্যানমধ্যে কিছুটা পদচারণা করেন। শারীরিক কোনও অসুবিধা হলে আমাকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেবেন। প্রফুল্ল অশ্বারোহণে অভ্যস্ত নিশ্চয়। সে যেন স্বয়ং যায়, যাতে আমি তাকে প্রশ্ন করে রোগিণী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারি।

মিত্রমশাই সম্মত হলেন। ইতিমধ্যে ঘোষালমশাইও উদ্যান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মিত্রমশাই বলেন, আশ্বিন মাসের হিসাব আশ্বিনেই হবে। এবার বিজয়া দশমী পড়েছে আশ্বিনের ছয় তারিখে। কোজাগরী এগারো তারিখে। আমি বারোই আশ্বিন বধূমাতাকে প্রেরণের ব্যবস্থা করব। কিন্তু সেসব বিস্তারিত কথাবার্তা পরে হবে। আপাতত আজ আপনাকে কী বৈদ্যবিদায় দেব বলুন?

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধবা

ঘোষালমশাই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আমার তরফেও সেই একই প্রশ্ন।

রূপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বললেন, এ বিষয়ে আপনাদের দুজনের কাছেই আমার একটি প্রস্তাব আছে। কিন্তু তার পূর্বে কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। শুনুন : রূপেন্দ্রনাথ ওঁদের বিস্তারিত জানালেন যে, তিজলহাটিতে তিনি বছবার এসেছেন। লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, এখানকার রোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মিক রোগে আক্রান্ত হয়। তার একমাত্র হেতু—একমাত্র না হলেও মূল হেতু—তিজলহাটি গ্রামে পানীয় জল বিশুদ্ধ নয়। কীভাবে তিনি সোএগই গ্রামের এই ব্যাধি প্রায় নির্মূল করেছেন তাও বুঝিয়ে বললেন। এ গ্রামেও ওই রকম একটি পানীয় জলের সংরক্ষিত পুষ্করিণী তৈরি করতে হবে। হয় শ্যামসায়র অথবা রাধাসায়র।

দুজনে স্বীকার করলেন যে, সোএগই গ্রাম থেকে যে আত্মিক রোগ প্রায় দূরীভূত হয়েছে এ তথ্যটি তাঁরা সবিশেষ জানেন। কিন্তু যেহেতু এ দুটি প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী তাই অবগাহন-স্নানের জন্য নিষিদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। কারণ ওঁদের দুজনের স্বর্গত পিতা প্রতিষ্ঠার সময় অঙ্গীকার করেছিলেন—‘যাবৎচন্দ্রার্কমেদিনী’ এ পুষ্করিণীতে বর্ণহিন্দু অবগাহনের অধিকার সুরক্ষিত। এখন সে পিতৃ-প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় করা ওঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

রূপেন্দ্র বললেন, সেক্ষেত্রে আপনারা দুজনে একটি নূতন পুষ্করিণী খননের আয়োজন করুন। এ সমস্যা সোএগই গ্রামেও হয়েছিল—এভাবেই তার সমাধান করেছিলেন ভূম্যধিকারী ব্রজেন্দ্রনারায়ণ।

ঘোষাল জানতে চান, একটা কথা বুঝিয়ে বলুন তো, ভেষগাচার্য। সোএগই গাঁয়ের সেই সংরক্ষিত পুষ্করিণী থেকে জল-অচল জাতের মানুষ তো পানীয় সংগ্রহ করতে পারে না। তাহলে ওখানে আত্মিক রোগ...

—আজ্ঞে না। তারাও ওখান থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে। মানে, যারা দামোদরের এ পারে আছে। তিনজন জলচল জাতের ‘পানিবাঁবা’ নিয়োগ করা হয়েছে। তারা পর্যায়ক্রমে সকাল থেকে সন্ধ্যা তৃষ্ণার্তকে জল তুলে দেয়। জল-অচল জাতের রমণীরা হাঁড়ি বা হাণ্ডা নিয়ে আসে। কপিকলের সাহায্যে শঙ্কু আকৃতির লৌহ-জলপাত্রে পানিবাঁবা জল তুলে হাঁড়িতে জল ঢেলে দেয়। স্পর্শবিচানো সেই ব্যবস্থায় দামোদরের এপারের সকলেই বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহ করে। পানিবাঁবারা জমিদারদের কাছে বৃত্তি পায়।

—আর দামোদরের ওপারের বাসিন্দা?

—বায়েনপল্লি, চামারপল্লি থেকে নৌকা করে জল নিতে আসে অনেকে। তাদের আত্মিক রোগ হয় না। তবে পীরপুর বা ফুল্লুরা থেকে কেউ আসে না। অতদূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়।

ঘোষাল বললেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি। কিন্তু সেজন্য আপনি ‘বদ্যিবিদায়’ কেন নেবেন না?

—আপনারা দান করছেন। আমিও করছি।

মিত্র বলেন, মনে হচ্ছে অনেক টাকার ধাক্কা। আমরা পঞ্চায়েতে প্রস্তাবটা তুলব। পঞ্চায়েত যদি স্বীকৃত হন তাহলে আমরা প্রতিটি গৃহস্থের কাছে গিয়ে চাঁদা তুলতে পারি। সেক্ষেত্রে 'একের বোঝা দশের লাঠি' হয়ে যাবে।

—খুবই সত্য কথা। এ ব্যবস্থা তিজলহাটি গ্রামের স্বার্থে। কারও ব্যক্তিগত স্বার্থ এতে জড়িত নয়।

—কিন্তু পঞ্চায়েত-প্রধানেরা যদি অস্বীকৃত হন? ওঁরা যে এসব বিশ্বাসই করতে চান না।

—সে ক্ষেত্রে আপনারা পঞ্চায়েতকে জানিয়ে দেবেন যে, এ গ্রামে আমি কোনও রোগী দেখতে আসব না। ওঁরা যা বিশ্বাস করেন সেই মতোই চলবেন। গ্রামে ওলাওঠা শুরু হলে চাঁদা তুলে ওলাবিবির পূজা দেবেন! আচ্ছা, আজ আমি চলি—

মিত্রমশাই ভেগগাচার্যকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন না। আজই সদ্যপরিচয়। তিনি ফস করে বলে বসেন, পঞ্চায়েত স্বীকৃত না হলে আপনি আমার পুত্রবধূর ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলতে চান?

ধক করে জ্বলে উঠল রূপেন্দ্রনাথের চোখদুটি। তবু ইন্ড্রিয়সংযম তাঁর করায়ত্ত। পরক্ষণেই হেসে বললেন, আপনি তো এইমাত্র বললেন, আশ্বিনের হিসাব আশ্বিনেই হবে। এত তাড়াহড়ার কী আছে? পঞ্চায়েতের কাছে প্রস্তাবটা তুলেই দেখুন না।

—ধরুন যদি পঞ্চায়েত রাজি না হন। তাহলে....

—না, মিত্রমশাই। ব্রজরানির দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। আমার কথার নড়চড় হবে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি আপনার সঙ্গে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ব্যবহার করব। আপনাকে অর্থদান করতে দেব না।

—দাতব্য? কিন্তু আপনার দান আমি গ্রহণ করব কেন?

—করবেন না। আমি তো বাধ্য করছি না। সাবেক দাইয়ের মাধ্যমেই দ্বিতীয়বার নাতির ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। তবে আমি যেটুকু করেছি, যা করব, তার জন্য 'যথাবিহিত কাঞ্চনমূল্যে' আমি বৈদ্যবিদায় গ্রহণে অস্বীকৃত।

রূপেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। ঘোষালও উঠে দাঁড়ালেন। ভেগগাচার্যের দুটি হাত ধরে বললেন, আমার কথাটা কিন্তু শেষ হয়নি ভেগগাচার্য! মিত্রমশাই অগাধ সম্পত্তির মালিক, তিনি ইচ্ছামতো তাঁর বংশরক্ষার্থে কাটোয়া, বর্ধমান বা মুর্শিদাবাদেও বধুমাতাকে নৌকাযোগে নিয়ে যেতে পারেন। সেটা ভবিষ্যতের গর্ভে। আমরা জানি না, কী হবে। কিন্তু আমার প্রসঙ্গটা ভবিষ্যতের নয়, অতীত কালের। আপনি দুই-দুইবার আমার বংশরক্ষা করেছেন। কেউ কোনও সাহায্য না করলেও সমস্ত ব্যয়ভার আমি একাই বহন করব। আমি প্রয়োজনে নিজ ব্যয়ে একটি সংরক্ষিত পুষ্করিণী খনন করাব। শুধু আপনার একটি অনুমতি সাপেক্ষে।

—অনুমতি! কীসের অনুমতি?

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

—দ্বিঘটিত আকার-বিষয়ে। সেটা বর্ণক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র করা হবে না।

মিত্রিমশাইয়ের রাগটা পড়েছে। বলেন, তবে কী হবে? বৃত্তাকার না ডিম্বাকার?

—না, মিত্রিমশাই। সেটা চতুর্ভুজই হবে। তবে তার কোনও কোণ সমকোণ হবে না।

মিত্র বলেন, এ আবার কোন জাতের ধাঁধা? এমন চতুষ্কোণ কি ভূভারতে কোথাও আছে? আমি তো শুনিনি।

ঘোষাল বলেন, এজন্য আপনাকে ভূ-ভারত টুডতে হবে না মিত্রিমশাই। আপনি পালকি-বেহারাদের ডাকুন। আমি ঠিকানা বাতলে দিচ্ছি। মাত্র চার ক্রোশ দূরত্বে দেখতে পাবেন এমন এক আজব পুকুর। চক্ষুর্গণের বিবাদ ভঞ্জন হবে।

তারপর রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বলেন, আর সেই নিপাতনে সিদ্ধ সংরক্ষিত দীর্ঘিকার নামকরণ করব আমি : রূপসায়র।

রূপেন্দ্র তীব্র আপত্তি জানান। না, না, আমার নামটা কোনওভাবেই জড়ানো চলবে না।

—বেশ কথা! জড়ার না আপনার নাম। আমরা ওর নামকরণ করব : ‘একবগ্না দ্বিঘি’। আশাকরি এবারও আপনি দাবি করবেন না যে, ওটাও আপনার নাম। কী বলেন? ওই ‘একবগ্না’।

রূপেন্দ্র হেসে ফেলেন।



তিজলহাটি থেকে অশ্বারোহণে যখন স্বগ্রামে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। একপ্রহর রাত। এতটা দেরি হবার কথা নয়। কিন্তু উনি প্রত্যাবর্তনের পথে দামোদরের তীরে এসে অশ্ব থেকে অবতরণ করেন। দীর্ঘ সময় নিশ্চুপ বসেছিলেন দামোদর কিনারে। একটি বিশাল বটবৃক্ষের পাদমূলে।

এ সেই মহাপাদপ। নিতান্ত বাল্যকাল থেকে এ বৃক্ষ গুঁর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। বিশালাকার, বয়োবৃদ্ধ। চতুর্দিকে প্রসারিতবাহু দশভুজ যেন মহাকাালের খাজাঞ্চি। পঞ্চগ্রামের ইতিহাস ওর শাখায় শাখায় লিখিত। অমৃত-নিযুত ঝড়ি নামিয়ে সে স্বধর্মরক্ষায় প্রাণিত। যুগে যুগে কত বিচিত্র বিহঙ্গ ওর শাখায় ভালোবাসার নীড় বেঁধেছে বছর বছর বসন্তকালে। মানসযাত্রী যাবাবরেরাও ওই মহাপাদপের উর্ধ্ববাহু-শাখায় দু-দণ্ড বিশ্রাম নিয়ে গেছে—মরাল, বেলে হাঁস, শামকুট, সারস, সিল্লি।

ওই জ্ঞানবৃক্ষ মহাপাদপ যেন এই সর্বসহা হিন্দুধর্মের প্রতীক। শতহস্ত প্রসারিত করে ও সবাইকে ডাক দেয় : গ্রিক, শক, ছন, পল্লব, যুটী—আফগান-পাঠান-মোঘল—দিনেমার, পর্তুগিজ, ফরাসি। দিগন্তচুম্বী ব্রহ্মডাঙার একান্তে যেন কোন মনিবর ধ্যানমগ্ন। দামোদর রাক্ষস যে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে তাতে কোনো ভ্রক্ষেপ নেই। আত্মসমাহিত অগ্নি-অঙ্গিরা-বশিষ্ঠের ও সগোত্র। কয়েক বছর আগে ওকে দেখেছিলেন। তখন দামোদরের বর্ষার সর্বগ্রাসী ধারা সন্ন্যাসীর আশ্রম থেকে বেশ কয়েক রশি তফাতে। আজ দেখলেন ললিতজিহ্বা দামোদরকে আশ্রমের দ্বারপ্রান্তে। হয়তো আগামী শ্রাবণ-ভাদ্রেই সে হেঁকে উঠবে : হা-রে, রে! ধ্যানরত মহাযোগীবর লুটিয়ে পড়বেন দামোদর গর্ভে! সেই মহামৃত্যুমুহুর্তে কি শেষবারের মতো হাহাকার করে উঠবেন মহাবট? কী সেই চরম হাহাকার-ধ্বনি? কী তাঁর অন্তিম বিদায়মন্ত্র? নাকি জীবনে কখনও যে মন্ত্রটা উচ্চারণ করেননি, করতে জানেনই না, যা বইছে না ওঁর ধমনিতে সেটাই পুকার দিয়ে উঠবেন, লায় লাহা ইল্লেলাহ!

তাই এতটা বিলম্ব। অশ্বারোহণে যখন সংকীর্ণ বনপথ দিয়ে, সাতপুরুষের ভিটার দিকে এগিয়ে আসছিলেন তখন পাখ-পাখালি নীরব। গাছ-গাছালির লতাগুচ্ছ ওঁকে বার বার ছুঁয়ে দেখছিল। রৌদ্রদগ্ধ বিশীর্ণ স্বর্ণলতা, খরতাপ পীড়িত হলুদ-ফুল-হারানো তিৎপল্লার শাখা। আর কী জানি—উনি হয়তো খেয়াল করেননি—জৈষ্ঠের তাপদগ্ধ কোনও মালতীলতাও!

তোমরা বলবে : এটা তুমি কী লিখলে দাদু? সেটা যে কৃষ্ণপক্ষ! সোএই গাঁয়ে তো স্ট্রিটলাইট নেই, গৃহস্থবাড়ি থেকেও আসবে না কোনও আলোর আভাস। তাহলে কীভাবে নীরন্ধ অন্ধকারে অশ্বারোহণে...

তোরা ভুল করছিস, দিদিভাই! আমরা তো আছি আড়াইশো বছর আগেকার এক রাতে। গৌড়মণ্ডলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সে পরিমণ্ডলটা যে তাদের ধারণার বাইরে। আমি তা আমার এই ছানিপড়া চোখে দেখতে পাই—ঘুম-না-আসা রাতে। আবহা, অস্পষ্ট। তবু, দেখতে পাই। বিজলি বাতি নাই বা থাকল পথে, গৃহস্থবাড়ির তির্যক আলোকরশ্মি নাই বা পড়ল রাস্তায়। তবু ওরা তো আছে। ওই মুঠো মুঠো জোনাকির টুনি-বাল্ব—যা তোরা আজ দেখতে পাস না, শহরে কিংবা গ্রামে। আছে এক-আকাশ কৌতুহলী তারাসুন্দরী। তাও তোরা দেখিসনি—দেখতে পাস না, লোডশেডিং হলেও নয়। কী করে দেখবি? আকাশটাকে তো ধুলোয়, ধোঁয়ায় আর কার্বন ডাইঅক্সাইডে লেপে-পুঁছে একশা করে দিয়েছি আমরা।

সেকালে, এই কালবৈশাখী-ধোওয়া জ্যৈষ্ঠের আকাশ ছিল নিরঞ্জন, নির্মল, নীল। প্রতি রাতের প্রতিটি মুহূর্তে চন্দ্রপুরীর প্রাসাদ থেকে প্রদীপহস্তা ত্রয়োদশ রাজমহিষী পথচারীদের পথ দেখাতেন; অশ্বিনী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণী মায়েরা। তোরা তাঁদের চিনিসই না। সপ্তর্ষির আশ্রমে জ্বলত সাতটি ঘৃতপ্রদীপ। চিত্রা-স্বাতী-জ্যেষ্ঠা মায়ের দল পথচারীকে ডেকে বলতেন; ভয় কি রে? ব্রহ্মহৃদয় স্বস্তিবিচন শোনাতে। আর দণ্ডধারী কালপুরুষ পাহারা দিতে হাঁকাড় পাড়তেন : হুঁশিয়ার!

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

তাছাড়া অশ্চালনার রীতিনীতিও তো তোরা জানিস না। হয়তো ঘোড়ার গাড়িই চড়িসনি জীবনভর। তোদের দৌড় তো ট্রাম-বাস আর মেট্রোরেল! কিছু সৌভাগ্যবতী—ওই যাদের কর্তারা কম্পুটার শিখে আজ বিশ-পঞ্চাশ হাজারি মনসবদার—তারা হয়তো চেনে মারুতি অথবা টাটাসুমো। পাল্কির দুর্লকি চাল তো শুনেছিস শুধু হেমন্তর গানে। গো-গাড়ির অস্থিবিদারক উথাল-পাতাল চিনিস? তাই জানিস না—গৃহাভিমুখী অশ্বারোহীকে লাগাম ধরতেই হয় না। নীরন্ধ অন্ধকার ভেদ করে সে আরোহীকে তার ভিটেয় পৌঁছে দেয়। যেখানে তার আস্তাবল।



অর্গলবদ্ধ সদরদ্বারে করস্পর্শমাত্র ভিতর থেকে সশব্দ প্রশ্ন হল : কে?

রূপেন্দ্রনাথ আত্মপরিচয় দেওয়া মাত্র দ্বার গেল খুলে। ভিতরে প্রবেশ করে দ্বারটি অর্গলবদ্ধ করতে করতে প্রশ্ন করেন, শিবনাথ আসেনি এখনও?

—না।

—মামণি কোথায়?

—ঘুমিয়ে পরেছে।

—এত সন্ধ্যারাত্রে? খেয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাবে মালতী যা বলল তাকে বলা যায় অবাস্তব, অসংলগ্ন কথা। বললে, আপনি কি আর একটু ঘুরে আসবেন, ঠাকুরপো?

—ঘুরে আসব? কেন? কোথা থেকে?

—বনজঙ্গল অথবা দামোদরের ধার থেকে?

—কেন? এখন আবার ঘুরতে যাব কেন?

—না, মানে আর এক প্রহরের মধ্যেই শিবুভাই এসে যেত।

রূপেন্দ্র প্রত্যুত্তর করলেন না। এগিয়ে গেলেন দাওয়ার দিকে। ঘটিতে জল ভরাই ছিল। হস্তপদ প্রক্ষালন করে অঙ্গরাখায় মুছলেন। দেহ ক্লান্ত, মনও। দাওয়ায় মাদুর পাতা ছিলই। বসলেন তাতে। উপাধানটা টেনে নিলেন—না আজ আর তার পাশে কোন রেকাবি-টেকাবি নেই। তালপাখা ছিল। সেটাই তাড়াতাড়ি জবরদখল করলেন—যেন বে-হাত না হয়ে যায়।

—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বউঠান? বসুন।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঠায়। এবার বসল। মাদুরেই। তবে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে।

—মামণি সন্ধ্যারাত্তেই ঘুমিয়ে পড়ল যে? জ্বর-টর হয়নি তো?

—না।

—খেয়েছে?

—না।

—কেন? অভিমান?

—হ্যাঁ।

—কার ওপর? আপনার?

—না!

মালতী আজ 'হাঁ-না'-র বাহিরে পা দেবে না। অস্তি আর নাস্তি। স্বস্তি নাই। কর্মক্লাস্ত গৃহস্থামী সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলে গৃহটি কলমুখরিত হয়ে ওঠে সেটাই স্বাভাবিক। এ ভদ্রাসনে তা হল না। রাতচরা প্যাঁচাটা পর্যন্ত আজ ডাকতে ভুলে গেছে। ঝিকি পোকাগুলোর বোধহয় স্বরভঙ্গ হয়েছে। অস্বস্তিকর নীরবতা।

মালতীই স্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল, আপনি ওকে ডেকে তুলুন। একবাটি দুধ অন্তত খাইয়ে দিন। আমার কথা ও শুনছে না। কেঁদে কেঁদে শেষে ঘুমিয়েই পড়ল।

—কান্না কীসের? অভিমান তাহলে আমার উপর?

—ও বলছিল 'বাবা আমাকে একটুও ভালোবাসেননা। বাড়িতে থাকতেই চাননা, আজকাল! কোথায়-কোথায় টো-টো করে ঘোরেন।'

রূপেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটা বদল করেন, শুভপ্রসঙ্গ আসেনি খেলতে?

—না!

—দুজনের ঝগড়া হয়েছে?

—জানি না।

আবার সেই অস্বস্তিকর নীরবতা। দীর্ঘসময়! এবারেও নীরবতা ভঙ্গ করল মালতী, আমি এখন কী করি, ঠাকুরপো?

—কালই তো বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আপনার সামনে এখন তিনটি বিকল্প পথ। আপনিই নির্বাচন করবেন। আমি তা শুধু কার্যকরী করতে পারি।

মালতী বলল না যে গতকাল আলোচনাটা শেষ হয়নি। কেন রূপেন্দ্রনাথ ওকে মন্থদীক্ষা দিতে অস্বীকৃত সে কথা অকথিতই আছে।

আবার অনেকটা নৈশশব্দ পাড়ি দিয়ে এবার রূপেন্দ্রনাথই বলে ওঠেন, কাল আপনাকে তিনটি বিকল্প পথের কথা বলেছিলাম। পরে চতুর্থ একটি সমাধানের কথা আমার মনে হয়েছে—

উনি থামলেন। মালতীর চোখদুটি প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সে কিছু প্রশ্ন করল না। ডাগর দুটি চোখ মেলে আরও শোনার জন্য প্রতীক্ষায় থাকল। রূপেন্দ্র বলেন, যদি আমরা দুজন ধর্মত্যাগ করি।

বক্তব্যটা মালতী প্রণিধান করতে পারল কিনা বোঝা গেল না।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

রূপেন্দ্র অহেতুক তাঁর উপবীতটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে নতনেত্রে বলে চলেন, হিন্দুধর্মে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। ভূভারতে তা কোথাও হয়নি, কখনও হয়নি। ব্যতিক্রম হিসাবে দ্রৌপদীর ছিল পঞ্চস্বামী; কিন্তু স্বামীর দেহান্তে পুনর্বিবাহের উল্লেখ পুরাণে বা মহাকাব্যে নাই।

নৈব্যক্তিক উদাসীনতায় এমনভাবে বললেন যেন, একটা তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন ছাত্রীকে। মালতী উৎকর্ণ, কিন্তু শুদ্ধ, অসার। আবার শুরু করেন রূপেন্দ্র, কিন্তু ইসলামধর্মে এর প্রচলন আছে।

উদ্গত অশ্রুকে গলাধঃকরণ করে মালতী কোনওক্রমে বললে, ও-কতা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলে আমি কিন্তু গলায় দড়ি দেব, ঠাকুরপো!

—আপনি ভাববেন না বউঠান যে, ‘ধর্মত্যাগ’ মানে আমার আদর্শকে ত্যাগ করছি। ক্ষেত্রটা বদল হচ্ছে শুধু। যেমন ‘ব্রজসুন্দরী’ মহিলা বিদ্যায়তন’কে আমি ত্রিবেণীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের মধ্যেও অনেক কিছু করার আছে। ‘সতীদাহ’ নেই, কিন্তু ‘তালাকপ্রথা’ আছে। চার-চারজন বিবি রাখার ধর্মীয় অনুশাসন আছে। খ্রীশিক্ষায় তারা আরও পশ্চাদপদ। বোরখা প্রথা—

—থামুন আপনি।

রূপেন্দ্র শুদ্ধ হলেন। এতক্ষণে একটা রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। ব্যঙ্গ করল কাকে? রূপেন্দ্রের ওই উদ্ভট প্রস্তাবেই কি সে অট্টহাস্য করে উঠল?

আবার ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ্য। অনেকক্ষণ পরে মালতী আবার কথা বলে। আমি সব দিক ভেবে সিদ্ধান্তে এসেছি, ঠাকুরপো—আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোনও পথ নেই।

—আপনার শরীরে কিন্তু এখন আপনি একা নন, বউঠান!

—জানি। কিন্তু মাগের পাপে সন্তানকেও মরতে হয়। একথা কি শোনেনি কখনও?

অর্ধশায়িত রূপেন্দ্রনাথ এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। অভ্যস্ত ‘সমংকায়শিরোগ্রীব’। বললেন, অনেক পণ্ডিত বিধান দেন: ‘আত্মহত্যা মহাপাপ’। আমি সে কথা মানি না। মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে আত্মহত্যার। আমার জীবন—আমি রাখব কি রাখব না, এটা শুধু আমার বিবেচ্য। আমার বিবেকের নির্দেশ।

—আপনি তাহলে অনুমোদন করছেন?

—না। করছি না। দৃঢ়ভাবেই করছি না। কারণ আপনার গর্ভে সার্বভৌমদাদার আশীর্বাদ আছে। আপনি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনি তাকে হত্যা করতে পারেন না। তাকে এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় জগতে ভূমিষ্ঠ করার দায়িত্ব আপনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। সে দায়িত্ব পালন করার পর, সন্তানকে কোনও বিকল্প মাতার হস্তে সমর্পণের পর, নিশ্চয় আপনার অধিকার বর্তাবে আত্মহত্যার।

—কিন্তু সে তো অনেকদিনের কথা, ঠাকুরপো। আত্মহত্যা যদি পাপ না হয়—

—আমার বক্তব্যটা শেষ হয়নি বউঠান! রাজপুত্রমণীরা যৌথভাবে জহররত পালন করতেন। তাঁদের নারীত্বের মর্যাদা রাখতে। টুলো পণ্ডিতদের সঙ্গে ‘দোহার’ দিয়ে আমি বলতে পারব না—তাঁরা মহাপাপী! আমার স্ত্রী মঞ্জু, কুমারী অবস্থায় আমার কাছে বিষ চেয়েছিল। আমি স্বহস্তে তাঁর অঞ্চলপ্রান্তে কালকূট বিষ বেঁধে দিয়েছিলাম। মীনুকে আমি শ্রদ্ধা করি। সে তার নারীত্বের মর্যাদা রাখতে আত্মহনন করেছিল। কিন্তু আপনি? আপনি কেন নিজের মনকে বশে রাখতে পারবেন না? আপনি কেন ও পথে পা বাড়াবেন?

—আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না, ঠাকুরপো!

—আরও খোলাখুলি বলি, বউঠান! আপনি আজ দু-মাস মাত্র আছেন এখানে। আমার সন্তানের বিকল্প জননীস্বরূপ। আমাকে আপনি নানাভাবে সেবায়ত্ত্ব করেছেন। আপনার সঙ্গে আমার একটা স্নেহ-শ্রদ্ধা-সৌহার্দ্যের নিবিড় সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। হ্যাঁ, স্বীকার করছি—কেন আমি আপনাকে মদ্রদীক্ষা দিতে অস্বীকৃত। আপনার-আমার সম্পর্কটা আজ আর গুরু-শিষ্যের নয়! তার চেয়ে মধুরতর কিছু একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শুধু আপনার নয়, আমার অন্তরেও। আমিও আপনাকে একই রকম ভালোবেসে ফেলেছি—

—ঠাকুরপো!

—কথাটা আমার শেষ হয়নি, বউঠান! আমার শেষ কথাটাও শুনুন। গুরুদেবের মতের বিরুদ্ধে, বস্তুত তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করে, যেদিন আপনার হাত ধরে সোএগাই গ্রামে ফিরে এসেছিলাম, সেদিন শুধু আপনাকেই নয়, আরও একজনকে আমি কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সে তা জানে না—এই যা। সে আমার বন্ধুর ভবিষ্যৎ সন্তান। সে আমার আশ্রিত। সে আমার অজাত অতিথি। আপনি যদি নিজের অসংযমে আমার সেই সন্তানতুল্য অতিথিকে হত্যা করেন, তাহলে সেই সঙ্গে আপনি আরও কিছু হত্যা করবেন। আমার এই দুই মাসের সুখস্বতিকেও! সেই অজাত অতিথিকে রক্ষা করার শক্তি আমার নাই, হত্যা করার ক্ষমতা আপনার আছে। সে ক্ষেত্রে আমি বাকি সারাটা জীবন মনে করব—মালতী নামে আমার কোনও ভালোবাসার ধন এ বাড়িতে কোনওদিন আসেনি। সে আমাকে ভালোবাসতে পারেনি—আমিও তাকে ভালোবাসতে পারিনি। সে এক ভুগঘাতিনী মাত্র!

এক আর্ত হাহাকারে লুটিয়ে পড়ল মালতী মাদুরের উপর। সৌভাগ্যটা কার জানি না—ঠিক তখনই ভেসে এল বহির্দ্বার থেকে একটা মুক্তির আহ্বান। মালতীকে সান্ত্বনা দিতে, নাকি রূপেন্দ্রনাথকে বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি দিতে?

—বাবাঠাকুর!





কাহিনি যখন এমন ঘূর্ণিপাকে পড়ে, যখন কথাসাহিত্যিক আর হালে পানি পান না—মনে করেন, কাহিনির জটিলতা সমাধানের অতীত, তখন বাধ্য হয়ে তিনি একটা মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা করেন। এটাই প্রথা। ল্যাঠা চুকিয়ে দেবার!

আমাদের ক্ষেত্রে—কাহিনিকার তো ছাড়—তার সৃষ্ট-চরিত্র মহাপণ্ডিত পর্যন্ত খুঁজে-খুঁজে মাত্র চারটি সমাধানসূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার মধ্যে কোনও একটাও গ্রহণযোগ্য নয়। সৌভাগ্য কাহিনিকারের, তাঁকে একটা মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা করতে হল না। কারণ কাহিনির চৌহদ্দির বাহিরে অবস্থিত এক নেপথ্য নাট্যকার—যিনি কোন নাট্যসমালোচকের তোয়াক্কা করেন না—তিনিই হঠাৎ সে হাল ধরলেন। একটা সহজ সমাধান উপহার দিলেন। যাতে ‘সর্পের মৃত্যু অথবা যষ্টির বিনাশ’ কোনওটারই প্রয়োজন হল না। ঘটনাটা ঘটল এভাবে :

জ্যেষ্ঠের গরম। রোদ তেতে ওঠার পূর্বেই তারাপ্রসন্ন সপুত্র গিয়েছিলেন দামোদরে—অবগাহন স্নানে। সঙ্গে আমাদের কাহিনির নায়িকা—রূপেন্দ্রনাথের ‘রূপো-মন-চুরি’।

ওরা দুজনে অনেকক্ষণ বাঁপাই জুরেছে। দুজনেই ইতিমধ্যে সাঁতার শিখেছে। নদীমাতৃক দেশের শিশুরা যেমন শেখে। অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে অনেক ধমক ও ‘পুনর্ধমক’ শুনে পাড়ে উঠে এসেছে। তারাপ্রসন্নের বস্ত্র-পরিবর্তন পর্ব সমাপ্ত; কিন্তু তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে হল। কারণ শুভপ্রসন্ন আর রূপমঞ্জরী এবার পাণ্ডাজীর ছত্রছায়ায় এসে কপালে কৃষ্ণজির শ্বেতচন্দনের চরণ ছাপ নেবে। হঠাৎ তারাপ্রসন্নের নজর হল ঘাট থেকে একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণপণ্ডিত উঠে আসছেন। ভিন গাঁয়ের মানুষ। উর্ধ্বাঙ্গে উড়ুনি। মাথায় ভটাভার। আবক্ষ শ্মশ্রু। গলায় রত্নাক্ষের মালা। তারাপ্রসন্নের সঙ্গে চোখাচুখি হতেই নমস্কার করে বললেন, আমি ত্রিবেণী-ঘাট থেকে আসছি। আমার নাম, শ্রী শীলভদ্র বাচস্পতি। আমার গুরুদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

তারাপ্রসন্নও যুক্ত করে তাঁকে নমস্কার করে বলেন, কী সৌভাগ্য আমার এবং সৌভাগ্যই গ্রামের। আপনি স্বাগত। আমার নাম শ্রীতারাপ্রসন্ন ভাদুড়ী, পিতা শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী। এই গ্রামেই আমার বাস।

—বিলক্ষণ! শুধু বাস কেন? আপনি এ অঞ্চলের ভূম্যধিকারী। রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আপনার সবিশেষ পরিচয় পেয়েছি। রূপেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ; কিন্তু আমরা গুরুভাই।

—জনি। আপনি কি রূপেন্দ্রনাথের সন্ধানে এসেছেন? চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব। কিন্তু আপনি এলেন কীসে?

—ওই নৌকায়। ওটি গুরুদেবের নিজস্ব নৌযান।

—তাহলে অনুগ্রহ করে মাঝি-মাল্লাদের নির্দেশ দিয়ে যান, ওরা যেন নৌকায় রন্ধনের আয়োজন না করে। আমাদের মন্দিরে যেন দ্বিপ্রহরে মায়ের ভোগ-প্রসাদ পেতে আসে। ওরা সোএগ্রাই গ্রামের অতিথি—বিশেষ পুণ্যনন্দ ঠাকুরের সেবক।

শুভপ্রসন্ন এবং রূপমঞ্জরী এসে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করল।

ওঁরা সদলবলে এসে যখন রূপেন্দ্রনাথের ভট্টাসনে উপস্থিত হলেন তার পূর্বেই তিনি রোগি দেখতে বেরিয়ে গেছেন। তবে দ্বিপ্রহরে বাড়িতেই এসে আহার করবেন। মালতী আগন্তকের পা ধুইয়ে দিল। আসন পেতে বসতে দিল। বলাবাহুল্য, প্রণামও করল। ত্রিবেণীর পরিচিত নার্মনিজনের কুশল সংবাদও গ্রহণ করে। বাচস্পতি বললেন, প্রাতঃকালীন অহ্নিকটা তাঁর বাকি আছে। সেটি সমাপ্ত না হলে তিনি জলস্পর্শ করেন না। মালতী ব্যবস্থা করে দিল। সাবেক ঠাকুরঘরে। যেখানে এককালে রূপেন্দ্রর পিতৃদেব পূজা করতেন, জণ্ডঠাকুরণ বা গিরিপিসিমাও করে গেছেন। এখন মালতী ঠাকুরকে ভোগ-রাগ দেয়। রূপেন্দ্র সে কক্ষে নিত্যপূজা করেন না। নিজের শয়নকক্ষে কুশাসনে বসে ধ্যান করেন শুধু। শাক্তবংশের সন্তান হলেও আন্তরিকভাবে তিনি অদ্বৈত বৈদান্তিক।

তারাপ্রসন্ন এতক্ষণ দাওয়ায়-পাতা মাদুরে অপেক্ষা করছিলেন। বাচস্পতি পূজা-ঘরে প্রবেশ করার পর তারাপ্রসন্নের নির্দেশে শুভপ্রসন্ন মালতীকে প্রশ্ন করে, বাবামশাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, তিনি কি ওই ঠাকুরমশাইকে আমাদের বাড়িতে মধ্যাহ্ন আহারে মায়ের ভোগ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করে যাবেন?

মালতী কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। বাচস্পতি মশাই এই ভট্টাসনের অতিথি, অথচ গৃহস্থানী অনুপস্থিত! তাছাড়া ঘরে আনাজপাতি যা আছে...

রূপমঞ্জরী হঠাৎ বলে উঠল, সোনা-মা, জ্যেষ্ঠামশাইকে বরং গিয়ে বলি যে, উনি এখানেই থাকবেন। কিছু অন্নব্যঞ্জন যেন জ্যেষ্ঠামশাই এ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বড়ঠাকুরমশাই নিয়ে আসবেন। দু জনের মতো? কেমন? বাবামশাইও তো দুপুরে আজ বাড়িতে অন্নসেবা করবেন। দুজনে একসঙ্গে বসলে—

শুভপ্রসন্ন ধমক দেয়, তোর কী বুদ্ধি, হট্টা! এ বাড়িতে চারজন লোক, আর দু-জনের মতো পাঠাতে বললি?

শুভ ওকে চিরকাল ওই 'হট্টা' নামেই ডাকে।

মালতী অবাক হল বালক-বালিকা দুটির উপস্থিত বুদ্ধি দেখে।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য



মধ্যাহ্নআহারের পর বাচস্পতি জানালেন যে, তিনি পত্রবাহকমাত্র। গুরুদেব রূপেন্দ্রনাথকে একটি পত্র দিয়েছেন—সেই শীলমোহরাস্থিত পত্রে কী লেখা আছে তা অবশ্য তিনি জানেন না। তবে গুরুদেবের আদেশমতো কাল প্রত্যুষে তিনি মালতীমায়ের সমভিব্যাহারে ত্রিবেণীর দিকে যাত্রা করবেন।

রূপেন্দ্রনাথ বলেন, গুরুদেব যদি তাই আদেশ করে থাকেন তবে তাই হবে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। অপরাহ্নে আমার এক অনুজপ্রতিম শ্রীশিবনাথ দত্ত আপনাকে গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনবে। অনেকগুলি দেবালয় আছে। আমাদের আরোগ্য-নিকেতনও দেখিয়ে আনবে।

বাচস্পতি বলেন, সে সব তো দেখবই। আরও একটি আশ্চর্য জিনিস আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই সোণাই গাঁয়ে।

—কী সেটি?

—‘একবগ্না দিঘি’ এবং তার কার্যক্রম।

—খুবই আনন্দের কথা। গুরুদেব কি অমন একটি সংরক্ষিত পুঙ্খরিণী ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবছেন?

—শ্রীমন্ গুরুদেব কখন কী চিন্তা করেন তা দেবাঃ ন জানন্তি। তবে আমার কৌতূহল প্রচণ্ড। শুনেছি, সেই একবগ্না দিঘির প্রভাবে সোণাই গাঁ থেকে নাকি আত্মিক রোগ সম্পূর্ণ বিদূরিত? সত্য কথা?

—আমার কথা কেন শুনবেন, ঠাকুরমশাই? আমি তো নিমিত্তমাত্র। অপরাহ্নে তো গ্রাম-পরিক্রমা করবেনই। তখন গ্রামবাসীদের মতামত সংগ্রহ করবেন। সেটাই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে।



বাচস্পতি দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত নন, যতই গুরুপাক মধ্যাহ্নভোজন হোক না কেন—তিনি উপনয়নের সময় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেটি কঠোরভাবে মেনে চলেন : ‘দিবা মা শাল্জি’।

তর্কপঞ্চননের পত্রে সন্ধান ছিল : কল্যাণীয়েষু।

পত্রটি ভূর্জপত্রে। দেবনাগরি হরফে, সংস্কৃত।

রূপেন্দ্রনাথ একাগ্রমনে পত্রটি পাঠ করতে থাকেন। মামণি তখন নিদ্রাগত। জ্যেষ্ঠের দাবদাহে গ্রামীণ দ্বিপ্রহরে নেমেছে স্তব্ধতা। মালতী ওঁর শয়নকক্ষের প্রবেশপথে দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষারতা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করছে পত্রপাঠকের প্রতিক্রিয়া। কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। পত্রপাঠকের মুখ ভাবলেশহীন—কোনও প্রভাব পড়ছে না। পত্রপাঠ সমাপ্ত করে রূপেন্দ্র সেটি নামিয়ে রাখলেন। একটি পাথরের নুড়ি দিয়ে সেটিকে সুরক্ষিত করলেন—হাওয়ায় না উড়ে যায়।

মালতীর লক্ষ্য হল ভূর্জপত্রের সঙ্গে আরও একটি পত্র বাবলা-কাঁটায় গাঁথা। অধীরভাবে জানতে চায়, কী লিখেছেন উনি?

রূপেন্দ্র স্নান হাসলেন। বললেন, আপনি আনন্দমাদ্রু গড়া শুরু করতে পারেন বৌঠান। সংবাদ শুভ। আপনার মাতুল-মহাশয় আমাদের দুইজনকে আমন্ত্রণ করেছেন। আপনার ভগিনী অর্থাৎ মাতুল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সরস্বতীমায়ের বিবাহ স্থির হয়েছে। পাত্রটি আচার্যদেবের চতুষ্পাঠীতেই অধ্যয়নরত। কুলপুরোহিতের বংশ। সম্বল পরিবার।

—ওমা! সরির বিয়ে ঠিক হয়েছে! কবে?

—‘আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, মিথুনরাশিষ্টে ভাস্করে’!

—আবার অংবং!

—অর্থাৎ আষাঢ়ের প্রথম দিন। এখনও এগারো দিন বাকি।

—আপনারও নিমন্ত্রণ হয়েছে বললেন না? আমরা দুজনেই যাচ্ছি?

—না, বৌঠান; আমার যাওয়া সম্ভবপর নয়। অনেকগুলি কঠিন রোগি এখন আমার তত্ত্বাবধানে। তাছাড়া আচার্যদেব নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি অতঃপর পাকাপাকিভাবে তাঁর ভদ্রাসনেই থাকবেন। সোএগাইয়ে আপনার অবস্থিতিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি।

মালতীর অকুণ্ঠন হয়। বলে, আপত্তি তো তাঁর চিরকালই ছিল। আবার নতুন করে আপত্তি জানানো হল কেন?

—আমার কয়েকটি আচরণ লোক-মারফত তিনি জেনেছেন এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাই এই নির্দেশ। বোধকরি, আমাকে শাস্তি দিতে।

—আপনার কোন অপরাধ? কোনটায় তাঁর আপত্তি?

—তাঁর আপত্তি আমার একাধিক আচরণে। প্রথমত, সোএগাই পঞ্চায়েতের বিচারসভায় আমি বলেছিলাম যে, এ গ্রাম থেকে বিতাড়িত হলে আমি ত্রিবেণীতে চলে যাব। সেখানে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করব ‘ব্রজসুন্দরী মহিলা শিক্ষায়তন’। সে ঘোষণা নাকি আমার পক্ষে ‘অনধিকারীর দস্ত’! কারণ আমি তার পূর্বে আচার্যদেবের অনুমতি গ্রহণ করিনি। তৎভিন্ন, তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে। তাঁর বিশ্বাস, সম্ভ্রান্তগৃহের পুরুললনার দল শিক্ষিতা হলে ‘ব্যাপিকা’ হয়ে উঠবেন—

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

মালতী জানতে চায়, ‘ব্যাপিকা’ কাকে বলে?

—যে স্ত্রীলোক স্বাধিকারপ্রমত্তা, চঞ্চলা, প্রগল্ভা। যারা সন্তানপালন অপেক্ষা প্রসাধনে বেশি আসক্ত, যারা পতিদেবতার সেবা করার পরিবর্তে পরপুরুষ সেবায় আগ্রহী!

—বুঝলাম। আর কী অভিযোগ এনেছেন আপনার গুরুদেব?

—গুরুদেব নয় বৌঠান, তিনি আমার আচার্যদেব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল মালতী। ত্রিবেণীর পঞ্চানন-ঠাকুরের উল্লেখ করতে উনি বরাবর ‘গুরুদেব’ শব্দটি ব্যবহার করতেন। তাই প্রশ্ন করে, ‘গুরুদেবকে ‘আচার্যদেব’ বলছেন যে আজ?

—সে প্রসঙ্গ থাক। আপনি জানতে চেয়েছিলেন, ‘আর কী অভিযোগ’। হ্যাঁ, আরও একটি গুরুতর কারণে উনি আমাকে তীব্র ভৎসনা করেছেন। লোকপরম্পরায় উনি জ্ঞাত হয়েছেন যে, একটি যবনীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে আমি নাকি তাকে—

—‘মোহগ্রস্ত’ হয়ে? তাই লিখেছেন উনি?

—বলা কঠিন। সংস্কৃতভাষায় তিনি মহাপণ্ডিত। তাই তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার বিবিধ অর্থ। প্রথমত, ‘কামমোহিতের মনোভাব’, দ্বিতীয়ত, ‘করুণার মনোভাব’।

—তা, কোন্ অর্থে শব্দটা উনি ব্যবহার করেছেন?

—তা তো নিশ্চিত করে বলা সম্ভবপর নয়। তবে পরবর্তী পঙ্ক্তিতেই তিনি যে ভাষায় আমাকে ভৎসনা করেছেন তাতে প্রথম অর্থটিই গ্রাহ্য। যাকে আমি মোলায়েম করে আপনাকে বলেছিলাম; ‘মোহগ্রস্ত’—বস্তুত ‘কামোন্মত্ত’!

হঠাৎ একেবারে অন্য কথা বলে বসল মালতী, ঠাকুরপো আমি ত্রিবেণীতে যাব না। সরির বিয়ের নিমন্ত্রণে গেলে তিনি আর আমাকে ফিরে আসতে দেবেন না।

—তাহলে কী করবেন? এখানেই কয়েকমাস যন্ত্রণা সহ্য করে যাবেন? ভারমুক্ত হবার পর আত্মহনন?

মালতী দাঁতে-দাঁত দিয়ে বললে, আপনি ভারি নিষ্ঠুর!

—না, বৌঠান! আমি শুধু আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে, এটা আপনার ‘শাপে বর’! আপনার ত্রিবেণী প্রত্যাগমনের একটি শোভন কৈফিয়ত। কেউ বলবে না—ভ্রষ্টাচারী কামুকটার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে ঘনশ্যাম সার্বভৌমের বিধবা পালিয়ে বাঁচল!

মালতীর ডাগর চোখদুটি জলে ভরে উঠল।

—এ চোখের জল আপনার আনন্দাশ্রু হওয়ার কথা, বৌঠান। আপনি জানেন, যার ভদ্রাসনে আপনি আছেন সে লোকটা কামুক, ভ্রষ্টাচারী নয়; কিন্তু এ গাঁয়ের অনেক খরজিহু সমাজপতি আমাকে সেই বিশেষণে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে খুশি হবেন। তাঁরা চান না, আমি স্ত্রীলোকদের শিক্ষিত করে তুলি। তাঁরা চান না যে, সতীদাহ প্রথায় আমি

পাখা দিই, অথবা অস্ত্রজ পরিবারগুলিকে উন্নততর করায় সচেষ্ট হই। কিন্তু তাঁরা আমার বিরুদ্ধাচরণও করে উঠতে পারেন না। কারণ গ্রামের সাধারণ মানুষ আমার এই প্রতিবাদী চরিত্রটাকে শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া রোগ-ভোগে আমাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন বৌঠান—এর অপেক্ষা শালীন, ভদ্র, সুন্দর সমাধান আর কিছু হতে পারত না।

মালতী নতনেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলে, আপনি সরির বিয়েতে যাবেন না?

—এটা কি একটা প্রশ্ন হল? সে তো অসম্ভব।

—আর একটা কথা। আপনি আমার সে প্রশ্নটা চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন। পঞ্চানন ঠাকুরকে আপনি ‘গুরুদেব’ না বলে আচার্যদেব বলছেন কেন?

—যেহেতু তিনি তাই। উনি আমার মন্ত্রগুরু নন, দীক্ষাগুরু নন, ‘শিক্ষাগুরু’—আচার্যদেব!

—আপনি পঞ্চানন ঠাকুরকে ‘গুরু’ বলে মানেন না? তাঁর সব আদেশ বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে প্রস্তুত নন?

—নিশ্চয় নয়। চতুর্বেদেবের সব অনুশাসনই আমি বিনাপ্রশ্নে মেনে নিতে পারি না।

—আপনি স্বীকার করেন না : বেদ অত্রাস্ত!

রূপেন্দ্র মৃদু হাসলেন। বললেন, বৈদিক বর্ণনায় পড়েছি তাঁরা ক্ষেত্রবিশেষে গো-মাংস ভক্ষণ করতেন। সেই নির্দেশে গো-মাংস ভক্ষণ এখন হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়? আপনি কী বলেন?

মালতী স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, আপনি মহাপণ্ডিত। আপনার সঙ্গে আলোচনা করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু ‘বেদ অত্রাস্ত’-একথা না মানলে কি হিন্দু থাকা যায়?

—যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মে থাকা যায় না। জাবালি বৈদিক মন্ত্রকে অত্রাস্ত বলে স্বীকার করতেন না, তবু তিনি সর্বজনস্বীকৃত এক মহামুনি। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধও বেদকে স্বীকার করেননি।

—তিনি তো বৌদ্ধ?

—শ্রীচৈতন্যদেব যেমন বৈষ্ণব। কিন্তু এঁরা সকলেই ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্যের ধারক। এঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ!

মালতী আকুল হয়ে প্রশ্ন করে, ত্রিবেণীর পঞ্চানন ঠাকুরকে আপনি অপ্রতিবাদে মানেন না, শাস্ত্র মানেন না, বেদও মানেন না। তাহলে আপনি কী মানেন? কার নির্দেশ মানেন?

—বিবেকের। আমার সাধনায় ‘আত্মদীপ’ হয়ে ওঠার।

—‘আত্মদীপ’! তার অর্থ?

—সে কথা বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে, বৌঠান। আপনি এখনও অভুক্ত। পরে আপনাকে বুঝিয়ে বলব।



সন্ধ্যা সমাগমে ওঁরা ফিরে এলেন। অপরাহ্নে শিবনাথ অতিথিকে গোটা গ্রাম ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। শুভ্রপ্রসন্ন আর রূপমঞ্জরীও সঙ্গে ছিল। সোএগইয়ের দেবালয়গুলি বাচস্পতি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। প্রতিটি মন্দিরে প্রণাম করলেন। যে তালবৃক্ষ থেকে বেঁটা-বায়েন গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয়েছিল সেই এক-পায়ে-খাড়া শহিদমিনারটিকে দেখলেন। জমিদারবাড়ি এবং আরোগ্য নিকেতনও দর্শন করলেন। একবগ্না দিঘিটাকে তিনি সবাইকে নিয়ে কী-জানি-কেন প্রদক্ষিণ করলেন। বলেন, এমন চতুষ্কোণ পুঙ্করিণী আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি, যার কোনও কোণই সমকোণ নয়। এরই নাম ‘একবগ্না দিঘি’?

রূপমঞ্জরী বলে, সেটা ওর ‘ডাকনাম’। ভালো নাম, ‘নিপাতনে সিদ্ধ’।

—কী নাম? ‘নিপাতনে সিদ্ধ’! বাঃ! কে দিয়েছে অমন নামটি? বন্দ্যোঘটি মহাশয়? মানে তোমার বাবামশাই?

—আজ্ঞে না। নামকরণ করেছে ভিন গাঁয়ের একটি ছেলে। তাকে আমি চিনি না।

—‘নিপাতনে সিদ্ধ’ কাকে বলে জানো? কেন ওর অমন নাম হয়েছে তা বলতে পারো?

রূপমঞ্জরী বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবামশাই আমাকে বুঝিয়ে বলেছেন। ‘নিপাতনে সিদ্ধ’ মানে এমন একটা শব্দ যা ব্যাকরণ মানে না। অথচ তার মানে বোঝা যায়, সেটা সবাই মেনে নিয়েছে। আর যেটা ভাষার মঙ্গলবিধান করে।

—বাঃ! সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছ তুমি! তা একবগ্না দিঘির অমন নাম কেন হল তা বলতে পারো?

ছয় বছরের বালিকাটি একটু বিহ্বল হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তার বাল্যবন্ধু শুভপ্রসন্ন : দেখুন ঠাকুরমশাই, পুঙ্করিণী নির্মাণের একটা প্রচলিত রীতি আছে। এ সেটা মানেনি। তবু সকলের স্বীকৃতি পেয়েছে। আর ‘নিপাতনে সিদ্ধ’ শব্দ যেমন ভাষাকে সুসুন্দর করে এই সংরক্ষিত জলাশয়টিও তেমনি সমাজের সমৃদ্ধি বিধান করছে—আত্মিক রোগকে বিদূরিত করে। তাই ও ‘নিপাতনে সিদ্ধ!’

বাচস্পতি অত্যন্ত প্রীত হলেন।

শিবনাথ ওঁদের ফিরিয়ে এনে মালতীকে বলেছিল, আজ রাতে আর আমি আসব না দিদি। রাত-বিরেতে যদি রোগি বাড়ি থেকে বাবাঠাকুরের ডাক আসে তাহলে ত্রিবেণীর ঠাকুরমশাই তো আজ থাকবেন।

মালতী বলেছিল, ঠিক আছে। তোমাকে আজ আর আসতে হবে না। কাল থেকেও নয়। কারণ কাল ভোরবেলায় আমি ওঁর সঙ্গে ত্রিবেণী ফিরে যাব।

—আবার কবে ফিরে আসবেন?

জবাব দিতে মালতীর গলাটা কেঁপে গেল। বললে, তা কি এখনই বলা যায়? সেখানে আমার ছোটবোনের বিয়ে। পয়লা আষাঢ়। সেসব মিটলে...দেখা যাক...

শিবনাথ তার দিকে প্রণাম করল। মালতী বলে, একটু বসে যাও ভাই। ওবেলা অনেকটা পরমান দিয়ে গেছেন বড়ঠাকুর। তুমি একবাটি প্রসাদ খেয়ে যাও।

বাচস্পতি একাহারী। তদুপরি ওবেলায় গুরুপাক আহার হয়েছে। দু-একটি ফলমূল শুধু মুখে দিলেন। আর পূজার প্রসাদ কিছু স্কীরের নাড়।

সারাদিনে মালতী তার জিনিসপত্র বেঁধে নিয়েছে।

বিকালে মীনুখুড়িমার বাড়িতে গিয়েছিল। বিদায়-প্রণাম সেরে আসতে। ও যে আর কোনওদিন সোঞাইয়ে ফিরে আসবে না একথা কাউকে বলেনি। সবাই জানল ও বোনের বিয়েতে ত্রিবেণী যাচ্ছে, গিরিপিসিমা ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, হাঁরে মালু, তুই কি আমার ওপর রাগ করে আছিস? কিন্তু দেখ...

মালতী বাধা দিয়ে বলেছিল, আপনাকে একটা গোপন কথা বলব পিসি। কিন্তু কাউকে তা বলবেন না যেন!

গিরিপিসিমার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেল। একটা আতঙ্কের আভাসও যেন ফুটে উঠল তাঁর মুখে। বলেন কী এমন কথা? ঠিগাছে বল! আমি কারেও বলবনি।

—আমি আর কোনওদিন এ-গাঁয়ে ফিরে আসব না, পিসি। এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া।

পিসি বোধহয় খুশি হলেন মনে মনে। মুখে কিন্তু ধমক দিয়ে ওঠেন, ও আবার কী কথা? ষাট-বালাই! আসবি না কেন? মামণির বে-তে এসে তুই না ডাঁড়ালে কাজ্জসিদ্দি হবে?

মালতী জবাব দেয়নি।



বিদায়পর্ব মিটিয়ে ফিরে এসে দেখে ঠাকুরপো দাওয়ার মাদুর পেতে বসে পাখার হাওয়া খাচ্ছেন। একটু দূরে হটী আর শুভ খেলা করছে। ওদের খেলা মানে ছোটোপুটি নয়। শুধু তর্কাতর্কি। শুধু বক্বকম্। শুভ বলে, 'তোমার মাথায় গোবর পোড়া। এমন সহজ কথাটা বুঝিস না?' আর হটী জবাবে বলে, 'তোমার মাথাতেও ঘোড়ায় ডিম পেড়েছে! তুমি কিছুই জানো না!' ওদের এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই দ্বন্দ্ব।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধবা

মালতী ঘটির জলে পা-ধুয়ে মাদুরের একান্তে বসে পড়ে। বলে, ঠাকুরপো, আপনি তো মহাপণ্ডিত! আমার একটা সমস্যার সমাধান করে দেবেন?

—কী সমস্যা?

—এ আমার জিত হল, না হার? জয় না পরাজয়?

—আর একটু বিস্তারিত করে বলুন?

—আমার এই ত্রিবেণীতে ফিরে যাওয়াটার কথা বলছি। এ কয়দিন দুশ্চিন্তায় পাগল-পাগল হয়ে উঠেছিলাম। মুক্তির কোনও আশা ছিল না। এমনকি—আপনি জানেনই—একটা চরম সিদ্ধান্তের কথাও আমার মাথায় এসেছিল। তারপর হঠাৎ এল এই সমাধান। সসম্মানে এই কারাগার থেকে মুক্তির সুযোগ—

—তবে তো জিতলেনই আপনি?

—কিন্তু সব কিছু ছেড়ে যেতে আমার যে বুকটা টনটন করে উঠছে, ঠাকুরপো। বিয়ের পর স্বপ্নরবাড়ি যাওয়ার সুযোগ হয়নি। গিয়েছিলাম বলভদ্রের কারাগারে। সেখানে আমার অধিকার ছিল দাসীবাদিরও অধম। অথচ সোএগই গাঁয়ে এসে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলাম। এ বাড়িতে গৃহিণীর মর্যাদা পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এ ভিটেটা আমার। ওই পূজার ঘর, ওই পাকঘর, ওই তুলসী মঞ্চ—সব—সব আমার। পেয়েছিলাম মামণিকে। আর আপনার স্নেহ-ভালোবাসা! এ সব ছেড়ে যেতে আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে! তাই তো জানতে চাইছি, এ আমার জয় না পরাজয়?

রূপেন্দ্র স্নান হেসে বললেন, এইটাই যে মেয়েদের নিয়তি বৌঠান। তাঁদের যে জয়েই পরাজয়। জিতলেও হারেতে হয়, হারেতে হয়!

—ঠিক বুঝলাম না!

—তাহলে আপনাকে একটা গল্প বলি শুনুন।

হঠাৎ ওপাশ থেকে উৎকর্ণ হয়ে উঠল রূপমঞ্জরী। বললে, আপনি কি এখন সোনামাকে একটা গল্প বলবেন, বাবা?

—হ্যাঁ, মামণি। তুমি শুনবে? চলে এস এখানে।

শুভপ্রসঙ্গের সম্পর্কটা তো ওর সঙ্গে কানের সঙ্গে মাথার। দুজনেই এসে মাদুরের উপর টুমটুম হয়ে বসল। পাশাপাশি। ঘেঁষাঘেঁষি।

রূপেন্দ্রনাথ শুরু করলেন তাঁর কাহিনি :

—প্রায় সহস্রাব্দ পূর্বে আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধধর্মের একটা সংগ্রাম চলছিল—
রূপমঞ্জরী বাধা দিয়ে বলে ওঠে, ‘সহস্রাব্দ’ মানে হাজার বছর। আর ‘সংগ্রাম’ মানে লড়াই! তাই না বাবা?

রূপেন্দ্র ওর পিঠে একটি হাত রেখে বলেন, হ্যাঁ মামণি। তবে এখানে সংগ্রাম মানে লড়াই বা মারামারি-কাটাকাটি নয়। মতবিরোধ।

ওঁর মনে পড়ে গেল—উপাখানের ভাষা ‘বক্তার’ অধিকারে। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত শ্রোতার গ্রহণ ক্ষমতার সমতলে। তাই এবার সহজ ভাষায় কাহিনিটি বিবৃত করতে থাকেন সংক্ষেপে-শব্দর বিজয়, শব্দরদিগ্বিজয় গ্রন্থ অবলম্বনে।

প্রায় হাজার-বছর আগে আৰ্য্যাবর্তের ধর্মজগতে ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করেছে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব। ধীরে ধীরে মাথা তুলছে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বৈদিক কর্মকাণ্ড : পূর্বমীমাংসা-দর্শন এই মতের প্রধান প্রবক্তা তখন গৌড়মণ্ডলের আচার্য কুমারিল ভট্ট। বৌদ্ধ অহঁতদের সঙ্গে তর্কে জয়লাভের জন্য তিনি ছদ্মবেশে সমকালীন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ অহঁৎ আচার্য ধর্মকীর্তির নালন্দা সংঘারামে উপনীত হলেন। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত ভাব, বক্তব্য ও যুক্তিগুলি আয়ত্ত করে নিলেন। তারপর ফিরে আসেন হিন্দুধর্মে। খণ্ডন করেন বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিতদের মত।

এই মহাপণ্ডিত কুমারিল ভট্ট যখন অশীতিপর বৃদ্ধ তখন তাঁর অন্তরে উপস্থিত হল অনুশোচনা এবং তা থেকে নির্বেদ! তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে, ছলনার আশ্রয়ে তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এবং তার ছিদ্রগুলি শিখে এসেছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর স্থির করলেন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন তুবানলে আত্মাচ্ছত্তি দিয়ে। সেই মতো সব আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন গৌড়মণ্ডলে এসে হংকার ছাড়লেন এক যুবক। তরুণ বেদান্তকেশরী : অয়ম্-অহং ভো!

তিনি বেদের কর্মকাণ্ডের উপর স্থাপিত পূর্বমীমাংসা মত খণ্ডন করে উত্তর-মীমাংসার সনাতন ও সার্বভৌম অদ্বৈতবাদ আৰ্য্যাবর্তে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। সেটি বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মীমাংসক আচার্য কুমারিল ভট্টের আশ্রমে উপনীত হয়েছেন। তাঁকে পরাজিত করতে পারলেই তাঁর আৰ্য্যাবর্ত জয় সম্পূর্ণ হবে। তিনি দাক্ষিণাত্যের মহাপণ্ডিত যুগাবতার শঙ্করাচার্য!

শঙ্করের অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে কুমারিল বললেন, আপনি বড় বিলম্বে এসেছেন আচার্য শঙ্করদেব। আমি এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি। তবে আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না। আপনি গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ মহাধামে চলে যান। সেখানে নগরপ্রান্তে অরণ্য-আশ্রমে আছেন আমার প্রিয়শিষ্য মীমাংসক মণ্ডন মিশ্র। তাঁকে তর্কে পরাস্ত করতে পারলেই আমি স্বীকার করে নেব যে আপনার গৌড়বিজয় সুসম্পন্ন। শঙ্কর বলেন 'তথাস্তু'! কিন্তু আমাদের বিচারসভায় মধ্যস্থ বা বিচারক কে হবেন? কুমারিল বললেন, 'বিচারক হবেন মণ্ডন মিশ্রের বিদূষী সহধর্মিণী কল্যাণীয়া উভয়াভারতী।' শঙ্কর কিছু বিচলিত। বলেন, 'মহিলা বিচারক? তিনি কি..' কুমারিল মধ্যপথেই বলে ওঠেন 'তাকে অনুপযুক্তা মনে করলে আমি তাঁর নাম প্রস্তাবই করতাম না। তত্ত্বিন্ন তাঁর নিরপেক্ষতাও সন্দেহাতীত'।

শঙ্কর স্বীকৃত হলেন। এলেন নবদ্বীপে। রাজসভায় বিচারের আয়োজন হল। একপক্ষে মীমাংসক মণ্ডন মিশ্র। অপরপক্ষে অদ্বৈত বেদান্তের ধ্বজাধারী স্বয়ং আচার্য শঙ্কর। তর্কযুদ্ধের শর্ত হল এই রকম : শঙ্করদেব যদি পরাজিত হন তাহলে তাঁর সম্মাস দণ্ডটি দ্বিগুণিত করবেন। ভারতের চারপ্রান্তে চারটি অদ্বৈত বেদান্তের মঠ-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করবেন! আর যদি মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হন তাহলে তিনি আচার্য শঙ্করের শিষ্যত্ব নিয়ে সম্মাস গ্রহণ করবেন। আশ্রম ত্যাগ করে যাবেন চিরকালের জন্য।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

দীর্ঘকাল উভয়পক্ষের বিচার চলতে থাকে। সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ স্তব্ধ। ক্রমে তর্কযুদ্ধের আলোচ্য তত্ত্বগুলি এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ে উপনীত হল যে, সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ তার নাগাল পেলেন না। শুধু মধ্যস্থ বিচারক উভয়ভারতী নীমিলিত নেত্রে কর্ণময়। দু'পক্ষের বক্তব্যই তাঁর জ্ঞানসীমার পরিধি অতিক্রম করে যাচ্ছে না।

একসময় বিচার শেষ হল। সভাস্থ সকল পণ্ডিত বুঝে উঠতে বুঝে উঠতে পারেন না : কে জয়ী আর কে পরাজিত। উভয় প্রতিযোগী বিচারকের দিকে দৃকপাত করলেন। উভয়ভারতী স্পষ্টভাবে বলে ওঠেন, বিজয়ী হয়েছেন : বিজয়ী হয়েছেন দাক্ষিণাত্যের মহাপণ্ডিত আচার্য শঙ্করদেব।

তার নির্গলিতার্থ : মণ্ডন মিশ্র তাঁর আশ্রম ত্যাগ করে, উভয়ভারতীকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। শঙ্করাচার্য গাত্রোথানের উদ্যোগ করতেই উভয়ভারতী বলে ওঠেন; আচার্যদেব! আপনার গৌড়মণ্ডল বিজয় কিন্তু এখনও সুসম্পন্ন হয়নি। আপনি আমাকেও তর্কে পরাস্ত করলে তবেই আপনার বঙ্গবিজয় সমাপ্ত হবে।

শঙ্করাচার্যের দ্রুতগলে জাগল কুঞ্চন। বলেন, এ কেমন কথা? গৌড়মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আচার্য কুমারিল ভট্ট তো বলেছিলেন মণ্ডন মিশ্রই গৌড় অঞ্চলের একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁকে পরাস্ত করলেই আমার গৌড়বিজয় সুসম্পন্ন।

—যথার্থ কথা। কিন্তু যেমুহূর্তে আপনি আমাকে মধ্যস্থ বা বিচারক পদে ব্রতী হতে আহ্বান জানালেন সে মুহূর্তেই তো আপনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আপনার বিপক্ষপণ্ডিতের সহধর্মিনী আরও উচ্চমার্গের পণ্ডিতা। না হলে তিনি কেমন করে বিচারকের আসন অলংকৃত করেন। তাই নয়?

শঙ্করকে স্বীকার করতে হল, এ যুক্তি খন্ডনের অতীত। বললেন তথাস্তু!

আপনাকেও আমি তর্কে পরাজিত করে আবার অদ্বৈত-বেদান্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা করব। কিন্তু আবার কে হবেন বিচারক?

—আপনার সঙ্গে যে কয়জন অনুচর দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছেন তাঁদের মধ্যে যে কোনো একজনকে স্বীকার করে নিতে আমি সম্মত।

শঙ্করাচার্য তাঁর প্রধান শিষ্য পাদপদ্মকে মনোনীত করে বলেন, এবার বলুন কোন শাস্ত্র বিষয়ে আমরা বিচার করব?

উভয়ভারতী বললেন, আপনিই আপনার মনোমতো বিষয়টি নির্বাচন করুন।

শঙ্কর সবিনয়ে প্রত্যুত্তর করেন, না মা। কোনও মহিলা তর্কিকের সঙ্গে আমি ইতিপূর্বে তর্কসভায় যোগদান করিনি। ফলে, এ সুযোগ আমি আপনাকেই প্রদান করতে ইচ্ছুক। আপনি আপনার মতো যে কোনো শাস্ত্র নিয়ে আমার সঙ্গে তর্কারমুগ্ধ শুরু করুন। আমি তাতেই স্বীকৃত।

উভয়ভারতী বললেন : আপনি যখন আমার উপরেই নির্বাচনের অধিকার দিলেন

—আমি নারী, এই দাক্ষিণ্য দেখিয়ে—তখন আমিই তা স্থির করছি। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্র হবে : মহামুনি বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র!

‘মধুচক্রে’ লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মতো সভায় জাগল একটা মৃদু গুঞ্জন। সর্বনাশ! এ কি অবাস্তব অশালীন কথা উচ্চারণ করলেন উভয়ভারতী! প্রকাশ্য রাজসভায় বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র!!



হাজার বছরের ব্যবধানে সেই চঞ্চলতা যেন অনুদিত হল রূপেন্দ্রনাথের তিনটি শ্রোতার অন্তরে। প্রথমেই প্রশ্ন করল রূপমঞ্জরী - মাত্র ছয় বৎসরের বালিকা : 'বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র' কি বাবা?

আরক্তিম নতনয়না একটু নেড়েচড়ে বসল। আর শুভপ্রসন্নের প্রতিক্রিয়া সর্বাধিক। সহসা সে বহির্দ্বারের দিকে দৃকপাত করে বলে ওঠে - এই যে আমি এখানে। যা-ই!

মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়ায়। হটী তার বস্ত্রাকর্ষণ করে বলে, কেউ তো ডাকেনি শুভদা! কই? কে ডাকছে?

শুভপ্রসন্ন সে কথায় কর্ণপাত করে না। ওর মুষ্টি আলগা করে দ্রুতপদক্ষেপে অন্তর্হিত হয়ে গেল দশবৎসরের বালকটি।

রূপমঞ্জরী বলে ওঠে। আস্ত পাগল! কেউ ডাকেনি; - অথচ আপনি বরং গল্পটা শেষ করুন বাবা। আমি ওকে পরে বলে দেব।

আতঙ্কতাড়িতা মালতী কোনওক্রমে বলে, বড়ো তেষ্ঠা পেয়েছে মামণি। তুমি ও ঘর থেকে একঘটি জল এনে দেবে?

- এফুনি দিচ্ছি সোনামা। আপনি কিন্তু গল্পটা শেষ করবেন না বাবা।

রূপমঞ্জরী দৃষ্টির আড়াল হওয়ামাত্র মালতী ধমকে ওঠেন, আপনার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওসব কথা কি ওদের সামনে বলতে হয়? শুভ তো ছুটে পালিয়ে বাঁচল। নিন, তাড়াতাড়ি শেষটা বলে দিন।

রূপেন্দ্র সকৌতুকে হেসে ওঠেন। বলে, তাই কি পারি? মামণি কি বলে গেল গুলেলেন না?

-ও ছেলে মাণুষ। না বুঝে বলেছে চট করে বাকিটা বলে দিন।

রূপেন্দ্র নির্বাক। কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল। রূপমঞ্জরী ফিরে এল। জলের ঘটিটা নামিয়ে দিয়ে বলে, এবার বলুন- বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে কি আছে?

ছয় বৎসরের বালিকা। অসাধারণ তার স্মৃতিশক্তি। অজ্ঞাত শব্দ দুটি তার জিজ্ঞাসু মস্তিষ্ক বিস্মরিত হয়নি।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

রূপেন্দ্র বুঝিয়ে বলেন, বাৎস্যায়ন ছিলেন পুরাকালের মহাপণ্ডিত এক মুনিঋষি। কামশাস্ত্র তাঁরই রচনা। সেটা কিন্তু কোনও চতুষ্পাঠীতে শেখানো হয় না।

—তাহলে পণ্ডিতেরা কী করে শেখেন?

—ওধু পণ্ডিত নয়, মামণি, প্রত্যেকটি মানুষ —নর এবং নারী সে শাস্ত্র শিখতে পারে। শেখেও! আকাশের দুজন দেবদেবী—অনঙ্গদেব আর রতি—প্রত্যেককে সে শিক্ষা দেন। তার অক্ষর পরিচয় থাক বা না থাক। কেমন করে শেখান জানো? তাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে। ওঁরা দেবতা তো? তাই অনায়াসে সূক্ষ্মশরীরে মানুষের মনের ভিতর প্রবেশ করতে পারেন। মনের ভিতর প্রবেশ করে ‘কামশাস্ত্র’ শিখিয়ে দেন।

—আমাকেও শেখাবেন?

—নিশ্চয়! যখন তোমার উপযুক্ত বয়স হবে। ছোটদের তিনি সে শিক্ষা দেন না। একটা বিশেষ বয়স না হলে কারও সে শিক্ষার অধিকার নেই।

রূপমঞ্জরী তার কাকপুচ্ছশোভিত ছোট মাথাটি নেড়ে বলে, বুঝেছি। যেমন আপনি সেদিন শুভদাকে বললেন যে, উপনয়নের পূর্বে ‘গায়ত্রী’ মন্ত্র শেখানো শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাই না বাবা?

—হ্যাঁ মা। অনেকটা সে রকমই বটে। এবার উপাখ্যানের বাকি অংশটা শোন :

আচার্য শঙ্করদেব বললেন, আমাকে মার্জনা করবেন, মা। আমি তো ‘কামশাস্ত্রে’র কথা কিছু জানি না! আমি যে সংসারাত্মমে আদৌ প্রবেশ করিনি। ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপ্ত হতেই আমি সরাসরি সন্ন্যাসাত্মমে প্রবেশ করেছিলাম।

উভয়ভারতী বলেন, সে সমস্যা আপনার। কোন হেতুতে কোন শাস্ত্র আপনার অনধীত তা জানার কোনও কৌতূহল আমার নেই, আচার্যদেব। কিন্তু আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন মহামুনি বাৎস্যায়নের ‘কামশাস্ত্র’ ভারতীয় জ্ঞানমার্গের একটি স্বীকৃত গ্রন্থ। তিনি জগৎহিতায় সে শাস্ত্রটি রচনা করেন। ‘গোত্রং নঃ বর্ধতাম্’ এই বৈদিক নির্দেশকে সার্থক করে তুলতে। সে জন্যই হিন্দুধর্মে চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা।

—না, মা। আমি চতুরাশ্রমকে বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করি না। শাস্ত্র বলেছেন ‘যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজ্যেত।’*

—সেটা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত। অদ্বৈত-বৈদান্তিকের মত। সেই মতাদর্শই প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন আপনি। তা কিন্তু এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মানবসমাজের অবলুপ্তি যাতে না হয় তাই আমরা, মীমাংসকপন্থীরা, বিশ্বাস করি ত্রৈবর্গিকের বেদে স্পষ্ট নির্দেশ আছে : চতুরাশ্রমের পথেই প্রতিটি হিন্দুর জীবনযাপন বাধ্যতামূলক। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ একটি ব্যতিক্রম। হয়তো আপনিও তাই হতে ইচ্ছুক। তা, ব্যতিক্রম তো নিয়মেরই পরিচায়ক কিন্তু গৌতমবুদ্ধ থেকে গুরু নানক, তুলসীদাসজি

* মুমুক্শুর অন্তরে যে মুহূর্তে মুক্তির ইচ্ছা জাগবে সেই মুহূর্তেই সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারে। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ কর

থেকে শ্রীচৈতন্যদেব চতুরাশ্রমকে স্বীকার করেছেন।* আমার বক্তব্য তা নয়, আচার্যদেব। আমার বক্তব্য : তর্কের প্রথম পর্যায়ে আপনি আমাকে নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছেন। স্বেচ্ছায়। আমি তা নির্বাচন করেছি : ‘বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র’। এক্ষেপে আপনারও সম্মুখে চতুমার্গপথ উন্মুক্ত। এক : আমার নির্বাচিত বিষয়ে তর্কে অবতীর্ণ হওয়া। দুই : আপনার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে স্বীকার করা যে আপনি সর্বশাস্ত্রবিৎ নন। তিন : প্রমাণ করা যে, ‘বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র’ একটি স্বীকৃত শাস্ত্র নয়। চার : স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। আমি আপনার শিষ্য বিচারক আচার্য পদ্মপাদ মহোদয়ের নির্দেশ প্রার্থনা করি।

বিচারক তাঁর গুরুব—বর্তমানে উভয়ভারতীর প্রতিপক্ষের—দিকে দৃকপাত করে বলেন, আপনার কী বক্তব্য, পূর্বপক্ষ মহাশয়?

শঙ্করদেব বললেন, আমি স্বীকার করছি : বাৎস্যায়ন ঋষির ‘কামশাস্ত্র’ হিন্দুধর্মের একটি স্বীকৃত আবশ্যিক শাস্ত্র। ঘটনাক্রমে আমি সে বিষয়ে অনবহিত। আরও স্বীকার করছি, তর্কের বিষয়বস্তু আমি আমার প্রতিপক্ষকেই নির্বাচন করার সুযোগ দিয়েছিলাম। এখন তা প্রত্যাহারও করতে পারি না।

আবার বাধা পড়ল গল্পে। রূপমঞ্জরী সহসা প্রশ্ন করে বসে, একটা কথা বুঝতে পারলাম না, বাবা। আচার্য শঙ্কর তো বালক নন, যুবাধর—আপনিই বলেছেন, তাহলে অনঙ্গদেব আর রতি তাঁকে ‘কামশাস্ত্র’ শিখিয়ে দেননি কেন?

—আচার্য শঙ্কর যে তাঁর মনের দরজায় কলুষ এঁটে রেখেছিলেন। অনঙ্গদেব আর রতিকে প্রবেশ করতেই দেননি ওঁর অন্তরে। ছাত্র না শিখতে চাইলে কেমন করে শেখাবেন তাঁরা? বলো?

—বুঝলাম। তারপর কী হল, বলুন?

—বিচারক তখন উভয়ভারতীর দিকে দৃকপাত করে বলেন, এ বিষয়ে আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?

উভয়ভারতী বলেন, আছে। নিজের স্বীকৃতি মতে আচার্য শঙ্করের গৌড়বিজয় অসমাপ্ত। তবে এ আশ্রমের প্রধান ইতিপূর্বে পরাজিত। ফলে, তিনি এই দণ্ডেই আশ্রম ত্যাগ করে যাবেন। শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। আমার সমাধান: এক্ষেত্রে আপনার গৌড়বিজয় অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও আপনি আখ্যাবর্তের চারপ্রান্তে চতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। কিন্তু আপনার এবং আপনার চতুরাশ্রমের মঠাধীশের অধিকার শুধুমাত্র দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত থাকবে। গৃহস্থের উপর, গার্হস্থ্যধর্মশ্রমীর উপর, কোনও অনুশাসন জানাবার অধিকার আপনাদের থাকবে না।

মালতী বলে, তার মানে কি শঙ্করাচার্য গৌড়বিজয় করতে পারেননি?

* এখানে আমরা সজ্ঞানে ‘কালানৌচিত্য’ দোষ ঘটিয়েছি—মার্জনা চাইছি।

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

—এ বিষয়ে দুটি মত আছে, বৌঠান। শঙ্করাচার্যের শিষ্যরা বলেন, এরপর আচার্যদেব এক সদামৃত রাজার দেহে সূক্ষ্মশরীরে প্রবেশ করেন। তাকে পুনর্জীবিত করে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন। মহিষীদের সঙ্গে সহবাস করে কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। তারপর উভয়ভারতীর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে তাকে ‘কামশাস্ত্র’ বিষয়ে তর্কে আহ্বান করেন। উভয়ভারতী উপলব্ধি করেন শঙ্কর ‘ঈশ্বর প্রেরিত আচার্য ও যুগমানব’—তিনি পরাজয় স্বীকার করেন বিনা তর্কে। পরে তিনি যোগবলে মরদেহ ত্যাগ করেন।

কিন্তু আমি মনে করি, এ কাহিনি পরবর্তীকালে মঠাধীশদের ‘প্রক্ষিপ্ত’ রচনা। অর্থাৎ তাঁদের মনোমতো সমাধান।

—কেন তা মনে করেন, ঠাকুরপো?

—কারণ আমার বিশ্বাস কোনও যুগাবতারই অলৌকিক কোনও কিছু করতে পারেন না—যতক্ষণ তাঁরা নরদেহধারী ধর্মপ্রচারক। তাঁরা মহামানব, তাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তাঁরা যুগাবতার—কিন্তু যতক্ষণ নরদেহধারী ততক্ষণ তাঁদের প্রাকৃতিক বিধান মেনে চলতে হবে। তাই আমি বিশ্বাস করি না গৌতম বুদ্ধ পদব্রজে নিরঞ্জন নদী অতিক্রম করেছিলেন। ‘নিরঞ্জন’ শব্দের অর্থ নির্মল, অকলঙ্ক, এবং পরমব্রহ্ম। লোকুত্তম বুদ্ধের জীবনীতে আদি সংকলক বলতে চেয়েছিলেন যে, বুদ্ধদেব পরমব্রহ্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও চিন্তাশুদ্ধি মাধ্যমে, তাঁর অহিংসা-ধর্মের মাধ্যমে নির্মল, অকলঙ্ক জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী অহঁতেরা গল্প বানালেন যে, বুদ্ধদেব পায়ে হেঁটে নিরঞ্জন নামে এক নদী অতিক্রম করে যান। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শঙ্করাচার্যকে ওঁরা সূক্ষ্ম দেহে মৃত মহারাজার দেহে প্রবেশ করিয়েছেন। মহারাজকে পুনর্জীবিত করেছেন।

রূপমঞ্জরী আবার প্রতিবাদ করে। একটা কথা বাবা। অনঙ্গদেব আর রতি তো সব মানুষের —মানে তারা একটু বড় হলে—সূক্ষ্মশরীরের তাদের মনের ভিতর প্রবেশ করতে পারেন। তাহলে শঙ্করাচার্যই বা মন্তবলে তা পারবেন না কেন?

—যেহেতু অনঙ্গদেব আর রতি হচ্ছেন দেবদেবী। তাঁরা মানুষ নন। আর আচার্য শঙ্করদেব নরদেহধারী যুগাবতার।

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে ছোট্ট রূপমঞ্জরী বলে, বুঝলাম!

সে স্থানত্যাগের পর রূপেজ্র বলেন, শিশুদের কৌতূহল কীভাবে মেটাতে হয় দেখলেন। ওদের বলতে নেই ‘এসব বড়দের কথা’! আর তাই বলছিলাম, বৌঠান, মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক সময় জয়ই পরাজয়। উভয়ভারতী দু-দুবার বিজয়ী হলেন। প্রথমবার নিরপেক্ষতায় স্থিতধী থেকে, দ্বিতীয়বার কূটকৌশলে। অথচ তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাঁরই বিধানে। বিজয়িনীর পুরস্কার তাঁর চিরবিরহের বেদনা!



রাত এক প্রহর অতিক্রান্ত। সোণাই গ্রামে সেটা মধ্যরাত্রি। কারণ গ্রামবাসী সূর্যালোকে অভ্যস্ত। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তারা কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে, সূর্যাস্ত হতে-না-হতেই শয্যাগ্রহণ।

মামণি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। রূপেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষে একটি ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। গৃহস্বামী ধ্যানমগ্ন। বাচস্পতি শয্যাগ্রহণ করেছেন। মালতী তার জিনিসপত্র—কীই বা আছে তার—খানকতক থান—বেঁধে নিয়েছে একটি পুটুলিতে। তাতে একটি লালপাড় শান্তিপুরীও আছে। এটি দিয়েছেন তারাসুন্দরী। ও যখন তাঁকে বিদায় প্রণাম করতে যায়। তিনি মালতীর হাতে শাড়িটা দিয়ে বলেছিলেন, বিয়েবাড়িতে খালি-হাতে যেতে নেই রে। এটা নিয়ে যা, তোর বোনকে দিস।

তিন চারবার উঁকি দিয়ে দেখে গেছে। ঘৃতপ্রদীপ আর গৃহস্বামী তখনও একে অপরের উপমান। দুজনেই নিবাত-নিদ্রম্প। রূপেন্দ্র সেই একই ভঙ্গিতে ধ্যানমগ্ন : সমংকায়শিরোগ্রীব।

নিশেপ্ধেই দু-তিনবার সে ফিরে গেছে। কিন্তু কাল প্রত্যুষে তাকে রওনা হতে হবে। সূর্যোদয় মুহূর্তে। মাঝিমালায় দিনে দিনেই নৌকা বাইতে চায়। কাল সকালে কর্মচঞ্চলতায় রূপেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে না। মালতীর ইচ্ছা আজ রাত্রেই ঠাকুরপোর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে যাওয়া। আর কেউ না জানলেও তাঁরা দুজন তো জানেন যে, এই ওঁদের শেষ সাক্ষাৎ। আরও—গিরিপিসিমা ব্যতিরেকে এ দুনিয়ায় শুধু ওঁরা দুজনেই জানেন মাত্র দুই মাসে এই দুজন একান্তবাসী নরনারীর মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা অপ্রত্যাশিত স্নেহ-শ্রদ্ধা-সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। বৌঠান আর দেবরের মধ্যে যেমনটা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক।

কিন্তু সেটাও তো শেষ কথা নয়! শেষ কথাটা গিরিপিসিও জানেন না। জানেন না—কী কারণে ওই সন্ন্যাসীপ্রতিম মানুষটি ওকে মন্তবীক্ষা দিতে অস্বীকৃত! অসীম আত্মিক শক্তিদর মহাপণ্ডিতটি সে-কথা স্বমুখে স্বীকার করেছেন। ওর মতো একটি অল্পশিক্ষিতা শ্যামাসিনীর কাছে!

চতুর্থবার এসে দেখল রূপেন্দ্রনাথের ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। তিনি শয্যাগ্রহণের উপক্রম করছেন। বাইরে ঘনাককার। ঘৃত প্রদীপের স্বল্লোলোকিত কক্ষে দেখা যায় মশারির ভিতর মামণি অঘোরে নিদ্রাগত। ঝিল্লির একটানা শব্দ। তাছাড়া চরাচর নিস্তব্ধ। দ্বারপ্রান্ত থেকে মালতী ডাকল, ঠাকুরপো?

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

একটু যেন চমকে উঠলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন। মুখোমুখি। তাঁর উপর্যুপে দীর্ঘ উপবীত ব্যতীত কবচবক্ষ অনাবৃত। খড়মজোড়া খুলে রেখেছেন। বললেন, বৌঠান? বলুন।

—কাল সকালে তো আর সময় হবে না। তাই শেষ বিদায়টা নিতে এসেছি।

একটু যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বললেন, এই সবথেকে ভালো হল বৌঠান। কাল থেকে অবশ্য মামণি তৃতীয়বার মাতৃহীন হয়ে যাবে! কিন্তু উপায় কী?

—আমি কি মামণিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম না?

—কী লাভ? মাত্র দু-মাস আগেই তো সে ছিল ত্রিবেণীতে।

—তা ছিল। তবু বিয়েবাড়ির হই-হল্লা তার নিশ্চয় ভালো লাগত।

—তা হয় তো লাগত। কিন্তু

—কী কিন্তু?

—আপনি তো জানেন, আচার্যদেব আমার উপর রুষ্ট হয়েছেন। ওই যে মেহেরউননিসা সংক্রান্ত বিকৃত তথ্যে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। আপনি যে আমার ভদ্রাসনে থাকবেন এটা তিনি জানতেন। কিন্তু আপত্তি সেবারও জানিয়েছিলেন। আমি তাতে বিচলিত হইনি। কারণ সার্বভৌমদাদার ইচ্ছা ছিল না যে, আপনি ওঁর সর্বতোভাবে আশ্রয় নেন। তখন আচার্যদেব দৃঢ়ভাবে আমাকে বাধা দিতে পারেননি। গুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, বলতে আমারও লাগছে, কিন্তু সার্বভৌমদাদা যে নিদারুণ আঘাতটা করেছিলেন, তার দ্রুত তখনও শুকোয়নি। আচার্যদেব মানসিকভাবে সে সময় কিছু বিচলিত ছিলেন। তাই আপনাকে শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছিলেন—

—তার সঙ্গে মামণির ত্রিবেণী যাবার কী সম্পর্ক?

—সে কথাই বলছি। উনি মুখে না বললেও মনে মনে আমার উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ সার্বভৌমদাদার সেই ব্রাহ্মীহরফে লেখা তিরস্কার-পত্রটির পাঠোদ্ধার করেছিলাম আমরা তিনজন। লেখক স্বয়ং, আচার্যদেব আর আমি। ঘনশ্যামদার উপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। সে ওঁর অসীম ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু আমি? আমাকে তাই তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় ওঁকে প্রকাশ্যে অপমান করেছিলেন। তাই প্রতিশোধ নিতে উনি মামণিকে ওঁর কবজা থেকে ছিনিয়ে নিলেন। আজও ঠিক তেমনি। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে সোএগাই নিয়ে আসায় তিনি আমার উপর ক্ষুদ্ধ হয়েই ছিলেন। তাই এই শাস্তিবিধান।

—আবার একই প্রশ্ন করছি ঠাকুরপো। তার সঙ্গে মামণির...

—কী আশ্চর্য! বুঝলেন না? আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তো আমার প্রথম পাপের শাস্তি—দ্বী শিক্ষাবিন্ডারের অশাস্ত্রীয় প্রয়াসের শাস্তি। কিন্তু তাঁর চতুষ্পাঠীর প্রাক্তন ছাত্রটি যে যবনীর সঙ্গে প্রেমাসক্ত তার শাস্তি হল কই? মামণিকে কবজার ভিতর পেয়ে যদি তিনি নতুন নিদান হাঁকেন? —না, এখন থেকে হট্টা তার পাতানো দাদুর ভদ্রাসনেই থাকবে। রূপেন্দ্রনাথ যেহেতু কুলীন ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও আচার্যদেবের নির্দেশমতো দ্বিতীয়বার বিবাহে অস্বীকৃত তাই মাতৃহীন সংসারে

মামণিকে ফেলে রাখা চলবে না। আমার হিম্মত হবে দ্বিতীয়বার কন্যাটিকে উদ্ধার করে আনার ?

মালতী স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটু অধোবদনে কী যেন চিন্তা করে। শেষে স্বীকার করে, আমি এভাবে ভেবে দেখিনি ঠাকুরপো। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চিতই আপনি ঠিক। মামণিকে ত্রিবেণীতে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

—এবার শয্যাগ্রহণ করতে যান। কাল খুব প্রত্যুষেই উঠতে হবে তো ?

হঠাৎ কী যেন হল মালতীর। এভাবে মামুলি বিদায়পর্বটা শেষ হওয়া যেন তার সইল না। বললে, আমার একটি অনুরোধ রাখবেন, ঠাকুরপো ? একটি ভিক্ষা ?

—অনুরোধ ? ভিক্ষা ! কী ?

—সেটা কিন্তু একটু অশাস্ত্রীয়। তা শাস্ত্র তো আপনি মানেন না।

রূপেন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল মহাভারতের কৰ্ণকুন্তী সংবাদের কথা। অর্জুনের সঙ্গে দৈরথ্যসমরের ঠিক পূর্বে মাতা কুন্তী এসে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দাতাকর্ণের কৰ্ণমূলে এমনই একটা কথা বলেছিলেন বটে। একটি অনুরোধ পেশ করেছিলেন। চেয়েছিলেন একটি ভিক্ষা !

বলেন, শাস্ত্রমতে অদেয় হলেও যা চাইছেন তা দিতে আমি স্বীকৃত, যদি তা আমার বিবেক-নির্দেশের পরিপন্থী না হয়। বলুন ?

—আমি সম্পর্কে আপনার বৌঠান। কিন্তু কোনওদিন আপনাকে আমার পায়ে হাত দিতে দিইনি। কেন দিইনি, তা আপনি জানেন। তেমনি আপনি আমাকে কেন ‘মহাদীক্ষা’ দিতে পারেননি তা আমরা দুজনেই শুধু জানি। বিদায়কালে আমার ভিক্ষা—আপনার শ্রীচরণে আমি একটি প্রণাম করে যাব। আপনি কি গ্রহণ করবেন ?

রূপেন্দ্র বললেন, মানুষের অন্তর্লীন সব হৃদয়বৃত্তিকে শাস্ত্রীয় বিধানে গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না—বিশেষ যে আচরণে সমাজের কোনও অমঙ্গল নেই। তোমার শেষ মনোবাসনায় আমি বাধা দেব না, মালতী। তোমার প্রণাম গ্রহণে আমি স্বীকৃত।

মালতী ওঁর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে। তার থান শাড়িটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে মাথাটা নামিয়ে দিল দণ্ডায়মান রূপেন্দ্রনাথের যুগলচরণে। ওর খোলা চুলে ঢেকে গেল ব্রাহ্মণের চরণদ্বয়।

কিন্তু ঠিক তখনই উচ্ছ্বসিত অন্তরের আবেগে মালতী কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। রূপেন্দ্র বললেন, স্থির হও মালতী ! ওঠ ! উঠে দাঁড়াও। মালতী অব্যাহত হল। দুটি বাহুপাশে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল ওঁর দুটি চরণ। এবার আর অভ্যস্ত মস্ত্রোচ্চারণ করতে পারলেন না : ওঁ নমো নারায়ণায় !

নত হয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরলেন মালতীর দুই অনাবৃত বাহুমূল।

মালতী উঠে দাঁড়াল। ঘৃতপ্রদীপের স্তিমিতালোক দণ্ডায়মান দুটি বিদায়কামী নরনারীর দেহে লুটিয়ে পড়ল। মালতীর নয়নদ্বয় মুদ্রিত—চোখের কোণ দিয়ে নেমেছে জলের দুটি ধারা। রূপেন্দ্র সংযম হারাননি। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কের কোন গোপন

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধবা

রক্তকোষে হঠাৎ ভেসে এল এক ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের দূরাগত ভর্তসনা : ক্যা রে ! তু পিতামহ ভীষ্ম তো নহি হো?

মালতী তার আনন্দলোক থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিতে এসেছে। তার অন্তরের আকৃতিকে সে বাঙ্ঘ্য করতে চেয়েছে একটি শ্রদ্ধানম্র প্রণামের মাধ্যমে। সেটি তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ওই ভাগ্যতাড়িতা সামান্যার প্রেমের মর্যাদা? সেটা কি উপেক্ষিতই থেকে যাবে? তিনি কি তা মিটিয়ে দিতে পারেন না?

এবার অসংকোচে ওকে টেনে নিলেন ওঁর অনাবৃত কবচবক্ষে। মালতীর নিমীলিত ডাগর দুটি চোখ চরম বিস্ময়ে বিস্ফারিত। এ যে অঘটন! এ যে কল্পনাভীত! এ কী হতে চলেছে? জিতেদ্রিয় রূপেন্দ্রনাথ ...

পরমুহূর্তে তার বিস্ফারিত দুটি চোখ সুখাবেশে পুনরায় নিমীলিত হয়ে গেল।

রূপেন্দ্রনাথ চুম্বন করলেন ওই উপেক্ষিতা মন্দভাগিনীর অশ্রুআর্দ্র অধরোষ্ঠ! মালতী শিউরে উঠল না। অনাঘ্রাতা কুমারী কন্যা সে নয়। এ আশ্বাদনে সে অভ্যস্তা—কিন্তু এ কার কাছ থেকে পেল ও? সেই নরম স্পর্শের চরম পুলকে, পরম আনন্দে সে যেন অবশ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে রূপেন্দ্রর বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে শান্তচরণে এগিয়ে গেল নিঃকমণ দ্বারের দিকে। কোনও কথা না বলে।

—মালতী!

দূর দ্বারপ্রান্তে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, না! আর না। যা পেয়েছি তা আমার অমূল্য সম্পদ। এর বেশি আমার সহ্য হবে না। আর ডেক না আমাকে।

—সে কথা বলছি না। মালতী। এবার আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে? আমারও যে একটা ভিক্ষা আছে!

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। রূপেন্দ্রনাথ ভেষগাচার্য তার মতো সামান্যার দ্বারে অর্থী? ভিক্ষা চাইছেন তিনি? তার কাছে? কণ্ঠে ওর স্বর ফুটল না। অবাক বিস্ময়ে তার ডাগর দুটি চোখ মেলে রূপেন্দ্রনাথের মুখে তাকায়। সে দৃষ্টি সপ্রশ্ন। সে দৃষ্টি বাঙ্ঘ্য।

—বিদায়বেলায় তোমাকে যা দেবার দিয়েছি। কিন্তু আমার আর এক অতিথিকে? তাকে যে কিছুই দিতে পারলাম না? খালি হাতে সে যে আজ ফিরে যাচ্ছে!

আবেশের ঘোর এখনও কাটেনি। প্রাপ্তির আনন্দে বোধকরি সে এখনও তন্ময়, তাই বুকে উঠতে পারে না, উনি কী বলছেন, কার কথা বলছেন।

—তোমার অজাত সন্তানের নামকরণটুকু আমি করে দেব। সে যদি মামণির ছোট্ট বোনটি হয়ে দুনিয়াদারি করতে আসে তবে তার নাম দিও ‘শ্যামামালতী’। আর যদি ভাই হয়ে আসে তবে তার নাম হবে : আশ্বদীপ!

—আশ্বদীপ!

—হ্যাঁ মালতী। শেষ বিদায়কালে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরও এই অনুরোধটি করেছিলেন আমাকে। কিন্তু ‘আশ্বদীপ’ সেবার আসেনি। যদি এবার আসে তবে তাকে ওই নামে ডেকো।

মালতী এতক্ষণে সহজ হয়েছে, স্বাভাবিক হয়েছে। কেন হবে না? তার নারীত্ব, তার একান্ত গোপন প্রেমকে তো ওই বজ্রকঠিন পণ্ডিতটি স্বীকৃতি দিয়েছেন! তবে আর সংকোচ কীসের? বলে, তাই হবে! তোমার দেওয়া নামে তাকে যতবার ডাকব ততবারই মনে পড়ে যাবে তোমার কথা। আর এই শেষ বিদায়ের মুহূর্তে যে আশাতীত প্রাপ্তি আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি তার স্মৃতি। কিন্তু তুমি তো ওটা সঠিক বললে না গো! তোমার বন্ধুর অজাত-অতিথিকেও তুমি দিয়েছ কিছু সামান্য সম্পদ!

—দিয়েছি? আমি? সামান্য সম্পদ! কী সেটা?

—ওর ছোট্ট জীবন। আত্মঘাতিনী রাক্ষসী-মায়ের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করেছ তোমার 'নিরঞ্জন' ভালোবাসায়।



কয়েক বৎসর পরের কথা। যাবনিক বিচারে 1753 খ্রিস্টাব্দ। এই কয়বছরে নবাব আলিবর্দি আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। হেঁদুদের জন্য কোরানের বঙ্গানুবাদ অথবা মুসলমানদের জন্য রামায়ণের ফার্সি অনুবাদের খোয়াব অনেকদিন হল ঘুচে গেছে। এখন তিনি তাঁর মসনদ-প্রত্যাশী লোভাতুর দামাদ বাবাজিদের ষড়যন্ত্রজাল থেকে দৌহিত্রকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে দামাদের দিয়ে অনেক অনেক জল বয়ে গেছে। সমাজপতি দুর্গা গাঙ্গুলী মশাই এতদিনে নিশ্চয় বৈকুণ্ঠলোকে দেবতাদের মধ্যে তেজরতি কারবার খুলে বসার উদ্দেশ্য করছেন। গিরিপিসিমাও দেহ রেখেছেন।

আমাদের কাহিনির নায়িকা দশম বর্ষে উপনীতা। তার বালাসঙ্গী শুভপ্রসন্ন এখন চতুর্দশবর্ষীয় কিশোর। দুজনেই ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্রপাঠ শেষ করেছে। রূপেন্দ্রনাথের 'ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যালয়ে' উপাধিদানের প্রথা নেই। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী পর্যায়ে পাঠের আসরে যোগদানের অধিকার পায়। সে বিদ্যালয়ে এখন একটি ছাত্রী—কিশোরী হটী। একটি ছাত্র—তারাপ্রসন্নের একমাত্র উত্তরাধিকারী। দুই বৎসর পূর্বে তার উপনয়ন হয়েছে। সে এখন উপবীতধারী সদ্য-ব্রাহ্মণ। সে শুভকার্যেও কিছু গুণগোলের উপক্রম হয়েছিল। শুভ বায়না ধরেছিল সে মাথা মুড়িয়ে 'বটু' সাজতে রাজি যদি তার দীক্ষা-আচার্য হন রূপেন্দ্রনাথ। তাকে সবাই মিলে অনেক বুঝিয়েছিল যে, রূপেন্দ্রনাথ ভিন্ন গোত্রের— উপবীত গ্রহিধানের

রূপমঞ্জরীর বিবাহ ও বৈধব্য

সময়ে গোত্রের আদিপুরুষের নামোচ্চারণ করে বলতে হয় ‘অমুক গোত্রস্য’। কিন্তু রূপেন্দ্রের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন পাঠ করে শুভ রীতিমতো একবগ্না হয়ে উঠেছে। তারাপ্রসন্ন বাধ্য হয়ে বন্দ্যোঘটিকেই আচার্য হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। উপবীতে গ্রহিৎদানের সময় ঔর্ব, চ্যবন, অত্রি, অসিরা, জমদগ্নি, ঠিক কার যে স্মরণ নিতে হবে সেটা স্বগোত্রের এক ব্রাহ্মণ যথাবিহিত কাঞ্চনমূল্যে শুভর কৰ্ণমূলে বলে দিয়েছিলেন।

একয় বৎসর রূপেন্দ্রের সংসারযাত্রা কীভাবে নির্বাহ হল? গৃহিণীহীন গৃহে?

শিবনাথও এতদিনে একবগ্না। বারণ করলেও কৰ্ণপাত করে না, তাড়ালেও ফিরে আসে। প্রতি রাত্রে দাওয়ায় তার মাদুরটা বিছিয়ে মশারি টাঙিয়ে শয়ন করে : রাত-বিরেতে রোগিবাড়ি থেকে যদি বাবামশাইয়ের ডাক আসে তাহলে মামণি একা পড়ে যাবে না? ভয় পাবে না?







চিত্রাঙ্ক

(1748)

দ্বাদশ পর্ব

পূর্ব আকাশে মেঘসঞ্চার হলে
সুখিঠাকুরের হাজিরা দিতে বিলম্ব হয়ে
যায়, শোভারানির হয় না। সুখি ওঠার
আগেই সে হাজির।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা। সেও ক্রমশ একবন্ধা।
দুর্গা গাঙ্গুলীর বৈকুণ্ঠলাভের পর এখন
একান্নবর্তী পরিবারে কর্তামশাই হয়েছেন

মেজোতরফের কালিচরণ। তাঁর নিষেধে ও কর্ণপাত করে না। কুলীন সংসারে বয়স্থা
অরক্ষণীয়ার আর কিছু থাক-না-থাক দাপটটা থাকে। সাতসকালে এসে হাজিরা দেয়
তার রূপোদার বাড়িতে। প্রাতরাশের ফলমূল কেটে রেকাবিতে সাজিয়ে দিয়ে রান্না
চাপায়। অরক্ষণীয়া কন্যার পাক-করা অন্ন অভক্ষ্য। একবন্ধা ঠাকুর তা মানেন না।
দ্বিপ্রহরে রূপোদা আর মামণিকে পরিবেশন করে নিজেও দুটি অন্নগ্রহণ করে। শেষ
কাজটা তার নিজের গরজে হয়। ওই অজুহাতে সে গাঙ্গুলীবাড়ির ভাঁড়ার থেকে নিয়ে
আসে নানান আনাজ—কলা-মুলা, মানকচু, এঁচোড়, লাউ-কুমড়ো, শাক-সবজি।
সেজগিম্নি একদিন কী একটা প্রতিবাদ করা মাত্র শোভা গাঁকগাঁক করে রুখে উঠেছিল—
'এ-আবাগীও তো ওখানে দুটি গেলে! না কী?' সন্ধ্যায় মামণিকে শুইয়ে দিয়ে সে
ফিরে যায় নিজের বাড়িতে। শোভারানির একটাই সমস্যা—ওঁরা তিনজন ক্রমাগত
'অং-বং-চং' ভাষায় বাক্যালাপ করেন! এ এক বিড়ম্বনা। সে ভাষাটা শোভার মাথার
অনেক উপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু উপায় কী? এটা স্বয়ং বড় একবন্ধার আদেশ!

রাত্রে ইদানীং আর রোগিবাড়ি যান না। শিবনাথের ভরসায় মামণিকে ফেলে রেখে
যেতে ভরসা হয় না। জীবন দত্তকে ঠেকা দিতে পাঠিয়ে দেন। ত্রিবেণীতে সোনা-মার
কোলে এতদিনে নিশ্চয় এসেছে মামণির ফুটফুটে ভাই কিংবা চুমুচুমু বোন। বাবার
কাছে শুনেছে—তার নাম: হয় শ্যামামালতী অথবা আত্মদীপ, ঠিক কোনটা তা অতবড়
পণ্ডিতও জানেন না। সে-যুগে শের শাহর ঘোড়ার ডাকের হুঁয়াদখনি গৌড়বঙ্গ থেকে
শোনা যেত না। দু-দশ ক্রোশ দূরবর্তী আত্মদীপের কুশল-সংবাদ লাভই ছিল দুর্লভ!

চিত্রাঙ্ক

অতি প্রত্যাষে উঠে রূপেন্দ্র পরিদর্শন করে আসতেন তাঁর আরোগ্য নিকেতন। একপ্রহর বেলায় বসত তিনজনের পাঠের আসর। আদিকবি বাস্মীকির মূল রামায়ণ-পাঠ শেষ হয়েছে। তারপর ব্যাসদেবের দিকে যাননি। শুরু করেছেন সংস্কৃত কাব্য। বিক্রমোবর্ষীয়ম্, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ শেষ হয়েছে। এখন চলছে শূদ্রকের মুচ্ছকটিকম্।

রূপেন্দ্র বলেন, ‘মুচ্ছকটিকম্’ কাহিনি বা উপাখ্যান নয়। এটি একটি নাটক। অভিনয়যোগ্য। ‘অভিনয়’—কী বলতো মামণি?

—‘অভি পূর্বক নী-ধাতু অ’। অর্থাৎ অভিনবরূপে নিকটে আসা।

—কে কার নিকটে আসছে?

—দর্শক বা শ্রোতা আসছেন কুশীলবদের নিকটে। অভিনব ব্যবস্থাপনায়। আবার ওঁরা দুজনেই একসঙ্গে আসছেন নাট্যকারের কল্ললোকে। নাট্যকারের মূল পরিবেশ্য রসে।

—ঠিক বলেছ।

—আচ্ছা বাবা, আপনি বললেন, মুচ্ছকটিকম্ ‘কাহিনি’ বা ‘উপাখ্যান’ নয়। এক্ষেত্রে কাহিনি আর উপাখ্যানের প্রভেদ কী?

রূপেন্দ্র শুভপ্রসঙ্গের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, তোমার কী অভিমত ভাদুড়ীমশাই? উনি মাঝে মাঝে শুভকে এই বিচিত্র নামে ডাকেন। যদিও সে ‘প্রাপ্তো তু বোড়শে বর্ষে’ হয়নি তবু মিত্রের মতো এজাতীয় রসিকতা করে পাঠের আসর সরস রাখেন।

শুভপ্রসঙ্গ বলে, দুটোই সমার্থক। ‘কাহিনি’ শব্দটা এসেছে যাবনিক উৎস থেকে : ‘কহানি’ থেকে। আর উপাখ্যান হচ্ছে উপ-আখ্যান। ওদের প্রভেদ হচ্ছে এই যে : কাহিনি কথাকোবিদ বা কবির কপোল কল্পনা। যেমন ‘মেঘদূতম্’; আর উপাখ্যানের উপাদান হচ্ছে সর্বজনজ্ঞাত কোন ঘটনার—বাস্তব অথবা পৌরাণিক—বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি তাকে কাব্যরসে জারিত করে সেটা সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন মাত্র। যেমন ‘কুমারসম্ভবম্’। কবি কালিদাস না লিখলেও আমরা সবাই জানি যে, পতিনিন্দায় সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। পরে হিমালয়দুহিতা রূপে তাঁর পুনর্মিলন হয় মহাদেবের সঙ্গে।

হটী প্রতিবাদ করে, আমার মনে হয় শুভদা ঠিক বলেনি। শুভদা এককালে শুধু মাজায় ঘুলি বেঁধে ওদের দরদালানে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। সেই অজুহাত দেখিয়ে বলা যাবে না যে, শুভদা শিশু!

—এটা তো তোমার ব্যক্তিগত আক্রমণ হল বন্দ্যোষাট-মহাশয়া। কাব্য-সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করো এবার—

—শুভদা যেটার কথা বলল সেটাই উদাহরণ। মহাকবি কালিদাসের পূর্বযুগে, কেউ ওই উপাখ্যানটা জানত না। কিন্তু আজ যদি প্রশ্ন করা হয়: ‘রামগির্যাশ্রমের যক্ষ তার প্রেয়সীর কাছে কাকে দূত করে পাঠিয়েছিল? তাহলে সমগ্র আর্যাবর্তের পণ্ডিত

একবাক্যে বলবেন ‘পুষ্করবংশাবতংস’ মেঘকে! একদিন যা ছিল কল্পকাহিনি আজ তা সর্বজনবিদিত উপাখ্যান!

রূপেন্দ্র শুভপ্রসঙ্গের দিকে ফিরে বললেন, বন্দোঘাট মহাশয়ার যুক্তিটি কিন্তু অগ্রাহ্য করা চলে না। কী বল?

শুভপ্রসঙ্গের মুখ তখন আরক্ত। পরাজয়ের গ্লানি? নাকি তাকে ঘৃণিসর্বস্ব নিরাবরণরূপে এমন প্রকাশ্য বর্ণনায়, সেকথা বোঝা গেল না। আরও একটি হেতু ছিল: রূপেন্দ্রনাথ এ দিকে ফিরতেই হতী তার সহাধ্যায়ীকে জিহ্বা-প্রদর্শন করে মুখ ভেঙেছিল।

রূপেন্দ্র এবার তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন: উপাখ্যান সাধারণত কোনও বৃহৎ সাহিত্য কর্মের খণ্ড কাহিনি: উপ + আখ্যান! যেমন, বাঙ্গালীর রামায়ণে রামসীতা বিরহ-মিলনের কথাই মূল উপজীব্য; তাই ‘অহল্যাউদ্ধার’ একটি উপাখ্যান। আচ্ছা এবার বলো ‘ব্যাজস্ততি’ কাকে বলে? মামণি, তুমি এবার প্রথমে বলো?

—‘ব্যাজস্ততি’ মানে আপাতনিন্দার মাধ্যমে স্তুতি করা! শুনলে মনে হয়, নিন্দা করা হচ্ছে, আসলে করা হচ্ছে প্রশংসা বা স্তুতি।

—তোমার কী অভিমত ভাদুড়ীমশায়?

—হটীর প্রত্যুত্তর অসম্পূর্ণ। ব্যাজস্ততির বিপরীত ব্যবহারও ভাষায় গ্রাহ্য। আপাতপ্রশংসার মাধ্যমে নিন্দাও করা হয়। সেটিও ব্যাজস্ততি।

—এবার কিন্তু তোমার হার হল মামণি! শুভই পূর্ণ সংজ্ঞা দিতে পেরেছে। বেশ, এবার শ্রীমদভগবত থেকে একটা ব্যাজস্ততির উদাহরণ দাও, যেখানে আপাত-প্রশংসার মাধ্যমে নিন্দা করা হয়েছে।

ওরা দুজনেই বলল শ্রীমদভগবত থেকে অমন উদাহরণ ওদের অজানা!

আচার্য বলেন, বেশ, উদাহরণটা আমিই দাখিল করছি। তোমরা দুজনে অল্প-ব্যাখ্যা দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দাও, এটা কীভাবে প্রশংসার মাধ্যমে নিন্দা। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে উনবিংশতিতম শ্লোকে দেখছি নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষি সূতমুনিকে একটি শ্লোক শোনাচ্ছেন:

শ্ববিড়বরাহেষ্টিখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।

ন যৎকর্ণোপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥

মামণি তুমি প্রথমে এর অর্থ বল।

হটী বললে, ‘শ্ব’ হচ্ছে কুকুর, উষ্ট্র এবং খর অর্থাৎ গর্দভ এরা সকলে পুরুষপশুকে স্তুতি জানাচ্ছে।

—‘বিড়বরাহ’টা বাদ গেল কেন?

—ওর অর্থ আমি জানি না।

সুযোগ পেয়ে শুভপ্রসঙ্গ বলে, বিড়বরাহ হচ্ছে বিষ্ঠাভোজী শূকর।

—ঠিক বলেছ। আর ‘পুরুষপশু’ কে? তাছাড়া দ্বিতীয় চরণের অর্থ?

—যে ব্যক্তির কর্ণে গদাগ্রজের নাম কখনও প্রবেশ করে না সে পুরুষপশু!

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু ‘গদাগ্রজ’ই বা কে আর ‘পুরুষপণ্ড’ই বা কে?

শুভপ্রসন্ন বলে, ‘গদাগ্রজ’ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ—যাঁর অগ্রজ গদাধারী বলরাম। বহুব্রীহি সমাস। কিন্তু ‘পুরুষপণ্ড’ যে কে তা ধরতে পারিনি!

—শোনো, বুঝিয়ে বলি। কুকুর বলছে, হে বিষয়ী মানবসন্তান! তুমি আমাদেরই মতো ক্ষুধার অগ্নির সন্ধানে ভিক্ষা করে ফিরছ, তাই তোমাকে প্রণাম করি, তুমি মানব-সারমেয়। বরাহ বলছে, হে মানুষ! আমি রাজভোগ ত্যাগ করে বিষ্ঠায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকি। যেমন তোমরা হরিভক্তির অমৃতভোগ অগ্রাহ্য করে বিষয়বিষ্ঠায় মশগুল। তাই তুমি আমার নমস্য। উটের বক্তব্য : আমরা যেমন রক্তাক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঘাসপাতা না খেয়ে কণ্টকগুলি চর্বণ করে থাকি, তোমরাও সেভাবে হরিসেবা ত্যাগ করে বিষয় বিষে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তাই তোমাকে প্রণাম। আর গর্দভের যুক্তি: আমি বনে ছিলাম, বেশ ছিলাম। তারপর শহরে এলাম-মানুষের মোট বইতে। তুমিও, হে ‘অমৃতসাপুত্র’, সাধ করে আমার মতো জীপুত্র-বল্লভাদির মোট পিঠে বহন করে চলেছ। আমি যেমন গাধার মোট পিঠ থেকে নামাতে পারি না, হে গর্দভশ্রেষ্ঠ, তুমিও তেমনি তোমার বোঝা নামাতে পার না। সুতরাং তুমি আমার অগ্রজ! তোমাকে প্রণাম। এইভাবে বিষয়ভোগী মানুষকে ভাগবত বলছেন ‘পুরুষপণ্ড’। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চারজন পণ্ড বিষয়ভোগীকে প্রণাম করছে, প্রশংসা করছে। বাস্তবে করছে তিরস্কার।



এরপর ‘মুচ্ছকটিকম্’ শেষ হল। আচার্য বললেন, তোমরা দেখ, গুপ্তযুগে সমাজ কত উদার ছিল। চারুদত্তের মতো একজন বিশিষ্ট নাগরিক বাসবদত্তার ন্যায় একজন বারবনিতাকে বিবাহ করলেন। সমাজ তা স্বীকার করে নিল। সেকালীন সমাজ আজকের মতো কুপমণ্ডুক ছিল না। আজকের দিনে যদি কোনও সমাজপতি ভালোবেসে কোনও জনপদবধূকে বিবাহ করেন, ঘরে এনে আশ্রয় দেন, তাহলে সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করবে। শাস্তি দেবে। জনপদবধূ তো দূরের কথা, যদি কোনও ব্রাহ্মণ কায়স্থ-কন্যাকে বিবাহ করতে চায় তাতেও গ্রামপঞ্চায়েতের ঘোরতর আপত্তি! তাকে একঘরে করে ছাড়বে।

এরপর শুরু হল ‘মেঘদূতম্’ পাঠ : “কশ্চিৎকান্তাবিরহপুংগবা...”

তিনজনই পালাপালি করে পাঠ করেন। কিশোর-কিশোরীকে অপ্রচলিত শব্দার্থ আচার্য বুঝিয়ে দেন; ‘নিচুল’ হচ্ছে বনবেতস। পঞ্চাস্তরে কালিদাসের কবিবন্ধুর নাম। ‘দিগ্‌নাগ’ আটটি দিগ্‌হন্তী, যথা ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঙ্কন, পুষ্যদণ্ড, সার্বভৌম, ও সুপ্রতীক। পঞ্চাস্তরে বৌদ্ধদার্শনিক দিগ্‌নাগাচার্য। রূপেন্দ্র বুঝিয়ে বলেন,

টীকাকার মল্লিনাথের মতে এই শ্লোকে কিছু গুপ্ত শ্লেষ আছে। ‘নিচুল’ ও ‘দিঙ্নাগ’ শব্দ প্রয়োগে। কবি বলতে চান: হে বন্ধুবর মেঘ! তুমি রসিক কবি নিচুলের কাব্যে অবগাহন কর; বৌদ্ধদার্শনিক দিঙ্নাগাচার্যের তর্কের স্থূলতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে থেকো না।

আরও বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, যক্ষ বিরহী—তার প্রেমে উৎকণ্ঠা থাকলেও অহেতুক ব্যস্ততা নেই। অলকাপুরীর পথনির্দেশ দিতে বসে যক্ষের মন সমগ্র আর্ঘ্যবর্ত পরিভ্রমণ করছে। যেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মধুর, কল্যাণময়, তার বর্ণনা করছে—এমনকি বলছে “বক্রঃ পত্না যদিমি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশ্যাং” (উত্তর দিকে তুমি যাচ্ছ তা একটু ঘুরপথেই না হয় গেলে, উজ্জয়িনীটা দেখে যেতে ভালো না, সেখানকার পৌরাঙ্গনাদের সৌন্দর্য না দেখে গেলে বুখাই তোমার দৃষ্টিশক্তি।) অথচ মেঘদূতের কবি রূপজ মোহে এবং দৈহিক লালসায় সীমিত নন। কবি সর্বদা সুন্দরমুখী, সুন্দরের উপাসক। সরোবরের গভীর তলদেশে জন্ম নেয় পঙ্কজ, কিন্তু সে তার একান্ত, নিবাত-নিষ্কম্প সাধনায় জলরাশি ভেদ করে জলতলের উপরে উঠে আসে। সূর্যালোক পান করে। কারণ সে সূর্যরশ্মিপায়ী—সূর্যই তার সাধনার ধন। কালিদাসের যক্ষও তেমনি দেহজ কামনার প্রেরণায় প্রথমে তার বিরহিণী যক্ষিণীর প্রসঙ্গ তুললেও ক্রমে সে সমগ্র আর্ঘ্যবর্তের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যায়। তার সাধনা সেই সুন্দরের সঙ্গে মিলনের সাধনা—যক্ষিণীর সঙ্গে দৈহিক মিলন নয়। সে সাধনায় পুরুষ-নারী তাদের পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। “ন সো রমণ ন হাম রমণী/ দুঃমন মনোভব পেশল জানি।” আর সে জন্যই একেবারে শেষ শ্লোকে যক্ষ তার বিরহযন্ত্রণা তুলতে পেরেছে। স্থিতধী ব্রাহ্মণের মতো মেঘকে শেষ শ্লোকে আশীর্বাদ করতে পেরেছে :

‘মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।’*



‘মেঘদূতম্’-এর পর মহাকবি ‘কুমারসম্ভবম্’ও একদিন শেষ হল হর-পার্বতীর মিলনে। সপ্তম সর্গের শেষে। রূপেন্দ্র পুঁথিটি বন্ধ করে ললাটে স্পর্শ করলেন। বোঝা গেল না সে প্রণাম কাকে-‘জগতঃ পিতরৌ’ না কবীন্দ্র কালিদাস।

রূপমঞ্জরী বলে, ওখানেই শেষ? আরও কিছু ভূজপত্র বাকি রয়েছে তো?

* ‘বিদ্যুৎ বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক বন্ধু, বন্ধুর আজি আশীষ লও’—কবি সত্যেন্দ্রনাথ।

‘ঘটে না গো যেন তব সনে ক্ষণ বিচ্ছেদ চপলার’—পণ্ডিত যামিনীকান্ত শর্মা।

—হ্যাঁ মা। এরপরে আছে অষ্টম সর্গ। সেটা থাক।

—কেন বাবা?

রূপেন্দ্র শুভপ্রসঙ্গের দিকে ফিরে বলেন, ওর প্রসঙ্গের জবাবটা জানো? কুমারসম্ভবমের অষ্টম সর্গের কথা কিছু শুনেছ তুমি?

শুভপ্রসঙ্গের মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। মুখ নিচু করে বললে, আমি ঠিক জানি না।

রূপেন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বলেন, মুখ তোলো। শুভপ্রসঙ্গ, তাকাও আমার দিকে।

শুভ তার লজ্জাকর মুখটি তুলে আচার্যের দিকে তাকায়। রূপেন্দ্র বলেন, তুমি জান না, ‘গুরুশিষ্যসম্বাদে’ ‘সত্যমপ্রিয়ম্’ নীতিটা বজ্রনীয়?

রূপমঞ্জরী সরলভাবে জানতে চায়,—অপ্রিয় সত্যটা কী বাবা?

রূপেন্দ্র এবার কন্যার দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ মামণি, ‘কুমারসম্ভবম্’ কাব্যে অষ্টম সর্গও আছে। সেখানে হরপার্বতীর দৈহিক মিলনের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তা আমরা একত্রে পাঠ করব না।

এতক্ষণে গুটততুটা আন্দাজ করতে পেরেছে। এবার বলে, সে অংশটাও কি কবীন্দ্র কালিদাসের রচনা?

—এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা দ্বিমত। আমার সিদ্ধান্ত অষ্টম সর্গও কালিদাসের রচনা। কারণ ভাবামাধুর্যে ও কাব্যরসে সেটি সমভাবেই সমুত্তীর্ণ। সম্ভবত রাজাদেশে কালিদাস ওই সর্গটি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রচনা করেছিলেন। এই পুথির সঙ্গেই সেটা গাঁথা আছে। তুমি বড় হয়ে পড়ে নিও।

কুমারসম্ভবম্ শেষ হল সপ্তম সর্গের ‘অসমাপ্ত গানে’।



রূপেন্দ্র বলেন, কাব্য-নাটক পর্যায় এই পর্যন্তই। আমার সংগ্রহে ভবভূতি, ভাস, এবং কালিদাসের আরও কিছু পুঁথি আছে। তোমরা ইচ্ছামতো তা পড়ে নিও। এবার বরং বলো, আমার কাছে বিশেষ কোন্ মার্গের শাস্ত্র পাঠ করতে চাও। শুভপ্রসঙ্গ প্রথমে বলো, তুমি কোন্ বিদ্যাগ্রহণে আগ্রহী?

—বিভিন্ন ধর্মমতের মূলতথ্য ও তত্ত্ব। উপনিষদ, খেরবাদী শূন্যবাদ, বেদগ্রন্থী এবং বিশেষ করে সর্বেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদ।

হঠাৎ ওর খুঁৎ ধরতে সদাই উদগ্রীব। তৎক্ষণাৎ বলে, তুমি ‘বেদগ্রন্থী’ বললে কেন শুভদা? বেদ তো চারটি! তাই না বাবা?

রূপেন্দ্র ওকে বুঝিয়ে বলেন, চতুর্থ বেদ অর্থাৎ অথর্ববেদ রচিত হয়েছে কালানুক্রমে অনেক পরে। 'ব্রাহ্মণে'র যুগে, উপনিষদের যুগে তিনটি বেদই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই বলা হত 'বেদত্রয়ী'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সূত্রটি "যমযজ্ঞীবিদ্যোঃ বিদুঃ খচঃ সামানি যজুংষি"। তারপর আসে উপনিষদের যুগ। প্রাচীনতম উপনিষদ দুটি। ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক। তাতেও ক্রমাগত তিনটি বেদের উল্লেখ আছে। কিন্তু একটি 'অনুপপত্তি'ও বর্তমান। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমদিকে দেখছি, দেবতারা মৃত্যুভয়ে বৈদিক 'ত্রয়ী' বিদ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। অপর পক্ষে ওই একই উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে এই ভাবে: নারদমুনিকে তাঁর গুরু সনৎকুমার বললেন, 'তোমাকে আমি ব্রহ্মবিদ্যা দেব, কিন্তু তার পূর্বে বলো, তুমি কোন্ কোন্ বেদ অধ্যয়ন করেছ? নারদ প্রত্যুত্তরে স্পষ্টভাবে চারটি বেদেরই নামোল্লেখ করলেন—অথর্ববেদ সমেত। একই ভাবে বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ে 'ত্রয়ী' বেদের নাম রয়েছে, চতুর্থ বেদ বাদে। আবার ওই একই বেদের চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে চতুর্বেদের উল্লেখ আছে। সে যা হোক, তুমি কোন্ বিদ্যা আহরণ প্রত্যাশী, মামণি?

—ওই চতুর্থবেদ; অথর্ববেদ!

গুরু ক্ষণকাল নীরব রইলেন। তারপর বললেন, শোনো মা, বিদ্যা দুই স্তরের। প্রথমটার প্রয়োজন জীবিকার প্রয়োজনে। দ্বিতীয়টি 'জীবন'-এর সন্ধানে। অথর্ববেদ এবং তার অনুক্রম আয়ুর্বেদ, ভেষজবিদ্যা বা চিকিৎসা-বিদ্যা। সেগুলি জীবিকা লাভে সাহায্য করবে; কিন্তু নিজের 'জীবনে'র জন্য তুমি কিছু শিখবে না?

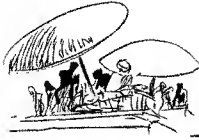
—সব নিয়মেরই তো ব্যতিক্রম থাকে, বাবা! আপনি তো সববিদ্যা-বিশারদ; কিন্তু আপনার 'জীবিকা-বিদ্যাই' কি আপনাকে 'জীবন' দেয়নি? মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে আপনি পূজা দেন না। ঠাকুরঘরেও আপনাকে যেতে দেখি না। আপনি কি আর্তের সেবার মাধ্যমেই 'জীবনের অর্থ' খুঁজে পাননি?

রূপেন্দ্র প্রশান্ত হাসি হাসলেন। বোঝা গেল, এ প্রত্যুত্তরে তিনি গীত হয়েছেন। বলেন, বেশ! কাল থেকে ভাদুড়ীমশাই বেদত্রয়ী অধ্যয়ন করবে—সেই সঙ্গে উপনিষদ আর খেরবাদী শূন্যবাদ। আর তুমি তো স্বীলোক! তুমি চতুর্থবেদ। এ ভালোই হল, জীবন দণ্ডও তাই চায়। আমিও খুশি হব তোমাকে সমাজসেবায় ব্রতী হতে দেখলে, বিবাহের পূর্বেই স্বনির্ভর করে তুলতে পারলে।

'বিবাহ' শব্দটা উচ্চারণ মাত্র দুজনের চোখাচোখি হল।

ওরা দুজনেই জানে; ভাদুড়ীবাড়ির সকল বধুমতাই জীবনে সুখী—তাঁরা কেউ স্বনির্ভর নন। সে প্রয়োজন আদৌ হয় না!

শুধু ভাদুড়ীবাড়িতে নয়, গোটা গৌড়বঙ্গেই কোনও মহিলা স্বনির্ভর নন। বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ষিক্যে পুত্রগণ তাঁদের ভরণপোষণ করে।



ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যালয়—এতদিনে তাকে ‘মহা-বিদ্যালয়’ই বলা সমীচীন, কারণ তাতে বর্তমানে দু-দুটি বিভাগ! প্রথম বিভাগে নানান সঙ্কল্পের সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়—বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, খেরবাদী বৌদ্ধধর্ম। তার আচার্য একজন, ছাত্রও একটি। সেটির পাঠ অপরাহ্ন থেকে সায়াহ্ন।

দ্বিতীয় বিভাগের পাঠ শুধুমাত্র অথর্ববেদ। ওই সঙ্গে আয়ুর্বেদ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান। তার পাঠ সারাদিনই চলে। তারও একজন আচার্য, একজনই ছাত্রী।

বেদত্রয়ের সঙ্গে অথর্ববেদের প্রধান পার্থক্য উদ্দেশ্যগত। তিন বেদের মূল লক্ষ্য: প্রশস্তি জ্ঞাপন করে দেবতার প্রতি প্রার্থনা নিবেদন। অথচ অথর্ববেদের উদ্দেশ্য হল সংসারে মানুষের জীবনযাপনের উন্নতিবিধান। বেদত্রয়ের সম্পর্ক শ্রৌতকর্মের, তার লক্ষ্য মানবধর্ম, অথর্ববেদের সম্পর্ক গৃহকর্মের, তার লক্ষ্য মানবজীবন।

অথর্ববেদের সূত্রগুলি বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম সাতটিতে আভ্যুদয়িক কর্মের মন্ত্রই সমধিক। তার মূল লক্ষ্য দীর্ঘ আয়ু লাভ। এগুলি গার্হস্থ্য ও সামাজিক বিষয়সংক্রান্ত, যা ইতিপূর্বের তিন বেদে আলোচিত হয়নি।

দ্বিতীয় ভাগের পাঁচটি কাণ্ডে আভ্যুদয়িক কর্ম ব্যতিরেকেও কিছু দার্শনিক চিন্তা আছে। কিন্তু সেগুলিও মানবসমাজের হিতার্থে। এই ধরনের সূত্রগুলিকে অপর তিন বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না।

তৃতীয় ভাগের আটটি কাণ্ডের বিষয়বস্তুও সুনির্দিষ্ট।

সূতরাং অথর্বসংহিতায় শ্রৌতকর্মের অপেক্ষা স্মার্তকর্মেরই প্রাধান্য।

প্রায় তিনমাস লাগল অথর্বসংহিতা পাঠ শেষ হতে।

তারপর শুরু হল আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র। বিভিন্ন রোগ ও তার নিরাময়ের ব্যবস্থা। বায়ু-পিত্ত-কফ-এর লক্ষণ-নির্ণয়। নাড়িভ্জান। এই পর্যায়ে আবশ্যিক হয়ে পড়ল মানব শরীরে বিস্তারিত আলোচনা। প্রকট পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপ্রকট অন্তরীন্দ্রিয়ের পার্থক্য। দেহের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহা, শিরা ও ধমনী। আবশ্যিকভাবে উপনীত হল নর ও নারীদেহের পার্থক্যের প্রসঙ্গ। বিভিন্ন গ্রন্থী, পুরুষের অণুকোষ, স্ত্রীলোকের অমৃতরস ভাণ্ডের গ্রন্থী, জরায়ু, প্রসবপথ। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় আচার্য তাঁর শিষ্যকে সবকথা বুঝিয়ে দিলেন। প্রসঙ্গত এল নারীর মাসিক চক্রাবর্তন-ছন্দের কথাও। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার এ বিষয়ে কোনও জ্ঞান ছিল না। বয়স্কা রমণীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যই কি পেয়েছে এতদিন? মাকে হারিয়েছে

জন্মমূহূর্তে, মামণিকে মাত্র পাঁচ-ছয় বছরে। সোনা-মা যখন এ বাড়ি আসেন তখন তাঁর সে চণ্ডবর্ত ছন্দ সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ। ও অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইল: এটা কি সব স্ত্রীলোকেরই হয়, বাবা? প্রতি মাসে?

—হ্যাঁ মামণি। একটু বয়স হলেই। সাধারণত তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে। তোমারও হবে। তখন আতঙ্কিত হয়ে পড়ো না। তোমার শোভাপিসি অথবা বড়বাড়ির তারা বৌঠানকে সে কথা জানিও—লজ্জা কোরো না—ওঁরা শিখিয়ে দেবেন এ-ক্ষেত্রে কী করণীয়। কীভাবে এই বিড়ম্বনা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা যায়।

রূপমঞ্জরী নতনেত্রে শুধু শুনে গেল।

এরপরের ধাপটি: আবশ্যিক কিন্তু অধিকতর বিড়ম্বনার। প্রজননতত্ত্ব। সেটাও ওকে শেখাতে হবে। প্রসবের কথাও। আচার্য তাঁর ছাত্রীকে বুঝিয়ে বললেন, কীভাবে প্রতি মাসে অযুত-নিযুত অনিষিক্ত ডিম্ব রক্তস্রোতে অপব্যয়িত হয়। তারপর হঠাৎ একটি মাত্র ডিম্ব নিতান্ত ঘটনাচক্রে নিষিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। সেই নিষিক্ত ডিম্বটি জননীর জরায়ুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে ভ্রূণে পরিণত হয়। প্রায় আঠারো-উনিশ পক্ষকাল সেখানেই ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। তার নাক-মুখ-চোখ, অন্তরিস্রিয় সব তিল-তিল করে রূপায়িত হয়ে ওঠে। সে কিন্তু শ্বাসগ্রহণ করে না। তার ফুসফুস তখনো কার্যকরী নয়। জননীর রক্তেই তার জীবনীশক্তি জগ্ন প্রাণিত হয়ে ওঠে মায়ের আশীর্বাদ শোণিতে।

রূপমঞ্জরী ওই অনিবার্য প্রশ্নটা আদৌ জিজ্ঞাসা করল না। লক্ষ লক্ষ অনিষিক্ত ডিম্বের মধ্যে হঠাৎ একটি মাত্র ডিম্ব কী ভাবে নিষিক্ত হয়ে ওঠে। কী সেই আশ্চর্য প্রক্রিয়া? যাতে আকৈশোরের অবক্ষয়ী রক্তপাত হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যায়?—নারী তার জীবন সার্থক করে। জননী হয়ে ওঠে। ‘গোত্রং নঃ বর্ধতাম্’ মন্ত্রে পূর্ণাঙ্কতি দেয়।

রূপেন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারেন না—কেন ওই অনিবার্য প্রশ্নটি তাঁর মেধাবী ছাত্রীটি পেশ করল না। সে কি জানে? শুনেছে? বুঝেছে? উনি জানান না। তবে জিজ্ঞাসিত না হওয়ায় তাঁর একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি-লাভ করেন। উনি শেখাতে থাকেন প্রসূতির কী কী সাবধানতা গ্রহণ আবশ্যিক। কোথায় তারা ভুল করে, কীভাবে তা শোধরানো যায়। সবশেষে প্রসব করানোর কথাও।

একদিনেই সব কিছু হল না। কয়েক সপ্তাহ লাগল। রূপেন্দ্রের অনুমান মামণি তার সমস্যাগুলির কথা—যা তার পিতা স্পষ্টাক্ষরে বলেননি—ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে তার শোভাপিসির কাছে। অথবা বড়বাড়ির পুঁটুরানির কাছে।





দিনসাতেক পরের কথা। আরোগ্য-নিকেতন থেকে অসময়ে হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসতে হল। প্রায় মধ্যাহ্নকাল। একটি ঔষধ রাখা আছে ওঁর শয়নকক্ষে। দুর্লভ ঔষধ এবং তীব্র বিষ। তাই সেটি আরোগ্য নিকেতনে রাখেন না। শোভারানি তখন পাকঘরে ব্যস্ত। মামণির কোনও সাড়া পেলেন না। শয়নকক্ষে এসে নির্দিষ্ট সম্পুটক থেকে ঔষধটি সংগ্রহ করার সময় নজর হল—পালঙ্কের অপরপ্রান্তে, প্রায় আয়্যগোপন করে, মামণি খুব মনোযোগ সহকারে কিছু পাঠ করছে। তার একাগ্রতা এত তীব্র যে, সে অনুভব করেনি, উনি ঘরে এসেছেন, সম্পুটক উন্মুক্ত করে তাঁর প্রয়োজনীয় ঔষধটি সংগ্রহ করেছেন। রূপমঞ্জরী যখন কিছু পাঠ করে তখন স্বভাবতই তন্ময় হয়ে যায়—কিন্তু এতটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য তো হয় না!

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, কী পড়ছ ওটা? অত মন দিয়ে?

তড়িতাহতার মতো হট্টা উঠে দাঁড়ায়। তার হাতে একটি পুঁথি। —দূর থেকেই সেটিকে শনাক্ত করতে পেরেছেন। —তবু প্রশ্ন করেন; কী পুঁথি? কুমারসম্ভবম্?

রূপমঞ্জরী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না করে বলে, আপনি কখন এলেন?

রূপেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখলেন—পালঙ্কের ওপ্রান্ত দিয়ে মামণি কৰ্কটগতিতে এগিয়ে গেল—হস্তধৃত পুঁথিটি নির্দিষ্টস্থানে রাখতে।

ক্ষুরধারবুদ্ধি রূপেন্দ্রনাথের বুঝতে কিছু বাকি থাকল না। পুনরায় প্রশ্ন করেন, কী ওই পুঁথিটি? কুমারসম্ভবম্?

শব্দ হল না। শিরশ্চালনে দিল স্বীকৃতি।

—অষ্টম সর্গ?

একটু বিলম্ব হল। মিথ্যাভাষণে অভ্যস্তা নয়। বলতে পারে না। তাছাড়া বাবামশায়ের কাছে মিথ্যাভাষণ তো অকল্পনীয়। পুনরায় নীরবে শিরশ্চালন স্বীকৃতি জানায়।

সহসা রূপেন্দ্রনাথের কী যেন হয়ে গেল! ওর বাহুমূল দৃঢ়হস্তে ধারণ করেন। রূপমঞ্জরী স্তম্ভিতা! বাবামশাই নিষেধ করেছিলেন—সে নিষেধ অগ্রাহ্য করে ও পুঁথিটি পাঠ করছিল। অপরাধবোধ ছিলই! না হলে এই নির্জন গৃহাভ্যন্তরে ও কেন অমন একটা গোপন স্থান নির্বাচন করবে? শোভাপিসি তো দেখলেও বুঝবে না—ও কী পড়ছে! কিন্তু বাবামশাই কখনও তাকে তিরস্কারই করেন না—আজ কি দৈহিক পীড়ন সহ্য করতে হবে? আদেশ লঙ্ঘন করায় ভয় যতটা পেয়েছে, লজ্জা পেয়েছে তার চেয়ে বেশি।

রূপেন্দ্র ওকে জোর করে বসিয়ে দিলেন পালঙ্কের উপর। নিজেও বসলেন তার পাশে। বললেন, তোর মনে আছে মামণি, বহুদিন পূর্বে তোর সোনা-মাকে আমি একটা গল্প বলছিলাম? শঙ্করাচার্য আর উভয়ভারতীর উপাখ্যান?

এই অবাস্তুর প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা ও বুঝে উঠতে পারে না। অবাক চোখে বাবার মুখের দিকে তাকায়। রূপেন্দ্র বলেন, সেদিন আমি বলেছিলাম—অন্তরীক্ষের দুজন দেবদেবী প্রত্যেকটি মানুষের মনে সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করেন একটা বিশেষ বয়সে। মনে আছে সে-কথা? কী রে? মনে পড়ে না তোর?

রূপমঞ্জরী অবাক হল অন্য কারণে। বাবামশাই ওকে বরাবর ‘তুমি’ বলে কথা বলেন। হঠাৎ আজ সে ‘তুই’ হয়ে গেছে! ও নতনেত্রি বললে, হ্যাঁ বাবা। মনে আছে। অনঙ্গদেব আর রতি!

রূপেন্দ্র এবার ওর বাহুমূল ছেড়ে দিয়ে সম্মুখে মাথায় হাত রাখলেন। আত্মগতভাবে বললেন, ভ্রান্তি! আমারই ভ্রান্তি!

—কী ভুল বাবা?

—কালের ভ্রান্তি মা-মণি। আমি শারীরবিদ্যার সাধারণ সূত্রটা তোর উপরেও প্রয়োগ করেছিলাম! সেটাই আমার ভ্রান্তি। কিন্তু অনঙ্গদেব তো ভুল করতে পারেন না! যে মেয়ে দ্বাদশ বৎসরে দেবতাবা আয়ত্ত করে ‘কুমারসম্ভবমে’র অন্তিম সর্গের রসগ্রহণে সমর্থ! তার ক্ষেত্রে তো সাধারণ সূত্রটি প্রযোজ্য নয়!

নিদারুণ লজ্জায় রূপমঞ্জরী অধোবদন হল। অতি বুদ্ধিমতী সে—বুঝে নিয়েছে বাবামশায়ের আপাত-অসংলগ্ন স্বগতোক্তি গূঢ়ার্থ!

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। রূপেন্দ্র ওর মাথায়—এখন আর তাতে ‘কাকপুচ্ছ’ থাকে না। কঙ্কতিকাশাসনে ঘন কৃষ্ণ কেশরাজি কাঁধ ছাপিয়ে পিঠের উপর লুটাজে—হাত বুলাতে থাকেন। একটু পরে বলেন, তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন, মামণি? তুই তো আমার আদেশ লঙ্ঘন করিসনি। আমি তো বলেই ছিলাম; বড় হয়ে নিজে নিজে পড়ে নিতে। ভ্রান্তিটা আমারই। বুঝে উঠতে পারিনি: তুই ইতিমধ্যেই বড় হয়ে গেছিস! মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়সেই।

আবার মাথাটা নেমে যায়।

হঠাৎ একটা অবাস্তুর প্রশ্ন করে বসেন, একটা কথা বুঝিয়ে বল তো, মামণি। শুভপ্রসন্ন আজকাল তোর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। কেন? তোদের কি কিছু...মানে মনোমালিন্য হয়েছে?

রূপমঞ্জরী দু-হাতে তার লজ্জারূপ মুখটা ঢাকে।

—দূর পাগলী! আমার কাছে আবার লজ্জা কী? আমি তো শুধু তোর বাবা নই, আমি যে তোর মা-ও!

হঠাৎ কী হল। রূপমঞ্জরী সবলে জড়িয়ে ধরল তার বাবাকে। হ হ করে কঁদে ফেলে!

অনেকক্ষণ ওর মাথায় নীরবে হাত বুলিয়ে বলেন, আমাকে সব কথা খুলে বল মা!

চিত্রশ্রী

আমি তো জানিই সেই অন্তরীক্ষের দেবদেবী তোদের দুজনের অন্তরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অকালে নয়, সুসময়েই। তোরা দুজনই যে অ-সাধারণ! কিন্তু মনোমালিন্যটা কী কারণে? মতবিরোধের হেতুটা কী?

রূপমঞ্জরী সংকোচ করল না। অধোবদনে বলল, ও হঠাৎ আমাকে অন্য একটা নামে ডেকেছিল। আমি তাতে আপত্তি করেছিলাম। তাতেই ওর রাগ হয়ে গেল। আমার সঙ্গে কথা বলে না আজ নিয়ে চারদিন।

রূপেন্দ্র মনে-মনে হাসলেন। অহোরাত্রের হিসাবটি নিখুঁত—‘দিন চার-পাঁচ’ নয়, চা-রদিন। বললেন, ‘অন্য একটা নাম’? কী নাম? ‘মাজারমুখী’, বা ‘পেচকাননা’ নিশ্চয় নয়! তাহলে তুইও নিশ্চয় তাকে মধুর সম্ভাষণ করতিস : ‘রাসভানন্দ’ কিংবা ‘ছুন্দরগন্ধী’!

এবার হেসে ফেলে।

—লক্ষ্মীটি! বলে দে মা আমাকে! আমি ওকে শাসন করব। নতনয়নেই বলে, ও আমাকে বরাবর ‘হটী’ নামে ডাকে। সেদিন হঠাৎ নির্জনে আমাকে ডেকে উঠল, ‘মঞ্জু’।

—মঞ্জু! এ তো সুন্দর নাম। তাতে তুই এত রেগে গেলি কেন?

রূপমঞ্জরী জবাব দেয় না।

—কী হল রে? ‘মঞ্জু’ তো একটা মিষ্টি নাম। রূপমঞ্জরী>মঞ্জরী>মঞ্জু! অনঙ্গদেবাদেশে অপিনিহিতি কিনা ঠিক জানি না—কিন্তু এমন প্রয়োগ তো অশুদ্ধ নয়। অসুন্দরও নয়।

অধোবদনেই বলে, ওটা যে আমার মায়ের নাম। আপনি মা-কে ওই নামে ডাকতেন না?

—তাতে কী হল? আমি তাই ডাকতাম, তোর বাল্যবন্ধুও না হয় সেই নামেই ডাকল।

—সে কথা নয়! আমার মনে হল, কথাটা আপনার কানে গেলে আপনার মনে পড়ে যাবে তাঁর কথা—যাঁকে ভুলে থাকতে চান!

রূপেন্দ্রনাথ অশ্রুসজল চোখে হেসে ওঠেন। বলেন, এত বুদ্ধিমতী তুই, আর বোকার মতো ও-কথাটা বললি? তাকে আমি ভুলে থাকতে চাইব কেন রে? সে আমার নয়নসম্মুখে নাই, কিন্তু আন্তরগতীতে তো সর্বদাই আছে। রাত্রে সে স্বপ্নের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতেও আসে।

—কে? মা? আপনি তো সেকথা কোনওদিন বলেননি? কই আমার স্বপ্নে তো তিনি আসেন না?

—আসেন। তুই তো তাকে দেখিসনি। তাই চিনতে পারিস না। আমার কাছে এসে তোর সম্বন্ধে কত কথা বলেন—

—আমার সম্বন্ধে! কী কথা বাবা?

—মঞ্জু বলে, ‘মামণিকে যত্ন করে মানুষ করো। আর তার জন্যে একটি টুকটুকে বর পছন্দ করে নিয়ে এস। সে যেন দেবসেনাপতির মতো সুন্দর হয়, আর দেবগুরুর মতো পণ্ডিত।’

রূপমঞ্জরী লজ্জায় মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি।

—তোর মা আরও বলে, ‘ভিন গাঁয়ে ওকে যেতে দিও না বাপু? এই সোণাই-গাঁয়েই অমন ছেলে তো রয়েছে।’ তা আমি বলি, ‘কই, সোণাই গাঁয়ে তেমন কোনো ছেলে তো আমার নজরে পড়ে না!’ তা শুনে তোর মা আমাকে ধমকে দেয়। ‘তা কেমন করে পড়বে? তুমি যে দিবারাত্র পুঁথির মধ্যে ডুবে আছ! তাই ছুছন্দরের মতো অন্ধ। সে তো রোজই তোমার কাছে ‘অং-বং-চঙ’ শিখতে আসে।’ দ্বাদশবর্ষীয়া ‘তরুণী’টি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে।



পরদিন প্রত্যুষেই উনি যাত্রা করলেন—আরোগ্য নিকেতনের পরিবর্তে জমিদার-বাড়ির দিকে। অশ্বপৃষ্ঠে নয়, পদব্রজে। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণটির সুপাত্র সন্ধানে শুভযাত্রা। সেকালে সামাজিক বিধানের নির্দেশ ছিল: ‘অষ্টম বর্ষে তু ভবেৎ গৌরী।’ একবৎসর তা মনোনীত নয়। তাঁর মতে—না, সংখ্যাতত্ত্ব বিচারে নয়—আয়ুর্বেদশাস্ত্র-মতে অনুচা কন্যার বিবাহকাল, একটি বিশেষ ছন্দানুসারে। প্রাকৃতিক বিধানে মাসিক চক্রাবর্তন ছন্দ দ্বাদশ পক্ষকাল পুনরাবর্তিত হওয়ার পর সে বিষয়ে অভিভাবক উদ্যোগী হতে পারেন। পাত্রপক্ষের অভিভাবককে গিয়ে অনুরোধ করবেন: আপনার উপযুক্ত পুত্রটিকে কি অনুমতি দেবেন, আমার কন্যাটিকে বি-পূর্বক বহু-ধাতু ‘ঘঙ’ করতে?

উনি যখন গৃহদ্বার উন্মোচন করে যাত্রা করছেন তখন শোভারানি তাঁকে দূর থেকে দেখতে পায়। সে এ বাড়িতে নিত্যকর্ম সারতে আসছিল। বাসিমুখে রূপোদা কোথায় যাচ্ছে জানবার দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল। কিন্তু সংস্কারবশে ‘পিছু’ ভাকেনি। রূপমঞ্জরীকে জিজ্ঞাসা করে। হ্যাঁরে মামণি, রূপোদা অমন হনহন করে এই সাতসকালে কোথায় গেলেন? মা-কালী না-করুন, কারও কোনও অসুখবিসুখের খবর পেয়ে অমনভাবে ছুটে গেলেন না তো?

রূপমঞ্জরী হাসি লুকিয়ে শুধু বলল, হুঁ! অসুখই তো করেছে!

—কোন বাড়িতে? কার অসুখ?

—এ বাড়িতেই! আমার।

—তোর? কেন, কী হয়েছে তোর?

—ও মা, তা আমি কেমন করে জানব? যার অসুখ করে সে কি জানে তার কী অসুখ করেছে?

শোভারানি ওকে বুক টেনে নিয়ে বলে, বলাই যাট! কী কষ্ট হচ্ছে তোর? কোথায়? বুক?

—হুঁ!

—শুয়ে পড় তাহলে। আমি তোর বুক মালিশ করে দিই।

চিত্রপট্টা

খিলখিল-করে এবার হেসে ওঠে চপলা দ্বাদশবর্ষিয়া কিশোরী বলে, ধুস! আমার কিছু হয়নি। রসিকতা করছিলাম পিসি!

—হিঃ! এমন বদ রসিকতা কি করতে হয়? অসুখ-বিসুখ নিয়ে?



ভাদুড়ীবাড়ির দোরের কাছেই দেখা হয়ে গেল শুভপ্রসঙ্গের সঙ্গে। সে কিছু অবাক হল। পদধূলি গ্রহণ করে বলে, বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা করবেন তো? এত সকালে?

—হ্যাঁ, তারাটা উঠেছে? কোথায় আছে সে?

—আসিক করছেন। আপনি বসুন, আমি মাকে খবর দিই।

—হ্যাঁ, চল। বৈঠকখানায় গিয়ে বসি। মাকে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

তোমার সঙ্গে বরং দু-চার কথা বলি।

বৈঠকখানায় একটি চৌকিতে শীতলপাটি বিছানো। ব্রাহ্মণেরা সচরাচর সেখানে উপবেশন করেন। অপর একটি চৌকিতে ফরাসপাতা। সেটা অব্রাহ্মণ অতিথিদের। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কেদারাও আছে—যবন দর্শনপ্রার্থীদের জন্য সেগুলি চিহ্নিত।

কাল থেকেই তাঁর পিতৃহৃদয়ে এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রফুল্লতার জোয়ার এসেছে: মামণি —বড় হয়ে উঠেছে! কী আনন্দ! তাই প্রথম খেলাতেই রঙের টেকাটি নামিয়ে দিয়ে খেলা শুরু করলেন রূপেন্দ্রনাথ। বললেন, আজ নিয়ে পাঁচদিন ধরে তুমি মঞ্জুর সঙ্গে বাক্যলাপ বন্ধ করে রেখেছ। কিন্তু কেন ভাদুড়ী-মহাশয়?

শুভপ্রসঙ্গ স্তম্ভিত। তার দূরন্ত বিস্ময় প্রকাশিত হল একটিমাত্র শব্দের প্রতিপ্রশ্নে: মঞ্জু?

—হ্যাঁ গো। ওই যে আমার বাড়িতে একটা মুখফোঁড় মেয়ে আছে,— ‘হটী’, না কী যেন নাম!

শুভপ্রসঙ্গ নির্বাক! এ কী ভাষা আচার্যদেবের?

রূপেন্দ্র ওর হাতদুটি টেনে নিয়ে বলেন, বোকা মেয়েটার উপর অহেতুক রাগ পুষে রাখিস না। শোন, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি :

উনি বুঝিয়ে বলেন যে, রূপমঞ্জুরীর মায়ের নাম ছিল ‘কুসুমমঞ্জরী’। তাঁকে উনি ‘মঞ্জু’ নামে ডাকতেন। সে নামটা ওঁর কর্ণগত হলে পরলোকগতা স্ত্রীর স্মৃতি ওঁর মনে জাগরক হবে একথা আশঙ্কা করেই হটী এ সম্বন্ধে আপত্তি করেছিল। আর কিছু নয়।

শুভপ্রসঙ্গ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েই রইল। তার বাক্যস্মরণটি হল না। একটি দাসী বোধহয় ওঁকে বৈঠকখানায় বসে থাকতে দেখে গেছে। ভিতর বাড়িতে সংবাদ দিয়েছে। একটু পরেই তারা প্রসঙ্গ এসে উপস্থিত। রূপেন্দ্রনাথ তাঁর হবু-জামাতার হাত দুটি ছেড়ে দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যাচ্ছে।

—কী ব্যাপার রূপেনভাই? এত সকালে? এ বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়েছে বলে তো জানি না।

—না, তারাদা, সেজন্য আসিনি। আমি আজ এসেছি অন্য একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

—শুনব সে-কথা। তার আগে বলো, আহ্নিক-টাহ্নিক সেরে এসেছ তো? কিছু প্রসাদ আনতে বলি?

—শুধু প্রসাদ কেন? ভরপেট মিষ্টান্নই আহার করে যাব। আগে তুমি রাজি হও। প্রথমে আমার আর্জিটা পেশ করি।

—আর্জি?

—হ্যাঁ, গো। আমি একটি 'ভিক্ষা' চাইতে আজ তোমার দ্বারে উপস্থিত।

একটু যেন চমকে ওঠেন। বলেন, ভিক্ষা? তারাপ্রসন্ন ভাদুড়ীর ভদ্রাসনে এই প্রত্যয়ে রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভিক্ষা' চাইতে এসেছেন! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

—না! রাজা বলির দ্বারেও তো একদিন এক 'উদ্বাছরিব' বামন ভিক্ষা চাইতে এসেছিলেন!

—সেটা কথা নয়! আমার বাবামশাইকে একদিন তুমিই না বলেছিলেন যে, তোমরা দু-পুরুষে কখনও কোনও ভিক্ষা গ্রহণ করনি?

—বলেছিলাম। আনার বাবামশাইয়ের কোনো কন্যাসন্তান ছিল না। তাঁকে অরক্ষণীয় কন্যার জন্যে কোনওদিন পাত্রসন্ধান করতে যেতে হয়নি।

তারাপ্রসন্ন রীতিমতো চমকে ওঠেন। কথা খুঁজে পান না।

রূপেন্দ্রনাথ পুনরায় বলেন, আশা করি আন্দাজ করেছ আমি আজ তোমার দ্বারে কী ভিক্ষা চাইতে এসেছি!

না বোঝার হেতু নেই। ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তবু উনি স্বীকার করতে পারলেন না। অস্বীকারও নয়।

রূপেন্দ্রনাথই পুনরায় বলেন, তুমি অবশ্য বলতে পার : এত তাড়াতাড়ি কীসের? তুমি জান, আমি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে। জ্যাঠামশাইও তাই ছিলেন। শুভপ্রসঙ্গের বয়স এখন ষোলো। জ্যাঠামশাই তোমার বিবাহ দিয়েছিলেন সতেরো বৎসর বয়সে। পুঁটুকেও পাত্রস্থ করেছিলেন চোদ্দো বছর বয়সে। আমার মনে আছে। কিন্তু কী জান তারাদা? সকলের মানসিক পরিণতি তো একই আঙ্গিক নিয়ম মেনে চলে না। ওরা দুজন সহাব্যায়ী, পরস্পরকে বাল্যকাল থেকেই চেনে। আমার চোখের সামনেই ওরা বড় হয়ে উঠছে। আমি ঘটনাচক্রে উপলব্ধি করেছি—

—থাম তুমি!—হঠাৎ বলে ওঠেন তারাপ্রসন্ন।

—থামব? কেন? তুমি রাজি নও? আমি যে-কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম,—যা তুমি না ওনেই থামিয়ে দিলে—সেটা তো অন্যায় কিছু নয়! এটা তো একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে হ্যাঁ, তুমি বলতে পার : ওরা নিতান্ত বালক-বালিকা। মানছি! বেশ, মামণি আপাতত বাগদত্তাই হয়ে থাক।

—আহ! তুমি থামবে?

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। তারাদা কি কোনো বড় ঘর থেকে পুত্রবধু সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক? প্রচুর যৌতুক, অটেল বরপণ! কিন্তু তিনিও তো মামণিকে শাখা-সিঁদুর-সর্বস্ব করে সম্প্রদান করবেন না। কুসুমঞ্জরীর যাবতীয় অলংকার—জ্যেষ্ঠামশাই যা দিয়েছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপহার দেওয়া সেই হীরকখচিত শতনরী—সবই তো তারাদার ধনভাণ্ডারে সুরক্ষিত। একটু পরে বলেন, তোমার আপত্তির কারণটা কী বলত? আমি তো অন্যায় কিছু প্রস্তাব পেশ করিনি। আমি কন্যাদায়গ্রস্ত—শুভপ্রসন্নকে আমার অত্যন্ত সুপাত্র বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া আমি অনুভব করেছি ওদের দুজনের মধ্যে—

হঠাৎ উত্তেজনায়ে ফেটে পড়েন তারাপ্রসন্ন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি! তুমি মন্ত বড় পণ্ডিত। অনেক কিছু অনুভব করতে পার, যা আমাদের নজরেই পড়ে না—

—এসব কী বলছ তারাদা?

একনিশ্বাসে তারাপ্রসন্ন বলে চলেন, আমি কি জানি না—শুধু পঞ্চগ্রামের ভিতরেই নয়, সারা গোড়মণ্ডলে এমন একটি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতীর সন্ধান আমি পাব না? আমি অথবা তোমার বউঠান কি মামণিকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি না? ও তো আমাদের চোখের সামনেই বড় হয়ে উঠছে। তোমার বউঠান কি ধন্য হয়ে যেতেন না, মামণিকে পুত্রবধুরূপে বরণ করে তুলতে? কিন্তু এ যে হবার নয় রূপেন! এ যে হবে না! অসম্ভব!

বজ্রাহত রূপেন্দ্রনাথ বলেন, কেন তারাদা? বাধা কোথায়?

—তুমি হচ্ছে অদ্বৈত বৈদান্তিক। পাথরের নুড়ি আর শালগ্রাম শিলায় কোনো পার্থক্য দেখতে পাও না। এককালে তুমি মহাপ্রসাদ খেতে রাজি হওনি। নন্দখড়োর বাড়িতে। মনে আছে? ঠাকুর-দেবতাও নাকি তুমি মান না। এ তোমার সেই পাপের ফল। সারাটা জীবন নিজে ভুগেছ, এখন ভোগাতে থাকবে মামণিকে।

অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারলেন না। তারপর বললেন, আমার পাপের জন্য আমার মেয়েকে দায়ী করছ কেন তারাদা? সে তো বলির পাঁঠার মাংস প্রত্যাখ্যান করেনি। সে তো বছর বছর তোমাদের পূজা বাড়িতে এসে হাতে-হাতে কাজ করে যায়। সে তো আর অদ্বৈত বৈদান্তিক নয়।

তারাপ্রসন্ন এবার ওঁর হাত দুটি ধরে কেঁদে ফেলেন, আমাকে মার্জনা করো ভাই। তোমার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে আমার কি বুক ফেটে যাচ্ছে না? মাসতিনেক আগেই আমিই গুরুদেবকে জানিয়ে ছিলাম—একটা বড় রকম যজ্ঞ-উজ্ঞ করলে কি এ বাধা অতিক্রম করা যায় না? তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন : যজ্ঞের মাধ্যমে অশাস্ত্রীয় অনাচারের অনুমোদন লাভ করা যায় না।

—অশাস্ত্রীয়! কী অশাস্ত্রীয় অনাচার?

—তোমাকে তাও বুঝিয়ে বলতে হবে? তোমরা রাঢ়ী শ্রেণির, আমরা বারেন্দ্র!

—শাস্ত্র কোথায় বলেছেন রাঢ়ী শ্রেণির কন্যার সঙ্গে বারেন্দ্র শ্রেণির পাত্রের বিবাহ অসিদ্ধ? অনাচার?

—আমি জানি না রূপেন। সে তর্ক আমি তোমার সঙ্গে করতে পারব না।

—রাজা বল্লালসেন কনৌজ থেকে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনিয়ে ছিলেন...

—তোমার পাণ্ডিত্য বন্ধ করো রূপেন! আমার আর সহ্য হচ্ছে না। যা হয় না, তা হয় না। হবে না।

—কিন্তু একপুরুষ আগে তোমার বাবামশাই—মানে জ্যেষ্ঠামশাই, তো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ‘সগোত্র’ বিবাহ দিয়েছিলেন? সেটাও তো তোমাদের মতে অশাস্ত্রীয়! তাই নয়?

—হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। কিন্তু কেমন করে দিয়েছিলেন তা তুমি জানো? আমি জানি। কুসুমমঞ্জরীর পিতা ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রের। তোমরাও তাই। সেজন্য তোমাদের বিবাহের পূর্বে বাবামশাই আমাদের কুলগুরুকে ডেকে এনে একটি যজ্ঞ করান। কুসুমমঞ্জরীর গোত্রান্তর হয়। আমাদের কুলগুরুদেব একটি শংসাপত্র লিখে দেন যে অনুঢ়া কুসুমমঞ্জরীর গোত্রান্তর ঘটেছে। তারপর সোএগই গাঁয়ের সমাজপতিদের বাবামশাই ডেকে পাঠান। সেই শংসাপত্রটি দেখিয়ে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর আশ্রিতা কুসুমমঞ্জরীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিচ্ছেন। আমি সে মন্ত্রণাসভার উপস্থিতি ছিলাম। নন্দখুড়ো বলেছিলেন, এজাতীয় বিবাহ সিদ্ধ হলে তো ঘরে ঘরে এই অনাচার চলতে থাকবে। এ বিষয়ে গৌড়বঙ্গের সমাজপতি নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মতি আনাতে ভালো হয়। তাতে বাবামশাই প্রচণ্ড আপত্তি করে বলেছিলেন, সোএগই গ্রাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এলাকার বাহিরে। নন্দখুড়োকে আরও সাবধান করে বলেছিলেন, এটা আমার সিদ্ধান্ত। এর বিরোধিতা যাঁরা করবেন, তাঁরা যেন, স্মরণে রাখেন যে, তাঁরা ভূম্যধিকারীর শত্রুপক্ষ! তারপরে আর কেউ উচ্চবাচ্য করেনি।

—এবারও তেমন কিছু করা যায় না?

—কী আশ্চর্য! সেটা ছিল ‘গোত্রান্তর’, আর এটা যে রাঢ়ী-বারিন্দির! তবু আমি আশ্রাণ চেষ্টা করেছি রূপেনভাই। গুরুদেব কিছুতেই রাজি হলেন না। গুরুদেবের নিদান লঙ্ঘন করি কী করে বলো? গুরুশাপ—ব্রহ্মশাপ।

ঠিক তখনি একটি দাসী এসে উপস্থিত হল। একটা কাঁসার রেকাবিতে কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন নিয়ে। দেবতার প্রসাদ। সে চলে যাবার পর রূপেন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এই তোমার শেষ কথা?

—আমার নয় ভাই। গুরুদেবের শেষ নিদান!

—আমি তবে চলি?

—সেকি। প্রসাদটুকু মুখে দিয়ে যাও! রাগ করে প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করতে নেই।

—কেন? তুমি তো জানো তারাদা—আমি আচার্য শঙ্করপন্থী—অদ্বৈত বৈদান্তিক! আমার দৃষ্টিতে পাথরের নুড়ি আর শালগ্রাম শিলায় কোনো প্রভেদ নেই। সবই ব্রহ্মময়।

দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়েও আবার ফিরে আসেন। বলেন, একটা কথা, তারাদা।

চিত্রাবলী

শুভপ্রসন্নকে তুমি জানিয়ে দিও সে যেন আমার কাছে শাস্ত্রপাঠ নিতে আর না আসে।

তারাপ্রসন্ন বলে ওঠেন, আমার উপর রাগ করে তুমি কি শুভকে শাস্তি দিতে চাইছ?

—না, তারাদা! সেটা অন্য কারণে। তোমাদের ওই সংস্কারের কৈঙ্কৰ্বে তোমরা আমাকে হত্যা করতে পারবে না, আমার মামণিকেও নয়। আমরা নতুন কোনো পথ খুঁজে নেবই। কিন্তু শুভপ্রসন্নের নিত্য উপস্থিতিতে মামণির বিচলিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা। তোমাকে আগেই বলেছি ওদের পরস্পরের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠার উপক্রম হয়েছে। তাই এই নিষেধ করছি। শুভকে মামণির দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখতে।

উনি একপদ অগ্রসর হতেই পিছন থেকে তারাপ্রসন্ন বলে ওঠেন, কিন্তু এসব কথা তো তাকে বলা যাবে না। তাকে আমি কি কৈফিয়ত দেব? কেন তুমি তাকে পরিত্যাগ করছ?

আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, সে কথাটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? তোমরা তো শুভবুদ্ধির ধার ধারনা। যুক্তিতর্ক মানো না। তোমার অভ্যস্ত ভাষাতেই ওকে বল, এটাই তোমার পিতার আদেশ! অলঙ্ঘনীয় নিদান। আর মনে রেখো বাবা শুভ, পিতৃশাপ—ব্রহ্মশাপ!

ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসেই দেখেন শুভপ্রসন্ন চৌকাঠের পাশে প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো সে সব কিছুই শুনেছে। একটু বিব্রত হয়ে পড়েন যেন। শুভপ্রসন্ন কোনও কথা বলল না। আচার্যকে প্রণাম করল নিশ্চন্দ্রে। হঠাৎ ওঁর নজর হল শুভপ্রসন্নের চোখ দুটিতে জল টলটল করছে। উনি সবলে তাকে আলিঙ্গন করে ধরলেন। মাথায় হাত রেখে বললেন, আত্মদীপো ভব! আত্মশরণো ভব!! অনন্যশরণোভব!!!

শুভপ্রসন্ন আবার নত হয়ে প্রণাম করল তার গুরুদেবকে।



মাঘের শেষ। শীত কিছুদিন ধরেই যাই-যাই করছে। এখনও বিদায় নিতে পারেনি। রূপেন্দ্রনাথ যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন রৌদ্রতাপ উপভোগ্য শোভারানি জানতে চায়, সাতসকালে বাসিমুখে কোথায় গেছিলেন?

—বড়বাড়ি।

গ্রামে জমিদার-বাড়িকে অনেকেই ওই নামে উল্লেখ করে।

—ও বাড়ির সবাই ভালো আছেন তো?

—তা আছেন। আমি অন্য একটা কাজে গিয়েছিলাম।

শোভা ওঁর প্রাতরাশের কাটা ফল আনতে যায়। রূপমঞ্জরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাবাকে লক্ষ্য করতে থাকে। আশ্চর্য মানুষ! মুখ দেখে বোঝা যায় না ভিতরে কী হচ্ছে। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ! অথচ হট্টা জানে, কী জন্য উনি এত সকালে ও বাড়ি গিয়েছিলেন। একটা খুশি-খুশি ভাব প্রত্যাশা করেছিল। সেটাই হবার কথা। অথচ মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

দ্বিপ্রহরে ওঁদের দুজনকে মধ্যাহ্ন আহার পরিবেশন করে শোভা একটু গা-গড়াতে গেল—সোনা-মার ঘরে। রূপমঞ্জরীর প্রচণ্ড কৌতূহল হাছিল সব কথা জানতে। কী কী কথা হল জ্যেষ্ঠামশায়ের সঙ্গে, অথবা জ্যেষ্ঠিমা। শুভদার সঙ্গে কি ওঁর দেখা হয়েছে? তাকে কি কিছু বলেছেন? শুভদা কি উৎফুল্ল হয়ে উঠল? নাকি মুখটা নিচু করে মনোভাব লুকায়িত করল? সংকোচে সে প্রশ্ন করতে পারল না। রূপেন্দ্রনাথ নিজেই সে সুযোগ করে দিলেন। বললেন, এ ঘরে আয় মা। তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে।

বসলেন দুজনে। পালকে নয়। মাদুর বিছিয়ে। রূপেন্দ্র ধীরে ধীরে সব কথাই খুলে বললেন। কোনও কিছু রেখে-ঢেকে নয়। বজ্রাহতা হয়ে গেল রূপমঞ্জরী। এটা সে একেবারেই আশঙ্কা করেনি। এমনটা যে হতে পারে তা ছিল তার দুঃস্বপ্নেরও অগোচর।

কাহিনি শেষ হল। রূপমঞ্জরী মাদুরের কাঠির উপর হাত বুলাতে বুলাতে বললে, তাহলে কাল থেকে শুভদা আর আপনার কাছে পাঠ নিতে আসবে না? সে কি অন্য কোনও চতুষ্পাঠীতে চলে যাবে?

—সেসব কথা কিছু হয়নি। সেটা শুভপ্রসঙ্গের ইচ্ছা। এবং তারাদার অনুমতিসাপেক্ষ। ও ত্রিবেণীতে যেতে পারে। ভাটপাড়া, নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগরেও। তবে ও তো আর চতুষ্পাঠী খুলে বসবে না। জমিদারি দেখাশোনা করতে হবে ওকে। ফলে তারাদা এবার হয় তো ওকে জমিদারি সেরেস্তার কাজ শেখাতে চাইবেন।

হট্টা অনেকক্ষণ মাদুরের নকশার উপর আঙুল বোলালো। তারপর প্রশ্ন করে, আমি কি আর শুভদার সঙ্গে কথা বলব না?

—না, না, তা কেন? আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে যেমন কথা বলিস, গল্পগুজব করিস, ওর সঙ্গেও তেমনি করবি।

—তাহলে আপনি ওকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে দিলেন কেন?

—আমি তো তাকে এ বাড়ি আসতে বারণ করিনি। শুধু বলেছি, তাকে প্রত্যহ পাঠ দিতে পারব না। তুই প্রশ্ন করবি : সেটাই বা কেন? তার কারণ আমি তোদের ঘনিষ্ঠতা আর পছন্দ করছি না। তোদের বন্ধুত্ব যখন কোনো মধুর পরিণতির দিকে যাবেই না, তখন দুজনকেই সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন—অতীতকে ক্রমশ ভুলে যেতে।

একটু নীরব থেকে আবার বলেন, জানি, তুই কী ভাবছিস। অথচ বলতে পারছিস না—কিন্তু মনে মনে ভাবছিস : তাই কি হয়? না, হয় না রে মা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি তা প্রায় অসম্ভব। আচ্ছা মামণি, তুই কি পীতু-খুড়োর মেয়ে মীনুপিসির কথা শুনেছিস?

—মীনুপিসি না মীনুদিদা? আপনি তাঁকে ‘খুড়িমা’ ডাকতেন না? গাঙ্গুলী বাড়ির বড়কর্তার গৃহিণী তো?

—হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। সে এককালে ছিল আমার পাড়াভূতো ছোট বোন। বাল্যসঙ্গিনীই বলতে পারিস। শেষে হয়ে গেল আমার পূজাপাদ খুড়িমা।

—শুনেছি তাঁর কথা। সোনা-মার কাছে। তিনি নাকি শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা অবশ্য জানি না।

—সেই হতভাগিনীর কথাই আজ তোকে শোনাব।

কোনো সংকোচ করলেন না। জানালেন অনেক কথা। মীনু ছিল ওঁর ছোটবোন কাত্যায়নীর সখী। তাঁর সঙ্গে ওর গড়ে উঠেছিল একটা মধুর সম্পর্ক—ঠিক যেমনটি গড়ে উঠতে চাইছিল মামণি আর শুভপ্রসন্নর মধ্যে। তারপর উনি গেলেন গুরুগৃহে। ফিরে এসে শুনলেন ইতিমধ্যে দুর্গা গাঙ্গুলী মীনুকে তৃতীয় পক্ষ করে ফেলেছেন। মীনুর করুণ জীবনকথা অকপটে বলে গেলেন। সে হতভাগিনীও পারেনি তার কিশোরকালের রূপোদাকে ভুলতে। তারপর নির্দিষ্টায় ব্যক্ত করলেন তার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা—তার আত্মহননের ইতিকথাও। প্রসঙ্গত ‘বিনিয়োগ প্রথা’র বীভৎসতার কথাও অকপটে বলে গেলেন। তাঁর সেই অলোকসামান্য দ্বাদশবর্ষীয়া শ্রোতার কাছে, যে মেয়েটা ওই বয়সেই দেবনাগরী হরফে ‘অষ্টম সর্গের’ রসাস্বাদনে সক্ষম। শুধু অনুভব রইল সেই প্রত্যাখ্যাতা বিপ্রলঙ্কার লজ্জার অনুকাহিনি। কোনাকের সেই দোলপূর্ণিমার রাত্রে তার নারীত্বের সেই অবমাননা। মীনু পরলোকগতা—তবু তার সেই গোপন বেদনার কথাটা সংগুপ্তই থাক না! দুর্গা গাঙ্গুলী যে অলীক মিথ্যাকাহিনির রটনা করছিলেন, মীনু আর রূপেন্দ্রকে জড়িয়ে—সেই সংযুক্তাহরণ কাহিনি—তাই জানালেন এবং কীভাবে বৃদ্ধ মৃতপথযাত্রী সর্বসমক্ষে পাপ স্বীকার করেছিলেন, মীনুকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সে-কথাও।

ভাগর দুটি চোখ মেলে তাঁর শ্রোতা নির্বাক শুনে গেল।

তারপর সে অসংকোচ প্রশ্ন করে, আপনি কি তাঁর কথা সারাজীবনে ভুলতে পারেননি, বাবা?

—তা যে ভোলা যায় না মা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সংসার করেছি। মীনুর চিকিৎসা করেছি, হাসি-রসিকতাও করেছি। তাকেও ওই রকম শক্ত হতে হবে। নিরাসক্ত হতে হবে। পারবি না?

—পারব বাবা।

—পারতেই হবে। এই তো সামনেই দোলপূর্ণিমা। প্রতি বছর যেমন বড়বাড়িতে

আবির খেলতে যাস এবারও তেমনি যাবি। আবির মাখবি, আবির মাখাবি। তারপর দেখবি স্নানের পর সে দাগ আর মুখে থাকবে না। হয়তো বুকে কিছুটা লেগে থাকবে। তা থাক না—তা তো আর কেউ দেখতে পাবে না। কিছুদিন পরে হয় তো বড়বাড়িতে নতুন বউ আসবে। কোনও বনেদি জমিদার বাড়ি থেকে। সে হবে প্রায় তোর সমবয়সি। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবি—

—করবই তো। শুভদার বউ তো আমার বউঠান। তার সঙ্গে হয়তো ‘গঙ্গাজল’ পাতাব। কিন্তু একটা কথা বাবা—শুভদা করে করুক, আমি কিন্তু করব না।

—‘কী’ তা জানতে চাইলেন না। প্রশ্ন করলেন কেন?

—আমি সোণাই গাঁকে ছেড়ে যেতে পারব না। সোণাই গাঁয়ের সেবা করব বলেই না আয়ুর্বেদ শিখছি!

—না রে মা, সোণাই গাঁ একটা অজুহাত। আসলে আমাকে ছেড়ে যেতেই তোর মন সরছে না। তুই তো এ বিদ্যা শিখেছিস মানবজাতির স্বার্থে! সে আর্ত মানুষটা শিশু কি বৃদ্ধ, ধনী কি দরিদ্র, সোণাইবাসী না তিজলহাটির মানুষ—

—তিজলহাটি! এত এত গ্রাম থাকতে হঠাৎ আপনি তিজলহাটির নাম করলেন কেন?

—এ কথার জবাব কাল বিকালে দেব। আমি কাল সকালে তিজলহাটি যাচ্ছি।

—সেখানে কেউ কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে? আপনার ডাক এসেছে?

—বললাম যে, সে কথা কাল সন্ধ্যায় আলোচনা করব। তবে তোর অমতে কিছু হবে না। আগে পরিস্থিতিটা দেখে আসি।



হঠাৎ ভিষগাচার্যের আবির্ভাবে কিছু বিস্মিত হলেন পাঁচকড়ি ঘোষালমশাই। তবে অভ্যর্থনার কোনও ক্রটি হল না। বললেন, কার ভদ্রাসনে রুগি দেখতে এসেছিলেন?

—আজ্ঞে না। রোগী দেখতে তিজলহাটিতে আসিনি। এসেছি নিজের গরজে! চলুন, আপনার বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

দুজনে বসলেন ওঁর অভ্যর্থনাকক্ষে। রূপেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য শুরু করার পূর্বেই ঘোষালমশাই বলেন, আমাকে প্রথমে কিছু বলতে দিন। তারপর আপনার বক্তব্যটা শুনব।

—বলুন?

—আমি আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি। প্রতিশ্রুতিটা এই কয় বছরের ভিতর

চিত্রাভট্টা

রক্ষা করতে পারিনি। আমাদের পঞ্চায়েত আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হননি। সমাজপতিদের ধারণায় সোএগই গ্রামের একবগ্না-দীঘির সঙ্গে সে অঞ্চলের আত্মিকরোগের অবলুপ্তি একটা কাকতালীয় ঘটনামাত্র। ৩৫মায়ের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। মিত্রমশাইও তাই শুনে ইতস্তত করতে শুরু করলেন। আমার একার পক্ষে অতবড় কাজটা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বিশেষ, পর পর দু-বছর ফসল ভালো হয়নি, অথচ ‘আবুওয়াব’-এর চাপ বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না আমি কথার খেলাপ করব। আমি ইতিমধ্যেই ভকিলমশাইকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে একটা ইচ্ছাপত্র লিখে রেখেছি—অকস্মাৎ আমার দেহান্ত হলে আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে প্রথমেই তিজলহাটির জন্য সেই ‘নিপ্ৰতনে-সিদ্ধ’ দীঘিটা খনন করা হবে। বাকি অংশ আমার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

—আপনার অকস্মাৎ দেহান্ত ইবার আশঙ্কা হল কেন?

—মানুষের জীবন তো পদ্যপত্রে জল! আমার পিতৃদেব এই বয়সেই সম্যাসরোগে দেহরক্ষা করেছিলেন।

—বুঝলাম। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আপনাকেও একবার পরীক্ষা করে যাব। সাবধানতার যদি কোনও প্রয়োজন থাকে, তবে সে ব্যবস্থাও করে যাব। শরীরে কোন অসুবিধা বোধ করছেন ইদানীং?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ক্ষুধামান্দ্য এবং অনিদ্রা। সে এমন কিছু নয়। এবার বলুন, কী কথা বলতে এসেছেন?

—বলছি। সৌম্যসুন্দর কোথায়? তর্কসিদ্ধান্ত মশাই-এর চতুষ্পাঠীতে? কৃষ্ণনগরে?

—আজ্ঞে না। ওর এক জ্ঞাতি ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে সে এখানেই আছে। আপনার বক্তব্যটা শেষ হোক। তারপর তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

রূপেন্দ্র বলেন, আপনার আপত্তি যদি না থাকে তাহলে আমি তার সম্মুখেই প্রস্তাবটা রাখতে চাই।

জকুঞ্চন হল ঘোষালমশায়ের। তবে তিনি সম্মত হলেন। সৌম্যসুন্দর এসে দাঁড়াল। দুজনকেই পদস্পর্শ করে প্রণাম করল। অনুরুদ্ধ হয়ে বসল চৌকির একান্তে। রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, শেষ উপাধি লাভে আর কতদিন লাগবে, বাবা?

সৌম্য নতনেত্রি বলল, আজ্ঞে না, উপাধি লাভে আমার বাসনা নাই। জ্ঞানলাভই একমাত্র লক্ষ্য। বাবামশাই যতদিন অনুমতি দেবেন ততদিনই গুরুগৃহে অতিবাহিত করব।

—খুব আনন্দ পেলাম একথা শুনে। তুমি কিন্তু পুনরায় কিছু কৃশকায় হয়ে গিয়েছ, বাবা। যোগাভ্যাস করো? প্রাণায়াম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুইটিই করি।

রূপেন্দ্র এবার করজোড়ে ঘোষালমহাশয়ের দিকে ফিরে বলেন, আমি আজ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হিসেবে আপনার ভদ্রসনে এসেছি, ঘোষালমশাই।

একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পাঁচকড়ি। বাক্যস্মৃতি হল না তাঁর।

রূপেন্দ্র পুনরায় বলেন, আমার একটিই সন্তান। রূপমঞ্জরী। সে দ্বাদশবর্ষীয়া। আমি তার পিতা, হয়তো আমার কথাটা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু তার রূপ, স্বভাব ও শিক্ষা—

সংবিৎ ফিরে পান ঘোষাল। বলেন, এ তো আমার আশাতীত সৌভাগ্য। আপনি স্বয়ং মদনদেবের মতো সুকান্ত, শুনেছি, আপনার গৃহিণীকে রূপনগরের প্রেমদাস মোহান্ত বাবাজি 'রাইরানি' করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন তাঁর সময়ে পঞ্চগ্রামের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। আপনাদের দুজনের কন্যা যে রূপে লক্ষ্মী এবং গুণে সরস্বতী হবে সেটা মুখেও অনুমান করতে পারে। আমি সর্বান্তঃকরণে এ প্রস্তাবে সম্মত।

—কোন শর্ত নাই? বরপক্ষের তরফে?

—আদৌ না। ঘোষালবংশ ধনী হয়ে যাবে এ বিবাহে।

—আমার কিন্তু তিনটি শর্ত আছে!

—বলুন?

—প্রথমত, আমি বরপণ দিতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ নগদে। তবে আমি সালংকারা কন্যা সম্প্রদান করব। রূপমঞ্জরী—অর্থাৎ আমার কন্যা, তার মায়ের প্রচুর স্বর্ণালংকার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, বিবাহ আমি এই ফাল্গুন মাসেই দিতে চাই। বিলম্ব করায় কিছু বাধা আছে। তবে আমার কন্যা বালিকামাত্র, তার বয়স দ্বাদশ বৎসর। চার বছর পরে তার দ্বিরাগমন হবে। তখন সে তিজলহাটিতে এসে আপনাদের সেবা করবে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে সেটাই বিধেয়। তৃতীয় কথা, আমি মামণিকে আয়ুর্বেদ-শিক্ষিতা করছি। চার-পাঁচ বৎসরের ভিতরেই সে সুদক্ষা চিকিৎসক হয়ে উঠবে। আর্তের সেবা-শুশ্রূষা করতে সক্ষম হবে। আমার সংকল্প যে-পরিবারে সে এই স্বাধীনতা লাভ করবে—অর্থাৎ নরনারী-নির্বিশেষে রোগাক্রান্তকে নিরাময় করার সুযোগ পাবে—শুধুমাত্র তেমন পরিবারেই তাকে সম্প্রদান করব। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না এমন প্রতিশ্রুতি পেলেন—

রূপেন্দ্রনাথের বক্তব্যটা শেষ হল না। তার পূর্বেই ঘোষাল বলে ওঠেন, তবে তো মুশকিল হল, ভেষগাচার্য। আপনার শেষ দুটি শর্ত আমি নির্বৃত্ত শর্তে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত। আমার বিশ্বাস আমার পুত্রটিও যথেষ্ট আধুনিক-মন। সে তার স্ত্রীর স্বাধীনতায় স্থূল হস্তক্ষেপ করবে না। আমার অবর্তমানেও সে আর্তের সেবায় বাধা দেবে না। কিন্তু আপনার প্রথম শর্তটি যে আমি স্বীকার করতে পারছি না। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। বরপণ গ্রহণ আমাদের কৌলিক প্রথা। বরপণ গ্রহণ না করে আমি তো আমার পুত্রের অমর্যাদা ঘটাতে পারি না।

রূপেন্দ্রনাথের জয়ুগলে জাগল কুঞ্চন। নাসারক্স কিঞ্চিত স্মৃতি হয়ে উঠল। এ প্রস্তাব তিনি আশঙ্কা করেননি। ঘোষাল রীতিমতো ধনী, অর্থের কাঙাল তাঁর হবার কথা নয়। একটু দ্বিধা করলেন। সৌম্যসুন্দরকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন। ছেলোট

সুদর্শন এবং প্রখর বুদ্ধিমান! কিন্তু বরপণ! কৌলীন্য প্রথা! দাঁতে-দাঁত দিয়ে বলেন, কী পরিমাণ কৌলীন্যমর্যাদা আমাকে প্রদান করতে হবে বলুন। আমার সাধ্যের মধ্যে যদি কুলায় আমি সৌম্যসুন্দরের সঙ্গেই...

ঘোষাল গভীর হয়ে বলেন, সৌম্যসুন্দরকে চিকিৎসা করে আপনি প্রথমদিন যে পরিমাণ 'বৈদ্যবিদায়' আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেই পরিমাণই। স্মরণে আছে নিশ্চয় আপনার : একমুষ্টি আতপ তণ্ডুল এবং পাঁচটি কপর্দক। একটিমাত্র কপর্দক কম হলে কিন্তু আমি বর উঠিয়ে নিয়ে ফিরে আসব।

রূপেন্দ্র অটুহাস্য করে ওঠেন।

ঘোষাল বলেন, হাসির কথা নয় আয়ুর্বেদাচার্য! 'বৈদ্যবিদায়' দান যেমন একটি কৌলিক প্রথা, কৌলীন্যমর্যাদা গ্রহণও তাই। ওটা দিতেও হয়। নিতেও হয়।

রূপেন্দ্রনাথ এবার সৌম্যসুন্দরের দিকে ফিরে বলেন, তোমার কোনও শর্ত আছে, বাবা?

সৌম্য নতনেত্রী বলল, আছে আচার্য! নদিয়ায় গুরুদেবের চতুষ্পাঠীতে অদ্বৈতবেদান্তের শিক্ষা শেষ করে আমি আপনার নিকটে অথর্ব বেদ অধ্যয়ন করতে যাব। তিজলহাটিতে কোন চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার বাসনা আমার নাই। বাবামশাইয়ের সম্পত্তির দেখাশোনা দাদাই করতে পারবেন, খুড়োমশাইও আছেন। বাবার অনুমতি লাভ করলে আমি এখানে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। আপনাদের আশীর্বাদে যদি সন্তীক সে পুণ্যকর্মের অধিকারী হই নিজেকে ধন্য মনে করব।

রূপেন্দ্র উচ্ছ্বসিত আবেগে উঠে দাঁড়ান। সৌম্যসুন্দরও তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হয়। রূপেন্দ্র ওকে বুকে টেনে নিলেন। আবেগে। আনন্দে।



সৈনগুপ্ত বুঝতে পেরেছে তার প্রভু আজ খুশিয়াল। তাঁর ক্রত গৃহ-প্রত্যাগমনের বাসনা তীব্র। তাই চার-কোশ পথ সে যে সময়ে অতিবাহন করে তার অর্ধেক সময়ে সে ফিরে এল সোঞাই। পূর্ণ আশ্রুদিত গতিচ্ছন্দে।

তিজলহাটি অভিযানের বিবরণ সবিস্তারে জানালেন মামণিকে। ঘোষালমশায়ের বরপণ বিষয়ে কৌতুক, সৌম্যসুন্দরের বিচিত্র শর্তের কথাও। ওই সঙ্গে জানালেন বহুদিন পূর্বে তিনি পাঁচকড়ি ঘোষালমশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র নকড়িকে কীভাবে সর্পদংশনের অনিবার্য মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন। নকড়ির সহধর্মিণীর সঙ্গে সেই কৌতুকের কাহিনিও। চোখে চোখে চাইলেই রূপেন্দ্রনাথ নাকি সকলের মনের কথা জানতে পারেন। একথা

শুনে বধূমাতার দিদিশাণ্ডি কেমন করে আঁতকে উঠেছিলেন : এ কী সববোনেশে কথা গো! মানুষের মনের ভিত্তির কী হতিছে তা উনি দিব্যদৃষ্টিতে জ্ঞাপ্তে পারেন!

রূপমঞ্জরী বাবার মুখে সেই প্রাকৃতভাষ শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

—তুই আর কিছু জানতে চাস?

—হ্যাঁ, ওঁদের কড়ির হিসাবের মাঝখানে অমন অদ্ভুত নাম রাখা হল কী করে?

—এ তোর কেমন সিদ্ধান্ত হল মামণি? এককড়ি-পাঁচকড়ি-সাতকড়ি তিনকড়ি-নকড়ি নামগুলোয় তোর আপত্তি নেই, শুধু ‘সৌম্যসুন্দর’ নামটাকেই মনে হল অদ্ভুত!

হটী হাসল। বলল, অদ্ভুত নয়, তবে একটু দলছাড়া লাগছে না কি?

—হয়তো কড়িতে ঘাটতি পড়েছিল। একাদশকড়ি, ত্রয়োদশকড়ি নাম তো প্রচলিত নয়। বৃহৎ সংসারে কড়ির টানাটানি তো হতেই পারে। যাক সে-কথা। আর কিছু জানতে চাস না?

—আবার কী?

—তা ঠিক। তুই ও প্রশ্নটা করলেও তো আমি বলতাম ‘ঠিক জানি না’।

হটী বাবার চোখে-চোখে তাকাল। বললে, কী প্রশ্ন?

—তুই যেটা ভাবছিস। কে বেশি সুন্দর?

রূপমঞ্জরী ওঁকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে। আপনি না—

—আমি কী?

—আমি মোটেই সে-কথা ভাবছি না।

—কে বেশি সুন্দর তা বলতে পারব না। তবে দুজনের একটা তুলনামূলক আলোচনা করতে পারতাম। কিন্তু তুই যখন ‘মোটেই সে-কথা ভাবছিস না—’! ঠিক আছে ঠিক আছে। শোন। সৌম্যসুন্দর দেহদৈর্ঘ্যে কিছুটা বেশি। গৌরবর্ণ দুজনেই। তবে সৌম্য কিছুটা কৃশকায়। সম্ভবত দৈর্ঘ্যের জন্যই অমন মনে হয়। বয়সে আরও এক বছর বড়। অন্ধশাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতীত সেটার আরও একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ নজর হল। খজানাসার নিম্নে কিছু নবোদ্ভিন্ন ওষ্ঠলোম।

রূপমঞ্জরী তখন কর্ণময়, কিন্তু মেদিনীনিবন্ধদৃষ্টি।

হঠাৎ বহির্দ্বার থেকে কে যেন ভেকে উঠল, রূ-পে-ন! রূপেন আছ?

—তারাদা না? তুই বসে থাক, আমি দেখে আসি।

দ্বার অর্গলমুক্ত করে দেখেন সড়কের উপর দাঁড়িয়ে আছেন তারাপ্রসন্ন। কিছু দূরে দুজন পাইক।

—কী ব্যাপার তারাদা?

—শুভ এসেছিল?

—শুভপ্রসন্ন? না তো! কেন?

—সাতসকালে সে কোথায় চলে গেছে। সারা দিন তার কোনো খবর নেই। দুপুরে খেতে আসেনি। কাউকে কিছু বলেও যায়নি। সারা গাঁ আমার লোকেরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। অথচ—

—না তো! সে আমার কাছে আসেনি।

—আমি জানতাম! তোমার বৌঠান তবু জোর করে আমাকে পাঠাল।

হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে, মাঝি-মাল্লাদের কাছে খোঁজ নিয়েছেন? সে ওপারে যায়নি তো?

রূপমঞ্জরী কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার বাবার পিছনে। তারা প্রসন্ন বলেন, না! ওপারে যায়নি। কোন মাঝি-মাল্লাই তাকে পার করেনি। আমার বরকন্দাজেরা তন্নতন্ন করে খোঁজ নিয়েছে।

রূপমঞ্জরী আবার বলে ওঠে, একমুঠি বাবার ওখানে খোঁজ নিয়েছেন?

—একমুঠি বাবা! সেখানে কেন যাবে?

—না। মানে শুভদা প্রায়ই একমুঠি বাবার আশ্রমে দেখা করতে যেত। কী জানি যদি সেদিন তাঁর একমুঠি না জুটে থাকে!

—সেখানে গেলে তো তার সারাটা দিন লাগবে না!

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, অশ্বাবাসে খোঁজ নিয়ে দেখেছ?

—হ্যাঁ। সেখান থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে গেছে। অশ্বারোহণে! ঠিক আছে। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না রূপেন। সংবাদ পেলেই আমি লোক মারফত জানিয়ে দেব।

বাপ-বেটিতে ফিরে এলেন আবার। মধুর একটা প্রাকবিবাহবাটীর পরিবেশ গড়ে উঠছিল। হঠাৎ যেন কালবৈশাখীর ঝড়ে সব তছনছ হয়ে গেল। এভাবে কোথায় চলে যেতে পারে ছেলেটা?

ঘণ্টাদুই পরে একটি পাইক এসে সংবাদ দিল, ছোট্টা হুজুর ওয়াপস্ আ গয়ে। চিন্তা মৎ কিজিয়ে।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, কোথায় গিয়েছিল সে?

—মুখে ন মালুম, বাবাঠাকুর।

রূপেন্দ্র বলেন, একবার খবর নিয়ে আসব?

—নিশ্চয়, এমনভাবে কাউকে কিছু না বলে সে কোথায় গিয়েছিল! কেন? আমিও আপনার সঙ্গে আসব, বাবা?

—না, মা! এখন সেটা ঠিক হবে না, তুই বরং দোরটা দিয়ে অপেক্ষা কর। আমি যাব আর আসব।

বড়বাড়িতে পৌঁছে যে খবর পেলেন তার কোন মাথামুণ্ড নেই। শুভপ্রসন্ন নাকি গিয়েছিল রূপনগরে। প্রেমদাস-বাবাজির আখড়ার ধ্বংসস্তুপ দেখতে! কোন মানে হয়? ধ্বংসস্তুপে দেখার কী আছে? পুটুরানি সেকথা জানতে চেয়েছিল। শুভ বলেছিল, সে তুমি বুঝবে না, পিসি!

রূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল না, সমস্তদিন অশ্বারোহণে—হয়তো অভূক্ত অবস্থায়—কিশোরটি নিত্য পরিশ্রান্ত। সন্ধ্যারাত্রেই কিছু আহারাতি সেসে সে শয্যা নিয়েছে।



আমাদের কাহিনির নায়িকার শুভবিবাহ স্থির হয়েছে, শুক্রবার, একুশে ফাল্গুন। ‘ফাল্গুনে মাসি মকররাশিছে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ।’ হুটী সেকথা শুনে খেপে আগুন। আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! আর কি কোন দিন ছিল না?

—কেন থাকবে না? তেইশে, সাতাশেও বিবাহের শুভদিন ছিল। তা একুশেই বা আপত্তি কিসের?

—তিথিটা যে দ্বাদশী! পর পর দুদিন আপনার উপবাস পড়ে যাচ্ছে না?

—ও দু-চারদিন উপবাসে আমার কিছু অসুবিধা হয় না।

—জানি। আমাদের হয়।

রূপেন্দ্রের একমাত্র কন্যার বিবাহ। কিন্তু উনি আড়ম্বর করেননি কিছু। গ্রামের ভদ্রজনের নিমন্ত্রণ হয়েছে, কিন্তু কর্মসূত্রে যেসব বড় বড় পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠাননি। বস্তুত মধ্যবিত্ত পরিবারে সে আমলে তা সম্ভবপরও ছিল না। আগেই বলেছি, শেরশাহর ঘোড়ার ডাকের ত্র্যেক্ষরী তখন সাধারণ গৌড়বাসী শুনতে পেত না। তবে দাদার দেহান্তে কালিচরণ গঙ্গাজল সরবরাহের ব্যবস্থাটা চালু রেখেছেন। তাই মাঝিদের মারফত ত্রিবেণীতে একটি—না, দুটি—নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন। একটি গুরুদেবকে, অপরটি হুটীর পাতানো দাদু মাহেশের ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। যদিও জানতেন, তাঁরা কেউই আসবেন না।

কিন্তু আশাতীতভাবে এসে উপস্থিত হলেন বাচস্পতিমশাই। সতেরোই ফাল্গুন, সকালে। তাঁকে দেখে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন আমন্ত্রণকর্তা : আসুন, আসুন, বাচস্পতিদাদা! স্বাগত!

—আমি কিন্তু একা আসিনি বন্দ্যোপাধ্যায়দাই। আমরা একুশে সওয়া দুইজন অতিথি।

—সওয়া দুইজন? অসম্ভব!

বাচস্পতিকি অম্বয়-ব্যখ্যা দাখিল করতে হল। তাঁর পিছন থেকে সাদা থান-পরা একটি অবগুণ্ঠনবতী অগ্রসর হয়ে আসে। তার হেগেড়ে একটি ঘুমন্ত শিশুকন্যা। কেউই কাউকে প্রণাম করে না। বৌঠান সম্পর্কে বড় হওয়া সত্ত্বেও যে অতবড় পণ্ডিতকে প্রণাম করতে দেন না, এটা সবাই জানে। মালতী অস্ফুটে বলে, আপনি কিন্তু কিছুটা রোগা হয়ে গেছেন ঠাকুরপো।

—আপনার মধ্যদেশও, আমার অনুমানে, বেশ কিছুটা কুশ হয়ে গেছে।

ডাগর চোখ মেলে মালতী বিস্মিত হবার অভিনয় করে, ও মা, তাই বুঝি? আমি তো টের পাইনি!

রূপমঞ্জরী দূর থেকে দেখতে পায়। ছুটে এসে সবলে জড়িয়ে ধরে তার সোনা-মাকে। হঠাৎ তার নজর পড়ে বাবার কোলে একটি ঘুমন্ত শিশুকন্যা। ছিনিয়ে নেয় তাকে। চুমায়-চুমায় ওর গালটা ভরিয়ে দেয়। নিদ্রাভঙ্গে শিশুটি কেঁদে ওঠে।

রূপেন্দ্র হট্টকে ধমক দেন, অমন করে ঘুমন্ত শিশুকে চুমো খেতে হয়! দেখ্ তো, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি শ্যামার।

—শ্যামার?—অবাক হয়ে জানতে চায় হট্ট—ওর নাম শ্যামা?

রূপেন্দ্র বলেন, ‘শ্যামা’ ওর ডাকনাম। ভালো নাম ‘শ্যামামালতী’।

গুণু হট্ট নয়, বাচস্পতিও বিস্মিত। বলেন, ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনি এখানে বসে তা কেমন করে জানলেন?

রূপেন্দ্র মৃদু হাসলেন। হট্ট কিন্তু ছাড়ে না। বলে, বলুন না বাবা! কী করে জানলেন? আমি তো জানতামই না যে আমার ভাই এসেছে না বোন!

রূপেন্দ্র খুশিয়ার হয়ে উঠেছেন, সকন্যা মালতীর আগমনে। কন্যাকে বলেন, বাঃ! সেদিনই বললাম না? আমি ভুও আয়ত্ত্ব করেছি! দেখলেই মানুষজনের মনের কথা জানতে পারি।

হট্ট সেদিনের সেই দিদিশাশুড়ির প্রাকৃত ভাষার অনুকরণ করে। হাসতে হাসতে বলে ওঠে, কী সর্বোপায়ে কতা গো!

মালতী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ঘটি করে পা-ধোওয়ার জল নিয়ে আয়। ও সব বিভ্রান্ত পরে হবে।

মালতী রহস্যজালটা ভেদ করে দেয় না। এ নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং রূপেন্দ্রনাথ, শ্যামামালতীর জন্মের পূর্বেই।

পথশ্রান্ত বাচস্পতি একটু জিরিয়ে নিয়ে বলেন, এবারও আমার ভূমিকা পত্রবাহকের। আপনার একটি পত্র আছে—

—গুরুদেবের?

—আজ্ঞে না। তবে তাঁর মাধ্যমেই পেয়েছি বটে। পত্রটি এসেছে মাহেশ থেকে। সম্ভবত শ্রীযুক্ত ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন।

মুখবন্ধ লেফাফাটি গ্রহণমাত্র তীক্ষ্ণবী রূপেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন বাচস্পতি-মশায়ের অনুমানটি ভ্রান্ত। লেফাফার উপর তাঁর নামটি বামাহস্তে রচিত।

নির্জনে এসে লেফাফাটিকে বন্ধনমুক্ত করলেন। ঠিকই আন্দাজ করেছেন। পত্রলেখিকা শ্রীমতী তুলসী গঙ্গোপাধ্যায়। গঙ্গোপাধ্যায়? তার মানে তুলসী আজও অরক্ষণীয়া?

শতকোটি প্রণামান্তে তুলসী তার ভগিনীপতিকে জানিয়েছে :

“কী আনন্দ যে হচ্ছে, জামাইবাবু, তা কী বলব? আমার মামণি আজ তার নারীজীবন সার্থক করতে চলেছে! সেই ছোট্ট মেয়েটি! আজ যদি দিদি থাকত...না, সে হতভাগিনীর দুঃখের কথা আজকের আনন্দের দিনে অন্তরালেই থাক। আমি আজও কুলীনঘরের অরক্ষণীয়া। তবে আমারও মুক্তি আসন্ন। শুনছি, আগামী বৈশাখে। যেতে হবে মা গঙ্গার ওপারে। ভাটপাড়ায়। কথা পাকা, তবে পোড়া কপাল তো?—না আঁচালে বিশ্বাস নেই। আপনি আপনার কন্যার বিবাহে বাবামশাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তা বলে ভাববেন না যে, তিনিও তাঁর কন্যার বিবাহে আপনাকে নিমন্ত্রণ করবেন। দূর থেকেই আশীর্বাদ করুন। আর ভুলে যাবেন না যেন, আমি সুসময়ে আপনার দ্বারস্থ হব। মালিকানা পরিবর্তিত হলেই সে ব্যবস্থা করা যাবে। প্রণামান্তে

তুলসী

ওই সঙ্গে মামণিকেও একটি পত্র আর একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয় আশীর্বাদ পাঠিয়েছে।



উনিশে ফাল্গুন বুধবার তারাসুন্দরী মামণিকে অব্যাহতের আমন্ত্রণ করেছেন। প্রথা বলে, বিবাহের পূর্বদিন অব্যাহতের আয়োজনের অধিকার কন্যার গর্ভধারিণীর। তাঁর অনুপস্থিতিতে তা করবে হটীর সোনা-মা। উনিশে বড়বাড়িতে ওঁদের তিনজনেরও নিমন্ত্রণ হল—বাচস্পতি, রূপেন্দ্র এবং মালতীর। বিশ তারিখ একাদশী। রূপেন্দ্র আর মালতীর উপবাস। তাই এ ব্যবস্থা।

রূপেন্দ্র আর বাচস্পতি পরে আসবেন। মামণিকে নিয়ে মালতী এল বড়বাড়িতে। হটীকে আজ ঘাটে যেতে দেওয়া হল না। এ-কটা দিন হবু-কনেকে খুব সাবধানে রাখতে হয়। বাসি কাপড়ে ঘরের বাইরে পা দিতে নেই, সুঘ্যি-ডোবার আগেই চুলের আগায় একটি গ্রন্থী দিয়ে রাখতে হয়। প্রকাশ্য সড়ক ধরে ঘাটে স্নান করতে যাওয়া মানা। বড়বাড়িতে তোলা-জলেই মামণি স্নান করে একটা মুর্শিদাবাদী রেশমবস্ত্র পরিধান করল। এটা তারাসুন্দরীর ‘আইবুড়ো ভাতে’র উপহার। নাপতিনী-দিদি ওর চরণদুটি অলঙ্করণে রাঙিয়ে দিল। পুঁটুরানি সযত্নে কেশবিন্যাস করে দিল। না, কাকপুচ্ছ নয়, জোড়া সাপের আলিঙ্গনাবদ্ধ কেশরচনাচাতুর্ঘ্য। তারপর বড়বাড়ির ধনভাণ্ডারে সুরক্ষিত কুসুমমঞ্জরীর নানাবিধ অলংকারে সাজিয়ে দিল ওকে। মাথায় জড়োয়া মুকুট। কপালে টায়রা, কর্ণমূলে পান্নাখচিত বুমকোদুল, নাকে মুক্তা-নোলক, হাতে আটগাছি করে আয়নামোড়া চুড়ি, বাঁ-হাতে মানতাসা, কণ্ঠে একের-পর-এক শতনরি। সব চেয়ে চটকদার—নদিয়া মহারাজের আশীর্বাদী হীরকখচিত কণ্ঠহার।

পুঁটুরানি ওকে প্রথমে নিয়ে গেল দেবমন্দিরে, তারপর তোষাখানায়। সেখানে প্রাচীরে প্রলম্বিত ভাদুড়ি বংশের পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ও ব্রজসুন্দরীর যুগল তৈলচিত্র—এক ফ্রেমে বাঁধানো। রূপমঞ্জরী একে-একে সবাইকে প্রণাম করল। তারপর তাকে এনে বসানো হল অন্দরমহলের একটি বড় ঘরে। পশমের আসনে। সমুখে প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় পুষ্পায়। তা ঘিরে সারি-সারি বাটিতে নানান ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নপাক, দধি, ক্ষীর ও পরমান্ন।

তারাসুন্দরী বলেন, প্রথমে একটু প্রসাদী পরমান্ন মুখে দে মামণি, তারপর শাক-সুজো-ভাজার পালা।

—ওরে তোরা শাঁখ বাজা! উলু দে!

উলু-উলু-উলু-উলু!

বৃহৎ কক্ষের ও-প্রান্ত থেকে একটি কিশোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আহা যেন লক্ষ্মীঠাকরুণটি!

নতনয়না রূপমঞ্জরী একবার চোখ তুলে দেখল : তার সহাধ্যায়ী বাল্যবন্ধুকে।

পুঁটুরানি বলে, তা যা বলেছিলাম শুভ! তিজলহাটির ঘোষালবাড়িতে মশাল জ্বালার খরচ কমে যাবে। আমাদের ঘোঁরেটাই সে বাড়ি আলায় আলো করে রাখবে।

—একটা খুঁত রয়ে গেল কিন্তু, গিসি!

—খুঁত! কী খুঁত?

—ওকে তো এখনও 'বউ' বলে চেনাই যাচ্ছে না। মাথায় ঘোমটাটা তুলে দাও।

ঘরসুদ্ধ মেয়ে-বউ খিল খিলিয়ে হেসে ওঠে। কে একজন প্রগল্ভা হটীর মাথার দিকে হাত বাড়াতেই রূপমঞ্জরী বলে ওঠে : ধোং।

তারাসুন্দরী মামণিকেই সমর্থন করেন, তা কেমন করে হবে? ও তো এখনও আইবুড়ে!



কর্তারা এবার আহারে বসেছেন। নিমন্ত্রিত পুরুষ কয়জনও। পুঁটুরানি এবার মামণিকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে এসে পালঙ্কে বসিয়ে দিল। এক-গা গহনা পরে তার পক্ষে ঘোরাঘুরি করা মুশকিল। অথচ পুঁটুর নানান কাজ। একটু ইতস্তত করে বললে, তুই একটু একা-একা বসে থাক মামণি, আমি একবার ওদিকটা দেখে আসি। ওঁরা সবাই মধ্যাহ্ন আহারে বসেছেন তো!

রূপমঞ্জরী বলে, শুভদাও বসেছে?

—ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিলি! শুভ বলেছে সে আমাদের সঙ্গে বসবে।
তাকেই ডেকেদি। তুই তার সঙ্গে কতা ক। আমি ওদিকটা দেখে আসি।

মামণিকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই পুঁটু হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায়।

একটু পরে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল শুভপ্রসন্নকে। গায়ে রেশমের পিরান। বাবা
সেদিন ঠিক বলেননি, হয়তো তাঁর লক্ষ্য হয়নি। শুভদার খঙ্গানাসার নিচেও কচি
ওষ্ঠলোমের আভাস।

—ভিতরে আসব?

রূপমঞ্জরী বলল না—‘এটা তোমাদের বাড়ি শুভদা, কখন কোথায় যাবে তা কি
আমার বলে দেবার কথা?’ অথবা, ‘আমি এখনও পরব্রী হয়ে যাইনি, শুভদা!’

বিনা অনুমতিতেই ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। কাছে এসে বললে, দারণ সুন্দর
দেখাচ্ছে কিন্তু! চপলার চঞ্চলতা নেই। আছে হীরকখণ্ডের দীপ্তি! সৌম্য এবং সুন্দর!

শ্লেষ! ‘শ্লেষ কাহাকে বলে?’ ‘একই শব্দের দ্বিবিধ অর্থ!’ উদাহরণ? ‘অতিবড় বৃদ্ধ
পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোনো গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন।’

—কী হল? তুমি কথা বলছ না কেন, মঞ্জু?

‘তুই’ নয় ‘তুমি’! ‘হট্ট’ না, ‘মঞ্জু’!

বললে, এ-কদিন আমাদের বাড়িতে যাওনি কেন?

—তুমিও তো এ-কদিন আমাদের বাড়িতে আসনি।

প্রতিপ্রশ্ন! ‘প্রতিপ্রশ্ন কী?’ ‘পূর্বপক্ষকে উত্তরপক্ষ একই প্রশ্ন করিয়া যখন উত্তর
প্রদান করে তখন তাহাকে বলে প্রতিপ্রশ্ন।’

মামণি বলে, আমার এখন বাড়ির বাইরে যাবার নানান বিবিনিবেধ আছে, তুমি
জানো না?

—ও হ্যাঁ। মনে ছিল না। অপদেবতাদের নজর লাগবে। তুমি সে কুসংস্কারে বিশ্বাস
করো?

—বিশ্বাস করি না করি, তা মানতে তো হয়? তোমাকেও তো মানতে হয়। হয়
না?

এবার হার স্বীকার করতে বাধ্য হল শুভপ্রসন্ন। ক্ষুরধারবুদ্ধি হট্টর। সে যে প্রশ্নটি
করেছে তা অলংকার-শাস্ত্র মতে ‘তির্য্যকোক্তি’। ‘তির্য্যকোক্তি’ কাহাকে বলে? ‘যাহার
ব্যাচ্যর্থ আপাত অভিহিতার্থের অতিরিক্ত কোন এক গূঢ় ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতবাহী।’

—কই, বললে না, তো—এতদিন কেন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে?

—না, তা কেন বেড়াব? ভিষগাচার্য যে আমাকে নিষেধ করেছিলেন।

—‘ভিষগাচার্য?’ ‘গুরুদেব’ নয়? ‘আচার্যদেব’ও নয়?

—আমি যে সে সম্বোধনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তুমি জানো না?

—ভুল কোরো না শুভদা। বাবামশাইও তোমার-আমার মতোই সামাজিক
অনুশাসন মানতে বাধ্য। তিনি নিতান্ত নিরুপায়। দোষ করেননি কিচ্ছু!

চিত্রাশ্রয়

—জানি, মঞ্জু। ভুল তিনি করেননি, করতে পারেন না। সারাজীবনে তাঁর একটাই মাত্র ভ্রান্তি—একটি মাত্র দোষ।

—দোষ! বাবামশাইয়ের? কী দোষ?

—‘কালানৌচিত্য’! ভুল করে তিনি দুই শতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত হয়েছেন।

কথাটা ভাববার। কিন্তু সময় কোথায়? হঠাৎ কণ্ঠস্বর পালটে বলে, আমাদের হাতে সময় খুব কম। এখনি হয়তো কেউ এসে পড়বে। আমরা কি শুধু তর্কই করে যাব?

জ্ঞান হাসল শুভপ্রসন্ন। কথা বলল না।

—সেদিন অমন করে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলে?

—আমি গিয়েছিলাম রূপনগরে।

—রূপনগরে? তোমার মামাবাড়ি?

—না। দাদামশায়ের বাড়ি অবশ্য সেখানেই। আমি সেখানে যাইনি আদৌ। আমি গিয়েছিলাম প্রেমদাস-বাবাজির আখড়ার ধ্বংসস্থল দেখতে।

—ধ্বংসস্থল! তাতে দেখবারি কী আছে শুভদা?

—আছে। চোখ থাকলে তা দেখা যায়। কী সুন্দর! কী অপরূপ!

—সুন্দর! অপরূপ?

—হ্যাঁ! বাবাজির দোলমঞ্চটা মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। উর্গনাত সেখানে কী বিচিত্র জাল বুনেছে। শিশিরবিন্দুর মুক্তাদানায় তা বলমল করছে। দেবদাসী নৃত্যের ময়দানবীরা মঞ্চটায় এখন বাস করে শৃগাল, চর্মচটিকা আর গৃহগোধ। সাপ-সাপিনীরাও থাকে।

—এর মধ্যে সুন্দর কোনটা? কোনটা অপরূপ?

—ওই যে বললাম : দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই অপরূপকে দেখা যায়। সমাজের কুসংস্কারকে মূলধন করে প্রেমদাস অতিদর্পিত অহংকারে ব্যভিচারে মেতেছিল। দেখে এলাম মহাকালের মুখলাঘাতে তার চরম পরিণতি! দেখলাম তার বিরটি শৃঙ্গারকক্ষে একটা প্রকাণ্ড ঝাড়লগ্ন ধরাশায়ী হয়েছে। ছোট ছোট স্ফটিকখণ্ড ইতস্তত ছড়িয়ে আছে গোটা প্রাঙ্গণে। কী বলব, মঞ্জু—হঠাৎ নজরে পড়ল একটা ছোট আতসখণ্ডের উপর। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে। একান্তে। আর পাঁচটা স্ফটিকখণ্ডের মতো সে কিন্তু বুক-চাপড়ে কাঁদছে না। অবাক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে ভাঙা ছাদের দিকে। সেই ভাঙা অংশটা দিয়ে মেঝেতে এসে পড়েছে একমুঠো সূর্যের আলো। মৃত্যুর পরেও স্ফটিকখণ্ডটা তার স্বধর্মকে ভোলেনি, ভোলেনি সূর্যপ্রণামের মন্ত্র। চিরটাকাল যা করত আজও তাই করছে : সুন্দরের উপাসনা। জীর্ণ প্রাচীরে আজও ঐকে চলেছে প্রতিসরিত সূর্যরশ্মির সপ্তবর্ণা ইন্দ্রধনু।

হঠাৎ রসভঙ্গ হল পুঁটুরানির আবির্ভাবে : আয় শুভ। এবার খাবি আয়।





বিবাহের দিন। গোধূলি লগ্নে সম্প্রদান।

তিজলহাটি থেকে এসেছেন একবিংশতিজন বরযাত্রী—বর, বরকর্তা, পরামানিক ও পুরোহিত সমেত। এসেছেন সে অঞ্চলের ভূম্যধিকারী মিত্রমশাই, সপুত্র। ইতিমধ্যে তিনি পিতামহ হবার গৌরব লাভ করেছেন। বরযাত্রীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা বড়বাড়িতে। তারাপ্রসন্ন সে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। সন্ধ্যা সমাগমের পূর্বেই গ্রামস্থ ভদ্র-পঞ্চজন একে-একে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। সকলেরই গায়ে পিরান, নিম্নাঙ্গে আঙুল্যবিস্তৃত ধুতি। কারও কারও কাঁধে শাল। কারও বা মাথায় পাগড়ি অথবা শামলা। এসেছেন কালিচরণ, নন্দখুড়ো, শিরোমণি, তারিণীখুড়ো, বাচস্পতি, পীতাম্বর মুখুজে। কিন্তু কী আশ্চর্য! বড়বাড়ি থেকে তো এখনও কেউ আসেনি। বর ও বরযাত্রীর দায়িত্ব তাঁদের। তাঁরা সেখানেই ব্যস্ত। সেটা বিয়েবাড়ির কাজই। কিন্তু তাই বলে তারাবউঠান বা পুটুরানি সারাদিন আসতে পারল না! কেন? সকালে গাত্রহরিদ্রায় ‘এয়োস্ত্রী’ হিসেবে তারাসুন্দরীর অভাবটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। মালতী শেষমেশ শিবনাথকে পাঠিয়েছিল। সে ফিরে এসে জানালো, দূরদেশের কে এক জ্ঞাতি ঋগঙ্গা পেয়েছেন। ওঁদের মৃত্যুশৌচ হয়েছে। সেই কারণে গাত্রহরিদ্রার শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারছেন না।

কিন্তু তাই বলে তারাদা সারাদিনের মধ্যে একবার এসে দাঁড়াতে পারল না? আর শুভপ্রসন্ন? তার উপর যে অনেকটা নির্ভর করেছিলেন রূপেন্দ্র।

সূর্য পশ্চিম-দিক্বলয়ে ঢলে পড়েছে। গোধূলি লগ্নের আর বিলম্ব নাই। যে কোন মুহূর্তে বড়বাড়ি থেকে বরযাত্রীরা এসে পড়বেন। বর আসবে অশ্বপৃষ্ঠে। আর সবাই পদব্রজে। তারাদা বরকর্তার জন্য একটি পালকির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। ঘোষালমশাই প্রত্যাখ্যান করেন—‘এক রশি তো দূরত্ব! আমার নিমন্ত্রিত অন্য বরযাত্রীরা যখন পদব্রজে যাবেন তখন আমিও তাই যাব।’

রূপেন্দ্র জীবন দণ্ডকে জনান্তিকে ডেকে বলেন, কী হল বলতো জীবন? আমার নিমন্ত্রণের কোনও জ্রুটি? তারাদা সারাদিনে একবার এসে দাঁড়াতে পারলেন না? অশৌচ হলে কি মুখ দেখানোও বারণ? তুমি একবার জেনে এসো তো বাবা।

জীবন একই সংবাদ নিয়ে ফিরে এল। নায়েবমশাই বলেছেন, মৃত্যুশৌচ!

—মৃত্যুশৌচ? কে লোকান্তরিত হয়েছেন?

হঠাৎ চমকে উঠে বলেন, কালীধাম থেকে কোন দুঃসংবাদ আসেনি তো?

চিত্রশ্রুতি

—না, না, সেসব কিছু নয়। আমি দূর থেকে বড়কর্তাকে দেখেছি। তাঁর উদ্ভাসে পিরাণ—‘কাচা’ নয়।

একটু পরেই শোরগোল উঠল! বর এসেছে! বর এসেছে! উলু-উলু-উলু।

হৃদয় হতে রূপে এগিয়ে গেলেন প্রবেশদ্বারের দিকে।



রূপেন্দ্রের শয়নকক্ষে সর্বাঙ্গিকারভূষিতা রূপমঞ্জরী তখন ‘সোহাগজল’ মাপছে মঙ্গলকলস থেকে ছোট্ট ঘুরিতে জল তুলছে। আবার কলসেই ঢেলে দিচ্ছে।

‘—সোহাগ জল’ কাকে বলে দাদু?

আঃ। তোমাদের নিয়ে আর পারি না বাপু। শোনো, বুঝিয়ে বলি :

বর আসার আগে কনেকে বসে বসে ‘সোহাগজল’ মাপতে হয়। মাটির কলসিতে গঙ্গাজল। কলসির গায়ে তেলসিঁদুরের মাঙ্গলিক-চিহ্ন। কনের মা-মাসি-পিসি—মানে যারা সধবা, স্বামী-গরবিনী—তারা অঞ্চলপ্রাপ্ত সে জলে স্পর্শ করান। অর্থাৎ মেয়েটা তো চিরকালের মতো পরের ঘরে চলে যাচ্ছে, তাই এই সোহাগ জানানো—সেও যেন তাঁদের মতো স্বামী-গরবিনী হয়। কনেকে তখন স্থির হয়ে বসে থাকতে হয়। হটোপুটি করা বারণ এক-গা গহনা পরে। আবার নিষ্কর্মা বসে থাকলেও মনে আসে নানান দুশ্চিন্তা। চোখে আসে জল। তাই তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয় : ওই ‘সোহাগজল’ মাপা।

সে জলটার কী অন্তিম গতি? কলসিটারই বা কী হয়? শোনো বলি :

মেয়ে যখন বরের সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা অবস্থায় প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যায় তখন মেয়ের মাকে তো দেখতে নেই। তাহলে সে আবাগি করবেটা কী? তাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে হয়ে ঘরের কোণে। আবার নিষ্কর্মা বসে থাকলেও মনে আসে নানান দুশ্চিন্তা। দু-চোখে ভরে আসে জল। তাই মেয়ের মাকে একটা কাজ দেওয়া হয়। সে নির্জন ঘরে বসে বসে ওই ‘সোহাগজল’ মাপে—কলসি থেকে জল তুলে আবার কলসিতেই ঢেলে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব!

কলসির সেই জলে চোখের জল মিশে যাওয়া মানা। তেমন অনাচার দেখলে ঘরের ও-প্রান্ত থেকে কায়ত-গিন্নি ধমক দিয়ে ওঠেন : ওটা কী হচ্ছে বাউনদিদি? সোহাগজলে চোখের জল মেশাচো? কাঁদার কী আছে? তোমার মেয়ে তো রাজরানি হতে যাচ্ছে গো?

দাঁতে দাঁত দিয়ে মেয়ের মা বলে, কিন্তু আমার ঘরে সোনার পিদিমটা যে নিবে গেল, দিদি!

—সেটাই যে আমাদের পোড়াকপাল গো! ‘আপনি বুঝিয়া দেখ, কার ঘর কর।’

না, ভুল হল। ও কথা কায়েত গিমি বলত না। বলতে পারে না! সে আমলে গাঁ-ঘরে এক লাখের মধ্যে একজন মহিলাকেও খুঁজে পাওয়া যেত না যিনি ওই ‘রাধানাথ’কে চেনেন।

রাধানাথ : অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবীন্দ্র ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর!

তিনকুড়ি বছর পাড়ি দিয়েছেন, প্রায় সমসংখ্যক শুভবিবাহের সম্প্রদায় কার্যও সুসম্পন্ন করেছেন—রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিক, কুলীন-কাপ-শ্রোত্রীয়, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য—কিন্তু এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। পুরোহিতমশাই যেই ধুরো ধরেন ‘ফাল্গুনে মাসি’ অমনি নজরে পড়ে নাসিকাগ্রে যজমানের বামহস্তের পাঞ্জাছাপ। হচ্চকিয়ে থেমে যান। আর যজমান গড়গড়িয়ে গো-গাড়ি চালান ‘ফাল্গুনে মাসি, মকররাশি’স্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে, দ্বাদশ্যাং তিথৌ’ ইত্যাদি। প্রথর স্মরণশক্তি যজমানের। বৃদ্ধ প্রমাতামহীর ক্ষেত্রেও ‘যথানালী’ বলতে হয় না। পুরোহিত যে মাত্র শুরু করেন ‘মধুবাতা ঋতায়তে’ অমনি নাসিকাগ্রে পাঞ্জাছাপ! যজমান উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করে বলেন, মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ।। মধু-নক্তমুতোষসো মধুমং পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরন্ত নঃ পিতা। মধুমামো বনস্পতির্মধুমা নন্ত সূর্য মাধ্বীগীবো ভবন্ত নঃ। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।।”

কচি মেয়েটা কাঁদছে কাঁদুক—সব মেয়েই কাঁদে—কিন্তু অমন তাগড়াই জোয়ান মরদ কেন কাঁদে ভাসাচ্ছে? ব্যাপারটা এই—ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, নদীর জল মিঠে, জ্যোৎস্না রাতও মিষ্টি, মাঘের জমাটি শীতে সূর্যের রোদও বেশ মিষ্টি লাগে। আর দুখেলা গাইয়ের বাঁটে তো মধুই ঝরে! কিন্তু সেসব কথা বলতে গিয়ে মানুষটা কাঁদে কেন? এমনটি তিনি আগে কখনও দেখেননি।

একসময় শেষ হল পুরোহিতের সম্প্রদানীয় ধাত্তামো। এবার কুশাণ্ডিকাপর্ব। রূপেন্দ্রনাথের কোন ভূমিকা নেই। পুরোহিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তবে হ্যাঁ, যজমানের বিবেচনা আছে। উনি মাত্র ‘চার-কড়া’ মন্তোচ্চারণ করেছেন। তবু যথাবিহিত কাঞ্চনমূল্যে দক্ষিণাদানের সময় গণ্ডা পুরিয়েই দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতিমতো রজতখণ্ডই।

নারায়ণশিলাকে প্রণামান্তে গাত্রোত্থান করলেন অদ্বৈত বৈদান্তিক।

নিমন্ত্রিতরা ততক্ষণ পণ্ডিত ভোজনে বসেছেন। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। জোড়হস্তে। মালতী ইতিমধ্যে তিনবার দু-দিনের অভুক্ত ব্রাহ্মণটিকে ডেকে পাঠিয়েছে। কর্ণপাত করেননি একবগ্না ঠাকুর। এ যে নিমন্ত্রণকর্তার সামাজিক কৃত্য। আমন্ত্রিতদের সেবাস্ত না হলে তিনি কী করে উপবাস ভঙ্গ করেন?

চিত্রাঙ্ক

শেষে ডাকতে এল শোভারাগী নিজেই : রূপোদা! আপনি একবার বাসরে আসুন।
বরকনে আপনাকে জোড়ে প্রণাম করবে।

এবার কর্ণপাত করতে হল। এটাও পিতার কৃত্য।

বাসর জমজমাট। বরকনেকে ঘিরে আছে সালংকারা সুসজ্জিতা পুরনারীরা।

সদ্যোবিবাহিত দম্পতি জোড়ে প্রণাম করল তাঁকে।

—মাথা অমন নামাসনে মামণি। মুকুটটা পড়ে যাবে। হাতে পদস্পর্শ করে ললাট
স্পর্শ কর।

অবাধ্য হল রূপমঞ্জরী। যা কখনও হয় না। তার চন্দনচর্চিত ললাটটি নামিয়ে দিল
পিতার যুগ্ম চরণকমলে। পদ্মপত্র শিশিরসিক্ত হল যেন! উনি নিচু হয়ে স্বর্ণমুকুটটার
স্থানচ্যুতি ঠেকাতে গেলেন। দু-হাতে চেপে ধরলেন ওর লাজবস্ত্র-অবগুপ্তিত মস্তক।
বাবার কানে কানে অস্ফুটে কী যেন বলল মামণি। সকলের শ্রুতিগোচর হল না। তারা
শুনল বিব্রত পিতার প্রত্যুত্তর : আমার নজরে পড়েনি মা, আমি তো ব্যস্ত ছিলাম নানা
কাজে।

মালতী বোধহয় স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল। সর্বসমক্ষে চেপে ধরল তার
ঠাকুরপোর মণিবন্ধ। বলল, আপনি এঘরে আসুন তো! কিছু মুখে দিন আগে।

মীনুর মা সায় দেন, হ্যাঁ বউমা! এবার পাগলটাকে দুটি খাইয়ে দাও। দু-দুটো দিন
উপোস করে আছে!

মালতী ওঁকে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। সেখানে একটি আসন পাতা।
আসনের সম্মুখে কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন-পরমান্ন। পাশেই একটি পাত্রে বেলের পানা।
রূপেন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে ভুলে নিলেন পানপাত্রটা। একনিশ্বাসে বেলের পানা নিঃশেষ
করে পাত্রটি বৌঠানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আমাকে মার্জনা করবেন বৌঠান!
ওর ওই প্রশ্নটার সদুত্তর না জানা পর্যন্ত আমি কিছু মুখে দিতে পারব না।

—কী জানতে চেয়েছিল মামণি?

রূপেন্দ্র তখন চলতে শুরু করেছেন। দ্বারপ্রান্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ও
বলেছিল : ‘শুভদা আসেনি’?





ভাদুড়িবাড়ি নিস্তরু। কৃষ্ণ দ্বাদশীর এক-আকাশ তারার চালচিহ্নের সম্মুখে নিষ্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে মৌন প্রাসাদটা। কোনও ঘরে আলো জ্বলছে না। কোনও সাড়াশব্দ নেই। দারোয়ান আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে বললে, অইয়ে বাবা!

—তারাদা কোথায়? ঘুমিয়ে পড়েছেন?

—জি নহি। সবকোই জাগত হয়। যাইয়ে না ভিতর।

—কে মারা গেছেন মিশিরজি?

—মুঝে নহি মালুম, বাবাঠাকুর।

গলিপথে সেজবাতি জ্বলছে। দাসদাসীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বিনা নির্দেশেই। সোপানশ্রেণি অতিক্রম করে দ্বিতলে উঠে এলেন। খোলা বারান্দায় তারা প্রসন্ন একটি আরামকেদারায় অর্ধশায়িত। পদশব্দে ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখেন। কী যেন বলতে গেলেন—বাক্যস্মৃতি হল না।

রূপেন্দ্রনাথ বসে পড়েন তাঁর পায়ের কাছে। পাথরের মেঝেতেই। তারাদার একটি হাত নিজ মুষ্টিতে তুলে নিয়ে কাতরভাবে প্রশ্ন করেন : কী হয়েছে তারাদা?

তারাপ্রসন্ন নিজের হাতটি বন্ধনমুক্ত করে দু-হাতে মুখ ঢাকেন। উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে পড়েন পাঁজরভাঙা কানায়। রূপেন্দ্রনাথ এদিক-ওদিক দেখেন। ভদ্রাসনটি যেন জনমানবহীন। আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে কাউকে দেখতে পান না। না তারাবৌঠান, না পুটুরানি, না শুভপ্রসন্ন। এমনকি দাসদাসীরাও যেন এক অজ্ঞাত গৃহদাহে ভস্মীভূত। হঠাৎ নজর হল, তারাদার মুঠিতে ধরা আছে একটি ভূর্জপত্র। সেটি তিনি ওঁর দিকে যেন বাড়িয়ে ধরেছেন। মৌনমুখ শোকাহত মানুষটি যেন ইঙ্গিতে সেটি দেখাতে চাইছেন তাঁর অনুজপ্রতিম রূপো-বাঁড়ুজ্জেকে।

রূপেন্দ্রনাথ পত্রটি গ্রহণ করলেন। যথেষ্ট আলোকের অভাব। পড়া গেল না। তাই প্রশ্ন করেন, কীসের এ মৃত্যুশৌচ? কে? কে মারা গেছেন তারাদা?

এতক্ষণে বজ্রাহত মানুষটি খুঁজে পেলেন তাঁর কণ্ঠস্বর : আমি!

বুঝতে পারেন এই মানুষটার কাছ থেকে এখন প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। সম্ভবত রহস্যমঞ্জুষার কুঞ্চিকা ওই পত্রটি। এগিয়ে গেলেন দূরপ্রান্তস্থিত দীপাধারের দিকে। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা অচঞ্চল। পার্থিব শোকে বেপথুমান হওয়া তার স্বধর্মবিরুদ্ধ। মুহূর্তে আলোকিত হয়ে গেল সমস্যাটা—

চিত্রাঙ্কন

পত্রের লেখক : শ্রীমান শুভপ্রসন্ন দেবশর্মনঃ

পত্রের প্রাপক : তদীয় পিতৃদেব।

পত্রটির নিগলিতার্থ : কিশোর ব্রাহ্মণটি আত্মসন্মায়স গ্রহণ করেছে। তাই গৃহত্যাগ করেছে আজই প্রত্যুষে। সে সুন্দরের অভিসারে মানসযাত্রী। সদগুরুর সন্ধানে। আক্ষেপ করে জানিয়েছে মনোমতো সদগুরু সে স্বগ্রামেই লাভ করেছিল। কিন্তু কুপমণ্ডুক ব্রাহ্মণ্য সমাজ কুসংস্কারের কৈঙ্কর্যে তার সেই গুরুদেবকে বাধ্য করেছে ওই সুন্দর-সন্ধানীকে পরিত্যাগ করতে। জানিয়েছে : পৈতৃক সম্পত্তির জীমূতবাহন-সূত্রের দায়ভাগ-অধিকার— সে স্বেচ্ছায় নির্বুঢ় স্বত্বে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। ভূম্যধিকারী তাঁর ইচ্ছামতো অন্যান্য ওয়ারিশদের ভিতর সম্পত্তি বণ্টন করলে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। পত্রান্তে সে একটি মাত্র অনুরোধ জানিয়েছে : যেন তাকে অনুসরণ না করা হয়, যেন তল্লাশ না করা হয়। অর্থাৎ তাকে আত্মহননে বাধ্য করা না হয়। কারণ সে জীবিত থাকতে চায়—ভূমার স্পর্শ পেতে চায়, সত্যশিবসুন্দরের আশীর্বাদ লাভ করতে ইচ্ছুক।

পত্রের সঙ্গে বাবলাকাঁড়িয় আর একটি ক্ষুদ্র ভূর্জপত্র অনুবিল্ল :

পরমকল্যাণীয়াসু

মঞ্জুভাষিণী।

মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে সুন্দরাং বিপ্রযোগঃ ॥ *



এটি মেঘদূতম্ কাব্যের শেষ শ্লোকের শেষার্ধের সজ্ঞানকৃত ভ্রান্ত-উদ্ধৃতি।

যক্ষ মেঘকে আশীর্বাদ করে বলেছিল ‘বিদ্যুতা’—‘বিদ্যুৎ হইতে’, অপাদানে পঞ্চমী স্থলে তৃতীয়া বিভক্তি। মঞ্জুভাষিণীকে আশীর্বাদ করতে শুভ বলেছে ‘সুন্দরাং’। পংক্তিটির অনুবাদ : “হে মঞ্জুভাষিণী! আশীর্বাদ করি সারাজীবনে ক্ষণকালের জন্যও তুমি, যা কিছু ‘সুন্দর’ তা-থেকে বিচ্যুত হোয়ো না।”





রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

1757

ত্রয়োদশ পর্ব

1757 : ভারতেতিহাসের এক চিহ্নিত বৎসর।

নবাব আলিবর্দির এতেকাল হয়েছে। তাঁর গদিলোভী দামাদবর্গকে দৃঢ়হস্তে অবদলিত করে আলিবর্দির দৌহিত্র হয়ে উঠেছে বাঙলা-বিহার-উৎকলখণ্ডের মহান অধিপতি। ইতিমধ্যে কলকাতায়

সসৈন্য অভিযান করে ইংরেজদের কুঠি লুটও করেছে। উচ্ছৃঙ্খল নব্যযুবক। তার নামে ইতিহাসের একতরফের পণ্ডিতবর্গ নানা কুৎসা রচনা করেছেন। তার কতখানি সত্য, কতখানি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শাসকদলের চাটুকারণিতা তা নিয়ে ইতিপূর্বেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন তার পুনরুজ্জ্বল নিষ্প্রয়োজন। পলাশীপ্রান্তরে অন্তর্মিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য! বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর অধিকার করেছে গদি। তার সাকরেদরা, যড়যন্ত্রকারীরা—রাজবল্লভ, রাজদুর্লভ, কৃষ্ণচন্দ্রের দল, তাঁদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। সমকালীন প্রতিষ্ঠাবান ভূম্যধিকারীদের মধ্যে একমাত্র একজন—যিনি যড়যন্ত্রে যোগদান করতে স্বীকৃতা হননি তিনি—রানি ভবানী। অমর্যাদার আশঙ্কায় তাঁর বিগতভর্তা পরমাসুন্দরী কন্যাটিকে নিয়ে বরানগর ত্যাগ করে কাশীবাসী হয়েছেন।

পলাশী যুদ্ধের শহিদদ্বয়ের সম্বন্ধে—একজন মুসলমান, একজন হিন্দু—ইতিহাস নীরব। মীরমদনের বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি, মোহনলাল সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পেয়েছি তার উপর কথাসাহিত্য-অনুমোদিত চিত্র রচনা করে অন্যত্র তা লিপিবদ্ধ করেছি।* ফলে সে প্রসঙ্গও পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সিরাজ সম্বন্ধে বোধকরি শেষ কথাটা বলে গেছেন পণ্ডিতপ্রবর ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় : 'Siraj was more unfortunate than wicked !

* দর্পণে প্রতিবিস্তিত কাঁটা

রূপমঞ্জরীর বৈধবা

আমরা বরং আমাদের পরিচিত পল্লীপ্রান্তে দূকপাত করি। এই কয় বৎসরে সেখানেও বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বাচস্পতিমশাই গঙ্গালাভ করেছেন। নন্দখুড়ো বাতব্যাধিতে বড়ই বিব্রত। তার পরিবর্তে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বড়খোকা এখন পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান। যেমন দুর্গা গাঙ্গুলীর অবর্তমানে হয়েছেন কালিচরণ। তবে নন্দখুড়োর তো গঙ্গালাভ ঘটেনি। তাই নেপথ্যে অবস্থান করেও তিনি আজও কলকটি নাড়েন—যাতে সমাজে অন্যায় প্রবেশ না করে।

তারাপ্রসন্ন যেন বজ্রাহত তালবৃক্ষ। গোঁফদাড়ি ফৌরি করেন না। কাঁচাপাকা শ্মশ্রুতে তাঁকে আর চেনাই যায় না। তারাসুন্দরী শোকস্তব্ধা। সংসারের সব কাজ করে যান যন্ত্রচালিত পুতলিকার মতো। এ কয় বছরে কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি। তবে এসব তো অনেক পরের কথা। বিগত কয়েক বছরের বিবর্তনের চুম্বকসারটা বরং শুনিয়ে দিই :

গুডবিবাহের পরদিন অপরাহ্নের পূর্বেই যাত্রা করল বর-কনে, যাতে গোধূলিলগ্নে ও বাড়িতে বধুবরণ সম্ভব হয়। কনেযাত্রার পূর্বে বড়বাড়ি সংক্রান্ত মর্যাদিক সংবাদটা মামণিকে জানানো হয়নি। কাম্বাকাটি, প্রণাম, আশীর্বাদের পালা মিটলে রূপমঞ্জরী গিয়ে বসল পালকিতে। শাঁখ বাজলো, হলুধ্বনি শোনা গেল। ‘জয় দুর্গা’ বলে বরযাত্রীদল রওনা হয়ে গেল। রূপেন্দ্রনাথ জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন গৃহদ্বারে। জীবন-শিবনাথরা বরযাত্রীদের অনুগামী হয়ে গ্রামসীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। পালকি নামল গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথে।

হুহু-না, হুহু-না করে পালকি চলেছে। মামণির দু-চোখে বারে বারে নামছে জলের ধারা। কানাইয়ের-মা ওকে ধমক দেয়—আর কাঁদিস্নি মা, চন্দনছাপ সব ধুয়ে গেল যে।

একই পালকিতে চলেছে কানাইয়ের মা। মুখোমুখি দুজন। কানাইয়ের-মা গাঙ্গুলীবাড়ির বহুদিনের দাসী। এটাই ছিল প্রথা। বালিকাবধুর প্রথম স্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে কনের বাড়ির কোন দাসী যেত সঙ্গে। তা রূপো বাঁড়ুজের তো ও বালাই নেই, তাই কালিখুড়ো তাঁকে ধার দিয়েছেন তাঁর দাসীকে, আটদিনের জন্য। অষ্টমঙ্গলায় যখন ওরা ফিরে আসবে তখন দাসীও ফিরবে।

আজ থেকে দু-আড়াই শ বছর আগে এটাই ছিল সামাজিক প্রথা। সেটা যে ‘অষ্টমবর্ষে তু ভবেৎ গৌরী’র জমানা। এমন আরও কিছু নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল। যেমন : ফুলশয্যা। সেটা অনুষ্ঠিত হত, তবে বিবাহের ছয়-সাত বছর পরে। অনিবার্য হেতুতে।

যে সাত রাত-দিন বালিকাবধূ নতুন বাড়িতে থাকত সেই বাপের বাড়ির দাসী শয়ন করত বালিকা বধুর সঙ্গে একই কক্ষে। মেঝেতে মাদুর বা কতল পেতে। দাসীটি যদি বৃদ্ধা বা রাত-অন্ধ হত তখন নববধুর দিদিশাওড়ি জাতীয় কোনও বৃদ্ধা এসে বলতেন, ‘ও নাতবউ! আমরা তোমার সাথে টুক গুতি দিবা? আমার শোবার কুন ঠাই নাই গো’।

উদ্দেশ্যটি প্রাঞ্জল। বরের পক্ষে যদিও প্রাণ-জল নয়। এ ব্যবস্থা করা হত যাতে গভীর রাতে 'চোরে-কামারে' মুখোমুখি সাক্ষাৎ না হয়ে যায়। বধুটি বালিকা। ডাগর নয়। হয়তো বোধগম্যি হয়নি। কিন্তু আর একজন? তিনি যে দিবারাত্র হোঁক-হোঁক করছেন সেটা কি ঠান্মার নজরে পড়ে না?

তিনি তো আর রাত-অন্ধ নন!

রূপমঞ্জরী চলেছে দুলাকি চালে—হুমব্রো, হুমব্রো ছন্দে।

সে মর্মান্তিক আহতা হয়েছে শুভদার শশুকবৃত্তিতে। এমন শুভদিনে সে একবার এসে হাসিমুখে দাঁড়াতে পারল না? আশুরবেদনাকে অন্তরীণ রেখে? পরাজিত সেনাপতির মতো মুখ লুকিয়ে বসে রইল! কিসের পরাজয়? তার মঞ্জু তো স্বয়ম্বর হবার সুযোগ পায়নি। তা পোলে কি এমনটা ঘটত? শুভদাকে তো লক্ষ্যভেদের অনুমতিই দেওয়া হল না। হাঁ-হাঁ করে সবাই রুখে উঠল : তুমি বারিন্দির!

মঞ্জুতো বলেনি 'বারিন্দিরে বরির না-কভু!'

তবু শুভদার অনুপস্থিতির একটা যুক্তি আছে। যদিও তা অর্থহীন। কিন্তু জেটিমা? পুঁটুপিসি? জ্যাঠামশাই? কেউ—কেউ এসে তাকে আশীর্বাদ করে গেলেন না।

পালকির পর্দার ফাঁক দিয়ে একজন অশ্বারোহীকে দেখা যাচ্ছে। সাদা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। যেন যুদ্ধজয় করে ফিরছে। লোকটার কিন্তু বিবেচনা আছে। বাসি-বিয়েতে তাকে প্রকাণ্ড নতুন কাঁসার থালায় পুষ্পান দেওয়া হয়েছিল। সে খুব সাবধানে তার এক-চতুর্থাংশ এলাকায় অন্নব্যঞ্জন মেখে খেয়েছে। আহাৰ্য-থালিকার তিন-চতুর্থাংশ অস্পর্শিত। সে অংশটা বাকবাকে কাঁসার নতুন থালা। ও জানে যে, নববধু জীবনে কখনো কারও উচ্ছিষ্টপাত্রে অন্নগ্রহণ করেনি; এটাই প্রথম। এই স্ত্রী-আচার সেই ঘৃণিত গৃহসূত্রের ধারাবাহী : 'ভুক্তোবাচ্ছিষ্টংবদৈব দদাৎ' (আহারান্তে যা খেতে পারলে না তা ঐটোপাতায় রেখে দিও, স্ত্রী খেয়ে নেবে)। লোকচার সৌম্যকেও মানতে হয়েছে, কিন্তু কী সুন্দরভাবে সেই কদবরীতিটা মেনেছে! কী নাম যেন ওর? সৌম্যসুন্দর?

সাতদিন ছিল শ্বশুরবাড়িতে। সবাই খুব আদর যত্ন করেছেন। পাড়া-প্রতিবেশী সবাই একবাক্যে বলেছেন : 'এমন ঘর-আলো করা নতুন বউ জীবনে দেখিনি'! একমাত্র বড়-জা ছাড়া সবাই নববধুর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এই সাতদিনে অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়েছে। সেই কিশোরটিকেও দেখেছে। তবে দূর থেকে। ঠিকই বলেছিলেন বাবামশাই। দৈর্ঘ্যের জন্যই ওকে একটু শীর্ণকায় লাগে। কিন্তু কণ্ঠস্বরটি মিষ্ট। একান্তে কোনদিন আলাপ হয়নি। একদিন দুপুরে দিদিশাণ্ডি তো তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন। বললেন, এই দ্যাখ নাত-বৌ, কারে ধরে এনেচি! এক নম্বর চোর! জানলার ফাঁক দে' তোরে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে! কেনে দাদা? বৌভা তো তোরই! দ্যাখনা চোকের আশ্মিটিয়ে!

সৌম্যসুন্দর বলে, আহ! কী অসভ্যতা করছ ঠান্মা!

—অসভ্যতা! আমি পিছন ফিরলিই তো চুক্চুক করে অরে চুমু খাবি!

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

—তোমার মুখে কোন আড় নেই?

—কেমন করে জানলি দাদা? তুই কি আমার মুখে কোনদিন চুমু খেয়ে দেখেছিস? আড় আছে, না নেই!

সৌম্যসুন্দর পালিয়ে বাঁচে। সকালে ঠাম্মারা এই জাতীয় রঙ্গ-রসিকতাই করতেন। কেউ দোষ ধরত না। হাসত। আজকের দিনে হয় তো মনে হবে রসিকতাগুলো স্থূল!



অষ্টমঙ্গলার দিন ওরা সোণাইমুখো যাত্রা করল একই সময়ে, অর্থাৎ অপরাহ্নের অনেকটা পূর্বে। ছয় বেহারার কাঁধে ওরা দুজন; আর অশ্বপৃষ্ঠে বর। সোণাই গাঁয়ের কাছাকাছি এসে অশ্বারোহী পাল্কি-বাহকদের কী যেন বলল। তারা সাবধানে মাটিতে নামিয়ে রাখল পালকিটা। সৌম্য পাল্কির দ্বারের কাছে অগ্রসর হয়ে এসে বলে। তোমরা ওই গাছতলায় গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। আমার ঘোড়ার পায়ে একটা নাল আলগা হয়ে গেছে, একটু ঠুকে নিয়ে আসি।

কানাইয়ের-মা জানতে চায়, আপনার কাছে নাল চোকার যন্ত্র আছে তো জামাইদাদা?

—না, নাই। কিন্তু শত্ৰু কাকার ছাপরাটা কাছেই। সেজন্যেই এখানে থেমেছি। শত্ৰুকাকা জাতে কামার। ওঁর ঘরে যন্ত্র পাবই। বেশি দেরি হবে না। আমি যাব আর আসব। ভয় পেও না।

কানাইয়ের-মা রূপমঞ্জরীর হাতখানি ধরে তেঁতুল-বটের ছায়ায় এগিয়ে গেল। গাছের তলাটা বাঁধানো। তেলসিঁদুরের দাগও নজরে পড়ে। ওরা সেখানে গিয়ে প্রণাম করল। বসল বাঁধানো চাতালে। পালকি-বেহারার দল একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। সৌম্য ঘোড়ার লাগাম ধরে পদব্রজে এগিয়ে গেল একটা পর্ণকুটিরের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল সে। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে গতর নাড়ালো কানাইয়ের-মা। না-বিইয়ে সে কানাইয়ের-মা হয়নি। বুঝলো, জামাইদাদাকে এ সুযোগটা দেওয়া তার কর্তব্য। হয়তো ঘোড়ার পায়ে নাল মোটেই আলগা হয়ে যায়নি। হয়তো জামাইদাদা একটু নিরিবিলির সুযোগ নিতেই এই অস্থির আশ্রয় নিয়েছে। আহারাণ্ডে একটি মিঠে খিলি বাঙলা পান মুখে দিয়েছিল কানাইয়ের-মা। আবার একটা ঠেসে দিল গালে। হেলতে দুলতে এগিয়ে গেল জোয়ান বেহারাগুলো যেখানে বসে আছে। ওর পানে-রাঙা ঠোঁট দেখে ওই মরদগুলো মুগ্ধ হয় কিনা সেটা দেখতে চায়।



রূপমঞ্জরী বলে, তুমি আবার কোথায় চললে, কানাইয়ের-মা?

কানাই-জননী পিচ করে পিক ফেলল। মুচকি হেসে জামাইবাবুর ভাষা অনুকরণ করে বললে, আমি যাব আর আসবো। ভয় পেওনি। আর ওই দ্যাখ জামাইদাদা আসতিছেন। দুটো মনের কথা করে নাও মা বাপু! এমন সুযোগ আর পাবা?

অশ্বটিকে একজন বেহারার জিম্মায় দিয়ে সৌম্য এগিয়ে এল। খুশি হল কানাইয়ের মায়ের বিবেচনায়। এসে বসল রূপমঞ্জরীর পাশে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে। বললে, এ কয়দিন তোমার খুব খারাপ লাগছিল, তাই না? বাবামশাইকে ছেড়ে কখনো তো থাকনি।

রূপমঞ্জরী অধোবদনে নীরবই রইল।

—কী? তুমি কথা বলছ না যে?

অশ্বটো এবার বলে, খারাপ লাগবে কেন? সবাই আমায় কত আদরযত্ন করলেন।

—তুমি অনেক পুঁথি পড়েছ, তাই না মঞ্জু?

হঠাৎ চোখ তুলে তাকায়। বলে, আপনি আমাকে ও নামে ডাকবেন না।

সৌম্য একটু অবাক হল। বোধকরি আহতও।

বললে, কেন বল তো? ‘মঞ্জু’ তো ‘মঞ্জরীর’ সংক্ষিপ্ত রূপ, যেমন ‘মঞ্জরী’ হচ্ছে ‘রূপমঞ্জরী’র।

—সে জন্য নয়। ‘মঞ্জু’ ছিল আমার মায়ের নাম। তাঁর পুরো নাম ছিল ‘কুসুমমঞ্জরী’।

বন্ধিম হলে হয়তো এই সময়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে ধমক দিয়ে উঠতেন, “ও রূপমঞ্জরী! কী বলিলে? সেটাই কি আপত্তির মূল হেতু? না কি ও নামে ডাকিবার অধিকার আর কাহাকেও দিতে মন সরিতেছে না”?

তা এ অধম তো বন্ধিমচন্দ্রের জমানার নয়। তাই তাকে নীরব থাকতে হচ্ছে।

—সে ক্ষেত্রে তোমাকে যদি ‘রূপা’ নামে ডাকি?

—তা ডাকতে পারেন।

—তুমি আমাকে ‘আপনি’ করে কথা বলছ কেন? তোমার-আমার কী সম্পর্ক তা কি আটদিনেই ভুলে গেছ?

—আমি তো জানি সব স্ত্রীই স্বামীকে ‘আপনি’ বলে কথা বলেন!

—ভুল জান। সেটা প্রকাশ্যে। জনান্তিকে নয়।

রূপমঞ্জরী নিরন্তর অধোবদনে বসে থাকে।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

—কই বললে না? তোমার বাবা আমার বাবাকে বলেছিলেন তুমি তাঁর কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র পড়। কাব্যগ্রন্থ পড়নি কিছু? অথবা মহাকাব্য?

—পড়েছি। মহাভারত অবশ্য পড়িনি এখনো।

—কার কাব্যরচনা তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে?

অধোবদনেই বললে, কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ!

সৌম্যসুন্দর উচ্ছ্বসিত। বলে, আশ্চর্য! আমারও তাই অভিমত। তুমি তাঁর সব পুঁথি পড়েছ?

—না। সব আর কোথায় পড়লাম? শুধু বিক্রমোর্বশীষম্, নলোদয়, মেঘদূতম্ আর কুমারসম্ভবম্।

—কুমারসম্ভবম্ও? কতটা? মানে কোন স্রগ পৰ্যন্ত?

রূপমঞ্জরী কৌতুক বোধ করে। বলে, আপনি কোন স্রগ পৰ্যন্ত পড়েছেন?

—এটা অনায় প্রতাপ্রশ্ন। আমি প্রথমে জানতে চেয়েছি।

—সবটা!

—সপ্তম সর্গের শেষ পর্যন্ত?

রূপমঞ্জরী তার কাজলকালো দু-চোখ মেলে কী যেন বুঝে নিতে চাইলো।

—কই বললে না? সপ্তম সর্গের শেষ পর্যন্ত?

—আপনি কি অতটাই পড়েছেন? তারপর পড়েননি? “পাণিপীড়নবিধেরনস্তরং শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি...”

সৌম্যসুন্দর একথার জবাব দেবার সুযোগ পেল না। এগিয়ে এল কানাইয়ের মা। বললে, পালকি বেয়ারারা গা তুলতে বললে। ওদের তো আজই তিজলহাটি ফিরতে হবে।

সৌম্য তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। রূপমঞ্জরীর সঙ্গে তার আবার চোখাচোখি হয়ে যায়। দুজনেই হাসে। ঠোঁটের প্রান্তে নয়। চোখে-চোখে।



মাত্র তিনরাত্রি শ্বশুরবাড়িতে বাস করে তিজলহাটিতে প্রত্যাবর্তন করল সৌম্যসুন্দর। এ তিন রাত্রি রূপমঞ্জরী শয়ন করেছে শ্যামা আর মালতীর সঙ্গে। আর সৌম্যসুন্দর রূপেন্দ্রের শয়নকক্ষে।

প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সৌম্যসুন্দর রূপেন্দ্রনাথকে বললে, আপনি আমার বাবামশাইকে বলেছিলেন আমাদের দ্বিরাগমন হবে চার বছর পরে। পিতৃদেব সম্মত

হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্রয় করছি আর দুই-এক বছরের ভিতরেই নদীয়ায় আমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমি আপনার কাছে অতঃপর অথর্ববেদ, আয়ুর্বেদ এবং চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করতে ইচ্ছুক। এটা কী ভাবে সম্ভবপর হতে পারে?

—তুমি একটি শর্ত স্বীকার করে নিলেই। আমার দ্বার তোমার জন্য সদা উন্মুক্ত। যে কোনদিন তুমি এ ভদ্রাসনে আসতে পার। আমিও মহাচার্য রামনাথপন্থী—গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করি না। তোমার ক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গ তো আদৌ ওঠে না। তুমি আমার একমাত্র জামাতা।

—কিন্তু শর্তটি কী?

—তুমি আমার ভিটেয় যে কোনদিন আসতে পার। আমরা যা আহাৰ করি—তা তিস্তিভীপত্রের ব্যঞ্জন হলেও—গুরুশিষ্য ভাগ করে নেব। তোমরা দুজনেই—স্বামী-স্ত্রী—আমার কাছে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠ। দক্ষ হয়ে ওঠ—এটাই আমার মনোগত ইচ্ছা। তারপরে তুমি সেদিন যা বলেছিলে তাই হবে। অর্থাৎ তোমরা দুজনে তিজলহাটিতে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু শর্তটি হচ্ছে এই : যাবৎ দ্বিরাগমন তুমি রাত্রিবাস করবে সোএগই আরোগ্যানিকেতনের অতিথিশালার একটি নির্দিষ্ট কক্ষে।

—আমি সানন্দে স্বীকৃত, বাবা! এ শর্ত তো প্রত্যাশিত!



দশ-দশটা দিন যেন পাহাড়ি বরনার মতো নাচতে নাচতে চলে গেল। কত অপরিচিত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। ঘোষালবাড়ির আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী “এঁকে প্রণাম কর বৌমা, ইনি তোমার পিসাশ্বশুর, এঁকে পেন্নাম কর নাাতবৌ, এ হল গে তোমার সেজ খুড়শ্বশুর, এনাকে দণ্ডবৎ কর, ইনি তোমার জেঠশাশুড়ি...” একের পর এক। সোএগই গাঁয়ে ফিরে আসার পরেও তা চলেছে। ওখানে সবাই দেখতে আসতো নতুন বউ। এখানে নতুন-জামাই।

এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে গুর মনে পড়ত না যে, একটা প্রকাণ্ড ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। একেবারে যে পড়েনি তাও নয়। এ বাড়ি সে-বাড়ি থেকে এত লোক এল কিন্তু বড় বাড়ি থেকে তো কেউ একবারও এলেন না। মীনুর মা নতুন জামাইয়ের নাম করে পরমাল বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, গাঙ্গুলীবাড়ির সেজখুড়িমা পাঠিয়েছেন গোকুলপিঠে। মায় নদীর ওপার থেকে একটা চাউস কুমড়ো ঘাড়ে করে এসে হাজির বায়েন-পল্লীর মাতব্বর পেন্নাদ বায়েন। তার গাছের পেরথম কুমড়োটা। ওর হাত ধরে এল একটি ফুটফুটে শ্যামলা ছেলে, মাজায় শুধু ঘুনসি বাঁধা। মালতীই দ্বার খুলে দিয়েছিল। পেন্নাদ সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে বললে, গাছের পেরথম ফলটা

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

বাবা-ঠাউরের জন্য নে-এলাম মা-জননী। শুনলাম জামাইবাবাজিও নাকি ভিন-গাঁথিকে এয়েছেন।

মালতী জানতে চায়, এটি কি তোমার ছেলে? কী নাম?

প্রহ্লাদ বলে, না-মাঠান, এড়া বেষ্টা-বায়েনের ব্যাটা বটে! বাবাঠাউরই তো এর পেরানডা দিলেন। নাম...

বাচ্চাটার পেটে একটা খোঁচা মেরে বলে, তর নামডো'ক'।

শিশুটি বললে, গুপাল।

—ওর বুঝি অসুখ করেছিল? কী অসুখ?

—না মাঠান। অর কিছু হয় নাই। অ তখনো জাম্মায়ইনি! অর মা যমুনারে সবাই পোড়ায় মারতে চাইছিল। বাবাঠাউর না বাঁচলি এই ছ্যামডাও পুইড়ে মরত আস্তে।

মালতী বলে, তোমরা দুজন কিছু প্রসাদ পেয়ে যেও।

ওর মনে হল, ওই অর্ন্তজে পরিবারের অবোধ বালক গোপাল আর তার নিজের শিশুকন্যা শ্যামামালতীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দুজনেই ঈশ্বরের দান এবং একবন্ধা-ঠাকুরপোর আশীর্বাদ।



রূপমঞ্জরী জানতে চায়নি কেমন করে এই অঘটনটা ঘটল। কেন ওরা সপরিবারে রূপমঞ্জরীর বিবাহকার্যটা বর্জন করলেন। বোধকরি তার অবচেতনে জন্ম নিয়েছিল এক তীব্র অভিমান। জেঠামশাই যদি মনে করে থাকেন বরযাত্রীদের জন্যে অতিথিশালা খুলে দেওয়াই যথেষ্ট, জেঠাইমা যদি ভেবে থাকেন 'আইবুড়োভাতে ভরপেট তো খাইয়েই দিয়েছি, আবার কী চাই?' অথবা পুঁটুপিসি যদি বলে, 'ওমা! আমিই সেদিন তো ওর খোঁপা বেঁধে দিলাম। দিইনি?' তাহলে মামণির কিছু বলার নেই। আর শুভদা? সে তো প্রেমদাস বাবাজির ধ্বংসস্তূপে ভাঙা আতস কাচ দেখেই মুগ্ধ! তার ঘোর বোধহয় এখনো কাটেনি। কিন্তু শুভদা কি একটা কথা ভেবে দেখেছে? 'বসুধালিঙ্গন ধূসরসুত্নী' আতসকাচটা যখন দেখবে যে, মাঘের শেষে সূর্যদেব উত্তরায়ণের পথে যাত্রা করেছেন, তখন তার কী দশা হবে? তখন তো ওই ভাঙা ছাদের ফোকর দিয়ে সূর্যালোক ওর দিকে আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে না? সূর্যাসীর্বাদবধিতা তখন কী করে পালন করবে তার স্বধর্ম? তারপর যদি নীরঙ্ক অন্ধকারে কোন এক নতুন অতিথি মশালধারী রূপে এগিয়ে আসে? ভুলুগ্ধিতা আতসকাচের দিকে? তখন সে কি সূর্যালোকের বিকল্প সেই মশালের আলোককে প্রতিফলিত করবে না?



আজ অপরাহ্নে সৌম্যসুন্দর তিজলহাটিতে প্রত্যাবর্তন করবে। এ বাড়িতে আসার পর জনান্তিকে সাক্ষাতের সুযোগ ওদের একবারও আসেনি। হয়তো অনেক দিন দেখা হবে না। মামণির খুব ইচ্ছা করছিল ওর সঙ্গে আড়ালে দুটো কথা বলতে। আর কিছু নয়, দুটো অসংলগ্ন আলাপচারী। বাবামশাই ওকে নিয়ে দামোদরে স্নান করতে গেছেন। মামণি এঘর-ওঘর করছে তার সোনা-মার সন্ধানে। হঠাৎ নজরে পড়ে তিনি তাঁর ঘরেই আছেন। খোলা বাতায়নপথে তিনি কী যেন দেখছেন, জানলার দুটি গরাদ দৃঢ়মুষ্টিতে দু-হাতে ধরে, একেবারে তন্ময় হয়ে।

ঘরের বাইরে থেকে ডেকে ওঠে, কী দেখছে সোনা-মা?

দ্রুতহস্তে মালতী বাতায়নপথের কাঠের পাল্লাটা বন্ধ করে দেয়। বলে, কিছু না। আয় বোস। না, বরং ওঘরে চল।

দুরন্ত কৌতূহল হল মামণির। এগিয়ে এসে বলে, জানলাটা বন্ধ করে দিলেন কেন? কী দেখছিলেন এতক্ষণ?

—না, না! ওসব দেখতে নেই। ও একটা বিস্ত্রী ব্যাপার।

—বিস্ত্রী ব্যাপার? মানে? কী সেটা?

জোর করে জানলাটা খুলে দেয়।

মালতী দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে, হয়েছে? কৌতূহল মিটেছে? বন্ধ করে দে এবার।

হ্যাঁ দেখেছে। চমকে উঠেছিল প্রথমে। এমন দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু ওটা বিস্ত্রী হবে কেন? অলীল হতে যাবে কী কারণে?

উদ্যানে দুটি বৃহদাকার না-মানুষ মেতেছে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে।

রূপেন্দ্রনাথের বাহন সৈনগুপ্ত হচ্ছে অশ্ব। আর সৌম্যসুন্দর যার পিঠে সওয়ার হয়ে অষ্টমঙ্গলায় এ বাড়ি এসেছে সেটি ঘোটকী! এতদিন দুজনেই পড়ে ছিল একা-একা। বৃহদারণ্যকের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গেই বলেছেন :

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।

স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষজৌ স ইমমেবাত্মনং

দ্বৈধাপাতয়ন্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাতবতাং তস্মাদিদমধিবৃগলমিব

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

স্ব ইতি স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তমাদয়মাকাশঃ স্ত্রীয়া পূর্যত এব
তাং সমভবৎস্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।”*

মালতী জোর করে বন্ধ করে দিল পাল্লাটা। বলে, ওসব দেখতে নেই। সরে আয়।
রূপমঞ্জরী অব্যাহত হয় না। সোনা-মাকে বৃহদারণ্যকের তত্ত্বকথা বেকানোর চেষ্টা
করে না। বলে না, মনুষ্যদৃষ্টিতে আপাত অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান হলেও এটা একটা
জাগতিক জৈবিক সত্য। এভাবেই সৃষ্টিকর্তা প্রাণীজগতকে প্রাণবন্ত করে রেখেছেন।
কিন্তু তা-সত্ত্বেও একটা খটকা লাগে। সৈন্যগুপ্তের এ কী বিচিত্র রূপান্তর! সম্মুখের দুটি
পা তুলে দিয়েছে গ্রামান্তরের ওই ঘোটকীর পৃষ্ঠদেশে! সৃষ্টিসুখের এ কী বিচিত্র উল্লাস!
আর... আর... এ কী বিচিত্র বিস্ময়জনক! মিলনমুহুর্তে কি মানুষেরও এমনটা হয়? ও
জানে না। কপোত-কপোতীর কুকুট-কুকুটীর ঐ জাতীয় আচরণ সে ইতিপূর্বেও
দেখেছে। কিন্তু এই উন্মাদ-স্বাধীনতা তো কখনো দেখেনি! আশ্চর্য! অষ্টম সর্গে তো এমন
কথা নেই! ভারতচন্দ্রের অনাবিল বর্ণনাতেও তো সে কথা বলা হয়নি? এটাই কি
তাহলে কাব্যের সীমারেখা? সাহিত্যের লক্ষণগণ্ডী?

ওর সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। ললাটে ফুটে ওঠে স্বেদবিন্দু।



দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। মধ্যাহ্ন আহারের পালা মিটেছে। এবার সৌম্যসুন্দর ফিরে
যাবে। পাল্কি-বেহারার দল যথাবিহিত আপ্যায়িত হয়ে তিন দিন পূর্বেই প্রত্যাগমন
করেছে। সৌম্যসুন্দর তার শ্বশুরকে প্রণাম করে দাঁড়ায় বার হয়ে এল। প্রণাম করল
সোনা-মাকে। তারপর ইতিউতি চাইতে থাকে। মালতী নির্বোধের অভিনয় করে বলে,
কিছু কি খুঁজছ, বাবা?

—আজ্ঞে না। এবার তাহলে যাই?

—‘যাই’ বলতে নেই বাবা। বল : ‘আসি’। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর। মামণিও যে
তোমাকে একটা প্রণাম করবে। তাকে ডেকে দিই।

—ও!

মালতী ফিরে এল তার শয়নকক্ষে। শ্যামা পালঙ্কে ঘুমোচ্ছে। শান্তিপুত্রী লাল ডুরে

* কিন্তু তিনি (ব্রহ্ম) আনন্দলাভ করিলেন না। কারণ একাকী থাকিয়া কেহই আনন্দলাভ করিতে
পারে না। তিনি দ্বিতীয় সত্তায় রূপান্তরিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ আলিঙ্গনাবদ্ধ
অবস্থায় যে পরিমাণ (আনন্দিত) হয়, তিনি সেই পরিমাণ (আনন্দিত) হইলেন। তিনি স্বীয় সত্তাকে
দ্বিধাভিভক্ত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী সৃষ্টি হইল। এজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ‘প্রত্যেক
পুরুষ স্বয়ং অসম্পূর্ণ। সেই শূন্যস্থান প্রকৃতি কর্তৃক পূর্ণ হয়।’ তিনি (ব্রহ্ম) স্বীয় পত্নী সত্তায়
মৈথুনমাধ্যমে উপগত হইলেন। এইরূপে উৎপন্ন হইল মনুষ্যজাতি।

শাড়ি পরে শ্যামার পাশে চুপচাপ বসে ছিল রূপমঞ্জরী। জানতে চায়, এবার কি আমি যাব? প্রণাম করতে?

—এ কী! তুই পানটা খাসনি?

মামণির হাতে ধরা আছে একটা মিঠেখিলি। আহা রাস্তে এটা তাকে দিয়েছিলেন তার সোনা-মা। ও বলে, আমি পান খাই না সোনা-মা! জীবনে খাইনি কখনো!

—এর আগে মাথায় কখনো ঘোমটা দিয়েছিস পোড়ারমুখি? সিঁথিতে সিঁদূর?

—ঠিক আছে বাপু! খাচ্ছি।—পানটা মুখে দিয়ে চিবোতে থাকে।

মালতী ওর চিবুকটা তুলে ধরে বলে, দেখি হ্যাঁ, এইবার ঠিক রাঙা হয়েছে! নতুন বৌকে পান খেতে হয় রে। বোস, আমি ওকে ডেকে দি'।

মালতী বাইরে যায়। সৌম্যকে বলে, আমার ঘরে যাও, বাবা। ও ওখানে অপেক্ষা করছে।

সৌম্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতই মালতী নিঃশব্দ হল। দ্রুতহস্তে বাইরে থেকে শিকলটা তুলে দিল কবাটে। রূপমঞ্জরী চমকে ওঠে। কিন্তু কী বলবে? লাফিয়ে নেমে পড়ে পালঙ্ক থেকে। সৌম্য বলে, সোনা-মা বলেছেন, 'যাই' বলতে নেই। তাই বলি, 'এবার আসি, বুপা?'

—একটু দাঁড়াও। আমি তোমাকে একটা প্রণাম করব।

—এই তো! জ্ঞানলাভ হয়েছে দেখছি!

—জ্ঞানলাভ?

—এতদিন তোমার ধারণা ছিল বরকে বউ 'আপনি' বলে। জনান্তিকেও। তাই বলছিলাম আর কি।

রূপমঞ্জরী কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে আসে। নতজানু হবার উপক্রম করতই সৌম্য ধরে ফেলে ওর দুই বাহুমূল। রূপমঞ্জরী একটু শিউরে ওঠে। বলে, কী?

—তুমি তো আমাকে 'প্রণাম' করবে। কিন্তু আমি কী করব?

নতনয়নে বালিকাবধু বলে, আশীর্বাদ!

—ব্যস? এত কৃপণ কেন গো তুমি? আর কিছু পাব না? দেব না?

মাথার মধ্যে এমন টলমল করে উঠল কেন? অনভ্যস্ত পান-গুবাকের প্রভাবে? নাকি কালিদাস-ভবভূতির আশীর্বাদে প্রত্যাঙ্গন অনুভূতিটার প্রত্যাশায়?

নতনয়নে কোনক্রমে বললে, জানি না! যাও!

—'যাব' তো বটেই! না, 'যাব' না, 'আসব'। কিন্তু দখলদারীর পাঞ্জাছাপটা না দিয়ে যাওয়া কি উচিত? চার-বছর তো আর দেখা হবে না।

ডুবে শাড়ি-পর্য্য তার বালিকা বধূকে টেনে নিল বুকে। অনাঘ্রাতার নয়ন দুটি মুদ্রিত। সৌম্যসুন্দর ওর চিবুকের নিচে হাত দিয়ে নতদল শতদলকে করে দিল সূর্যমুখী। প্রত্যাশিত স্পর্শমাত্রে শিহরিত হয়ে উঠল কুসুমায়জা কুসুমকলির সর্বাংগবয়ব।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

‘দুখানি অধর হতে কুসুম-চয়ন’
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাজ্য বাসর-শয়ন।।’

আমার কাহিনির নায়িকা তার নারীত্বের প্রথম স্বীকৃতি পেল।



‘প্রথম’? লিখতে আমার কলম সরছে না, দিদিভাই। আমি—কাহিনিকার হিসাবে যে জানি : এটা শুধু ‘প্রথম’ নয়, এটাই ‘শেষ’। মালিকা গাঁথার সুযোগ ও আর কোনদিন পাবে না। তাই মহাকবি ওই পংক্তিতে অনেক পরবর্তী কালে লিখেছিলেন ‘বুঝি’। কবি জানেন, সকলের সে সৌভাগ্য হয় না। মালা গাঁথার আগেই শুকিয়ে যায় অনেক ফুল! অনেকের ফুল!

বিশ বছর আগে ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি মাত্র পংক্তিকে পাথেয় করে যখন যাত্রা শুরু করেছিলাম তখন পরমশ্রদ্ধেয়া হুটী বিদ্যালঙ্কার ছিলেন আমার ঠাকুমার-ঠাকুমার-এনএথতমা বৃদ্ধ প্রপিতামহী! ভারতবর্ষের আধুনিক যুগে নারী-স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা! শ্রদ্ধায় মাথা নত করে তাঁর কথা লিখে গিয়েছিলাম। তারপর কখন ধীরে ধীরে সব কিছু বদলে গেল। আমি টেরও পাইনি। পরমশ্রদ্ধেয়া জননী হয়ে উঠলেন আমার কন্যা। বুলবুল অথবা মৌয়ের মতো। সেই যখন ত্রিবেণীতে প্রাকৃতভাবে সে আমাকে অনুরোধ করেছিল তাদের গোম্বাছুট খেলায় ‘বুড়ি’ হতে। আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, ‘তুমি এত বোকা কেন গো? আমি কি তোমারে খুন্খুনে জটিবুড়ি হতে বলিছি?’

তারপর কেটে গেছে আরও দশটা বছর। এখন এই অশীতিপর বৃদ্ধ লেখক যখন রূপমঞ্জরীর উপসংহার লিখতে বসল তখন তার চোখে ছানি, বার্ধক্যজনিত কারণে তার হাত কাঁপে। সে অবাকচোখে তাকিয়ে দেখল তার সেই নায়িকার দিকে। না! ‘কন্যা’ তো আর নয়! ও যে এতদিনে হয়ে গেছে আমার ‘নাতনি’। অন্তরার মতো, নীনার মতো! তাই আমি আজ কোন লজ্জায় ওকে বলি : ওরে হতভাগি! আজ এই যা পেলি এটাই তোমার সারাজীবনের সঞ্চয়। যত্ন করে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখ! এই পরশমণির স্পর্শ আর জীবনে দ্বিতীয়বার পাবিনারে। এই প্রথম, আর এই শেষ! আমি কী করব? আমার যে হাত-পা বাঁধা!

তবে হ্যাঁ, আমার ওই নাতনি তো হার মানবার মেয়ে নয়। সমাজ বালিকা-বয়সেই

খুলে নেবে ওর লালরাঙা ডুরে শাড়ি। পরিয়ে দেবে সাদা থান। রিটে দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেলবে কিশোরী সীমন্তিনীর লাজে রাঙা সিন্দূরবিন্দু! তবু আমার নাতনি হার মানবে না—তাকে যে হতে হবে হটাৎ বিদ্যালঙ্কার!

ও যে সেই উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিতা : “তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।”*

তুই ধীরা, তুই বিজ্ঞানী, পরাবিদ্যা তোর আয়ত্তাধীন! আনন্দ আর অমৃত তোর কাছে সমার্থক। আনন্দস্বরূপকে যে জেনেছে তাকে তো অপমানে দলিত-মখিত করা যায় না! কাশীরেশের পাশবিক অত্যাচার থেকে—হ্যাঁ রে দিদিভাই, তুই দেখে নিস আমার কলমটা আপ্রাণ চেষ্টা করবে তোকে বাঁচাতে—কিন্তু যদি সে ব্যর্থ হয়? তবু তোর আত্মাকে সে পাষণ্ড স্পর্শ করতে পারবে না। তোর আনন্দ যে অবিনশ্বর! পাশব বলাৎকারে তোর দেহটার মৃত্যু হতে পারে? কিন্তু আত্মার?



সুখ আর দুঃখ। আনন্দ আর বেদনা। ক্রমাগত চক্রাবর্তন। অপরাহ্নে হয়েছিল পরম অমৃতলাভ। মাত্র দুদণ্ড পরেই চরম আঘাত!

গোধূলি অতিক্রান্ত। গ্রাম্য পরিবেশে নেমে আসছে সন্ধ্যা। কুলায় প্রত্যাবর্তন করছে এক ঝাঁক টিয়া পাখি। সন্ধ্যাদীপ হাতে রূপা-মা এগিয়ে গেল তুলসীমন্ডের দিকে। তার ডুরে শাড়ির আঁচলে প্রদীপখানি আড়াল দিয়ে। মালতী শঙ্খধ্বনি করল। ওরা ফিরে এলে রূপেন্দ্রনাথ বললেন, মামণি, আমার ঘরে আয়। কথা আছে। আপনিও আসুন, বৌঠান।

শয়নকক্ষে মাদুরটা বিছিয়েই রেখেছেন। ওরা দুজন বসল। পদ্মাসনে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসলেন গৃহকর্তাও। বললেন, একটা কথা তোকে এ কদিন বলা হয়নি। একটা চরম দুঃসংবাদ আছে।

ভাগর দুটি চোখে বাবামশায়ের দিকে তাকিয়ে ও বলল, বড়বাড়ি সংক্রান্ত?

—হ্যাঁ, মামণি। ওঁরা কেন তোর বিবাহে আসতে পারলেন না।

—কাশীধাম থেকে কি কোন দুঃসংবাদ এসেছিল?

—না রে! জ্যেষ্ঠিমা ভালই আছেন। সংবাদটা শুভপ্রসন্ন সংক্রান্ত।

* বিশ্বসত্তাকে ধীর ব্যক্তি বিজ্ঞান এবং পরাবিদ্যার মাধ্যমে শুধু আনন্দরূপে নয়, অমৃতরূপেও আত্মদানে সমর্থ। মুণ্ডকোপনিষৎ। ২।৭

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

—শুভদার! কী হয়েছে তার?

—সে গৃহত্যাগ করেছে।

—কী করেছে? গৃহত্যাগ! মানে?

—সে আত্মসম্মান গ্রহণ করেছে। সংসারাত্মক ত্যাগ করে সদগুরুর সন্ধানে হিমালয়ের পথে যাত্রা করেছে।

কক্ষে শিশিরপতন নিস্তব্ধতা। বেশ কিছুক্ষণ পরে রূপমঞ্জরী বলে, কেন?

—‘কেন’, তা তো বলা যাবে না, মা। শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রজ বিশ্বরূপদেবও অশ্রুত বাঁশির ডাকে এভাবেই গৃহত্যাগ করেছিলেন। শুভও তেমনি কেন্দ্রাতিগ বেগে সোএগ্রাই গ্রামকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করে চলে গেছে। তারাদাকে একটি পত্রে জানিয়ে গেছে—সে সন্ন্যাস নিয়েছে। তার পার্থিব সমস্ত অধিকার সে স্বেচ্ছায় নির্বৃত্তস্বত্বে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। বিষয় সম্পত্তি যেন তারাদা অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেন। সে আর ফিরবে না।

এতক্ষণে বোধহয় সংবাদের প্রত্যাঘাতটা ওর ছোট্ট বুকে ঠিক মতো বিঁধল। হঠাৎ সে জড়িয়ে ধরল তার সোনা-মাকে। বাবামশাই ছিল তার এতদিনের অবলম্বন। কিন্তু এটা এমন একটা বেদনা, এমন একটা আঘাত, যখন মেয়েরা মায়ের আঁচলের তলায় আশ্রয় নিতে চায়। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে চায়। শুভদা তো এখন আর তার বাল্যবন্ধু নয়, সহপাঠীও নয়, সে যে এখন পরপুরুষ। এখন এ কান্নাটা যে ‘ব্যর্থ অবৈধপ্রেম’ হারানোর হাহাকার।

মালতী ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। কেঁদে মনটা হালকা করতে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পরে রূপেন্দ্রনাথ বলেন, অন্যায় সে কিছু করেনি। তার জীবন একটাই। সে যদি সেটা পরমেশ্বরের স্বরূপ সন্ধানে ব্যয়িত করতে চায়, তাহলে আমাদের আপত্তি করার কী থাকতে পারে? সে যে পথে চলতে চায়, তাকে সে পথেই যেতে দেওয়া উচিত। শুধু দুটি বিষয়ে আমি বেদনা পেয়েছি।

চোখ মুছে আবার সোজা হয়ে বসে রূপমঞ্জরী।

রূপেন্দ্র একই ভাবে বলে চলেন, আমার প্রথম স্ফোভ কালনির্ণয়ে। শুভপ্রসন্ন ধীর, স্থির, স্থিতপ্রজ্ঞ। সে কেন এই অতিনাটকীয়তার আশ্রয় নিল?

—অতিনাটকীয়তা?

—নয়? অষ্টপ্রহর অপেক্ষা করলে কী ক্ষতি হত তার? কেন সে ‘দুঃখেদ্বন্দ্বিগমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ’ রূপে এসে দাঁড়াতে পারল না বিবাহমণ্ডপে? আর পাঁচজন গ্রামবাসীর মতো? কালনির্ণয়ের আশ্রিতে সে যে সোএগ্রাই গাঁয়ের খরজিহু মানুষগুলোকে একটা মুখরোচক আলোচনার সুযোগ দিয়ে গেল—এটা সে বুঝতে পারল না? ওই যারা বলেছিল, একই বিদ্যায়তনে বালক ও বালিকার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে সমাজে অনাচার প্রবেশ করবে!

মালতীও সায় দেয় এই যুক্তিতে। বলে, সে-কথা একশবার! শুভ যদি দু-দিন সবুর

করে গৃহত্যাগ করত, তাহলে এ-কথা উঠত না। কাল তো সেজখুড়ি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেসই করে বসলেন, হ্যাঁগা বউমা, অরা দুজনে কি আড়ালে-আবড়ালে—

রূপমঞ্জরী তাকে চাপা ধমক দেয়, আপনি থামুন।

মালতীও রুখে ওঠে, আমি তো থামব। কিন্তু তুই কি পারবি সবাইকে ধমক দিয়ে থামাতে?

—না, পারব না। কিন্তু ক্রাফেপও করব না।

—কিন্তু কথাটা যদি তিজলহাটি পৌঁছে যায়?

রূপমঞ্জরী বিরক্ত হয়। বলে, কী কথা? গ্রামে একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আর একটি ছেলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে কথার কী অবকাশ? কোনটাতে আপত্তি? বিবাহ না সন্ন্যাসগ্রহণ?

রূপেন্দ্র এবার অংশগ্রহণ করেন ওদের আলোচনায়। বলেন, আমার আপত্তিটা কোথায় সে-কথা আমি ইতিপূর্বেই বলেছি, মামণি। কালনির্ণয়ে! এটাই তার অপরাধ। এজন্যই সে দোষী।

তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে বালিকা-তর্কিক। শান্তভাবে সে বলে, আপনি কিন্তু অপরাধীর অনুপস্থিতিতে—তার বক্তব্য না শুনেই—তাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন, বাবা।

—কালনির্ণয়ের ভ্রান্তি বিষয়ে তার কোন বক্তব্য থাকতে পারে?

—জানি না। শুভদা অনুপস্থিত। তবে আমি তার সহপাঠিনী, তার বাল্যবন্ধু। সেই অধিকারে একটা কথা বলব?

—কী বলবি তুই?

—আপনি কিন্তু অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করার পূর্বে বিস্মৃত হয়েছিলেন যুগাবতার আদি শঙ্করাচার্যের সেই শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ—যা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী উভয়ভারতীর কাছে : ‘যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজ্যেত’* একই লগ্নে গ্রামের একটি বালিকার বিবাহ এবং একটি কিশোরের গৃহত্যাগ যদি নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা হয়?

রূপমঞ্জরী নীরব হল। তাকিয়ে দেখল তার আচার্যের দিকে। দেখল, তিনি মুদিত নেত্রে ধ্যানস্থ। মালতী একবার এর দিকে একবার ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না।

দীর্ঘ সময় পরে যেন ধ্যানভঙ্গ হল রূপেন্দ্রনাথের। তিনি সন্নেহে একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন আত্মজার মস্তকে। বললেন, শাস্ত্র বলেছেন, সর্বত্র জয়মিচ্ছুতি, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্—পুত্র এবং শিষ্যের কাছে পরাজয়ই কাম্য। শাস্ত্রবাক্য অসম্পূর্ণ।

* মুমুক্শুর অন্তরে যে মুহূর্তে মুক্তির ইচ্ছা জাগরিত হবে সেই মুহূর্তেই সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারে, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করতে পারে।

রূপমঞ্জরীর বৈথব্য

পুত্রীর ক্ষেত্রেও শ্লোকটি প্রযোজ্য! হ্যাঁ, মা! তাও হতে পারে। এ কথা আমার খেয়াল হয়নি। একটা পাষণ্ডভার নেমে গেল আমার বুক থেকে।

রূপমঞ্জরী তৎক্ষণাৎ বলে, আপনি দুটি হেতুতে আহত হয়েছিলেন। একথাই প্রথমে বলেছেন। একটি তো কালনির্ণয়। শুভদার দ্বিতীয় অপরাধটা কী?

—শুভপ্রসন্ন তারাদাকে লিখেছে, গ্রামেই সে সদগুরুর সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই সে মানস-সরোবরে চলেছে সদগুরুর সন্ধান। শুভপ্রসন্ন বুঝতে পারল না যে, আমি তাকে আদৌ ত্যাগ করিনি। তাকে সাময়িক ভাবে আসতে বারণ করেছিলাম মাত্র। তোর সম্প্রদান হয়ে গেলেই আমি তাকে আবার আমার শিক্ষায়তনে ভেঁকে নিতাম।

—সে-কথা তাকে বলেছিলেন?

—কোন কথা?

—যে, আপনি তাকে সাময়িকভাবে নিষেধ করেছিলেন? অর্থাৎ আপনার কন্যাটিকে পাত্রস্থ করা মাত্র তাকে সর্বস্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদে শিক্ষাদান শুরু করতেন?

আবার অনেকক্ষণ মুদিত নেত্রে স্মৃতিচারণ করলেন। তারপর আশ্চর্যের দিকে দৃকপাত করে বলেন, এবারও ঠিক বলেছি, মা! না—তাকে সে ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে তা বলিনি। এটাও আমারই দোষ।

—না, বাবা। দোষ কারও নয়, ভ্রান্তি। ভুল! ভুল আপনারা দুজনেই করেছেন। প্রচণ্ড অভিমানে। আপনাদের দুজনেরই উদ্ভার মূল লক্ষ্য সমাজের কুসংস্কার। নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি ক্ষেত্রেই তা প্রতিফলিত হল ক্ষেত্রান্তরে। আপনি ভুলে গেলেন শুভদাকে জানাতে যে, এ-একটা সাময়িক ব্যবস্থা—অগ্নি এবং দাহ্য পদার্থকে পৃথক রাখার আয়োজনে। আপনার কন্যাকে পাত্রস্থ করার পরেই আবার তাকে বুক টেনে নেবেন। ভুল শুভদাও করেছে। প্রচণ্ড অভিমানে এই সহজ সরল সত্যটা তার মতো বুদ্ধিমানও বুঝে উঠতে পারল না।

রূপেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নীরব রইলেন। তাঁর বালিকা কন্যার ক্ষুরধার বিশ্লেষণে মোহিত হয়ে গেলেন। মুখে শুধু বললেন, ঠিকই বলেছি, মা।

রূপমঞ্জরী আবার বলে, আপনার বিষয়ে শুভদার সঙ্গে আমার সেদিন কিছু কথা হয়েছিল। সেই যেদিন আমি ওদের বাড়ি ‘আইবুড়ো ভাত’-এর নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। শুভদা বলেছিল, আপনি সারাজীবনে একটাই দোষ করেছেন—যার উপর আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না!

রূপেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি প্রশ্নময় হয়ে উঠল।

মালতীর আর ধৈর্য রইল না। বলে, শুভ বলেছে যে, ঠাকুরপো সারাজীবনে একটাই দোষ করেছেন? কী দোষ?

—‘কালানৌচিত্য দোষ’!

মালতী জানতে চায়, তার মানে?

—উনি ভুল করে দুই শতাব্দি পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন।

মালতী আবার বলে, তারই বা কী মানে?

রূপেন্দ্র তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, থাক ও আলোচনা। আর একটি কথা তোকে বলার আছে, মা। শুভ যাবার আগে তোকে একটি চিঠি দিয়ে গেছে। এটা ধর।

ভূর্জপত্রটি হাতে নিল। অন্ধকার ঘনিয়েছে এতক্ষণে। তাই সে দীপাধারের কাছে উঠে গেল। প্রদীপের আলোকে পাঠ করল সেই একছত্রের পত্রটি। সেই সম্বোধন ‘মঞ্জুভাষিনি!’ সেই আশীর্বাদ :

‘মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে সুন্দর্যাং বিপ্রয়োগঃ।’

পাঠান্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরপদে নিষ্কান্ত হয়ে গেল কক্ষ থেকে। মালতী পিছন থেকে ডেকে ওঠে, কোথায় যাচ্ছিস?

রূপেন্দ্র বাধা দেন, ওকে যেতে দিন, বৌঠান। ও কেঁদে মনটা হালকা করতে যাচ্ছে!

—কেন?

—মন্দাকিনীস্তায় ছন্দপতনে।



মাসছয়েক পরের কথা। সমস্ত রাত্রি শ্রাবণের বর্ষণে ভেসে গেছে গ্রাম। ফুঁসছে দামোদর। সকাল বেলাতেই ভিজতে ভিজতে এসে উপস্থিত হল নকড়ি ঘোষাল।

—কী ব্যাপার নকড়ি? তুমি এই প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় করে?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে তাই মশাই। কাল শেষ রাত্রে বাবামশাই হঠাৎ পালক থেকে পড়ে গেছেন!

—পড়ে গেছেন? জ্ঞান আছে?

—ওঁর জ্ঞান হবার পরেই রওনা হয়েছি। কিন্তু তাঁর দক্ষিণাঙ্গ অবশ্য হয়ে গেছে। বৈদ্য বললেন : সম্যাস!

—চল, এখনি যাচ্ছি আমি।

ভাণ্ডারঠাকুরকে একটু মিষ্টিমুখ করানো গেল না। দূর থেকে তাঁর চরণপ্রান্তে প্রণাম করল শুধু।

ওঁরা দুজন তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে তিজলহাটির দিকে রওনা দিলেন। সেখানে পৌঁছালেন একপ্রহর বেলায়। দূর থেকে দেখতে পেলেন ঘোষালবাড়ির সামনে অনেক মানুষজন এবং অন্দরমহল থেকে ভেসে আসছে পুরললনাদের সম্মিলিত আর্থবিলাপ।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

রূপেন্দ্র থমকে গেলেন, বললেন, উনি বোধহয় আমাকে চিকিৎসার সুযোগটা দিলেন না।

দুজনে অবতরণ করলেন অশ্ব থেকে। দুই জন গৃহভৃত্য এগিয়ে এসে লাগামজোড়া ধরল। নকড়ি দ্রুতপদে চলে গেল অন্দরমহলে। উনি প্রবেশ করলেন না। সদর দরজার সামনেই নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। একজন অপরিচিত গ্রামবাসী বললে, আপনার আর কিছু করার নেই, বাবাঠাকুর। বড়কর্তা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

রূপেন্দ্র প্রশ্ন করেন, সজ্ঞানে ছিলেন?

—তা তো জানি না, বাবাঠাকুর। আমরা তো বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বাড়ির সামনেই একটা বড় গোলোকচাঁপার গাছ। নিচের ইট দিয়ে বাঁধানো। উনি স্থির করলেন আপাতত ওখানেই গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। শোকের আঘাতটা স্তিমিত হওয়া পর্যন্ত। সেদিকে একপদ অগ্রসর হতেই সদর দরজা দিয়ে বার হয়ে এলেন এক বিধবা বৃদ্ধা। মাথায় ঘোমটা নাই, চুলগুলি কদমছাঁট। গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা। খনখনে গলায় তিনি চীৎকার করে ওঠেন, ও কি! পালাচ্ছেন কোথায়? আসেন! ভিতরে এসে দেখেই যান আপনার কীর্তি।

অজান্তেই ওঁর মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল প্রশ্নটা : আমার কীর্তি?

—আবার কার? আপনারই তো! কী যে ফুসমন্তর ঝাড়লেন পাঁচুর কানে! নিক্কথায় সে রাজি হয়ে গেল। সোনার চাঁদটাকে ওই বিষকন্যার সাথেই বে দিল। মাস্তুর ছয় মাসের ভেতরেই হতচ্ছাড়ি খেয়ে ফেলল জলজ্যান্ত শ্বশুরটারে। এমন অপয়া বউ জন্মে দেখিনি বাবা!

অপরাধীর মতো নতনয়নে নিশ্চূপ দাঁড়িয়ে থাকেন। জবাব দেন না।

—কী হল? সঙের মতো দাঁইড়ে রইলেন কেন? এসে নিজের চোখে দেখে যান, কতবড় সবেদানাশ সে হারামজাদি করেছে বছর না ঘুরতেই।

এতক্ষণে তিনকড়ি ঘোষাল বার হয়ে আসেন। বৃদ্ধার হাতটা ধরে বলেন, আঃ! এসব কী হচ্ছে বড়দি! আসুন আপনি, ভিতরে আসুন।

—যাবনি! আগে এর একটা বিহিত হোক! কেন ওই অলপ্নেয়ে কোষ্ঠিবিচার করতে দিলনি? কেন যোটক বিচের হলনি? পাঁচুটার হাতে পাঁচ কপদক ধইরে দে' গছিয়ে দিল ওই বিষকন্যারে।

তিনকড়ি ওঁর হাত ধরে টানাটানি করতে থাকেন। বৃদ্ধা দাওয়ার একটি থাম আঁকড়ে উঠেঃস্বরে চীৎকার চালিয়ে যান। রগড় দেখতে গ্রামবাসী ঘনিয়ে আসে। তাদের ভিড় ঠেলে হঠাৎ কে যেন অগ্রসর হয়ে এলেন। জনতা সসম্মুখে তাঁকে পথ দিল। জমিদার মিত্রমশাই। রূপেন্দ্রনাথের হাতটা চেপে ধরে বলেন, আপনি চলে আসুন। বড়দি এখন উন্মাদ হয়ে গেছেন। কাকে কী বলছেন জানেন না। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে।

নিজের ভদ্রাসনে রূপেন্দ্রনাথকে নিয়ে এসে বসালেন। রূপেন্দ্র জানতে চান, উনি কি পাঁচকড়ি ঘোষা মশাইয়ের দিদি,

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বালবিধবা। প্রচণ্ড মুখরা। উনি যখন যে বাড়িতে থাকেন তখন তার ত্রিসীমানায় কাক-চিল বসতে পারে না। আপনার এখানে এখন কিছুই করণীয় নেই। আমার বাড়িতেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। আপনার ঘোড়াটাকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাকে আবার ও বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। শবযাত্রা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সামাজিক কর্তব্য! বুঝতেই তো পারছেন!

রূপেন্দ্রনাথ জানতে চান, সৌম্যসুন্দর কি এখানে আছে?

—আজ্ঞে না। সে কৃষ্ণনগরে। এখনি তাকে শ্বর দিতে লোক পাঠাব। ঘোষালভায়ার শবযাত্রা রওনা হয়ে গেলেই। মহাগুরুনিপাত বলে কথা!

রূপেন্দ্র নতনেন্দ্রে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন: আমি কি আমার কন্যাটিকে পালকিতে চাপিয়ে নিয়ে আসব? কালুদণ্ডের মধ্যে? মহাগুরুনিপাত তো তারও হয়েছে।

মিত্রমশাই বলেন, আমার পরামর্শ যদি কান দেন, তবে ওসব কিছু করতে যাবেন না। অন্তত যতক্ষণ না সৌম্য এসে উপস্থিত হয়। বড়দি একা নয়, তার দলে আরও অনেকে আছেন। মুখরা মেয়েদের ঘোঁট তো জানেনই! বধু-নির্যাতনে তাঁরা সিদ্ধহস্তা। তাঁদের অভিমত—কিছু মনে করবেন না আমার স্পষ্টোক্তি—আমি আপনার শুভকামী বলেই এতকথা জানাচ্ছি। পরিবারের অনেকেই মনে করেন পাঁচকড়ি যথাযোগ্য কৌলিন্য মর্যাদা গ্রহণ না করে ওঁদের পূর্বপুরুষের অপমান করেছেন। এটাই ওঁদের ক্ষোভের মূল হেতু। পাঁচ মুঠি রজতখণ্ড বরদান দিলে তাঁরা ভাগ করে নিতেন। অথচ আমি জানি—ঘোষালভায়া আমাকে নিজেই বলেছিল—আপনি বরপণ দিতে অস্বীকার করেন, আর ও নিজ ইচ্ছামতো নামমাত্র কৌলিন্য মর্যাদা গ্রহণ করেছিল।

—আমি এই সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে!

—শুনেছি সে-কথা। কিন্তু আর একটা কথা বলুন তো ভিষগাচার্য। ঘোষালভায়া কি যোটক-বিচার আদৌ করায়নি? কন্যার জন্মপত্রিকাও দেখতে চায়নি?

—আজ্ঞে না।

—এটা কিন্তু আপনারা দুজনেই অন্যায় করেছেন। আমি জানি, সৌম্য ‘নরগণ’। আপনার কন্যা যদি ‘রাক্ষসগণ’ হয় তাহলে এমন দুর্ঘটনা তো স্বাভাবিক। বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই নাহলে কেমন করে....

রূপেন্দ্র কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

—তাহলে আপনি আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন? আমি আবার ঘোষালভায়ার ওখানে যাই? আমার পুত্রটি ওখানেই আছে—শবযাত্রা যাবে। কিন্তু আমার এই ভৃত্যটিকে রেখে যাচ্ছি। যা প্রয়োজন হবে জানাবেন!

রূপেন্দ্র বলেন, আপনি পরামর্শ দিলেন মামণিকে যেন এখন এ বাড়ি না পাঠাই। অন্তত সৌম্যসুন্দর না এসে পৌছানো পর্যন্ত। মেনে নিলাম। কিন্তু তা ছাড়াও তো আমার কিছু কৃত্য আছে।

রূপমঞ্জরীর বৈথব্য

—জানি। ও বাড়িতে কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন পাঠানো। আতপ চাউল, কাঁচকলা ইত্যাদি প্রভৃতি। ঘাটকামানোর আগে একপ্রস্থ খুতি-শাড়িও পাঠাতে হবে। এ বিষয়ে আপনি কি আমার পরামর্শ শুনবেন?

—নিশ্চয়। বলুন।

—আমি সময়মতো সব কিছু পাঠিয়ে দেব ঘোষালভায়ার বাড়িতে। বলব যে, আপনি সেগুলি আমার মারফতে পাঠিয়েছেন। না, না, আপনি সঙ্কোচ করবেন না। আপনি আমাকে নাতির মুখ দেখিয়েছেন। ‘বেদ্যবিদায়’ গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, সেটা এ গ্রামের সংরক্ষিত দীঘির জন্য আপনার অনুদান। কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি এখনো পালন করতে পারিনি। আমি জেঁড়হস্তে প্রার্থনা করছি ভেষগাচার্য, এটুকু আমাকে করতে দিন! সামাজিক কৃত্য করেননি বলে কোন অনুযোগ আমি উঠতে দেব না। কথা দিচ্ছি।

এইসময় একটি দাসীর হাতে ডাবের জল আর কিছু প্রসাদী ফল-মিষ্টান্ন নিয়ে উপস্থিত হল ওঁর বধুমাতা। অরিন্দ্র ঘোষাটা টেনে। রূপেন্দ্রের কাছে তার কোন সঙ্কোচ নেই। ভেষগাচার্য স্বহস্তে ঝকে পুত্রবতী করেছেন। তিনি তো দেবতা। তার অবগুষ্ঠনটা শ্বশুরমশায়ের উপস্থিতির জন্য। দাসীর হাত থেকে পাত্রগুলি গ্রহণ করে শ্বেতপাথরের মেজ-এ নামিয়ে রাখে। কবিরাজ-মশায়ের কানে-কানে বলে, মা বললেন, আপনি মধ্যাহ্নে এখানেই দুটি ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যাবেন।

রূপেন্দ্র বলেন, সে আর একদিন হবে রে মা। দাও গেলাসটা দাও আমাকে।

ডাবের জলটুকু নিঃশেষ করে বলেন, বাকি সব নিয়ে যা রে মা। এখন কি ওসব—। হাঁ-হাঁ করে বাধা দেন গৃহস্বামী, ও-কথা বলতে নেই! এ যে ঋাধাগোবিন্দজির প্রসাদ! রূপেন্দ্র অতঃপর একটি বাতাসা তুলে মুখে দিলেন।



অশৌচাবস্থায় বাড়ির কনিষ্ঠা পুত্রবধূ কেন হাজিরা দিতে এল না এ নিয়ে ঘরে ঘরে যৌট। “এ কী অসৈরণ কতা গো! কতায় বলে ‘সিঁথের সিঁদূর থাকলে জানি, শ্বশুরঘরের বহরানী/ঘুচলে হাতের শাঁখা-খাড়ু, বাপের বাড়ি মারগে বাডু।’ শ্বশুরের গঙ্গালাভ হলে তোরও তো মহাগুরুনিপাত হয়। এটা জানিস না? এমন বাপ্-চেংটি মেয়ে দেখিনি বাপু। একবার এসে উঁড়ালো না পয্যন্ত!

মামণি যেতে চেয়েছিল। স্বামীর মহাগুরুনিপাত হলে তারও হয়। তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। চকু রান্না করে দিতে হয়। কস্বলের বিছানায় বালিশ-ইট দিয়ে তার শয়নের ব্যবস্থা হয়। স্বামীকে অশৌচকালে পদস্পর্শ করে প্রণাম করার বিধান নেই।

তবু যেতে হয়। রূপেন্দ্র ইতস্তত করছিলেন—বিশেষ মিত্রমশাই নিবেদন করেছেন। সৌম্যের দজ্জাল বড়পিসির রণচণ্ডী মূর্তি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। মালতী কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বলে, সে অত্যাচার যে কী বীভৎস তা আপনার আন্দাজের বাইরে, ঠাকুরপো। আমি নিজে ভুক্তভুগী বলে জানি।

সমাধান হয়ে গেল সৌম্যসুন্দরের পত্রে। অস্বাভাবিক পাইকের হাতে সে স্বশুরমশাইকে অনুরোধ করেছে এখন যেন ঘোষালবাড়ির ছোট-বৌমাকে না পাঠানো হয়। কেন কী বৃত্তান্ত জানায়নি।

শ্রদ্ধের দুদিন আগে নিমন্ত্রণ করতে এল প্রফুল্লকান্তি। ভূস্বামীতনয়। সঙ্গে সেকালীন সামাজিক রীতিতে নকড়ির এক জ্ঞাতিভ্রাতা। প্রফুল্লকান্তি রূপেন্দ্রনাথকে জনান্তিকে জানালো যে, তার বাবামশাই মৌখিক পরামর্শ দিয়েছেন : উনি যেন শ্রাদ্ধবাড়িতে একাই যান। যদিও সবান্ধব নিমন্ত্রণ হয়েছে।



তাই গেলেন। বৃষাৎসর্গের আয়োজন। এলাহী কাণ্ড। বহু লোক জমায়েত হয়েছে। প্রাঙ্গণে বিরাট সামিয়ানা। তিনকড়ি, নকড়ি এবং সৌম্যসুন্দরের সঙ্গে দেখা হল। শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হতে এবং আমন্ত্রিতদের মধ্যাহ্ন আহ্বারে তৃপ্ত করতে অপরাহ্ন হয়ে যাবেই।

মিত্রমশাই ওঁকে জনান্তিকে ডেকে এনে বলেন, এটা কী শুনছি বাঁড়ুজ্যোমশাই! আপনি নাকি জানিয়েছেন যে, শ্রাদ্ধবাড়িতে জলস্পর্শ করবেন না।

—না, না, সে কী কথা! আমি সরবৎ পান করব, ডাব অথবা বেলের পানাও পান করব। তবে আজ একাদশী তো? তাই আর কিছু খাব না।

—কেন? আপনি তো বামুনের বিধবা নন!

—না! আমি বিপত্নীক। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে এই নিয়মই আমি মেনে চলি। মনুসংহিতায় তেমন কোনও নির্দেশ না থাকলেও।

—এতো বড় আজব কথা। অন্তত ‘নিয়মভঙ্গের’ অনুষ্ঠানে আসছেন নিশ্চয়?

—আমি নিরামিষাশী! আমাকে মার্জনা করবেন!

গম্ভীর হয়ে গেলেন মিত্রমশাই। বলেন, আমি হয়তো করব। এঁরা কিন্তু করবেন বলে মনে হয় না। যাহোক, একটা জরুরি কথা বলি। আজ সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে কিছু গোপন বৈষয়িক কথা আলোচনার আছে। মানে, গোপনীয়তা আমার নয়। ঘোষাল পরিবারের স্বার্থে। আপনার জামাতাবাবাজীবনের পক্ষে পিতার সম্পত্তি লাভে কিছু

রূপমঞ্জরীর বৈধবা

বিলম্ব উপস্থিত হয়েছে। বৈষয়িক ব্যাপার। নিমন্ত্রিতেরা বিদায় না হওয়া পর্যন্ত সেসব আলোচনা হতে পারে না। তাই তিনকড়ি-নকড়ি আর সৌম্যের স্বার্থে আপনাকে অনুরোধ করছি : আজ রাত্রি আমার গরিবখানায় আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি সোএগাই গাঁয়ে আপনার বাড়িতে সংবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাতে তাঁরা চিন্তা না করেন। সম্ভাব্য পর আলোচনাটা হতে পারে। আপনি আমার ভদ্রাসনে শয়ন করবেন। কাল প্রাতে ঘোষালবাড়িতে আপনার একাদশীর পারণ সেরে ফিরে যাবেন। তাহলে ওদেরও ক্ষুধা হবার কোনও অবকাশ থাকবে না। সধবা অথবা বিপত্নীকীর একাদশীতে ওরা তো অভ্যস্ত নয়।

—ঘোষাল-মশায়ের সম্পত্তির দখলের ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনার কী আছে? তিনি যদি কোন শেষ অস্থিরতামায় রচনা না করে গিয়ে থাকেন তাহলে তো জীমূতবাহন-নির্দিষ্ট দায়ভাগশতানুসারে—

—আজ্ঞে না। ঘোষাল একটি শেষ 'ইচ্ছাপত্র' রচনা করেই 'গঙ্গালাভ' করেছেন। আর সেই অস্থিরতামায় আপনার নামোল্লেখ করে গেছেন। না হলে আপনাকে অহেতুক সে মন্ত্রণাসভায় আহ্বান করব কেন বলুন?

রূপেন্দ্র বলেন, শুনুন মিত্রমশাই! বেহাইমশায় কী ইচ্ছাপত্র রেখে গেছেন তা আমি জানি না। তিনি যদি তাঁর সম্পত্তির কোন অংশে আমাকে ওয়ারিশ করে গিয়ে থাকেন তা হলে তা গ্রহণে আমি অস্বীকৃত। ইচ্ছাপত্র মোতাবেক সম্পত্তির দখলনামা নিতে অন্যান্য ওয়ারিশদের স্বার্থে প্রয়োজন হলে আমি লিখিতভাবে একটি শংসাপত্রে স্বাক্ষর করে যাব। কিন্তু আমি বৈবাহিকের সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণে অস্বীকৃত। এমনকি যদি কোন জনহিতকর কার্যের জন্য সে অর্থ আমাকে দান করে থাকেন তদসত্ত্বেও নয়।

—ওই রকম একটি শংসাপত্রে আপনাকে স্বাক্ষর দেবার অনুরোধই করছি বাঁড়ুজ্যে মশাই। না হলে তিনকড়ি-নকড়ি আর সৌম্য নাম খরিজ করতে পারবে না। আপনি তা হলে এ বিষয়ে ওদের সাহায্য করতে স্বীকৃত? শংসাপত্রে স্বাক্ষর দিতে রাজি?

—নিশ্চয়! আমি বৈবাহিকের সম্পত্তির কপর্দকমাত্র গ্রহণে অস্বীকৃত।

—সে কথা আপনি ইতিপূর্বেই বলেছেন। মৌখিক। লিখিত শংসাপত্রে স্বাক্ষর দেবেন তো?

—সে কথাও আমি বলেছি। বেশ, আপনাদের সাহায্য মন্ত্রণাসভায় আমি উপস্থিত থাকব। আপনার ভদ্রাসনে রাত্রিবাস করব।

—আপনি আমাকে নিশ্চিত করলেন বাঁড়ুজ্যে মশাই। অথচ এই সহজ সরল কথাটা ওরা সাহস করে আপনার কাছে উত্থাপন করতেই সাহস পাচ্ছিল না। আমাকে দূত করে পাঠিয়েছে!

বৃষোৎসর্গের আদ্যাশ্রদ্ধ—সময় তো লাগবেই। নিমন্ত্রিতদের ভূরিভোজ সমাপ্ত হতে হতে অপরাহ্ন পার হয়ে গেল।

সন্ধ্যার সময় ওঁকে ডেকে নিয়ে গেল নকড়ি। দ্বিতলের একটি নির্জন কক্ষে। কক্ষটি মাঝারি। মাঝখানে একটি চৌকি। ফরাস পাতা। দু-চারটি তাকিয়া। তাম্বকুট-সেবনের আয়োজনও আছে। উপরে টানাপাখা। ব্যজনকারী পার্শ্ববর্তী কক্ষে। তাকে দেখা যায় না। শ্রাবণেই ভাদ্রের গরম। সৌভাগ্যক্রমে আজ সকাল থেকে বৃষ্টি নামেনি।

রূপেন্দ্রনাথ দেখলেন কক্ষে মাত্র চারজন উপস্থিত : তিনকড়ি, নকড়ি, জমিদার মিত্রমহাশয় আর ঘোষমশাই। তিনি উকিল। আইন-পরামর্শদাতা। প্রয়োজনে যজমানের পক্ষে কাজির আদালতে ওকালতিও করেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। রূপেন্দ্রের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু সমকালীন সামাজিক প্রথায় তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন।

রূপেন্দ্র তাঁকেই প্রশ্ন করেন, ‘অছিয়ৎনামটা’ কি আপনিই রচনা করেছেন?

—হ্যাঁ এবং না। অর্থাৎ রচনা আমারই। তবে সেটি স্বহস্তে আদ্যোপান্ত অনুলিখন করে স্বাক্ষর করেছিলেন পাঁচকড়ি ঘোষালমশাই। মূল ইচ্ছাপত্রটি তাঁর স্বহস্তলিখিত ও স্বাক্ষরিত।

—বুঝলাম। তাতে কি আপনারও স্বাক্ষর আছে? সাক্ষী হিসাবে?

—এবারেও উত্তর হ্যাঁ এবং না। অর্থাৎ স্বাক্ষর আছে, তবে সাক্ষী হিসাবে নয়। দলিল রচনাকারী হিসাবে। সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর দিয়েছে আমার দুই মুহুরি।

—স্বর্গত ঘোষালমশায়ের ইচ্ছাপত্রে কি এই দুইজন ওয়ারিশ আছেন? সৌম্যসুন্দর কি অন্যতম ওয়ারিশ নয়?

এবার প্রত্যুত্তর করলেন মিত্রমশাই, না, না। সৌম্যকেও যথাযোগ্য অংশ ঘোষালভায়া দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে নাবালকমাত্র। তার তরফে তার দুজন অভিভাবক তো উপস্থিত—তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও খুল্লতাত।

রূপেন্দ্র বলেন, নবাবী আইনে কী নিয়ম আমার জানা নেই, কিন্তু এ আলোচনাসভায় তার উপস্থিতিতে কারও কি আপত্তি আছে?

—সে নাবালক হোক অথবা নাবালক?

মিত্রমশাই বলেন, না, না, আপত্তি থাকবে কেন? কী আশ্চর্য!

ডাক পড়ল সৌম্যসুন্দরের। মুণ্ডিতমস্তক কিশোরটি এসে উপস্থিত হল। তিনজনকে পদস্পর্শ করে প্রণাম করল। মিত্র ও ঘোষ মশাইদের দু-হাত তুলে নতশির নমস্কার।

ভকিল-সাহেব এবার তাঁর পুলিন্দার বাঁধন খুলে একটি ইচ্ছাপত্র বাহির করলেন। রূপেন্দ্র বললেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ওই ফার্সি শব্দে পরিপূর্ণ মূল দলিলটি পাঠ করা নিষ্প্রয়োজন। পরে দরকার হলে আমি দেখে নেব। মূল বিষয়বস্তুটা কী এবং সমস্যাটা কোথায় তা কেউ একজন আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

মিত্রমশাই বলেন, আমি ওটি খুঁটিয়ে পড়েছি। আদালত ও নবাবী সেরেস্তায় ফার্সি শব্দে-ঠাসা দলিল পাঠে আমি অভ্যস্ত। ইচ্ছাপত্রের মূল বক্তব্যটি এই রকম :

ঘোষাল ইচ্ছাপ্রকাশ করে গেছেন যে, তাঁর স্বোপার্জিত স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি থেকে প্রথমেই পরিশোধ করতে হবে একটি বন্ধকী ঋণ। মূল ঋণের পরিমাণ দুই শত

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

রজতমুদ্রা। প্রাপক তিজলহাটির ভূম্যধিকারী। অর্থাৎ আমি। সুদ-সহ এই ঋণ পরিশোধের পর বাকি মূল্যমানের অর্ধাংশ গচ্ছিত থাকবে একটি অছিপর্যদের দায়িত্বে। বাকি অর্ধাংশের দশ-শতাংশের প্রাপক : ইচ্ছাপত্র লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান তিনকড়ি ঘোষাল এবং বিশ-বিশ শতাংশ তাঁর দুই পুত্র নকড়ি ও সৌম্যসুন্দর।

রূপেন্দ্র বলেন, তাহলে আমাকে ডাকা হল কেন? আমার কী ভূমিকা?

মিত্রমশাই বুঝিয়ে বলেন, আপনি ওই অছি-পর্যদের সদস্যত্রীর অন্যতম। বাকি দুজনের একজন আমি, অপরজন ঘোষালের গুরুদেব।

—তিনি এই পরামর্শ সভাতে এলেন না কেন?

—তিনি বৃদ্ধ। শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। ভকিল সাহেবকেও। প্রয়োজনে কোন শংসাপত্রে স্বাক্ষরে তিনি সম্মত। আমিও তাতে সম্মত।

—বুঝলাম এবার ওই অছি-পর্যদ কেন গঠন করা হয়েছে, অছিপর্যদের কী করণীয় একটু বুঝিয়ে বলুন।

‘একটু’ নয়, বেশ বিস্তারিতভাবেই সেটা বুঝিয়ে দিলেন মিত্রমশাই।

ঘোষাল জানাচ্ছেন : তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক পৃথক করে রাখা হচ্ছে তিজলহাটি গ্রামে একটি সংরক্ষিত পুষ্করিণী খননের উদ্দেশ্যে। সেটি খননের জন্য তিনি সোএগ্রাই গ্রামের ভিষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁরই তত্ত্বাবধানে দীঘিটি খনন করা হবে। তার জন্য কপিকল, কদলীপুষ্প আকারের ‘বারি-আহরণ-পাত্র’ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তিনজন পানিবারার জন্য পাঁচ বৎসরের মাসোহারার অর্থ পৃথক করে রাখতে হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। পাঁচ বৎসরে যদি গ্রামবাসী প্রণিধান করে যে, ওই সংরক্ষিত পুষ্করিণীতে এ অঞ্চলে আত্মিক রোগ প্রস্রুতি হয়েছে—ইচ্ছাপত্রলেখকের আশা সেক্ষেত্রে গ্রামপঞ্চায়েত ব্যবস্থাস্থি চালু রাখার উপযুক্ত অনুদান বরাদ্দ করবেন। পুষ্করিণী সংক্রান্ত তাঁর তিনটি শর্ত। প্রথমত : সেটির আকৃতি সোএগ্রাই গ্রামস্থ সংরক্ষিত পুষ্করিণীর মতো হবে। দ্বিতীয়ত : সেটি খননের এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী ওই ভিষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয়ত : পুষ্করিণীটির নামকরণ করা হবে : ‘একবঙ্গা দীঘি’।

নির্মীলিত নেত্রে এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিলেন রূপেন্দ্রনাথ। মিত্রমশাই নীরব হতে বলেন, তা এই ইচ্ছাপত্র কার্যকরী করায় কী অসুবিধা হচ্ছে? সমস্যাটা কোথায়?

মিত্রমশাই এবার ভকিল-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন : আপনি বুঝিয়ে বলুন বরং।

ভকিল-সাহেব একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, পাঁচকড়িদা বলেছেন, পুকুরটা হবে সোএগ্রাই গ্রামের সংরক্ষিত পুষ্করিণীর আকৃতি অনুসারে। আমি সে পুষ্করিণী দেখেছি। সেটি চতুষ্কোণ, কিন্তু বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র নয়। যাবনিক-জ্যামিতিতে শুনেছি তাকে বলে ‘রস্মস’। তার দুই বিপরীত বাহু পরস্পরের সমান্তরাল। অপর দুটি বাহু বিপরীত

বাহুর সমান্তরালে নয়। পুষ্করিণীর আকৃতি কী হবে তা দলিলে বলা আছে। কিন্তু কত বড় হবে বলা নেই। এটি এক নম্বর সমস্যা।

রূপেন্দ্র বলেন, এ সমস্যার তো সহজ সমাধান। আমরা ওই ‘রম্বস’ আকৃতির একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খননের কাজ শুরু করব। তার গভীরতা এমন হওয়া চাই যাতে সংবৎসর তাতে জল থাকে। তারপর অছি-তহবিলে অর্থের পরিমাণ বুঝে আমরা স্থির করব কোথায় খামতে হবে। এখানে ‘আমরা’ বলতে অছি-পর্যদের সদস্যত্রয়ী।

তিনকড়ি জানতে চান, দাদা কি আপনাকে এই ইচ্ছাপত্র সম্বন্ধে কিছু বলে গেছেন? কিংবা কিছু চিঠিপত্র লিখেছেন?

—না! এ কথা এই প্রথম শুনিছি।

তিনকড়ি বলতে থাকেন, দেখুন বেয়াইমশাই! দাদা এ প্রস্তাব তাঁর জীবদ্দশাতেই উত্থাপন করেছিলেন। পঞ্চায়েত স্বীকৃত হননি। তাঁদের অভিমত এটা নিতান্ত ভ্রম্মে ঘি ঢালা। তাই তাঁরা দাদার প্রস্তাবে সম্মত হননি। কোন অনুদান দিতে স্বীকৃত হননি। আপনি চারকোশ দূরে বাস করেন। চিকিৎসক হিসাবে আপনার সময়ের নিতান্ত অভাব। আপনি যদি একটি শংসাপত্রে জানিয়ে দেন যে, দাদা আপনার পরামর্শ ব্যতিরেকেই আপনার নাম ওই অছি-পর্যদে লিখেছেন সেজন্য আপনি সে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত, তা হলে অর্থেক সম্পত্তি জলে ফেলতে হয় না। সৌম্যসুন্দরও তাহলে পিতার সম্পত্তি থেকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

অকুণ্ঠিত হল রূপেন্দ্রনাথের, বলেন, এইমাত্র শুনলাম ওঁর প্রস্তাবিত অছি-পর্যদের অপর দুই সদস্য এমন শংসাপত্র লিখে দিতে স্বীকৃত। কিন্তু সেটা প্রয়োজন হচ্ছে কেন? আমার নিকট তো কোন লিখিত দলিল বা কাগজপত্র নাই। আমি দাবী করলেও কাজী-সাহেবের আদালতে প্রমাণ করতে পারব না যে, ঘোষালমশাই অমন একটি ‘ইচ্ছাপত্র’ রেখে গেছেন। আপনারা তো জীমূতবাহন-নির্দেশিত ‘দায়ভাগ’ মতে সম্পত্তির দখল নিতে পারেন।

—সেখানেই তো হয়েছে মুশকিল। দাদা একটি কেলেকারি করে গেছেন। তিনি এই ইচ্ছাপত্রের দুটি অনুলিপি করে দুজনকে লোকমারফত জানিয়েছিলেন। প্রথম জন কোতোয়ালসাহেব, দ্বিতীয়জন নায়েব-কানুনগো। তাঁরা ব্যপারটা জানেন। তাঁরাই প্যাঁচ কষছেন! বলছেন, অছি-পর্যদের তিন সদস্য যদি পৃথক পৃথকভাবে এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করেন, তাহলেই নামখারিজ করে আমাদের তিনজনকে দাদার সমস্ত সম্পত্তির পত্তনি দেওয়া হবে। অবশ্য দুইজনকেই যথোচিত সম্মান-মর্যাদা দিতে হবে—তাঁদের হস্তগত ইচ্ছাপত্রের অনুলিপি দুটি বিনষ্ট করে ফেলার মূল্যস্বরূপ।

—বুঝলাম না। আমাদের শংসাপত্র হাতে না পেলে তাঁরা দুজন উৎকোচ গ্রহণ করতে পারছেন না কেন?

ভকিলসাহেব প্রতিবাদ করেন, ‘উৎকোচ’ নয়, ‘সম্মান-মর্যাদা’! ওঁরা তো জানেন না যে, আপনারদের তিনজনের কারও কাছে এই ইচ্ছাপত্রের অনুলিপি আছে কি না। যদি সেটি নিয়ে উপরে দরবার করেন তখন ওঁরা বেইজ্জত হবেন।

রূপমঞ্জরীর বৈষ্য

রূপেন্দ্রনাথ এবার হেসে বলেন, এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। শুনুন, ভকিলসাহেব! যদিও আমার সঙ্গে পরামর্শ করে বা আমার অনুমতিসাপেক্ষে অছি-পরিষদটি গঠিত হয়নি, তবু এ দায়িত্ব গ্রহণে আমি সানন্দে স্বীকৃত। আমি চারকোশ দূরে থাকি বটে কিন্তু সেখান থেকে এই জনহিতকর কার্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি মনে করি, পরলোকগত আত্মার ইচ্ছাপত্রটির যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

মিত্র বলেন, আপনি কিন্তু আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, শংসাপত্রে আপনি স্বাক্ষর দিতে স্বীকৃত!

—না, মিত্রমশাই। আমি বলেছিলাম ওঁর সম্পত্তির কপর্দকমাত্র আমি গ্রহণে স্বীকৃত নই। শুধু সেই মর্মেই আমি শংসাপত্রে স্বাক্ষর করতে স্বীকৃত হয়েছিলাম।

এরপর অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলল, কিছু কটুকথার বিনিময়ও হল। কিন্তু রূপেন্দ্রনাথ ওই সংরক্ষিত পুঙ্খরিণী খননের প্রস্তাবটির শিশুমৃত্যুতে স্বীকৃত হলেন না।

একপ্রহর রাতে তিনি বললেন, আপনারা যা ভালো বোঝেন করবেন। আমি কোতোয়ালিতে বা নায়েব-কানুনগোর দরবারে যাব না। কারণ সে অধিকার আমার নাই। ক্ষমতাও নাই। কারণ আমার নিকট কোন প্রমাণপত্র দলিল-দস্তাবেজ কিছুই নাই। তদুদ্দেশ্যে আমার অভিমত : স্বর্গত ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপত্রটিকে তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধদিবসেই এরাপে অমর্যাদা করা অনুচিত।

রূপেন্দ্রনাথ জমিদারবাড়িতে রাত্রিবেলায় স্বীকৃত হতে পারলেন না। জ্যোৎস্নালোকিত বনপথে মধ্যরাত্রে প্রত্যাবর্তন করলেন নিজ ভদ্রাসনে।



মাসখানেক পরের কথা।

সমস্ত রাত্রিব্যাপী শেষ ভাদ্রের একটানা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। দামোদর কূল ছাপিয়েছে। সারা গ্রাম জল-ছপছপ। কোথাও এক হাত, কোথাও বা এক বিঘত। নদীমাতৃক ভূখণ্ডের বৎসরান্তিক আশীর্বাদ পড়ছে নাড়ামুড়ো ধানের খেতে।

রূপেন্দ্রনাথ সে রাতে অনুপস্থিত। দূরগ্রামে গিয়েছেন আর্তরোগীর চিকিৎসায়। ফিরবেন পরদিন সন্ধ্যায়। যথানিয়মে দাওয়ায় মাদুর বিছিয়েছে শিবনাথ। এ ঘরে ওরা তিনজন। মাঝে শ্যামামালতী আর দু পাশে ওরা দুজন। রূপমঞ্জরী ও মালতী।

ভোররাতে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখল রূপমঞ্জরী।

সে যেন উপনীত হয়েছে এক সর্পিলা পার্বত্য পাকদণ্ডি পথে। ও যেন ধীর

পদক্ষেপে চড়াই ভেঙে উপরে উঠছে। তুষারাবৃত এক পর্বতচূড়ায়। ‘উত্তরস্যাংদিশি’ পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ এক পর্বতমালা আছে জানানো তো? তারই অযুত-নিযুত গিরিশৃঙ্গের এক অজানা শিখরে। সানুদেশ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে আসছে ‘ধূমঃ-জ্যোতি-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ’ জলভরা মেঘের দল। মাঝে মাঝে ঘন-কুয়াশায় আবৃত হয়ে যাচ্ছে দিগ্দিগন্ত। হঠাৎ নজর হল : অগ্রবর্তী এক পথিকের দিকে। চিনতে পারল না, অথচ খুব চেনা-চেনা লাগছে। মস্তকে অবিন্যস্ত ধূলিধূসরিত কেশদাম। পরিধানে গৈরিক কাষায়। উর্ধ্বাঙ্গে কম্বল, হস্তে সন্ন্যাসদণ্ড। ও তাকে পিছন থেকে চিৎকার করে ডাকতে গেল। কী আশ্চর্য! নামটা মনে পড়ছে না। অগ্রবর্তী পথিক ইতিমধ্যে সম্মুখস্থ পাকদণ্ডি পথে অন্তর্হত। আর তখনই চরাচর আবৃত হয়ে গেল ঘন কুয়াশায়। জলীয় বাষ্প অপসারিত হবার পর দেখল সেই পাকদণ্ডি বাঁকে ওপাশে থেকে বিপরীত মুখে অগ্রসর হয়ে আসছেন এক অশ্বারোহী। ওকে দেখামাত্র অশ্বটি রূপমঞ্জরীর দুই স্কন্ধে তার সম্মুখের পদদ্বয় উঠিয়ে দিতে চাইল—সেই সেদিনের সৈন্যগুপ্তের মতো। দূরন্ত ভয়ে ও চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফুটল না। বিজয়োল্লাসে অশ্বটি হ্রেবাক্ষনি করে ওঠে।

তৎক্ষণাৎ ঘুমটা ভেঙে যায়। দুঃস্বপ্নের প্রভাবে অথবা ভাদ্রের প্রচণ্ড গরমে ও ঘর্মাক্ত। পালকে উঠে বসে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছতে থাকে।

তৎক্ষণাৎ পুনরায় হ্রেবাক্ষনি।

প্রচণ্ড চমকে ওঠে রূপমঞ্জরী। এ কী হচ্ছে! এখন তো ও স্বপ্ন দেখছে না! বাবামশাই তো সৈন্যগুপ্তের গিঠে সওয়ার হয়ে ভিন গায়ে গেছেন। তাহলে ওদের সদর দরজায় এ হ্রেবাক্ষনির অর্থ কী? একটাই অর্থ হতে পারে। যে কোন হেতুতেই হোক রূপেন্দ্রনাথ প্রত্যাগমন করেছেন। ও দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যায়। নজর হয়, শিবনাথ দাওয়াতে নিদ্রাগত নয়। সম্ভবত উত্তরের ছাটে বর্ষার জলে বিড়ম্বিত হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিমধ্যে পূব আকাশে ফুটছে আলোর আভাস। গাছের শাখায়-শাখায় সহস্র-বিহঙ্গের কাকলি-কলতান। হঠাৎ সদর-দরজায় করাঘাত হল। মামণি এগিয়ে গেল সেদিকে। জানতে চায় : কে?

ওপ্রান্তবাসী বলে, দ্বার খুলে দাও রূপা। অতিথি!

দূরন্ত আবেগে ওর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। দ্বারের অর্গল অপসারিত করে। ও প্রান্তে সৌম্যসুন্দর। এখন ও মুণ্ডিতমস্তক নয়। কচি দুর্বাস্যসের মতো মাথায় ঘন সবুজরঙা কেশাক্ষুর!

—তুমি! এত সকালে! কোথা থেকে?

সৌম্য বলে, হাত পাত দেখি। একটা জিনিস দেব।

রূপমঞ্জরী তার দুটি হাত অঞ্জলিমুদ্রায় প্রসারিত করে দেয়।

সৌম্য স্পর্শ-বাঁচিয়ে সেই অঞ্জলিতে নামিয়ে দেয় একটি ভাদ্রের ফোটা-কদম। ওদেরই উদ্যানের। যে কদমগাছের কাণ্ডে এখন ফুল্লরা বাঁধা আছে। ‘ফুল্লরা’ ঘোষালবাড়ির অশ্বিনী।

রূপমঞ্জরীর বৈথব্য

রূপমঞ্জরী বলে, হাতে দিলে কেন? খোঁপায় গুঁজে দেবে না?

ম্লান হাসে সৌম্য। বলে, সেটুকু রসজ্ঞান আমার আছে, রূপা। কিন্তু আমার একটি ব্রত চলছে। তাই আমাকে যদি প্রণাম করতে চাও পদস্পর্শ কোরো না!

চমকে উঠে বলে, সেকি! তুমি আমাকে ছোঁবে না?

—মহাশূরনিপাতের প্রথম বৎসরটুকু। চল, ভিতরে যাই। বাবামশাই গাত্রোত্থান করেননি এখনো?

রূপমঞ্জরী বোধহয় কিছু ক্ষুধা। নিয়মভঙ্গের পর এ জাতীয় বিধিনিষেধ আর থাকে না। বলে, তিনি ভিন গাঁয়ে গেছেন। এস, ভিতরে এস। আমি সদরটা বন্ধ করি।



মালতী বলে, ঠাকুরপো আজই সন্ধ্যায় ফিরে আসবেন। তাঁকে যা বলতে এসেছ তখন বোলো।

—না, সোনা-মা। আমি এখনি রওনা হব। দ্বিপ্রহরে সোণাই ঘাট থেকে একটি যাত্রীবাহী নৌকা ছাড়বে। আমি তাতেই নবদ্বীপ ফিরে যাব। মাঝিভাইকে বলা আছে। সে স্থান-সংরক্ষণ করে রেখেছে।

রূপমঞ্জরী প্রশ্ন করে, আর ফুল্লরা?

—মেঘদা আসছে পদরজে। সে বাবার একজন বিশ্বস্ত পাইক। সেই ফুল্লরাকে এ বাড়ি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

নিয়মভঙ্গের পরদিনই সৌম্যসুন্দর নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন করেছিল। কিন্তু মাসখানেক পরে খুড়োমশায়ের জরুরি তলব পেয়ে তাকে আবার গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছে। জানা গেল, কাকা ও দাদা ওর উপর প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছেন। যেহেতু সে রূপেজ্ঞানাথকে প্রভাবিত করার কোনও চেষ্টা করেনি। সম্পত্তি দখলের সুরাহা এখনো হয়নি। নায়ের-কানুনগো-মশাই উপরমহলে সম্পত্তির অর্ধেক নবাবী তহবিলে খাশ করার সুপারিশ করেছেন। বাকি অর্ধেক ওয়ারিশবর্গের মধ্যে বণ্টন করা যেতে পারে। নবাবের অর্থদপ্তর এখন ঢাল-মাটাল। একটু স্থিরতা লাভ করলেই ঘোষালমশায়ের 'ইচ্ছাপত্র' অনুসারে সেই একবগ্লা দীঘির খননকার্য শুরু হতে পারে। সরকারি তত্ত্বাবধানে। যেহেতু অছি-পর্যদের এক-তৃতীয়াংশ সহযোগিতা করছেন না, তবে সে কাজ কবে শুরু হবে, আদৌ হবে কি না, সেটা নির্ভর করবে নবাবের ইচ্ছায়।

ফলে পরিবারের সকলেই সৌম্যসুন্দরের উপর মনোমুগ্ধ বিরক্ত।

মালতী জানতে চায়, মামণিকে তুমি শ্রাদ্ধবাড়িতে যেতে বারণ করেছিল কেন, বাবা?

—আপনি জানেন না, সোনা-মা, আমাদের পরিবারে—শুধু আমাদেরই নয়, তিজলহাটির সব ব্রাহ্মণ পরিবারেই—একটি কদর্য প্রথা প্রচলিত আছে। যে কয়জনের মহাগুরুনিপাত হয়েছে তাদের ধর্মপত্নীদের ওই দশ দিন একবস্ত্র হয়ে থাকতে হয়। শ্রাদ্ধান্তে তারা বস্ত্র পরিবর্তনের অনুমতি পায়। কোনও অধোবাস বা উত্তরীয় বস্ত্রখণ্ড অননুমোদিত। সে এক বীভৎস ব্যাপার। পুরুষমানুষের ভিড়ে ঠাসা সেই জনাকীর্ণ শ্রাদ্ধবাড়িতে নববধুর সে এক চরম বিড়ম্বনা! এমনকি স্নানান্তে অঙ্গমার্জনার অধিকার পর্যন্ত তার নাই। সিন্ধু বস্ত্র সেই একবস্ত্রের অঙ্গই শুধায়! প্রচণ্ড মাঘের শীতেও!

রূপমঞ্জরী অবাক হয়ে বলে, দিদিকে তুমি করতে হয়েছিল? একবস্ত্রে ভিজে কাপড়ে অমন ভিড়ে-ঠাসা বাড়িতে?

—হ্যাঁ, রূপা! সে দশদিন আমি বোঠানের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। সৌম্য এতই উত্তেজিত যে, তার খেয়াল হয় না সোনা-মার সম্মুখেই সে তার স্ত্রীকে জনাস্তিক-সম্বোধন করে বসেছে। রূপমঞ্জরীরও তা খেয়াল হল না।

মালতী প্রশ্ন করে, মাসখানেকের মধ্যেই এভাবে তোমাকে ডেকে পাঠানো হল কেন? কী জরুরি প্রয়োজন হয়েছিল?

স্নান হাসল সৌম্য। বলল, সেও এক ন্যাকারজনক ব্যাপার। বাবামশায়ের ইচ্ছাপত্রের জন্য যেহেতু আমরা তিনজন সম্পত্তির অধিকার এখনো পাইনি সেজন্য ওঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। আমার পিতৃদেবের উপর তো শোষণটা তোলা যাবে না, তাই ওঁদের সবটা রাগ এসে পড়েছে আমার শ্বশুরমশায়ের উপর। ওঁদের বক্তব্য, তিনি ওই শংসাপত্রে স্বীকৃতি দিলেন না বলেই আমাদের এতবড় আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেল—

—তার সঙ্গে তোমাকে ডেকে পাঠানোর কী সম্পর্ক?

—ওঁরা প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। দাদা এবং খুড়ামশাইয়ের নির্দেশ আমি যেন আমার প্রথমা পত্নীকে পরিত্যাগ করি।

—প্রথমা?

—হ্যাঁ মামণি। ওঁরা একটি দ্বিতীয়ার সন্ধান ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। কোষ্ঠি বিচার করে জানা গেছে যে, আমার সঙ্গে তার রাজযোটক। খুড়ামশাই এতদূর ক্ষিপ্ত যে, অবিলম্বে আমার দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করতে চান!

—অবিলম্বে? মানে, কালাশৌচ না কাটতেই?

—আপনি জানেন না? শাস্ত্রে সে বিধান অনুমোদিত? জরুরি প্রয়োজনে এসব ক্ষেত্রে সপিগুরুণ করা যায়!

মালতী অবাক হয়ে যায়। রূপমঞ্জরী প্রস্তরমূর্তি!

সৌম্যসুন্দরই আবার শুরু করে, ~~সেই বিবাহের~~ বাবামশায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলাম।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

ক্ষুধা মালতী বলে ওঠে। ঠাকুরপো কী বলবেন? সে তো তোমার অভিরূচি, বাব কুলীন ঘরের সুপাত্র! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, মাত্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ নে স্বাভাবিক ব্যাপার!

—না, সোনা-মা! সর্বক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক নয়; গুরুদেব তর্কসিদ্ধান্ত-মহাশ কুলীন, কিন্তু একপত্রিক। আমার স্বপ্নমশাইও তাই, উপরন্তু তিনি বিপত্নীক!

রূপমঞ্জরী প্রশ্ন করে, সেই মেয়েটিকে তুমি দেখেছ?

হাসল সৌম্যসুন্দর। বলে, দেখেছি। দেখতে বাধা হয়েছে। কবেই তাকে আমাদের বাড়িতেই এনে রাখা হয়েছিল। যাতে আমি দেখি।

—তুমি রাজি হওনি?—জানতে চায় মালতী।

—এই অবাস্তুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তর কি সত্যিই চাইছেন?

এতক্ষণে হাসি ফুটল আমাদের বালিকাবধূর মুখে। সে সোনা-মার দিকে ফিরে বলল, আমি কি উনানে দুটি ভাত বসিয়ে দেব?

মালতী সচকিত হয়ে ওঠে। বলে, না, না। আমি ওদিকটা দেখছি। তোরা দুজন গল্প কর।

মালতী চলে যেতে সৌম্য বলে, তোমার বাবার কাছে একটা প্রস্তাব আমি রেখেছিলাম, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই। আয়ুর্বেদশিক্ষা শেষ করে আমরা দুজন তিজলহাটিতে একটি আরোগ্যনিকেতন প্রতিষ্ঠা করব। পুরুষ রোগীদের চিকিৎসা করব আমি, আর মহিলামহলের দায়িত্ব তোমার—

—জানি। শুনেছি বাবার কাছে।

—তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই প্রস্তাবটা করেছিলাম বলে তুমি ক্ষুব্ধ হওনি তো?

রূপমঞ্জরী ওর কথাটাই ফিরিয়ে দিল, এই অবাস্তুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তর কি সত্যিই চাইছ?

—না, চাইছি না। আমি জানতাম। কিন্তু অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, সেটা বোধহয় সম্ভবপর হবে না। ওঁদের সপিওকরণের প্রস্তাব আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি। দাদা আর খুড়োমশাই বাবার শ্রদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়মভঙ্গ করেছেন। কিন্তু আমি করিনি! আমি এক বৎসর এই অশৌচ পালন করব। এই দ্যাখ রূপা, আমি নখ পর্যন্ত কাটিনি। ফলে ওঁরা আর পীড়াপীড়ি করতে সাহস পাননি। কিন্তু বাৎসরিক-শ্রাদ্ধের পর একটা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনিবার্য। বাবামশাই যে একাদশীতে উপবাস করেন এটা নিয়ে ওঁরা উপহাস করেন। এই আচারের আস্তর-গভীরতায় ওঁরা প্রবেশ করতে পারেন না। ফলে, আশঙ্কা করছি, বাৎসরিক-শ্রাদ্ধের পরে আমি পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হব। আমার সম্পত্তির অংশ তখন ওঁরা দুজন দখল করে নেবেন। এ নিয়ে কাজির বিচার আমি চাইব না। তাহলে কোথায় পাতব আমাদের সংসার?

—কালোহায়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বীঃ! আমাদের সারাটা জীবনই পড়ে আছে, আর এই গৌড়মণ্ডলে রোগশূন্য কোন গ্রাম আছে বলে তো আমার জানা নেই।

আমাদের যদি নিষ্ঠার অভাব না থাকে তবে বঙ্গদেশের যেকোন বর্ষিষ্ণু গ্রামে গিয়ে আমরা আমাদের সাধনা শুরু করতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যাতেই ফিরে এলেন রূপেন্দ্রনাথ। শুনলেন সবকিছু। বললেন, এখনো এগারো মাস সময় আছে। একটা কোন উপায় হবেই।



দিনকতক পরে একদিন সকালে হাঁক শুনলেন, রূপোভায়া আছ নাকি?

চমকে উঠলেন রূপেন্দ্রনাথ। এ কণ্ঠস্বর তো ভুল হবার নয়। এ নির্ঘাৎ তারাদার আহ্বান। দ্রুত এগিয়ে গেলেন সদর দরজা খুলে দিতে।

শুভপ্রসন্ন গৃহত্যাগ করার পর এ কয় মাস তারাপ্রসন্ন গৃহের বাহিরে পদার্পণ করেননি। ক্ষৌরকর্ম করেন না। শ্রুষ্ণ এখন প্রায় বুক সই-সই। দ্বিতলে বারান্দায় পদচারণা করেন শুধু। তারাসুন্দরীর অবস্থা আরও সঙ্গীন। তিনি বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। যন্ত্রের মতো চলাফেরা করেন। রূপেন্দ্রনাথ তাঁর চিকিৎসার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রোগি কোন কথারই জবাব দেননি। ফলে আয়ুর্বেদমতে তাঁর চিকিৎসা হতে পারেনি।

রূপেন্দ্র জানতে চান, বৌঠান এখন কেমন আছেন, তারাদা?

—সেই একই রকম! কাঁদে না, হাসে না। কারও সঙ্গে কোন কথাও বলে না। দুনিয়ার ওপর তার প্রচণ্ড অভিমান! এর কি কোন চিকিৎসা নেই রূপেন?

—আছে। তবে চিকিৎসা করার দায় তোমার। একটাই ওষুধ : ভালবাসা। সহানুভূতি।

—কিন্তু ও যে কথাই বলে না। ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দেয় না। ও কিছু শুনতেও পায় না।

—না, তারাদা। ভুল করছ। বৌঠান শুনতে পান ঠিকই। অর্থগ্রহণও হয় তাঁর। কিন্তু প্রচণ্ড অভিমানে তিনি মুক হয়ে আছেন। ওঁর মানসিক শান্তি হয় তো ফিরে আসতে পারে যদি উনি মন্ত্রদীক্ষা নেন। জপতপের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন।

—আমি চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের কুলগুরু ওকে দীক্ষা দিতে স্বীকৃতও হয়েছিলেন। কিন্তু ও সাড়া দিল না। হাঁ-না কোন কথাই বলল না।

রূপেন্দ্র একটু নীরব থেকে বললেন, ওঁকে বল, আমি বলেছি বলেই বল—ঠিকই শুনতে পাবেন তিনি। বুঝতেও পারবেন। বল যে, রূপেন মনে করিয়ে দিতে বলেছে, তিনি যে আঘাতটা পেয়েছেন তার দ্বিগুণ আঘাত পেয়ে আর এক মা কিন্তু তাঁর ঈশ্বর ভক্তি থেকে বিচলিত হননি। বৌঠানই বা পারবেন না কেন?

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

একটু চিন্তা করে তারা প্রসন্ন বলেন, তুমি কার কথা বলছ রূপেন?

—শচীমাতা! তাঁর দুই উপযুক্ত পুত্রই মাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।
বিশ্বস্তরদেব আর শ্রীচৈতন্যদেব।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তারা প্রসন্নের। বললেন : তুমি তাকে নিজমুখে পরামর্শ দেবে
মন্ত্রদীক্ষা নিতে?

—তোমাদের একটা ভুল হয়েছিল তারাদা। তোমাকে গুরুনিন্দা শোনাচ্ছি না। কিন্তু
বৌঠানের দৃষ্টিভঙ্গিতে শুভপ্রসন্নের গৃহত্যাগের জন্য তোমার গুরুদেবই মূলত দায়ী।

—থাক রূপেন্দ্র, বাকিটা বুঝেছি। তুমি কোন সদগুরুর সন্ধান দিতে পার?

—পারি। তুমি বৌঠানকে বল : ‘রূপেন বাঁড়ুজে জীবনে কখনো কাউকে মন্ত্রদীক্ষা
দেয়নি। সে তা দেয় না। কিন্তু বৌঠানের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম একবগ্না ভাঙতে রাজি।
তিনটি শর্তে : এক : মন্ত্র গ্রহণে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ থাকা চাই, অর্থাৎ কারও
উপরোধে এ কাজ করছেন না; দুই : আমাকে তিনি দীক্ষাগুরু হিসাবে স্বীকার করতে
রাজি; তিন : গুরুকে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিতে তিনি স্বীকৃত।

তারা প্রসন্ন অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বক্তার দিকে। তারপর জানতে
চাইলেন, গুরুদক্ষিণাটা কী?

—বৌঠানকে বল, রূপেন ধ্যানের দৃষ্টিতে মানসযাত্রী এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পায়।
দেখতে পায় যে, সেই সন্ন্যাসী তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারছে না তার মায়ের
দুর্মনসাতার জন্য! সে মাতৃঋণ পরিশোধ করে যাবনি বলে। মা বিষ্ণুপ্রিয়ার তবু
একজোড়া খড়ম জুটেছিল, কিন্তু শচীমাতা? তিনি আত্মহত্যা করেননি, মৌন অবলম্বন
করেননি। ‘নামগানের’ মধ্যে ‘আনন্দস্বরূপ’কে লাভ করেছিলেন।

তারা প্রসন্ন নীরবে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বলেন : বলব তাকে। এখন
যে কারণে তোমার কাছে এসেছি তা বলি। একটি মর্মান্তিক কথা কানে এল—জানতে
চাইছি, সেটা কি সত্য? সৌম্যবাবাজি নাকি মামণিকে ত্যাগ করতে চলেছে? বাৎসরিক
শ্রাদ্ধ সে-রেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করবে?

রূপেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন না এ খবর উনি কোথায় শুনেছেন। পরিবর্তে
আদ্যোপান্ত সব কথা বিস্তারিত জানালেন।

তারা প্রসন্ন বলেন, তুমি আমার কোন অনুরোধই কখনো শোননি। আজ একটা
শুনবে?

—কী অনুরোধ!

—তোমরা বল কাল অনন্ত কাল নিরবধি। আমরা সাধারণ মানুষ। তাই জানি,
মানুষের জীবনে কাল ক্ষণস্থায়ীমাত্র। কয়েক দশক পরে তুমিও থাকবে না। আমিও
থাকব না। কিন্তু সো-এই গ্রামটা থাকবে। থাকবে রোগাক্রান্ত নরনারীর আর্তনাদ। আমি
তাই এক সদব্রাহ্মণকে একটি বাস্তু দান করতে চাই। যাতে পরবর্তী প্রজন্মেও তোমার
ধারাটা এ গাঁয়ে বজায় থাকে। ওরা দুজন তোমার অধীনে চিকিৎসা শুরু করবে, ধীরে
ধীরে দায়িত্বভার গ্রহণ করে নেবে। তোমার কোন পুত্রসন্তান নাই, আমার থেকেও নাই,

তাই বৃদ্ধ বয়সে তুমি, আমি, তোমার বৌঠান ওদের সেবাযত্নে দিনযাপন করতে পারব। তবে হ্যাঁ, আমি জানি তার গুরুদেব রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত-মশাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার স্বশ্রুও একই রকম একবাক্য। ফলে, সে যদি আমার দান গ্রহণে অস্বীকৃত হয়, তাহলে তাকে বল, ওটাকে সে যেন ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে। ওরা দুজন উপার্জনক্ষম হবার পর আমি সে ঋণশোধের অর্থগ্রহণ হাত পেতে নেব। সে অর্থ কার ভোগে লাগবে তা অবশ্য ঈশ্বরই জানেন।

রূপেন্দ্র সংক্ষেপে বললেন, তোমার প্রস্তাব তাকে জানাব।

—‘জানাব’ নয়, রূপেন। তুমি এখনি নবদ্বীপে চলে যাও। তাকে সব কথা বলে ফিরে এসে আমাকে জানাও। আমি ওর গৃহনিমাণের কার্য শুরু করে দিই। বাৎসরিক-শ্রাদ্ধান্তে সে এসে গৃহপ্রবেশ করবে। সেটা সে দান হিসাবে গ্রহণ করুক অথবা ঋণ।



মালতী আর মামণিকে তারাশ্রমের প্রস্তাবের কথা জানালেন।

মামণি নতনয়নে নীরব রইল, মালতী কিন্তু ইতস্তত করে বলে, কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন, ঠাকুরপো যে, যোলা বছর বয়স না হলে মেয়েদের দ্বিরাগমন হওয়া উচিত নয়?

—হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম। কিন্তু সেটা হচ্ছে সাধারণ-সূত্র। আমার কন্যা এবং জামাতা অ-সাধারণ। সাধারণ সূত্রের পঞ্চাদপটের তাৎপর্যটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে ওরা বুঝবে। ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক।



প্রায় একটি বছর পার হয়ে গেল। আবার শ্রাবণ এসেছে ফিরে। আজ শ্রাবণের শুক্লাষ্টমী। তিন দিন পরে তিজলহাটিতে পাঁচকড়ি ঘোষাল-মশায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। যতদূর খবর পেয়েছেন সৌম্যসুন্দর এখনো নবদ্বীপ থেকে এসে পৌঁছায়নি। বাৎসরিক শ্রাদ্ধে রূপেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ হয়নি। তিনি প্রত্যাশাও করেননি। কিন্তু স্থির করছেন, অনিমন্ত্রিতই যাবেন। মালতীর প্রচণ্ড আপত্তি, নেমন্তন্ন না করলে কেন যাবেন?

—যেহেতু তিনি ছিলেন আমার বৈবাহিক এবং ঋণী মানুষ! তবে এবার আমি একা যাব না। মামণিকে সঙ্গে নিয়ে যাব। অবশ্য সে যদি আপত্তি না করে।

রূপমঞ্জরীর বৈষ্য

মালতী গর্জে ওঠে, না! ও তো আর আপনার মতো উন্মাদ নয়।

রূপমঞ্জরী প্রতিবাদ করে, না সোনা-মা। আমিও যাব। যাওয়াটা আমার কর্তব্য।
সেবারও যেতাম, আপনাদের জামাই বারণ না করলে।

সংবাদ পেয়ে তারা প্রসন্ন ছুটে এলেন, না রূপেন! তুমি যেও না!

— কেন এভাবে আপত্তি কর বল তো, তারাদা? বারে বারে তোমার অবাধ্য হতে আমার খারাপ লাগে না? তুমি জানই আমি যা স্থির করি—

— হ্যাঁ জানি! তুমি সংশোধনের বাইরে। চিরটাকাল একবন্ধা।

এবার কিন্তু কথা রাখতে পারেননি। বৈবাহিকের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে তাঁর যাওয়া হয়নি। মমবিদারক হেতুতে। সৃতিকাগৃহে কুসুমমঞ্জরীর মৃত্যু ব্যতিরেকে এতবড় আঘাত তিনি জীবনে পাননি!



যেকথা বলছিলাম—শ্রাবণের শুক্লা-অষ্টমী। সেদিন সকালে রূপেন্দ্রনাথ প্রাতঃরাশে বসেছেন। রান্নাঘরের সম্মুখের দাওয়ায়। মালতী দুধটা জ্বাল দিচ্ছে। মামণি একটি পাখা হাতে বসেছে মক্ষিকা-বিতারণ মানসে। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছিল। এখন একটু ধরেছে। সহসা ওঁর গৃহদ্বারে শ্রুত হল এক বিকট তুর্ঘ্যনিদাদ। ওই সঙ্গে ঢাকের বাদ্যি। সচকিত হয়ে ওঠে সবাই। মালতী রান্নাঘর থেকে বলে ওঠে, ও কীসের শব্দ?

রূপমঞ্জরী বলে, দেখে আসব বাবা?

— না। আমিই দেখছি। আমার ভিটার সামনে শিঙা বাজায় কে?

ক্রতপদে উঠে গিয়ে সদরদ্বার উন্মুক্ত করে দাঁড়ালেন।

বিচিত্র দৃশ্য। গৃহসম্মুখে তিন-চার জন অশ্বারোহী। কিছু বাজনদার আর জনাবিশেক লাঠিয়াল পাইক! তাদের মালকোঁচা-মারা খাটো ধুতি, মাথায় পাগড়ি, হাতে তৈলাক্ত লাঠি! লক্ষ্য করে দেখেন, অশ্বারোহীরা ইতিমধ্যে অবতরণ করেছে। একজন টলতে টলতে এগিয়ে আসে। যেন আকর্ষণ কারণবারি পান করেছে। ওঁর সম্মুখে এসেই সে কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল। হাউমাউ করে কী বলল বোঝা গেল না। রূপেন্দ্র তাকে চিনতে পারেন : নকড়ি ঘোষাল!

— কী হয়েছে নকড়ি? অমন করছ কেন?

হাউমাউ করে ভূপতিত জোয়ানটা কী বলল এবারও বোঝা গেল না। মনে হল, জড়িত ভাষে সে বললে, সর্বোনাশ হয়ে গেছে তাই মশাই।

এতক্ষণে এগিয়ে এসেছেন তিনকড়ি। ভ্রাতৃপুত্রকে ধমক দিয়ে ওঠেন; প্রচণ্ড

আঘাত তুমি পেয়েছ নকড়ি, মানছি! কিন্তু শুভকাজে চোখের জল ফেলতে নেই! ওঠ! ওঠ! উঠে দাঁড়াও।

এবার তাঁকেই প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে? আপনিই বলুন?

— ও যা বলল তাই হয়েছে বেয়াইমশাই : সর্বনাশ! নিদারুণ সর্বনাশ!

—সেটা কী? কোথায় হল?

—তিজলহাটির ব্রহ্মডাঙার মাঠে। কাল সন্ধ্যারাত্রে। সৌম্য খেয়াঘাট থেকে বাড়ি ফিরছিল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে। হঠাৎ—মাঠের মাঝখানে—

—কী? সর্পাঘাত?

—না, বেয়াইমশাই! তাহলে তো কাল রাত্রেই খবর পেতেন। এ শিবের অসাধ্য ব্যামো! সৌম্য মারা গেছে বজ্রাঘাতে!

মাথার মধ্যে টলে উঠল ওঁর। চৌকিট ধরে ধীরে ধীরে বসে পড়লেন। গোময়লিপ্ত উঠানে। অজ্ঞান হননি; কিন্তু যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে।



তুর্য়ধ্বনিতে সারা গ্রাম মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠেছিল। অনেকেই বাড়ির বাইরে এসে দেখতে পায় একবয়সী-ঠাকুরের বাড়ির সামনে একটা অপ্রত্যাশিত জনসমাবেশ—ঘোড়সওয়ার, বাদক, লাঠিয়াল, পাইক। কী ব্যাপার? দাবানলের মতো কিছুক্ষণের মধ্যেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল সারা গাঁয়ে। এই তো সেদিন সেই ছেলোটোপ-মাথায় এসেছিল। চন্দনচর্চিত ললাটে। রাজপুত্রের মতো। সোণাই গাঁয়ের রাজকুমারীর সন্ধানে। সে আজ অমর্ত্যালোকের বাসিন্দা। পিলপিল করে মানুষজন ছুটে আসে বাঁড়ুজেবাড়ির সামনে। অথচ গৃহস্বামী সেই যে প্রস্তরমূর্তির মতো দ্বারের পাশে বসে পড়েছেন তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসেনি। তিনি জানতেও পারেননি—বাড়ির ভিতর তাঁর আদরের মামণি মুর্ছিতা হয়ে পড়ে আছে। মালতী দাঁতে-দাঁত দিয়ে বসে আছে তার মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে। শোভারানী বারে বারে জলের ঝাপটা দিচ্ছে মুখে। বাতাস করছে জোরে জোরে।

বাড়ির দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন সমাজপতিরাও—নন্দখুড়ো, শিরোমণি এবং তারাপ্রসন্ন।

তারাপ্রসন্নই প্রশ্নটি পেশ করলেন প্রথমে, তা এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি জানাতে আপনারা বাজনদার সঙ্গে করে আনলেন কেন?

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

তিনকড়ি তাঁকে নমস্কার করে বলেন, আপনাকে চিনতে পেরেছি, ভাদুড়ীমশাই!

—সেটা আমার সৌভাগ্য, কিন্তু প্রশ্নের জবাব নয়!

—আমরা যে বধূমাতাকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওদিকে তিজলহাটিতে সব ব্যবস্থা হচ্ছে। সারা গ্রাম প্রতীক্ষা করছে। বৌমার পদধূলি গ্রহণ করতে। পালকি আমরা সঙ্গে নিয়েই এসেছি। সতী-মা তিজলহাটিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত যে অপঘাতে-মৃত হতভাগ্যের সৎকার করা যাবে না!

তারাপ্রসন্নর ওষ্ঠাধর শুধু উচ্চারণ করল : সতী-মা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ! বহুদিন পরে আজ পঞ্চগ্রামে সহস্ররূপের আয়োজন করা হয়েছে।

একটু বিলম্ব হল প্রত্যুত্তর করতে। তারপর তারাপ্রসন্ন বললেন, রূপেন বাঁড়ুজ্জে—আমি যতদূর জানি—সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। সে নিশ্চয় সম্মত হবে না—

বাধা দিয়ে তিনকড়ি বলেন, কন্যা-সম্প্রদানের পর ওঁর মেয়েটি আর তো বাঁড়ুজ্জে-বংশের নয় ভাদুড়ীমশাই! সে এখন সৌম্যসুন্দর ঘোষালের ধর্মপত্নী। তাকে তার স্বামীর সেবা করতে একই সঙ্গে স্বর্গে যেতে হবে। এটাই শাস্ত্রীয় নির্দেশ! এটাই আমাদের কুলপ্রথা!

তারাপ্রসন্ন জানতে চাইলেন না,—সেক্ষেত্রে পাঁচকড়ি ঘোষালমশায়ের সেবা করতে তাঁর ধর্মপত্নীকে আপনারা স্বর্গে পাঠাননি কেন?

তিনকড়ি বলেন, আপনারা বধূমাতাকে বধুবেশে সাজিয়ে দিন। অহেতুক বিলম্ব করবেন না। যে ভাবে কন্যাটি সম্প্রদান করা হয়েছিল সেই সাজে তাকে অনুগ্রহ করে সাজিয়ে দিতে বলুন!

তারাপ্রসন্ন ধমকে ওঠেন, কিন্তু বলবটা কাকে? দেখতেই তো পাচ্ছেন সে এই মর্মান্তিক আঘাতে পাথর হয়ে গেছে!

—শোক তো আমরাও পেয়েছি! কিন্তু ধর্মীয় আচার তো পালন করতেই হবে! দোষ তো ওঁরই। যেটুকু বিচার না করেই—একবছরের ভিতরে শ্বশুর এবং স্বামী—

নন্দখুড়ো এতক্ষণে যোগদান করেন আলোচনায়, এ বড় কঠিন কাজ তারাভাই। আমারই কি বুকটা ফেটে যাচ্ছে না? কিন্তু কী করবে? এই হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ। আমি বরং তোমার দুই খুড়িমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাঁরাই রূপমঞ্জরীকে বধুবেশে সাজিয়ে দেবেন।

তারাপ্রসন্ন কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর রূপেন্দ্রনাথের বাহুমূল ধরে ডাকেন, রূপেন! রূপেন! কথা শোন! ওঠ!

কোন সাড়া জাগল না। রূপেন্দ্রনাথ দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল বসে আছেন। সেই যেখানে বহুদূর আকাশে একটা সূর্যসাক্ষী চিল ক্রমাগত চক্রাকারে পাক খাচ্ছে।

তারাপ্রসন্ন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কী একটা কথা বলতে গেলেন। পারলেন না। নন্দ তাগাদা দেন, অহেতুক বিলম্ব কর না তারাপ্রসন্ন! আমি জানি, মামণির যাবতীয়

অলঙ্কার তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা আছে, সেগুলি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করেছিল রূপেন। সেগুলি এখন ঘোষালবংশের সম্পত্তি! সে বেশেই সতী-মা যাবে।

হঠাৎ রুখে দাঁড়ান তারাপ্রসন্ন, না খুড়ো! আপনি ভুল করছেন। রূপেন সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করেছিল তার জামাতাবাবাজিকে। ঘোষাল পরিবারকে নয়। রূপেন যতক্ষণ না অনুমতি দিচ্ছে ততক্ষণ তার গচ্ছিত ধনও আমি অন্য কারও হাতে তুলে দিতে পারি না।

—তা বেশ তো! অনুমতি নাও। সর্বসমক্ষে। আমরা স্বকর্ণে শুনি সে শাস্ত্রবিরোধী কথা বলে কিনা।

তারাপ্রসন্ন আবার বাহমূল ধরে বাঁকি দিলেন রূপেন্দ্রকে। তিনি নির্বাক।

নন্দ বলেন, দেখলে তো! সম্মতিও দিচ্ছে। মুখে বলছে না। তাই মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।

তারাপ্রসন্ন বলেন, আজে না। মর্মান্তিক শোকে মানুষ মুক হয়ে যায়। পাথর হয়ে যায়! আমি জানি। এটা তার সম্মতির লক্ষণ নয়।

তিনকড়ি বলেন, শুনুন ভাদুড়ীমশাই, এমন একটা বাধা সৃষ্টি হবে সেরকম আশঙ্কা আমাদের ছিলই। সেজন্য আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আপনার ডানদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ওরা সুদক্ষ বিহারী লাঠিয়াল। কিন্তু এখানে এখন শুভকার্যের প্রারম্ভে আমি রক্তগঙ্গা বহাতে চাই না! আপনি কি বধূমাতার অলঙ্কারগুলি পাঠিয়ে দেবেন? সাজাবার দরকার নেই। সে কাজ আমরা ওখানেই করে নিতে পারব।

তারাপ্রসন্ন দেখলেন একসার লাঠিয়াল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। তারা প্রভুর আঞ্জার প্রতীক্ষায় আছে। মুহূর্তে কেমন যেন পরিবর্তিত হয়ে গেলেন তারাপ্রসন্ন। বলেন; আজে হ্যাঁ! দেখেছি। এটা আমি ইতিপূর্বে খেয়াল করিনি। আমি স্বয়ং গহনার পুঁটলিটা নিয়ে আসছি। তা এখানে কেন? আমার অতিথিশালায়—

তিনকড়ি তৎক্ষণাৎ বলেন, ও যদি করবেন না ভাদুড়ীমশাই। ইঁদুরকলে আমরা মাথা গলাব না। এখানেই অপেক্ষা করছি। আপনি অনুগ্রহ করে একটু তাড়াতাড়ি করুন।

ভাদুড়ীমশাই তৎক্ষণাৎ বড়বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ছত্রধর মিশিরজি চলল তাঁর পিছন পিছন। বাড়ির কাছাকাছি এসে তাকে বললেন, মিশির! এই চাবির থোকাটা খাজাঞ্চিবাবুকে দিয়ে আয়। তুরন্ত! বলবি ভীমা বা ঈশেনরা যদি চাইতে আসে তাহলে তাদের হাতে অস্ত্রাগারের ভীল ধনুকগুলি যেন বার করে দেয়।

হনহন করে দ্বিতলে উঠে গেলেন। পুঁটুরানীকে দেখতে পেয়েই বললেন, মর্মান্তিক খবরটা শুনেছিস? মামণি বিধবা হয়ে গেছে। ওরা তিজলহাটি থেকে লাঠিয়াল আর পাল্কি নিয়ে এসেছে। জোর করে মামণিকে সহমরণে পুড়িয়ে মারতে চায়!

পুঁটুরানী দু-চোখে আঁচল দিয়ে বলে, শুনেছি!

—কান্নার সময় অনেক পাবি। তুই ঠাকুরঘর থেকে বড় শঙ্খটা নিয়ে আয় দেখি।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

পুঁটুরানী মুহূর্তমধ্যে হুকুম তামিল করল। তারাপ্রসন্ন বলেন, এবার দৌড়ে ছাদে চলে যা। শাঁখটা বাজিয়ে দে!

—আমার ...আমার যে একটা গুণ্ডব্রণ হয়েছে দাদা!

—আহ! শাঁখ বাজাতেও পারিস না? তবে ওদের কাউকে ডাক—সদু, মোতির-মা কে কাছেপিঠে আছে দেখ!

তারাসুন্দরী নির্বাক বসেছিলেন একটু দূরে। ওঁদের কথাবার্তা যে শুনতে পাচ্ছিলেন, বুঝতে পারছিলেন তা বোঝা যায়নি। হঠাৎ অদ্ভুত ভাবান্তর হল তাঁর। উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে এসে ননদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন শঙ্খটা। ছুটেই বার হয়ে গেলেন দ্বিতলের খোলা বারান্দায়। সহসা তীব্র শঙ্খধ্বনিতে সচকিত হয়ে উঠল বড়বাড়ি।

বর্গীর হাস্যামা সদ্য-অতীত। সেই মর্মান্তিক দিনগুলোর কথা ভুলে যায়নি সোএগই গাঁয়ের কুলবধূরা। সেই সেদিনের নির্দেশ, সেই সেদিনের সঙ্কেতময় শঙ্খের শঙ্খভাষে! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা গ্রামটা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল! ওরা অনেকেই জেনেছে ভিন গাঁ থেকে আবার এসেছে লুটেরা বর্গীর দল!

এখানেও সচকিত হয়ে ওঠেন তিনকড়ি ঘোষাল। তিনিও রাঢ়বাংলার অভিজ্ঞ মানুষ। এ সঙ্কেতের অর্থ তাঁর ভালমতো জানা! তৎক্ষণাৎ জ্ঞাতিক্রান্তর দিকে ফিরে বলেন, সুবল! আমি ভাল বুঝছি না। ওরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইছে। এখনি কাজ হাসিল না করলে ওরা পিলপিল করে ছুটে আসবে।

—আসে আসুক! আমাদের সঙ্গে তো বিশজন দক্ষ লাঠিয়াল আছে দাদা?

—তর্ক করিস না সুবল। যা বলছি কর। লছমনপ্রসাদকে বল, বৌমাকে দু-তিনজন পাঁজকোলা করে তুলে আনুক। পালকিতে উঠিয়ে দে! আমরা এই মুহূর্তেই রওনা দেব। গাঁয়ের মানুষ জড়ো হওয়ার আগেই—

—কিস্ত গহনাগুলো?

—পরে এসে সে ফয়শালা করব। সেগুলো ন্যায়ত-ধর্মত আমাদের।

সুবল লেঠেল সর্দার, লছমনপ্রসাদকে হুকুম দিল—ওই মুর্ছিতা নারীদেহটা পাঁজকোলা করে তুলে আনতে। দু-তিনজন লাঠিয়াল এগিয়ে এল।

ভিড়ের মধ্যে, একটু দূরে এতক্ষণ ‘তিনমাথা এক করে’ বসেছিল একজন কঙ্কালসার বৃদ্ধ। খালি গা, মিশকালো গায়ের রঙ। অবিন্যস্ত মাথার চুলগুলো ধবধবে সাদা। লোকটা হাত দুটি জোড় করে উঠে দাঁড়ালো। তিনকড়ির দিকে ফিরে বললে, মনে লাগে আপনাই তিজলহাটির কণ্ঠমশাই! শুনুন দ্যাবতা!

—আগে বল তুই কে? কী নাম তোর?

—আজ্ঞে বাপে মোর নাম রাখিছিল ‘ভীমা’। মোরা জেতে বাগদি আজ্ঞে!

—তা বামুনপাড়ায় নাক গলিয়েছিস কেন? হারামজাদা বাগদির পো! জানিস না, তোদের ছায়া মাড়ালে আমাদের স্নান করতে হয়?

—জানি, দ্যাবতা। জানব না কেনে? আমার বাপ জানতো, জেঠা জানত—বাপের বাপ, তেনার বাপ জানত—

এতক্ষণ দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ছিল নকড়ি। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়। ভীমাকে বলে, হট যাও বদতমিজ! ইয়ে হ্যায় হামারা ইজ্জৎ-কা-সওয়াল!

ভীমা লক্ষ্য করে দেখল ওই উঠতি জোয়ানের চোখ দুটো রক্তবর্ণের। কেঁদে-কেঁদে হয়েছে, নাকি ভ্রাতৃশোকে অতিরিক্ত কারণবারি পান, তা জানে না। কিন্তু ও যে কী বলল তা বুঝল না। পার্শ্ববর্তী দিকে ফিরে বললে, উ কী বললেরে পেলাদ?

পেলাদ বায়েন শাকেরভাষ্য দাখিল করে, ছুটো হজুর বললে, কি যে এটা হতিছে তিজলহাটির ইজ্জতের কতা! অরা লাঠির জোরে বাবাঠাকুরের মাইয়াডারে....

—অ। বুঝছি!—আবার ভীমা তিনকড়ির দিকে ফেরে। জোড়হস্তে সবিনয়ে বলে, শোনেন দ্যাবতা! সোএগই গাঁয়েরও তো টুক ইজ্জৎ আছে? না কী বলেন? শুভকাজে আমাদের গাঁয়ের এড্ডা মাইয়ারে নে-মাবেন! আমাদের বাধা দিব কেন? কিন্তুক এমন আদুল-গায়ে তাঁরে বিদায় দি' ক্যামনে? জমিদারমশাই গয়নাগুলান নে-আসুক। মায়েরে সাজায়ে দিই শ্যাববারের মতো। তারপর...

তিনকড়ি বুঝতে পেরেছেন ওই বাগদি-পোর মতলব—সেই যাকে পণ্ডিতেরা বলেন ‘অশুভস্য কালহরণম্’! নিদেন হাঁকেন, না! যেমন আছে তেমনই উঠিয়ে নিয়ে যাব। লছমনপ্রসাদ—

আবার এগিয়ে আসে দু তিনজন লাঠিয়াল।

ভীমা তার পাজর-সর্বস্ব বুকেটা চিতিয়ে দু-হাত দুদিকে বাড়িয়ে দেয়। ক্রুশবিদ্ধ বীণু স্ট্রিটের ভঙ্গিতে। বলে : খবরদার!!

—কী বললি হারামজাদা? ‘খবরদার’? তোর এতবড় দুঃসাহস! হারামজাদা বাগদির-পো!

জনতার মাঝ থেকে কে যেন চিৎকার করে ওঠে, ব্যাপারডা কী খুড়ো? তোমারে কি গাল দিল ওই ভিনগাঁয়ের হারামজাদ বামুনডা?

—না, না, গালি দেয় নাই! অরা বামুন, অরা দ্যাবতা। অরা কি তুর-আমার মতো বল্‌বলতি মুখ-খরাপ করতি পারে? তু মেজাজ খরাপ করিস না।

তিনকড়ি নজর করে দেখেন যাকে বলা হল সে একটি দশাসই জোয়ান। উদাম গা, খেটো ধুতি মালকোচা করে পরা। হাতে প্রকাণ্ড একটা ভীলধনু। এগিয়ে এল না সে। হাতদশেক দূরে স্থিরলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কথা বলল আবার সেই বৃদ্ধ ভীমা বাগদি, তিনকড়িকে সম্বোধন করে, আপনার বাঁ-বাগে যায়ে দ্যাখেন দ্যাবতা। কয়জন আসে পড়ছে। আরো আসতিছে। অদের হাতে যেগুলান দ্যাখছেন, তারে কয় ভীলধনু! আপনার লাঠিয়ালদের মধ্যে যে নিকোথ লাঠিগাছখান মাথার উপর তুলবে তারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করি দিবে। লাঠি নামার আওতেই!

তিনকড়ি বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন প্রায় দশ-পনের-হাত দূরে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সাতজন ধনুকী। তাদের ধনুকের জ্যা আকর্ষণবিস্তৃত।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

—পেতায় হলনি? তো দ্যাখেন! অরে ঈশেন! দ্যাবতার মাথার শামলাটারে নামায়ে দে তো! দেখিস্ বাপ্—চক্ষুরত্নটি যেন খুয়া না যায়।

‘টাং’ করে একটা শব্দ হল। বাণবিদ্ধ শিরস্ত্রাণটি লুটিয়ে পড়ল ধূলায়।

শিউরে উঠলেন তিনকড়ি।

—আপনারা ঘর পানে রওনা দ্যান দ্যাবতা! এই ছারাটারেও লয়্যা যান। অর ইজ্জতের বড় দ্যামাক!

এবার গর্জন করে ওঠেন নন্দখুড়ো, ভীমা! ঈশেন!

তদোধিক উচ্চস্বরে গর্জে ওঠে ভীমা : আপনেও কম হারামজাদ’ নয়, দ্যাবতা! আপনেরে মোরা চিনি। বেতো ঠ্যাঙ লয়্যা আপনেও ঘরপানে রওনা দেন। অই দ্যাখেন ক্যানে ঈশেন তার ধনুতে আবার বাণ লাগায়েছে!

সর্বসমক্ষে এতবড় অপমান নন্দকে কখনো সহিতে হয়নি।

আগন্তুক ‘বর্গী’র দল নতমস্তকে ফিরে গেল খালি হাতে।

ভীমা বাগদি এতক্ষণে রূপেন্দ্রনাথের দিকে ফেরে। ছুঁয়ে ফেললে বাবাঠাকুরকে যে আবার স্নান করতে হবে এ-কথা ওর আর মনে রইল না। দু-হাতে জড়িয়ে ধরল তাঁর চরণযুগল। মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বলতে থাকে, আপনে থির হন দ্যাবতা! আপনি পাগল হই গেলি মোরা ডাঁড়াব কুথায়?

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল শোকসন্তপ্ত মানুষটার। তিনি ওই অস্ত্রাজ বৃদ্ধের ধূলিধূসরিত মস্তকটি দু-হাতে তুলে ধরলেন। শিরশ্চূষন করে বললেন, না রে ভীমা! আমি উন্মাদ হয়ে যাইনি। আমি উন্মাদ হয়ে গেলে তোরা আবার কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়াবি? সব শোক আমাকে সহিতে হবে। তোদের মুখ চেয়ে।



কালের রথচক্র এগিয়ে চলেছে।

চিত্তাভ্রষ্ট রূপমঞ্জরীর পিতৃদেবকে গ্রাম-পঞ্চায়েত সমাজচ্যুত করেছে। জাতিভ্রষ্ট। ওই যাকে বলে ‘একঘরে’। অর্থাৎ ধোপা-নাপিত বন্ধ। বিবিভক্তসেবী ব্রাহ্মণটি জাক্কেপ করেননি। সংসারে মাত্র দুটি মানুষ। যে-যার বস্ত্রখণ্ড নিজেরাই পরিমার্জনা করে নেন, ফলে রজক নিস্ত্রয়োজন। পরামানিকের প্রয়োজন দু-জনের মধ্যে একজনেরই। তিনি ওষ্ঠলোম, শ্মশ্রু বা কেশদামের বৃদ্ধিতে জাক্কেপ করেন না। ফলে সেদিক থেকেও কোনও অসুবিধা হয় নাই। দুজন কেন? কেন নয় সওয়া-তিনজন? সেকথাই এবার বলব। কিন্তু তার পূর্বে জানানো দরকার সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণটির প্রধান অসুবিধার কথা। সপ্তাহান্তিক হাটে কোনও ব্যাপারি রূপেন্দ্রনাথকে কিছু বিক্রয় করতে পারে না। চায় না

নয়, পারে না। কারণ সমাজপতিদের तरफে লগুড়হস্ত প্রহরীরা সচেতন। ভিন-গাঁয়ের ছাটি থেকেও সওদা ক্রয় করে আনার উপায় নাই। কারণ একবগ্না-ঠাকুরকে এবার শুধু সোণাই গ্রাম-পঞ্চায়েতই সমাজচ্যুত করেনি। করেছে পঞ্চগ্রামের মিলিত-পঞ্চায়েত। এতবড় অন্যায়ের শাস্তি দেবার জন্য পাশাপাশি চার-পাঁচটি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের মোড়লেরা মিলিতভাবে তাঁকে জাতিচ্যুত করেছেন। না করবেন কেন? প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেকটি বিগতভর্তাকে সহমরণে যেতে হয় না, কিন্তু যেখানে শ্বশুরকুল থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেখানে পিতৃকুলের 'একবগ্নামিতে' তা ভেসে যাবে, এমন অসৈরণ্য অসহ্য! অনাচারের পরিমাণটা তোমরা বিবেচনা করে দেখ :

রূপেন্দ্রনাথের জামাতাবাবাজি অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। অপঘাত-মৃত্যুতে একটা 'প্রাচিস্তির' অবশ্য কর্তব্য। এখানে তাঁর শ্রাদ্ধই করা গেল না। কী করে যাবে? সৌম্যসুন্দর যে মারা গেল 'অশৌচাবস্থায়'। দোষটা তারই! সে সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করেছিল। তার শ্বশুরোচিত 'একবগ্নামিতে'। মহাশ্বরূপিনীপাতের একাদশ তিথিতে অশৌচান্তের ব্যবস্থা শাস্ত্রে ছিল। আছে! জেদের বশবর্তী হয়ে সৌম্যসুন্দর সে নীতি লঙ্ঘন করেছিল। সেই পাপেই বজ্রাঘাতে সে নিহত হল। তখন তার মস্তকে তৈলতৃষিত জটা, হাত-পায়ের নখ রাক্ষসাকৃতি! অশৌচ যার অনতিক্রান্ত তার তো শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধাদি অনুমোদিত! হয়তো পণ্ডিতেরা তার জন্য একটা ব্যতিক্রম বিধিব্যবস্থা করতেন, 'মূল্য ধরে নিয়ে'—'প্রাচিস্তিরের' মাধ্যমে। কিন্তু প্রেতযোনি প্রাপ্ত হতভাগ্যের ধর্মপত্নী যে সে পথটাও রুদ্ধ করে দিল। চিত্তাভ্রষ্ট হয়ে অনাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করে বসল!

হয়তো তাকে বাগে আনা যেত, কিছু ধুরুরার রস-টস খাইয়ে।

কিন্তু তার অধার্মিক পিতৃদেব কিছু জল-অচল অনুচরের সাহায্যে গায়ের জোরে সে শুভকার্যটাও অসম্ভব করে তুলল!

এখন বোঝো : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কিনা স্বচক্ষে দেখে যাও!

চিত্তাভ্রষ্ট হবার মাত্র পক্ষকালের মধ্যে মালতীর ভাঁড়ারে মা-লক্ষ্মী হয়ে পড়লেন 'বাড়ন্ত'। অথচ হাতে তণ্ডুল ক্রয় করা যায় না। তখনো সংসারে সওয়া-তিনটি প্রাণী। মালতী বলেছিল, ঠাকুরপো, চলুন আমরা এ-গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। আপনার তো অনেক যজ্ঞমান আছেন—নদিয়ায়, কৃষ্ণনগরে, বর্ধমানে?

রূপেন্দ্র স্বীকৃত হতে পারেননি। কারণ তিনি তাঁর পিতৃদেবকে নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন আমৃত্যু সোণাই গ্রামেরই সেবা করবেন।

—কিন্তু গ্রাম যদি না চায়?

—কে বলল, বৌঠান যে, গ্রাম আমাকে চাইছে না? এটা তো শুধু ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের বিধানে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হতভাগ্যগুলো কি তাই চায়?

—কিন্তু আপনিই তো একদিন বলেছিলেন প্রয়োজনে স্বহস্তে বাস্তভিটার মুখাঘি করে ত্রিবেণী চলে যাবেন।

—বলেছিলাম। যদি সবাই চাইত। তারা তা চায়নি। চায় না।

ৰূপমঞ্জৰীৰ বৈধবা

সেবার গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সত্যিই তা চায়নি। এবার ব্যবস্থাটা অন্যরকম। এবার হল পঞ্চগ্রামের সম্মিলিত পঞ্চায়েত সভা। পাঁচ গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে গণভোট তো আর নেওয়া যায় না। তাই নন্দ চাটুজ্জের উদ্যোগে পঞ্চগ্রামের সমাজপতি ব্রাহ্মণেরা গ্রামবাসী জনতার তরফে বিধান দিলেন। এবারও আসামীকে উপস্থিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আসামী সে সুযোগ গ্রহণ করেনি। সে আদৌ উপস্থিতিই হল না ষোলো-আনার ডাকে।

ক্রমে মালতীর ভাঁড়ারে বাড়ন্ত মা-লক্ষ্মীর বৃদ্ধি এতটাই হয়ে গেল যে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন ফিরে আসতে থাকে একাদশী। উনান জ্বলে এক দিন বাদ দিয়ে। শ্যামামালতী দুধপোষাই রয়ে গেল। অশ্বাসের পাশে এতদিনে একটি গোশালাও নির্মিত হয়েছে। গোমাতা এসেছেন সেখানে। রূপমঞ্জরী তাঁর নাম দিয়েছে সুরভি। সে উন্নীত হয়েছে কন্যা থেকে দুহিতার পদে।

তারপর মা-লক্ষ্মী সত্যিই একদিন এলেন। গভীররাত্রে। ‘পেচকঙ্কঙ্গসমারাদান’ ‘চতুষ্পুত্রকঙ্কঙ্গাদান’ ৰূপে।



নন্দ চাটুজ্জ মশায়ের শতেক খোয়াড়। একবগ্নাটাকে কিছুতেই কায়দা করা যাচ্ছে না। পাঁকাল মাহের মতো ক্রমাগত পিছলে পিছলে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যদিও গভীর রাত্রে অতি সন্তুৰ্ণ পদক্ষেপে মা-লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটল তবু নন্দ খবর পেয়ে গেলেন পরদিনই। ডেকে পাঠালেন ছিনাথ সাহাকে। জোড়হস্তে আসামী এসে হাজিরা দিল।

—হাঁয়ে ছিনাথ! এসব কী শুনছি? তোরা চারভাই নাকি তোদের জ্যাস্ত মা-টাকে খাটিয়ায় তুলে মাঝরাত্রে হরিধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে নে-গিয়েছিলি?

নতনেত্রে ছিনাথ বলে, আঙে না! শ্মশানে নয়। একবগ্না-ঠাউরের ভিটেয়। বড় যত্নগা হচ্ছিল যে মায়ের। তাই নিরুপায় হয়ে—

—তোরা জানিস্ না যে, একবগ্নাটা জাতিচ্যুত? সমাজচ্যুত? ওর ভিটেয় মাথা-গলানো মানা?

—জানব না কেন খুড়ো? আপনারা তো ঢোল-শহরৎ করে পাঁচ-গায়েই তা জানিয়েছেন! কিন্তু কী করব বলুন? মায়ের সে যত্নগা যে চোখে দেখা যাচ্ছিল না। তাই আমরা চারজনে তাঁকে খাটিয়ায় তুলে—

—শুনলাম, পুঁটলি বেঁধে চাল-ডাল-সবজি ভেট দিয়েছিস। সত্যি?

—বৈদ্যবিদায় দিতে হবে না?

—তা তো হবে। কিন্তু এখন যদি তোদের চারভাইকে একঘরে করি?

ছিনাথ নতনেত্রে নীরব রইল।

নন্দ চাটুজে বলেন, তুই স্বীকার করেছিস। কবুল খেয়েছিস। তাই এযাত্রা ছেড়ে দিলাম। আর কখনও যেন এমন অধর্মের কথা না শুনি। তোদের চারজনকে নামমাত্র একটা টাকা জরিমানা করলাম।

ছিনাথের পচাই মদের দোকান আছে। জাতে শুঁড়ি। একটা সিক্কা টাকার জরিমানা দিলে সে দেউলিয়া হয়ে যাবে না। তবু সে হাতজোড় করেই বলে, তার চেয়ে এক কাজ করুন খুড়ো, আমাদের চার ভাইকেও ‘একঘরে’ করে দিন। তাহলে মায়ের চিকিচ্ছে করতে আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। মাঝরাত্রে কাঁধে তুলতে হবে না।

নন্দের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ছিনাথ একনিশ্বাসে বলেই চলে, আর কি বলে ভাল, আমাদের তো আর ‘একঘরে’ হয়ে থাকতে হবে না। ধোপা-নাপিতও বন্ধ হবে না। গাঁয়ের ধোপা-নাপিত-কামার-কুমোর সবাই একে-একে হয়ে যাবে ‘একঘরে’, মানে ‘এককাটা’। মুশকিল হবে আপনাদের তিনজনের। তিন সমাজপতি হয়ে যাবেন ‘তেঘরে’! চিকিচ্ছে বন্ধ।

নিজেকে সামলে নিতে বাধ্য হলেন নন্দ! মকুব করে দিলেন ওর জরিমানা। ওঁর নিজের বাতের মালিশটা ফুরিয়েছে। একবগ্না ছাড়া আর কে দেবে সে দাওয়াই? উনি নিজেই পড়ে আছেন এক আতান্তুরিতে।



দুর্গতিনাশিনী বার দুর্গতি দূর করতে এগিয়ে আসেন না তার কী গতি? মিলিত হিন্দু-মুসলমানের এই গৌড়বঙ্গে সে হতভাগ্যের বিপত্তারী রূপে এগিয়ে আসেন স্বয়ং : আল্লাহ্‌তাল। সমুদ্রযাত্রা করার অপরাধে মধ্যযুগের অনেক দক্ষ বণিক—বিজয় সিংহ-চাঁদ সদাগরের উত্তরসূরিদের—জাতিচ্যুত করা হয়েছিল। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরিত্রাণ পায়। এবার অতদূর যেতে হয়নি রূপেন্দ্রনাথকে। ধর্মত্যাগের প্রয়োজন হয়নি অথচ আল্লাহর দোয়া পেলেন।

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি। অথচ মেঘমুক্ত বলমলে আকাশ। সে আকাশে কিন্তু ঘুড়ি উড়ছে না একটাও। ‘ঘুড়ি’ এসেছে পরবর্তী ‘বাবু-কালচারে’র জমানায়—প্রায় একশ বছর পরে। বিশ্বকর্মা পূজাও তখন এতটা ব্যাপক ছিল না। পঞ্চগ্রামের কারিগরি মানুষ—কামার, কুমোর, ছুতোর, তন্তুবায়েরা এককাটা হয়ে একটাই পূজা করত। কর্মকার শঙ্কুকামারের ভিটের সম্মুখে। তারই দুরাগত ঢাকের বাদি ভেসে আসছিল।

এমন সময় অশ্বপুষ্ঠে এসে হাজির হলেন পীরপুরের হাজিসাহেব।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

রূপেন্দ্র এগিয়ে এসে বলেন, আসুন, আসুন! এবার অনেকদিন পরে! কী ব্যাপার?

—বলছি। আগে এই পুঁটলি দুটো ঘরে রেখে আসুন।

—কী আছে ওতে?

—একটায় আমার ক্ষেতের কিছু শাক সবজি, তরি তরকারি, আর দ্বিতীয়টায়—ওই যাকে আপনারা বলেন : ‘মা লক্ষ্মী’!

গভীর হয়ে গেলেন রূপেন্দ্রনাথ। বলেন : আপনি তো জানেন হাজি-সাহেব, আমি দান গ্রহণ করি না!

দু-হাতে নিজের দুই কর্ণস্পর্শ করে হাজিসাহেব বলেন, গোস্তাকি মাফ করবেন। আমার অতবড় স্পর্ধা নেই! এ শুধু বৈদ্যবিদ্যায়। আমি এসেছি আপনার দ্বারে আয়ুর্বেদাচার্য হিসাবে পরামর্শ নিতে।

—আপনি অসুস্থ? কী হয়েছে আপনার?

—আজ্ঞে না। আমার নয়। মেহেরের। আমার ভগিনীর। তার জানুসন্ধিতে একটি বিষশ্ফোটক হয়েছে। বড় যন্ত্রণা পাচ্ছে...

রূপেন্দ্রনাথ থমকে গেলেন এবার। একটু চিন্তা করে বললেন, কিন্তু আমার পক্ষে তো তার চিকিৎসা করা সম্ভবপর নয়। বহিনজীর মুখখানিও আমি কোনওদিন ভাল করে দেখিনি। এমন বেপর্দা হয়ে তিনি কি... তাছাড়া, আপনারা দুজন সম্মত হলেও আপনাদের সমাজ কি তা অনুমোদন করবে? মেনে নেবে?

অধোবদন হলেন হাজিসাহেব। বলেন, বড় কষ্ট পাচ্ছে বহিনটা। কোনও উপায়েই কি হতে পারে না, ভাইসাব?

—হ্যাঁ পারে। আমি একটি বিকল্প প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি কাল সকালে তাকে পালকি করে এ গ্রামে নিয়ে আসুন। আমার কন্যা রূপমঞ্জরীকে আমি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বেশ কিছুটা শিখিয়েছি। আমার নির্দেশমতো সে চিকিৎসা করবে। প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারও করবে।

হাজিসাহেব বলেন, কিন্তু এখানে সে থাকবে কোথায়? আপনি তো জানেন যে, আপনাদের আরোগ্য-নিকেতনে বিধর্মীদের জন্য যে দুটি পৃথক শয্যা সংরক্ষিত ছিল এখন তা নেই। আমাদের সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন বর্তমান পথগণ্যেত।

—জানি। আপনিই বরং জানেন না যে, সেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকলেও কোনও সুরাহা হত না। আমি জাতিচ্যুত। বর্তমানে ওই আরোগ্যনিকেতনে আমার প্রবেশাধিকার নেই। আপনি বহিনজীকে নিয়ে আসুন। সে আমার ভদ্রাসনেই থাকবে। আমার ভাবিজীর সঙ্গে।

হাজিসাহেব আদাব জানিয়ে বলেন, খোদা আপনার মঙ্গল করবেন!





আমাদের ত্রয়োদশবর্ষীয়া নায়িকা জীবনে প্রথম শল্যাচিকিৎসক হিসাবে সেই বিষম্বেদ্যটাকটি বিদীর্ণ করল। শোণিত ও পূঁজ পরিষ্কার করে দিল। প্রায় সপ্তদিবস চিকিৎসাধীন থেকে, নিরাময় হয়ে মেহের প্রত্যাবর্তন করল পীরপুরে। বিদায় মুহূর্তে মুখমণ্ডল বে-পর্দা করে পণ্ডিতজীকে আদাব জানাল। বলল, খোদাতালা আপনাকে দোয়া করুন ভাইসাব!

হাজিসাহেব ইতিমধ্যে সব খবরই পেয়েছেন। কীভাবে হিন্দুসমাজ ওই সেবারতী ব্রাহ্মণকে জাতিচ্যুত করে শাস্তি দিচ্ছে। তিনি একটি বিচিত্র প্রস্তাব পেশ করলেন পণ্ডিতজীর কাছে :

পীরপুরে প্রতি মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে হাট বসে। উনি পীরপুর-গ্রামের প্রধান মোল্লাদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রস্তাব দিলেন যে, প্রতি মঙ্গলবার প্রত্যুষে সেখান থেকে একটি পালকি আসবে। রূপমঞ্জরীকে সে গাঁয়ে নিয়ে যেতে। তার পিতৃদেব অশ্বপুষ্ঠে তার সঙ্গে যাবেন। পাশাপাশি দু-তিনটি মুসলমান-প্রধান গ্রামের আর্ত নরনারী মঙ্গলবার সকালে সমবেত হবে হাজিসাহেবের ‘ছামু’তে। সারা সকাল পিতা-পুত্রী সারিবদ্ধ রোগাক্রান্তদের পরীক্ষা করে ঔষধাদি প্রদান করবেন। পিতা শুধু পুরুষদের। কন্যা পর্দানসিনদের। তারপরে কিছু ফলমূল-ডাবে তৃপ্ত হয়ে, পীরপুরে হাট সেরে ফিরে আসবেন সন্ধ্যায়। মালতী একাহারী তিনজনের জন্য নৈশাহার প্রস্তুত করে রাখবে!

রূপেন্দ্রনাথ সানন্দে স্বীকৃত হলেন। পীরপুরের আশপাশের মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলিতে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। হাজিসাহেবের, পণ্ডিতজীর, আর মুন্নিহাকিমমাস্টার।



শুধু আকাশ ভেঙে পড়ল একজনের মাথায়। তিনি নন্দ চাটুজ্জে। ইতিমধ্যে তিনি সোএগাই-গ্রামের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছেন। বাচস্পতিদাদা স্বর্গে গেছেন। দুর্গা গাঙ্গুলী চলে গেছেন তাঁর সাধনোচিত ধামে, উদাসীন তারাপ্রসন্ন প্রায় উদ্ধাস্তের মতো একান্তচারী। সে তো থেকেও নেই। এ ছাড়া আছেন কালিচরণ ও শিরোমণি।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

তারা নন্দভায়ার অনুগামী। কিন্তু নিরঙ্কুশ সুখ বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। নন্দ চাটুজ্জের কাতর প্রার্থনায় মা দুর্গা নয়-হাতে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু ওই দশমহন্তটি কিছুতেই বরদানে উবুড় হল না।

এক নম্বর—ওই বাগদিপাড়ার অসৈরণ অসুরগুলো। তাদের পাণ্ডা হচ্ছে ভীমা আর ঈশেন! সর্বজনসমক্ষে ভীমা বাগদি চিৎকার করে ওঁকে ‘হারামজাদ’-দ্যাবতা’ বলে সম্বোধন করেছিল! নন্দ রুখে দাঁড়াবার সাহস পাননি। তখনও তিনকড়ি ঘোষাল-মশায়ের বাণবিদ্ধ শামলাটা ধুলোয় লোটাচ্ছে। আর প্রতিবাদ করতে গিয়েই নজর হল ঈশেনটা তার ভীল ধনুতে নতুন করে বাণ জুড়েছে। আকর্ষণ সম্প্রসারিত করে প্রতীক্ষা করছে খুড়োর নির্দেশের। ওই অসুরটাকে বিশ্বাস নেই! ব্রাহ্মণের রক্তপাতে ওর হাত কাঁপে না। আতঙ্কতড়িত নন্দ সেবার স্বর্গহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নতমস্তকে।

কিন্তু সর্বসমক্ষে এতবড় অপমানটা হজম করে গেলে মান থাকে না। নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন অচিরেই। বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করতে হল অবশ্য। তা হোক! কুশাকুরকে সম্মুখে বিনষ্ট না করলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের মর্যাদা থাকে না। তিনি শিকারেত করলেন কোতোয়ালের দরবারে। একমুঠো রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে। যথাবিহিত রজতখণ্ডের সম্মানদক্ষিণা লাভ করে কোতোয়াল এলেন ‘ডাকাত’ ধরতে বাগদি পাড়ায়। নবাবি সৈনিকদের হাতে গাদাবন্দুক চড়িয়ে। বেশ কিছু তথাকথিত ‘ডাকাত’ মারা পড়ল। তার মধ্যে ওদের পাণ্ডা সেই পাঁজরসর্বস্ব ভীমা বাগদি। তবে ঈশেনটাকে কজা করা যায়নি। সে হারামজাদা ভাদ্রের ভরা দামোদরে বাঁপ খেয়ে পড়েছিল। তার মৃতদেহের সন্ধান আদৌ পাওয়া যায়নি। তবে নন্দর দৃঢ় বিশ্বাস এতদিনে দামোদর মোহনায় কুমীর-কামঠরা অসুর-মাংসে যথারীতি তৃপ্ত হয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় কটকটি উৎপাটিত করা যায়নি এখনও। পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা যাকে সম্মিলিতভাবে জাতিচ্যুত করলেন—যাকে হাটে এসে সওদা পর্যন্ত কিনতে দেওয়া হল না, সেই একবগ্নাটা আবার পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গেল। এখন সে প্রতি মঙ্গলবারে পীরপুরে যায়। হাট করতে। পীরপুরের হাট নন্দখুড়োর এজিয়ারের বাহিরে। সেখানে অর্কফলার আন্দোলন নামঞ্জুর। কারও বামনাই-গিরিই চলে না।

‘অরা হল গে মোছলমান। নেড়ে! নবাব-ছায়েবের সুয়োরানির পুতুর!’

উপায় নেই। সে-কথা খাঁটি। তা ছাড়া সোএগ্রাই গাঁয়ের অলিতে-গলিতে কেমন যেন একটা চাপা বিদ্রোহের লক্ষণ। গ্রামবাসী ইতরভদ্র যেন ফেটে পড়তে চাইছে : ইকী অসৈরণ কথা, মশাই! নিজ গাঁয়ের মানুষ বাবাগো-মাগো করি চিল্লাতেই থাকবে, বিন-চিকিচ্ছেয় মরবে! আর ভিন গাঁর নেড়েগুলো আনন্দে নাচবে?

নন্দ চাটুজ্জ প্রণিধান করতে বাধ্য হলেন : খাঁটি কথাই বলে ‘গেস্লে’ চণক্যপণ্ডিত :

স্বর্গায়ে পূজ্যতে মোড়ল

গাঁয়ে-না-মানা সর্বত্র ড্যাংড্যাঙায়তে!



অবশ্য মা-দুর্গা একেবারে অবিবেচক নন। মহাষ্টমীতে জোড়া-পাঁঠা বলিদানে তৃপ্ত হয়েছেন করুণাময়ী। এবার আঘাত এল ত্রিবেণী থেকে। বজ্রটি নিক্ষেপ করলেন সেই অলোকসামান্য পণ্ডিতটি স্বয়ং। রূপো বাঁড়ছে যে তার আত্মজাকে সহমরণে যেতে দেয়নি এই শাস্ত্রবিরোধী কার্যের জন্য তার কোনও শাস্তিবিধান করেননি পণ্ডিতাগ্রগণ্য। কারণ ছিল। তিনি নিজেই তাঁর কয়েকজন ধনী যজমানকে অনুরূপ নির্দেশ ইতিপূর্বেই দিয়েছেন। তারা তাদের তরুণী-বিগতভর্তা কন্যার সহমরণ নিবারণে সমর্থ হয়েছিল। বেহাইমশাইদের মুণ্ডপাত তাঁর 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি দিতে দিতে তারা ঘরে ফিরেছিল।

কিন্তু এবার? এ কী মর্যাস্তিক অনাচার! আশা করেছিলেন তাঁর শিষ্যটি এতদিনে মোহমুক্ত হয়েছে। সংশোধন করেছে নিজেকে। কিন্তু না। পাকা খবর পেলেন সেই নিকা-নিপীড়িতা নবযুবতী যবনীকে রূপমোহিত রূপেন্দ্র পুনরায় স্বগৃহে এনে তুলেছেন! এবার বিদ্যাদানের অছিলায় নয়। রাত্রিবাস! পুরো একটি সপ্তাহ বামুনের ভিটায় সুন্দরী যবনী! বিপত্নীক রূপমোহিত রূপেন্দ্র আর স্বামীসুখবঞ্চিতা রূপসী : মেহেরুন্নিসা বেগম! অসহ্য!

গুরুদেবের আদেশ তামিল করতে আবার এসে উপস্থিত বৃদ্ধ শীলভদ্র বাচস্পতি।

মালতী আর শ্যামা-মা কাঁদতে কাঁদতে নৌকায় উঠে বসল।

মালতী জানে এবার সত্যিই চিরবিদায়।

তাই ওঁর সংসারে এখন আর সওয়া-তিনজন নয়। মাত্র দুজন। বাপ আর মেয়ে!



মাসকতক পরের কথা।

মহাপূজা আর কোজাগরী অতিক্রান্ত। দীপাবিধি আসন্ন।

ওদের উঠানে কদমগাছটা এ বছরেও ফুলে-ফুলে মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছিল। কণ্টকিত-তনু ফোটা-কদমফুল একে একে ভুলুপ্তি হল। কেউ তার একটিকেও তুলে এনে দিল না তার নববধূর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে। ফোটা-কদমের মরশুম শেষ হল। এল শিউলি ফোটার শুভলগ্ন। দামোদরের ধারে-ধারে অযুত-নিযুত কাশফুল দুলতে থাকে।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

শিউলি-বাঁটার মতো রক্তিম নয় তাদের সীমন্ত—শুভবসনা বিধবার বেশ! দূর থেকে গুনল বড় বাড়ির ঢাকের বাদ্য “টাক-ডুমাডুম-ডুম! এল পূজার ধুম! কাড়ব তোদের ধুম! টাক ডুমাডুম ডুম!”

বালিকা বয়স থেকেই দুর্গাপূজার সময় সকাল-সন্ধ্যা পড়ে থাকত ভাদুড়ীবাড়ির পূজা-দালানে। একেবারে শুরু থেকে শেষ। সেই যখন বুড়ো কুমোরদাদু বাঁশ-কঞ্চির কাঠামোতে খড়ের হাত-পা গড়তেন তখন থেকে। খড়ের কাঠামো শেষ হলে মৃত্তিকার প্রলেপ। কুমোরদাদু যে সেই সময়ে এক নিষিদ্ধপল্লি থেকে এক মুঠি মৃত্তিকা সংগ্রহ করে আনতেন এ গূঢ় বার্তাটা অবশ্য জানতে পারেনি।

প্রলেপের পর প্রলেপ। মায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমে রূপায়িত হতে থাকে। বালিকা জানতে চাইত, ও কুমোরদাদু, মুখচোখ কই গো? মায়ের মুখখানি তো গড়ছ না?

শুভপ্রসন্ন ধমক দিয়ে উঠত। তোর মাথায় গোবর! এটাও জানিস নে? মায়ের মুখখানি তো আলাদা গড়তে হয়। সব শেষে বসবে। তাই না কুমোরদাদু?

সরল বালিকা তার শুভদাকে প্রশ্ন করত, আচ্ছা মানুষের বেলাতেও কি ওইরকম হয়? মায়ের পেটের ভিতর ধড় আর মুণ্ড কি আলাদা-আলাদা গড়ে ওঠে! পরে ভগবান জুড়ে দেন?

শুভ বলত : তুই একটা পাগলি।

হটীও হটার পাত্রী নয়। বলত, আর তুমি একটা গাধা! জান না, তাই বলনা বাপু।

কোথায় হারিয়ে গেল সেই আনন্দমুখর বাল্যকালের দিনগুলো! আজও কুমোরদাদা— না দাদু নয়, দাদা, বুড়ো কুমোরদাদু দেহ রেখেছেন—তাঁর ছেলে এখন ঠাকুর গড়ে। হয়তো নতুন যুগের বালক-বালিকা একইভাবে মাটি চুরি করে পুতুল বানায়। ও জানে না। দেখেনি। এখন তো পূজাবাড়িতে যাওয়াই মানা! সে জাতিচ্যুতা। সে চিতাহুঁস্টা।

বিজয়া-দশমীতেও যায়নি। জ্যাঠা-জ্যাঠিকে প্রণাম করতে। অথবা পুঁটুপিসিকে। তবে ঠাকুর যখন বিসর্জনে চললেন—যোলো-বেহারা কাঁধে চড়ে, ঢাকিরা চলল নাচতে নাচতে ‘ড্যামকুড়াকুড়’ বাদ্য বাজিয়ে, তখন একবার দেখেছিল। জাতিচ্যুতার সদর দরজাটি খুলে। সজল নয়নে।

এখন ও জানে ‘বিসর্জন’ হচ্ছে—‘বি-পূর্বক সৃজ্ ধাতু অনট’!

বিশেষরূপে জন্ম নেওয়া। ধাতুটা ‘সৃজ্’। তাই মন্ত্রটা : ‘পুনরাগমনায় চ’—মা ফিরে আসবেন। নিশ্চিত ফিরে আসবেন। কিন্তু ওর জীবনে আর সেই লালে-লাল সিঁদুর খেলার দিনটি ফিরে আসবে না। জাতিচ্যুতা বলে নয়, সমাজত্যাগী বলেই শুধু নয়—সেই কিশোরটি যে আর কোনদিন ফিরে এসে বলবে না : হাতদুটি পাত রূপা, আমি তোমার অঞ্জলিতে একটি ফোটাকদম উপহার দেব।



তালপাতা কেটে-কেটে ও একটা ফানুসের মতো বানাচ্ছে। একাই। না, ফানুস নয়, পিদিম-আড়াল-করা একটা খাশ-গেলাস। আকাশ-পিদিম। কার্তিক মাস ভ'র সন্ধ্যা সমাগমে তা একটি বংশদণ্ডের উপর বেঁধে জ্বলি দিতে হয়। তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া শেষ হচ্ছে। না হলে বন্দ্যোঘটি পরিবারের পূর্বপুরুষেরা অন্ধকারে কেমন করে খুঁজে পাবেন সোণাই গাঁয়ে তাঁদের ছেঁড়ে-যাওয়া সাতপুরুষের ভিটে? হোক-না তাঁদের শেষ বংশধর জাতিচ্যুত, তবু তাঁরা তো লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। বাপ-বেটিকে আশীর্বাদ করতে।

সমাজচ্যুত বাপবেটির একান্ত পরিবেশ। সোনা-মাও চোখের জলে ভাসতে ভাসতে চলে গেছেন। হটী-দিদির পায়ে-পায়ে ঘুর-ঘুর করত আর একটা ফুটফুটে মেয়ে। সেটাও নেই। কিন্তু তাই বলে কি ওদের ভিটেয় আকাশপ্রদীপ জ্বলবে না? কাল বাদে পরশু আশ্বিনের সংক্রান্তি। তার পরদিন থেকেই আকাশ-পিদিম জ্বালতে হবে।

রান্নাবান্নার হাস্যামা নেই। না, আজ একাদশী নয়। আজ কৃষ্ণ দশমী। সে জন্য নয়। গতকাল রূপেন্দ্রনাথকে একটি দাঁত তুলে ফেলতে হয়েছে। কদিন খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। দাঁতের যন্ত্রণায়। কাল বিকালে জীবন দত্ত এসে দাঁতটা তুলে দিয়ে গেছে। 'একঘরে'র ধোপা-নাগিত বন্ধ। মানলাম। তাই হলে কি তাঁর চিকিৎসাও হবে না? জীবন দত্ত মানে না সে-কথা। না হয় তাকেও ওঁরা একঘরে করে দিক। তাহলে ওরা 'একঘরে' থেকে 'দু ঘরে' উন্নীত হয়ে যাবে।

তাই হটী স্থির করেছে আজ ফেনা-ভাত বানাবে। কাঁচকলা আর কুমড়া সিদ্ধ দিয়ে। ফ্যানসহ গলা-গলা ভাত। বাবামশাই যাতে গিলে-গিলে খেতে পারেন।

রূপেন্দ্রনাথ সকালে শুধু এক পাত্র গরম দুগ্ধ পান করেছেন। কী একটা পুঁথি নিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে সকালবেলা বসেছেন দাওয়ায়। হঠাৎ সদর দরজার সামনে কী-যেন একটা মিলিত কোলাহল! অনেক মানুষ যেন দূর থেকে দৌড়ে আসছে। কে একজন আর্ত-চিৎকার করে উঠল : বাবাঠাউর!

চমকিত হয়ে উঠলেন রূপেন্দ্রনাথ। পুঁথিটি রজ্জুবদ্ধ করে ললাটে স্পর্শ করালেন। উঠে দাঁড়ালেন : কে? কে ডাকে?

ছুটে গেলেন সদরদরজাটা খুলে দেখতে।

ও-প্রান্তে বায়েনপল্লির জনাদেশেক উদাম-গা মানুষ। সঙ্গে একটি অবগুষ্ঠনবতী বিধবা। সবার সমুখে পেলাদ বায়েন। তার দু-হাতে কোলপাঁজা করে একটি মূর্ছিত বালক।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

—কী হয়েছে রে প্রহ্লাদ?

—সর্বোনাশ হইছে বাবাঠাউর। ওপালরে নাগে দংশন করছে।

—‘নাগ’? ‘সাপ’ নয়? কী করে বুঝলি?

—দ্যাখেন কেনে! ওপাল এক্ষেত্রে ন্যাতিয়ে পড়ছে।

তোমাদের অভিধানে যাই লেখা থাক, আমরা এখন যে-কালে আছি তখন ‘অভিধান’ ছিল না। কিন্তু গ্রামবাংলার মৌখিক ভাষায় কিছু শব্দের নির্দিষ্ট গূঢ়ার্থ ছিল। যোগরূঢ় অর্থ। ‘সাপ’ আর ‘নাগ’ ভাষায় সমার্থক নয়। সাপ ‘কামড়ায়’। নাগ কিন্তু ‘দংশন করে’। আনপড় চাষাভুষোরাও তা জানে। কারণ সাপ নির্বিষ। ‘নাগ’ হচ্ছে মা-মনসার পেয়ারের। তারা নির্বিষ হয় না। তাদের দংশনে যমরাজের দুন্দুভি বেজে ওঠে। সর্পকুলে ‘নাগ-বংশ’ কুলীন! শঙ্খচূড়, গোখুর, কেউটিয়া, কালনাগিনী। আর সাপেরা অন্ত্যজ :—হেলে, জলটোড়া।

রূপেন্দ্র লক্ষ্য করে দেখলেন বালকের বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে দুটি দংশন-চিহ্ন। দংশন-চিহ্নেই বোঝা যায় দংশনকারী নির্বিষ ‘সাপ’ নয়, ‘নাগ’! দুটি পাশাপাশি চিহ্ন। দেখেই বুঝলেন এটি বিষধরের দংশন। প্রশ্ন করেন, সাপটা দেখেছিস? মাথায় চত্র ছিল? কৃষ্ণবর্ণের না গৈরিক?

—আপনাই দ্যাখেন দ্যাবতা। মাইরা আনছি।

দলের কে একজন একটা ঝাঁপি খুলে মাটিতে নিক্ষেপ করল একটি মৃত নাগ। হ্যাঁ, বিষধরই! রাত বসে দুর্লভ হলেও কচিং তার দেখা মেলে। গোখুর বা কেউটিয়া নয় : বন্ধরাজ!

বলেন, গোপালকে দাওয়ায় শুইয়ে দে। ওর বাপ কোন্ জন?

পেল্লাদ ললাটে করাঘাত করে বলে, হায়রে আমার রূপাল। অ্যারে চিনলেন না ঠাউর? ওপাল, ওপাল! ওই তো তার মা! যারে আপনে বাঁচাইছিলেন। বেষ্টা বায়েনের বেধবা! যমুনা।

রূপমঞ্জরী ইতিমধ্যে এক ঘটি জল এনে অচৈতন্য বালকটির ক্ষতস্থান ধৌত করে দিয়েছে। সে জানে বাবামশায়ের বিচিত্র চিকিৎসা পদ্ধতি! তিনি মুখে শুষে নেন বিষটা—থু-থু করে ফেলে দেন। সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ভাবে মা-মনসার ভরে ভেষগাচার্য এই গুপ্ত বিদ্যাটি আয়ত্ত করেছেন। আসলে তা মোটেই নয়। রূপেন্দ্রনাথ হট্টকে বুঝিয়ে দিয়েছেন—মুখে বিষ টেনে নিলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। এমনকি কিছুটা পেটে গেলেও নয়, যদি না খাদ্যনালি বা পাকস্থলীতে কোনও ক্ষত থাকে। নাগের বিষ যতক্ষণ না দেহের রক্তচলাচল ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করতে পারছে, ততক্ষণ চিকিৎসক নিরাপদ।

রূপেন্দ্রনাথ বালকটিকে চিনতে পেরেছেন। বেষ্টা বায়েনের ছেলে। বেষ্টা বায়েন সেই শহিদ। যে তালগাছের মাথায় শিঙেঁ ফুকে একদিন গ্রামকে রক্ষা করেছিল। গুলিবদ্ধ হয়েছিল। আর তার স্ত্রী ওই যমুনাকে চিতাহুষ্ঠা করে বাঁচিয়েছিলেন আর একদিন—সমস্ত গ্রামের বিরুদ্ধে একা সংগ্রাম করে।

রূপেন্দ্রনাথ বালকটির বাম পদ উঠিয়ে নিলেন। নিচু হয়ে ক্ষতস্থানে অধরোষ্ঠ স্পর্শ করালেন। রক্তচোষা রাক্ষসের মতো অনেকটা রক্ত মুখে তুলে নিয়ে থু-থু করে ফেলে দিলেন। একবার, দুবার, তিনবার। তারপর ঘটি থেকে মুখে জল নিয়ে দু-তিনবার কুলকুচি করে মুখটা ধুয়ে ফেললেন।

সোজা হয়ে বসে বলেন, ওর পায়ে বন্ধনীটা কে বেঁধে দিয়েছে?

বালকের বাম-ওল্ কে ও জানুতে দুটি বস্ত্রখণ্ড দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন মধ্যবয়সী অগ্রসর হয়ে এসে বলে, আজ্ঞে আমি, বাবাঠাউর। মহাদেব গুনি। আপনার ছিচরণের দাস বটি।

—বড় সুন্দরভাবে বেঁধেছ গুনি। এ বিদ্যা কোথায় শিখলে?

মহাদেব সলজ্জে হেসে বললে, আপনার মনে নাই দ্যাবতা? আপনার ঠেঞে।

ওঁর স্মরণ হল না। পঞ্চগ্রামে যখন যেখানে গেছেন ‘নাগগুনি’দের ডেকে ডেকে এ বিদ্যা শিখিয়েছেন। ‘বন্ধনদান বিদ্যা’। বলতেন, তোরা তোদের বাপপিতামোর আদেশে সব কিছু করিস, আমি আপত্তি করব না। মস্ত্রপড়া, চাল-পর্য, ধূপ-ধুনো যা তোদের মন চায়। কিন্তু এই কথাটি ভুলিসনে, বাবাসকল। নাগ দংশনে সবার আগে চাই ‘বন্ধন’!

ওরা প্রশ্ন করত, ক্যান দ্যাবতা? কিয়েল্লোগে?

অম্লানবদনে মিথ্যাভাষণ করতেন : মা-মনসা আমাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন! উনি জানেন, উপলব্ধি করেন, ওভাবেই ওই অশিক্ষিত আনুড় গুনিগুলোকে স্বমতে আনা সম্ভব। ‘মিথ্যা’ যেখানে মঙ্গলের দিশারী, জনহিতকারী, সেখানে তা সত্যের চেয়েও সত্য!

ছেলেটির নাড়ির গতি পরীক্ষা করে বললেন, মহাদেব, এবার ওই বাঁধনদুটো অল্প-অল্প করে আলগা করে দে। দীর্ঘসময় রক্তচলাচল বন্ধ থাকলে পা-টা জন্মের মতো অসাড় হয়ে যাবে!

—আপনিই তা করেন দ্যাবতা!

—না। তুই করবি। আমি দেখিয়ে দেব। শিখিয়ে দেব। আয়।

বন্ধন আলগা হলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আর ভয়ের কিছু নাই। ও প্রাণে বেঁচে গেল। তোমরা যে যার বাড়ি ফিরে যাও। শুধু যমুনা আর প্রহ্লাদ থাকবে। গোপালের সম্বন্ধে আশঙ্কার আর কিছু নাই।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলে বসে, অর নাম ‘গোপাল’ নয় দ্যাবতা। ‘গুপাল’।

রূপেন্দ্রনাথ হাসলেন। বললেন, তোমাকে চিনেছি। তোমার নাম যেমন নবীন নয়, নবা নয়, লবা! তাই তো?

—আইনজ্ঞ হ!

রূপেন্দ্র হটীর দিকে বললেন, একে চিনে রাখ মা। এ হচ্ছে সোঞাই-গাঁয়ের দু-নম্বর একবগ্গা।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

নবা মুখ নিচু করে হাসে। বায়েনপল্লির সবাই একে একে ফিরে যায়। রইল শুধু প্রহ্লাদ আর যমুনা। রূপেন্দ্রনাথ মামণিকে বললেন, ওদের দুজনের জন্যেও হাঁড়িতে দুটি চাল নিস। ভয় নেইরে। ওদের জাতই নেই তা জাতিচ্যুত হবে কেমন করে?

একগাল হেসে পেন্নাদ বলে, আইডা বড় ন্যায্য কতা বলিছেন দ্যাবতা। যার মাতা নাই তার আবার কিসের মাতাব্যাতা?

যমুনা তার ছেলের মাথাটি কোলে তুলে নিয়েছে। গোপালের এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি। পেন্নাদ একটু ওদিক বাগে গেল। নলচের আড়াল দিয়ে টুক্ বিড়ি ফুকতে।

রূপেন্দ্রনাথ পাতকুরো-তলার দিকে এগিয়ে গেলেন। নিষ্ঠিবন ত্যাগ করে একটু চম্কে ওঠেন। কী অশ্চর্য। এখনও সেটা লাল! ঘটি থেকে জল নিয়ে বার কতক মুখ-প্রক্ষালন করলেন। জকুধন হল তাঁর। এ কী! জলের রক্তিমতা বিদূরিত হচ্ছে না কেন? বারে বারে মুখ প্রক্ষালনের পরেও?

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো একটা চিন্তা জাগল মনে। তাই কি? স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দক্ষিণহস্তের তজনি প্রবেশ করিয়ে দিলেন নিজের মুখ-বিবরে। অনুভব করলেন উৎপাটিত দেওর মূল গহ্বরটা। আবার চমকিত হয়ে ওঠেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো। তারপর ধীর পদক্ষেপে ফিরে আসতে থাকেন দাওয়ার দিকে। হঠাৎ টলে উঠল মাথার ভিতর। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালটা ধরলেন। শৈশবের সেই হাঁটি-হাঁটি-পা-পা-ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে থাকেন দাওয়ার দিকে।

চাল ধুয়ে হাঁড়িটা নিয়ে রূপমঞ্জরী এগিয়ে আসছিল রামাঘরের দিকে। হঠাৎ নজর হল তার। হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এসে চেপে ধরল ওঁর বাহুমূল। বললে, কী? কী হয়েছে বাবা?

—মাথাটা হঠাৎ কেমন টলে উঠল রে!

—টলে উঠল? কেন? শরীরটা কি খারাপ লাগছে?

উত্তর দিলেন না। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বসলেন দাওয়ায়। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে।

—বালিশটা এনে দেব? শোবেন?

—না! শয়ন নিষিদ্ধ। বসেই থাকব।

—জীবনদাকে খবর পাঠাব?

—হ্যাঁ। জীবন, শিবনাথ আর শোভাকে।

—ওরা কী করবে?

—দরকার আছে। তুই এখানে বস দেখি। আনার পাশে।

রূপমঞ্জরী সে-কথায় প্রথমে কান দিল না। চিৎকার করে ডাকল প্রহ্লাদকে। সে দৌড়ে এল। তাকে আদেশ করল জীবন আর শিবনাথকে ডেকে আনতে। খুব জরুরি দরকার। তারপর বসে গড়ল বাবার কোল ঘেঁষে। বলে, কী হল বলুন তো হঠাৎ? দেখি, আপনার নাড়িটা?

লক্ষ্য হল রূপেন্দ্রনাথ নিজেই নিজের নাড়ির গতি লক্ষ্য করছেন।

—রক্তচাপের বৃদ্ধি?

নাড়ি দেখা শেষ হয়েছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। হঠাৎ কী যে হল—প্রচণ্ড ভাবাবেগে সবলে জড়িয়ে ধরলেন মামণিকে।

—বাবা! বাবা! কী হয়েছে বলুন?

দুহাতে আতঙ্কতাজিত কন্যার মুখটি তুলে ধরে তার গুস্ত সিঁথিমূলে ঐকে দিলেন এক নিবিড় চুম্বনচিহ্ন।

রূপমঞ্জরী স্তম্ভিতা। এমন উচ্ছ্বাস, এমন আবেগ সে তো কখনও দেখেনি। দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ। তাহলে এই বীধভাঙা দুরন্ত আবেগের কী অর্থ? বাবার বুকে লুকানো মুখটা তুলে আবার একই প্রশ্ন করে, বলুন, কী হয়েছে আপনার? ঔষধের পুলিন্দাটা কি এনে দেব?

এবার মামণিকে আলিঙ্গনমুক্ত করে ছিঁর হয়ে বসলেন তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে—সমংকায়শিরোগ্রীব। অনুভূজিত কণ্ঠে বললেন, না রে মা! এ রোগের কোনও চিকিৎসা আয়ুর্বেদশাস্ত্র জানে না!

—মানে? কী রোগ? কী হয়েছে আপনার?

—আমি একটা নিদারুণ ভুল করে বসেছি মা! কালাত্মক-ভ্রান্তি! তার ক্ষমা নাই! আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম যে আমার মুখবিবরে একটি ক্ষতচিহ্ন আছে। বন্ধরাজের কিছুটা বিষ আমার ধমনিতে প্রবেশ করেছে! এ ভ্রান্তির কোনও মার্জনা নাই।

জীবনে কখনও যা করেনি, করে-না—বজ্রাঘাতে সৌম্যসুন্দরের মৃত্যু সংবাদ-শ্রবণেও যা করেনি আজ তাই করে বসল : একটা জান্তব আর্তচিৎকার। গগন বিদীর্ণ করে। সবলে জড়িয়ে ধরল পিতাকে।

ছুটে এসে প্রহ্লাদ, যমুনা আর জীবন দত্ত।

শান্তস্বরে উনি শিষ্যকে বললেন, আমার একটি মারাত্মক ভ্রম হয়ে গেল, বাবা! তুমি আমার ক্ষতস্থানে যে কার্পাসখণ্ডটি গুঁজে দিয়েছিলে সেটি অতর্কিতে কখন পড়ে গেছে! আমার খেয়াল হয় নাই। বন্ধরাজের বিষ প্রবেশ করেছে আমার ধমনিতে!

প্রহ্লাদের কাছে জীবন ইতিপূর্বে শুনেছে সব কথা। বুকেছে! সে জানে—এ ভ্রান্তির ক্ষমা নাই। আলিঙ্গনাবদ্ধ মামণিকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে বলে, কিন্তু সেবার তো নকড়ি ঘোষালকে আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন?

এতক্ষণে উনি সংযত। সংহত। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় ব্যাখ্যা দিলেন : সেবার নাগটা বন্ধরাজ ছিল না। তাহাড়া সেবার বাঁধন দেওয়া গিয়েছিল। এবার যে শিরে সর্পাঘাত হয়েছে জীবন! কোথায় বাঁধবে তাগা?

উত্তেজিত জীবন স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল। গুরুদেবের বাহুমূল চেপে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে জানতে চায়, বন্ধরাজ বিষের কোনও প্রতিষেধক নাই শাস্ত্রে?

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

জ্ঞান হেসে রূপেন্দ্র বললেন,

অমোঘা পশ্চিমে মেঘাঃ*

অমোঘা উত্তরে বিদ্যুৎ।

অমোঘা শ্রীনাগচতুষ্টয়ঃ**

অমোঘা ব্রাহ্মণাশীষঃ।।

—আমরা... আমরা এখন কী করব?

—প্রতীক্ষা। আমার শরীরের অভ্যন্তরে একটা দ্বৈরথ-সংগ্রাম চলছে। এক পক্ষে বঙ্করাজের বিষ, অপরপক্ষে আমার জীবনীশক্তি। কে জয়ী হবে বলা অসম্ভব। তবে বঙ্করাজের বিষের অতি সামান্য অংশই আমার ধমনিতে প্রবেশ করেছে। আমার দেহও যোগাভ্যাসে প্রতিরোধে প্রস্তুত। তাই এখন কিছু বলা যায় না। তদভিন্ন মস্তকের শেষ পংক্তিটাও তো বিচার্য! সপ্তপুরুষের আশীর্বাদ আমার পক্ষে। এখন দেখা যাক কে জয়ী হয়!



ইতিমধ্যে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সারা গাঁয়ে। ছোট্ট গ্রাম। এতবড় দুঃসংবাদ প্রচারিত হতে একদণ্ডও লাগেনি। বঙ্করাজের বিষে আহত হতভাগ্যের প্রহরাস্তর হয় না। অর্থাৎ তিনঘটিকার ভিতরেই তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্করাজের বিষের অতি সামান্য অংশই প্রবেশ করেছে ওঁর রক্তবাহী শিরা-ধমনিতে। দুপক্ষের জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা সমান-সমান!

* পশ্চিমে মেঘ সঞ্চার এবং উত্তরে বিদ্যুৎ অনিবার্যভাবে বর্ষণের সঙ্কেতবাহী। নাগচতুষ্টয়ের দংশন যেমন অব্যর্থ মৃত্যুর সঙ্কেতবাহী। সদব্রাহ্মণের আন্তরিক আশীর্বাদ যেরূপ অব্যর্থ।

** নাগচতুষ্টয়ের পরিচয় : (১) শঙ্খচূড় : King Cobra (*Hamadryad ephiphagous*)

(২) গোখুর (কেউটে) : Cobra (*Naja naja*)

(৩) চন্দ্রবোড়া : Russell's Viper (*Vipra russelli*)

(৪) বঙ্করাজ : Saw-scaled Viper (*Echis carinatus*)

আপাত-অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করি এই নাগচতুষ্টয়ের তিন-চতুর্থাংশের তীব্র বিষের প্রতিষেধক ভারতে সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন মুম্বাইয়ের Haffkine Research Institute। এখন ভারতে একমাত্র শঙ্খচূড়ের দংশন বজ্রাঘাতের মতো অমোঘ। সাম্প্রতিক তথ্য, শঙ্খচূড়ের প্রতিষেধকও আবিষ্কৃত হয়েছে থাইল্যান্ডে। ভারতে তা আজও অলভ্য।

বাড়ির বাহরে গোটা গ্রাম সমবেত। ভিতরে বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা। জাতিচ্যুতের এই প্রচণ্ড দুঃসংবাদে সামাজিক বাধা কেউই মানেনি। এসেছে সবাই।

শিরোমণি জীবনকে একটা ধমক দেন, ওঁকে অমন খাড়া করে বসিয়ে রেখেছ কেন? একটা মাদুর-বালিশ আনার কথাও কারও খেয়াল হয়নি?

জীবন এতই মর্মান্বিত, এতই অসহায় বোধ করছে যে, জবাব দেয় না।

রূপেন্দ্র মাঝে-মাঝে নির্মীলিত নেত্র হচ্ছেন বটে, প্রচণ্ড নিদ্রাবিবেগে টলে-টলেও পড়ছেন; কিন্তু এখন তিনি অনেকটা সুস্থ। সজ্ঞানে আছেন। বললেন, না, শিরোমণি-খুড়ো। শয়ন এ অবস্থায় নিষিদ্ধ। তাতে বিষ মস্তিষ্কে প্রবেশের সুযোগ পায়। তাই উপবিষ্ট অবস্থায় পরিণতির প্রতীক্ষা করছি।

নন্দ বলেন, দোষটা বাপু তোমারই। তুমি কলীন বামুন! রক্তচোষা বাদুড়ের মতো বায়েন-পোর রক্ত চুষে নিতে সঙ্কোচ হল না তোমার?

রূপেন্দ্র বলেন, তাতেই ও বেঁচে গেছে কিন্তু। ছেলেটিকে চিনতে পেরেছেন তো? বেঁটাবায়েনের পুত্র। ওই তো দাড়িয়ে আছে ওর মা—যাকে সহমরণের চিতা থেকে উঠিয়ে আনা সম্ভবপর হয়েছিল।

রূপেন্দ্র ভাববাচ্যে বলেছেন। তবু নন্দের মনে হল এই ঘোষণার পশ্চাতে কিছু শ্লেষ আছে। স্মরণ হল সেদিনের পরাজয়ের কথা। গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে একলা সংগ্রাম করে রূপেন্দ্র যমুনাকে চিতাভ্রষ্টা করতে পেরেছিলেন। এটা তির্যকপাথে ওঁকে অপমানই করা হল।

তাই ফিরিয়ে দিলেন শ্লেষাত্মক জবাব : তবে তো তুমি ওর দু-দুবার বাপ হয়ে গেলে, রূপেন্দ্র! দু-বার জন্ম দিলে যমুনার সন্তানটির। শুধু বাপ নয় এক্ষেত্রে বাপ-বাপ!

জীবনের আর সহ্য হল না। বলে, তা যা বলেছেন দাদু! একবার যে বিয়ে করে তাকে বলি বর; বার বার যে মাথায় টোপর চড়ায় তাকে বলি বর্বর!

কর্ণমূল রাজ্য হয়ে উঠল নন্দখুড়োর। তাঁর তিনটি সহধর্মিণী।

রূপেন্দ্রনাথ শুনতে পাননি। তাঁর প্রচণ্ড নিদ্রাবিবেগ এসেছে। ঘুমে টলে টলে পড়ছেন। পাশেই বসে ছিল শোভারানি। তাকে বললেন, তোর কোলে মাথা রেখে আমি একটু শোব রে? শোভা?

শোভা শিউরে ওঠে! ওর রাজপুত্র এমন কথা কোনওদিন বলেননি! ওর কোলে মাথা রেখে শয়নের এই আশাতীত অদ্ভুত প্রস্তাব। দাঁতে-দাঁত দিয়ে বললে, না রূপোদা! তোমার শোওয়া বারণ! তুমি নিজেই বলেছ। তুমি বসেই থাক। আমি বরণ তোমাকে ধরে রাখছি।

সর্বসমক্ষে সন্ত্রস্ত বাঁচিয়ে সে তার রূপোদার দুটি বাহমূল ধরে খাড়া করে বসিয়ে রাখল। এভাবে সে কখনও আলিঙ্গনাবদ্ধ করেনি ওই আশুপবরণ ছেলেটিকে। যার

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

সঙ্গে বালিকা বয়সে তার নাকি একটা বিবাহ-প্রস্তাব উঠেছিল। তার নিমীলিত দু-চোখে জলের ধারা।

যমুনা তার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে-আসা সন্তানটিকে আঁকড়ে নিশ্চুপ বসে আছে। এতক্ষণে গোপালের জ্ঞান হয়েছে। রূপমঞ্জরী অহেতুক ঘর-বার করছে।



অপরাত্নবেলায় শেষ হল দ্বৈরথ সমর। বঙ্করাজ বিজয়ী। পরাজিত করেছে কবিরাজের জীবনীশক্তিকে। জীবন ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল ওঁর মণিবন্ধ। তাতে আর স্পন্দিত হচ্ছে না প্রাণশক্তির প্রতিরোধী দুন্দুভি। শোভারানি ভেঙে পড়ল কান্নায়। চোখে আঁচল চাপা দিলেন তারাসুন্দরী। আর রূপমঞ্জরী? না, সে লুটিয়েও পড়ল না, মুর্ছিতাও হল না। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল শূন্যে দৃষ্টি মেলে। প্রস্তর প্রতিমা।

একে-একে সবাই বাইরে বেরিয়ে গেলেন। পুরনারীদের এখন অক্ষপাতে শান্ত হতে দিতে হয়। সেটাই প্রথা। তারপর করতে হবে সংস্কারের আয়োজন।

ক্রমে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম শেষ হবার পরেও কিছু কৃত্য থাকে। আবার সবাই একে একে ফিরে এলেন প্রাঙ্গণে। এল ফুল। মহাশবকে পরিষে দেওয়া হল গাঁদাফুলের মালা। শোভারানি যত্ন করে রূপোদার কপালে-গালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিল—সেই একদিন তার বিবাহ-রাত্রি যেমন এঁকে দিয়েছিলেন তাঁর বিমাতা—মুন্সায়ী। তারাসুন্দরী দেবরের আঁখি-পল্লব দুটি নিমীলিত করে তার উপর স্থাপন করলেন দুটি চন্দনচর্চিত তুলসীপত্র।

শুধু আমাদের ত্রয়োদশবর্ষীয়া নায়িকার কোনও পরিবর্তন নেই। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সে শুধু দূর-দিগন্তে দৃষ্টি মেলে একইভাবে বসে আছে। নির্বাক, নিষ্পন্দ। কী জানি, হয় তো এতক্ষণ সে দেখছিল পশ্চিমাকাশের রক্তরাঙা পটভূমিতে সেই নিঃসঙ্গ চক্রাবর্তনরত সূর্যসাক্ষী চিলটাকে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর সেটাও হারিয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল সন্ধ্যাতারা।

নন্দ—যাঁকে তির্যক রসিকতায় ওই দুর্বিনীত ছোকরাটা ‘বর্বর’ বলেছিল—তিনি জীবনের দিকে ফিরে বললেন, খাটিয়া তো জোগাড় করে এনেছ বাবাজি, কিন্তু শববাহী পাবে কোথায়?

জীবনের চোখ দুটি রাঙা। বলে, কেন? গাঁয়ে কি বামুনের অভাব?

—তা নয়, কিন্তু রূপোনের ‘প্রাচিন্দির’ তো হয় নাই, বাবা! জাতিচ্যুতকে বহন করার মতো বামুন তো তুমি খুঁজে পাবে না সোএই গাঁয়ে। তাইলে যে তাকেও জাতিচ্যুত হয়ে যেতে হবে।

তারাপ্রসন্ন প্রতিবাদ করে ওঠেন, এটা কী বলছেন আপনি! মৃত্যুতীর্থে যে পৌছে গেছে তার আবার জাত কী?

চাদরের প্রান্তে অশ্রুহীন চোখ দুটি মুছে নিয়ে নন্দ বললেন, বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তারা! কিন্তু শাস্ত্রের বিধান যে সেইরকমই। চিরটাকাল এই নিয়মই চলে এসেছে গ্রাম্য সমাজে! ‘প্রাচিন্দির’ না হলে জাতিচ্যুতের শ্রমশানযাত্রী কেউ হতে পারে না।

সমবেত জনতার মধ্যে জাগল এক গুঞ্জনধ্বনি। পীতাম্বর কাতরকণ্ঠে বলে ওঠেন, তাহলে কীভাবে হবে ওঁর সংকার? একটা কিছু করতে তো হবে?

—তাই তো ভাবছি! তুমি কী বল শিরোমণিভায়া?

শিরোমণি তাঁর অর্কফলাসমেত মাথাটি নেড়ে বললেন, কঠিন সমস্যা!

জীবন রুখে ওঠে : আপনাদের বিধান দিতে হবে না। আমরা দুভাই ওঁকে বহন করে নিয়ে যেতে পারব।

—দু ভাই! তাহলে খাটিয়ায় তো নেওয়া যাবে না, বাবা! মাদুরে জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে নে-যেতে হবে! তা শিবনাথও কি রাজি আছে জাত দিতে?

শিবনাথ চিৎকার করে ওঠে, আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবামশাইও রাজি হবেন। আমরা একুনে তিনজন। আপনি না হয় আমাদের গোটা পরিবারটাকেই ‘একঘরে’ করে দেবেন!

—বটে! আর চতুর্থ বাহকটি কে?

—হামি কাঁধ লগাবে বামুনমশা! ম্যয় সন্ন্যাসী হঁ। হমার কুনো জাত না আছে। সম্বলেন?

একমুঠিবাবা! নিদারুণ দুঃসংবাদটি শুনে সে বৃদ্ধও এসে দাঁড়িয়েছে জনারণ্যের একান্তে।

জীবন বলে ওঠে, তবে আর একটা কথাও জেনে রাখুন চাটুজে-দাদু! আরোগ্য-নিকেতনে এখনও কিছু রোগী মরতে বাকি। তাদের দায়িত্ব কিন্তু আপনার! সমাজপতি হিসাবে। আমি কাল থেকে পীরপুরে যাব। এ গাঁয়ে কারও চিকিৎসা করব না।

নন্দ গুম্ খেয়ে গেলেন। শিরোমণি বলেন, এটা তো তোমার অন্যায় কথা হল, জীবন। আমাদের উপর রাগ করে তুমি....

জীবন তাঁকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, ও আলোচনাটা কালকেও হতে পারে শিরোমণি-জ্যাঠা! আগে পঞ্চায়েত আমাদের একঘরে করুক! ততক্ষণে শ্রমশানের কৃত্যটা আমরা সেরে আসি বরং।

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

নন্দ বলেন, কিন্তু কোন্ চিতায় ওঁকে পোড়াবে, বাবা?

—‘কোন্ চিতায়’ মানে?

—তুমি গাঁয়ের ছেলে হয়ে জান না, শ্মশানে তিনটি এলাকা আছে? বামুন, কায়েত আর জল-অচলদের? মৃতের শরীরে এখন যে রক্ত তাতে তো বায়েনের রক্ত মিশে গেছে। মৃত্যুর পূর্বেই সে নিজমুখে তা স্বীকার করে গেছে। যায়নি?

এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল রূপমঞ্জরী। অনবগুপ্তিতা সদ্যপিতৃহারা একফোঁটা মেয়েটা। যুক্ত করে এগিয়ে এসে বললে, আপনারা এবার আসুন! আমরা ওঁকে ওই অচ্ছুতদের শ্মশানেই দাহ করব! আপনাদের দুশ্চিন্তার কেনও কারণ নেই!

—তুমি আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ হটা?

—না! কিন্তু এ ভিটে তো অপবিত্র! জাতিচ্যুতের ভদ্রাসন! আপনারা এবার আসুন!

তারপর তারাপ্রসন্নের দিকে ফিরে বললে, জোড় হস্তে অনুনয় করছি জেঠু! আমাকে আপনারা এবার রেহাই দিন!

নন্দ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তারাপ্রসন্ন প্রায় ধমক দিয়ে রুখে দিলেন, না! আর কোনও কথা নয়। আসুন, আমরা স্থানত্যাগ করি! নামগি সহ্যের শেষ সীমাত্তে পৌঁছে গেছে!

নতমস্তকে সমাজপতিরা একে একে বিদায় হলেন। তারাপ্রসন্ন কিন্তু স্থানত্যাগ করলেন না। বললেন, মামগি, আমি যদি শ্মশানযাত্রী হতে চাই, তোর আপত্তি আছে?

এতক্ষণে কন্মায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা। জড়িয়ে ধরল তার জ্যাঠামণিকে। যাঁর কোলেপিঠে ওর বাল্যকাল কেটেছে! বালিকা থেকে তরুণী হয়েছে।



দামোদরের তীরে। সোণাই গ্রামের শ্মশানঘাট। লোকে লোকারণ্য। সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে তাদের অতি প্রিয় একবগ্না-ঠাকুরকে শেষ বিদায় জানাতে। সমাজপতিদের ভিতর উপস্থিত আছেন একমাত্র একজন : ভূস্বামী তারাপ্রসন্ন।

পরলোকগতের একমাত্র কন্য়ার ইচ্ছানুসারে মহাশব বহন করে এনেছে জল-অচল অচ্ছুতেরাই। তারাই তো ওঁর শ্মশানবন্ধু হবার অধিকারী। তাদের সেবাই তো তিনি

করে গেছেন সারাটা জীবন। মহাশবের ধ্মনিতোও থমকে থেমে আছে বায়েনের রক্তকণিকা। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মিলিত জমাট-বাঁধা শোণিত।

কন্যা হিসাবে যা কিছু কৃত্য তা সম্পন্ন করে গেল নিরুচ্ছ্বসিত নিষ্ঠায়। মুখাগ্নিও করল। চোখে তার জল নেই। রাত এখন একপ্রহর। চিতায় অগ্নিস্পর্শ করল স্বহস্তে। না, চন্দন কাঠ জোটেনি। তাতে যে অনেক খরচ। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। অচ্ছুতদের উপেক্ষিত একান্ত-শ্মশানে।

যুক্তকরে দণ্ডায়মানা দুচোখ মেলে দেখল। অস্ফুটে উচ্চারণ করল শেষ মন্ত্র “বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধ্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্”।*



গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে অয়োদধৌম্যের সাধক-শিষ্য আরুণি যাত্রা করেছিলেন অসাধ্য সাধনে। দুর্বার বন্যাস্রোত থেকে সুজলা-সুফলা মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে। প্রচণ্ড প্লাবনে যখন মৃত্তিকাবন্ধনী বিচূর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি ভগ্নস্থানে অকুতোভয়ে স্থাপন করেছিলেন নিজের শরীর! গুরুর আশীর্বাদে তাঁকে প্রাণদান করতে হয়নি। জীবিত প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আশ্রমে।

‘কেদারখণ্ড বিদারণপূর্বক উত্থান-হেতু’ গুরুদেব তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন নূতন উপাধিতে, নূতন সংজ্ঞায়। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন : ঋষি উদ্দালক!

উদ্দালক সিদ্ধকাম। তিনি সার্থক।

কোনও অলক্ষ্য গুরুর অন্তর্লীন আদেশে রূপেন্দ্রনাথও ছুটে গিয়েছিলেন বন্যারোধের ব্রত গ্রহণ করে। কুসংস্কারের প্রচণ্ড প্লাবনে যখন শুভবুদ্ধির প্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে গেল তখন তিনিও ভগ্নস্থানে স্থাপন করেছিলেন তাঁর শরীর। দুর্ভাগ্য তাঁর। জীবিত প্রত্যাবর্তন করতে পারেননি। পারেননি সেই অষ্টাদশ শতাব্দিতে সুজলা-সুফলা জন্মভূমিকে রক্ষা করতে।

রূপেন্দ্রনাথ ব্যর্থকাম। তিনি নিরর্থক!

* অনুমতি দাও : তোমার শ্মশানবন্ধুরা এবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। এখন থেকে তোমার সাথী, তোমার সঙ্গী : একমাত্র তোমার ধর্ম!

রূপমঞ্জরীর বৈধব্য

ভুল লিখলাম না তো? ‘সিদ্ধকাম’ হওয়াই কি পরমার্থ? দুনিয়ার অযুত-নিযুত ব্যর্থকাম শহিদের জীবন কি নিরর্থক? রূপেন্দ্রনাথের সাধনা যে ছিল ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত! শুধু কমেই ছিল তাঁর অধিকার! ‘সিদ্ধকাম’ আর ‘ব্যর্থকাম’ জীবনদ্বয় তাঁর অদ্বৈতদর্শনে নিরর্থক!

তাই তাঁকে স্বাগত জানাতে অগ্নিদেবের লেলিহান শিখায় তাঁর সেই অলক্ষ্য গুরুদেব পাঠিয়ে দিয়েছেন শিষ্যের জন্য বিজয়রথ!

হিরণ্যগর্ভ সেই অন্তরীক্ষবাসী গুরুর সঙ্গে মিলন হল তার একনিষ্ঠ সেবকের।







কাশীযাত্রা

1769

চতুর্দশ পর্ব

1769 খ্রিস্টাব্দ। সহস্রাব্দের ইতিহাসে এই বৎসরটি সুপরিচিত। কেন বুঝলে না? বাংলা সালটা উল্লেখ করলেই ধরতে পারবে। সেটা ১১৭৬ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ ভয়ঙ্করী 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর সর্বনাশা কাল। মৃত্যুচিহ্নিত বৎসর। পুরাতন নথিপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেছি—কিন্তু এই

মহামন্বন্তরের তথ্যনির্ভর কোনো ইতিহাস সংগ্রহ করতে পারিনি। কিছু পেয়েছি বন্ধিম-পথে। কিন্তু তা উপন্যাসের উপাদান মাত্র।

তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তো মান্বাতার বাপের আমলের কথা। বুড়ো ইতিহাস সেসব কথা ভুলে যেতেই পারে। আমাদের যৌবনকালে স্বচক্ষে দেখা পঞ্চাশের মন্বন্তরেরই কিছু জানতে পেরেছি? কী করে সেটা হল Man-made Famine? পাইনি। সমকালীন কথাসাহিত্যিকেরা কিছুটা ঔপন্যাসিক সত্য জানিয়েছেন, কিছুটা ধরা আছে চিত্রশিল্পীদের ক্যানভাসে—জয়নাল আবেদিন, পূর্ণ চক্রবর্তী, খালেদ চৌধুরী, গোপাল ঘোষ। নন্দলাল আঁকলেন : 'অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কান্দে অন্নের তরে/এ বড় মায়ার পরমাদ।' এ সর্বনাশের সামগ্রিক ঐতিহাসিক গবেষক কেউ এগিয়ে আসেননি।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালে রূপমঞ্জরী প্রায় পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। পিতৃবিদায়কালে সে ছিল চতুর্দশী। ফলে এর মাঝখানে একযুগ অতিক্রান্ত। এই পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সেই রূপমঞ্জরী স্বগ্রাম ত্যাগ করে কাশীধামে চলে যান। বাকি জীবনে গৌড়বঙ্গে আর ফিরে আসার সুযোগ পাননি। ফলে এই দ্বাদশ বৎসরের একটি চুম্বকসার এখানে দাখিল করা দরকার।

দামোদরের ধারে চণ্ডাল-শ্মশানে পিতৃদেবের দেহ ভস্মীভূত হল। চিতা যখন নির্বাপিত হল তখন রোহিণী নক্ষত্র মহাকাশের ঋ-বিন্দুতে। সূর্য যেহেতু এখন তুলারাশিতে তাই বলা যায় এখন মধ্যরাত্রি।

বড় উত্তাপ, বড় জ্বালা, বড় দহন! দীর্ঘদিন তা সহ্য করে এসেছেন। ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের সারাটা জীবন ধরে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারত-গরুড়ের দু-দুটি পক্ষ : নারীসমাজ আর জল-অচল জাত। এ দুটি পক্ষ শান্তন করলে এই মহাবিহঙ্গ কোনোদিনই মহাকাশে উড়তে পারবে না। কেউ সে কথায় কর্ণপাত করেনি। এতদিনে সে-জ্বালা মিটল। কলসিতে করে ঘড়া-ঘড়া জল এনে ওই জল-অচল প্রিয়বন্ধুরা তাদের অতিপ্রিয় মানুষটার প্রতি বন্ধুকৃত্য করল। ভীমা বাগদি নেই। মরেছে। ওই সমাজপতিদের নেপথ্য ন্যাকারজনক পন্থায়। না হলে সে হয়তো চিতার উপর আছাড় খেয়ে বলত : ‘বাবা ঠাউর! তুমি চলি গেলে মোরা ডাঁড়াব কুথা?’

দামোদরে ডুবে মরেছে তার ভাইপোটাও : দীর্ঘশ্বাস! আর্জান-সর্দার!

একটি বটপত্রের ঠোঙায় রূপেন্দ্রের উত্তপ্ত অস্থিটুকু নিয়ে এগিয়ে এল শ্মশানচণ্ডাল। রূপমঞ্জরীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, ‘এইডে দামোদরে দে-আয়, মা! বাবাঠাউর শান্ত হবেনে!’

অঞ্জলিবদ্ধ হাতটি প্রসারিত করে এগিয়ে এল ঘাটের দিকে। জলে নিক্ষেপ করল না কিন্তু। এগিয়েই গেল ক্রমাগত। ধীরে ধীরে দামোদরের গর্ভে। তিন ডুব দিয়ে ফিরে এল যখন, তখন তার মুষ্টিতে বটপত্রটি নেই।

ডাঙায় উঠেই হঠাৎ সচেতন হল। বিকচিৎ হল ওর স্বভাবজাত নারীসত্তা। খেয়াল হল, সে একবস্ত্রা এবং সিদ্ধবসনা। ঘাটে তখনো সারা গ্রাম অপেক্ষা করছে। সকলেরই দৃষ্টি ওর দিকে।

হঠাৎ নজর হল সোপানশ্রেণি বেয়ে নগ্নপদে নেমে আসছেন তারাপ্রসন্ন। স্নানান্তে যে বস্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে একথা মনে ছিল না রূপমঞ্জরীর। কিন্তু ভোলেননি তারাপ্রসন্ন। তিনি ওর দিকে একটি সাদা থান বাড়িয়ে ধরে বলেন, ‘স্ত্রীলোকদের বস্ত্র-পরিবর্তন-কক্ষে গিয়ে ভিজ়ে শাড়িটি ছেড়ে আয়! ওটা ওখানেই থাকবে। শ্মশানচণ্ডালের প্রাপ্য।’

শাড়িটা পালটে যখন ফিরে এল, তখন উনি বললেন, ‘এবার ওই পালকিতে উঠে বস। পুঁটুরানী ওখানে অপেক্ষা করছে।’

পিতৃহীন শূন্য ভিটেয় ফিরে এল। তখনো কিন্তু গ্রাম্যমহিলার দল ওর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। আশ্চর্য! আকাশ-প্রদীপটা তখনো নিভে যায়নি। কে আজ জ্বালাল ওটা? কে তেল ভরে দিল বারেবারে? হটী জানে না। আকাশ-পিদিমটা যখন তৈরি করেছিল তখন স্বপ্নেও ভাবেনি যে, ওর এমন একটা ব্যবহার হবে। রূপেন্দ্রের পূর্বপুরুষ নয়, রূপেন্দ্রকেই পথ দেখাতে প্রদীপটা এভাবে প্রতীক্ষা করবে।

সে রাতের বাকিটুকু কে কোথায় কাটাল হিসাব নাই। কেঁদে-কেঁদে সবাই ক্লান্ত—তারাজ্যোতি, শোভাপিসি, মীনু-খুড়িমার মা আর পিতৃহারা অভাগিনী।

পরদিন সকালে ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তারাপ্রসন্ন বললেন, রূপেন্দ্র

আদ্যশ্রাদ্ধ বোধহয় করতে দেবেন না ওঁরা, তাছাড়া ওর শ্রাদ্ধাধিকারীও তো কেউ নেই। তুই চতুর্থী পালন কর শুধু। আমি সব-ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কী কী উপকরণ লাগবে বল।

—উপকরণ তো মাত্র তিনটি—তিল, তুলসী আর গঙ্গাজল। তা আমার ঘরে আছে। আর ব্যবস্থা কী করবেন? পুরোহিতের প্রয়োজন হবে না। হয়তো কেউ রাজি হবেন না। মন্ত্র তো মাত্র একটি : ‘ইদং মে শ্রাদ্ধম্’! তবে আমি দ্বাদশটি অত্রাক্ষণকে আমন্ত্রণ করব।

—দ্বাদশটি অত্রাক্ষণ!

—না, না। আপনাকে জোগাড় করতে হবে না। আমি শুধু শ্মশান-বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জানাব। ওদের কারও তো জাত-যাবার ভয় নেই। শুধু কাঁচা ফলার। আমি জীবনদাকে দিয়ে আনিয়ে নেব।

—না, না। জীবন কেন? আমিই পাঠিয়ে দেব সবকিছু। কী কী পাঠাব বল?

—না জেঠু! সোএগই হাট থেকে কেনা কোনো কিছুতে শ্মশান-বন্ধুদের আপ্যায়ন করলে বাবার স্বর্গত আত্মার তৃপ্তি হবে না। তাঁর আত্মার নিশ্চয় স্মরণে আছে যে, সমাজপতিদের বিধানে তাঁর ‘প্রাচ্ছিত্তির’ হয়নি।

ওই পণ্ডিতার মুখে এই প্রাকৃত শব্দটা শুনে তারাপ্রসন্ন বুঝতে পারেন, শোকসন্তপ্তার অন্তরের নিরুদ্ধ ক্ষোভ। তিনি বললেন, যা ভাল বুঝিস করিস। কিন্তু এই ফাঁকা বাড়িতে তোর বয়সী মেয়ের তো একা-একা থাকা ঠিক নয়। নিরাপদও নয়। শিবনাথ রাতে শয়ন করতে এলেও নানা কথা উঠতে পারে।

—জানি। এইমাত্র শোভাপিসিও ওই কথা বলেছিলেন। তিনি রোজ রাত্রে আমার কাছে এসে থাকতে চেয়েছিলেন। আমি স্বীকৃত হয়নি। তা হয় না।

—কেন হয় না? কেন হবে না? শোভা আর পুঁটু যদি পালাপালি করে...

—না! আমার দুর্দৈব আমাকেই সইতে হবে। এ নিয়ে সমাজপতিদের নতুন করে আঘাত হানার সুযোগ আমি দেব না। আমারও তো ‘প্রাচ্ছিত্তির’ হয়নি। আমি তো সামাজিক বিধান অগ্রাহ্য করে ‘চিত্তভ্রষ্টা’। বাবামশায়ের শেষযাত্রায় কাউকে কাঁধ দিতে দেওয়া হল না। এ ভিটেয় কেউ রাত কাটালে তাকেও জাতিচ্যুত করা হবে। আপনি একা তা ঠেকাতে পারবেন না জেঠু! আমার জন্যে আর কাউকে বিড়ম্বিত হতে দেব না।

তারাপ্রসন্ন অধোবদনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর যেন হঠাৎ সিদ্ধান্তে এলেন। বলেন, তুই আমার বাড়িতে চল! দেখি, কে আমাকে জাতিচ্যুত করে! আমি এইসব বর্বর সামাজিক অনুশাসন মানি না।

এতক্ষণ স্থির ছিল। এবার আর পারল না। হঠাৎ ওর দু-চোখ ভরে এল জলে। নতনয়নে অশ্রুফুটে বললে, এ কথাটা সেদিন কেন বলেননি, জেঠু?

—কোনদিন?

কাশীযাত্রা

রূপমঞ্জরী জবাব দিল না। অথোবদনই রইল। টপটপ করে দু-ফোঁটা জল এতক্ষণে ঝরে পড়ল ওর চোখ থেকে! তারাপ্রসন্ন নিদারুণ লজ্জা পেলেন ওঁর প্রশ্নের জন্য। তা ঠিক! ওই কথাটা যদি সেদিন বলবার হিম্মৎ তাঁর থাকত, তাহলে শুভপ্রসন্ন সংসার ত্যাগ করে যেত না। তারাসুন্দরী মুক হয়ে যেতেন না। আর এই একফোঁটা মেয়েটা সসম্মানে ভাদুড়িবাড়িতে গিয়ে উঠত। অনাথা আশ্রিতার পরিচয়ে নয়। স্বমর্যাদায়। উন্নতশিরে। নিজের স্বশুরালয়ে।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলেন, মিশিরকে বরং পাঠিয়ে দেব। তোর বাড়ির সামনে বসে পাহারা দেবে।

—না! তাতেও আমি রাজি নই! আমি বাবামশায়ের পুত্রসন্তান হয়ে জন্মাইনি। আমি ‘আত্মদীপ’ হতে পারিনি। এটাই কি আমার অপরাধ? আমি একাই থাকব। আপনি বরং একটা কাজ করুন, জেটু। মা আনন্দময়ীর মন্দিরের ভিতরে, পিছন দিকের প্রাচীরে কীলক থেকে যে ঝাড়খানা ঝুলছে, ওইটা মিশিরজির হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিন। লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যে। সবাই জানুক— গভীর রাত্রে অনধিকারী কেউ অন্যায়ভাবে এ ভিটেয় মাথা গলালে তাকে খপ্পরধারিণীর সম্মুখীন হতে হবে।

তারাপ্রসন্নের বাক্যস্ফূর্তি হল না। তাঁর মনে পড়ে গেল ভারতচন্দ্রের একটি অনবদ্য পংক্তি : “এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।”



রূপমঞ্জরীকে কিন্তু একাকী তার ভিটেয় রাত্রিবাস করতে হয়নি।

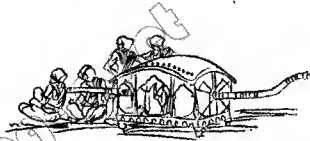
সেদিন সন্ধ্যাতেই এসে উপস্থিত হলেন ‘একমুঠিবাবা’। তিনি মুক্তপুরুষ। সামাজিক বিধানের উপরে। সমাজপতিদের অঙ্গুলিহেলনে জ্বাফেপ করেন না। তাঁর বিচিত্র আধা-হিন্দি আধা-বঙ্গভাষে যা বললেন তা সদ্য স্বশুরালয়ে নবাগতা নববধূর দিদিশাওড়ির অনুকরণে—

“আমারে টুক শুভে দিবি, নাতবৌ? আমার শোবার কুন ঠাই নাই রে!”

একমুঠিবাবা তাঁর তিনকুড়ি বছর বয়সে জীবনযাত্রাটার ছকটাই পালটে ফেললেন। তেল-সিঁদুর-মাখা বাঁধানো বটগাছতলার সাবেক ডেরাটা গুটিয়ে ফেলে কঞ্চল বিছালেন একবগ্না-ঠাকুরের দাওয়ায়। তিনি স্থির করেছেন—দৈনিক একমুঠি ভিক্ষাও আর চাইবেন না কারও কাছে। শেষ বয়সে চাকরি করবেন। হ্যাঁ, পাহারাদারের চাকরি।

‘জাগতে রহো’ মন্ত্রে দীক্ষিত চৌকিদারের বৃষ্টি। পারিশ্রমিক? হ্যাঁ, নেবেন না কেন? নেবেন! ওই একমুঠো চালের হবিষ্যাম। দিনান্তে একবার।

ঝুঁকটি আনন্দময়ী মায়ের মন্দির থেকে এ ভিটেতে আদৌ পাঠাতে হয়নি। লোহার চিমটেটাই যথেষ্ট। তেমন-তেমন ক্ষেত্রে শিউজীর ত্রিশূলটা তো রইলই।



কমবীর নন্দ চাটুজে-মহাশয়ের অষ্টপ্রহর নানান কর্মচক্রে ঘননিবদ্ধ। সপ্তাহের সাতটি দিনই। শয্যা ত্যাগ করেন ব্রাহ্মমুহুর্তে। শয্যাসঙ্গিনী ছোট-খুড়ি তখন ভোসভোস করে ঘুমোয়। বড় আর মেজকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা অবসরপ্রাপ্ত। ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। ছোট-খুড়ি দেড়কুড়ি পাড়ি দিয়েছেন। তিনি এমা কালীর ইচ্ছায় সন্তান উৎপাদনক্ষমা নন। না হলে এই দশ বছরে কর্তাকে অন্তত একটি সন্তানের মুখ দেখাতেন—থোকা-খুকু যাই হোক। হয়নি। ফলে, দেড়-কুড়ি বছর বয়সেও তাঁর ‘গতরে’ ঢিল ধরেনি। কিন্তু ওই এক রোগ। মহিষের মতো ভোসভোস ঘুম। তাও নীরবে নয়। সগর্জনে!

প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নন্দ পূজাঘরে চলে যান আঙ্গিক সারতে। সেখানে প্রতিদিন প্রতীক্ষায় থাকে শ্যামা। শিবু কর্মকারের কিশোরী মেয়েটি। চতুর্দশী। তবে সেই অলক্ষ্য দেবদেবীর বদান্যতায় বয়স অনুপাতে তার দেহ কিছু পুষ্ট। সার্থকনামা কিশোরী। শ্যামাসঙ্গিনী। বুড়ো-কর্তার জন্য পূজার ফুল তুলে সাজি-হাতে সে নিশ্চুপ প্রতীক্ষা করে রুদ্ধদ্বার মন্দিরের বাহিরে। কর্তামশাই এগিয়ে এলেই সাজিটি নামিয়ে রাখে মন্দির-চাতালে। স্পর্শ বাঁচিয়ে তা তুলে নেন নন্দ। কর্মকারতনয়া জল-অচল নয়। তার ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয় না। কর্তা ফুলের উপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেটি হাতে নেন। দাদু-নাতনি সম্পর্ক। তাই কিছু রসরসিকতাও চলে।

নন্দ বলেন, এ কী রে? বেল-জুই-গন্ধরাজ এনেছিস, অপরাজিতা তো আনিসনি আজ? শ্যামামায়ের যে সেটাই সবচেয়ে প্রিয়।

শ্যামা নতনয়নে বলে, পাইনি, দাদু। ফোটেনি।

—কেন? বেল-জুইয়ের মতো রংটা ফর্সা নয় বলে? গন্ধ নেই বলে?

শ্যামা জবাব দেয় না। বুড়োকর্তা বলে চলেন, তোর গায়ের রঙও তো ওই শ্যামামায়ের মতো, অপরাজিতার মতো। তুই তো দিন দিন দিবি ফুটে উঠছিস!

মরমে মরে যায় শ্যামা। মুখটা নেমে যায় বৃকের উপত্যকায়!

—তা হ্যাঁ রে, শ্যামা—অপরাজিতা ফুলের কাছে কি মুক্ত ভ্রমরের দল আসে না? পীরিত করতে? টুক চেখে দেখতে—ওর বুকো মধু জমে আছে কি না পরখ করতে? তোর কী অভিজ্ঞতা?

শ্যামা দু-হাতে মুখটা ঢাকে। কর্তামশাই ওর সেই লাজে-রাঙা মুখটা দেখে তৃপ্ত হন নিজের রসিকতায়।

পূজা-আহ্নিক সারতে একদণ্ড যায়। তারপর বার হয়ে এসে চলে যান স্নানাগার সংলগ্ন তৈলমর্দন-কক্ষে। এখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় নষ্ট হয়। অবশ্য সবটাই নষ্ট হয় না। আগে দামোদরে যেতেন অবগাহন স্নানে। তিন-কুড়ি পাড়ি দেবার পর এখন তোলা-জলেই স্নান সারতে হয়। এতদিন তৈলমর্দন করাতে আসত শচীপতি প্রামাণিক। ইদানীং তাকে ও-কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। পরামানিকের হাতের তালু বড় কর্কশ। সে শুধু ক্ষৌরি করেই ছুটি পায় আজকাল। শচীপতি শুধু নাপিত নয়, সে বাস্তবে ওঁর গোপন গুপ্তচর। সোএগই গাঁয়ের অনেক বাড়িতে তার যাতায়াত। তাই অনেক বাড়ির কেছা-কাহিনির টাটকা খবর রাখে। সেগুলি গোপনে নিবেদন করে কর্তামশাইকে।

শচীপতি ক্ষৌরি করে বিদায় হলে আসে মোক্ষদা। নন্দর এক আশ্রিতা। বালবিধবা। তৈলমর্দনের দায়িত্বটা ইদানীং তাকেই দেওয়া হয়েছে। আহা-মরি সুন্দরী কিছু নয়, তবে হাতের তালুটা নরম। কর্তা একটি অঙ্গমার্জনবস্ত্র মাজায় জড়িয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকেন শ্বেতপাথরের মেঝেতে। মোক্ষদা প্রথমে গরম জলের সেক দেয়। বাতের ব্যাথায় বড় উপকারী। হাঁটুতে, জানুতে, জানুসন্ধির কাছাকাছি পর্যন্ত। মোক্ষদা নির্বিকার। তারপর কর্তামশাইকে তৈলমর্দন করতে হয়। বুকো, পিঠে, উরুতে।

স্নানান্তে বালভোগ। ৩মা কালীর প্রসাদ। সেটি পরিবেশন করেন মেজগিনি। এ দায়িত্বটুকু তাঁর। স্বামীসেবার প্রান্তিক অধিকার। কর্তা প্রাতরাশ সমাপনান্তে গিয়ে বসেন বারমহলে। ব্যবসার খাতাপত্র দেখতে। প্রয়োজনে নানান স্থানে স্বাক্ষর ও পাঞ্জাছাপ দিতে হয়। এতদিন কাগজপত্র এগিয়ে দেবার কাজটার দায়িত্ব ছিল খাজাঞ্চির। ইদানীং বড়খোকার।

মধ্যাহ্ন-আহার পরিবেশনের দায়িত্ব ষোড়শীর অর্থাৎ বড়খুড়িমার। রন্ধন কার্যটার দায়িত্বে বামুনদিদি। কিন্তু কর্তার আহার্য-খালিকার সম্মুখে পাঙ্কাহাতে বসে থাকার অধিকার তাঁর প্রথমা পত্নীর। পাকাচুলে সিঁদুর পরে পট্টবস্ত্র-পরিহিতা সীমন্তিনীর এটুকুই স্বামীসেবার শেষ অধিকার।

দ্বিপ্রহরে কিছু যোগনিদ্রা। অপরাহ্নে আবার গিয়ে বসেন বারমহলে। গ্রামের ইতর-ভদ্র আসেন। ঘরের বাইরে অপেক্ষা করেন। বড়খোকা তাঁদের একে একে ঘরের ভিতরে যাবার ছাড়পত্র দেয়। উনি শোনেন তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা। শরিকি বিবাদের নিষ্পত্তি করেন। খুড়োর বিরুদ্ধে ভ্রাতৃপুত্রের অভিযোগ, পুত্রবধূর বিরুদ্ধে স্বশুরমশায়ের ফরিয়াদ। মন দিয়ে শোনেন। বিধান দেন। এককালে গাঁয়ের

মানুষ এ জন্য বাড়বাড়িতে যেত। কিন্তু এখন তো জমিদারমশাই একেবারে উদাসীন। তাই এই সামাজিক দায়িত্বের যোলো-আনা বর্তেছে নন্দখুড়োর স্বক্ষে। কী আর করা যাবে? সমাজপতি হলে সামাজিক নানান কামেলা সহিতে হবে বইকি।

এরপর বসে গ্রামপঞ্চায়েতের মজলিশ। আসেন অন্যান্য সমাজপতি—শিরোমণি, তারিণী ঘোষাল, কালিচরণ, শম্ভু দত্ত ইত্যাদি। সে আসরে মাঝে-মাঝে ধর্মতত্ত্বও আলোচিত হয়। সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের নানান উপকথা, অনুশাসন, উদাহরণ। সমাজপতির অদ্বয়ব্যাখ্যা।

সেদিন কে একজন বেমক্কা প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা, মহাভারতের সবসেরা চরিত্র কোনটি?

শিরোমণি আগ বাড়িয়ে বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!

—আহা তিনি তো ভগবান! আমি মানুষদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাই জানতে চাইছি।

শিরোমণি বলেন, সেক্ষেত্রে বলব, কৃষ্ণসখা গান্ধীবী!

—আপনি কী বলেন, খোয়ালদা?

—আমার মতে গঙ্গাপুত্র পিতামহ ভীষ্ম!

নন্দ হো-হো করে হেসে ওঠেন, এটা কী বললে ঘোষাল? ভীষ্ম? রামঃ! জ্ঞেয় বাপের ল্যাকলাকানি দেখে যে অমন কাছাখোলা হয়ে যায়? তার তো বিয়ে করার হিম্মতই হল না জীবনভর।

—তাহলে আপনার মতে শ্রেষ্ঠ চরিত্র কোনটি? কে শ্রেষ্ঠ পুরুষ?

যুক্তকর কপালে স্পর্শ করিয়ে নন্দ বলেন, নিঃসন্দেহে ব্যাসদেব! দেখ, লোকটার হিম্মৎ! ব্রহ্মচারী মানুষ—মানে ওই ‘উর্ধ্বরেতা’ বলতে যা বোঝায়। কিন্তু দৈবক্রমে তিন-তিনটি পুত্রবধূকে পেয়ে গেলেন কজ্জার ভিতর! একটি অবশ্য পাকাল মাছের মতো পিছলে গেল। বাকি দুটিকে পরপর দু-রাত্রে পুত্রবতী করে তুললেন। অথচ স্ত্রী-সংসর্গের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না তাঁর! উপরন্তু বিদূর-জননীকে। পর-পর তেরাত্রিতে তিনটি যুবতীকে সন্তানবতী করে ফেললেন! মহাপুরুষ যাকে বলে!

শিরোমণি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বহু স্তবজতি শুনেছেন। কিন্তু এমন বিচিত্র ব্যাখ্যা কোনো পণ্ডিতের মুখে শোনে ননি।

নন্দখুড়ো একনাগাড়ে বলেই চলেন, বলি, তোমরা শাস্ত্র-বাক্য মানো তো? শাস্ত্র বলছেন, “নাঙ্গে সুখম্ হস্তী/ভূমৈব সুখম্।।” অর্থাৎ কিনা, হস্তী কদাচ স্বল্লাহারী হয় না। তাকে ভরপেট খাইয়ে রাজপথে ছেড়ে দাও—দেখবে সে হেলতে-দুলতে চলেছে আপনমনে। কিন্তু যেই তার নজরে পড়বে আশপাশের কোনো গেরস্ত-বাড়িতে ডবগা কলাগাছ মাথা তুলেছে, কচি কলাপাতা বাতাসে দুলে-দুলে ওকে ডাকছে, অমনি সে থমকে থেমে যাবে। সড়াং করে শুঁড় বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরবে কলাগাছটির কোমর। তাকে সমূলে উৎপাটন করে কচড়-মচড় করে চিবিয়ে শেষ করবে।

‘নাঙ্গে সুখম্ হস্তী’ শ্লোকের এই সরল ও সরস ব্যাখ্যা শুনে শিরোমণির চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়েছিল। তবে নাকি তিনি নন্দদাদার একান্ত ভক্ত, তাই রা-কাটেননি।

সন্ধ্যা সমাগমে সন্ধ্যাহ্নিক। গায়ত্রী মন্ত্র একশ আটবার। আরও কিছু অর্থহীন অং-বং-চং। তারপর শয়নের ব্যবস্থা। নৈশাহারের আয়োজন সেখানে। ছোটখুড়িয়ার একান্ত তত্ত্বাবধানে। এবার আর অন্ন নয়। ঘৃতপক্ক লোচিকা। তৎসহ মহাপ্রসাদ। পরমাম বা মিষ্টান্ন সেবা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কারণ? কারণ, কারণবারির সঙ্গে মিষ্টান্নের সহবাস শাস্ত্রবিরুদ্ধ। রাঢ়ী-বারিন্দিরের মতো।

এটা তো গেল ওঁর প্রকাশ্য নিত্যকর্মপদ্ধতির ফিরিস্তি। কিন্তু ওই বৃদ্ধের বুকে যে এক দীর্ঘদিনের বেদনাময় স্মৃতি লুকিয়ে আছে, এ-খবরটা কেউ কি রাখে? কিছুটা আন্দাজ করেছিল সরি—মানে ষোড়শী—ওঁর বড়বউ। সে কিছু বাঁকা প্রশ্নও করেছিল তাই নিয়ে। সেই পাপেই কর্তামশাই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ষোড়শী বস্তুত অন্দরমহলে নির্বাসিতা হয়ে যায় বাকি জীবনভর। সে কাহিনিটি বড় করুণ। বড় বেদনার :

নন্দের পিতৃবিয়োগ হয় কৈশোরকালে। এতবড় ব্যবসা আর তেজারতি কারবার তাঁকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন ওঁর মামা তালুকদারমশাই। তিনিই নন্দের প্রথম বিবাহের সম্বন্ধ করেন। জ্যেষ্ঠা বধূমাতাকে নির্বাচন করে ঘরে আনেন।

নন্দের বয়স তখন সতেরো। বধুটি বালিকামাত্র : একাদশ।

এখনো মনে পড়ে যায় বাসরঘরের কৌতুককথা। মাথায় টায়রা, নাকে নোলক ঝুলিয়ে বালিকাধূ বসে আছে পাশে। এক-গা গহনা পরে। বেনারসীর একটা পুঁটলি। বাইরে সানাই বাজছে। ভেসে আসছে কোলাহল। এক দিদিশাণ্ডি ওদের দুজনকে নিয়ে কড়ি খেলাচ্ছেন। বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মতো একঝাঁক সুন্দরী ঘিরে আছে বাসর। ঠানদি নাতনির তরফে কড়িগুলি লুকিয়ে রাখছেন। কখনো নববধুর আঁচল-আড়ালে, কখনো হাঁটুর তলদেশে। নন্দকে তা খুঁজে খুঁজে বার করে আনতে হচ্ছিল। কোথাও কিছু নেই একটি যুবতী বলে ওঠে, ‘আপনি খেলা ভুলে গেছেন, ঠানদি। আপনি সরে বসুন। আমি খেলাচ্ছি। দেখি, জামাইয়ের কতটা হিম্মৎ!’

দ্যাখ-না-দ্যাখ একমুঠি কড়ি তুলে নিয়ে সে ফেলে দিল নববধুর বক্ষাবরণের অন্তরালে। একাদশবর্ষীয়ার পক্ষে সে রেশমী বস্ত্রখণ্ডের প্রয়োজন আদৌ আছে কি না নন্দ জানে না। কিন্তু সর্বসমক্ষে সেই গোপন বস্ত্রান্তরালে হস্তসঞ্চালনেও সন্কোচ হয়। নন্দ বলেছিল, হার মানছি! আমি খুঁজে দিতে পারব না!

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সেই প্রগল্ভা যুবতী। বলে, পারব না বললে আমরা মানব কেন, ভাই? খুঁজে বার করতেই হবে!

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল বালিকাধূর সহায়তায়। সে নিজেই কড়িগুলি বার করে দিল। নন্দ তাকিয়ে দেখল মেয়েটির দিকে। ওর চেয়ে বছর তিনেকের বড়ই হবে। তার অঙ্গে কোনো আভরণ নাই। তবে অনঙ্গদেব অলঙ্কারের অভাব পুরিয়ে দিয়েছেন তাঁর অকৃপণ দানে।

কুন্দফুলের মতো সুন্দর মুখ। গৌরবর্ণা, বিনা কাজলেই কাজল-কালো দুটি খঞ্জন-নয়ন। কৌতুকপ্রিয়া। চঞ্চলা, অভাগিনী।

শুনল, তার নাম সদু—সৌদামিনী—ষোড়শীর দিদি। বালবিধবা। অপাঙ্গে দৃষ্টি হেনে সে বললে, তুমি কোনও কাজের নও, জামাইভাই! এত সহজেই হার মেনে নিলে?

নন্দ সাহস পেয়ে বলেছিল, আপনার বর হার মানেনি?

—মোটাই না! সে ঠিক খুঁজে খুঁজে বার করেছিল। আমি তো আর এই ছুটকির মতো বোকা ছিলাম না যে, নিজেই বার করে দেব?

নন্দ ফস্ করে বলে, তখন আপনার বর কত?

—সে খোঁজে তোমার কী দরকার গো? যা জিগেস করি তার জবাব দাও দিনি। কড়ি তো খুঁজে বার করতে পার না। তা, পুতুল বানাতে পার?

—পুতুল? মাটির পুতুল?

—কী দিয়ে বানাতে হবে সেটা তো কারিগর জানে! আমি তার কী জানি?

ঘরসুদ্ধ সবাই ঝিলঝিলিয়ে হেসে ওঠে। নন্দ বুঝতে পারে তির্যক রসিকতার গুঢ়ার্থ। বলে, পারি, তবে কিছুটা সময় লাগবে। এসব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।

—বটে! তা কতটা সময় লাগবে গো, কারিগর?

আর একজন তরুণী সীমন্তিনী জানতে চায়, কী পুতুল বানাতে গো? থোকা না খুকু?

নন্দ বলেছিল, কী জানেন দিদি, পুতুল কখনো একাহাতে বানানো যায় না! আপনাদের বোন সাহায্য করলেই বানিয়ে ফেলব।

সৌদামিনী বলেছিল, জামাই তো ভারি মুখফোঁড়। একেরে বেহায়া।



সে-কালীন আইনে ফুলশয্যা হয়েছিল পাক্কা পাঁচ বছর পরে। নন্দ তখন বাইশ, নববধু সার্থকনামা : ষোড়শী। দ্বিরাগমনে ও ফিরে গেল স্বশুরবাড়ি। ফুলে-ফুলে ঢাকা পালঙ্ক। আজও সানাই বাজছে বাড়ির বাহিরে। অলঙ্কারে সর্বাপেক্ষে আবৃত করে সেই ফুলশেয়ের উপর আলতারাঞ্জ পা ঝুলিয়ে বসেছিল নববধু। আজও তাকে ঘিরে একঝাঁক প্রজাপতি। তাদের অতি প্রিয় একজনের নারীজন্ম আজ রাতে সার্থক হতে চলেছে। নানান কৌতুক, রঙ্গ-রসিকতা। সৌদামিনী দুটি গোড়ের মালা হাতে আগিয়ে আসে। বর ও বধুর হাতে দিয়ে বলে, এবার তোমরা মালা-বদল কর। আমরা নয়ন সার্থক করি।

কাশীযাত্রা

নন্দ বলে, মালা-বদল তো পাঁচ বছর আগেই হয়েছে।

—তা হয়েছে। আজ রাতে তো শুধু ‘মালাবদল’ নয়, ‘পালাবদল’ও হবে। সেটা তো দেখতে দেবে না। তাই মালাবদল দেখেই আমরা খুশিমনে সবাই চলে-যাব। কী বলিস রে তোরা?

আর একটি প্রগল্ভা বলে ওঠে, তা কেন? জামাইদাদা আমাদের গান শোনাবে। তারপর আমরা বিদেয় হব।

নন্দ বলেছিল, মাপ করবেন। গান আমি জানি না।

সৌদামিনী তৎক্ষণাৎ বলেছিল, তবে কী জানি? তুমি একটা অকস্মার খাড়ি। একাধারে পুতুল বানাতে পার না, আবার গানও গাইতে জান না?

সেই ফুলশয্যা রাত্রির কথা ভুলতে পারেননি নন্দ। সেই প্রথম একটি পূর্ণযৌবনা নারীদেহের দখল পেলেন একান্ত নির্জনে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য নতুন জামাইয়ের—তার জীবনসঙ্গিনী অতিমাত্রায় বীভূতনতা। শম্বুকবৃন্তির লাজুক। যোলোটি বসন্ত চোখ মেলে দেখেছে, অথচ এখনো তাঁর যৌবনের স্বাভাবিক কামনা-বাসনা উদগ্র হয়ে ওঠেনি। কথা বলছে, হাসছেও, রঙ্গ-রসিকতাতে যোগদানও করেছে—কিন্তু গায়ে হাত ছোঁয়ালেই সে আড়ষ্ট হয়ে উঠছে : না! না! না!

এ কী বিড়ম্বনা! মুখে-মুখে একটা চুমু পর্যন্ত খেতে দিল না সারারাতের মধ্যে! নন্দের ইচ্ছে করছিল ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মেরে বলতে : তবে বিয়ে করলি কেন রে হারামজাদি! নেকী!

বলেনি। বুকে নিয়েছিল সবুরে মেওয়া একদিন ফলবেই!

রাত ভোর হল। শোনা গেল পাখির কলতান। নববধু তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। অথচ সারারাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি নন্দ! এ কী আতাতরী!

রাত ভোর হতেই আবার হুড়মুড় করে ফিরে এল প্রজাপতির ঝাঁক। ঘোড়শী ধড়মড় করে উঠে বসল। ছুটে পালিয়ে গেল অন্য ঘরে। সংলগ্ন স্নানাগারে মুখ প্রক্ষালন করে ফিরে এসে নির্জন ঘরে পালঙ্কের উপর উঠে বসল নন্দ। ফিরে এল সৌদামিনী। তার এক হাতে কাঁসার থালায় ঘৃতপক লোচিকা আর নানান মিষ্টান্ন। অপর হস্তে তরমুজের সরবত। পাথরের মেঝেয় আসন পেতে সে আহ্বান জানাল নন্দকে। নন্দ বলে, আপনি খেয়েছেন?

—তাই কি পারি? নতুন জামাইকে অভ্যস্ত রেখে? কিন্তু কই আমার শয্যা তুলুনি তো দিলে না ভাই?

—শয্যা তুললেন কোথায়? কাল সন্ধ্যারাত্রে পালঙ্ক যেমন ছিল তেমনই তো আছে!

—ন্যাকামি কর না, নন্দ! আমি কি অন্ধ? সন্ধ্যারাত্রে চাদরটা ছিল টান-টান। এখন কুঁচকে একশা! সন্ধ্যাবেলায় দেখেছিলাম টাটকা ফুল—বেল, জুই, করবী, বকুল! আর এখন? দলিত-মথিত! বল, মিছে কথা বলছি?

—এ প্রশ্নের জবাব আপনার বোনের কাছে জেনে নেবেন! আমি তো কোনো প্রভেদ বুঝছি না।

তারপর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে নিম্নস্বরে বলে, আপনার বোনকে এত কিছু শিখিয়েছেন আর এটুকু শিখিয়ে দেননি যে, বর ফুলশয্যার রাত্রে...

—রাত্রে?

—চুমু খায়!

স্নান হয়ে গেল সৌদামিনী। অবাকও। বলল, সত্যি?

নন্দ বিদ্যুৎবেগে ওর দক্ষিণ বাহুমূল চেপে ধরে দৃঢ়মুষ্টিতে বলে, এই আপনার গা-ছুঁয়ে বলছি।

কেমন যেন অবশ হয়ে গেল। বললে, হাত ছাড়া। কারা যেন আসছেন।

নন্দ সংযত হয়ে বসে। তখন ঘরে প্রবেশ করলেন আরও কয়েকজন আত্মীয়া। কে একজন বললেন, ওকে একা কেন খেতে দিয়েছিস সদু? এখন যে 'জোড়'-এ খেতে হয়। এ ওকে খাইয়ে দেয়।

সৌদামিনী কেমন যেন শিউরে উঠেছিল নন্দের দৃঢ়মুষ্টির নিষ্পেষণে। এতক্ষণে সামলেছে। বললে, সে কি ঘুম থেকে উঠেছে ঠানদি? ও ঘরে গিয়ে আবার ঘুমুতে শুরু করেছে।

ঠানদি বলেন, তা ওর কী দোষ? দোষ তো জামাইদাদার! দেখ না, ফুলশয্যের পালাংটা একেই তছনছ করে ছেড়েছে। সারারাত বোধহয় ঘুমুতে দ্যায়নি নাতনিটারে।

বেলা বাড়ছে। অনেকে এলেন নতুন জামাই দেখতে। পর্যায়ক্রমে তাঁদের প্রণাম করতে হল। তারপর আগন্তুকদের ভিড় কিছুটা পাতলা হল। ষোড়শীর দেখা নেই। সৌদামিনী আবার এল ডাকতে, চল নন্দভাই, ছানটা করে নেবে এবার।

—দামোদরে?

—না। প্রথম দিন তোলা-জলেই ছান করতে হয়। ছানঘরে হাওয়া জল ভরা আছে। এস আমার পিছু পিছু।

প্রাসাদের একান্তে বাগানের ধারে স্নানঘর। সচরাচর মহিলারাই ব্যবহার করেন। পুরস্বেরা যায় দামোদরে, অবগাহন স্নানে। তবে আজ নাকি একটা বিশেষ দিন। তাই এই ব্যবস্থা। সুগন্ধী শীতল সলিলে স্নান। একজন ভৃত্য শ্রেণির লোক ইতিপূর্বেই বস্ত্র এবং অঙ্গমার্জনবস্ত্র ইত্যাদি সাজিয়ে রেখে গেছে। নন্দ এগিয়ে যায় সদুব পিছন-পিছন। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। কাঁঠালতলার একান্তে। স্নানঘরের মাথা খোলা, পাথরের মেঝে, কাঠের পাল্লা। দরজার কাছাকাছি এসে সদু সরে দাঁড়াল। বললে, ওই হাণ্ডাটায় গোলাপজল মেশানো আছে, আর এইটায় সাদা জল। আগে সাদা জলে ছান করে তারপর গোলাপজল গায়ে ঢালবে। তাহলে সুগন্ধ হবে। নতুন জামাইয়ের একটা সৌরভ থাকা চাই!

হঠাৎ মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল নন্দর। প্রশ্ন করে, কোনটায় সাদা জল? ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কাশীযাত্রা

—সরো। দেখিয়ে দিই।

নন্দ পাশ দিল। সৌদামিনী স্পর্শ বাঁচিয়ে প্রবেশ করলে স্নানঘরে। হাওয়া হাত দিয়ে বললে, এইটের গোলাপজল, আর এইটের সাদা জল। এবার বুঝলে হস্তিমূর্খ?

কিন্তু চোখাচোখি হতেই তার মুখ শুকাল। নজর হল, নন্দ নিঃশব্দে স্নানঘরের পাশাটা ভিতর থেকে ঠেলে দিয়েছে। ক্ষুদ্র কক্ষে ওরা দুজন বন্দী-বন্দিনী!

—একী করছ? তুমি...তুমি...আমাকে...

চাপাগলায় নন্দ বলে, সারারাত তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেছে সদু! আগে আমার তেপ্পাটা মিটিয়ে দাও, লক্ষ্মিটি!

—মানে? এ কী বলছ তুমি?

ততক্ষণে দুই দৃঢ়মুষ্টিতে নন্দ ধরে ফেলেছে সৌদামিনীর দুই বাহুমূল। টেনে নিয়েছে তাকে নগ্ন বক্ষে। ওই বিধবার যৌবনপুষ্ট উর্ধ্বাঙ্গ ওর কবাটবক্ষে নিষ্পেষিত হচ্ছে—মিলনবঞ্চিতা যুবতীর যৌবনের উপেক্ষিত যুগ্মজয়স্তম্ভ। প্রথমটা সে অবাক হয়েছিল। পরক্ষণেই তার কী একটা পরিবর্তন হল! নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল নতুন জামাইয়ের নিরাবরণ পৃষ্ঠদেশ। সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমকলির মতো উন্মুক্ত হয়ে গেল তার চূষনতৃষিত অধরোষ্ঠ! নিবিড় চূষন! সৌদামিনী স্বেচ্ছায় শুণু দিল না। সেও পান করল। নন্দর তৃষ্ণা তো মাত্র একটি রাত্রের। আর ওর? সাত বছরের তৃষ্ণা সেই আবাগি যে এতদিন বুকে বহে বেড়াচ্ছে। আবেধব্যাকাল!



ফুলশয্যার পর আরও তিনটি রাত ছিল শ্বশুরালয়ে।

দ্বিতীয় দিন সকালে সৌদামিনী যথারীতি নিয়ে এল প্রাতরাশ। আসন পেতে ওকে বসতে আহ্বান করল। কালকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আভাসমাত্র নেই। নন্দ মুখ ফিরিয়ে রইল। জবাব দিল না।

—কী হল? ছুটুকি কি এখনো স্বাভাবিক হয়নি?

—ও একটা মনের অসুখে ভুগছে। আমি ওকে নিয়ে যাব না। একাই ফিরে যাব। আবার বিয়ে করব আমি।

বেদনাত্ন হয়ে উঠল সৌদামিনীর মুখ। বলে, ছিঃ! ও-কথা বলতে নেই। এ তো

দু-চার দিনের ব্যাপার। আমি আজ সকালে ওকে অনেক বুঝিয়েছি। মাকেও বলেছি। তিনি খুব বকাবকি করেছেন। একটু ধৈর্য ধর, ভাই।

নন্দ বললে, খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমার ক্ষিদে নেই। খাব না।

সৌদামিনী এসে বসল পালঙ্কে। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে। সঙ্কোচ করল না। খোলাখুলি নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কাল রাতে চুমু খেতে দেয়নি?

—না! ও ঘুমিয়ে পড়ার পর ওর পিঠের দিকে কাঁচুলির ফাঁসটা আলগা করে দিতে গিয়েছিলাম। ও তড়াক করে উঠে বললে, এমন অসভ্যতা করলে আমি ও ঘরে গিয়ে শোব।

সৌদামিনীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। নিম্নস্বরে বললে, বুঝতে পারছি তোমার অবস্থটা। ওর মনটা এখনো কাঁচা। কারও কারও দেরিতে হয়। একটু ধৈর্য ধর ভাই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আপনার ফুলশয্যা হয়েছিল কত বছর বয়েসে?

—পনেরো। তোমার ভায়রা-ভাইয়ের বয়স তখন উনিশ।

—আপনি দাদাকে চুমু খেতে দেননি, ফুলশয্যার রাত্রে?

স্নান হাসল সৌদামিনী। বললে, তার কথা থাক। আমার তো কোনো মনের অসুখ ছিল না। ছুটকিও ভাল হয়ে যাবে, স্বাভাবিক হয়ে যাবে। স্ত্রীর অসুখে স্বামী কি সেবা করে না?

—কে আমার স্ত্রী? ওই কাঠের পুতুলটা?

—না, না! কাঠের পুতুল নয়। আমরা ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে...

—আমি আর একটা রাত দেখব। ওর যদি কোনো পরিবর্তন না হয়, ওকে রেখে ফিরে যাব। আপনারা ওকে কোনো আশ্রম-টাশ্রমে ভর্তি করে দেবেন।

শাশুড়ি আর দিদিশাশুড়ি এসে পড়ায় আলোচনায় ছেদ পড়ল।

তৃতীয় রাত্রেও সেই একই অভিজ্ঞতা। সরি তার বাল্য-কৈশোরের অনেক গল্প শোনাল। তার 'গঙ্গাজলে'র কথা। খুব বন্ধুত্ব ছিল সই-এর সঙ্গে। এখন শ্বশুরবাড়িতে থাকে। তার একটি ফুটফুটে খোকাও হয়েছে। ছেলেবেলায় একটা বিড়াল পুবেছিল—মুন্নি। মারা গেছে সেটা। নন্দও তার বাল্য-কৈশোরের নানান কাহিনি শুনিয়েছে। কিন্তু দৈহিক সান্নিধ্যে আসার প্রচেষ্টামাত্র নববধূ কঠোর হয়ে গেছে। নন্দ রাগ করে বলেছিল, তোমার বাবাকে বল, নামটা তিনি ভুল দিয়েছিলেন। তোমার নাম 'ষোড়শী' নয়। শীতলা!

ঝরঝর করে কঁদে ফেলেছিল নববধূ। কথা বলতে পারেনি।

রাত্রি গভীর হল। দ্বিতীয়বার শিবাধ্বনিও হয়েছে। পাহারাদার হেঁকে গেছে : 'জাগতে রহো'। নন্দ জেগেই আছে, যদিও তার শয্যাসঙ্গিনী অঘোর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ মৃদু করাঘাত হল দ্বারে।

নন্দ চমকে উঠে বসে। মশারি সরিয়ে ধীরপদে এগিয়ে আসে দোরের কাছে। সন্তর্পণে নিচু গলায় বলে, কে?

কাশীযাত্রা

—আমি। দোর খোলো।

নিঃশব্দে অর্গলমোচন করে বলে, কী ব্যাপার? এত রাতে?

—তোমাদের বালিশের পাশে হাতপাখাটা রাখতে ভুলে গেছিলাম। নাও, এটা ধর।
পাখাসমেত ওর নিরাভরণ হাতটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ফেলল নন্দ।

—ছুটকি?

—অঘোর ঘুমে অচেতন!

—আজও কি সে তোমাকে...

—এ রক্তমাংসের জীব নয়। শ্রেফ চ্যালাকাঠ।

সদুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। নিম্নস্বরে বলে, হাতটা ছেড়ে দাও লক্ষ্মিটি। ওর যদি ঘুমটা ভেঙে যায়?

নন্দ মুখটা নামিয়ে আনার উপক্রম করতেই বাধা দিয়ে বলে, এই না। এখানে না।

—তবে কোথায়?

—ঘরের বাইরে এস। দোরটা টেনে দাও। কিন্তু শ্রেফ একটা আলতো চুমু। তার বেশি কিছু চাইবে না।

আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ পশ্চিমে ঢলেছে, বারান্দাটা আলো-আঁধারি।
সৌদামিনী গজগমনে সামনে চলতে থাকে। নন্দ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ওর কর্ণমূলে
বলল, বাঃ তুমি তো বেশ! কথা দিয়ে কথা রাখছ না?

অগ্রবর্তিনী তার অধরোষ্ঠে তর্জনী স্পর্শ করে। ইস্তিতে যেন ওকে বলছে অনুসরণ
করতে। নন্দ বোঝে, ওটা ছিল শুধু মুখের কথা! আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ওই অভিসারিকা
হয়তো একক শয্যা ছুটফট করেছে। হাতপাখা দিতে আসা একটা অজুহাতমাত্র।

নিজের শয়নকক্ষে নন্দকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। সন্তর্পণে অর্গলবদ্ধ করে
দরজাটা। খোলা জানলা দিয়ে একমুঠো জ্যোৎস্না এসে লুটোপুটি খাচ্ছে ওর বিছানায়।
নজর হল সেখানে একটি শিশু। ঘুমে অচেতন। সদু তাকে সাবধানে ওপাশে সরিয়ে
বললে, শ্রেফ একটি চুমু কিন্তু। আর কিছু চাইবে না। কথা দিয়েছিলে তুমি।

নন্দ ওর কর্ণমূলে বলে, বাজে কথা বোলো না। ও-কথা আমি আদৌ বলিনি।

বলতে বলতে ওকে টেনে নেয় বুকে। আবেশে অভিসারিকার চোখ দুটি মুদে
আসে। চুম্বনরত অবস্থাতেই দুজনে বসে পড়ে পালক্ষে। সৌদামিনী হাত বাড়িয়ে
শিশুটিকে ওপাশে ফিরিয়ে কিছুটা জায়গা করে নেয়। আধো-জ্যোৎস্নায় নন্দর হাতটা
চলে যায় ওর নাভিমূলের দিকে। নীবিবন্ধের গ্রস্থিতে হাত পড়তেই সৌদামিনী বলে,
এই অসভ্য! ওটা কী হচ্ছে?

বলে বটে তবে বেশ বোঝা যায় যে, সেটাও ওর মৌখিক ছদ্ম-আপত্তি। যেন
ঘৃতনিক্ষেপে অগ্নি-নির্বাপণের প্রয়াস।

অতর্কিতে যেন ঘনিয়ে এল কালবৈশাখীর ভীমতাণ্ডব! বাড়ের আন্দোলনে আশঙ্কা
হচ্ছিল বুঝি উন্মূলিত হবে তরুণী তরুটি। হল না। শিকড়জাল বিস্তার করে সে সবলে
আঁকড়ে থাকল। ক্রমে প্রভঞ্নের বেগ হল স্তিমিত। শুরু হল বর্ষণ। থামল তাও।

আকাশ আর ধরণী যেন একই ঝগুমুহূর্তে পূর্ণাখতি দিল আনন্দযজ্ঞে! কিছুক্ষণ দুজনেই পড়ে রইল আলিঙ্গনাবস্থায়। তারপর পৃথিবী যেন আকাশকে বললে, অনেক তো হল, এবার ছেড়ে দাও, লক্ষ্মিটি!

ব্রহ্মপদে সাবধানে অনুসরণ করে নন্দ ফিরে এল নিজ শয়নকক্ষে। যে কক্ষে নববধূ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। দ্বারপ্রান্তে সৌদামিনী ওর বাহুমূল চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে ওঠে, ইতিমধ্যে ছুটকির যদি ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকে?

নন্দও নিম্নকণ্ঠে জবাবে বলে, ওকে বলব প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছিলাম।

মুখে আঁচলচাপা দিয়ে কৌতুকময়ী বলে, সেটা মিছে কথাও হবে না। পুরুষসিংহ তো এভাবেই প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটে যায়। যায় না?



পরদিন সৌদামিনীকে দেখে কে বলবে পূর্বসামিনীতে তার দামিনীর দমক! নন্দ জনান্তিকে বলে, দিদি, আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে? মাকে বলুন, এক সপ্তাহের জন্য সো-এটাই যাচ্ছেন। বোনটিকে তালিম দিতে। আমি নিজেই আবার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। দিবাভাগে নির্জনেও সে ওকে 'দিদি' ডাকে। 'আপনি' বলে কথা বলে। সাবধানের মার নেই!

সৌদামিনী বলে, তা হয় না ভাই। সেটা খুব বিসদৃশ দেখাবে।

—দেখাবে না। ওঁরা তো জানেনই যে, সরি ঠিক স্বাভাবিক নয়।

—ওঁরা রাজি হলেও আমি রাজি নই।

একটু আহত হল যেন। বলে, আমি কি অজান্তে কোনো অপরাধ করে বসেছি?

—না! বোঝ না কেন? আমি যে নিজেই জ্বলে-পুড়ে মরছি তা বুঝতে পারনি কাল রাতে?

—তাহলে?

—আমাকে কাছে পেলে তুমি ওই হতভাগী কাঠের পুতুলটার দিকে ফিরেও চাইবে না।

নন্দ বোঝে, ও শুধু রমণপটিয়সীই নয়, দারুণ বুদ্ধিমতী। বলে, তাহলে আবার কবে আমাদের দেখা হবে?

—মাসতিনেক পরে। আমি নিজেই যাব। বোনের তত্ত্বালাশ নিতে। যদি তুমি কথা দাও এই তিন মাসের মধ্যে অধৈর্য হয়ে টোপর কিনতে ছুটবে না।

—কথা দিলাম। আপনিও দিলেন কিন্তু। আষাঢ় মাসের মধ্যে যদি আপনার দেখা না পাই, তাহলে সত্যিই আমি টোপর কিনতে ছুটব। সেক্ষেত্রে দোষটা হবে আপনার।

—কথা দিলাম। শান্তি : তিন মাসের কারাযজ্ঞা।

—কার? আপনার না আমার?

—'বুঝ লোক যে জান সন্ধান!'

নন্দ বোঝে। বোঝে যে, তার ভায়রাভাই নববধূকে অন্তত ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'টা পড়ে গুনিয়েছে। কারণ সৌদামিনী অন্যান্য কাজে যতই পটু হোক— অক্ষর-পরিচয়হীনা। নন্দের পড়াগুনা যদিও কম, তবু বিদ্যাসুন্দরটা সে বারেরবারে পড়েছে।



তিনমাস পরে সৌদামিনী তার এক খুড়তুতো ভাইকে সঙ্গে করে সতাই এসে হাজির। সোএগই গাঁয়ে। ততদিনে অবশ্য সরি পোষ মেনেছে। প্রতি রাতেই তৃপ্ত করছে তার বরকে। সৌদামিনীকে পেয়ে সরি উচ্ছ্বসিত। নন্দ ততোধিক! খুড়তুতো ভাইটি একটি চতুষ্পাষ্ঠীর ছাত্র। দিনচারেক সোএগই গাঁয়ে আপ্যায়িত হয়ে নিজের অশ্বপৃষ্ঠে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছিল। কথা হল, জামাই কিছুদিন পরে স্বয়ং সৌদামিনীকে তার পিত্রালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

সরি তার দিদিকে সারাদিন আগলে রাখে। স্বামীগরবিনী ক্রমাগত বকবক করে তার অনাবিল আনন্দের বিবরণ দেয়। অসপত্র অধিকারে সে লাভ করেছে একটি যুবকের একান্ত প্রেম। সচ্ছল পরিবার। কোনো দিকে কোনো অভাব নেই। স্বামীর কোনো বদ নেশা নেই। বাইজি নেই, বাগানবাড়ি নেই। সন্ধ্যার পর একটু শ্রমকালীর চরণামৃত পান করে, এই যা। তিন-তিনটি দিন কেটে গেল, জনান্তিকে সৌদামিনীকে একবারও পেল না।

তারপর একদিন সুযোগ এল। বেলা দ্বিপ্রহর। সরি স্নানঘরে। সৌদামিনী এল নির্জন কক্ষে একান্ত সাক্ষাতে। নন্দ ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। বাধা দিল সৌদামিনী : এখন ওসব নয়।

—মানে? এতদিন পরে দেখা! এমন করছ কেন?

—শোন নন্দ! তোমার কাছে ছুটে এসেছি অত্যন্ত বিপদে পড়ে। পারলে তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারবে!

—বিপদ! কী বিপদ?

—আমি...আমি...কীভাবে কথাটা বলি?

নন্দ ওর হাতটা ধরে বলল, এমন করছ কেন সদু! কী হয়েছে?

—আমি 'মা' হতে বসেছি!

—মা!!

বজ্রাহত হয়ে গেল নন্দ! বলে, কী করে বুঝলে?

—যেমন করে সবাই বোঝে। দু-মাস আমার মাসিক বন্ধ। ইদানীং গা-ও গুলাতে শুরু করেছে। সেজন্যেই ছুটে এসেছি তোমার কাছে। যা হয় একটা ব্যবস্থা কর ভাই। না হলে আমার গলায় দড়ি দিতে হবে।

—না, না, সে কী কথা! আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি! ভাবনার কী আছে? আমি তো

বেঁচে আছি। আমার বিশ্বস্ত একজন গুনি আছে। এ কাজে দড়। একটা শিকড় এনে দিচ্ছি। বেটে খেতে হবে। তিন দিনেই খালাস হয়ে যাবে!

—জানাজানি হয়ে যাবে না তো?

—পাগল! কাকপক্ষীতে টের পাবে না।

—আমার...আমার শরীরে কোনো ক্ষতি হবে না তো?

—দিন-তিনেক স্নান-ট্রাব হবে। সে তো মেয়েদের হয়েই থাকে আকছার।

—ছুটকি কিছু আন্দাজ করবে না তো?

—কেমন করে করবে? সে কি জানে যে তার বর লুকিয়ে-লুকিয়ে তোমার মধু খায়! শোন, আজ রাতে সরি ঘুমিয়ে পড়লে তোমার ঘরে যাব। ঠিক মধ্যরাতে। বড় বাড়ির পেটা ঘন্টায় মাঝরাতে বারোটায় ঘন্টা ধাক্কা থামলেই। তুমি জেগে থেক। আর দরজাটা খুলে রেখ। ভয় নেই, আর কোনো চোর মধু খেতে তোমার ঘরে ঢুকবে না।

সৌদামিনী রাজি হল না। বললে, না! এ হাস্যামা মিটুক, তারপর ওসব কথা চিন্তা করা যাবে।

—আমার যে আর ধৈর্য মানছে না সদু!

সৌদামিনী কঠোর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। বললে, বোঝ না কেন? তুমি তো ঘরের কোণে প্রতি রাতেই ভরাপাত্রটা পাচ্ছ। আর আমি? কিন্তু আর নয়। ছুটকি হয়তো এখন এসে পড়বে। তা কখন শিকড়টা এনে দেবে?

—না, শিকড় বাটতে হবে না তোমাকে। আমি নিজেই দুটো বড়ি তৈরি করে নিয়ে আসব। রাতে আহালাদির পর বড়ি দুটো গিলে ফেল। ব্যস। পরদিন সকাল থেকেই শ্রাব শুরু হয়ে যাবে। একরাতেই খালাস।



তাই হয়েছিল সৌদামিনীর। একরাতেই খালাস।

সে কোনো স্বীকৃতিপত্র লিখে যায়নি। কেন এমনভাবে কাউকে কিছু না বলে আত্মহত্যা করল! কেউ জানতেও পারেনি। আন্দাজও নয়। শুধু কিছুটা আঁচ করেছিল সরি। নন্দের আছাড়ি-পিছাড়ি মেকি-কান্না দেখে। এ বাড়িতে অমন তীব্র বিষ দিদি কোথায় পেল? কেমন করে পেতে পারে? কে জানে, কোনও অসতর্ক মুহূর্তে সে হয়তো কিছু অশোভন দৃশ্যও দেখতে পেয়েছিল। দূরন্ত ক্রোধে সে সরাসরি কৈফিয়ত দাবি করেছিল তার স্বামীর কাছে।

কাশীযাত্রা

সেই পাপেই তার অসপত্ন অধিকারটা ঘুচে গেল।

নন্দ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন। এলেন সুয়োরানী। বিতাড়িত হলেন দুয়োরানী। রাজবাড়ি থেকে নয়। হৃদয়সিংহাসন থেকে।

এমন যে প্রবল প্রতাপাধ্বিত সমাজপতি, তিনিও তিন-কুড়ি-পাড়ি-দেওয়া বয়সে পড়ে গেলেন মহা-আতান্তরিতে। ওই একফোঁটা মেয়েটার কাছে।

শত্রুনিধন ওঁর রক্তে। আজীবন নির্মম হস্তে সরিয়ে দিয়ে এসেছেন পথের কাঁটা।

একেবারে প্রথম যৌবনে সেই মাগিটা। কী-যেন নার্ম? এখন আর মনে পড়ে না। ওই যে গো—বড় বৌয়ের দিদি। ওঁর ভদ্রাসনে এসে দ্যাখ-না-দ্যাখ বিষ খেয়ে মরল। কেন রে বাপু? দুনিয়ায় কি মরার জন্য জুসেই ঠাই পেলিনে? লোকে বলে, তার নাকি ‘পেট’ হয়েছিল। হবেও বা। ওসব ছোঁদো কথায় কান দিতে নেই। রাধামাধব! কালী-তারা-বেঙ্গমায়ী!

তারপর ধর গিয়ে ওই দুই বাগদির পো! কী দুজ্জয় সাহস! সমাজপতিকে প্রকাশ্যে বা-নয়-তাই বলে বসল। ধম্মের কল ব্যাতাসে নড়ে। খুড়োটা ফৌৎ হল গুলি খেয়ে। আর ভাইপোটা ডুবে মল দামোদরে। ওই একবগ্নাটা কী পাষণ্ড! বলে কি না মহাপ্রসাদ খাই না। কেন? না পাঁঠাটা যে উচ্ছুণ্ড করা। ‘বৃথামাংস’ এনে দাও, কবজি ডুবিয়ে সাঁটব। দুগ্ধার ছোট গিন্নি—সম্পর্কে তোর খুড়িমা হয়—তার সঙ্গে এমন পীরিত করলি যে আবাগিটা শেষমেশ গলায় দড়ি দিল। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা! তারপর ধর গিয়ে তরুপঞ্চাননের ভাগ্নে-বৌটা! তাঁরে নির্লজ্জের মতো নিয়ে এসে তুললি তোর ফাঁকা ছামুতে। মতলবখানা কেউ বোঝে না? কুলীন বামুন তুই। হিম্মৎ থাকে তো দু-তিনটি কন্যাদায়গ্রন্থকে উদ্ধার কর না! সে মুরোদ নেই। ইদিকে বিধবা ডব্বা বৌঠানরে ময়না পোষা! কিন্তু পারলি? পঞ্চানন-ঠাকুর এ-অসৈরণ সইল? তোর নাকে ঝামা ঘষে ঘরের বউ ঘরে তুলল না? সেই একবগ্নার এন্তেকালটা তোমরা একবার বিবেচনা করে দেখ, বাবাসকল! কুলীন বামুনের মড়া বয়ে নিয়ে গেল দুলে-বাগদি-টাড়ালে! পুড়িয়ে ছাই করল জল-অচলদের শ্মশানে! মায় ছেরাদটা পর্যন্ত হল না।

এসব গৌরবের দাবি তিনি করেন না। তিনি সমাজপতি! এসব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে হয়। সবই ামায়ের ইচ্ছে!

কিন্তু এবার? এই শেষ-কিস্তিটা কিছুতেই ঠেকাতে পারছেন না! ওই একবগ্নার হাড়হাবাতে মেয়েটা! ভাঙবে তবু মচকাবে না। কিছুতেই ওটাকে কজা করা যাচ্ছে না। সে নাকি এখন মাথা খাড়া রেখে এবাড়ি-ওবাড়ি চিকিচ্ছে করে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে সবসময় কালপুরুষের মতো তার এক দেহরক্ষী। তিনকুড়ি-পাড়ি-দেওয়া একটা যমদূত। হাতে ত্রিশূল! তার মায়েরে কেউ কিছু বললে দ্যাখ-না-দ্যাখ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে!



তিন-তিনটে আমন্ত্রণ এসেছিল রূপমঞ্জরীর। তিনটিই সে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

প্রথমত, বড়বাড়ির ভাদুড়ি-জেঠু। প্রচণ্ড অভিমানে তাঁকে সে হঠাৎ বলে বসেছিল, 'সেদিন কেন কথাটা বলতে পারেননি জেঠু?'

তবে জেঠুমার প্রতি তার কোনো অভিমান নেই। প্রায় প্রতিদিন গিয়ে তাঁর কাছে বসে। গল্প করে যতটা, শোনে তার চেয়ে বেশি। মৌনতা ভঙ্গের পর উনি বোধহয় পুষিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর শূন্য বুকে টেনে নিতে চান মামণিকে। এখন তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেমন করে হল?

গল্পে শুনেছি, একটি তরুণীর দুই বাঘ নাকি বেমকা আটকে যায় আড়ামুড়ি ভাঙতে গিয়ে। স্বক্কাস্থির কী-একটা স্থানচ্যুতিতে সে হাতদুটি আর নামাতে পারছিল না। বিচক্ষণ চিকিৎসক অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাকে নিরাময় করেছিলেন। সর্বসমক্ষে তার বস্ত্রাকর্ষণ করে। মর্মাস্তিক প্রয়োজনে মেয়েটির দুটি হাত নেমে আসে—শাড়ির প্রান্ত আঁকড়ে ধরতে। বুদ্ধ চিকিৎসক করজোড়ে মেয়েটিকে বলেছিলেন, মা রে! বুড়ো ছেলেটাকে মাপ করে দে! এছাড়া তোকে সারিয়ে তুলতে পারতাম না।

তারাসুন্দরীর অবস্থাও সেইরকম। কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় অত্যধিক বজ্রপাতে তিনি মুক হয়ে গিয়েছিলেন। ধনুস্তরি ঠিকই বুঝেছিলেন—ওঁর বোধশক্তি হারিয়ে যায়নি। সব বুঝতেন, কিন্তু কেঁদে মনটা হালকা করতে পারতেন না। মস্তিষ্কের স্নায়ুজটিলতায় শুধু বাকশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। আবার এক অত্যধিক বজ্রপাতে সেই স্নায়ুগ্রন্থির জটিলতা দূরীভূত হয়ে গেল। সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা হওয়ার বিড়ম্বনা প্রতিহত করতে যেভাবে সেই মেয়েটি দু-হাতে চেপে ধরেছিল তার লাজবস্ত্র। ঠিক তেমনি এক মর্মাস্তিক প্রয়োজনে তারাসুন্দরী একদিন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন পুঁটুরানীর হাত থেকে লক্ষ্মীর শঙ্খটা। ভাদুড়িমশাই ফিরে এলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন, ওরা কি মামণিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

তারাপ্রসন্ন তৃপ্তির হাসি হেসে বলেছিলেন, না! পারেনি! ভীমা-ঈশেন ওকে রক্ষা করেছে।

তারপরেই অবাক হয়ে বলেন, এ কী! তুমি কথা কইছ?

তারাসুন্দরীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তাই তো দেখছি!

দ্বিতীয় আমন্ত্রণটি এসেছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত এক পল্লীপ্রান্তের জমিদারবাড়ি থেকে। তুলসীর চিঠি :

কাশীযাত্রা

‘মামণি! আমাকে মনে পড়ে? আমি এখন এ-বাড়িতে আছি। মজুমদার পরিবারের ছোটবউ। তোদের সব খবর পেয়েছি। বাবামশায়ের কাছে। তুই আমার কাছে চলে আয়। এঁরা তোকে মাথায় করে রাখবেন। কথা দিয়েছেন। আমারও বুকটা জুড়াবে।

পত্রবাহক মারফত জানিয়ে দিস কবে তোকে আনতে লোক পাঠাব।’

পত্রবাহকের মাধ্যমেই রূপমঞ্জরী জবাব দিয়েছিল :

“আপনাকে কি ভুলতে পারি, মামণি? মাকে চোখে দেখিনি। আপনিই তো আমার মা। আপনার বুক ফিরে যেতে পারলে আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত। কিন্তু তা হবার নয়। বাবামশাইয়ের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে।...বাবামশায়ের কাছে গুনেছিলাম আপনি বিশেষ প্রয়োজনে একবার সোএগই গাঁয়ে আসবেন। সেই যখন আমার ভাই বা বোন আসবে আপনার কোল-জুড়ে। বাবা নেই। কিন্তু আপনার মামণি তো আছে। এতদিনে সেও এক-খুদে ধনুস্তরি হয়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত এ গাঁয়ে আপনার মামণি তেইশটি প্রসূতির হাতে তুলে দিতে পেরেছে তেইশটি খোকা-খুক। শতকরা শতভাগ! আপনি যদি না আসতে পারেন, আমাকে খবর পাঠাবেন। আমি নিজেই চলে যাব।

ইতি আপনার মামণি।

তৃতীয় আমন্ত্রণপত্রটি এসেছিল এক স্বনামধন্য পণ্ডিতের কাছ থেকে। ত্রিবেণীর ক্ষণজন্মা পঞ্চানন ঠাকুর। প্রিয় ছাত্রের দেহান্তে তার অনাথা মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। তাঁকেও শতকোটি প্রণাম জানিয়ে অভিমানিনী দৃঢ়তার সঙ্গে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। জানিয়ে দিয়েছিল সে স্বগ্রামে থেকে পিতার অসমাপ্ত কাজটি করে যাবে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। আরও জানিয়েছিল, আর্থিক সঙ্গতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলে সে ব্রজসুন্দরী মহিলা বিদ্যালয়টিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়।



একমুঠিবাবা এখন একেবারে অন্য মানুষ। ডিম্কাষ বার হন না। সারাদিন ঘুমান। সারারাত জাগেন। ‘সা নিশা পশ্যতো মুনঃ’। পাহারা দেন। তাঁর ক্রিশূলের ভয়ে এ পাড়ায় কেউ আসে না। এছাড়া সুরভির জাবনা মেখে দেন। গো-মাতার সেবা করেন। দুধ-দোহনের দায়িত্বটাও গ্রহণ করেছেন। সৈন্যগুপ্তকে দানাপানি দেওয়ার দায়িত্বটাও। মা ভবানীকি ওয়াক্ত কঁহা?

হটীর ডাক আসে এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে। কাছাকাছি হলে পদব্রজেই পাড়ি দেয়। সঙ্গে যান ক্রিশূলপাণি একমুঠিবাবা। একটু দূরে হলে পালকিতে যেতে হয়। সেটা জেঠিমার অনুরোধে ব্যবহার করতে হয়। তখন অশ্বপৃষ্ঠে অনুগমন করেন একমুঠিবাবা।

শূলপাণি সম্যাসীর জীবনে তিন-তিনটি বাঁক। তাঁর প্রকৃত পরিচয় এবং পূর্ব ইতিহাস

কেউ জানে না। এই তিন-কুড়ি বয়সে পৌছে তা অকুণ্ঠভাবে গুনিয়েছেন তাঁর পাতানো ঝামা-ভবানীকে। হঠাৎ, রূপমঞ্জরী মামণি—কোনো নামই তাঁর মনপসন্দ হয়নি। তাঁর ছানিপড়া দৃষ্টিতে ওই একফোঁটা মেয়েটি : সাক্ষাৎ ঝামা-ভবানী।

একমুঠিবাবা বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মানুষ নন। তাঁর আদি নিবাস মহারাষ্ট্র। বাস্তবে তিনি : বর্গী!

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। ওঁদের বৃত্তি ছিল—যজ্ঞ, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন। বাবামশাই ছিলেন গ্রামের পণ্ডিতজী। কিন্তু তিনি স্বপ্নায়ু। একমুঠিবাবার পিতৃদত্ত নাম শান্তো—অর্থাৎ শত্রুদেব। মানুষ হয়েছেন তাঁর পিতামহের কাছে। পিতামহের নামটি তাঁর স্মরণে নেই। উনি তাঁকে বলতেন : দাদাজী কধদেও। শিবাজী মহারাজের অনুকরণে। তাঁর আদর্শেই জীবনের প্রথম গতিমুখ পরিবর্তন।

দাদাজী তাঁর জমানায় যোগ দিয়েছিলেন স্বয়ং শিবাজী মহারাজের সৈন্যদলে। শিবাজীর দেহাবসানের পর ফিরে আসেন গ্রামে। আঁকড়ে ধরেন পিতৃহীন শান্তোকে। শান্তোর লেখাপড়ায় মন ছিল নী। দিবারাত্রি দাদাজীর কাছে ‘কিস্সা’ শোনে—কীভাবে শিবাজী মহারাজ আফজল খাঁ অথবা শায়েস্তা খাঁকে শায়েস্তা করেছিলেন। কীভাবে মিঠাইয়ের ঝুড়িতে আত্মগোপন করে আলমগীরের কারাগার থেকে মুক্তি পান। দাদাজীর দেহান্তকালে শান্তো কৈশোর অতিক্রম করে তারুণ্যের সিংহদ্বারে উপনীত। দাদাজীকে নর্মদাতীরে দাহ করে শান্তো গৃহত্যাগ করল। সম্যাস নিতে নয়—পেশোয়ার অধীনে সৈন্যদলে যোগ দিতে। তখন তরুণের স্বপ্ন ছিল—ভুলুষ্ঠিত ভাগোয়া ঝাণ্ডাকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করার। ভবানীমাতার পূজায় প্রয়োজন হলে বুকের রক্ত অঞ্জলি দেওয়া।

চৌথ-আদায়ের দাবি নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত যখন এলেন বঙ্গভূমে তখন তরুণ শান্তোজীও এলেন তাঁদের সঙ্গে। আশা করেছিলেন, সম্মুখ যুদ্ধে যবন নিধন করে গৌড়বঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন ‘ভাগোয়া-ঝাণ্ডা’। কিন্তু মোহভঙ্গ হল অচিরে। পণ্ডিতজীর সৈন্যদল বাস্তবে লুণ্ঠের। কোথায় নবাবের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তা নয়, ক্রমাগত গ্রামের পর গ্রাম ওরা লুট করে চলে। সে কী অকথ্য অত্যাচার! কী বিভৎস দৃশ্য! মানুষকে ওরা মানুষ বলে গণ্য করত না। বালক থেকে বৃদ্ধের শিরশ্ছেদ করে মুণ্ড নিয়ে গেঁড়ুয়া খেলত! যৌথ বলাৎকারে গ্রাম্য রমণীকুলকে চরম বেইজ্জৎ করত। প্রতিবাদ করেছিল শান্তো। তা থেকে বচসা। শেষে ওকে বধ করতে ছুটে আসে তিন-চারজন বর্গী সৈন্য। শান্তো মারাত্মকভাবে আহত হয়, তবে প্রতিপক্ষের দুজনের শিরশ্ছেদ এবং একজনকে মারাত্মকভাবে আহত করার পর।

ফৌজ ছেড়ে পালায়। ফেরারী আসামী। বর্গী সৈন্য ওর তল্লাশে পশ্চাদ্ধাবন করে। শান্তো ওষ্ঠলোম ও শ্বশুর বৃদ্ধিতে মন দেয়। জটাজুটখারী সম্যাসী সাজে। তাকে তখন বাঘ ও সিংহ দু’দিক থেকে তাড়া করেছে। নবাবী সৈন্য তাকে চিহ্নিত করেছে বর্গী হিসাবে, আর পেশোয়ার দৃষ্টিতে সে ফেরারী আসামী।

কাশীযাত্রা

শাস্ত্রোজীর জীবনে এল দ্বিতীয়বার গতিমুখ পরিবর্তনের জন্মানা। ‘ভাগোয়া-বাণ্ডা’ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নটা ক্রমে বাপসা হয়ে এল। বিন্দুবৎ হয়ে গেল। শেষে ‘না’ হয়ে গেল।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসন্তান তাঁর ক্ষত্রিয় বৃত্তি ত্যাগ করে হয়ে গেলেন কৌপীনধারী সন্ন্যাসী—একমুঠিবাবা। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষাজীবী। গৃহস্থবাড়িতে গিয়ে হাঁকাড় পাড়েন : ‘জয় শিবশস্তো! জয় ভবানী-মাতা!’ দৈনিক একমুঠি ভিক্ষা। তার বেশি গ্রহণ করেন না—‘কিউকি কল তো ফিন নিকালনা হায় না?’ ঘুরতে-ঘুরতে একদিন এসে পৌঁছালেন এই সোএই গ্রামে। দামোদরতীরের এই ছায়া সুনিবিড় শান্ত পল্লীপ্রান্তে। জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল। ভূস্বামী ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী সজ্জন। সাক্ষা ব্রাহ্মণ। তেঁতুলবটের ছায়ায় পাকাপাকিভাবে ডেরাডাঙা গাড়লেন। ইচ্ছা ছিল এখানেই দুনিয়াদারী খতম করবেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশের সন্তান কৈশোরে গ্রহণ করেছিলেন ক্ষাত্রধর্ম—হয়েছিলেন ভাস্কর পণ্ডিতের দক্ষিণহস্ত! কিন্তু বর্গী সৈন্যর অবক্ষয় দেখে, পৈশাচিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন সংসারত্যাগী কৌপীনধারীতে।

কিন্তু মা-ভবানীর তা ইচ্ছা নয়। সারা জীবন খুঁজেছেন শিবাজী মহারাজের ইস্টদেবীকে। সাক্ষাৎ পাননি। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ প্রয়াত হলেন। তারপর সোএই গাঁয়েও এসে পৌঁছাল লোভী অত্যাচারী সমাজপতিদের অবক্ষয়ী চিন্তাধারা। শিবাজী মহারাজের প্রয়াণে যেমন অবক্ষয় নেমে এসেছিল স্বার্থসর্বস্ব পেশোয়ার সৈন্যদলে। আবার একটি মর্মান্তিক আঘাতে জীবনের লক্ষ্যমুখ পরিবর্তিত হয়ে গেল। যেদিন দেখলেন সোএই গাঁয়ের সমাজপতিদের অত্যাচারে নিষ্ঠাবান ধর্মস্তরি-বাবাকে দাহ করল চণ্ডালের দল। রুখে দাঁড়ালেন দাদাজী কধদেও—এর মন্ত্রশিষ্য। অকস্মাৎ দেখতে পেলেন : ঠাঁর ছানিপড়া দৃষ্টির সম্মুখে এতদিনে আবর্তিত হয়েছেন সেই আজীবন ধরা-না-দেওয়া ‘ভবানী মাতা! একটি কিশোরীর বেশে। সে অনর্গল দেবভাষায় কথা বলতে পারে! সে পিতৃহীনা। তবু পিতৃকুলের সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করে সে জমিদারবাড়ির আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করল।

সঙ্কল্প পরিবর্তিত হল আবার। ছিলেন সন্ন্যাসী, হলেন গৃহস্থ। মৃগশিশুর প্রেমে ভরতমুনির মতো এখন তিনি দুঃখ দোহন করেন। অশ্বের দানাপানি জোগান দেন। আর ‘মা-ভবানী যখন আর্তদের সেবায় নিম্ভ্রান্ত হন তখন অশ্বপৃষ্ঠে তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন, অনুভব করেছেন—এই সোএই গাঁয়ে ‘বিডবরাহের’ দল তাঁর মা-ভবানীকে অপমান করতে চায়, নির্যাতন করতে চায়। ঠিক যেমন করত তাঁর যৌবনের বর্গী সঙ্গী-সাথীরা।





১১৭৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখের মাঝামাঝি। আজ পুণ্যাই—অক্ষয় তৃতীয়া। বৈশাখে মাসি মেঘরাশিচ্ছে ভাস্করে শুক্রে পক্ষে তৃতীয়াং তিথৌ। যাবনিক বিচারে ১৭৬৬। আমাদের কাহিনির নায়িকা তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয়া পূর্ণযুবতী। এখন তিনি শুধু সোএগই গ্রামেরই নয়, পঞ্চগ্রামের সুপ্রতিষ্ঠিতা ধনসুরি-মাতা। অনেকেই ইদানীং তাঁর সেবকের ভাষায় তাঁকে ডাকে ‘ভবানী-মা’। একমুঠিবাবা আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন; কিন্তু আজন্ম-ব্রহ্মচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের শরীরে জরা দন্তশৃঙ্খট করতে পারেনি। বছরখানেক আগেও দেখা গেছে তিনি অক্লেশে পায়ে রজ্জুবন্ধন করে নারিকেল গাছে ডাব পাড়তে উঠে যাচ্ছেন ‘কিউকি আজ একাদশী হায় না? ভবানী-মা সিরফ পিয়েঙ্গি, কুছ খায়েঙ্গি নহী!’

বৎসরে এই একটি দিন নন্দ চাটুজেজ মশাই দামোদরের জলে অবগাহন স্নান করেন। জনশ্রুতি—শাস্ত্রেও কোথাও লেখাটেখা আছে নিশ্চয়—এ দিন দামোদরের জল গঙ্গোদকের মতো পবিত্র হয়ে ওঠে।

প্রাতঃকালীন আহ্নিক সমাপনান্তে নন্দ এসেছেন স্নানাগার সংলগ্ন তৈলমর্দন-কক্ষে। কটিদেশে অঙ্গমার্জন বস্ত্র জড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়েছেন, শ্বেতপাথরের মেঝোতে। মোক্ষদা তাঁকে তৈলমর্দন করে দিচ্ছিল।

মোক্ষদা ব্রাহ্মণ-কন্যা। ওঁর অতি দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতিভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর বিধবা। ওঁর আশ্রিত হয়ে আছে আজ বছরকয়েক। বাড়ির সবাই তাঁকে ডাকে ‘বামুনদি’। কারণ রন্ধনশালার দায়িত্বটা তাঁর। তবে নন্দ তাঁকে নাম ধরেই ডেকে থাকেন। বামুনদির রান্নার হাতটি বড় মিঠে। শুধু কি তাই? তাঁর হাতের তালুও খুব পেলব। তৈলমর্দনও একটি চারগশিল্প। কর্তামশাইকে সে এমন সুচারুভাবে মালিশ করে যে, তাঁর নিদ্রাবেশ এসে যায়। বামুনদির বয়স দেড়কুড়ি। ছোট গিমিয়ার প্রায় সমবয়সী। সাদা থান। অভরণহীন তথা মেদহীন দেহ। শুধু কর্ণে একটি রুদ্রাক্ষের মালা। কর্তামশাই যদিচ বহু দূর সম্পর্ক ধরে ভাসুর, তবু অবগুষ্ঠনবতী তাঁর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বাক্যালাপ করে থাকেন। তৈলমর্দন করতে করতে নানান সুখ-দুঃখের কথা হয়।

সেদিন কী যে হল, কর্তা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, মোক্ষদা, তোমার বেই হইছিল কত বছর বয়সে?

মোক্ষদা বলে, তা কি আর মনে আছে কত্তামশাই? তবে আমি তখন বোধহয় রানীর বয়সী।

কাশীযাত্রা

রানী ওঁর নাতনি। বড়খোকার প্রথম পক্ষের প্রথম সন্তান। বছর নয়-দশ। কর্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, আর শাঁখা-সিঁদুর মুছল কত বছর বয়সে?

—তখন আমি শ্যামার চেয়েও বছরআষ্টেকের বড় হব, মনে লাগে।

শ্যামা ওঁর মালিনী। সে চতুর্দশী। তার মানে, আন্দাজ বাইশ বৎসর।

—তাহলে সবাই তোমারে ‘বালবিধবা’ বলে কেন? শাঁখা-সিঁদুর যেদিন ঘোচে সেদিন তো তুমি দিব্যি ডাগর গো! এককুড়ি-দুই!

বামুনদিদি বলে আঙে না, ‘বালবিধবা’ হওয়া ঠিক নয়। পাঁচ-ছয়টা বছর তো ছিলাম শ্বশুরবাড়িতে। শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে।

—এই পাঁচ-ছয়টা বছরে নগেনকে একটা খোকার মুখ দেখাতে পারলে না? একটা ছেলে অথবা মেয়ে থাকলে তোমারও জীবন আজ দুঃসহ হয়ে উঠত না। তাই না?

বামুনদিদি জবাব দিল না। কী জবাব দেবে? এ তো স্বতঃসিদ্ধ। এ ইচ্ছা তো পূরণ হল না।

কর্তার কিন্তু কৌতূহল মেটেনি। বলেন, নগেনের তো তুমি তৃতীয়পক্ষ? তাই নয়? সতীনের সংসার ছিল না তোমার?

—আঙে না। বড়দি প্রথম সন্তান হতে গিয়েই গঙ্গালাভ করেন। ছোড়দির দুটি সন্তান হয়েছিল। তাঁর দেহান্তের অনেক পরে উনি আমারে ‘বে’ করেন।

হবিবা কৃষ্ণবর্ষের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পায়। নগেনভায়ার আগের দুই পক্ষই ফলবতী। মোক্ষদার কেন হল না? নিজ স্বীকৃতিমতে সে তো পাঁচ-ছয় বছর স্বামীসহবাস করেছে? তা হলে? মোক্ষদা কি ওঁর ছোট গিন্নির মতো ‘বীজা’? কথাটা তো এতদিন খেয়াল হয়নি।

লজ্জা-শরম ত্যাগ করে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, নগেন কি তোমারে নিয়ে শুতো না? তুমি সন্কোচ কোরো না মোক্ষদা। সুখ-দুঃখের কতা মন খুলে কাউকে কইতে পারলে মনটা হালকা হয়।

মোক্ষদা এ-কথার জবাবে বললে, এবার আপনি উবুড় হন কত্তাদাদা! আপনার পিঠে টুক তেল দোব।

—তা না হয় শুচ্ছি। কিন্তু আমার কতার জবাবটা এড়িয়ে গেলে কেন?

—এড়িয়ে যাব কেনে? আমি তখন তাঁর একমাস্তর বউ। আমারে নে শোবেন না? এটা কি একটা কতা হল?

কর্তা উবুড় হলেন। মনটা কিন্তু চিৎ হয়েই রইল। কার্য-কারণ-সূত্রগুলি বিশ্লেষণযোগ্য। মোক্ষদা পাঁচ-ছয়টা বছর স্বামীর শয্যা শয়ন করেছে। তখন তার ভরা যৌবন। তার স্বামী সন্তান-উৎপাদনক্ষম! পাঁচ-ছয় বছরে নগেনটা ওকে নিশ্চয় পাঁচশবার আশীর্বাদ করেছে। তার একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত : ওই মধ্যযৌবনা রমণী সন্তানোৎপাদনক্ষম নয়। নন্দ ঘরপোড়া গরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়! বড় গিন্নির দিদি—সেই কী-যেন-নাম রমণপটিয়সী—একরাত্রই মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। এবার

সে ভয় আদৌ নেই! এ মাগী ওঁর ছোট-গিমির মতো বাঁজা! নির্ঘাৎ! এ তো দারুণ বার্তা!

ওঁর মনোজগতে উদয় হল 'শাস্তর' বাক্য : নাল্লে সুখম্ হস্তী!

আশ্চর্য! প্রতিবেশীর বাগানে নয়, তাঁর নিজস্ব উদ্যানেই গজিয়েছে এমন ডাঁটোখাটো কলাগাছ। কচি কলাপাতা দুলিয়ে দুলিয়ে এতদিন ধরে ডেকেছে : আয়, আয়! ওর হাতের তালু নরম। হয়তো বাকি শরীরও। তাই উবুড় হয়ে চোখ বুঁজে চিন্তা করতে থাকেন। ওই ত্রিশতিবর্ষীয়া নিঃসন্তানা যে পীবরবক্ষা তা অনুমানযোগ্য। এতদিন ওকে ভাল করে নজরই করেননি। উবুড় অবস্থাতেই প্রশ্ন করেন, তোমার কি তিনকুলে কেউ নেই, মোক্ষদা?

উরুস্বয়ে তৈলমর্দনরতা বললে, তা কেন ধাকবেনি? সতীনপো এই সংমারে ভাতকাপড়ের যোগান দিবে না বলেই না আপনার ঠেং গতর খাটতি আসা?

গতর! গতর খাটার তো কতই রকমফের! তৈলমর্দনের কাজে বহাল করার সময় বামুনদিদির মাস-মাহিনার বৃদ্ধি হয়েছিল। 'কতা'য় বলে, 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল।' ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হচ্ছে!

বলেন, ওমা-বস্তীর থানে ঢিল বেঁধেছিলে?

—না!

—কেন গো? ওসব মানো না? নাকি থোকা-খুকু চাইতে না?

বামুনদিদি একটু বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, ছাড়ান দ্যান না কত্তা। ও-সব ছেঁদো-কথায় কি দরকার?

একদিনে বেশি কৌতূহল দেখানো ঠিক নয়। সবুরে মেওয়া ফলে। তাই বলেন, তোমার যদি কোনো শখ-আহ্লাদ থাকে আমারে বল। কেমন? আমি কিনে দেব নে। কারেও বলবেনি কে কিনে দিল।

মোক্ষদা বলে, আমি বেধবা মনিষ্যি। আমার আবার শখ-আহ্লাদ কী?

—না, তাই বলছিলাম। শাড়ি-গয়না ছাড়াও তো মানুষের শখ-আহ্লাদ থাকে!

মোক্ষদা এবার একটু উৎসাহ পায়। বলে, তা যদি বলেন কত্তা, তাহলে বলি : আমারে এট্টা ছোট্ট মাটির 'গুপাল' আন্যে দিবেন? এই অ্যাণ্টুকুন!

পিঠের দিকে থাকায় ওর মনোমতো গোপালের মাপটা দেখতে পেলেন না। বলেন, ঠাকুর-ঠুকুরে মনে দেওয়া ভাল। আন্যে দেব নে। কালীঘাটের পট, মাটির কালীমূর্তি, রাখাকেই...

—না, না, তেনারা মাতায় থাকুন। আমার চাই ছোট্ট একটি নাড়ুগোপাল।

ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়ালো? সন্তান-কামনায় সব সীমন্তিনীই মা-বস্তীর থানে ঢিল বাঁধে। ও তা বাঁধেনি। আবার একবঙ্গার মতো গোঁয়ার-গোবিন্দও নয়। নিজেই বলছে, পূজার জন্য একটা গোপালের মূর্তি লাভের বাসনা আছে ওর অন্তরে। দুয়ত কৌতূহলে ওই শাস্ত্রবাক্যটা আর স্মরণে রইল না—'সবুরে মেওয়া ফলে।' যেমন্না

কাশীয়াত্রা

আবার ফিরে আসেন একই প্রসঙ্গে, ব্যাপারটা কী রে মোক্ষদা? পাঁচ-ছয় বছরে তোর কোলজুড়ে কোনো সোনার চাঁদ এলনি, অথচ তুই ৩মা-বন্তীর থানে ঢিলও বাঁধলিনি। কেন?

কর্তা যে 'তুমি' থেকে 'তুই'-এর নৈকট্যে এসেছেন সেটাও খেয়াল করল কি না বোঝা গেল না। সলজ্জ বললে, সেসব সরমের কতায় আপনার এত কৌতূহল কেনে?

—না, মানে তুই তো শুভার চেয়েও বয়সে ছোট। শুভারে দেখেছিস তো? বড়খোকার দিদি! এ সংসারে জন্মালে তোরেও আমি ন্যাংটোপোঁদে কোলে করে ঠাকুর দেখিয়ে আনতাম!

মোক্ষদা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে ওঠে। বলে, আপনার মুকের কোনো আড় নেই!

—ওমা! অন্যায়্য কতা কী বললাম? আশ্মো তো ছেলেবেলায় মাজায় ঘুলি বেঁধে ন্যাংটোপোঁদে বাপ-দাদার কোলে চেপেচি! আমার কাছে তোর আবার শরম কী?

মোক্ষদা আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। ওই সহানুভূতিশীল বাপের বয়সী কর্তামশায়ের কাছে খুলে বলে তার গোপন বেদনার ইতিকথা : আমার যখন দ্বিরাগমন হয় তদিনে তিনি এক্ষেরে বুড়িয়ে গেছেন। আমারে 'মা' করার ক্ষ্যামতাই ছিল না তাঁহির!

নন্দর মনে হল পৃষ্ঠদেশে যে কোমল হস্তস্পর্শ ওটা একটা হিলহিলে কালনাগিনীর! সর্বনাশ! কী কাণ্ড হতে যাচ্ছিল! ওই তৈলমর্দনকারিণীর রজোদর্শন হয়েছে চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে, অথচ বাকি বিশ বছরে ধ্বজদর্শন হয়নি। উর্বরা ভূখণ্ড আকাশপানে মুখ তুলে প্রতীক্ষা করছে। কখন একটি অচিন পাখি—কাক-বক-ঢিল যাই হোক—সন্তানপ্রত্যাশীর উর্বর ভূখণ্ডে একটি ফলের বীজ নিক্ষেপ করবে—কালকান্তি-মোঁটু-ভ্যারেণ্ডা যাই হোক! কালীঘাটের পট, রাধাকৃষ্ণের মূর্তিতে ওর মন ভরে না—তৃষিত চাতকের মতো ওর মনোবাসনা : একটি কোলজুড়ানো 'গুপাল'! এই অ্যান্ডটুকুন!

কালী-তার-মোক্ষদে! ভবযন্তনা থিকে আমারে মোক্ষ দে মা! খুব কানঘেঁষে বেঁচে গেছেন!

মোক্ষদা বলে, এবার এটু বাবু হয়ে বসেন। মাথায় গন্ধতেল দিয়ে দি। বেশ ভুরভুরে গন্ধ হবে।

কর্তা বলেন, না-রে মোক্ষদা! গন্ধতেলটা আমি নিজেই মেখে নেব নে। তোরে ছুটি দে-দিলাম, মোক্ষদা-মা!

ওঁর মনে পড়ে গেল আর একটি 'শান্তর-বাক্য'। 'সমোক্ষত' মন্তরটা মনে নাই, তবে বাচ্যার্থটা এই প্রকার :

'মুণ্ডিতমস্তক মূর্খও বিশ্ববৃক্ষতলে কদাচ পুনরাগমন করে না!'

এই বামুনদিদিও যদি ওঁর ভিটেয় বেমক্কা আত্মহত্যা করে বসে, ওই অ্যাণ্টুকুন গুপালকে পেটাকোঁচড়ে নিয়ে, তবে উনি পড়ে যাবেন গভীর গাভড়ায়। মহা আতান্তরিতে!



দামোদরে অবগাহনান্তে পালকি চেপে যখন ভিটেয় ফিরে এলেন, তখন মধ্যাহ্ন। হঠাৎ নজর হল, দেউড়ির পাশে নামানো আছে আর একটি পালকি। দেখেই চিনতে পারেন। বড়বাড়ির। তারাপ্রসন্ন আসেননি। তিনি পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করেন। তাহলে কে? তারাসুন্দরী না পুটুরানী? বৈশাখের এই খর-মধ্যাহ্নে কেন এসেছেন?

দেউড়ি পার হয়ে ভদ্রাসনের দিকে অগ্রসর হতেই নজর হল অন্দরমহল থেকে বার হয়ে আসছে বড়খোকা। তার পিছন-পিছন এক শুভ্রবসনা অনবগুপ্তিতা যুবতী। তারাসুন্দরী বা পুটুরানী নয়। তাহলে কে? হঠাৎ থমকে থেমে পড়েন। একই অবস্থা বড়খোকাকার। বাবামশাই যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তা বোধহয় সে আন্দাজ করেনি। চোখাচোখি হতেই নন্দ তাকে প্রশ্ন করেন, ওটি কে? একবগ্না বাঁড়ুজের সেই মেয়েটা নয়?

বড়খোকাকার বাক্যস্ফূর্তি হল না। তার পাশ থেকে রূপমঞ্জরী এগিয়ে আসে। বড়খোকাকেই প্রশ্ন করে, উনি আপনার বাবা—সেই কি-যেন-নাম চট্টোজেশমশাই না?

এবারও বাক্যস্ফূর্তি হল না বড়খোকাকার। নন্দই বলে ওঠেন, তুমি যে আমাদের চিনতেই পারছ না হটী! ‘কী-যেন-নাম’ নয়, আমার নাম শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়।

রূপমঞ্জরী বললে, আমার বাবার নাম ‘একবগ্না বাঁড়ুজের’ নয়—‘রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়!’ পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান। আমাকে যেতে দিন।

—দাঁড়াও! আমার বিনা অনুমতিতে আমার ভদ্রাসনে মাতা গলিয়েছিলে কেন?

রূপমঞ্জরী প্রতিপ্রশ্ন করে, হেতুর্থে পঞ্চমী বিভক্তি কাকে বলে জানেন? ‘পর্বতো বহিমান ধূমাৎ’?

আপাদমস্তুক জ্বলে গেল সমাজপতির। রূচস্বরে বলেন, বেশি পণ্ডিতোমো দেখাবার চেষ্টা কর না। যা জানতে চেয়েছি তার জবাব দাও।

—তাই তো দিলাম। হেতুর্থে পঞ্চমী। কারও ভদ্রাসন থেকে যখন চিকিৎসক বহির্গত হয়ে আসেন তখন বুঝে নিতে হয় অন্দরমহলে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

—অসুস্থ! কে?—এ প্রশ্নটা বড়খোকাকার দিকে ফিরে।

কাশীযাত্রা

এবারও সে নিরুত্তর। হটাই জবাব দিল, যেই হোন। তিনি ভাল আছেন। গৃহস্থামী হিসাবে আপনার চিন্তিত হবার কোনো কারণ নাই। আমি যথাবিহিত নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছি। পথ ছাড়ুন।

—না! চিকিৎসা করতে যখন এসেছিলে তখন তোমার কিছু বৈদ্যবিদ্য প্রাপ্য, সেটা...

—না! চাটুজ্জেশাই। বৈদ্যকে আপনি আহ্বান করেননি। আপনাকে সেজন্য ব্যস্ত হতে হবে না। যিনি ডেকেছেন, তিনি বুঝবেন।

—তা হবে না। আমি এ সংসারের কর্তা। বৈদ্যবিদ্য আমার হাত থেকেই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

—কর্তা? কেমনতর গৃহকর্তা? আপনি তো সংবাদই রাখেন না সংসারে কে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন! কেন বৈদ্যের প্রয়োজন হল!

নন্দ পুনরায় বড়খোকার দিকে দৃকপাত করেন। এবারও সে কোনো কথা বলে না। অধোবদনে দাঁড়িয়েই থাকে। রূপমঞ্জরী পুনরায় বলে, অসুস্থ নন, স্বাভাবিক ঘটনাপরম্পরা। আপনার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সন্তানসম্ভবা। এটা চতুর্থ মাস। জ্যৈষ্ঠ মাসে পঞ্চামৃতের ব্যবস্থা করবেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

আশ্বস্ত হলেন নন্দ। বড়খোকার দ্বিতীয়া স্ত্রীর এটাই তাহলে প্রথম গর্ভলক্ষণ। বললেন, আমাকে না জানিয়ে তোমাকে আহ্বান করা ওর অন্যায় হয়েছে। আমাদের সংসারে রাসু-দাই চিরকাল প্রসূতিদের দেখভাল করেছে। তবু তুমি যখন বিনা-অনুমতিতে তাকে পরীক্ষা করে দেখে গেছ, তখন আমার কাছে বৈদ্যবিদ্য তোমাকে নিতেই হবে। বল, কী এনে দেবে?

—আমি তো ইতিপূর্বেই জানিয়েছি চাটুজ্জেশাই, আপনার কাছ থেকে কোনো বৈদ্যবিদ্য আমি গ্রহণ করব না। চিকিৎসকের ধর্ম পালন করতেই আপনার ভদ্রাসনে পদার্পণ করেছি, না হলে আমি এ-বাড়ির টৌকাঠ মাড়াতাম না।

—বটে! সেক্ষেত্রে অনধিকারী হিসাবে প্রবেশ করায় তোমার বিরুদ্ধে যদি আমি কাজিসাহেবের আদালতে শিকায়ত করি?

—সেটা আপনার অধিকারভুক্ত। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পুত্রের বিরুদ্ধেও শিকায়ত করতে হবে। এটা কি আপনি তলিয়ে দেখেছেন? আমি বিনা-আহ্বানে স্বেচ্ছায় আসিনি।

—আর নালিশ না করে আমি যদি একটি চড়ে তোমার মুণ্ডটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিই?

হটীর চোখদুটি ধক করে জ্বলে উঠল। শান্তস্বরে বললে, সেক্ষেত্রে আপনার মুণ্ডটাও উল্টোদিকে ঘুরে যাবে চাটুজ্জেশাই!

নন্দ উন্মত্ত মহিষের মতো ওর দিকে একপদ অগ্রসর হতেই রূপমঞ্জরী দেউড়ির দিকে ফিরে হাঁক পাড়ে, বাবা!

মুহূর্তমধ্যে প্রতিধ্বনি শোনা গেল, মা?

নন্দ পাশ ফিরে দেখেন, অন্তরীক্ষ থেকে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছেন এক জটাজুটধারী ভীমকায় সন্ন্যাসী। তাঁর দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল।

নন্দও হাঁকাড় পাড়েন, ব্রিজলাল! মহাদেওপ্রসাদ!

দেউড়ি থেকে দুজন প্রহরী তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে। তাদের কটিদেশে তরবারি। হস্তে দীর্ঘ যষ্টি।

সন্ন্যাসী একে একে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখেন, মুখে শুধু বলেন, তো?

নন্দ বলেন ‘তো?’ মানে?

—আপ্নে দো সিপাহী কো বোলায়া। বহু হাজির ভি হো চুকা। অব্ উন্ দোনোকো তো হুকুম দেনা চাহিয়ে! না কি রে ব্রিজলাল ওঁর মহাদেও?

ওরা দুজনে জবাব দিল না। সন্ন্যাসীকে করজোড়ে প্রণাম জানাল।

নীরবতা ভঙ্গ করল হটী : চলুন বাবা! আমাকে আরও দু’বাড়িতে রোগী দেখতে যেতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—তো আইয়ে মা!

রূপমঞ্জরী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল পালকির দিকে। সন্ন্যাসীও তার অনুগমন করলেন। তারপর হঠাৎ কী মনে হল তাঁর। ফিরে এসে দাঁড়ালেন নন্দ চাটুজের মুখোমুখি। বললেন, বাবুজি! এক बात বাতঁউ?

এবার নন্দেরই বাক্যস্মৃতি হল না। অনুমতির অপেক্ষা না করে প্রাক্তন বর্গী সর্দার বজ্রগভীরস্বরে বললেন, মহিলায়্যৌকে সাথ সোচ্ সমঝকে बातচিং করনা হি তমিজ হ্যায়! ইয়াদ রখনা!

ধীরপথে ফিরে গেলেন। অশ্বারোহণ করে আকাশপানে মুখ তুলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন—‘জয় শিবো শস্তো! জয় ভবানীমাতা’।

ব্রিজলাল আর মহাদেওপ্রসাদ তখনো যুক্তকরে প্রণামরত।

গাছ-গাছালিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল মাতৃবন্দনা : জয় ভবানীমাতা।

নন্দ অস্থিতে-অস্থিতে প্রণিধান করেন আজ এই পুণ্যাহে সমাজপতিকে শেষকিস্তির চালে মাং করে দিয়ে গেল একবগ্লার ওই একফোঁটা মেয়েটা।





লাটাইয়ের সুতো অনেকটাই ওটিয়ে আনা গেছে। বাকি আছে মাত্র পাঁচ বছর। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়, বিশ বছর আগে প্রথম খণ্ডটা যখন লিখতে বসেছিলাম তখন কাহিনি শুরু হয়েছিল ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। তখন হটী বিদ্যালয়দ্বারের বয়স ত্রিশ-একত্রিশ। সেই যখন কাশীনরেশ তাঁকে তার আশ্রমে গৃহবন্দী করে রেখেছিল উনিশ দিনের মেয়াদে। সেটা ছিল ১৭৭৪-এর চৈত্রমাস। আমরা এখন এসে পৌঁছেছি ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে। যখন হটী ঘোষাল ভিষগাচার্য্যর বয়স ছাব্বিশ।

ইংরেজি ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দটা হচ্ছে বাংলা ১১৭৬ সন। অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মহামহন্তের দুর্বৎসর। পর পর দু' বছর হল অনাবৃষ্টি। তার চেয়ে বেশি হল শাসকবর্গের অনাসৃষ্টি : মীরজাফরের কুশাসন। রেজা খাঁ আর দেবীমালার প্রজাপীড়ন। মীরজাফর গদির লোভে ইংরেজ কোম্পানিকে যে পরিমাণ খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা গৌড়বঙ্গ আধপেটা খেয়েও জোগান দিতে পারত না। পারল না। খেয়ে এল মহামহন্তের! গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। বর্গীর আক্রমণে রাঢ়বঙ্গের মানুষজন দলে দলে পাড়ি জমিয়েছিল পূবমুখে। এবার চলল পশ্চিমমুখে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লির দিকে। জনশ্রুতি সেখানে কিছু বৃষ্টি হয়েছে। হয়তো ফসল ফলেছে।

সোএগই গ্রামে বারো-চৌদ্দ আনা ভদ্রাসনে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না। কেউ নেই। হয় মরেছে, নয় পালিয়েছে। ফুল্লরা গ্রামে একঘর লোক নেই। মোল্লাহাটির মসজিদে কেউ আজান দেয় না। সোএগই গাঁয়ে গাঙ্গুলীবাড়ি, চাটুজ্জপাড়া, কায়স্থপাড়া শূন্য। বড়বাড়ির সবাই আগের অজন্মার বছরেই চলে গিয়েছেন কাশীধামে। শুধু জমিদারমশাই বাদে। তারাসুন্দরী হটীকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু স্বীকৃতা হয়নি সে। তারপর এই বছরে গ্রাম আরও জনশূন্য হয়ে পড়েছে। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে সদ্যোমৃতকে শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যায় না।

একমুঠিবাবা দেহ রাখলেন মাঘ মাসে। শেষ সময়েও সজ্ঞানে ছিলেন। মুক্তিলাভের পূর্বে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য্য-মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পার্থিব সম্পদটি। বলেন, ইয়ে রাখ দে মাদি! দুনিয়ামে বহৎসে বিডবরাহ হ্যৈ!

হটীর মনে পড়েছিল বাবামশাই একবার বলেছিলেন ওই অপ্রচলিত শব্দটি শ্রীমদ্ভগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। শুভদা বলে দিয়েছিল, তার অর্থ বিষ্ঠাভোগী শূকর। একমুঠিবাবার স্নেহের দান সে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিল। সম্যাসীর

দাহ হয় না। তাঁকে সমাধিস্থ করা হল ওদের বাস্তুভিটার প্রাঙ্গণে। ব্রিজলাল, মহাদেও প্রসাদ প্রভৃতির সে-ব্যবস্থা করে দিল। হটী গুর সমাধির শিয়রে একটি শ্বেতকরবীর চারা রোপণ করে দিল।

মহন্তর ক্রমে ভীষণাকৃতি হয়ে উঠছে। গ্রামে একটিই পরিবারের কর্তা আছেন, যিনি এই মহামারীর মুখোমুখি হবার হিম্মৎ রাখেন। নন্দ চাটুজ্জেশমশাই। তিনি অতি বিচক্ষণ সংসারী। দুই বৎসর ধরে তাঁর ধনভাণ্ডার শূন্য করে শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। সিপাহি-বরকন্দাজের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। যদিও পঞ্চাশের মহন্তরের মতো পৌনে দু-শ' বছর পূর্বেও নিরন্ন মানুষ মহাজনের গদি লুট করেনি।

তারাপ্রসন্ন আবার এলেন। তাঁর মামণির কাছে দরবার করতে।

—শোন মামণি! কাল ভোররাত্রে একটা বজরা রঙনা হবে কশীধামের দিকে। আমি তোকে আদেশ করছি মা, এই শেষ সুযোগ। তুই কশীতে চলে যা।

—আপনি?

—আমি কেমন করে যাব? কশীন্দময়ী মায়ের নিত্যসেবা আছে না?

—আমারও তো আছে, জেঠু, সোএগই মায়ের নিত্যসেবা।

তারাপ্রসন্ন বলেন, তোকে আজ এই অনুরোধ করতে এসেছি একটি বিশেষ কারণে। তোর স্বার্থে নয়, আমার স্বার্থে। শোন বুঝিয়ে বলি :

ব্রজসুন্দরী কশীধামের চৌবাট্টিযোগিনী ঘাটের বাড়িতে আজও জীবিত। কিন্তু সম্প্রতি তিনি উত্থানশক্তিরহিতা। দুর্ভাগ্যক্রমে তার পূর্বেই দীর্ঘদিনের জন্য বাড়ির আর সবাই—তারাসুন্দরী, পুটুরানীরা—এক যাত্রীদলের সঙ্গে তীর্থদর্শনে যাত্রা করেছে—মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, হয়তো-বা কদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী।

হটী রাজি হল। ব্রজসুন্দরীকে সে স্বচক্ষে দেখেনি, শুধু গল্পই শুনেছে বাবামশায়ের কাছে। তিনিই এ অঞ্চলের—হয়তো গোটা বর্ধমানভূমির—প্রথম সংস্কৃতভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত। বললে, তাই যাব, জেঠু। আপনি তাহলে বাবামশায়ের এই পুঁথিগুলি আপনার সংকলনে রাখুন। যদি কখনো ফিরে আসি তাহলে আবার পাব।

তারাপ্রসন্ন বলেন, তা না হয় রাখছি। কিন্তু তোর বিবাহের যৌতুক তো আমার কাছে গচ্ছিত রাখা আছে! তার কী হবে?

হটী বলেছিল, আপনার কাছেই থাক। যদি ফিরে আসতে না পারি তবে সংকাজে তা ব্যয় করবেন। মহামহন্তর যত ভয়াবহই হোক, তবু কিছু মানুষ তা পাড়ি দেবেই। তারা আবার ফিরে আসবে। তখন হয়তো স্বর্ণের বিনিময়ে তগুলও হাটে ক্রয় করা সম্ভব হবে। সেটাই হবে স্বর্ণালঙ্কারের যথাযোগ্য ব্যবহার।





পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই বজরাটা রওনা হল। জনাত্মশেক যাত্রী। অধিকাংশই ক্রীলোক ও নাবালক। মাঝি-মাল্লা ব্যতিরেকে দু-তিনজন সশস্ত্র পাইকও আছে। ইদানীং যেহেতু চাষবাস বন্ধ, তাই নদীবক্ষে দস্যুদলের অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। হঠাৎ ওদের মধ্যে পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না, অথচ অনেকেই তাকে শনাক্ত করল ভবানী-মা হিসাবে। নিজেরাই সড়ে-নড়ে ওর ঠাই করে দিল। ওর সঙ্গে একটি পুটলিতে কিছু থানকাপড়, দু-একটি প্রিয় পুঁথি; একটি পুলিন্দায় কিছু জরুরি ঔষধপত্র। আর একমুঠিবাবার সেই বিড়বরাহ-বিতাড়নের ত্রিশূলটা।

বজরা চলল প্রথমে দক্ষিণ-পূবমুখো। পার হল অনেক বড় বড় গঞ্জ, শহর। সব যেন শূন্য খাঁ-খাঁ। লোকজনের সাক্ষাৎই মেলে না। হয় মরেছে, নয় পালিয়েছে। বজরা মাঝে মাঝে চড়ায় ভেড়ে অথবা ঘাটে। যাত্রীরা পাথুরে উনানে কাঠকুঠো জ্বলে রন্ধন করে। সঞ্চয় ক্রমশ কমে আসছে। আশা আছে, রাজমহলের কাছাকাছি পৌঁছে অর্থের বিনিময়ে তণ্ডুল ক্রয় করা যাবে। সেই ডরসাতেই ওরা আধপেটা খায়। আরও মাসখানেক পাড়ি না দিলে কোনও হাটে-বাজারে তণ্ডুল ক্রয় করা যাবে না। মাঝি-মাল্লারা ভবানী-মায়ের জন্য ফল-পাকুড় এনে দেয়। মাঝে-মাঝে সে বামুনদিদিদের রান্না করা অন্নও গ্রহণ করে। তাঁদের রন্ধনকার্যে সাহায্য করে। রায়গিри সাপ্তানা দেন, বৃহৎকাষ্ঠে দোষ নাই।

হঠাৎ হাসে। এসব কুসংস্কার তার নেই। ফলে অসুবিধা হয় না।

গঙ্গায় উপনীত হয়ে বজরা উত্তরমুখী হল। নবদ্বীপ অতিক্রমণের কিছু পরে পশ্চিমমুখী। তারপর একরাতে হল ভয়াবহ জলদস্যুদের অতর্কিত আক্রমণ।

মধ্যরাতে নিদ্রাভঙ্গের পর হঠাৎ দেখতে পেল—যাত্রীদল প্রাণভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। আর একদল মশালধারী দস্যু তাদের সর্বস্ব অপহরণ করছে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার ত্রিশূলটার নাগাল পেতে গেল। সেটা স্বস্থানে নাই। কোনো দস্যু মশালের আলোয় সেটাকে দেখতে পেয়ে সর্বপ্রথমেই আত্মসাৎ করেছে। রিক্তহস্তেই প্রতিবাদ গড়ে তুলতে চাইল রূপমঞ্জরী। কিন্তু সফল হল না। এক ভীমদর্শন দস্যু-সর্দারের যষ্টির আঘাতে সংজ্ঞাহীনা হয়ে লুটিয়ে পড়ল বজরার পাটাতনের ওপর।



জ্ঞান হল প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে। দস্যুরা ওদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছিল বটে, অহেতুক প্রাণহানি করেনি। যারা সম্ভরণে অভ্যস্ত তাদের অনেকেই গঙ্গায় কাঁপ খেয়ে পড়েছে। যারা সাঁতার জানে না, তারা শুধু ধরহরি কাঁপতে থাকে। পাইক ছাঁজন প্রতিরোধ করার চেষ্টায় প্রাণ দেয়, অথবা আহত অবস্থায় গঙ্গায় কাঁপ খায়। তাদের মধ্যে কয়জন বেঁচে গেছে তার হিসাব নেই।

জ্ঞান হয়ে দেখল, সে একটি বজরায় শায়িত। ছোট্ট একফালি কামরা। একটি মধ্যবয়সী মহিলা ওর মাথায় জলপটি বদলে দিচ্ছেন। ওর মাথায় আহত স্থানটি বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ বজরাটি দস্যু-সর্দারের। মহিলাটি জানতে চায়, দর্দ হয় ক্যা?

হট্টা নেতিবাচক শিরঃসঞ্চালন করে। মহিলাটি ওকে কী যেন একটা পানীয় গ্রহণ করতে বলেন। সম্ভবত 'নিম্বুপানি'। সেটা পান করে ও কিছু সুস্থ বোধ করে। জানতে চায়, আমাদের দলের আর সবাই কোথায়?

স্ত্রীলাকটি ঠোট হিন্দিতে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন যে, তারা বিশ ত্রিশ ভাঁটিতে তাদের বজরায় পড়ে আছে। তাদের মধ্যে কতজন 'জিন্দা' আর কতজন 'গুজর গয়া' এ সংবাদ তিনি জানেন না। উপসংহার হিসাবে বলেন, সবাই অবশ্য শেষমেশ মরবেই। অনাহারে। কারণ জলদস্যুরা তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে এনেছে। আহাৰ্য বা তণ্ডুল সে জলখানে নাই।

—আমার মতো আর কয়জনকে এভাবে তুলে এনেছে?

—ওঁর কোই নেহি। সিরেফ আকেলি তু।

তারপর সে নিজেই প্রশ্ন করে, জানতি হো কৈসে তু বঁচ গয়ী?

হট্টা নিষ্পন্দ তাকিয়ে থাকে। মহিলাটি তার বিচিত্রভাষে বুঝিয়ে বলে, তোকে 'জান' দিয়েছে তেরি জওয়ানি ওঁর খুবসুরতি।

হট্টা জানতে চায়, তুমি কে? দস্যুসর্দারের ঘরওয়ালি?

মেয়েটি স্নান হাসল। তার ভাষায় যা বলল তার অর্থ : লোকটার ঘরই নেই, এই নৌকাই তার আশ্রয়। তা ঘরওয়ালি থাকবে কেমন করে? মায় হুঁ সর্দারকী রখেল।

'রখেল'! তার অর্থ কী? প্রশ্ন করায় মহিলাটি বললে, তু ন হি জানতি ক্যা? হিম্মৎবালে আদমি খুবসুরৎ রখেল পালতে হুয়!

বুঝিয়ে বলে, 'রখেল'কে সাদি করা যায় না। লেकिन সুহাগমে কোই কমি নেহি। যদিও তার জন্য সোনেকি জঞ্জিরের ইত্তাজামও থাকে। তারপর তার নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, দেখতেই তো পাচ্ছিস, মায় বুড়ি বন্ গয়ী।

এখন তার বাতিল হবার জমানা। সে এবার ধরম্-করমমে মন বসাবে। হট্টাকে আশ্বাস দেয়, তার এখন দশ-বিশ বছর কোনও অসুবিধা হবে না—যবতক্ ওঁর জওয়ানি আর খুবসুরতি অটুট থাকবে।

কী মর্মান্তিক দুর্ভাগিনী আমাদের কাহিনির নায়িকা : জন্মমুহূর্তেই হারিয়েছিল

কাশীযাত্রা

গর্ভধারিণীকে। শিশুকাল বিদায় নেবার আগে বিদায় নিল মায়ের বিকল্প মামণি; বাল্যকাল শেষ হবার আগে মামণির বিকল্প সোনা-মা! পেয়েছিল এক ক্ষণজন্মা ব্রাহ্মণকে পিতা হিসাবে। লাখে-একটা অমন মানুষ হয় না। বালবিধবা হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে দাহ করে এল চণ্ডাল-শ্মশানে। ‘প্রেম’ এসেছিল নিঃশব্দচরণে। ওর খেলার সাথীর হাত ধরে। রূপমঞ্জরী কৈশোরের উষালগ্নেই হয়ে গিয়েছিল : মঞ্জু। নিষ্ঠুর নিয়তির সেটা সহ্য হল না। ওর জীবনের প্রথম প্রেম বিবাগী হয়ে মানস সরোবরে যাত্রা করল। তবু সে হার মানেনি। আয়ুর্বেদশাস্ত্র আয়ত্ত করে স্বামী-স্ত্রী মিলে খুলে বসতে চেয়েছিল একটি আরোগ্য-নিকেতন। সে স্বপ্ন মুছে গেল বজ্রাঘাতে। ওর হাতে রইল স্পর্শ-বাঁচানো একটি ভাদ্রের ফোটা-কদমের সুখস্মৃতি।

কিন্তু আমার কী অপরাধ? আমি কী করতে পারি? এটাই যে কথাকোবিদের নিয়তি! স্বয়ং আদিকবির নায়িকাও ভেঁ ছিল জনমদুখিনী! সেওতো সবকিছু পেয়েও হারিয়েছিল তার বেশি! নিয়তির নিষ্ঠুর কশাঘাতে তাকেও তো একদিন বলতে হয়েছিল : মা ধরনী! দ্বিধা হও!

আদিকবির খাণ্ডের কলমেও কি মাঝে মাঝে কালি শুকিয়ে যেত? তাঁর তালপাতার পৃষ্ঠাও কি আমার পাণ্ডুলিপির মতো টপটপ করে ঝরে-পড়া চোখের জলে যেত ভিজ়ে?



ক্রমে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হল। সর্দারের বয়স্থা রখেলের নাম রুক্মিনী।

ব্রাহ্মণ-কন্যা। আদি নিবাস রাজস্থান। মানুষ হয়েছে গৌড়বঙ্গে। মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি জিয়াগঞ্জে। ওর পিতা ছিলেন ফতেচাঁদ বা জগৎ শেঠ-এর প্রিয় পাত্র। বিবাহ হয়েছিল ওই জিয়াগঞ্জেই। আট বছর বয়সে। শাস্ত্র মেনে : ‘অষ্টম বর্ষে তু ভবেৎ গৌরী।’ ‘গহনা’, অর্থাৎ দ্বিরাগমন হয় বোড়শ বর্ষে। সাত বছর বজায় ছিল তার শাঁখা-সিঁদুর। তা যখন ঘুচল তখন ঋগুরকুল আয়োজন করলেন শাস্ত্রসম্মত সহমরণের। রুক্মিনীর দুই সতীন ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সন্তানবতী এবং সংসারে প্রতিষ্ঠিতা। এই নিঃসন্তানা নবাগতাকেই প্রদান করা হল স্বামীর চিতায় উঠে বসার অধিকার। এরপর সবকথা ওর ঠিক ঠিক মনে পড়ে না। কী-একটা সরবৎ ওকে খাইয়ে দেওয়া হয়। ওর সবকিছু গুলিয়ে যায়। মাথার ভিতর টলমল করতে থাকে। বাকিটা শুনেছে সর্দারের কাছে। সর্দার তখন জিয়াগঞ্জের ঘাটে তার দস্যুদল নিয়ে ছক কষছে : কোন্ শেঠের গদিতে ডাকাতি করতে গেলে বিপদের আশঙ্কা কম, লভ্যাংশ বেশি।

হঠাৎ ঘাটে একটা সোরগোল শুনে সদলবলে সে কৌতূহলী হয়ে সতীদাহ দেখতে আসে।

ধুতুরামিশ্রিত সরবৎ পান করে রুক্মিনীর মাথায় যেমন চক্কর দিয়েছিল, এই একবস্ত্রা ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয়াকে স্নানরতা অবস্থায় দেখে সর্দারের মাথাতেও তেমনি চক্কর দিয়ে উঠল। ওরা সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুক্মিনীর শ্বশুরের পাইক-বরকন্দাজের উপর। কোন পক্ষে কতজন হতাহত হয়েছিল সেটা হিসাবের বাইরে। রুক্মিনীকে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করতে হয়নি। তারপর সে দীর্ঘদিন আছে সর্দারের 'রখেল' হিসাবে। মাঝে কিছুদিন সে কাশীর এক বাইজির আশ্রয়েও ছিল। ওর কোন সন্তান নেই, খেদও নেই। সর্দারকে ও ভালবাসে। সর্দারও ওকে। এখন ওর জওয়ানি খতম হয়েছে। সে খুশি মনেই তার বাইজি-বহিনের আশ্রয়ে ফিরে যাবে। বাকি জীবন ভজন গাইবে।

হটা জানতে চেয়েছিল, ও তোমাকে সাদি করল না কেন?

—ও মা! তা কী করে করবে? ও তো নিচু জাত। জল-অচল। আর আমি বামুনের বিধবা। সাদি কেমন করে হবে?

হটা রুখে ওঠে, এ তো আজব কথা! ব্রাহ্মণের বিধবাকে 'রখেল' রাখা যাবে অথচ বিবাহ করা যাবে না?

—পণ্ডিতজী তো তাই বলেছিলেন। কোনও শাস্ত্রে নাকি বলা নেই 'রখেল' পোষার সময় জাতবিচার করা হবে কি হবে না।

হটা নিজেও কিছু শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়েছে। ওরও মনে পড়ল না মনুসংহিতায় বা গৃহসূত্রে উপপত্নী নির্বাচনের সময় জাতি, গোত্র, কৌম ইত্যাদির বিচার করতে হবে কিনা। পুরুষ-স্ত্রীর জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠিবিচার আদৌ নির্ণেয় কি না।

রুক্মিনী ওকে আশ্বস্ত করেছে—সর্দারের কোনো বিকৃত রুচি নাই। একটু নেশাভাঙ করে, এই যা। কামবিকার নাই! স্বাভাবিক সুরতেচ্ছা।

বজরা এসে পৌছেছে বিহার রাজ্যে। পার হল রাজমহল। তারপর আরও গুটিকয়েক গঞ্জ। এখানে লোকালয় জনমানবশূন্য নয়। সকালের দিকে ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড়। পালোয়ানেরা ডন-বৈঠক দেয়। পণ্ডিতজীরা জলমগ্ন অবস্থায় গঙ্গাজলে গঙ্গাকেই অঞ্জলি দেন। পাণ্ডাজি গোলপাতার ছাউনিতে স্নানার্থীদের জামাকাপড় পাহারা দেয়। বাচ্চারা কাঁপাই জোড়ে। বধূরা টুপটুপ ডুব দেয়। পানকৌড়ির মতো।

রুক্মিনী এখন কাজে ব্যস্ত। রান্নার দায়িত্বটা তার। বজরার সঙ্গে চলেছে আরও তিনটি ছিপ-নৌকা। দৈনিক বিশ-পঁচিশজন দস্যুর আহাৰ্য প্রস্তুত করতে হয়। হটা গৃহবন্দিনী। কামরার বাইরে আসার হুকুম নাই। সর্বক্ষণ এক সশস্ত্র প্রহরী ওর দরজার সম্মুখে পাহারায় থাকে। ওর কক্ষ-সংলগ্ন স্নানাগার ও শৌচাগার আছে। ওর আহাৰ্য প্রতিদিন নিয়ে আসে একটি বালক। সাত-আট বছর বয়স। নাম : রতনলাল। সর্দারের

কাশীযাত্রা

একমাত্র মাতৃহীন সন্তান। মানুষ হচ্ছে তার বিমাতা-প্রতিম রুক্মিনীর দেখভালে। হটীর সঙ্গে তারও খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ছেলোটো বাংলাভাষা একেবারেই বোঝে না। তবে একমুঠিবাবার দয়ায় হটী কাজ-চলা মতো হিন্দি বলতে পারে। রতন প্রায়ই এসে বসে তার 'মৌসি'র কাছে। গল্প শোনে—ধ্রুব, একলব্য, প্রহ্লাদ, লবকুশের কাহিনি। এদের কাউকেই রতনলাল এতদিন চিনত না।

রুক্মিনীকে হটী এখন 'দিদি' ডাকে। বয়সে সে দশ-পনের বছরের বড়। একদিন সে জনান্তিকে রুক্মিনীকে বললে, একটা কথা বুঝিয়ে বল তো, দিদি। আমি আজ দশ-পনের দিন এ বজরায় আছি, কিন্তু সর্দার তো একরাত্রিতেও এল না আমার গায়ে হাত দিতে। কেন?

রুক্মিনী বললে, হয়তো বজরার এই ছোট্ট ঘরখানা তার মনপসন্দ নয়। কাশীধামের উল্টোদিকে রামনগরের কাছাকাছি আমাদের একটা গোপন আস্তানা আছে। সেখানে পৌঁছে তোকে নথ পরাবে।

—'নথ পরাবে'! তার মানে?

—'সাদি'র পরে প্রথম রাতটাকে যেমন বলে 'ফুলশেষ', রখেল পোষারও তেমনি একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে। খানাপিনা হয়। গানা-বজানাও চলে। সে রাত্রে মরদ তার পোষা ময়নাকে একটা সোনার টানা-নথ পরিয়ে দেয়। তার মানে, আনুষ্ঠানিকভাবে ওই স্ত্রীলোকটিকে সে তার 'রখেল' হিসাবে স্বীকার করে নিল।

রূপমঞ্জরী অনেকক্ষণ নীরবে কী যেন ভাবল। তারপর বলে, দিদি, তুমি আমাকে একটা জিনিস এনে দেবে?

—কী? বল?

—একটা পিতলের কলসি।

—মতলব?

—আমি ভাল সাঁতার জানি। প্রহরীটার চোখ এড়িয়ে কোন রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ খেলেও ডুবে মরতে পারব না। দড়ি লাগবে না। শাড়ি আমার কাছেই আছে। কেউ কিছু টের পাবে না। তোমাকে সন্দেহ করবে না। ঘরে একটা জলভরা কলসি রেখে গেলেই...

রুক্মিনী কথার জবাব দেয় না। নিঃশব্দে উঠে চলে যায়।

পরদিন সে আবার ফিরে আসে। জানতে চায়, সর্দারের উপপত্নী হিসাবে জীবন অতিবাহিত করতে সে কেন রাজি নয়। রূপমঞ্জরী বলল, সে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আত্মহত্যা আমাকে করতেই হবে। এখানে সুযোগ নেই। কাশীতে পৌঁছে নিশ্চয় তা পেয়ে যাব। কেউ যদি আত্মহত্যা করতে বন্ধপরিকর হয় তাহলে তাকে রোখা যায় না। আমি চাইছি ও আমার ধর্মনিষ্ঠ করার আগেই তা করতে। কাল সে জন্যই আমি তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম।

রুক্মিনী বলল, তুই যা চাইছিস তা আমি তোকে দিতে পারব না। সেটা আমার

পক্ষে নিমকহারামি হয়ে যাবে। ও লোকটা আমার জান দিয়েছে। দীর্ঘদিন দুনিয়াদারী করার সুযোগ দিয়েছে। সুখেও রেখেছিল। আমার জওয়ানি হারিয়ে যাওয়াটা আমার হাতে নেই, তা বলে তাকে আমি দোষী করতে পারি না। কিন্তু তাকে আমি বাঁচাতে পারি। যদি তুই সচ্ছ আমার সব কথার জবাব দিস। কেন জানতে চাইছি তা জিগ্যেস করবি না।

আশার একটা ক্ষীণ আলোকবর্তিকা দেখতে পেল রূপমঞ্জরী। বললে, মিছে কথা আমি বলি না, দিদি। বলব না। কী জানতে চাও বল?

—তুই বামুনের বিধবা একথা আগেই বলেছিস। তোর সাদি হয়েছিল কত বছর বয়সে?

—এগারো।

—আর গাওনা?

—না। দ্বিরাগমন আমার হয়নি। তার আগেই আমি বিধবা হয়ে যাই।

—তার মানে ফুলশয্যা হয়নি? সোয়ামির সঙ্গে একটা রাতও কাটাসনি?

—সে তো বটেই!

—আর কোনো পুরুষের সাথে?

—মানে?

—ন্যাকামি করিস না! এর মানে বোঝা কি এতই শক্ত? যা জিগ্যেস করছি, সাফ সাফ ব্যতা দে। তুই কি জিন্দেগিভর কখনো কোনও পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটাসনি?

—এসব কথা জানতে চাইছ কেন?

—না বলতে চাস, বলিস না। তোর জীবনের গোপনকথা আমারই বা জেনে কী লাভ? তোর 'ভালাই'-এর জন্যই জানতে চাইছি। আমি যা জানতে চেয়েছি—তা যদি সত্যি হয়—পুরুষ-সংসর্গ যদি তোর এই এককুড়ি-পাঁচ বছর বয়সে একবারও না হয়ে থাকে তাহলে আমি তোকে হয়তো বাঁচাতে পারব। তোকে সর্দারের 'রখেল' হয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে না। তোকে ও ছেড়ে দেবে। যেখানে চাস তোকে নামিয়ে দেবে। কিছু অর্থও দেবে।

রূপমঞ্জরী অবাক হয়ে যায়। কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারে না। আশায় উদ্দীপনায় উজ্জ্বল হয়ে বলে, হ্যাঁ দিদি! তুমি যা বললে তাই ঠিক। জীবনে আমি কখনো কোনো পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুইনি। ফুলশয্যার রাত্রিটা আমার জীবনে আসেইনি। বাকি জীবনেও কোনো পুরুষের সঙ্গে আমার সহবাস হয়নি।

—কোনও দাই-এর সাহায্যে আমরা কিন্তু পরীক্ষা করে নেব। সচ্ছ বলছিস?

রূপমঞ্জরী রুখে ওঠে, এ কথার জবাব আগেই দিয়েছি দিদি, আমি মিছে কথা বলি না।

রুক্মিনী তখন ওকে জানাল এক গুট বার্তা। দশদিন এ বজরাতে যদিও ওই সুন্দরী

কাশীযাত্রা

মেয়েটি বাস করছে তবু সর্দার তার দেহটা উপভোগ করতে আসেনি—তার হেতু সম্পূর্ণ অন্যরকম। সর্দারের এক গুরুজী আছেন। কাশীতে তাঁর আশ্রম। মহা নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক। তিনি বহুদিন পূর্বে সর্দারকে জানিয়েছিলেন এক অক্ষতযোনি ব্রাহ্মণকন্যার নিতান্ত প্রয়োজন তাঁর। তত্ত্বসাধনার এক কঠিন মার্গের শেষ পর্যায়ে অমন একটি কন্যাকে তাঁর সাধনসঙ্গিনী করতে হবে। সাধিকা ব্রাহ্মণকন্যা হওয়া চাই। তার অঙ্গহানি থাকলে চলবে না। বয়ঃক্রম ন্যূনতম ষোড়শ, উর্ধ্বতম ত্রিশ। আর তার আবশ্যিক আর একটি গুণ থাকা চাই—তাকে অক্ষতযোনি হতে হবে। সেক্ষেত্রে তান্ত্রিক গুরুমহারাজ সাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করবেন। তিনি বাকসিদ্ধ হয়ে যাবেন এবং সর্দারকে অস্ত্রসিদ্ধ করে দিতে পারবেন। অর্থাৎ কোনো অস্ত্রই সর্দারের দেহে তখন আর বিদ্ধ হবে না। তরোয়াল বা ভল্ল প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে।

সর্দার দীর্ঘদিন সন্ধান করে ফিরেছে। ‘অস্ত্রসিদ্ধ’ হবার বাসনাটা তার উদগ্র কিন্তু অমন একটি যুৎসই রমণীরত্নের সন্ধান পায়নি। রূপমঞ্জরীকে পরীক্ষা করে যদি সর্দারের বিশ্বস্ত ধাত্রী সিদ্ধান্তে আসে যে এই মেয়েটির দেহে কোনও পুরুষ-সংসর্গের প্রমাণ নাই, তাহলে তাকে ও আদৌ ‘রখেল’ হিসাবে রাখবে না। গুরুদেবকে এই দুর্লভ উপহারটি ভেট দেবে। সেই সূত্রে গুরুদেবের সাধনসঙ্গিনী হয়ে যাবেন ওর মাতাজী। গুরুদেব পরিবর্তে ওকে ‘অস্ত্রসিদ্ধ’ করে দেবেন। বাকি জিন্দেগিভর কোনও হারামজাদা ওকে বর্ষণ বিদ্ধ করতে পারবে না, তরোয়ালের কোপেও কাবু করতে পারবে না। দস্যুসর্দারের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ প্রাপ্তি এক রমণীরত্নকে ‘রখেল’ রাখতে পারার চেয়েও অনেক অনেক বেশি মূল্যবান।

রুক্মিনী ওকে বোঝাল, তান্ত্রিক ওকে কোনো এক অমাবস্যা রাত্রে একরাত্রের জন্যই সাধনসঙ্গিনী করতে চান। তারপর তার ছুটি। সেই একটি রাত্রে সাধনসঙ্গিনীকে ঠিক কী-কী করতে হবে তা অবশ্য রুক্মিনী জানে না। আন্দাজ করে, তার অক্ষত নারীত্বকে পূর্ণাঙ্ঘতি দিতে হবে।

‘মৎস্য-মাংস-মদ্য-মুদ্রা’ ইত্যাদি সাধনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে কিনা জানা নেই। তবে শেষ ‘ম’-কারটা যখন অনিবার্য তখন একরাত্রের জন্য কি বিধবার পক্ষে বাকি চারটি অকিঞ্চিৎকর ‘ম’-কার গ্রহণে কিছু আপত্তি থাকতে পারে?

রূপমঞ্জরী নতনেত্রে বললে, আমি স্বীকৃত।

—আমি জানতাম। তুই রাজি হয়ে যাবি। সিরফ এক রাতের যন্ত্রণা। যন্ত্রণাও ঠিক নয়। শুনেছি, মন্ত্র, দারু আর মাংসের প্রভাবে উত্তেজনা এমন চরম হয়ে ওঠে যে, সাধিকা সক্রিয় অংশ নেয় শেষ মৈথুনপর্বে। এমনকি কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাধিকা আমাকে গোপনে জানিয়েছে যে, প্রথম পুরুষ-সংসর্গের যে যন্ত্রণাটা স্বাভাবিকভাবে হয়, চক্রের সাধনমার্গে তাও হয় না। মদ্যপ্রভাবে সব কিছুই ভাল লাগে সাধিকার। প্রথম সংসর্গেই চরম পুলক লাভ করে সাধনসঙ্গী আর সঙ্গিনী।

—তাহলে আর আপত্তি কিসের? আমি রাজি।

নিশ্চিত হল রুক্মিনী—রূপমঞ্জরী একরাতের জন্য সেই অপরিচিত তান্ত্রিক সাধুবার কাছে তার নারীত্বের অর্ঘ্য উজাড় করে দিতে রাজি।

রুক্মিনী তিলমাত্র আন্দাজ করেনি, রূপমঞ্জরীর অন্তরে তখন জাগ্রত হয়েছিল একটি নীতিবাক্য : ‘অশুভস্য কালহরণম্’।

সে অস্বীকৃতা হলে সর্দার হয়তো সে রাতেই বন্যমহিষের মতো ওর ধর্মনষ্ট করতে তেড়ে আসবে। মদের ভাণ্ডটি হাতে করে!

অন্তত মাসখানেকের জন্য সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ওই মুখ সংস্কারাচ্ছন্ন দস্যুসর্দার সুন্দরী যুবতীর একটা নিরাবরণ দেহের অপেক্ষা ‘অস্ত্রসিদ্ধ’ হওয়ার অলীক স্বপ্নে আপাতত বিহ্বল।



কিন্তু এ কী ব্যাপার? মহানগরী পাটলিপুত্রের কাছাকাছি এসে বজরাটাকে একটা আঘাটায় নোঙর করা হয়েছে। তারপর পুরো পাঁচদিন সে নোঙর তুলল না। কেন? বজরার অনুবঙ্গী ছিপ নৌকাগুলি ক্রমাগত শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। বজরায় সংগৃহীত হচ্ছে রসদ। এ জলযানটা যে দস্যুসর্দারের তা হয়তো জানে নগর-কোটাল। তাই সেটাকে একটা খাড়ি-পথে গাছ-গাছালির অন্তরালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু রসদ সংগ্রহ করতে পাঁচদিন লাগবে কেন? রুক্মিনী কদিন আসছে না। রতনলালও নয়। পাহারাদার অবশ্য নিরন্তর পাহারা দিচ্ছে। তাকে প্রশ্ন করেছিল, সদুত্তর পায়নি। দ্বিতীয় দিন জানতে চাওয়ায় তিরস্কৃত হয়েছে।

বজরাটা প্রায় নির্জন। সবাই ছিপে চেপে শহর দেখতে গেছে। সর্দার যায়নি। তার নামে হলিয়া আছে। রুক্মিনী অথবা রতনলালও শহর দেখতে গেছে হয়তো। কারণ তাদের দেখা মিলছে না।

এই গোপন আস্তানায় বজরাটা নোঙর করার পরদিন ঘটনাচক্রে সর্দারকে দেখতে পেল। অতি প্রত্যুষে। পূর্বের আকাশটা সবে ফর্সা হতে শুরু করেছে। সর্দার তার নির্দিষ্ট শয়নকক্ষ থেকে নির্গত হয়ে এল। দাঁড়াল বজরার ফাঁকা ছাদে। দশাসই জোয়ান। যেন মহিষাসুর। মাথায় লালশালুর ফেট্রি। একমুখ গোঁফদাড়ি। গলায় একটা রত্নাক্ষর মালা। কিন্তু লোকটা কী করছে? মনে হল একটা চটের থলি থেকে কী একটা পাখিকে বার করে আনল। পাখিটা উড়তে পারে না। দেখতে কবুতরের মতো। কিন্তু গমনভঙ্গিমা কবুতরসুলভ নয়। কাঠের পাটাতনে সেটা জোড়া-পায়ে হাঁটছে। লাফিয়ে লাফিয়ে। সর্দার তাকে হাতে তুলে নিয়ে কিছু শস্য খাওয়াল। বোধহয় ভুট্টার দানা। তারপর—রূপমঞ্জরীর মনে হল, পাখিটার কানে-কানে কী যেন মন্ত্র পড়ল। কী নিষ্ঠুর!

কাশীযাত্রা

পরমুহূর্তেই পাখিটাকে ছুঁড়ে দিল গঙ্গার দিকে। সেটা কিন্তু জলে পড়ল না। মস্তবলে সেটা উড়তে শিখে গেছে। চক্রাকারে পাখিটা পাক খেতে থাকে। অনেক-অনেক উঁচুতে। এবার সর্দার তাকে ডাকল—আ—আ—আ—আ!

পাখিটা—না, ওটা কবুতরই—ঘুরতে ঘুরতে এসে বসল ওর কাঁধে। সর্দার তাকে আদর করল। তার পায়ে সুস্বাদু রেশমিসূতোয় লেখা কী একটা ভূর্জপত্রের টুকরো বেঁধে দিয়ে নৌকার পাটাতনে নামিয়ে দিল। এখন আর সে জোড়া-পায়ে হাঁটছে না। সর্দার তার পুলিন্দা থেকে বার করে আনে একটি বিরাট শঙ্খ। উর্ধ্বমুখে শঙ্খধ্বনি করে ওঠে। ততক্ষণে সূর্যদেব দেখা দিয়েছেন পূর্ব গগনে। যেন তাঁরই আবাহনী মন্ত্র। বনেনবনান্তরে সেই শঙ্খধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

তৎক্ষণাৎ পারাবতটি উঠে যায় আকাশে। একটা বিরাট চক্র দিয়ে সে রওনা হয়ে পড়ে সূর্যের বিপরীতে। পশ্চিমমুখে। পাখিটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছোট হতে-হতে বিন্দুবেৎ হয়ে গেল। তারপর মেঘের আড়ালে কোথায় মিলিয়ে গেল।

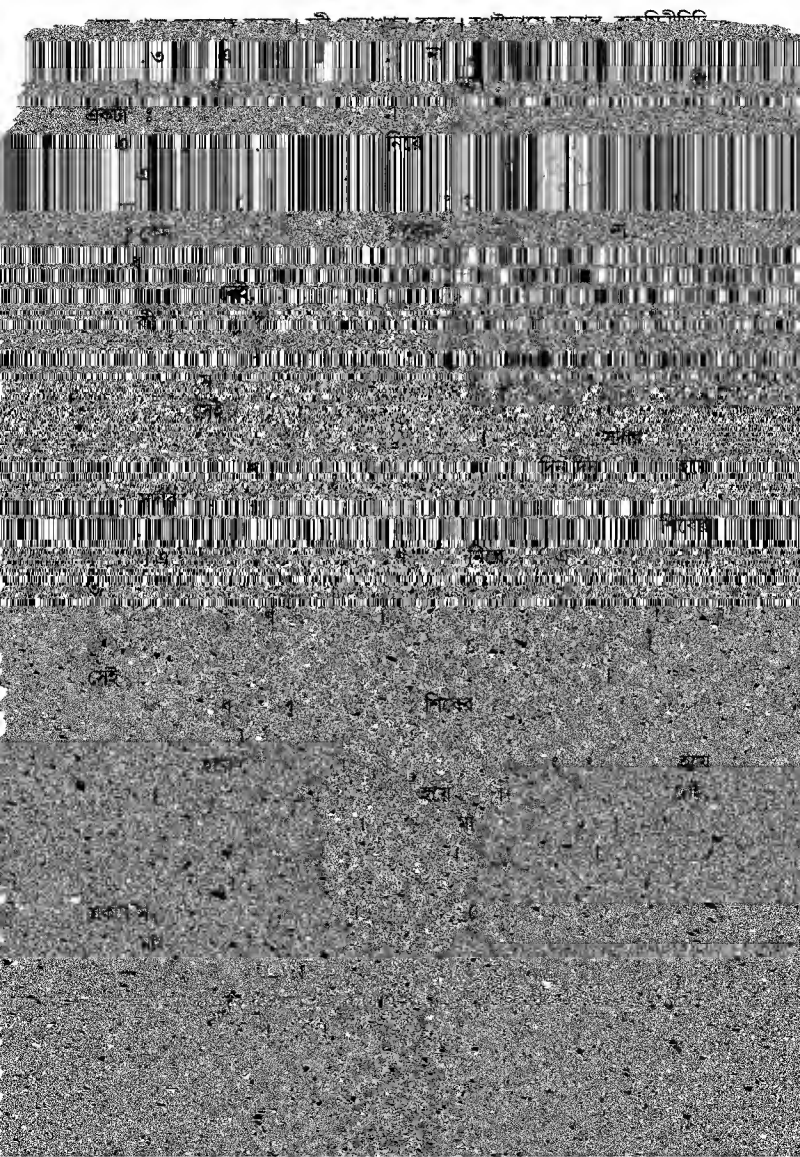
হঠাৎ অবাক হয়ে যায়। এর তাৎপর্য কী? পাখিটা মনে হল কবুতর। শুনেছে কবুতরকে রণ-সেনাপতির। সংবাদবহ রূপে আকাশে উড়িয়ে দেয়। এ লোকটা যেন রামগিরি পর্বতের সেই বিরহী যক্ষ। কিন্তু সে তো বিপত্তীক। তার ‘রখেল’ তো নিত্য তার অঙ্কশায়িনী! তাহলে? সে কোন্ অজানা অলকায় প্রেরণ করল তার দূত? কবুতরটার কানে-কানে অত অল্প সময়ে কী মন্তোচ্চারণে সে বলে দিল কোথায় কোন পথে তাকে পাঠানো হল : ‘মার্গং অবচ্ছনু চ কথয়তস্বৎপ্রয়াগানুরুপং’। না হয় মেনে নেওয়া গেল, কবুতরটা সে খবর জানে। জানে অর্থাৎ কোথায়, কোন অলকাপুরীতে ওই দস্যুসর্দারের বিরহিণী যক্ষিণীর বাস। ধরে নেওয়া যাক, সে পথের নির্দেশ ওর নখদর্পণে। বেশ, পৌছাল। কিন্তু কী বার্তা সে শোনাতে প্রাপককে? ‘সন্দেশং মে তদনুটুকু তো কবুতরকে শিখিয়ে দেওয়া হল না? তাহলে?

এ ব্যাসকূট-অনুপপত্তির সমাধান হল না আদৌ!

ক’দিন ধরে না আসছে রুক্মিনী, না রতনলাল। সারারাত ও বিছানায় ছটফট করে। তৃতীয় দিন দেখল আবার এক অদ্ভুত দৃশ্য। সেই অতি প্রত্যুষে, যখন “উষো যাতি স্বসরস্য পল্লী” (উষা সূর্যদেবের অগ্রবর্তিনীরূপে আবির্ভূতা হন)। সর্দার বার হয়ে এল ছাদে। মাথায় লালশালুর পট্ট। উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। আকাশের দিকে মুখ করে ডাক দিল : আ—বা—বা—বা। দেখা গেল মেঘের অন্তরাল থেকে পাক খেতে খেতে নেমে এল সেই কবুতরটি। সর্দার তাকে দু-হাতে লুফে নিল। তাকে চুষন করে প্রবেশ করল তার একান্তকক্ষে।

হঠাৎ লক্ষ্য হল তারপরেই কেমন যেন স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসতে থাকে বজরায়। একে একে ছিপগুলি ফিরে এল। বজরায় এখন অনেক লোক। কিন্তু কোনো কোলাহল নেই। পরস্পরের সঙ্গে ওরা কথা বলছে নিম্নকণ্ঠে। কী যেন একটা দুঃসংবাদে জলযানটি ভারি হয়ে উঠেছে।

দ্বিপ্রহরে ওর আহাৰ্য-থালিকা নিয়ে উপস্থিত হল সেই প্রহরীটি। যে এ কয়দিন



সোরগোল শুনে সবাই ছুটে এসেছে। সর্দারও। হঠাৎ তার নাসিকাগ্রে তর্জনীটা তুলে কালিকাপুরাণ থেকে আট-দশটি শ্লোক গড়গড় করে আওড়ে গেল। অতবড় দশাসই সর্দার কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। জোড়হস্তে বলে, তু ক্যা মাংতি রে, মা?

হঠাৎ নৌকার পাটাতনে লুটিয়ে পড়ে। আছাড়ি-পিছাড়ি খায়। কিছুক্ষণ পাটাতনে মুখ ঘষে উঠে বসে। অনেকটা যেন স্বাভাবিক হয়। তার বাহাজ্ঞান ফিরে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে আধাহিন্দী-আধাবাংলায় বলে, সর্দার! আমি ডাকিনীবিদ্যা সিদ্ধা! তোর ছাওয়ালটাকে যে পিশাচ কজা করেছে তাকে বিতাড়ন করার মন্ত্র আমি জানি। তাকে এই মুহূর্তেই কজা করতে পারি। তুই আমাকে রতনের কাছে নিয়ে চল! ময়্য অভি বহ্ শয়তানকো গর্দন পকড়কে নিকাল দুম্দি।

সর্দার তৎক্ষণাৎ হঠিকে নিয়ে গেল শম্যাস্ত্রীন বালকটির কক্ষে।

হঠাৎ কিছু অনুপান ভিক্ষা করল। একটি খোলা পানপাতা, একটু সিঁদুর, সরিষার তেল আর গঙ্গাজলনিষিক্ত তণ্ডুল। প্রথমেই বালকের শম্যাস্ত্রীর চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিল পানপাতা থেকে তৈলসিন্দুর-রঞ্জিত তণ্ডুলকণা মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে। তারপর রুক্মিনীর দিকে ফিরে বললে, সমঝি? ময়্য ক্যা করতি?

রুক্মিনী নেতিবাচক মন্তক সঞ্চালন করে। হঠাৎ বললে, 'দেহবন্ধন'! অব্ বহ্ বদমাস পিশাচ রতনকো ছুঁনে নহি সকেগা!

বসল বালকের মাথার কাছে। দীর্ঘক্ষণ তার নাড়ির গতি লক্ষ্য করল। তারপর জানতে চাইল, তাকে যখন অপহরণ করে আনা হয়, তখন একটি পুলিন্দায় ডাকিনীবিদ্যার কিছু সাজসরঞ্জাম ছিল। সেগুলি কোথায়?

তৎক্ষণাৎ সর্দারের আদেশে একজন জলদস্যু নিয়ে এল তার ঔষধের পুলিন্দা। হঠাৎ তা থেকে বাহির করল তার খল-নুড়ি, মধুপর্কের আধার আর কিছু ঔষধচূর্ণ। 'খল'-এ ঔষধবটিকা অর্পণ করে, মধুমিশ্রিত সেই ঔষধটি নুড়ি দ্বারা পেষণ করতে থাকে।

রতনের জ্ঞান নেই। চোখ দুটি নিম্নীলিত। দাঁতে-দাঁত লেগে আছে। বিগত অহোরাত্রে তাকে কিছু আহার বা পান করানো যায়নি। মৃত্যুপথযাত্রী আছে নির্জলা উপবাসে।

ঔষধ প্রস্তুত শেষ হলে রতনের মুখটা জোর করে উন্মুক্ত করাল। তার জিহ্বায় সেই মধুমিশ্রিত ঔষধটি লেপন করে দিল। আবার বসল তার নাড়ি ধরে। চতুর্দিকে ঘিরে আছে নির্বাক জলদস্যুর দল। অর্ধদণ্ড পরে নিশ্চেতন বালক ধীরে ধীরে তার চোখ দুটি খোলে। সে-দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন। প্রত্যক্ষকে উপলব্ধি করায় অসমর্থ। তার ঠোঁট দুটি ফাঁক করে হঠাৎ কয়েক ফোঁটা গঙ্গোদক ঢেলে দিল। জিহ্বা শীতল হল। তারপর ধীরে ধীরে ওর কণ্ঠনালিতে জল ঢেলে দিতে থাকে। অধিকাংশই গুঁঠাধরের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে এল বটে কিন্তু কিছুটা কণ্ঠনালীতে প্রবেশও করল। হেতুর্থে পঞ্চমী। গলকণ্ঠের 'সঞ্চলনাৎ'! আবার প্রয়োগ করল একদাগ ঔষধ। রতনের চক্ষুদ্বয় পুনরায় নিম্নীলিত হয়ে গেল। কিন্তু পুনরায় একদণ্ড পরে রতন তাকিয়ে দেখে। এবার সে-দৃষ্টি উন্মাদের

ঘোলাটে চাহনি নয়। রূপমঞ্জরী তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, ক্যা রে রতন? মুখে পহচাস্তে হো ক্যা?

বালক হাসে। অস্ফুটে বলে : মৌসি!

রূপমঞ্জরী ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। শিরশ্চুম্বন করে বলে, ডরো মৎ, বেটা! আরামসে নিন্দ যাও।

শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ায়। সর্দারের দিকে ফেরে। বলে, বহু পিশাচ ভাগ গয়া! ডরো মৎ। অব্ তুম নাও ছোড় সক্তে হো। শিউজীকে পাশ কাশীধাম চলো।

রুক্মিনীর দিকে ফিরে হিন্দিতে বলে, কিছুক্ষণ বাদে-বাদে ওকে গঙ্গাপানি পিলাতে বেলো। ওর শরীরে জলীয় অংশ 'কমি' হয়ে গেছে।

—খানেকে বারোমে ক্যা দুঁ?

—পহলে নিম্বুপানি। পিছে ডাব-পানি। উস্কো পিছে দুধ পিলানা। খ্যয়ের যবতক ম্যয় ছকুম নহি দেতি তব্তক মৎ পিলানা।

অর্ধদণ্ড পূর্বে যে ছিল বন্দিনী, এখন সে পরিত্রাতা। মাথা ঝাড়া রেখেই সে ধীরপদে ফিরে গেল তার বন্দি-কুটুরিতে। পিছন পিছন জলযানের দোদগু প্রতাপ মালিক চলেছে জোড়হস্তে। তার পশ্চাদনুসরণ করছে দস্যুসর্দারের 'রখেল'।

বন্দিশালার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে হট্টা ধমকে ওঠে, অব্ ক্যা মাংতে হো?

হঠাৎ ওর সম্মুখে নতজানু হল দশাসই মহিবাসুরটা। করজোড়ে নিম্নস্বরে সে যে নিবেদনটি পেশ করল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল রূপমঞ্জরী। বক্তব্যের বাচ্যার্থে নয়, তার ভাবাবৈশিষ্ট্যে।

—তরে মুই পেরথমে চিন্তে লারছি, মা-ঠাইরান!

পরিকার রাঢ়বঙ্গের গ্রাম্যাভাষা। ওই বিহারী দস্যুসর্দার এ-ভাষা শিখল কোথায়?

—হমার ভরম হই গেল! অ্যাই বুড়া ছামড়াডারে মাফ করি দে, মা।

—তুমি বাঙালি?

—হঁ রে মা! মুই বাঙালিই আছি।

—আবার 'আছি' কেন? বল, 'আমি বাঙালিই'।

লালশালুর পাগড়িটা মাথা থেকে খোলে। অক্রসজল চোখ দুটি মুছে নিয়ে বলে, হঁ রে মা। বহৎ রোজ তো দ্যাশের ভাষা কই নাই। তাই ভুলিয়া গ্যাছি। গাঁয়ের মনিষি জানে, মুই দামোদরে ডুব্যা মরছি।

—দামোদর! দামোদরের ধারে ছিল তোমার ভিটে? কোন গ্রাম?

—নামটো বুললে তু কি পহছাস্তে পারবি? মোর গাঁয়ের নামটো ছেল সোঞাই।

সমস্ত দেহের রোমকূপ ভাদ্রের ফোঁটাকদমের মতো কণ্টকিত হয়ে উঠল : সোঞাই! সোঞাই! সোঞাই!!

নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, সর্দার। তোমার গাঁয়ের এক বামুনের নাম শুনেছ? চিনতে তাঁকে? ধন্বন্তরি কবিরাজ? একবগ্না ঠাকুর?

কানীয়াত্রা

এবার শুভিত হবার পালা মহিষাসুরের। কোনোক্রমে বলে, ইঁ রে মা। তাঁরে চিত্তাম। শুনছি তাঁই সংগে গেছেন।

—কিন্তু কীভাবে তিনি দেহ রাখলেন তা জান?

—হ। সিঁডাও শুনছি। বেষ্টাবায়েনের ছামড়ডারে বাঁচাইতে। তা তু ইসব কুথা শুনলি?

—সেই একবন্ধাবাবার একটি মেয়ে ছিল। তাকে মনে পড়ে?

—না, তাঁরে মুই চখে দেখি নাই। তয় তাঁইর কথা শুনছি।

—কী শনেছ?

—তাঁরে পুড়িয়ে মারতি চাইছিল তিজলহাটির এক হারামজাদা বামুন...

—যাঁর মাথা থেকে শামলাটা তীরবিদ্ধ করে তুমি পথের ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছিলে তাই তো?

শুভিত দস্যুসর্দার এতক্ষণে বজ্রাহত।

—কী হল? মনে পড়ছে না? তর খুড়া তোরে বুইলো অই শামলাটো ভুঁয়ে নামারে দে, বাবা ঈশেন! তয় খুব ইশিয়ার! চক্ষুরত্ন দুটি যান বাঁচ্যা যায়। মনে পড়ে?

দস্যুসর্দার ঈশেন বাগদি লুটিয়ে পড়ল মা-ভবানীর চরণমূলে।



বাবামশাই বলতেন : 'সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত'।—তথ্য ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ সে সত্য-শিব-সুন্দরের দিশারী। নচেৎ নয়। তাই তিনি গ্রাম্য গুনিদের অনায়াসে বলতেন, মা-মনসার স্বপ্নাদেশের কথা। নাগদংশনে বন্ধন দেবার কায়দা শিখিয়ে দিতেন।

রূপমঞ্জরীও তার উপস্থিতবুদ্ধিতে বুঝে নিয়েছিল—কীভাবে ওই বালকটির চিকিৎসার অধিকার সে লাভ করতে পারে। ডাকিনীবিদ্যা-পটয়সীর ভূমিকায় নির্দিধায় অভিনয় করে বালকটির প্রাণরক্ষা করেছে। তথাকথিত মিথ্যার মাধ্যমে। সেই সত্যনিষ্ঠার ফলাফল তৎক্ষণাৎ পেয়ে গেল। পূর্বমুহূর্তে যে ছিল বন্দিনী—তাস্ত্রিক-সম্মাসীর সাধনসঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্যের জন্য যাকে জিইয়ে রাখা হয়েছিল, সে পরমুহূর্তেই হয়ে গেল দস্যুসর্দারের : মা!





আমরা আবার ফিরে এসেছি সেই ‘আমড়াতলার মোড়ে’। 1774 খ্রিস্টাব্দে, সেই যখন দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবের চতুষ্পাঠীতে আমাদের নায়িকা হটী বিদ্যালঙ্কার আশ্রম-গৃহাবরোধে বন্দিণী। উনিশ দিনের মেয়াদ। কাশীরেশের সিংহাসন দখল করে তখন পুরন্দর ক্ষেত্রী শাসনদণ্ড হাতে নিয়েছে। স্ত্রীশিক্ষাদানের মতো জঘন্য সামাজিক অপরাধে হটী বিদ্যালঙ্কারের প্রতি কঠোর শাস্তিবিধান করা হয়েছে।

আমরা ফিরে এসেছি সেই প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভ দিবসে। পূর্বদিন মর্মান্বিত দ্বারকেশ্বর দুরন্ত অভিমানে একবস্ত্রে আশ্রম ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন হরিদ্বারের পথে। আদরিণী পালিকা কন্যাকে কোনও সংবাদ না দিয়েই। হরিদ্বারের পূর্ণকুণ্ডে স্নান করলে হয়তো তাঁর কন্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। কী পাপ? হটী বলেছিলেন, “নিজ বিবেকের বকবস্ত্রে তিনি যাচাই করে নিতে চান যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ—এমনকি বৈদিক অনুশাসন পর্যন্ত!” তার পূর্বদিন ওঁরা দুজনে—গুরু ও শিষ্যা—নৌকাযোগে গিয়েছিলেন গঙ্গার পরপারে, ব্যাসকাশীতে। অচল ঐশ্ব্যনাথের রাজ্য ছেড়ে শরণ নিয়েছিলেন সচল বিশ্বনাথের পদপ্রান্তে। তিনি কী যেন একটা তির্যক ইস্তিতও করেছিলেন। তার অর্থগ্রহণ হয়নি মহাপণ্ডিতের। কিন্তু মনে হয় সামান্য বোধের উন্মেষ হয়েছিল তাঁর পালিতা কন্যার। সময় অত্যন্ত অল্প। উনিশটি দিবসের ভিতর তিন-চারটি দিন এভাবেই কেটে গেছে। বিদ্যালঙ্কার মুক্তিপথের কোনও সন্ধানই পাননি।

সেরাত্রে তা পেলেন। কী অর্থ ওই দুটি নির্দেশের? জীবাঙ্কাকে মুক্ত-আকাশে মুক্তি দিতে হয়, পরমাঙ্কার দিকে জীবাঙ্কার অভিযান। কী অর্থ ওই তির্যক ভর্ৎসনার : ‘ঔরং হয়ে তুই শাঁখ বাজাতে ভুলেছিস?’

পরদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করলেন। ঈশেন-সর্দারের উপহার দেওয়া কবুতরটিকে হাতে করে বার হয়ে এলেন প্রাসঙ্গে। প্রতিদিনই আনেন। তাকে ভুট্টার দানা খাওয়ান। পলায়নের আশঙ্কা নাই। ও হাঁটতে পারে না। জোড়া-পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আশ্রম প্রাসঙ্গে ঘোরাফেরা করে। বিদ্যালঙ্কারের স্মরণ হল কীভাবে তিনি এই উপহারটি লাভ করেন। এইটি আর সেই বিচিত্র শঙ্খটি।

কাশীর কোনও ঘাটে বজরাটা ভেঙেনি। কাশী-কোতোয়ালের প্রহরীরা ওই বজরাটাকে বিশেষভাবে চেনে। তাই কাশীর এক ক্রোশ দূরে গঙ্গার একটি শাঁড়িতে

কাশীযাত্রা

বজরাটাকে নোঙর করা হয়েছে। এক মধ্যরাত্রে ঈশেন তার মা-জননীকে নিয়ে রওনা হয়েছিল বেণীমাধবের গুহার দিকে। দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে।

শুক্রা অষ্টমী তিথি। নির্মেষ আকাশে চন্দ্রদেব প্রায় মধ্যগগনে। সকৌতুকে চন্দ্র দেখছেন একটি ছিপ-নৌকা প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। ঘাট জনহীন। কিছু মানুষ অবশ্য পাষাণ সোপানে গভীর নিদ্রাগত। ওরা অনিকেত। ভিক্ষাজীবী। আছেন কিছু জটাভূটধারী সন্ন্যাসীও।

নৌকায় তিনজন আরোহী। দুজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক। ঈশেন সর্দার তার এক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে তার মা-জননীকে দশাশ্বমেধে পৌঁছে দিতে। চৌষট্টি-যোগিনী ঘাটে সোএগই গাঁয়ের জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ীর সোপানটি তার অপরিচিত নয়। কিন্তু সেখানে সে তার মা-জননীকে পৌঁছে দিতে পারবে না। কাশীধামের নগর-কোতোয়ালের প্রহরীদের কাছে ঈশেন অপরিচিত নয়। দস্যুসর্দার হিসাবে সে সুচিহ্নিত। তার মাথার উপর মোটা ইনাম ঘোষণা করা আছে। হঠাৎ ঈশেনের নজর হল দূর থেকে দু-তিনটি ছিপ-নৌকা তীরবেগে ওদের নৌকার দিকে এগিয়ে আসছে। ঈশেনের দৃষ্টি অতি সজাগ। নিশাচর বৃষ্টি গ্রহণ করার পর সে চিতাবাঘের মতো অন্ধকারেও দেখতে পায়। তার সঙ্গীকে ঠেট্ হিন্দিতে নিচুগলায় বলে ওঠে, যদুলাল! হারামজাদাগুলো আমাদের তল্লাস করতেই এগিয়ে আসছে রে। কোতোয়ালের প্রহরী-নৌকা!

—তব্ ক্যা করুঁ?

—তোকে ওরা চিনবে না। তুই মা-কে দশাশ্বমেধে নামিয়ে দিবি। রাত ভোর হলে মা নিজেই খুঁজে খুঁজে চৌষট্টিঘাটে চলে যাবেন।

—ওর তুম?

—আমি টুপ করে এখনি গঙ্গায় নেমে যাব। সাঁতরে ফিরে যাব বজরায়। ওরা দলে ভারি। এ ছাড়া আর পালাবার পথ নেই।

সর্দারের নির্দেশ মতো যদুলাল রূপমঞ্জরীকে নামিয়ে দিয়েছিল দশাশ্বমেধ ঘাটে। প্রহরীরা যদুলালের ছিপ তল্লাসী করে কিছুই পায়নি। বিদায় নেবার আগে মা-জননীকে গড় করে যদুলাল ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল একটি পুঁটলি। তাতে কী আছে যদুলাল জানত না। হটীও তা হাথড়ে দেখেননি। সেই পুঁটলিটি বুকে জড়িয়ে ধরে রাত্রি প্রভাতের জন্য বসেছিলেন দশাশ্বমেধঘাটে।

তারপর কীভাবে দ্বারকেশ্বর তাঁর সন্ধান পান তা আমরা বিশবছর আগেই জেনেছি।





কবুতরটি জোড়াপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রাঙ্গণ পরিক্রমা করছে। কেন? ও উড়তেই বা পারে না কেন? পাখিটাকে সবত্রে হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, ওর দুটি পায়ে সূক্ষ্ম মসলিন-সূতোর শৃঙ্খল, দুটি ডানাতেও। তাই ও ইঁটতে পারে না। উড়তেও পারে না। আহা রে! তাই ও বন্দি—ঠিক হট্টা যেমন বন্দিনী। তখনই মনে পড়ে গেল মহাপুরুষের নির্দেশ : ‘জীবাঙ্কাকে বন্দি রাখতে নেই। মুক্ত নীলাকাশে, পরমাত্মার দিকে অভিষাত্রায় তার জন্মগত অধিকার! ক্যা রে বেটি? সমঝি’?

না। সেদিন সবটা বুঝতে পারেননি। আজ পারলেন। ঈশেন কেন ওঁকে উপহার দিয়েছিল এই কবুতরটি। এ হচ্ছে মুক্তিদূত। ঈশেন হয়তো ওঁকে সবকথা বুঝিয়ে বলার সময় পায়নি। কিন্তু তীক্ষ্ণবী বিদ্যালঙ্কার কার্য-কারণ-সূত্রগুলি সহজেই প্রণিধান করলেন। ওই পারাবত-দূতের মাধ্যমেই সংবাদ পাঠাতে হবে ঈশেন সর্দারকে। কিন্তু ঈশেন তো অন্ধর-পরিচয়হীন! কী করে সে বুঝবে? তা হোক দূতকে প্রেরণ করলে কবুতরটি অনায়াসে রামনগরে ঈশেনের গুপ্ত আবাসে ফিরে যাবে। সেখানে কেউ-না-কেউ বুঝবেই। তিনি একটি ছোট্ট ভূর্জপত্রে তাঁর বিপদের কথা লিখে রেশমসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন দূতের পায়ে। তাকে কিছু ভুট্টাদানা খাইয়ে আদর করলেন। নিক্ষেপ করলেন মুক্ত নীলাকাশের দিকে।

আশ্রমের উপর পাখিটি বামাবর্তে ক্রমাগত পাক খেতে থাকে। কী বিপদ! ও রামনগরের দিকে উড়ে যাচ্ছে না কেন? তখনই স্মরণ হল সেদিনের কথা। দস্যুসর্দারের সেই বিচিত্র আচরণ। দূত তার মালিকের আদেশের প্রতীক্ষায় ক্রমাগত পাক খাচ্ছে।

বিদ্যালঙ্কার তাঁর দক্ষিণ তালুটা মুখের কাছে এনে বিচিত্র ধ্বনিতে ডেকে ওঠেন :
আ—আ—আহ্!

পাক খেতে খেতে পক্ষিদূত ফিরে এসে বসল তাঁর কাঁধে।

উনি এবার সেই বৃহৎ শব্দটি হাতে তুলে নিয়ে শব্দধ্বনি করলেন। আশ্রমের গাছ-গাছালিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে সেই আত্মবর্তা : ‘ঈশেন, আমার বড় বিপদ বাবা!’

কবুতর-দূত মুহূর্ত মধ্যে উঠে গেল আকাশে। দক্ষিণাবর্তে আকাশে একটি পাক

কাশীযাত্রা

খেয়ে 'সূর্যসিদ্ধান্ত মতে' সে রওনা হয়ে গেল রামনগরের দিকে। জীবাত্মা যেন পরমাত্মার সন্ধানে অভিযাত্রী।

সেদিনই সন্ধ্যায় ফিরে এল সংবাদবহ-বিহঙ্গ। সোজা নেমে এল আশ্রম প্রাঙ্গণে। বিদ্যালঙ্কার ছুটে এলেন। আবার আদর করলেন তাঁর মুক্তিদূতকে। তার পায়ে রেশমরজ্জুতে অনুবিন্দ একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা : 'মা ভৈঃ! শ্রীচরণাশ্রিত বজ্রধর সিংহ।'

বজ্রধর সিংহ! কে তিনি? ডেকে পাঠালেন রমারঞ্জনকে।

রমারঞ্জন চিনতে পারল। বললে, হ্যাঁ! তাঁকে তো সমস্ত কাশীধাম চেনে। তিনি ছিলেন প্রয়াত কাশীনরেশের জ্ঞাতিভ্রাতা। সে-আমলে তিনিই ছিলেন কাশীরাজ-সৈন্যদলের সেনাপতি। পুরন্দর গদি দখল করার পর তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। পারেনি। শুনেছি, তিনি বিহাররাজ্যে রোহিতাশ্ব দুর্গে থাকেন। তবে জনশ্রুতি তিনি সৈন্য-সংগ্রহ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর কথা কেন জানতে চাইছেন দিদি?

বিদ্যালঙ্কার ইতস্তত করলেন না। দীর্ঘসময় ধরে তিনি রমারঞ্জনকে বুঝিয়ে বলেন, তিনি কীভাবে ওই বজ্রধরের কাছ থেকে একটি 'মা ভৈঃ' সঙ্কেত পেয়েছেন।

রমারঞ্জন নিদারুণ উল্লসিত হয়ে ওঠে। সে ঈশান সর্দারের নামও শুনেছে—গঙ্গাবক্ষে সর্বকুখ্যাত জলদস্যু—কাশী থেকে নবদ্বীপের একচ্ছত্র যমরাজ বলে। বজ্রধর যদি ঈশান সর্দারের সঙ্গে সংযুক্তভাবে কাশীধামের দুর্গ আক্রমণ করেন তাহলে পুরন্দরকে পরাজিত করা অসম্ভব হবে না। কারণ কাশীরাজের সৈন্যশিবিরে বিক্ষোভ এখন চরমে। ওই অত্যাচারীর শাসনের অবসান সবাই চাইছে। সবাই তা বুঝছে। একমাত্র বিলাসে আকণ্ঠ নিমগ্ন পুরন্দর ছাড়া।



কাহিনির বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

দীর্ঘদিন ধরে বজ্রধর বিহারের রোহিতাশ্ব দুর্গে সৈন্য সমাবেশ করছিলেন। কাশীরাজ্যের প্রতিটি সংবাদ তাঁর নখদর্পণে। পুরন্দর হটী বিদ্যালঙ্কারের উপর যে পৈশাচিক নির্যাতনের হুকুমনামা জারি করেছে তাও তাঁর অজানা নয়। বজ্রধরের মনে হল : এইটাই সুবর্ণসুযোগ। সমস্ত কাশীরাজ্য বিক্ষুব্ধ। এমনকি যারা ইতিপূর্বে বিদ্যালঙ্কারের বিরুদ্ধে রাজসরকারের শিকারেত করেছিল তারাও অনুশোচনায় অধোবদন। এই বর্বর, শাস্তিবিধানের সংবাদে তারাও মর্মাহত। বজ্রধর তাই বিহার

থেকে সসৈন্য এসেছিলেন রামনগরের দুর্গে, ঈশান সর্দারের সন্ধানে। ঈশানের অনুচর-সংখ্যা অল্প, কিন্তু তারা নির্ভীক, নির্ভরশীল এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। এমনই এক ব্রাহ্মমূহুর্তে দৈববাণীর মতো উপস্থিত হল পারাবত-দূত।

একযোগে কাশীরাজের দুর্গ আক্রমণ করলেন বজ্রধর আর ঈশান-সর্দার। কাশীরাজের সৈন্যদল প্রতিরোধের কোনো প্রচেষ্টাই করল না। বরং সসম্মানে স্বাগত জানাল তাদের প্রাক্তন সেনাপতিকে।

বজ্রধর তাঁর তরবারি কোষমুক্ত করে রাজমাতার চরণপ্রান্তে নামিয়ে দিয়ে সবিনয়ে বললেন, আমাকে আদেশ দিন মাতা। কী আমার করণীয়?

রাজমাতা বললেন, আমি তো তোমাকে কোনো আদেশ দেব না। সেটা দেবেন রাজকুলগুরু। আমি শুধু আশীর্বাদ করব তোমাকে। তুমি স্বর্গত মহারাজের প্রতি তোমার আনুগত্য প্রকাশ করেছে। তাঁর বংশধরের জীবনপথের কণ্টক উন্মোচিত করতে এসেছ। আমি বাবা বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করব তোমার শতায়ু। তুমি চিরজীবী হও।

কিন্তু নাটকের খলনায়ককে রাজপ্রাসাদে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

কে একজন বললে, বহু কঁহি ছিপকে বৈঠা হয়!

ঈশেন বলে, নেহিহে ইয়ার! ছিপকে নহী। ম্যায় জানতা হঁ বহু বেতমিজ বদমাস কাঁহা মজাক উড়াতা হয়। হুকুম দিজিয়ে সেনাপতিজি, ম্যায় কাম ফতে করু!

জনাআষ্টেক বন্দুকধারী অশ্বারোহী অনুগামীকে নিয়ে সে বিদ্যুতগতিতে ছুটে চলল অসিঘাটের বাগানবাড়িতে। যে প্রমোদভবনে গদি-আসীন পুরন্দর সাম্রাজ্য-বিলাসে সুরাপান করে থাকে। দস্যুসর্দার হবার পূর্বযুগে ঈশেন ছিল কাশীসৈন্যদলের পাঁচহাজারি মনসবদার। তাই মধ্যরাত্রে জলসাঘরটা খুঁজে পেতে তার বিলম্ব হল না।

এমন দুর্যোগ রজনীতে প্রতিটি গৃহস্থই রুদ্ধদ্বার উৎকণ্ঠায় রাত্রি প্রভাতের প্রতীক্ষা করে। পথ আজ জনমানবশূন্য। শুধু বিশ্বনাথের মন্দিরের দিক থেকে ভেসে আসছে শয়নারতির শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি। কাশীর অবস্থান বাবা বিশ্বনাথের ত্রিশূলশীর্ষে। সেখানে ভূমিকম্প হয় না। রাজরাজ্যে রাজপথ কদমাক্ত হতে পারে। কিন্তু বাবার শয়নারতিতে ছেদ পড়ে না।

রাত্রির তৃতীয় যাম শুরু হয়েছে। চৈত্রশেষের শুক্লা একাদশী। অশ্বারোহী সৈন্য কয়জনকে অন্তরালে লুক্কাইত রেখে নাপ্তা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল নির্ভীক দস্যুসর্দার। প্রমোদভবনের সম্মুখে একটি বিশাল লৌহফটক। তার ওপাশে ফুলের বাগান। পাথর-বাঁধানো পথ এসে থমকে থেমেছে লোহার-গরাদ দেওয়া ফটকে। ঈশান অকুতোভয়ে একলা এসে দাঁড়ালো সেই লৌহ-ফটকের সম্মুখে। গেটটা তালাবদ্ধ। ঈশেন তার সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রথমেই নজর করে দেখল প্রাসাদ-শীর্ষে ইন্দ্রকোষের ছিদ্রপথের দিকে। সেখানে কোনও ধানুকী বা আঘেয়াস্ত্রধারী আছে কিনা সমঝে নিতে। না, নেই। এটা দুর্গ নয়, 'প্রমোদভবন'। তাই প্রতিরোধের নিশ্চিন্দ্র আয়োজন নজরে পড়ল না। হর্ম্যশীর্ষ থেকে ভেসে আসছে বাইজির সুরেলা ঠুংরি : 'বাজুবন্ধু খলু-খলু যায়'। সারেঙ্গির টান আর তবলটির লহরা।

ঢালাই-লোহার গরাদ দুই হাতে চেপে ধরে ঈশেন বজ্রগন্তীর স্বরে হাঁকাড় পাড়ে :
কোই হয়?

‘হয়’ তো বটেই। মহারাজ পুরন্দরের দেহরক্ষী রামলগন কাহার আছে পাহারায়।
দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল সে। তরবারি চালনাতেও অতিশয় দক্ষ। তারই ওপর প্রমোদবনের
সুরক্ষার দায়িত্ব।

প্রমোদ-ভবনের সদর দ্বার খুলে গেল। উদ্যানে নেমে এল হাতিয়ারবন্দ রামলগন
সর্দার। সে যেন প্রতিধ্বনি করে ওঠে, কৌন চিল্লাতা হয় রে?

ঈশেন শক্তহাতে চেপে ধরল জিঞ্জিরবদ্ধ লৌহফটকের গরাদ।

গর্জন করে ওঠে : তেরি বাপু-রামলগন! পহুন্তে নহি হো ক্যা?

রামলগন যেন ভূত দেখল : উস্তাদ! তুম?

ঈশেন ঠেট্ হিন্দিতে বললে, চিনতে পেরেছিঁস্ দেখছি? এখন বল : কী করবি?
লড়বি? না কি তোর গুরুদক্ষিণা দিবি?

রামলগন লাঠি আর তলোয়ার খেলা শিখেছিল ঈশেন-সর্দারের কাছেই। ঈশেন
যখন ছিল কাশীরাজের সৈন্যদলে পাঁচহাজারি মনসবদার। পূর্বতন কাশীনরেশের
আমলে।

ইতিমধ্যে অন্তরাল থেকে বাহির হয়ে এসেছে বন্দুকধারী অশ্বারোহীর দল।
লৌহগরাদের ফাঁক দিয়ে বন্দুকের গুলি অনায়াসে রামলগনকে বিদ্ধ করতে পারে।
রামলগন সেটা জানে। তাই বলে, উস্তাদ! আমি তো কোনো পাপ করিনি। তুমি কেন
এসেছ আমার নোকরি খতম করতে?

ঈশেন অট্টহাস্য করে ওঠে : তুই হারামজাদা জন্ম-নোকর! তোর নোকরি খায়
কোন শালা? লেकिन কী করবি বল? লড়বি? না গুলি খেয়ে মরবি?

রামলগন এদিকে-ওদিক দেখে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, ফটক খোল দুঙ্গা। লেकिन
এক শর্ত হয়!

—শর্ত? কী শর্ত বল? কী ইনাম চাস?

—ইনাম নেহী! পহিলা মওকা।

—পহিলা মওকা? কিসের রে?

আজব শর্ত! রামলগন বিনা প্রতিরোধে ওদের ভিতরে আসতে দেবে, কিন্তু একটি
শর্তে! পুরন্দরের স্বয়ং থেকে রাজমুকুট-শোভিত মুণ্ডটা নামিয়ে আনার প্রথম সুযোগ
যেন তাকে দেওয়া হয়।

ঈশেন পুনরায় অট্টহাস্য করে বলে, মান্‌লি!

খুলে গেল লৌহফটক। বিনা রক্তপাতে।

তবে অনিবার্য রক্তপাতটা রোধ করা গেল না। কাশীধামের যাবতীয় জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত
হয় ওই পূত গঙ্গাজলেই। কদিন পরে যে গঙ্গোদকে নিক্ষিপ্ত হবার কথা একটি ধর্মিতা
রমণীর খণ্ডিত মৃতদেহ সেখানে আজ নিক্ষিপ্ত হল গদি-দখলকারীর ছিন্ন মুণ্ডটি!

জাহ্নবীর পূত সলিল সেই উষ্ম রাজরক্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠল না আদৌ। সর্বসহা মা-গঙ্গা অনায়াসে গ্রহণ করলেন সেই আবর্জনার ভার।

‘—কা শীতলবাহিনী গঙ্গাঃ?’

‘—কাশীতলবাহিনী গঙ্গাঃ!’



নববর্ষের পূণ্যাহে কাশীরাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করলেন স্বর্গত কাশীনরেশের নাবালক পুত্র শ্রীমান মহারাজ কৃষ্ণেন্দুনारायण सिंह। দক্ষিণে তাঁর অভিভাবক রাজকুলগুরু, বামে সদ্যনিযুক্ত প্রাজ্ঞ সেনাপতি। মহা আড়ম্বরে অভিষেক হয়ে গেল। সেদিন আপামর কাশীবাসী রাজবাড়িতে পাত পাড়ল। পণ্ডিতদের যথাবিধি সম্মান-মর্যাদা প্রদান করা হল। হটী বিদ্যালঙ্কারকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে রাজমাতা বলেন, আপনাকে কী বৈদ্যবিদ্য দেব বলুন?

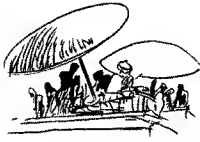
—বৈদ্যবিদ্য! আমি তো কারও চিকিৎসা করিনি।

—করেছেন। আমার পুত্রটির। সে তো কী যেন একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। ‘কংসব্যাধি’ কি ‘শকুনিব্যাধি’ তা আপনিই জানেন।

হটী বললেন, আমার বহুদিনের বাসনা কাশীধামে একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা*—

* এইখানে সম্ভবত কথাকবিদকে কল্পনার রাশ টানতে হবে। বর্ধমানের সোণেই গ্রামে অথবা কাশীধামে বক্ষ্যমাণ কাহিনিকালে কোনও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নজির খুঁজে পাইনি। গল্পের গোমাতা একবার বুদ্ধারোহণ করলে পাঠিকা-পাঠক তা ক্ষমা-ঘেঁষা করে মেনে নেন। বারবার নয়।

আধুনিক যুগে, যতদূর জ্ঞান, ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তেমন কোনো বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সম্ভবত তা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে—হটী বিদ্যালঙ্কারের মহাপ্রয়াণের তিন-চার দশক পরে। মূল হোতা সংযুক্তভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মহামতি জন এলিয়ট ডিক্‌সনসের বৈদ্য। তাঁদের আন্তরিক সহায়ক ছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শঙ্করাচার্য পণ্ডিত, রামগোপাল ঘোষ, এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার। প্রথম ছাত্রীদ্বয় : ভুবনমালা ও কুন্দমালা। মদনমোহনের দুই আত্মজ। কোনও গবেষকমনা পাঠিকা যদি এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কোনো বালিকা বিদ্যালয়ের সন্ধান অথবা লেখককে জানাতে পারেন তাহলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এ তথ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করব। ইতিহাস বলছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে—অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বৎসর—বিদ্যাসাগরমশাই আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হুগলি জেলায় সাতটি আর বর্ধমানে একটি।



বেশ কয়েক বছর পরের কথা।

সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। ষড়ঋতু তার চক্রাবর্তন ছন্দ মেলে আসে-যায়, মা-গঙ্গার জলধারা নিরবচ্ছিন্ন-ধারায় সমুদ্রাভিসারী। তার ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল সঙ্গীত সমে এসে থামে না। থামতে জানে না।

সূর্য এখন কন্যারশিতে। হিমালয়-দুহিতা আবার মর্ত্যে আগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই আকাশে গড়ে উঠেছে তুলো-পেঁজা মেঘের তোরণ। গঙ্গার দুই তীরে অযুত-নিযুত কাশগুচ্ছ মায়ের আগমন প্রত্যাশায় শুভ্র চামর দুলিয়ে চলেছে। শেফালিগাছ প্রতিদিন সকালে মাঠে বিছিয়ে দেয় কমলারঙের পাড় বসানো শ্বেতশুভ্র জাজিম।

কাশীধামে তখনও দশভুজার অকালবোধন চালু হয়নি। দুর্গাবাড়িতে হত নবরাত্রির উৎসব। পিতৃপক্ষের পরের পক্ষকালে। শ্যামাপূজার অমারাত্রে অসি থেকে বরুণার হর্ম্যশীর্ষে জ্বলজ্বল করে জ্বলত প্রদীপমালার শতনরী।

দ্বারকেশ্বর-বিদ্যাপীঠে এখনও পূজাবকাশের কর্মবিরতি হয়নি। হটী বিদ্যালঙ্কার এখন আর চতুষ্পাঠীর উপাধ্যায় নন। নিজের পর্ণকুটিরে একান্ত সাধনায় আত্মনিমগ্ন। জরা এখনও তাঁকে আক্রমণ করেনি। স্বপাক রন্ধন এখনও করেন। দু-চারজন উচ্চশ্রেণির বিদ্যার্থী মাঝে মাঝে আসেন। তাঁরা ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়ের সোপানাবলি অতিক্রম করে উপনিষদ অথবা বেদের দুর্জয় রাজ্যে প্রবেশেচ্ছু। তাঁরাই আসেন কখনো-সখনো তাঁদের অনুপপত্তি নিরাকরণ-মানসে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকজন নবীন পণ্ডিতও উপাধ্যায়রূপে যোগদান করেছেন এই চতুষ্পাঠীতে। রাজানুগ্রহে কিছু পাঠমণ্ডপও সংযোজিত হয়েছে।

সেদিন একপ্রহর বেলায় পণ্ডিত রমারঞ্জন ভট্টশালী একটি বৃক্ষচ্ছায়ার মুক্ত মণ্ডপে কয়েকজন ছাত্রকে ব্যাকরণের পাঠ দিচ্ছিলেন। সহসা তাঁর লক্ষ্য হল চতুষ্পাঠীর বাহিরদ্বারে একজন বৃদ্ধ সাধু আবর্তিত হয়েছেন। জটাভূটধারী কৌপীনসার সন্ন্যাসী। স্কন্ধে একটি কঙ্কল, হস্তে দীর্ঘ যষ্টি। তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো চারিদিকে তাকিয়ে কী-যেন খুঁজছেন। ভট্টশালী জনৈক ছাত্রকে বললেন, বহির্দ্বারে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। ওঁকে সাদরে আশ্রমের ভিতরে নিয়ে এস।

ছাত্রটি গাত্রোথানের উপক্রম করতেই তাকে বাধা দিয়ে পুনরায় বলেন, না থাক। আমি নিজেই দেখছি।

প্রবেশদ্বারের সম্মুখে এসে ভট্টশালী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

—আপনি?

—হ্যাঁ রমারঞ্জন। স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্।

—কোথা থেকে আসছেন এখন? কবে এলেন?

—উত্তরখণ্ড পরিক্রমা সমাপ্ত করে সর্বতীর্থসার কাশীধামে ফিরে এসেছি আজই। দেখতে এসেছিলাম আমার সাধনধামের ধ্বংসস্থূপ। কিন্তু এ কী দেখছি! কেমন করে এমনটা হল?

রমারঞ্জন গুরুর পদধূলি গ্রহণ করে বলেন, যাঁর কপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে। বাবা বিশ্বনাথের দয়ায়!

—পুরন্দর?

—যমালয়ে। এখন কাশীরাজ হচ্ছেন শ্রীমান মহারাজ কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ রায়। তাঁর সব কথাই বলব। কিন্তু তার পূর্বে আপনি ভিতরে এসে বসুন। আমাকে পদপ্রক্ষালন করতে দিন—

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকস্মাৎ ভট্টশালীর দুই বাহুমূল দৃঢ়মুষ্টিতে গ্রহণ করে অশ্রুতে বলেন, আমার মা?

দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন বিদ্যালঙ্কার। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে এসে বৃদ্ধের কর্দমাক্ত চরণে নামিয়ে রাখেন তাঁর অনবগুপ্ত মস্তক।

উত্তেজিত বৃদ্ধ এবার তাঁর দুই বাহুমূল ধরে বলেন, তুই...তুই বেঁচে আছিস?

হটী প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না। তাঁর দুইগণ্ডে প্রবাহিত হচ্ছে দীর্ঘদিনের নিরুৎসাহ অভিমান। আনন্দে, শ্রদ্ধায়, উত্তেজনায়।

—কিন্তু কেমন করে বেঁচে আছিস তুই?

আবার একই প্রত্যুত্তর করলেন ভট্টশালী : বাবা বিশ্বনাথের দয়ায়, বাবা।

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বসলেন গোলকচাঁপা গাছের বাঁধানো চত্বরে।

ইতিমধ্যে এই চমকপ্রদ সুসংবাদটা ছড়িয়ে পড়েছে আশ্রমে। ছাত্রের দল—অনেকে শুধু তাঁর নামই শুনেছে, প্রত্যক্ষ করেনি—সার বেঁধে এসে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাকে প্রণাম করে চলেছে।

বিশ্রামগ্রহণের পর বিদ্যার্ণবকে রমারঞ্জন সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন তাঁর অনুপস্থিতকালের ঘটনাবলি। অতি সংক্ষেপে। দীর্ঘদিনের প্রহরটার প্রত্যুত্তর পেলেন তিনি। কেন সচল বিশ্বনাথ বলেছিলেন জীবাত্মাকে পরমাত্মার দিকে প্রেরণ করাই সাধনার মূলকৃত্য। কেন শঙ্খধ্বনির বিষয়ে তাঁর পালিতা কন্যা তিরস্কৃত হয়েছিল।

নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও বললেন। হরিদ্বারে পূর্ণকুণ্ডে স্নানান্তে তিনি এতদিন সমগ্র উত্তরখণ্ড পরিক্রমা সমাপ্ত করেছেন : কেদার-বদ্রী, তুঙ্গনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, এমন কি একবস্ত্রে অমরনাথ!



পুরন্দরের অপসারণে কাশীধাম নবজীবন লাভ করেছিল।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা হল ঈশেন বাগদির।

কলিঙ্গ যুদ্ধের অবসানে যেন সম্রাট অশোক। ঈশেন বাগদি রাতারাতি ‘চণ্ডেশান’ থেকে রূপান্তরিত হয়ে গেল ‘ধর্মেশানে’। মারদাঙ্গা সে সারাটা জীবন করেছে। রক্তপাত-দর্শনে বিচলিত হবার মতো মানুষ সে নয়। তবু একটা বাস্তব ঘটনা-পরম্পরায় তার আন্তরগভীরে ঘটে গেল মহাবিপ্লব। কিন্তু এমনটা তো বারে বারে ঘটেছে ইতিহাসে। ‘বেলা যে যায়! বাস্নায় আগুন দে’—এই কথাগুলো কি লালাবাবু জীবনে সেই প্রথম ওনলেন?

বজ্রধর সৈন্যাপত্য গ্রহণ করে ঈশান কৈবর্তকে দশহাজারি মনসবদার করতে চেয়েছিলেন। ঈশেন সবিনয়ে সেই মহাসম্মান প্রত্যাখ্যান করে। সে আর বাকি জীবনে লড়াই-কাজিয়ার মধ্যে থাকতে চায় না। সে এবার পরকালের চিন্তা করতে ইচ্ছুক। ধর্মকর্মে মন দিতে চায়।

এইখানে বোধকরি একটা কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন। লোকটাকে আমরা কখনও বলছি ‘ঈশান কৈবর্ত’ আবার কখনও ‘ঈশেন বাগদি’। দুটো পরস্পরবিরোধী নামরূপ। বাস্তবে জন্মগতভাবে ঈশেন ছিল বাগদির পো। ওর বাপ-খুড়োর পেশা ছিল দস্যুবৃত্তি। সেটা নবাব সুজাউদ্দিন (1727-39) অথবা সরফরাজ খাঁর (1739-40) জমানা। তারপর সুবে বাংলার শাসন অধিকার লাভ করেন নবাব আলিবর্দী। গিরিয়ার যুদ্ধে (1740) সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে। তার দুই বৎসরের মধ্যেই গুরু হল বর্গীর হাঙ্গামা। লুণ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদ। তিলতিল করে গৌড়বঙ্গে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেন আলিবর্দী। দমন করলেন মারাঠা দস্যুদের। নিহত হলেন ভাস্কর পণ্ডিত। বর্গীদলনেতা।

আলিবর্দী ছিলেন একপত্রিক, ইন্ড্রিয়-সংযমী, অপ্রমত্ত এবং একমাত্র নবাব যিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য দেখতেন না। দুইটি সম্প্রদায়কে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন প্রায় আকবরী-ঐকান্তিকতায়। বাংলার ভূম্যধিকারীদের ডেকে তিনি অনুরোধ করলেন প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ এলাকায় দস্যুদলের অবাধ-লুণ্ঠন বন্ধ করেন। বর্গী দস্যুদের হাত থেকে বঙ্গদেশকে রক্ষা করতে একদল দুঃসাহসিক মানুষকে বেপরোয়া হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তারা ভল্ল, বর্শা, কৃপাণ ও তীরধনুক লাভ করেছিল—ঠিক যেমন অধুনাকালে গদীলাভের পূর্বকালে দেশশাসক গোষ্ঠি ‘ক্যাদারদলকে’ অস্ত্রধারী ও বেপরোয়া হবার সুযোগ দেয়।

সোএগই গ্রামের জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী নবাবের নির্দেশ অনুসারে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাগদিদলের সর্দার ভীমা বাগদিকে। ঈশেন তখন বালকমাত্র। তার পিতৃবিয়োগ হয়েছিল শৈশবেই। ভীমাই তার অভিভাবক। তার আদর্শ।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ জনান্তিকে ডেকে নিয়ে ভীমাকে বলেছিলেন, ভীমা! এতদিন যা করেছিস তা করেছিস। আমি সেসব পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাই না। কিন্তু এখন থেকে তোদের জাতব্যবসাটা পালটাতে হবে, বাবা। আমি তোদের সবাইকে কিছু নিষ্কর চাষের জমি দিচ্ছি। একজোড়া হেলে-গরু, লাঙল আর প্রথম বছরের বীজ ধান। কিন্তু তোকে প্রতিদানে একটা কাজ করতে হবে, ভীমা। আনন্দময়ী মায়ের চৌকাঠ ছুঁয়ে বাগদি-পাড়ার তরফে জবান দিতে হবে ওসব কাজ তোরা আর করবি না।

—কুন সব কাজ, দ্যাবতা?

—তা তুইও জানিস, আমিও জানি। ভেবে দেখ।

ভীমা নতমস্তকে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর হাত দুটি জোড় করে বললে, মোরা জেতে বাগদি। হালচাষের কিছুটি জানি না দ্যাবতা। দু-একজন অভাবে পড়ি মুনিষ খাটে। এই পযাস্ত।

—তার মানে তোরা দস্যুগিরি ছাড়বি না?

দুই হাতে দুই কর্ণমূল স্পর্শ করে ভীমা বলেছিল, অমন কতটা কয়েন না দ্যাবতা! আপনি মোরে একখান নাও দাও, আর ওই মাছমারাদের জাল। মুই কৈবর্তের বিত্তি নেব-অনে।

কৈবর্তরা হল মৎস্যজীবী। জেলে। ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের নিজিতে তাদের জাত একধাপ উপরে। জাতপাত সোপানশ্রেণির। বাগদির ছায়া ব্রাহ্মণ মাড়ালে তাঁর অবগাহন-স্নান আবশ্যিক। কিন্তু জল-অচল কৈবর্তের ছায়া অসতর্কভাবে মাড়িয়ে ফেললে স্নান করতে হয় না। শ্রীচরণযুগল ধৌত করলেই পাপস্খালন হয়।

ভীমা রাতারাতি হয়ে গেল ‘মাছমারা’ কৈবর্ত। ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা—তোমরা তো জানই—উদারমনা। হাটে এসে তাঁরা যখন টাটকা মাছ খরিদ করতেন তখন জানতে চাইতেন না, কোন্ মাছটা কৈবর্তের জালে ধরা পড়েছে আর কোন্টা দুলে-বাগদি-চাঁড়ালের।

ফলে ঈশেনের কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে মাছমারাদের সংস্পর্শে। ওই বয়সেই সে বুঝতে শিখেছিল বাগদির তুলনায় কৈবর্তরা উঁচু জাত। তাই কাশীধামে এসে কাশীরাজের ফৌজে নাম লেখাবার সময় নিজের পরিচয় দেয় ‘ঈশেন কৈবর্ত’!

পিতৃহীন কিশোরের কাছে খুড়োই ছিল তার বাবা। তার গুরু। তার কাছেই শেখে লাঠিখেলা, তলোয়ার চালানো আর ধনুর্বিদ্যা। শেষবিদ্যায় সে হয়ে গেল ‘গুরু-মারা-চেলা’। কৈবর্ত পাড়ার ‘আর্জান-সর্দার’, অর্থাৎ অর্জুনতুল্য ধনুর্ধর।

ভীমাই ওর বিবাহ দেয়। একটিমাত্র পুত্র সন্তানকে রেখে ঈশেনের সহধর্মিণী অদ্যমোদর লাভ করে। ঈশেন আর পুনর্বিবাহ করেনি।

কাশীযাত্রা

জীবনে তিনতিনটি সদ্যবিধবাকে চিতাভ্রষ্টা হতে সাহায্য করেছে। সহমরণের দহন-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সবার আগে বেটাবায়েনের বিধবা : যম্মা। দ্বিতীয় হচ্ছে জিয়াগঞ্জের শ্মশানঘাটে রুক্মিনী। আর সবার শেষে একবন্ধা-ঠাউরের 'মাইয়াডা'। খুড়ার হুকুমে যার খুড়শ্বশুরের শামলাটারে তীরবদ্ধ করে ভুঁইয়ে নামিয়ে দিয়েছিল।

এক-জমানা আগে ওর খুড়ো যে-কথা বলেছিল জমিদারমশাইকে ঈশেনও ঠিক সে-কথাই বললে সেনাপতি বজ্রধর সিংহকে। সে মন্সবদারের লোভনীয় পদের প্রত্যাশী নয়। খুন-জখম, মারদাঙ্গা জীবনভর করেছে। আর করবে না। তাকে একখানি মাছমারা-নৌকা আর মাছধরার জাল দেওয়ার হুকুম হোক। ও মানুষের বদলে মাছ মেয়েই দু-কুড়ি-সাতের খেলাটা শেষ করবে। ও জাত-কৈবর্ত! সে বৃত্তিতে ওর অসুবিধা হবে না। নেহাৎ যদি মাছেদের ধড়ফড়ানি দেখে বৈরাগ্য আসে তখন সে গঙ্গাবক্ষে যাত্রীবাহী নৌকার মাঝি হয়ে যাবে।

রুক্মিনী ইতিপূর্বেই ওকে ত্যাগ করে চলে গেছে। সে খুশি মনে গেল, নাকি অভিমান করে—এ জটিল তত্ত্বটা অব্যর্থসম্মানী ঈশেন ঠাওর করে উঠতে পারেনি। যাবার সময় তার মরদকে সন্তানপালনের দায়িত্ব থেকেও মুক্তি দিয়ে গেছে। রতনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

আরও একটি মর্মান্তিক হেতু হয়তো ঈশেনের এই নির্বেদের পশ্চাৎপটে কাজ করে থাকবে। ঘটনাচক্রে ঈশেন প্রণিধান করেছে তার তথাকথিত গুরু সেই তান্ত্রিক কাপালিক ছিল ইন্দিয়াসন্ত—তাকে অস্ত্রসিদ্ধিলাভের লোভ দেখিয়ে একটি যুবতী নারী সংগ্রহে আগ্রহী করে তুলেছিল।

মোট কথা ঈশেন বর্তমানে মুক্ত-পুরুষ। রাজসরকার থেকে একটি নৌকা গ্রহণ করে সে মৎস্যশিকারীর ভূমিকায় জীবন যাপন করে। কিন্তু তাতেও ওর মন ভরল না। পাপবোধে সে ভারাক্রান্ত।

একদিন ঈশেন এসে ধর্না দিল তার মা-জননীর আশ্রমে।

বিদ্যালঙ্কার তাকে সাদরে আহ্বান করে বসালেন। প্রসাদী ফল-মিষ্টান্ন দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ঈশেন তার সমস্যার কথা অপকটে ব্যক্ত করল। সারাজীবন সে নানা পাপ করেছে। এখন তার অন্তরে জমেছে গ্লানি। সে এখন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। মানে 'প্রাচীতির'। কাশীতে সন্ন্যাসীর অভাব নেই, কিন্তু তার সঞ্চিত পাপের গ্লানির কথা সে তাঁদের মন খুলে বলতে পারে না। তাই তার মা-জননীর দ্বারস্থ হয়েছে। তার পাপের কথা মা-জননী সবই জানেন। বললে, আমাদের টুক দয়া কর মা। মন্তর দে। আমি পূজা-আর্চা লয়্যা থাকব অনে।

হটী বললেন, এ তো ভালো কথা ঈশেন। কিন্তু আমি তো কাউকে মন্ত্র দিই না। ভগবান যখন তোমাকে সুমতি দিয়েছেন তখন উপযুক্ত গুরুও জুটিয়ে দেবেন। গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্যও সাধনা দরকার।

কথাগুলি ঈশেনের বোধগম্য হল না। বললে, তুর কথাডা বুঝলাম না, মুই।

—শোন, বুঝিয়ে বলি। জমি 'তর' না হলে তাতে বীজ ছড়িয়ে কী লাভ? তোর মনের জমি এতদিন ছিল চোত-বোশেকের রোদে ফাটা-ফাটা। দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে দে। জমি নরম হলেই দেখবি গুরু আপনি এসে ধরা দেবেন। তাঁকে দেখেই চিনতে পারবি।

ঈশেন আকুলভাবে জানতে চায়, এখন কুন দেবতাকে ডাকব?

—যাঁকে তোর মন চায়। শিব, কালী, রাধাকৃষ্ণ, যাঁকে মন চাইবে।

—কিন্তু আমার প্রাচিতির কেমন কইর্যা হবে মা?

হটা বলেন, যে কোনও দেবদেবীই তোমাকে তরাতে পারবেন। তোমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবেন। শোন ঈশেন, তুমি যদি গঙ্গাস্নান করতে চাও তাহলে যে-কোন ঘাটে তা করতে পার। দশাশ্রমেধ, চৌষট্টিযোগিনী, চৈৎ সিং-এর ঘাট। যে-কোনও ঘাটেই ডুব দাও গঙ্গাস্নানের পুণ্য তোমার হবেই। শুধু খেয়াল রাখতে হবে মানুষজনের ক্ষতি হয় এমন কাজ করবে না। কাউকে ঠকাবে না। ধর্মে মতি রাখবে। তাহলেই গুরুর সন্ধান পেয়ে যাবে। তিনিই তোমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে দেবেন।

ঈশেন ফস্ করে প্রশ্ন করে বসে, তরে কে মস্তুর দিয়েল?

—কই আর দিলেন? তোমাকে আমি আজ যেকথা বলছি, আমাকে একদিন তিনি ঠিক সেই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, তোর মনের জমি এখনও 'তর' হয়নি।

ঈশেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'মা-জননীও তাইলে একই সমিস্যে!'



দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, এমন কি শতাব্দিও ফুরিয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দির উষা মুহূর্ত। ইউরোপ-খণ্ডে এখন ফরাসি ভাগ্যান্বেষী নেপোলিয়ান বোনাপার্টির দোর্দণ্ডপ্রতাপ। সে খবর এসে পৌঁছায়নি এই কাশীধামে। এখানে উত্তরবাহিনী ভাগীরথী চিরকালের মতো সমুদ্রসঙ্গমের প্রত্যাশায় একমুখী। দুনিয়া বদলে যায়। মহাদেবের ত্রিশূলপ্রাপ্তে অবস্থিত কাশীতলবাহিনী এই শীতলবাহিনী গঙ্গার রূপ অপরিবর্তিত। গঙ্গাঘাটে ভাসতে থাকে সারি সারি নৌকা, সূর্য্যোদয় মুহূর্তে সমবেত হয় স্নানার্থীরা, স্নানান্তে ঘাটোয়াল-পণ্ডিতজি তাদের ললাটে অঙ্কিত করেন চন্দনছাপ, ছেলে-ছোকরার দল ঝাঁপাই জোড়ে আর মণিকর্ণিকার ঘাটে অনিবার্ণ শিখায় উর্ধ্ববাহ

কাশীযাত্রা

অগ্নিদেব অযুত-নিযুত কাশীবাসীদের স্বর্গধামের পথ দেখান। অনাদিকাল, বোধকরি অনন্তকাল ধরে যা চলবে।

গোটা ভারতবর্ষের মতো কাশীধামের সেই 'ট্র্যাডিশন' সমানে চলেছে।

'রূপমঞ্জরী' নামটা হারিয়ে গেছে। ও নামে তাঁকে সোধেদন করবার মতো মানুষ আর কই? সাধারণের কাছে ওঁর অভিধা : মা-জননী; পণ্ডিতেরা ওঁর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন : বিদ্যালঙ্কার-মা।

বিদ্যালঙ্কার এখন একমুণ্ডিতমা প্রৌঢ়া।

দ্বারকেশ্বর ংঙ্গালাভ করেছেন। কার্যত এখন বিদ্যালঙ্কারই আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ। তবে চতুষ্পাঠীতে আজকাল তিনি নিজে যান না। সে দায়িত্ব রমারঞ্জন ভট্টশালীর। বিদ্যালঙ্কার তাঁর ক্ষুদ্র-ক্ষেত্র নিজের সাধনকাণ্ডে আত্মনিমগ্ন। দৃষ্টিশক্তি এখনও অটুট, ফলে অধ্যাপনা ত্যাগ করলেও অধ্যয়ন আছে অব্যাহত। কিন্তু ইদানীং তাঁরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সাধনক্ষেত্র ধ্যানে যেন স্থিতি পান না। কী লাভ এই যোগসাধনায়? আত্মার মুক্তি? পরমেশ্বরের বিলীন হওয়াই কি মনুষ্যধর্মের কৃত্য? শাক্যসিংহ তো যৌবনেই বুদ্ধ লাভ করেছিলেন, তাহলে তার পরে দীর্ঘ পাঁচ-দশক কেন তিনি দেহরক্ষা করেননি? অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি তো যৌবনকালেই 'নির্বাণ'-এর সুযোগ পেয়েছিলেন, তাহলে কেন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে জীবসেবায় এই প্রপঞ্চময় জগতের দুঃখ-দুর্দশার ভিতর পড়ে থাকলেন? ওঁর পিতৃদেবও তো জ্ঞানমার্গের চরম সিদ্ধি লাভ করার পরে কর্মযোগে চণ্ডাল-চিতায় দেহরক্ষা করলেন। বিদ্যালঙ্কারও তেমনি যুগল জলযানে চরণ স্থাপন করে সংসার-সমুদ্রের যাত্রী : জ্ঞান ও কর্ম।

প্রচণ্ড আক্ষেপ রয়ে গেল জীবনে—'ব্রজসুন্দরী' মহিলা বিদ্যালয়কে পুনর্জীবন দান করতে পারলেন না। না সোএগাই গ্রামে, না কাশীধামে। অর্থাভাবে নয়, শিক্ষিত মানুষের কুপমণ্ডুকতায়। কাশীবাসী কোনো গৃহস্থ কোনো বালিকা বা কিশোরীকে তাঁর বিদ্যাশ্রমে প্রেরণে স্বীকৃত হলেন না। অক্ষর পরিচয় যে অকালবৈধব্যের দিশারী। স্বয়ং বিদ্যালঙ্কারই তো প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

ইদানীং অবশ্য তাঁকে একাকী অন্তঃবাসীর জীবন যাপন করতে হয় না। একটি তরুণী সেবাব্রতা জুটেছে তাঁর : রোহিণী।

রোহিণী ব্রাহ্মণকন্যা। অষ্টাদশী। শৈশবেই মাতৃপিতৃহীনা। মানুষ হচ্ছিল তার খুড়ামশায়ের ভদ্রাসনে। এমনই দুর্ভাগ্য, খুড়ামশাই পুত্রসন্তান-বঞ্চিত। তাঁর তিন-তিনটি কন্যাসন্তান। তিনজনই রোহিণীর অনুজা। বেশ চলছিল—খুড়ামশায়ের ব্রাহ্মণী ংঙ্গালাভ করার পর রোহিণীই তাদের কোলে-পিঠে মানুষ করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের কী অবিচার! দুর্ভাগ্য মেয়েটি খুড়ামশায়ের দুর্দশার কথা বিবেচনা করল না। দেহে-মনে অচিরেই অরক্ষণীয় হয়ে উঠল। সমাজপতিদের তাড়নায় এক মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে তার উদ্ধাহনের আয়োজন করলেন। 'উদ্ধাহন' অর্থে 'উদ্ধব্ধন'। হবু

জামাতাবাজি ধনী, তাঁর তিন-তিনটি গৃহিণী বর্তমান। তিনজনই সন্তানবতী ও কুলীন ব্রাহ্মণের সংসারে তিনটি স্তম্ভ। চতুর্থটিকে উদ্ধার করতে রাজি হয়েছেন তাঁর সঙ্গী হবার জন্য। সহমরণে যাবার সৌভাগ্যলাভের উদ্দেশ্যে।

বিদ্যালংকার এই সংবাদ পেয়ে রমারঞ্জনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিছু ব্যবস্থা করার। রমারঞ্জন আশ্রমের ছাত্রদলকে নিয়ে কন্যাপক্ষের ভদ্রাসনে হানা দেন। বস্তুত মেয়েটিকে ছিনিয়ে আনা হয়। কাশীর সমাজপতিরা বিদ্যালংকারের বিধান অস্বীকার করতে পারেননি।

রোহিণী আশ্রয় পেল আশ্রমে। কিন্তু কিছুতেই সে অক্ষরপরিচিতা হতে স্বীকৃতা হল না। হঠাৎ বিদ্যালংকার যেমন স্বভাবগতভাবে জ্ঞানযোগী অথবা কর্মযোগী এই হতভাগিনী তেমনি জন্মগতভাবে সেবারতী। এতদিন সে শিবরাত্রি করেছে, ইতুপূজা করেছে, পুণ্যপুকুর করেছে—কোনও সাক্ষর দেবদেবীর সাক্ষাৎ পায়নি। এখন সুযোগ পেয়ে সে আঁকড়ে ধরেছে তার দিদাকে। তার বিশ্বাস ওঁকে সেবা করেই সে ‘তরে’ যাবে।



বিদ্যালংকার আজকাল প্রায়ই আশ্রমপ্রান্তে সেই গোলকচাঁপা গাছটির তলায় এসে বসেন। নির্জনে বসে—না, ধ্যান করেন না—ফেলে-আসা গ্রাম্য জীবনের স্মৃতিচারণে মগ্ন হয়ে যেতেন। কী বিচিত্র-বিষম তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবনের খণ্ডচিত্রগুলি। ওঁর মানসপটে ফুটে উঠত দামোদর-তীরের সেই ছোট গ্রামখানির নানারূপের রূপকথা।

ঋতুতে-ঋতুতে হয় দামোদরের সাজবদল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে শীর্ণ দামোদর হাঁটুজল-সর্বস্ব। তখন অনায়াসে পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গোগাড়ি। তখন টিট্টিভ, শামুকখোর, আর চখাচখির দল নিরুদ্দেশ হয়ে যায়—দূরের কোনও বিলে। বালি-চিক-চিক জল আঁকাবাঁকা পথে লুকোচুরি খেলে কিশোরী-বালিকার মতো। এদিকে তাকালে নজরে পড়ে নাড়া-মুড়ো-মোড়া দিগন্ত-অনুসারী ধু-ধু ধানের খেত। মাঝে-মাঝে ব্রহ্মডাঙার উষর তেপান্তরের মাঠ। রৌদ্রতাপে বায়ুস্তর বিসর্পিল ভঙ্গিতে আকাশপানে উঠতে থাকে। প্রকৃতি তখন গাজনের রক্ষজটা সন্ন্যাসী। রিক্তপত্র বৃক্ষরাজির যেন বিধবার বেশ। খর-মধ্যাহ্নে ক্লান্ত ঘুঘুর একটানা বিম ধরা ডাক অথবা তৃষ্ণার্ত বিহঙ্গের কাতর আর্তনাদ—‘ফ-টি-ক-জল!’

তারপর একদিন শেষ হয় গাজনের পালা। তাপদগ্ধ এক অপরাহ্নে ঈশান-কোণ

কাশীযাত্রা

থেকে ধেয়ে আসত উন্মাদিনী কালবৈশাখী। শিহরিত হত পিপাসার্ত পাদপ। উন্মাদিনীর ভৈরবী নৃত্যের তালে তালে তারা মাথা দেলাত—যেন মদনানন্দে স্বামী সুখবঞ্চিতা বধূর অপ্রত্যাশিত মিলনসুখ। থামত ঝড়। বর্ষগসিক্ত প্রকৃতি রতিক্লাস্তার আল্পেষায়নে তখন সুসুপ্ত।

দামোদর তখনও দুইপারের বন্ধনে বন্দি নয়। বর্ষাগমে ফেনিল আক্রোশে সে কূল ছাপাতো অনায়াসে। অচিরেই উপচে পড়ত গৈরিক জল—গ্রামে-গঞ্জে তাপদঙ্ক-কৃষিক্ষেত্রে। সারা গ্রামে তখন জল-ছপ-ছপ দুর্দেব।

শেষ হত বর্ষা। সরে যেত প্লাবনের খ্যাপা ঘোলামি। মেঘবালিকাদেরও হত সাজবদল। নীলাশ্বরীরা সরে যেত নেপথ্যে। আশ্বিনের আকাশে দেখা দিত তুলো-পেঁজা মেঘের তোরণ/গিরিতনয়ার আহ্বানে। বৈরাগীর দল গুণ্ডবি বাজিয়ে শৈলসূতাকে শোনাত আগমনী-গান। তারপর আসত শিশিরস্নাত হেমন্ত, পৌষালি হিমের হাওয়া। সব শেষে আবার বসন্ত। প্রকৃতি সাজত মিলনোৎসবে।

রূপমঞ্জরী প্রকৃতির এই রূপপরিবর্তন অনুভব করতেন দেহে-মনে। পিতৃদেবের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত সৌর-ভাস্বরতার সঙ্গে মিশে যেত অনুভূতিস্নিগ্ধ কোমলমধুর কবিমানস। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতেন তিনি।

কোথায় হারিয়ে গেল সেই সব আনন্দকোলাহল মুখরিত দিনগুলি?

গোলকটাঁপা গাছের তলায় বসে সেকথা ভাবতেন প্রৌঢ়া বিদ্যালঙ্কার :

দুর্গাপূজার মণ্ডপে শুভদার সঙ্গে খুনসুটি, রং দোলে ফাগ-আবিরে আবিল ছটোপুটি, দীপাষিতার রাত্রে তারাবাতির ফুলঝুরি।

তারপর ওঁর কিশোরীর স্বপ্নে হঠাৎ এল একটা বিরাট পরিবর্তন। ক্ষণস্থায়ী কিন্তু অবিস্মরণীয়। ঝরা কদম ফুলের ক্ষণিক সুবাস যেন।





কাশীধামের আশ্রম। বিদ্যালঙ্কার এখন তিন-কুড়ি মাত্র করেছেন—যষ্টিহীন যষ্টি। শীতের অপরাহ্ন। কাশীর শীত। বিদ্যালঙ্কার রোহিণীকে নিয়ে বসেছেন—তার চুল বেঁধে দিতে। তাঁর নিজের কেশরাজি কদমছাঁটের। যেকালে অধ্যাপনা করতেন তাঁর ছিল শিখাসর্বস্ব মুণ্ডিতমস্তক। ইদানীং আর মাথা কামান না। চুলগুলি ক্রমে হয়েছিল কদমছাঁট। এখন প্রায় কাঁধ সই-সই। কিন্তু রোহিণীর চুল দীর্ঘায়ত।

—হ্যাঁরে তুই কি চুলে তেল-টেল দিস না?

—আস্তে দিদা, আস্তে! চুলে লাগছে।

—লাগবেই তো। এত রক্ষ হয়ে গেল কেন? চুল আঁচড়াস না বুঝি?

—আমিও যে তোমার মতো ‘চিঁতাছুট’, দিদা! একরকম বিধবাই।

—বাট-বালাই। তোর তো বিয়েই হয়নি। তুই কেন বিধবা হবি?

তেল দিয়ে কঙ্কতিকা-শাসনে ওর ঘন কালো কেশগুচ্ছকে আয়ত্তে আনতে থাকেন। যেন এ-কাজই করেছেন সারাটা জীবন—মেয়ের, পুত্রবধূর, নাতনি-নাতবৌদের। দিদা বসে আছেন পিছনে। তাঁর মুখখানা দেখা যাচ্ছে না। এই সুযোগে রোহিণী জানতে চায়, আচ্ছা দিদা, বরের মুখখানা তোমার মনে আছে?

—তা থাকবে না কেন? এত এত সংস্কৃতমস্ত্র মনে থাকে, আর একটা মানুষের মুখের আদল ভুলে যাব?

—না, তাই বলছিলাম। তোমার তো বে হইছিল ন'বছর বয়সে, দ্বিরাগমন তো হয়ইনি। তাই না? শুভদৃষ্টির এক-লহমার স্মৃতি।

—তা কেন? উনি তো আমাদের বাড়িতে দু-একবার এসেছেন। তখন দেখেছি তাঁকে।

—কখনো কথা কয়েছ?

—তোর এত কৌতূহল কেন রে?

—বাঃ! জানতে ইচ্ছে করে না বুঝি? বল না? কথা কয়েছ দাদুর সঙ্গে?

হঠাৎ হাসলেন। রোহিণী অষ্টাদশী। কিন্তু অক্ষর-পরিচয়হীনা। সংস্কৃত কাব্য কিছুই পড়েনি। হয়তো যাত্রায় বা পালাগানে কিছু প্রেমের দৃশ্য দেখে থাকবে। তার বেশি নয়।

—কই, বললে না? কখনো কথা কয়েচ দাদুর সঙ্গে? নির্জনে?

—হ্যাঁ, বলেছি বৈকি।

—আড়ালে পেয়ে দাদু কখনো তোমাকে ধরে চুমু খেয়েছে?

কাশীযাত্রা

বিদ্যালঙ্কার ঠক করে চিরুনির এক বাড়ি বসিয়ে দিলেন প্রগল্ভা মেয়েটির মাথায় : তোর আত্মপরা তো কম নয়! এই কথা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়?

—কেন হবে না! ওদের কাছে তুমি পেলায় এক কেওকেটা। কিন্তু আমার কাছে তো তুমি স্রেফ : দিদা!

কথোপকথনে বাধা পড়ল। বাইরে থেকে শোনা গেল রমারঞ্জনর কণ্ঠস্বর : দিদি?

—কে? রমারঞ্জন? এস। ভিতরে এস। কী ব্যাপার?

—না। ভিতরে আসব না। একটা কথা জানাতে এসেছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে কয়েকজন এসেছেন। আমি তাঁদের মণ্ডপে বসিয়েছি। আপনাকেই একটু বাইরে আসতে হবে।

গায়ের উপর থান-আঁচলটা টেনে দিয়ে বিদ্যালঙ্কার গৃহের বাইরে এলেন। বলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? কে?

—কাশীধামের পণ্ডিতসমাজের তরফে কয়েকজন।

—আমার কাছে কেন? আমি তো কাশীর পণ্ডিতসমাজের কেউ নই এখন।

—তা জানি না, দিদি। পাঁচসাত জন বিশিষ্ট মহোপাধ্যায়।

—ঠিক আছে। ওঁদের বসায়। আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। আমি এখনি আসছি।

রমারঞ্জন গ্রীবাভঙ্গিতে সম্মতি জানিয়ে প্রস্থান করলেন।

—আমাকে উত্তরীয়টা এনে দে তো রোহিণী।—ও কী, তোর কী হল?

বিদ্যালঙ্কারের নজর হল রোহিণী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেওয়াল-যেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। বলে, ওঁরা আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছেন, দিদা!

—ধরে নিয়ে যেতে! কেন রে? তুই কী করেছিস?

—খুড়ামশায়ের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। জান না?

বিদ্যালঙ্কার আবার হাসলেন। বলেন, কী পাগলি রে তুই! তুই কেন পালিয়ে আসবি? আমিই তো তোকে এখানে নিয়ে এসেছি।

—কিন্তু....কিন্তু খুড়ামশাই-ই তো আমার অভিভাবক।

—না রে, রোহিণী। তোর অভিভাবক একমাত্র বাবা বিশ্বনাথ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোকে ধরে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কারও নেই। তুই আমার আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিস। ভয় কি?

রোহিণী মাথা ঝাঁকায়, কিন্তু ওঁরা যে পাঁচ-সাতজন!

আবার হাসলেন বিদ্যালঙ্কার। বলেন, বাহুবলের যুক্তি? তাও খাটবে না আমার আশ্রমে। ওঁরা তো মাত্র পাঁচ-সাতজন, নিরস্ত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত! কেন? জানিস না—জলদস্যুরা সংখ্যায় ছিল বিশ-পঁচিশ জন। তুই নিজে থেকে যেতে না চাইলে কারও সাধ্য হবে না জোর করে তোকে তুলে নিয়ে যেতে।

—কিন্তু তুমি তো সেদিন আমাকে জোর করেই তুলে এনেছিলে।

—না। সেদিন তোর আন্তরিক ইচ্ছাটা ছিল আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। তুই নিজেই

সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলি। খুডামশাই তোকে এক থুখড়ো বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিল। তুই রাজি হসনি—তাই না? আমি তোকে সাহায্য করেছিলাম মাত্র। তুই নির্ভয়ে থাক। আমার ঘর ছেড়ে বার হস না। আমি দেখছি—

চতুষ্পাঠীর বড় মণ্ডপে অতিথিরা আসন পেতেছেন। তাঁরা প্রতীক্ষারত। বিদ্যালঙ্কার উত্তরীয়টা গায়ে জড়িয়ে যুক্তকরে এসে উপস্থিত হলেন। অনেকে উঠে দাঁড়ালেন। বিদ্যালঙ্কার সকলকে সমবেতভাবে নমস্কার করলেন। অগ্রসর হয়ে এসে মহোপাধ্যায় রতনলাল ব্রহ্মচারীর পদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। রতনলাল কাশীধামের একজন প্রধান উপাধ্যায়। অশীতিপর বৃদ্ধ। হট্টা বিদ্যালঙ্কার যখন কাশীতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনা শুরু করেন তখন স্ত্রীলোকের অধ্যাপন-অধিকার হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকৃত কি না, এই বিষয়ে একটি তর্কসভার আয়োজন হয়। একপক্ষে হট্টা বিদ্যালঙ্কার। অপরপক্ষে কাশীধামের নব্য পঞ্চপণ্ডিত। সে তর্কসভায় পঞ্চপণ্ডিতকে পরাজিত করে হট্টা বিদ্যালঙ্কার নারীর বেদাভ্যাস ও অধ্যাপনা বৃত্তির স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সেসব অতীত কথা প্রথমখণ্ডেই বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মচারী রতনলাল সে সভার অন্যতম বিচারক ছিলেন। তিনি বললেন, বস মা-জননী। তোমার কাছে আমরা এসেছি একটি আর্জি নিয়ে। শোন, বুঝিয়ে বলি।

বিদ্যালঙ্কার উপবেশন করলেন। ব্রহ্মচারী বললেন, উত্তরখণ্ডের এক মহাপণ্ডিত কাশীনরেশের নিকট কাশীধামে দশবিঘা ভূখণ্ড দেবোত্তর-হিসাবে যাজ্ঞা করেছেন। দুর্গাবাড়ি মন্দিরের কাছাকাছি। সেখানে তিনি একটি আশ্রমপ্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক। শ্রীমদ মহারাজ সেই পণ্ডিতকে জানিয়েছেন যে, ওই ভূখণ্ড দেবোত্তর হিসাবে প্রদান করতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই। তবে দানকার্যটা হতে হবে কাশীর পণ্ডিতসমাজের সম্মতি-সাপেক্ষে। কাশীনরেশ সেই আবেদনপত্র এবং তার প্রত্যুত্তরের অনুলিপি আমাদের প্রেরণ করে আমাদের অভিমত জানতে চেয়েছেন।

বিদ্যালঙ্কার বলেন, দেখুন আচার্যদেব! কাশীনরেশ আপনাদের মতামত প্রার্থনা করেছেন—কাশী-পণ্ডিত-সমাজের। আমি সেই সমাজের অনুবর্তী হলেও আপনাদের কর্মপরিষদের সদস্য নাই। বস্তুত আমি বর্তমানে নিতান্তই একান্তবাসিনী। অধ্যাপনাও করি না। ফলে এ বিষয়ে আমার মতামতের তো কোনো মূল্য নেই। আপনারা আপনাদের মতামত কাশীনরেশকে জানাবেন, আমার মতামত প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

—ঠিক কথা। আইনসম্মত কথা বলেছ তুমি। কিন্তু একটি ব্যত্যয় উপস্থিত হয়েছে। তাই আমরা সবাই তোমার দ্বারস্থ হয়েছি। বস্তুত আমরা এসেছি মহামহোপাধ্যায়ের নির্দেশানুসারে।

—মহামহোপাধ্যায়?

—কাশীধামের সর্বাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন।

নামটি শ্রবণাত্র বিদ্যালঙ্কার যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করালেন।

সর্বাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে। সর্ববিখ্যাত নন তা বলে। যেমন গৌড়বঙ্গে সর্ববিখ্যাত পণ্ডিত ত্রিবেণীর পঞ্চানন-ঠাকুর অথচ সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন অরণ্যচারী বুনো

কাশীযাত্রা

রামনাথ। কাশীবাসী রামপ্রসাদ ওই বুনা রামনাথের মতোই বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে উপেক্ষিত এক ক্ষণজন্মা।

বাঁশবেড়িয়া বিদ্যাসমাজের ভট্টাচার্যবংশীয় এই পণ্ডিত যৌবনেই কাশীবাসী হয়েছিলেন। তিনিও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো অতি দীর্ঘজীবী (1709-1814)। তাঁর যখন বিরাশি বৎসর বয়স তখন (1791) কাশীধামে প্রথম একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বয়সেই তিনি ওই মহাবিদ্যালয়ে ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিশ্বাস করা কঠিন যে তারপর দীর্ঘ বাইশ বৎসর তিনি সেখানে অধ্যাপনা করেন। মৃত্যুর পূর্ববৎসর পঞ্চাশ টাকা পেনশন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। আমাদের কাহিনির কালে তাঁর বয়স একশ তিন। বাঁশবেড়িয়ায় প্রতিষ্ঠিত ওই পণ্ডিতের শিবমন্দিরটি বর্তমানেও বর্তমান।

বিদ্যালঙ্কার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, তা বাবা হঠাৎ আপনাদের আমার কাছে পাঠালেন কেন? আমি কে? আমি কী?

—তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। এখন বল, তোমার কি সম্মতি আছে?

—কেন? আপনাদের কি নাই?

—এ প্রশ্ন অবাস্তব। তুমি তো নিজেই বলছ যে, কাশীধামের পণ্ডিত-সমাজের অনুবর্তী হলেও তুমি এর সদস্য নও। আমরা দূত—স্বভাবতই অবধ্য। তোমার মতামতটা জানতে এসেছি মাত্র।

স্রকুঞ্চন হল বিদ্যালঙ্কারের। বললেন, তা যদি বলেন, তবে বলব আক্ষেপে হ্যাঁ। আমার এতে কোনো আপত্তি নাই। উত্তরখণ্ডের পণ্ডিত তো দেবোত্তর ভূখণ্ড প্রার্থনা করেছেন। একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা মানসে। তাতে আপত্তি হবে কেন? কোন্ দেবতার মন্দির?

—না, কোনো দেবদেবীর মন্দির সম্ভবত সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হবে না। কারণ প্রার্থী যোশীমঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য। ওঁরা তো দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না। নিরাকার ব্রহ্ম ওঁদের উপাস্য।

—তা হোক না। তাঁরা নিরীশ্বরবাদী নন। ঈশ্বরকে স্বীকার করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যুগাবতার সম্পূর্ণ নীরব, তাঁকেও তো তৎকালীন কাশীনরেশ দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন—কাশীধামের উপকণ্ঠেই। সারনাথ মৃগদাবে তাঁর আশ্রম আজও আছে। ধামেক স্তূপও আছে। দেবদেবীর কোনো মূর্তি সে স্তূপে নাই।

—আড়াই-হাজার বছর পূর্বে কাশীধামে বিশ্বনাথের মন্দির ছিল। শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতারও তখন বর্তমান। কিন্তু কাশীনরেশ কি ছিলেন তখন? তিনি কি অনুমতি দিয়েছিলেন বুদ্ধদেবকে বা তাঁর কোনো শিষ্যকে? সারনাথ মৃগদাবে একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করতে?

—অনুমতি দিয়েছিলেন কি না তা বলতে পারব না। কিন্তু কাশীনরেশ সে সময়ে নিশ্চয় ছিলেন। তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে।

—কী প্রমাণ, বিদ্যালঙ্কার?

—একাধিক বৌদ্ধজাতকে কাশীধামের উল্লেখ আছে—যড়দন্তজাতক শিবিজাতক প্রভৃতি। আর জাতক-কাহিনিগুলি বুদ্ধপূর্ব যুগের—এটাই প্রমাণ।

—বুঝলাম। কিন্তু বুদ্ধদেব জগতের দুঃখকষ্টকে অস্বীকার করেননি। জীবে দয়া করার কথা বলেছেন। ‘জগৎ মিথ্যা’ একথা বলেননি। তিনি জগদীশ্বরের দশাবতারের নবম অবতার।

বিদ্যালঙ্কার বললেন, ‘আপনি মহাপণ্ডিত। আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার শোভা পায় না; কিন্তু যেহেতু আপনি দু-বার ওকথা বললেন, তাই প্রতিপ্রশ্ন করছি : শাক্যসিংহ যে শ্রীকৃষ্ণের নবম অবতার, এই তথ্যটির প্রমাণ কী?’

—শঙ্করাচার্যকৃত দশাবতার-স্তোত্র।

—আপনি আদি শঙ্করাচার্যের অতবড় দশাবতার-স্তোত্রকে প্রামাণ্য মনে করেন, অথচ তাঁর ওই শ্লোকটি মানে না : ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা?’ সেই আদিশঙ্করের ধর্মমত প্রচার করছেন যোশীমঠের বর্তমান যে শঙ্করাচার্য তাঁকে সূচ্যগ্র-মেদিনী দানের সুপারিশে আপনাদের আপত্তি?

তৎক্ষণাৎ আসনত্যাগ করে দণ্ডায়মান হলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। বললেন, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি, বিদ্যালঙ্কার। আমি তোমার অভিমতটুকু শুধু সংগ্রহ করতে এসেছিলাম। তা জেনেছি। ধন্যবাদ!

তৎক্ষণাৎ করজোড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিদ্যালঙ্কারও। বলেন, আপনি আমার উপর রুষ্ট হয়েছেন, আচার্যদেব। আমার কথায় আহত হয়েছেন; কিন্তু আমি তো আপনাকে...

বাক্যটা সমাপ্ত হয় না। তার পূর্বেই ব্রহ্মচারী বলে ওঠেন, না, মা! তোমার উপর রুষ্ট হব কেন? সে অধিকারও তো আমার নাই। আমি দূত মাত্র। বিদ্যারত্নও তোমার উপর রুষ্ট হননি। তিনি এ আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন দূরন্ত অভিমানে।

নতমস্তকে এ তিরস্কার গ্রহণ করলেন হটী বিদ্যালঙ্কার।



এ কয়দিন প্রচণ্ড মনঃকষ্টে কেমন যেন দুর্মনস্যায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

কী প্রয়োজন ছিল এভাবে ওঁদের স্বমতে আনার? ওঁরা সবাই আবাল্য সংস্কারে নিমগ্ন হয়ে আছেন। শাক্যসিংহের নির্দেশে ‘আত্মদীপ’ হতে পারেন না—‘অনন্যশরণ’ হতে অশক্ত। শাস্ত্রোক্ত নির্দেশে ওঁরা নিজ-নিজ বিবেককে লৌকিক ধর্মের যুগকাণ্ডে বলিদান করেছেন। মহাপণ্ডিত রতনলাল ব্রহ্মচারীকে আঘাত দেবার কোনো ইচ্ছা আদৌ ছিল না তাঁর। হয়তো ‘সূচ্যগ্র-মেদিনী’ শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। যুক্তি

কাশীযাত্রা

ক্ষুরধার পথে ওঁদের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যই ছিল শুধু। ওঁর আশ্রমের প্রধান আচার্য দ্বারকেশ্বর বিদ্যার্ণবকেও একদিন এ-কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। পারেননি। রতনলাল ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল। ওঁরা আজন্মকালের শিক্ষায় স্মার্ত পণ্ডিতদের উদ্ধৃত শ্লোকে নিজ-নিজ বিবেককে বর্জন করেছেন। কিন্তু ওঁর পিতৃদেবও তো ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। সমস্ত শাস্ত্র ছিল তাঁর অধিকারে। কিন্তু কৈশোরকালে রূপমঞ্জরী যখন বলেছিল : ‘তোমরা দুজনেই ভুল করছ, বাবা—তুমি আর শুভদা!’—তখন তিনি তো রতনলাল ব্রহ্মচারীর মতো স্থানত্যাগ করেননি। অথবা বিদ্যার্ণবের মতো আশ্রমত্যাগ। মুহূর্তমধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন কিশোরী কন্যার যুক্তি। বলেছিলেন, ‘তুই ঠিক কথাই বলেছিস, মা!’

সেই অতীতকালের কথা স্মৃতিপথে উদয় হতেই মনে পড়ে গেল গ্রামের কথা। বিস্মৃতপ্রায় বাল্যের কথা। কৈশোরের স্মৃতিকথা।

কী আনন্দঘন ছিল সেসব দিন। গাছ-গাছালি-ছাওয়া শান্ত একটি কিম্বদন্তি গ্রাম। একবগ্নাঠাকুরের বালিকা কন্যাটিকে সবাই কত স্নেহ করত, আদর করত। সোনা-মা ওর মাথায় কাকপুচ্ছ বেণী বেঁধে দিতেন। গাছ-কোমর শাড়ি জড়িয়ে সে নাচতে নাচতে চলে যেত বড়বাড়ি—শুভদাদের বাড়িতে। শুভদা! তার বাল্যসঙ্গী! দুরন্ত অভিমানে যে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিল। একসঙ্গে বেড়ে উঠেছিল ওরা—ভাইবোনের মতো। তারপর কী যেন হয়ে গেল! কৈশোরকালে দুজনের মনেই এসেছিল একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। দুজনেই দুজনকে কাছে পেতে চাইত—কিন্তু সে যেন অন্যরকম কাছে-পাওয়ার ইচ্ছা।

কিন্তু সে-কথা ওরা কেউ মন খুলে বলেনি, পরস্পরের কাছে স্বীকার করেনি। হয়তো অন্য ধরনের পরিণতি হত ওদের বাল্যপ্রেমের। হল না। রাঢ়ী-বারেন্দ্রর অশাস্ত্রীয় মিলনের বাধায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেঁকে বসলেন তারা প্রসন্ন। আঘাত তিনিও কম পাননি—কিন্তু সামাজিক কুসংস্কারকে অস্বীকার করে উঠতে পারেননি। হয়তো সেই গৌড়ামির ফলে ঈশ্বর তাঁকে দিলেন মর্মান্তিক শাস্তি। একবস্ত্রে শুভদা গৃহত্যাগ করে গেল। জেঠামশাই হয়ে গেলেন প্রায় উন্মাদ। জেঠিমা মুক।

রূপমঞ্জরীর মনে পড়ে—এই পর্যায়ে আরও একটা প্রবল পরিবর্তন এসেছিল তার জীবনে। শুভদাকে সে ভোলেনি, ভুলতে পারে না, ভোলা অসম্ভব! কিন্তু বর্তমানের দাবিও অমোঘ—অতীতকে আঁকড়ে ধরে প্রত্যক্ষ বর্তমানকে অস্বীকার করা যায় না—বিশেষত কৈশোর-যৌবনের সেই ক্রান্তিকালে। সেই আধো-জানা আধো-অজানা অবাকমানা দিনগুলোয়।

রূপমঞ্জরীর যৌবনের মৌবনে এল এক নতুন ভ্রমর। মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি কিশোরী সীমন্তিনী। দু-হাত পেতে গ্রহণ করেছিল তার সামান্য উপহার—যা হয়ে উঠেছিল ওর জীবনে অসামান্য—ঝড়ে-ঝরা একটি বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল।

নিষ্ঠুর নিয়তির তাও সহ্য হল না। নিয়তিরই বা কী দোষ? এ যে শাস্ত্রীয় বিধান! শোননি, সেই ‘তট-তট-তোতয়’ পুঁথিতে দেবনাগরী হুরফে লেখা ‘অং-বং-চং’

মন্তরটা—‘স্বীলোক অক্ষর-পরিচয়ের উদ্যোগ করিলে তাহার অনিবার্য ললাটলিখন : অকালবৈধব্য!’

ঘুচে গেল বালিকাবধূর শাঁখাসিঁদুর রাঙাশাড়ি। তবু হার মানেনি। স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে যদি না-ই হয়—পিতাপুত্রী প্রতিষ্ঠা করবে সোণাই-গ্রামে এক আরোগ্য নিকেতন! তার সঙ্গে আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়! গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন সংস্কৃতিকেন্দ্র থেকে ছুটে আসবে মেধাবী ছাত্ররা—সাংখ্য-বেদান্ত চর্চা অনেক হয়েছে, অনেকে এখনো করছেন—ওরা তাই জীবের ‘মুক্তিকামী’ নয়, ‘নিরোগকামী’! রক্ষা সত্য কি না জানা নেই প্রত্যক্ষজ্ঞানে, কিন্তু জগত যে মিথ্যা নয় তা ওরা মর্মে-মর্মে অনুভব করেছে। দৈহিক নিপীড়নে কাতর আত্মীয়-পরিজনের রোগযন্ত্রণা। নাগদংশনে নীল হয়ে যাওয়া বালক। মারীণ্ডটিকায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়া লিঙ্গভ্রষ্টা বিয়ের কনে। কিন্তু সে স্বপ্নও পূরণ হল না। অন্ত্যজ-পরিবারের একটি শিশুকে নাগদংশন থেকে রক্ষা করার ‘পাপে’ প্রাণ দিলেন কিশোরী কন্যার প্রাণপুরুষ : পিতৃদেব।

আঘাত! আঘাত! আঘাত! তবু ভেঙে পড়েনি রূপমঞ্জরী, সে জ্যাঠাইমা-দিদার সেবা করতে রওনা হয়েছিল বাবা ঐশ্বনাথের শরণ নিতে। নিয়তি কিন্তু পিছু ছাড়েনি তখনো। বন্দিনী হয়ে পড়ল দস্যুসর্দারের বজরায়। তবু সে হার মানেনি। দস্যুসর্দারের বালকপুত্রের প্রাণরক্ষা করে আবার হয়ে উঠল ‘মাতাজী’!

না, ভাগ্যদেবতাকে দোষারোপ করতে পারে না। বারে বারে তাকে প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন করা সত্ত্বেও বরাবর তাকে রক্ষা করে গেছেন তিনি। দস্যুসর্দার যদি ঈশান না হত তাহলে কি সে আদৌ পৌঁছাতে পারত ঐকশীধামে?—বিদ্যার্ণবের সম্মেহ সম্পূটে? আবার হয়ে উঠতে পারত আশ্রম-মাতাজী?

এইসব ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিকথাই তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন। আশ্রমপ্রান্তের সেই নির্জন গোলকচাঁপা গাছটার তলায় বসে। হঠাৎ আবার আবির্ভাব ঘটল রমারঞ্জনের, দিদি। একবার এদিকে আসতে হবে। মহামহোপাধ্যায় স্বয়ং এসেছেন আপনার সাক্ষাতে।

স্তুভিত হয়ে গেলেন বিদ্যালঙ্কার : মহামহোপাধ্যায়?

হ্যাঁ, তিনিই। রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন স্বয়ং! কাশীধামের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতপ্রবর। তিনি তো ওঁকে অনায়াসে ডেকে পাঠাতে পারতেন।

তড়িঘড়ি ছুটে এলেন সেই অতিবৃদ্ধের সন্নিকটে।

—এ কী! আপনি আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন?

নিদ্রাস্ত হাসি হাসলেন বৃদ্ধ। বলেন, অনেকদিন যে তোকে দেখিনি, মা...

—তাই তো বলছি। আমাকে চোখের দেখা দেখতে চান তো ডাক দিলেই পারতেন?

—তাই কি পারি রে? বলিরাজকে কি বামনাবতার ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পর্বকুটীরে? আমি যে আজ ত্রিপদ ভূমির প্রার্থী। আর ‘চোখের দেখার’ কথা বলছি? সে শক্তি আর আমার নেই! বেটি। ~~চোখের সমুদ্রে এখন সব আঁধার~~—নীরঞ্জন অমরাত্রি!

কাশীযাত্রা

—সে কি! আপনি তো এখনো অবসর গ্রহণ করেননি?

—না। ওরা ছাড়েনি আমাকে।

বিশ্ময়কর তথ্য! আদ্যন্ত ঐতিহাসিক সত্য। লেখকের কল্পনা নয়। কয়েক বৎসর তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ। হটী বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন চৌদোলায় চেপে। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় আজও তাঁকে মুক্তি দেয়নি। চৌদোলায় চেপে একশত বৎসর পাড়ি দেওয়া অতিবৃদ্ধ মহাবিদ্যালয়ে আসেন। কারও হাত ধরে গিয়ে উপবিষ্ট হন নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে। তখন একে একে এগিয়ে আসতেন মহাবিদ্যালয়ের গুটিবয় ছাত্র—যাঁরা ক্ষুরস্যাধারা ন্যায়ের উচ্চমার্গে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন। জটিল ন্যায়সূত্রের অনুপপত্তি নিরাকরণমানসে। ভূর্জপত্রে লিখিত পুঁথি উনি দেখতে পান না, কিন্তু মস্তিষ্কের রক্তে স্মৃতিমঞ্জুষায় সজ্জিত পংক্তিগুলি বিস্মৃত হননি। অনর্গল তা শুনিয়ে দিতেন, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। প্রতিটি ব্যাসকূটের গ্রহিচ্ছেদন করে যেতেন।

—বলুন বাবা। কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি?

—না, মা। খাদ্যপানীয়ে আমার কিছু বাধা আছে। বলতে পারিস : সংস্কার! তবে আজ আমাকে আপ্যায়ন করতে পারিস আমার মনের সংশয় নিরাকরণ করে।

বিদ্যালঙ্কার বোঝেন এ শুধু বাকপ্রয়োগের কারিগরী, মহামহোপাধ্যায় এসেছেন ওই প্রতর্ক প্রসঙ্গেই—সেদিন যেকথা অসমাপ্ত রেখে রতনলাল ব্রহ্মচারী উঠে চলে গিয়েছিলেন। বিদ্যালঙ্কার কোনো প্রশ্ন করলেন না। প্রতিক্ষা করলেন।

বৃদ্ধ বলেন, রতনলালের কাছে শুনলাম, কাশীধামে অদ্বৈত বেদান্ত মঠ প্রতিষ্ঠায় তোর নাকি কোনো আপত্তি নাই। এ কথা সত্য?

—হ্যাঁ, বাবা। কেন? আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?

—আমার কথা পরে। তার পূর্বে তোর মতামতটা বুঝে নিই।

—আজ্ঞে না। এ প্রস্তাবে আমার কোনো আপত্তি নাই। ভারতবর্ষ এক সর্বসংহা মহাদেশ। এখানে সকল ধর্মমতই স্বাগত। আমরা তো অনায়াসে গ্রহণ করেছি শাক্যসিংহ, বর্ধমান-মহাবীর, জরথুষ্ট্র, যীশুখ্রিস্ট এবং হজরত মহম্মদের ধর্মমত। একমাত্র শঙ্করাচার্যকেই বা প্রত্যাখ্যান করব কেন?

—আমি ভারতবর্ষের কথা বলছি না, মা। বলছি কাশীধামের কথা।

—সেই কাশীধামও ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত।

—না, মা। আমাদের বিশ্বাস ঐকাশীধাম ভারত-ভূখণ্ডের বাহিরে। বাবা বিশ্বনাথের ত্রিশূলপ্রাপ্তে তার অবস্থান।

—বেশ। তাই যদি হয় তবে সেই ত্রিশূলপ্রাপ্তে তো ঠাই হয়েছে গির্জার, মসজিদের, ধামেক স্তূপের। অদ্বৈতবেদান্তের মঠ প্রতিষ্ঠাতেই শুধু বাধা দেব কেন?

—আসছি সে প্রসঙ্গে। তার পূর্বে আমাকে বুঝিয়ে বল তো মা—আদি শঙ্করাচার্য সহস্রাব্দপূর্বে সে কাজটি কেন করে যাননি? ভারত ভূখণ্ডের চারপ্রান্তে তিনি চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, কিন্তু কেন পরিহার করলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠ : কাশীধামকে?

বিদ্যালঙ্কার একটু চিন্তা করে বললেন, সম্ভবত আদি শঙ্করাচার্য চতুর্বেদ অবলম্বনে ভারতের চারপ্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। গোবর্ধনমঠে : ঋক্, সারদামঠে : সাম, শৃঙ্গেরীমঠে : যজুঃ, এবং যোশীমঠে : অথর্ব।

—তাই যদি হয় তবু তিনি তো অনায়াসে রামেশ্বর বা দ্বারকাকে পরিত্যাগ করে তালিকায় কাশীধামকে রাখতে পারতেন!

বিদ্যালঙ্কার পুনরায় চিন্তা করে বলেন, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন?

তর্কপঞ্চানন অঙ্কের দৃষ্টি মেলে বোঝাতে থাকেন :

আদি শঙ্করাচার্য ভারত-ভূখণ্ডের চার প্রান্তে চারটি মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্বৈত বৈদান্তিক সূত্রে ভারতকে বাঁধতে চেয়েছিলেন।

উত্তরে : বদরীকাশ্রমের প্রবেশদ্বারে যোশীমঠ। বেদ : অথর্ব। দেব : নারায়ণ; দেবী : পুন্নগাধী। তীর্থসলিল : অলকানন্দা। ভৌগোলিক সীমানা : উত্তরখণ্ড— অর্থাৎ কুরু, পাঞ্চাল, কাশ্মীর, কচ্ছোজ ও আর্যাবর্তের উত্তরাপথ। এই উত্তরখণ্ড আশ্রমে মহাবাক্য : ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ মন্ত্র।

দক্ষিণে : শৃঙ্গেরীমঠ : রামেশ্বরমে। বেদ : যজুঃ। দেব : না, রামেশ্বর বা শিব নন, আদিবরাহ; দেবী : কামাখ্যা। তীর্থসলিল : তুঙ্গভদ্রা। ভৌগোলিক সীমানা : দক্ষিণখণ্ড—অর্থাৎ অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র। দক্ষিণ খণ্ডের মহাবাক্য : ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’।

পূর্বে : গোবর্ধনমঠ : শ্রীক্ষেত্রে। বেদ : ঋক্। দেব : জগন্নাথ; দেবী : বিমলা। তীর্থসলিল : মহোদধি। ভৌগোলিক সীমানা : পূর্বখণ্ড অর্থাৎ বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ। মহাবাক্য : ‘প্রজ্ঞানামানন্দং ব্রহ্ম’।

পশ্চিমে : সারদামঠ : দ্বারকায়। বেদ : সাম। দেব : না, শ্রীকৃষ্ণ নন, সিদ্ধেশ্বর; দেবী ভদ্রকালী। ভৌগোলিক সীমানা : পশ্চিমখণ্ড অর্থাৎ সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতানা, কাথিয়াবাড়। মহাবাক্য : ‘তত্ত্বমসি’ মন্ত্র।

সমস্ত বিবরণ শ্রবণান্তে আমাদের মনে অনেকগুলি প্রশ্ন জাগে। প্রথম কথা : নির্বাচিত চারটি ধামে সহস্রাব্দ-চিহ্নিত দেবদেবীদের কেন উৎখাত করা হল, একমাত্র শ্রীক্ষেত্র ব্যতিরেকে? বদরীকাশ্রমে বদরীবিশালকে স্থানচ্যুত করে কেন আবির্ভূত হলেন ‘নারায়ণ’? উভয়েই সমার্থক, তবু নামটি কেন পরিবর্তন করা হল? আর কেনই বা লক্ষ্মী অথবা নারায়ণীকে পরিত্যাগ করে তাঁর দেবী হলেন ‘পুন্নগাধী’? বৈদিক ব্রাহ্মণধর্মে ‘পুন্নগাধী’র কী মহিমা? আবার রামেশ্বরমে শিবকে, অর্থাৎ রামেশ্বরকে অপসারিত করে কেন প্রতিষ্ঠিত হলেন : ‘আদিবরাহ’? কেন নয় শঙ্করাচার্য সৃষ্ট দশাবতার স্তোত্রের আদি অবতার : ‘আদি মৎস্য’? আবার দেখা যাচ্ছে সেই আদি-বরাহের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছেন সুদূর পূর্বভারত থেকে মা কামাখ্যা। এ সকল প্রশ্নের সমাধান আমরা জানি না। শুধু অনুমান করা যায়—দেবদেবীর ভিতর ‘পুরুষ-প্রকৃতি’ সহাবস্থান আদি শঙ্করাচার্য অনুমোদন করেননি। আবার বলি : একমাত্র

কাশীযাত্রা

ব্যতিক্রম শ্রীক্ষেত্রধাম। কিন্তু সেখানে যে দেবদেবী আছেন তাঁরা ‘পুরুষ-প্রকৃতি’ নন : ভ্রাতা-ভগিনী!

দ্বিতীয় প্রশ্ন : যোশীমঠ—যে মহাপথে আর্যরা ভারত-ভূখণ্ডে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে কেন আদি বেদ ঋক্ নির্বাচিত হল না? এ প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য সমাধান এ ভাবে পাওয়া যেতে পারে : হিমালয় হচ্ছে ওষধির আকর এবং অথর্ববেদের চর্চা ওষধিনির্ভর। হয়তো সেই হেতুতেই বদরিনাথাত্মক সন্নিকট যোশীমঠে শঙ্করাচার্য অথর্ববেদের উপর একটি তর্কসভার আয়োজন করেছিলেন এবং সে প্রতর্কে যিনি শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদাচার্য রূপে চিহ্নিত হলেন তাঁকেই নির্বাচিত করা হল প্রথম মঠাধ্যক্ষ হিসাবে : তেটিকাচার্য।

তৎসত্ত্বেও একটি অনুপপত্তি থেকে গেল না কি? ‘ওষধি’র প্রয়োজন তো আর্তের—রোগাক্রান্ত নরনারীর। তাঁদের সেবায়ত্নের কী প্রয়োজন? তাঁরা তো মায়া? ‘জগৎ’ তো মিথ্যা!

এই প্রতর্কের সমাধান হতে পারে একমাত্র এ ভাবে : ‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা’ মহাবাক্য শুধু মুক্তিকামী সম্যাদীর। আপামর জনসাধারণের আধিব্যাধি দূরীকরণে আদি শঙ্করাচার্য এটি করেছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন : ভারত-ভূখণ্ডের চারপ্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেই কেন সন্তুষ্ট হলেন আদি পরিকল্পনাকার? মধ্যভারতের দুটি মহাতীর্থকে কেন পরিহার করা হল—যেখানে ব্রাহ্মপঞ্চধর্মের দুটি প্রধান শাখা সুপ্রতিষ্ঠিত : কাশীধাম এবং বৃন্দাবন? শিবপার্বতী ও রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমিদ্বয়? চতুর্বেদের অতিরিক্ত পঞ্চমবেদের অনুপস্থিতির কারণ—এটা সম্ভবপর নয়। আর তাই যদি হয় তাহলে কাঞ্চিমঠ গড়ে উঠল কেনন করে?

হট্টা বিদ্যালঙ্কার প্রশ্ন করে ওঠেন, এ প্রশ্নের কোনো সমাধান আপনি পাননি?

—অনুমাননির্ভর সমাধান পেয়েছি। শাস্ত্রের অনুমোদন খুঁজে পাইনি।

—আপনার সেই অনুমান-নির্ভর সমাধানটি কী?

—আমার ধারণা যুগাবতার আদি শঙ্করাচার্য এটি করেছিলেন—মাতা উভয়ভারতীর ইচ্ছানুসারে। বলা যায় : মাতৃআজ্ঞায়!

বিদ্যালঙ্কার প্রশ্নভরা দুটি নয়ন মেলে প্রতীক্ষা করেন। রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন তাঁর ধারণা অনুসারে এ অসঙ্গতির ব্যাখ্যা দিয়ে চলেন :

সমগ্র আর্যাবর্ত পরিক্রমা সমাপ্ত করে, প্রতিটি ধর্মমতের শীর্ষস্থানীয় আচার্যদের একে একে পরাস্ত করে, আদি শঙ্করাচার্য এসে উপস্থিত হলেন পূর্বভারতে : গৌড়বঙ্গে। অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে মীমাংসা দর্শনের মোকাবিলা করা অপরিহার্য। বেদের কর্মকাণ্ডের উপর স্থাপিত মীমাংসা-দর্শনের শ্রেষ্ঠ মীমাংসক আচার্য কুমারিল ভট্ট তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত। আচার্যের অভিপ্রায় শ্রবণ করে কুমারিল বলেন যে, তিনি আর কোনো তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনিচ্ছুক। তবে শঙ্করের নিরাশ হবার কারণ নেই। কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য আচার্য মণ্ডন মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করলেই

হবে। তাহলেই কুমারিল ভট্ট স্বীকার করে নেবেন : সাধনমার্গে অদ্বৈত-মতবাদই শ্রেষ্ঠ।

আচার্য শঙ্কর এসে উপনীত হলেন মণ্ডন মিশ্রের আশ্রমে। মণ্ডন তখনো সন্ন্যাস অবলম্বন করেননি। সহধর্মিণী মহাপণ্ডিতা উভয়ভারতীয় সঙ্গে একত্রে একটি আশ্রম পরিচালনা করেন। আচার্য কুমারিলের অনুজ্ঞাক্রমে তিনি স্বীকৃত হলেন তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। বেদব্যাসের উত্তর-মীমাংসা (অদ্বৈতবাদ) বনাম জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন। কিন্তু বিচারক কে হবেন? উভয় দর্শনের উপর অধিকারী এমন পণ্ডিত কোথায় পাওয়া যাবে? যিনি এই জ্ঞানমার্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় মধ্যস্থ হতে সক্ষম? শঙ্করই এ প্রশ্নের সমাধান করে দিলেন। বলেন, আমি আপনার সহধর্মিণীর প্রগাঢ় জ্ঞানের বিষয়ে অবহিত। তিনি যদি স্বীকৃত হন তাহলে তাঁকেই আমি বিচারক বলে মেনে নেব।

উভয়ভারতী সর্বিনয়ে স্বীকৃত হলেন।

শঙ্করাচার্য তখন বলেন, কিন্তু একটি শর্ত আছে, মা!

—কী শর্ত?

—বিচারান্তে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যে পূর্ব-মীমাংসা-দর্শনই শ্রেষ্ঠপন্থা তাহলে আমি আমার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করব—ভারতের চারপ্রান্তে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হবে না। উপরন্তু আমি আচার্য মণ্ডন মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করব।

উভয়ভারতী প্রশ্ন করেন, আর যদি বিচারান্তে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অদ্বৈতবাদই শ্রেষ্ঠ?

—সেক্ষেত্রে আচার্য মণ্ডন মিশ্র আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই আশ্রম ত্যাগ করে আমার অনুগামী হবেন।

মণ্ডন মিশ্র বললেন, আমি এ শর্তে স্বীকৃত।

শঙ্করাচার্য বিচারকের দিকে দৃকপাত করে বললেন : আপনি?

উভয়ভারতী বজ্রগর্ভ হয়ে উভয়ের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। এবার শুধু বললেন, শর্তারোপের অধিকার উভয় পক্ষেরই থাকে। তা গ্রহণ-বর্জনের অধিকারও থাকে প্রতিপক্ষের। বিচারকের তো কোনো ভূমিকা নাই।

শুরু হল বিচার। সভায় উপস্থিত হয়েছেন উভয় মীমাংসা-দর্শনের বহু আচার্য এবং আচার্য শঙ্করের একাধিক অনুগামী। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। ক্রমে তর্কের বিষয়বস্তু এমনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ পরিগ্রহ করল যে তা শ্রোতৃবর্গের অধিকারসীমা অতিক্রম করে গেল। কে জিতছেন, কে হারছেন—কেউ বুঝতে পারলেন না।

একসময়ে বিচার শেষ হল। শ্রোতৃবৃন্দের কাছে জয়-পরাজয়ের কোনো সমাধান হয়নি। আচার্য শঙ্কর বিচারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার আপনি বলুন মা, কোন মত জয়লাভ করেছে?

উভয়ভারতী নিমীলিত নেত্রে পদ্মাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। অস্ফুটে বললেন, ‘অদ্বৈতবেদান্ত’ মত।

কাশীযাত্রা

সমস্ত সভা হায়-হায় করে উঠল। সভাস্থ পণ্ডিতদের অনেকেরই গুরু হচ্ছেন আচার্য মণ্ডন মিশ্র। এ সিদ্ধান্তবলে তাঁকে তদুপেই সন্ন্যাসগ্রহণ করতে হবে। আশ্রম ত্যাগ করে আচার্য শঙ্করের অনুগামী হতে হবে।

শঙ্করাচার্য আসন ত্যাগের উপক্রম করতেই উভয়ভারতী বাধা দিলেন। বললেন, আচার্যদেব! আপনি এ আশ্রমের প্রধান আচার্য মণ্ডন মিশ্রকে অর্ধ-অংশে পরাজিত করেছেন মাত্র! আমি তাঁর অর্ধাঙ্গিনী। আমাকেও পরাজিত না করে আপনি তো বিজয়ী হতে পারেন না?

স্মিত হাসলেন আচার্য শঙ্কর। বললেন, এই কথা? তথাস্তু! আপনার সঙ্গেও আমি তর্ক বিচারে প্রস্তুত। কিন্তু কে হবেন বিচারক?

—আপনার অনুগামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে কোনো একজনকে আপনি নির্বাচন করুন। আমি তাঁকেই বিচারক হিসাবে স্বীকার করে নেব।

—ভাল কথা। বিচারক নির্বাচনের অধিকার আপনি আমাকে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নির্বাচনের অধিকার আমিই আপনাকে দিলাম। বলুন মা, কোন শাস্ত্রবিষয়ে আমাদের এই প্রতর্ক হবে?

উভয়ভারতী তৎক্ষণাৎ বলেন, মহামুনি বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র।

আচার্য শঙ্কর প্রমাদ গণলেন। সলজ্জে বলেন, মা! আমি যে বাল্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। চিরব্রহ্মচারী। কামশাস্ত্র বিষয়ে আমি যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

উভয়ভারতী প্রত্যুত্তর করলেন, মহাভাগ! আপনার সম্মুখে এখন তিনটি পথ উন্মুক্ত। হয় প্রমাণ করুন : মহামুনি বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র অর্বাচীন, প্রক্ষিপ্ত; তা শাস্ত্রই নয়! অথবা আপনার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করুন যে, আমি তর্কের জন্য ইচ্ছামতো শাস্ত্র নির্বাচন করতে পারব। তৃতীয়ত, আপনি স্বীকার করতে পারেন যে, আপনি সবশাস্ত্রবিদ্যাবিশারদ নন—অর্থাৎ স্বেচ্ছায় পরাজয় মেনে নিচ্ছেন।

রামপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের মতে : এরপর শঙ্করাচার্যের জীবনীতে কিছু কপোলকল্পিত অলৌকিক কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বলা হয়েছে এই পর্যায়ে তর্ক অসমাপ্ত রেখে আচার্য শঙ্কর একমাস সময় প্রার্থনা করেন। তারপর অমরুক নামের একজন মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করেন। তাকে পুনর্জীবিত করে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন। মহিষীদের সঙ্গে সহবাস করে, কামশাস্ত্রবিশারদ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন উভয়ভারতীর আশ্রমে। উভয়ভারতী বিনাতর্কে পরাজয় স্বীকার করেন। সম্ভবত তিনি বুঝতে পারেন শঙ্কর 'ঈশ্বরপ্রেরিত আচার্য ও যুগমানবরূপে তাঁর আবির্ভাব'।

তর্কপঞ্চাননের মতে এই উপকাহিনিটি প্রক্ষিপ্ত। পরবর্তীকালের সংযোজন। কারণ শঙ্করাচার্য আজীবন উর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী ছিলেন এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। তদ্বিত্ত প্রতিটি নরদেহধারী ধর্মপ্রচারক বা যুগাবতার প্রাকৃতিক নিয়ম (Cosmic Laws) বা 'ঋতম্'কে অস্বীকার করতে পারেন না। মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের অধিকার কোনো নরদেহধারীর নাই!

বিদ্যালঙ্কার বলেন, তাহলে এই খণ্ডকাহিনির কী উপসংহার? এবং কোন্ সূত্রে আপনি সেই উপসংহারে আসছেন?

—বলছি। প্রথমে বলি, আমার কী বিশ্বাস। আমার মতে পরবর্তী ঘটনা এই জাতের হয়েছিল :

আদি শঙ্করাচার্য তিনটি বিকল্প-পথের কোনোটিকেই স্বীকার করে নিতে পারেন না। বলতে পারেন না যে মহামুনি বাৎস্যায়নের ‘কামশাস্ত্র’ একটি প্রক্ষিপ্ত রচনা। তেমনি প্রত্যাহার করে নিতে পারেননা তাঁর প্রতিশ্রুতি : উভয়ভারতীকে বিচার্য শাস্ত্রের নির্বাচন-অধিকার দানের কথা। আর যেটি তাঁর জীবনের ব্রত—ভারতে চার-চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিষ্ঠা—সেটিকে পরিত্যাগ করা তো আত্মহত্যা!

উভয়ভারতী বললেন, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এই অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের সমাধান দিতে পারি—

—বলুন, মা!

—প্রথম কথা, আপনি আমার স্বামীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। ফলে, পূর্বশর্তানুসারে তিনি এই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে আশ্রমত্যাগ করে যাবেন। দ্বিতীয় কথা : আপনি কামশাস্ত্র বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রত্যেক অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃত। যেহেতু গার্হস্থ্যধর্মের প্রামাণ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি অনবহিত। এক্ষেত্রে আমি বলব যে, আপনি ভারত-ভূখণ্ডে আপনার ইচ্ছামতো চারটি অদ্বৈত-বেদান্তের মঠ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, কিন্তু আপনার অনুশাসন শুধুমাত্র সংসারত্যাগী দর্শনামী সন্ন্যাসীদের ভিতরেই প্রযোজ্য হবে। কোনো গৃহস্থের জীবন-যাপনরীতির উপর আপনাদের অনুশাসন কার্যকরী করা চলবে না।

শঙ্করাচার্য নীরবে এই সমাধান সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকেন।

উভয়ভারতী পুনরায় বলেন, আপনি বিবেচনা করে দেখুন মহর্ষি : আপনার সিদ্ধান্ত যদি সমগ্র ভারত নির্বিচারে গ্রহণ করে তাহলে শতাব্দীকালের মধ্যে ভারতবর্ষে মনুষ্যপ্রজাতি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। থাকবে শুধু মনুষ্যতর প্রাণী—স্বাপদসঙ্কুল সে অরণ্য অনিবার্যভাবে প্রাগ্‌মানবযুগে প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ অন্যান্য জীবনে আপনি আপনার মূল তত্ত্ব—‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা’ এ মত গ্রহণ করাতে পারবেন না। বিবেচনা করে দেখুন, মহাভাগ! ‘ব্রহ্ম সত্য’ এ মন্ত্র আছে শুধু আপনার মননে, আপনার ধীশক্তিতে, ধ্যানে। ‘জগৎ’ মিথ্যাই হোক আর মায়াই হোক—সে মিথ্যা বা মায়া সৃজন করেছেন সেই ব্রহ্মই। নয় কি? এ ‘মায়া দোলা’ তাঁরই—জীবের সৃষ্ট নয়। পূর্বমীমাংসা দর্শনের চতুরাশ্রম পথেই শুধু মানবপ্রজাতি বিবর্তনপথে অগ্রসর হতে পারবে। অন্যথায় আপনার চতুরাশ্রম শতাব্দীকাল পরে ধ্বংসস্থাপে পরিণত হবে—ভবিষ্যৎ শঙ্করাচার্যের অভাবে।

শঙ্কর বললেন, আপনাকে আমি মাতৃ-সম্বোধন করেছি। এ আমার মাতৃ-অনুজ্ঞা। তাই হবে—ভারতবর্ষের চারটি প্রত্যন্তদেশে আমি আমার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করব! মধ্যভারত থাকবে পূর্ব-মীমাংসা-দর্শনের এজিয়ারে।

কাশীযাত্রা

এজন্যই সেই মহাপণ্ডিত বৃন্দাবনে বা কাশীধামে তাঁর অদ্বৈত বেদান্তের মঠ প্রতিষ্ঠা করেননি। এটাই আমার বিশ্বাস। এটাই আমার সমাধান।

বিদ্যালঙ্কার এতক্ষণে বলেন, আপনি আমাকে কী আদেশ দিচ্ছেন?

—হয় আমার এ মতকে খণ্ডন করে দেখাও : কী হেতুতে আদি শঙ্করাচার্য বৃন্দাবনে বা কাশীধামে তাঁর মঠ প্রতিষ্ঠা করেননি। কেন তিনি ‘আদি-বরাহ’কে পর্যন্ত মঠের মূল দেবতা হিসাবে স্বীকার করেছেন? তদানীন্তন ভারতের সর্বাধিক ভক্তের উপাস্য ‘শিবপার্বতী’ এবং ‘রাধাকৃষ্ণ’কে কেন পরিহার করেছিলেন। কিংবা স্বীকার করে নাও—বৃন্দাবন বা কাশীধামে অদ্বৈত বেদান্তের মঠ প্রতিষ্ঠা না করে আদি শঙ্করাচার্য কিছু ভুল করেছিলেন, যে ভুল যোশীমঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য সংশোধন-মানসে কাশীনরেশের নিকট কিছু ভুখণ্ড দাবি করেছেন।

নতমস্তকে হট্টা বিদ্যালঙ্কার অনেকক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে বললেন, আমি আপনার সিদ্ধান্ত সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করছি আচার্যদেব।

—কিন্তু যোশীমঠের শঙ্করাচার্য একজন সম্মানীয় সন্ন্যাসী। তাঁকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা অসৌজন্যমূলক এবং অভদ্রতা হবে। তাই আমাদের ইচ্ছা তাঁকে কাশীধামে আমন্ত্রণ করা। কোনো তর্কবুদ্ধে অবতীর্ণ হতে নয়। ঘরোয়া আলোচনায়। যে প্রশ্নগুলি আমি এতক্ষণ পেশ করেছি সেগুলিই আমরা রাখব তাঁর সম্মুখে। তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলবেন—কী কারণে সহস্র বৎসর পূর্বে আদি শঙ্করাচার্য ভারতের চতুঃপ্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। কেন অদ্বৈত বেদান্তের মঠের অনুশাসন শুধুমাত্র দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সীমিত। গৃহীদের ভিতর নয়।

—আমার মনে হয় আপনি যা বললেন, সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে।

—সেক্ষেত্রে কাশীধামের পণ্ডিতসমাজ যদি তোমাকেই সে দায়িত্ব প্রদান করতে চায় তাতে তোমার কীসের অপত্তি?

বিদ্যালঙ্কার ইতস্তত করে বলেন : আমি কেন? আমি তো ইদানীং কোনো তর্কসভায় যোগদান করি না।

—আমি জানি। ধরে নাও এটা আমার ইচ্ছা।

—আপনার ‘ইচ্ছাই’ যে আমার কাছে ‘আদেশ’।

—তুমি তো কোনো তর্কে অবতীর্ণ হচ্ছ না। এটা তর্কসভা নয়।

নতমস্তকে বিদ্যালঙ্কার বলেন, তাই হবে, বাবা।

বৃদ্ধ হেসে বলেন, বিদ্যার্ণব তোকে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি দিয়েছিল। সেটাও তার ভুল হয়েছিল। তোর উপাধি হওয়া উচিত : ‘উভয়ভারতী’।



প্রাককথন

সপ্তদশ শতকে এক প্রজন্মের ব্যবস্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাঙলার দুই বিদ্যুদী— হুঁ ও হুঁ বিদ্যালঙ্কার। এঁদের জীবনের নির্যাসেই সৃষ্ট লেখকের মানসকন্যা ‘রূপমঞ্জরী’। বর্ধমান জেলার সোএগ্রাই গ্রামের ভেষগাচার্য রূপেন্দ্রনাথ ও কুসুমমঞ্জরীর ঘরে জন্ম তাঁর। পূর্বসূরী রূপেন্দ্র ও কুসুমমঞ্জরীর জীবনের গল্প নিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

শেষখণ্ডের (যারাবাহিক নবকল্লোল ১৪১১, বৈশাখ-ফাগুন সংখ্যা) লেখায় দেখতে পাই মাতৃহীন রূপমঞ্জরী রূপেন্দ্রের সাহচর্যে বড় হচ্ছেন। বেদজ্ঞ পিতৃদেব রূপেন্দ্রের গৃহে আসে নানান বিদ্যার্থী, জমিদারপুত্র শুভপ্রসন্নও। রূপমঞ্জরীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এবং ক্রমে প্রেমের প্রথম মুকুল অঙ্কুরেই নিষ্পেষিত হয়। কারণ ভিন্ন শ্রেণীর পরিণয় সমাজসিদ্ধ নয়। জমিদার তারাপ্রসন্ন ভাদুড়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ে রূপেন্দ্রের কন্যাদান প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

অভিমানাহত শুভপ্রসন্ন গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হন। রূপমঞ্জরীর বিবাহ হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের সৌম্যসুন্দরের সঙ্গে। নব বরবধু পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়, কিন্তু এক অত্যাশ্চর্য দুর্ঘটনায় সৌম্যসুন্দরের অকালমৃত্যু ঘটে।

শুণ্ডরালয় থেকে বরকন্দাজ আসে সালঙ্কারা রূপমঞ্জরীকে তুলে নিয়ে যেতে। সে যে এখন তাদের সম্পত্তি। সহমরণের পুণ্যরত থেকে তো বধুকে বঞ্চিত করা চলে না!

মূর্ছিতা রূপমঞ্জরী ও প্রস্তরবৎ পিতা রূপেন্দ্রকে অবশেষে রক্ষা করে জল-অচল, কৃতজ্ঞ লাঠিয়ালের দল।

গল্পের অধিক বিস্তার নিম্প্রয়োজন। শেষ সংখ্যায় দেখছি রূপমঞ্জরী কাশীর পণ্ডিতমহলে সুপ্রতিষ্ঠিত। ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধিতে সম্মানিত।

এখন যোগীমঠের এক মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী কাশীধামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক হন যা উপস্থিত কাশীর পণ্ডিতসমাজের সম্মতিসাপেক্ষ। তাঁরা বিদ্যালঙ্কারের প্রতি এ দায়িত্ব অর্পণ করেন ও তর্কযুদ্ধে তাঁদের প্রতিভা নিযুক্ত করেন।

বিদ্যালঙ্কার ইতস্তত করে বলেন—আমি কেন? আমি তো ইদানীং কোনো তর্কসভায় যোগদান করি না।

—আমি জানি, ধরে নাও এটা আমাদের ইচ্ছা।

নতমস্তকে বিদ্যালঙ্কার বলেন, তাই হবে বাবা।

বৃদ্ধ (তর্কপঞ্চানন) হেসে বলেন, বিদ্যার্ণব তোকে ‘বিদ্যালঙ্কার’ উপাধি দিয়েছিল, সেটাও তার ভুল হয়েছিল। তোর উপাধি হওয়া উচিত ‘উভয়ভারতী’!



‘অসমাপ্ত গানে’

(1830)

পঞ্চদশ পর্ব

‘উভয়ভারতী’! কবে কথাটি যেন প্রথম শুনেছিলেন ভাবতে চেষ্টা করলেন বিদ্যালঙ্কার। একচিলতে হাসি ফুটে উঠল। একঘটি বছরের বলিরেখার তজনীসংকেত, তবু সে হাসিতে একফোঁটা মলিনতার আভাস নেই।

আশ্রমপ্রান্তের গোলক-চাঁপা গাছটি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ‘আয় বোস মা’। বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন রূপমঞ্জরী। আঃ, চম্পক সৌরভ। সেই চেনা ফুলের সুবাস হাত ধরে নিয়ে এল বহুদিন আগের ফেলে-আসা সোএগাই গ্রামের ছোট্ট কুটিরটিতে। যেখানে তাঁর শৈশব কেটেছে। কেটেছে কৈশোর।

মাতৃহীন গৃহে বিধবা সোনা-মা—যিনি তাঁকে বুক করে লালন করতেন—মনে পড়ল তাঁর কথা। মনে পড়ল স্নেহাতুর পিতৃদেবের অমূল্য সঙ্গ-সাহচর্য। ভেসে উঠল পিতৃদেবের গল্পবলা অবসরগুলি। অঙ্গনপ্রান্তের ছোট্ট মাটির ঘরটি। সামনে ঐ তো সোনা-মা মাদুর পেতে দিলেন। ঘটির জলে চরণ মার্জনা করে বসলেন এসে একপ্রান্তে। আর ওরা? শুভদা আর সে? মেতেছিল চপল খেলায়।

না ছটোপুটি নয়, অর্থহীন তর্কযুদ্ধ খেলা। শুভদা বলেছিল—তোর মাথায় গোবর পোড়া। রূপমঞ্জরীও ছাড়েনি। উত্তর দিয়েছিল—আর তোমার মস্তকে বুঝি অশ্বভিষ?!

স্মৃতির মণিমাণ্ডুকা সব কিছুই মেলে ধরে। এতগুলি বছরের আড়াল, তবু মনের গভীরে সবই জ্বলজ্বল করে। নিবিড় অন্ধকার রাত্রে আকাশের চেনা তারাদের মতো। কতই বা বয়স তখন তাঁর? সাত কিংবা আট?

কী আশ্চর্য, পিতৃদেব সেদিন শোনাচ্ছিলেন ঐ একই গল্প। উভয়ভারতীর কথা আর মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমত। কুমারিল ভট্ট, মণ্ডনমিশ্র, উভয়ভারতী, ... কামশাস্ত্র ... শব্দগুলি সেদিনই প্রথম ধরা দেয় শ্রুতিতে। তারপর কী আশ্চর্য প্রকারে শঙ্করাচার্য তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন মণ্ডন মিশ্রের সম্মুখে। জয়ী হলেন শঙ্করাচার্য, কিন্তু জয়ধ্বজা উড্ডীন করা আর সম্ভব হল না তাঁর। পরাজয় স্বীকার করতে হল প্রতিদ্বন্দ্বী

‘অসমাপ্ত গানে’

মণ্ডনমিশ্রের অর্ধাঙ্গিনী উভয়ভারতীর কাছে। পারলেন না তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতে। পেলেন না উপযুক্ত প্রত্যুত্তর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তখন উভয়ভারতীর শেষ বিধান—ও পথ কেবল সম্যাসীর পথ, গৃহীর গ্রাথ পছা হতে পারে না—‘আর্য, সংসারের অর্ধেক যে নারী সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বৃত আপনি।’

একটি একটি প্রলেপ উন্মোচিত হয়ে ফুটে উঠতে লাগল স্মৃতির পট জুড়ে।

কামশাস্ত্র। শব্দটি সেদিনই প্রথম কর্ণগোচর হয় রূপমঞ্জরীর। শ্রবণমাত্র অন্যান্য সকলের কপোল রক্তিম-রাতুল হয়ে উঠতে দেখেছে সে। নিষ্পাপ বালিকার বোধগম্য হয়নি কিছুই। ও কেবল অবাক হয়েছে। কিন্তু মননের কোষে উণ্ড হয়েছে বীজ তৎক্ষণাৎ।

সব কথা মনে পড়ে রূপমঞ্জরীর। স...ব। সোনা-মাকে হারানো... পিতৃহীন দিনগুলির শূন্যতা ... আর শুভদা।

শুভদার আরতিম সেই মুখখানা—বাৎস্যায়ন, কামশাস্ত্রের উল্লেখমাত্র ওর মুঠি ছেড়ে দ্রুত পলায়ন।

আজ একা-একই হাসলেন বৃদ্ধা। পরক্ষণে একই ভাবনার সূত্র কণ্ঠ অবরুদ্ধ করে তুলল তাঁর। মনে পড়ল শুভদার সঙ্গে শেষ বিদায় দিনটির কথা। বৃদ্ধা চোখ মুছলেন। সে সব তো কত কত দিন আগের কথা। তবু কেন এমন স্ফটিকস্বচ্ছ, জীবন্ত?

কোলের ওপর রাখা নিজেরই হাত দুটির ওপর চোখ পড়ল। শিরাসর্বস্ব লোলচর্মসার আজ। এই সেই হাত যা কিশোর শুভদাকে সরিয়ে দিয়েছিল। আঙুল দশটি নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে কপালে বলিরেখা ফুটে উঠল।

উদাস দুটি চোখ দূরে মেলে ভাবতে থাকলেন বিদ্যালঙ্কার। অন্তরাছা—তাকে কি জরা গ্রাস করতে পারে না? না হলে চোখে জল আসে কী করে? সেখানে কেমন করে তবে এই সম্যাসিনীর নির্মোকে আজও বন্দী থাকে কিশোরী রূপমঞ্জরীর অভিমানী অশ্রুবিন্দু—শক্তির মাঝে নিটোল মুক্তাবিন্দুটির মতো?



আশ্রমে আজ ভারি ব্যস্ততা। আশ্রমপ্রান্তর সাজিয়েওজিয়ে সুন্দর করার কাজে লেগেছে ওরা। মহামানী অতিথি, যোশীমঠের আচার্যের নিমন্ত্রণ—বিদ্যার্ণব নিয়ে আসবেন তাঁকে স্বয়ং। আর দুদিন মাত্র সময় বাকি। অভ্যর্থনার যেন কোনো ত্রুটি না হয়। তাই কেউ লেগেছে আগাছা নিষ্কাশনের কার্যে। কেউ বা আশ্রমপ্রাঙ্গণটি গঙ্গাজলে ধৌত করে পরিমার্জনায় ব্যস্ত। পিতলের বৃহৎ পিলসুজ প্রদীপগুলি এনে রেখেছে রোহিণী। বসেছে তিস্তিলী-অম্লিকা সহযোগে মার্জনায়। দুপুরের রৌদ্রে সেগুলি উজ্জ্বল, স্বর্ণাভ।

মধুনস্তমুতোযসো মধুমং পার্থিবং রজঃ

মধু দৌরন্ত নঃ পিতা।।

গাছপালা, ওষধিসকল মধুময় হয়ে উঠুক। দিবস-যামিনী নিয়ে এই যে পৃথিবীলোক, তা মধুময় হয়ে উঠুক। পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হোন।

হাতের কাজ থামিয়ে রোহিণী মুখ তুলে চেয়ে রইল। কী যে অং-বং বলেন আশ্রম-মা, বোধগম্য হয় না রোহিণীর। কিন্তু মাঝেমাঝে যখন এমন করে বুঝিয়ে দেন, কী সুন্দর কথাগুলি—ভাবে সে।

দুপুরের অবসরে এই নীরব গৃহপ্রাঙ্গণে সেই কথাগুলি কেবল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বাজতে থাকে পাতার রিমঝিম নৃপুর নিকর্ণে, বাজতে থাকে ঘুঘুপাখির একটানা ডাকে—উম্..উ-উ-ম্..উ উ উ ম্।

কদিন হল এই পাখিজোড়া ওদের উঠোন প্রাঙ্গণে প্রায়ই আসছে। মাঝেমাঝে রোহিণী তাদের গমের দানা, চাল-ডাল ছুঁড়ে দেয়, টুকিয়ে টুকিয়ে খায় ওরা—তারই লোভে বুঝি আসে। একজন এলেই কোথা থেকে আরেকজনও এসে উপস্থিত হয় ঠিক। তারপর ঠোটে ঠোটে খেলা-আদর। একটু পরে সঙ্গীটি চড়ে বসল সঙ্গিনীর ওপর।

কী কাণ্ড! নির্লজ্জ-বেহায়া। একেবারে আশ্রম-মার চোখের সামনে! রোহিণী চৈঁচিয়ে ওঠে—হুশ্ হুশ্। তাড়াতে যায়। কিন্তু পাখি দুটির কাছে তখন বিশ্বচরাচর লুপ্ত। ওরা আপনাতে-আপনি বিভোর। ‘এই হুশ্ হুশ্’ রোহিণী উঠে ছুটে যায়।

বিদ্যালঙ্কার বাধা দেন ওকে। অঙ্গুলি রাখেন ওষ্ঠে। ইঙ্গিত করেন—স্থির, নিশ্চুপ হতে। প্রকৃতির সাথে মিলে যেতে ধীরে, খুব ধীরে।

একটু পরেই পাখি দুটি উড়ে যায়। বৃদ্ধা হেসে বলেন—

—এই যে নিয়ম রোহিণী। এ-ই রীতি প্রকৃতির, জীবনের। এতে বাধ সাধতে নেই।

—তাই বলে ঠাকুরঘরের সামনে?

—স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রম্মতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। এমন কী তিনিও (ব্রহ্মাও) আনন্দলাভ করতে পারেন না একাকিত্বে। কারণ একাকী থেকে কেউ আনন্দ লাভ কতে পারে না। তখন তিনি দ্বিতীয় সত্তায় নিজেকে রূপান্তরিত করতে চাইলেন, বুঝলি, রোহিণী—তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ

সংপরিষক্তৌ স ইমমেবাষ্টানং—বেধাপাতয়ন্ততঃ।।

আলিঙ্গনাবদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ যে আনন্দলাভ করে, তিনিও সে আনন্দলাভ করলেন। তিনি স্বীয় সত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী সৃষ্ট হল।

পতিশ্চ পত্নী চাভবতং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব। তাং সমভবন্ততে—মনুষ্যা অজায়ন্ত।—এইভাবে উৎপন্ন হল মনুষ্য জাতি।

রোহিণী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এসব তত্ত্বকথার কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। সে কেবল মস্তমুণ্ডের মতো চেয়ে রইল।

‘অসমাপ্ত গানে’

বিদ্যালঙ্কারেরও লক্ষ্য রইল না যে তাঁর একমাত্র শ্রোতাটি নিরক্ষরা গ্রাম্য রোহিণী, যে বিশ্বাস করে অক্ষরপরিচয়ই বৈধব্যের কারণ। ঘরভরা বিদগ্ধ গুণিজনের জন্য যে সপ্তম প্রযোজ্য সেই একই একাগ্রতায় তিনি নিমগ্ন হলেন।

যেন দেখতে পেলেন এই মঞ্চ সভাস্থ সম্মানিত গুণিজন-আলোকে উদ্ভাসিত। ঐ যেন প্রথম সারিতে বসে আছেন বিদ্যার্ণব, যোশীমঠের আমন্ত্রিত আচার্য, বসে আছেন ভূভারতের মহামানী বিদ্যাবিভূষণ সন্ন্যাসীরা।

ওপারে চিকের আড়ালে যেন এসে বসেছেন রানীমা, মালতী-মা, রোহিণী, আরও কত নোলকপরা কুমারী, সিঁথেয় সিন্দুর-রাঙা সধবা, সাদা-থান বিধবা মেয়ের দল। এসে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষ—কালো আব্দুল গায়ের মঝি-মাল্লা ঈশান ও তার সাদোপাদরা।

আর তিনি সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে, সবার সামনে, অনবগুণ্ঠিত।

যতপ্রদীপ জ্বলে হু-হু করে, ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। মাসলিক শঙ্খধ্বনি বাজায় পুরকামিনীরা।

উদাত্ত গলায় বলে ওঠেন বিদ্যালঙ্কার—

‘ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিথ্য’—এ কেবল মুক্তিকামী সন্ন্যাসীর মন্ত্র হতে পারে। সংসারে খাটে না। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই দিয়েছেন রোগ, জরা, মৃত্যু। দিয়েছেন রূপ, যৌবন, জন্ম। চিনিয়েছেন সেবা, মায়া, হাসি-কান্না। তিনি অসীম দূরদর্শী। কিংবা দূরদর্শিনী! হয়ত আমাদের প্রবিধানের অনেক উর্ধ্বে।

সেই কথাই তো উভয়ভারতী বুঝিয়েছিলেন। নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। এ প্রপঞ্চে, এ নিত্যখেলায় প্রকৃতি ভিন্ন পুরুষ অচল, পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি অচল। এ জীবন অচল।

তারপর রোহিণীর খুব কাছে এসে বলেন—

—অথচ দ্যাখ্ মা, আপন রক্ত-মাংস দিয়ে যে মা জন্ম দেয় তার সন্তানকে, সব প্রজাতির মধ্যে চেয়ে দ্যাখ্, পুরুষ প্রকৃতিকে মিটিয়ে দেয় সে প্রাপ্য মর্যাদা। পুরুষ ময়ূর রঙবাহার পৈখম মেলে নেচে সাদামাটা ময়ূরীর মন জয় করে। পুরুষ সিংহ সিংহীর তুলনায় কত আকর্ষণীয়, উজ্জ্বল। তারা জননী জাতিকে ভোলে না সে সপ্রশংস মূল্য জানাতে। একমাত্র ব্যতিক্রম মানুষ সমাজে। আমাদের সভ্য পুরুষমানুষ সবচেয়ে কৃপণ, হৃদয়হীন ও স্বার্থপর।

রোহিণী এসবের কী বুঝল তা সে-ই জানে। ওর সরল হৃদয় কেমন একটা অজানা গা-ছমছম ভয় ও অপরিসীম গর্বে ভরে গেল। মনে মনে সে যেন দেখতে পেল, ঐ তীব্র বুদ্ধি ও শক্তির কাছে, জ্ঞান ও রূপের আলোয় উজ্জ্বল ঐ মানুষটির সামনে বুঝি আর কেউ দাঁড়াতে পারে না। তিনি নিঃসন্দেহে বিজয়িনী প্রথমা এবং তিনি ওদের প্রতিভূ।

কী ভেবে সে খুব কাছে এসে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিল আশ্রম-মার পায়ে। বিদ্যালঙ্কার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।



কাজল নদীর কালো জলে তখন দুটি আলোর বিন্দু টলমল করে এগিয়ে চলেছে স্রোতের টানে। দুটি ছিপছিপে ছোটো মেয়ে, গাছ-কোমর ডুরে শাড়ি পরা হেসে, ভেঙে পড়ছিল এ ওর গায়ে। পাতার ভেলায় ওরা আকাশ-প্রদীপ ভাসিয়েছে যে।

শুভপ্রসন্ন এই রঙ্গ দেখছিলেন। হঠাৎ চমক ভাঙল। দেখলেন, একটি অল্পবয়সী কিশোরী, বয়স চোদ্দ কি পনের, সাদা থানের ঘোমটায় ঢাকা মুখখানি। কাজলকালো দীঘল চোখদুটি মেলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

—বাবা, আমায় দয়া করো বাবা। আমার কেউ নেই। বিশ্বনাথের চরণে ঠাই পাবো বলে পালিয়ে এসেছি।...ভিক্ষা করে খাই, বার।... দু-দিন কিছু পেটে পড়েনি, আমাকে দয়া করো ... তুমি তো সন্ন্যাসীঠাকুর, বাবা...।

শুভপ্রসন্ন চমকে উঠলেন। ঐ মুখ যে তাঁর চেনা। বহুদিন আগের ফেলে আসা সোণাই গ্রামের সেই কাজলকালো চোখ। অস্ফুটে ঠোট দুটি নড়ে উঠল তাঁর—‘মঞ্জু!’

পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেলেন শুভপ্রসন্ন। মঞ্জু? তা কী করে হবে? সে তো পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আত্মস্থ হলেন সন্ন্যাসী। নিজেকে সামলে নিলেন। মনে করিয়ে দিলেন নিজেকে তিনি সন্ন্যাসী। তাঁকে থাকতে হবে ‘দুঃখেন্দ্রনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ’।

এমন সময় মিশকালো আদুল গা, কাঁচা-পাকা দাড়ি এক মাঝি এসে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাল।

—পেন্নাম হই, ঠাকুর, মুই ঈশেন মাঝি এজ্ঞে। জেতে কৈবত্য। আপনাকো এই ঘাটে পৌঁছে বাসায় নে যাবার কাজটা পড়িচে এই অধমের উপর।

হাত কচলিয়ে, গলার গামছাটি টেনে সে মাথাটি প্রায় বুকের কাছে ঠেকিয়ে ফেললে। করজোড়ে আবার নমস্কার জানালে।

—ছি চরণদুটি এই নৌকায় রাখেন দ্যাব্তা। এই যে ধরেন আমার হাত। এ্যাঃ এ্যাই। জল-অচ্ছুৎ নই গো মোরা, জেতে কৈবত্য হই ঠাকুর।

যৌশীমঠের সন্ন্যাসীঠাকুর ওর সাহায্যে উঠে এলেন নৌকায়। কাশীর গঙ্গাবক্ষে ছিপ-নৌকাখানি ছালাং ছালাং শব্দে এগিয়ে চলল। মাথার ওপর একফালি দ্বিতীয়ার চাঁদ। খানিক আগেই সূর্যাস্ত হয়েছে। এখন হালকা নীল আকাশে সন্ধ্যাতারাটি বিকমিক করছে। অপরাধ মৌনতার মাঝে সারা চরাচর জুড়ে যেন পূরবীর তান শুনতে পেলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর।

কিন্তু বেশীক্ষণ সইল না। একটু পরেই—কাঁসর-ঘণ্টার খাতব নিনাদে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল নিখিল নিস্তব্ধতা। দেখা গেল একটি ঘাটের কাছে যেন বেশ কয়েকটি মশাল জ্বলছে। শব্দও আসছে সেখান থেকেই।

‘অসমাপ্ত গানে’

—এ মণিকর্ণিকা ঘাট, ঠাকুর। কোনো সতী-নথি সহমরণে চললেন বুঝি। তাই এই জাঁকজমক।

—পৈশাচিক উল্লাস।

সন্নাসী ঠাকুরের মুখে এই কথাটির অর্থ ঈশান মাঝি বুঝল কিনা বোঝা গেল না। জ্ঞ-কুঁচকে চেয়ে রইল খানিক। কিন্তু কথাটি তার বহুদিন আগের একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িয়ে দিল। প্রৌঢ় মাঝি বলে উঠল :

—আপনের ঐ কতটো আমরা এক কতা মনে পড়িয়ে দিল, কত্তা। আমাদের গাঁয়ের কতা। বদমান জিলায় সোএগ্রাই গ্রাম—হোথায় আমাগো দেশ। মা নথি, অমন রাজপুত্রের মতো সোয়ামী পেলে, কিন্তু ভোগ করতি পারলে না গো। বাপ তার ছেল কোবরেজ। কারও কোনো অসুক-বিসুক করিচে তো কোবরেজ ঠাকুর ঠিক এসি হাজির হইচেন। মোদের কত জনের যে পেরাণ বাঁচাইচেন। তিনি ছিলেন দ্যাবতা, ঠাকুর।

একটু থেমে সে বললে,—অথচ নিজের অমন একমাত্র কন্যেটির বেলায় কিচ্ছুটি করত্যা করেন না। জ্যাস্ত কন্যা অজ্ঞান অবস্থায় পাক্ষিতে তুলে নিল, তিনি পাথরডার মতো হইয়ে গেলেন।

—কী বলছ ঈশান, খুলে বল।

—সেই তো বলি কত্তা, মা ঠাকুরের অমন বিয়ে দিলেন বাপ, কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ... সব ফাঁকি ... সব ফাঁকি। এ্যামন ম্যাঘ হইল, এ্যামন বাজ পইড়ল, আর পইড়ল কিনা ঠিক ত্যানার মাথার উপর। অমন সোয়ামী, পরানটা দিলেন মাঠের মাঝে বজ্রাহত হইয়ে। মুহূর্তে ছাই হইয়ে গ্যালেন।

তখন মা-জননীর স্বপ্নরবাড়ি থেকে ওরা পাক্ষি আনলে। আনলে গ্রামগুদু লোক, গয়নাগাটি সমেত বৌমাকে নিয়ে যাতি। সহমরণে নে যাবে। এ্যামনকি সঙ্গে আনলে একদল লাঠিয়ালও।

কিন্তুক আমাগো সঙ্গে পারবে কেনি? আমরাও দেখিয়ে দিনু। ভীমা বাগদীর চেলা মুই— ঈশান বাগদীর নামে তখন বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। তখন আমার হেই চেহারা, কত্তা, এই এখনকার পারা নয়।

আমাগো দলেও ছিল সাতটি ধানুকী। ওরা যেমন লাঠি তোলে আমরাও মারলাম ভিল-ধনুর ছিলায় জোর টান। বুক চিতাইয়া ডাঁড়াইলাম। ওরা পা-পা কইরা পেছু হটল। পলাইবার পথ পাইল না। এ কলিজায় পরান থাকতি মা ঠাকুরের নি যাবে? সোএগ্রাই গেরাম থিক্যে? সে হবিনি। যে দ্যাবতা আমাদের কতজনার সন্তানের পরান ফেরায়ে দেছে কতবার, আমরা হেটুক করব না, তেনার পাশে ডাঁড়াইতে?

ঈশানের রোষ-ক্রুদ্ধ আবেশ ছড়িয়ে পড়ল হাতের দাঁড় বাওয়ার ছন্দে। কালো মানুষটার পেশিবহল গায়ে শ্বেদবিন্দু চিকচিক ফুটে উঠল, জলে শব্দ উঠল—ছলাৎ ছলাৎ।

খানিক চূপ থেকে ঈশান আবার বলে উঠল—

—আমার খুড়ো ভীমা বাগদি তো কোবরেজ ঠাকুরের পা জড়াইয়ে কেঁদে পড়ছিল—কোবরেজ ঠাকুর, আমরা তো মরি যাইনি। আমরা থাকতি দিদি ঠাকুরগণকে কেউ ছুতি পারবা না। হেডা তুমি জেনো। এখন তুমি অমন পাথর হইয়ে গেলে কেনে? তুমি অমন হলি আমরা কুথায় যাবো গো?

—এমনই কপাল ঠাকুর, ঘাটে ঘাটে ঘুইরে ঠিক এসে পড়িচি মা-ঠাকুরগণের যখনই বিপদ এসিচে।

মাথার উপর ঈশ্বরের উদ্দেশে চোখ তুলে বললে—ভগমান ঠিক আমাদের এনে দিছেন। ঘুরে ঘুরে সেই কাশীতে। মা-ঠাকুরগণ বাপের মতোই ধর্মন্তরা—কতজনকে যে প্রাণে বাঁচাইছেন। এখন তেনার চরণেই মুই ঠাই পেইচি। জাকাইতি আর করি না ঠাকুর। কত পাপ করিচি। এখন তেনার সেবাতেই শেষ দিন কাটি পার করি দিতে চাই।

কথায় কথায় অনেক কথাই বলে ফেলে ঈশান।

তখন কাশীরেশের সিংহাসন দখল করে পুরন্দর ক্ষেত্রী নিজহস্তে শাসনভার তুলে নিয়েছে। কাশীর সাধারণ মানুষ তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ। অত্যাচারী পুরন্দরের ব্যভিচার, হটি বিপ্লবকারীর প্রতি তার পৈশাচিক নির্যাতনের হুকুমনামা জারি, অশালীন ব্যবহার—সবই বললে। অথচ এ রাজার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারার মতো কেউ নেই।

ঈশান তার নিজের জলদস্যু সত্তার কথা, তার বিচিত্র বৃত্তি ও ক্ষমতার কথা, কিছুই গোপন করল না। বললে—বজ্রধরের সঙ্গে সংযুক্তভাবে সে সুকৌশলে পুরন্দরের প্রমোদকানন আক্রমণ করে ও তাকে হত্যা করে। অবশেষে কাশীধামের সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

—তাই তো বলি কত্তা, ভগমান আমায় ঠিক সময়মতো জুটিয়ে দেছেন মা-ঠাকুরগণের ছিচরণে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে তার শ্রোতা মহামান্য সন্ন্যাসীঠাকুর। তাঁর সম্মুখে এত কথা এমন করে বলাটা ঠিক শোভন হয়নি। হয়ত অত্যন্ত বাচালতা ও গুরুতর অপরাধই হয়েছে।

দাঁড় দুটি নৌকার গায়ে আটকে হাত জোড় করলে সে।

—আমায় আপনি মাফ করো কত্তা। নিজগুণে ক্ষমা করে দ্যান দ্যাবতা। আমি যে কার সুমুখে কী বলি ফেলিচি খেয়াল পারিনি। ছি, ছি। এই তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর, আমাকে আপনি ক্ষমা করো।

নৌকা দুলে ওঠে ভারসাম্যের অভাবে। কিন্তু সন্ন্যাসীঠাকুর সেদিকে খেয়াল করেন না, বলে ওঠেন—

—ঈশান, তোমার ভাদুড়ীমশাইকে মনে পড়ে, সোএগুই গ্রামের জমিদার তারাপ্রসন্ন ভাদুড়ী? তিনি আমার পিতাঠাকুর।

ঈশানের চোয়ালদুটি ঝুলে পড়ে।

—শুভদাদা? যিনি নিরুদ্দেশ হইছিলেন?

অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। ঘোর ভাঙে জোর ধাক্কা। নৌকা তীরে এসে ভিড়েছে।



ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠাতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্;
আবীরাবীম্ এধি; বেদস্য ম আগীস্থঃ;
শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি;
ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি; তস্মামবতু, তদ্বজ্জারমবতু
অবতু মাম্, অবতু বজ্জারম্, অবতু বজ্জারম্
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন সন্ন্যাসীঠাকুর। গঙ্গাবক্ষে আধবুক জলে দাঁড়িয়ে। আচমন করলেন। মন্ত্রপাঠের সুরের রেশটা রয়ে গেল। আহা, কী সুন্দর—ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি। মানসিক সত্য বলিব, বাচনিক সত্য বলিব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, ব্রহ্ম আচার্যকে রক্ষা করুন...

সেই ভাবনার সূত্র ধরে মনে পড়ল তাঁর আচার্য রূপেন্দ্র ভেষগাচার্যের কথা। মনে পড়ল সোএগাই গাঁয়ে তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলি। রূপমঞ্জরী আজ তাঁর এতো কাছে, তাকে একবারটি দেখবার জন্য মন কেমন করে উঠল। পরক্ষণেই সংযত হলেন সন্ন্যাসী। নিজেকে মনে করিয়ে দিলেন, তিনি সন্ন্যাসী। এই সকল মানসিক চপলতা তাঁকে শোভা পায় না। বোঝালেন নিজেকে, তাঁদের পরস্পরের দেখা না হওয়াই বোধহয় ভালো।

কিন্তু তাঁর আরেকটি সত্তা বিরহবিধুর প্রার্থনার গেয়ে উঠল :

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্
মিত্রস্যাং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।।

হে পরমেশ্বর, আমাকে এরূপ দৃঢ় কর যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করে, আমিও যেন মিত্রের দৃষ্টিতে তাদের দর্শন করি, আমরা যেন পরস্পরকে বন্ধুভাবে দর্শন করি।

এমন সময় খুব কাছে আওয়াজ উঠল গুব-গুব-গুবক। একটি পূর্ণকুম্ভ কাঁখে তুলে শ্যামলা ছিপছিপে একটি মেয়ে বলে উঠল—বেলা যে পড়ে এল ঠাকুর। আপনার পূজার ফুল, হবিষ্যির সরঞ্জাম সব উঠানের ওপর গুছিয়ে রেখে এসেছি।

এর নাম রোহিণী। এখন সে আশ্রমের সেবিকাপ্রধান। বেশ হাসিখুশি চটপটে মেয়েটি, ভাবলেন শুভপ্রসন্ন। গতকালই এদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর—রোহিণী,

রমারঞ্জন, আরও কে কে। পরে জেনেছিলেন শুভপ্রসন্ন, আজ রোহিণী আশ্রমের সেবিকাপ্রধান, কিন্তু সে-ও চিতাভ্রষ্টা। আশ্রমমায়ের তৎপরতাতেই রক্ষা পেয়েছে। মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে।

একে দেখে তাঁর হঠাৎ আরেকটি মুখ মনে পড়ে গেল। ঘাটের পাশে সন্ধ্যাবেলায় দেখা সেই সদ্যবিধবা, কিশোরী ভিখারিণীর কথা। অথচ তার জন্য কিছুই কি তিনি করতে পারতেন না? এমনকি ফিরে দুটো কথা বলা, দুটো পয়সা দেওয়া—তাও কি পারতেন না?

কানে বাজতে লাগল ওর বিশ্বাস ভরা কণ্ঠস্বর—তুমি তো সন্ন্যাসীঠাকুর বাবা, তুমি আমায় দয়া করো।

চৌষটি ঘাটের চৌষটিটা সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মনে পড়ল তাঁর—তিনি অস্থি-মাংস-সর্বস্ব একজন সামান্য মানুষ মাত্র। তার বেশি কিছু নন। গাঁটে গাঁটে ব্যথা মনে পড়িয়ে দিল জাগতিক, শারীরিক সীমানায় বাঁধা সেই সত্তাটির কথা।

এতক্ষণে সকালের কোলাহল শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে পসারিনিদের বিকি-কিনি, পূজার্থীর ভীড়। লোটাকম্বল গুটিয়ে পদ্ম, বুদ্ধ ভিখিরির দল গুছিয়ে নিয়ে এসে বসেছে আপন আপন জায়গায়। একটি চোঙা নিয়ে কে যেন কী ঘোষণা করছে। কোন্ রাজা আসছেন বুঝি। অমুক জায়গায়, এত ঘটিকা সময়ে।

—কোন্ রাজা?

—আজ্ঞে রাজা রামমোহন রায়।

কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয় রমারঞ্জন। সন্ন্যাসীঠাকুরের পদধুলি মাথায় ঠেকিয়ে বলে :

—আপনারও নিমন্ত্রণ সে সভায়, ঠাকুর। সেই কথাই বলতে এসেছি, আজ্ঞে। তাহলে, আজ আপনারাও এসে নিয়ে যাবো আপনাকে।



সভাগৃহ উপবিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, অধ্যক্ষ ও বৈয়াকরণ সমাবেশে প্রায় পরিপূর্ণ। আরেকদিকে কয়েকজন কালো ফেজ পরিহিত আলেম-উলেমা। দরমা ও মাদুরের পর্দাটির ওপারে চোখ রাখলে দেখা যাবে কিছু চাষাভুষো, মাঝিমাঝী গোছের লোকও এসে দাঁড়িয়েছে।

রমারঞ্জন পাশের সঙ্গীর কানে কানে বললে :

—ঐ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। রামমোহনের শিক্ষকবিশেষ।

ইনি নাকি ছিলেন তাঁর তত্ত্বশিক্ষার গুরু। পরবর্তীকালে 'ইন্ডিয়া গেজেট' সহমরণের উপর একটি রচনাও প্রকাশ করেন। অবশ্য অনেকে সন্দেহ করেন হরিহরানন্দের ছদ্মনামে এর আসল লেখক নাকি রামমোহন স্বয়ং।

‘অসমাপ্ত গানে’

এই সেই পীঠস্থান যেখানে প্রায় একযুগ আগে কিশোর রামমোহন প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। প্রথম গ্রন্থ রচনা করে রুখে দাঁড়ান। বোলো বছরের ছেলোটর ঔদ্ধত্য দেখে নাসিকা কুণ্ঠিত হয়েছিল অনেক অর্কফলাসমৃদ্ধ ব্রাহ্মণদলের। এমনকি তাঁর পিতৃদেবেরও!

—ও ছেলে বয়ে একেবারে গোপ্তায় গ্যাচে।

রামমোহন যেমন কাশীর টোলে বেদাভ্যাস করেন তেমনি পাটনায় আরবি-ফারসী শিক্ষারও তালিম নেন। তাঁর মননে তাই ইসলামধর্মের একেশ্বরবাদ এবং হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান নিরাকার একেশ্বরবাদের বীজ বপন করে।

রমারঞ্জনের সঙ্গীটি বলে ওঠে—

—আচ্ছা, উনি ‘তুহফাং উল মুবাহহিন্দীন’ নামেও একটা বই লিখেছিলেন না?

—ঠিক জানিনা ভাই, তবে গুনেছি মুসলমান শাস্ত্রাদি এত বেশি চর্চা করেছেন যে মৌলবীরা নাকি তাঁকে ‘জবরদস্ত মৌলবী’ বলে। ঠিক তেমনি করেই একদিন দেখা গেল খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিও তিনি সমান আগ্রহী। মৌলবীদের সব গুলিয়ে গেল।

পাদরীরা যেই না ভাবলে তবে বুঝি উনি আমাদের দলের লোক, ধর্মান্তরিত হলেন বুঝি—অমনি খ্রিস্টান মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর ঘোর সংঘাত বাধল।

রামমোহন লিখে, বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করলেন হিন্দুধর্ম আর হিন্দু দর্শনের তুলনা পৃথিবীতে নেই। হিন্দু পণ্ডিতেরা রামমোহনকে বিধর্মী বলেছিলেন, কিন্তু ‘বিধর্মী’ রামমোহনই হিন্দুধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন।

অল্পবয়সী সঙ্গীটি রমারঞ্জনের কানে কানে বলল :

—মানুষটি নাকি হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি আট-নয়টি ভাষায় পারদর্শী। তার একটা প্রভাব পড়বে না? আসলে তিনি এদের ধ্যান-ধারণা-চিন্তার অনেক ওপরে।



এইসময়ে যেন অমানিশার অন্ধকার বিদূরিত করে হল নবসূর্যোদয়। দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ পৌরুষদীপ্ত এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হল। তাঁর চোখ দুটিতে যেন প্রমিথিউসের আগুন, নাসিকা শাবিত খজুরের মতো। ইস্পাতকঠিন ওষ্ঠাধরে বিষাদম্মান হাসি—যেন মেঘাবৃত সূর্যকিরণের লাবণ্য। তাঁর চলাফেরা রাজার মতোই আভিজাত্যমণ্ডিত। কথায় হীরকের দ্যুতি।

সভা যেন সহস্র আলোকে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। সভাপ্ত সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি যে সুগভীর বক্তব্য রাখলেন তাতে মোহাবিষ্ট হল শ্রোতার দল।

কতো কথাই যে বললেন তিনি, কিন্তু কটি কথা যেন গ্রুপদের মূল তানের মতো ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল—

শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী হলেই শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হয় না। শিখতে হবে

বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা। *mens sana in corpore sano**—তাই জানতে হবে দৈহিক গঠনতন্ত্র। না হলে মানুষকে সুস্থ করবে কেমন করে?

বাংলায় সহজ গদ্য ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে। সে ভাষায় গদ্য লিখতে হবে। না হলে সাধারণ মানুষ বুঝবে কেমন করে?

তেননই, ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করলে চলবে না, তাতেও প্রস্তুত করতে হবে আমাদের নিজেদের। ইংরাজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বর্জন করলে তা বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার সামিল হবে। সতীদাহ আইনত বন্ধ হয়েছে মাত্র আজ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের মন থেকে এই ধরনের কুসংস্কার, এ রকম যতো কুৎসিৎ ধ্যান-ধারণা আছে, সব সমূলে উৎপাটন ও ভস্মীভূত করতে হবে।

এ যজ্ঞে নারী পুরুষের সমান দায় ও দায়িত্ব। পশ্চিমে আজ নারী তার লজ্জা, ভয়, সংস্কারের নির্মোক ভেঙে বিস্তারিত হচ্ছে সংগ্রামে। উল্লেখ করলেন মেরী উলস্টোনক্রাফ্টের নাম। ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র—স্বাধীনতা-সাম্য-ভ্রাতৃত্বের চেতনায় তিনি অনুপ্রাণিত। সে স্বপ্ন কেমন করে সম্ভব নারীর ভূমিকা ব্যতিরেকে? নারী যে সংসারের, সমাজের, দেশের অর্ধাঙ্গিনী।

এ স্বাধীনতা, এ সাম্য নারী-পুরুষ নির্বিচারে প্রযোজ্য। উলস্টোনক্রাফ্টের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবন-সংগ্রাম যেন তাঁকে আলো দেখায়।

জলদগড়ীর স্বর বেজে উঠল বীণার নিষাদে :

“স্ট্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? ... আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ট্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণটরাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন তাহারা সর্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত আছে। বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হইলেন।

“দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরাশঙ্করূপ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি; কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ট্রীলোক অশঙ্করূপের স্বৈর্য্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অশঙ্করূপের স্বৈর্য্য নাই!...”



রূপমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, তুমি কোথায়? শুভপ্রসন্ন চারদিকে তাঁকে খুঁজে বেড়ালেন। রূপমঞ্জরী তাঁর সতীর্থ, তাঁর প্রথম বন্ধু। আজ এতদিন পরে এ মুহূর্তে এইসব কথা, এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে।

* বলিষ্ঠ মনের জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ দেহ।

‘অসমাপ্ত গানে’

রূপমঞ্জরী তো অসূর্যস্পর্শরূপা, অন্তরালচারিণী নয়। তবে সে কেন এল না এ সভায়? বিদ্যালঙ্কার কি সভায় যোগদানের চেয়ে কর্মযজ্ঞেই বেশি বিশ্বাসী? সে হয়ত এখন কোন দুঃস্থ আতুরের সোয় মগ্ন—ভাবলেন সম্যাসীঠাকুর।

তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলেন যে যদিও মাঝিমাল্লা আপামর মানুষের জন্য এ সভার দ্বার উন্মুক্ত, নারীর স্থান নেই কিন্তু সেখানে। মেয়েমানুষের এসে বসার কথা এই সভাতেও কেউ ভাবেনি।

আগামীকাল বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধের দিন-পাৰ্ব হয়েছে—মনে মনে ভাবলেন সম্যাসী।

তারপর ঘরে ফিরে শুভপ্রসন্ন একটি প্রদীপ জ্বাললেন। বার করলেন দোয়াত, কালি কলম। দুটি চিঠি লিখলেন। তারপর লেফাফা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিলেন।



গত কদিন হল বিদ্যালঙ্কার এক আশ্চর্য তদ্রাজস্রতা বোধ করছেন মাঝেমাঝে। কখনো এক বিবশ ভাব, কখনো এক মায়াঘোর যেন তাঁকে আশ্রিত করে। এক ধরনের বিবমিষা— আবার এক ধরনের চিন্তাচঞ্চল্যও বলা যায়। বিদ্যালঙ্কার বিব্রত বোধ করেন। বুঝে উঠতে পারেন না, কী হচ্ছে তাঁর মধ্যে? এক শারীরিক, না মানসিক? তিনি কি আসন্ন তর্কযুদ্ধ-সভার জন্য মনে মনে অস্থির বোধ করছেন? কিন্তু তিনি তো জানেন

ন জায়তে প্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ

নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোভয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

জ্ঞানীর যে জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই, এই আত্মা কোনো কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই, আত্মা হইতেও কেহ উৎপন্ন হন নাই; তিনি অজ নিত্য শাস্বত ও পুরাণ; শরীরের আঘাতে তিনি তো আহত হন না।

তবে? তবে কেন এমন হয়? জয়-পরাজয়, চিন্তাচঞ্চল্যের তো প্রশ্নই হয় না।

এমন সময় রোহিণী এসে বিদ্যালঙ্কারের হাতে দুটি চিঠির খাম দিয়ে গেল। বললে :

—রমারঞ্জন দাদা এসেছিলেন মা। জানো, সতীদাহ নাকি আইন কইরে বন্ধ হয়ে গেছে। আর সহমরণের নামে পুড়িয়ে মারা চলবে না।



প্রথম চিঠিটি বিদ্যার্ণব তর্কপঞ্চাননের কাছ থেকে। বিদ্যার্ণব লিখেছেন—
তর্কসভার আর প্রয়োজন নাই। যোশীমঠের মহাচার্য জানিয়েছেন যে উপস্থিত বিদ্যার্ণব
ও বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর মতের কোন অমিল নেই। যদিও তিনি আদি শঙ্করাচার্যের
পন্থায় বিশ্বাসী সন্ন্যাসী, তদাপি বিদ্যালঙ্কারের অভিমত তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার
করেন। চিঠির শেষে জানিয়েছেন বস্তুত জীবনের প্রথম পাঠ তাঁদের একই আচার্যের
সান্নিধ্যে—সেই একই মননে, একই মন্ত্রে তাঁরা দুজনেই বীক্ষিত। সেই হিসাবে তাঁরা
সতীর্থ। কাজেই সর্বসমক্ষে তর্কযুদ্ধের প্রয়োজন অর্থহীন। আগামী বুধবার,
শুভদিন—সেদিন পূর্বাঙ্কেই তিনি যাত্রা করবেন যোশীমঠে।

দ্বিতীয় চিঠিটি :

হট্টা বিদ্যালঙ্কার শ্রদ্ধাস্পদেষু
কল্যাণীয়া প্রিয় মঞ্জু,

বহুদিন পর বহু ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ তোমার খুব কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।
তুমিও এই শহরেই এত কাছে আছো ভাবিতে রোমাঞ্চ বোধ করিতেছি। অথচ
লোকারণ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়, এমন ইচ্ছা করি না। তোমার ইচ্ছা না হইলে না
হয় না-ই বা সাক্ষাৎ হইল।

আজ তোমাকে যাহা লিখিতেছি তাহা না জানাইয়া গেলে মনে একটি শূন্যতা লইয়া
মরিব, তাই না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমিই জয়ী হইয়াছ, মঞ্জু। জীবনযুদ্ধের এ কঠিন খেলায় শত প্রতিকূলতা তোমাকে
পরাস্ত করিতে পারে নাই। নিজে আপনি জুলিয়া তুমি শত শত প্রাণে দীপালি
জ্বালাইয়াছ। তোমার কথা রোহিণী, ঈশান, রমারঞ্জনর কাছে শুনিয়া আনন্দ-গর্বে
আমার বুক ভাসিয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের আলো দশদিক আলোকিত করে সত্য, কিন্তু প্রেমের আলো আপন
অন্তরের দীপশিখাটি প্রজ্বলিত করে। সেই দীপশিখা আমাদের একার পথচলায় আলো
দেখায়। হাজার মনে দীপিকা জ্বালায়। তোমার স্মরণ হয়, আচার্য
বলিতেন—‘আত্মদীপো ভব’?

তুমি ‘আত্মদীপ’ হইয়াছ মঞ্জু। তুমি সংসারের মাঝে আপন জীবন সফল করিয়াছ।

তুমি আমার কনিষ্ঠা। তবু আজ ইচ্ছা হয় শ্রদ্ধায় তোমাকে প্রণাম করি। ইচ্ছা হয়,
বন্ধুর মতো অভিনন্দন-আলিঙ্গন জানাই।

ইতি—

তোমার শুভদা



আশ্রমে আজ বহুলোকের সমাগম। যে মানুষটি তাদের অসুস্থতার খবরে সর্বাগ্রে ছুটে এসেছেন, আপন চেষ্টায় ভালো করে তুলেছেন, আজ তিনি শেষশয্যা়া শায়িত। আর ওরা আসবে না?

সাধারণ মানুষ আনে পূজার ফুল, প্রসাদ, প্রার্থনার অশ্রুজল তাঁর আরোগ্য-কামনার্থে। আসেন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, বিদ্যার্ণব, বিদ্যাচঞ্চু — জ্ঞানী-গুণীর দল।

একসময়ে, দিনশেষে, বিদ্যালঙ্কার বলেন :

—রোহিণী-মা, একবার তাঁকে আসতে বল?

—কার কথা বলছ মা?

—শুভদা।

—তিনি কে?

—আমার গুরু, প্রথম গুরু। আমার আবাল্যের বন্ধু। যোশীমঠের সন্ন্যাসীঠাকুর। তাঁকে একবার খবর দে।



শুভপ্রসন্ন শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। রূপমঞ্জরী তাঁর হাতটি নিজ করতলে তুলে নিলেন। আপন ললাটে, কপোলে, অধরে নিয়ে ঠেকালেন। বললেন :

—আজ আমার বড় সুখের দিন, শুভদা। বড় শান্তির দিন। এমন শান্তি আমি জীবনে পাইনি। তাই আর দেরী করতে চাই না। আসি।

একটু থেমে আবার বললেন,

—এতদিন পরে তুমি এলে, একটু সেবা করতেও পারলাম না। দাও, তোমার পায়ের ধুলো দাও। উঠে যে নেব সে ক্ষমতাও নেই আর আজ। আমি তো আর আগের মতো নেই। দেখছ তো অবস্থা।

শুভপ্রসন্ন তাঁর মুখে, চোখের পাতায়, আঙুল বুলিয়ে দিলেন সম্মেহে।

—মঞ্জু, তুমি সুন্দর। এখনও সুন্দর।

রূপমঞ্জরী ক্ষীণ হেসে বললেন :

—মনে আছে, তুমি আশীর্বাদ করেছিলে—মঞ্জুভাষিনী! মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে সুন্দরাং বিপ্রয়োগঃ।

(হে মঞ্জুভাষিনী! আশীর্বাদ করি সারাজীবনে ক্ষণকালের জন্যও তুমি যা কিছু 'সুন্দর' তা থেকে বিচ্যুত হয়ে না।")

শুভপ্রসন্ন চোখ মুছলেন।

—একটা কথা শুভদা, এদের তুমি দেখো। আর দেখো, যদি পারো, ঘরে ঘরে মেয়েরা যেন সুশিক্ষার সুযোগ পায়। যদি পারো সোএগই গ্রামে একটা মেয়েদের বিদ্যালয় খুলো। যেমন করে পারো ওদের উৎসাহ দিয়ো।

শুভপ্রসন্ন ওঁর জরাজীর্ণ হাতখানি তুলে নিলেন আপন মুঠিতে।

—কাল এক অদ্ভুত মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, মঞ্জু। কী তাঁর বক্তৃতা, কী ব্যক্তিত্ব। স্ত্রীজাতির শিক্ষা, স্বাধীনতা, তাদের অস্ত্রনিহিত শক্তি, মেধার কথাই বলছিলেন তিনি। আহা, তোমার সঙ্গে যদি একবারটি দেখা হতো।

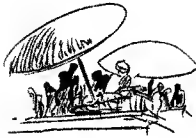
রূপমঞ্জুরী চোখ তুলে চাইলেন।

—সতীদাহ আইনত বন্ধ হয়েছে।

অন্ধকার রাত্রে এক পলকের জন্য যেন দিগন্তজুড়ে বিদ্যুৎ-আলোক ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল।

রূপমঞ্জুরী পরম নিশ্চিন্তে চোখের পাতা বুজলেন।





সাঁঝের আলো নিভে আসে। অন্ধকারের মাঝে ফুটে উঠতে থাকে একটি একটি আলো। প্রদীপের আলো। প্রদীপ হাতে এগিয়ে আসে ওরা কারা? রূপমতী, সত্যবতী, চন্দ্রাবতীর দল।

—চিনতে পারলে না, কবি? আমি রূপমতী। স্বর্ণালী অবগুষ্ঠন সরিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়ন মেলে সে চেয়ে রইল।

—রূপই যে আমার কাল হয়েছিল, মনে নেই? মা আমাদের নিজে হাতে বিষ খাইয়েছিলেন ইজ্জত বাঁচাতে। লিখেছ তো তোমার বইয়ে, আর এখন ভুলে গেলে?

এগিয়ে এল আগুনের ফুলঝুরি নিয়ে সত্যবতী। সর্পিল বেণী দুলিয়ে ঘাগরায় রামধনুর ঝিলিক তুলে নীবিবন্ধ থেকে এক ঝলকে উৎসারিত করল ক্ষুরধার ছুরিকা। এলিয়ে দিল গা।

—আমি সত্যবতী গো। অত সহজে প্রাণ দিইনি। খুন কা বদলা খুন। বেশরম লম্পটটার গর্দান নিয়ে তবেই দিয়েছি বেণির সঙ্গে মাথা। হাসির জলতরঙ্গে ভেঙে পড়ল খানখান।

আর ঐ চন্দ্রাবতী। ‘ময়মনসিংহগীতিকা’র কবি হিসাবেই ছিল যাঁর খ্যাতি। পিতা কবি বংশীদাস ভট্টাচার্যের চতুপ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে কিশোরী চন্দ্রাবতীর রূপেগুণে মুগ্ধ এক ভ্রমর জয়চন্দ্র প্রেমে পাগল হয়েছিল। পরস্পর বিবাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল ওরা। তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল! এক যবনীর প্রতি আকৃষ্ট হয় জয়চন্দ্র। স্বগ্রাম ত্যাগ করে, ধর্মান্তরিত হল, বিবাহ করলো ঐ মুসলমান রমণীকে।

এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে কিছুদিন পরেই যবনীর মৃত্যু হয়। তখন জয়চন্দ্র প্রত্যাবর্তন করে জানায় যে এখন সে চন্দ্রাবতীর পাণিপ্রার্থী। প্রয়োজনে নাথপন্থী হয়ে, অথবা বৈষ্ণব। চৈতন্যদেবের তিরোধানের কয়েক দশকও অতিক্রান্ত হয়নি তখন। কিন্তু চন্দ্রাবতী জানান যে চিরকুমারী থেকে গৃহদেবতার পূজাঅর্চনা আর সাহিত্যসেবায় জীবন কাটিয়ে দেবেন তিনি।

জয়চন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে জানতে চাইলেন, তুমি আমাকে আর ভালোবাস না?

চন্দ্রাবতী স্নান হেসে বললেন, সেটাই তো সব চেয়ে বেদনার। বাসি!

—তাহলে কোথায় তোমার আপত্তি? ‘ধর্ম’ ত্যাগ করতে?

—হ্যাঁ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের কথা বলছি না। আমার ‘নারীত্ব ধর্মের’। সেটা ত্যাগ করতে পারব না।

জনশ্রুতি, জয়চন্দ্র আত্মহত্যা করেন এবং সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র মুর্ছিতা হয়ে ভুলুগ্ধিতা হন চন্দ্রাবতী। সে মুর্ছা তাঁর আর ভাঙেনি।



এরা সবাই আমার পূর্বসূরি গো। এদের নির্যাসেই তো গড়লে আমরা। আর আজ ভুলে গেলে? রূপমঞ্জরী অভিমানাহত।

কথাকোবিদের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

এরা আসে বারবার। দীপালি জ্বালাতে। এ মহাঅমানিশার অন্ধকার দূর করতে। যুগে যুগে। কিন্তু এ আঁধার যে বড় বিকট।



রূপমঞ্জরী ঘনিয়ে আসে। সোএগই গ্রামের সেই কাজল-নয়না মেয়েটি, ঘুম-না-আসা রাতে যে শোনাতে আসত তার হাসি-কান্নার গাথা। কথাকোবিদের চিবুক তুলে ধরে —ওগো ওঠো। আমি তোমার মানসকন্যা। শোনো, চেয়ে দেখো।

কিন্তু কথাকোবিদের চোখ ঘুমে ঢলে আসে।



রূপমঞ্জরীর গল্প শেষ হয় না। এ গল্প যে শেষ হবার নয়। এ সংগ্রাম যে অনন্তকালের। এ সংঘাত যে বিপুল। পৃথী জুড়ে।

নিপ্রভাত রাত্রি নেই। পূব দিগন্তে ফুটে ওঠে উয়ারানীর আঁচলবিছানো রক্তিম প্রতিশ্রুতি। সেইক্ষণে চেয়ে দেখো, আকাশে চোখ মেলে। এ গল্পের নায়কের দেখা মিলবে। সেই একক বিহুদ—যে বিশ্বাস করে ‘আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অঙ্গন’।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

1. রূপমঞ্জরী ১ম ও ২য় খণ্ড—নারায়ণ সান্যাল
2. রূপমঞ্জরী—নবকল্লোল ১৪১১ বৈশাখ-ফাল্গুন সংখ্যা।
3. শ্রবকুসুমাজলি—স্বামী গভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন।
4. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান—সাহিত্য সংসদ
5. বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন—দে'জ পাবলিশিং
6. রামমোহন রচনাবলী—দে'জ পাবলিশিং
7. আমরা বাঙালি—শিশু সাহিত্য সংসদ
8. A Vindication of the Rights of Women : With Structures on Political and Moral Subjects—Mary Wollstonecraft, London, J. Johnson, and Boston, Thomas & Andrews, 1792, second edition, London, J. Johnson, 1792.
9. শ্রী প্রদীপ দত্ত—যিনি স্থিরনির্দিষ্ট করেন যে লেখক শ্রী নারায়ণ সান্যাল শেষ অংশ নিজে হাতে লিখে যাননি।
10. শ্রী প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত—গল্পটির শেষাংশ তিনি যেমন শুনছিলেন স্বয়ং লেখকের মুখ থেকে, মিলিয়ে নিতে আমাকে সাহায্য করেন ও Mary Wollstonecraft সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করেন।
11. শ্রী সুবাস মৈত্র—যাঁর সাহচর্য ও উৎসাহ না পেলে এই লেখাটি শুরু ও শেষ করার সাহস বা উদ্যম সম্ভব হত না।